বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের অগ্রগতিতে সাহিত্যপত্রিকার ভূমিকা

(১৯৪৭ - ৭১)

Ph.D.

মুহম্মদ ইসমাইল খান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের অগ্রগতিতে সাহিত্যপত্রিকার ভূমিকা

(১৯৪৭ - ৭১)

GIFT

মুহম্মদ ইসরাইল খান

Dhaka University Library
382281

382281

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জুলাই ১৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

মুহম্মদ ইসরাইল খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আমার তত্ত্বাবধানে 'বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের অগ্রগতিতে সাহিত্যপত্রিকার ভূমিকা (১৯৪৭-৭১)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে পরীক্ষণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ২৮/১৯৮৯-৯০।

তাঁর এই অভিসন্দর্ভ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত হয়নি এবং এ অভিসন্দর্ভের কোন অংশ কোথায়ও ছাপা হয়নি।

(আবুল কাসেম ফজলুল হক)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
এবং
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

382281

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

বর্তমান অভিসন্দর্ভ প্রণয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করার পর থেকেই আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বর্তমান অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক জনাব আবুল কাসেম ফজলুল হকের নির্দেশনায় বাংলা ভাষার প্রবীণ সাহিত্যিক ও গবেষকদের কাছে গিয়ে পাকিস্তান আমলের সাহিত্যপত্রিকা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকি। বিভিন্ন গ্রন্থাগার এবং ব্যক্তিগত-সংগ্রহও অনুসন্ধান করে বেড়িয়েছি। অনেক জায়গা ও ব্যক্তির নিকট থেকেই কার্যকর কিছু পাইনি। তবে যাঁরা পথ-চলতে আমাকে দিশা দিয়েছেন আর যে-সকল সম্পাদক বা তাঁদের সহযোগী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পত্রিকা সম্পর্কে নানান তথ্য অবহিত করে, এমনকি কেউকেউ তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ ঘেঁটে সম্পাদিত পত্রিকার নমুনাকপি আমাকে সস্নেহে উপহার দিয়ে আমার গবেষণা-কর্মকে সার্থক করে তুলতে সহায়তা করেছেন, তাঁদের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে অপরিসীম কৃতজ্ঞতা অনুভব করছি। এটা যদি বাঙালির সাহিত্যপ্রয়াসের ও সংস্কৃতি-সাধনার একটি ঐতিহাসিক কালের ক্ষুদ্র একটা ইতিহাস হয়ে থাকে, তাহলে তাঁরা সেই জাতীয় ইতিহাস-এর জন্য তথ্য সরবরাহ করে জাতীয় দায়িত্বই পালন করেছেন। যাঁরা তথ্য সরবরাহ না-করলে এই গবেষণাকর্ম নানাদিক থেকে দুর্বল ও অপূর্ণ থেকে যেতো — তাঁদের মধ্যে এই মুহূর্তে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি কয়েকটি উজ্জ্বল নাম ঃ

ডক্টর আহমদ শরীফ
ডক্টর মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (অন্যতর সম্পাদক, পূর্বমেঘ; সম্পাদক সুন্দরম)
ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ
অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (অন্যতর সম্পাদক, পূর্বমেঘ)
জনাব মাহবুব উল আলম চৌধুরী (সম্পাদক, সীমান্ত)
ডক্টর আনিসুজ্জামান
ডক্টর ওয়াকিল আহমদ
ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (অন্যতর সম্পাদক, সংলাপ)
কবি আবুল হোসেন (অন্যতর সম্পাদক, সংলাপ)
জনাব আতোয়ার রহমান (কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক)
জনাব মফিজউল হক (সম্পাদকমণ্ডলীর সভপতি, পরিচিতি)
কবি আতাউর রহমান
কবি শামসুর রাহমান
অধ্যাপক আবু রুশ্‌দ মতীনউদ্দীন (কথাসাহিত্যিক)
জনাব রশীদ করীম (কথাসাহিত্যিক)
অধ্যাপক মহীউদ্দীন আহমদ (তমদ্দুন মজলিশ)
ডক্টর রফিকুল ইসলাম (অন্যতর সম্পাদক, পরিক্রম)
ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (অন্যতর সম্পাদক, পরিক্রম; সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা)
ডক্টর এনামুল হক (উত্তরণ)
কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ (নির্বাহী সম্পাদক, পূবালী)
অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ (সম্পাদক, কণ্ঠস্বর)
কবি রফিক আজাদ (অন্যতম সম্পাদক, স্বাক্ষর)

382281

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কবি আসাদ চৌধুরী (অন্যতম সম্পাদক, স্বাক্ষর)

জনাব ফজলুল হক সরকার (সম্পাদক, পলিমাটি)

জনাব সৈয়দ আবুল মকসুদ (অন্যতম সহযোগী সম্পাদক, নাগরিক)

জনাব আহমদ ছফা (কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক)

মিসেস শ্যামলী নাসরীণ চৌধুরী (যাত্রিকের অন্যতম সম্পাদক শহীদ ডাক্তার আবদুল আলীম চৌধুরীর স্ত্রী)

ডক্টর ভূঁইয়া ইকবাল (সম্পাদক, পূর্বলেখ)

ডক্টর খোন্দকার সিরাজুল হক (অন্যতর সম্পাদক, যাত্রী)

জনাব লুৎফর রহমান সরকার (রম্যরচনা-লেখক ও সাহিত্যপত্রিকার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক)

কবি সানাউল হক

জনাব মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন (সম্পাদক, সওগাত)

ডক্টর মযহারুল ইসলাম (সম্পাদক, উত্তর-অন্বেষা ; সম্পাদক, সাহিত্যিকী)

মিসেস রাবেয়া চৌধুরী (দিলরুবা পত্রিকার সম্পাদক মরহুম এ. এইচ. এম. আবদুল কাদেরের স্ত্রী)

জনাব বশীর আল হেলাল (কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক)

আমিনুল ইসলাম বেদু (সম্পাদক, সাম্প্রতিক)

যে সমস্ত গ্রন্থাগারে কাজ করেছি তার মধ্যে উল্লেখ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ; কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, শহীদুল্লাহ গবেষণাকক্ষ (বাংলা একাডেমী), জাতীয় যাদুঘর গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার ইত্যাদি। এইসব গ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ আমাকে যে সহযোগিতা দান করেছেন তা অতুলনীয়।

জনাব শামসুজ্জামান খান, জনাব আজহার ইসলাম, জনাব আমিরুল মোমেনীন, ডক্টর খোন্দকার রিয়াজুল হক, জনাব মাসুদুর রহমান, জনাব শেরজাহান সিদ্দিকী প্রমুখ বাংলা একাডেমীতে কাজের সময় আমাকে মূল্যবান সহযোগিতা দান করেন। গবেষণার অবকাশ ও উৎসাহ দিয়েছেন আমার স্ত্রী আনোয়ারা খান। তাঁদের সহযোগিতা ব্যতীত এ কাজ কোনো অবস্থাতেই সম্পন্ন হতো না।

অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন ও মুদ্রণের কালে সময়ে-অসময়ে নানান ব্যাপারে বিরক্ত করেছি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক জনাব আবুল কাসেম ফজলুল হককে। তাঁর ঋণ মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশে পরিশোধনীয় নয়। কাশবন মুদ্রায়ণ (১ ভিতরবাড়ি লেন, নবাবপুর, ঢাকা ১১০০) এর সত্ত্বাধিকারী ভ্রাতৃপ্রতিম জনাব আমিনুল ইসলাম এবং তাঁর তিন সহকর্মী সর্বজনাব মোঃ মোজাম্মেল হক, মোঃ আবুল কালাম খান এবং মোঃ সোবান আলীর সানন্দ-সহযোগিতা ব্যতীত এই অভিসন্দর্ভ মুদ্রণের কাজ এতো তাড়াতাড়ি শেষ করা সম্ভবপর হতো না। তাঁদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ।

মুহম্মদ ইসরাইল খান

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা : গবেষণার উদ্দেশ্য ও অনুসন্ধানের বিষয়

প্রথম অধ্যায়

সাহিত্যপত্রিকা ও তার বহুমাত্রিক ভূমিকা ১–৩১

১.১. সাহিত্যপত্রিকার স্বরূপ ১
১.২. বাংলা ভাষায় সাহিত্যপত্রিকার ঐতিহ্য ৩
১.৩. সাহিত্যপত্রিকা ও কালের দাবী ৯
১.৪. সাহিত্যপত্রিকা, সাহিত্যিকগোষ্ঠী ও সাহিত্য–আন্দোলন ১৪
১.৫. সাহিত্যপত্রিকা ও সাময়িকপত্র বিষয়ে গবেষণার ঐতিহ্য, সাম্প্রতিক প্রবণতা ১৬
১.৬. বর্তমান অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ১৯
১.৭. আলোচ্যকালের পত্রিকা-পরিস্থিতি ও প্রধান প্রধান পত্রিকা ২০
১.৮. বিভিন্ন ধারার সাহিত্যপ্রয়াসের বিচিত্র পরিচয় ২৪
তথ্যপঞ্জি ২৮–৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাকিস্তানকালের পূর্ব বাঙলার সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও
সাহিত্যিক–সাংস্কৃতিক পটভূমি ৩২–৬৮

১ সামাজিক অবস্থার রূপান্তর ও ভারত–বিভক্তির সম্ভাবনা; পলাশীর 'পাপের ফল'; বৃটিশ ভারতের গণবিদ্রোহ; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজনিত সামাজিক সংকট ও সাহিত্যসংস্কৃতিতে মধ্যশ্রেণীর প্রাধান্য; হিন্দুজাগরণের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় মুসলিমজাগরণ; মুসলিম-লীগের প্রভাব; ভারত বিভক্তি ও 'স্বাধীনতার রুদ্ধপুলকের ফুটন্ত আবেগের পথরোধ; মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের পাকিস্তানে ক্ষমতা দখল; সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা; উদ্বাস্তু ও মোহাজের সমস্যা; কৃষি ও কৃষক এবং পাটচাষীদের দুর্ভোগ; আর্থিক অবস্থার অবনয়ন; পূর্বপাকিস্তানে 'পকেটলীগে'র তৎপরতা; বাঙালি জাতীয়তাবাদীচেতনা ধ্বংসের পাঁয়তারা; ৩২–৩৬

২ রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও আন্দোলন : পাকিস্তানী সংস্কৃতি ও সংহতির জন্যে নানা বিকৃত উপায় অবলম্বন ; ভাষার প্রশ্নে পাকিস্তানের প্রথম সরকার–বিরোধী গণআন্দোলন; একুশে ফেব্রুআরি আন্দোলনের আর্থ–সামাজিক–রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট; যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা; যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ফলাফলে পশ্চিম পাকিস্তানী তথা কেন্দ্রীয় সরকারের গাত্রদাহ; নির্বাচনের ফলাফল বানচালের পাঁয়তারা; পূর্বপাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতা; সামরিক শাসন জারি; প্রেসিডেন্ট আইউব খানের কার্যাবলী; আইউব-বিরোধী ছাত্র ও রাজনৈতিক আন্দোলন; রাজনৈতিক দলের পুনরুজ্জীবন; নয় নেতার বিবৃতি ; পাক–ভারত যুদ্ধ; ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের সায়ত্তশাসন দাবি ; ছয় দফা; আন্দোলন দমনের জন্য আইউব সরকারের দমন–নির্যাতন–নিপীড়ননীতি অবলম্বন; আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত বন্দীদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ; গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে উদ্ভূত ১১ দফার দাবিতে ছাত্রদের আন্দোলন; উনসত্তরের গণ–অভ্যুত্থানের পরিণতিতে ক্ষমতার মঞ্চ থেকে আইউব খানের বিদায় গ্রহণ ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ক্ষমতার মঞ্চে ইয়াহিয়া খানের আগমন; উপকূলবর্তী অঞ্চলে সত্তরের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও সত্তরের সাধারণ নির্বাচন; আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়লাভ; নির্বাচনের ফলাফল বানচালের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীদের ষড়যন্ত্র এবং বাঙালি-দমন–নিধনের জন্য সামরিক বাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞ; বাঙালির প্রতিরোধ সংগ্রাম এবং বাঙলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ৩৬–৫০

Dhaka University Institutional Repository

৩. বাংলার রাজনীতি ও সাহিত্যসংস্কৃতি ভাবনায় কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রভাব—ভারতবর্ষ তথা বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ; মার্কসীয় রাজনীতি ও সংস্কৃতি চর্চার প্রভাব ; পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ও তার কার্যক্রম ; গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠন ; গনতন্ত্রীদলের জন্ম ; ভাষা-আন্দোলন ও ১৯৫৪ সনের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ; কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম দমনের জন্য পাকিস্তান সরকারের কঠোর নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা ; কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা ; ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) এর জন্ম এবং মার্কসীয় চিন্তাধারার কর্মীদের মধ্যে চীন-সোভিয়েত মহাবিতর্কের প্রভাব ; কমিউনিস্ট পার্টি ও তার বিভিন্ন অঙ্গদলের মধ্যে ভাঙন ; সাংস্কৃতিক অঙ্গনে চীন–রাশিয়ার মার্কসীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাব ; বাঙালি কবি-সাহিত্যিক–বুদ্ধিজীবীদের মার্কসীয় ভাবধারায় অনুপ্রেরণা লাভ ৫০–৫৩

৪. পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ধরণ—যুক্ত অর্থনীতির নামে পুঁজিপতি ২২-পরিবার সৃষ্টি এবং কৃষক জনসাধারণকে শোষণের মাধ্যমে ভূমিহীনে রূপান্তরের প্রক্রিয়া ; পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতিতে বৈষম্য ; আইউব সরকারের গৃহীত অর্থনৈতিক পদক্ষেপ ৫৩–৫৫

৫. সাংস্কৃতিক ঘটনাবলী : পূর্বপাকিস্তানের সাংস্কৃতিকপরিস্থিতি ; চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক অবস্থা ; হরিখোলার মাঠে অনুষ্ঠিত ১৯৫১ সনের সাংস্কৃতিক সম্মেলন ; সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ ; সভাপতি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিদের বক্তব্য ও ভাষণ ; সম্মেলনের মূল্যায়ন ; ঢাকা ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সম্মেলন, আন্দোলন এবং এক্ষেত্রে চট্টগ্রামের সংস্কৃতিকর্মীদের বিশেষ ভূমিকা ; ১৯৫২ সনের কুমিল্লা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন ; সম্মেলনের কার্যক্রম ও সভাপতির ভাষণ ; ১৯৫৪ সনে ঢাকার কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন ও এর সমালোচনা ; চট্টগ্রাম 'প্রান্তিক নবনাট্য সংঘে'র পরে 'ইস্ট এণ্ড ক্লাব' ও 'কৃষ্টিকেন্দ্রের' উজ্জীবন এবং 'নারী সমিতি' ; 'পাকিস্তান লেখক সংঘে'র মাধ্যমে আইউব কর্তৃক দেশের বুদ্ধিজীবীদের সমর্থনলাভের চেষ্টা ; 'প্রগতি লেখক সংঘে'র পরে 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' এর প্রতিষ্ঠা; 'একুশে ফেব্রুআরি' সংকলন ও 'পুঁথিপত্র প্রকাশনী'র সৃষ্টি; 'বাফা' ও 'বাংলা একাডেমী'র প্রতিষ্ঠা; হরফ ও ভাষা সংস্কারের প্রয়াস; ১৯৪৮–৪৯ সনের পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন; ১৯৫২ সনের নিখিল পাকিস্তান চিত্রপ্রদর্শনী (ঢাকা) ও তমদ্দুন মজলিশের ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন ১৯৫২; ১৯৫৭সনের নিখিল পাকিস্তান সঙ্গীত সম্মেলন; সিপাহী যুদ্ধের শত–বার্ষিকী পালন; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজী বিভাগের সাহিত্য সেমিনার (১৯৫৮); ১৯৫৮ সনের চট্টগ্রামের পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন; পাকিস্তান লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠা (১৯৫৯); পাক ভারত যুদ্ধ ও ৬ই সেপ্টেম্বর পুরস্কার প্রবর্তন; ১৯৬৮ সনে 'উন্নয়ন দশক' পালন ও বাংলা একাডেমীর সাহিত্য সেমিনার; উন্নয়ন দশক পালনের উদ্দেশ্য; রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধকরণের বিতর্ক ও 'ছায়ানট' এর প্রতিষ্ঠা; পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উদযাপনের রেওয়াজ চালু; 'পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি' বই নিয়ে আন্দোলন এবং বুদ্ধিজীবীদের মুক্তিসংগ্রামের শপথ গ্রহণ ৫৫–৫৬ তথ্যপঞ্জি ৬৬–৬৮

তৃতীয় অধ্যায়

পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী,ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী, সরকারী ও বেসরকারী সাহিত্যপত্রিকা ৬৯–১৭৬

প্রস্তাবনা ৬৯; ১. মোহাম্মদী (১৯২৭–৭০) ৭০; ২. আল ইসলাহ্ (১৯৩২–৭১) ১০৯; ২ মাহেনও (১৯৪৯–৭১) ১১৪; ৪. দিলরুবা (১৯৪৯–৬৪) ১২৫ ; ৫. নও–বাহার (১৯৪৯–৫৪) ১৩২; ৬. তাহজিব (১৯৫০) ১৩৭; ৭. দ্যুতি (১৯৪৯–৫৩) ১৪০; ৮. পূরবী (১৯৬০) ১৪৯; ৯. লেখক সংঘ পত্রিকা (১৯৬১–৬২) ১৫০; ১০. পরিক্রম (১৯৬২–৭০) ১৫২; ১১. সংলাপ (১৯৬১–৭০) ১৫৮ ; ১২. উত্তর অন্বেষা (১৯৬৭–৭০) ১৬১

পূর্বোক্ত ধারার কতিপয় অপ্রধান পত্রিকা

১. নওরোজ (১৯৪২–৭০) ১৬৫ ; ২. জাগরী (১৯৫৬) ১৬৬; ৩. অতএব (১৯৬০–৬২) ১৬৭;
৪. প্রবাহ (১৯৬১) ১৬৯; ৫. দিগন্ত (১৯৬৬) ১৬৯ ; ৬. অভিযান (১৯৫৪–৬৪) ১৭০; তথ্যপঞ্জি ১৭১–৭৬

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

মানবতাবাদী ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার সাহিত্যপত্রিকা ১৭৭–২৯৪

প্রস্তাবনা ১৭৭ ; ১. সওগাত (১৯১৮—৮০) ১৭৮ ; ২ ইমরোজ (১৯৪৯—৫৪) ২০৭; ৩. সমকাল (১৯৫৭—৭৭) ২১৪;
৪. পূবালী (১৯৬০—৬৭) ২৩৯; ৫. পুর্বমেঘ (১৯৬০—৭০) ২৫৬; ৬. কণ্ঠস্বর (১৯৬৫—৮৬) ২৬৭

এ ধারার কতিপয় অপ্রধান পত্রিকা

১. মেঘনা (১৯৫৭) ২৭২ ; ২ সাহিত্য (১৯৬০–৬৩) ২৭২; ৩. যাত্রী (১৯৬০–৬২) ২৭৬ ; ৪. সুন্দরম (১৯৬৩) ২৭৭; ৫. স্বাক্ষর (১৯৬৩–৬৬) ২৭৯ ; ৬. স্বদেশ (১৯৬৩–৭০) ২৮২; ৭. পুর্বলেখ (১৯৬৬–৬৭) ২৮৫ ; ৮. মেঘনা (চট্টগ্রাম ১৯৬৭–৭০)২৮৬

এ ধারার কিছুপত্রিকা প্রয়াস

১. অন্ন চাই আলো চাই (১৯৪৯) ২ দিশারী (১৯৫০) ৩. প্রাচী (১৯৫৭) ৪. পরিচিতি (১৯৫৯) ৫. বিবর্তন (১৯৬০) ৬. পরিচয় (১৯৬০) ৭. বইবিচিত্রা (১৯৬০) ৮. যুববাণী (১৯৬০) ৯. বর্তমান (১৯৬২) ১০. বিচিত্রিতা (১৯৬২) ১১. গণমন (১৯৬৩) ১২ সৈকত (১৯৬৩) ১৩. মৌসুম (১৯৬৪) ১৪. বর্ণালী (১৯৬৪) ১৫. বই (১৯৬৫) ১৬. বনানী (১৯৬৬–৬৯) ১৭. সুনিকেত মল্লার (১৯৬৭–৭০) ১৮. একান্ত (১৯৬৭) ১৯. ছোটগল্প (১৯৬৭–৬৮) ২০. সুরভি (১৯৬৮) ২১. কিছুধ্বনি (১৯৭০) ২২ পূর্বাশা (১৯৭০) ২৩. সাম্প্রতিক (১৯৭০) ২৪. বালার্ক (১৯৭০) ২৮৮–২৯০ তথ্যপঞ্জি ২৯০–২৯৪

পঞ্চম অধ্যায়

মার্কসীয় মতবাদ প্রভাবিত কতিপয় সাহিত্যপত্রিকা ২৯৫–৩৫৪

প্রস্তাবনা ২৯৫; ১. কৃষ্টি (১৯৪৭) ২৯৫ ; ২ সীমান্ত (১৯৪৭–৫৩) ৩০০; ৩. সংকেত (১৯৪৮) ৩০৯ ; ৪. অগত্যা (১৯৪৯–৫৩) ৩১০ ; ৫. মুক্তি (১৯৫০) ৩১৭; ৬. পরিচিতি (১৯৫১–৫৩) ৩২৫; ৭. যাত্রিক (১৯৫৩) ৩২৬; ৮. স্পন্দন (১৯৫৩) ৩৩১; ৯. উত্তরণ (১৯৫৮–৬০) ৩৩৫; ১০. পলিমাটি (১৯৬৪–৯৩) ৩৪২; ১১. নাগরিক (১৯৬৪–৭০) ৩৪৫; তথ্যপঞ্জি ৩৫১–৩৫৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার ৩৫৫

পরিশিষ্ট :

ক. প্রকাশের সন ও সম্পাদকের নামসহ আলোচিত পত্রিকার নাম ৩৫৭

খ. একালে প্রকাশিত ও আলোচ্য কতিপয় পত্রিকার প্রচ্ছদের প্রতিলিপি ৩৫৮–৭৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা : গবেষণার উদ্দেশ্য ও অনুসন্ধানের বিষয়

বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতি ও ভাষা-সাহিত্যের অগ্রগতির ক্ষেত্রেই শুধু নয়, — বিশ্বের সকল দেশ, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্যের নবজাগরণে পুনর্গঠনে এবং উন্নতি-অগ্রগতি তথা বিকাশের সার্বিক প্রক্রিয়ায় সংবাদ-সাময়িকী ও সাহিত্য-বিষয়ক পত্র-পত্রিকার এক বিরাট বিচিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উনিশ শতকে বাঙলাভাষায় যেসমস্ত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, তা ধর্মপন্থী, রক্ষণশীল, মানবতাবাদী ও মার্কসবাদী সকল শ্রেণীর গবেষকের ইতিহাস-অনুসন্ধানের লক্ষ্যে মৌলিক তথ্যের আকররূপে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। বিশ শতকের পত্রপত্রিকা থেকেও তথ্য সংগৃহীত হয়ে সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের অগ্রগতির বহুবিচিত্র ইতিহাস তৈরি হয়েছে। গবেষকেরা লক্ষ্য করেছেন— পত্র-পত্রিকাই বাঙলার জাগরণের মূল অবলম্বন, এবং সাময়িকপত্রের পাতাতেই বাংলার জাগরণের এবং জাতির চিন্তা-চর্চার আসল চেহারাটা ফুটে উঠেছে। 'পাকিস্তান আন্দোলন' এবং 'ভারত বিভাগ' তথা উপমহাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামেও পত্র-পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা ইতিহাস পাঠে জানা যায়। শুধু ভারত-বিভক্তি ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে এবং ত্রিশ ও চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনের সহায়ক মাধ্যম হিসেবেই কেবল নয়, এর পূর্বে ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তকালে আর প্রত্যেক যুগে প্রধান প্রধান সামাজিক-রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ও জাতীয় জীবনাদর্শের বিবর্তনকালে প্রচলিত পত্রপত্রিকাসমূহ যুক্তিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ, সমর্থন-অসমর্থন ও বিরোধিতায় অংশ গ্রহণ করেছে। এসব আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য সাহিত্যিক শিল্পী সাংবাদিক সমাজকর্মী ও প্রতিভাবান শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকেরা নতুন নতুন বহু পত্র-পত্রিকা ও শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্মও দিয়েছেন। সমাজের সৃষ্টিশীল ব্যক্তিবর্গ নানান পত্রিকার প্রকাশ, প্রচার ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে নেতৃত্বদান করে সমাজের চিন্তাধারাকে সংগঠিত ও পরিচালিত করেছেন। ফলে শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চর্চার ধারা বিকশিত হয়েছে। শিল্প-দর্শন, বক্তব্য ও নৈতিক প্রশ্নে এবং সাহিত্য-শিল্পের সাংগঠনিক কাঠামোর বিতর্কে অংশ নিয়ে সক্রিয়ভাবে কোনো-কোনো পত্রিকা বাঙলা সাহিত্যের বির্বতন ও বিকাশের ধারায় ঐতিহাসিক ভূমিকাও পালন করেছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "বাঙলা সাহিত্যের প্রসারের সহিত বাঙলা সাময়িক পত্রিকার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে বাঙলা সাময়িকপত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে।" (নিবেদন, বাংলা সাময়িকপত্র, ২য় খণ্ড ১৩৫৯) সেজন্য দেখা যায়, সাহিত্যের তো বটেই, সকল প্রকার সামাজিক-প্রবণতার গতি-প্রকৃতির ইতিহাসের আকর উৎসরূপেও পত্রপত্রিকার অনুসন্ধান এখন একটি স্বীকৃত পদ্ধতিরূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বৈরী পরিস্থিতি (অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক) সত্ত্বেও ১৯৪৭-৭১ পর্বে বাঙলাদেশ থেকে (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ও পূর্ব-পাকিস্তান) যে-সমস্ত পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো নিয়ে বাস্তবিক গুরুত্বপূর্ণ কোনো গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়নি। যদিও সামাজিক রাজনৈতিক এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রশ্নে ১৯৪৭-৭১ পর্বে বাঙলাদেশের পরিস্থিতি ছিলো দাবি-আদায়ের সংগ্রাম-আন্দোলন ও বিতর্ক-বিক্ষুব্ধ। যেভাবেই হোক এসব সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিতর্কসমূহ প্রচলিত সাহিত্যপত্রিকাগুলোতে অনেক সময় প্রধান আলোচ্য বিষয়রূপে স্থান লাভ করেছে। পত্রিকাগুলোর পাতা মেললেও দেখা যায় পাকিস্তানের সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আদর্শগত প্রশ্নে তখন (৪৭-৭১) অনেক বিতর্ক সংঘটিত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যপত্রিকাগুলোর ভূমিকা অনবদ্য, জননন্দিত, বাঙালির স্বার্থ প্রযোজিত না হলেও ঘটনাক্রমে বাঙলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। বাঙলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে বিশ্বের বুকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, 'বাঙলাদেশের সাহিত্য' নামে ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সংযোজন ঘটেছে। এসবের পেছনে অবশ্যই কতিপয় পত্র-পত্রিকা আর লেখক বুদ্ধিজীবীর অবিস্মরণীয় সদর্থক ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু সেগুলো কোন্ শ্রেণীর পত্রিকা, কারা সেই পত্রিকার লেখক সম্পাদক ও ব্যবস্থাপক, প্রযোজক? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের তাগিদেই আমি বর্তমান গবেষণাকর্মে প্রবৃত্ত হয়েছি।

বস্তুতঃ বৃটিশ শাসনামলে রাজনৈতিক কারণে পূর্ববঙ্গে সাময়িকপত্র ও গ্রন্থজগতের বিকাশ তেমন ঘটেনি। কলকাতাই ছিলো শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। ঢাকায় 'উন্নত মানের প্রকাশনা-শিল্প' বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব তখন ছিলোনা বললেই চলে। ১৯৪৭ এর স্বাধীনতাপ্রাপ্তিও বাঙলা বই-পুস্তক তথা সাময়িকপত্র-পত্রিকার বিকাশকে তেমন প্রশস্ত করেনি। বরঞ্চ শাসক শ্রেণীর বৈরী মনোভাব সর্বদা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশকে জব্দ-স্তব্ধ করার ষড়যন্ত্রই করেছে। যার ফলে বাঙলা বই ও বাঙালির সংস্কৃতি জব্দ হয়েছে। বিকৃত ও বিভ্রান্ত হয়েছে বাঙালির চিন্তাধারা। অধিকাংশ লেখক-সম্পাদক, সমাজকর্মী সরকারী ছত্র-ছায়ায় পাকিস্তানবাদী ধ্যান-ধারণার পুষ্টি-

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। ব্যতিক্রম দু-চারজন বাদে সকলে নির্ঝঞ্ঝাট থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করায় আলোচ্যকালে পূর্ববাঙলা থেকে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সহায়ক উন্নতমানের সৃষ্টিশীল সাহিত্য-শিল্পবিষয়ক পত্রপত্রিকা তেমন প্রকাশিত হতে পারেনি (বা হয়নি)। এ-কালের বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে পূর্বে নিয়মিত প্রকাশিত হতো এমন পত্রিকাও প্রকাশের ক্ষেত্রে অনিয়মিত হয়ে পড়ে। বহু পত্রিকা এসময়ে নতুন আবির্ভূত হয়েছে, কিন্তু কোনোটাই দীর্ঘজীবী ও সুদূরপ্রসারী হয়নি। সওগাত (১৯১৮) মোহাম্মদী (১৯২৭), আল-ইসলাহ্ (১৯৩২) নওরোজ (১৯৪২) প্রভৃতি সাতচল্লিশের স্বাধীনতালাভের পরে পূর্ব মান-মর্যাদা অনুযায়ী নিয়মিত প্রকাশিত হয়নি। সীমান্ত (১৯৪৭); অগত্যা (১৯৪৯); নওবাহার (১৯৪৯); ইমরোজ (১৯৪৯); দ্যুতি (১৯৪৯); সমকাল (১৯৫৭); উত্তরণ (১৯৫৮); লেখক সংঘ পত্রিকা, পরিক্রম (১৯৬২); পূর্বমেঘ (১৯৬০); পূবালী (১৯৬০); নাগরিক (১৯৬৪); কণ্ঠস্বর (১৯৬৫) প্রভৃতি নিয়মিত প্রকাশের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পত্রিকাগুলো স্বল্পকালই নিয়মিত ছিল এবং কৃষ্টি, সীমান্ত, অগত্যা, সওগাত, সমকাল, উত্তরণ, পূর্বমেঘ, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি গুটিকয়েক পত্রিকার ব্যতিক্রমী নিদর্শনবাদে (নিয়মিত প্রকাশের আশ্বাস দেয়া অনিয়মিত) মাসিক, দ্বিমাসিক ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রিকাগুলোর প্রায় কোনটাই নতুনকালের প্রবণতাকে ধরবার চেষ্টা করেনি। সরকারী পত্রিকা মাহেনও ১৯৪৯ থেকে যদিও ১৯৭১ সন পর্যন্ত নিয়মিতই প্রকাশিত হয়েছে, তবু এই পত্রিকা সৃষ্টিশীল লেখক-পাঠকদের চাহিদা পূরণে প্রায়ই সক্ষম হয়নি। সীমান্ত, দ্যুতি, সওগাত, সমকাল, উত্তরণ, লেখক সংঘ পত্রিকা, পরিক্রম, কণ্ঠস্বর প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এক একটা সৃষ্টিশীল 'সাহিত্যিক আড্ডা' এবং সৃষ্টিশীল রচনার জোয়ার ঘটবার অফুরন্ত সম্ভাবনা দেখা দিলেও অদূরদর্শিতা, প্রতিভার সীমাবদ্ধতা, দৃঢ়তার অভাব আরও অব্যক্ত নানা কারণে উদ্যমসমূহ বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। ঈর্ষা-বিদ্বেষ, বাণিজ্যিক অসাফল্য ও দলীয় কোন্দলের ফলে এসব পত্রিকার কোনোটাই দুই তিন কিংবা চার বছরের বেশি একটানা চলতে পারেনি। প্রায় প্রতিটি ভালো পত্রিকাই স্ফুলিংগের ন্যায় জ্বলে উঠেই নিভে গিয়েছে। সরকারী কোপানল এবং সরকার-ঘেষা মনমানসিকতাসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের অসহযোগিতা সত্ত্বেও পত্রিকার প্রধান উদ্যোক্তা বা সম্পাদকের একক প্রচেষ্টা ও ত্যাগী প্রয়াসের ফলেই প্রথমদিকে কিছুদিন নিয়মিত চলেছে, কিন্তু ক্ষণকালের মধ্যেই উদ্যম নির্জীব হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কোন পত্রিকাই একালে বাণিজ্যিকভাবে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। প্রখ্যাত সাহিত্যপত্র 'কণ্ঠস্বর' (১৯৬৫) বিতর্কের ঝড় তুললেও দৃঢ় আর্থিক ভিত্তিতে দাঁড়াতে পারেনি বলে, নির্দিষ্ট, নির্ধারিত সাইজে, মাপে, ওজনে ও মানে কখনোই নিয়মিত প্রকাশিত হয়নি। বারে বারে আকার-আকৃতি প্রভৃতি পরিবর্তিত হয়েছে। উপর্যুক্ত পত্রিকাগুলো ছাড়া ১৯৪৭ সনের পর থেকে আজ পর্যন্ত যেসব সাহিত্যবিষয়ক সৃষ্টিশীল জ্ঞানচর্চামূলক পত্রিকা প্রকাশিত হতে দেখা গেছে—সেগুলোরও কোনোটাই দীর্ঘদিন নিয়মিত প্রকাশিত হয়নি। সমাজগঠনে সাহিত্য সাময়িকপত্রিকার প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে পঞ্চাশের দশক থেকেই ঢাকা শহরে ব্যক্তিগতভাবে, কখনও কোনো কোনো সংগঠনের পক্ষ থেকে বেশকিছু অনিয়মিত সাহিত্য-সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে এখানে যত ক্ষীণই হোক মননশীল সাহিত্য সৃষ্টির একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। এসব সংকলন ও সাহিত্য-প্রয়াসের সংগঠক, সম্পাদক ও প্রকাশকদের অধিকাংশই ছিলেন বয়সে তরুণ। তবে অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ প্রবীণদের উদ্যোগেও তখন বেশ কিছু সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এঁদেরই চিন্তাচর্চার পরিণতিতে বাঙলাভাষার মর্যাদার প্রশ্ন উচ্চকিত থেকেছে। বাঙালির জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা এবং ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির ধারা শুকিয়ে যায়নি। সেজন্য স্বল্পপ্রাণ ক্ষীণদেহ লিটল ম্যাগাজিনসমূহ আর দু-চারটি প্রগতিশীল মাসিক-ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রিকা যুগোপযোগী সেবকের ভূমিকা যে পালন করেছে তা অবশ্যই ইতিহাসে যথার্থ মূল্যে স্বীকৃতি লাভ করবে। বর্তমান আলোচনায় সেগুলোর মূল্য যথারীতি নিরূপিত হয়েছে। পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, সাহিত্যপত্রিকাগুলোর সমান্তরালে অনিয়মিত সংকলনগুলোও নানা কারণে প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ মেধাবী প্রতিভাবানেরা সৃষ্টিশীলতার তাগিদে প্রাণ খুলে হাতমেলে দরাজ দিলে লিখেছেন এসব পত্রিকাতেই। যা বলা যায়নি প্রাতিষ্ঠানিক, সরকারী পত্রিকাতে, তা তাঁরা বলতে বদ্ধপরিকর ছিলেন অনিয়মিত সংকলনগুলোর জন্য রচিত লেখাগুলোতে।

এছাড়া একুশে ফেব্রুয়ারি (১৯৫২ সনের ফেব্রুয়ারির পর) ও অন্যান্য তাৎপর্যপূর্ণ দিবস উপলক্ষেও প্রকাশিত হয়েছে অনেক সংকলন। এসবের সাহিত্য সংস্কৃতি ও রাজনীতিগত এবং সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য অপরিসীম। সেই তাৎপর্য অণুসন্ধানের জন্য এবং আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ইতিহাস উদ্ঘাটনের তাগিদে এই অনিয়মিত পত্রিকাগুলোর অধ্যয়ন অনুশীলন বিশ্লেষণ ও মর্মোদঘাটনও অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু বর্তমান অভিসন্দর্ভে অনিয়মিত এসব সংকলনের মূল্যমান বিচারের প্রয়াস নেই। সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক অনেক পত্রিকাতে সাহিত্য বিরাট জায়গা জুড়ে থাকলেও তা সংবাদপত্রশ্রেণীর অন্তর্গত বিবেচনায় সাহিত্য-পত্রিকার উপস্থাপনায় আলোচনায় টানা হয়নি। শিশু , মহিলা এবং বিজ্ঞান ইত্যাদি বিশেষ বিষয়ের বিশেষায়িত পত্রিকাও প্রস্তাবিত গবেষণার অন্তর্গত করে নেয়া যায়নি, —যেমন 'গবেষণা' পত্রিকাগুলোর মূল্যবিচার এক্ষেত্রে লক্ষ্য হয়নি। প্রতিটি বিষয়েই স্বতন্ত্র অনুসন্ধান ও সন্দর্ভ-প্রণয়নের দাবি অস্বীকার করা যায়না।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবিত বর্তমান গবেষণার কাজ সম্পন্ন করার জন্য বিবেচ্য সাহিত্যপত্রিকাগুলোর ধারাবাহিক সূচীপত্র সংকলন করে প্রকাশিত লেখাগুলো প্রথমে পাঠ করেছি। প্রতিটি পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা আদ্যোপান্ত পৃষ্ঠা উল্টে মূল্যবান রচনাগুলোর মর্ম অনুধাবন পূর্বক সামাজিক সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য ও গুরুত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। বুঝতে চেয়েছি প্রকাশিত রচনার দ্বারা (পত্রিকাগুলোর) পালিত সামাজিক লক্ষ্য ও ভূমিকা কি ছিলো? সাহিত্যিক মান এবং সামাজিক চাহিদার প্রেক্ষিতে পত্রিকার বক্তব্য ও সামাজিক চেতনা বিষয়ে নিজস্ব মতামত নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করেছি। পত্রিকার পাতা থেকেই সংগ্রহ করেছি প্রয়োজনীয় তথ্য ও উদ্বৃতি। যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এইসব পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের খোঁজ (যাঁরা জীবিত আছেন) করে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি। তাছাড়া পত্রিকার উদ্যোক্তাদের সমকালীন অন্য সম্পাদক লেখকদের নিকট থেকে তাঁদের বক্তব্য যেমন সংগ্রহ করেছি তেমনি ৪৭-৭১ পর্বে সক্রিয় ছিলেন এমনসব প্রধান চিন্তাবিদ, লেখক-সাহিত্যিকদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেও ৪৭-পরবর্তী সাহিত্যজগত ও পত্রিকা-পরিস্থিতি অনুধাবনের চেষ্টা করেছি। পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক-পুস্তিকাসূত্রেও জেনে বুঝবার চেষ্টা করেছি পত্রিকাগুলোর প্রয়াস-প্রচেষ্টার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক মূল্য, মর্যাদা ও প্রকৃতি। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিস্পৃহ মনে নিরপেক্ষ বিবেচনায় তুলনা করে সত্যাসত্য নির্ণয় ও মর্ম সংকলনের চেষ্টা করেছি।

'বাঙলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের অগ্রিগতিতে সাহিত্যপত্রিকার ভূমিকা (১৯৪৭-৭১)' নির্ণয়ের জন্য আমাদের অনুসন্ধান ও মূল্যায়ন করতে হয়েছে ১৪ আগষ্ট ১৯৪৭ সনে ভারত বিভক্তির পর থেকে যুদ্ধোপূর্ব বাঙলাদেশের তথা পূর্ব পাকিস্তান ভূ-খণ্ড থেকে বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকাসমূহের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়; এর প্রকাশক, লেখক, শুভানুধ্যায়ীদের শ্রেণীগত অবস্থান এবং এইসব পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলীর সাহিত্যিক মূল্য, চিন্তাধারার এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক ভূমিকা। পূর্ববর্তীকাল দ্বারা এইকাল কতটা প্রভাবিত হয়েছে এবং পরবর্তী কালকে এই কাল কতোটা প্রভাবিত করেছে তাও বুঝতে চেয়েছি। গবেষণার ফলাফল উপস্থাপনের জন্য সন্দর্ভটিকে ৬টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে বর্ণনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে সাহিত্য পত্রিকার সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। অতপর বাঙলা ভাষায় সাহিত্য পত্রিকার ঐতিহ্য অনুসন্ধানে সমাচার দর্পণ (১৮১৮) থেকে কণ্ঠস্বর (১৯৬৫) পর্যন্ত পত্রিকাগুলো কিভাবে সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অগ্রগতিতে ভূমিকা পালন করেছে তা অতিসংক্ষেপে কোথাও কেবল সূত্রাকারে দেখাবার প্রয়াস আছে। এই অধ্যায়েই সাহিত্যপত্রিকাসমূহ কিভাবে নানা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে তার পরিচয়ও পাওয়া যাবে। বর্তমান অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য সাময়িকপত্রিকা নিয়ে গবেষণার ধারা বর্ণনা করে প্রথম অধ্যায়েই একটি অনুচ্ছেদে আলোচ্যকালের পত্রিকা-পরিস্থিতি প্রকটিত করা হয়েছে। গবেষণার বিষয়বস্তু এবং কালের পটভূমি হিসেবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচ্য (৪৭-৭১) কালের অব্যবহিত পূর্ব ও পরবর্তীকালের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে ঐতিহাসিক প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর সূত্র ধরে।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে ১৯৪৭-৭১ পর্বে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিম্নোক্ত তিনটি শিরোনামের অধীনে সেগুলো বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথা : ১. 'পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী, ইসলামী-পুনর্জাগরণবাদী সরকারী ও বেসরকারী সাহিত্য-পত্রিকা'; ২ 'মানবতাবাদী ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার সাহিত্যপত্রিকা' এবং ৩. 'মার্কসীয় মতবাদ প্রভাবিত কতিপয় সাহিত্যপত্রিকা'। প্রধান ও অপ্রধান পত্রিকাগুলোকে আলাদাভাবেই আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সমগ্র আলোচনার সার-সংক্ষেপ করা হয়েছে এবং আলোচ্য-কালের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজের অগ্রগতিতে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকাসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে ঘটনা-উত্তর সামাজিক সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

সাহিত্যপত্রিকা ও তার বহুমাত্রিক ভূমিকা

১.১. সাহিত্যপত্রিকার স্বরূপ

'সাহিত্য' যে-পত্রিকায় স্থানলাভ করে তাই 'সাহিত্য পত্রিকা', এটাই হলো সাহিত্য পত্রিকার সহজ ও সাধারণ সংজ্ঞা। সাহিত্যের পরিধি 'একটি জাতির সর্বাঙ্গীন জীবন সাধনার' মতো বিশাল। ভাষা সৌন্দর্য-সৃষ্টি ও জ্ঞানার্জনের বাহন। আর সাহিত্য 'মানব-হৃদয়ের ক্ষুধা-তৃষ্ণার' একমাত্র 'পানাহার'। সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন বাঙলা ভাষার আধুনিক যুগের সকল প্রধান লেখক। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৭), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪), আবু সয়ীদ আইয়ুব, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১০-১৯৫৬) প্রমুখ ভাবুক সাহিত্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বহু মতামত লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কাব্যের ভাষায় একজন বলেছেন ঃ "সাহিত্যের মাধ্যমে মূক পায় স্পন্দন, বীর পায় অমিত তেজ, যোদ্ধা পায় চঞ্চল-শোনিতের আহ্বান, শিল্পী পায় সুরের রেষ, কবি পায় কাব্যের ছন্দ, প্রেমিক পায় হৃদয় নিংড়ানো বিরহ-মিলনের আমেজ, ধার্মিক পায় কল্পলোকের সন্ধান, আর জাতি পায় বেঁচে থাকার প্রাণ।" লেখকের প্রধান লক্ষ্য তাই পাঠক সমাজ।[১] কারণ জাতির বেঁচে থাকার প্রাণ-সাধনায় মিলিত হবার লক্ষ্যে শিল্পী সাহিত্য সৃষ্টি করেন। সাহিত্য ও সাহিত্য-স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চার্লস-অগাস্টিন সাঁত বভ লিখেছেন ঃ 'সাহিত্যিক (ক্লাসিক') হচ্ছেন সেই লেখক যিনি মানুষের আত্মাকে সমৃদ্ধ করেছেন, জ্ঞানের ও অনুভূতির ভাণ্ডারে নতুন সম্পদ সংযোজন করেছেন, মানবতাকে দিয়েছেন কোনো দ্ব্যর্থহীন নৈতিক সত্যের নিশ্চিত সন্ধান কিংবা কোনো শাশ্বত আবেগের অনন্য উপলব্ধি অনিবার্য করে তুলেছেন অগ্রগতির কোনো নতুন ধাপ ; যিনি তাঁর চিন্তাধারাকে, অনুসন্ধানের ফলকে, আবিষ্কৃত বিরল সত্যকে তুলে ধরেছেন ব্যপ্ত উদারতায়, রুচির পরিশীলনে, যুক্তিবিচারের প্রশান্তিতে ও সৌন্দর্যের দীপ্তিতে ; যিনি স্রষ্টার আসনে বসে অনন্য শৈলীতে কথা বলেছেন, অথচ বলেছেন পৃথিবীর মানুষের মনের কথাই ; তাঁর সে শৈলী নব্যতাকে অস্বীকার করলেও নতুন,—নতুন ও পুরাতন বা দুই-ই ; প্রতিটি যুগের মানুষের কাছেই তিনি সমকালীন। যথার্থ ক্লাসিকের, সাহিত্যিকের এই-ই হলো স্বরূপ, কেবল রূপরীতির প্রশ্নই তাতে অপরিহার্য ও মুখ্য নয়।"[২]

আমাদের দেশের সাম্প্রতিক কালের পত্রিকা এবং সাহিত্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে একজন সমালোচক লিখেছেন ঃ "একটি জাতির সর্বাঙ্গীন জীবন সাধনা বহুমুখী। অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ থেকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পর্যন্ত, সামরিক কর্মকাণ্ড থেকে ললিত কলার চর্চা পর্যন্ত তা ব্যাপ্ত। সাহিত্য সাধনা এই বহুমুখী বহুব্যাপ্ত সার্বিক কর্মধারারই একটি অংশ মাত্র। তবে সাহিত্যের পরিধিও সর্বব্যাপী ; — জীবন-জগতের সকল বিষয়ই সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে। একটি জাতির সাহিত্যের সুস্থবিকাশ ও পূর্ণ স্ফূর্তির অপরিহার্য শর্ত হিসেবে দরকার সেই জাতির সার্বিক জীবনানুশীলনের অভিজ্ঞতা, এবং সাহিত্য-চর্চার পাশাপাশি সর্বমুখী-জ্ঞানের গভীরতর অনুশীলন। বলাবাহুল্য, যে-সমাজে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি মানবিক জ্ঞানের সকল শাখার পর্যাপ্ত চর্চা নেই, নেই জ্ঞানচর্চার সঙ্গে উন্নত জীবন ও উন্নত সমাজ গঠনের বাস্তব কর্মের যোগ, সে-সমাজে সাহিত্য কখনও পুষ্টি ও স্ফূর্তি লাভ করতে পারেনা। সাহিত্য জীবন ও সমাজের সঙ্গে যেমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত, তেমনি যুক্ত সর্বপ্রকার মানবিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সঙ্গেও। এজন্যই সাহিত্য বিচারের পটভূমি হিসেবে জ্ঞানানুশীলনের ধারাও অবশ্য বিবেচ্য। এই বিবেচনার অভাবে সাহিত্যের আলোচনা হয়ে পড়ে তাৎপর্যহীন এবং সাহিত্যও হয় ক্ষীণপ্রাণ, বিবর্ণ, ফ্যাকাশে।"

প্রত্যেক কালের শিল্পী-সাহিত্যিকের কাছেই সমাজের ও কালের দাবি থাকে। দাবি থাকে যে 'লেখকেরা জীবন ও সমাজের প্রতি তাকাবেন নানা বাতায়ন দিয়ে—সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি, জড়বিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি সকল বাতায়ন-পথে জীবন-জগতের রহস্যকে অবলোকন করবেন তারা।"[৩] অতএব একটি জাতির সর্বাঙ্গীন জীবনানুশীলনের অভিজ্ঞতা এবং সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি সর্বমুখী জ্ঞানের গভীরতর অনুশীলন ঘটে যেসকল শিল্পগুণ সম্পন্ন রচনায়, সেগুলোকে 'সাহিত্য' অভিহিত করে যেসমস্ত পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয় তাকে 'সাহিত্যপত্রিকা' আখ্যা দেয়া যায়। এই আলোকে সাহিত্য-পত্রিকার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় এভাবে ঃ কোনো সাহিত্য পত্রিকা কেবল 'গতানুগতিক সাহিত্য' ধারণ করে প্রকাশিত হবে না। তা "সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান , বিজ্ঞান, দর্শন, গণনীতি, সংস্কৃতি এবং সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী বিষয়ক আন্তরিকতাপূর্ণ সৃষ্টিশীল রচনাবলীর আধার হয়ে সমাজ-জীবনে জাগরণ সৃষ্টির দুঃসাহসিক অভিযানে অভিযাত্রী হবে এবং বর্তমান যুগ-সংক্রান্তির বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ধারণাসমূহকে সংহত করে এক নতুন যুগ সৃষ্টির অদম্য প্রয়াসে ব্রতী হবে।"[৪] অবশ্য 'সাহিত্য-পত্রিকা'র এই ধারণা প্রথম দিকে প্রচলিত ছিল না। সাম্প্রতিক কালে যুগের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে এই ধারণা পুষ্টি লাভ করলেও গোড়াতে সাহিত্য-পত্রিকা বা 'লিটারেরি জার্নাল' কিংবা 'পিরিয়ডিক্যালস' বা 'ম্যাগাজিন' অন্য অর্থ বহন করতো। 'দি ওয়ার্ল্ড বুক এনসাইক্লোপিডিয়া' ; 'ওয়েবস্টার থার্ড নিউ ইন্টারন্যাশনাল ডিকসনারী' ; 'ওয়ার্ল্ডবুক ডিকসনারী' ; এবং 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' তে Periodical বা Magazine এর যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে যে মাসিক, দ্বিমাসিক (বঙ্গদর্শন, সবুজপত্র, সওগাত, সমকাল প্রভৃতি) ত্রৈমাসিক ইত্যাদি সাহিত্য-পত্রিকার বৈশিষ্ট্যের মিল আছে। Encyclopedia

Dhaka University Institutional Repository

Britannica (volume-17, 1963, P-513) তে PERIODICAL এর সংজ্ঞায় লেখা হয়েছে : "This term, which was once applied to all publications appearing at regular intervals, is now used by librarians and others to designate all such serials except newspapers " প্রথম দিকের Periodicals সম্পর্কে উক্ত সূত্রে বলা হয়েছে ; The forebears of the literary periodical in the 17th Century were the book notices inserted by publishers in the early news-books. By 1646 such notices, accompanied by short critical Comments, were appearing with some regularity ; about 1650 they began to be grouped together and to form a regular feature of the news books or paper," ইত্যাদি। 'দি ওয়ার্ল্ডবুক ডিকসনারী'তে পিরিয়ডিক্যাল সম্বন্ধে লেখা হয়েছে ঃ "a magazine that appears regularly, but less often than daily : The quarterly magazine is a periodical published every three month .... published at regular intervals, less often than daily : Periodical publications are usually bought by Subscription throgh the mailhappening at regular intervals;" 'ডিকসনারী অব লাইব্রেরী এ্যাণ্ড ইনফরমেশন সায়েন্স' (Vol.3) এ সম্পর্কে লিখেছে ঃ "Refers to a publication with a distinctive title which appears at stated or regular intervals, generally oftener that once a year, without prior decision as to when the last issue shall appear. It contains articales. Stories or other Writings, by several Contributers. News papers, Whose Chife function is to disseminate News, and the memoirs, Proceedings, Journals, etc. of Societies are not Considered Periodicals under the Cataloguing rules. At the General conference of unesco, held at paris on 19th November 1964, it was agred that a publication is a periodical if it constitutes on issue in a continuous Series under the some title, published at regular or irregular intervals, overn an indefinite Preiod, individual issues in the Series being numbered consecutively or each issue being dated." ৫

ম্যাগাজিন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 'দি ওয়ার্ল্ডবুক এনসাইক্লোপিডিয়া'-য় বলা হয়েছে ঃ হাজার হাজার মানুষ পড়ে, অধিকাংশ বুকস্টলে এবং অনেকেই ঘরে সরবরাহ পেয়ে ; বিপুল সংখ্যক পাঠক বিজ্ঞাপন দিয়ে ম্যাগাজিনের আকর্ষণ বৃদ্ধি করে এবং এর আয়ের প্রধান উৎস বিজ্ঞাপন। এর প্রতিটি সংখ্যা একজন অথবা একদল সম্পাদক কর্তৃক পরিকল্পিত হয়ে সপ্তাহে অথবা মাসে-মাসে প্রকাশিত হয়। সম্পাদকগণ বিষয় নির্ধারণ বা পছন্দ করেন এবং তাঁরাই নির্বাচন করেন লেখক এবং দিক নির্দেশ দেন ম্যাগাজিনের চিত্রগ্রাহক ও অঙ্গসজ্জার শিল্পীদেরকে। সময়োপযোগী লেখার জন্য রচয়িতারা জনগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন এবং ফটোগ্রাফার নাটকীয় ছবি সংগ্রহ করেন রচনাকে 'ইলাস্ট্রেট' করার জন্য। মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের পর ম্যাগাজিনসমূহ ডাক-মারফত গ্রাহক-পাঠকদের নিকট প্রেরণ করা হয়। Magazine is a collection of articales or stories --or both--published at regular intervels. Most magazines also include illustrations. Magazine Provid a wide varity of information, opinion, and entertainment. For example, they may cover Current events and fashions, discuss foreign affairs, or describe how to repair appliances or prepare food.

ব্যবসা, সংস্কৃতি, শখ, চিকিৎসা, ধর্ম, বিজ্ঞান ও খেলাধূলার বিষয় নিয়ে হরেক রকমের ম্যাগাজিন এখন প্রকাশিত হয়। কোনো কোনো পত্রিকা (ম্যাগাজিন) কেবলমাত্র গল্প-উপন্যাস-নাটক-কবিতা-কার্টুন-ছবি বা টেলিভিশন শো অথবা চিত্রতারকাদের কথকতা নিয়েও প্রকাশ পায়। দৈনিক পত্রিকাও বহু লেখক-সাংবাদিকের যৌথকর্ম, কিন্তু দৈনিক সংবাদপত্র থেকে ম্যাগাজিন বিষয় ও আকৃতিগত দিক থেকে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। ম্যাগাজিন সংবাদপত্রের থেকে বেশি সময় অন্তর প্রকাশিত হয়। কারণ, তা সাইজে ক্ষুদ্র এবং উন্নত মানের কাগজে ছাপা হয়। অধিকাংশেরই স্বতন্ত্র প্রচ্ছদ বা মলাট থাকে এবং তা সেলাই অথবা স্টাপলস করে বাঁধাই করতে হয়। সংবাদপত্র থেকে ম্যাগাজিনে তুলনামূলকভাবে কম বিষয় থাকে। তবে ম্যাগাজিনের বিষয়বস্তু দ্রুত পরিবর্তন করতে হয়। অর্থাৎ বিষয়-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে হয়। কোনো কোনো ম্যাগাজিন বা সাময়িকী নিউজপেপারের আকারে প্রকাশিত হয়। আবার দীর্ঘ বিস্তৃত রচনা নিয়েও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন ধরণের লেখাও তাতে থাকে। ঘটনাভিত্তিক, বাস্তবকাহিনী ব্যক্তিগত ঢংয়ে আবেগময় ভাষা ও ভঙ্গিতে ম্যাগাজিনে উপস্থাপন করা হয়। জাতির শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ এবং লেখকেরাও বিশেষ-বিশেষ সংখ্যায় অথবা নিয়মিতভাবে সাময়িকী বা ম্যাগাজিনে লিখে থাকেন। অনেক সুপরিচিত মহত লেখকের প্রথম দিকের রচনাবলী ম্যাগাজিন বা সাময়িকীতে প্রথমে প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিভাবান এবং খ্যাতিমান লেখকেরা ম্যাগাজিন ও সাময়িকীতে লিখেই সুপরিচিত হয়েছেন।

ম্যাগাজিনসমূহকে মোটামুটি দুটি বড় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ট্রেড বিজিনেস, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্রভৃতি বিশেষায়িত ম্যাগাজিনসমূহ প্রফেশনাল গ্রুপের পাঠক সদস্যদের নিকট ডাকে পাঠানো হয়। জনপ্রিয় বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলো বুকষ্টলে বিক্রির জন্য সঞ্চিত থাকে। এগুলোর মধ্যে থাকে আবার চিলড্রেন্স ম্যাগাজিনস, হবিস ম্যাগাজিনস, ইনটেলেকচুয়ালস ম্যাগাজিনস, মেনস ম্যাগাজিনস, উইমেনস ম্যাগাজিনস এবং সার্ভিস ম্যাগাজিনস। "Intellectual magazines' provide a thoughtful analysis of current cultural and political events. This publications include opinion magazines, which discuss Current events from a particrlar economic or political vewpoint. Many intellectual magazines publish fiction and poetry as well as factual articles." ৬

সাহিত্য-পত্রিকা বা ম্যাগাজিনের বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে The world Book Encyclopedia য় বলা হয়েছে ঃ The earliest magazines probably developed from newspapers or from book seller Cataloges. Such cataloges, which

Dhaka University Institutional Repository

reviewed books on sale, first appeared during the 1600's in France then other Countries. Pamphlets published at regular intervals appeared in England and America in the 1700's, Primarily as literary publications"[৭]

বাংলা ভাষার সাময়িকীগুলোর দিকে তাকিয়ে বলা যায়—টেক্সট বইয়ের প্রয়োজন মেটায় এমন পত্রিকা থেকে আরম্ভ করে শিশু, পুরুষ, মহিলা, বিজ্ঞান, খেলাধূলা, সিনেমা, রাজনীতি, ধর্মীয় এবং ব্যবসা–বাণিজ্য ভিত্তিক বিশেষায়িত এবং বাণিজ্যিক–উদ্দেশ্যে প্রকাশিত পত্রিকা উনিশশতক থেকেই প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৪৭–৭১ পর্বেও পূর্ববাংলা থেকে বাংলা–ভাষায় দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক বার্ষিক, শিশু, মহিলা, বিজ্ঞান, সিনেমা, মৌলিকগণতন্ত্রী, বইয়ের পরিচিতিমূলক এবং ব্যবসা–বাণিজ্যভিত্তিক পত্র–পত্রিকা অসংখ্য প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সকল পত্রিকার মান এক রকম ছিলনা। প্রচার সংখ্যা এবং গ্রাহক–পাঠকের সংখ্যায়ও পার্থক্য আছে। গবেষণার জন্যে সামাজিক প্রভাব ছিল, এমন খ্যাতিমান, প্রধান সাহিত্য–পত্রিকাগুলোকে বেছে নেয়া হয়েছে। দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক প্রভৃতি সংবাদপ্রধান, খবরের কাগজের মধ্যে পড়ে। যদিও 'সাহিত্য' এগুলোর বিরাট অংশ জুড়ে ছিল, কিন্তু সংবাদপত্র বিবেচনায় বলাবাহুল্য অত্র আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ধর্মীয়, শিশু, মহিলা এবং বিজ্ঞান, সিনেমা বিষয়ক পত্রগুলোও বুদ্ধিবৃত্তিক রচনা এবং সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের গুরুতর আলোচনায় মনোনিবেশ করেনি। সেজন্য ওগুলোও আলোচনার বহির্ভূত রয়েছে। মহিলা বা নারীপ্রাধান্য সমাজ ও রাজনীতিতে ৪৭–৭১ পর্বে তেমন ছিলনা। পুরুষ-শাসিত সমাজে পুরুষের সম্পাদিত পত্রিকাগুলোই প্রধানভাবে সমাজকে নানাভাবে আলোড়িত করেছিল। নারীদের পত্রিকাগুলো তখনও সমাজে জাগরণ বা আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। বিজ্ঞান–চর্চা বাংলা ভাষায় আগে শুরু হলেও সাতচল্লিশ পরবর্তী এবং একাত্তর পূর্ববর্তী সময়ে উৎকর্ষ অর্জন করতে পারেনি। তাই এসব পত্রিকা অনুসন্ধান করলেও অত্র আলোচনার বহির্ভূত রাখা হয়েছে। সিরিয়াস গবেষণা পত্রিকাগুলোর কোনো কোনোটা 'সাহিত্য পত্রিকা' বা 'সাহিত্যিকী' নামে প্রকাশিত হলেও তা জনপ্রিয় সাহিত্যপত্রিকার সংজ্ঞায় পড়েনা। এগুলো 'একাডেমিক নেচারের গবেষণা পত্রিকা'। সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সমকালীন বিষয় এবং যুগের ছাপ তাতে প্রায়ই অনুপস্থিত। অতএব সেগুলোও আলোচ্য বিবেচিত হয়নি। সমকালে এবং ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ পর্বে কিছুদিন অন্তত আলোড়ন সৃষ্টির অথবা চিন্তারাজ্যে কোনো পরিবর্তন কামনায় যেসমস্ত পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে খ্যাতি বা অখ্যাতি অর্জন করেছিল—সেই সমস্ত পত্রিকাকেই বিশ্লেষণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

১.২. বাংলা ভাষায় সাহিত্যপত্রিকার ঐতিহ্য

'সাহিত্য–পত্রিকার' আবির্ভাব ইংরেজী ভাষার 'সাময়িক পত্রিকা'র (সংবাদপত্র) সূতিকাগার থেকেই। কিন্তু বাংলাভাষী জনগণ এই মাধ্যমটির সঙ্গে আধুনিক কালের পূর্বে পরিচিত ছিলনা। গোটা বিশ্বেই ৪৩২ বছর পূর্বে কোনো সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো না। আধুনিক বিশ্বের অন্যতম বিস্ময় 'সংবাদপত্র'। এখন 'আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, সেই পৃথিবীর এক একটি দিনের ইতিহাস সেই দিনের একটি সংবাদপত্র'।[৮] তবে সত্য যে, ভারতবর্ষের 'সাংবাদিকতা' পশ্চিমের কাছে ঋণী হলেও এদেশে সাংবাদিকতার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। 'সাংবাদিকতা' বলতে যে 'বৃত্তি' বা 'পেশা' মূলগত ও বস্তুগত অভিধা নির্দেশ করে—তার অস্তিত্ব বৈদিক যুগ থেকেই লক্ষ্য করা যায়। সমাজ–জীবনের বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকতা রূপ বদলিয়েছে মাত্র।[৯]

মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো হাতে লেখা খবরাখবর, ব্যক্তিগত ও রাজকীয় চিঠিপত্র, বার্তা ইত্যাদির প্রচলিত রেওয়াজ উঠে গিয়ে ষোলো শতকের মধ্যভাগ থেকেই ছাপার হরফে সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। পৃথিবীর প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় জার্মান ও সুইজারল্যাণ্ড থেকে ১৫৬০ খ্রীস্টাব্দে। ভারতেও আঠারো শতকে মুদ্রাযন্ত্রের বদৌলতে পুরনো রীতির বদল ঘটতে থাকে। বলা বাহুল্য, ইউরোপীয়দের সৌজন্যেই তা ঘটেছিল এবং জেমস অগাস্টাস হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' (১৭৮০) পত্রিকা সেজন্য বাঙালার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। হিকির পদাঙ্ক অনুসরণ করে কলকাতায় অনেকগুলো সংবাদপত্র অতপর প্রকাশিত হয় যথা ঃ ইণ্ডিয়া গেজেট, ক্যালকাটা গেজেট, গভর্ণমেন্ট গেজেট, বেঙ্গল জার্নাল, ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন, ক্যালকাটা এ্যামুজমেন্ট, এশিয়াটিক মিসেলিনী, ক্যালকাটা ক্রনিকেল, বেঙ্গল হরকরা, মর্নিংপোষ্ট, টেলিগ্রাফ, ক্যালকাটা কুরিয়ার, ওরিয়েন্টাল ষ্টার, এশিয়াটিক মিরর ইত্যাদি। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি 'সংবাদপত্র সেন্সরশীপ আইন' জারি করার পর সংবাদপত্রের গতিধারা স্তিমিত হয়ে আসে। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে লর্ড হেস্টিংস সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক আইন প্রত্যাহার করে নিলে প্রকাশিত হয় প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পন' এবং 'বঙ্গাল গেজেট'।[১০]

পর্তুগীজদের দ্বারা ভারতে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে এদেশ থেকে কোনো সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি। যদিও এদেশাগত ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরাজ প্রমুখের আধুনিক সাহিত্য ও সংবাদপত্র সম্পর্কে জ্ঞান ছিল বলে ধারনা করা সঙ্গত। কারণ, ১৬১৮ সন থেকেই আমস্টারডাম থেকে ইংরাজী ফরাসী, ওলন্দাজ ও জার্মানী ভাষায় নিয়মিত ভাবে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো। ভারতের বোম্বেতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম ছাপাখানা বসায় ১৬৭৪ সনে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তখনো কোনো সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি। সেরকম কোনো প্রয়াসও তখন পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়না। সে প্রয়াস প্রথম লক্ষ্য করা যায় ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু ১৭৮৩ পর্যন্ত তা সফল হতে পারেনি। এর পূর্বে ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যাণ্ড থেকে প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। ১৭০৪ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় বোস্টন থেকে। কলকাতা থেকে উইলিয়াম বোল্টস কর্তৃক ভারতের প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের একটি প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায় সেপ্টেম্বর ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে। ১৭৭৩–

Dhaka University Institutional Repository

এ বাংলাভাষায় মুদ্রিত প্রথমগ্রন্থ 'হ্যালহেডের ব্যাকরণ' প্রকাশিত হয়। কলকাতায় অতপর মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৭৯ সনে। ১৭৮০ সনের ২৯শে জানুয়ারী কলকাতা থেকে ভারতের প্রথম সংবাদপত্র জেমস অগাস্টাস হিকির বেঙ্গল গেজেট প্রকাশিত হলো। ভারতের এই ঘটনার পর আমেরিকার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় পেনসিল ভ্যানিয়া থেকে। পরের বছর ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতা থেকে 'ক্যালকাটা গেজেট' প্রকাশিত হয়। এ সময় থেকে মদ্রাজ (মদ্রাজ কুরিয়র ১৭৮৫); বোম্বাই (বোম্বাই হেরাল্ড ১৭৮৯, বোম্বাই গেজেট ১৭৯১) প্রভৃতি অঞ্চল থেকেও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ পেতে শুরু করে। এতে এদেশীয় শাসক, ইংরেজ, ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নানা দুর্নীতি, অনাচার প্রভৃতি-কাহিনী ছাপার জন্য পত্রপত্রিকার ওপর সেন্সর প্রথা চাপিয়ে দেয়া হয় (১৭৯৫)। ১৭৯৯ সনের মে মাসে ওয়েলেসলি কর্তৃক সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য পাঁচ দফা রেগুলেশন্স জারী করা হলো। ইংল্যাণ্ডের সংবাদপত্রে এদেশের ইংরেজ কর্মকর্তাদের অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী শোষনের নিষ্ঠুর-নির্মমতা প্রকাশ পেলে গভর্ণর জেনারেল পদ থেকে ওয়েলেসলির পদত্যাগ করতে হয় (১৮০৫)। এসবই সংবাদপত্র-শিল্পের বিকাশের ফল। কিন্তু সমাজের অগ্রগতির প্রক্রিয়ায় সংবাদপত্রশিল্প প্রয়াসী হবার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ, সাহিত্য ও শিল্পকলার তথা জনমত ও জনসভার উপর দমননীতিও কার্যকর হতে আরম্ভ করলো। ১৮০৭ এ জনসভার উপর নিষেধাজ্ঞা এবং ১৮১১ সনে সংবাদপত্র সম্পর্কে লর্ডমিন্টোর আদেশ লক্ষনীয়। তথাপি সংবাদপত্রের কল্যাণে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার খর্ব হতে থাকে। ফলে ১৮১৩ তে বৃটিশ সরকার একচেটিয়া অধিকার খর্ব করে ২০ বছর মেয়াদী সনদপত্র অনুমোদন করে। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে হেস্টিংস ভারতবর্ষে আগমন করেন। ব্রাইস কর্তৃক 'এশিয়াটিক মিরর' পত্রিকাও এ বছর প্রকাশিত হয়। এ সময় ভারতে ইউরোপীয় ক্রিশ্চানদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। পাশাপাশি (ভারতে) বৃটিশ অধিকারের শক্ত খুঁটিও স্থাপিত হয়েছে। এরই মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতে পরিবর্তনের সুরও এঁদেরই প্রভাবে ধ্বনিত হতে শুরু করে। রামমোহন রায় কলকাতায় বসবাস শুরু করেন ১৮১৫ থেকে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে কোম্পানীর একচেটিয়া কর্তৃত্ব খর্ব হওয়ার সাথে সাথে কোম্পানী ছাড়াও অপরাপর বাণিজ্যিক সংস্থাও এদেশে কার্যারাম্ভ করতে থাকে। তাঁরাই নিজেদের স্বার্থের তাগিদে প্রথমে সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হন। বিভিন্ন সংবাদপত্রকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে তাঁরা এর বিকাশে অনন্য ভূমিকা রাখেন। ফলে, 'হেস্টিংসের সময়ে (১৮১৪) সেন্সর প্রথার অসারত্ব প্রমাণিত হয়।[১১]

একথা অবিদিত নয় যে, অবাধ লুণ্ঠন ও অবৈধ বাণিজ্যের মাধ্যমে শোষণের প্রবল বাসনা নিয়ে আগত ইউরোপীয়ানদের লুণ্ঠন ও বাণিজ্যকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংগঠন করা হয়েছিল কর্ণওয়ালিসের প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে। ইংরেজ-প্রশাসনের কর্মকর্তারা বণিকদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে এদেশকে অন্তসারশূণ্য করে ফেলে। ১৭৯০ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত (কর্ণওয়ালিস থেকে বেন্টিঙ্ক পর্যন্ত) বাংলায় ঘোর অন্ধকার যুগ চলছিল। পুরনো সমস্ত ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছিলো, অথচ নতুন যুগের বিকাশের কোনো নিদর্শন মিলছিলোনা। এই দুর্দিনে বাংলায় উপস্থিত হয়েছিলেন মনীষী রামমোহন রায় এবং বিদেশী কেরী ও তাঁর পরিজনেরা। তাঁদের উৎসাহ, উদ্দীপনা ছিলো অন্য ধরণের। তাঁরা ছিলেন কর্মযোগী। ফলে বাংলার ভাবধারাকে তাঁরা অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন। কেরী খ্রীস্টধর্ম প্রচারের জন্য আগত মিশনারীদের নিয়ে শ্রীরামপুরে এক মিশন পরিবার গঠন করেন। ডাঃ উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) হানা মার্শম্যান (১৭৬৭-১৮৪৭) ; ডাঃ জোসুয়া মার্শম্যান (১৭৬৮-১৮৩৭) প্রমুখের অবদান বিতর্কিত হলেও, সংবাদপত্র ও বাংলাগদ্যের বিকাশে তাঁদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব চিরস্মরণীয়।[১২] উনিশ শতকের আরম্ভ থেকে এদেশে যে নবজাগরণের ঢেউ উদ্বেল হয়ে উঠতে থাকে, তারই পথ ধরে মুদ্রিত বাংলা সংবাদপত্র এদেশবাসীর মর্মে এক নতুন সত্যের সন্ধান দিল। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত হলো প্রথম বাংলা সাময়িক পত্রিকা 'দিগদর্শণ—সম্পাদক জনক্লার্ক মার্শম্যান (১৭৯৪-১৮৭৭)। পরের মাসে তাঁরই সম্পাদনায় (২৩শে মে ১৮১৮/১০ই জ্যৈষ্ঠ ১২২৫, শনিবার) প্রকাশিত হয় ইতিহাস-খ্যাত 'সমাচার দর্পণ'। এক বিদেশী, বিভাষী বাংলাভাষায় সাময়িকপত্রিকার ইতিহাসের জয়যাত্রার সূচনা করলেন। বাংলার নবজাগরণের সূচনা-বার্তা ঘরে-ঘরে পৌঁছে দেবার ব্রতে দীক্ষা নিয়ে তিনি দেশীয় শিক্ষিত সমাজকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে সাময়িকসাহিত্য অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করলেন। ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত 'সমাচার দর্পণ' জানপ্রিয়তার সঙ্গে চালু থাকে। বাংলাভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম ইত্যাদি সমকালীন বাঙালি জীবনের সকল দিকের পূর্ণাঙ্গ তথ্য-চিত্র এই প্রাচীন সংবাদপত্রের পাতায় বিধৃত আছে।[১৩]

এই পত্রিকা প্রকাশের প্রাথমিক পরিস্থিতিটা লক্ষণীয়। সরকারী মনোভাব বোঝার জন্য মার্শম্যান স্কুল পাঠ্য নানা বিষয়ের অবতারনা করে 'মাসিক পুস্তিকা' দিগদর্শন প্রথম প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সরকারী বাধা না পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে তিনি অতপর সমাচার দর্পন প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন ঃ February 13th 1818, Mr. Marshman having proposed the publication of periodical work in Bengalee, to be sold among the natives for the purpose of exciting a sprit of enquiry among them, it was resdved that there is no objection to the publication of such a jurnal (Digdarsan). কেরী গোলমালের সম্ভাবনায় আশঙ্কিত হলেও মার্শম্যান তখন অবদমিত হবার পাত্র নন। তিনি সরকারী দপ্তরে 'সমাচারদর্পণ' পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু এবারেও কোনো বাধা এলোনা। গ্রাহক-সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। অন্যান্য পত্রিকার স্রোতও খুলে গেলো।[১৪] ১১ বছর বাংলায় প্রকাশিত হবার পর সমাচারদর্পণ ১৮২৯ সনের ১১ জুলাই থেকে ইংরেজী ও বাংলা দুভাষাতেই ছাপানো শুরু হয়। কারণ ততোদিনে হিন্দু কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইংরেজী পত্রিকা পাঠের আগ্রহ প্রবল হয়েছে। ১৮৪১ এর ২৫ ডিসেম্বর এর শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৮৪২ এ সমাচার দর্পন দ্বিতীয় দফায় আত্মপ্রকাশ করে বছরখানেক চালু ছিল বলে অনুমান করা হয়। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে সমাচার দপন নব পর্যায়ে ১ ভলিউম, ১ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়ে দেড় বছর চলে আবার বন্ধ হয়ে যায় বলে সংবাদ প্রভাকর জানায় (১২ এপ্রিল ১৮৫৩ সনে 'শ্রীরামপুরে গঙ্গার জলে প্রাণত্যাগ করে') এরপর আর সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হয়নি।[১৫]

বিদেশী দ্বারা সম্পাদিত হয়ে বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসের সূচনা হলেও, বাঙালি সম্পাদিত বাংলা সাময়িক পত্রিকার ঐতিহাসিক আবির্ভাব

অচিরেই ঘটেছিল বাংলার জাগরণের অগ্রদূত, চিন্তানায়ক রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) উদ্যোগে। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের (মৃত্যু ১৮৩১) এবং হরচন্দ্র রায় এর সম্পাদনায় 'বঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই মে। সমাচারদর্পণের প্রকাশকালের (২৩শে মে ১৮১৮) হিসেবে বাঙালি-সম্পাদিত পত্রিকাই বাংলার সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে প্রথম প্রয়াস হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে ; কিন্তু এই পত্রিকার (বঙ্গাল গেজেটি) কোনো নমুনা বা 'ফাইল' পাওয়া যায়নি বলে সমাচার দর্পন ই প্রথম বাংলা পত্রিকারূপে ইতিহাসখ্যাত হয়ে আছে। যদিও এর মূলে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ই ইন্ধন যুগিয়েছে। কারণ উনিশ শতকের বাঙলার জাতীয় ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের জন্য সমাচারদর্পণের ঐ সংকলন মহামূল্যবান আকর গ্রন্থরূপে স্বীকৃত হয়েছে। প্রাপ্তব্য পত্রিকার মধ্যে সমাচার দর্পন প্রথম। তবে প্রকাশের ক্ষণ হিসেবে বঙ্গাল গেজেটি আদি। "বাংলাভাষার সাংবাদিকতার ইতিহাসে বাঙালির এই প্রথম স্বাধীন প্রচেষ্টা অবশ্যই শ্লাঘনীয়। এই ধারারই সফল পুষ্টি ও পরিণতি লক্ষ্য করি রাম মোহনের বিচিত্রচারী প্রচেষ্টায়। তিনি একখানি ইংরেজী Brahmonical Magazine (1821) এবং ফার্সি পত্রিকা মীরাতুল আখবার (১৮২২)ও সম্পাদনা করেছিলেন। বাংলা পত্রিকার সম্পাদনায় তাঁর প্রথম আবির্ভাব ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে 'ব্রাহ্মণ সেবধি' পত্রিকা নিয়ে।সম্পাদক হিসেবে রামমোহন রায় ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন শিবপ্রসাদ রায়। পত্রিকাটি অল্প দিনের মধ্যেই অবলুপ্ত হয়ে রামমোহনের নতুন প্রচেষ্টার পথ করে দিয়েছিল।" ১৮২১ সনেই 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১-২৪) নিয়ে তিনি দৃপ্ত আত্মপ্রকাশ করলেন। এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮) সমাজ-সংস্কার বিষয়ের (সতীদাহ নিবারণ ইত্যাদি) চিন্তাধারায় এবং নানা মতের পার্থক্য ঘটায় কৌমুদী ত্যাগ করে রাধাকান্ত দেব (১৭৮৩-১৮৬৭) প্রমুখের পৃষ্ঠপোষণে রক্ষণশীল হিন্দুমত প্রচারের জন্য নতুন সংবাদপত্র 'সমাচার-চন্দ্রিকা' (১৮২২-১৮৫৩)র প্রবর্তন করেন। এরপরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-৫৯) সংবাদ-প্রভাকর (১৮৩১-১৯০৫) প্রকাশের পূর্বে 'বঙ্গদূত' (১৮২৯) নামে একটি উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় (বেঙ্গল হেরাল্ড এর বাংলা সংস্করণ) নীলরতন হালদারের সম্পাদনায়। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৮৪-১৮৪৬) প্রমুখ বঙ্গদূতের পৃষ্ঠপোষক এবং বেঙ্গল হরকরা পত্রিকার অংশীদার ছিলেন।

সংবাদ-প্রভাকর থেকে তত্ত্ববোধিনী (১৮৪৩) পত্রিকার প্রকাশকাল একটি যুগসন্ধিক্ষণ। সংবাদ প্রভাকর প্রকৃত সাহিত্যিক কবি সম্পাদিত যথার্থ সাহিত্যগুণ ও রসসমৃদ্ধ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্র ; আর তত্ত্ববোধিনী প্রথম সাহিত্য-পত্রিকা। জড়তামুক্ত গদ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য ও সঙ্গীতের সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে এই পত্রিকা এক অভূতপূর্ব জাগরণ নিয়ে এল। সেজন্য শুধু সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসেই নয় বাঙালির মনন সাধনার ইতিহাসেও 'তত্ত্ববোধিনী' এক গুরুতর ঘটনা বা বিশিষ্ট দিগদর্শন।[১৬] সমাচার দর্পন থেকে তত্ত্ববোধিনী পর্যন্ত যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় সেগুলো যথাক্রমে :

১. ১৮১৮ ১৪ মে বঙ্গাল গেজেটি গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য ও হরচন্দ্ররায় সম্পাদিত

২. ১৮১৮ ২৩ মে সমাচার দর্পণ মার্শম্যান সম্পাদিত

৩. ১৮১৮ ২ অক্টোবর ক্যালকাটা জার্নাল

৪. ১৮১৯ ডিসেম্বর গসপেল ম্যাগাজিন ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক পত্রিকা উদ্দেশ্য ; ধর্ম প্রচার ও সমাজ-চিন্তা। উদ্যোক্তা ব্যাপটিস্ট অকজিলারী সোসাইটি কলকাতা

৫. ১৮২১ সেপ্টেম্বর Brahmunical Magazine বা ব্রাহ্মণ সেবধি ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক নেপথ্য নায়ক রামমোহন রায়

৬. ১৮২১ ৪ ডিসেম্বর সম্বাদ কৌমুদী (সাপ্তাহিক) নেপথ্য নায়ক রামমোহন রায় উদ্দেশ্য উদারনৈতিক হিন্দুমতের প্রচার ও সমাজ-সংস্কার উদ্দেশ্যে লেখনী-চালনা

৭. ১৮২২ ফেব্রুয়ারি পশ্বাবলী মাসিক কলকাতা স্কুলবুক সোসাইটি বিষয় পাঠ্য উপকরণ

৮. ১৮২২ ৫ মার্চ সমাচার চন্দ্রিকা (সাপ্তাহিক) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত রক্ষণশীল হিন্দুমতের প্রচারক

৯. ১৮২২ মে খ্রীস্টের রাজ্য বৃদ্ধি (মাসিক) শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত ধর্মবিষয়ক পত্রিকা

১০. ১৮২৩ অক্টোবর সম্বাদ তিমির নাশক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সম্পাদক কৃষ্ণমোহন দাস

১১. ১৮২৯ মে ১০ বঙ্গদূত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সম্পাদক নীলরতন হালদার

১২. ১৮৩০ জুন শাস্ত্রপ্রকাশ সাপ্তাহিক সম্পাদক লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালংকার ধর্মবিষয়ক পত্রিকা

১৩. ১৮৩১ ২৮ জানুয়ারী সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত

১৪. ১৮৩১ ফেব্রুয়ারী সম্বাদ সুধাকর সাপ্তাহিক সম্পাদক প্রেমচাঁদ রায়

১৫. ১৮৩১ ৭ মার্চ সমাচার সভারাজেন্দ্র সাপ্তাহিক বাংলা-ফারসী দ্বিভাষিক পত্রিকা সম্পাদক শেখ আলিমুল্লাহ

১৬. ১৮৩১ জ্ঞানান্বেষণ উদার পন্থী তরুণদের মুখপত্র

১৭. ১৮৩১ জ্ঞানোদয় সম্পাদক রামচন্দ্র মিত্র (হিন্দু কলেজের শিক্ষক)

১৮. ১৮৩২ বিজ্ঞান-সেবধি সম্পাদক গঙ্গাচরণ সেন (হিন্দু কলেজের ছাত্র)

১৯. ১৮৩৫ সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

২০. ১৮৪৩ তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত উদ্যোক্তা তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯)।

গদ্যের সুসংগঠন ও পূর্ণ রূপায়ন আর সেই সঙ্গে শিক্ষিত মনের রুচির প্রসার—এই দুধরণের প্রয়োজন সাধনের সূত্রেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সাময়িকপত্র-পত্রিকার অনুপ্রবেশ। আর এই দুটি উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশে। মধ্যবর্তীকালে আরো বহু পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিলো, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের বিকাশে ও বৈচিত্র্যসাধনে প্রভাকর ব্যতীত অন্যান্যগুলোর অবদান সামান্য। "কারণ কি গদ্যরূপের সংগঠনে কী সৃজনশীল রুচির পরিবর্ধনে। এইসব পত্রিকার কোনো উল্লেখ্য দান অনুপস্থিত।"[১৭] তবে পশু প্রাণিবৃত্তান্ত, পুরাবৃত্ত, বৃক্ষ সম্বন্ধীয়, বিজ্ঞান চর্চা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করে পত্রিকাগুলো বাংলাগদ্যের ইতিহাসে নতুনভাব ও বিষয়ের অবতারণা করেছিল। প্রভাকর এবং তত্ত্ববোধিনী পরম্পরাগত সকল প্রয়াসের সুসম্পৃক্ততা বিধান করে দিয়েছিল। বিখ্যাত গবেষক এবং ইতিহাসকার কেদারনাথ মজুমদার (১৮৭৩-১৯৩০) 'সাময়িক সাহিত্য (১৩২৪/১৯১৭) শীর্ষক গ্রন্থে 'প্রভাকর' সম্বন্ধে লিখেছেন : "প্রভাকরের পূর্বের পত্রিকায় গুরুতর ধর্মকথার কাটাকাটি ও বাদ-প্রতিবাদে পূর্ণ থাকিত সুতরাং লোকে তাহা বড় মনোযোগ দিয়া পড়িত না। পড়িলেও সহজে তাহা হইতে কোন সরলভাব গ্রহণ করিতে পারিত না।.... স্বল্প শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠকের নিকট প্রীতিপ্রদ হইবে না। ..... ঠিক এই সময়—যখন পাঠকের আগ্রহ হইতেছিল, পরন্ত তা পূরণের উপকরণ পাওয়া যাইতেছিলনা—বাঙ্গালার স্বল্প-শিক্ষিত পাঠকদিগের সম্মুখে ঈশ্বরচন্দ্র সহজ কাব্যরসে ভরপুর করিয়া 'সংবাদ প্রভাকর' উপস্থিত করিলেন—ঈশ্বরচন্দ্রের 'প্রভাকর' শ্লেষ ও রস-কথায় পূর্ণ থাকিত। সেই শ্লেষ ও রস-কথা সহজেই তখন বাঙ্গালী পাঠকের মন আকর্ষণ করিল। এইরূপে প্রভাকর অল্পে অল্পে বাঙ্গালার পাঠক গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। প্রভাকর কেবল যে পাঠকসমাজই গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা নহে ; বাঙ্গালী লেখক-সমাজও গঠন করিয়াছিল।.... বাঙ্গালা সাহিত্য প্রভাকরের নিকট ও তদীয় সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট কতদূর ঋণী—'প্রভাকর' ও ঈশ্বরচন্দ্র সেই মৃত বঙ্গভাষা সঞ্জীবিত করিতে কতদূর সাহায্য করিয়াছিলেন, পাঠক তাহা ক্রমে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।"[১৮]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩) রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭) মনোমোহন বসু প্রমুখ প্রধান বাঙালি মনীষী ও সাহিত্যিক প্রভাকর- সম্পাদক গুপ্ত কবির শিষ্য ও প্রভাকরের লেখক ছিলেন (ছাত্র, তরুণ বয়সে)। 'তখনকার দিনে সাহিত্য পত্রিকা বলে আলাদা কিছু ছিলনা, অথচ ঈশ্বরগুপ্তের স্বাভাবিক কবি প্রতিভা আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজছিল। সংবাদ প্রভাকর হয়ে উঠল সাহিত্য পত্রিকা। তাঁকে ঘিরে তৈরি হল একটি তরুণ লেখকের দল। সংবাদ প্রভাকর একটি লেখক গোষ্ঠী তৈরি করল, যাঁরা পরবর্তীকালে সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি অনেকখানি নির্ধারিত করেছেন।'[১৯] বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ বিধানে মাতৃভাষার জন্য সংগ্রাম ও সমাজ-সংস্কৃতির নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত দিয়ে এই পত্রিকা অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেছিল। বাঙলার জাগরণে প্রভাকরের প্রভাব এককথায় অপরিসীম। শ্রী বিনয় ঘোষ লিখেছেন : "নব্যশিক্ষার সৌধ মাতৃভাষার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার জন্য প্রভাকর আগাগোড়া অবিরাম সংগ্রাম করেছে। প্রভাকর লিখেছে নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীরা নিজের মাতৃভাষাকে সমাদর করেন না বলে বাংলা ভাষার বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়েছে ; কোন ভাষায় এদেশের লোককে শিক্ষা দেওয়া উচিত, ইংরেজীতে না বাংলায়, এ-বিষয় নিয়ে যখন দেশী-বিদেশী শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিতর্ক চলতে থাকে, প্রভাকর তখন মুক্ত কণ্ঠে মাতৃভাষার সপক্ষে প্রচারে প্রবৃত্ত হয়। বৃটিশ সরকার এদেশে ইংরেজী ভাষার প্রসারের জন্য যে অর্থব্যয় করছেন, প্রভাকরের মতে তা অপব্যয় ছাড়া কিছু নয় এবং তার কিয়দংশও যদি বাংলাভাষার জন্য তাঁরা ব্যয় করতেন তাহলে দেশবাসীর অজ্ঞানতা এতদিনে অনেকটা দূর হত।"[২০]

বাংলাভাষায় পাঠ্যপুস্তকের অভাব বলেই মাতৃভাষায় শিক্ষা বিস্তার লাভ করতে পারেনি। এখন বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসেও একই অভিযোগ শোনা যায়। প্রভাকর সম্পাদক বৃটিশ সরকারকে তখনই প্রস্তাব করেছিলেন এবং শিক্ষিত বাঙালিদের কাছে বারংবার অনুরোধ জানিয়েছেন বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ করার জন্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত (১৮৫৭) হবার পর প্রভাকর বাংলা ভাষার সম্যক অনুশীলনের জন্য আবেদন জানিয়েছিল। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে প্রভাকর প্রশ্ন করেছিল তিন বছরে বিশ্ববিদ্যালয় বাঙালি সমাজের কি উপকার করেছে? দেশীয় ভাষার উন্নতি সাধন করা গভর্ণমেন্ট ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাগ্র কর্তব্য বলে প্রভাকর মত দেয়। 'মাতৃভাষার সমৃদ্ধির জন্য প্রভাকরের এই আন্দোলন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মর্তব্য।'[২১]

তত্ত্ববোধিনী সভা ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের পৃষ্ঠপোষণে ও পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রধানত ব্রহ্মজ্ঞানচর্চা ও তা প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। এই উদ্দেশ্য-সাধনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পরিকল্পনা করা হয়। 'আত্মজীবনী'তে (সপ্তম পরিচ্ছেদ) দেবেন্দ্রেনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) লিখেছেন ঃ "আমি ভাবিলাম, তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য কার্যসূত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে আছেন। তাঁহারা সভার কোন সংবাদই পাননা ; অনেক সময় উপস্থিত হইতেও পারেন না। সভায় কি হয় অনেকেই তাহা অবগত নহেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পাননা ; তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক। আর, রামমোহন রায় জীবদ্দশায় ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার উদ্দেশ্যে যেসকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহারও প্রচার আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত, যে সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র শোধনের সহায়তা করিতে পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সংকল্প করি।" দেবেন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন ; 'তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল ; তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্বপ্রথমে এই অভাব পূরণ করে।' বলা আবশ্যক, ধর্ম চর্চা মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান পুরাতত্ত্ব জীবনী শাস্ত্রানুবাদ সমাজনীতি রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে 'লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ' প্রবন্ধ প্রকাশিত হত।[২২] উনিশ শতকের প্রথমপাদে স্বদেশের মাটি থেকে উন্মূলিত ইয়ংবেঙ্গলদের চিত্তকে স্বদেশের অভিমুখী করার সামাজিক ঐতিহাসিক দাবী পূরণ করেছিল তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯) ও তার মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩)। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' দীর্ঘজীবন লাভ করেছিল। তবে তার মধ্যে প্রথম পঁচিশ বছর এই পত্রিকার সবচেয়ে গৌরবের যুগ। একথা

Dhaka University Institutional Repository

জোরের সঙ্গে বলা চলে যে, বাঙলার নবজাগরণের মুখটি সঠিক দিকে ফিরিয়ে দিতে তত্ত্ববোধিনী এক অতি সার্থক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।[২৩] কারণ, এই পত্রিকা কেবল ব্রাহ্মধর্মের তত্ত্ব ও আদর্শ নিরূপনের কাজে সীমিত ছিলনা। ইউরোপীয় দর্শন, বিজ্ঞান ও প্রাচীন ভারতের মূল্যবান ধর্মশাস্ত্র ও সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরাজি বাংলায় অনুদিত হয়ে এতে প্রকাশিত হতো। দেবেন্দ্রনাথ প্রাচীন হিন্দুধর্মের বহু কুসংস্কার ও বিধি ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে ব্রাহ্মধর্ম ও তত্ত্ববোধিনী সভার মাধ্যমে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির একটি বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাবার সাধনা করেছিলেন।[২৪] চিন্তামুক্তির ক্ষেত্রে তথা বাঙলার জাগরণে তত্ত্ববোধিনীর সামাজিক সাংস্কৃতিক অবদানের চেয়ে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে তার অবদান কম ছিলনা। "তত্ত্ববোধিনী প্রচার হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালাদেশে প্রকৃত বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ হয়। তত্ত্ববোধিনীর পূর্বে যেসকল পত্র-পত্রিকায় সাহিত্যালোচনা হইত, প্রকৃত পক্ষে তাহাতে শিক্ষণীয় বিষয় কিছুই থাকিত না। বাদ-প্রতিবাদ, ছড়া-কবিতা এবং হাসি-ঠাট্টাই সেগুলির আলোচ্য বিষয় ছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে গুরুগম্ভীর আসন লইয়া উচ্চ দর্শন বিজ্ঞান ও নৈতিক আলোচনার সূত্রপাত করিলেন। অক্ষয়কুমারের সংগৃহীত প্রাচ্য ও প্রতীচ্যভাবসমূহ তাহার তেজস্বিনী ও হৃদয়গ্রাহিনী ভাষায় প্রচারিত হইতে লাগিল।.... বিদ্যাসাগর মিলিত হইলেন .... তত্ত্ববোধিনীর অঙ্গে সোনায় সোহাগার কার্য্য করিল....."[২৫]

তত্ত্ববোধিনীর সরণী বেয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে শত শত সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সকল পত্রিকাই সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে সমান প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। অধিকাংশই ছিল ক্ষণস্থায়ী। কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে অধিকাংশ। তাছাড়া পাঠক ও গবেষকদের নিকটও তা সমান সমাদরণীয় হয়নি। 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) প্রকাশের পর থেকে বাংলা সাহিত্যে আর এক নবযুগের সূচনা হলো। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি মানসিকতার ত্রিধারা—বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা, ঐতিহাসিক বস্তুবোধ ও সামাজিক নীতি-বিশুদ্ধিকে বাংলা সাহিত্যে সার্থকভাবে প্রবাহিত করে দিলেন। এই ত্রিধারার ক্রমপরিনতি লক্ষ্য করা যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪০-১৯২৬) ভারতী' (১২৮৪) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০-১৯২১) সম্পাদিত 'সাহিত্য' (১২৯৭/১৮৯০) এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩) সম্পাদিত 'প্রবাসী' (১৩০৮/১৯০১) তে। উনবিংশ শতাব্দে এই মানসিকতা বজায় ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং 'সবুজপত্র' (১৯১৪) পর্যন্ত।

সবুজপত্র থেকে আবার পালাবদল শুরু হয়। কিন্তু বিশ শতকের কতিপয় পত্রিকা (যেমন, 'উপাসনা' (১৯০৪) ; 'গৃহস্থ' (১৯০৯) ; 'আর্যাবর্ত' (১৯১০) ; 'অর্ঘ (১৯১১) 'ভারতবর্ষ' (১৯১৩) ; 'নারায়ণ' (১৯১৪) প্রভৃতি মাসিকপত্রে পুরনো ধারাই অক্ষুন্ন ছিল।[২৬]

'বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সমাগত রাজবদুন্নতধ্বনি ঃ।' 'বঙ্কিমের মত রসদৃষ্টি ও বুদ্ধিবিচার—এ দুয়ের সম্মিলিত প্রতিভার অধিকারী আর কেউ পত্রিকা সম্পাদনায় এর পূর্বে আসেননি। বাংলার জাগরণের মর্মকে সুপ্ত বাঙালি সমাজের কাছে পৌছে দেবার তিনি ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তি'।[২৭] ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন ঃ ...... শুধু আলঙ্কারিক অর্থে যুগান্তকারী নয়। আক্ষরিক অর্থেই যুগান্তর সৃষ্টিকারী। 'বঙ্গদর্শন শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার বাহন নয়। সেই যুগেরই প্রতিভার বাহন ছিল। 'বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীতি হইল।' বঙ্গদর্শনের পূর্বে আরও কটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল ; যেমন : বেঙ্গল স্পেক্টের (১৮৪২) ; 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১), 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪) 'সোমপ্রকাশ- (১৮৫৮) ; 'পূর্ণিমা' (১৮৫৯) ; রহস্য-সন্দর্ভ (১৮৬৩) ; 'অবোধবন্ধু' (১৮৬৩) এবং 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (১৮৬৮)।

বেঙ্গল স্পেক্টেটর উচুমানের পত্রিকা ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সাময়িকপত্র জগতে খুব অল্প সময়ের জন্য প্রচারিত হলেও অগ্রগামী চিন্তাধারা ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে রামগোপাল ঘোষের উদ্যোগে এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর একজন প্রধান প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-৮৩) ওপর এর সম্পাদনাভার অপন করা হয়। ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষী মাসিক পত্ররূপে প্রথমে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পাঁচমাস ধরে মাসিক পত্ররূপে চলার পরে এটি পাক্ষিক পত্রের রূপ গ্রহণ করে। আরও পরে এটি সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। এই পত্রিকার জীবনকাল ছিল স্বল্প। ১৮৪২ সনের এপ্রিল মাসে এর জন্ম এবং ১৮৪৩ সনের নভেম্বর মাস পর্যন্ত চলার পরে আর্থিক কারণে বন্ধ হয়ে যায়।[২৯] প্যারীচাঁদ মিত্রের সম্পাদনায় এরপরে দুটি কারণে বিখ্যাত 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪) প্রকাশিত হয়। অতপর বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫-৯৪) 'পূর্ণিমা' (১৮৫৯) এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২-৯১) 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১) ও 'রহস্য-সন্দর্ভ' (১৮৬৩) এবং যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এর 'অবোধ বন্ধু' (১৮৬৩) ; শিশির ঘোষের অমৃতবাজার পত্রিকা (১৮৬৮) ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮২০-৮৬) সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮) এ বিদগ্ধ সাহিত্যালোচনা এবং রাজনৈতিক বিষয় স্থান পেতে থাকে। সমাজ ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য প্রধান হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এই পত্রিকাগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। প্যারীচাঁদ মিত্র রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় ক্ষুদ্রাকায় 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪) প্রকাশ করেন অল্প শিক্ষিত জনসাধারণ, বিশেষত মহিলা সমাজকে শিক্ষাচ্ছলে সাহিত্যরস জোগান দেবার মানসে। পত্রিকার আদর্শ সম্পর্কে বলা হয় ঃ " এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষত স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে ; যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞপণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।" প্যারীচাঁদের প্রথম রচনাগুলো এই পত্রিকায় বের হয়েছিল। মাসিক পত্রিকায় 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশ করে অভিনবত্ব দেখালেও 'বঙ্গদর্শন' এক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রাখে। অবশ্য শুধু 'উপন্যাস' দিয়ে নয় আধুনিক চিন্তা ও মনস্বীতায় বঙ্গদর্শন বাঙালি মানসকে ঝাঁকি দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছিল। পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো সংকীর্ণ বা বদ্ধ দৃষ্টি ছিলনা বঙ্কিমচন্দ্রের। কোনো বিশেষ মত, ধর্ম বা ব্যক্তিগত তৃপ্তিসাধনের ব্যাপারও ছিলনা বঙ্গদর্শন। সমগ্র বাঙালি সমাজই ছিল এর লক্ষ্য। বাঙালিকে নবজাগরণের পথ নির্দেশ করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। বঙ্কিমচন্দ্র একটি মাসিক পত্রিকার মধ্য দিয়ে জাতির জন্য এই মূল্যবোধ তৈরি করেছিলেন, এটা কম কথা নয়।

বঙ্গদর্শনের আলোচনা হতো নৈর্ব্যক্তিক। সম্পাদক বঙ্কিমের বিশিষ্ট মানসিকতা ছিল বাঙালিকে মানবধর্মে উজ্জীবিত করে তোলার চেষ্টা। তাঁর চিন্তায় উদার নীতিধর্মের সঙ্গে স্বধর্মানুরাগের মিশ্রণ ঘটেছে। স্বদেশ ও স্বধর্মকে তিনি ভালোবাসতে শেখাচ্ছেন, সেই সঙ্গে প্রণোদিত করছেন যুক্তিবাদী

Dhaka University Institutional Repository

হতে, অন্ধতাকে ত্যাগ করতে। বঙ্গদর্শনে ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, অর্থনীতি ও মানববিদ্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে গভীরতর আলোচনার ধারা সৃষ্টি করলেন। 'এক কথায় বলতে গেলে বাঙালিকে তিনি যথার্থ শিক্ষিত হয়ে উঠবার পথ প্রদর্শন করেছিলেন।' উনিশ শতকের প্রথম দিকে সমাজকে নানা সংস্কারক ভেঙ্গেচুরে গড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখনও সুগঠিত হয়নি (গঠন) বন্ধনকার্য। বঙ্কিম ও তাঁর সহযোগীরা সমাজবন্ধনের যুক্তিসঙ্গত আদর্শবাদ নিয়ে বঙ্গদর্শনের মাধ্যমে উপস্থিত হলেন। কেন্দ্রবিন্দু অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্র। ফলে সমগ্র বঙ্গদর্শনের ভাবনায় ঐক্য ছিল। ভাষা ও সাহিত্যিক স্টাইলের দিক থেকেও সংগতি ছিল পূর্বাপর। এটা সম্ভব হয়েছিল সম্পাদকের সুনিয়ন্ত্রণ ও সম্পাদনার দক্ষতার গুণে।৩০

বিংশ শতাব্দীতে পত্রিকা সম্পাদনার লক্ষ্য ও আদর্শের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বা প্রমথ চৌধুরী অথবা বুদ্ধদেব বসু যিনি-ই হোন না কেনো, আপন কঠোর ব্যক্তিত্বের দ্বারা কোনো লেখককে তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইতেন না।বিশ শতকের সম্পাদকমণ্ডলী লেখককে স্বাধীনতা দিতে চান। 'ব্যক্তিত্ববাদের স্বীকৃতি বিংশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য।' 'আধুনিক যুগ শুধু ব্যক্তি স্বাধীনতার যুগ নয়, ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠারও যুগ'। সেজন্যে বিংশ শতাব্দীর একটি পত্রিকায় ভিন্ন মত-পথের লেখকেরা একই সঙ্গে লিখতে পারেন। তাঁরা বিতর্কেও যোগ দেন। সেজন্য পত্রিকার ভূমিকা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে লেখক গোষ্ঠীর সদস্যদের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনাই পন্থা হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য একই উদ্দেশ্যে কোনোপত্রিকার লেখকদের সকলেই একত্র হয়ে যে লেখার প্রতীজ্ঞা করেন নি, তা একদম নয়। সবুজপত্র, কল্লোল, মোহাম্মদী, সওগাত, সমকাল, কণ্ঠস্বর মাহেনও প্রভৃতি পত্রিকায় আদর্শের ঐক্য ছিল। যদিও ভাষা, স্টাইল আর সব উপকরণ এবং লেখকদের উপর নিয়ন্ত্রণ কিছুই ছিল না। বিশ শতকের প্রখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা সবুজপত্র (১৯১৪/১৩২১) প্রকাশের পূর্বে একঝাঁক সাহিত্য পত্রিকার বিকাশ ও প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

বঙ্গদর্শনের পরে-পরেই ১৮৭৭ সনে প্রকাশিত হয় জোড়াসাঁকোর দ্বিতীয় প্রধান পত্রিকা 'ভারতী'। ভারতীও দীর্ঘজীবী হয়েছিল। ১৯২৩ সন পর্যন্ত চলে। নানা সম্পাদকের হাত ঘুরে, সময়ের অগ্রগামী বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেছিল এই পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথের নামের সাথে এবং তাঁর চিন্তা ও সাহিত্য শিল্পকে ধারণ করে বিখ্যাত হয়ে আছে আরও দুটি পত্রিকা 'বালক' (১২৯২/১৮৮৫) ও 'সাধনা' (১৮৯১)। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'সাধারণী' (১২৮০-৯২) এবং মাসিক 'নবজীবন' (১২৯১-১২৯৫) পত্রিকা দুটিও বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। উনিশ শতকেই আরও তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পত্রিকার প্রকাশ ঘটলেও বিংশ শতাব্দীতেই এই তিন শ্রেণীর পত্রিকা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়ে ওঠে— প্রথমত সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে মহিলা সমাজ আগ্রহী হয়ে উঠছেন। আর দ্বিতীয়ত শিশুতোষ সাহিত্যের আলাদা পত্রিকাও প্রকাশ পেয়ে যায় উনিশ শতকেই। বালক-এ কিশোরোপযোগী লেখাই প্রকাশিত হতো। এবং মহিলাদের দ্বারা সম্পাদনা কার্য শুরু না হলেও, কেবলমাত্র মহিলা বিষয়ক লেখা নিয়ে পত্রিকাও উনিশ শতক থেকেই প্রকাশিত হতে শুরু করে। তৃতীয়ত উনিশ শতকের শেষে মুসলিম জাগরণের ফলে মুসমনান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাও প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। মুসলিম সমাজের কল্যাণ কামনায় ভাবিত বিষয়াবলী নিজেদের পত্রিকাতে প্রকাশ আরম্ভ করলে মুসলিম রচিত সাহিত্য ও মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকার ধারা সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে বঙ্কিমের প্রভাব অনস্বীকার্য। বঙ্কিম প্রভাবিত মুসলিম সাহিত্যিক মীর মোশাররফ হোসেন বঙ্গদর্শনের দুই বছর পর সম্পাদনা করেন 'আজীজন নেহার' (১৮৭৪)। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনে বাঙালি জাতীয়তাবাদী (প্রধানত হিন্দু জাতীয়তা বা ভারতীয় জাতীয়তা) চেতনার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট মুসলিম জাতীয়তার জাগরণের ফলে সৃষ্টি হয় মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র সাহিত্য। মুসলিম জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও মুসলিম সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাও সমাজ ও সাহিত্যকে ব্যাপকভাবে নাড়া দিতে থাকে। মুসলমানদের পত্র-পত্রিকার সাধনার ফলে পিছিয়ে থাকা মানুষদের নব জাগরণের ফলেই ১৯৪৭ সনে 'পাকিস্তান' সৃষ্টি হতে পেরেছিল।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বঙ্গদর্শনের পর থেকে রবীন্দ্রনাথের সাধনা পর্যন্ত বিশ বছর (১৮৭২-৯১) বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ে বাঙালির ইংরেজি শিক্ষা অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে। সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করেছে। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালির কাছে চাকুরীর দরজা উন্মুক্ত। সিপাহী বিদ্রোহের পর দেশের শাসনব্যবস্থা অধিকতর সুসংহত ; রেল-টেলিগ্রাফের কল্যাণে ভারতবর্ষের প্রান্তগুলি সুগম, দূর নিকটতর হয়েছে : বাঙালির প্রেসটিজের বাজার-দর তখন উচ্চ। এই পর্বটি 'শিক্ষা-পর্ব'। পূর্ববর্তী অধ্যায় ছিল 'সংস্কার-পর্ব'। তাই বঙ্গ-দর্শনের পূর্ব-যুগের সাহিত্যের প্রবণতা ছিল প্রধানত সমাজ-সংস্কারের দিকে, বেড়া ভাঙার খেয়ালে। আর বঙ্গদর্শন পরবর্তী যুগের সাহিত্যের প্রবণতা হলো চিত্ত-সংস্কারের অভিমুখে, ঘরগড়ার দিকে। বঙ্গ-দর্শনের সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছিলেন, তাতে এই যুগের তাৎপর্য অভিব্যক্ত। চিত্ত-সংস্কারের একটি বড় প্রকাশ হচ্ছে 'জাতীয়তা বোধের উন্মেষ' স্বাধীনতা-স্পৃহার স্ফুরণে। গদ্যে, পদ্যে, নাটকে, প্রবন্ধে, তর্কে, অভিনয়ে, বেশে, ব্যবহারে, চিন্তায়, কর্মে এই সময়ের ও যুগের মর্মকথাটি প্রকাশোন্মুখ হয়েছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্র এসময়ে সাহিত্যগুরু, সাহিত্যসম্রাট। বঙ্কিমচন্দ্র যা সাধন করেছিলেন তাকে এভাবে বলা যায় : "গদ্যের লঘুতর ও সরস রূপদান ; ঐতিহাসিক এবং গার্হস্থ্য রোমান্স সৃষ্টি ; নিরাবিল কৌতুক রসের এবং শুচিরস বোধের প্রবর্তন, পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে সাহিত্য সমালোচনার পথ নির্দেশ, শিক্ষার আলোকদীপ্ত স্বাধীনবুদ্ধির কষ্টিপাথরে হিন্দুধর্মের ও শাস্ত্রের মূল্যবিচার, নব্য-হিন্দুধর্মের পক্ষাবলম্বন, সমাজচেতনা, রাষ্ট্রচেতনা এবং সাংস্কৃতিক চেতনার উদ্দীপন, এবং সর্বোপরি পাঠকচিত্তে সাহিত্য-রসতৃষ্ণা জাগানো।"৩১

বঙ্গদর্শন প্রকাশের পরবর্তীকালে শিক্ষিত বাঙ্গালীর স্বাজাত্যবোধও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়। এরই ফল 'হিন্দুমেলা' এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫)। মুসলমানদের মধ্যেও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা দেখা যায়। নবাব আবদুল লতীফ (১৮২৬-৯৩) সৈয়দ আমীর আলীর (১৮৪৯-১৯২৮) প্রতিষ্ঠান দুটি— মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি (১৮৬৩) ও ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৭) এর কথা এখানে স্মর্তব্য। বাঙালীর জাগ্রত রাষ্ট্রীয়-চেতনার খণ্ডচিত্র এই সময়ের সাময়িকপত্রে বিধৃত রয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এর 'ভারতী' (১৮৭৭) ; দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কৃষ্ণকোমল ভট্টাচার্যের 'হিতবাদী' এবং রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' (১৮৯১) প্রভৃতি পত্রিকার নামকরণের মধ্য দিয়েও তা অনুধাবন করা যায়। অবশ্য

Dhaka University Institutional Repository

কিছুদিনের মধ্যে কয়েকটি কারণে সাহিত্যে জাতীয়তার ও স্বাদেশিকতার বহিপ্রকাশ কমে আসতে থাকে। এর কারণ বঙ্কিমের অনুসরণে গীতা অনুশীলনের প্রতি ঝোঁক এবং হিন্দুধর্মের নবজাগরণ। ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষের কঠোর মনোভাব সাময়িক-সাহিত্যে রাজনীতি ও সমাজ-সমালোচনার নতুন ধারা সৃষ্টি করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সমকালে এবং তার পরের সাহিত্যে দেশ রাষ্ট্র ও মানব-ভাবনার স্বরূপ অনুধাবন করলে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

১.৩. সাহিত্যপত্রিকা ও কালের দাবী

ইতিহাসের দিকে তাকালেই দেখা যায় — সংবাদ, সাময়িক ও সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের মূল প্রেরণাই ছিল সমাজ ও সংস্কৃতি-ভাবনা । বেঙ্গল গেজেট (১৭৮০) থেকে বঙ্গাল গেজেটি (১৮১৮) পর্যন্ত ইংরেজী ভাষায় যতো গুলো পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তাও প্রকাশিত হয়েছিল সমাজ-সমালোচনার লক্ষ্যে ; যদিও বহিরাগত ধনিকদের স্বার্থ-চিন্তা ছিল এর মূলে কার্যকর; তথাপি এইসব প্রয়াসের মাধ্যমে সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তরের ক্ষেত্রে পত্র-পত্রিকার ভূমিকা সম্পর্কে এদেশবাসী অবহিত হতে পেরেছিলো। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নানা অনাচারের কাহিনী পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশের ফলে সরকারের উচ্চ-স্তরে, ও প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ কৌশল ও পদ্ধতিতে পরিবর্তন অনিবার্য হচ্ছিল। ফলে পত্রিকায় সমাজ-সমালোচনার প্রবণতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে ; পাশাপাশি জনমত দমন করার জন্যে কায়েমী স্বার্থবাদী ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী সেন্সরশীপ প্রথার উদ্ভাবন করে। সেই ধারা আজও চলছে। সমাজ-সংস্কারকেরা মতাদর্শ প্রচারের মুখ্য মাধ্যম হিসেবে আগেই যেকোনো পত্রিকা প্রকাশের চিন্তাই করে থাকেন। কে না-জানেন, বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-কাঠামোর ভিত্ কাঁপিয়ে দিতে এবং স্বাধীন সার্বভৌম ভারতীয় রাষ্ট্রসমূহের প্রতিষ্ঠার পেছনে কালে কালে পত্র-পত্রিকা গুলো কি অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছিলো। বাংলাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজের অগ্রগতিতে সাহিত্যপত্রিকাসমূহের যুগান্তর সৃষ্টিকারী ভূমিকার কথাও ইতিহাসকারগণ উচ্ছসিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করবেন।

সমাচার-দর্পণ (১৮১৮)-এ কোনো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া না-গেলেও, তা বাংলার নবযুগের পত্রিকা হয়ে উঠেছিল। এবং লক্ষণীয়, 'মিশনারীদের পত্রিকা হওয়া সত্তেও' তাতে 'খ্রীষ্টীয় আদর্শের প্রচারের উৎকট চেষ্টা ছিল না'। সম্পাদক মার্সম্যান সমাচার দর্পণ পত্রিকার নামের নিচে পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যসংবলিত এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছিলেন ঃ " দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণা :। বৃত্তানিহ জানন্ত সমাচারাস্য দর্পণে।।"

পত্রিকাতে নবযুগের চাঞ্চল্যকর ধর্মান্তরণ-ঘটনা, ইংরেজি শিক্ষার ফলে বাঙালি যুবকদের অস্থিরচিত্ততা ও নানান সামাজিক ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ পাবার ফলে উদ্ভূতসামাজিক সংকট মোকাবিলার জন্য রামমোহন, ঈশ্বরগুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ প্রধান সম্পাদকবৃন্দ উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১) আধুনিক বাঙালি সমাজের প্রথম বাণীবহ; সংবাদ পরিবেশনের সঙ্গে তাতে থাকত গদ্যে লেখা দীর্ঘ রচনা এবং কবিতা। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তের (১৮১২-৫৯) সংবাদ প্রভাকরও পরিবর্তনশীল সমাজের মুখপত্র হয়ে উঠেছিল। সজ্ঞানে না হলেও উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাঁস-এর পটপরিবর্তন এই পত্রিকায় প্রতিফলিত হয়েছিল সম্পাদক-ব্যক্তিত্বের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণেই। সম্পাদক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত দিতেন, ভালোমন্দ সমালোচনা করতেন। সম্পাদক ও লেখকগণ সামাজিক দায়িত্ববোধ সচেতন হওয়ায় পত্রিকাটি সংস্কৃতি ও সমাজ-ভাবনার ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে জাগরণের স্বর্ণযুগের প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিল।

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশিতই হয়েছিল একটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে। 'সমুদয় শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব' ও 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার' তখন বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মিশনারী কর্তৃক হিন্দুধর্মের উপর হানিত আঘাতকে প্রতিহত করার জন্য 'সমস্ত হিন্দু (তখন) একযোগে সমাজ সংস্কারে অগ্রসর' হয়েছিলেন। মিশনারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে 'আঘাতকে প্রতিঘাত করিবার মধ্যেই বাঙ্গালী তাহার আত্মশক্তির পরিচয়' পেয়েছিল। প্রতিঘাত-কর্মটি মুখ্যত প্রকাশিত হয়েছিল ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের মধ্য দিয়ে। 'তত্ত্ববোধিনী' প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাই ধর্মচর্চা ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচার। কারণ, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ধর্মের আদর্শ ও প্রত্যয়সমষ্টি কেন্দ্র করে রামমোহন দেবেন্দ্রনাথের ধারা ব্রাহ্মধর্মের অভ্যুদয় হয়েছিল। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেছেন ঃ 'বাংলাদেশের তো বটেই, সারা ভারতবর্ষে উনিশ শতকে যে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ঐতিহাসিক লক্ষণ সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল তাতে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্র প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের ... গভীর ও ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান'।[৩২] বলাবাহুল্য, একাজে তত্ত্ববোধিনী (১৮৪৩) প্রধান অবলম্বন হয়েছিল।

উনিশ শতকের প্রারম্ভে ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে সমাচার দর্পণ, ... প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতির পরে জ্ঞানান্বেষণ, বেঙ্গলস্পেক্টেটর, সোমপ্রকাশ, বঙ্গদর্শন, ভারতী প্রভৃতি প্রত্রিকার মতামত সমালোচনা এবং জনমত-গঠন প্রয়াসের কথা ইতিহাসে উচ্চমূল্য লাভ করেছে। যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বাংলার জাগরণকে রূপ দিয়েছিল এই সব পত্রিকা-ই। ফার্সী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা প্রবর্তনের কালে সমাচার দর্পণ বাংলা ভাষার পক্ষে জোর সংগ্রাম করেছিল। প্রভাকর-সম্পাদক স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রেমের বীজ অঙ্কুরিত করেছিলেন সংবাদ-প্রভাকরে স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতা লিখে। ইয়ংবেঙ্গলদের পত্রিকা জ্ঞানান্বেষণ ও বেঙ্গলস্পেক্টেটর উদারপন্থী চিন্তা-চর্চার ধারায় পুষ্টি জুগিয়েছে। প্রকারান্তরে এঁরা রামমোহনের চিন্তাধারারই উত্তর-সাধক। সোমপ্রকাশ-এর চেতনাধারায় ছিল রাজনৈতিক প্রবণতা। জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশের লক্ষ্যে সজ্ঞানে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। 'তাঁকে কেউ এ-বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন কিংবা এ-কাজে নিযুক্ত করেছিলেন, এমন খবর আমাদের জানা নেই। শম্ভুচন্দ্র মুখার্জিকে লেখা ১৮৭২ -এর চিঠিতে দেখা যায় এভাবনাটা তাঁর মধ্যে নিজের থেকেই এসেছিল।'[৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

'বঙ্গদর্শনে'র সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন : ...."বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্গ-মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বিবেচনা করেন যে, এরূপ বার্ত্তাবহের কতকদূর অভাব আছে। সেই অভাব নিরাকরণ এই পত্রের এক উদ্দেশ্য। আমরা যে কোন বিষয়ে, যে কাহারও রচনা, পাঠোপযোগী হইলে সাদরে গ্রহণ করিব। এই পত্র, কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের মঙ্গল সাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই।"[৩৪]

পত্র-সূচনায় সম্পাদক সুশিক্ষিত, 'কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে' বঙ্গদর্শন অর্পণ করবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন এই কারণে যে, তৎপূর্ববর্তী পত্রিকাসমূহ ('বার্ত্তাবহ') 'পাঠোপযোগী' ছিলনা এবং 'সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ' ছিলেন। বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের তাই 'প্রথম উদ্দেশ্য'ই হল সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশে 'যত্নবান হওয়া। পত্রিকার সামাজিক উদ্দেশ্য ছিল : "যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্ধিত হয়"— সাধ্যানুসারে তা 'অনুমোদন' করা।[৩৫] বঙ্গদর্শন বাঙ্গালীর সমাজ, সংস্কৃতি ও মনন সাধনার অগ্রগতিতে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল, তার আদর্শ অনুসরণ-অণুকরণের চেষ্টা যুগে যুগে হয়ে আসছে। কিন্তু যা সম্ভব হয়েছিল বিশেষ দেশকাল ও সমাজ-পরিস্থিতিতে এবং প্রতিভাশ্রেষ্ট বঙ্কিমের কারণে, তা আর কোনও যুগে কারো দ্বারাই সম্ভব হয়নি। কিছুটা হয়েছিল 'ভারতী' দ্বারা।

বঙ্গদর্শনের আদর্শে অণুপ্রাণিত উচ্চমানের সাময়িকপত্র জ্ঞানাঙ্কুর, আর্যদর্শন, বান্ধব, প্রতিবিম্ব, ভ্রমর প্রভৃতি প্রকাশের পর উনিশ ও বিশ শতকের অন্যতম প্রধান ও দীর্ঘজীবী পত্রিকা ভারতী (১৮৭৭) প্রকাশিত হয়েছিল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টির অভিপ্রায় নিয়ে। বঙ্গদর্শন চারবৎসর চলে বন্ধ হয়ে সঞ্জীবচন্দ্রের (১৮৩৪-৮৯) সম্পাদকত্বে পুণপ্রকাশিত হলেও হৃতগৌরব আর ফিরে পায়নি। শেষের দিকে বঙ্গদর্শন হিন্দুধর্মের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে সমাজকে গোঁড়ামির দিকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। 'বঙ্গদর্শনের এই রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে প্রগতিশীল এবং ধর্মে, সমাজে ও সাহিত্যে সংস্কারমূলক চিন্তাধারা প্রচারের প্রয়োজন অনুভূত হইতে থাকে। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে (সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত) বঙ্গদর্শন বন্ধ হইবার পর এই নব ভাবধারাকে রূপ দিবার জন্যে ঐ বৎসর শ্রাবণ মাস হইতে ভারতী (১৮৭৭, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক) প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে।[৩৬] 'সব মিলে ভারতী পত্রিকা উনিশ শতকের শেষার্ধের পরিণততম বাঙালি মনীষার প্রকাশস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ... বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে ভারতীযুগ বলতে বিশেষ সাহিত্যাদর্শকেই বুঝিয়েছে যা বাঙালির চিন্তা ও কল্পনার ধারক। বঙ্গদর্শন বলতে যেমন বঙ্কিমীচিন্তা ও আদর্শকে বোঝায় যার অনেকখানি সঞ্চারিত হয়েছে বাঙালি সমাজে, ভারতী বলতে তেমনি ঠাকুর পরিবার তথা রবীন্দ্রীয় চিন্তা ও আদর্শকে বোঝায় যা বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ শতকে।'[৩৭] সবুজপত্র (১৯১৪) ও কল্লোলের (১৯২৩) মাধ্যমে শুরু হয় পালা বদল। সওগাত-শিখা - মোহাম্মদী - গুলিস্তাঁ-বুলবুল প্রভৃতি যে ধারার সূচনা করে তাতে সমাজে ঘটে আর এক রূপান্তর। বিশ শতকে যে-এক দল সম্পাদক সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনে ব্রতী হয়ে সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য-ভাবনায় মাত্রাযোগের সাধনা করেছিলেন, তাঁরা সকলে সমাজ ও সংস্কৃতির যুগগত চাহিদা বা কালের দাবি সমানভাবে মেটাতে সক্ষম হননি বটে; কেউ- কেউ সংরক্ষণশীল ভূমিকা অবলম্বন করে প্রগতিবাদীদেরকে তীক্ষ্ম-তীব্র কটাক্ষ ও বিদ্রূপও করেছেন। কিন্তু এতে প্রকৃত পক্ষে প্রগতিবাদীরা আরও বেপরোয়া হতে পেরেছেন বলে খুব ক্ষতি হয়নি। স্ফুলিংগ জ্বলার জন্য প্রয়োজনীয় সংঘর্ষ সৃষ্টি করে পরোক্ষভাবে তাঁরাও কালের সঠিক মাত্রাকে ছুঁয়ে যেতে সহযোগিতা করেছেন। 'শনিবারের চিঠি', (১৯২৪) ও 'মোহাম্মদী' (১৯২৭) ভবাচীরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত উনিশ শতকের রক্ষণশীল সংস্কারবিমুখদের প্রতিনিধিত্বকারী চিন্তাধারার বাহক সমাচার-চন্দ্রিকা (১৮২২) র ন্যায় প্রগতিবিমুখ ও সংরক্ষণকামী ছিল; কিন্তু তাঁরাও সমাজের মঙ্গল-চিন্তা থেকেই কথাগুলো বলতেন, কাজ করতেন মনে রাখতে হবে। অমঙ্গল তাঁরাও চাইতেন না। কিন্তু পরিবর্তনে ভয় পেতেন। মেধার সীমাবদ্ধতা এবং সৃজনক্ষমতার অভাবও তাঁদের ছিল। কিন্তু বাদ-প্রতিবাদে অংশ নিয়ে প্রগতি-পন্থীদের চিন্তা ও কর্মে প্রেরণা দান, প্রাণ-রস-সঞ্চার কিংবা উসকানি প্রদান করে পরোক্ষভাবে তাঁরাও সামাজিক ক্রিয়াকর্মে, অগ্রগতির বিতর্কে ক্রিয়াত্মক ভূমিকা পালন করেছিলেন। ফলে উনিশ ও বিশ-শতকের পত্র-পত্রিকার ইতিহাসে সমাচার-চন্দ্রিকা, শনিবারের চিঠি ও মোহাম্মদী প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত ও আলোচিত হয়ে থাকে ।

ভারতীর পরে বিশ শতকের সাহিত্য ও সংস্কৃতি ভাবনায় প্রগতিশীল ধারার নেতৃত্বদান করে 'সবুজপত্র' (১৯১৪) 'কল্লোল (১৯২৩), 'শিখা' (১৯২৭), 'সওগাত' (১৯২৬) বুলবুল (১৯৩৩) প্রভৃতি পত্রিকা। তবে বিশ শতকের গোড়া থেকে প্রথম সারির একগুচ্ছ সাহিত্য-পত্র সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অগ্রগতির সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে উল্লেখযোগ্যতা অর্জন করেছিল। বঙ্গদর্শন, ভারতী, সবুজপত্র, কল্লোল-শিখার ধারাকেই এঁরা পুষ্টি দান করেছিল এবং এর পরও দুই বাংলায় অনেক উন্নতমানের সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এঁদের প্রধান প্রশ্ন এবং প্রকাশের নেপথ্যে প্রেরণা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকট মোকাবিলা করা এবং মানব সমাজের সমৃদ্ধির সাধনার সঙ্গে কিভাবে একাত্ম হওয়া যায় — তার পথ খুঁজে বের করা।

১৯৪৭-পূর্ববর্তীকালে বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতির প্রশ্নকে উচ্চকিত করে যেসমস্ত পত্রিকা খ্যাতি অর্জন করেছে (প্রগতিপন্থীগুলোর ভেতর) তারমধ্যে প্রবাসী (১৯০১); বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা (১৯১৮); মোসলেম ভারত (১৯২০); সাম্যবাদী (১৯২৩); কালি-কলম (১৯২৭) সওগাত (নবপর্যায়ে ১৯২৬); ধূপছায়া (১৯২৭) প্রগতি (১৯২৭); মোয়াজ্জিন (১৯২৮) পরিচয় (১৯৩১), গুলিস্তাঁ (১৯৩২), বুলবুল (১৯৩৩) অগ্রগতি (১৯৩৫); চতুরঙ্গ (১৯৪০) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বলাবাহুল্য পুরোভাগে থেকে এইসব পত্রিকা আরও শত শত সাহিত্য-পত্রিকার পথ প্রদর্শন করেছে। এই সমস্ত সাহিত্য পত্রিকা প্রাণরস আহরণ করেছে আবহমান বাংলার প্রধান মনীষীদের চিন্তা ও কর্ম থেকে। সাহিত্য-সম্পদ গ্রহণ করেছেন জয়দেব, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখের কালজয়ী ক্লাসিক সৃষ্টিসম্ভার থেকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব-সাহিত্যের প্রাণ -সম্পদ ও স্পন্দনও তাঁরা স্বীকার করে নেন। ফলে চিন্তা -চেতনায় ঘটে বিপ্লব। রবীন্দ্র-পরবর্তীকালে সাহিত্যের নতুন সুরটি বেঁধে দেন প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৬)। আলো ও আঁধারের রহস্য-মিতালীর মধ্যে একটি বিদ্যুৎ-ঝলকের মতোই তিনি বাংলার সাহিত্যাকাশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ডক্টর অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন : 'আমাদের জলভারানত নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন সাহিত্য-জীবনের মধ্যে এই বিদ্যুৎ ঝলক এক তীব্র জ্বালাময় জ্যোতির প্রকাশ ঘটালো। তাতে জীবনের পুঞ্জিভূত বেদনা ও মদির বিহ্বল স্বপ্ন মুহূর্তের মধ্যে স্বচ্ছ লঘু ও তরল হয়ে গেলো।'[৩৮] এই কর্মে 'সবুজপত্র' তাঁর হাতিয়ার হয়েছিল।

সবুজপত্রের প্রকাশ প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪) সমকালে। এর পূর্বেই সমগ্রবিশ্ব -সাহিত্যে একটি নতুন জীবন-জিজ্ঞাসা, সমাজ-চেতনা, প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধ ও যুদ্ধপরবর্তী বিদ্রোহী চিন্তা বাংলা সাহিত্যে সবুজপত্রের মাধ্যমে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিলো বলে কালের দিক থেকে এই পত্রিকার ঐতিহাসিক মূল্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রমথ চৌধুরী 'যৌবনে দাও রাজটীকা' শীর্ষক প্রবন্ধেও লিখেছেন : "সমাজে নূতন প্রাণ, নূতন মন, নিত্য জন্মলাভ করছে। অর্থাৎ নূতন সুখ-দুঃখ, নূতন আশা, নূতন ভালবাসা, নূতন কর্তব্য ও নূতন চিন্তা নিত্য উদয় হচ্ছে। সমগ্র সমাজের এই জীবনপ্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন, তাঁর মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই। এবং তিনিই আবার কথায় ও কাজে সেই যৌবন সমাজকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন।'[৩৯]

এই যৌবনাবেগে উদ্দীপিত হয়েই সবুজপত্র সেদিন প্রচলিত নীতি, সংস্কার ও জীবন বোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানিয়েছিল। পরবর্তী কল্লোলযুগে সমাজ-বিপ্লব যে বহ্নুৎসবের আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার সূচনা হয়েছিল এই সবুজপত্র হতে নিক্ষিপ্ত অগ্নিশলাকা হতে।[৪০]

'সবুজপত্র' প্রকাশের পেছনে কোন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ছিলনা। উন্নত রুচির পত্রিকা বলেই নিয়মিত লেখকের সংখ্যাও বেশি থাকতোনা। পত্রিকার জন্য অনেক লোকসান দিয়েও প্রমথ চৌধুরী নিজের রুচি বজায় রেখে দেশের আর পাঁচজনের চিত্তকে জাগাতে এবং সাংস্কৃতিক রুচির আভিজাত্য আনার উদ্দেশ্যে পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সবুজপত্র বাংলা গদ্যরীতির প্রচলনের বৈপ্লবিক কর্মও সাধন করেছিল। পত্রিকার নাম এবং মলাটের সবুজরঙও তারুণ্য ও প্রাণধর্মের প্রতীকী নির্দেশ করত। সম্পাদকীয় ('সবুজপত্র' শীর্ষক রচনা) তে প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন : "আমাদের কর্মযোগীরা আর জ্ঞানযোগীরা ... আমাদের মনকে রাতারাতি পাকা করে তুলতে চান। ... এঁরা ভুলে যান যে জোর করে পাকাতে গিয়ে আমরা শুধু হরিৎকে পীতের ঘরে টেনে আনি, মৃত্যুকে যেন প্রাণের দারস্থ করি।'

তাই, তারুণ্যের জয়ধ্বজা তুলে জীবন-সমালোচনা দিয়েই শুরু করে জীবনের দুর্লক্ষণগুলোকে আঘাত হেনে সবুজপত্র-লেখকগোষ্ঠী যুগের প্রধান দাবি মেটালেন। জীবনের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ আচারের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। কাজেই সবুজপত্রের বিদ্রোহ, জীবন-সংগ্রামেরই অন্য নাম। প্রচলিত ব্যবসায়িক পত্রিকার মতো বিজ্ঞাপন ছবি আর ফিচার কিছুই থাকত না তাতে। কারণ সাধারণের উদ্দেশ্যে এই পত্রিকা পরিকল্পিত ও প্রকাশিত হয়নি। যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তীকালের যে নতুন চিন্তাধারা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে আঘাত হানছিলো, প্রবেশের দ্বার খুঁজছিলো — তাকে দেশীয় রীতিতে মিলিয়ে দেওয়াই ছিল সবুজপত্রের উদ্দেশ্য। বক্তব্য ও বলার ভঙ্গীতে নতুনত্ব — উভয়ই ছিল তার বৈশিষ্ট্য। এতে সাহায্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এবং ফরাসি সাহিত্য, ভারতচন্দ্রের কাব্য, কৃষ্ণনাগরিক সংস্কৃতি আর প্রাচীন ভারতের শাস্ত্র-সাহিত্যের টীকা -ভাষ্যকারদের নিকট থেকে প্রমথ চৌধুরী আত্মীকৃত করেছিলেন যুক্তিবাদ, ভাষার সংহতিগুণ, বুদ্ধির আধিপত্য এবং বাক-নৈপুন্য প্রভৃতি গুণগুলো, সমালোচকেরা এজন্যই লিখেছেন সব্য-সাচী প্রমথ চৌধুরীর 'গাণ্ডীব' ছিল সবুজপত্র। সবুজ-সভার সভ্যরা হচ্ছেন পাণ্ডব-সেনার দল। বাংলা সাহিত্যে 'বীরবলী যুগ' বা 'বীরবলীচক্র' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সবুজপত্র ছিল মাধ্যম। সমসাময়িক এবং নিকট আত্মীয় হয়েও প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী সর্বাশ্রয়ী সম্ভবপর প্রভাব থেকে 'মুক্ত' ছিলেন'।[৪১] আরও লক্ষণীয় " ... সবুজপত্রের মানসিকতা দেশজ মানসিকতা নয় ... প্রথম মহাযুদ্ধের কালে বাঙালি পাঠককে (তা) মুক্তি দিয়েছিল। সে মুক্তি কিসের মুক্তি? রক্ষণশীলতা ও সংকীর্ণতার অন্ধ গুহা থেকে মুক্তি, জাত্যাভিমান ও শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকা থেকে মুক্তি, ভাবালুতা ও উচ্ছ্বাস থেকে মুক্তি।"[৪২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমথ চৌধুরীর সংবর্ধনা উপলক্ষে প্রকাশিত 'প্রমথ চৌধুরীর গল্পসংগ্রহ' (১৯৪১) র ভূমিকায় লিখেছেন : 'সবুজপত্রে সাহিত্যের ... একটি নূতন ভূমিকা রচনা প্রমথর প্রধান কৃতিত্ব।' তিনি মানুষের মনকে নিদ্রার অধিকার থেকে ছিনিয়ে এনে জাগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কারণ সম্পাদক লক্ষ্য করেছিলেন বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় অভাব হলো মনের ও চরিত্রের। জাতির 'আত্মহত্যা থেকে রক্ষা' করার জন্য তাই সবুজপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। একটি জাতির জীবনে 'প্রাণ' সঞ্চারের দায়িত্ব কাঁধে নিতে অভিলাষী হয়েছিল একটি সাহিত্য পত্রিকা একি কম কথা?

জাতি গঠনে, সংস্কৃতিক অগ্রগতিতে এবং সমাজ-সংস্কারে একটি সাহিত্য পত্রিকা কিভাবে ভূমিকা পালন করে, তা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'সবুজপত্রের' যুগগত বৈশিষ্ট্য ও আরব্ধ কর্ম মিলিয়ে অনুধাবন করলে। বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাচক্রের অন্তর্নিহিত ভাবাবর্তে বাঙালির মনোজগতের ভিত্তিভূমি ধ্বসে গিয়েছিল। এই কারণেই তখন বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়েছিল মানসিক সংগঠনের। বর্তমান দুনিয়ার বাতিলকৃত হৃদয়-ধর্মের স্থলাভিষিক্ত বুদ্ধিবাদ, যুক্তিশীলতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে মূলমন্ত্র করে "সবুজপত্র ... এই যুগগত বুদ্ধিবাদকে, সর্বাদিদৃক্ষু মননশীলতাকে বাংলাদেশে প্রচার করেছে। তাছাড়া, বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের আবিষ্কার হচ্ছে—গণবাদ (গণতন্ত্র), সমাজতন্ত্রবাদ, প্রগতিবাদ, যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতাবাদ। এর মধ্যে প্রগতিবাদ প্রচারে 'কল্লোলের' এবং সমাজতন্ত্রবাদ প্রচারে 'পরিচয়ের' কৃতিত্ব অধিক হলেও অন্য তিনটি মতবাদ প্রচারের কৃতিত্ব মুখ্যত সবুজপত্রের প্রাপ্য। তাই সবুজপত্রকে বলা যায় বিংশ শতাব্দীর বাংলার আধুনিকতার অন্যতম বাহক।"[৪৩] সবুজপত্রের প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক 'ওঁ প্রাণায়স্বাহা' বলে জাগরণমন্ত্র উচ্চারণ করে এই যাত্রা শুরু করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোল' (১৯২৩) পত্রিকা সৃষ্টি করেছিলো এক নতুন যুগের। ইতিহাসের পাতায় কোনো-না কোনোভাবে এই যুগ অবশ্যই

Dhaka University Institutional Repository

আলোচিত হয়ে থাকে। কারণ 'কল্লোল' তরুণ সমাজকে এতোবেশি আলোড়িত করেছিল এবং প্রাচীন, রক্ষণশীলদের দ্বারা এমন আক্রান্ত হয়েছিলো যে, সমাজ সংস্কৃতি ও মননের ক্ষেত্রে তা ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। যদিও প্রথম সংখ্যাতেই সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য তাঁরা ব্যক্ত করেন নি বা করতে পারেননি। তবে এ-কথা ঠিক — বঙ্গদর্শন, ভারতী, সবুজপত্র প্রভৃতি পত্রিকার মতো কল্লোল কোনো বিধিবদ্ধ বা পরিচ্ছন্ন চিন্তা কিংবা বিঘোষিত কোনো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রকাশিত না হলেও , ক্রমান্বয়ে তাঁরা নানাভাবে উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করতে সক্ষম হন। এবং তাতে সাহিত্যসমাজ এক ব্যাপক আলোড়ন অনুভব করে। বিতর্কের ঝড় ওঠে তাঁদের চিন্তা ও কর্ম নিয়ে। 'মাসিক পত্রিকা কল্লোলের জন্মের বীজ নিহিত ছিলো ফোরআর্টস (১৯২১-২২) ক্লাবের' স্বল্পায়ু সত্তার মধ্যে। কল্লোলেরও লক্ষ্য ছিলো শক্তি-সঞ্চারের দিকে। 'জীবনের দুঃখ ঝড় বিচ্ছেদ ... (এর) ভেতরেই যে জীবনের সম্ভাবনা আছে তা আমরা ভাবতে পারিনা বলেই জীবন শুকিয়ে যায়।এসমস্তগুলির ভেতর থেকে রস সঞ্চয় করে নেওয়াটাই জীবনে আনন্দের কারণ। সেই থেকে শুরু হয় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জীবনের জন্ম। তারই মধ্যে সত্যের খ্যাতির, নির্ভীক চিত্তের প্রতিষ্ঠা। কল্লোল এই নির্ভীক চিত্তের বাঁচার মন্ত্র, জীবনের শত দুঃখের মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগিয়ে তোলার আদর্শ বাংলাদেশে প্রচার করতে চেয়েছিল।'

সবুজপত্র যেমন ছিল অল্প সংখ্যক প্রজ্ঞাবান শিক্ষিত ভদ্রলোকের পত্রিকা, তেমনি কল্লোলও ছিল 'পূর্ণবয়স্ক ও চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকাদের জন্য। অল্প বয়স্ক বা যাহারা কিছু পড়িয়া সময় কাটাইতে চান তাহাদের জন্য' কল্লোল প্রকাশিত হয়নি। আদর্শগত তিনটি চিন্তা— পরিণত সৌন্দর্যের প্রশান্তি, প্রেমের ধ্রুবত্ব ও সৌন্দর্য এবং 'কামনার অশান্তি ও বেদনা'- র উপর কল্লোলের আগ্রহ ছিল। 'আরম্ভের দিন থেকেই কল্লোল কর্তৃপক্ষ কাগজটির উদ্দেশ্যকে উচ্চমানের বলেই মনে করতেন। বাংলার জাতি, ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি তাতে ত্বরান্বিত হবে বলে তাঁদের বিশ্বাস ছিল।'

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক শেষে বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সমাজের পটভূমিকার এবং জীবনবৃত্তের পরিবর্তন হলো প্রথম মহাযুদ্ধের উত্তর কালে। " প্রথম মহাযুদ্ধ অনুকূল সংঘটনে অনেক বাঙালি তরুণের মনে অন্তত তাদের প্রাথমিক চেতনায়, একটা উদ্দাম যৌবন ও বাধাবন্ধনহীন অভিযাত্রার স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছিলো, জাতীয় ভাগ্য বা স্বাধীনতা অর্জনের দুর্জয় স্বপ্নাবেগ সৃষ্টি করেছিলো। যুদ্ধোত্তর তরুণ বাংলার মানসলিপির এই সংকেত সাহিত্যের মোড় ফেরার প্রয়াসে একটা নির্জর সত্য হিসেবে আজও স্মরণীয়।"[৪৪] কারণ , প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপের মানসভাণ্ডারে জমিয়ে তুলেছিলো যে হতাশ্বাস, নৈরাশ্য, শূন্যতাবোধ ও বিষাদ চেতনা তা ভালোর দিকের সঙ্গে বাংলার শিক্ষিত তরুণদের মনেও আঘাত হেনেছিল। তাছাড়া যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ভূগোলে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার উদ্ভব (১৯১৭-২১) শুধু রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের বাস্তব দৃষ্টান্ত হিসেবে নয়, বাঙালির চিন্তা অনুভূতি ও চেতনার ভিতকেও একেবারে বদলে দিতে উদ্যত হলো। কিন্তু এই বিপ্লবের আদর্শে সাধারণ শ্রমিক জনতার জীবনের বহুকৌণিক সমস্যার গভীরে মানবিক অনুপ্রবেশের ক্ষমতা বেশির ভাগ তরুণের মন-মনন-বোধ ও চেতনাতে ছিলনা। কল্লোলে সমাজতন্ত্র ও মার্কসীয় লেখা প্রকাশের ফলে সমাজ-মানসে প্রগতিবাদী ধারণার প্রসার ঘটেছে। মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক ধারনার চর্চার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মধ্যে আরও কিছু সমাজ-দর্শনও কৌতূহলের সৃষ্টি করে। তবে 'ফ্রয়েডীয় গবেষণা ও মনস্তত্ত্ব তরুণ দলের মনকে আকর্ষণ করলো সবচেয়ে বেশী। সেই মনস্তাত্ত্বিক আলোক-সম্পাতের ফলে স্বপ্নের আকাশ নতুন অর্থ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো; নারী -পুরুষ, জননী-সন্তান, দেহ-মন, প্রেম-কাম ইত্যাদি সম্পর্কে পুরনো ধারণাগুলি একেবারে পাল্টে গেলো।' ফ্রয়েডীয় চর্চা কল্লোলগোষ্ঠীর তরুণদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করার ফলে অতপর এই ধারায় কল্লোল পত্রিকা এবং ঐ গোষ্ঠীর লেখকেরা প্রচুর সাহিত্য সৃষ্টি করলেন। আরও বিভিন্ন বিজ্ঞানের চর্চাও তাঁরা করেছিলেন— সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি। আর বিদেশী সাহিত্যের বিভিন্ন প্রান্তরের প্রতিও দৃষ্টি পড়লো তাঁদের। ফলে, বাঙালির 'সাহিত্যিক ক্ষুধা বেড়ে গেলো'। "ইংরেজি ও ফরাসী সাহিত্যের বাইরেও যে য়ুরোপীয় সাহিত্যের এক মহৎ ভাণ্ডার আছে, এ সংবাদ বাঙালী চৈতন্যে নূতন সাড়া না জাগিয়ে পারেনি।' এসবই সম্ভব হয়েছিল কল্লোলের প্রভাবে। গবেষকেরা লক্ষ্য করেছেন : "তরুণ বাঙালীর মন য়ুরোপীয় সাহিত্য থেকে যুদ্ধোত্তর কালে পেয়েছিলো মনুষত্বে শ্রদ্ধেয়তা, বাস্তব ও জনগণতান্ত্রিক চেতনা, যৌবন সংলগ্নতাবোধ, মিথুনাসক্তি, প্রেমের মনস্তাত্ত্বিকতা, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের পুনর্বিচারজাত নতুন মূল্যবোধ এবং দুঃখাত্মকতা ও বিষাদচেতনা। আর সেই সব নতুন মত ও পথ তাঁরা বিশেষভাবে দেখতে পেয়েছিলেন ফ্লবেয়ার, জোলা, ইবসেন, ন্যুট হামসুন, গোর্কি, গোগোল, টুর্গেনিভ, চেখভ ডস্টয়ভস্কি, টলস্টয়, মেটারলিঙ্ক, জোহান, বোয়ার, বেনাভান্তে জাসিন্তো ইত্যাদির মধ্যে।"

এসব ছাড়াও বাঙলার আভ্যন্তরিণ রাজনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতিতে বাঙালী যুবকদের মধ্যেও 'অবসাদ, শূন্যতাবোধ ও বিষাদঅকতা' ছড়িয়ে পড়লো। বেকার সমস্যা প্রকট হয়ে উঠলো। মোটকথা কল্লোলের কাল ছিলো 'বাংলাদেশের মোড় ফেরার কাল — জীবন চর্যায় ও মানসিকতায়' । গ্রামীণ সুর ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠলো সংস্কৃতিতে 'নাগরিক সুর'। সমাজের কুসংস্কার, অন্ধতা, নিষ্পেষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ধ্বনিত হতে শুরু করলো। এসবই রূপায়িত হলো কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের রচনায় এবং কল্লোল পত্রিকায়। ফলে বাংলা সাহিত্যে পালা-বদল ঘটাতে তাঁরা সক্ষম হলেন। কল্লোলগোষ্ঠী শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন না — তাঁরা দাঁড়ালেন জনগনের সপক্ষে; তাঁদের জীবনের শরিক হয়ে।' সুতরাং কল্লোল-গোষ্ঠীর রচনায় জনজীবন নতুন তাৎপর্যে অভ্যর্থিত হয়ে ভবিষ্যতের প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়লো বিচিত্র ভঙ্গিমায়, বিচিত্র বিষয়ে। তাই শুধু সমকালে নয়, কল্লোলোত্তর বাংলা সাহিত্যের মধ্যেও কল্লোলের অবদান নিহিত রয়েছে। বাঙলা ও বাঙালির সংস্কৃতিতে নতুন জীবন চেতনার সঞ্চার করেছিল একটি পত্রিকা 'কল্লোল'।[৪৫]

সাহিত্যপত্রিকা সমাজ ও সংস্কৃতির অগ্রগতিতে কালেকালে বৈপ্লবিক ভূমিকা যে পালন করে গেছে ইতিহাস তার সাক্ষী। 'শিখা' পত্রিকা এবং 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে কি রকম আলোড়ন তুলেছিলো সে ইতিহাস আজও সকলের জানা। শিখা গোষ্ঠীর মূলমন্ত্র ছিলো 'বুদ্ধির মুক্তি' ঐমঅনচইপঅটইওন ওে টাএ ইনটএললএচট. 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (ঢাকা, ১৯২৬) সেই দিনে এই মতবাদ প্রচার করে বাংলার শিক্ষিত মুসলমানদের মন মননের ও যুক্তিবোধের উপরে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছিল, অবশ্যই তা শিখা পত্রিকার মাধ্যমে। কাজী আবদুল

Dhaka University Institutional Repository

ওদুদ লিখেছেন : "বাংলার জাগরণের একটি অপেক্ষাকৃত অল্প পরিসর কিন্তু বেগবন্ত ধারা যে এই দল বাংলার মুসলমানদের মধ্যে অল্প কিছু কালের জন্য (হলেও) প্রবাহিত করতে পেরেছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।"[৪৬]

অর্থ ও শিক্ষার অভাবে কুসংস্কার, সামাজিক প্রথা, অতীতমুখীনতা, লালিত কলা বিমুখীনতায় মুসলমান সমাজ যখন বদ্ধতায় আবর্তিত হচ্ছিল, মুক্তির বাণী নিয়ে ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ তখন সামাজিক প্রতিরোধ ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনাকে ভ্রুকুটি দেখিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন সমাজ-সংস্কারের বৈপ্লবিক ভূমিকা গ্রহণ করতে। ফ্রয়েডীয় ও মার্কসীয় মনস্তত্ত্ব সমাজতত্ত্ব ও নরনারীর জৈবিকজীবনের নবতর ব্যাখ্যা ও সম্পর্কের বিবরণ কল্লোল পত্রস্থ করে যেমন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়েছিলো, ঠিক তেমনি, প্রায় সমকালে বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের এক বিদ্রোহী তরুণ দল ইসলাম, তথা ধর্ম ও জীবনের নানান আবশ্যকীয় বিষয়ের নতুনতর ব্যাখ্যা নিয়ে উপস্থিত হয়ে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছিলেন। ধর্মকে তাঁরা জীবনের সহায়ক মতাদর্শরূপে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে যে কোনো বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে নয়, মুসলিম সমাজের সর্বব্যাপী সমস্যা নিয়ে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' চিন্তা করেছে। অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন, এর মনন ও আচরণ, এর কুসংস্কার, পরিবার জীবন, সামাজিক প্রথা, গোঁড়ামী, অতীতমুখীনতা, পশ্চিমমুখীনতা, ললিতকলাবিমুখতা, শিক্ষা-সমস্যা, কোনো কিছুকেই সাহিত্য সমাজ এড়িয়ে যেতে চাননি। সব কিছু সম্বন্ধে সমকালীন চিন্তাধারার গলদ তাঁরা উন্মোচন করেছেন এবং করেছেন বলেই তাঁরা বৃহত্তর সমাজের অপ্রীতিভাজন হয়েছেন।"[৪৭] সাহিত্য সমাজের বিভিন্ন অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ, অভিভাষণ এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যবিবরণী ও স্বচিৎপ্রাপ্ত নিবন্ধ আর অন্যান্য রচনা শিখায় ছাপা হত।"এটি ছিল একান্তভাবে মতবাদমূলক বার্ষিক পত্রিকা, গল্প-উপন্যাস-নাটক-কবিতা ছাপা হতো না'। এর প্রথম সংখ্যা ১৩৩৩ সালের চৈত্র মাসে এবং পঞ্চম ও শেষ সংখ্যা ১৩৩৮ সালে বের হয়েছিল। কিন্তু মাত্র পাঁচটি সংখ্যায় (বার্ষিকী) কর্তৃপক্ষ যে গুরুতর প্রশ্নগুলো উত্থাপন করেন, তাতে 'শিখা' ও 'সমাজ' যুগান্তর ঘটিয়ে নতুন জীবনে পৌঁছে যাবার স্পর্ধা দেখিয়েছিল। সমকালে যেমন বৈপ্লবিক আলোড়ন তুলেছিল, উত্তর কালেও তা বাঙালির উচ্চস্তরের কল্যাণকামী মানবপ্রেমিক প্রগতিবাদী চিন্তাবিদদের মননে সুদূরপ্রসারী ও গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে গেছে। মুসলিম সমাজের সংস্কৃতি-ভাবনা, শিক্ষা-চিন্তা ও সাহিত্যচর্চায় শিখাগোষ্ঠী ইতিহাসের মাইল ষ্টোন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। মাত্র ৫টি সংখ্যায় একটি পত্রিকা পূর্ণাঙ্গ জীবন বেদ, সামাজিক চাহিদা এবং ভবিষ্যৎ মুসলিম বাঙালি সম্প্রদায়ের সাহিত্য-ভাবনার ক্ষেত্রে যে দিক-পরিবর্তন ঘটিয়েছেন এবং দিক-নির্দেশ প্রদান করে গেছেন তার তুলনা বিরল।

সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন-কার্যে মেয়েদের স্থান গ্রহণের সহায়তার উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে বেরিয়েছিল 'জয়শ্রী' (১৩৩৮) সচিত্র মাসিকপত্রিকা। একাধিকবার সরকারী লাঞ্ছনা সয়ে সয়ে অর্ধশতাব্দীকালেরও অধিক বাংলার সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অগ্রগতিতে 'জয়শ্রী'ও এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। 'জয়শ্রী' পত্রিকায় (১৩৫৩, ফাল্গুন) সম্পাদিকা 'জয়শ্রীর বলবার কথা কী?' প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ "সর্বধ্বংসী পরাধীনতার বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জয়শ্রী করে চলেছে আপোষহীন সংগ্রাম। ... সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে, তার রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রূপ নিয়ে জয়শ্রীর ধারণা ও পরিকল্পনা ক্রমশ তার পাতায় প্রকাশ পাবে।"[৪৮]

কল্লোলোত্তর যুগে 'পরিচয়' এবং 'জয়শ্রী' সহ কতিপয় পত্রিকা মার্কসীয় মতাদর্শ ও মার্কসীয় চিন্তাকে সাহিত্যের মাধ্যমে রূপায়িত করে তার দ্বারা সমাজ-পরিবর্তনের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। 'পরিচয়' এর খ্যাতি অনেক, 'জয়শ্রী' ও বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে বাংলার তাবৎ লেখকই লিখেছেন তাতে। ১৯৩১ থেকে আরম্ভ, প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ধরে 'এই পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রকাশন বলে পরিগনিত হয়েছে ; এমন কোনো বাঙালী মনীষীর বা উজ্জ্বল সাহিত্য সেবকের নাম দেখছিনা যাঁর কোনো না কোনো রচনা এই 'জয়শ্রী'র কোনো না কোনো সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি।' বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্যাহ্নকালে, বিশ ও ত্রিশের দশকের সংগ্রামের তেজোদৃপ্ত পৌরুষে, সর্বস্বপণ ত্যাগ ও সেবায় মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনের বৈপ্লবিক কার্যক্রম বেগবান হয়ে উঠেছে — সেই পটভূমিতে লীলাবতী নাগ (পরে রায়) প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত জয়শ্রী মাসিক পত্রিকা ১৯৩১ সনের মে মাসে ১৩৩৮ এর বৈশাখে আত্মপ্রকাশ করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এই আশীর্বাণী নিয়ে ঃ 'সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান / সংকটের কল্পনাতে হয়োনা ম্রিয়মান :/ মুক্ত করো ভয় / আপনা মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয় ।'

"পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন এবং সমাজ পরিবর্তন — এই দুই লক্ষ্য সামনে রেখে প্রথম সংখ্যা থেকেই জয়শ্রী নির্ভীক মত প্রকাশের এবং স্বচ্ছচিন্তার স্বাক্ষর রেখেছে . . . . গোড়াতেই স্পষ্টতরভাবে উল্লেখ করেছে ঃ এ পত্রিকার উদ্দেশ্য সর্বপ্রকার দেশ সেবা।" এইরূপ আদর্শকে সামনে রেখে খুব কমসংখ্যক সাহিত্যপত্র বলিষ্ঠ পদযাত্রায় উদ্বেজিত হয়েছেন। জয়শ্রীর রচনাবলীর বিষয়বস্তু জাতীয় জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ— 'এইসব প্রবন্ধ দীর্ঘকাল আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে রাখবে। এসব প্রবন্ধে বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের অনেক দিক বিধৃত হয়েছে, এমন সব দিক যার মধ্যে বাঙালী ও ভারতীয় ব্যক্তিসত্তার অগ্রগতির রূপ ও শক্তি পরিস্ফুট হয়েছে অথবা নিদেনপক্ষে আভাসিত হয়েছে। .... (জয়শ্রীর স্মৃতি) আমাদের চেতনায় নিয়ে আসে বিগত অর্ধ শতাব্দীর ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলাদেশে বহু বিষয়ের জ্ঞানসম্পৃক্ত স্মৃতি ঃ স্বাধীনতার চিন্তা, শিক্ষা-সমাজ-শিল্প-বিজ্ঞানের ভাবনা, ভাষা-সমস্যা, নারীর মর্যাদা, বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপান্তর এবং বিবর্তন, গণসংগ্রামের প্রয়োজন ও পদ্ধতি, পল্লী সংগঠনের রীতি প্রকৃতি। এই সঙ্গে আমরা তিনটি ব্যক্তিসত্তার ভাস্বর প্রতিকৃতি দেখতে পাই . . . . লীলারায়, অনিল রায়, নেতাজী সুভাষ।"[৪৯]

উপরের আলোচনায় এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ইতিহাসে সাময়িকী ও সাহিত্য পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য। ব্রজেন্দ্রনাথের পরেও যাঁরাই সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করতে কাজে লেগেছেন, তাঁরাই আকর-উৎস হিসেবে বিবেচনা করে সমকালীন পত্র-পত্রিকার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কারণ পত্রপত্রিকাই যুগ-সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর

Dhaka University Institutional Repository

নবযুগের দিক্-নির্দেশ করতে অগ্রসর হয়েছে আগে। ফলে সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি-অর্থনীতির প্রশ্নে পত্রপত্রিকার ভূমিকা সর্বাগ্রে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিদেশী শাসন থেকে মুক্তির ব্যাপারে, জাতীয়তাবাদের বিকাশে, নানা-ধ্যান-ধারণার প্রচারে, সংস্কৃতি ও চিন্তার বিবর্তনে পত্রপত্রিকার ভূমিকা স্পষ্ট হওয়ায় এখন একথা ধ্রুব সত্যে পরিণত হয়েছে যে, বাংলার নবজাগরণ ও সাহিত্য, সংস্কৃতির বিকাশের ইতিহাস—বাংলা সাময়িকপত্রেরই ইতিহাস। যাঁরা এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁরা বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বাংলার রাজনীতি ও চিন্তাজগতের নেতা, বুদ্ধিজীবী। একথার সমর্থন পাওয়া যায় ব্রজেন্দ্রনাথের উক্তিতেও ঃ "বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ, আমাদের সমাজে ইংরেজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় প্রভাবের বিস্তার, দেশের তৎকালীন সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা এবং ধীরে ধীরে তাহার পরিবর্তন, এক কথায় উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জীবনের সুখ দুঃখ, আশা-আকাংক্ষা, সকল দিক সম্বন্ধেই সে যুগের সংবাদপত্রের মধ্যে বহু অমূল্য উপকরণ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। আবার উনবিংশ শতাব্দীতে যাহাদের আবির্ভাবে বঙ্গের ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহাদের জীবন-চরিত রচনা করিতে গেলেও সমসাময়িক পত্রের মূল্য অপরিহার্য্য।"[৫০]

১.৪. সাহিত্যপত্রিকা, সাহিত্য-আন্দোলন ও সাহিত্যিক-গোষ্ঠী

সাহিত্যপত্রিকার মাধ্যমে সাহিত্যের অগ্রগতি তথা বিকাশ ঘটে ; কিন্তু পত্রিকাটি যদি কোনো গোষ্ঠীবদ্ধ সাহিত্যকর্মীদের যৌথ-প্রয়াস হয়, তাহলে সেই পত্রিকায় যেরূপ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, অনুরূপ কোনো একক ব্যক্তির রুটিন মাফিক কমার্শিয়াল পত্রিকায় প্রায় সম্ভব হয়না। কোনো একদল কর্মী বা সভ্য কিংবা সদস্য অথবা সতীর্থ-সম্মিলন হলেই, তা রূপ নেয় গোষ্ঠী কিংবা পরিষদে। এই পরিষদ, 'আড্ডা', 'সভা', 'চক্র' বিভিন্ন নামে চিহ্নিত হতে পারে— কিন্তু মূল অর্থ একই। আসল কথা হলো, 'কোনো পত্রিকাকে আশ্রয় করে সাহিত্যিকদের একটি 'আড্ডা' না জমে উঠলে সে-পত্রিকাও জমে ওঠেনা। নতুন ক্ষমতাশালী লেখকদেরও সন্ধান পাওয়া যায় না।'[৫১] এই কাজে উপযুক্ত নেতার দরকার হয়। পত্রিকার সম্পাদকই হন সভার সংগঠক। সংগঠনশক্তি, সম্পাদকীয় দক্ষতা, স্বকীয় সৃষ্টিসম্ভব প্রতিভা, আর্থিক পরিকল্পনায় সিদ্ধহস্ততা যদি থাকে কোনো উদ্যোক্তার, তাহলে তাঁর নেতৃত্বে সবকিছু মিলে একটি লেখক-গোষ্ঠী একপ্রাণ হয়ে কোনো মহৎ-উদ্দেশ্যে একটি পত্রিকা চালিয়ে যেতে পারলে, তার দ্বারা নতুন নতুন-সাহিত্য-আন্দোলন সৃষ্টি করা সম্ভব হয়ে থাকে। তাই এই বিষয়গুলো পারস্পারিক আপেক্ষিক সম্পর্কে সম্পর্কিত দেখা যায়। আর যেক্ষেত্রে এইসব গুণ একত্র হতে পেরেছিল, তাঁদেরই পক্ষে কোনো সাহিত্য পত্রিকা নিয়মিত কিছুদিন চালিয়ে জন্ম দেয়া সম্ভব হয়েছে কোনো সাহিত-আন্দোলনের। প্রসঙ্গেক্রমে বিংশ শতাব্দীর প্রথম বৈপ্লবিক সাহিত্য-পত্রিকা 'সবুজপত্রের' (১৯১৪) কথাই প্রথমে উল্লেখ করা দরকার। এর সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) নিজে প্রচুর লিখেছেন, সবুজপত্র ছিল তাঁর প্রধান কীর্তি। কিন্তু শুধু পত্রিকা সম্পাদনাই তাঁর প্রধান কীর্তি নয় 'সবুজ সভা' পরিচালনার যোগ্যতা ও সার্থকতাও ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। সমভাব ও সম-আদর্শে বিশ্বাসী একটি সাহিত্যিক-গোষ্ঠী গঠন করে সাহিত্যের ইতিহাসকে নতুনপথে নিয়ে যাবার অভিপ্রায়কেও পত্রিকা-সম্পাদনা বোঝায়। এজাতীয় কাজকে রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) বলেছেন 'সাহিত্যের কর্মকাণ্ড'। একাজের জন্য বিশেষ একটি শক্তির প্রয়োজন হয় এবং সে-শক্তি খুব সুলভও নয়। "আর এই কাজ যিনি সুষ্ঠভাবে করিতে পারেন তিনি সাহিত্যের একটি মহৎ উপকার সাধন করেন।"[৫২] প্রমথচৌধুরী প্রকৃতিতে মজলিশী মানুষ ছিলেন। 'কমলহীরে বিদ্যা আর তার দ্যুতি কালচারের সম্বল নিয়ে তাঁর 'কমলালয়ে' সাহিত্য মজলিশও গড়ে উঠলো। এই মজলিশের যজ্ঞেশ্বর ছিলেন তিনি স্বয়ং—আর তাঁর উত্তর সাধক ছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কিরণ শংকর রায়, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, সতীশচন্দ্র ঘটক, হারিতকৃষ্ণদেব, বরদারণ গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় মজলিসটি বসতো . . . সকলেরই আপন মত ব্যক্ত করার ও তর্কে-বিতর্কে যোগ দেওয়ার অবাধ সুযোগ ছিল। তবে সমস্ত বক্তব্যেরই লক্ষ্য থাকতেন প্রথম চৌধুরী। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাবতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি সব কিছুরই আলোচনা সেখানে হতো। আলোচনার লক্ষ্য ছিল—এসব বস্তু যাতে মনকে পুষ্টি ও স্ফূর্তি দেয়, তারা বোঝা না হয়ে উঠে। মজলিশ স্বীকার করে নিয়েছিলো, বিনা বিচারে কোনো কিছু মানা হবেনা। বুদ্ধিতে যা বাধে তাকে অগ্রাহ্য করতে হবে, তার সমর্থনে যত বড়ো নামই থাক্না কেন।'[৫৩]

পত্রিকার লেখাগুলোর মধ্যে যে সজীব, যুক্তিশীল অভিনব চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে 'সবুজপত্রীদের গোষ্ঠীগত সমধর্মিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই পত্রিকার সংগ্রামী চরিত্র ও অখণ্ড সুরের কথা মনে করেই বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছিলেন : তাতে বিদ্রোহ ছিলো, যুদ্ধ ঘোষণা ছিলো, সে সঙ্গে ছিলো গোষ্ঠীগত সৌষম্য। . . . .যেখানে সমধর্মীরা পরস্পরের মনের স্পর্শে বিকশিত হয়ে ওঠেন, তাকেই বলে গোষ্ঠী। সেটা যখন ঘটে তখনই কোনো পত্রিকায় সবুজপত্রের মতো সুরের ঐক্য দেখা দেয়, চরিত্রের অমন অখণ্ডতা, প্রকাশের অমন প্রথামুক্ত নির্ভয় ভঙ্গী।.... যে সংখ্যায় বহুলোকের লেখাও বেরিয়েছে, সেটিও রূপ নিয়েছে সম্পূর্ণ একটি রচনার ; অর্থাৎ সেই বহুর মধ্যে দপ্তরির সুতো ছাড়াও আন্তরিক একটি সম্বন্ধ থেকে গেছে। এই অখণ্ডতা গোষ্ঠীসাপেক্ষ, তাই গোষ্ঠী ছাড়া সাহিত্যপত্র হয়না।'[৫৪] প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সবুজপত্রীরা নতুনভাবের নতুন ধাচের সাহিত্যের কথা শুধু পাঠককে শুনিয়ে গেলেন না, নিজেরা লিখে তার পরিচয় দিয়ে গেলেন। অভিনবকে শুধু তত্ত্বে নয়, বাস্তবে দেখিয়ে গেলেন। প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চোধুরী, ধূর্জটি প্রসাদ, অতুলচন্দ্র, বরদাচরণ, সুনীতিকুমার, কিরণশঙ্কর, সতীশ ঘটক, সুরেশ চক্রবর্তী, হৃষীকেশ সেন ; গল্পে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, সুরেশ চক্রবর্তী, বীরেশ্বর মজুমদার; কবিতায় রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, অমিয়চক্রবর্তী, সুরেশ চক্রবর্তী প্রমুখ যে সৃজনশীলতার পরিচয় দেন, তা সবুজপত্রেরই পরিচয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রধান স্রষ্টা রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীরও এই গুণ ছিল। এই গুণযোগে বহুলোকের সমবায় ঘটিয়ে তিনি সাহিত্য পরিষদ গড়ে তুলেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রে এই শক্তি প্রচুর পরিমাণে ছিল। যার ফলে দেখা

Dhaka University Institutional Repository

যায় সমভাবাপন্ন একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গঠন করে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা তিনি সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছিলেন।[৫৫] সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র যা করেছিলেন, তার আদর্শ এযুগেও কিছু কিছু অনুসৃত হচ্ছে বলেই সাহিত্যপত্রিকা দাঁড়াতে পারছে ; সাহিত্য-আন্দোলনও সৃষ্টি হয়েছে। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্যযোগ্য : বঙ্গদর্শনে উপন্যাস লিখতেন বঙ্কিমচন্দ্র, কবিতা লিখতেন হেমচন্দ্র, প্রবন্ধ লিখতেন বঙ্কিমচন্দ্র, রামদাস ঘোষ, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ নাথ রায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার। তাছাড়া আরও কেউ কেউ লিখেছেন। ড: শশীভূষণ দাসগুপ্ত 'বঙ্গদর্শনের লেখক' হিসেবে যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন তাঁদের মধ্যে (উপরোক্তদের বাদ দিয়ে) আছেন বঙ্কিমের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম।[৫৬] বঙ্গদর্শনে তখন লেখকদের নাম থাকত না। অনেক লেখকের, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজ, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে ছাপা হয়েছে। লঘু-গুরু বহু সাহিত্যিক প্রবন্ধ তাতে রয়েছে। কিন্তু "লক্ষ্য করলে দেখা যায় বঙ্গদর্শনের বিভিন্ন লেখার মধ্যেও দৃষ্টিভঙ্গিগত একটা প্রচ্ছন্ন ঐক্য ছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখকদের মধ্যে ঐক্যের কারণ বোঝা যায়, কিন্তু বঙ্গদর্শনের নানা বিষয়ের লেখার স্টাইল এবং বক্তব্যের মধ্যে ঐক্যের কারণ সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র। পরবর্তীকালে বঙ্কিম সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে বলেছেন যে এ পত্রিকা যখন আরম্ভ হয়, তখন দেশে লেখকের সংখ্যা খুব বেশি ছিলনা। একথাটার অর্থ এই যে সাধারণভাবে তথ্য সংগ্রহ করে লিখতে পারে, এমন লেখক হয়তো তখন পাওয়া যেত; কিন্তু বঙ্কিম যেমন সুগঠিত সুপরিণত ভাবুক লেখকদের প্রয়োজন অনুভব করতেন, তেমন হয়ত খুব বেশি ছিলনা। ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষিত লেখক ছিলেন, তাঁরা বাংলা লিখতে চাইতেন না। বঙ্কিম ইংরেজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের দিয়ে যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁকে সেই বিষয়ে লেখালেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদক হিসেবে একটি বড় বিশেষত্ব দেখিয়েছিলেন। কে কোন বিষয়ে বাংলায় লিখতে পারবে, তিনি সেই ব্যক্তিকে চিনে নিতে পেরেছেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, রমেশচন্দ্র দত্তকে তিনিই বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে যান। বঙ্কিম নব্য লেখকদের রচনা নিজে খুব ভালো করে পড়ে ভাষার এবং বক্তব্যের পরিমার্জনা করে দিয়েছেন। এর ফলে বঙ্গদর্শনের ভাষায় এবং দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা ঐক্য সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিবাদী চিন্তা, ইতিহাসপ্রীতি, স্বদেশানুরাগ, এবং গদ্যে স্পষ্টতা বঙ্গদর্শনের বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি লিখেছেন, কিন্তু তাঁরই মধ্যে বঙ্গদর্শনের ভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠল। বঙ্কিম নিজে একজন যুগ নায়ক ছিলেন বলেই যুগ ও জাতির চিন্তায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। যেসব লেখক তাঁকে ঘিরে চাঁক বেঁধেছিলেন সকলের মধ্যেই এই ভাবনাটা তিনি সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন।"[৫৭]

বাংলা সামসিক পত্রের প্রাচীনতর কালে উইলিয়াম কেরী, গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্র ও তত্ত্ববোধিনীর নেতৃত্বে সংগঠনিক কার্যাবলীর মধ্যে এই গোষ্ঠী-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সমভাবাপন্ন পণ্ডিতদেরকে সমসূত্রে স্থাপন করে তাঁরা বাংলা গদ্যের সূত্রপাত করেছিলেন। ঈশ্বরগুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় দত্ত নিজেদের সৃজনীশক্তিবলে আকর্ষণ করেছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখক, কবি, ভাবুক ও চিন্তাবিদদেরকে। ভারতী-গোষ্ঠীতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা বঙ্গদর্শন-গোষ্ঠীতে ছিলেননা। ১৮৭৬ এ 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ী থেকে ভারতী প্রকাশিত হলে আর একটি গোষ্ঠী তৈরী হয়েছিল। ভারতী গোষ্ঠীর বিশেষত্ব ছিল গল্প উপন্যাস কবিতা রচনায়। "ভারতী (১৮৭৭-১৯২৩) আগাগোড়া ঠাকুরপরিবার গোষ্ঠীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে। একারণেই হয়ত ভারতী গল্প কবিতা প্রভৃতি সৃষ্টি মূলক রচনার একটা নিজস্ব আদর্শ অনুসরণ করে এসেছে। বিংশ শতাব্দীতে ভারতী গোষ্ঠী ছিল একান্তভাবে রবীন্দ্রকাব্যাদর্শের অনুগামী। বস্তুত ভারতী ঠাকুর পরিবারে বদ্ধ থেকে একটি বিশিষ্ট সাহিত্যাদর্শকে সচল রেখেছে। বঙ্গদর্শনের সমাজকেন্দ্রিক দৃষ্টির পাশে ভারতীর লেখকদের আত্মকেন্দ্রিক সুক্ষ্মরসের চর্চা পরের শতকে হয়েছে প্রধান সাহিত্যাদর্শ।"[৫৮] এসবই বাংলা সাহিত্যের মহৎ ঘটনা, ইতিহাসের প্রধান-প্রধান স্তম্ভ।

"সাহিত্য রচনার গৌরবের অপেক্ষা সাহিত্য-ঘটনার গৌরব লঘুতর নয়, অনেক সময়েই গুরুতর। এই গৌরবের আসনে বাংলা গদ্যের ঘটয়িতা উইলিয়াম কেরি, বঙ্গ-দর্শন সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র ; বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-প্রতিষ্ঠাতা রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী,[৫৯] একাধিক পত্রিকার সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ, সবুজপত্রের সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী প্রমুখের সঙ্গীরূপে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে আরও অনেক সংঘটক, সম্পাদক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের উদ্ভব হয়েছে। 'কল্লোলযুগের' অথবা 'কল্লোল-গোষ্ঠীর' তথা 'কল্লোলের বিশ্বকর্মা' দীনেশরঞ্জন দাশ, ঢাকার 'শিক্ষা গোষ্ঠী' (বা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের') র কর্মযোগী আবুল হুসেন এবং কাজী আবদুল ওদুদ ; 'প্রগতি' ও 'কবিতার' নেতা বুদ্ধদেব বসু, 'পরিচয়ের আড্ডা' এবং 'পরিচয়' পত্রিকা, আশু চট্টোপাধ্যায়ের 'অগ্রগতি'র সাহিত্যিক আড্ডা এবং তাঁর পত্রিকা 'অগ্রগতি'র প্রকাশ, ; সওগাত সাহিত্য মজলিশ ও 'সওগাত' পত্রিকা এবং মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন; মোয়াজ্জিন পত্রিকা ও খাদেমুল এনসান সমিতি এবং সৈয়দ আবদুর রব; পূর্বাশার বৈঠক, মোহাম্মদী-আজাদ-গ্রুপ ও মৌলানা আকরম খাঁ ; এবং পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি ; পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ ও পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস ও 'সৈনিক' , 'দ্যুতি', সংস্কৃতি সংসদ, সমকাল পত্রিকা ও সিকান্দার আবুজাফর; কণ্ঠস্বর গোষ্ঠী প্রভৃতির রসতন্ত্র থেকে উর্ণনাভের সাহিত্যের জাল তৈরি করেছেন আড্ডা-রসিক মন। এইসব আড্ডায় জন্ম নিয়েছে বাংলার সুখ্যাত এই সাহিত্য পত্রিকাগুলো এবং পত্রিকা-কেন্দ্রিক সাহিত্য সৃষ্টির সুফল যে কতো বিরাট তা এক কথায়ও বোঝা যায়, তাহলো প্রতিষ্ঠিত লেখকদের প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকায় নতুন লেখকদের মৌলিক ভাবনা, স্বাধীন চিন্তা এবং নব্যতর আঙ্গিক যেক্ষেত্রে স্বীকৃত হয়না, সেক্ষেত্রে নতুন নবীন উৎসাহী সাহিত্যকর্মীদের নিজেদের পত্রিকায় তাঁরা স্বতস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশের পথ পান। এই পথ না-পেলে বাঙলার অনেক বড় কবি, লেখক, সাহিত্যিকের আবির্ভাব (হয়ত) ঘটতোনা। বিকশিত হতো না নতুন সাহিত্য, নতুন আইডিয়া, নতুন চিন্তা ও নতুন শিল্প প্রকরণ। উনিশ শতক থেকেই দেখা যায় কোননা কোনো বিশেষ আড্ডায় জন্ম হচ্ছে কোনো বিশেষ সাহিত্য পত্রিকার, এবং তাকে অবলম্বন করেই বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠছে ; চিন্তাধারা বিকশিত হচ্ছে। তবে যখনই কোনো পত্রিকা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে বা প্রতিষ্ঠানে রূপ গ্রহণ করেছে, তখন তার চরিত্র পাল্টে গেছে। কারণ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য পত্রিকা বিরাট স্টাবলিশমেন্টের শর্তে জড়িত হয়ে পড়ায় বিনিয়োগ ও পুঁজির সাথে সাথে পুঁজিপতি বিনিয়োগকর্তার স্বার্থে ব্যবহৃত হয়ে সৃজনশীলতা ধ্বংস হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে চালচুলোহীন লিটল ম্যাগাজিনই সাম্প্রতিক কালে আধুনিক

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তার বিকাশের প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। যা কেউ বলতে বা প্রকাশ করতে সাহস করেন বা করছেন না, তাই বলেন এবং করেন লিটল ম্যাগজিনের তরুণ সম্পাদক ও নবীন লেখকেরা। এদের কখনো প্রযোজনা করেন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন প্রবীণেরা এবং কোনো কোনো প্রগতিশীল আদর্শানুসারী মুক্ত ও যুক্তিবুদ্ধির ধারক, বাহক, প্রচারক সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী এবং সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আড্ডা বা 'ব্যক্তিত্ব'। এইসব আড্ডার উপর ('পরিচয়ের আড্ডা') পুস্তক লিখিত হয়েছে। অবশ্য এ কথাও স্মরণযোগ্য যে, সাময়িক পত্রিকাগুলো অনেক সময় যেমন একটা সাহিত্যিক আড্ডা বা সঙ্ঘ গড়ে তুলে সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহিত করে— অন্যদিকে আবার সে সাময়িক সাহিত্যই গড়ে তোলে। যথার্থ, মহান, ক্লাসিক সাহিত্য তাঁরা উত্তেজনাবশে সৃষ্টিতে মন দেননা। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার পার্থক্যহেতু সাময়িক পত্রিকা অনেক ক্ষেত্রেই 'সাহিত্য' সৃষ্টি করতে পারেনা।

যে সাহিত্য চিরস্থায়ী নয়, তাই সাংবাদিক-রচনা। যে সাংবাদিক রচনা টেকে তাই-ই 'সাহিত্য'[৬০] অবশ্য সাংবাদিক সাহিত্য মর্যাদায় নগন্য হলেও সমাজের চিত্র ও চিন্তাধারার বৈচিত্র্য এবং গতি-প্রকৃতি নির্দেশেও প্রভূত সাহায্য করে। এদিক থেকে সাময়িক পত্রিকার রচনাগুচ্ছ বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন কালে মূল্য অর্জন করে থাকে। কোনোটা পায় সাহিত্যিক মূল্য, কোনোটা পায় সামাজিক বা ঐতিহাসিক কিংবা তথ্যগত মূল্য। একারণে অনেক পত্রিকার অনেক বিজ্ঞাপনও অনেক সময়ে প্রভূত মূল্য পেয়ে থাকে।

১.৫. সাহিত্যপত্রিকা ও সাময়িকপত্র বিষয়ে গবেষণার ঐতিহ্য ও সাম্প্রতিক প্রবণতা

আজ যা সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত, একশ বছর আগেও তা পরিচায়িত হতো 'সাময়িকপত্র' অভিধায় ; এবং আরও কিছু আগে 'সাহিত্য', 'সংবাদের' সঙ্গে মিশে একই আধারে প্রকাশিত হওয়ায় সাহিত্য পত্রিকার আলোচনায় সাময়িকপত্রের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে চলে আসে। উদ্ভব-বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনায় সংবাদপত্র প্রকাশের আদি কাহিনী দিয়েই সকল গবেষক তাই কথা আরম্ভ করেন।

সাহিত্য পত্রিকার ওপরে গবেষণার ধারা সম্প্রতি সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু প্রথমে সাময়িক, সংবাদপত্র নিয়েই গবেষণার সূত্রপাত হয়। সংবাদপত্র প্রকাশের ন্যায় ভারতবর্ষের সংবাদ সাময়িক পত্র নিয়ে গবেষণারও পথ প্রদর্শন করেন একজন বিদেশী, এবং তা ইংরেজী ভাষায়। রেভারেণ্ড জেমসলঙ প্রণীত 'The Return of the names of 515 persons connected with the Bengali literature during the last fifty years' (কলকাতা ১৮৬৮ ?) একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি। 'Returns Relating to publications in the Bengali language, in 1857', to which is added a list of the native Press with the Books Printed of each, their price and charecter, with notice of the past condition and Future prospective of the varnacular Press of Bengal, Calcutta 1859 এর ভূমিকাংশ 'Report on the native Press in Bengal' 'বাংলা ছাপাখানা ও প্রকাশনা' নামে অনূদিত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগের 'সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। বাকী অংশ বাংলা ছাপাখানা ও পুস্তকের তালিকাটি সংকলিত করে (যা 'লঙ সাহেবের ক্যাটালগ' নামে খ্যাত') মুহম্মদ হাবিবুর রশিদ অনূদিত) 'আদিপর্বে বাংলা প্রকাশনা ও সাংবাদিতা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে (১৯৮৮) বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে।

প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষায় বাংলা সাময়িকপত্র নিয়ে গবেষণার পথিকৃত কেদারনাথ মুজমদার (বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য, প্রথম খণ্ড ১৩২৪ ; ১৯১৭)। তাঁকে অনুসরণ করেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর 'বাংলা সাময়িকপত্র' (১ম ও ২য় খণ্ড) এবং 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রকাশের পর সমাজবিজ্ঞানী ও বিশিষ্টগবেষক বিনয় ঘোষ অনুপ্রাণিত হয়ে 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' (৫ খণ্ড) প্রকাশ করেন। এর পর পত্রপত্রিকা নিয়ে গবেষণার একটা ধারা যেনো সৃষ্টি হলো। অতপর বিভিন্ন গবেষক ও লেখক সাময়িকপত্র নিয়ে গবেষণার তথা তথ্য সংকলন ও সংগ্রহের ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। ফলে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান থেকে অধ্যাপক, গবেষকদের দ্বারা বিশেষ সময়ের ও বিশেষ পত্রিকা অবলম্বন করে গবেষণার ধারা সৃষ্টি হয়। পূর্ব বাংলা থেকে বিশেষ করে মুসলিম সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার ইতিহাস ও তথ্য সংকলনের আগ্রহ দেখা যায়। সাম্প্রতিক কালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার অনুসন্ধান এবং গবেষণার প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে। পশ্চিম বাংলায় ১৯৪৭ পূর্ববর্তীকালের প্রধান সাহিত্য ও সাময়িকপত্রিকা নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে। এই সমস্ত কাজের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতিতে অন্তত চারটি ধরণ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত বিশেষ পত্রিকার ইতিহাসও সূচীপত্র সংকলন এবং বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিফলিত ভূমিকা বিশ্লেষণ ; দ্বিতীয়ত কোনো বিশেষ বিশেষ পত্রিকার ভূমিকা নির্ধারণ ; তৃতীয়ত ভাষা তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে উনিশ ও বিশ শতকের পত্র-পত্রিকার অবলম্বন ও বিচার বিশ্লেষণ। এবং চতুর্থত উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকা অবলম্বন করে কলকাতা ও ঢাকা শহরের ইতিবৃত্ত রচনা এবং বিশেষ ব্যক্তিত্বের জীবনী প্রণয়ন ইত্যাদি। এ পর্যন্ত সাময়িক বা সাহিত্য পত্রিকা নিয়ে যে সমস্ত গবেষণা কিংবা পুস্তক প্রণীত হয়েছে এক নজরে তা দেখা যেতে পারেঃ

১. শ্রী কেদারনাথ মজুমদার — বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য, ঢাকা ১৯১৭
২ শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা সাময়িকপত্র, ১ম ও ২য় খণ্ড কলকাতা ১৩৪৬ ও ১৩৫৮
৩. শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম ও ২য় খণ্ড কলকাতা, ১৩৩৯ ও ১৩৪০

Dhaka University Institutional Repository

৪ শ্রী বিনয় ঘোষ — সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১–৫ খণ্ড কলকাতা

৫. পার্থ চট্টোপাধ্যায় — বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ (১৮১৮ - ১৮৭৫) কলকাতা ১৯৭৭

৬. আনিসুজ্জামান — মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, ঢাকা ১৯৬৯

৭. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম —সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, ঢাকা ১৯৭৭

৮. মুনতাসির মামুন — উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদসাময়িকপত্র (৫ খণ্ড) ঢাকা ১৯৮৫-৯২

৯. তারাপদ পাল— ভারতের সংবাদপত্র, কলকাতা ১৯৭২

১০. কাজী আবদুল মান্নান — আধুনিক সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ঢাকা ১৯৬১ ; ২য় সং ১৯৬৯

১১. শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী, কলকাতা ১৩৫৭

১২. রথীন্দ্রনাথ রায় — বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী, কলকাতা ১৯৫৮

১৩. মাহেনও - সংকলন, পাকিস্তান পাবলিকেশনস্, ঢাকা ১৯৫৩

১৪. মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র, ঐ, ঢাকা ১৯৬৬

১৫. সত্যনারায়ণ দাশ — বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন-সাধনা, কলকাতা ১৯৭৪

১৬. অমিত্র সূদন ভট্টাচার্য — বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন, কলকাতা ১৩৭৮

১৭. ইন্দুমিত্র — ইতিহাসে আনন্দবাজার, কলকাতা ১৯৭৫

১৮. আনন্দসঙ্গী (২য় সং, আনন্দবাজার এর নির্বাচিত সংবাদ-সংকলন, আনন্দবাজার প্রকাশন, কলকাতা ১৯৭৫)

১৯. নির্মলেন্দু ভৌমিক — সাহিত্য পত্রিকার পরিচয় ও রচনাপঞ্জী, কলকাতা ১৩৮৩

২০. সুনীল দাস— ভারতী : ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী, কলকাতা ১৯৮৪

২১. আতোয়ার রহমান — বাংলাদেশের শিশুপত্রিকা, ঢাকা ১৯৭৭

২২. হিরণ কুমার স্যান্নাল — 'পরিচয়' এর কুড়িবছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র, কলকাতা ১৯৭৮

২৩. প্রভাতকুমার দাস — 'কবিতা' পত্রিকা : সূচিগত ইতিহাস, কলকাতা ১৯৮৯

২৪. সুনীলদাস (সম্পাদক) - জয়শ্রী সুবর্ণ জয়ন্তী গ্রন্থ, কলকাতা ১৯৮৩

২৫. শ্রী অশোক কুমার কুণ্ডু - পত্রিকাপঞ্জী, কলকাতা ১৩৮৯

২৬. নরহরি কবিরাজ — উনিশ শতকের বাঙলার নবজাগরণ ও তর্ক - বিতর্ক (সম্পাদনা), কলকাতা ১৯৮৪

২৭. হরিপদ ভৌমিক - সেকালের সংবাদপত্রে কলকাতা, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলকাতা ১৯৮৭ ও ১৯৮৮

২৮. অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত — কল্লোল যুগ, কলকাতা ১ম সং ১৩৫৭, সপ্তম প্রকাশ ১৩৯৫

২৯. জীবেন্দ্র সিংহ রায় — কলোলের কাল, কলকাতা ১ম সং ১৯৭৩; পরিবর্ধিত দেজ সং ১৯৮৭

৩০. জীবেন্দ্র সিংহ রায় — প্রমথ চৌধুরী (সবুজপত্রের ইতিহাস), কলকাতা, ১৯৫৪/১৯৮৬

৩১. সোনামনি চক্রবর্তী — শনিবারের চিঠি ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য, কলকাতা ১৯৯২

৩২. আশু চট্টোপাধ্যায় — কল্লোল যুগের পরে, কলকাতা ১৯৯৩

৩৩. খোন্দকার সিরাজুল হক — মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম, ঢাকা ১৯৮৪

৩৪. লায়লা জামান — সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা, ঢাকা ১৯৮৯

৩৫. রবিনপাল — কল্লোলিত ছোটগল্প, কলকাতা ১৯৮৮

৩৬. রবিন পাল — কল্লোলের কোলাহল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, কলকাতা ১৯৮০

৩৭. প্রাণকৃষ্ণ দত্ত — কলিকাতার ইতিবৃত্ত, কলকাতা ১৯৮১

৩৮. রাধারমণ মিত্র — কলিকাতা দর্পণ, ১৯৮০/১৯৮৮

৩৯. অতুলসুর — ৩০০ বছরের কলকাতা : পটভূমি ও ইতিকথা, কলকাতা ১৯৯১

৪০. কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় — সাময়িকপত্রে সমাজচিত্র ঃ সঞ্জীবনী, (সম্পাদনা ও সংকলন), কলকাতা ১৯৮৯

৪১. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ — পরিচয় এর আড্ডা, কলকাতা ১৯৯০

৪২. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম — সাময়িকপত্রে সাহিত্যিক-প্রসঙ্গ, ঢাকা ১৯৯০

৪৩. সৌম্যেন্দ্রনাথ বসু — বিদেশী ভারত সাধক, কলকাতা ১৩৬৮

৪৪. নন্দরাণী চৌধুরী — সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ; শান্তিনিকেতন (?)

৪৫. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান — সাময়িকপত্রে সাহিত্য চিন্তা : সওগাত, ঢাকা ১৯৮১

৪৬. সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ : প্রবাসী (১৩০৮– ১৩৪৮)(?)
৪৭. সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় — স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা ১৯৬০
৪৮. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (সংকলিত, সম্পাদিত) — সওগাতযুগ, ঢাকা ১৯৮১
৪৯. শামসুল হক — বাংলা সাময়িকপত্র (১৯৪৭ – ৭১) ঢাকা ১৯৭৩
৫০. শামুল হক — বাংলা সাময়িকপত্র – (১৯৭২ – ৮৩) ঢাকা ১৯৮৪
৫১. আমিরুল মোমেনিন — একুশের সংকলন : গ্রন্থপঞ্জী (১৯৫৩–৮৯) ঢাকা ১৯৯১
৫২. মুহম্মদ মজির উদ্দিন মিয়া — বাংলাদেশের গবেষণা-পত্রিকা, ঢাকা জুন ১৯৯২
৫৩. মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক — বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা : ত্রিশ বছরের প্রবন্ধপঞ্জী, ঢাকা ১৯৮৯
৫৪. গৌতম ভট্টাচার্য — কল্লোলে রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা ১৩৯৪
৫৫. গৌতম ভট্টাচার্য — বিচিত্রায় রবীন্দ্রনাথ (?)
৫৬. মীনাক্ষী দত্ত — কবিতা পত্রিকার সূচীপত্র ও সম্পাদক (?)

এসব পুস্তক ব্যতীত সুকুমার সেন, শশীভূষণ দাসগুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী, গোপাল হালদার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব চৌধুরী প্রমুখ গবেষকের সাহিত্যের ইতিহাস, ইতিবৃত্ত এবং সমালোচনামূলক গ্রন্থগুলোতে সাময়িকপত্রিকা বা সাহিত্য পত্রিকার ওপর স্বতন্ত্র ও প্রাসঙ্গিক আলোচনাগুলোর কথা এখানে স্মরণ করতে হবে। এইসব লেখকের পরবর্তী অনুসারীদের হাজার-হাজার গ্রন্থে কোনো না কোনো ভাবে উনিশ ও বিশ শতকের সংবাদ, সাময়িকী ও সাহিত্য-পত্রিকাগুলোর ওপর আলোকপাত লক্ষ্যযোগ্য। সমস্ত আলোচনার তালিকা প্রস্তুতও এক স্বতন্ত্র গবেষণার দাবি করতে পারে।

এছাড়া একগুচ্ছ প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে। সাময়িক, সাহিত্য-পত্রিকার ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ-এর ছাত্র-ছাত্রীরা কিছু গ্রন্থপঞ্জীও তৈরী করেছে। এসব মিলিয়ে একটি তালিকা করলে এরকম দাঁড়ায় :

১. আবদুল হক— ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ, সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ, ১৯৬৮
২. আবদুল হক — 'সমকাল' -এর ভূমিকা, নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা ১৯৮৪
৩. আবদুল কাদের — ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাময়িকপত্রিকার পরিচিতিমূলক গ্রন্থপঞ্জী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের থিসিস)
৪. হাসান হাফিজুর রহমান — 'সওগাত থেকে সমকাল' ও 'সওগাতের অর্ধ শতাব্দী' আলোকিত গহবর ঢাকা ১৯৭৭
৫ গোলাম সাকলায়েন — আমাদের সাহিত্য – পত্রিকা ও সাহিত্যিক গোষ্ঠী (সংলাপ, ৩ বর্ষ ৩সংখ্যা ১৯৬৯
৬ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম — পূর্ব পাকিস্তানের সাময়িকপত্র, আমাদের সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৯
৭. আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ — সমকাল প্রসঙ্গে, দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ, ঢাকা ১৯৭৬
৮. আবুল কাসেম ফজলুল হক— পূর্ব বাংলার সাহিত্য ও কণ্ঠস্বর, কালের যাত্রার ধ্বনি, ১৯৭৩
৯. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ইসলাম প্রচারক, সাহিত্য পত্রিকা ১৩ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩৭৬
১০. মনিরুজ্জামান — পূর্ব পাকিস্তানের পত্র পত্রিকায় সংস্কৃতি চিন্তা, সাহিত্য পত্রিকা, ১২বর্ষ ২য় সংখ্যা শীত ১৩৭৫
১১. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম — মুসলিম বাংলায় জনমতের উন্মেষ ও সাময়িক পত্র সাধনা, পূর্বমেঘ, ১৩৭৪
১২. ঐ — জগদুদ্দীপক ভাস্কর, পরিক্রম, ১৯৬৪
১৩. ঐ —অগত্যা ও আমরা কয়েকজন (ইত্তেফাক); আনিসকে দেখছি (অগত্যা – সম্পর্কে, ইত্তেফাক)
১৪. শাহাবুদ্দীন আহমদ — সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের সমস্যা, নাগরিক, ১৩৭৫
১৫. জিয়াউল হক – পূর্ববাংলার সাহিত্য পত্রিকা ও নাগরিক, নাগরিক, ১৩৭৬
১৬. মোহাম্মদ বদরুল আমিন খান — পাঠকের বক্তব্য, নাগরিক, ১৩৭৬
১৭. সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের সংকট ও শাসক গোষ্ঠীর মনোভাব (লেখকের নাম নেই), সাম্প্রতিক , ৪বর্ষ : ১ম সংখ্যা, ১৩৮০
১৮. মুহম্মদ নুরুল হুদা — সিকান্দার আবু জাফরের প্রাসাঙ্গিকতা (দৈনিক ইত্তেফাক)
১৯. আহমদ কবির — সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা (দৈনিক বাংলা)
২০. শাহানা হুদা রঞ্জনা — সংবাদপত্রের ভূমিকা – ষাটের দশকের প্রেক্ষাপট, দৈনিক জনতা।

এছাড়া বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকাতেও বেশ কিছুপ্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে :

১. আতোয়ার রহমান – 'অঙ্কুর' (৯ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা : ১৩৭২); 'তোষিনী' (১০ বর্ষ ১৩৭০)
২. আলমগীর জলীল – বিস্মৃত শিশুপত্রিকা ফুল-বাগিচা, (২২ বর্ষ, ৩-৪ সং ১৩৮৪)

Dhaka University Institutional Repository

৩. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর - 'সংবাদপত্রে ভাষা - আন্দোলন ; নওবেলাল' (২৯ব : ১ম সং, ১৩৯২)
৪. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম — মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্রে ভাষা ও সাহিত্য (১৪ বর্ষ ২য় সং ১৩৭৬)
৫. ঐ — সমাচার সভারাজেন্দ্র (৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩৭১)
৬ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম — সাময়িকপত্রে সেকালের ঢাকা (১৫ শ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩৭৭)
৭. রেভ: জেমস্ লঙ — বাংলা সাহিত্য ও সংবাদপত্রের আদিপর্ব, হাবিবুর রশিদ অনূদিত (২৪ বর্ষ, ২য়-৩য় সং, ১৩৮৬)
৮ শফিউল আলম — একটি বিস্মৃত পত্রিকা : সাপ্তাহিক 'মোসলেম জগৎ' (২৩বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩৮৫)
৯. সুকুমার বিশ্বাস — সাময়িকী বুলবুল : ভিন্নমত (২২শ বর্ষ ; ২য় সংখ্যা ১৩৮৪)
১০. সৈয়দ মুর্তাজা আলী — 'কোহিনূর' (৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৬৭)
১১. হেলাল মুহম্মদ আবু তাহের — 'বাঙালী' একটি সাহিত্য সাময়িকী (২১-২২শ বর্ষ, ৪র্থ- ১ম সংখ্যা ১৯৮৩-৮৪)
১২. ঐ — সাহিত্যপত্রিকা 'মোয়াজ্জিন' (২৫শ বর্ষ, ৪র্থ সং ১৩৮৭)
১৩. ঐ - সাহিত্য সাময়িকী 'জয়তী' (২৯ বর্ষ ৩য় সং, ১৩৯৬)

'ভাষা-সাহিত্যপত্র' ৫ম সংখ্যা ১৩৮৪ তে মোহাম্মদ আবদুল কাইউম প্রনীত 'ঢাকার সাময়িকপত্র' ; ও 'পরিবর্তন' শারদীয়া সংখ্যা ১৩৮৮/১৯৮১ তে মুদ্রিত সৈয়দ খালেদ নৌমান প্রণীত প্রবন্ধ 'প্রাক-স্বাধীনতাযুগের মুসলিম সম্পাদিত সাময়িকপত্রিকা' এবং সমজাতীয় আরো অনেক গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করা যায় (যেমন ঃ মুহম্মদ জাহাঙ্গীর প্রণীত বাংলাদেশে সাংবাদিকতা, ঢাকা ১৯৮৭ এবং সুব্রত শংকর ধর প্রণীত বাংলা দেশের সংবাদপত্র, ঢাকা ১৯৮৫ ইত্যাদি) কিন্তু তালিকা দীর্ঘতর করে প্রকৃতপক্ষে লাভ হবে সামান্য। তবে এতে একথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সংবাদ ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকার ঐতিহ্য প্রায় দু'শ বছরের হলেও এই বিষয়ে গবেষণার ঐতিহ্য দীর্ঘ নয়।

১.৬. বর্তমান অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব

বিনয় ঘোষ-এর পূর্বে লঙ সাহেব, কেদারনাথ এবং ব্রজেন্দ্র নাথের ৩টি উদ্যোগ ব্যতীত আর কোনো প্রয়াস-এর কথা জানা যায়না বলে একথা বলতে দ্বিধা থাকেনা যে, বিশ শতকের ষাটের দশকের প্রান্ত থেকে সত্তর ও আশির দশকে বেশিকম ত্রিশ বছরের মধ্যেই সকল গবেষণামূলক রচনা প্রকাশিত হয়েছে এবং অধিকাংশ কর্মই অবলম্বন করেছে উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা। ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের পরে পাকিস্তানের বাংলা ভাষি অঞ্চল থেকে যতো পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা শামসুল হক প্রস্তুত করলেও তালিকাই সেটি ; তাতে কোনো আলোচনা বা মূল্যায়ণ নেই। আবদুল হক, হাসান হাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, আবুল কাসেম ফজলুল হক, জিয়াউল হক, মুহম্মদ নুরুল হুদা প্রমুখ'৪৭ পরবর্তী প্রখ্যাত কয়েকটি পত্রিকা (সওগাত, সমকাল, কণ্ঠস্বর, নাগরিক) সম্পর্কে আলোচনা বা মূল্যায়নের প্রয়াস পেলেও সার্বিকভাবে দেশকাল সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনীতি ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে ৪৭ পরবর্তী সাহিত্য পত্রিকাগুলোর মূল্যায়ণ তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলনা। আবার মোহাম্মদ আবদুল কাইউম এবং গোলাম সাকলায়েন ৪৭ পরবর্তী সাহিত্য-পত্রিকাগুলোর নামোল্লেখ করে একটি রূপরেখা তৈরী করলেও ধারাবর্ণনার অতিরিক্ত তা কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নয়। একারনেই ১৯৪৭ এর পরবর্তীকালে পূর্ববাংলা (পূর্বপাকিস্তান) থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ভূমিকা নির্ণয়ের পর্যাপ্ত অবকাশ রয়েছে। গবেষকেরা এখনও এই সময়কালে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা সমূহের অবদান নিরূপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। রচয়িতাদের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ এতে প্রতিফলিত হয়েছে। ইতিহাসের ধারা অনুসরণের কিংবা তথ্য পরিবেশনের চেষ্টা নেই। অথচ দেশ-বিভাগ এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি যে সংকটের সম্মুখীন হয়, সেই সংকট মোকাবিলায় সীমান্ত (১৯৪৭) থেকে কণ্ঠস্বর (১৯৬৬) পর্যন্ত একগুচ্ছ পত্রিকা সম্মুখ-সমরে লড়াইয়ের মানসিকতা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। পাকিস্তানবাদী ধারাকে পরাজিত করে মানবতাবাদী এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার বিজয়-সূচনার মাধ্যমে 'বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পটভূমি তৈরী করেছিল একদল সম্পাদক ও লেখক কয়েকটি পত্রিকাকে অবলম্বন করে। অথচ এই পত্রিকাগুলোর ভূমিকা নির্ণয়ের জন্য এ-পর্যন্ত কোনো গবেষণার পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি। একারণেই এ বিষয়ে গবেষণার সুযোগ উন্মুক্ত। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে গবেষণামূলক কোনো কাজের সন্ধান এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়না।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এই গবেষণার মাধ্যমে উদঘাটিত হবে বাংলাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ অধ্যায়। নানা-বিষয়ে যেসব জনশ্রুতি এবং কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তার অনেকগুলোই পড়বে ভেঙ্গে এবং প্রকাশিত হবে অনেক অজানা সত্য ও তথ্য। তরুণ সমাজ বিচার-বিবেচনাহীনভাবে এবং পূর্বঅভিজ্ঞতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন না-করে, যুক্তিহীন আবেগের সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যেভাবে কাজ করে যায়—এই গবেষণা প্রকাশিত হলে তা প্রভাবিত হবে। তরুণেরা জানতে পারবে এক্ষেত্রে পূর্বঅভিজ্ঞতার স্বরূপ এবং আগ্রহী হবে নিরেট আবেগকে পরিহার করে যুক্তির দ্বারা নিজেদেরকে পরিচালিত করতে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ভবিষ্যত অগ্রগতির পরিকল্পনা প্রণয়নেও এই গবেষণার ফলাফল দীর্ঘকাল প্রয়োজনীয় বিবেচিত হবে বলে ধারণা করা যায়।[৬১]

Dhaka University Institutional Repository

১. ৭. আলোচ্যকালের পত্রিকা-পরিস্থিতি ও প্রধান পত্রিকা

১. ৭. ক. ১. ১৯৪৭-এর পূর্ববর্তীকালে সাহিত্য ও সংস্কৃতির রাজধানী ছিল কলকাতা। আধুনিক কালে বাংলার নবজাগরণের সূত্রপাতও কলকাতায়। অতএব প্রধান প্রধান সাময়িকপত্র, সম্পাদক, সাহিত্যিক ও শিল্প-সংস্কৃতি কলকাতাকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি ও পুষ্টি লাভ করেছিল। ঢাকা তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা শহর। বড় বড় জিলা শহরও তখন বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ফলে কলকাতা থেকে প্রধান পত্রিকাগুলো অধিক হারে প্রকাশিত হলেও, বিভিন্ন মফস্বল শহর থেকেও নানান জাতের পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতো। ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর, ফরিদপুর, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, টাঙ্গাইল, কুষ্টিয়া, বগুড়া, বরিশাল, রংপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি জিলা মফস্বল শহর থেকেও (পশ্চিম বাংলার মফস্বল শহরগুলোর কথাও স্মর্তব্য) বৃটিশ-শাসিত ঔপনিবেশিক আমলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, সাময়িক ও সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হয়েছে।[৬২] বিভাগ-পরবর্তীকালে সেগুলোর কোন কোনটার প্রকাশ অব্যাহত ছিল। নতুন পত্রিকাও মফস্বল থেকে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত তকবীর (পাক্ষিক ১৯৪৭), দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সম্পাদিত 'নওবেলাল' (সাপ্তাহিক, ১৯৪৭/১৩৫৪) প্রকাশিত হয় যথাক্রমে বগুড়া ও সিলেট থেকে।

'ঢাকা প্রকাশ' ঢাকা থেকে শতবর্ষ পূর্বেই প্রকাশ পেতো। 'অমৃত বাজার' , 'আজাদ' প্রভৃতি দৈনিক পত্রিকার ঢাকাই-অফিস এবং ম্যানেজারিয়েল-ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। 'আইনুল ইসলাম' (১৯২৩) ; তরুণপত্র' (১৯২৫) ; 'দরদী' (১৯২৬) ; 'অভিযান' (১৯২৬) ; 'সবুজপল্লী' (১৯২৬) ; 'শিখা' (১৯২৭) '; 'জাগরণ' (১৯২৮) ; 'সঞ্চয়' (১৯২৮) ; 'চাবুক' (১৯৩৩) ; 'জিন্দেগী' (১৯৪৭) প্রভৃতি পাক্ষিক, মাসিক, সংবাদ সাময়িকী ও সাহিত্যপত্র ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সাতচল্লিশ সনে স্বাধীনতা লাভের সময়ে এবং পরবর্তীকালেও চাবুক প্রভৃতি পত্রিকার প্রকাশ অব্যাহত ছিল। অতএব পূর্ববঙ্গ বা ঢাকায় পত্রিকা প্রকাশের ঐতিহ্য দীর্ঘ। কিন্তু উন্নত মানের অথবা সাধারণ মাপের প্রকাশনা সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা ছিল। বড় প্রেস ও মুদ্রণ শিল্প বলতে তেমন কিছুই ছিল না। প্রকাশনায় বৈচিত্র্য আনার ইচ্ছা থাকলেও উপায় ছিলনা। 'চাবুক' ১৯৪৭ সনেই বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি জানায়। চাবুক পাকিস্তান যুগের প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র যা ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি 'পূর্ববঙ্গের জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক' ছিল। বিভাগ পরবর্তীকালে সম্পাদক হিন্দু বিধায় ভারতে চলে গেছেন অনুমান করলে পত্রিকা বন্ধের কারণ পাওয়া যায়।[৬৩]

কলকাতা থেকে ঢাকা এসে'কাফেলা' মাসিক রূপে ১৯৪৭ সনে আত্মপ্রকাশ করে। আবদুল গনি হাজারী 'পিপলস্ পার্টির সাপ্তাহিক রাজনৈতিক মুখপত্র আলোড়ন' ১৯৪৭ সনে সম্পাদনা করেন। 'আজাদ পূর্বপাকিস্তানের মজলুম জনসাধারণের মুখপত্র' ফয়েজউদ্দিন হোসেন সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'ফরিয়াদ' এবং 'ছাত্রলীগ' শীর্ষক রাজনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকাও ১৯৪৭ সনেই প্রকাশিত হয়। 'ছাত্রলীগ' সম্পাদনা করেন কাজী আবদুল মান্নান ও একরামুল হক। অতএব একালের সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো প্রকাশিত হয় প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি ও সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তর পরিবর্তন ও নতুন সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে। ১৯৪৮ সনে প্রকাশিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সাপ্তাহিক মুখপত্র', 'তাওহীদ' (১৯৪৮); 'তকবীর' (১৯৪৮) ; এবং 'নবনূর' (ফেনী ঃ ইসলামী সাম্য ও সমাজতান্ত্রিক পাকিস্তান গড়িয়া তোলার পথে সাহায্য করার জন্য— অর্ধসাপ্তাহিক ; সম্পাদক : মহিউদ্দীন আহমদ)। এই সময়ে প্রকাশিত সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক শাহেদ আলী ও এনামুল হক সম্পাদিত এবং মোহাম্মদ আবুল কাসেম প্রকাশিত ঢাকার 'সাপ্তাহিক সৈনিক' (১৯৪৮)। এরপর 'যুগের দাবী', 'নিশান' (১৯৪৮); 'রেনেসাঁ', 'সুলতানা', 'তানজীম', 'জনমত', 'পাকিস্তান', 'দীপালী' (১৯৪৯) ; 'খেদমত', 'কোহিনূর' ; 'তওফিক' (১৯৫০); 'পাক-হিতৈষী', 'পাক-সমাচার', 'পঞ্চায়েৎ' (১৯৫১) ; 'আলোর পথে' (১৯৫২); এবং 'চিত্রালী' (১৯৫৩); 'জমানা' (১৯৫৪) ; 'জনমত' (১৯৫৫); 'প্রবাহ' (১৯৫৬; প্রধান সম্পাদক : আহসান হাবীব ; সম্পাদক : জহির রায়হান এতে সাহিত্যও বেশ থাকতো); 'পূর্বদেশ' (১৯৫৬); প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ সন পর্যন্ত ১২৮ টি সাপ্তাহিকী ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী প্রভৃতি জিলা এবং মহকুমা ও থানা পর্যায়ের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন গ্রুপ ও শ্রেণীর মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হয়েছিল। উল্লেখ্য, এর মধ্যে বেশ কিছু 'সাহিত্য সাপ্তাহিক'রূপে প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। প্রতিটি সাপ্তাহিকেই সাহিত্য সৃষ্টির এবং কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ প্রকাশের প্রবণতা দেখা যায়। অবশ্য কোন কোনটা নিতান্তই সিনেমাপত্রিকা। তাই এগুলো সাহিত্য পত্রিকারূপে শ্রেণী বিন্যাসিত হবার দাবি রাখেনা। পাক্ষিক পত্রিকাও সাহিত্য পত্রিকা নয়। ৫৭টি পাক্ষিক একালের পূর্ব বাংলা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১ ও ৫২, প্রতিবছরেই দুতিন চার পাঁচটি করে পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে। 'আনসার' (১৯৪৭), 'নূতন আলো', 'নওরোজ', 'জিহাদ' (১৯৪৮); 'চন্দ্রবিন্দু', 'প্রবাহ' (১৯৪৯) ; 'তবলীগ' (১৯৫০) এবং রেডিও পাকিস্তান-এর পাক্ষিক অনুষ্ঠান পত্রিকা 'এলান' (১৯৫১); 'জনশিক্ষা পরিষদের পাক্ষিক মুখপত্র' মুহম্মদ শহিদুল্লাহ সম্পাদিত 'কাজের কথা' (১৯৫১) প্রকাশিত হয় অনতিবিলম্বে। ভাষা-আন্দোলনের বছরে (১৯৫২) সরকারী পাক্ষিক 'পাকিস্তানী খবর' (১৯৫২) এবং মার্কিন জীবনধারা ও মার্কিন সরকারের জীবনদৃষ্টির সঙ্গে বাঙালি পাঠকদের পরিচিত করানোর লক্ষ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় বাংলা-পাক্ষিক 'মার্কিন পরিক্রমা' (১৯৫২)। মার্কিন তথ্য সরবরাহ কেন্দ্রের পক্ষে প্রকাশিত এই পাক্ষিক পত্রের সঙ্গে-সঙ্গে 'আহরনী' নামের আরও একটি মাসিক সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হতো। এতে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই লিখতেন। প্রতিষ্ঠিত কবি-সাহিত্যকদের রচনায় ভরে উঠতো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রের বাঙালিপনার ভাঁড়ামিতে পূর্ণ এই সব পত্র-পত্রিকা।

সাতচল্লিশ সনে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'বেগম' ঢাকায় স্থানান্তর এর পর মহিলা সম্পাদিত, মহিলাদের জন্য প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার ধারা এদেশে বেগবান হয়। 'বেগমের' সঙ্গে কলকাতায় সংশ্লিষ্ট ছিলেন প্রখ্যাত কবি বেগম সুফিয়া কামাল। ঢাকা এসে ১৪ই জানুয়ারী ১৯৪৯ সনে অন্যতর মহিলা কবি জাহানারা আরজুকে সাথে নিয়ে তিনি প্রকাশ করেন 'সুলতানা' (১৯৪৯)। এরপর পাবনা থেকে কুমারী জ্যোৎস্নারাণী দত্ত ও অনিমা গুপ্ত সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'মানসী' (১৯৫০) ও 'বেগম' ১৯৫২) দীর্ঘদিন পূর্ব বাংলার নারীদের মুখপত্ররূপে কাজ করে। এধারায় লায়লা সামাদ সম্পাদিত

Dhaka University Institutional Repository

'অনন্যা' (১৩৬২/১৯৫৫) 'খাওয়াতীন' (১৩৫১) ; 'অবরুদ্ধা' (১৯৫৮) ; 'মহিলা' (১৯৬১) ; 'অঙ্গনা' (১৩৫৮) 'কবরী' (১৯৬৩) ; 'বান্ধবী' (১৯৬৫) ; গৃহশ্রী (১৯৬৩); ললনা (১৯৬৬); শ্যামলী (১৯৫৮); রশ্মি (১৯৬৫); 'আপনি ও আপনার শিশু' (১৯৬৭) 'মা' (১৯৬৯) ; মধুমিতা (১৯৬৯) এবং লাবনী (১৯৭০) প্রকাশিত হয়। এগুলোর অধিকাংশই ক্ষণস্থায়ী। 'বান্ধবী', 'ললনা', 'বেগম' জনপ্রিয় পত্রিকা ছিল। সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে এঁদের অবদান স্বীকার্য। কিন্তু এগুলো 'সাহিত্য পত্রিকা' হিসেবে খ্যাতি অর্জন না করে স্বীকৃতি লাভ করেছে 'মহিলা পত্রিকা' রূপে।[৬৪]

ঢাকা থেকে ১৯৪৮ সনে প্রকাশিত হয় প্রথম শিশু পত্রিকা 'মুকুল'। আতোয়ার রহমান প্রণীত 'বাংলাদেশের শিশু পত্রিকা' (১৯৭৭) গ্রন্থে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু শিশু পত্রিকা প্রকাশের তথ্য আছে। মুকুল ফৌজের কেন্দ্রীয় দফতর থেকে 'কায়েদে আযম সংখ্যা' রূপে আবদুল্লাহ্ আল মুতী শরফুদ্দীন এর সম্পাদনায় (প্রধান সম্পাদক) আজাদীযুগের প্রথমে এর আবির্ভাব। 'ঝংকার' (১৯৪৯) ; 'মিনার' (১৩৫৫) ; হুল্লোড় (১৩৫৭, সম্পাদক ; ফয়েজ আহমদ) 'প্রতিভা' (১৯৫৩) ; 'আলাপনী' (১৯৫৪) ; 'সেতারা' (১৯৫৫) ; 'সবুজ নিশান' (১৩৫৮) শাহীন (১৩৬২) 'খেলাঘর' (১৯৫৫) রংধনু (১৩৬৭) 'সবুজ সেনা' (১৯৫৭) ; পাঁপড়ী (১৯৬২); 'সোনার কাঠি' (১৩৭০); 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' (১৯৬০); ফুলকি (১৯৬৫) কচিকাঁচা (১৯৬৫) টাপুরটুপুর (১৯৬৫) ; নবারুণ (১৯৬৪) টরেটক্কা (১৯৬৪) ; প্রভৃতি পত্রিকা একালে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয়। 'বিজ্ঞান বিচিত্রা' (১৯৫৭) 'পুরোগামী বিজ্ঞান' (১৯৬৩) 'বিজ্ঞান সমাচার' (১৯৬৬) 'বিজ্ঞানের জয়যাত্রা' (১৩৭২) 'বিজ্ঞান সাময়িকী' (১৯৬১) প্রভৃতি বিজ্ঞান-পত্রিকাও শিশুদের জন্য একালে পরিকল্পিত হয়।

১৯৪৭-৭১ পর্বে ২০১ টি মাসিক, ১২৮ টি সাপ্তাহিক, ৫৭ টি পাক্ষিক ও ২৭টি দৈনিক, ২৭টি ত্রৈমাসিক ; ১৪টি দ্বিমাসিক, ১০টি ষান্মাসিক, ৭টি অর্ধ-সাপ্তাহিক, ৭টি সংকলন, ৬টি বার্ষিকী ; চতুর্মাসিক ২টি, মহিলা ১৭টি, কিশোর পত্রিকা ৩৩টি ; বিজ্ঞান ১৮টি এবং ১১টি ধর্ম বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[৬৫] রাজধানী থেকে কিছু প্রকাশিত হয়, অধিকাংশই জন্ম নেয় মফস্বলে। জিলা, মহকুমা ও থানা পর্যায় থেকেও প্রকাশিত হয়েছে। রাজধানী থেকে প্রকাশিত প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা মাহেনও, দিলরুবা, সওগাত সমকালই এখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। মফস্বলের সাময়িকীগুলোর তো কোনো কথাই নেই। অধিকাংশ পত্রিকারই দু এক বা দু চার, পাঁচ সংখ্যা সংগৃহীত হয়েছে। বহু পত্রিকার কেবল নাম শোনা যায়। কিছুই জানা যায় না, এমন অনেক পত্রিকা ও আছে। কিন্তু তার পরও প্রায় ৫০০ খানা পত্রিকা পূর্ববাংলা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। উন্নতমানের কোনো সাহিত্যপত্রিকা এখানে নিয়মিত প্রকাশিত হতে পারেনি। পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং কারিগরী প্রতিবন্ধকতা ছিল প্রকট। বড় অভাব ছিল ভালো লেখার। লেখক সম্প্রদায় তখন কেবল গড়ে উঠছেন। অথচ হঠাৎ করে অসংখ্য পত্রিকা প্রকাশ পেতে আরম্ভ করলো। এঅবস্থায় নব্য-শিক্ষিত, হাতে খড়ি-দেয়া লেখকদের রচনাতেই ভরে থাকতো তাবৎ পত্রিকা। দু'চারজন সম্পাদক উন্নতমানের লেখক নির্বাচন করে ভালো লেখা সংগ্রহ করতে পেরেছেন। ফলে পূর্ববঙ্গে খুব অল্প সংখ্যক পত্রিকাই দাঁড়াতে পেরেছে। আবার সাম্প্রদায়িক কারণে হিন্দু লেখক ও শিক্ষিত সম্প্রদায় ভারত গমনের ফলে বিরাট শূণ্যতার সৃষ্টি হয়। তা পূরণ করতে গিয়ে স্বল্পশিক্ষিত মুসলমান বাঙালি এগিয়ে এসেছেন, কিন্তু সাহিত্যিক স্টাণ্ডার্ড মান তাঁরা বজায় রাখতে পারেননি। তা অর্জন করতে সময় ক্ষেপণ করতে হয় অনেক। সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক ভালো না থাকায়, হিন্দুরা অধিকাংশই (সমর্থবানেরা) ভারতগমনের ফলে পূর্ববাংলার সাহিত্যসমাজ ভারসাম্যহীনভাবে কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের সদস্যদের দ্বারা গড়ে ওঠে।পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম কবি সাহিত্যিকেরা প্রাণ পাননি। হাতে গোনা দু চারজন লেখক সেখানে গত পঞ্চাশ বছরে বিকশিত হয়েছেন। পাশাপাশি পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত সমাজ, লেখক সম্প্রদায় রাজধানী কলকাতাতেই থেকে যাবার ফলে বাংলার মেধাবী তাবৎ লেখক কেন্দ্রীভূত হলেন কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতে।

১. ৭. ক. ২. পূর্ববঙ্গে বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল্যহীনতা প্রকট হয়ে উঠল, সাহিত্যক্ষেত্রে প্রকৃত সৃষ্টিশীলতা ও জাতীয় অনুভূতির বাস্তবতা যখন অস্বীকৃত হল, তখন, সেই সংকটময় শূণ্যতার কালে, পূর্ব বাঙলায় প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল সুস্থ মানবিক চিন্তা-ভিত্তিক জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় সাহিত্য চর্চার উপযুক্ত উন্মুক্ত পরিবেশ। সেজন্য দরকার ছিল ভালো সাহিত্যপত্র, ও সাময়িকপত্রের। আর সঙ্গীত-নৃত্য-অভিনয়-অঙ্কনের বিভিন্ন ধারার গতিশীল সংস্কৃতি চর্চার অফুরন্ত অবকাশ থাকা দরকার হলেও, সরকারের নিষেধাজ্ঞা ও সাবধানতা এমন পর্যায়ে ছিল যে, বাঙালি সংস্কৃতির ও গণসংস্কৃতির চর্চা গণ্য হত রীতিমতো 'কমিউনিষ্ট' কার্যাবলী হিসেবে। আর 'ভারতীয় দালাল' এবং 'পাকিস্তানের শত্রু বিচ্ছিন্নতাবাদী' ছাড়া বাঙলা সংস্কৃতির চর্চা-যে কেউ করতে পারেন, তা ছিল তখন সরকারী বিবেচনায় অসম্ভব ও অভাবনীয়। সরকার-সমর্থক, সাম্প্রদায়িক, উগ্র পাকিস্তানবাদী কবি-সাহিত্যিকেরাও ঘরের শত্রু বিভীষনের মতো জাতীয় স্বার্থের প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে চরম শত্রুতা ও মুনাফেকি করতে লেগে গেলেন। এমনি এক বন্ধ্যা, সৃষ্টি-বিরোধী সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক পরিস্থিতিতে উত্তরকালের স্বাধীনতা সংগ্রামের (১৯৭১) শক্তি-সহায়ক সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সাতচল্লিশ সন থেকেই কাজ শুরু করেছিলেন একদল কবি-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মী। দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে এই শুভবাদীরা সরকারী আদর্শের, সাম্প্রদায়িক চিন্তার, হীন উদ্দেশ্যে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের এবং বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশের প্রক্রিয়াকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে নানান নামের সাময়িকপত্র প্রকাশ আরম্ভ করেছিলেন। তাঁরা কলম ধরেছিলেন প্রগতিশীল মানবতাবাদী নীতি অবলম্বন করে এবং বাঙলাভাষার বিকাশের ও বাঙলা সংস্কৃতিচর্চার উদ্দেশ্যে। এ ধারাতে প্রথমেই প্রকাশিত হলো — ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জ থেকে কার্তিক ১৩৫৪, অক্টোবর- নভেম্বর ১৯৪৭ সনে 'কৃষ্টি' নামের একটি মাসিক পত্রিকা। উদ্যোক্তাদের প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু। সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন সুধাংশু রায়, প্রভাত সরকার, সাধন চ্যাটার্জী, ফুলদা রায়, জীবন গোস্বামী প্রমুখ। আর মুসলমানদের ইসলামী প্রজাতন্ত্রে, এক ধর্মজাতির রাষ্ট্রে ভিন্ন মতাবলম্বী লোকেদের পক্ষে প্রয়োজনীয় সত্য উচ্চারণে অনেক বাধা ছিল। রাষ্ট্রটি গঠিতই যেখানে মিথ্যা ও বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে, সঠিকতা সেখানে আক্রমনের শিকার হবেই। কাজেই 'কৃষ্টি' বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। কালের দীর্ঘপথ পরিক্রমার পর কৃষ্টির মাত্র একটি

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যা এখন পাওয়া গেলেও একাধিক সংখ্যা যে প্রকাশিত হয়েছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছেনা।

একই সময়ে (কার্তিক ১৩৫৪) 'সীমান্ত' প্রকাশিত হয় চট্টগ্রাম থেকে মাহবুব উল আলম চৌধুরী ও সুচরিত চৌধুরীর সম্পাদনায়। সম্পাদক ও উদ্যোক্তাদের ঘিরে যে মানবতাবাদী, গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আদর্শ, বাঙালির সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অখণ্ড অবিভাজ্য ঐতিহ্যের অনুরাগী, সর্বোপরি দাঙ্গাবিরোধী সম্প্রীতির মনোভাব-পুষ্ট সাহিত্য-সংস্কৃতি সৃষ্টি হতে লাগলো— তা কালে ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও প্রাধান্য বিস্তার করল। 'সীমান্ত' পত্রিকার সম্পাদক মাহবুব উল আলম চৌধুরী ও সহকর্মী সমমনাদের সমন্বয়ে গড়ে উঠা 'প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ' অনুষ্ঠিত করলে পূর্ববাংলার প্রথম সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন, ১৯৫১ সনের মার্চ (১৬-১৯ তারিখ) মাসে চট্টগ্রামের হরিখোলার মাঠে। এই সম্মেলনের সাফল্য ও আনন্দ উদ্বুদ্ধ করে সংগ্রামী সংস্কৃতি কর্মীদেরকে ১৯৫২ সনে কুমিল্লায়, ১৯৫৪ সনে ঢাকায় এবং ১৯৫৭ সনে কাগমারিতে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করতে।

এরপরই ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় অন্যতর একটি প্রধান সাহিত্য পত্র 'সংকেত' (১৯৪৮ ; পৌষ ১৩৫৫ ; সম্পাদক সিরাজুর রহমান)। এঁরা দাবি করেছিলেন 'সংকেত' 'পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র প্রগতিশীল মাসিক' পত্রিকা। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় ঘোষণায় বলা হয়— "যাত্রাপথে তলিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে বিগত দেড় বছরের খতিয়ান —— সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন দায়িত্ববোধের সূচনা হলো—— দেশ ভাগের ফলে বাঙ্গালী মুসলমানদের অধিকাংশই পড়লেন পূর্ব বাঙলার আওতায়। তাদের জীবনও মননকে ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়লো।' — এইরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষী পত্রিকাটিকে মৃত্যু এসে গ্রাস করে। দ্বিতীয় সংখ্যার পর 'সংকেত' আর প্রকাশিত হয় বলে জানা যায়না। অতপর ফজলে লোহানী (১৯২৮-৮৫) প্রতিষ্ঠিত 'অগত্যা' (১৯৪৯) প্রকাশিত হলো। একদল তরুণ ছিলেন লোহানীর সহযাত্রী। ফলে তিন-চার বছর পত্রিকাটি অগ্রসর হতে পেরেছিল। জনপ্রিয়তাও জোটে তাঁদের কপালে। অবশ্য প্রধান, প্রতিষ্ঠিতদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যেই তাঁদের আলোচিত হবার প্রধান কারণটি খুঁজে পাওয়া যায়। আবদুল গণি হাজারী (১৯২৫-৭৬) এবং মাহবুব জামান জাহেদী সম্পাদিত সরদার জয়েনউদ্দীন (১৯২৩-?) প্রকাশিত একটি ভালো সাহিত্যপত্র 'মুকতি' (১৯৫০) প্রকাশিত হয়ে মাত্র তিন-চার সংখ্যার পরেই মৃত্যুবরণ করে। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'পরিচিতি' (১৯৫১-৫৩) মফিজউল হকের সম্পাদনায় ২-৩ বছর চলে বন্ধ হয়ে যায়। প্রগতিশীল সাহিত্যকর্মী ও চিন্তাবিদ একাত্তরের শহীদ ডা: আবদুল আলীম চৌধুরী (১৯২৮-৭১) ও আহমদ কবির সম্পাদিত 'যাত্রিক' (১৯৫৩) এর ভাগ্যলিপিও 'মুক্তি'র অনুরূপ হয়েছিল। ঢাকা থেকে মহিউদ্দীন আহমদ প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত 'স্পন্দন' একটি পরিচ্ছন্ন সাহিত্যপত্র ছিল। কিন্তু তাও দুই-তিন বছরের বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। মেধাবি সাহিত্যকর্মী, সংস্কৃতি-সেবক ডঃ এনামুল হক তরুণ বয়সে আইউব খানের সামরিক শাসনামলে 'উত্তরণ' (১৯৫৮) প্রকাশ করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। চারুকলার ব্যাকরণগত মানসম্পন্ন বিচিত্র রঙের চিত্রশোভিত সাহিত্য-পত্র 'উত্তরণ' ৩য় বর্ষে পদার্পণ করে আর বের হতে পারেনি। গোয়েন্দা বিভাগ থেকে 'সম্পাদককে' চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে 'উত্তরণের' কণ্ঠরোধ করা হলো। 'নাগরিক' ১৯৬৪ সনে প্রকাশিত হয়ে বেশ কবছর চলে। আর ঐ বছরেই ক্ষীণকায় পত্রিকা 'পলিমাটি' প্রকাশিত হয়ে ১৩৭৮ বা ১৯৭১ সন পর্যন্ত ৫টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ/রচনা তাতে প্রকাশিত হয়েছিল। বন্ধ্যা, অন্ধকারাচ্ছন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে উজ্জ্বল আলোক সম্পাতের প্রয়াসী এই সব সাহিত্য পত্রিকা প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকা-গ্রুপের মাত্র একটির সমান আকৃতি-ওজনের হলেও এগুলোর মধ্যেই নবযুগের অভীপ্সা ব্যক্ত হতে চেয়েছিল। বাঙালির চিত্ত তখন গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আলোকে উদ্‌ভাসিত হতে চলেছে। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের ক্ষমতাসীনেরা পাকিস্তানকে দীর্ঘায়ু করার উপায় খুঁজছিলেন। তাঁরা পূর্বাহ্নেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন প্রচার-মাধ্যমের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য। তাই পাকিস্তান-পন্থী ইসলামীপুনর্জাগরণবাদী অথবা ধর্মীয় আদর্শের প্রচারের মুখ্য অস্ত্র রূপে একদল শক্তিশালী পত্রিকার আবির্ভাব ঘটলো, যাঁরা প্রগতিকে রোধ করার জন্য কোমর বেঁধেছিলেন। এগুলোর মধ্যে প্রথমে বের হয় মোহাম্মদী (১৯২৭-৭০) আল ইসলাহ ও (১৩৩৯-৭৮) মাহেনও। সরকারী তথ্য-কেন্দ্র প্রযোজিত 'মাহেনও' প্রথমে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এবং পরে অচিরেই ঢাকা থেকে (চৈত্র ১৩৫৫) কোমর বেঁধে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করলো। মোহাম্মদীও (১৯২৭) ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়ে (১৯৪৯) তাঁদেরই কাঙ্ক্ষিত সাধের পাকিস্তানকে নতুন প্রাণ-সঞ্চারের ব্রতে পুনরায় মাঠে নামলেন। এঁদেরকে অনুসরণ করলো একগুচ্ছ সাহিত্যপত্র—'দিলরুবা' (১৯৪৯) ; 'নওবাহার' (১৯৪৯) ; 'দ্যুতি' (১৯৪৯) ; 'তাহজিব' (১৯৫০) ; পূরবী, লেখকসংঘ পত্রিকা, পরিক্রম, সংলাপ, উত্তর-অন্বেষা প্রভৃতি পত্রিকা। বলাবাহুল্য সরকারী খরচে এবং সরকারী কর্মকার্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কিংবা অনুপ্রেরণায় বিচিত্র, শত শত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও বার্ষিক-সংকলন এই ধারাকে পুষ্টি জোগালেও শিক্ষিত সমাজে পাকিস্তানবাদীদের ফাঁকি এবং স্বার্থপরতা অচিরেই নগ্নভাবে প্রকট হয়ে উঠলো। ক্রমে এক শ্রেণীর লেখক সম্পাদক পৃষ্ঠপোষক উদার-নৈতিক ভাবধারায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। তরুণ দলের মুখপত্র কম থাকায় তাঁরাও এঁদের সাথে মানবতাবাদ, গণতন্ত্র এবং শিল্প-সাহিত্যের স্বাভাবিক বিকাশেই তৎপর হয়েছিলেন। সরকারী বিষনজর এড়িয়ে চলার পন্থারূপে এঁরা উদারনৈতিক মানবতাবাদ এবং সাধারণভাবে গণতন্ত্রের পক্ষাবলম্বন করলেন। ১৯৫২ সনের ভাষা-আন্দোলন সংঘটিত হবার ফলে এঁদের মানসে যে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহী চেতনার নির্যাস তৈরী করলো—তাকে পরিচায়িত করা যায় 'বাঙলী জাতীয়তাবাদী ও মানবতাবাদী ভাবধারা' বলে। পাশাপাশি মার্কসীয় চিন্তাধারায় বিশ্বাসীদের দলও ভারী হচ্ছিলো প্রধানত অনিয়মিত সংকলন, রাজনৈতিক পার্টির বুলেটিন ইত্যাদি অবলম্বন করে। কিন্তু এঁদের কোন নিয়মিত, দীর্ঘায়ু, উন্নত মানের বিশালবপু সাহিত্য পত্রিকা নেই। পাকিস্তানকালে কেবল নয়, পরবর্তীকালেও মার্কসীয় ধারার কোনো সাহিত্যপত্রিকা কল্লোল, প্রগতি, অগ্রগতি কিংবা সমকালের মতো খ্যাতি অর্জন করেনি। এই শ্রেণীর লেখক-সাহিত্যিকদের রচনা প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে বাংলাদেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মসূচীর মতোই বুর্জোয়া কোনো বড়ো দলের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে। যেসমস্ত পত্রিকায়— বাঙালী জাতীয়তাবাদী লেখকেরা লিখেছেন সেগুলোই কালে প্রধান ধারা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ছয়-দফা পরবর্তীকালেই এঁদের চেতনায় পরিবর্তনের ধারাটি স্পষ্ট লক্ষ্যযোগ্য হয়ে ওঠে। তবে সকলের নয়, কারো কারো মধ্যেই তা সৃষ্টিশীলতার রূপ নেয়। অধিকাংশেরই চিন্তাধারার সঙ্গে পাকিস্তানবাদী ধারার পত্রিকার, লেখক-

Dhaka University Institutional Repository

গোষ্ঠীর সাযুজ্য, সৌহার্দ্য, আন্তরিকতা ছিল। এক্ষেত্রে স্বার্থবোধ সমাজের বিবেককে প্রচণ্ডভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বহুকবি সাহিত্যিক, সম্পাদক, শিল্পী, সংস্কৃতিকর্মী পাকিস্তানবাদী ইসলামীধারার চিন্তাবিদ-বুদ্ধিজীবীদের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন সত্তর-একাত্তর সন পর্যন্ত। এ অবস্থায় তরুণ সম্প্রদায় বন্দিবিবেক- সমাজের অতন্দ্র প্রহরীরূপে জাগ্রত থেকে কাজ করলো 'শিখা অনির্বাণ' এর মতো। মানবতাবাদী ধারার পত্রিকা হিসেবে যেগুলোকে চিহ্নিত করা চলে, তার মধ্যে প্রধান ও প্রথম পত্রিকা মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (১৮৮৯-১৯৯৪) প্রতিষ্ঠিত 'মাসিক সওগাত' (১৯১৮ ; পাকিস্তান-পর্বে প্রথম প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, '১৯৫২ সনে)। এই কালের প্রধান পত্রিকারূপে যেটি নতুন করে খ্যাতিলাভ করে সেটা হচ্ছে সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-৭৫) সম্পাদিত 'সমকাল' (১৯৫৭)। এ ধারায়ই বিশিষ্ট কতিপয় পত্রিকা প্রকাশিত হয় পরপর। 'ইমরোজ' (১৯৫০); 'সাহিত্য' (১৯৬০) ; 'পূর্বমেঘ' (১৯৬০) ; 'পূবালী' (১৯৬০) ; 'স্বদেশ' (১৯৬৩) ; 'স্বাক্ষর' (১৯৬৩); সুন্দরম (১৯৬৩); 'কণ্ঠস্বর' (১৯৬৫) 'পূর্বলেখ' (১৯৬৫); মেঘনা (১৯৬৭-) প্রভৃতির নাম এখানে উল্লেখ করার মতো।

১. ৭. ক. ৩. এইকালে অনেক অপ্রধান পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। যেগুলোর বলিষ্ঠ কোনো মতাদর্শ ছিলনা। সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করলে পাকিস্তানবাদী ধারাকেই তাঁরা পুষ্ট করেছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ দিনাজপুরের 'নওরোজ' (১৯৪৪-৭০) ; 'জাগরী' (নারায়ণগঞ্জ, ১৯৫৬); 'দিগন্ত' (১৯৫৫) ; 'অতএব' (বগুড়া, ১৯৬০) 'প্রবাহ' (ঢাকা ১৯৬১) ; 'মেঘনা' চট্টগ্রাম (১৯৬৭) 'দিগন্ত' (সিলেট, ১৯৬৬) ; 'অভিযান' (নাটোর, ১৯৫৪-৬৪) প্রভৃতি।

তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানে ও বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার একটি ধারা সৃষ্টি হয়েছিল কর্মোপলক্ষে গমনকারী বাঙালি শিক্ষিত সমাজের সদস্যদের দ্বারা। 'দিগন্ত' প্রভৃতি পত্রিকা এবং বেশকিছু সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সেখানে গড়ে ওঠে। পূর্ব বাংলার কবি সাহিত্যিকদের লেখাও তাতে প্রচুর ছাপা হতো। অর্থ ও যশের জন্য এঁরা লিখতেন প্রবাসী বাঙালী বন্ধুদের অনুরোধে। কিন্তু প্রবাসী বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশ পাকিস্তানবাদী চিন্তার প্রবর্তক ছিলেন। যদিও তাঁরা বাঙলা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচার চাইতেন। মধ্যে মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী উর্দুভাষীদের সঙ্গে নিজেদের অবস্থার তুলনার মধ্যে নিজেদের উষ্মা প্রকাশ করতেন, কিন্তু সেই উষ্মার মধ্যে কিছু স্পষ্টতা ছিলনা। ছিলনা কোনো সিরিয়াসনেস।

ধর্ম বিষয়ক কতিপয় পত্রিকা একালে প্রকাশিত হয়ে মোটামুটি সমাজকে প্রভাবিত করেছিল। 'ইসলামী একাডেমী পত্রিকা' ; 'দিশারী' (১৯৬০) 'মীনার' (১৯৫৮) ; তর্জুমানুল হাদীস (১৩৫৬) ; আহমদীয়া ; মদিনা (১৯৬১) প্রভৃতি পত্রিকা নেতৃত্ব দিয়ে আরও একশ্রেণীর পত্রিকার জন্ম দেয়। কিন্তু এগুলোর চিন্তা পশ্চাৎপদ ; অধিকাংশই আবর্জনা ছাড়া আজ আর কিছু নয়।

বিশিষ্ট বা একক বিষয়ের পত্রপত্রিকা এসময়ে বেশ কিছু প্রকাশিত হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে একগুচ্ছ চিকিৎসা বিষয়ক সংকলন-সাময়িকীর কথা বলা চলে। শিক্ষা, শিল্প, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ক বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা থেকে কয়েকটি পত্রিকা বের হয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। তবে এগুলো 'প্রচারধর্মী' এবং 'তথ্য-ভারাক্রান্ত'। প্রকাশনা শিল্পের উন্নয়ন এবং শ্রীবৃদ্ধির লক্ষ্যে কতিপয় পত্র-পত্রিকা পূর্ব-পাকিস্তানে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন ত্রৈমাসিক 'পরিচিতি' (১৩৬৬) ; 'বই-বিচিত্রা' (১৩৬৭) ; 'বই' (১৯৬৫) ইত্যাদি। প্রচুর বেরিয়েছে প্রমোদ বিষয়ক পত্রিকা—তথা সিনেমা ম্যাগাজিন। ক্রীড়াবিষয়ক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছে। সিনেমা পত্রিকার মধ্যে নেতৃত্ব দিয়েছে চিত্রালী। উল্লেখযোগ্য অপরাপর প্রকাশনার নাম সচিত্র সন্ধানী, চলন্তিকা, সন্দেশ, ছায়াপথ, সাজঘর, পদক্ষেপ, ঝিনুক, অন্তরঙ্গ প্রভৃতি। এগুলোতে বেশ কিছু প্রণয়-প্রধান উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ব্যতিক্রম হিসেবে 'সচিত্র সন্ধানী'তে জহীর রায়হানের 'হাজার বছর ধরে' এবং 'পদক্ষেপ' পত্রিকায় আলাউদ্দীন আল আজাদের বিখ্যাত 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ-সত্ত্বেও এইসব পত্রিকা অপসংস্কৃতির চর্চা করেছে আর সুস্থ সাহিত্যপত্রের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। 'মৌলিক গণতন্ত্র' 'পূর্বপাকিস্তানের সাময়িকপত্রের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা' করে। প্রদেশের বিভিন্ন জেলা বা মহকুমা থেকে মৌলিক গণতন্ত্রের মুখপত্র স্বরূপ বহু -পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। "মৌলিক গণতন্ত্রের কার্যপ্রণালী, উন্নয়ন-কার্যপন্থা এবং স্থানীয় সংবাদ পত্রিকাগুলোতে মুখ্য হলেও সাহিত্য শাখাও এ-পত্রিকাগুলোতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। নতুন লেখকদের রচনা সম্ভার ছাড়াও কোনো কোনো পত্রিকায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের পরিচয়" ছাপা হত। মফস্বল শহরের প্রতিশ্রুতিশীল লেখকেরা এসব পত্রিকায় আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছিল।[৬৬]

১. ৭. ক. ৪. মুসলিম লীগের স্বৈরাচারী শাসনের যাঁতাকলে প্রগতিশীল তরুণদের উদ্যোগগুলো অবরুদ্ধ হওয়ায় এবং কলকাতা কেন্দ্রিক মুসলিম সাহিত্য সমাজের পাকিস্তানবাদী প্রধান লেখকেরা বিভাগ পরবর্তী পূর্ববঙ্গে এসে স্বার্থের প্রতিযোগিতায় মত্ত থাকায় সৃষ্টিশীলতা এক প্রকার স্তব্ধ হয়েই ছিল। এসময়ে, ১৯৫৪ পর্যন্ত, সংবাদ ও সাহিত্য জগতে এক প্রকারের বন্ধ্যাত্ব বিরাজ করছিল। সাহিত্য জগতের অন্ধকার কাল এটা। সৃষ্টিশীলতার জোয়ার নানা কারণেই সম্ভব হচ্ছিলো না। কিন্তু ৫২-র ভাষা-আন্দোলন সাহিত্যের বিষয় ও চিন্তায় নতুনত্ব সৃষ্টির উপকরণ ও উপাদান সৃষ্টি করে দেয়। পাকিস্তান-পন্থী ইসলামী ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী অসৃষ্টিশীল ক্ষয়িষ্ণু ধারার প্রবীণদের এবং সরকারী আদর্শের প্রচারক 'মাহেনও', 'দিলরুবা' ইত্যাদি প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে প্রকাশিত হলেও সৃষ্টিশীল তরুণদের সামনে পর্বত-প্রমাণ বাঁধা এসে দাঁড়িয়েছিল। এঁদের অবরুদ্ধ সৃষ্টিপ্রয়াস মুক্তি পেয়েছিল ১৯৫৪ র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনোত্তরকালে সওগাত-সমকাল-সাহিত্য-পূবালী, পূর্বমেঘ ও পরিক্রম এর মাধ্যমে কিছু-কিছু করে। মোহাম্মদী, মাহেনও দিলরুবা দীর্ঘদিন চলেছে। সওগাত, সমকাল, পূবালী, পূর্বমেঘ, পরিক্রম প্রভৃতি পত্রিকা বেশকিছুদিন যাবত (অন্তত দশ বছর) প্রকাশিত হলেও নিয়মিত স্বচ্ছন্দে বেরুতে পারেনি। বারেবারেই গতি স্তিমিত হয়েছে। বছরের সবকটা সংখ্যা নিয়ম অনুযায়ী কোনো পত্রিকাই বের করতে পারেনি। নিয়মিত, দীর্ঘদিন স্বাচ্ছন্দে সমান মানমর্যাদা নিয়ে পাকিস্তান আমলে প্রকাশিত হয়েছে প্রগতিশীল ধারার এমন একটি পত্রিকার নাম উল্লেখ করার নেই।

তবে একথাও অতি সত্য যে, স্বাধীনতা লাভের পর বিভিন্ন শ্রেণীর পত্র-পত্রিকা প্রকাশের দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল সমাজ-ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে। সাতচল্লিশের আগে ঢাকায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ঐতিহ্য গড়ে উঠলেও বিচিত্র ধরণের পত্রিকা প্রকাশের অবকাশ ছিলনা।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনদেশের রাষ্ট্রীয় স্বার্থে নানা ধরণের পত্রিকা প্রকাশের আবশ্যকতা দেখা দিল (জেলা বা মহকুমা প্রশাসকদের মুখপত্র, সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র, শিশুদের জন্য, বিজ্ঞানের বিষয়ের এবং ধর্মীয় পত্রিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে)। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র (বাংলা একাডেমী, ইসলামিক একাডেমী, নজরুল একাডেমী, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রভৃতি) এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নানান গবেষণা পত্রিকা ছাড়াও 'প্রবীণ হিতৈষী' ইত্যাদি পত্রিকা এবং নানা পেশাজীবীদের মুখপত্র প্রকাশের যে হিড়িক পড়ে যায়— তাতে নতুন নতুন সাহিত্য স্রষ্টার আবির্ভাব ঘটলো। যাঁরা কোনোদিন সাহিত্য নামধেয় গল্প, কবিতা, গান, প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি লিখবেন এবং তা কাগজে ছাপা হবে এমন চিন্তাও করতে পারেননি, তাঁরাও ছাপার অক্ষরে লেখা প্রকাশ করলেন। দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের ফলে পূর্ববঙ্গের পাঠক ও লেখকদের এই অভীপ্সার ব্যাপক মুক্তি ঘটলো। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের আপ্যায়ন লাভের সুযোগ পেয়ে বাঙালি মুসলমান সমাজ পাকিস্তানবাদী হবার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। কারণ পাকিস্তান নামক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়াতেই তাঁদের ভাগ্যে এই ছিঁকে ছিঁড়েছিল। ১৯৬০-৬৫ পর্যন্ত প্রায় সকলেই পাকিস্তানের সংহতিতে আস্থা রেখেই দেশের ও মানুষের কল্যাণের চিন্তা করতেন। সবাই তাই 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' আন্তরিকভাবেই উচ্চারণ করতেন।

১. ৭ .ক. ৫. বিভাগ-পূর্বকালে পূর্ববঙ্গ থেকে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হতোনা। স্বাধীনতা দৈনিক পত্রিকার ধারাকেও মুক্তি দিল। দৈনিক 'আজাদ' কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জিন্দেগী' ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সনে দৈনিক রূপে প্রকাশিত হয়। 'দৈনিক সংবাদ' জিন্দেগীকে আত্মীকরণ পূর্বক (একীভূত হয়ে) ১৭ মে ১৯৫০ –এ প্রকাশিত হলো। চট্টগ্রাম থেকে ১৯৪৭ সনে 'পূর্ব পাকিস্তান' ও 'পয়গাম' নামে দুটি দৈনিক প্রকাশিত হয়। এরপর দৈনিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয় 'ইত্তেফাক'। তবে এটি প্রথমে শুরু হয়েছিল সাপ্তাহিকীরূপে। এ-ধারায় 'ইনসান, মিল্লাত, আমার দেশ, জমানা ; ইত্তেহাদ ; বুনিয়াদ ; চাষী ; পূর্বদেশ ; নাজাত ; নবজাত ; আজাদী ; পয়গাম ; স্বদেশ ; দৈনিক পাকিস্তান ; আওয়াজ ; জনমত ; ইসলামাবাদ প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। ঢাকা থেকে ৪/৫ টি দৈনিক পত্রিকা গুরুত্বের সঙ্গেই প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর পাঠক-গ্রাহক সংখ্যাও ছিল প্রচুর। ইত্তেফাক, সংবাদ, পূর্বদেশ, দৈনিক পাকিস্তান, অবজারভার, টাইমস্ প্রভৃতি তখনকার নামকরা দৈনিক পত্রিকা। হামিদুল হক চৌধুরীর অবজারভার ও তোফাজ্জাল হোসেন মানিক মিয়ার ইত্তেফাক-গ্রুপ অব পাবলিকেশনস এবং সরকারী দৈনিক পাকিস্তান প্রভৃতি পত্রিকার জগতে প্রভাবশালী ছিল। ১৯৭১ সনের শেষ নাগাদ দৈনিক সংবাদপত্র ছিল দশটির মতো।[৬৭] এগুলো ভারত বিভক্তির পর সাংবাদিকতা সংবাদপত্র ও সাহিত্যজগতের পুনর্গঠন কাজে ব্যাপৃত হওয়ায় এদেশে শিল্পসাহিত্য বিকাশের পথ কিছুটা হলেও ত্বরান্বিত হয়।

১. ৮. বিভিন্ন ধারার সাহিত্য প্রয়াসের বিচিত্র পরিচয়

১. ৮. ক. ১. আলোচনার স্বার্থে দ্বিরুক্তি করে বলতে হয়— ১৯৪৭-৭১ পর্বে পূর্ব বাংলা থেকে প্রায় ৫০০ পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে দৈনিক, অর্ধ-সাপ্তাহিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক, চতুর্মাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক ইত্যাদি মেয়াদী পত্রিকা রয়েছে। আবার বিষয়-ভিত্তিক শ্রেণী-বিন্যাস করলে সব শাখার পত্রিকাই পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ববাংলার সাহিত্যিক-পরিস্থিতি সার্বিক ভাবে অনুন্নত এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দীর্ঘ হলেও সুদৃঢ় ছিলনা বলে পত্রিকা সংগ্রহের প্রবণতা দেখা যায়না। ফলে প্রকৃতপক্ষে কতোগুলো পত্রিকা এখান থেকে তখন প্রকাশিত হয়েছিল তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। শামসুল হক প্রণীত 'বাংলা সাময়িকপত্র' (১৯৪৭-৭১) গ্রন্থে পূর্ববাংলার পত্রপত্রিকার তালিকা প্রনয়নের গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রয়াস আছে। পত্রিকা প্রকাশের ধারা বুঝতে হলে সংকলন গুলোর কথাও বলতে হয়। সরকারী অপকৌশলের প্রতিবাদে সব সময়ই অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছে ছাত্রসমাজ ও তরুণদের ছোট ছোট সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। এই সময়কালে তরুণদের উদ্যোগে বহু অনিয়মিত সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারীতেও প্রকাশিত হয়েছে বহু সংকলন। নতুন চিন্তাধারার পরিচয় বহনকারী এইসব সংকলনেই বিধৃত আছে পূর্ব বাঙলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস। এই সব সংকলন বা ম্যাগাজিন (লিটলম্যাগাজিনসহ)-এর পরিচয় পেলে তালিকা দীর্ঘ হবে। দেশভাগের পর নতুন দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন মহল থেকে পত্রিকা প্রকাশের যে ব্যাপক প্রেরণার সৃষ্টি হয় তার ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোথা থেকে কি-পত্রিকা কতো বের হতো বা হয়েছে সে ইতিহাস সংগৃহীত হয়নি। হয়তো তা সম্ভবও নয়। আইউব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের আদর্শ প্রচারের জন্য জেলা, মহকুমা এবং থানা পর্যায় থেকে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় যতো পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে— তার হিসাব নেয়াই আজ দুষ্কর। এইসব পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকার মান নিম্ন হলেও, প্রচারের মাহাত্ম্যে প্রভাব নিতান্ত কম ছিলনা। এতে সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টাও ছিল। অর্ধ-সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, বার্ষিকী ও সংকলন দেশের ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ প্রশাসনিক এলাকা থেকে প্রকাশিত হবার ফলে সাহিত্য সৃষ্টির প্রক্রিয়ার সঙ্গে বাঙালি ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ লাভ করে। গুণে-মানে উন্নত না-হলেও সবধরণের রচনা প্রকাশের সহজ-সুযোগ এসে পড়ায় সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্যাপক গতি লাভ করে। প্রতিভা বা মেধা বিকাশের সুযোগ আসে তবে তাকে বিকৃত করার চেষ্টা হয় পাকিস্তানী, ইসলামী ভাবাদর্শের মদিরা দিয়ে, অখণ্ড বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভারত-বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে। কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলে বৃটিশের স্বার্থে শিক্ষা সংস্কৃতির চর্চা উৎসাহিত হলেও বাঙালি স্বাজাত্যবোধে, স্বাধীনতা লাভের জন্য যেমন আগ্রহী হয়ে উঠেছিল— তেমনি, পূর্ব বাঙলায় পশ্চিম-পাকিস্তানী অবাঙ্গালী শাসকগোষ্ঠী নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে চাইলে সচেতন-সজাগ বাঙালি ঠিকই 'মুক্তি-পাগল' হয়ে উঠেছিল। পরিণতিতে ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা প্রাপ্তি। এই স্বাধীনতালাভের মূল প্রেরণা সৃষ্টি করেছিলেন সাহিত্য-শিল্প স্রষ্টারা, পত্রিকার মাধ্যমে। তবে এর চতুস্পার্শে লোভের মায়াজালের ষড়যন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা জোরে সোরেই ছিল। ভারত বিভক্তির সময়েও কূচক্রীরা সক্রিয় থেকে বাংলা ও পাঞ্জাবকে কেটে জম্মু- কাশ্মীর ইত্যাদি নানা সমস্যাকে স্থায়ী করে রেখেছে। তাও এদেশের লোকেরাই সায় দিয়ে, মেনে নিয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

১. ৮. ক. ২. বায়ান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন বা রাষ্ট্র-ভাষার সংগ্রাম মুক্তিকামী জনসমাজকে উদ্দীপিত করেছিল। ফলে ১৯৫৩ সনের ফেব্রুয়ারি থেকে একুশের সংকলন ও শহীদ দিবস সংখ্যা প্রকাশের ঐতিহ্য যেমন সৃষ্টি হয় তেমনি ১৪ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস 'বিপ্লব দিবস' ও রমজানের শেষে ঈদ সংখ্যা প্রকাশের মধ্য-দিয়েও পাকিস্তান-পন্থীরা বিরুদ্ধ সংস্কৃতিক-চেতনা সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন নানা প্রত্রিকা প্রকাশের সুযোগ দিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছাপিয়ে উঠেছে একুশের ধারাই। এজন্য বাঙলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামে নানান অনিয়মিত ও একুশের সংকলনগুলোর ভূমিকা বাঙালির সমাজগঠন-মাসিকতা ও পরিবর্তনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ।

১. ৮. খ. ১. পাকিস্তান-আমলের বাঙলা সাময়িক বা সাহিত্যপত্রিকার পাতায় সম্পাদকীয় ও ভূমিকায় 'সাহিতপত্রিকা' সম্পর্কে উচ্চারিত কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করা হলো। এতে তখনকার পরিস্থিতি অনুধাবনে সহায়তা করবে। ১৯৫৮ সনে 'সবার পত্রিকা'র সম্পাদকীয়তে সম্পাদক কায়সুল হক লেখেন ঃ "এতোবড়ো দেশ এই পূর্ব-পাকিস্তানে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য পত্রিকার সংখ্যা মর্মান্তিকভাবে অল্প। লেখকদের ভাবতে হয়, কোথায় তাঁরা লিখবেন? লিখে বাঁচবার মতো অর্থও তাই কোনো লেখকের ভাগ্যে জোটেনা। রুচিবান প্রকাশকও এদেশে বিরল। অথচ শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান আর সব দেশের মতন অগ্রসর হতে পেরেছে— নিঃসন্দেহে এটা গৌরবের।"[৬৮]

সচিত্র মাসিক 'রূপকথা'র সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস সাদী ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় (ডিসেম্বর ১৯৫৯) 'সম্পাদকের অচলকলমে' পত্র-পত্রিকার জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে মন্তব্য করেন ঃ "মানুষের জন্মটা যেমন বিস্ময় এবং মৃত্যুটাই স্বাভাবিক, তেমনি অর্থপূর্ণ পূর্ব পাকিস্তানের বাজারে পত্র-পত্রিকার জন্ম-মৃত্যুর ইতিহাসও। তবে পার্থক্য এই যে, জন্মপ্রাপ্ত মানুষের আয়ুর কিছুটা কাল নির্দেশ মোটামুটিভাবে দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু এখানকার নবজাত পত্রিকার বেলায় সে নিশ্চয়তা আদতে নেই। তাই শুরুতেই জোর করে কোন কথা বলতে যাওয়া উচিত হবে না। দেশ বিভক্ত হবার পর এই দীর্ঘ তের বৎসরে জন্ম-মৃত্যুর খাতায় অনেক মাসিক, পাক্ষিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম উঠেছে। যেগুলোর নাম এখনো মৃত্যুর খাতায় ওঠেনি। তাদের সংখ্যাও কম এবং মেরুদণ্ডও খুব শক্ত নয়। কেননা এর-ওর কাঁধের উপর ভর করেই তাঁদের বেঁচে থাকতে হচ্ছে বলেই আমাদের মনে হয়।"[৬৯] মাসিক 'পাঁচমিশালী' পত্রিকায় (সম্পাদক : ইবনুল হাসান ; সহ-সম্পাদক : সৈয়দা সুলতানা আরা, সৈয়দা জাহান আরা লাইজু) লেখা হয় ; 'ঈদুল ফিতর' আর 'পাকিস্তান দিবসের' মত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিন দুটোকে উপলক্ষ করে পাঁচমিশালীর যে আত্মপ্রকাশ তা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।' এই পত্রিকার নিয়মাবলীতে বলা হয় ; 'পাঁচ মিশালীর পরিচালকবর্গকে খুব বেশী পরিশ্রম করতে হয় বলে লেখক লেখিকাদের পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভব নয়।'

১. ৮. খ. ২. বিভিন্ন মন্তব্য, বক্তব্য, সম্পাদকীয় ইত্যাদি থেকে এবং সবকিছু মিলে পত্রিকাগুলোর 'বৈশিষ্ট্য' ও 'চারিত্র' সম্পর্কে আরো যে ধারণা জন্মেছে—তা মোটামুটিভাবে এই—

ক. একই সঙ্গে একই পত্রিকা রাজনৈতিক সামাজিক ভূমিকা পালন করতে পেরেছে। পাশাপাশি সাহিত্য সংখ্যা প্রকাশ করেছে। সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকাগুলো বার্ষিক সংস্করণ বা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। কিশোর ও মহিলা পত্রিকাগুলোও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছে। প্রতিটি পত্রিকাই সাহিত্যের আবরণে সজ্জিত হতে অভিলাষী হয়েছে। প্রত্যেক লেখার পেছনে সাহিত্যিক প্রেরণা বা প্রবণতা কাজ করেছে।

খ. এই সময়ে প্রায় প্রতিটি পত্রিকাই 'ঈদসংখ্যা' এবং 'আজাদী সংখ্যা' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। (মানবতাবাদী ও প্রগতিশীল ধারার পত্রিকায় কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যাবে)। লেখার জন্য সম্মানী দেয়া হতোনা। ভালো সাহিত্য পত্রিকার সংখ্যা নিতান্তই অল্প এবং ক্ষণজীবী। প্রায় সকল পত্রিকাই নিয়মিত প্রকাশের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে যাত্রা শুরু করেছে। কিন্তু এক দুই তিন বা চার-পাঁচ সংখ্যা প্রকাশের পরই তা বন্ধ হয়ে গেছে।

গ. অনেক সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকা 'সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পত্রিকা' হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। অনেক পত্রিকায় পাক্ষিক সংবাদপত্র ঘোষণা থাকলেও ভূমিকা পালন করেছে 'মাসিক সাহিত্য পত্রিকা'র। যেমন 'আলো' ও 'সবার পত্রিকা'।[৭০]

ঘ. সাপ্তাহিক থেকে মাসিক কিংবা দৈনিকে রূপান্তরিত হয়েছে। এবং এক সময়ে প্রচার বন্ধ হয়ে গেছে। সাতচল্লিশ-একাত্তরপর্বে প্রকাশিত সমকাল- কণ্ঠস্বর ছাড়া কোন পত্রিকা বাহাত্তরের পর প্রকাশিত হয়নি। 'বেগম' চলেছে। কিন্তু সে-বেগম নেই।

ঙ. ঢাকায় ১৯৪৭ সনে পত্র-পত্রিকা প্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশ ছিলনা। 'কাফেলা' (সাপ্তাহিক) পত্রিকার ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংখ্যার (মাসিকরূপে ১৯৪৭) 'কৈফিয়ৎ' এ বলা হয় (সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন—কাজী নজমুল হক, বেগম সুফিয়া কামাল, মোসলেমউদ্দিন, বেগজাদী মাহমুদা নাসির প্রমুখ) ঃ "পাকিস্তানে টাইপ ফাউণ্ডারী, ব্লক তৈরীর কোন প্রতিষ্ঠান না থাকায় কলকাতার মত সাপ্তাহিক আকারে পত্রিকা প্রকাশ করাও এখানে সম্ভব হচ্ছেনা। এখনও টাইপ এবং ব্লক এখানে পাওয়ার কোন উপায় নেই। আর কবে যে পাওয়া যাবে, তারও কোন স্থির নিশ্চয়তা নেই। এতগুলো অসুবিধা সত্ত্বেও দেশ, দশ ও সমাজের খেদমতে আল্লার কৃপায় 'কাফেলা' মাসিক আকারে প্রকাশ করছি। ইনশাল্লাহ অতিসত্বর আমরা আপনাদের প্রিয়পত্রিকা 'কাফেলা' পুনরায় সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশ করতে সমর্থ হব।"

চ. অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা প্রকাশের নেপথ্যে কোনো মহত উদ্দেশ্যও সুনির্দিষ্ট আধর্শ ব্যক্ত হতো না। 'তারুন্যের উচ্ছাস' আর গতানুগতিক 'দেশ, দশ ও সাহিত্য সেবার' অঙ্গীকার আছে মাত্র।

ছ. পূর্ব-পাকিস্তানে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ খুব কঠিন কাজ। সহজ, স্বচ্ছন্দ নয়— পত্রিকায় এধরণের মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। আরো বলা হয়— একাজ মফস্বলে আরো কঠিন, লেখা পাওয়া যায়না, ছাপানো কঠিন। নিয়মিত করা দু:সাধ্য ইত্যাদি।[৭১]

Dhaka University Institutional Repository

জ. ১৯৬৩ তেই পূর্ব-পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকায় গণ-জীবনে সূচিত জাগরণের কথা ব্যক্ত হতে থাকে। 'পৃথিবী'র মতো 'ধর্মীয় পত্রিকা'তেও সাহিত্যের সীমা এবং সামাজিক ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয়নি : "সাহিত্য বলতে আমরা এক ব্যাপক পরিধি বুঝি যার সীমার মধ্যে সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কোন কিছুই বাদ নেই, বাদ নেই এমন কিছু যা নিয়ে আমাদের জীবন পরিপূর্ণ এবং এসবের মধ্যদিয়ে সাহিত্য মানুষকে সেই জ্ঞানদান করবে, যা দিয়ে আমরা বিশ্বসভ্যতা তথা মানব সমাজের অগ্রগতির মূলসূত্রটি বা ধারাটিকে বুঝতে পারব, এবং তা সমাজ জীবনকে আরো উন্নত করে তোলার জন্য প্রয়োগ করতেও সক্ষম হব।" গণ-জাগরণ ও সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 'পৃথিবী'র বক্তব্য : "পৃথিবী তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে এগিয়ে যাবার শপথ গ্রহণ করছে। কিন্তু এই সঙ্গে আমরা বেশী করে আশা করছি যে সাম্প্রতিক কালে পূর্বপাকিস্তানের গণ-জীবনে যে জাগরণ দেখা দিয়েছে, তরুণ সাহিত্যিকেরা তা হতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে নৈরাশ্যকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হবেন। এইসব সাহিত্যিকদের প্রতি সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবার জন্যেই জন্ম নিয়েছে 'পৃথিবী'।"[৭২]

ঝ. পূর্ববঙ্গের নারী-সমাজের মধ্যে ব্যাপক জাগরণ বা সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মহিলাদের সদম্ভ, গর্বিত আত্মপ্রকাশ, বলিষ্ঠ ভূমিকা এবং নারী জাগরণের সাংগঠনিক তৎপরতা লক্ষ্যযোগ্য। ১৯৬৩ সনেই ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় গৃহিনীদের একটি সমিতি 'ঢাকা গৃহিনী সমিতি'। এঁদের বার্ষিক মুখপত্র 'গৃহশ্রী' (১৩৭০)র উদ্দেশ্য : "গৃহিণীদের মনের সৌন্দর্যে সুন্দর হয়ে উঠবে আমাদের প্রতিটি গৃহ—— এ গৃহই হবে প্রিয়জনের পরম কাম্যবস্তু।" মহিলারা রাজনৈতিক সাংগঠনিক এবং সামাজিকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠছেন। পত্র-পত্রিকায় তাঁদের বক্তব্য জোরে-সোরে উপস্থাপিত হচ্ছে। এঁদের বৃহৎ সংগঠন 'নিখিল পাকিস্তান মহিলা সামিতি'র পূর্বাঞ্চল শাখার মুখপত্র 'রশ্মি' বার্ষিকী ১৯৬৫ সনে জোবেদা খানমের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পুরুষ-শাসিত সমাজের পশ্চাৎপদ 'মূক-ভাষাহীন অবরোধ বাসিনীদের মুখে কথা ফোটানোর জন্য 'মহিলা সাপ্তাহিক 'লাবনী' (১৯৭০) প্রকাশিত হয় হাজেরা তালুকদার এর সম্পাদনায় (হাজেরা নজরুল?)। 'ললনা'র (১৯৬৬) উদ্দেশ্য ছিলো ঃ "মহিলা সমাজের সকল প্রকার দাবি দাওয়া, সুবিধা-অসুবিধা এবং সর্বতোভাবে তারই প্রয়োজনে যথাসাধ্য কাজ করে যাওয়া"। অনগ্রসরতার জন্য নারী সমাজে ক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে।[৭৩]

ঞ. সরকারের মুখ্য ব্যক্তি, এসডিও প্রমুখ সম্পাদিত মৌলিক গণতন্ত্রীদের পত্রিকার রবীন্দ্র-নজরুল সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার তথ্যও পাওয়া যায়। সিরাজগঞ্জের এস. ডিও ইনাম আহমদ চৌধুরী সম্পাদিত 'যমুনা' (পাক্ষিক)-র ২৩-২৪ যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় রবীন্দ্র-নজরুল সংখ্যা-রূপে।[৭৪]

ট. সমাজ-মানস বিচিত্রভাবে বিকশিত ও বিস্তৃত হচ্ছে। পাশ্চাত্য-ধরণের প্রবীণ-সংঘ গড়ে উঠেছে ১৯৬৩ তে এবং এঁদের মুখপত্র দীর্ঘদিন ধরে (১৯৬৮ পর্যন্ত) প্রকাশিত হয়েছে। 'পাকিস্তান প্রবীণ হিতৈষী' শীর্ষক পত্রিকা প্রকাশ করেছে 'পাকিস্তান এসোসিয়েশন ফর দি এজেড' (৭৮ ধানমণ্ডি রেসিডেন্টসিয়াল এরিয়া, রোড-৫ থেকে, সম্পাদক ; ডাঃ একেএম আবদুল ওয়াহেদ, সহ-সম্পাদক : ডাঃ আলিমউদ্দিন আহমেদ)।

ঠ. জেলা কাউন্সিল বা জেলা প্রশাসকদের প্রযত্নে প্রকাশিত মৌলিক গণতন্ত্রীদের পত্রিকা (বগুড়া জেলা কাউন্সিলের পাক্ষিক মুখপত্র-'মহাস্থান', ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৬ জানুয়ারী ১৯৬৬)-র সম্পাদকীয় উদ্দেশ্য ছিল এইরূপ : "জেলা কাউন্সিলের মুখপত্র হিসেবে মুখ্যত জেলা কাউন্সিল এবং অন্যান্য মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন মূলক কার্যক্রমের সহিত জনসাধারণের পরিচয় ঘটানো ইহার লক্ষ্য। সঙ্গে-সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে পাঠকদের অবগতির জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদও পরিবেশন করা হইবে।"

ড. স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে বাঙালির কাঙ্ক্ষিত উন্নতি (সর্ব প্রকারের) না হওয়ার বিচিত্র বর্ণনা প্রায় সকল বাংলা পত্রিকায় ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কার্যকরভাবে জনগণের প্রকৃত মুক্তি কামনায় মাত্র গুটি কতক পত্রিকায় জাতীয়-সমস্যার গভীর আন্তরিক শিল্পসম্মত গ্রাহ্য ভাষায় যুক্তিসিদ্ধ উপস্থাপন (ব্যক্ত) হয়েছে। ভালো লেখার বড় অভাব পত্রিকাগুলোর। সুসম্পাদনার ছাপও ক্বচিৎ মেলে। অর্থাভাব এবং নানা সংকটের আহাজারি ছাড়া কোনো পত্রিকার যাত্রা আরম্ভ হয়নি। কাল কাটেনি নির্বিঘ্নে। সমাজ যে স্থবির হয়ে পড়েছে—তার পরিচয় পাওয়া যায় 'উত্তরণ' (১৯৭০; এনামুল হক সম্পাদিত 'উত্তরণ' নয়) এর সম্পাদকীয়তে : "বহুবাধা-বিপত্তি এবং ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে সমাজ-মনে অনিশ্চয়তা এবং বুদ্ধি ও চিন্তার রাজ্যের জড়তা তথা অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে। তা থেকে উত্তীর্ণ হবার আশায় এবং নিজস্ব সাহিত্য সংস্কৃতি ও সর্বাঙ্গীন সৃষ্টিশীল প্রচেষ্টার অবারিত বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির চেতনায় আমাদের এ সংগঠন প্রয়াস এবং তারই ফলশ্রুতি উত্তরণ।"[৭৫]

ঢ. সরকার ঘেষা পাকিস্তানবাদী বুদ্ধিজীবীদের ইসলামী ধারার পত্রিকায় অথবা সরকারী নানা অপচেষ্টায় লিপ্ত বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় কিরূপ 'মাকাল ফলের' ব্যবসা করা হতো তার একটি নমুনা ডঃ হাসান জামান সম্পাদিত 'পূবালী' (১৯৭০) পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে দেয়া যায়— "সাময়িক পত্রিকা আজ একাধারে দেশের সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনীতিক, অর্থনৈতিক, সংস্থার ও অন্যান্য বহু পরিবর্তনের আলেখ্য। সমাজের এই চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা পূবালী প্রকাশে ব্রতী হয়েছি। অনুসন্ধিৎসু ও আনন্দলিপ্সু মনের চাহিদা মেটানোই এর মুখ্য উদ্দেশ্য, কোন আদর্শ বা নীতি প্রচার নয়।"

কোনো আদর্শ বা নীতি ছাড়া পত্রিকা বের করার কি মানে তা বোঝা যায় না। যদিও তাঁরা স্বীকার করেন 'সাময়িকপত্র সকল পরিবর্তনের আলেখ্য'। কোনো নীতি, আদর্শ এঁদের সামনে ছিলনা (ছিল জনগনকে বিভ্রান্ত করার নীতি) বলেই এরূপ অস্পষ্ট, অর্থহীন ভাষার ক্যাঁচ-কাঁচানি করা হতো।[৭৬]

১. ৮. গ. ১৯৬৮ সনের অক্টোবর মাসে (আইউব খানের শ্যাসনামলে) বাংলা একাডেমী সপ্তাহব্যাপী একটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচী গ্রহণ করে। পূবপাকিস্তানের বিশ বছরের সাহিত্যের ব্যাপক পর্যালোচনা মূলক সাহিত্য সেমিনার অনুষ্ঠান এই কর্মসূচীর অন্যতম অংশ ছিল। এই সেমিনারে

Dhaka University Institutional Repository

'পূর্ব পাকিস্তানের সাময়িকপত্র' বিষয়ে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। আলোচনা করেন ডক্টর রফিকুল ইসলাম, জনাব মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ; সভাপতিত্ব করেন জনাব মুজীবুর রহমান খাঁ (আজাদের এককালীন সম্পাদক)। আলোচনা কালে রফিকুল ইসলাম বলেন ঃ " ..... একটি তথ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হল এই যে পূর্বপাকিস্তানে গত বিশ বছরে অনেক পত্রিকা প্রকাশিত হলেও তার মধ্যে অল্প কয়েকটি মাত্র দীর্ঘ জীবন লাভ করেছে। বস্তুত .... প্রকাশকেরা চান যে তাঁদের পত্রিকা টিকে থাকুক, অথচ পত্রিকা কিছুদিন চলার পরেই বন্ধ হয়ে যায় কেন? এ সমস্যা আলোচনার যোগ্য। আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার কম আবার শিক্ষিতদের মধ্যেও পাঠকের সংখ্যা আরও কম, এমন অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দেশে পত্র-পত্রিকার প্রচার সীমাবদ্ধ। কাজেই কেবল পত্রিকা বিক্রয়ের মূল্য দিয়ে কোন পত্রিকার খরচ উঠতে পারেনা। আবার পত্রিকা বিক্রয় হলেও তার মূল্য যথাযথভাবে প্রকাশকের কাছে ফিরে আসেনা। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই সাময়িকপত্রিকাকে বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করতে হয়। দৈনিক পত্র-পত্রিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সাময়িকপত্রগুলি খুব বেশী বিজ্ঞাপন পায়না, ফলে সে উপায়েও পত্র-পত্রিকার আর্থিক সমস্যার সমাধান হয়না। আমাদের দেশে নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশের পথে একটা প্রধান প্রতিবন্ধকতা হল ছাপাখানার অবস্থা। অধিকাংশ ছাপাখানাই নির্দিষ্ট সময়ে কাজ দিতে সক্ষম হয়না। ছাপার খরচও খুব বেশী। কাগজ এবং ব্লকের সমস্যাতো রয়েছেই। তদুপরি সাহিত্য সাময়িকীগুলোকে রম্য বা প্রমোদ পত্রিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়। এমন অবস্থায় সরকারী উদ্যম বা সহযোগিতা ছাড়া বা কোন দৈনিক পত্রিকার সহায়তা ছাড়া এখানে নিছক বেসরকারী প্রয়াসে খুব কম সাহিত্য সাময়িকীই টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছে।"[৭৭]

জনাব মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলেন, ঃ "বিভিন্ন সাময়িকপত্রের উদ্দেশ্য ও আদর্শ কি ছিল, সেগুলোকে কেন্দ্র করে কোন সাহিত্য আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে কিনা অথবা কোন সাহিত্য আন্দোলন সৃষ্টিতে তাঁরা কতখানি সহায়ক হয়েছেন সেগুলোর বিচার আবশ্যক।"[৭৮] সভাপতির ভাষণে জনাব মুজীবুর রহমান খাঁ বলেন : "স্বাধীনভাবে আপন সত্তায় প্রকাশিত, আর্থিক দিক থেকে আত্মনির্ভরশীল এবং জনগণের বিভিন্ন ধ্যানধারণার বাণীবহ সাহিত্য পত্রিকার অভাব আজ আমাদের সাহিত্য ক্ষেত্রে এক বড় সমস্যা হিসাবে বিরাজ করছে। তিনি বলেন, আমরা আজ এমন সব সাহিত্য পত্রিকার প্রত্যাশী যা সাহিত্য চেতনায় বিপ্লব আনবে, জমাট সাহিত্য আন্দোলন সৃষ্টি করবে এবং সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে তুলবে। ... চিন্তায় বিপ্লব সাধনকারী বলিষ্ঠ সাময়িকপত্র আমরা পাচ্ছিনা : একটা নৈরাশ্য যেন ক্রমেই আমাদের ঘিরে ফেলছে .... এক্ষেত্রে তেমন কোন উন্নতি হয়নি . . . কাগজ বেরুচ্ছে, টিকেও আছে হয়ত, ... এর অধিকাংশই কোন বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র মাত্র এটা কোনক্রমেই সাহিত্য আন্দোলনের সার্বিক অগ্রগতির পরিচায়ক নয় .... কোন প্রতিষ্ঠানের ছত্রছায়ায় প্রকাশিত একটি বা দুইটি সাময়িকপত্রে আমাদের চিন্তাধারা কতটুকু প্রতিফলিত হতে পারে তা সঠিকভাবে বলা যায় না। ...... স্বাধীন এবং আত্মনির্ভরশীল পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে আর্থিক সমস্যা একটা বিরাট সমস্যা। ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার অকাল মৃত্যু .... দুঃখজনক..... আর্থিক সমস্যা এবং ব্যক্তিত্বশালী সম্পাদকের অভাব এ পরিস্থিতির জন্য অনেকাংশে দায়ী।"[৭৯]

আহমদ ছফা এক সাক্ষাৎকারে বলেন ঃ বাংলাদেশের মধ্যে সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ নির্মাণ এবং জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই নানারকম প্রয়াস-প্রযত্ন লক্ষ্য করা যায় ; তার প্রমাণ দেখা যাবে অজস্র স্বাস্থ্যবান রুচিসমৃদ্ধ অনিয়মিত সংকলন, একুশের বিশেষ সংখ্যা এবং কতিপয় (নিয়মিত প্রকাশের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ) সাহিত্য পত্রিকাতে। এই প্রয়াস শুধু ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সুদূর প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এই ধরণের সাংস্কৃতিক উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। একটা বেদনাদায়ক ব্যাপার হলো এই পত্র-পত্রিকাগুলোর আয়ু দীর্ঘ হতে পারেনি। তার একটি সুনিশ্চিত কারণ এই যে, এই পত্র-পত্রিকাসমূহের পিছনে কোনো সুনিশ্চিত সুগঠিত আর্থিক ও সামাজিক সহযোগিতা এবং সহায়তা ছিলনা। তাছাড়া আর একটি কথা ভুলে গেলে চলবেনা, পাকিস্তান-সরকার সবসময় সুস্থ পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা নিরুৎসাহিত করতো। আরও একটি বিষয় পাশাপাশি লক্ষ্য করার মতো—১৯৫২ সনের পর ভাষা-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হামিদুল হক চৌধুরী সম্পাদিত ইংরেজী দৈনিক 'পাকিস্তান অবজারভার' পূর্ব-পাকিস্তানের দাবি-দাওয়া তুলে ধরার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে থাকে। পত্রিকাটি এই সরকার-বিরোধী ভূমিকার জন্য একাধিকবার সরকারী-কোপানলে পড়ে। আশ্চর্য ব্যাপার, যেই পত্রিকাগোষ্ঠী জাতীয় দাবি দাওয়া জনসমক্ষে উত্থাপন করে আসছিলো, সেই পত্রিকাগোষ্ঠী প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে 'চিত্রালী' নামে একটি সাপ্তাহিক সিনেমা পত্রিকা প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, সেই সময়ে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে একটিও চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়নি। বিকাশমান মধ্যশ্রেণীর বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে গণরুচি দোষণের এমন কারখানা তৈরী করার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বোধ করি অধিক নেই।

অবজারভার এর পরে সঙ্গত কারণেই 'ইত্তেফাক' পত্রিকাটির কথা আসবে। সবাই জানেন, পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতির বিশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে ইত্তেফাক পত্রিকার জন্ম। ভাষা-আন্দোলনের শহীদদের রক্তের অঙ্গীকার এই পত্রিকাটি বহন করেছিল। শুরুতে মজলুম গণনায়ক মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০- ১৯৭৬) ছিলেন এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। পত্রিকার শিরোভাগে মওলানা সাহেবের নাম শোভা পেত। আওয়ামী লীগের রাজনীতিকে জনপ্রিয় করার ব্যাপারে এই পত্রিকাটি অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করে। একটা সময়ে ইত্তেফাক, শেখ মুজিব (১৯১৭-১৯৭৫) এবং বাংলাদেশের স্বায়ত্বশাসন তথা স্বাধীনতা সমসূত্রে এসে দাঁড়িয়েছিল। জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশে তথাকথিত নির্ভীক সাংবাদিক মরহুম তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া যে ভূমিকা গ্রহণ করলেন, তা অবজারভার পত্রিকার মালিক হামিদুল হক চৌধুরীর থেকে ভিন্ন নয়। তিনিও 'পূর্বাণী' নামে অধিকতর রঙচঙে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। এরপর এরকম আর দশটি সাপ্তাহিক সিনেমা পত্রিকা বাজারে প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে, কিন্তু একটিও রুচি-স্নিগ্ধ সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। এ থেকেই প্রমানিত হবে, তৎকালীন ধনবান শ্রেণী, যাঁরা জনমত গঠন করছিলেন, তাঁদের সংস্কৃতি-চিন্তার স্বরূপ কেমন ছিল।[৮০]

আর একজন লেখক-এর ভাষ্য অনুযায়ী : পাকিস্তানকে দীর্ঘায়ু করার বিকৃত প্রচেষ্টায় সহযোগী ছিলেন কিছু সংখ্যক বাঙালি বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধিজীবীদের কেনে নেয়ার ধূর্ত কৌশল রূপে সরকারী তথ্য বিভাগ জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, পাকিস্তান কাউন্সিল, নজরুল একাডেমী ও আরও অনেক সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকার লেখকদেরকে বিপথগামী করার জন্য প্রচুর অর্থ প্রদান করেছে.. "একটি শ্রেণী হিসেবে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর শেষ পর্যন্ত কোন

Dhaka University Institutional Repository

পারস্পর্যশীল ভূমিকা ছিলনা। বিশেষভাবে আইউব শাসনামলে, বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর যে অংশ আগাগোড়াই নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য পাকিস্তানবাদী চক্রের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে তাদের ছাড়াও অপর অংশটিও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। পূর্ববাঙলার বুদ্ধিজীবীদের বিপথগামী করার জন্য পাকিস্তানবাদী চক্রের অপকৌশলের কোন অন্ত ছিলনা। বেতার, টেলিভিশন, সরকারী পত্র-পত্রিকা এবং তথ্য ও প্রচার বিভাগ প্রভৃতিকে সরকার ব্যবহার করেছে নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসেবে। ব্যবসায়ীরা ও সরকার সাহিত্য পুরস্কারের যে ব্যবস্থা করেছিল, তার পশ্চাতেও কোন সৎ উদ্দেশ্য ছিল না এমনকি একান্তভাবে ভাষা-আন্দোলনেরই ফলে সৃষ্ট বাংলা একাডেমী যা পুরোপুরি সরকারী প্রতিষ্ঠান বলে পরিচিত নয়— তাকেও সরকার আশ্চর্য কৌশলে ব্যবহার করেছে স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে। বাংলা একাডেমীর পরিচালককে দিয়ে কখনও কখনও সরকার রবীন্দ্র-বিরোধী আন্দোলন করিয়েছে, বাংলা বর্ণমালা সংস্কার-ষড়যন্ত্রে ব্যবহার করেছে." সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের মাধ্যম হিসেবে বাংলা একাডেমী, পাকিস্তান কাউন্সিল, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, নজরুল একাডেমী প্রভৃতি অন্যান্য সরকারী, আধা-সরকারী ও সরকারী সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠানকে একাজে ব্যবহার করা হয়েছে সম্পূর্ণ নগ্ন, নির্লজ্জ ও উলঙ্গভাবে। পাকিস্তান বাঁধা ছিল সাম্রাজ্যবাদী গাঁট ছড়ায়। মার্কিনী ও পাকিস্তানী যোগসাজসে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে নানা উৎকোচ, হলিউডী চলচ্চিত্র ও যৌনবিকৃতির উপাচার পাঠিয়ে চিন্তাবিদ ও তরুণ সমাজকে সাধারণভাবে বিপথগামী করতে চেয়েছে। কিন্তু শুভবাদী বুদ্ধিজীবীরা ও তরুণ ছাত্রসমাজকে সহজে বিভ্রান্ত করা যায়নি ..... পাকিস্তানের কোন লাভ হয়নি বরং পূর্ববাঙলায় এর জন্য আন্দোলন তীব্র হয়েছে— পাকিস্তান অধিকতর স্বল্পায়ু হয়েছে। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনও গড়ে উঠেছে। সমস্ত আঘাতই লেগেছিল 'পাকিস্তানের উপনিবেশবাদী সরকারের মসনদের গোড়ায়'।[৮১]

১. ৮ .ঘ. আলোচ্য কালে পূর্ব বাংলায় সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যে নানা মাত্রাযোগ ও বিবর্তন-ধারা লক্ষ্য করা যায়, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পজগতে তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। সমকালের অকপট চিত্র বিধৃত হয় সাময়িকপত্রে। একালের সাময়িক-সাহিত্যপত্রই তাই পাকিস্তানীযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান দর্পন।

বিভাগ পরবর্তীকালে সাংস্কৃতিক ঘটনাক্রম ও পরিস্থিতি বিপর্যয়ের দরুন দ্রুত বিকশিত হয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবোধ। পাকিস্তানি জাতীয়তাবোধের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবোধের আত্মপ্রকাশের ক্রম-বিবর্তন-ধারা একশ্রেণীর সাহিত্য পত্রিকার পাতা মেললেই স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। আরও দেখা যায় "ধর্মীয় জীবনদৃষ্টির নিগড় ভেঙে মাথা তুলেছে যুক্তি অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনদৃষ্টি, পরকালের দিক থেকে মানুষ দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছে ইহকালের দিকে, আর শ্রেণী-নিরপেক্ষ মানবিকতাবাদী মতবাদের বিপরীতে শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদের প্রসার ঘটেছে।"[৮২] এইসব মতবাদ প্রসারের নেপথ্যে কাজ করেছে একশ্রেণীর প্রগতিশীল তরুণ সাহিত্যশিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীদের কর্মকাণ্ডগুলো। মুখপত্র ছিল কিছু পত্র-পত্রিকা। সেসবের মধ্যে ছোট, ক্ষুদ্র অনিয়মিত সংকলনই বেশী; কিছু নিয়মিত পত্রিকায় এঁদের দলের কেউ কেউ সাহিত্য-মর্যাদা পেতে পারে এমন লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন তাঁদের চিন্তাধারা। অধিকাংশই ছিল পাকিস্তানবাদী। তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্যের উপর গুরুত্ব দেন। তাদের বিশ্বাস হলো ঃ পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল 'ইসলামের ভিত্তিতে সমাজ-ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যস্ত করার প্রয়োজনে।' এঁদের রচিত প্রবন্ধ ও গদ্য রচনাগুলোর মূল্য, গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনাকালে একজন গবেষক যে মন্তব্য করেছিলেন— সেখানে সাময়িক বা সাহিত্য পত্রিকার ভূমিকা হুবহু এক ধরে নিয়ে বলা যায় ; এই কালে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকাগুলোর "গা থেকে প্রকাশ কালের চিহ্ন মুছে দিয়ে যদি আমরা ভাবীকালের কাছে পাঠিয়ে দিই তাহলে ঐ কালের সমাজবিজ্ঞানীর পক্ষে চিনে নিতে কষ্ট হবে না যে এরা (লিখিত ও) প্রকাশিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরবর্তীযুগে। তিনি বলে দিতে পারবেন যে, সেই সময়টায় নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে উঠেছিল .... তার মনে জিজ্ঞাসা ছিল বেশ কিছু বিষয়ে। তার ভারি মুস্কিল হয়েছিল আত্মপরিচয় নিয়ে। সে জানত যে গৌরব করার মত বড় একটা ঐতিহ্য তার আছে, কিন্তু নিশ্চিত জানতনা যে কোনটা সেই ঐতিহ্য ঃ বর্জন ও গ্রহণের বিচিত্র তরঙ্গে তার চিত্ত দোদুল্যমান থাকত। সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুযোগ ছিল দেশ ভ্রমণের, অবকাশ ছিল স্মৃতি মন্থনের। তার সমাজে বিজ্ঞান আসছিল ধীরে ধীরে। আর দেশের সাধারণ মানুষ কি করত, কোন কোন দ্বন্দ্ব ও সংকটে তারা পীড়িত ছিল তার একটা ছায়া মধ্যবিত্তদের এইসব লেখায় যদিবা পড়েছে বলে মনে হয় তবু সেটা ছায়াই। ভাবীকালের সেই সমাজ বিজ্ঞানী হয়তো আরও বলবেন যে, সাধারণ মানুষের দুর্দশার ছবি তৎকালীন সংবাদপত্রে পাওয়া যায় ; আর সংবাদপত্রের চিত্রকে নির্ভরযোগ্য মনে করলে তারা হয়ত এও বলতে বাধ্য হবেন যে ১৯৪৭-৬৮ (১৯৭১ ধরে নিলেও ক্ষতি নেই) এর সেই নব্য মধ্যবিত্তদের ব্যস্ত চিন্তা ও উৎসাহিত কল্পনা জন-জীবনের বিপুলাংশকে মোটেই স্পর্শ করেনি।"[৮৩]

তথ্যপঞ্জি :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, কলকাতা ১৩৮৪, পৃ ৩৪৩

২ চার্লস-অগাস্টিন সাঁতবভ, 'ক্লাসিক কি' (What is a Classic?) অনুবাদক : আবুল কাসেম ফজলুল হক, নবযুগের প্রত্যাশায়, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ ৫৫

৩ আবুল কাসেম ফজলুল হক, 'বাঙলাদেশের প্রবন্ধ ও গবেষণা : কয়েকটি প্রসঙ্গ কিছু মন্তব্য', বাঙলাদেশের প্রবন্ধ, সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ঢাকা (প্রকাশের তারিখ নেই) পৃ ৪৬-৪৭

৪. লোকায়তর মুখপত্র, লোকায়ত, ঢাকা ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮২

৫. সংজ্ঞাগুলো নেয়া হয়েছে 1. The world book dictionery, vol-2, P-1551; 2. Webster's Third New International dictonary and seven Language dictionery, (1981) Vol-II, P-1680; 3. The world book encyclopedia, Vol-13, P--43; 4. Encycllopaidia

Dhaka University Institutional Repository

Britannica, Vol-17, (1963) P-512-513; 5. Encyclopaedic : Dictionary of library and information science, VOL-3 (India 1989) P-862 থেকে

৬. The World Book encyclopedia, VOL-13, P 43

৭. পূর্বোক্ত

৮. জে. এ. ব্রডাস ও জর্জ হর্ণের উক্তি, উদ্ধৃত করেছেন তারাপদ পাল, ভারতের সংবাদপত্র, কলকাতা ১৯৭২, পৃ ১

৯. তারাপদ পাল, পূর্বোক্ত, পৃ ২২৩

১০. হরিপদ ভৌমিক সংকলিত ও সম্পাদিত সেকালের সংবাদপত্রে কলকাতা (২য় খণ্ড) ১৯৮৮, ডঃ অতুল সুর লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য

১১. তারাপদ পাল, পূর্বোক্ত, পৃ ৮। তাছাড়া দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকা প্রকাশের তারিখ গুলো 'ভারতের সংবাদপত্র' গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট ঘ'এর ঘটনাপঞ্জি নির্ভর করে লেখা হয়েছে।

১২. সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলার নবজাগরণে উইলিয়াম কেরী ও তাঁর পরিজন, কলকাতা ১৯৭৪, পৃ ১১৫

১৩ ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কলকাতা ১৯৮২, পৃ ১৯৭

১৪. সোমেন্দ্রনাথ বসু, 'জোশুয়া মার্সম্যান' , বিদেশী ভারত সাধক, কলকাতা ১৩৬৮, পৃ ১১৭

১৫. হরিপদ ভৌমিক, সেকালের সংবাদপত্রে কলকাতা, ১ম খণ্ড, পৃ ১৪

১৬. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ ১৮

১৭. ভূদেব চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ ২০১

১৮. কেদারনাথ মজুমদার, সাময়িক সাহিত্য, ময়মনসিংহ ১৩২৪/১৯১৭, পৃ ২৪০

১৯. ভবতোষ দত্ত, উনবিংশ শতাব্দীর সম্পাদক ও সাহিত্যপত্র, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৭, পৃ ২৭

২০. বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, কলকাতা ১৯৬২, পৃ ৪২-৪৩

২১. পূর্বোক্ত

২২. বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (প্যাপিরাস সংস্করণ) ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা ১৯৮০, পৃ ২৪

২৩. নরহরি কবিরাজ, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভূমিকা'; উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ : তর্ক-বিতর্ক ; সম্পাদনা : নরহরি কবিরাজ, কলকাতা ১৯৮৪, পৃ ৬৭

২৪. নেপাল মজুমদার, ভারতের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (১ম খণ্ড) কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ ২১

২৫. কেদারনাথ মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ ২৭৮-৭৯

২৬. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্র, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৭ পৃ ৭৯

২৭. ভবতোষ দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ ২৮

২৮. শশীভূষণ দাশগুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের একদিক, কলকাতা ১৯৬০, ৩য় সংস্করণ, পৃ ১১৩

২৯. নরহরি কবিরাজ, 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর ও আধুনিক চিন্তা ; পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৪০

৩০. ভবতোষ দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ ২৯

৩১. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ ২০৬-১৪

৩২. বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৩১। এইসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য শ্রী সুশীলকুমার গুপ্ত প্রণীত 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ' (কলকাতা ১৯৫৯) ; এবং হরিপদ ভৌমিক প্রণীত 'সেকালের সংবাদপত্রে কলকাতা', ১ম খণ্ড, পৃ ১৪

৩৩. ভবতোষ দত্ত, পূর্বোক্ত

৩৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গ-দর্শনের পত্র-সূচনা ; বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ১৩৯২ (৯ম মুদ্রণ) পৃ ২৮৩

৩৫. পূর্বোক্ত

৩৬. সুনীল দাস, ভারতী : ইতিহাস ও রচনাপঞ্জি, কলকাতা ১৯৮৪, পৃ ১

৩৭. ভবতোষ দত্ত, পূর্বোক্ত

৩৮. অজিত কুমার ঘোষ, বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, কলকাতা ১৯৬৮, পৃ ৪১১-২৫

৩৯. প্রমথ চৌধুরী, 'যৌবনে দাও রাজটীকা', প্রবন্ধ-সংগ্রহ, কলকাতা, ১৯৬৮, (পুনর্মুদ্রণ ১৯৯০) পৃ ৪৫৭

৪০. অজিত কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত

৪১. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, প্রমথ চৌধুরী, (৪র্থ সংস্করণ) কলকাতা ১৯৮৬, পৃ ৯

৪২ অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়,বীরবল ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা (৩য় সং) পৃ ২০

৪৩ জীবেন্দ্র সিংহ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ ১১

৪৪ পূর্বোক্ত, কল্লোলের কাল, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ ২৩, ১১৪

Dhaka University Institutional Repository

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ ১১৫-৫৬

৪৬. কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ, কলকাতা, ১৯৫৬, পৃ ১৯৬

৪৭. আবদুল হক, সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ, ঢাকা ১৯৭৬, পৃ ১২৩, ১২৭

৪৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী, কলকাতা ১৩৫৭

৪৯. অমলেন্দু বসু (ভূমিকা), সুনীল দাস সম্পাদিত 'জয়শ্রী সুবর্ণ জয়ন্তীগ্রন্থ ১৯৮৩' কলকাতা ১৩৯০

৫০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, কলকাতা, ১৩৩৯ (১মখণ্ড) ভূমিকা দ্রষ্টব্য

৫১. আশু চট্টোপাধ্যায়, কল্লোল যুগের পরে, কলকাতা ১৯৯৩, পৃ ১১-১২

৫২. প্রমথনাথ বিশী, বাংলার লেখক (প্রথম খণ্ড) কলকাতা ১৩৫৭, পৃ ৭৬

৫৩. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, প্রমথ চৌধুরী, কলকাতা ১৯৮৬, পৃ ৬

৫৪. বুদ্ধদেব বসুর উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন জীবেন্দ্র সিংহ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ ১৫

৫৫. প্রমথনাথ বিশী, পূর্বোক্ত

৫৬. শশীভূষণ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত

৫৭. ভবতোষ দত্ত, পূর্বোক্ত

৫৮. পূর্বোক্ত

৫৯. প্রমথনাথ বিশী, পূর্বোক্ত

৬০. শশীভূষণ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ ৫৩

৬১. ১.৫ অনুচ্ছেদে সাময়িকপত্র ও সাহিত্যপত্রিকা নিয়ে কাজের (গবেষণার) পরিচয় বা তালিকাটি তৈরী করতে গিয়ে — কোন্ পদ্ধতিতে করা হবে — এ নিয়ে ভাবনায় পড়তে হয়। বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে সাজাতে গেলে আদিকর্মগুলো যেমন কেদারনাথ ব্রজেন্দ্রনাথ ও বিনয় ঘোষের নাম অনেক পরে চলে যায়। বিষয় অনুসারে করতে গেলেও সূক্ষ্ম বিভাজন সম্ভব নয়। এ কারণে মোটামুটিভাবে প্রথম দিককার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলোর নাম আগে উল্লেখ করে অতপর প্রাপ্তব্য বই ও লেখকের নাম সাজিয়ে দেয়া হয়েছে।

৬২. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, আনিসুজ্জামান, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুনতাসির মামুন এবং মোহাম্মদ আবদুল কাইউম দ্রষ্টব্য ।

৬৩. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম; ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লা সম্পাদিত পাক্ষিক 'তকবীর' কে (তিনি লিখেছেন 'তরবারী' কিন্তু শামসুল হকে আছে 'তকবীর'। 'তকবীরই' মনে হয় ঠিক) 'আজাদী যুগের প্রথম সাময়িকপত্র' বলে উল্লেখ করেছেন (দ্বিতীয় সংখ্যার প্রকাশকাল ২৪ শে অক্টোবর ১৯৪৭, বাংলা ৬ই কার্তিক ১৩৫৪)। এর পরে তিনি উল্লেখ করেছেন চট্টগ্রামের 'সীমান্ত' পত্রিকার কথা। তিনি মন্তব্য করেছেন ঃ "আশ্চর্যের বিষয় আজাদী লাভের পর প্রথম বছরে ঢাকা থেকে কোন পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু এসময়ে মফস্বল থেকে কয়েকটি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়।" প্রাপ্ত তথ্য উপর্যুক্ত বর্ণনার বিপরীত। 'চাবুক' (১৯৩৩) সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশের পর বিরতিহীনভাবে ঢাকা (৫২ জনসন রোড, সম্পাদক : শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র সাহা) থেকে প্রকাশিত হয়। 'চাবুক' এর ১৫ বর্ষ ৪৯ ও ৫০ সংখ্যা (অর্ধ-সাপ্তাহিক হয়েছিল শেষের দিকে) ৮ ও ১১ নভেম্বর ১৯৪৭ সনে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার শিরোনাম এর নীচে লেখা ছিল— 'পূর্ববঙ্গের জাতীয়তাবাদী অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক'। কার্তিক ১৩৫৪ তেই 'কৃষ্টি' (১৯৪৭ সনের অক্টোবর) নামের প্রখ্যাত মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ঢাকার নারায়ণগঞ্জ থেকে

৬৪. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, পূর্ব-পাকিস্তানের সাময়িকপত্র, আমাদের সাহিত্য, ঢাকা ১৯৬৯ পৃ ২৫৬-৫৭

৬৫ শামসুল হক, বাংলা সাময়িকপত্র (১৯৪৭-৭১) ; ঢাকা ১৯৭৩। লেখক লিখেছেন ঃ "এ-গ্রন্থে ৫০০ খানি পত্রিকার আলোচনা আছে। যেসব পত্রিকা একই নামে সাপ্তাহিক থেকে মাসিকে, পাক্ষিক থেকে সাপ্তাহিকে বা মাসিক থেকে পাক্ষিকে পরিবর্তিত হয়েছে— এজাতীয় পত্রিকাকে পৃথক পৃথক ধরে এ-হিসেবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।" অর্থাৎ একাধিকবার উল্লেখিত হয়েছে কোনো কোনো পত্রিকা। ৪৭-৭১ সময়কালে প্রকাশিত সকল দৈনিক, সাপ্তাহিক, সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন দপ্তরের, বিদেশী দূতাবাসের বিভিন্ন মুখপত্রের এবং প্রতিটি প্রশাসনিক ইউনিট থেকে মৌলিকগণতন্ত্রীদের মুখপত্র অন্তর্ভুক্ত করার পরও মাত্র ৪৭৬ টি পত্রিকার নাম শামসুল হকের বইয়ে পাওয়া যায়। তিনি এই তালিকা প্রণয়নের জন্য বিজ্ঞাপন, বিভিন্ন লেখকের রচনা এবং লোকশ্রুতি ব্যবহার করে তালিকা লম্বা করেছেন। সমস্ত পত্রিকা সংরক্ষিত নেই কোন গ্রন্থাগারে। আবার কোনো পত্রিকা থাকলেও সকল সংখ্যা পাওয়া যায়না। 'সমকালে'র মতো একটি দুটি পত্রিকার উদাহরণ এখানে গণনীয় নয়। এ-বইয়ে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রকাশিত পত্রিকার নামও আছে। তালিকা দীর্ঘ হবার কারণ সেটাও একটা। কিন্তু তালিকা বড় হলেও উন্নতমানের পত্রিকা পাকিস্তান থেকে বেশি প্রকাশিত হয়নি।

৬৬. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, পূর্বোক্ত, পৃ ২৬০-৬১

৬৭. মুহম্মদ জাহাঙ্গীর, বাংলাদেশে সাংবাদিকতা, ঢাকা ১৯৮৭, পৃ ৯

৬৮. উদ্ধৃতি, কায়সুল হক ; 'সবার পত্রিকা'র সম্পাদকীয়। দ্রষ্টব্য 'বাংলা সাময়িকপত্র (১৯৪৭-৭১)', পৃ ৯৮

৬৯. দ্রষ্টব্য, বাংলা সাময়িকপত্র, ১৯৬০ সনের পত্রিকার তালিকা অংশ

৭০. পূর্বোক্ত, পৃ ৯৮

৭১. পূর্বোক্ত, পৃ ১৪৮

৭২. পৃথিবী, সম্পাদক : মোজাম্মেল ইসলাম, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৬৯ (সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য)। এই পত্রিকার উপদেষ্টা-পরিষদে ছিলেন মুহম্মদ বরকতউল্লাহ, মৌলভী ফরিদ আহমদ, মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, অধ্যক্ষ এ. এ. রেজাউল করিম চৌধুরী প্রমুখ। পরে এই পত্রিকা ঢাকার

Dhaka University Institutional Repository

'ইসলামিক রিসার্চ একাডেমীর মুখপত্র' রূপে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক হন আবদুল মান্নান তালিব।

৭৩. শামসুল হক, বাংলা সাময়িকপত্র, পৃ ২৪৪

৭৪. পূর্বোক্ত, পৃ ১৬৬-৬৭

৭৫. পূর্বোক্ত, পৃ ২৪৪

৭৬ মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম সম্পাদিত 'পূবালী' পত্রিকার নামে এটি প্রকাশ করেন পাকিস্তান জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা। কেনো এই নাম ব্যবহার করতেন তার অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়না: মুদ্রিত হতো কনসেপ্ট প্রিন্টার্স, ২৫ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-২ থেকে। পৃ ৭৫। দাম ঃ ৫০ পয়সা। দেখুন শামসুল হক, পৃ ২৪৬

৭৭ রফিকুল ইসলাম, পূর্ব পাকিস্তানের সাময়িকপত্র (আলোচনা) ;আমাদের সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৯, পৃ ২৬২-৬৩

৭৮. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ ২৬৪

৭৯. মুজীবুর রহমান খাঁ, সভাপতির অভিভাষণ, পূর্বোক্ত, পৃ ২৬৫-৬৬

৮০. আহমদ ছফার সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৩০-০৭-১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ

৮১. আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুক্তি সংগ্রাম, ঢাকা ১৯৭২ পৃ ২৬

৮২ পূর্বোক্ত, বাংলাদেশের প্রবন্ধ ও গবেষণা (প্রবন্ধ), বাংলাদেশের প্রবন্ধ (তারিখবিহীন), সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ ৫৪ – ৫৫

৮৩. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর, ১৯৬৮ সনে বাংলা একাডেমী আয়োজিত সেমিনারে পঠিত 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রবন্ধ সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধটি 'আমাদের সাহিত্য' (বা/এ, ঢাকা ১৯৬৯, পৃ ৯১ – ১১৬) গ্রন্থে মুদ্রিত হয়। উপর্যুক্ত প্রবন্ধটিই 'বাংলাদেশের প্রবন্ধ' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। সূত্রের জন্য দেখুন বাংলাদেশের প্রবন্ধ, পৃ ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাকিস্তান-কালের পূর্ব বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক পটভূমি

২. ১. পলাশীর পাপের ফল: সামাজিক অবস্থার রূপান্তর ও ভারত-বিভক্তির সম্ভাবনা; বৃটিশ ভারতের গণবিদ্রোহ; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজনিত সামাজিক পরিবর্তন ও সাহিত্য সংস্কৃতিতে মধ্যশ্রেণীর প্রাধান্য; হিন্দু জাগরণের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় মুসলিম নবজাগরণ; মুসলিম-লীগের প্রভাব; ভারত বিভক্তি ও স্বাধীনতার রুদ্ধপুলকের ফুটন্ত আবেগের পথরোধ; মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল; সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা; উদ্বাস্তু ও মোহাজের সমস্যা; কৃষি ও কৃষক এবং পাটচাষীদের দুর্ভোগ; আর্থিক অবস্থার অবনয়ন; পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় মুসলিম নেতাদের অন্ধ-অনুসারীদের তৎপরতা; বাঙালী জাতীয়চেতনা ধ্বংসের পায়তারা;

২.১ পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭) পরিণতিতে এ-উপমহাদেশের হাজার বছরের অতীত সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবন-পদ্ধতির পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়। স-সহচর ক্লাইভ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক যে-সমস্ত ব্যবস্থার প্রচলন করেন,— তাতে এদেশের সাধারণ মানুষের মনে ও মননে, সমাজ ও জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। সমাজ-ব্যবস্থা ও চিন্তাচেতনা থেকে মধ্যযুগের লক্ষণগুলো অপসৃত হয়ে আধুনিকতার আভাস দ্রুত ফুটে উঠতে থাকে। কিন্তু 'পলাশীর পাপে' ১৯৪৭ সন পর্যন্ত বাঙালির জীবনে ও সমাজে আধুনিকতা 'সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে' পারেনি।[১] পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব-পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্য সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক রচনার মর্ম অনুধাবন করতে গেলে তাই অব্যবহিত পূর্বকালের সামাজিক -রাজনৈতিক ভাব-বিপর্যয়ের অভিনব রূপান্তরের কাহিনী বিস্মৃত হওয়া চলেনা। সাহিত্য সমাজেরই সৃষ্টি। বর্তমান কালকে বোঝার জন্য পুরাতনের স্মরণ আবশ্যক।

তাছাড়া আধুনিক কালে, বিশেষত বিংশ শতাব্দী জুড়ে যে সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে, তার একটি বড় অংশের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রাদর্শের পরিবর্তন।[২] যুগে-যুগে কালে কালে গণমানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনার্থে সংঘটিত নানা বিপ্লবী কর্মকাণ্ড, যুদ্ধ-সংঘর্ষ ও প্রতিরোধ-আন্দোলন বিপ্লবী গণসাহিত্য সৃষ্টির পটভূমি ও প্রেরণার সৃষ্টি করেছে। আধুনিকতম বাঙলা সাহিত্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকালে সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের বিকাশ ও বিবর্তনের ইতিহাসও তাই সূত্রাকারে মনে রাখা দরকার। দেখা যায় "পৃথিবীর অন্য বহু দেশের মত ভারতবর্ষের গণ-বিদ্রোহের ইতিহাসও অতি দীর্ঘ। শোষণ উৎপীড়ন থেকেই এই বিদ্রোহের সৃষ্টি। কিন্তু ভারতবর্ষে বিদেশী ইংরেজ শাসনের অতি নিষ্ঠুর, বর্বর-সুলভ শোষণ উৎপীড়নের ফলে ভারতের গণবিদ্রোহ সংখ্যায় ও ব্যাপকতায় অন্য বহু দেশকেই ছাড়িয়ে গেছে। এই সব গণ-বিদ্রোহ নিয়েই গড়ে উঠেছে বিদ্রোহী ভারতের দীর্ঘ ইতিহাস।"

আধুনিক কালের বিদ্রোহী ভারতের ইতিহাসের আরম্ভ বাংলা ও বিহারের 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' (১৭৬৩-১৮০০) থেকে। এরপর সারা ভারতে অসংখ্য কৃষক-বিদ্রোহ, এবং ১৮৫৭-৫৮-র 'মহাবিদ্রোহ' (বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মিলিত) ইংরেজ শাসনের ভিত্তিমূল পর্যন্ত ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। ১৮৮৫ ও ১৮৯৮ সন থেকে আরম্ভ হয় ভারতের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি এবং বিপ্লবী সশস্ত্র বিদ্রোহ। চলে ১৯৪৭ পর্যন্ত। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে আরম্ভ হয় ভারতে শ্রমিক-শ্রেণীর বিদ্রোহ। ১৯২৮ বা ১৯৩০ থেকে আরম্ভ হয় ভারতের পাঁচশত দেশীয় রাজ্যের সর্বশ্রেণীর প্রজা বিদ্রোহ। স্বাধীনতার (১৯৪৭) পরেও গণ-বিদ্রোহের ঝড় দুর্বার গতিতে বেড়ে চলেছে। পাক-ভারত উপমহাদেশের গণ-বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেছে আদিবাসী কৃষক, সর্বনিম্নস্তরের অগণিত অস্পৃশ্য, শ্রমিক, দিনমজুর, স্বল্পবেতনের কর্মচারী এবং বিত্তহীন সকল শ্রেণীর জনগণ।[৩] ৭১-এর স্বাধীনতা লাভের পরে আজও জনগণ অর্থনৈতিক শোষণ উৎপীড়নের কবল থেকে 'মুক্তি'কে ছিনিয়ে আনতে পারেনি।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবলী ঘটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে যোগ হয় নানা মাত্রা, নতুন নতুন উপাদান। সাহিত্য সৃষ্টি করে ভবিষ্যতের নানা ঘটনা আন্দোলন ও বিস্ফোরণ। ফলে সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি এবং চিন্তার জগতে নতুন নতুন উপাদান জড় হয়। প্রগতির সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার ওৎপ্রোত সম্পর্ক। প্রগতি-বিরোধী সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাবধারার সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও সাহিত্য-চিন্তা সমাজ-সম্পর্কের মধ্যেই উন্মেষ লাভ করে।

ইংরেজ শাসনের পত্তনের ফলে সমাজ-ব্যবস্থার রূপান্তর সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে ১৭৯৩ সনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত জমিদারী ব্যবস্থা। গোটা ঔপনিবেশিক শাসনামলে বলবৎ এই ভূমি ব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট সংকট মোকাবিলা করার জন্য অসংখ্য প্রতিরোধ সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছে। বৃটিশ শাসনোত্তর পাকিস্তানী আমলেও জমিদাবদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও আন্দোলন অব্যাহত ছিল। জমিদারী প্রথার বিলুপ্তি ঘটে পাকিস্তান সৃষ্টির পর, ১৯৫০ সনে। উনিশ শতকে বাংলাদেশে যে নতুন জমিদার শ্রেণী গড়ে ওঠে তাঁরাই শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি সাহিত্য ও চিন্তার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকায় অবস্থিতি লাভ করেন। ফলে বাঙলা সাহিত্যে মধ্যশ্রেণীর জীবন ভাবনাই প্রধানত মূর্ত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসকদেরকে দীর্ঘকাল ধরে এঁরাই

Dhaka University Institutional Repository

সহযোগিতা করে পরাধীনতাকে দীর্ঘতর করেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রধান স্রষ্টা মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র সকলেই মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানসন্ততি। ইংরেজ ও ঔপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে তাঁদের ও অন্যান্য পরিবারের পারিবারিক ও ব্যবসায়িক লেনদেনের গভীর সম্পর্ক ছিল। পাকিস্তান আমলের বাঙলা সাহিত্যের যাঁরা প্রধান কারিগর শিল্পী-তাঁদেরও ছিল এই 'মধ্যবিত্ত চারিত্র'। সামাজিক রাজনৈতিকভাবে জনগণের স্বার্থের দিকে না-তাকিয়ে তাঁরাও পাকিস্তান সরকারের কৃপা লাভের জন্য চিন্তা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করেছেন।

হিন্দু-জাগরণের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ায় মুসলমান সমাজের নেতাদের মধ্যেও সমাজ-প্রগতির চেতনা জাগ্রত হয়। নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখের সাংগঠনিক কর্মতৎপরতায় মুসলিম-জীবনে যে চেতনাবোধের সঞ্চার হয়, তারই ফল ১৯০৬ সনের 'মুসলিম লীগ'। লীগ-কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক এমন উষ্ণ ও উগ্র হয়ে ওঠে যে ভারত বিভাগ অনিবার্য হয়ে ওঠে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলেই এদেশের রাজনীতিতে পেশী ও পশু-শক্তির উদ্ভব। ভারতবর্ষে কালে কালে যতোগুলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়েছে পশু-শক্তির অনুশীলন ততো নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ সনের মধ্যে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে মুসলিম ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছিল। ভারতের মুসলমানগণ পাকিস্তান চায় কিনা তা নির্ণয় করার জন্য ১৯৪৬ সনে ভারতবর্ষে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪ সনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের সময় বাংলাদেশে মুসলিম লীগের যেরকম ভরাডুবি ঘটেছিল, ১৯৪৬ সনের নির্বাচনে মুসলিম লীগ-বিরোধী মুসলমানদের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিরও সে দশা হয়েছিল। 'মুসলিম লীগ অর্থাৎ পাকিস্তান আন্দোলনের বিরুদ্ধে যদি কোন মুসলমান ক্ষীণ প্রতিবাদও করতো তবে তার আর রক্ষা ছিল না।'[৪] পাকিস্তান দাবির জন্য হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা যে ভ্রাতৃঘাতী নৃশংসতার জন্ম দেয় তার তুলনা ইতিহাসে বিরল। এর প্রকোপ ১৯৪৭ সনে কমে গেলেও লোকবিনিময়-নীতির সূত্রে সংখ্যালঘুদের বিতাড়নের নতুন উপায়ও পাওয়া গিয়েছিল। সংখ্যাগুরুরা (সংখ্যালঘুদের উপর) নানা অত্যাচার শুরু করলেন। ফলে ভারত-বিভক্তির পরও দুদেশের হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের উন্নতি ঘটলো না। 'স্বাধীনতা' বা 'আজাদী' লাভের ইচ্ছার মূলে ছিল মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক মুক্তির প্রেরণা। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরেও কোনো ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনাই সূচিত হলোনা। পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিক ও আমলাদের শোষণের নতুন কৌশল প্রবর্তনের ফলে এদেশের জনগণের কাছে স্বাধীনতা-প্রাপ্তি প্রতিভাত হলো 'তথাকথিত আজাদী' বা 'অর্থহীন স্বাধীনতা' রূপে। ৮ নভেম্বর ১৯৪৭ সনে অর্ধ-সাপ্তাহিক 'চাবুক' (ঢাকা) এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয়েছিল ঃ "তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পর আমরা আশা করিয়াছিলাম এইবার মানুষের জন্য মানুষের সত্যিকার প্রীতির উৎসমুখ অন্ততঃ কিছুটা ভার মুক্ত হইবে। কিন্তু প্রাণের কোনও স্পন্দন — অনুভূত হয় নাই। .... দেশের নানাস্থানে পৈশাচিকতার তাণ্ডব (সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা) স্বাধীনতার প্রথম-প্রভাতে রুদ্ধ পুলকের ফুটন্ত আবেগের পথ রোধ করিয়াছে। এই অমানুষিক বর্বরতা জাতি গঠনের প্রথম প্রভাতটিকে মর্মান্তিক ব্যথায় ম্লান করিয়া তুলিয়াছে।" এই অবস্থাতে ভাগ্য-দেবতার নিষ্ঠুর অভিশাপ মাথা পেতে নেবার শক্তি ও সাহস সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্নরাই আপন অন্তরে সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন, কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন 'ভাগ্যাকাশে বন্ধনমুক্ত জ্যোতিস্মান ভবিষ্যতের সূচনা অবশ্যম্ভাবী।'[৫] মুসলিম লীগের নির্যাতনের ফলে সে আশাও মরীচীকায় পরিণত হয়।

'পাকিস্তান' প্রস্তাব উত্থাপনের পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ। আর এই বিরোধ মুসলিম মনে জাগ্রত হয়েছিল 'হিন্দু-জাগরণের' ও 'হিন্দু-রাজ্য গঠনের' জিগির থেকে। ফলে 'ধর্ম-মোহ' এদেশের মানুষের সৃষ্টি-ধর্মের সাধনায় ব্যর্থতার প্রতি-রূপে প্রকট হয়ে উঠলো। আমাদের দেশের প্রধান চিন্তাবিদ, নেতৃবর্গও এই 'ধর্ম-মোহ' বৃদ্ধিতে কার্যকর অবদান রেখেছেন। মহাত্মা গান্ধী, মহাকবি ইকবাল উন্নততর মানবতাবাদী হয়েও সকলকে স্বধর্মেনিষ্ঠ ধার্মিকরূপে গড়ে উঠতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এতে করে এইসব মনীষীরাই প্রকৃতপক্ষে ধর্মের নেশায় জনগণকে মোহান্ধ করে তুলেছিলেন। এই মোহান্ধতা থেকেই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে তাঁরা চিরস্থায়ী সমস্যারূপে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীরা ধর্মীয় মোহান্ধতা এবং পাকিস্তান প্রস্তাবকে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা দেখেছিলেন মহাকবি ইকবালের পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতবর্ষ বিভক্ত হলে মুসলমানেরা আর্থিক-ভাবে দুর্বল ও পঙ্গু হয়ে পড়বে। কারণ "মুসলমানদের ভাগে দেশের যে অংশ পড়বে তা সাধারণত অনুর্বর। অথচ দেশকে ভাগ যদি করতেই হয় তবে এ ভিন্ন অন্য কোন রকমের ভাগ অসম্ভব বলেই মনে হয়। বাংলা আর পাঞ্জাবকে বিশেষভাবে ইসলামী দেশে পরিণত করবার চেষ্টা শুধ যে বাঙ্গালী হিন্দু আর পাঞ্জাবী শিখের কাছ থেকে প্রবল বাধা পাবে তাই-ই নয়, সে চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হলেও অসার্থক হবে ভৌগলিক কারণে—পাঞ্জাব থেকে বাংলার দূরত্বের জন্যে।"[৬] কিন্তু তবুও কূচক্রীদের কারসাজিতে ভারত ও বঙ্গ-ভঙ্গ হলো (১৯৪৭)। কুচক্রীদলের মধ্যে অবাঙ্গালী রাজনৈতিক নেতা, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমূহের দালাল-এজেন্ট বুদ্ধিজীবী কায়েমীস্বার্থী পুঁজিপতি এবং বৃটিশ কূটনীতিকবৃন্দ প্রধান শক্তি হিসেবে সক্রিয় ছিলেন। কূচক্রী ও তাদের সহযোগিরা সফল হয়েছিলেন, কারণ বাঙালি মুসলমান ও হিন্দু নেতাদের মধ্যেও উপরিউক্ত চক্রান্তকারীদের সহায়ক সহযোগী ছিলেন, এবং ভারত বিভাগের কালে রাজনৈতিক কূটচালে তাঁরাই প্রধান ভূমিকা পালন করে ছিলেন। বিভিন্ন ধারার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানবতাবাদীদের ভূমিকা তখন বিশেষ প্রভাব বিস্তারকারী ছিলনা। এ. কে. ফজলুল হক, এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম প্রমুখ নেতৃবর্গ তখন নাজিম উদ্দীন ও আকরম খাঁ-পন্থীদের উপদলের এবং জিন্নাহ লিয়াকতপন্থী দ্বিজাতিতত্ত্বের অনুসারী কূটবুদ্ধি-প্রধান রাজনীতিকদের চালে ঘটনার আবর্তে অনেকটা 'ক্রীড়নক' হয়ে পড়েছিলেন। বাঙলা তাই জম্বু-কাশ্মির ও অপরাপর ছোটবড় সমস্যাজটিল অঞ্চল ও প্রদেশের মতোই নানা সমস্যাকে চিরজনমের মত আত্মস্থ করে ভাগ হয়েছিল। ফলে পূর্ব বাঙলার কৃষিপণ্য ও কৃষক-শ্রমিকের ধনে-সম্পদে গড়ে ওঠা কলকাতা ও সন্নিকটবর্তী কারখানাসমূহ রয়ে গেল ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিম বাঙলায় ; কিন্তু পাটচাষের উপযুক্ত জমি ও পাটচাষীরা রয়ে গেলেন পূর্ব বাঙলায়। শিল্পকারখানা বিশেষ করে পাট-উৎপাদনের প্রধান অংশ থেকে যায় পূর্ববঙ্গে। সমস্ত চটকল ছিল কলকাতা ও

Dhaka University Institutional Repository

শহরতলী অঞ্চলে। কাঁচা পাটের উৎপাদন ব্যবস্থা পূর্ববঙ্গে কিন্তু পাটকল এ অংশে ছিলনা। পরে নতুন করে গড়ে উঠলো খুলনা ও দৌলতপুরে।

পূর্ব বাঙলার সংস্কৃতিকর্মী, শিক্ষিতশ্রেণী, সাহিত্যকর্মী, চিন্তাবিদদের প্রধান সক্রিয় গোষ্ঠী (হিন্দুই অধিক) সাম্প্রদায়িক উগ্রতার জন্য 'উদ্বাস্তু' হলেন ভারতের। আর পূর্ব বাঙলায় 'মোহাজের' ভ্রাতারূপে বরণ করে নেয়া হল লক্ষ লক্ষ দরিদ্র অশিক্ষিত অবাঙালি মুসলমানদেরকে ; যারা অচিরেই বাঙালির অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিকাশের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক রূপে দাঁড়িয়ে গেল। তারা শত্রুতা শুরু করে যেদেশের ভাত-কাপড়ে তাদের জীবন বাঁচল, সেই দেশের মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির সঙ্গে। ফলে ঢাকা, এবং বিভিন্ন শহর-বন্দরে অবাঙ্গালী মুসলমানেরা স্থানীয় কুচক্রীদের সহায়তায় যেভাবে বাঙালী-উচ্ছেদে ব্রতী হলো, তাতে সমাজের অভ্যন্তরে এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। জোর করে হিন্দুদের বাড়ী দখল করায় এবং ভারতের মুসলমানরা অনুরূপ অত্যাচারের শিকার হয়ে পাকিস্তানে চলে আসায় জনজীবনে, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

বাঙলার ইতিহাসের যে-অধ্যায়ে ব্যাপক হারে বাস্তুত্যাগ ঘটেছিল, তা উভয় বাঙলার এক অতি দুঃসময়ের কাহিনী। হিন্দুর পাড়ায় মুসলমানের যাওয়ায় বিপদ ছিল ; আর মুসলমানবহুল অঞ্চলেও হিন্দুর গতিবিধি নিরাপদ ছিলনা। এই অবস্থায় দুই বাঙলার হিন্দু-মুসলমান 'উদ্বাস্তু' ও 'মোহাজের' হিসেবে দুর্ভোগের জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়। দুর্দশাগ্রস্ত লোকেদের পুনর্বাসনের অছিলায় দুদেশেই ব্যাপকভাবে জোর-জবরদস্তি বাড়ীঘর দখলের হিড়িক পড়ে যায়। দখলের প্রয়োজনে দরকার হয় দাঙ্গার। ১৯৪৭ সনে ঢাকায় জোর করে বাড়ী দখলের ঘটনা ঘটে সংখ্যাগুরুর সদস্যদের এমনকি প্রশাসনের নাকের ডগায়।[৭] ১৯৫০ সনে ভারত বর্ষের বিভিন্ন স্থানে মর্মান্তিক দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় ঢাকায় মারাত্মক দাঙ্গা আরম্ভ হয় ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ থেকে। মাসিক 'মাহেনও' পত্রিকায় সেই দাঙ্গা সম্পর্কে লেখা হয় ঃ মাগরেবি (পশ্চিম) বাংলায় সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সংখ্যালঘিষ্ট মুসলমানদের উপর যে অকথ্য ও অচিন্তনীয় জুলুম করা হয়েছে সে-সম্বন্ধে মাগরেবী বাঙ্গালার ব্যবস্থা-পরিষদের ৭ জন সদস্য নেহেরুর নিকট স্মারক লিপি দাখিল করেন। এটা প্রামান্য দলিল। এতে দেখা যায় .... (বিভিন্ন) স্থানে হত্যা, লুটতরাজ গৃহদাহ এবং মুসলিম তরুণী নিখোঁজ হয়েছে। ১০ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ফলে ১২ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের উপর হিন্দুদের নৃশংসতা চরমে ওঠে। ১৯শে জানুয়ারী হতে ৪ঠা মার্চ ১৯৫০ পর্যন্ত একইভাবে অবাধগতিতে মুসলমান পীড়ন চলে।[৮]

একথা বলা চলে যে, উচ্চ-স্তরের নেতৃবৃন্দের (কংগ্রেস ও লীগ—জিন্নাহ ও নেহেরু) ঘোষণার মধ্যেই উদ্বাস্তু-সমস্যার বীজ নিহিত ছিল। জিন্নাহ ২৫ শে নবেম্বর ১৯৪৬ তারিখে লোক-বিনিময়ের পরামর্শ দিয়েছিলেন। নেহেরু ঘোষণা দিয়েছিলেন ঃ "দেশ বিভাগের পর যাদের নাড়ীর যোগ ভাবী ভারত রাষ্ট্রের সহিত ছিন্ন হবে, অথচ—যারা রয়ে যাবে ভাবী পাকিস্তান রাষ্ট্রে, তাদের কল্যাণচিন্তা ভারতের ভাবী শাসকদের মনে নিত্য জাগ্রত থাকবে এবং এমনকি প্রয়োজন হলে তারা যদি অবস্থা বিপর্যয়ে দেশত্যাগী হতে বাধ্য হয়, তাদের ভারতের মধ্যে পুনর্বাসনের জন্য সকল সুযোগ সুবিধা দেবার ব্যবস্থা করা হবে।"[৯]

নেতাদের অঙ্গিকার ভবিষ্যৎ দুর্দিনের আশংকা হতে পরিত্রাণ করবার একমাত্র ক্ষীন আশার আলোকবর্তিকারূপেই সেদিন জনগণের সম্মুখে বিরাজ করেছিলো বটে ; কিন্তু এই আশ্বাসেই লঘুদের বাড়ী দখল, লুঠতরাজ করার জন্য গুরুদের পেশীতে পশু—শক্তির সঞ্চার হয়েছিল। বঙ্গ-বিভাগের ফলে বাঙলার অখণ্ড অর্থব্যবস্থা বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৪৩ (১৩৫০) এর স্মরণকালের ঐতিহাসিক দুর্ভিক্ষের স্মৃতি-চিহ্ন তখনও জনমানস থেকে মুছে যায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর (১৯৩৯-৪৫) পরিস্থিতিতে প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত কালাপাহাড়ি সিদ্ধান্তের দ্বারা (ইচ্ছাকৃতভাবে) বাঙলাকে দুর্ভিক্ষ-কবলিত করে দেয়া হয়েছিল। অভাব, অনটন, দুর্ভিক্ষ, অশিক্ষা, সাম্প্রদায়িক হীনমন্যতা দেশভাগের (স্বাধীনতা-লাভের) পরেও দুর্নীতিবাজিতে মানুষকে মত্ত করে তুললো। কালোবাজারি, মোনাফাখোরি, চোরাকারবারী ফাঁকি প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল। স্বাধীনতার পরে পরেই জনগণ তাই 'ইয়া আজাদী ঝুঁটা হ্যায়' শ্লোগান কম দুঃখে তুলেছিলনা।

দীর্ঘকাল ধরে মোটের উপর যে অখণ্ড, অনেকটা সুসংবদ্ধ অর্থ-ব্যবস্থা, বাংলাদেশে গড়ে উঠেছিল তাকে হঠাৎ অবৈজ্ঞানিকভাবে ভেঙ্গে দেওয়ায় দেশ নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল। বিশেষ আঘাত আসে কৃষি ক্ষেত্রে, কৃষকদের উপর। অন্নবস্ত্রের অভাব ও সামাজিক অব্যবস্থার ফলে অনিবার্য পরিনতিরূপে দেখা দেয় গণ-বিক্ষোভ। এ থেকে দানা বাঁধে গণ-আন্দোলন। একে দমন করার জন্য পাকিস্তান সরকার আইন, আদালত, পুলিশ, জেল-জুলুম, হত্যা, ধর্ষণ, ইত্যাদি নিয়ে এগিয়ে এল বাঙালিদের দমন করার জন্য।[১০]

সামাজিক অত্যাচার-নিপীড়ন সৃষ্টির নেপথ্যে কুচক্রীদের শক্তির উৎস ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মুসলিম লীগ সরকার। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগকে নিয়ে পশ্চিমপাকিস্তানী অবাঙ্গালী মুসলমানদের নতুন উপনিবেশরূপে পূর্ববঙ্গকে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন লিয়াকত-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ। জিন্নাহ যে প্রকৃত প্রস্তাবে যুক্ত বাংলার প্রস্তাব সোহরাওয়ার্দীকে উত্থাপনের উস্কানী দিয়েছিলেন কি উদ্দেশ্যে তা আজ আর অস্পষ্ট নেই। কায়েদে আজম পরবর্তীতে রহস্যজনকভাবে নির্বাক থেকে কূট মতলবকে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রে কলকাতা পূর্ব পাকিস্তানের হাতছাড়া হয়। এই ভয়ই ছিল যে, বৃহৎ-বঙ্গ এক থাকলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে শোষণ ও শাসন করা যাবে না। ওদিকে কংগ্রেসের অবাঙ্গালী নেতৃবৃন্দও কলকাতা ভারতের সঙ্গে থেকে গেলে ক্ষতি কি, এই প্রশ্ন ও সংশয় তথা দ্বিধা বা লোভের টোপ ফেললেন হিন্দুনেতৃবৃন্দের সামনে। মুসলিম লীগের হীনমন্য নেতাদের তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তে পাকিস্তান ভারতের অনুর্বর অঞ্চলগুলো নিয়েই গঠিত হলো। ক্ষতিপুরণ দাবির প্রতিও তাঁরা অতপর গুরুত্ব দিলেননা। মুসলিম লীগের মধ্যে ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব চরমে উঠার ফলেই "বঙ্গভঙ্গ রোধের বিশেষতঃ কলিকাতাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা, অন্যথায় কলিকাতার বিনিময়ে ক্ষতিপুরণ আদায়ের সংগ্রাম যখন গতিশীল হইয়া উঠিয়াছে ঠিক সেই সময় হঠাৎ ২৭শে জুন প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী সভায় মাত্র ৬জন সদস্যের উপস্থিতিতে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল যে, ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানের

Dhaka University Institutional Repository

অস্থায়ী সদর দফতর স্থাপিত হইবে।" অথচ সোহরাওয়ার্দী বগুড়ার মুহাম্মদ আলী প্রমুখ মুসলিম লীগ নেতাদের বক্তব্য ছিল : যেহেতু "বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ বঙ্গ বিভাগ চাহে নাই, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ই এই বিভাগ দাবি করিয়াছেন, সুতরাং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাংলার রাজধানীর উপর দাবি করিতে পারেনা।" মুসলিম লীগের কতিপয় নেতার এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তদানীন্তন মন্ত্রী বগুড়ার মুহাম্মদ আলী যে বিবৃতি প্রচার করেন, তাতে বলা হয় : "কলিকাতা পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং কলিকাতা হইতেই পূর্ববঙ্গের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হইবে।"

মুসলিম নেতৃত্বকে দ্বিধাবিভক্ত করে কেন্দ্রীয় অভিসন্ধি চরিতার্থের "প্রক্রিয়ায় কলকাতার উপর আমাদের (মুসলমানদের) দাবি পরিত্যক্ত হইল। এমনকি ক্ষতিপূরণের টাকা আদায়ের (১২ কোটি?) প্রশ্নটিও অবলীলাক্রমে চাপা পড়িয়া গেল। বাংলার লীগ নেতৃত্বের মধ্যে চূড়ান্ত বিরোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পাকিস্তান আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা সংগ্রামী (দল) 'বঙ্গীয় মুসলিম লীগ কাউন্সিল' ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। বলাবাহুল্য, দেশ বিভাগের পরপরই কেন্দ্রীয় হাই কমাণ্ড কর্তৃক চৌধুরী খালেকুজ্জামানকে পাকিস্তান মুসলিম লীগ সংগঠনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই দায়িত্ব পালনের নামে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের, এমনকি বিভক্ত পাঞ্জাবের মুসলিম লীগ বাতিল করিলেন না, বাতিল করিলেন একমাত্র বাংলার মুসলিম লীগ—পাকিস্তান আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠার মূলে যার ভূমিকা ছিল অনন্যসাধারণ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর লীগের মধ্যে বিরোধ কিংবা ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব প্রত্যেক প্রদেশেই কমবেশী মাথাচাড়া দিয়া উঠে, কিন্তু অন্য প্রদেশে পরিবর্তন না ঘটাইয়া 'পকেট লীগ' গঠন করা হয় কেবল পূর্ব পাকিস্তানে।"[১১]

লিয়াকত-নেতৃত্ব প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের জননেতাদের দেশপ্রেমের প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাব প্রদর্শন করতে থাকেন। বিরোধী মতবাদীদের প্রতি লিয়াকত ছিলেন অসহিষ্ণু ও প্রতিশোধপরায়ণ। যুক্ত বাংলা সম্বন্ধে কায়েদে আজমের মনোভাব প্রকাশ্যভাবে প্রচারিত না-হবার মূলে কোনো উদ্দেশ্য ছিল এবং তিনি কোনো কারণে, কোণঠাসা করার মওকা পাবার জন্যই শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে এ-ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনকারী অনেকের স্মৃতিকথায় (ইতিহাসে) এই বক্তব্যের স্বীকৃতি রয়েছে। অথচ পরবর্তীকালে যুক্ত বাংলার প্রস্তাবকে যখন শহীদ সাহেবের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন কায়েদে আজম রহস্যজনকভাবে 'নির্বাক' থাকেন।[১২]

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার লক্ষ্যে পাকিস্তান আন্দোলন ঘণীভূত হলেও মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজে ধর্মকেও টানা হয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতাসীন হয়েই মুসলিম লীগ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নকে সযত্নে পরিহার করে শুধু ধর্মীয় বন্ধনকে সম্মুখে তুলে ধরে অখণ্ড ভারতের মুসলিম আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বিকৃত করে, প্রকৃত সমস্যা এড়াবার এবং শোষণ ও বৈষম্য অব্যাহত রাখার দুরভিসন্ধি আঁটতে লাগলো। ধর্ম কোনো মূলমন্ত্র না-হলেও ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহারের নানা উদযোগ-আয়োজন করতে পূর্ব পাকিস্তানের 'পকেট লীগ'-সরকার উঠে-পড়ে লেগেছিল। পাকিস্তানের প্রায় প্রত্যেক শাসকেরই এই মনোভাব ছিল যে, এই প্রদেশের "জনগণের সহিত যাঁহাদের কিছুটা যোগাযোগ আছে এবং যাঁহারা জনগণের দাবি-দাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা তুলিয়া ধরিতে চাহেন বা বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার কোন প্রকার বিরোধিতা করেন, যেকোন পন্থায় তাঁহাদের জব্দ করিয়া রাখাই" হবে অন্যতম পবিত্র দায়িত্ব। অথচ "কত রঙিন মধুর স্বপ্ন আর মহান আদর্শ নিয়াই না পাকিস্তান আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল। কত ত্যাগ-তিতিক্ষা আর রক্তদানের মাধ্যমেই না পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পাকিস্তানের জন্মলগ্নে হাজার -হাজার মুসলমান প্রাণ দিয়াছিলেন, লক্ষ লক্ষ মুসলমান সুখ-শান্তি-নিরাপত্তার আশায় দুঃখ যন্ত্রণা বরণ করিয়াছিলেন ; নিজের ভিটামাটি ত্যাগ করিয়া মোহাজের সাজিয়াছিলেন। সেই স্বপ্ন কি সফল হইয়াছে? তাঁহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা কি পূর্ণ হইয়াছে? তাঁহারা জানমাল ও মান-ইজ্জতের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পাইয়াছেন?"[১৩]

১৯৪৬ সনের নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম লীগ-নেতৃত্ব আশানুরূপ ফল লাভ করতে ব্যর্থ হয়। পূর্ববাংলার জনগণই পাকিস্তান অর্জন করে। কিন্তু পূর্ববাংলার লোকেদের নৈতিক মনোবল নষ্ট করার জন্য 'পাকিস্তান হাসিলের কৃতিত্ব' কায়েদে আজম লিয়াকত আলী প্রমুখ পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যক্তি-বিশেষের ওপর অর্পণ করা হয়েছিল। নিজেদের দাবি করবার মতন কিছুই ছিলনা বলে তারা কবি ইকবালকে পাকিস্তানের স্বপ্নস্রষ্টা এবং কায়েদে আজমের নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সকল কৃতিত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল প্রচার-মাধ্যমগুলোকে নিয়ন্ত্রণভুক্ত করে। গোটা পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকা, সিনেমা রেডিও, টিভিতে পশ্চিম পকিস্তানীদের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি ছাপোষা ব্যক্তিত্বহীন মেরুদণ্ড বিবর্জিত পণ্ডিত বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক-রাজনীতিবিদেরাও ঐ শ্লোগান তুলতে উম্মাদ হয়ে যেতেন। "মুহাম্মদ ইকবাল উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত কবি সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাকে যদি পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টারূপে গ্রহণ করিতে হয়, তবে বলিতে হয় যে, তাঁহার পরিকল্পনা আদৌ স্পষ্ট ছিলনা। এমনকি, তাঁহার স্বপ্নে ভারতের পূর্বাঞ্চল বা পূর্ব পাকিস্তানের কোন স্থানই ছিলনা ; বরং বিভিন্ন সময়ে তিনি ভারতের অখণ্ডতার জয়গান গাহিয়াছিলেন ; কখনও বা বিশ্বকবি হিসাবে 'সারা জাহাঁ ছে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা' অথবা "চীন ওয়া আরব হামারা হিন্দুস্তাঁ হামারা"—এই ধরণের ভাবধারারও পরিচয় দিয়াছেন। জিন্নাহ সাহেবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, নেতৃত্বের বিচক্ষণতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্বন্ধে কোন বিতর্ক নাই, কিন্তু যাহারা স্বাধীনতা-আন্দোলনে জনগণের ভূমিকাকে তুচ্ছ স্থান দিয়া ব্যক্তি বিশেষের নেতৃত্বকে ফুলাইয়া-ফাঁপাইয়া তুলিতে প্রয়াসী তাঁহারা হয় রাজনৈতিক এতিম নয় গণবিরোধী।"

পূর্ববংলার জনগণ (অধিকাংশ) মানসিকভাবে যে, এতিম' হয়ে পড়েছিলো—তার পেছনে তাই কারণ ছিল। কলকাতা হাতছাড়া হবার পর পূর্ববাংলায় বড় নগর ও শহর ছিলনা। ঢাকা তখন ৯/১০ বর্গ মাইলের একটি ক্ষুদ্র মফস্বল শহর (১৯৭১ সনে ২০ লক্ষ লোকের অধিবাস ছিল), যেখানে আধুনিক জীবনযাত্রার উপকরণ ছিলনা বরঞ্চ নাগরিক জীবনে ছিল পর্যাপ্ত গ্রাম্যতা এবং লৌকিক সংস্কৃতির প্রাবল্য। ভারত বিভাগকালে বিশেষতঃ বাংলাদেশ বিভক্ত হয়ে কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাতে ফেডারেল রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিলনা। দ্বিতীয়তঃ অবিভক্ত ভারতে উচ্চপদস্থ মুসলিম সরকারী কর্মচারীদের যে হার ছিল তাতে পূর্ব পাকিস্তান অনেক পেছনে পড়েছিল। প্রাক্তন আই. সি. এস. দের মধ্যে পূর্বপাকিস্তানী মুসলমান ছিলেন মাত্র একজন। "ভারত হইতে 'অপশন' দিয়া

Dhaka University Institutional Repository

যে-সকল মুসলিম আই-সি-এস এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী পাকিস্তানে আগমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রথমদিকে অবাঙ্গালীরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। স্বভাবতঃই কেন্দ্রীয় শাসনব্যস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসকারী অবাঙ্গালী অফিসাররাই প্রাধান্য বিস্তার করেন।"[১৩.ক]

কায়েদে-আজম দেশ শাসনের ব্যাপারে রাজনীতিকদের থেকে আমলাদেরই পছন্দ করতেন বেশী। একশ্রেণীর রাজনীতিক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে ও পরে ব্যক্তিগত সুবিধা ও পদমর্যাদা লাভের লোভে এমন ব্যক্তি -পূজা ও স্তাবকতা শুরু করেন যে, তাদের যোগ্যতা ও দেশপ্রেম সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। একারণেই 'জিন্নাহ মন্ত্রী সভায় গোলাম মুহাম্মদ ও স্যার জাফরুল্লাহ খানের মতন আমলাদের স্থান দিলেন। তাতে স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় আমলাদের প্রভাব দিন দিন বাড়তে থাকে। একটা উন্নয়নকামী দেশে উদ্বৃত্ত বাজেট ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়' অথচ গোলাম মুহাম্মদ অর্থমন্ত্রী হিসাবে বছরের পর বছর উদ্বৃত্ত বাজেট পেশ করতে লাগলেন। রাজনৈতিক তাক লাগানো ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য তাতে ছিলনা। রাজনীতিকদের চেয়ে আমলাদের দেশ শাসনের ব্যাপারে যে অধিকতর দক্ষতা আছে তা প্রমাণের জন্য তাঁরা ধোঁকাবাজির সৃষ্টি করতেন। পত্র-পত্রিকাগুলো অন্ধভাবে বাজেটের প্রশংসা করতো, আর ভারতের সঙ্গে তুলনা করে পাকিস্তান-এর প্রচার মাধ্যমগুলো খুব আত্মপ্রসাদ লাভ করতো। খুব কম পত্রিকাই অর্থনীতির এই ধোঁকা বুঝতেপারত এবং বুঝলেও সঠিক সমালোচনা করতে সাহস পেতনা। লিয়াকত চক্রের কারসাজিতে পূর্ব পাকিস্তানে দুর্বল নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মৌলানা আকরম খাঁকে পূর্ব প্যাকিস্তানের মুসলিম লীগের সংগঠক ও কর্ণধার নিয়োগ করা হয়েছিল। ফলে এক ধরনের বন্ধ্যাত্ব, নৈরাজ্য ও অন্ধকার সমাজের সর্বত্র সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার মতোই অশুভ ছায়ায় পূর্ববাঙলাকে ঘিরে ফেলেছিল।

২.২. রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ঘটনাবলী - পাকিস্তানী সংস্কৃতি ও সংহতির জন্যে নানা বিকৃত উপায়ের অবলম্বন ভাষার প্রশ্নে পাকিস্তানের প্রথম সরকার-বিরোধী গণ আন্দোলন; একুশে ফেব্রুআরি আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক-প্রেক্ষাপট যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা; যুক্তফ্রন্টের ফলাফলে পশ্চিম পাকিস্তানীদের তথা কেন্দ্রীয় সরকারের গাত্রদাহ; নির্বাচনের ফলাফল বানচালের পায়তারা; পূর্বপাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতা; সামরিক শাসন জারি; প্রেসিডেন্ট আইউব খানের কার্যাবলী; আইউব-বিরোধী ছাত্র ও রাজনৈতিক আন্দোলন; রাজনৈতিক দলের পুনরুজ্জীবন; নয় নেতার বিবৃতি ; পাক-ভারত যুদ্ধ; ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের সায়ত্তশাসন দাবি ; ছয় দফা; আন্দোলন দমনের জন্য আইউব সরকারের দমন-নির্যাতন-নিপীড়ন নীতি অবলম্বন; আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী শেখ মুজিব ও অন্যান্য বন্দীদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ; গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে উদ্ভূত ১১ দফার দাবিতে ছাত্রদের আন্দোলন; উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও গণবিদ্রোহের পরিণতিতে ক্ষমতার মঞ্চ থেকে আইউব খানের বিদায় গ্রহণ ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ক্ষমতার মঞ্চে ইয়াহিয়া খানের আবির্ভাব; উপকূলবর্তী অঞ্চলে সত্তরের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও সত্তরের সাধারণ নির্বাচন; আওয়ামী লীগের নিরংকুশ জয়লাভ; নির্বাচনের ফলাফল বামচালের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীদের ষড়যন্ত্র এবং বাঙালী দমন-নিধনের জন্য সামরিক বাহিনীর নির্লজ্জ নির্মম হত্যাযজ্ঞ; বাঙালির প্রতিরোধ সংগ্রাম এবং বাঙলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন।

কংগ্রেস ও লীগ, হিন্দু আর মুসলমান যদি একমত হতো তাহলে হয়ত বাংলাদেশ অবিভক্ত থাকতো।[১৪] কিন্তু উভয়েই অবিভক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের সম্ভাবনা যে কারনে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দিয়েছিল, সেইকারণেই সাম্প্রদায়িক মনোভাব টিকিয়ে রাখা হলো পাকিস্তানে বাঙালি-সংস্কৃতির চর্চা পাকিস্তানবাদী সরকারের কাছে ভীতির বিষয় হয়ে রইলো। কারণ বাঙলাকে যাঁরা দ্বিখণ্ডিত করেছেন, তাঁরা বাঙালি সংস্কৃতির অখণ্ডতা, বিকাশ বা অগ্রগতি মেনে নিতে পারেন না। পাকিস্তানের সিভিল ও মিলিটারী আমলা এবং দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বাঙালিদের বিভেদকে স্থায়ী করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ধর্মভিত্তিক সমাজ ও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। ফলে কোন অমুসলিম ব্যক্তি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবেন না, এমন অগণতান্ত্রিক, আমানবিক বিধিও পাকিস্তানের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী সরকার গণসাহিত্য ও গণসংস্কৃতির চর্চাকে প্রবলভাবে বাধা দিল।[১৫]

দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের রাষ্ট্র-কাঠামোতে যখন বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল্যহীনতা প্রকট হয়ে উঠল, আর সাহিত্যক্ষেত্রে প্রকৃত সৃষ্টিশীলতা ও জাতীয় অনুভূতির বাস্তবতা অস্বীকৃত হল, তখন সেই সংকটময় শূন্যতার কালে পূর্ব বাঙলায় প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল সুস্থ মানবিক চিন্তা-ভিত্তিক জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় সাহিত্য চর্চার উপযুক্ত উন্মুক্ত পরিবেশ।

বিভিন্ন সাময়িকপত্রে বিভাগপূর্বকালেই বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। সাতচল্লিশের পরেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক সাহিত্যিক পত্র-পত্রিকায় 'বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতিদানের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।[১৬] ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক 'কৃষ্টি'তে স্পষ্টই বাংলার অমর্যাদার পরিণতি ভালো হবেনা বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন ১৯৪৭। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৪৮ সনের বিভিন্ন বক্তৃতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ন্যায় একটি উন্নততর কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতি (বাঙলা একাডেমী যার ফল) স্থাপনের প্রস্তাব করে আসছিলেন। ফলে সরকার এ-বিষয়ে সচেতন ও সতর্ক হয়ে ওঠে। "তখন থেকেই শহরে শহরে সরকার মুৎসুদ্দী, বুদ্ধিজীবী সরল বাঙালীর মাধ্যমে বাঙলাভাষার উৎসগত, বর্ণগত, বানান-গত এমনকি লিখনভঙ্গিগত নানা ত্রুটির কথা প্রচারের ব্যবস্থা করে। এ প্রচার জনগণকে সহজেই প্রভাবিত করে অন্য এক মনস্তাত্ত্বিক কারণে। বাঙালী মুসলমানেরা জন্মাবধি দেখছিল—জমিদার হিন্দু, মহাজন হিন্দু। শিক্ষিতেরা হিন্দু, চাকুরেরা হিন্দু, উকিল-ডাক্তার-ব্যবসায়ীরা হিন্দু ; অফিস হিন্দুর, প্রশাসনও হিন্দুর। স্কুল-কলেজের বাঙলা বইগুলোতেও ছিল হিন্দুর লেখা ও হিন্দুর কথা।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে অর্থে বিত্তে বেসাতে ও শিক্ষায় বঞ্চিত মুসলিম-মনে হিন্দুর প্রতি ঈর্ষা-ক্ষোভ ও বিদ্বেষ ঘন হয়ে ওঠে।"[১৭] এই মনোভাবকে কাজে লাগাবার জন্য সরকারী পর্যায়ে বাংলার ওপর তিনদিক থেকে দুই দফায় হামলা চালানো হলো। নির্বিচারে আরবী ফারসী-উর্দু শব্দ ঢুকিয়ে বাংলা ভাষার মুসলমানী রূপ ফুটিয়ে তোলা, আরবী হরফে বাংলা লেখা এবং উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করে জাতীয় জীবন থেকে বাংলাকে সরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র এর অন্যতম ঘটনা। বর্ণ ও বানান সংস্কারের ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম যবানের পার্থক্য সৃষ্টি করে ইসলামী স্বাতন্ত্র্য প্রদানের এবং "বর্ণে বানানে, লিখনে জটীলতা, অসঙ্গতিও অনিয়ম দেখিয়ে একে শেখার শেখানোর ও ব্যবহারের তথা শিক্ষার ও প্রশাসনের কাজের বাহনরূপে প্রয়োগের অযোগ্য প্রমাণ করে রাষ্ট্রভাষা করানোর দাবি পরিহার করানো বা বাতিল করা।"[১৮]

পাকিস্তানের অন্তস্থিত দুর্বলতা ঘুচাবার কোনো স্বাভাবিক উপায় ছিলনা। তাই বিকৃত উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করতে হল। ভারত বিদ্বেষের মদিরা দিয়ে বাঙালিকে মাতাল করতে চাইল পাঞ্জাবী-শাসকগণ। কিন্তু বাঙালী চিত্তে জেগে উঠল ধর্ম-নিরপেক্ষ মানবতাবাদী ভাবধারা ও ভারতের প্রতি সৌহার্দ্য। পাকিস্তানবাদীরা স্বেরাচারের আশ্রয়ে বাঙালীকে দমন করতে চাইল, গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষায় বাঙালী উম্মাদ হয়ে উঠল। "পাকিস্তানবাদীরা আঞ্চলিক শোষণ ও শ্রেণী—শোষণের সাহায্যে বাঙালী জাতিটাকে চিরকালের জন্য দাস করে রাখার ষড়যন্ত্র আঁটল—বাঙালীরা প্রাণপণে স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের মন্ত্রে দীক্ষা নিল। দিন যেতে লাগল, পাকিস্তানের দর্বলতা ঘুচাবার বিকৃত চেষ্টা তীব্রতর হতে থাকল, আর তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দ্রুত অনিবার্যতার দিকে এগুতে লাগল এবং ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চে পূর্ববাংলার জনগণের উপর ইয়াহিয়ার নির্বোধ সামরিক আক্রমনের পর স্বাধীন বাঙলাদেশের প্রতিষ্ঠাকে রোধ করার শক্তি পৃথিবীতে আর কারো রইল না।"[১৯]

পাকিস্তানকে দীর্ঘায়ু করার জন্য যতো বিকৃত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল তার প্রতিটিই প্রতিক্রিয়া ও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের বিকাশের স্বাভাবিক গতিকে তারা চেয়েছিল কৃত্রিম প্রচেষ্টা দ্বারা নিজেদের অভীষ্ট খাতে প্রবাহিত করতে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সাহায্যে পাকিস্তানের পূর্ব খণ্ডের জনগণের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে দিয়ে উর্দু ভাষা, সাম্প্রদায়িক সাহিত্য ও পকিস্তানী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে। সেজন্য তারা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সঙ্গীত নিষিদ্ধ করতে উদ্যত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এবং হিন্দুরচিত সাহিত্যচর্চা সীমিত করা হয় পৌরাণিক কাব্য-কবিতা-কাহিনী মুদ্রণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সাহিত্য ও পাকিস্তানী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, সরকারী আধা-সরকারী ও প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্কুল, টেক্সটবুক বোর্ড, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র ব্যাপক আয়োজন করা হয়। এসবের মধ্যে উর্দু রাষ্ট্রভাষা, বাংলা হরফের পরিবর্তে আরবী ও রোমান হরফ প্রবর্তনের ষড়যন্ত্র এবং ১৯৫৭ তে সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকী পালন এবং কতিপয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন এবং সাহিত্যিক আড্ডার কথা ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করে আছে। এখানে এসবের মাধ্যমে এক ধর্ম, এক জাতি ও একরাষ্ট্রের জিগির তুলে তারা ভেবেছিল দেশটাকে অজ্ঞতা ও মূর্খতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখে চিরকাল শাসন চালিয়ে যাবে। পাকিস্তানোত্তর সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনা-প্রবাহ মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোতে পূর্ব বাঙলাকে এক বিশেষ ধরনের পরিপূর্ণ উপনিবেশে পরিণত করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য।

পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের আয়ুষ্কালে পাকিস্তানবাদী চক্র সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে-সব পদক্ষেপ গ্রহন করেছিল, তা ছিল সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক, প্রাকৃতিক নিয়ম বিরোধী, নির্বুদ্ধিতা, প্রসূত হাস্যস্পদ ও কাণ্ডজ্ঞানশূণ্য। কিন্তু সেসব আয়োজন পূর্ব বাঙলার জনগনের কাছে এসেছিল জীবন-মরণ সমস্যার মতো এক বিরাট চ্যালেঞ্জ-রূপে। অতএব বাঙালি সংগ্রামে, প্রতিরোধে পিছপা হয়নি।

পাকিস্তানের শাসকচক্রের সঙ্গে পূর্ব বাঙলার জনগণের বিরোধের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে। ১৯৪৮ সনের ২১শে মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে এবং ২৪শে মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে পাকিস্তানের স্রষ্ট ও প্রথম গভর্ণর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষনা করেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। অন্য কোন ভাষা নয়।' রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠাকামীদের তিনি নানান কটূক্তি সহকারে তিরস্কার পূর্বক ধমক ও হুমকি প্রদর্শন করেন। পূর্ব বাঙলা সরকারের দমন নীতিকে এবং পাশবিক অত্যাচারকে সমর্থন করেন। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পূর্ববাঙলায় ভাষা-আন্দোলন ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং রাষ্ট্রভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণ অবহিত হচ্ছিল। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে ১৯৫২ সনের ২১ থেকে ২৫শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঢাকায় ছাত্র জনতা অবিরাম প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পুলিশের গুলিতে সালাহউদ্দীন, আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, রফিক উদ্দীন, আবদুস সালাম প্রমুখ নিহত হন।

ভাষার প্রশ্নে পূর্ববঙ্গে ১৯৫২ সনের 'একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলন' ও বিক্ষোভের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলেও, এর পেছনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষন ও তা থেকে মুক্তির প্রেরণাই মুলচালিকাশক্তি রূপে কাজ করেছিল। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় : ১৯৪০ সনের লাহোর প্রস্তাবের সময় থেকে ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্টে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত—পূর্ব বাঙলার জনসাধারণের মনে ভবিষ্যৎ স্বাধীন আবাসভূমিকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন জেগেছিল। এক শোষকের বদলে নতুন আর এক শোষককে—এক অত্যাচারীর বদলে নতুন আর এক অত্যাচারীকে তারা ক্ষমতায় বসাচ্ছে—একথা তারা তখনও ভাবতে পারেনি। অন্যায় মুক্ত, অভাবমুক্ত, প্রেমপ্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যপূর্ণ নতুন জীবনের স্বপ্নই তাদেরকে একদা পাকিস্তান আন্দোলনে আকৃষ্ট করেছিল। মুসলিম লীগ নির্বাচনকালে (১৯৪৬) বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ঘটিয়ে কৃষক-জনতার জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা পূর্বক সুখি-সুন্দর নতুন জীবন সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তা ছাড়া সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিম পরিচালিত মুসলিম লীগের নাজিমউদ্দীন-আকরম খাঁ-বিরোধী গ্রুপও তখন মানুষের মনে নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার জাগরণ ঘটিয়েছিল। সোহরাওয়ার্দী আবুল হাশিম প্রমুখ এবং ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি, নিখিল ভারত কিষাণ সভা ফজলুল হক পরিচালিত কৃষক-প্রজা-পার্টি প্রভৃতির আন্দোলনের ফলেও পূর্ব-বাঙলার কৃষক জনতার মনে নব নব আশার সঞ্চার হয়েছিল। দীর্ঘদিনের হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা-রায়টের বীভৎস স্মৃতি, তিক্ত

Dhaka University Institutional Repository

জীবনাভিজ্ঞতা, জনসাধারণের মনকে ধীরে ধীরে দাঙ্গা—বিরোধী অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক করে তুলেছিল। তাদের মানসনেত্রে প্রত্যেক্ষ হচ্ছিল একটা নতুন দেশ, সম্পূর্ণ নতুন সুস্থ ও স্বাভাবিক মনুষ্যজীবনের ছবি। কিন্তু লীগ শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আর ভাওতাই দিয়েছিল। উন্নত সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রবিধির কোন পরিকল্পনা দূরের কথা সেসবের চিন্তা পর্যন্তই ছিলনা তাদের।

ফলে ক্ষমতায় গিয়ে (১৯৪৭ এর ১৪ই আগষ্ট এবং পরবর্তীতে) তাঁদের কিছুই করার উপায় ছিলনা। এ-অবস্থায় তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন 'রাজনৈতিক ইসলাম' প্রচার, ভারতের কাশ্মির দখল করে নেয়ার জুজুর ভয় প্রদর্শন, ভারত-বিরোধী প্রচারনা ; সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বিতরণ ও উস্কানিদান এবং সীমান্ত সংঘর্ষের নামে গণমনে ভীতি-সঞ্চার আর কমিউনিষ্ট-নিধন ও মিথ্যা প্রচারের। কিন্তু জনসাধারণের মনে প্রায় সব সময় এধরণের প্রচারের ফলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।

"অপর দিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩) যে অর্থনৈতিক দুর্দশার সৃষ্টি করেছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তা আরও তীব্রতা লাভ করতে থাকে। দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায় হু হু করে। সরকারি ঔদাসীন্য ও অব্যবস্থার কারণে এবং মুসলিম লীগের আশ্রয়পুষ্ট মজুতদার, মুনাফাখোর ও কালোবাজারিদের কারসাজিতে চাউল ও খাদ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। ১৯৫১ সনের চরম লবণ সঙ্কটের কথা (১৬ টাকা সের) কথা বাদ দিলে চাউলের অভাবই হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড় অভাব ও স্থায়ী সংকট। বলাবহুল্য ১৯৪৮ থেকে ৫২-র বছরগুলোতে সারা পূর্ব বাঙলা ছিল দুর্ভিক্ষকবলিত। ১৯৪৯ ও ৫১-তে দুর্ভিক্ষ কোন কোন অঞ্চলে মন্বন্তরের আকার ধারণ করেছিল। এক দিকে দুর্ভিক্ষ, অপরদিকে বিলাসিতার স্রোত চলছিল একই সঙ্গে।"

কৃষি প্রধান পূর্ব বাঙলার কৃষক জনতার জীবন ছিল বহু সমস্যায় আকীর্ণ। সেগলোর প্রতি মুসলিম লীগ সরকার কোন দৃষ্টি দেয়নি। উপরন্তু বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদার উচ্ছেদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে সরকার 'জমিদারি ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব আইন' প্যাশ করে। ফলে লীগ সরকারের প্রতি জনমনে তীব্র ঘৃণা জাগ্রত হয়। কৃষকদের প্রতি চরম ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞার ফলে কৃষক বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। ১৯৫২ সনের একুশে ফেব্রুয়ারী অভ্যুত্থানের পূর্বে রাজশাহীর নাচোল বিদ্রোহ, ময়মনসিংহের টঙ্কপ্রথা বিরোধী বিদ্রোহ, সিলেটের নানকার প্রথা বিরোধী বিদ্রোহ ইত্যাদি কয়েকটি বিখ্যাত বিদ্রোহ ছাড়াও স্থানীয় দাবির ভিত্তিতে কমিউনিষ্ট পার্টির পরিচালনায় কিংবা স্বতস্ফূর্তভাবে পূর্ব বাঙলার প্রায় প্রতিটি জেলায় আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল কৃষক বিদ্রোহ ও কৃষক আন্দোলনের। দেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় দেখা দিয়েছিল দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, বিশৃঙ্খলা, অব্যবস্থা, কর্তব্যনিষ্ঠার অভাব ও হতাশা। আইনের শাসন ছিল শিথিল। দুর্নীতিই যখন সমাজের নীতি হয়ে উঠছিল—তখন সাধারণ মানুষও দুর্নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করে আত্মদগ্ধ হচ্ছিল। সরকারী আশ্রয়পুষ্ট মুসলিম লীগারদের যথেচ্ছাচারের সঙ্গে প্রশাসনিক অব্যবস্থা ও দুর্নীতি, দলীয় নিপীড়ন, সংকীর্ণতা যুক্ত হয়ে সমাজে মানুষের বসবাসের অনুপযোগী এক শাসরুদ্ধকর অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতেও কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র মধ্যবিত্ত জনসাধারণ স্থানীয়ভাবে মাঝে-মাঝেই আন্দোলনে অগ্রসর হয়ে চরম নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছে। গণ আজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, তমদ্দুন মজলিশ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম আওয়ামী লীগ, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি ইত্যাদি বহু সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান বায়ান্নো সনের একুশে ফেব্রুয়ারীর অভ্যুত্থানের আগেই আত্মপ্রকাশ করে বিভন্ন আদর্শ, দাবিদাওয়া ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছিল। "বস্তুত, ১৯৫২ সনের ফেব্রুয়ারী-অভ্যুত্থান পূর্ব-বাঙলার জনসাধারণের চার বছরের জমাট বাধা বিক্ষোভেরই ব্যাপক বিস্ফোরণ। সারা দেশ জুড়ে মানুষের মনে যে আক্রোশ সঞ্চিত হয়েছিল, ঢাকার ছাত্রদের ও জনসাধারণের মনে তাই সাহস, শক্তি ও প্রেরণা জুগিয়েছিল। আর সে আন্দোলনে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাও ছিল। বিভিন্ন মুখি।" কৃষকদের দাবির মধ্যে ঐক্য ছিল, আবার বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের দাবির মধ্যেও ছিল বৈচিত্র্য। শ্রমিকদের দাবি ছিল এক রকম, কিন্তু মধ্যবিত্তের বিভিন্ন অংশের দাবি ছিল বিভিন্ন রকম। "ভাষার দাবি ও সরকারের ১৪৪ ধারা জারির ঘটনা উত্তপ্ত পরিবেশে অগ্নিসংযোগ করেছিল মাত্র।"[২০] একারণেই ১৯৪৮ সনের ফেব্রুয়ারী-মার্চ ও ১৯৫২-র জানুয়ারি-মার্চ এর আন্দোলনের মধ্যে 'সচেতনতা, ব্যাপকতা, সাংগঠনিক তৎপরতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তারতম্য' বুঝতে হলে 'মধ্যবর্তী চার বছরের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির খতিয়ান' মনে রাখতে হয়।[২১]

পূর্ব-বাঙলার ভাষা-আন্দোলন প্রাথমিকভাবে (১৯৪৮) সাংস্কৃতিক আন্দোলনরূপে বিকশিত হলেও পরবর্তীতে (১৯৫২ তে) রাজনৈতিক সংগ্রামের উন্নততর পর্যায়ে উত্তরণ লাভ করেছিল। বদরুদ্দিন উমর লিখেছেন : "১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন যে সীমিত এলাকায় ঘটেছিল এবং ছাত্র-শিক্ষকসহ বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে যেভাবে সীমাবদ্ধ ছিলো ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন সেইভাবে সীমাবদ্ধ থাকেনি। দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাষা-আন্দোলন শুধু ভাষার প্রশ্নে সীমাবদ্ধ না-থেকে তা শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্তের এক ব্যাপক গণপ্রতিরোধ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে সমগ্র পূর্ব বাঙলায় এক অভুতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো।" তা কেবল মুষ্টিমেয় ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীর আন্দোলন ছিলোনা। শিক্ষাগত অথবা সাংস্কৃতিক আন্দোলনও ছিলনা। বস্তুতপক্ষে তা ছিল পূর্ব বাঙলার ওপর সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার পাকিস্তানী শাসক ও শোষক শ্রেণীর জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক বিরাট ও ব্যাপক গণ-আন্দোলন।[২২]

আন্দোলনের ঘটনাবলী ও পটভূমি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শুধু জাতিগত নিপীড়নই নয়, পূর্ব বাঙলার আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রকার শ্রেণী শোষণ ও শ্রেণী-নিপীড়নও এই আন্দোলনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশ ভাগ প্রভৃতি ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনগণ একুশে-ফেব্রুয়ারীর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে জেলা, মহকুমা, থানা প্রভৃতি মফস্বল শহর, গ্রাম-গঞ্জে ক্রমাগত বিক্ষোভ বিদ্রোহ ও সংগ্রামের আগুন জ্বালিয়ে তোলে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান তুলে সারা পূর্ব বাঙলার আপামর জনতা মুখরিত হয়ে ওঠে। ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী কর্মী বাহিনীর নেতৃত্বে এই আন্দোলন এত তীব্র হয়ে ওঠে যে সরকারের পতন প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু বহু ছাত্র, শিক্ষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নিরীহ মানুষকে গ্রেফতার করে, পরিশেষে এক দারুন সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে স্বৈরাচারী সরকার আন্দোলন দমন করে বটে, কিন্তু এই দমন-নির্যাতন পূর্ব-বাঙলার রাজনীতি ও সংস্কৃতি-ভাবনায় এক নতুন মাত্রা সংযোগ করে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানী-শাসকদের ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজ-গঠনের নীতির উপর ভাষা-আন্দোলন দারুন আঘাত হেনেছিল। দলমত ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষ একাত্ম হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শের জন্ম দিতে সক্ষম হয়। 'পাকিস্তান-আন্দোলন' কালে যে সাম্প্রদায়িক এবং শ্রেণীভিত্তিক মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল এই আন্দোলন তা দূরীভূত করে সকল বাঙালিকে একমঞ্চে একমঞ্চে মিলিত হবার সুযোগ করে দিয়েছিল। ফলে বায়ান্ন-সংলগ্নকালে পূর্ববঙ্গে ভাষা-ভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক 'বাঙালি-জাতীয়তাবাদের, উন্মেষ ঘটে। ফলে পূর্ব-বাঙলার জননন্দিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও প্রধান দলগুলো ভাষা-আন্দোলন-সৃষ্ট জাতীয় চেতনার আলোকে তাঁদের দলীয় কর্মসূচী গ্রহণ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালু করতে বাধ্য হন। আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) তাঁর রাজনৈতিক আত্মজীবনী 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন ২১শে ফেব্রুয়ারীকে চিরস্মরণীয় করে রাখার ইচ্ছায় ফ্রন্টের বিভিন্ন অঙ্গদলের মেনিফেস্টোর সমন্বয়ে ১৯৫৪ সনের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের একুশ দফা প্রণীত হয়েছিল। তিনি লিখেছেন ঃ "......... ২১ ফিগারটাকে চিরস্মরণীয় করিবার অতিরিক্ত উপায় হিসাবে যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচীকে একুশ দফার কর্মসূচী করিলে কেমন হয়?"[২৩] দফাগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায় কেনো মুসলিম লীগের চূড়ান্ত ভরাডুবি হয়েছিল ঃ

যুক্ত ফ্রন্টের ২১ দফা

নীতি ঃ কোরাণ ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাফ কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং
ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।

২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সমস্ত খাজানা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে এবং উচ্চ হারের খাজানা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজানা আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে।

৩. পাট ব্যবসায়কে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাটচাষীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং লীগ মন্ত্রিসভার আমলের পাট কেলেঙ্কারি তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৪. কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারী সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্ত-শিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে।

৫. পূর্ববঙ্গকে লবণ-শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির শিল্পের ও বৃহৎ শিল্পের লবণ তৈয়ারীর কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার আমলের লবণের কেলেঙ্কারি তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৬. শিল্প ও কারিগরি শ্রেণীর গরিব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইবে।

৭. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৮. পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রম-সঙ্ঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

৯. দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকর করিয়া কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চ শিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে।

১২. শাসন-ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীদের বেতন কমাইয়া ও নিম্ন-বেতনভোগীদের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুসঙ্গত সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের কোন মন্ত্রী এক হাজারের বেশী বেতন গ্রহণ করিবেন না।

১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ-রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী পদাধিকারীর ও ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিনান্স প্রভৃতি কালা কানুন রদ ও রহিতকরতঃ বিনা বিচারে আটক বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা হইবে।

১৫. বিচার-বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে।

১৬. যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়ীতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাততঃ ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে।

১৭. বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবীতে যাহারা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন, তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. ২১শে ফেব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করিতে হইবে।

১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন সার্বভৌমিক করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় (অবশিষ্টাত্বক ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থল-বাহিনীর হেড কোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তান ও নৌ-বাহিনীর হেড-কোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণ করতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হইবে।

২০. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোন অজুহাতেই আইন-পরিষদের আয়ু বাড়াইবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন।

২১. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পর পর তিনটি নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।[২৪]

পক্ষান্তরে পাকিস্তান মুসলিমলীগের কোন নির্বাচনী মেনিফেস্টো ছিলনা। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে মুসলিম লীগ নীরব ছিল। 'ইসলাম বিপন্ন' ; 'পাকিস্তান বিপন্ন' এই-ই ছিল মুসলিম লীগের নির্বাচনী অভিযানের সার কথা। তাছাড়া মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন নূরুল আমীন, যিনি অন্যান্য দমননীতি ছাড়াও ১৯৫২ সনের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকালে ছাত্র-জনতার উপর গুলি চালাবার নির্দেশ দিয়ে জনপ্রিয়তা হারিয়েছিলেন। আর যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে ছিলেন-এ কে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী এবং এইচ এস সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ জননন্দিত বাঙলার ঐতিহ্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। একুশ দফার রচয়িতাদের শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণ করে একজন সমালোচক দেখিয়েছেন ঃ" সুবিধাবাদী উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী 'অধিকতর সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতারা' মূলত তাঁদের শ্রেণীগত আশা-আকাক্ষার ভিত্তিতে রচনা করেছিলেন ..... তবু পূর্ববর্তী আন্দোলন সমূহের চাপে ও ৫২-র ফেব্রুয়ারী-অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরে যুক্তফ্রন্টের নেতাদের পক্ষে নির্বাচনী কর্মসূচী প্রণয়নের সময় বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণের দাবি-দাওয়া ও আশা-আকাক্ষাকে সম্পূণ উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ফলে একুশ দফার প্রতিশ্রুতিতে বিভিন্ন স্তরের জনগণের বিভিন্নমুখি দাবির ও আকাক্ষার একটা মোটামুটি প্রতিফলন ঘটেছিল।"২৫ এবং পরবর্তীকালে আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারীদের পক্ষে এর থেকে ন্যূনতম দাবি নিয়ে জনসম্মুখে হাজির হওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে "এই একুশ দফা মেনিফেস্টো পরবর্তীকালে পূর্ব বাঙলার ছাত্র জনতার জীবনবাণী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"২৬ এজন্যই বায়ান্নো সনের ফেব্রুয়ারী অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ২১ দফা কর্মসূচীর মর্ম অনুধাবন প্রাসঙ্গিক, আর ১৯৫৪-র নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিরাট বিজয় যে বিশেষভাবে ভাষা-আন্দোলনের অবদানেই সম্ভব হয়েছিল তা আজ সর্বজন স্বীকৃত। প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারী উদযাপনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাঙলার জনগনের অধিকার ও স্বাতন্ত্র চেতনা ; বঞ্চনাবোধ ও বিদ্রোহের তাগিদ দৃঢ়তর করার প্রেরণা তারা এখান থেকেই লাভ করে। ভাষা-আন্দোলনের ফলে বা প্রভাবে ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি-চর্চার ধারা সৃষ্টি হয়। ফলে ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ অনুসৃত হতে থাকে। ২৪শে জুন ১৯৪৯ সনে গঠিত 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নাম থেকে 'মুসলিম' কথাটি বাদ পড়ে। ১৯৫২-র ২৬শে এপ্রিল তারিখে অসাম্প্রদায়িক ছাত্রসংগঠন 'ছাত্র ইউনিয়ন' গঠিত হয়। ২৭শে এপ্রিল ১৯৫২তে গঠিত হয় 'গণতন্ত্রী দল'। ১৯৫৩-র ২৬শে জুলাই গঠিত হয় 'কেএসপি' বা কৃষক-শ্রমিক পার্টি। 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' নাম থেকেও 'মুসলিম' কথাটি ঝরে পড়ে। অসাম্প্রদায়িক বেশকটি প্রতিষ্ঠান অতঃপর গড়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ প্রভৃতিতেও কোন সাম্প্রদায়িক পরিচয় রাখা হলোনা। যুক্তফ্রন্টের (নির্বাচনে) বিজয়ে (১৯৫৪ সনের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয়) পশ্চিম পাকিস্তানে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই বিজয়ে চরম গাত্রদাহ অনুভব করে। যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ আনন্দের আতিশয্যে এই সহজ সত্যটা ভুলে গিয়েছিলেন যে, এই বিজয় একটি প্রাদেশিক নির্বাচনের বিজয় মাত্র। তখন তাঁদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল। কারণ, প্রদেশে যাদেরকে উৎখাত করা হয়েছিল, তাঁদের চূড়ামণিরা তখনও কেন্দ্রের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল, যেকোন উপয়ে তারা এই বিজয়কে নস্যাৎ করতে বদ্ধপরিকর ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত ১৯৩৫ সনে জারীকৃত বৃটিশ সরকারের ৯২-ক ধারার প্রয়োগ করে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে দেয়া হল। চরম নির্যাতন ও সন্ত্রাস নেমে এল। পূর্ব বাঙলার জনগণ ও রাজনৈতিক (ফ্রন্টভুক্ত আওয়ামীলীগ, কেএসপি প্রভৃতি) দলের নেতাকর্মীদের উপর। যে চক্রটি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় জেঁকে বসেন, তাদের জানা ছিল যে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের কোনো প্রভাব নেই। "পাকিস্তানের জন্মলগ্নে এই অঞ্চলে রাজনৈতিক চক্রান্তের মাধ্যমে যে দুর্বল নেতৃত্ব ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই দুর্বল নেতৃত্ব ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে টাঙ্গাইলের উপ-নির্বাচনে পরাজিত হইলে জনগণের মধ্যে তাঁহাদের সমর্থন নাই জানিতে পারিয়া তাঁহারা অতঃপর আর কোন উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে দেন নাই। এইভাবে প্রদেশে (পূর্ব বাঙলায়) একেএকে ৩৫টি উপ-নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়। কেন্দ্রীয় ক্ষমতার চাবিকাঠি যাঁহাদের হাতে ছিল, তাঁহাদের নির্দেশক্রমেই এইসব উপ-নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়।" যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ-শাসকচক্র সর্বশক্তি নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ পুঁজিপতিরা প্রকাশ্যে ক্ষমতাসীন দলকে অর্থ যুগিয়েছিলেন। 'দেশের সংবাদপত্রগুলিও প্রায় একচেটিয়া মুসলিম লীগকে সমর্থন দিতে লাগিল" (পত্র পত্রিকাগুলোর প্রায় অধিকাংশ, সবসময়ই জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে) নতুন পত্রিকা ইত্তেফাক (তখন সাপ্তাহিক ছিল এবং ঘটনা ক্রমে দৈনিক মিল্লাত) যুক্তফ্রন্টের সমর্থক ছিল। যুক্তফ্রন্ট গঠনের পর লীগের পরাজয় অবধারিত মেনে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ফজলুল হকের সঙ্গে আঁতাতের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরে আইন শৃঙ্খলার অজুহাতে নির্বাচন পিছিয়ে এবং ফ্রন্ট সমর্থক সাত-আটশত কর্মীকে গ্রেফতার তার করেও ফল হলোনা। ৯৬.৩টি আসন পেয়ে 'পাক-ভারতের নির্বাচনী ক্ষেত্রে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি' এবং উপমহাদেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো যুক্তফ্রন্ট। কেন্দ্রের কায়েমী স্বার্থবাদী শাসকচক্র 'পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচার শুরু করিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি ঘৃনা বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াই মূলত যুক্তফ্রন্ট জয়যুক্ত হইয়াছে।" পরাজয়ের গ্লানি ঢাকার জন্য কেন্দ্রীয় লীগও কুচক্রী শাসকবৃন্দ মিথ্যা ও কাল্পনিক উক্তি

Dhaka University Institutional Repository

করে পূর্ব পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃনার বীজ ছড়াতে লাগলো। কায়েমী স্বার্থীদের ধর্মই হল, স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটলেই তারা দ্বিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে পড়ে। তবে এর দ্বারা তখন জাতীয় স্বার্থ ও সংহতি বিপুলভাবে বিঘ্নিত হয়। কিন্তু সুদূরপরাহত 'স্বাধীনতা' ত্বরান্বিত হলো। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক-শোষক-রাজনীতিক এবং আমলাদের কাছে জাতীয় স্বার্থ, সংহতি ও স্থিতিশীলতার অর্থ ছিল তাদের নিজেদের স্বার্থ ও স্থায়িত্ব। এদেরই চক্রান্তে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ও মন্ত্রীসভা ভণ্ডুল হয়। তবে আভ্যন্তরীণ কোন্দল ইত্যাদির জন্য 'জনসাধারণ যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের উপর যে নজিরবিহীন আস্থা স্থাপন করিয়াছিল, তাঁরা সেই আস্থার মর্যাদা রক্ষা করিতে ব্যর্থ হন।'[২৭]

যুক্তফ্রন্টের দুর্বলতা ছিল এর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দলের মত-পথের পার্থক্য। তাছাড়া ফ্রন্টের প্রধান তিন নেতার মধ্যেও মতের অনৈক্য সৃষ্টি হয়। ফ্রন্টের (সরকারের) প্রধানমন্ত্রী হক সাহেবের নানান উক্তিকে দেশদ্রোহীতার নমুনা রূপে উপস্থাপন করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়। পূর্ব বাঙলার রাজনৈতিক নেতাদের উপর নির্যাতনের ঝড় বয়ে যায়। কিছুকাল পর গভর্ণরের শাসন প্রত্যাহার করা হলে পুনরায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। পূর্বেই আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করেছিল (১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫)। তাঁরা বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সনের জুলাই-আগষ্ট মাসে পূর্ব বাঙলায় তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দিলে ভূখা-মিছিলের মুখে ৩০ আগষ্ট ১৯৫৬ সরকার পদত্যাগ করে। ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ পূর্ব বাঙলায় আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ-কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে দলভাঙন, ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন দেশের পরিস্থিতি ঘোলাটে করে দেয়।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা বৃটিশের ট্রেনিং প্রাপ্ত আমলাদের (আমলাতন্ত্রের) কবলিত হয়ে পড়ে। অথচ স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনকল্যাণমুখী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ—যার দায়িত্ব ছিল একমাত্র রাজনীতিকদের ; অথচ পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং উন্নয়ন-পরিকল্পনা প্রনয়নে আমলাদের প্রাধান্যই স্বীকৃত ছিল। 'ফলে দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতি বিপর্যস্ত ও অর্থনৈতিক কাঠামো অগণমুখী হয়ে পড়ে। এমনিভাবে গোড়াতেই শাসন ব্যবস্থায়, রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণ প্রভৃতিতে আমলাদের প্রশ্রয় দেবার ফলে তাঁরা (চৌধুরী মুহম্মদ আলী, ইস্কান্দার মীর্জা প্রমুখ) ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও কব্জা করে বসেন। জেনারেল মুহমন্দ আইউব খান সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে 'প্রেসিডেন্ট' হয়েছিলেন। ইস্কান্দার মীর্জা বৃটিশ এজেন্ট হিসেবে ষড়যন্ত্র, ঘুষ আদান-প্রদান ও অন্যান্য দুর্নীতিতে হাত পাকিয়ে যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় (গ., জে.) অধিষ্ঠিত হলেন তখন পাকিস্তানের রাজনীতি সম্যকভাবে ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে পর্যবসিত হয়।

পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ দেশকে কোনো শাসনতন্ত্র দিতে পারেনি। ১৯৪৬-এ নির্বাচিত বিধানসভার সদস্যদের মনোনীত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত গণপরিষদে মুসলিমলীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় সরকার গনপরিষদকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে। ১৯৫৪-র ২৪শে অক্টোবর গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ গণপরিষদ বাতিল করেন। ১৯৫৫-র ৩১শে মে পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠিত হয়। ৭ জুলাই ১৯৫৫ এর প্রথম অধিবেশন বসে। মুসলিমলীগ—যুক্তফ্রন্ট কোয়ালিশন সরকার ৯ জানুয়ারী ১৯৫৬ তে শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া বিল গণপরিষদে উপস্থাপন করলে কিছু সংশোধনীর পর তা গৃহীত হয়। ২৩শে মার্চ ১৯৫৬ থেকে এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী দেশ শাসিত হতে আরম্ভ করে। গণপরিষদ পার্লামেন্ট হিসেবে কাজ করে। পার্লামেন্ট সদস্যদের ভোটে ইস্কান্দার মীর্জা গভর্ণর জেনারেল থেকে পাকিস্তান ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

এই শাসনতন্ত্রে 'পূর্ববাঙলা'কে 'পূর্ব পাকিস্তান' করা হয়। জনসংখ্যার ভিত্তি পরিহার করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যাসাম্যের ভিত্তি মেনে নেয়া হয় এবং পশ্চিমপাকিস্তানের চারটি প্রদেশকে বিলুপ্ত করে দিয়ে এক ইউনিট হিসেবে 'পশ্চিম পাকিস্তান' প্রদেশ গঠন করা হয়। এতে পাঞ্জাবী পুঁজিপতি ও শামন্ত স্বার্থের সুযোগ পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলেই অবারিত হয়। উর্দু এবং বাংলা এই দুটি ভাষাকেই ভবিষ্যতে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি দেয়া হয়। পাকিস্তান পত্তনের সাড়ে আটবছরেও 'শাসনতন্ত্র' প্রণীত না-হবার পেছনে পাকিস্তানবাদীচক্রের অশুভ ষড়যন্ত্র কার্যকর ছিল। লাহোর প্রস্তাবের মূলনীতিকে পাশকাটিয়ে 'একধর্ম এক রাষ্ট্র একজাতি' 'পাকিস্তানের' অন্তরায় বাঙালীত্ব ধ্বংসের কাজগুলো শেষ করার জন্যই শাসনতন্ত্র প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রিতা দেখাচ্ছিল। শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন দেশে খুব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল বলে পূর্ববাঙলার নেতৃবৃন্দ স্বায়ত্বশাসন ও ন্যায়-সঙ্গত অনেক স্বার্থ বিসর্জন দিয়েও অগণতান্ত্রিক এই শাসনতন্ত্র (১৯৫৬) গ্রহণে সম্মতি দিয়েছিলেন বলে অনেক ভাষ্যকার মন্তব্য করে থাকেন।

যুক্তফ্রন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ অঙ্গদল আওয়ামী লীগ দিখণ্ডিত হয়েছিল ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৫৭ সনের ২৫শে জুলাই। রাষ্ট্র ক্ষমতায় অংশ গ্রহণকারী সোহরাওয়ার্দীর অনুসারী আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি, পূর্ব বাঙলার স্বায়ত্বশাসন ও ২১ দফা বাস্তবায়নের প্রশ্নে ভাসানীপন্থীদের তীব্র বিরোধের ফলেই 'ন্যাপ' এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। গণতন্ত্রীদল ন্যাপের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। অন্যান্য বামপন্থীরাও ন্যাপে যোগদান করেন। 'ন্যাপ' পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন কায়েম, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল, স্বাধীন পররাষ্ট্র-নীতি অনুসরণ, কল্যাণমূলক রাস্ট্রগঠন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা ও সমাজ তান্ত্রিক দেশের সঙ্গে পাকিস্তানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। এবং এই পার্টির নেতৃত্বেই চরম নির্যাতনের মধ্য দিয়েও পূর্ব বাঙলায় স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ নিয়ে এক ইউনিট বা প্রদেশ-গঠনের বিরোধিতাও এই দল করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের রিপাবলিকান পার্টিও এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করে, কারণ এই ব্যবস্থায় পশ্চিমের ছোট ছোট প্রদেশগুলো পাঞ্জাবের নিয়ন্ত্রণভুক্ত হয়ে পড়েছিল। সোহরাওয়ার্দী তাঁর কোয়ালিশন সরকারের প্রধান শরিকদল রিপাবিলকান পার্টির (ডাঃ খান সাহেব ১৯৫৬-র ২৩ এপ্রিল লাহোরে গঠন করেন) মতামত উপেক্ষা করে এক ইউনিটের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে জনসভা করতে থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর এ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া রিপাবলিকানদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলনা বলে সোহরাওয়ার্দীর উপর থেকে তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবার কথা ইস্কান্দার মীর্জাকে অবহিত করলে ১৬ অক্টোবর ১৯৫৭ তিনি সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। ১৮ই অক্টোবর (১৯৫৭) কেন্দ্রে চুন্দ্রীগড়-মন্ত্রীসভা ক্ষমতাসীন হয়ে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে যুক্ত নির্বাচন বনাম পৃথক নির্বাচন বিতর্কে দেশের রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গন উত্তপ্ত রূপ ধারণ করে। চুন্দ্রীগড় কোয়ালিশন সরকার এর প্রধান শরীকদল রিপাবলিকান পার্টি প্রধান মন্ত্রীকে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখার জন্য পরামর্শ দেয়, কিন্তু আই. আই. চুন্দ্রীগড় রিপাবলিকানদের সাথে নির্বাচনপদ্ধতি সম্পর্কে একমত হতে না-পেরে ১১ ডিসেম্বর ১৯৫৭ প্রধানমন্ত্রীর পদথেকে পদত্যাগ করেন। তাঁর সরকারের আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র উনষাট দিন।

১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ পাকিস্তানের প্রথম যে শাসনতন্ত্র গৃহীত হয় তার ভিত্তিতে দেশে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। রিপাবলিকান পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা ফিরোজ খান নুন ১৩ ডিসেম্বর ১৯৫৭ সনে কেন্দ্রে সরকার গঠন করেন। কংগ্রেস ও কে-এস-পি এতে যোগদান করে। যুক্ত নির্বাচন প্রথায় দ্রুত জাতীয় পরিষদের নির্বাচন দেয়ার শর্তে আওয়ামী লীগ নুন-সরকারের প্রতি সমর্থন স্থাপন করলে প্রদত্ত শর্ত মোতাবেক ১৯৫৯ সনের ১৫ ফেব্রুয়ারী পার্লামেন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ধার্য হয়। মুসলিম লীগ ব্যতীত রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানায়। সাথে সাথে কায়েমী-স্বার্থী ষড়যন্ত্রও শুরু হয়ে যায়। তারা বুঝাতে পেরেছিল দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের বিজয় সুনিশ্চিত। নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রে জনসমর্থিত, জবাবদিহিমূলক ও স্থিতিশীল সরকার অধিষ্ঠিত হলে তাদের চিরস্থায়ী স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটবে। তাই সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র শিল্পপতি ও পুঁজিপতিগণ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ভূস্বামীরা একজোট হয়ে নির্বাচন বানচাল ও ক্ষমতা দখলের গোপন চক্রান্তে লিপ্ত হয়।

পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা গোড়া থেকেই ভালো যাচ্ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানে পাটের দর পড়ে গিয়েছিল। পাটের মন ছিল আট-দশ টাকা। রফতানী আয়ের চাইতে আমদানী ব্যয় অনেক বেড়ে গিয়েছিল। স্টেট ব্যাংকে সোনার মজুদ হ্রাস পেয়েছিল। ঘাটতির ফলে বৃদ্ধি পেয়েছিল খাদ্যশস্যের মূল্য। মার্কিন ঋণের উপর দেশ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। দেশের রাজনীতিতে কলহ, কোন্দল, দলাদলি ও নীতিহীনতা চরমে পৌছায়। পরিষদ সদস্য ও রাজনৈতিক নেতাবুদ্ধিজীবীরা অহরহ দলমতগোত্র বদল করতেন। কোন্ সদস্য কোন্ কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী বা এলিট কখন কোন্ দলে আছেন তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়তো। কেন্দ্রে ও প্রদেশে ঘনঘন সরকার পরিবর্তন ঘটতে থাকায় সরকারের উপর মানুষের আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ শিথিল হয়ে পড়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে এসময় একটি ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটে। পরিষদের ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী ১৯৫৮র ১৯শে সেপ্টেম্বর কৃষক-শ্রমিক-পার্টি ত্যাগ করে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। পরের দিন ২০ শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ পরিষদের অধিবেশন বসে। ঐদিন ন্যাপ-সদস্য দেওয়ান মাহবুব আলী পরিষদের স্পীকার আবদুল হাকিমের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আওয়ামী লীগ কংগ্রেস ও ন্যাপের সদস্যরা অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন। প্রস্তাবটি সংখ্যাধিক্য ভোটে পাশ হয়। ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীর সভাপতিত্বে পরিষদের অধিবেশন পুনরায় শুরু হয়। বিরোধী দলগুলোর (কৃষক-শ্রমিক পার্টি, মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম) সদস্যরা স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশের সত্যতা অস্বীকার করে। বাক্‌বিতণ্ডার পরিনতিতে সংঘর্ষে আহত হয়ে শাহেদ আলী ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানেও সুস্থ রাজনীতিচর্চার পরিবেশ ছিলনা। দেশের বিশৃঙ্খল অবনতিশীল আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা জনসাধারণের মনে প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি করে। এই সুযোগে ক্ষমতালিপ্সু ষড়যন্ত্রকারীরা সেনাপতি আইউব খানের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ৬ অক্টোবর ১৯৫৮ শাসনতান্ত্রিক সরকার উৎখাত করে অবৈধ পন্থায় ক্ষমতা দখল করে নেন। এই ষড়যন্ত্রের ও অভ্যুত্থানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগ ছিল বলে অনুমান করা হয়।

প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর সারা পাকিস্তানে সামরিক আইন জারী করে আইউব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেন। আইউব খান ২৭শে অক্টোবর ইস্কান্দার মীর্জাকে বল প্রয়োগে দেশ থেকে বহিস্কৃত করে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্র, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ, সমস্ত রাজনৈতিক দল ও কার্যক্রম বাতিল করা হয়। সকল মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখা হয় এবং সভা ও মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং সংবাদপত্রের ওপর সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়। রাজনৈতিক নেতাদেরকে পাইকারি হারে কারারুদ্ধ করা হয়। এবডো (ঐলএচটইুএ ঁডওডইএস ঢইসদতঅলইইেচঅটইওন ওরডইনঅনচএ ১৯৫৯) আইনের মাধ্যমে প্রায় ৭০০০ নেতা ও কর্মীকে রাজনীতি থেকে বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ করানো হয়। দুর্নীতির অভিযোগে অনেক সরকারী বড়-কর্মকর্তা (সিএসপি- ইঞ্জিনিয়ার প্রমুখ)-র বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আতঙ্কের ফলে অনেকে অসুস্থ হন ও মৃত্যুবরণ করেন। আত্মহত্যা করেন অনেক আত্মসম্মান বোধ সম্পন্ন অফিসার। ১৯৫৯ সনের জুলাই মাসের মধ্যে ৮১৩ জন বরখাস্তসহ ১৬৬২ জন অফিসার শাস্তিপ্রাপ্ত হন। মার্শাল ল রেগুলেশনে কোনো প্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা এবং সংহতি-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য মৃত্যু দণ্ডের পর্যন্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সামরিক শাসনের সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া কি হবে তা নিয়ে সচেতন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বগণ উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত হলেও 'সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ কিছুটা উল্লাসের ভাব লক্ষ্য করা গেল।' ক্ষমতায় এসেই আইউব পূর্ব বাঙলায় জনপ্রিয় হতে পেরেছিলেন-যদিও এজন্য তাঁর নিজস্ব কোন কৃতিত্ব ছিলনা। ঐতিহাসিক কারণেই তিনি জননন্দিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এবং বলাবাহুল্য, যুক্তফ্রন্টের ব্যর্থতাই জনগণের কাছ থেকে আইউবের অভিনন্দন লাভের কারণ মূল কাল ছিল। যুক্তফ্রন্ট নেতাদের প্রতি জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে তারা কোন নতুন শক্তির আবির্ভাব কামনা করছিলেন। আইউব খান যেহেতু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন এসেছিলেন, মূলত সেই কারণেই পূর্ব বাঙলার জনগণ তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন। তাছাড়া দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি কাজ করবেন এবং অচিরেই ক্ষমতা ছেড়ে চলে যাবেন—এইসব আশ্বাস দ্বারা জনগণকে আশ্বস্ত করা সম্ভব হয়েছিল।সামরিক শাসনের ভয়ে দ্রব্যমূল্য, দুর্নীতি ও রাজনীতি কিছু কালের জন্য স্থগিত থাকলেও মাস ছয়েকের মধ্যেই দ্বিগুণ হয়ে গেলো। দুর্নীতি পরায়ণ ব্যবসায়ী আর সরকারী কর্মচারীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে। ১৯৬১ সালের শেষ দিক থেকে কঠোর স্বৈরাচারী শাসন-নিপীড়নের মধ্যেও আইউব সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সংগ্রাম দানা বাধতে থাকে। সরকার নতুন শাসনতন্ত্র (১৯৬২) জারির একমাস পূর্বে ১৯৬২-র ৩০শে জানুয়ারী করাচীতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করে। প্রতিক্রিয়ায় ঢাকায় ছাত্রদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ১লা

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারী ১৯৬২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এ গ্রেফতারের প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করে। উপর্যুপরি পাঁচদিন ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৬২ ছাত্ররা সামরিক বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করে ঢাকার রাস্তায় প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। শোভাযাত্রীরা সামরিক আইনের বিরুদ্ধে গগনবিদারী ধ্বনি তোলে। তারা সামরিক আইন প্রত্যাহার গণতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠা ও সোহরাওয়ার্দীসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবি করে। আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও ছাত্রদের ব্যাপকহারে ধরপাকড় শুরু হয়। আবুল মনসুর আহমদ, কফিল উদ্দিন চৌধুরী, শেখ মুজিব, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এবং আরও বহু রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও ছাত্রদের গ্রেফতার করা হয়। ফলে আন্দোলন তীব্রতর আকার ধারণ করে। এই আন্দোলনের মুখেই প্রেসিডেন্ট আইউব ভোটাধিকারের প্রশ্নে জনমত যাচাইয়ের জন্য ভোটাধিকার কমিশন গঠন করেন। কিন্তু ভোটাধিকার কমিশন-এর সুপারিশ উপেক্ষা করে আইউব ক্যাবিনেট কমিটি গঠন করে নতুন শাসনতন্ত্র প্রনয়নের দায়িত্ব দেন। সামরিক শাসন ও শাসনতন্ত্র বিরোধী এ আন্দোলন পূর্ব বাঙলার সকল শহর বন্দর ও গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। আইউব খানের বজ্র কঠিন সামরিক আইনের বিরুদ্ধে ছাত্রদের এ আন্দোলন সরকার-বিরোধী ভবিষ্যৎ আন্দোলন পরিচালনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। এ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন। আইউব খান অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী পন্থায় শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে 'মৌলিক গণতন্ত্র' ও 'ইসলামিক প্রজাতন্ত্র' প্রবর্তন করেন (১লা মার্চ ১৯৬২)। ছাপ্পান্নর শাসনতন্ত্রের মতোই এক্ষেত্রেও অমুসলমানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার খর্ব করা হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার সংখ্যাসাম্য নীতি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা বলবৎ রাখা হয়। নয়া শাসনতন্ত্রে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অনেকখানি বিকেন্দ্রীকরণ করা হলেও জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়াবলীকে একটিমাত্র তালিকায় স্থান দিয়ে তালিকাটির একচ্ছত্র নিয়ন্তা করা হয় কেন্দ্রীয় সরকারকে। অবশিষ্ট বিষয়াবলী প্রদেশের হাতে রাখা হলেও দেশের দুই অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ সমন্বয় ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের কুক্ষিগত করা হয়। এই শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ আরও বেশী রাখা হয়। প্রদেশের গভর্ণরের নিয়োগকর্তাও প্রেসিডেন্ট। এবং তাঁকে গভর্ণর পদে বহাল রাখা না-রাখা প্রেসিডেন্টের অভিরুচির উপর নির্ভরশীল। প্রাদেশিক মন্ত্রীরা বা কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট, সেই গভর্ণরই অধস্তন কর্মচারী বিশেষ। এইসব কারণে দেশের প্রশাসনিক কাঠামোতে ফেডারেল সরকার অপেক্ষা ইউনিটারী ধরণেরই বৈশিষ্ট্য ছিল বেশী। বলা বাহুল্য, ১৯৬২ সনের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট আইউব প্রদত্ত শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও দেশের রাজনৈতিক দল রাখার কোন বিধান ছিলনা। মৌলিক গণতান্ত্রিক প্রথায় ১৯৬২-র ২৮ এপ্রিল নির্দলীয় ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে উপরোক্ত 'এবডো' প্রয়োগ করে দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদেরকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে দূরে রাখা হয়। ১৮ জুন ১৯৬২ তে রাওয়াল পিণ্ডিতে জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে এবং সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হয়। সামরিক শাসন অবসানের পরপরই ছাত্র আন্দোলনের মুখে ২৪শে জুন পূর্ব পাকিস্তানের নয়জন নেতা আইউবী শাসনতন্ত্রের বাতিল এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নয়া শাসনতন্ত্র রচনার দাবিতে এক যুক্ত বিবৃতি দিলেন। এই নয় নেতা হলেন — নূরুল আমীন, আতাউর রহমান খান, আবু হোসেন সরকার, হামিদুল হক চৌধুরী, পীর মোহসিন উদ্দিন (দুদুমিঞা), সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া) ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), মাহমুদ আলী এবং শেখ মুজিবর রহমান। এই বিবৃতি প্রকাশের মাত্র ৮দিন পূর্বে ১৬ জুন শেখ মুজিবুর রহমান এবং ইত্তেফাক—সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া জেল থেকে মুক্তি পান। শহীদ সোহরাওয়ার্দী সহ অন্যান্য রাজবন্দীর মুক্তির দাবিতে ও নয় নেতার বিবৃতির সমর্থনে পল্টনে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রদেশব্যাপী এই নয় নেতার বিবৃতিতে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মুক্তির দাবিতে পরিষদে ও পরিষদের বাইরে তুমুল আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলো। এরপরে (১৯৬২—১৭ সেপ্টেম্বর) আইউব—বিরোধী ছাত্র—আন্দোলন প্রমাণ করে যে আইউব-সরকারও অপরাজেয় নয়।

১৯৬২ সালের ছাত্রদের শিক্ষা কমিশন বিরোধী উপর্যুক্ত আন্দোলন ছিল মূলত ঃ দেশে গণতন্ত্র প্রবর্তন ও মানবিক অধিকার সমূহের নিশ্চয়তা বিধানের দাবি। কিন্তু তার স্ফূরণ ঘটে কমিশনের শিক্ষা-সংকোচন নীতির কালো দলিল বাতিলের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। সেইসঙ্গে পূর্ব বাঙলার স্বায়ত্তশাসনের দাবীও তখন নতুনভাবে উঠতে থাকে। 'ন্যাপ' গঠন কালে স্বায়ত্তশাসনের দাবি করলেও (১৯৫৭) বাষট্টি পরবর্তীকালে প্রধানত আওয়ামী লীগই এই দাবিকে সোচ্চার রাখে। এসময়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও পুস্তিকার মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পূর্ববাঙলার বঞ্চনার চিত্রটি সরকারের ও জনগণের গোচরীভূত হতে থাকে।

১৯৬২ সনের শাসনতন্ত্র এবং শাসনতন্ত্র অনুযায়ী মৌলিক গণতন্ত্রীদের মাধ্যমে অনষ্ঠিতব্য নির্বাচন উপলক্ষ করে পূর্ব পাকিস্তানে যে আন্দোলন দেখা দেয়—তার ফলে সামরিক শাসন প্রত্যাহৃত হয়েছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সারা পাকিস্তানে, বিশেষত পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বাষট্টির শাসনতন্ত্র ও মৌলিক গণতন্ত্র বাতিল এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিতব্য গণ-পরিষদ মারফত নয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু শহীদ সোহরাওয়ার্দী জেল থেকে ১৯ আগষ্ট ১৯৬২ তারিখে মুক্তিলাভের পর এই দাবি সমর্থন না করে গণতান্ত্রিক পথে আন্দোলন পরিচালনার স্বার্থে প্রচলিত শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণ বাতিলের পরিবর্তে শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রায়ণের (democratization of the constitution) দাবি উত্থাপন করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, প্রচলিত শাসনতন্ত্র বাতিল করলে দেশে পুনরায় শাসনতান্ত্রিক শূন্যতার সৃষ্টি হবে। ৫ অক্টোবর (১৯৬২) তিনি দুই প্রদেশের সর্বদলের ৫৪জন নেতার সমন্বয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের (National Democratic Front) গঠন করেন। এই সংস্থা দেশের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করতে ব্যর্থ হয়। কারণ ফ্রন্ট নেতাদের অনেকেই ছিলেন গণধিকৃত। মওলানা ভাসানী ফ্রন্টের কোন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নেই বলে তাতে যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন। নিজেও কোন কর্মসূচী না দিয়ে ফ্রন্টের মতই গণতন্ত্রের দাবি উত্থাপন করেন। ব্যাপক জনমতের প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট আইউব ভোটাধিকার প্রশ্ন বিবেচনার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিশন গঠন করেন এবং ঘোষণা দেন যে, জনগণ প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার দাবি করলে তিনি তাতে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন না। এই সময় তাঁর সম্মতিতে জাতীয় পরিষদে মৌলিক অধিকার বিল পাস হয়। কিন্তু পরবর্তীকালের ঘটনাপ্রবাহ সবকিছু ওলট পালট করে দেয়। সোহরাওয়ার্দীর অসুস্থতা, চিকিৎসার্থে বিদেশ গমন, (৫ ডিসেম্বর ১৯৬৩) এবং

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের অঙ্গদলসমূহের পুনরুজ্জীবন লাভ পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়। ফ্রন্টের ঐক্য ভেঙ্গে গিয়ে ভালোই হলো। ৬ দফার আন্দোলন জন্মলাভের ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো শেখ মুজিবের 'আওয়ামীলীগ' পুনরুজ্জীবনের (২৫ জানুয়ারী, ৯১৬৪) মাধ্যমে। নয় নেতার বিবৃতির শুভ প্রতিক্রিয়ায় দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এর সম্ভাবনা দেখা দিলে সরকারও এর মোকাবিলা করার জন্য রাজনৈতিক দল গঠনের নীতিমালা এবং নতুন আইন প্রণয়ন করেন।

রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার দেয়া হলে ১৯৬২-র ৪ সেপ্টেম্বর করাচীতে চৌধুরী খালিকুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে মুসলিম লীগ পুনরুজ্জীবিত হয়। খালিকুজ্জামান দলের প্রধান সংগঠক নির্বাচিত হন। 'কনভেনশন মুসলিম লীগ' নামে এই দল আইউব খানের কার্যাবলী সমর্থন করতো। মন্ত্রীরা ছিলেন এর কর্মকর্তা। আইউব খান ১৯৬৩ সনের ২৭শে মে খালিকুজ্জামানকে অপসারণ করে কনভেনশন মুসলিমলীগের সভাপতি হন। পক্ষান্তরে আইউব-বিরোধী মুসলিম-লীগাররা ঢাকার বার লাইব্রেরী হলে ১৯৬২ সনের ২৭শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত সম্মেলনে খাজা নাজিমুদ্দিন ও সরদার বাহাদুর খানকে (আইউব খানের ভাই) যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করে 'কাউন্সিল মুসলিম লীগ' গঠন করে সরকার-বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এর পূর্বপাকিস্তান শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে খাজা খয়ের উদ্দীন ও শফিকুল ইসলাম।

শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৬৪-র ২৫শে জানুয়ারী আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত হয়। ৮ মার্চ ১৯৬৪ ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে পার্লামেন্ট ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন, পরিষদের প্রাধান্য স্বীকার করে একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম ও দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনের কর্মসূচী গৃহীত হয়।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪ সনে ঢাকায় 'ন্যাপ' পুনর্গঠিত করেন। প্রাপ্তবয়স্কদে ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও নেজামে ইসলাম সমন্বয়ে ১১ মার্চ ১৯৬৪ সনে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং এঁদের ডাকে ১৯৬৪-র ১৯ মার্চ ঢাকা সহ সারা পূর্ব বাঙলায় স্বতস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। বিরোধী দলগুলোর ব্যাপক আন্দোলনের ফলে সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবী জনপ্রিয়তা লাভ করে।

মৌলিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সারা পাকিস্তানে বিভিন্ন স্তরের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৪-৬৫ সনে। নির্বাচনের প্রাক্কালে সংঘবদ্ধভাবে অবতীর্ণ হবার জন্য পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হবার তাগিদ অনুভব করেন বিরোধীদলগুলো। মওলানা ভাসানী থেকে আরম্ভ করে মওলানা মওদুদী পর্যন্ত সকল বিরোধী নেতা ও দল একত্রিত হয়ে (২ জুলাই ১৯৬৪) গঠন করেন কম্বাইণ্ড অপোজিশন পার্টি (কপ) বা সম্মিলিত বিরোধীদল। কপের অঙ্গদলগুলোর মধ্যে ছিল আওয়ামী লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, ন্যাপ, নেজামে ইসলাম ও জামাতে ইসলাম। ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট আইউব খানের বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কপ 'মাদারে মিল্লাত' ফাতেমা জিন্নাহকে (১৮৯৪-১৯৬৭) প্রার্থী মনোনয়ন দান করেন এবং নয়দফা কর্মসূচী প্রকাশ করা হয়। পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এর অন্যতম শর্ত ছিল। বিপুল উদ্যমে নির্বাচনী প্রচারণায় অবতীর্ণ হয়ে জনগণকে তাঁরা বল্লেন মিস জিন্নাহ নির্বাচনে জয়লাভ করলে সার্বজনীন ভোটাধিকার, পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার এবং বাক্-ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে। নির্বাচনে আইউব খানের জয় হয়েছিল। ফাতেমা জিন্নাকে দিয়ে জনগণ শুধু আইউবের পরাজয়ই কামনা করেছিল। কিন্তু জনগণের ভোটাধিকার ছিলনা। তাঁরা যাঁদেরকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছিলেন, সেই মৌলিক গণতন্ত্রীদের কিনে নিতে আইউবের খুব বেশি টাকা খরচ করতে হয়নি এবং বেগও পেতে হয়নি। আইউবের জয় পূর্ব থেকেই নিশ্চিত ছিল।

'কপ' গঠন এবং ফাতেমা জিন্নাহকে মনোনীত করার ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক নেতা ও দলসমূহের চিন্তাধারা ও কর্মসূচীতে বিরাট অসঙ্গতি ফুটে ওঠেঃ "যাঁরা ইতিপূর্বে প্রায় দুই বছর ধরে প্রচার করেছেন যে (১৯৬২-৬৪) আইউব প্রদত্ত শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক, এই শাসনতন্ত্র তাঁরা মানেন না, এই শাসনতন্ত্রকে মেনে নিয়ে কস্মিনকালেও কোন গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে ক্ষমতায় আসা কিংবা আইউব-সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব নয়,—তাঁরাই এই শাসনতন্ত্রের অধীনে নির্বাচনে অংশ গ্রহণে তৎপর হয়ে ওঠেন। তাঁদের এই মত পরিবর্তন সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা জনগণের সামনে কেউই উপস্থাপিত করেননি। আর একটি লক্ষ্য করবার মত বিষয় এই যে, ১৯৫৪ সনের যুক্তফ্রন্টের ব্যর্থতার করুণ অভিজ্ঞতা থাকার পরও..... গঠন করেছিলেন সম্মিলিত বিরোধী দল। তাছাড়া দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল সমস্যা অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠার পরও তাঁরা একমাত্র গণতন্ত্র ও অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক বিষয়ের দাবী ছাড়া অন্য কোন কর্মসূচী জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারেননি। আর গণতন্ত্রের প্রশ্নেও কারও কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা ছিলনা।" নির্বাচনে জয়লাভ করার পর আইউব সরকারের অত্যাচার শতগুণ বেড়ে যায়। "মৌলিক গণতন্ত্রী, টাউট, বদ মাতব্বর, আমলা, ব্যবসায়ী ও কনভেনশন লীগের লোকেরা যারা আইউবের সমর্থক ছিল—দেশের সকল স্তরের জনগণের উপর অকথ্য নির্যাতন আরম্ভ করে। এই নির্যাতন মধ্যযুগের কুখ্যাত অত্যাচারী সামন্ত শাসকদের বর্বরতাকেও অতিক্রম করে যায়। ছাত্রদের মধ্যে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (এন এস এফ) নামে এক সুসংগঠিত গুণ্ডাবাহিনী গড়ে তোলা হয়। এই গুণ্ডাবাহিনীর অত্যাচারে সারা পূর্ব বাঙলায় ছাত্রদের ও শিক্ষকদের জীবন অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।"[২৮]

আইউব খান বীরত্ব প্রকাশের অভিলাষে এবং আজীবন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট থাকার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় কাশ্মীর বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে 'মুজাহিদ বাহিনী' নাম দিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের অনুপ্রবেশ ঘটান। যুদ্ধের সময় (৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫) আইউব সরকার ভারত-বিদ্বেষের শ্লোগান দিয়ে এবং ইসলামের দোহাই দিয়ে সারা দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হন। জনগণ আইউব সরকারকে তখন দেশের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে সমর্থন জ্ঞাপন করেন, কিন্তু আভ্যন্তরিণ নীতির ব্যাপারে জনগণের অনাস্থার মনোভাবে পরিবর্তন ঘটে সামান্যই। বরং যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নতুন করে পূর্ববঙ্গবাসী জনগণের মনে নতুন সংশয়ের সৃষ্টি করে দেয়। স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষা যুক্তিভিত্তি পেয়ে তীব্রতর হয়।

যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় বাঙলার রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর রূপরেখা সম্পর্কে নতুন চিন্তা দানা বাঁধে।[২৯]

নির্বাচনে জয়লাভ করে আইউব খান পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটান। রাশিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষুব্দ হয়ে পাকিস্তানে অর্থ সাহায্য সঙ্কুচিত করে ফেলে। তবে সেজন্য আইউব খানকে বিপাকে পড়তে হয়নি রাশিয়ার জন্য। তাঁরা (রাশিয়া)পাকিস্তানের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য প্রদান করেন। 'ন্যাপ' আইউবের এই পররাষ্ট্রনীতির সমর্থক হয়ে ওঠে। ভাসানী ১৯৬৩ সনে সরকার দলের নেতারূপে চীনের বিপ্লব বার্ষিকীতে যোগদান করতে যান। সেখানে নাকি মাওসেতুঙ ভাসানীকে আইউবের বিরোধীতা না করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। রাশিয়ার মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইউব খান ও ভারতের প্রধামন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যে ১৯৬৬ র ১০ই জানুয়ারী তাসখন্দে স্বাক্ষরিত এক চুক্তিপত্রে ভারত ও পাকিস্তানের দখলীকৃত এলাকা থেকে ১৯৬৬-র ২৫ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে নিজনিজ দেশের সৈন্য ১৯৬৫-র ৫ সেপ্টেম্বরের সীমানায় সরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ চুক্তিতে কাশ্মীরের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবী স্বীকৃত না-হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানে তাসখন্দ চুক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয় এবং পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬তে লাহোরে আওয়ামী লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম প্রভৃতি বিরোধী দলুগলোর এক জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সাবজেক্ট কমিটির কাছে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্বপাকিস্তানের মুক্তি সনদ ৬ দফা কর্মসূচী উপস্থাপন করেন। কিন্তু সম্মেলনের উদ্যোক্তারা আলোচনার জন্য তা বিষয়-নির্বাচনী কার্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করায় শেখ মুজিবুর রহমান সম্মেলন বর্জন করে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। ঢাকায়, বিমান বন্দরে ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ তে তিনি সাংবাদিকদের কাছে ৬ দফা প্রকাশ করেন। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক শোষণ-নিপীড়ণে অতিষ্ঠ জনগণের কাছে ৬ দফা মুক্তির দূত রূপে আবির্ভূত হয়েছিল। কারণ জনগণ অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে একটা আমূল পরিবর্তন কামনা করছিল। এ-প্রয়োজন অনেক আগে থেকে অনুভূত হয়ে আসলেও তা তখন পরিপক্কতা লাভ করে তীব্র হয়ে উঠেছিল। ঠিক সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে, শেখ মুজিবুর রহমান চরম নিপীড়নের এবং মারাত্মক ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে বিরাট নৈতিক সাহসের সঙ্গে জনগণের নিকট ছয়দফা ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এই কর্মসূচী শেখ মুজিবুর রহমানের জবানীতে প্রকাশিত প্রচারিত ও সভাসমিতিতে উপস্থাপিত হতো যা নিম্নরূপ ঃ

ছয় দফা ১৯৬৬

১. **শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি ঃ** ঐতিহাসিক লাহোর – প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করত ঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভা সমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।.....

২. **কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ঃ** ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবল মাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।.....

৩. **মুদ্রা ও অর্থ-সম্বন্ধীয় ক্ষমতা ঃ** দুইটি বিকল্প বা অল্টারনেটিভ প্রস্তাব এর যে কোনও একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে ঃ ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সী কেন্দ্রের হাতে থাকিবেনা, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র 'স্টেট ব্যাংক' থাকিবে। খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সী থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে ; দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।........

৪. **রাজস্ব, কর ও শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা ঃ** সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা কর ধার্য্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভেনিউএর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংক সমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।......

৫. **বৈদেশিক বানিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা ঃ** এ ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হয় ঃ

১) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে ;

২) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।

৩) ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

৪) দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী-রফতানী চলিবে।

৫) ব্যবসা-বানিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রফতানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

শেখ মুজিবুর রহমান এই প্রসঙ্গে 'পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা ৩নং দফার মতই অত্যাবশ্যক, বলে মন্তব্য করে উল্লেখ করেন : 'পাকিস্তানের আঠার বছরের আর্থিক ইতিহাসের দিকে একটু নজর বুলাইলেই দেখা যাইবে যে'—

ক) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা বলা হইতেছে।

খ) পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়িয়া না উঠায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের নাই এই অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিদেশী আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইতেছে। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না।

গ) পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ আয় করে সেই পরিমাণ ব্যয় করিতে পারেনা। সকলেই জানেন, পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ রফতানী করে আমদানী করে সাধারণতঃ তার অর্ধেকেরও কম। ফলে অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম অনুসারেই পূর্ব পাকিস্তানে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালেরিয়া জ্বরের মত লাগিয়াই আছে। তার ফলে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম এত বেশী। বিদেশ হইতে আমদানী করা একই জিনিসের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী দামের তুলনা করিলেই এটা বুঝা যাইবে। বিদেশী মুদ্রা বন্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকার ফলেই আমাদের এই দুর্দশা।

ঘ) পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাট চাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্যত দূরের কথা আবাদী খরচটাও দেয়া হয়না। ফলে পাটচাষীদের ভাগ্য আজ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন, কিন্তু চাষীকে পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারেন না। এমন অদ্ভুত অর্থনীতি দুনিয়ার আর কোন দেশে নাই। যতদিন পাট থাকে চাষীর ঘরে, ততদিন পাটের দাম থাকে পনের-বিশ টাকা। ব্যবসায়ীর গুদামে চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথে তার দাম হয় পঞ্চাশ টাকা। এখেলা গরীব পাট-চাষী চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। পাট-ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়া পাট রফতানীকে সরকারী আয়ত্তে আনা ছাড়া এর কোনও প্রতিকার নাই, একথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। এ উদ্দেশ্যে আমরা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলে জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন গঠন করিয়াছিলাম। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পুঁজিপতিরা আমাদের সে আরব্ধ কাজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

ঙ) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাই যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে তা নয়, আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রার জোরে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশী লোন ও এইড আসিতেছে, তাও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইতেছে। কিন্তু সে লোনের সুদ বহন করিতে হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানকেই। ঐ অবস্থার প্রতিকার করিয়া পাট চাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য দিতে হইলে, আমদানী-রফতানী সমান করিয়া জনসাধারণকে সস্তা দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া তাদের জীবন সুখময় করিতে হইলে এবং সর্বোপরি আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পূর্ব পাকিস্তানীর হাতে পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিতে হইলে আমার প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা ছাড়া উপায়ন্তর নাই।

৬. আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা : এই দফায় আমি পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এ দাবি অন্যায়ও নয়, নতুনও নয়। একুশ-দফার দাবীতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবি করিয়াছিলাম। তাতো করা হয়ই নাই, বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ ই. পি. আর বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা ও নৌবাহিনীর হেড কোয়ার্টার স্থাপন করতঃ এ-অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবি একুশ দফার দাবি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বারো বছরেও আমাদের একটি দাবিও পুরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানীর বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবি করিতে হইবে কেন? সরকার নিজে হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? .... শত্রুর দয়া ও মর্জির উপর ত আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারিনা। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশ রক্ষা নীতি কার্যতঃ আমাদেরকে তাই করিয়া রাখিয়াছে।

তবু আমরা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির খাতিরে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে এও চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে এব্যাপারে আত্মনির্ভর করিবার জন্য এখানে উপযুক্ত পরিমান দেশরক্ষা বাহিনী গঠন করুন। অস্ত্র কারখানা স্থাপন করুন। নৌ-বাহিনীর দফতর এখানে নিয়া আসুন। এসব কাজ সরকার কবে করিবেন জানিনা। কিন্তু ইতিমধ্যে অল্প খরচে ছোটখাট অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া আধা সামরিক বাহিনী গঠন করিতেও পশ্চিমা ভাইদের এত আপত্তি কেন? পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র যুদ্ধ তহবিলে চাঁদা উঠিলে তাও কেন্দ্রীয় রক্ষা তহবিলে নিয়া যাওয়া হয় কেন? ঐসব প্রশ্নের উত্তর নাই। তবু কেন্দ্রীয় ব্যাপারে অঞ্চলের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরাও চাইনা। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান যেমন করিয়া পারে গরিবী হালেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবে, এমন দাবি কি অন্যায়? এই দাবি করিলেই সেটা হইবে দেশোদ্রোহিতা?[৩০]

লাহোর প্রস্তাবের মর্মানুযায়ী ১৯৪৭ সনে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে দুটি স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ভণ্ডুল হবার পর দুই অঞ্চলের লোকেরাই এক পাকিস্তান মেনে নিয়েছিল। পূর্ববঙ্গের কোন রাজনৈতিক দল বা সংস্থা কর্তৃক লাহোর প্রস্তাবের পূর্ণ বাস্তবায়ন দাবি করেননি বটে তবে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি গোড়া থেকেই উত্থাপিত হয়ে এসেছে। এই দাবি ক্রমশ জোরদার হয়ে ৬ দফা কর্মসূচীতে রূপলাভ করেছিল।

প্রেসিডেন্ট আইউব ক্ষমতা কুক্ষিগত করে পূর্বপাকিস্তানীদের শাসন-শোষণের জন্য পূর্বসুরীদের নীতিতে বস্তুত কোন পরিবর্তন ঘটাননি বরং একনায়ক সুলভ মানসিকতা নিয়ে সেই নীতিগুলো অনুসরণ করে গেছেন। রাজনৈতিকআমলে (১৯৪৭-৫৮) পূর্ব-পাকিস্তানে যে রাজনৈতিক নির্যাতন ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল আইউব এর শাসনামলে তা আরও শতগুণ বৃদ্ধি পায়। পূর্বে কেন্দ্রের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সুযোগ ছিল ;

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু আইউবের স্বৈরাচারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা নিরাপদ ছিলনা। প্রাদেশিক প্রশাসন যাঁদের উপর ন্যাস্ত ছিল, তাঁরাও ছিলেন তাঁরই বসংবদ ও কৃপাপ্রার্থী। মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে আইউব পূর্ব পাকিস্তানেও কায়েমী-স্বার্থী গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর দরবারে প্রকৃত জন-প্রতিনিধিদের স্থান ছিলনা। ন্যায্য অধিকারের দাবি যাঁরা করেন, জনস্বার্থের কথা তোলেন— তাঁরা রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যায়িত হন ; তাঁদের উপর চলে জেল ও জুলুম। কোন বিরোধীদলীয় নেতা আইউব খানের কোপানল থেকে নিস্কৃতি পেয়েছেন এমন নজীর বিরল। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত নেতাকে বৃদ্ধ বয়সে আইউব খানের অভিরুচি অনুযায়ী কারাজীবন বরণ করতে হয়েছিল। লাহোর প্রস্তাবের প্রণেতা পাকিস্তান আন্দোলনের প্রধানতম কর্মী নেতা এ কে ফজলুল হক পাকিস্তানী শাসকদের দ্বারা কম নির্যাতিত নিগৃহীত হননি। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয় আইউব খানের আমলে এই বৈষম্যজনিত সমস্যাবলী উত্তরোত্তর জটিলতর ও তীব্রতর হয়ে সমাধানের অসম্ভব পর্যায়ে পৌছেছিল। ১৯৫৮-৬৬ সময়কালে সামরিক আইন, অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র ও দমন নীতির দ্বারা জনমত বাহ্যতঃ স্তিমিত করা গেলেও জনগণের পুঞ্জিভূত বিক্ষোভের পরিনতি চিন্তা করে আইউব-চক্র দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। দেশ-শাসনের ব্যাপারে বাঙালীরা কখনোই প্রকৃত অংশীদার হতে পারেনি। স্বাধীনতার পূর্ণ আনন্দ থেকেও তারা বঞ্চিত হয়েছিল। এ-অবস্থায় ছয় দফা কর্মসূচী প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাঙলায় বিরাট সাড়া পড়ে যায়। বাঙ্গালীরা ব্যাপকভাবে এই কর্মসূচী সমর্থন করেন। আওয়ামী লীগ রাতারাতি জনগণের মন জয় করে নিতে সক্ষম হয়। আইউব সরকার এবং বিরোধী দলগুলোর কেউ-ই (জমাতে ইসলামী, কাউন্সিল মুসলিম লীগ) ছয় দফা সম্পর্কে একেবারে নীরব থাকতে কিংবা সমর্থনও দিতে পারলো না। অতএব আওয়ামী লীগের প্রতি কঠোর নির্যাতন মূলক ব্যবস্থা নেমে এলো। কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন অধিকাংশ। সাধারণভাবে আওয়ামী ও ছাত্রলীগের সকল নেতাকর্মী ও সক্রিয় সমর্থকদের (সমর্থক দলগুলোরও) জীবন বিপন্ন হয়ে পড়লো। ৬ দফা প্রচারকালে দেশে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা বিরাজ করছিলো, তাছাড়া যুদ্ধের সময় আইউব খানের প্রতি সমর্থন-এর সুযোগে কনভেনশন লীগ ও এন এস এফ-এর গুণ্ডাদের অত্যাচারও বেড়ে গিয়েছিল। এদের সমর্থনে সহযোগিতায় ছিল পুলিশ, ই. পি. আর ও সামরিক বাহিনী। এই লৌহ কঠিন অত্যাচারের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে ছয় দফা আন্দোলন অগ্রসর হয়ে চলল। দক্ষিণপন্থী দলগুলো ইসলামের ধোঁয়া নতুন করে তুললো। জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা সমাজ-পরিবর্তনের নানা ব্যাখ্যা দিতে লাগলো। সমাজতন্ত্রের কথা মওলানা ভাসানী প্রচার করতেন বলে এদের রোষ তাঁর উপরও কম ছিলনা। উপরন্তু তিনিও ১৪ দফার একটি কর্মসূচী এই সময় (১৯৬৬-র ফেব্রুয়ারী-মার্চ) প্রচার করেন। কিন্তু তিনি নঞর্থক দৃষ্টিতে আওয়ামী লীগের সমালোচনায় মুখর হন। আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য দলও (যেমন কৃষক সমিতি, শ্রমিক ফেডারেশন প্রভৃতি) ছয়-দফা সম্পর্কে অসহিষ্ণু হয়ে মন্দভাবে সমালোচনায় অংশ গ্রহণ করে। তবে কেউ-ই পূর্ব বাঙলার স্বায়ত্তশাসন ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির আবশ্যকতা ব্যাখ্যার দায়িত্ব এড়াতে পারেননি। এ সময়ে 'ন্যাপ' এবং সম্পর্কশীল দলগুলো বিভক্ত হয়ে গেলে একাংশ ছয় দফার পক্ষে আস্থা ব্যক্ত করে আন্দোলন দমন করার উদ্দেশে সরকার ৬ দফা আন্দোলনকে রাষ্ট্রদোহীতামূলক ও দেশের সংহতিবিরোধী কাজ বলে ঘোষণা করেন। ৮ মে ১৯৬৬ শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জহুর আহমদ চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে কারাগারে আটক করা হলো। ৭ই জুন ১৯৬৬ তে ৬ দফার দাবিতে এবং শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও সরকারী দমনীতির প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের আহ্বানে পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে এই হরতাল ও আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। বাঙালির এই স্বতস্ফূর্ততা সরকারের সহ্য হবার কথা নয়। পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীকে দমন-নির্যাতন অত্যাচারের নির্দেশ দিলে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ও দেশের নানা স্থানে বহু লোকের প্রাণ যায়। তবু জনগণ ৬ দফার দাবি থেকে সরে আসতে ছিলেন নারাজ। 'ইত্তেফাক' ছিল তখন গণমানুষের কণ্ঠস্বর ও ৬ দফার মুখপত্র। ১৬ জুন ১৯৬৬তে সরকার 'ইত্তেফাক' এর মালিক-সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে গ্রেফতার পূর্বক কারারুদ্ধ করে এবং ইত্তেফাক এর প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। ৬ দফাকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে এনডিএফ জমাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম ও কাউন্সিল মুসলিম লীগ সংঘবদ্ধ হয়ে ১৯৬৭-র ৩০ এপ্রিল পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পিডিএম) নামে একটি দক্ষিণপন্থী জোট গঠন এবং ৮ দফা কর্মসূচী প্রচার করে। জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৯৬৭-র ৩০ শে নভেম্বর লাহোরে পিপিপি (পাকিস্তান পিপলস পার্টি) গঠন পূর্বক ৬-দফা বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। উল্লেখ্য যে, ৬-দফা পশ্চিম পাকিস্তানের কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি ; বরং এর বিরুদ্ধে সেখানে নানা মনগড়া কথা প্রচার করে বাঙালিদের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের ক্ষেপিয়ে তোলা হয়। সরকার শেখ মুজিবের প্রাণ হরণ করে বাঙালিদের নেতৃত্বহীন, হতোবুদ্ধি, দুর্বল করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে ১৯৬৮-র ৬ জানুয়ারী 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করে। দেশরক্ষা আইনে ১৯৬৬-র ৮ মে থেকে শেখ মুজিব ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক ছিলেন। ১৯৬৮-র ১৭ জানুয়ারী মুক্তি দেয়ার কথা বলে তাঁকে আবার ১৮ই জানুয়ারী (১৯৬৮) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরূপে ঢাকা (কুর্মিটোলা) সেনানিবাসে অন্তরীণ করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ৬ দফা সমর্থক নেতা-কর্মীদের আটক নির্যাতন দমন প্রভৃতির মাধ্যমে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, এবং ৬-দফা দাবির ফলে পূর্ববঙ্গবাসীদের উপর নির্যাতনের ঘটনায় সরকারের প্রতি জনগণের ঘৃণা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে-হতে তখন বিপ্লবের পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল। ৭ই জুন আন্দোলনের পর চরম নির্যাতনের মুখে এবং প্রধান নেতা-কর্মীদের কারাগারে আটক রাখার ফলে আওয়ামী লীগ প্রায় নেতৃত্বহীন অবস্থায় পতিত হয়। কিন্তু আন্দোলনের ধারা তবু অব্যাহত থাকে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্যকারের মতে "১৯৬৮-র ডিসেম্বরে ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের সূচনা হবার পূর্ব পর্যন্ত সময়টা ছিল পূর্ব বাঙলার জন্য সবচেয়ে অন্ধকারময় সময়।" ৬ দফা আন্দোলন দমনের জন্য আইউব খান শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা ষড়যন্ত্র মামলা রুজ্জু করেন তার প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব সম্পর্কে প্রত্যাক্ষদর্শী ঐ ভাষ্যকার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে লিখেছেন ঃ

"পূর্ব বাঙলার জনগণের ওপর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে এক অভাবনীয় প্রতিক্রিয়া হয়। মামলা আরম্ভ হওয়ার আগেই জানা গিয়েছিল যে, মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কারও কারও উপর নানা স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য নির্মম শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল। জনৈক অভিযুক্তের স্ত্রী এ-

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারে কোর্টে মামলা দায়ের করার ফলে এ মামলার খবর হিসেবে এ-সম্পর্কে পত্রিকায় প্রামাণ্য তথ্য প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাঙলার জনগণের মধ্যে আইউব সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং জনগণের মনোভাব ছয় দফা থেকে সরে গিয়ে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হয়। এই মামলা সাজিয়ে আইউব সরকার এতই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে যে, পূর্ব বাঙলায় যে প্রতিক্রিয়া সরকার আশা করেছিল, বাস্তবে ঘটেছে ঠিক তার বিপরীতটি। তখন সরকারী অত্যাচার এতই লৌহ দৃঢ় ছিল এবং সন্ত্রাস এতই ভয়াবহ ছিল যে, তৎক্ষনাৎ জনগণের পক্ষে কোন প্রতিবাদ স্থাপন করা সম্ভব ছিলনা। সরকার যেকোন গণ-আন্দোলন দমাবার জন্য পুলিশ, ইপিআর ও সামরিক বাহিনীকে মোতায়েন রেখেছিল। প্রায় প্রতিদিন প্রতিরাত্রে অস্ত্র-সজ্জিত ইপি আর বাহিনী আক্রমণোদ্যত অবস্থায় শহরের রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াত। আহাম্মকের মত আইউবের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সাজাবার ফলেই পূর্ব বাঙলার গণজাগরণ এত দ্রুত হয়েছে। ১৯৬৮ সালের সারাটা বছর জনগণ প্রতিবাদের, প্রতিশোধের, বিদ্রোহের ও অভ্যুত্থানের উপায় অন্বেষণ করেছে। পূর্ব বাঙলার স্বাধীনতার, শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য রাজবন্দীর মুক্তির এবং অত্যাচার-অনাচার-অবিচারের অবসানের উদ্দেশ্যে সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে গোপনে বহু বেনামী বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছে। সারা দেশে—গ্রামে ও শহরে বিচ্ছিন্নভাবে তরুণেরা বহু গোপন দল সংগঠিত করেছে এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আইউব-মোনেম সরকারের উৎখাতের উপায় খুঁজেছে।"[৩১]

পশ্চিম প্যাকিস্তানের কতিপয় আমলা-পুঁজিপতি-ব্যবসায়ী সম্পদের পাহাড় গড়ে তুললেও সেখানকার সাধারণ মানুষ বাঙালীদের মতই ধনিক বণিক জায়গীরদার জমিদার ও শাসকদের দ্বারা শোষিত ও নিগৃহীত ছিল। আইউব খানের কালাকানুন পশ্চিম পাকিস্তানের নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত তথা বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার হরণ করেছিল। সে অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মনেও সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে ১৯৬৮ সনের ৭ নভেম্বর একটি সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাওয়ালপিণ্ডিতে আইউব-বিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের সূচনা হয়। সেখানকার ছাত্র হত্যা, নির্যাতন, সান্ধ্য আইন প্রভৃতির প্রতিবাদে ঢাকায় ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন সম্মিলিত ভাবে ১৯ নভেম্বর ১৯৬৮ প্রতিবাদ দিবস পালন করে এবং এর মধ্য দিয়ে পূর্ব বাঙলায় আইউব-বিরোধী গণ-আন্দোলনের সূচনা হয়। রিকশা চালকদের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে ঐ আন্দোলন গতি লাভ করেছিল। পুলিশী-জুলুম-নির্যাতনের প্রতিবাদে ২রা ডিসেম্বর ১৯৬৮ থেকে ঢাকায় রিকশা চালকরা ধর্মঘট করে আসছিলেন। মওলানা ভাসানী ৬ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করেছিলেন। জনসভায় পূর্ববাঙলার জনগণকে আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায়ের, রাজবন্দীদের মুক্ত করার এবং অন্যায়-অবিচারের অবসান ঘটাবার আহ্বান জানান। রিকশাচালক ইউনিয়নের জনৈক নেতার অনুরোধ মওলানা ভাসানী ঐ মঞ্চ থেকে পরদিন ৭ ডিসেম্বর ১৯৬৮ ঢাকা শহরে সর্বপ্রকার যানবাহন ধর্মঘট আহ্বান করেন। ঐ দিন নীলক্ষেত ও জিন্নাহ এভিনিউতে ছাত্র-জনতার সাথে পুলিশের তীব্র সংঘর্ষের জের হিসেবে পুলিশের গুলিতে নীলক্ষেতে আবদুল মজিদ ও জিন্নাহ এভিনিউতে আবু নামে এক কিশোর নিহত হয়। মওলানা ভাসানী ৬ ডিসেম্বরের সভামঞ্চ থেকে গভর্ণর মোনেমের 'গভর্ণর ভবন' ঘেরাও করে দাবি পেশের জন্য জনগণকে আহ্বান জানান। মওলানার নেতৃত্বে সেদিন জনগণ গভর্ণর ভবন ঘেরাও করে। আইউব খানের পদত্যাগ এবং ১৯৬৯ সনের ২৫শে মার্চ পুনরায় সামরিক শাসন নিয়ে ইয়াহিয়ার অভ্যুদয় নাগাদ পর্যন্ত ঘেরাও আন্দোলন অব্যাহত থাকে।

৭ ডিসেম্বরের (১৯৬৮) হরতালের সময় পুলিশী হামলার প্রতিবাদে পরদিন পুনরায় স্বতস্ফূর্তভাবে ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে হরতাল পালিত হয়। অতপর মওলানা ভাসানীর আহ্বানে পূর্ব বাঙলায় কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন দমন করতে গিয়ে পুলিশ আরও বহু-লোকের প্রাণ হরণ করে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে গুলি করে ছাত্র-জনতা হত্যা করার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মস্কোপন্থী) ও পিডিএম-এর যৌথ আহ্বানে ১৩ ডিসেম্বর ১৯৬৮ ঢাকাসহ সারা পূর্বপাকিস্তানে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ১৯৬৯ এর ৫ জানুয়ারী ঢাকায় সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে আন্দোলন সংগঠিত করে অর্থবহ গণ-আন্দোলন সৃষ্টির লক্ষ্যে ডাকসু-র নেতৃত্বে ছাত্রলীগ ও ছাত্র-ইউনিয়ন (উভয়গ্রুপ) এবং ছাত্র ফেডারেশনের একাংশকে সংঘবদ্ধ করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। ৬ দফাসহ সকল শ্রেণীর দাবি-দাওয়ার প্রতিফলন ঘটিয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক গৃহীত ১১ দফা কর্মসূচী জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় ১৪ জানুয়ারী ১৯৬৯ তারিখে। ৮ জানুয়ারী ১৯৬৯ ঢাকায় আওয়ামী লীগ (৬ দফা পন্থী), ন্যাপ (মস্কোপন্থী), এনডিএফ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জমাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, আওয়ামী লীগ (পিডিএমপন্থী) ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সমন্বয়ে ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি—'ডাক' বা গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি ৮ দফা কর্মসূচী নিয়ে গঠিত হলে তাঁদের ডাকে ১৭ জানুয়ারী ১৯৬৯ বায়তুল মোকাররম চত্বরে এবং ১৮ জানুয়ারী ১৯৬৯ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে জনমনে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। আন্দোলন মারমুখী হয়ে ওঠে প্রকৃতপক্ষে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কার্যক্রমেই। ২০শে জানুয়ারী (১৯৬৯) ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিশাল বিক্ষোভ মিছিলের ওপর পুলিশ গুলী বর্ষণ করলে ছাত্রনেতা আসাদ নিহত হন। এ-হত্যাকাণ্ড আন্দোলনকে আরও তীব্র আর মারমুখী করে তোলে। আসাদের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে হাজার হাজার মানুষ ঢাকার রাস্তায় সরকার-বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। আন্দোলনের নেতৃত্ব পুরোপুরি ছাত্র সংগ্রাম কমিটির হাতে চলে যায়। আসাদ হত্যার প্রতিবাদে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২৪ জানুয়ারী (১৯৬৯) প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করেন। 'গণ-আন্দোলন' পরিস্থিতির মোড় পরিবর্তন করে নিরস্ত্র জনতার 'অভ্যুত্থানে' রূপান্তরিত হয়। 'এতদিন যারা জনগণের উপর অত্যাচার চালিয়েছে সেইসব কনভেনশন লীগার, আমলা, মৌলিক গণতন্ত্রী, টাউট, বদ-মাতব্বর ইত্যাদিকে জনগণ হত্যা করতে লাগল ; অনেক জায়গায় অত্যাচারীদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দিতে লাগল এবং তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিতে আরম্ভ করল। বহুলাংশে কোন নেতৃত্বের ধার না-ধেরেই জনগণ এই আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগল। সরকারের আর কোন অস্তিত্বই প্রকৃতপক্ষে দেশে রইলনা।"[৩২] দক্ষিণপন্থী দলগুলো গণআক্রমণের ভয়ে ১১ দফার বিরোধিতা করতে আর সাহসী হলোনা। বাঙালি পুলিশ ইপিআর প্রভৃতি নিস্ক্রিয় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদের দ্বারা পূর্ববাঙলার বিপ্লবীদের দমন করাও তখন সম্ভব ছিলনা। সেখানেও (পশ্চিম পাকিস্তানে) চলছে তখন বিরাট গণআন্দোলন। আইউবের ক্ষমতার প্রধান উৎস মৌলিক গণতন্ত্রীরা ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দলেদলে পদত্যাগ করতে আরম্ভ করলেন। আইউব খান এই পরিস্থিতিতে

Dhaka University Institutional Repository

নরম ও কৌশলগত লাইন গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না বলে বেতারে এক ঘোষণা দিলেন। আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে (২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯) নিয়ে সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দিলেন। শেখ মুজিবের মুক্তিতে জনগণ পরম আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। ছাত্র সংগ্রাম কমিটি তাঁকে ২৩শে ফেব্রুয়ারী রমনার রেসকোর্স ময়দানে এক বিরাট গণ-সম্বর্ধনা জ্ঞাপন পূর্বক 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। বঙ্গবন্ধু বলতে মানুষ ১৯৭২ সন পর্যন্ত আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠতেন। আন্দোলনের জোয়ার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। আইউবের অপর প্রচেষ্টা—আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের গোলটেবিল বৈঠকের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। দেশবাসীকে শান্ত করার শেষ চেষ্টা হিসেবে গণধিকৃত গভর্ণর আবদুল মোনায়েম খানকে অপসারণ করে ডঃ এম. এন. হুদাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। পদচ্যুত করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণরকেও। কিন্তু জনগণের রোষ-ক্ষোভ কোনকিছুতেই আর নিবৃত্ত হলোনা। আন্দোলনের ঢেউ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতেই থাকে। পাকিস্তানকে রক্ষা করার কোন উপায়ই আর দেখতে না পেয়ে ২৫শে মার্চ ১৯৬৯ দেশের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে তিন মাসের ছুটির কথা বলে আইউব খান ক্ষমতার মঞ্চ থেকে চিরবিদায় নেন। ইয়াহিয়া খান তৎক্ষণাৎ সারা পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারিপূর্বক মৌলিক গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র বাতিল ও আইন পরিষদসমূহ বিলুপ্ত করে মন্ত্রীপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে গভর্ণরকে পদচ্যুত করেন। বলাবাহুল্য তিন মাস ছুটির পর আইউব খান আর ক্ষমতায় ফিরে আসেননি। বাঙলার রাজনীতিতে এর পরের ঘটনাপ্রবাহের নায়ক গণহত্যাযজ্ঞের জল্লাদ সেনাপতি ইয়াহিয়া খান। তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্টের পদে আসীন হয়ে ২৬শে মার্চ ১৯৬৯ প্রথম জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দেন, তাতে এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে পূর্ব বাঙলার জাগ্রত জনতার ভয়ে সর্বত্র সৎ উদ্দেশ্যই ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছিলেন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ গঠন, জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদের সদস্যদের হাতে নতুন শাসনতন্ত্র রচনার ক্ষমতা প্রদান প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করে তিনি ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াবেন। আরও বলেছিলেন, তিনি নিজে কোন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না কিংবা কোন রাজনৈতিক দল গঠন করবেন না। অতপর ১৯৭০ সনের ডিসেম্বর মাসে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ধার্য হয়। ১২ নভেম্বর ১৯৭০ পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রচুর মানুষজন ও সম্পদ ধ্বংস হয়। উপদ্রুত এলাকায় রাজনৈতিক দলগুলোর রিলিফ কাজ চালানোর জন্য ন্যাপ এবং কোনো কোনো পার্টি নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার দাবি করলেও আওয়ামী লীগ তথা শেখ মুজিবের ভয়ে নির্বাচন পিছানো হয় না। কেবলমাত্র উপদ্রুত এলাকায় কয়েকটি আসনের নির্বাচন পিছিয়ে দেয়া হয়। শেখ মুজিব নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কালবিলম্ব করতে চাননি দুটি কারণে—যথা কোন কারণে পিছিয়ে গেলে নির্বাচন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত হয়ে পড়তে পারে ; দ্বিতীয়ত নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। যারা হঠকারী এবং কায়েমী স্বার্থী—তারা নানা প্রতিবন্ধকতা এবং অজুহাতের সৃষ্টি করতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলো এবং পূর্ব বাঙলার জনগণ ৬ দফা ও ১১ দফার কর্মসূচীর ভিত্তিতে পরিচালিত আওয়ামী লীগের কর্মসূচীকে সফল করার জন্য নিরঙ্কুশভাবে সমর্থন জানালেন। মাত্র দুটি আসন ব্যতীত সকল আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয়ী হলেন। আওয়ামী লীগ ব্যতীত অপর দুটি আসনে (ময়মনসিংহের নান্দাইল থেকে) পিডিপির চেয়ারম্যান নূরুল আমীন এবং (পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে) রাজা ত্রিদিব রায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের (প্রাদেশিক পরিষদ) একশত বাষট্টিটি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ একশত ষাটটি আসন লাভ করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পিপসল পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে একশত আটত্রিশটি আসনের মধ্যে একাশিটি আসনে বিজয়ী হয়। তিনশত আসন বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। তবে পশ্চিম পাকিস্তানে তারা কোন আসন পাননি। অপরদিকে পিপলস পার্টি পূর্ব পাকিস্তানে কোন প্রার্থীই দিতে পারেনি। আইনানুগভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের অধিকার অর্জন করেন এবং পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রীরূপে শেখ মুজিবুর রহমানকে পূর্ববাঙলার জনগণ মনে মনে বরণ করে নেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও পশ্চিম-পাকিস্তানী শাসকচক্র নতুন চক্রান্ত শুরু করে। পূর্ব বাঙলাকে শোষনের অধিকার হাতছাড়া করতে তারা ছিল নারাজ। কিন্তু জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার কেউ খর্ব করতে পারে না। নির্বাচনের পর ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেন। আওয়ামী লীগ এ অধিবেশনে যোগদানের জন্য প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু ইয়াহিয়া খান তথা পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্র আওয়ামী লীগকে সে সুযোগ দিতে প্রস্তুত ছিলেননা। আওয়ামী লীগ বিজয় লাভ করায় ইয়াহিয়া খানসহ পশ্চিম পাকিস্তানের সকল সরকারী ও বেসরকারী মহল অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। পরিষদের লোক-দেখানো তারিখ নির্ধারণ ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে অধিবেশন বানচাল করার কুমতলবে জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে গোপন-আঁতাতে লিপ্ত হবার সুযোগ এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সঠিক পন্থা নির্ধারণ করার জন্য কৌশল অন্বেষণ। শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফার প্রশ্নে আপোষ করতে রাজী না-হওয়ায় ভুট্টোর পিপিপি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে অস্বীকার করায় জটীলতার সৃষ্টি হয়। একে অজুহাত করে ইয়াহিয়া খান ১লা মার্চ ১৯৭১ আকস্মিকভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। অধিবেশন মুলতবী রেখে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করায় পূর্ব বাঙলায় মারাত্মক বিপরীত ফল ফললো। সকল জনতা স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হলেন এবং সম্মুখ সশস্ত্র সংগ্রাম ও যুদ্ধ করে হলেও স্বাধীনতা লাভের জন্য তাঁরা প্রস্তুত হয়ে গেলেন। দিকে দিকে 'স্বাধীন বাঙলার পতাকা' উড্ডীন হতে আরম্ভ করলো। ইয়াহিয়া খান মার্চ মাসের পুরো সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও আধুনিক অস্ত্র-সস্ত্র পূর্ব বাঙলায় জমায়েত করতে লাগলেন। গণহত্যার মাধ্যমে পূর্ব বাঙলার জনগণের দাবিকে চিরতরে স্তব্দ করে দেবার জন্য ২৫শে মার্চ (১৯৭১) এর কালোরাত্রিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কামান গর্জে উঠল নিরস্ত্র বাঙালির কলিজা তাক্ করে। শেখ মুজিবকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হল পশ্চিম পাকিস্তানে। বাঙলার জনগণ জান দিতে জানে, কিন্তু মুক্তির আশা ছাড়তে পারেননা। তাঁরা 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম' বঙ্গবন্ধুর এই বাণীকে জীবন-মন্ত্ররূপে অবলম্বন করে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিড়ে পড়লেন। দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামে ত্রিশ লক্ষ বাঙালির জীবনদান, ক্ষয়ক্ষতি এবং বাঙালি মা-বোন-শিশু-বৃদ্ধ নরনারীর প্রাণ-মান-সম্মান-ইজ্জত ও 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে' ১৯৭১ সনের

Dhaka University Institutional Repository

১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে হানাদার মুক্ত করে বাঙালিরা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন নতুন, স্বাধীন, স্বার্বভৌম বিজয়ের পতাকা সম্বলিত এক জাতি ও রাষ্ট্রের---যার নাম 'বাঙালি' ও 'বাংলাদেশ'।

২.৩. বাংলার রাজনীতি ও সাহিত্য—সংস্কৃতি ভাবনায় কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রভাব— ভারতবর্ষ তথা বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ; মার্কসীয় রাজনীতি, সংস্কৃতি চর্চার প্রভাব ; পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ও তার কার্যক্রম ; যুবলীগ গঠন ; গনতন্ত্রী দলের জন্ম ; ভাষা-আন্দোলন ও ১৯৫৪ সনের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ; কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম দমনের জন্য পাকিস্তান সরকারের নিবর্তনমূলক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ; কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা ; ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)-র জন্ম এবং পাকিস্তানের মার্কসীয় চিন্তাধারার কর্মীদের মধ্যে চীন-সোভিয়েত মহাবিতর্কের প্রভাব ; কমিউনিস্ট পার্টি ও তার বিভিন্ন অঙ্গ দলের মধ্যে ভাঙন ; সাংস্কৃতিক অঙ্গনে চীন-রাশিয়ার মার্কসীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাব ; বাঙালি কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মার্কসীয় ভাবধারায় অনুপ্রেরণা লাভ ;

বাঙলায় কমিউনিষ্ট আন্দোলন ও মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রভাব সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা দরকার। কারণ আলোচ্য কালের রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রধান প্রাগ্রসর ধারা হচ্ছে মার্কসীয় মতবাদী কিংবা অনুসারীদের বিকাশ ও পুষ্টির ইতিকথা। এঁদের চরম শত্রু ও প্রতিপক্ষ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক কায়েমী স্বার্থবাদী প্রতিক্রিয়াশীলেরা। এরা সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন মুসলিম লীগের স্বৈরাচারী সরকারের ছত্রছায়ায়। বিপক্ষের প্রধান বিকাশমান শক্তি ছিল কমিউনিষ্ট বা মার্কসীয় মতবাদে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং এঁদের সৃষ্ট সাহিত্য-শিল্প। মোটামুটিভাবে এঁরা সবসময় সরকার-বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিলেন। এঁদের প্রভাব ও প্রচার কাজে লেগেছে মধ্যপন্থী উদার মানবতাবাদীদের জাগরণে। চরম ও পরম, সাম্প্রদায়িক ও কমিউনিষ্টদের মধ্যে সেতুবন্ধরূপে কাজ করেছেন গণতান্ত্রিক মানবতাবাদীরা। ১৯২১সনে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) পর্যন্ত সময়টা ছিল বাঙলার তথা ভারতের সমাজ-মানস, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গন মার্কসীয় চিন্তাধারা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হবার কাল। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে অব্যাহতি লাভ তথা ৪৭-এর স্বাধীনতা সংগ্রামে এই ভাবাদর্শ দ্বারা আলোড়িত ও উদ্‌বোধিত চেতনার কবি সাহিত্যিক, লেখক বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীবৃন্দ ব্যাপক সদর্থক ভূমিকা পালন করেছিলেন। এদেশে কমিউনিষ্টরাই গণ-সাহিত্যের, গণ নাটকের গণসঙ্গীতের স্রষ্টা। ১৯৩০ সনের পর থেকে শিল্পোত্তীর্ণ মার্কসীয় সাহিত্য সৃষ্টি হতে থাকে। ১৯৩৬ সনে প্রগতি লেখক সংঘ ভারতীয় গন-নাট্য আন্দালন শুরু করে। আর ১৯৪৩ সনে বাঙলায় গণ-নাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কসবাদের প্রভাবে 'এই প্রথম অতীত বিরহী বর্তমানে স্থিত নাস্তিক মানুষ সৃষ্টি'[৩৩] হতে থাকে। কিন্তু ভারতে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মতো কোনো 'বিপ্লব' কিংবা আমূল পরিবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থা কায়েমের ক্ষেত্রে কমিউনিষ্টরা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেননি। কারণ 'কমরেড' হলেও গুরুত্বপূর্ণ যুগ-সন্ধিক্ষণে ভারতবর্ষের এই মার্কসবাদী-কর্মীরা ছিলেন 'হিন্দু' ও 'মুসলমান'। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ও তার ফলে সংঘটিত দাঙ্গা, ও হত্যার ঘটনাসমূহ 'কমরেড'দের চিত্তলোককে এমন ভাবে তৈরী করে যে--- 'হিন্দুস্থান' ও 'পাকিস্তান' সৃষ্টিতে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি হয়নি। পাকিস্তান সৃষ্টির পরও কমিউনিষ্টরা মুসলিমলীগের নেতৃত্বাধীন পূর্ববঙ্গে, পশ্চিম পাকিস্তানে এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন হিন্দুরাজ্য ভারতের কমিউনিষ্টরা ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারেননি। বিভাগ-পরবর্তী কালে কলকাতায় (২৮ ফেব্রুয়ারী থেকে ৬ মার্চ ১৯৪৮ পর্যন্ত) ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে পাকিস্তানের কমিউনিষ্টপার্টি গঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক পশ্চিম পাকিস্তানের সাজ্জাদ জহির এবং সদস্যঃ খোকা রায়, নেপাল নাগ, জামালুদ্দীন বুখারা, আতা মোহাম্মদ, ইব্রাহীম, মনি সিংহ, কৃষ্ণ বিনোদ রায় ও মনসুর হাবিব প্রমুখ। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরো গঠিত হয় সাজ্জাদ জহির কৃষ্ণ বিনোদ রায় ও খোকা রায়কে নিয়ে।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টিতে শ্লোগান তোলা হয় ঃ 'ইয়ে আজাদী ঝুঁটা হ্যায়, লাখো ইনসান ভূখা হ্যায়'। এটা ছিল মূলত ঔপনিবেশিক আমলের সংগ্রামেরই ধারাবাহিক রূপ। কমিউনিষ্ট পার্টি কৌশল হিসেবে ভারতের কংগ্রেস ও পাকিস্তানের লীগ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু খাজা নাজিমুদ্দীননের পঞ্চ-বাহিনী কমিউনিষ্টদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার লক্ষ্যে জোর প্রচারনা চালায় এই বলে যে,—তারা ধর্মে বিশ্বাস করেনা, ভারতের দালাল, পাকিস্তানকে হিন্দুস্থান বানাতে চায়, স্বাধীনতা মানেনা ইত্যাদি। এতে জনগণ বিভ্রান্ত হন। তাছাড়া কমিউনিষ্ট ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীদের উপর নিপীড়ন চালানোর ফলে মার্কসীয় মতাদর্শের প্রভাব স্তিমিত হয়ে আসে। এরই মধ্যে কমিউনিষ্টরা দেশের হাজং বিয়ানীবাজার, নাচোল, খুলনা বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র সংগ্রামের চেষ্টা চালায়। কিন্তু নিপীড়নের মুখে তাও অচিরেই দমিত হয়ে পড়ে। তখন ' পার্টির লাইন ছিল হঠকারী কার্যক্রম পরিচালনা করা। রণনীতি ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব একাকার হয়ে গেছে। '[৩৪]

১৯৪৭ সনের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর সাম্যবাদী চিন্তায় অনুপ্রাণিত কতিপয় তরুণের উদ্যোগে ঢাকায় 'গণতান্ত্রিক যুবলীগের ' পূর্ব বাঙলা শাখা গঠিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন শামসুল হক এবং নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন মোহাম্মদ তোয়াহা (১৯২২-১৯৯০) কামরুদ্দীন আহমদ (১৯১৩-৮২) নইমুদ্দীন আহমদ, তাজউদ্দীন আহমদ (১৯২৮-৭৫) ও অলি আহাদ প্রমুখ। সরকারী ও সরকারের সমর্থকদের নির্যাতনের মুখে দলটি উঠে যায়। তবে দলের মুদ্রিত কর্মসূচী দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর প্রাধান্য এবং 'সমষ্টির মালিকানা'র ধারণা সমাজে ব্যপ্ত হয়েছিল।[৩৫] গণতান্ত্রিক যুবলীগের মার্কসীয় মতবাদে প্রভাবিত কর্মীবৃন্দ পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়ে ১৯৫১ সনের ২৭ মার্চ ঢাকার বার লাইব্রেরী হলে এক সম্মেলনের আয়োজন করেন। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ ১৪৪ধারা জারী করে স্থানটি দখল করে থাকায় সম্মেলন ব্যর্থ হয়ে যায়। অতপর এপ্রিল মাসে বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকার উপরে উদ্যোক্তাবৃন্দ সম্মেলন আহবান করেন এবং 'পাকিস্তান যুবলীগ' গঠিত হয়। ধর্মীয় রাজনীতির জোয়ারের দিনে 'অসাম্প্রদায়িকতার' মূলনীতি নিয়ে দল গঠন করে যুবলীগ কর্মীরা দেশের প্রতি প্রেম ও কল্যাণ ভাবনার পরিচয় দেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির এই দলটি ১৯৫৮ সনের সামরিক অভ্যুত্থানের পরিণতিতে বেআইনী ঘোষিত হয়।[৩৬]

১৯৫১সনের মার্চ মাসে পশ্চিম পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট নেতাদের উপর 'রাওয়ালপিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলা' চাপিয়ে দেয়া হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট নেতাদের গ্রেফতার করে কমিউনিষ্ট পার্টির কার্যক্রম স্তিমিত করে দেয়া হয়।

১৯৫৩ সনের জানুয়ারী মাসে পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যরা ঢাকার আরমানী টোলা ময়দানে পাকিস্তানের বুকে ডেমোক্রেটিক পার্টি বা গণতন্ত্রী দল নামে একটি প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক দলের পত্তন করেন। এই দলের পূর্ব বাংলা শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে হাজী মোহাম্মদ দানেশ ও মাহমুদ আলী। সভায় গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে ছিলঃ ' বর্তমান গণপরিষদ বাতিল করে প্রাপ্তবয়স্কদের যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন গণপরিষদ প্রতিষ্ঠা করা, মূলনীতি উপসংঘের রিপোর্ট বাতিল করা, কেন্দ্রের এখতিয়ারে দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও আন্তঃ -আঞ্চলিক যোগাযোগ রেখে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের কনফেডারেশনের ভিত্তিতে নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা, বৃটিশ কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিয়ে অবাধ গণতন্ত্রের পথ সুগম করা।"[৩৭] এই দলের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক নীতি ও কর্মসুচীর মধ্যে সেদিন মূর্ত হয়ে উঠেছিল পূর্ব বাঙলার সবচেয়ে প্রগতিশীল মতাদর্শ। এই সময় পার্টির লাইন ছিল আওয়ামী লীগ, গণতন্ত্রীদল প্রভৃতির মধ্যে কাজ করা। কমিউনিষ্ট পার্টির স্বতন্ত্র ভূমিকা নিয়ে দাঁড়ানোর চিন্তা ও কার্যক্রম কমিউনিষ্ট নেতাদের মধ্যে তখনও ছিল না। এই সময় থেকে পার্টি শ্রেণীসংগঠন ও সংগ্রামের লাইন ছেড়ে দেয়। যদিও এই ধরণের কাজের বিরুদ্ধে পার্টিতে জোরালো বক্তব্য উত্থাপিত হয়েছিল।১৯৫৩-৫৬ পর্যায়ে পার্টিতে মূল-লাইনের বিরুদ্ধে বক্তব্য নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন কুমার মিত্র, সত্য মৈত্র, মারুফ হোসেন প্রমুখ নেতা। তাঁরা জেল থেকে এক বক্তব্য (বা দলিল) উপস্থিত করেন। এতে পার্টিকে স্বতন্ত্র ভূমিকা নিয়ে অগ্রসর হবার কথা বলা হয় ; এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে মিলে কাজ করার লাইনকে ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়। এই দলিল 'থিসিস অব জেল কমরেডস ' নামে পরিচিত হয়েছিল।[৩৮] ১৯৪৮-৫২ পর্বে পরিচালিত 'ভাষা আন্দোলন' বা 'একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলনে' কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন বলে আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছিল। আন্দোলনে মার্কসীয় মতাদর্শের ছাত্র -নেতা কর্মীদের সংখ্যা কম ছিলনা। ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ পার্টি ভাষা-আন্দোলনের মূল্যায়ন করে নূরুল আমীন সরকারের পদত্যাগ দাবি করে এবং এই আন্দোলনের সঙ্গে কৃষক শ্রমিক ছাত্রসহ মেহনতী জনতার দাবি-দাওয়ার সম্পর্ক নির্ণয় করে। ভাষা-আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে ১৯৫২সনের ২৬শে এপ্রিল 'পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন 'নামে এক প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদ -বিরোধী ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলা হয়। নভেম্বর (১৯৫২) মাসে এই সংগঠনের নামকরণ করা হয় 'পূর্বপাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন'। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মোহাম্মদ সুলতান।৩৯ ভাষা-আন্দোলনের ন্যায় ১৯৫৪ সনের যুক্তফ্রন্ট-নির্বাচনে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য, কর্মী ও নেতৃবৃন্দ মুসলীম লীগ -বিরোধী নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এবং সম্মিলিত ভাবে জয় লাভ করেন। কমিউনিষ্টদের ভাবমূর্তির বিরূপ প্রতিফলনের আশঙ্কায় ফ্রন্টে কমিউনিষ্ট পার্টি অন্তর্ভূক্ত ছিল না। কিন্তু যেখানে সুপরিচিত কমিউনিষ্ট প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, সেখানে ফ্রন্ট কোনো প্রার্থী নাদিয়ে কমিউনিষ্টদের সহযোগিতা স্বীকার করেন। বিভিন্ন দলের ছদ্মাবরণে নির্বাচিত কমিউনিষ্ট সদস্যদের সংখ্যা ছিল ২৬জন।[৪০] ১৯৫৪ সনের নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তান সরকার পশ্চিমাদের শোষণ অবসানের আলামত মনে করে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বাতিল করার সময়ে ধ্বংসাত্মক কর্ম-তৎপরতা চালাচ্ছে মর্মে অভিযোগ এনে কমিউনিষ্ট পার্টিও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয় (৫ জুলাই ১৯৫৪)। পূর্ব বাঙলায় কোন কমিউনিষ্টকে থাকতে দেয়া হবে না —এই ছিল তখনকার পাকিস্তান সরকারের অনুসৃত নীতি। পার্টি বেআইনী ঘোষিত হবার পর আণ্ডার গ্রার্ডণ্ডে চলে যায় এবং আওয়ামী লীগের অভ্যান্তরে থেকে কাজ করতে থাকে। ১৯৫৬ সনে কলকাতায় অনুষ্ঠিত গোপন -বৈঠকে পার্টিকে পূর্ববঙ্গ ভিত্তিক কমিউনিষ্ট পার্টি হিসেবে কাজ করার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। এই বৈঠকে কোনো কোনো নেতা পূর্ব- পাকিস্তানকে পৃথক রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার কথা প্রস্তাব করেন।এই কংগ্রেসে কমিউনিষ্টদের দ্বারাই প্রথম পূর্ব--পাকিস্তানকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে গড়ার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। যদিও তা শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের ভোটাভুটিতে বাতিল হয়ে যায়। যাহোক, ১৯৫৭ তে 'ন্যাপ' গঠিত হলে কমিউনিষ্টরা আওয়ামী লীগ ছেড়ে ন্যাপের সঙ্গে কাজ করতে থাকেন। কিন্তু ১৯৫৮ সনের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসন জারি করলে কমিউনিষ্টদের কার্যক্রম আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে যায়। প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ্য কোন রাজ নৈতিক তৎপরতাই তখন ছিলনা।[৪১] পরবর্তীতে চীন-সোভিয়েত মহাবির্তকের প্রভাবে কমিউনিষ্ট পার্টিতে ভাঙন ধরে। স্টালিনের মৃত্যুর (১৯৫৩) পরে ১৯৫৬ সনে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসে স্টালিনের ভূমিকা মূল্যায়নে এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের রণনীতি ও কৌশলের প্রশ্নে কমিউনিষ্ট -শিবির দ্বিধা বিভক্ত হয়েছিল। একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো, অপর দিকে ছিল চীন ও আলবেনীয়া। এই বির্তক ১৯৫৬ সনে শুরু হয় এবং ১৯৬৪ সন নাগাদ মীমাংসার অসাধ্য পর্যায়ে উপনীত হয়। পৃথিবীর সকল দেশের কমিউনিষ্টদের মতো পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট -আন্দোলনেও এই বিতর্ক গভীর প্রভাব বিস্তার করে।১৯৬৪ সন থেকে জোর বির্তক আরম্ভ হয়। নেতা কর্মীরা দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েন। রুশ-চীন মহা বিতর্ক-কলহের কালে কেন্দ্রীয় কমিটির ১১জন সদস্যের মধ্যে ৯ জনই আন্তর্জাতিক তথা স্টালিন; যুদ্ধ ও শান্তি ; বিপ্লব; জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন ও যুগোশ্লোভাকিয়ার প্রশ্নে ক্রুশ্চেভ (রাশিয়ার)-নেতৃত্বের বক্তব্যকে সঠিক বলে গ্রহণ করেন। সুখেন্দু দস্তিদার ও মোহাম্মদ তোয়াহা উপর্যুক্ত প্রশ্নে চীনের মতামতকে সমর্থন করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য 'দুইনীতি' হিসেবে পরিচিত ছিল। এছাড়া, ১৯৬২ সনের চীন-ভারত যুদ্ধ ও শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের প্রশ্নেও মস্কো ও চীনপন্থী কমিউনিস্টদের মধ্যে মত-পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। ১৯৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধ নিয়েও এঁদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি হয়। তবে অধিকাংশই ভারতের পক্ষে মনোভাব ব্যক্ত করেন। শ্রমিক শ্রেণীর

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্ব বিসর্জন দিয়ে শ্রমিক ও দেশপ্রেমিক বুর্জোয়াদের যৌথ নেতৃত্বের তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। তাছাড়া ১৯৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ও তাঁরা আক্রান্ত দেশ ও আক্রান্তকারীর বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে প্রয়াসী হননি।

এই বিরোধের প্রশ্ন প্রথমে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ক্রমান্বয়ে কর্মী ও পার্টি-বহির্ভূত প্রগতিশীল ছাত্র-বুদ্ধিজীবী, লেখক-সাহিত্যিক এবং সমর্থক-দরদীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যেও এই বিরোধ-বিতর্ক ক্রিয়া করে এবং উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ফলে ১৯৬৫ সনের (১-৩ এপ্রিল, ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত বার্ষিক) সম্মেলনে পূর্বপাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন 'মেনন গ্রুপ' ও 'মতিয়া-গ্রুপ'-এ বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই ভাঙন এদেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও বামপন্থী মহলে গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সারা দেশের ছাত্র-সংগঠনগুলোতে বিভক্তিকরণের কাজও সম্পন্ন করে ফেলা হলো। ছাত্র ইউনিয়ন এর ভাঙনের ফলে পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি, ন্যাপ, শ্রমিক ফেডারেশন প্রভৃতিতেও ভাঙন শুরু হয়। মস্কোপন্থী নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রে বেশী থাকলেও জেলা পর্যায়ে পিকিং-পন্থী নেতাকর্মীর সংখ্যা অধিক ছিল। এভাবে নেতাদের মধ্যে ছল-চাতুরী হঠকারিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বামপন্থীদের মধ্যে হিন্দু-প্রাধান্যের কারণে পাক-ভারত, চীন-রাশিয়া প্রভৃতি যুদ্ধ ও মূলকর্মধারার প্রশ্নে পূর্ব-বাঙলার কমিউনিস্ট আন্দোলন ক্রমান্বয়ে বিভক্ত হতে হতে দুর্বল ও জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কেউ-ই এক পার্টি-কাঠামোর মধ্যে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। দুই পক্ষের সাংগঠনিক তৎপরতাই কেবল নিজেদের নেতৃত্ব ঠিক রাখার কাজে মগ্ন ছিল।

১৯৭১ সন পর্যন্ত মস্কোপন্থী কমিউনিস্টরা আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেন। তাঁরা ছয় দফা সমর্থন করেন আর পিকিংপন্থীরা ছয় দফার বিরোধিতা করেছিলেন। মস্কোপন্থীদের মধ্যে আবার আওয়ামী লীগ ও সোভিয়েত-ভারতের প্রতি অন্ধ-আনুগত্যের ইস্যুতে ভাঙন ধরে। নাসিম আলীর নেতৃত্বাধীন 'হাতিয়ার গ্রুপ' পার্টির সংশ্রব ত্যাগ করে এবং পিকিং-পন্থীরা আওয়ামী-লীগের নেতৃত্বাধীন ১৯৬৫ পরবর্তী গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ৭০-এর নির্বাচন এবং ৭১ এর মুক্তি সংগ্রামে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৪ সন থেকে পার্টির লাল পতাকা ছিল নমিত। পার্টি নিষিদ্ধকরণ, কর্মীদের কারারুদ্ধকরণ ইত্যাদি কারণে মার্কসবাদী রাজনৈতিক সংগঠনগুলো ছিল গোপনীয় এবং বিপজ্জনক। ফলে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পেতে পারেনি ; কিন্তু বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে মার্কসবাদের প্রভাব ও প্রচার হওয়ায় এদেশের সাহিত্য-শিল্পে এ-ধারার বিকাশ ঘটেছিল। তখন অবশ্য সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে মার্কসীয় চিন্তা-চেতনা ও কার্যক্রম আতঙ্কের বিষয় ছিল না। কিছুটা নৈতিক বল, দৃঢ় চারিত্রিক শক্তি এবং ত্যাগী মনোভাব না-থাকলে কেউ বামপন্থী চিন্তা করতেন না। স্বার্থবাদীরা সরকারের সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানবাদী ধারায় কাজ করতে আয়াস বোধ করতেন। চতুরেরা প্রগতিশীল বলে আত্মপরিচয়দানকারী মানবতাবাদী ধারায় নিজেদের চিহ্নিত করতে উৎসাহী ছিলেন। সুবিধাবাদী বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের কেউ কেউ নিরাপদ দূরত্বে থেকে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী সাজতে বা ভাববাদী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রচার করতে তৎপর হতেন। মুসলিম রাষ্ট্রের মুসলমান লেখক-সাহিত্যিক রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দ নাস্তিক্যবাদের প্রচারক মার্কসবাদকে গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। তবুও বলতে হয়, বিভাগ-পরবর্তীকালের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কূট-কৌশলের নানান পরিবর্তন ও নতুন সিদ্ধান্তের ফলে এদেশে মার্কসীয় চিন্তাধারা বা রাজনীতির মতো সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও বিস্তারলাভ করেছিলো। নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি একটা আকর্ষণ ও মোহ থাকে। ফলে গোপন, আণ্ডার-গ্রাউণ্ড পার্টির কার্যক্রম যেমন এদেশের সাধারণ মানুষের জীবনে কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল, তেমনি শিক্ষিত-মহলেও লাল-বই ও মার্কসীয় চিন্তা ফ্যাশনের মতো সংক্রামিত হয়েছিল। কিন্তু একথা সত্য— গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়ন-অনুশীলন (মার্কসীয় চিন্তা) হয়নি। যেহেতু সৎ ও আন্তরিক কমিউনিস্ট আন্দোলন এদেশে গড়ে ওঠেনি, সেহেতু শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি-জগতেও শিল্পোত্তীর্ণ বা গুরুত্বপূর্ণ, গভীর ও আন্তরিক কোনো সৃষ্টির বা চিন্তা-চর্চার পরিচয় পাওয়া যায়না। সাতচল্লিশ-পরবর্তীকালে মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রভাব সম্পর্কে এদেশের একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ও গবেষক লিখেছেন ঃ

> "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাঙলায় মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রসারের ..... কার্যক্রম নিদারুন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। তবে পির্যয়ের মধ্যেও ধারাটি কোনোভাবে সচল থাকে, বন্ধ হয়না।...... তথাপি তথ্যের দিকে তাকালে বলতে হয় যে, পূর্ব বাঙলার ভূখণ্ডে ১৯৫০ এর দশক পর্যন্ত মার্কসীয় পুস্তকাদির ...... প্রচার সামান্যই হয়েছে। প্রকাশ্যে আকস্মিক ও অভাবনীয় ব্যাপকতার সঙ্গে এদেশে মার্কসীয় পুস্তকাদির আমদানী শুরু হয় ১৯৬৩-৬৪ সনের দিক থেকে। তখন থেকে মার্কসবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের কারও কারও লেখায় মাওসেতুঙের জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ক রচনাবলীর উল্লেখ ও তাঁর চিন্তাধারার প্রতি সমর্থনের, বলা যায় বিচার-বিচেনাহীন মোহমুগ্ধ, অন্ধ, উগ্রসমর্থনের পরিচয় পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল, তবে উগ্রতার প্রবল স্রোতে তা দানা বাধতে পারেনি।
>
> ১৯৬২ সনে চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের সময়ে ঘটনা পরম্পরায় সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের নেতা সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক চীনের বিরুদ্ধে অসমাজতান্ত্রিক ভারতকে সমর্থন দেয়। তখন থেকে চীন প্রকাশ্যভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রথমে সংশোধনবাদী, পরে ধনতন্ত্রের পথগামী, এবং আরও পরে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী বলে নিন্দা করতে থাকে।
>
> মার্কসীয় বিশ্বদৃষ্টির স্বরূপ, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য এবং মার্কসবাদীদের কর্তব্য ও কর্মপন্থা ইত্যাদি বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ও সরকারের সঙ্গে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ও সরকারের মতবিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে। কার্যত চীনের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায় চরম শত্রুতামূলক। ধনতান্ত্রিক বিশ্বে এই ঘটনা প্রতিভাত হয় কমিউনিস্ট শিবিরের ও মার্কসীয় মতাদর্শের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতারূপে। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ধনতান্ত্রিক-বিশ্ব বিভক্ত কমিউনিস্ট শিবিরের প্রতি—বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের প্রতি এবং মার্কসীয় মতাদর্শের প্রতি তার মূলনীতি অপরিবর্তিত রেখেও কর্মকৌশল পরিবর্তন করে। তার ফলে ধনতান্ত্রিক বিশ্বের অন্তর্গত ঋণ-রিলিফ-নির্ভর দরিদ্র দেশগুলো চীন ও

Dhaka University Institutional Repository

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের কার্যকর সুযোগ লাভ করে। এ-অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সঙ্গে তৎকালীন পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ১৯৬৩ কি ৬৪ সন থেকেই ওই দুই দেশ থেকে ব্যাপকভাবে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্টালিন ও মাও সেতুঙের রচনাবলী বাঙলাদেশের ভূখণ্ডে আসতে থাকে। তার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ঋণদাতা-রিলিফদাতা আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের নিয়ন্ত্রণের (শর্ত আরোপের) ফলে পাকিস্তানকালে এদেশে চীন-রাশিয়া থেকে পুস্তকাদি আমদানী করা সম্ভব হত না।

১৯৬৬ সনে সূচিত হয় চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব। দেশব্যাপী বিভিন্ন কেন্দ্রে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতাকে 'পুঁজিবাদের পথগামী' হতে দেখে এক পর্যায়ে মাও সেতুঙ জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন Bombard the headquarters, তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা পার্টিকে ভেঙে দিয়ে সকল কেন্দ্রে বিপ্লবী কমিটি গঠনের জন্য সেদিন তিনি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। ঐ সময়ে পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা ও বেতারের মাধ্যমে চীন যেভাবে পৃথিবীব্যাপী মার্কসীয় আদর্শ ও মাও সেতুঙের চিন্তাধারা প্রচার করেছে, মাও সেতুঙের রচনাবলী ও বাণী প্রচার করেছে, তা ধনতান্ত্রিক বিশ্বের দেশে দেশে তরুণদের মনে প্রচণ্ড ঝড়ের সূত্রপাত করে। পিকিং-সাংহাই-ক্যান্টনে তো বটেই, সুবিশাল চীনের সর্বত্র তরুণেরা সেদিন শ্লোগান তুলেছে 'Father is dear to us, mother is dear to us, but chairman Mao is deerer to us, ঢাকায় ও কলকাতায় নয় শুধু, বাঙলাভাষী ভূখণ্ডের গ্রামাঞ্চলেও তরুণদের একাংশ সেদিন এক ভয়াবহ উন্মাদনায় মেতেছিল। দেয়ালে দেয়ালে তারা লিখেছিল : "চীনের চেয়ারম্যান— আমাদের চেয়ারম্যান" আর গগন বিদারী শ্লোগান তুলেছিল : "মুক্তি যদি পেতে চাও— হাতিয়ার তুলে নাও", "মুক্তির মতবাদ-মার্কসবাদ-লেনিনবাদ", "মাও সেতুঙের চিন্তাধারা-বিশ্বকে দিচ্ছে নাড়া"। যাদের কৈশোর যৌবনে প্রচারিত হয়েছে সাংস্কৃতিক বিপ্লব, এবং সেই সঙ্গে প্রথমবারের মত হাতে এসে পৌঁছেছে মাও সেতুঙের রচনাবলী, সেদিন যেন 'সেই মায়ায় না-মজে তাদের উপায় ছিলনা'। সেই উন্মাদনার রেশ আজও চলছে।"[৪২]

২.৪. পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ধরণ—যুক্ত অর্থনীতির নামে পুঁজিপতি ২২ পরিবার সৃষ্টি এবং কৃষক জনসাধারণকে শোষণের মাধ্যমে ভূমিহীনে রূপান্তরের ষড়যন্ত্র ; পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতিতে বৈষম্য ; আইউব সরকারের গৃহীত অর্থনৈতিক পদক্ষেপ ;

'পূর্ব বাঙলার মুক্তি-আন্দোলনে অর্থনৈতিক বঞ্চনার বোধই সবচেয়ে বড় উত্তেজক হিসেবে কাজ করেছে'। 'অর্থের প্রশ্নটি যখন সামনে এসে দাঁড়ালো, ধর্মের বাঁধন তখন গেল টুটে, এক জাতি, এক প্রাণ, একতা'র মোহটাকে ভেঙ্গে নব জাতীয়তার মোক্ষ সন্ধান করল বাঙালী।'[৪৩]

পাকিস্তান সরকার নিরপেক্ষ নীতির ধোঁয়া তুললেও প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতিতে নিরপেক্ষতা অনুসৃত হয়নি ; হলে পূর্ববঙ্গ তথা পাকিস্তান আর্থিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হতে পারত। ঔপনিবেশিক আমলে এদেশ সর্বতোভাবে বৃটিশ শাসকদের উপর নির্ভরশীল ছিল। ১৯৪৭ সনে রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের পরও পাকিস্তান বিদেশী সাহায্যের উপর পুরোমাত্রায় নির্ভরশীল থেকেছে। আত্মনির্ভরশীল হতে চেষ্টা করেনি। সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর (১৯৫৮) বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা আরও বহুগুণ বৃদ্ধিপায়। "রাজনৈতিক শাসনের আমলে (১৯৪৭-৫৮) ১২ বৎসরে গৃহীত বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের মোট পরিমাণ যেখানে ছিল ৪৯ কোটি টাকার মতন সেখানে সামরিক শাসন ও প্রেসিডেন্টশিয়াল আমলে (১৯৫৮-৬৮) ১০ বৎসরে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ২০০০ (দুই হাজার) কোটি টাকার উপর। ..... বৈদেশিক সাহায্যের উপর এই ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতার কারণ, পাকিস্তানের অনুসৃত তথাকথিত স্বাধীন মুক্ত অর্থনীতি আর এই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব ন্যাস্ত" ছিল একশ্রেণীর বুর্জোয়া, বৃটিশের ট্রেনিংপ্রাপ্ত এবং তাঁদের স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট আমলার উপর। এই অর্থনীতিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক (২২ পরিবার) –এর পুঁজি ও সম্পদ বৃদ্ধি পায়। এই অর্থনীতিতে দেশের গোটা সম্পদ ও মোট জনসংখ্যার কোনো আর্থিক উন্নতি ঘটেনি। সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী আইউব সরকারের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো নামমাত্র মূল্যে কতিপয় পুঁজিপতির মালিকানায়-দখলে চলে যায়। মুক্ত অর্থনীতির সুবাদে অল্পবিত্তের কিছুলোক রাতারাতি কোটিপতি হয়ে ওঠে। এক দশক পূর্বে যে পরিবার দশ লক্ষ টাকার মালিক ছিল আইউব খানের শাসনামলে সে পরিবার দশ কোটি টাকার মালিক হয়। একই পরিবার বা একই গ্রুপ একই সঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও বীমা, কনসালটেন্সি অফিস, কনস্ট্রাকশন ফার্ম ও বাণিজ্যিক সংস্থার স্বত্বাধিকারী হয়। এমনিভাবে বিপুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়ে পাকিস্তানের চিহ্নিত বাইশ পরিবার গড়ে ওঠে। দেশের শিল্প সম্পদের শতকরা ষাট ভাগ, ব্যাংকিং সম্পদের শতকরা আশি ভাগ ও বীমা সম্পদের শতকরা উনাশি ভাগ ২২ পরিবার কুক্ষিগত করে।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগের বেশী ছিলনা। কিন্তু পাকিস্তান আমলে শহরাঞ্চলের কিছুটা জৌলুস ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটলেও উৎপাদনধর্মী কাজ বেশী হয়নি। তথাপি অনুৎপাদনশীল কার্যক্রমে দেশের বিপুল সম্পদ ব্যয় করা হয়েছে। নতুন রাজধানী তৈরী করেও 'পাকিস্তান সরকার বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ ও এখানকার জনসাধারণের মাথাপিছু আয় সর্বনিম্ন' এই অপবাদ ঘোচাতে পারেনি। করাচী থেকে রাওয়ালপিণ্ডিতে অন্তর্বর্তীকালের জন্য রাজধানী স্থানান্তরের ব্যয়-বাহুল্য, ইসলামবাদে এক হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ব পাকিস্তানে লোক দেখানো অপ্রয়োজনীয় দ্বিতীয় রাজধানী নির্মাণে ১৭ কোটি টাকা ব্যয় অগঠনমূলক অনুৎপাদনশীল অর্থনীতির নমুনা। বৈদেশিক সাহায্যের অনুৎপাদক খাতে ব্যয়ের মাধ্যমেই পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় (২২ পরিবার) ব্যবসায়ী আমলা ফড়িয়া কন্ট্রাকটরকে কোটিপতি-পুঁজিপতি বানানো হয়েছিল।

তখন এবং এখনও পূর্ববঙ্গ ও পাকিস্তান কৃষি প্রধান দেশ। উভয়াঞ্চলের শতকরা ৮৫ জন অধিবাসী কৃষি নির্ভর। পাকিস্তান অর্জনের পর কৃষি উন্নয়নে বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণের পরও পূর্ব পাকিস্তানের (পাট, চা, চামড়া যা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতো) কৃষির উন্নয়নের প্রতি বিশেষ নজর

Dhaka University Institutional Repository

দেয়া হয়নি। দু একটা সার কারখানা নির্মাণ করা হয়েছে; মাঝে মাঝে বিদেশ থেকে কিছু পরিমাণ সার ও বিদ্যুৎচালিত পাম্প ইত্যাদিও আমদানী করা হয়েছে বটে— কিন্তু কৃষকদের মূল সমস্যার প্রতি আদৌ নজর দেওয়া হয়নি। তাদের মূল সমস্যা ছিল ঋণ-ভার, কর-ভার, ও কর্ষণযোগ্য ভূমির মালিকানাহীনতা। সর্বোপরি তাদের ক্রয়- ক্ষমতার নিদারুণ অভাব ছিল। পক্ষান্তরে দেশকে শিল্পায়িত করার এবং পুঁজিগঠনের জন্য শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদেরকে প্রথম থেকেই ট্যাক্স হলিডে, সংরক্ষিত বাজার, সাবসিডি প্রদান, বোনাস ভাউচার প্রভৃতির মাধ্যমে আর্থিক সুযোগ দেয়া হয়েছে। কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের বিনিময়ে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার দ্বারা শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সুযোগ দেয়া হলেও কৃষক-সমাজের ঋণ ও কর মুক্তির কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তাই কৃষককুলের অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি, বরং ভূমিহীনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ কমেছে, পাটচাষীদেরকে পাট-ব্যবসায়ী ও চটকল মালিকদের শোষণ থেকে রক্ষা করা হয়নি। ভারত বিভাগের পূর্বে এক মণ পাট বিক্রয় করে যেখানে দুই মণ চাউল ক্রয় করা যেত, সেখানে পাকিস্তান আমলে (১৯৬৭-৬৮) দুই মণ পাট বিক্রয় করে একমণ ধান ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। যারা পাট ও অন্যান্য ফসল উৎপাদন করে—গ্রামাঞ্চলের সেই জনসাধারণ বৎসরের প্রায় ছয়মাস একবেলা-আধবেলা বা অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে দিনাতিপাত করেছে। অথচ এই কৃষকদের উৎপাদিত পাট আর অন্যান্য ফসলেই উপরোক্ত পরিবারগুলো লক্ষপতি থেকে কোটিপতি হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্যের (চাল-গম-ভূট্টা) উপর অতি নির্ভরতার কারণেই কৃষি উন্নয়নের প্রতি মনোযোগ দেয়া হয়নি। তাছাড়া সার্বিকভাবে পূর্ববাঙলাকে শোষণ করার ইচ্ছাই তাদের ছিল, ; তাই এখানে উন্নয়নের কোন পদক্ষেপ তাদের কাম্য ছিলনা। তবে ষাটের দশকের মাঝামাঝি বিশ্বে খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় এবং খাদ্য সরবরাহ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির পরিবর্তন ঘটায় ও শর্তের বহুমুখি চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় পাকিস্তান সরকার সার আমদানী ও ইরি ধানের চাষ ইত্যাদি বৃদ্ধির প্রতি মনোনিবেশ করেছিল, যদিও তা অনেকটা প্রচার কার্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল— এ-ব্যাপারে তাদের কোনদিনই আন্তরিকতা ছিল বলে মনে হয়না। তাই কৃষকদের মূল সমস্যার প্রতি তারা তাকাতে চায়নি। কৃষকদেরকে ঋণভার ও করভার থেকে মুক্ত করার কোন ইচ্ছা জাগেনি। জনগণের বাঁচার স্বার্থে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যও হ্রাস করা হয়নি। উপরন্তু জমির কর থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন করের পরিমাণ বৃদ্ধি করে জনজীবন দুর্বিসহ করে দেয়া হয়েছে। জনগণের উপর প্রশাসনের জুলুম ও শোষণ এবং তহশিলদার, আমলা ও ফড়িয়াদের দুর্নীতি রেকর্ড ভঙ্গ করে যায়। বকেয়া খাজানা ও (বকেয়া) ঋণ পরিশোধের জন্য লক্ষ লক্ষ সার্টিফিকেট ও বেআইনী আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে কৃষক জনসাধারণকে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরানো হয়েছে নতুন করে। এই পরিস্থিতিতে পূর্ব বাঙলার ৮০% ভাগ জনগণ জীবন্মৃত অবস্থায় পতিত হয়। তাঁদের কল্যাণের জন্য কোন প্রকার খাজানা বা কর মওকুফের সিদ্ধান্ত পাকিস্তানী আমলারা গ্রহণ করতে দেননি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিদের শত শত কোটি টাকার কর মওকুফ করে দেয়া হয়েছে। ধনী আরও ধনী হয়েছে। প্রশাসনে জনপ্রতিনিধিদের কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা না-থাকার কারণে আমলারা জনস্বার্থ-বিরোধী আর্থিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পেরেছেন। তবে আইউব খান বা পশ্চিমা শাসকদের যে উদ্দেশ্য ও মনোভাব ছিল আমলারাতো তাই-ই বাস্তবায়িত করেছিলেন।

ফেডারেল রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায় এবং পুঁজিবিনিয়োগকারীদের ইচ্ছানুসারে (কারণ তারা পশ্চিম-পাকিস্তানী) পশ্চিম পাকিস্তান অধিকতর শিল্পায়িত হয়েছিল। সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য অধিকতর সম্প্রসারিত হয়। এবং দেশের মূলধন সেখানেই গড়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েট ও সামরিক বাহিনীর দফতর এবং ঘাঁটিগুলো সেখানেই অবস্থিত ছিল। এসবের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছিল। অপরিসীম কট্টর ধনতন্ত্রবাদী ব্যবস্থায় পাকিস্তানের অর্থনীতি গড়ে ওঠার ফলে বৈদেশিক কর্জের পরিমাণও বেড়ে যায় এবং ১৯৭০ সনে শুধু ঋণের সুদের পরিমানই দাঁড়ায় ১০০ কোটি টাকা। বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া যে-দেশের মানুষকে অনাহারে মরতে হয়, সেদেশের পক্ষে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা সম্ভব ছিলনা। ফলে শিবির নির্বিশেষে সকল বৃহত্তর শক্তিবর্গের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য পাকিস্তান তৎপর হয়ে উঠেছিল। কোনও নির্দিষ্ট স্বার্থের বশবর্তী হয়ে চীন-রাশিয়া আমেরিকা সকলেই পাকিস্তানের বন্ধু সাজলেও প্রকৃত প্রস্তাবে কেউ-ই পাকিস্তানকে বিশ্বাস করেনি। সেজন্যই সিয়াটো ও সেন্টো জোটের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করলেও পুঁজিবাদী ভূস্বামী প্রভাবিত পাকিস্তানকেও কমিউনিস্ট চীন বন্ধু করেছিল। রাশিয়ার সঙ্গে আইউবের বন্ধুত্ব হলে আমেরিকা পাকিস্তানের উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন উস্কে দিয়েছিল। রাশিয়া বাঙলাদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙলাদেশের পক্ষে কাজ করেছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য ও অদূরদর্শী পররাষ্ট্রীয়নীতি এবং নানান ক্ষেত্রে অসংখ্য ভ্রান্ত-পরিকল্পনা পাকিস্তানকে দ্রুত ধ্বংসের সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যায়।[৪৪]

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় অর্থনীতির ভ্রান্ত পরিকল্পনার কথা বাদ দিলেও, পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব বাঙলাকে বঞ্চিত রাখার সাম্প্রদায়িক-ঔপনিবেশিক মনোভাব পশ্চিম পাকিস্তানীদের কবল থেকে, বিশেষত অখণ্ড পাকিস্তানের মোহ থেকে বাঙালিকে দ্রুত মুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করেছিল। স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোতে পূর্ব বাঙলার সংস্কৃতি যেমন স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে পারেনি, "তেমনি তার অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনাও সম্পূর্ণ ব্যাহত" হয়েছিল। অথচ অফুরন্ত সম্ভাবনাময় পূর্ববাঙলা স্বাধীনতা লাভের পর অর্থে-সম্পদে-শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠার প্রাকৃতিক, ভৌগলিক, কৃষিজ এবং খনিজ সকল দিক দিয়ে যোগ্যতার অধিকারী ছিল। কিন্তু পূর্ব বাঙলাকে মরুভূমির দিকে অগ্রসর করিয়ে দিয়ে মরুভূমিসদৃশ অনুর্বর পশ্চিম-পাকিস্তানের মাটিকে উর্বর করার কৌশল গ্রহণ ছিল বৈষম্য নীতির নামান্তর। এই বৈষম্য ছিল রোমহর্ষক। শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, শিক্ষা, সামরিক ও বেসামরিক, বৈদেশিক-বাণিজ্য — সকল ক্ষেত্রে এমন সব নীতি প্রণীত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত সম্পদে পশ্চিম পাকিস্তান দ্রুত সমৃদ্ধ হয়েছে, আর নিঃস্ব-রিক্ত হয়েছে পূর্ব বাঙলা। আইউবের পতনের পর (১৯৬৯) তিনজন বিদেশী অর্থনীতিবিদ একটি গবেষণামূলক পর্যালোচনায় যা বলেন, তার কিয়দংশ থেকে পাকিস্তান সরকারের অর্থনৈতিক আগ্রাসনের ধরণ বোঝা যায় ঃ-

> "পাকিস্তান সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের বিশেষজ্ঞদের একটি প্যানেল কর্তৃক প্রণীত একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৯৫৯-৬০ সালে যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের গড় (মাথা পিছু) আয় পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা ৩২% বেশী ছিল, সেখানে দশ-বছর পর ১৯৬৯-৭০ সালে এই বৈষম্য প্রায় দ্বিগুণ হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

৬১% এ পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ট্যারিফ, আমদানী নিয়ন্ত্রণ, শিল্প অনুমোদন, বৈদেশিক সাহায্য পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ-বন্টন বিভাগকে ব্যবহার করা হয়েছে বিনিয়োগ ও আমদানীকে এমনভাবে পরিচালনা করতে, যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চ-মূল্যের শিল্প গড়ে উঠতে পারে। আমদানী কোটা ও ট্যারিফের দেয়ালের দ্বারা বন্দী পূর্ববাঙলার বাজারই এইসব শিল্পের লাভকে নিশ্চিত করেছে। যদিও পাকিস্তানের লোকসংখ্যার প্রায় ৬০% ভাগই পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী তবু কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন ব্যয় এই অঞ্চলের জন্য ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৫৪-৫৫ সন পর্যন্ত সর্বনিম্ন ২০% এবং ১৯৬৫-৬৬ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৩৬% এর মধ্যেই উঠানামা করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের ব্যক্তিগত বিনিয়োগের ভাগ ২৫% এরও কম হয়েছে। ঐতিহাসিক ভাবে পাকিস্তানের বৈদেশিক আয়ের ৫০% থেকে ৭০% ভাগই অর্জিত হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা। এতদসত্ত্বেও বৈদেশিক আমদানীর (রফতানী আয় ও বৈদেশিক সাহায্যের দ্বারা যার অর্থ পরিশোধ করা হয়) ক্ষেত্রে তার ভাগ ২৫% থেকে ৩০% এ সীমাবদ্ধ থেকেছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে অর্থ উদ্বৃত্ত করা হয়েছে তা ব্যবহৃত হয়েছে মূলত বিদেশের কাছে পশ্চিম পাকিস্তানের যে ঘাটতি তা পূরণের কাজে এবং তাতে যে নেট সম্পদ স্থানান্তরিত করা হয়েছে (১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সন পর্যন্ত) তার পরিমাণ একটি সরকারী রিপোর্টে অনুমান করা হয়েছে ২.৬ বিলিয়ন।"[৪৫] ..... অনুমান করা হয়েছে যে ১৯৪৭ সন থেকে (১৯৬৯ পর্যন্ত) পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে যে সম্পদ চলে গেছে তার মোট পরিমাণ ৩০০০ মিলিয়ন। পশ্চিম পাকিস্তান মোট উন্নয়ন ব্যয়ের ৭৭% ভাগ লাভ করেছে মোট জনসংখ্যার ৪০% ভাগের জন্য। রাজস্ব যেখানে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আয় হয় ৬০% সেখানে (পূর্ব পাকিস্তান) নিজের খরচের জন্য পায় ২৫% ভাগ। পশ্চিম পাকিস্তানের রাজস্ব খাতে আয় মাত্র ৪০% সেখানে খরচের জন্য পায় ৭৫% ভাগ।[৪৬]

দেশী-বিদেশী গবেষকেরা পশ্চিম ও পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের অনেক খতিয়ান এবং তুলনামূলক চিত্র তৈরী করে পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের ভয়াবহ অর্থনৈতিক শোষণের ইতিকথা তুলে ধরেছেন। সে সবের বিস্তারিত এখানে বর্ণনার অবকাশ নেই, প্রয়োজনও নেই। তবে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের পরিমাণ উপলব্ধির জন্য এখানে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হলো। পূর্ব বাঙলার রাজনীতি বিষয়ে একজন লেখক লিখেছেন ঃ "১৯৪৭-৬৯-এ বিদেশে পণ্য রফতানী করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে যথাক্রমে দুই হাজার চার শত ছত্রিশ কোটি দশ লক্ষ টাকা ও দুই হাজার সাতান্ন কোটি বিশ লক্ষ টাকা। এ সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে আমদানী করা হয় যথাক্রমে এক হাজার নয় শত সাতানব্বই কোটি টাকার পণ্য ও চার হাজার তিনশত ছিয়ানব্বই কোটি সত্তর লক্ষ টাকার পণ্য। এ হিসেব অনুসারে পূর্ববঙ্গ আয় করেছে ৫৫.২% ভাগ, আমদানীর বেলায় ভাগ পেয়েছে ৩১.১% ভাগ। পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ববঙ্গের অর্জিত চারশত উনআশি কোটি দশ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে উন্নয়ন খাতে পূর্ব পাকিস্তানে মাথা পিছু ব্যয়ের পরিমাণ ছিল দুই শত চল্লিশ টাকা, আর পশ্চিম পাকিস্তানে পাঁচশত বিশ টাকা। মাথাপিছু রাজস্ব ব্যয়ের পরিমাণ ছিল পূর্ব পাকিস্তানে সত্তর টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে তিনশত নব্বই টাকা। এ বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দরুণই তৃতীয় পরিকল্পনা কালে মাথা পিছু জাতীয় উৎপাদন পশ্চিম পাকিস্তানে শতকরা আঠারো ভাগ, আর পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা সাতভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল।"[৪৭]

ভিয়েনার একটি বিশেষজ্ঞদল পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য লক্ষ্য করে লিখেছিলেন ঃ

> "পূর্ব পাকিস্তানের অস্তিত্ব ছিল শুধমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতি, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ও কন্ট্রাক্টরদের এবং সামরিক ও সিভিল আমলাদের জন্য। গত ২৪ বছর ধরে পাকিস্তান সরকার যার অধিকাংশ সদস্যই পশ্চিম পাকিস্তানী—রাষ্ট্রীয় নীতিকে একটা উদ্দেশ্যমূলক কর্মপন্থা দ্বারা এমনভাবে পরিচালিত করেছে যাতে পশ্চিম পাকিস্তানের শূন্য মরুভূমির উন্নয়ন ঘটে, এবং এই নীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তান নিঃস্বে পরিণত হয়। ব্যাপক বৈষম্যের তথ্য যাতে প্রকাশিত হয়ে না পড়ে তার জন্য পাকিস্তান সরকার অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। তবুও সরকারী সূত্র থেকেই যতদূর তথ্য পাওয়া গেছে তাতে সত্য সম্পূর্ণ ঢাকা দিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি।"[৪৮]

পৃথিবীর কোথাও একই রাষ্ট্রের এক অঞ্চলের উপর অন্য অঞ্চলের এমন নগ্ন নির্লজ্জ ও ভয়াবহ অর্থনৈতিক শোষণ, সাংস্কৃতিক নিপীড়ন ও রাজনৈতিক আধিপত্যের দৃষ্টান্ত দেখা যায়না। একমাত্র একটি ঔপনিবেশিক দেশই তার একটি উপনিবেশের উপর এমন শোষণ, নিপীড়ণ ও আধিপত্য চালাতে পারে। যতদিন পর্যন্ত শুধু সাংস্কৃতিক দমন ও রাজনৈতিক নিপীড়নের প্রশ্নটি পূর্ববাঙলার জনগণের দৃষ্টিতে এসেছিল, ততদিন স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন তাই এত তীব্র হয়ে ওঠেনি। কিন্তু যখনই অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পূর্ব বাঙলার উপর নির্মম শোষণ ও একচ্ছত্র আধিপত্যের বিষয়টি বাঙালির গোচরে আসল তখনই এই আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে।[৪৯] পূর্ব বাঙলার নেতৃবৃন্দ প্রথম থেকেই আর্থিকভাবে বঞ্চনার জন্য অভিযোগ উত্থাপন করে আসলেও পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালিদের নানাভাবে দমন-নিপীড়ন করে, লোভ-লালসা, পদ-পুরস্কার দিয়ে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। পাকিস্তানের প্রায় অর্ধেকটা কাল কাটে আইউব খানের দারুন সন্ত্রাস ও নিপীড়নের মধ্যে। কিন্তু তবু পূর্ব বাঙলার জনগণ আইউবের সময়ই কঠোর নির্যাতন নিপীড়ন নিবর্তনমূলক আইন অগ্রাহ্য করে শোষণ-মুক্তির দাবি নিয়ে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিল।

২.৫. সাংস্কৃতিক ঘটনাবলী--পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি ; চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক অবস্থা ; হরিখোলার মাঠে অনুষ্ঠিত ১৯৫১ সনের সাংস্কৃতিক সম্মেলন ; সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ ; সভাপতি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিদের বক্তব্য ও ভাষণ ; সম্মেলনের মূল্যায়ণ ; ঢাকা ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সম্মেলন, আন্দোলন এবং এক্ষেত্রে চট্টগ্রামের সংস্কৃতিকর্মীদের ভূমিকা ; ১৯৫২ সনের কুমিল্লা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন ; সম্মেলনের কার্যক্রম ও সভাপতির ভাষণ ; ১৯৫৪ সনে ঢাকার কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন ও এর সমালোচনা ; চট্টগ্রাম প্রান্তিক নবনাট্য সংঘের পরে 'ইস্ট এণ্ড ক্লাব' ও 'কৃষ্টি কেন্দ্রের' উজ্জীবন এবং 'নারী সমিতি' ; পাকিস্তান লেখক সংঘের মাধ্যমে আইউব

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃক দেশের বুদ্ধিজীবীদের সমর্থনলাভের চেষ্টা ; প্রগতি লেখক সংঘের পরে 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' এর প্রতিষ্ঠা; একুশে ফেব্রুআরি সংকলন ও পুঁথিপত্র প্রকাশনীর সৃষ্টি; 'বাফা' ও 'বাংলা একাডেমী'র প্রতিষ্ঠা; হরফ ও ভাষা সংস্কারের ; ১৯৪৮-৪৯ সনের পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন; ১৯৫২ সনের নিখিল পাকিস্তান চিত্রপ্রদর্শনী (ঢাকা) ও তমদ্দুন মজলিশের ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন ১৯৫২; ১৯৫৭সনের নিখিল পাকিস্তান সঙ্গীত সম্মেলন; সিপাহী যুদ্ধের শত-বার্ষিকী পালন; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজী বিভাগের সাহিত্য সেমিনার (১৯৫৮); ১৯৫৮ সনের চট্টগ্রামের পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন; পাকিস্তান লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠা (১৯৫৯); পাক ভারত যুদ্ধ ও ৬ই সেপ্টেম্বর পুরস্কার প্রবর্তন; ১৯৬৮ সনের 'উন্নয়ন দশক' পালন ও বাংলা একাডেমীর সাহিত্য সেমিনার; উন্নয়ন দশক পালনের উদ্দেশ্য; রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধকরণের বিতর্ক ও 'ছায়ানট' এর প্রতিষ্ঠা; পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উদযাপনের রেওয়াজ চালু; পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি বই নিয়ে আন্দোলন এবং বুদ্ধিজীবীদের মুক্তিসংগ্রামের শপথ গ্রহণ।

২.৫. ক. পাকিস্তানী-রাজনীতির আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হয়না— যদিনা, সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে তার সংশ্লেষণ ঘটানো হয়। কারণ, পাকিস্তান-বিরোধী রাজনৈতিক-আন্দোলনের আরম্ভ হয়েছিল পশ্চিম-পাকিস্তানী শাসক-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক-আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব-বাঙলার জনগণের প্রতিরোধ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এই প্রতিরোধ প্রথমে প্রতিবাদের স্বরূপে উচ্চকিত হয়েছিল ঢাকা ও চট্টগ্রামের প্রগতিশীল সাহিত্যিক ও সকল দলমতের সংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে বাঙলা ভাষা ও বাঙালি-সংস্কৃতির পক্ষে জনমত গঠন করতে গিয়ে। তবে চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক কার্যাবলী কতিপয় ঐতিহাসিক কারণে দ্রুত সুসংগঠিত হয়ে সরকার-বিরোধী আন্দোলন বা বাঙালি সংস্কৃতির বিরোধীতাকারীদের বিপক্ষে বিদ্রোহ-বিপ্লবে রূপ নিতে পেরেছিল।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, বিদ্রোহী-বাঙলার উর্বর-ক্ষেত্ররূপে চট্টগ্রাম বহুকাল আগে থেকেই চিহ্নিত হয়ে আসছে। মধ্যযুগে এ-অঞ্চলে বাঙলাভাষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল এবং এখান থেকে অনেক উন্নতমানের সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টি হয়েছিল। বর্তমান শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে বৃটিশ বিরোধী বিদ্রোহ-বিপ্লব-অভ্যুত্থান তথা সূর্যসেনের ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যক্রম ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কথা স্মরণীয় ঘটনা। সাতচল্লিশে স্বাধীনতা অর্জনের পরে, পাকিস্তান-বিরোধী চিন্তাধারার বীজও বহুল পরিমাণে পাওয়া গিয়েছিল চট্টগ্রাম থেকেই। ১৯৭১ সনের সশস্ত্র-সংগ্রামের কৃতিত্ব বিচার করতে গেলেও চট্টগ্রাম রণাঙ্গণের কথা বিস্মৃত হওয়া চলেনা।

বৃটিশের ক্ষমতা হস্তান্তরের পর — সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পরিপোষক সদ্য-নির্মিত পাকিস্তান-এর চট্টগ্রাম অঞ্চলে কলকাতা থেকে আগত প্রগতিশীল সাহিত্যিক-শিল্পী-সংস্কৃতিকর্মীদের একটা উজ্জ্বল দল চট্টগ্রামে জড়ো হয়েছিলেন, কারণ তখন কলকাতার সঙ্গে চট্টগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল ভাল। তদুপরি তখন চট্টগ্রামে যেসব প্রাগ্রসর ভাবুক চিন্তক-কর্মীগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া গেল, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী-সদস্য-সমর্থক ও শুভার্থী। বলা বাহুল্য, বিভাগ-পূর্ববর্তীকালেই চট্টগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির সুসংহত সংগঠন গড়ে উঠেছিল। নবগঠিত (চট্টগ্রাম কেন্দ্রের) রেলওয়ে বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যেও কমিউনিষ্ট-ভাবাপন্ন কতিপয় সক্রিয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অর্থনৈতিক ভাবেও বন্দর-নগরী চট্টগ্রাম কিছুটা উন্নত আগে থেকেই ছিল। শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা তাই ও-অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে বেশি পাওয়া যায়। এসব কারণেই পূর্ব-পাকিস্তানের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং সংস্কৃতি ও সাহিত্য-শিল্পের প্রাগ্রসর ধারার চর্চা চট্টগ্রাম থেকেই শুরু হয় এবং ক্রমে সারা পূর্ববাঙলায় তা ব্যপ্তিলাভ করে। রাজধানী ঢাকায় আগত সংস্কৃতি-কর্মী ও লেখক-সাহিত্যিকেরা (অধিকাংশই সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত পাকিস্তানপন্থী, ইসলামী-জোসে উজ্জীবিত ও পাকিস্তান আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন) গদি বা ক্ষমতা দখল এবং দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থ-সংরক্ষণে তৎপর ছিলেন। প্রগতির সপক্ষ তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকেরা শাসকদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও নির্যাতনের মুখে কিছু করে উঠতে পারছিলেন না। তবু তাঁরা কিছু কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, যার বর্ণনা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। তরুণেরা কিছু সংখ্যক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রবীণের সমর্থন পেয়ে এ-ধারাকে সচল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক ও প্রবীণ সংবাদপত্রসেবী মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনকে সামনে রেখে তাঁরা ১৯৪৭-৪৮ এবং ৫২-৫৩ নাগাদ ঢাকায়ও একটি সুসংগঠিত সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালু করেছিলেন, যা ১৯৫৩-৫৪ থেকে জোরদার হয়। ১৯৪৭-সংলগ্ন সময়-কালে চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক-অঙ্গনের এক উৎসাহী কর্মী আজিজ মিছির (সিরাজুল ইসলাম) লিখেছেন ঃ চট্টগ্রামের "রেলওয়ে ইনস্টিটিউট বা ওয়াজিউল্লাহ ইনস্টিটিউট বাম-পন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের একটা প্রাণ কেন্দ্র ছিল। রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগে তখন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং সমর্থক ছিল অনেকেই। ... প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বীজ এই ..... ইনস্টিটিউটকে কেন্দ্র করেই রোপিত হয়। ...... একটা কথা আজ ভাবতে অবাক লাগে যে, যখন পূর্ব-পাকিস্তানের কোন জায়গায়— এমনকি ঢাকায়ও প্রগতিশীল সংস্কৃতির চর্চা ছিলনা— সেই সময়ে চট্টগ্রামে প্রথম প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা হয়।"[৫০]

১৯৪৮ সনের আগেও চট্টগ্রামে উল্লেখযোগ্য না-হলেও কিছু কিছু সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ছিল। আর্যসঙ্গীত সমিতি ও 'সঙ্গীত পরিষদ'-এ প্রশিক্ষণের একটা শ্লথ ও নিরুত্তাপ প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। এনায়েত বাজারে রেলওয়ের ওয়াজিউল্লাহ ইনস্টিটিউটে পৌরাণিক ও এতিহাসিক নাটক মঞ্চায়নের একটা অনিয়মিত প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। এই পরিস্থিতিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল ভাবনা-চিন্তার এক ঝাঁক কর্মী চাটগাঁয়ে এসে একত্রিত হয়ে— দেশ ভাগের ফলে উদ্বাস্তু হয়ে ভারত গমনের ফলে সৃষ্ট হিন্দুদের শূন্যস্থানে সংস্থাপিত হলেন। এঁদের মধ্যে শওকত ওসমান, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, এবনে গোলাম নবী, কলিম শরাফী প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। তাছাড়া ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিতপ্রবীণগবেষকচিন্তাবিদলেখক

Dhaka University Institutional Repository

এবং তরুণ সাহিত্যিকদের অবস্থান আগে থেকেই ছিল। এঁদের মধ্যে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ওহিদুল আলম, মাহবুবউল আলম, আবুল ফজল, কবিয়াল রমেশ শীল এবং চট্টগ্রামের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক ননী সেনগুপ্ত, চট্টগ্রামের প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক সুধাংশু সরকার, 'সীমান্ত' পত্রিকার সম্পাদক মাহবুবউল আলম চৌধুরী এবং সুচরিত চৌধুরীর কথা বলতেই হয়। বিভিন্ন সংগঠনের অনেক কর্মী — যেমন মোসলেহ উদ্দীন, জলিল উদ্দীন আহমদ, চৌধুরী হারুনর রশিদ, সাদেক নবী, যাত্রাশিল্পী অমলেন্দু বিশ্বাস, আবদুল হামিদ, মোঃ সাদেক আলী, আবদুল জব্বার, এমদাদুল হক, ইদ্রিস মীনা, ডি. বি. চৌধুরী, চিরঞ্জীব দাস শর্মা, অচিন্ত্যকুমার চক্রবর্তী, নির্মল মিত্র, স্নেহময় রক্ষিত, রমেন মজুমদার, মাহবুব হাসান, গোপাল বিশ্বাস, আজিজ মিছির, আহমদ শরীফ, তারাপদ ঘোষ, সায়ীদুল হাসান, ফরিদা হাসান, এম. এ. জামান, কাজী আলী ইমাম, ফনী বড়ুয়া, এ. কে. মন্নান, সুনীল চক্রবর্তী, এম. এ. সামাদ এবং নাম –না জানা আরও অনেকে ছিলেন তখন চট্টগ্রামে।

এঁদের মধ্যে তরুণতর সংগঠক মাহবুবউল আলম চৌধুরী অবিভাজ্য বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করার নিরপেক্ষ বক্তব্য নিয়ে 'সীমান্ত' নামে কমিউনিস্ট–ভাবাপন্ন একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশে প্রথম উদ্যোগী হন ১৯৪৭ সনের আগষ্ট–সেপ্টেম্বর–নভেম্বর মাসেই। তিনি পাকিস্তানের সরকারী দল মুসলিম লীগের একজন প্রধান সংগঠক ও নেতা, আহমেদ সাগীর চৌধুরীর ভগ্নি–পুত্র। অর্থবিত্তের জন্য তাঁর ভাবনা বেশী ছিলনা। অতএব 'সীমান্ত' মোটামুটি নিয়মিত বের হতো। প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর আয়োজন করা হয় প্রকাশনা–উৎসবের। পত্রিকাটি বেশ সুনাম অর্জন করে এবং অনতিকাল মধ্যেই প্রসার সৃষ্টি করে। এই পত্রিকাকে ঘিরেই গড়ে ওঠে একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী— 'সাংস্কৃতিক বৈঠক'। মাহবুবউল আলম চৌধুরী লিখেছেন ঃ প্রগতিগোষ্ঠী ও সাহিত্য সংঘ যখন সরকারের হামলায় ভেঙ্গে গেল তখন সমস্ত প্রগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিকরা এই 'সাংস্কৃতিক বৈঠক' –এ এসে জমায়েত হলেন। তাঁরা গল্প কবিতা পাঠ করতেন। আহমদুল কবির, সানাউল হক, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, শওকত ওসমান প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত লেখকেরা এতে যোগ দিতেন। তিনি আরও লিখেছেন, ১৯৫০ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কালে দাঙ্গা প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে দাঙ্গা–বিরোধী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সমাবেশ করার জন্য চট্টগ্রামের মাদারবাড়ী ক্লাব, নন্দন কাননের শক্তি সংঘ, দেওয়ান বাজারের অগ্রণী সংঘ প্রভৃতি ক্লাব সংগঠিত করে জে. এস. সেন হল প্রাঙ্গনে 'সমাবেশের আয়োজন করে মানুষকে সচেতন করে তোলা হয়।'[৫১] 'তখন ইসলামের জিগির তুলে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র সমস্ত প্রগতিশীল ও উদারনৈতিক চিন্তাধারার পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছিল। একে প্রতিহত করতে হলে শুধু সাংস্কৃতিক সংঘ দিয়ে রোধ করা যায় না। একটা পূর্ণাঙ্গ সংগঠনের প্রয়োজন। কিন্তু তখন কোন সংগঠিত পার্টি ছিলনা।' '১৯৫০ সনের এই গণ–সমাবেশে পূর্ব পাকিস্তানে সর্বপ্রথম বিশ্বশান্তি পরিষদের শাখা (চট্টগ্রামে) স্থাপিত হয়।' চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সম্পাদক ও সভাপতি নির্বাচিত হন যথাক্রমে মাহবুবউল আলম চৌধুরী ও আবদুল হক দোভাষ। আণবিক বোমা নিষিদ্ধ করণের দাবীতে তাঁদের নেতৃত্বে পরিষদ প্রায় সাত লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ করে। বিশ্বশান্তিপরিষদ এর আবেদন এবং কার্যক্রম, 'সীমান্ত', পত্রিকায় প্রচার করা হতো। সীমান্ত এক ঐতিহাসিক দাঙ্গা–বিরোধী সংখ্যাও প্রকাশ করেছিল । এইসব প্রচেষ্টাই তখন ছিল (পূর্ব পাকিস্তানে) ব্যতিক্রমী। 'সীমান্ত'র 'সাংস্কৃতিক বৈঠক' কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল 'প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ'। আর 'প্রান্তিক নব নাট্য সংঘ এবং সাংস্কৃতিক বৈঠকের সদস্যদের শক্তিকে সুসংহত করার লক্ষ্যে আমরা সর্ব প্রথম পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫১ সনের ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯–শে মার্চ, হরিখোলার (চট্টগ্রাম) মাঠে একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলন করি।[৫২]

এই সম্মেলন পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক–জগতে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। প্রগতিশীলতার বদ্ধদুয়ার যেন খুলে গেল। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল মহল— দৈনিক আজাদ, মর্নিং নিউজ প্রভৃতি পত্রিকা এবং মুসলিমলীগ সরকার সমর্থক অপরাপর প্রচার মাধ্যম এর বিরুদ্ধে আগেই কমিউনিষ্টদের সম্মেলন বলে প্রচার শুরু করে সম্মেলনের বিরুদ্ধে এমন প্রতিবাদ উত্থাপন করতে থাকেন যে সরকারী চাকুরে শিল্পী–সাহিত্যিকেরা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে সাহসী হননি। এ. বি. এম. হাবীবুলাহ, কাজী মোতাহার হোসেন, অমিয় ভূষণ চক্রবর্তী, অজিত গুহ প্রমুখ নিমন্ত্রিত অতিথি কেউ–ই গেলেন না। ঢাকা থেকে সম্মেলনের একজন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রবীণ কবি বেগম সুফিয়া কামাল (জ. ১৯১১) এবং 'সত্যযুগ' পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (অন্যতম প্রধান অতিথি) যোগদান করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকেও অনেক শিল্পী সাহিত্যিক আসেন। এঁদের মধ্যে সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, হেনা বর্মণ, প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন স্থান থকে যে–সমস্ত লেখক– শিল্পী সম্মেলনে যোগদান করেন — তাঁদের মধ্যে আলাউদ্দীন আল আজাদ, মোহাম্মদ আলী (সম্পাদক নও–বেলাল) মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সলিল চৌধুরী, রমেশ শীল এর নাম উল্লেখযোগ্য। সম্মেলন উদ্বোধন করেন বেগম সুফিয়া কামাল এবং সভাপতিত্ব করেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও পশ্চিমবঙ্গের খ্যাত–অখ্যাত, হবুখ্যাত বহুলোকের সমাগমে সম্মেলনটি সার্থকতার পথ নির্দেশ করতে সক্ষম হয়। কীর্তন, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কবিগানের মাধ্যমে সমাবেশের বিপুল সংখ্যক শ্রোতা–দর্শক বাঙালি–সংস্কৃতির আস্বাদ লাভ করেন। সমাবেশের মূল প্রস্তাব ছিল সমাজ পরিবর্তনের উপায় সম্পর্কে। নিজেদেরকে তাঁরা সবাই প্রাচীন ও আধুনিক কালের অবিভাজ্য বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী বলে দাবি করেন। প্রশ্ন উঠতে পারে কেন এই সম্মেলন? এর ব্যাখ্যা দিয়ে একজন সমালোচক সমকালীন একটি পত্রিকায় লিখেছিলেন ঃ

"শিল্পী–সাহিত্যিকেরা জনতার বিবেকের প্রতিনিধি। মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা, অর্থনৈতিক সংকটের আবর্তে সমাজজীবন বিপর্যস্ত, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দাঙ্গা, যুদ্ধের বিভীষিকা, জনজীবনে এনেছে অমঙ্গলের ঝড়। ভূখা জনতার আশা–আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যত সুস্থ সুন্দর জীবনের ছবি বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যাচ্ছে অসীম শূন্যে। ইতিহাসের গতিকে স্তব্ধ করে দেবার ষড়যন্ত্র চলছে প্রতিনিয়ত। বৃহত্তর জনতার (যারা সংস্কৃতির কর্ণধার) জীবনে শান্তি, অবসর, নিরাপত্তা নেই। ... দারিদ্র্য, মহামারী, দাংগা, যুদ্ধের বিভীষিকার বিরুদ্ধে লড়াই করে বাস করতে হচ্ছে জীবনের অধিকাংশ সময়। অথচ বৃহত্তর জনতাকে বাদ দিয়ে সাংস্কৃতিক উন্নতির কথা ভাবতে যাওয়া কাল্পনিক–বিলাস মাত্র। বৃহত্তর জনতার জীবনে নিরাপত্তা, শান্তি, প্রাচুর্য চাই। শিল্প–সাহিত্য সংস্কৃতির ব্যাপক প্রবাহকে এগিয়ে নিতে শিল্পী সাহিত্যিক—সংস্কৃতিসেবকরা আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সংস্কৃতিকে নিয়ে আজ ছিনিমিনি খেলা চলছে। বৃহত্তর জনতার মাতৃভাষাকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করবারও আয়োজন চলছে পুরোমাত্রায়। ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে সংস্কৃতির নামে বিভ্রান্তিকর পথে বৃহত্তর জনতাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অজ্ঞতার

Dhaka University Institutional Repository

অন্ধকারে, মৃত্যুর অতল গহবরে। জনতার বিবেকের প্রতিনিধি বলেই শিল্পী সাহিত্যিকদের সংবেদশীল মনে তুলেছে বিক্ষোভের তুফান।কালের যাত্রাধ্বনিকে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করতে শিল্পী-সাহিত্যিকরা কোনদিনই পিছপা হয়নি। আজকের শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিসেবীরাও এগিয়ে এসেছে দৃঢ় পদক্ষেপে। তাই এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের আয়োজন।"

একই পত্রিকায় সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে লেখা হয় ঃ

"১. আমরা বিশ্বাস করি - সাহিত্য শুধু জীবনের নিছক প্রতিফলন নয়, সাহিত্য সমাজ উন্নয়নের শক্তিশালী অবলম্বন। ক্ষুধা, বেকারী এবং অশান্তির হাত থেকে সমাজ জীবনকে রক্ষা করা — তার গতিশীলতাকে .... এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পবিত্র দায়িত্ব আজ শিল্পী, সাহিত্যিকদের। দুর্ভিক্ষে বাঙলাদেশের ৩৫ লক্ষ নরনারীর মৃত্যু, গত মহাযুদ্ধে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ভাঙন , যে ধ্বংস, আজকের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের যে অর্থনৈতিক সংকট— অভাব-অনটন, জীবনের এই বাস্তব সত্য— তাকে বাদ দিয়ে সমস্যাকে এড়িয়ে কোন সাহিত্যই মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারেনা। অতএব বিভিন্ন মতবাদের শিল্পী সাহিত্যিকের এ সম্মেলনে আমরা প্রস্তাব করছি — মানুষের কল্যাণের জন্য যে সাহিত্য, সমাজের গতিশীলতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে সাহিত্য আমরা সে সাহিত্যের প্রতি আস্থাশীল। মানুষের ভাল করবার, মানুষের মঙ্গল করার সদিচ্ছাকে অঙ্গীভূত করে যে সাহিত্য, শোষণের বিরুদ্ধে এক দেশের উপরে অন্য দেশের প্রভুত্যের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আমরা মতবাদ নির্বিশেষে মানবতার নামে সে-সাহিত্যের অনুসারী। আমরা বিশ্বাস করি আজ এ সাহিত্যই জনসাধারণের একমাত্র কাম্য।

২. নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ব্যতীত কোন দেশের সাংস্কৃতিক উন্নতি সম্ভব নয়। এই সম্মেলনে আমরা প্রস্তাব করছি — ভবিষ্যতে কোন যুদ্ধকেই আমরা বরদাস্ত করব না। আক্রমণকারী যে হোক না কেন তার বিরুদ্ধে আমরা মানবতাবিরোধী জঘন্য কাজ হিসাবে নিন্দা করবো।

৩. ... বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে অক্ষর পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে বাঙলা ভাষার মূলে আঘাত করার যে নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে এবং মূলনীতি কমিটির ৫৩ প্রস্তাবে বাঙলা ভাষার দাবীকে কোন প্রকার প্রাধান্য দেওয়া হয়নি দেখে আমরা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করছি। অবিলম্বে বাঙলা ভাষাকে যেন রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়।

৪. খুনী বাঙলা— বাঙলাদেশের পরিচয় নয়। বিগত দাঙ্গা হাঙ্গামায় ভাইয়ের রক্তে ভাইয়ের হাত কলুষিত হতে দেখে প্রত্যেক শিল্পী-সাহিত্যিকই অত্যন্ত পীড়া অনুভব করেছেন।

৫. সংস্কৃতির মূল ভিত্তি শিক্ষা। শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ছাড়া জাতীয় সংস্কৃতির মান উন্নয়ন অসম্ভব। ... অতএব এ সম্মেলন সাধারণ ছাত্র ও শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষার প্রসার করার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে।

৬. সংস্কৃতি বিকাশের পূর্ণ স্বাধী না পেলে যে কোন জাতি ক্রমশ পঙ্গু হয়ে পড়তে বাধ্য। শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, চিত্র, ভাস্কর্য, নৃত্য, ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অবদানগুলোর উৎকর্ষ ও পরিপূর্ণতা সাধন না হলে জাতীয় জীবনে কোন প্রকার অগ্রগতি সম্ভব নয়। আমাদের সংস্কৃতি বিকাশের জন্য আজ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন। এ না হলে জাতীয় জীবনের অগ্রগতি ব্যাহত হবে। কুসংস্কারের নাগপাশে আমরা চিরদিন জড়িত হয়ে থাকব। মানবতামুখী কোন নতুন চিন্তাধারাকে আমাদের মহান জাতীয় ঐতিহ্যের বলে সঞ্জীবিত করে গ্রহণ করার মত মানসিক ঔদার্য আমরা হারিয়ে ফেলব। নতুনকে বর্জন করে পুরাতনের আবর্জনা স্তুপে আমরা নিমগ্ন হয়ে পড়ব। তাই আজ গতিশীল জীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজন যাবতীয় সৃষ্টিশীল কল্যাণধর্মী শিল্প সাহিত্য প্রকাশ ও প্রচারের, পুস্তক, পত্র, পত্রিকা প্রকাশের; সংগীত ও নাট্যানুষ্ঠানের এবং সকল নতুন চিন্তাধারার ব্যাপক আলোচনার অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হোক।

৭. দেশের সমস্ত শিক্ষায়তনগুলি সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বাহন রূপে কাজ করে। কিন্তু আমরা দেখেছি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্ররা স্বাধীনভাবে আপন আপন বিশ্বাস অনুযায়ী সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টায় অবাধ অংশ গ্রহণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এতে জাতিকে হয়তো শিক্ষিত করে তোলা হয় কিন্তু সভ্য করে গড়ে তোলা হয়না। তাই শিল্পী সাহিত্যিকের এ সম্মেলন প্রস্তাব করে— সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্রদের এই অধিকার ও সুযোগ প্রদান করা হোক যেন তারা আপন আপন বিশ্বাস অনুযায়ী সর্বপ্রকার সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করতে বাধা প্রাপ্ত না হয়।

৮. আমাদের সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান পুরোধা কবি নজরুল ইসলাম। তাঁর অবদানে বাঙলাদেশের সংস্কৃতি নতুন প্রাণ-স্পন্দনের সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির এই শ্রেষ্ঠ পুরোহিত আজ পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে অচিকিৎসায় অনটনে কোনমতে বেঁচে রয়েছেন। অথচ আজ তাঁকে নিয়ে চলেছে নির্লজ্জ টানাটানি। তিনি নীরব বলে আজ তাঁর অবদানগুলোকে চূড়ান্ত অপব্যাখ্যায়, সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে টেনে আনবার চেষ্টা হচ্ছে। এমন কি তাঁর নাম বিকৃত পর্যন্ত করবার চেষ্টা চলছে। রুগ্ন কবিকে চিকিৎসার জন্য আজো সুইজারল্যাণ্ডে প্রেরণের ব্যবস্থা করা গেল না। আমরা মনে করি উভয় বাঙলার সরকারদ্বয় ইচ্ছা করলে জনগণের প্রিয় কবি নজরুলের জন্য পৃথিবীর সমস্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানকে এনে হাজির করতে পারেন। এমন কি নজরুলের চিকিৎসার জন্য যদি জনসাধারণের উপর করও বসানো হয় তাতেও কেউ কোন আপত্তি করবে না। এই সম্মেলন তাই আবেদন করে যে উভয় বাঙলা, সরকারদ্বয় চিকিৎস্যার জন্য নজরুলকে সুইজারল্যাণ্ডে প্রেরণ করে তাঁর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করুন। নজরুলের সৃষ্টির যারা অপব্যাখ্যা করেছে এবং নজরুলকে নিয়ে যারা সুবিধা আদায়ের অপচেষ্টা করছে এ সম্মেলন তাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করছে।

৯. এই সম্মেলন প্রস্তাব করছে যে এখানে বিভিন্ন জেলা থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁদের সাথে পরামর্শ করে সম্মেলনের কার্যকরী কমিটি আমাদের প্রথম প্রস্তাবনার ভিত্তিতে প্রদেশব্যাপী একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করেন। সেই কমিটি অবিলম্বে অন্যান্য জেলার সংগে যোগাযোগ করে প্রত্যেক জেলা থেকে প্রতিনিধি নিয়ে আহবায়ক কমিটিকে পরিবর্দ্ধন করবেন ও আর একটি প্রতিনিধিমূলক সম্মেলন

আহবানের জন্য প্রস্তুতি চালাবেন।"[৫৪]

প্রস্তাবগুলো থেকে সম্মেলনের মহৎ উদ্দেশ্যসমূহ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সভাপতির ভাষণে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ যা বলেন, তা ছিল তখনকার সমাজে দিকদর্শনের মতো এবং সৎসাহসী সমাজসেবীর পবিত্র দায়িত্ববোধের স্মারক ঃ

"ঐতিহ্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি ধ্রুব নক্ষত্র বিশেষ। ঐতিহ্যের অনুসরণ ও সেই স্রোত-ধারাকে চির বহমান করিয়া তোলাই সংস্কৃতিসেবীর আসল কাজ। যাঁরা তা মানেন না, তাঁদের কাছে আমার সাধনার কোন মূল্য নাই। তাঁহাদের সহিত আমি তর্কে প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু আপনাদের বলিতে চাই, ঐতিহ্যের পটভূমির সহিত যাহাদের যোগ নাই, তরুলতার ক্ষেত্রে যেমন পরভোজী শব্দ ব্যবহার করা হয়— এখানে ঐ জাতীয় ব্যক্তিদের জন্য তেমন বিশেষণই আরোপ করা চলে। সমাজ জীবনেও দেখিবেন ইঁহারা পরভোজী। মানবতার সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। জনসাধারণের মস্তকে কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া দিনাতিপাত করেন। এই জাতীয় ব্যক্তিদের উপদেশ কোনদিন গ্রহণ করিবেন না।

ঐতিহ্যের প্রেম সাংস্কৃতিক সাধনার আসল সোপান। দেশের ইতিহাস এই জন্যই ভাল রূপে জানা দরকার। ... ভুলিয়া যাইবেন না, অতীত আমাদের পথ প্রদর্শন করে। সেই আলোকে আমাদের বর্তমান নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। এই জন্য ঐতিহ্যের কথা বারবার স্মরণ রাখা দরকার। ঐতিহ্যহীন কোন কিছু গড়িতে গেলে আপনারা ভুল করিবেন। সাধনা পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র। অথবা জাতীয় বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া দিবে। ... ঐতিহ্য হইতে তাহারা দূরে সরিয়া যাইতে বলে। মনে রাখিবেন, ঐতিহ্য হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার অর্থ জীবন হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া। জীবন হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার অর্থ .... মৃত্যু। ঐতিহ্যের সহিত দেশের ইতিহাস, ধর্ম, ভাষা, লৌকিক আচার, জলবায়ু, গাছ-পালা, এমনকি তরুলতা পর্যন্ত জড়িত। বুকে দেশ-প্রেম না-থাকিলে তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়া মুশকিল।"[৫৫]

তাঁর আলোচনায় একথা পরিস্কার হয় যে অতীতের গর্ভে নিহিত সকল উজ্জ্বল উপাদানসমূহ পাথেয় করে ভবিষ্যতের পথে যাত্রা করতে হবে। "অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের যোগসূত্র রচনা করে, বৃহত্তর জনতার বাস্তব জীবনকে ভালবেসে সমস্ত সৎবুদ্ধি সম্পন্ন, মানবতার পূজারী-শিল্পী সাহিত্যিকদের কাঁধে -কাঁধ মিলিয়ে সমবেত প্রয়াস ও প্রচেষ্টা দিয়ে গড়ে তুলতে হবে নয়া শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি"। সংস্কৃতি কোন নির্দিষ্ট সীমা রেখায় আবদ্ধ নয়। সারা দুনিয়ার সঙ্গে সে সংস্কৃতির নিবিড় আত্মীয়তা রয়েছে। কবি সুফিয়া কামাল প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন : 'বিশ্বের সংগে, সকল জাতির সঙ্গে, আমাদের পরিচয় যত নিবিড় হবে, ততই আমাদের মনের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামী দূর হবে। ফলে আমাদের সাহিত্য হবে সুদূরপ্রসারী ও বহুবিস্তৃত।' সম্মেলনে শিল্পী-সাহিত্যিকদের তথা জনগণের ব্যাপক দারিদ্র্য দূরীকরণ করে অর্থনৈতিক সক্ষমতা সৃষ্টির পক্ষেও বক্তব্য উচ্চারিত হয়। চারদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দর্শকরা ধৈর্য ও উৎসাহ নিয়ে (স্থানাভাবে) দাঁড়িয়েও অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। এই অনুষ্ঠানে সলিল চৌধুরীর নেতৃত্বে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের একটি গানের দল অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া ভারতের প্রখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পীবৃন্দ অংশগ্রহণ করায় অনুষ্ঠানটি বহুগুণে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। 'প্রান্তিক নব নাট্য সংঘের' দলটি চিরঞ্জীব দাস শর্মার নেতৃত্বে গণসঙ্গীতপরিবেশন করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কবিয়াল রমেশ শীল ও ফণী বড়ুয়ার কবির লড়াই সকলকে মুগ্ধ করে। এই অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্রটি শওকত ওসমান এবং সাঈদুল হাসান এর যৌথ স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়। প্রান্তিক নবনাট্য সংঘের উদ্যোক্তাদের অন্যতম সদস্য ছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী কলিম শরাফী। 'সাংস্কৃতিক বৈঠকের' মাত্রা বৃদ্ধি পায় প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ দ্বারা। এর সভাপতি ছিলেন কবিয়াল রমেশ শীল, সহ-সভাপতি শওকত ওসমান। দপ্তর সম্পাদক : চৌধুরী হারুনুর রশিদ এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুব উল আলম চৌধুরী। সম্মেলনের সার্থকতার ফলে প্রান্তিকের গানের 'স্কোয়াড' গ্রামে-গ্রামে গিয়ে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে অধিকার সচেতন করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। জীবন-ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ্য করেও তাঁরা সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে অসামান্য অবদান রাখতে থাকেন। এই সম্মেলন পূর্ব বাঙলার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে পথের সন্ধান দিয়েছিল। পরে যত সম্মেলন হয় তার মূলসুর ছিল এটাই। ১৯৫২ সনে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের দ্বিতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন তার প্রমাণ। এই সম্মেলনেও চট্টগ্রামের প্রত্যক্ষ অবদান ছিল খুব বেশী। তখনকার কুমিল্লার 'প্রগতি মজলিশ' এর কর্মকর্তারা এবং জনাব সালাহউদ্দীন, অধ্যাপক আবুল খায়ের, অধ্যাপক আসহাব উদ্দীন প্রমুখ চট্টগ্রামের সম্মেলন দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে কুমিল্লায়ও একটা সাংস্কৃতিক সম্মেলন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তবে অর্থ ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের সংগ্রহ ও সমাবেশের, আয়োজনের সিংহভাগ দায়িত্ব আলোচনার মাধ্যমে চট্টগ্রামের সংগঠনগুলোকে অর্পণ করা হয়। চট্টগ্রামের কর্মীশিল্পীদের সাগ্রহসহযোগিতায় ১৯৫২ সনের ২২, ২৩, ও ২৪ শে আগষ্ট কুমিল্লা শহরে যে, পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তারও মূল সভাপতি ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। 'বর্ণাঢ্য রাজকীয় রঙ্গমঞ্চ'র অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শাখায় চট্টগ্রাম থেকে অংশ গ্রহণ করেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী (সমাজ ও সাহিত্য) ; গোপাল বিশ্বাস (সমালোচনা সাহিত্য); সুচরিত চৌধুরী (পরিহাস); শওকত ওসমান (পূর্ববঙ্গের নাটক ও রঙ্গমঞ্চ) ; সুনীল চক্রবর্তী (কাব্যসাহিত্য); সমরেন্দ্র দত্ত (স্বরচিত কবিতা); আহমদ শরীফ (তন্ত্রসংকট) প্রমুখ। 'প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ' চট্টগ্রামের লোকগীতিগুচ্ছ পরিবেশন করেন। চট্টগ্রামের 'ইষ্ট এণ্ড ক্লাব' পরিবেশন করেন সুচরিত চৌধুরীর নাটিকা 'পার্কের কোণ থেকে' এবং কবিয়াল রমেশ শীল প্রষিষ্যসহ রাই গোপালের সঙ্গে পরিবেশন করলেন কবির লড়াই 'যুদ্ধ বনাম শান্তি'।

সভাপতির ভাষণে সাহিত্যবিশারদ বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির তৎকালীন অবস্থা, রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত বিতর্ক, সাহিত্যে বিভিন্ন আদর্শের সংঘাত সম্পর্কে আলোচনা করে বলেন : "আজ প্রশ্ন উঠিয়াছে — বাঙলা আমাদের সংস্কৃতির ভাষা হইতে পারেনা। আমাদের ধর্ম, ঈমান এই ভাষায় অটুট থাকিতে পারেনা। এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমাদের কাছে লজ্জার ব্যাপার। ... সংস্কৃতি ধ্বংসের অনেক পথ আছে। জনসাধারণ-বিরোধী ও সমাজ-বিরোধী গোঁয়ার-নীতি তার অন্যতম উপায় বটে। কিন্তু তার পরিণাম পারস্যে আরবদের ভাগ্যের মতই হইতে বাধ্য।' তরুণ সমাজের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে তিনি উক্ত ভাষণে বলেন : "আমাদের সংস্কৃতি-ধ্বংসের যে হীন আয়োজন নেপথ্যে চলিতেছে, তাহা ব্যর্থ করিতে পারেন কেবল

Dhaka University Institutional Repository

আপনারাই। কারণ সংস্কৃতির নির্বাণোন্মুখ দীপশিখা আবার আপনারাই জ্বালাইতে পারেন। একটি কথা আপনারা প্রায় শুনিয়া থাকেন – 'জীবন বোধ'। কিন্তু দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ছবি সম্মুখে থাকিলেই শুধু জীবনবোধ জাগ্রত হইতে পারে। এই পথে অগ্রসর হইতে হইলে দেশের ও মানুষের ইতিহাস জানা দরকার। এক কথায় স্বদেশ-প্রেমের মালা গাঁথিয়া গলায় পরা আবশ্যক। জ্বলন্ত স্বদেশ প্রেম ছিল বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ, নজরুল জাতীয় কবির মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। আমার এই বিশ্বাস আছে যে, আমার দেশের মৃত্যু নাই, আমার দেশের আত্মা যে জনগণ, তারও মৃত্যু নাই, তেমনই অমর আমার এই বাঙলাভাষা।'[৫৬]

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে দেশের সংস্কৃতি তথা বাঙলা ভাষা-আন্দোলনকে দমিয়ে রাখার ষড়যন্ত্রের নিন্দা এবং যুদ্ধ বন্ধ রাখা এবং শান্তির অনুকূলে প্রচার চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেখানে ঘোষিত হয় যে, প্রগতি শান্তি ও জীবন সৃষ্টি করার জন্য সম্মেলন বদ্ধপরিকর।

চট্টগ্রামের এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারা পূর্ব বাঙলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে নতুন প্রেরণা দিয়েছিল সন্দেহ নেই। (কুমিল্লা ১৯৫২) ; ঢাকা (১৯৫৪) ও টাঙ্গাইল (১৯৫৭)এর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সম্মেলনে এবং ১৯৬১ তে রবীন্দ্রজন্ম-শতবর্ষ পালনের কালে চট্টগ্রামের ভূমিকা ছিল অনন্য। ১৯৫৪ সনের ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬ এপ্রিলে ঢাকার কার্জন হলে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন-এ চট্টগ্রাম থেকে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রায় শতাধিক শিল্পী-সাহিত্যিকের একটি দল অংশ গ্রহণ করেন। এঁদের সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সঙ্গীত শ্রোতাদের মনে দারুন উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। গণসঙ্গীত ছাড়া ২৪শে এপ্রিল সোমবার লেডি গ্রেগরি রচতি 'রাইজিং অব দি মুন' অবলম্বনে সলিল চৌধুরীর অনূদিত নাটক 'অরুণোদয়ের পথে' ... হলে কুশলীবৃন্দ বিপুল সুনাম অর্জন করেন। গণসঙ্গীত, নৃত্য, নাটক প্রভৃতিতে চট্টগ্রামের শিল্পীবৃন্দ প্রকৃতপক্ষে যে দক্ষতা দেখান তাতে চর্চা ও মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারত থেকে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, শ্রী পবিত্র গেঙ্গাপাধ্যায়, শ্রী শান্তি রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওদুদ, দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দিপ্তেন্দু সান্ন্যাল এবং আরও কতিপয় শিল্পী সাহিত্যিক এসেছিলেন। এই সম্মেলন-অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে সাঈদ -উর রহমান লিখেছেন ঃ

"১৯৫৩ সনের শেষের দিকে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলোর নির্বাচনী যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে প্রদেশের সংস্কৃতিসেবীরাও ঐক্যবদ্ধভাবে সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোগী হন। কয়েকবার তারিখ পরিবর্তিত হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত সেটা অনুষ্ঠিত হয় .... ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর উদ্বোধন করেছিলেন।"[৫৭] তিনি তাঁর ভাষণে লীগ সরকারের সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেন। এবং বলেন, '১৯৪৮ সনের পর বিষাক্ত আবহাওয়ায় এই পর্যন্ত কোন সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন সম্ভব হয়নি। আজ জনপ্রিয় পূর্ব বাঙ্গালার গভর্নমেন্টের আশ্রয়ে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এক সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করেছি।' সকল জেলা থেকে আগত প্রতিনিধির মাধ্যমে অনুষ্ঠেয় উক্ত সম্মেলনে আলোচনা, সঙ্গীত, প্রদর্শনী, আবৃত্তি, পাঠ ও মুশায়েরা হয়। বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ১০৮ জন শিল্পী-সাহিত্যিকের এক যুক্ত আবেদনপত্রে সম্মেলনের মূলনীতি পরিস্ফুট হয়েছে বলে মনে করা সঙ্গত। তাঁরা বলেন : 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য পূর্ব বাংলার শিল্পী সাহিত্যিকদের ব্যাপকতম ঐক্য' তাঁদের মূল মন্ত্র। তাঁরা মনে করেন, তাঁদের দায়িত্ব হলো জাতীয় প্রগতি, বিশ্বশান্তি ও দেশ মানবের কল্যাণে সৃষ্টিক্ষমতাকে কাজে লাগানো, বাংলা সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে প্রবহমান ধারায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সকল রকম বিকৃতি, কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতা এবং জাতি ধর্ম বর্ণ ও সম্প্রদায়গত সকল প্রকার বৈরীভাবের বিরুদ্ধে মানবতার আদর্শকে সাহিত্যের উপজীব্য করা এবং রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ন্যায্য আসনের জন্য চেষ্টা করা। তাঁরা আরও মনে করেন পূর্ব বাংলার সাহিত্যের বন্ধ্যাত্বের কারণ সাহিত্যিকদের অনৈক্য, ব্যাপক নিরক্ষরতা ও অজ্ঞানতা, অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমাবনতি, পুস্তক প্রকাশের সমস্যা, রাজনৈতিক সংকীর্ণতা ইত্যাদি।[৫৮]

১৯৫৪-র ঢাকা সম্মেলনে চট্টগ্রামের প্রান্তিক এর সাফল্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁরা সরকারী কোপানলে পতিত হন। প্রান্তিক এর সদস্যদের গোঁড়া কমিউনিস্ট বলে সরকার ধরে নিলেন। প্রান্তিকের সদস্যদের উপর নির্যাতন চলতে থাকলো। কেউ কেউ কারাবন্দী হলেন। কেউ বা 'আণ্ডার গ্রাউণ্ডে' গা ঢাকা দিলেন। কেউ চলে গেলেন ভারতে। এ পরিস্থিতিতে 'প্রান্তিক' এর জামাল খান রোডস্থ দড়মার বেড়ার দোচালা ঘর তালাবদ্ধ হয়। এরপর মাহবুব হাসান প্রমুখের 'ইস্ট এণ্ড ক্লাব' গড়ে ওঠে।[৫৯] ৯২(ক) ধারা জারির পর 'প্রান্তিক'কে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অনেক সদস্য 'প্রান্তিক' এর ছত্রতলে জড় হতে ভয় পেলেন রাজরোষের কারণে। 'কৃষ্টি কেন্দ্র' (১৯৫৬) নামে প্রান্তিক-কে অতপর টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। এই কৃষ্টি কেন্দ্রের সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে অধ্যাপক আবুল ফজল ও আবুল হাসনাত।[৬০] রাজকাপুর লেনে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে 'কৃষ্টি কেন্দ্রের' সাহিত্য সঙ্গীত ও নাট্য বিভাগ চালু করা হয়। সাহিত্য বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন সুধাংশু ভট্টাচার্য। সাহিত্য-আসরে নিয়মিত যোগ দিতেন শওকত ওসমান, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবুল ফজল, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, আইনুন নাহার, নুরুন্নাহার, দীননাথ সেন, সুচরিত চৌধুরী, সুনীল চক্রবর্তী প্রমুখ। নাট্য বিভাগে তৎপর ছিলেন কাজী আলী ইমাম, মাহবুব হাসান, দীননাথ সেন, সি. এম. রোজারিও, আমিনুল ইসলাম, মনি ইমাম, মীরা সেন প্রমুখ। সঙ্গীত বিভাগের নেতৃত্বে ছিলেন কলিম শরাফী। 'কৃষ্টি কেন্দ্র' মাহবুব উল আলম চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৯৫৭ সনের কাগমারী সম্মেলনে শতাধিক শিল্পী সাহিত্যিকের দল নিয়ে যোগদান করেন।

উল্লেখ্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন উপলক্ষে আয়োজিত কাগমারী সম্মেলনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের একটি ছিল সাংস্কৃতিক সম্মেলন। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে রূপ দেবার জন্য দূতাবাস এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিল্পীদেরও দাওয়াত দেওয়া হয়। এতে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত ও মিশর থেকে প্রতিনিধি আসেন। তৎকালে কাগমারী সম্মেলন ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিল। এই সম্মেলনের পরে আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে 'ন্যাপ' গঠিত হয় মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে। সেজন্য রাজনৈতিক ইতিহাসেও এই সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সম্মেলনের নানা বক্তব্য রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহলে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি করে।

নারীদের সমাজ সচেতন করে তোলার লক্ষে মহিলা পরিচালিত সংগঠনও (ফৌজিয়া সামাদ এর 'নারী সমিতি') চট্টগ্রামে গড়ে ওঠে। আইউব খানের শাসনামলে প্রগতিশীল সংগঠনগুলো ক্রমে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়। বুদ্ধিজীবী-সাহিত্যিকরা আপোষ কামিতার পথে অগ্রসর হয়ে ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা করতে সচেষ্ট হন।

তাছাড়া 'পাকিস্তান লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠা করা হলে এর মাধ্যমে বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিকেরা সংঘের ছত্রতলে আইউবের উদ্দেশ্য অভিপ্রায়কে সফল-সার্থক করে তুলেছিলেন। তখন সরকারী সাহায্য ছাড়া সাহিত্য ও শিল্প-সংগঠন করার তেজ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে পুরোপুরি না হলেও মোটামুটি ভাবে বিপ্লবী-সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র উঠে যায়। একদশক ধরে আইউব যে স্বৈর-শাসন চালাতে পেরেছিলেন এবং পূর্ব বাঙলার উপর যে অর্থনৈতিক শোষণ চলে, দেশের ৬৫% ভাগ কৃষক ভূমিহীনে পরিণত হয়, আর বিপরীতে কতিপয় ভুঁইফোঁড় ব্যক্তি ফুলে ফেঁপে কলাগাছ হবার সুযোগপান-- তার নেপথ্যে মধ্যবিত্ত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

২.৫.খ. ঢাকায় প্রগতি-লেখক সংঘের সর্বশেষ কার্যক্রম অত্যন্ত ঢিমে তালে হলেও ১৯৫০-৫১ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। ১৯৪৮ সনের ৩রা ডিসেম্বর তারিখের কাউন্সিল নির্বাচনে মুনীর চৌধুরী 'ঢাকা প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের' পরবর্তী মেয়াদের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৬১] 'বিবিধ সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে দেশ বিভাগের পূর্বে ঢাকায় একটি প্রগতিশীল সাহিত্য পরিবেশ সৃষ্টি' হলেও পাকিস্তান-প্রাপ্তির পরে ইসলামী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার সাম্রাজ্যবাদী বা নয়া উপনিবেশবাদীদের জোর-জুলুম-নির্যাতন নিপীড়নমূলক আগ্রাসনের ফলে প্রগতিশীল কমিউনিষ্ট কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। অনেকেই কারাগারে এবং ভারতে চলে যাবার ফলে প্রগতি-র ধারার সংগঠিত কার্যক্রমটি বিশৃংখল-ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সেখানে বিভাগ পূর্ববর্তীকালের অবিভাজ্য বাঙালি সংস্কৃতির বিরোধীতাকারী নব্য-কৃত্রিম-পাকিস্তানী-ইসলামপন্থী সংস্কৃতির ধ্বজাধারীদের কার্যক্রম বা ধারা উচ্চকিত প্রশস্ত হতেছিল। ১৯৪০ সনে কলকাতায় 'মোহাম্মদী' পত্রিকাগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে গঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি', ১৯৪২/৪৩ সনে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' এবং ১৯৪৭ সনে গঠিত 'তমদ্দুন মজলিশ' (ঢাকা ১৯৪৭) এর ধারা (মাত্রার পার্থক্য ও উদ্দেশ্যের বৈচিত্র্য থাকলেও) মোটামুটিভাবে প্রগতিশীলতা, বাম-পন্থী চিন্তাধারা এবং কমিউনিস্ট-প্রভাবিত সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিকূল অসৃষ্টিশীল আবহাওয়া তৈরীতে সহায়তা করেছিল। ১৯৫২ সনের শেষের দিকে (১৯৫৩ র প্রথম দিকে মতান্তরে) প্রগতি লেখক সংঘের উত্তরসূরী বলে আত্মপরিচয় দিতে উৎসাহী লেখক সাহিত্যিকদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' এর আবির্ভাব কাল পর্যন্ত ঢাকায় কোনো সুসংগঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি এবং সাহিত্য সংস্কৃতি জগতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল ধারার সংস্কৃতিসেবী ও চিন্তাবিদদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও চোখে পড়েনা। কতিপয় ক্ষীণপ্রাণ সাহিত্য-পত্রিকা তখন প্রকাশিত হতে চাচ্ছিল, সামাজিক-পরিবর্তনের অভিপ্রায় বুকে বেঁধে, কিন্তু বৈরী-পরিবেশে তাও প্রাণ-সফূর্তি লাভ করতে পারেনি। দু-এক বা তিন-চার সংখ্যা প্রকাশের পরই তা মৃত্যুর মুখ দর্শন করতে বাধ্য হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক 'সংস্কৃতি সংসদ', ১৯৫১ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে 'আসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী গণচেতনা' ও দেশাত্নবোধক নাটক-সঙ্গীত ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যতিক্রমী জীবনঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করলেও তা ছিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক এবং ১৯৫৪ কিংবা ১৯৬০-৬১ পর্যন্ত এর কার্যক্রম ছিল 'সীমিত'। 'একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলন বাঙলাভাষা-ভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করাতে, পরবর্তীকালে বাঙলা ভাষা ও বাঙালি-সংস্কৃতি রক্ষার তাগিদে এদেশের একাংশ সচকিত হবার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্যোগগুলো সমর্থক শুভানুধ্যায়ী সহৃদয়হৃদয়সংবেদীদের পরিপোষণ লাভ করে ক্রমে পূর্ব বাঙলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে দিক-নির্দেশনা দিতে সক্ষম হয়ে ওঠে। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেকালে (একালেও) প্রদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দ্র বিন্দু হওয়ায় সংস্কৃতি-সংসদের পরোক্ষ প্রভাব পড়েছিল সারা প্রদেশে।'[৬২]

'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' এর কোনো কোনো চিন্তক-সংগঠক কর্মকর্তার বিবেচনায় এটা (পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ) ত্রিশের দশকের 'সওগাত সাহিত্য মজলিশের' ধারাবাহিক উত্তরসূরী প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও বটে। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন 'হাসানের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম অধ্যায়' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন : "সে সময়ে এখানে (পূর্ব পাকিস্তান/ঢাকায়) কোনো সক্রিয় সাহিত্য প্রতিষ্ঠান ছিলনা ... এমন দুর্দিনে ১৯৫৩ সালের গোড়ার দিকে হাসান হাফিজুর রহমান কয়েকজন তরুণসহ ... সওগাত কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে 'সওগাত সাহিত্য মজলিশের' অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। ... সওগাত কার্যালয় সংলগ্ন (৬৬ লয়াল ষ্ট্রীট, ঢাকা ১) একটি প্রশস্ত ঘর ও সম্মুখে খোলা জায়গা ছিল। স্থির হলো ওখানেই .... তাঁদের নব প্রতিষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' এর কাজ" আরম্ভ হবে। ... হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে ঢাকার কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক দলে দলে এসে ভীড় জমালেন সওগাত কার্যালয় সংলগ্ন তাঁদের জন্য প্রদত্ত স্থানটিতে।[৬৩] উক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত হাসান হাফিজুর রহমানের (১৯৩৬-৮৩) নিজের কথা : 'আমরা ধূমকেতুর মত তেজে প্রখর, কিন্তু নিরাবলম্ব। ঠাঁই ছিলনা, তাই আমরা সংগঠিতও ছিলামনা। অসংগঠিত আমরা প্রবল উত্তেজনায় অস্থির .. কিন্তু সংহত নই বলে শক্তি ও তাৎপর্যকে অপরের অনুভবে তীব্র করে তুলতে পারছিলামনা। সেই সময় 'প্রগতি লেখক সংঘ' ভেঙ্গে গেছে। তরুণ সাহিত্যিকদের নতুন চেতনা নতুন বক্তব্যের সংগঠিত মাধ্যমের খোঁজে আমরা ছটফট করছি। সময়টা ১৯৫২ সাল, ভাষা - আন্দোলনের তুমুল মুহূর্ত। সেই সময়ে আমি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র) হঠাৎ সওগাত প্রকাশনালয়ের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ি . . (সওগাতকে কেন্দ্র করে) তরুণ সাহিত্য-কর্মীদের ভীড় জমতে লাগলো ... নাসির উদ্দিন সাহেবকে কেন্দ্র করে প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা সওগাতের প্লাটফরমে একত্র হয়েছিলাম এটাই বড় কথা। নাসিরুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আমাদের এই যোগাযোগ প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের এক স্বর্ণপ্রসূ ভবিষ্যতের দ্বার খুলে দিল। আমরা 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' গড়ে তুললাম সেই ১৯৫২ সনেই। প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের প্রথম সংগঠন নাসিরউদ্দিন সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠিত হলো। কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব (১৮৯৭-১৯৮১, প্রথমাবধি) সভাপতি : শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, বেগম সুফিয়া কামাল, অজিত কুমার গুহ,

Dhaka University Institutional Repository

কামরুল হাসান, মুনীর চৌধুরী, আবদুল গনি হাজারী, শামসুর রাহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, ফয়েজ আহমদ, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ফজলে লোহানী, আনিস চৌধুরী, বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, আতোয়ার রহমান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, খালেদ চৌধুরী, লায়লা সামাদ, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ প্রমুখ এই সংগঠনের সদস্য হিসেবে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। ... সেই সময়ে সাহিত্য সভায় প্রতিটিতেই প্রায় দুশো আড়াইশো লোক জমায়েত হতেন। ... নাসির উদ্দিন সাহেবের কাছে এদেশের সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাস অশেষ ঋণী।"[৬৪]

এই সকল ব্যক্তিদের শ্রেণীচরিত্রগত অবস্থান ছিল যাকে বলে 'মধ্যশ্রেণী'তে। বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরা কেউ কেউ সাম্যবাদে; অনেকেই বুর্জোয়া উদারনীতিতে। নিয়মিত অধিবেশনের অতিরিক্ত বিশেষ সভাও তাঁদের হতো। ১৯৫২-৫৩ সনে ম্যাক্সিমগোর্কি, ১৯৫৩ সনে বঙ্কিমচন্দ্র ও ১৯৫৫ সনে রবীন্দ্রনাথের উপর অনুষ্ঠানগুলো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। এই সংসদের কোনো কোনো কর্মীর উদ্যোগেই ১৯৫৩ সনে একুশের প্রথম সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারী' (হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায়) প্রকাশিত হয়। এঁদের প্রধান কর্ম ১৯৫৪তে অনুষ্ঠিত ঢাকার পূর্বোক্ত সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন। ১৯৫২-৫৩ বর্ষের 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'-এর কমিটি ছিল নিম্নরূপ ঃ সভাপতি : ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, সহ-সভাপতি : বেগম সুফিয়া কামাল, অধ্যাপক খান সরওয়ার মুর্শেদ; আবদুল গনি হাজারী; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম; সাধারণ সম্পাদক : ফয়েজ আহমদ; সহ-সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান; বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর; বিভাগীয় সম্পাদক : আলাউদ্দীন আল আজাদ; ফজলে লোহানী (সাহিত্য); আবদুল্লাহ আল মুতী (বিজ্ঞান); আমিনুল ইসলাম (চিত্রকলা); এম. অর. আখতার (প্রচার); সদস্য : শামসুর রাহমান; আনিস চৌধুরী; দৌলতেন নেসা খাতুন, লায়লা সামাদ; সরদার জয়েনউদ্দীন; আতাউর রহমান; আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ; আনিসুজ্জামান; শেখ লুৎফর রহমান।" (বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ : দলিলপত্র : প্রথম খণ্ড, পৃ ৩৯৭)

'একুশে ফেব্রুয়ারী' (১৯৫৩) প্রকাশের ঘটনা সাংস্কৃতিক জগতে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছিল। এর প্রকাশক মোহাম্মদ সুলতান 'পুঁথিপত্র প্রকাশনী'র সৃষ্টি করে প্রগতিশীল পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশের যে সুযোগ ঘটান, তাতে কমিউনিস্ট প্রভাবিত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর মুখপত্র ও প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচারের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। এজন্য 'পুঁথিপত্র প্রকাশনীর' মূল্য-গুরুত্ব বিস্মৃত হওয়া চলেনা। যেমন চলেনা 'একুশে ফেব্রুয়ারীর' প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলা। পুঁথিপত্র প্রকাশনী এবং 'একুশে ফেব্রুয়ারীর' ইতিহাস বাঙালির সংস্কৃতির উজ্জীবনে আত্মত্যাগের এক উজ্জ্বল নমুনা। এর অর্থ সংগৃহিত হয়েছিল চাষের জমি বিক্রি করে। কিন্তু বই বিক্রি করে আর টাকা ফেরত এলোনা। প্রকাশের (মার্চ ১৯৫৩) অব্যবহিত পরেই এটি তৎকালীন সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। পরে ১৯৫৬ সনের দিকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়, কিন্তু আর্থিক ক্ষতি পোষায়নি।

১৯৫৫ সনে বাঙালির সংস্কৃতি-জগতে পর পর দুটি নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় এক প্রবল জোয়ারের সম্ভাবনা সূচিত হয়েছিল। এর একটি, বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী রশিদ আহমদ চৌধুরী ওরফে বুলবুল চৌধুরীর (১৯১৯-১৯৫৪) স্মৃতিতে 'বুলবুল ললিত কলা একাডেমীর (বাফা) প্রতিষ্ঠা (১৯৫৫) এবং অন্যটি বাংলা একাডেমীর (১৯৫৫) উদ্বোধন। বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ১৯৪৮-৪৯ সনে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন এর প্রথম অধিবেশনের মূল সভাপতির অভিভাষণে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রথম উত্থাপন করেছিলেন। ১৯৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের 'একুশ দফার' ষোড়শ দফায় বলা হয়েছিল : 'বর্ধমান হাউসকে ... বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে'। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করার প্রেক্ষিতে ফ্রন্ট সরকার (পূর্ব বাঙলার) একাডেমী প্রতিষ্ঠার কাজ বাস্তবায়ন করলে বাঙলা ভাষার জয়যাত্রার আর এক ধাপ উত্তরণ ঘটে।

২.৫.গ. বাঙলা ভাষার হরফ পরিবর্তন (আরবী/ রোমান প্রভৃতি), মুসলমানী চেহারা গঠন (শব্দ পরিবর্তন — আরবী ফারসী উর্দু শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে) ; এবং রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা হরণ (উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করে জাতীয় জীবন থেকে বাঙলা ও বাঙালিত্ব সরিয়ে) করার ষড়যন্ত্র পাকিস্তান— পূর্ব ও পরবর্তীকালে বিভিন্নভাবে চলে আসছিল। রেনেসাঁ সোসাইটি (১৯৪০) 'মুসলমানী শব্দ অকাতরে' বাঙলাতে অনুপ্রবেশ ঘটাবার সুপারিশ করেছিলেন। ৪৭ সনের আজাদী লাভের আগেই বাঙলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দানের প্রস্তাব ছিল। পূর্ব বাংলা সরকার এই প্রস্তাব লুফে নিয়ে রেনেসাঁ-বাদীদের দ্বারা সরকারী পত্রপত্রিকা, প্রচার মাধ্যমগুলোতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার শুরু করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙালি শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান (১৯০৫-৬৬) 'পূর্ব পশ্চিমের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঐক্য সহজতর' করার যুক্তিতে বাঙলা হরফ পরিবর্তন করে আরবী হরফ প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫০ সন নাগাদ আরবীতে বাঙলা শিক্ষাদানের ২০ টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে বিনামূল্যে আরবী হরফের বাঙলা বই দেয়া হতো।[৬৫] পাকিস্তান সরকারের এই সমস্ত উদ্দেশ্য হাসিলের একটি পন্থা ছিল মৌলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে (সেক্রেটারী ছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা ১৮৯৫-১৯৬৪) গঠিত বাঙলা ভাষা সংস্কার কমিটি (১৯৪৯)। এই কমিটি বাংলা ভাষা, এর ব্যাকরণ ও বর্ণমালার গুরুতর সংস্কারের সুপারিশপূর্বক 'সহজ বাংলা'র প্রস্তাব করেছিলেন। জনগণের ব্যাপক প্রতিবাদ, প্রতিরোধ-সংগ্রাম ও আন্দোলনের মুখে সমস্ত উদ্যোগ যদিও ব্যর্থ হয়েছিল তবু এঁদের প্রয়াস থেমে ছিলনা। নানাভাবে বাঙালিদের মনের ভাবনার, চিন্তার, আকাঙ্ক্ষার এবং শৃঙ্খলার পরিবর্তন ও বিকৃতি-সাধনের উপায় অন্বেষণ করে চলেছিলেন। ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার ও তাঁর তাবেদার প্রতিক্রিয়াশীল বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের বাঙালিপনা, বাঙালিত্ব ও বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতি ধ্বংসের নানা উদ্যোগ একটার পর একটা গ্রহণ করা হতেই থাকে। ১৯৫৮ সনে আইউব খান পাকিস্তানের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়েই প্রস্তাব করে বসলেন যে পাকিস্তানে সবকটি ভাষার জন্যে এক রোমান হরফ প্রবর্তন করতে হবে। প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি হিসাবে পাকিস্তানের ঐক্য, সংহতি, বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ এবং বিজ্ঞানের দোহাই দেওয়া হল। তিনি আরও বললেন, বাঙলা ও উর্দুকে এক হরফে লিখতে পারলে ভবিষ্যতে পাকিস্তানের জন্য একটি জাতীয় ভাষা সৃষ্টি করাও সম্ভব হবে। আইউব খান এই প্রস্তাব করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী আইউব খানের এই প্রস্তাব সমর্থন করে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রচার করেন। সময় ১৯৫৯ সন।[৬৭] বাঙলাভাষা সংস্কারের নানা

Dhaka University Institutional Repository

উদ্যোগও তখন গৃহিত হয়। কিন্তু প্রতিবাদের মুখে বলাবাহুল্য, সেসব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়।

২.৫.ঘ. সরকারী মতাদর্শের সমর্থনে এবং ইসলামী তমদ্দুনের পুনর্জাগরণে বিশ্বাসী সংস্কৃতিকর্মীদের বেশকিছু সম্মেলন পাকিস্তানী-আমলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক স্বাস্থ্য-মন্ত্রী হবিবুল্লাহ বাহার (১৯০৬-৬৬) এর উদযোগে ১৯৪৮ সনের ৩১ শে ডিসেম্বর ও ১৯৪৯ সনের ১লা জানুয়ারী ঢাকার কার্জন হলে অনুষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন' এর উদ্দেশ্য ছিল মোটামুটি, 'পাকিস্তানী সাহিত্যের পুনর্জাগরণ'— কিন্তু হবিবুল্লাহ বাহার এবং ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯; মূল সভাপতি) বিবেকের তাড়নায় যে সত্য মন্তব্য উচ্চারণ করেন, তাতে সরকারী উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় এবং ড: শহীদুল্লাহর এই বক্তব্য : "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী, এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটা বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাঁড়িতে ঢাকবার জো টি নেই।' —পাকিস্তানী মহলের প্রবল আক্রমণের সম্মুখীন হয়। দৈনিক আজাদ ও তমুদ্দুন মজলিশের মুখপত্র 'সাপ্তাহিক সৈনিক' ডঃ শহীদুল্লাহর বক্তব্যের প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে।

১৯৫২ সনের নিখিল পাকিস্তান চিত্র প্রদর্শনী (ঢাকা) ও তমদ্দুন মজলিশের উদযোগে ১৯৫২ সনের ১৭-২০ অক্টোবর-এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল 'ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ' অন্বেষণ এবং 'আধুনিক দুনিয়ার বিভিন্ন মতবাদ ও সমস্যাবলীর তুলনায় ইসলামকে যাচাই করে ... ইসলামই যে শ্রেষ্ঠতম মানবকল্যাণকর আদর্শ তা .... গোঁজামিল না দিয়ে বুঝে নিতে ... বুঝিয়ে' দেওয়া। ১৯৫৭ সনে ঢাকা আর্ট কাউন্সিল এর উদ্যোগে 'নিখিল পাকিস্তান সঙ্গীত সম্মেলন' এর উদ্দেশ্যও ছিল দুই পাকিস্তানের সৌহার্দ্য সৃজন। ১৯৫৯ সনের ১—৪ মেতে দ্বিতীয় সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় এবং ব্যাপক শ্রোতা -দর্শক পাওয়া যায়। সাহিত্যিকদের সরকারী অপ-কৌশলের হাতিয়াররূপে ব্যবহারের লক্ষ্যে আইউব খানের 'পাকিস্তান লেখক সংঘ' (১৯৫৯) গঠনের পূর্বে প্রতিক্রিয়াশীল বা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির বুদ্ধিজীবী-সাহিত্যিকদের আরও উল্লেখযোগ্য অন্তত দুটি কার্যসূচী পূর্ব বাঙলায় সাফল্য লাভ করেছিল। একটি : ১৯৫৭ তে 'সিপাহী বিপ্লব শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান' এবং অপরটি 'রওনক' সাহিত্য সংস্থা গঠন।

'১৯৫৭ সনের মার্চ মাসে পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ, পাক-বাংলা সাহিত্য মহফিল, পাকিস্তান সাহিত্য মজলিশ, এছলামী সংস্কৃতি পরিষদ প্রভৃতি তামদ্দুনিক গোষ্ঠী সিপাহী বিপ্লবের (১৮৫৭) শতবার্ষিকী পালনের সিদ্ধান্ত নেন।' অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক ছিলেন অধ্যাপক হাসান জামান। মূল সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোহাম্মদ ইব্রাহীম (১৮৯০-১৯৬৬) এবং উদ্বোধক ছিলেন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। অনুষ্ঠানের মূল সুর ছিল 'সাম্প্রদায়িক'। 'রওনক' সাহিত্য সংস্থা গঠনের উদ্দেশ্য ছিল : 'জাতীয় ভিত্তিতে তমদ্দুন গঠনে সহায়তা করার জন্য সর্বপ্রকার সাহিত্যিক ও তামদ্দুনিক প্রচেষ্টা চালানো'। এই সংস্থার কজন প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, মতিনউদ্দীন আহমদ প্রমুখ। ১৯৫৮ সালের প্রথম দিকে রফফেলার ফাউণ্ডেশন পূর্ব বাঙলার সমসাময়িক সাহিত্য সম্পর্কে পর্যায়ক্রমিক আলোচনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩৭০০ ডলার অনুদান দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগ এর তদানীন্তন অধ্যক্ষ ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন এর তত্ত্বাবধানে বিশালাকার আলোচনা সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের প্রতিনিধিত্বশীল সকল সাহিত্যিক ও সাহিত্য-সমালোচকদেরকে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের পয়সা খাওয়ানো এবং 'পূর্ববাঙলার সাহিত্য সংস্কৃতিসেবীদের মধ্যে' মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 'প্রভাব' বিস্তার করা। [৬৭] এই পর্বে (মে, ১৯৫৮) চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন' অনুষ্ঠানের মূল তাৎপর্য ছিল প্রগতিশীল আন্দোলনের আদি কেন্দ্র চাঁটগায়ে, 'পাকিস্তানী আদর্শ পুন:প্রতিষ্ঠা করা'। 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য মহফিলের' উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কয়েকজন বুর্জোয়া শিল্পপতি। মূল সভাপতি ছিলেন মুসলিম লীগের দক্ষিণপন্থী নেতা মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। পাকিস্তানের রাজনীতি ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলন ও যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সাফল্য এবং বাঙালি সংস্কৃতি ও বামপন্থী প্রগতিবাদী চিন্তাধারার প্রসার, বিস্তার-এ আতঙ্কিত বুর্জোয়া, পুঁজিপতি, সাম্প্রদায়িক, নয়া-উপনিবেশবাদী 'পাকিস্তানপন্থীরা' ইসলামী সংস্কৃতির ধ্বজ্জা সম্মুখে নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। এই আয়োজনের ব্যাপকতা ও জাঁকজমক কম ছিলনা। কারণ ব্যক্তিগত ও দলীয় নগদ-স্বার্থ সংরক্ষণ তাঁদের কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল।

আইউব খান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ব্যাপক অবক্ষয়-সাধনের ব্যবস্থা করেছিলেন 'পাকিস্তান লেখক সংঘের' প্রতিষ্ঠা করে। সামরিক আইন জারির তিন মাসের মধ্যে (১৯৫৯ সনের ২৯, ৩০ ও ৩১ জানুয়ারী) শিক্ষা-সচিব কুদরতুল্লাহ শাহাব (জ. ১৯১৭) এবং কতিপয় উর্দু ভাষার লেখকের উদ্যোগে করাচীর গোয়ানিজ হলে প্যকিস্তানের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যিকদের এক মহাসমাবেশ ঘটানো হয়, প্রধানত বিনা-ব্যয়ে একটি 'ভ্রমণ' এবং বিলাস-ব্যসনে আনন্দ-ফূর্তিতে মজিয়ে দেবার জন্য । পূর্ব বাঙলার বহু কবি-সাহিত্যিক করাচী লেখক সম্মেলনে যোগদানের অছিলায় জীবনে সর্ব প্রথম উড়োজাহাজে চড়তে, আর দামী হোটেলে থাকতে-খেতে পেরেছিলেন। এতে উচ্ছ্বাস-আনন্দ ও গর্ব ছিল অনেকেরই যে, সরকার তাঁদেরকে 'সাহিত্যিক' বিবেচনায় এমন অপূর্ব সুযোগ দিয়েছেন। পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলতে এঁদের আগেই কোনো দ্বিধা ছিলনা। এখন চক্ষুলজ্জাও দেখা দিল। সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে যে, 'পাকিস্তান লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠা করা হয় তার সেক্রেটারী জেনারেল শিক্ষা সচিব কুদরতুল্লাহ শাহাব (তিনি দীর্ঘদিন ধরে, একটানা ঐ দুই পদে বহাল ছিলেন।) পূর্ববাঙলার শাখা লেখক সংঘের সক্রিয় উৎসাহী সদস্য ছিলেন না, তৎকালে এমন প্রতাপশালী, মেধাবী লেখক সাহিত্যিকদের খুঁজে পাওয়া ভার। অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, গোলাম মোস্তফা, জসীমউদ্দিন, আবদুল কাদির, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, আবুল হোসেন, ডঃ সৈয়দ সাজজাদ হোসায়েন, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, আসকার ইবনে শাইখ, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী, কবীর চৌধুরী, আহমদ শরীফ, আনোয়ার পাশা, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আবদুল গনি হাজারী, হাসান হাফিজুর রহমান, ফয়েজ আহমদ, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আনিসুজ্জামান প্রমুখ সকল বাঙালি প্রতিভাবানেরা লেখক সংঘের ছত্রছায়ায়

Dhaka University Institutional Repository

একত্র হতে পেরেছিলেন এবং বই-পুস্তক-পুস্তিকা-পত্রিকা-সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে পাকিস্তান-আমলে বাঙলা সাহিত্য সংস্কৃতির খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই সংঘের তহবিল গড়ে ওঠে সরকার কর্তৃক বিনা সুদে প্রদত্ত এক লক্ষ টাকার ঋণ দিয়ে। লেখক সংঘের চেষ্টায় বিভিন্ন পুঁজিপতি, আমলা-মুৎসুদ্দি-সামন্তরা অর্থ-সাহায্য দিয়ে নানা প্রকার সাহিত্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। পাকিস্তানী ধ্যান-ধারণার পরিপোষক হলেই পুরস্কার পাওয়া যেত। বাঙালি-সংস্কৃতির প্রাধান্য থাকলে আদমজী পুরস্কার (প্রতিষ্ঠা ১৯৭০) দাউদ পুরস্কার (১৯৬৩) ন্যাশনাল ব্যাংক পুরস্কার (১৯৬৪) এবং আইউব খান কর্তৃক প্রবর্তিত সাহিত্য-শিল্পের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'প্রেসিডেন্টস এওয়ার্ড ফর প্রাইড এণ্ড পারফরমেন্সেস' পাওয়া যেতনা। অথচ প্রধান বাঙালি লেখক-সাহিত্যিক -গবেষক-অধ্যাপক প্রায় সকলেই আইউবী-শাসনামলে পশ্চিম-পাকিস্তানী শাসকদের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত 'সাহিত্য -পুরস্কার' অর্জন করেছেন।

২.৫.ঙ. আইউব খান নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শন এর জন্য ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ (১৯৬৫ সনের ৬ই সেপ্টেম্বর) ঘোষণা করলে দেশরক্ষার খাতিরে শিল্পী সাহিত্যিকেরা দেশাত্মবোধক সাহিত্য-সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করলে পাকিস্তানের সংহতি বৃদ্ধি পেয়েছিল। পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ বিরোধী স্বায়ত্তশাসনের রাজনৈতিক আন্দোলনের সমকালে পাক-ভারত যুদ্ধ ভারত-বিরোধী জেহাদী মনোভাব জাগ্রত করিয়ে বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে বিপরীত ফল ফলাতে সক্ষম হয়েছিল। এই সময় পাকিস্তান লেখক সংঘ বাঙলা ও উর্দু সাহিত্যের জন্য (১৯৬৭ সনে) '৬ই সেপ্টেম্বর পুরস্কার' প্রবর্তন করলে পুরস্কার প্রাপ্তির লক্ষ্যে লেখকেরা 'পাকিস্তানের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষায় সহায়তাকারী গ্রন্থ' প্রণয়নের দিকে ঝুঁকেছিলেন। বাঙলা সাহিত্যে এই পুরস্কার প্রথম লাভ করেন হাসান হাফিজুর রহমান, তাঁর 'সীমান্ত শিবির' গ্রন্থের জন্য। বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে 'উন্নয়ন দশক' (১৯৬৮) পালনের সময়ে অনেক সেমিনার আলোচনা অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন আইউব খান করেছিলেন। সরকারী টাকার ছড়াছড়ি হয় তখন। ঢাকার বাংলা একাডেমী ১৯৬৮ সনের অক্টোবর (১৮-২৪) মাসে 'আমাদের সাহিত্য' পর্যায়ে একটি ব্যাপক সেমিনারের আয়োজন করে। কাব্য, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, শিশু সাহিত্য, এবং সাময়িক পত্র এই সাতটি বিষয়ের উপর আলোচনাগুলো সংঘঠিত হয়। বাংলা একাডেমীর সাহিত্য সেমিনারের উদ্বোধনী ভাষণ দেন পাকিস্তান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী কাজী আনোয়ারুল হক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এর সভাপতি ছিলেন বাংলা একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ। 'পূর্ব পাকিস্তানের বিশ বছরের কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন সৈয়দ আলী আহসান। আলোচনা করেন ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও ডঃ বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর। সেদিনের অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন ডক্টর মযহারুল ইসলাম। 'বিশ বছরের বাংলা নাটক' পর্যায়ের অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ পাঠ করেন ওবায়েদ উল-হক। আলোচনায় অংশ নেন ঃ আশকার ইবনে শাইখ, আনিস চৌধুরী, সাবেরা মুস্তাফা এবং জিয়া হায়দার; সভাপতি — মুনীর চৌধুরী। 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রবন্ধ সাহিত্য শীর্ষক' প্রবন্ধ পড়েন ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী; আলোচক : ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, ডক্টর আনিসুজ্জামান; ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম; সভাপতি : ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক। 'পূর্ব পাকিস্তানের উপন্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আতোয়ার রহমান। আলোচক : সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন, সরদার জয়েন উদ্দীন ও শামসুল হক; সভাপতি : আবুল কালাম শামসুদ্দিন। ছোটগল্প বিভাগে 'আমাদের গল্প সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন আবু জাফর শামসুদ্দিন। আলোচনায় অংশ নেন মোফাজ্জল হাদয়ার চৌধুরী, শহীদ আখন্দ, হাসনাত আবদুল হাই এবং সভাপতি : শাহেদ আলী। 'পূর্ব পাকিস্তানের সাময়িকপত্র' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েন ডঃ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। আলোচনা করেন রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ; সভাপতি : মুজীবুর রহমান খাঁ। 'শিশু সাহিত্য' বিভাগে 'আমাদের শিশু সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন রোকনুজ্জামান খান (দাদা ভাই); আলোচক : মোহাম্মদ নাসির আলী; ডক্টর আবদুল্লাহ আলমূতী শরফুদ্দিন ; হাবিবুর রহমান, এম. এ. আজম, হোসনে আরা কামাল এবং সভাপতি, মোহাম্মদ মোদাব্বের।[৬৮] ডক্টর সাঈদ-উর রহমান লিখেছেন : 'উন্নয়ন দশক' পালনের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুটো : বিরামহীন বর্ণাঢ্য প্রচারণার দ্বারা আইউব খানের এক মহিমাময় ব্যক্তিত্ব দেশবাসীর সামনে গড়ে তোলা এবং এর দ্বারা ১৯৬৯ সনের মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচন ও ১৯৭০ সনের জানুয়ারী মাসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে প্রভাবিত করা। প্রচারণা চলে নানাভাবে— সরকারী কাগজপত্র, লেফাফা, ষ্ট্যাম্প, টেলিগ্রাম, মানিঅর্ডার ফরম ইত্যাদির উপর উন্নয়ন দশকের ছাপ দেয়া হয়। রেডিও টেলিভিশন থেকে কথিকা প্রচার করা হয়। সরকারী ভাবে লক্ষ লক্ষ প্রচার পুস্তিকা বিতরণ করা হয়। এর মূল বক্তব্য ছিল : '১৯৫৮-৬৮ মধ্যবর্তী সময়ে (পাকিস্তানের) ... অর্থনীতিতে বিরাট উন্নতি হয়েছে, পররাষ্ট্র-নীতিতে এসেছে অভাবনীয় সাফল্য, দেশের পশ্চাৎপদ সমাজ কাঠামো পড়েছে ভেঙ্গে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পাকিস্তানের ইজ্জত বেড়েছে বহুগুণ, এবং এর সবই সম্ভব হয়েছে সৈনিক রাজনীতিবিদ আইউব খানের গতিশীল নেতৃত্বে ও মহিমাময় ব্যক্তিত্বে— ফলকথা ইকবাল যার স্বপ্ন দেখেছিলেন, জিন্নাহ যার ভিত গেঁথেছিলেন, সেই পাকিস্তানের সার্থক স্থপতি হলেন ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইউব খান'।[৬৯]

পাকিস্তানী সংস্কৃতির রূপায়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে ১৯৬৮ সনের ২৪ শে মে উদ্বোধন করা হয় 'নজরুল একাডেমী'। 'মুসলিম বাংলার রেনেসাঁর অগ্রদূত হিসাবে নজরুল-ভূমিকাকে চির জাগরুক রাখা', পাকিস্তানী জীবনাদর্শর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আধুনিক ও প্রগতিশীল ভাবধারার সকল উপাদানকে আত্মস্থ করা' এবং 'মুসলিম ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানী সংস্কৃতির সংহতি ও বিকাশ সাধন করা' প্রভৃতি উদ্দেশ্য লক্ষ্য সামনে নিয়ে; প্রেসিডেন্ট আইউব খানের ব্যক্তিপূজার জন্য তাঁর সম্মানে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন (২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮) ছাড়াও ঐ একাডেমী বছর খানেক যাবৎ আনন্দের সঙ্গে নজরুলের জন্মবার্ষিকী ইত্যাদি কয়েকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

২.৫.চ. পাক-ভারত যুদ্ধের (১৯৬৫) সময় থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ঐ নির্দেশ পরবর্তীতেও বহাল ছিল। এর মধ্যে ১৯৬৭ সনের জুন মাসে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বাজেটের অধিবেশনে পূর্ববাঙলার সংস্কৃতি ও এতে রবীন্দ্রনাথের অবদান বিষয়ে বিতর্ক উত্তপ্ত রূপ ধারণ করলো। তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন জাতীয় পরিষদে জানান জাতীয় আদর্শ ও ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে বেতার ও টেলিভিশনে

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রসঙ্গীত আর প্রচার করা হবেনা। আবদুস সবুর খান (সরকারী দলের নেতা) যা বলেন তার মূল কথা হলো ঃ ইদানিং পূর্ববাঙলায় সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের এক অশুভ তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পহেলা বৈশাখ ও রবীন্দ্র-জয়ন্তী উদযাপনের নামে বিদেশী সংস্কৃতি এদেশে অনুপ্রবেশ করে ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানের মূলে আঘাত হানছে।[৭০] উল্লেখ্য যে ১৯৬১ সনের রবীন্দ্রজন্মশত বার্ষিকীর সময় আইউব সরকার বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠে যাতে পূর্ববাঙলায় তা পালিত না হয়। পাকিস্তানবাদীদের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এ সম্পর্কে বহু আক্রমণাত্মক রচনা প্রকাশিত হয়। কিন্তু সরকারের এই নীতির প্রতিক্রিয়ায় প্রায় একটা গণ-আন্দোলনের উত্তেজনা নিয়ে পূর্ব বাঙলার জনগণ শতবার্ষিকী উৎসব উদযাপন করে।[৭১] এই বার্ষিকী উদযাপনের সাফল্যে ঢাকায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা ও বিকাশ লক্ষ্যে 'ছায়ানট' প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯৬২)। পাকিস্তান প্রাপ্তির পরে পহেলা বৈশাখের উৎসব হারিয়ে যেতে বসেছিল। কিন্তু ১৯৬১-পরবর্তী বছরগুলোতে আবার বাঙলা নববর্ষ পালনের আয়োজন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমেই উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। প্রাদেশিক সরকার পহেলা বৈশাখ সরকারী ছুটির দিন (১৯৬৪ থেকে) ঘোষণা করে বাঙালি-সংস্কৃতির স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন।

পাক-ভারত যুদ্ধের অবসানের পর সরকার ভারত থেকে পুস্তক আমদানী নিষিদ্ধ করে দেয়। মোনেম সরকার এক অর্ডিন্যান্সের দ্বারা ভারতীয় পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ বন্ধ করেন। এর ফলে বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদসমূহের সঙ্গে পূর্ববাঙলার জনগণের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ ব্যাহত হয়। এই সরকারী রীতির বিরুদ্ধে ছাত্ররা এবং শিক্ষিত সমাজ অনেক আন্দোলন করেন। কিন্তু সরকার তা গ্রাহ্য করেননি। এ সময় ছাত্র-ছাত্রী ও পাঠক-সাধারণের চাহিদা পুরণের জন্য চর্যাপদ-কৃষ্ণকীর্তন থেকে আরম্ভ করে বিদ্যাসাগর মধুসূদন দীনবন্ধু বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী পূর্ববাংলায় পুনর্মুদ্রিত হয়। তাছাড়া আরও অত্যাধুনিক পশ্চিমবঙ্গীয় লেখকদের রচনারও বহু ফুটপাথ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ নিয়ে অনেক বিতর্ক সভা-সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় এবং দোষ-গুণ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত হতে থাকে।

এই সময় (১৯৬৮) বাংলা একাডেমীর ব্যর্থ পুরাতন উদযোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলা ভাষা-সংস্কার করার পদক্ষেপ আবার গৃহিত হয়। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপর্ষদের মাধ্যমে ভাষা, লিপি ও বানান সংস্কারের উদ্যোগ প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। রোমান হরফ প্রবর্তনের প্রচারও এই সময় নতুন করে আরম্ভ হয়। আইউব খান অভিন্ন সংস্কৃতির জন্য এক 'জাতীয় ভাষা, প্রর্বতনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৬৯ সনের শেষের দিকে পূর্ব বাঙলায় বাঙালি সংস্কৃতি, বাঙালি জাতি ও স্বাধীন চিন্তার পরিপোষক পুস্তকাদি বাজেয়াপ্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয় পাকিস্তান সরকারের এক প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স বলে। ১৯৫৯ সনে প্রতিষ্ঠিত বি. এন. আর (B.N.R) জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা (Bureau of National Reconstraction) কে ১৯৬৯ সনের সামরিক শাসনামলে সার্বক্ষণিক পরিচালক নিযুক্তির (ডঃ হাসান জামানকে, ১৯২৮-৮১) মাধ্যমে সক্রিয় করা হয় এবং পর্যাপ্ত বাজেট (মূলধন) দিয়ে সংস্থাটিকে অপসংস্কৃতি প্রচারের এবং বুদ্ধিজীবী-লেখকদের দিয়ে বই লেখানোর মাধ্যমে টাকা বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। "মোটামুটিভাবে প্রতিষ্ঠিত লেখকদের দ্বারা উচ্চমূল্যে পুস্তক রচনা করে তাদের নিরপেক্ষ করে তোলা (হল)। .... পূর্ববাংলার প্রতিষ্ঠিত লেখকদের এক বিরাট অংশকে সংস্থাটির গণবিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে নীরব রাখতে সমর্থ হলেন।"[৭২] ঐ সময় পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ প্রচার ও প্রসারের জন্য পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের মাধ্যমে নবম ও দশম শ্রেণীর (১৯৭০-৭১ শিক্ষাবর্ষে) পাঠ্যরূপে 'পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি' নামের দু খণ্ডের একটি পুস্তক প্রণীত হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিকের (জ: ১৯১৮) সভাপতিত্বে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদের তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সিরাজুল ইসলাম (জ. ১৯২৬) এই বই রচনা করেন। ভারতবর্ষে কখন থেকে মুসলিম জাতীয়তাবাদের উৎস খোঁজা উচিত ও পাকিস্তানের মাধ্যমে কিভাবে তার পূর্ণ বিকাশ ঘটলো এই হলো ঐ বইয়ের মূল দৃষ্টিভঙ্গি। পাকিস্তানে অখণ্ড জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করার এই অপচেষ্টা পাকিস্তানী শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করবে — তার মাত্র একবছর পূর্বে, বাঙালি লেখক-গবেষক-অধ্যাপকদের দ্বারাই প্রণীত হয়েছিল। ভূমিকায় (২য় খণ্ড) গ্রন্থকার লিখেছিলেন ঃ "পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, পাকিস্তানী কৃষ্টির কতকগুলি দিক যেমন ঃ ভাষা, সাহিত্য ও সমাজ, স্থাপত্য ও ললিতকলা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে বইটিতে। .... পৃথিবীর যেকোনও উন্নত দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় জাতির শিল্প-কলা-কৃষ্টিগত বুনিয়াদ সম্পর্কে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরেই শিক্ষার্থীকে অবহিত করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কিন্তু ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা। তাই প্রদেশের শিক্ষাবোর্ডগুলি এবং সে-সঙ্গে টেকস্টবোর্ড তাঁহাদের এই নীতি ও পদক্ষেপের জন্য অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য।"[৭৩] কিন্তু পূর্ব বাঙলার ছাত্র-জনতা-বুদ্ধিজীবীরা এই রকম একটি বিকৃত আদর্শের ভাণ্ডার পুস্তককে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংগঠিত ভাবে আন্দোলন আরম্ভ করেন। চাপের মুখে সরকার আপোষমূলক বক্তব্য প্রচার করে উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করলেও এই বই আর ছাত্রদের ছুঁয়ে দেখার প্রয়োজন পড়েনি। পূর্ব বাঙলার বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকগণ বারে বারে গণ-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। ক্ষমতার সঙ্গে আপোষ করে জনগণের স্বার্থকে বিসর্জন দেয়া হয়েছে। শিল্পী-সাহিত্যিকেরাও গণ-বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও নেতাদের মতো হঠকারিতার আশ্রয় নিয়ে যা-খুশি তাই করেছেন, ব্যক্তিগত লাভালাভ ও ভালো-মন্দকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবু এই কালের বুদ্ধিজীবী-লেখক-সাহিত্যিকেরাই আবার জনমতের প্রতি লক্ষ্য রেখেই হোক, কিংবা দেশী বা বিদেশী কোন সংস্থা থেকে তাগাদা ও নগদ মুনাফা পেয়েই হোক, অথবা বন্দীবিবেকের করুণ আর্ত-চিৎকার-ধ্বনিরূপ সজাগমুহূর্তের সচেতনকর্মপ্রয়াস হিসেবেই হোক— ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন কতিপয় স্মরণীয় কর্মপন্থাও তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন; যা পূর্ব বাঙলার স্বায়ত্বশাসনকামী রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাকে পুষ্ট করেছিল এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাঙলাভাষা ও বাঙালি-সংস্কৃতির পরিপোষকদের শৈল্পিক মানসিক ক্ষুধা-তৃষ্ণার পানাহার সরবরাহ করেছিল। চট্টগ্রাম (১৯৫১) ঢাকা (১৯৫৪) ও কাগমারী (১৯৫৭) সংস্কৃতি সম্মেলন, রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ পালন (১৯৬১) এবং ১৯৬৩ সনে (২২-২৮ সেপ্টেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ কর্তৃক কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ও পূর্ব-পাকিস্তান জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার (ভণড়) আর্থিক সাহায্যে আয়োজিত 'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' সেকালের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। এতে বি.এন.আর. এর কালো পয়সার দোষ ঢেকে

Dhaka University Institutional Repository

গিয়েছিল। প্রচুর শ্রোতা-দর্শক অসীম আগ্রহ-উদ্দীপনা ও কৌতূহল নিয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের সপ্তাহব্যাপী ঐ অনুষ্ঠান উপভোগ করেছিলেন — কারণ, বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের হাজার বছরের ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত ও পরিকল্পিত আবৃত্তি, সঙ্গীত, সংস্কৃতি প্রদর্শনী ও আলোচনা অনুষ্ঠান স্ফুটনোন্মুখ বাঙালি-জাতীয়তাবাদী চেতনাকে পুষ্ট করেছিল। দেশবাসীর মনের সাংস্কৃতিক চাহিদাকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম ছিল অনেক কার্যক্রম।[৭৪]

লেখক সংঘের কার্যক্রম বুদ্ধিজীবীদের নিন্দার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বার্থ নিয়ে দলাদলি হানাহানি এবং বিভিন্ন প্রকার গোপন তৎপরতা বুদ্ধিজীবীদেরকে জনগণের স্বার্থ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।[৭৫] কিন্তু ১৯৬৮ সনে লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখা মহাকবি স্মরণোৎসব (৫ জুলাই-৯ দুলাই ১৯৬৮) ও আফ্রো-এশীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (২০-২১ অক্টোবর১৯৬৮) তাঁদেরকে জনগণের কাছে এনেছিল কিছুটা। এগুলো দ্বারা তাঁরা নিজেদের গণবিচ্ছিন্ন কার্যক্রমের অপবাদ ঢাকতে কিছুটা হলেও সফল হয়েছিলেন। কারণ অনুষ্ঠানে লোক সমাগম হতো বলে, জনমনে সাড়া জাগাতে পেরেছিল ভালো। ভেতরের সব কথা জনগণ খুঁটিয়ে জানতে চায়নি।

তথ্যপঞ্জি

১. গোপাল হালদার, বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, ঢাকাই সং ১৯৮৭, পৃ ৫

২. আহমদ শরীফ, বিচিত চিন্তা, ঢাকা (২য় সং) ১৯৭৫, পৃ ১৩০

৩. সুপ্রকাশ রায়, বিদ্রোহী ভারত, কলকাতা ১৯৮৯, ভূমিকা

৪. তাফাজ্জল হোসাইন, স্মৃতিকণা, ঢাকা ১৯৮৪ (২য় সং) পৃ ৯৪

৫. সাপ্তাহিক (তখন অর্ধ-সাপ্তাহিক) চাবুক, ঢাকা ৮ নভেম্বর ১৯৪৭ ১৫ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা

৬. কাজী আবদুল ওদুদ, শাশ্বত বঙ্গ (ঢাকা ১৯৮৩) পৃ ১৯৪-৯৫ ও সাপ্তাহিক চাবুক, শারদীয় সংখ্যা ১৩৪৫ এ প্রকাশিত তাঁর 'একটি প্রশ্ন' শীর্ষক আলোচনা

৭. অর্ধ-সাপ্তাহিক চাবুক, ১৫বর্ষ, ৪৯ ও ৫০ সংখ্যা, ৮ ও ১১ নভেম্বর ১৯৪৭

৮ মাহেনও (সম্পাদকীয়) ১ বর্ষ ১২ সংখ্যা, মার্চ ১৯৫০, পৃ ৫৬

৯. শ্রী হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্বাস্তু, কলকাতা ১৯৭০, পৃ ৮

১০. আবদুল্লাহ রসুল, কৃষক সভার ইতিহাস, তৃতীয় সং কলকাতা ১৯৮২, পৃ ১৯১-৯২

১১. তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর, ঢাকা ১৯৮১, পৃ ৩৩-৩৪

১২. পূর্বোক্ত, পৃ ৩৪

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ ৬, ১৮ ও ১৯

১৩. ক. পূর্বোক্ত, পৃ ৯৯

১৪. অনুদা শংকর রায়, সংহতির সংকট, কলকাতা ১৯৮৪, পৃ ১২০

১৫. ইসরাইল খান, চট্টগ্রামের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এক পর্ব, লোকায়ত (ঢাকা) ১১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯২, পৃ ৫৯

১৬. অর্ধ-সাপ্তাহিক চাবুক, পূর্বোক্ত, মাসিক সীমান্ত (১৩৫৪-র কার্তিক-অগ্রহায়ণ ও পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যা) এবং 'কৃষ্টি' (কার্তিক ১৩৫৪) ইত্যাদি বিভিন্ন পত্রিকায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব মুদ্রিত আছে। গণপরিষদেও (১৯৪৮ সনে) বাঙলাকে গণপরিষদের ভাষা করার প্রস্তাব উত্থিত হয় হিন্দু সাংসদ শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত কর্তৃক। কিন্তু মুসলিম লীগের বিরোধীতায় তা কার্যকর হয় না।

১৭. আহমদ শরীফ, বাংলাভাষা সংস্কার-আন্দোলন, ঢাকা ১৯৮৬, পৃ ১

১৮. পূর্বোক্ত, ভূমিকা

১৯ আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুক্তি-সংগ্রাম, ঢাকা ১৯৭২, পৃ ৫

২০. পূর্বোক্ত, একুশে ফেব্রুআরি আন্দোলন, ঢাকা ১৯৭৬, পৃ ২০

২১. বদরুদ্দিন উমর, পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ ও ২ খণ্ডের ভূমিকা

২২ পূর্বোক্ত

২৩. আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা ১৯৭০, পৃ ৩২১

২৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ : দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড, ঢাকা ১৯৮২, পৃ ৩৭৩-৭৪

২৫. আবুল কাসেম ফজলুল হক, একুশে ফেব্রুআরি আন্দোলন, পৃ ২৫

২৬. আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত

২৭ তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ ৫৬। ২৬ সংখ্যক পাদটীকার পরের সাধুভাষার উদ্ধৃতিগুলোর জন্য এগ্রন্থের ৪৬-৫৬ পৃ দ্র

২৮ আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুক্তি সংগ্রাম, পৃ ৫৬-৫৭। ২৭নং পাদটীকার পরের অংশ 'মুক্তি সংগ্রাম'; সাঈদ-উর-রহমান প্রণীত 'পূর্ব বাঙলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা' (পৃ ৬৪—৬৫); তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার 'পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর' (পৃ ১০০-১২০) ও নূরুল ইসলাম প্রণীত 'একাত্তরের ঘাতক-দালাল যা বলেছে যা করেছে' (ঢাকা ১৯৯১, পৃ ৮—২২) অবলম্বনে লিখিত।

২৯. নূরুল ইসলাম, একাত্তরের ঘাতক-দালাল যা বলেছে যা করেছে, পৃ ২৫

Dhaka University Institutional Repository

৩০. শেখ মুজিবুর রহমানের জবানীতে ছয় দফা কর্মসূচীর অসংখ্য পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত পুস্তিকাটি প্রকাশের তারিখ ৪ঠা চৈত্র ১৩৭২ (মার্চ ১৯/২০, ১৯৬৬)। ঐ ছয় দফা পুস্তিকার প্রকাশক ছিলেন ঃ আবদুল মমিন, প্রচার সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ২। গ্লোরি প্রিন্টার্স, ঢাকা ১ থেকে মুদ্রিত হয়েছিল।

৩১. আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুক্তি সংগ্রাম, পৃ ৬৮

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ ৭১

৩৩. আহমদ শরীফ, বাঙালীর চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা, ঢাকা ১৯৮৭, পৃ ১৮৯—৯০

৩৪. আমজাদ হোসেন, বাঙলাদেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলন (প্রবন্ধ), বিচিত্রা, ২১ নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ ১৯—২৩

৩৫. সাঈদ-উর রহমান, পূর্ব বাঙলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা, পৃ ১৬

৩৬. আমজাদ হোসেন ও সাঈদ-উর-রহমান, পূর্বোক্ত

৩৭. সাঈদ-উর-রহমান, পূর্বোক্ত

৩৮. আমজাদ হোসেন, পূর্বোক্ত

৩৯. পূর্বোক্ত পৃ ২১

৪০. সাঈদ-উর-রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ ২১-২২

৪১. আমজাদ হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ ২২

৪২. আবুল কাসেম ফজলুল হক, আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ ৩৪৯—৫১

৪৩. পূর্বোক্ত, মুক্তি সংগ্রাম, পৃ ৩৭

৪৪. তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর, পৃ ১৩৮—৫৫

৪৫. History of Economic and Political Domination of East Pakistan — Paper Reviewed for the Ripon Society by J. Lee Auspitiz, Stephen A. Marglin; and Gustav F. Papenek; Bangladesh Documents, P. 5-6 উদ্ধৃতি : মুক্তি সংগ্রাম পৃ ২৮—২৯

৪৬. Why Bangladesh -- by A group of Scholars in Viena, Bangladesh Documents, প. ১৬ উদ্ধৃতি পূর্বোক্ত সূত্র থেকে

৪৭. নূরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ ৪১

৪৮. আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুক্তি সংগ্রাম, পৃ ২৮–৩১

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ ৩৬—৩৭

৫০. আজিজ মিছির, 'পঞ্চাশ দশকের শুরু : প্রগতিশীলন সাংস্কৃতিক আন্দোলন'; চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন : প্রগতিশীল ধারা, সম্পাদক : মাহবুব হাসান, চট্টগ্রাম, ১৯৯১, পৃ ৩২

৫১. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, 'সাংস্কৃতিক আন্দোলন চট্টগ্রাম'; চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন : প্রগতিশীল ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ ৫—৬। তিনি লিখেছেন ঃ এই সমাবেশে এবং — সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-বিরোধী ... মিছিলে নেতৃত্ব দেন রফিক উদ্দিন সিদ্দীকী, আবদুল হক দোভাষ, প্রিন্সিপাল আবু হেনা, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, শওকত ওসমান, যোগেষ সিংহ প্রমুখ। এই মিছিলের বৈশিষ্ট্য ছিল : দুই হাজারেরও অধিক ক্লাবকর্মী ইউনিফর্মে সজ্জিত হয়ে ড্রাম বাজিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ-বিরোধী গান গেয়ে গোটা শহর প্রদক্ষিণ করতো। গানের নেতৃত্বে থাকতেন সাদেক নবী। ' ও ভাই দেশ ছাইড়া যাইওনা/ এক ভাই যখন বাঁইচ্যা আছে আর ভয় কইরোনা।' গানটির রচয়িতা— মাহবুবউল আলম চৌধুরী: সংখ্যালঘুদের মনে এই গান দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে অনেকে দেশ ছেড়ে চলে যাবার সংকল্প পরিত্যাগ করেন (পৃ ৭)।

৫২. পূর্বোক্ত, পৃ ৮

৫৩. ১৯৪৮ সনে পাকিস্তানের মূলনীতি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই মূলনীতিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের কথা ছিলনা। বাঙলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার কোন স্বীকৃতিও ছিলনা: ঐ রিপোর্টে পূর্ব পাকিস্তানের অত্যন্ত ন্যায্য দাবিগুলোকেও অস্বীকার করা হয়। তৎকালে পত্রপত্রিকায় সমালোচনা প্রকাশ পেলেও কোনো কার্যকর প্রতিবাদ বা গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা না হওয়ায় এবং দমন নির্যাতনের মাধ্যমে প্রতিবাদ স্তব্ধ করে দেয়া হয় বলে নীতির পরিবর্তন হয়না।

৫৪. ত্রৈমাসিক পরিচিতি, সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি মফিজ উল হক, চট্টগ্রাম, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৫৮; উদ্বৃতি : চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন ঃ প্রগতিশীল ধারা, পূর্বোক্ত, পরিশিষ্ট পৃ ৮—১৫ থেকে

৫৫. মাসিক সমকাল, সম্পাদক : সিকানদার আবু জাফর, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৬৭

৫৬. উদ্ধৃত, দীননাথ সেন প্রণীত প্রবন্ধ 'পঞ্চাশের তরঙ্গ'; চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন : প্রগতিশীল ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ ৭৯

৫৭. সাঈদ উর রহমান, পূর্ববাঙলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা, পৃ ৩৭—৩৯

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ ৩৯

৫৯. শংকর দাশ গুপ্ত (শ্রী শংকর), 'পঞ্চাশ ও ষাট দশকের সাংস্কৃতিক চর্চা : প্রসঙ্গ নৃত্য '; চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন : প্রগতিশীল ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ ১৩০

৬০. ১৯৫৬ সনে চট্টগ্রামের 'কৃষ্টিকেন্দ্র' উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকাশিত দীননাথ সেন সম্পাদিত 'কৃষ্টি' স্মরণিকায় অধ্যাপক আবুল ফজলের ভাষণ ('কৃষ্টি কেন্দ্র প্রসঙ্গে') থেকে জানা যায় : ".... এই পরিবেশে যাঁদের মনে বেদনার সঞ্চার করেছে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটুখানি সুস্থ পরিবেশ রচনার জন্য .... তাঁদের কয়েকজন এগিয়ে এলেন .... ফলে 'কৃষ্টি কেন্দ্রের' জন্ম ও আবির্ভাব সম্ভব হলো। দলমত নির্বিশেষে সবরকম সংস্কৃতিসেবীদের মনে একটুখানি

Dhaka University Institutional Repository

প্রাণ-স্পন্দন জাগিয়ে তোলা, তার জন্য যতটুকু সম্ভব অনুকূল পরিবেশ রচনা ও তরুণ শিল্পসেবীদের জন্য শিল্প চর্চার একটুখানি সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা — সংক্ষেপে কৃষ্টি কেন্দ্রের এই লক্ষ্য। ... হোক ক্ষুদ্র হোক সংকীর্ণ এই পথ —পথিকের লক্ষ্য যদি হয় ধ্রুব, সংকল্প যদি হয় দৃঢ়, এই পথই হয়ত একদিন আজকের অবহেলিত ও উপেক্ষিত সংস্কৃতিসেবীদের এক নূতন ভবিষ্যতের ঈঙ্গিত দিতে সক্ষম হবে।' (উদ্ধৃতি, চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন : প্রগতিশীল ধারা, পৃ ১৬—১৭)

৬১. আবদুল কাদির (সভাপতির ভাষণ); মুনীর চৌধুরী মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী আনোয়ার পাশা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭২, পৃ ৩৩.

৬২. সাঈদ উর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ ২৮

৬৩. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, 'হাসানের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম অধ্যায়', হাসান হাফিজুর রহমান (স্মারক-গ্রন্থ), সম্পাদক: খালেদ খালেদুর রহমান, জুন ১৯৮৩, পৃ ১৮—১৯

৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ ২১

৬৫. সাঈদ উর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ ৩০

৬৬. রফিকুল ইসলাম, মুনীর চৌ মোফাজ্জল হায়দার চৌ. আনোয়ার পাশা, পৃ ২৩

৬৭. সাঈদ উর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ ৫৫

৬৮. 'আমাদের সাহিত্য' বইএর প্রচ্ছদ আঁকেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী, প্রসঙ্গ- কথা লিখেন তৎকালীন পরিচালক কবীর চৌধুরী : সম্পাদনা করেন সরদার ফজলুল করিম। বইটি প্রকাশিত হয় সেমিনারের সকল প্রবন্ধ, আলোচনা-সমালোচনা ও সভাপতিদের ভাষণ ইত্যাদি নিয়ে ১৯৬৯ সনের নভেম্বর (কার্তিক ১৩৭৬) মাসে বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে।

৬৯. সাঈদ উর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ ৯২

৭০. পূর্বোক্ত, পৃ ১০৪

৭১. আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুক্তি সংগ্রাম, পৃ ১৭। রবীন্দ্র-বিতর্কের পক্ষে-বিপক্ষে যেসব বুদ্ধিজীবী অংশগ্রহণ করেন, তাঁরা হলেন : পক্ষে : ডঃ মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, জয়নুল আবেদীন, এম. এ. বারী, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ডঃ খান সরওয়ার মুরশিদ, সিকান্দার আবু জাফর, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ডঃ আহমদ শরীফ, ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম, কবি শামসুর রাহমান, কবি হাসান হাফিজুর রহমান, কবি ফজল শাহাবুদ্দিন, ডঃ আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।

রবীন্দ্র সংগীত সাহিত্য প্রচারের বিপক্ষে : ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, এম. শাহাবুদ্দীন, মোহাম্মদ মোহর আলী, এ. এফ. এম. আবদুর রহমান, কে. এম. এ. মুনীম, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ, বিচারপতি আবদুল মওদুদ, মুজীবুর রহমান খাঁ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, কবি আহসান হাবীব, কবি ফররুখ আহমদ, ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, ডঃ হাসান জামান, ডঃ গোলাম সাকলায়েন, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, কবি বেনজীর আহমদ, কবি মঈনুদ্দিন, অধ্যক্ষ শেখ শরফুদ্দিন, আ.কা.মু আদমউদ্দীন, কবি তালিম হোসেন, শাহেদ আলী, আ.ন.ম বজলুর রশীদ, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, সানাউল্লাহ নূরী, আবদুস সাত্তার, কাজী আবুল কাসেম (শিল্পী), মুফাখখারুল ইসলাম, শামসুল হক, ওসমান গনি, মফিজউদ্দিন আহমদ, আনিসুল হক চৌধুরী, মোস্তফা কামাল, মোহাম্মদ মতিউর রহমান, জহরুল হক, ফারুক মাহমুদ, মোহাম্মদ নাসির আলী, এ কে এম নুরুল ইসলাম, জাহানারা আরজু, বেগম হোসনে আরা, মাফরুহা চৌধুরী, কাজী আবদুল ওয়াদুদ ও আখতার উল আলম। সূত্র : মুক্তি সংগ্রাম, পৃ ১৯—২১

৭২ সাঈদ উর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ ১২৬

৭৩. মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম, পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি (২য় খণ্ড) প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৭০ ভূমিকা দ্রষ্টব্য

৭৪. বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০'; সম্পাদক মুহম্মদ আবদুল হাই (সহকারী সম্পাদক আনিসুজ্জামান ও রফিকুল ইসলাম); বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বৈশাখ ১৩৭১

৭৫. লেখক সংঘের –সদস্যরা যে বিশেষ 'চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য' ধারণ করেছিলেন, তা তাঁদের ১৯৭১ সনের ৫ মার্চ এর 'শপথ গ্রহণ' কর্মসূচীর প্রতি দৃষ্টি দিলেই উপলব্ধি করা যায়। তাঁরা এমন কাজ করেছিলেন — যার জন্য 'শপথ গ্রহণের' প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তাঁরা এ-ও ভেবেছিলেন, লেখকেরা অংশগ্রহণ না-করলেও জনগণ বাংলাদেশ স্বাধীন করেই ছাড়বে। জনগণ তখন নেতৃত্বের অপেক্ষা করছেনা। নেতৃত্ব জনতার সংগ্রামের অনুসারী মাত্র। নেতারা পিছনে পড়ে থাকলে নেতৃত্বই চলে যায় তাঁদের। লেখক- শিল্পী-সাহিত্যিকেরাও ধিকৃত হবার ভয়ে অতীতের সকল পাপ ভুলে জনগণের সংগ্রামের সাফল্যের শরিক হন। 'মুক্তি সংগ্রাম' গ্রন্থে লেখা হয়েছে ৫ মার্চ ১৯৭১ ঢাকার লেখক শিল্পীরা জনতার মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং পরে শহীদ মিনারে গিয়ে শপথ গ্রহণ করেন। দৈনিক পাকিস্তান (৬ মার্চ ১৯৭১) পত্রিকার খবর উদ্ধৃত করে উক্ত গ্রন্থে লেখা হয় : "ঢাকার লেখক ও শিল্পীবৃন্দ পূর্ববাঙলাকে জাগ্রত বাঙালীর প্রার্থিত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রামের শপথ ও সংগ্রামী জনগণের সাথে তাঁদের একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। গতকাল শুক্রবার বিকেলে শহীদ মিনারে এক সভায় সমবেত হয়ে হাত তুলে তাঁরা এই শপথ গ্রহণ করেছেন। .... তাঁরা শপথ নিয়ে বলেন যে, অতীতের সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কলহ, মতানৈক্য ভুলে গিয়ে আজ তাঁরা একে অপরের সাথে একাত্ম হয়ে এগিয়ে যাবেন সংগ্রামের সাফল্যের দিকে। লেখক ও শিল্পীরা ঢাকার তোপখানা রোডে লেখক সংঘের অফিস থেকে মিছিলে শামিল হয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে সভা করেন। .... এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, দেশের এই রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সময় বাঙলাদেশের লেখকেরা আর নিশ্চুপ থাকতে পারেনা। যে কারণে দেশের সর্বত্র গণআন্দোলনে সাধারণ নিরীহ নিরস্ত্র মানুষ প্রাণ দিচ্ছে, লেখক-শিল্পীরাও তার সাথে একাত্ম অনুভব করছেন। .... জনাব মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী লেখক সংঘকে পরিত্যাগ করে পূর্ব বাঙলার লেখকদের 'বাঙলা লেখক সমিতি' নামে একটি সংস্থা গঠনের জন্য প্রস্তাব দেন।' উদ্ধৃত, মুক্তি সংগ্রাম, পৃ ২৭৭-৭৮

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী, ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী, সরকারী ও বেসরকারী প্রধান সাহিত্যপত্রিকা

প্রস্তাবনা

বাঙালি মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবাদী-চেতনা সৃষ্টির জন্য প্রকাশিত, পাকিস্তান- আন্দোলনের মুখপত্র এবং অসাম্প্রদায়িক সাহিত্যপত্রগুলোর মধ্যে বেশ কিছু সাহিত্যপত্রিকা ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করে। এগুলোর মধ্যে কার্যসূচী ও চিন্তাধারাতে মাত্রাগত প্রভেদ থাকলেও তখনকার সওগাত, মোহাম্মদী, মোয়াজ্জিন, আল-ইসলাহ্, বুলবুল, গুলিস্তাঁ, চতুরঙ্গ, নওরোজ, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাতচল্লিশের পরেও মোহাম্মদী, সওগাত, নওরোজ, আল-ইসলাহ্ প্রায় গোটা পাকিস্তানী আমল জুড়ে প্রকাশিত হয়। আজাদী লাভের পরে পাকিস্তান সরকারের তথ্য দফতর থেকে মাহেনও (এপ্রিল ১৯৪৯, চৈত্র ১৩৫৫) প্রকাশের পর থেকে আরও একঝাঁক পত্রিকা এগুলোকে অনুসরণ কোরে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এদেশের সাহিত্য-জগতকে সক্রিয় ও সরব করে তোলে। এধারায় প্রকাশিত পত্রিকার মূল লক্ষ্যই হলো পাকিস্তানকে কল্যাণকর স্থায়ী আধুনিক রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলা। এই ধারার পত্রিকার দার্শনিক ভিত্তি 'ইসলাম' এবং জিন্নাহর 'দ্বিজাতিতত্ত্ব'। তবে বিভিন্ন সাহিত্যিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকটকালে এঁদের মূল আদর্শের ক্ষেত্রে অভিন্নতা দেখা গেলেও বক্তব্য এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈচিত্র্য ছিল। কোনো কোনো পত্রিকা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ' বলে পুলক অনুভব করলেও বাঙলা ও বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে, প্রগতিশীল দেশপ্রেমিকের উন্নতধরনের স্বচ্ছ চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলো। যেমন সিলেটের আল-ইসলাহ্ কৃষ্টি-সীমান্তর সমকালে, ১৩৫৪র কার্তিক অর্থাৎ ১৯৪৭ এর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বাঙলাভাষার প্রশ্নে উর্দুর পরিবর্তে বাঙলারই সপক্ষে নিঃসংকোচে সমর্থন জ্ঞাপন করে মুখ্য গণতান্ত্রিক সামাজিক ভূমিকা পালন করেছিল। জাতির মনন ও চিন্তাধারার গঠনে তাই এই পত্রিকার ভূমিকা গৌণভাবে দেখা চলেনা। তবে বলাবাহুল্য, আর্থিক সামর্থ্যের কারণে এবং মফস্বল থেকে প্রকাশিত বলে, বিশেষত একটি সমিতির ('সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি') মুখপত্ররূপে আত্মীকরণের ফলে, এবং মহিলা-শিশু-শিক্ষানবীশদের অনেক কাঁচা লেখাও এতে প্রকাশিত হতো বলে; আর পত্রিকার আকার-আকৃতি ও মুদ্রণ-পারিপাট্য আর্থিক ও শৈল্পিক সীমাবদ্ধতার কারণে খুব উন্নতমানের করা সম্ভব হয়নি। তবে উদ্যোক্তা-কর্ণধারদের যত্নের আর আন্তরিকতার কোনও অভাব ছিলনা। ফলে এতে যাই-ই ছাপা হোক, একালের পত্রিকার মতো অসংখ্য মুদ্রণ-ত্রুটি পরিদৃষ্ট হয়না। প্রথমদিকের সংখ্যাগুলোতে খুবই কম। পরের দিকে,— ষাট-সত্তরের দশকে সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এবং সাহিত্যবোধের অবক্ষয় ঘটার বাস্তব প্রেক্ষিতকে ধরে রেখেছে বলেই এসব ত্রুটি কিছু চোখে পড়ে। দিনাজপুরের নওরোজও তাই। মাহেনও, মোহাম্মদী সুপ্রতিষ্ঠিত, প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকা ছিল; কিন্তু অপরাপর পত্রিকা স্থায়ী, দীর্ঘজীবী এবং নিয়মিত হতে পারেনি। এক্ষেত্রে ব্যক্তিক-উদ্যোগ হিসেবে কেবল ব্যতিক্রম 'দিলরুবা'; এটি প্রায় পনের বছর চলেছিল। আর বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও মানবতাবাদী ধারার পত্রিকা সওগাত (নবপর্যায়ে ১৯৫২ থেকে); সমকাল (১৯৫৭); পূবালী (১৯৬০); পূর্বমেঘ (১৯৬০); পরিক্রম (১৯৬২) প্রভৃতি পত্রিকা অনিয়মিতভাবে ১৯৭০-৭১ সন পর্যন্ত ধারা বজায় রেখে প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া এদেশের আর কোনো সাহিত্য পত্রিকা নিয়মিত, দীর্ঘ জীবন নিয়ে প্রকাশিত হয়নি। উল্লেখ্য মোটামুটিভাবে এদেশের জনগণ পাকিস্তান এর রাষ্ট্রিক কাঠামোগত স্থায়ী সত্তাকে মেনে-বুঝেই সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সকল কার্যক্রম চালিয়েছিল। ইসলাম ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধভাব 'নাস্তিকতা' এবং 'স্বাধীন বাঙলার' চিন্তা অর্থাৎ ধর্ম ও রাষ্ট্র-র আদর্শবিরুদ্ধে বিপ্লবীভাব বিক্ষিপ্তভাবে কমিউনিষ্টদের (বা বামপন্থী) কোনো কোনো নেতাকর্মীর চিন্তাকর্মে বিরাজ করলেও ব্যাপকভাবে তার স্বীকৃতি ছিলনা। প্রধান দাবি ছিল মূল লাহোর প্রস্তাবের (১৯৪০) ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসিত পূর্ববাঙলা অর্থাৎ বঞ্চনা ও শোষণহীন সৃষ্টিশীল সম্ভাবনাময় পূর্ব বাঙলার প্রতিষ্ঠা কামনা। এই প্রশ্নে যাঁরা প্রথমাবধি নিরপেক্ষভাবে সক্রিয়-সচেতন এবং যুক্তি-প্রয়োগে তৎপর ছিলেন, তাঁদেরকে প্রগতিবাদী প্রাগ্রসর মানবতাবাদী গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় গণ্য করে মূল্যায়ন করা হয়েছে। যাঁরা একদমই পাকিস্তান সরকারের পঞ্চপাণ্ডব হিসেবে সাম্প্রদায়িকগোঁড়া, কূপমণ্ডুক, ভারতবিদ্বেষী এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের অপসংস্কৃতি ও অপকর্মের সমালোচনায় প্রতিবাদে-প্রতিরোধে অনুৎসাহী; পাকিস্তান সরকারের কার্যাবলীকে জনসমাজে গ্রহণ করার মানসিকতা সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত ছিলেন, অন্তত প্রগতিশীলতার আবির্ভাবকে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করার পক্ষপাতি ছিলেন, তাঁদেরকে পাকিস্তানবাদী, ইসলামী ধারায় গণ্য করা হয়েছে। এই শ্রেণীর অসংখ্য পত্রিকা আলোচ্যকালে প্রকাশিত হয়েছে। কোন উচ্চ আদর্শ লালন করতোনা বলে অধিকাংশই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। তবে তৎকালে খ্যাতি অর্জন করেছিল এবং সামাজিকভাবে কোনো না কোনো কারণে গৃহীত, অথবা ব্যাপকভাবে পঠিত হতো এমন পত্রিকার মধ্যে অবশ্যই মোহাম্মদী (১৯২৭-৭০) ; আল-ইসলাহ্ (১৯৩৪-৮১); মাহেনও (১৯৪৯-৭১); দিলরুবা (১৯৪৯-৬৪); নওবাহার (১৯৪৯-৫৩); তাহজিব (১৯৫০); দ্যুতি (১৯৪৯-৫২); পূরবী (১৯৬০)- লেখক সংঘ পত্রিকা (১৯৬১-৬২) ; পরিক্রম (১৯৬২-৭০); সংলাপ (১৯৬১-৭০); উত্তরঅন্বেষা (১৯৬৭-৭০) কিছু প্রভৃতির গুরুত্ব অস্বীকার করা চলেনা। এই অধ্যায়ে এইসমস্ত পত্রিকার স্বরূপ উৎঘাটন করা হয়েছে। তাছাড়া কয়েকটি অপ্রধান পত্রিকা যেমন নওরোজ (১৯৪২-৭০); জাগরী (১৯৫৬); অতএব (১৯৬০-৬২);

Dhaka University Institutional Repository

প্রবাহ (১৯৬১); দিগন্ত (১৯৬৬); অভিযান (১৯৫৪-৬৪)র আলোচনাও এই অধ্যায়ের শেষে সংযোজন করা হয়েছে। কারণ ওগুলো ছিল দেশের প্রধান পত্রিকাগুলোরই প্রসুণ। ক্বচিৎ মৌলিকত্ব চোখে পড়বে। আদর্শ এঁদের সরকারী কোপানলে পড়া নয়। 'পাকিস্তানবাদী' বলতে 'পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী' বুঝানো হয়েছে— 'পাকিস্তানবাদী' কথাটার তাৎপর্য এখানে ব্যাখ্যা করা হলো আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রণীত 'মুক্তি-সংগ্রাম' শীর্ষক গ্রন্থ (পৃ ৬) অবলম্বনে : 'পাকিস্তান আন্দোলনের সময়কার ও পাকিস্তানোত্তর কালের যেসব নেতা পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈচিত্র্য, স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যকে অস্বীকার করে 'এক ধর্ম, এক রাষ্ট্র ও এক জাতি'র যুক্তি দেখিয়ে পূর্ববাঙলাকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে শোষণ ও দমন করার এবং পূর্ববাঙলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে সেখানে পাকিস্তানী সংস্কৃতির প্রবর্তন করার চেষ্টা করতেন, তাঁদেরকেই .... পাকিস্তানবাদী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।' পাকিস্তানবাদীর এই তাৎপর্য পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসীদের বেলায় প্রযোজ্য।

১. মোহাম্মদী (১৯০৩-১৯৭০)

মাসিক মোহাম্মদী ও তার সম্পাদক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) সম্পর্কে অধিক বিবৃতি নিষ্প্রয়োজন। পাকিস্তান আন্দোলনে মাসিক মোহাম্মদীর নিরাপোষ ভূমিকার কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ১৯৪৮ সনে কলকাতা থেকে ঢাকা আসেন। তখনও তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ; এবং বলাবাহুল্য তখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় মুসলিম লীগের আকরম খাঁদের ডানপন্থী গ্রুপই অধিষ্ঠিত। এই গ্রুপের অন্যতম প্রধান নেতা মনে রাখতেই হবে, মোহাম্মদীর মালিক-সম্পাদক আকরম খাঁ। অতএব মোহাম্মদীর ভূমিকা পাকিস্তান আমলে কি হবে বা হতে পারে তা কিছুটা সহজেই অনুমেয়। তবে স্মরণ রাখা দরকার পাকিস্তান অর্জনের পূর্ব-পর্যন্ত পাকিস্তান-প্রত্যাশী জনগণের নিকট 'পাকিস্তান' ছিল স্বপ্নের স্বর্গরাজ্য প্রাপ্তির মতো একটি বড় আকাঙ্ক্ষার বাস্তব স্বরূপ। মোহাম্মদী সেই স্বপ্ন-কল্পনার বাস্তবায়নে ছিল নিরাপোষ। অতএব মুসলিম জাতীয়তাবাদের জাগরণের কালের মোহাম্মদী (১৯২৭-১৯৪৭)র সঙ্গে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের (১৯৪৭-৭০) মোহাম্মদীর বৈশিষ্ট্যে চরিত্রে, মেজাজে, ভাষায়, বক্তব্যে ও আদর্শ-ব্যাখ্যানের গাম্ভীর্যের বিচারে দুটি কালে, দুটি যুগে অথবা দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করে দেখাই সঙ্গত। এবং সেবিচারে সাতচল্লিশ-পূর্ববর্তী মাসিক মোহাম্মদী বাঙালী মুসলমানের জাগরণের বা উজ্জীবনের এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের জ্বলন্ত এক প্রতীক। আর সাতচল্লিশ-পরবর্তী মাসিক মোহাম্মদী অবক্ষয়ের, আর পূর্ব বাঙলার জনগণের ন্যায্য-অধিকার আদায়ের প্রতিবন্ধক,— বাঙালীর প্রগতিশীল চিন্তা-কর্ম ও আন্দোলনগুলোর বিপক্ষে প্রতিরোধে সোচ্চার, মূর্ত প্রতিক্রিয়ার স্বাক্ষর। অবশ্য একথা ভুললে চলবে না যে, মোহাম্মদী পত্রিকার স্বভাবজাত যে সাহিত্যিক উচ্চ-মান ছিল, তার কারণেই প্রতিক্রিয়ার ভাষা মোলায়েম থেকেছে। মওলানা আকরম খাঁর সহজাত যুক্তিবাদিতা আর মোহাম্মদী-সংশ্লিষ্ট কর্মী-কর্মচারীরাও সাধারণ, নিম্ন বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের লোকেরাই ছিলেন বলে পাকিস্তান সরকারের পক্ষাবলম্বন করতে গিয়েও তাঁরা একেবারে ভুলে যেতে পারেননি জনগণের অর্থাৎ নিজেদের ন্যায্য স্বার্থকে এবং মনে রয়েছে সবসময়ই যে, তাঁরাও পূর্ববাঙলার অধিবাসী; মাতৃভাষা তাঁদের বাঙলা ; শিক্ষার মাধ্যম বাঙলা হলে লাভ-ক্ষতি কি—তা কেউ কেউ বুঝতে না-পারলেও অনেকেই বিস্মৃত হতে পারেননি। বাঙলা ও বাঙালীর স্বার্থে অনেক যুক্তিসিদ্ধ কথা তাই মোহাম্মদী লিখেছে, এবং নিয়মিত ব্যাপক সার্কুলেশনের ঐতিহ্যবাহী মাসিক মোহাম্মদীর প্রভাব জনমনে অবশ্যই পড়েছে। বিশেষত আকরম খাঁর মুসলিম লীগ ত্যাগ (১৯৫৪) বা সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ (১৯৬২) এবং মৃত্যু-পরবর্তী (১৯৬৮) সংখ্যাগুলোর রচনা-নির্বাচনে কিংবা সম্পাদকীয় বক্তব্য ও চারিত্র্য নির্ধারণ করতে গেলে খুব বেশী প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকা হিসেবে মোহাম্মদীকে চিহ্নিত করা চলেনা। এর একমাত্র সীমাবদ্ধতা, এটা ধর্মীয় এবং পাকিস্তানবাদী পত্রিকা ছিল। যে-কোনো অবস্থাতে দুই পাকিস্তানের ঐক্যে এঁরা বিশ্বাস করতেন। যাঁরাই পূর্ব বাঙলার স্বাধিকার-স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেছেন, তাঁদেরকেই ভেবেছেন তাঁরা হিন্দু-বাংলার সঙ্গে আঁতাতকারী। মোহাম্মদী হিন্দু-বাঙালীদের বড় বেশী ভয় করতেন (নাকি ঈর্ষা?)। তবে হিন্দু লেখকদের অনেক লেখাই দুই পর্বের মোহাম্মদীতে ছাপা হয়েছে। হতে পারে ওগুলোর অনেক লেখাই ছদ্মনামের। তবে পাকিস্তান আমলে সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের মত হিন্দু-গবেষকেরা বাঙলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। বামপন্থী বদরুদ্দীন উমর, কিংবা যুক্তিবাদী প্রগতিশীল লেখক ডঃ আহমদ শরীফও মোহাম্মদীতে রচনা প্রকাশের জন্য দিয়েছেন—যার বিষয়বস্তু মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব প্রকাশ এবং প্রকৃত সত্য তুলে ধরে প্রমাণ করা যে মুসলমানরাও ঐতিহ্যে, ইতিহাসে, কর্মে হীন নয়। ভূঁই ফোঁড়তো নয়ই। অতএব শিকড় সন্ধানই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বাঙলার তৎকালীন প্রায় তাবৎ লেখকের।

মোহাম্মদী ১৯২৭ সন থেকে ১৯৪৭ সনের নভেম্বর পর্যন্ত কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত শেষ সংখ্যার সূচক ২১ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৪। সম্পাদকের নিবেদনে বলা হয়, আশা করা গিয়েছিল যে একবিংশ বর্ষ মোহাম্মদী ঢাকা থেকে প্রকাশিত হবে। কিন্তু নানা প্রতিকূলতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। কলকাতা থেকেই একবিংশ বর্ষ প্রথম যাত্রা আরম্ভ সংখ্যা প্রকাশ করতে হয়। একবিংশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা পুরো দু'বছর বন্ধ থাকার পর ১৩৫৬ র অগ্রহায়ণ মাসে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির (১৪ আগষ্ট ১৯৪৭) পর কলকাতা থেকে প্রকাশিত মোহাম্মদীর ২১ বর্ষের ১ম সংখ্যার সম্পাদকের নিবেদনে বলা হয় ঃ

> "আজি হইতে ২৫ বৎসর পূর্বে মোস্লেম-বাংলার জ্ঞান বিশ্বাস, সংস্কার--ঐতিহ্য এবং তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আরম্ভ করিয়া দেওয়া হয় একটা গুরুতর রকমের সাংস্কৃতিক অভিযান। সুযোগ ও সুসময় মনে করিয়া মোছলেম সমাজের পঞ্চমবাহিনীও এই অভিযানের সহায়তা করার জন্য পূর্ণ উদ্যমে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পড়েন। ২০ বৎসর পূর্বে মাসিক মোহাম্মদীর আবির্ভাব হইয়াছিল, প্রধানত এই অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার জন্য .... যতটা পারিয়াছি, করিয়া আসিয়াছি।... আজ আবার ডাক আসিয়াছে—মুক্ত-ভারতে মুক্ত এছলামকে প্রতিষ্ঠা করার একটা অভূতপূর্ব সুযোগ ও

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভাবনা আজ আমাদিগের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। পাকিস্তানের বহু প্রকার ভিত্তি সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রে বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। হওয়ার দরকারও আছে খুবই। কিন্তু দুঃখের সহিত ইহাও বলিতে হইতেছে, এগুলি আনুসঙ্গিক উপকরণ হইলেও, পাকিস্তানের মৌলিক ভিত্তি ইহার কোনটাই নয়। আমার জ্ঞান-বিশ্বাস মতে পাকিস্তানের মূলভিত্তি হইতেছে মনস্তাত্ত্বিক। মুছলমানের মন ও মস্তিষ্কে, এমন একটা পুলক, এমন একটা প্রেরণা এবং এমন একটা ভাবাবেগ জাগাইয়া তুলিতে হইবে, যাহার অপরিহার্য্য নির্দেশে বাংলার মুছলমান আদর্শ-সাধনার জন্য যে-কোন ত্যাগ স্বীকারে স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে প্রস্তুত হইয়া যাইবে—মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি বলিতে মোটামুটিভাবে এই জিনিসটাকেই বুঝাইতে চাহিয়াছি।"

বিভাগ-পরবর্তী মোহাম্মদী 'পাকিস্তানের মনস্তাত্ত্বিক-ভিত্তি প্রস্তুতের' সাধনায় লিপ্ত হয়েছিল, কিন্তু বলাবাহুল্য, মোহাম্মদীর সে-উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পাকিস্তান টিকে থাকেনি। বাঙালীর চিন্তাধারাতে কিংবা মন-মনসে 'মনস্তাত্ত্বিক-ভিত্তি' গড়ে ওঠেনি। দিন যতো গেছে, ততোই বাঙালীজাতীয়তাবাদী ভাবের বা বোধের জাগরণ ঘটেছে। ধ্বসে পড়েছে পাকিস্তানের 'মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি' ; এবং আশ্চর্য না-হয়ে উপায় নেই, মোহাম্মদী সেই পরিবর্তনের চিহ্নকেও ধরে রেখেছে। ১৯৬৮ সনের পরে, আকরম খাঁর মৃত্যুর কারণেই হোক, অথবা পূর্ববঙ্গে আইউব-বিরোধী তথা পাকিস্তান-বিরোধী আন্দোলন জাগ্রত হবার ফলেই হোক, কিংবা ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গিয়েই হোক— 'রূপান্তরের মুখে' যে বাংলা ও বাংলা সাহিত্য এসে পড়েছে— সেই কথা নিয়ে জোরালো ভাষার যুক্তিসিদ্ধ প্রবন্ধও তখন মোহাম্মদীতে কিছু প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া মোহাম্মদীর ২২ বছরের (১৯৪৯-৭০) সকল সংখ্যাতেই পাওয়া যায় পশ্চিম পাকিস্তানীদের অবিশ্বাসের সমালোচনা এবং পশ্চিম পাকিস্তানী কর্তৃক পূর্ববঙ্গের লোকেদের অবিশ্বাস করা যে ঠিক নয় মোহাম্মদী বারে বারে সে-কথাও বলতে চেয়েছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে। ফলে মোহাম্মদীর পাতাগুলো পাকিস্তানকালের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীর বিশ্বস্ত দলিল রূপে আজও মূল্যবান বিবেচিত হবে। দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য আছে, অনেক ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বনের অকপট পরিচয় আছে—তবুও বহু ঘটনার সাক্ষী মাসিক মোহাম্মদী। মোহাম্মদীর আকার আকৃতি ও বিষয়-বৈচিত্র্যের নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও পাকিস্তান-শাসনাধীন পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক—তথা সামাজিক অগ্রগতি বা রূপান্তর-পরিবর্তনের চিত্র শোভিত বর্ণাঢ্য উপহার দিতে মোহাম্মদী স্বার্থক হয়েছে।

মোহাম্মদীর সম্পাদকীয় বিভাগে অনেকে সহযোগী হিসেবে কাজ করলেও মোটামুটিভাবে মওলানা আকরম খাঁর নামই সম্পাদক হিসেবে ছাপা হয়েছে। মাঝে মধ্যে দু'এক সংখ্যাতে সম্পাদক হিসেবে আজাদ-মোহাম্মদী গোষ্ঠীর কোনো প্রধান ব্যক্তিত্বের নামও ছাপা হতে দেখা গেছে। মোহাম্মদীর ২৯ বর্ষ ১ম কার্তিক ১৩৬৪ সংখ্যায় সম্পাদক হিসেবে নাম ছাপা হয় মুজিবুর রহমান খাঁ-র। ২১ বর্ষ প্রথম সংখ্যা কলকাতা থেকে আবদুল হাকিম খান কর্তৃক মোহাম্মদী প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। সাতচল্লিশ পরবর্তীতে আবদুল হাকিম খান কর্তৃকই 'আজাদ প্রেস' রমনা, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় দশ বছর পর ৩১ বর্ষ ৮ম, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭ সংখ্যা প্রকাশিত ও মুদ্রিত করেন মোহাম্মদ বদরুল আনাম খাঁ। আকরম খাঁর মৃত্যুর পর (১৯৬৮) মোহাম্মদীতে সম্পাদক হিসেবে নাম ছাপা হয় মোহাম্মদ বদরুল আনাম খাঁর ১৯৭০ সনের নভেম্বর-ডিসেম্বর (অগ্রহায়ণ ১৩৭৭) মাসে প্রকাশিত শেষ ৬৮তম বর্ষ : ৮ম সংখ্যার প্রকাশক ও মুদ্রকও ছিলেন মোহাম্মদ বদরুল আনাম খাঁ। সাধারণত প্রচ্ছদ শিল্পীর নাম মোহাম্মদীতে উল্লেখ করা হতো না। ৩৪ বর্ষ ৬ষ্ঠ, চৈত্র ১৩৬৯ সংখ্যায় লেখা হয় প্রচ্ছদশিল্পী আবদুল হাই এবং অঙ্গসজ্জায় হাশেম খান।

১৯৪৭-৭০ সময়ে (যুগ্ম সংখ্যা আছে অনেক) মোহাম্মদী সাড়ে একুশ বর্ষের মতো (২১ বর্ষ ২ সংখ্যা : ২১ × ১২ + ২ = ২৫৪ সংখ্যা) প্রকাশিত হয়েছে। এর আগে কলকাতা থেকে বিশ বছর পুরো নিয়মিত (কাগজ সংকটে মাঝেমধ্যে আকারআকৃতি ছোট করতে হয়েছে, বিজ্ঞাপন, কভার নিউজপ্রিন্টে ছাপতে হয়েছে) প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মোহাম্মদী শেষের দিকে হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নেয় যে "বাংলা বর্ষ শুরু হয় বৈশাখ থেকে। কিন্তু এতদিন ধরে 'মাসিক মোহাম্মদী'র বর্ষ শুরু হয়ে আসছিল কার্তিক থেকে। এবার থেকে আমরাও আল্লাহর মর্জি বৈশাখ মাস থেকেই আমাদের বর্ষ শুরু করব। তাই গত আশ্বিন মাসে পূর্বতন হিসাব অনুসারে বর্ষ শেষ হলেও আগামী চৈত্রমাস পর্যন্ত একই বর্ষে (৩৯শ বর্ষ) আমাদের অবিশিষ্ট ছয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হবে।" এই সিদ্ধান্ত ছাপা হয়েছিল ৩৯ বর্ষ ১৩শ-১৪শ যুগ্মসংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় (অগ্রহায়ণ ১৩৭৫)। এভাবে ৩৯শ বর্ষ ১৮শ সংখ্যা প্রকাশের পর মোহাম্মদী বৈশাখ ১৩৭৬ সনে প্রকাশিত করে তার ৬৭তম বর্ষের ১ম সংখ্যা। এভাবে বর্ষ শেষ করে বৈশাখ ১৩৭৭ এ ৬৮তম বর্ষ ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ৬৮তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৭৭ সনে প্রকাশিত হয়। ডিসেম্বর ১৯৭০ সনের সাধারণ নির্বাচনে স্বাধীন বাংলাদেশের সকল সম্ভাবনা পরিস্ফুট হয়ে ওঠার পর আর মোহাম্মদী প্রকাশের কোনো সার্থকতা ছিলনা। এর দুমাস ২৪ দিন পরই বাংলাদেশ বীর-বিক্রমে স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মোহাম্মদী শেষ জীবনে ৬৭তম বর্ষ শুরু করেছিল ১৯০৩ সনে 'মাসিক মোহাম্মদী' নামে আকরম খাঁর সম্পাদকত্বে প্রকাশিত পত্রিকার বর্ষক্রম অনুসারে। আকরম খাঁর মৃত্যুর পরে ঐতিহ্য-গর্বী বংশধরেরা তাঁদের অবদানকে দীর্ঘতর ও মহীয়ান করে তোলার জন্য এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানের পূর্বক্ষণে 'বাঙালী' হয়ে বাংলা নববর্ষে মোহাম্মদীর বর্ষ আরম্ভ করার প্রবণতাও লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত বিভাগ-পূর্ববর্তীকালের নিয়মটিও স্মরণ করা যেতে পারে। ১৩৫৪র অগ্রহায়ণ থেকে ১৩৫৬র কার্তিক পর্যন্ত পুরো দু'বছর বন্ধ থাকার পরও একুশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যাই বের হলো ১৩৫৬ সনের অগ্রহায়ণে। এখানে ইতিহাস লম্বা করার প্রবণতা নেই। বরং খাটো করেও গ্রাহকদের জন্য সংখ্যার হিসাব ঠিক রাখা হয়েছে। কিন্তু মূল মোহাম্মদী ১৯২৭ সনে প্রকাশিত হলেও ১৯০৩ সনে প্রকাশিত স্বল্পায়ু মোহাম্মদীকে প্রান্ত ধরে সন গণণা করা ঠিক হয়নি। কারণ ১৯২৭ সনের পূর্বে বস্তুতপক্ষে গণনা করার মতো মোহাম্মদীর ঐতিহ্য ইতিহাসে সৃষ্টি হয়নি। ১৯০৩ সনে আকরম খাঁর সম্পাদনায় কয়েক সংখ্যা মোহাম্মদী প্রকাশিত হলেও ১৯২৭ সনে প্রকাশিত মোহাম্মদীর আয়োজন সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং চরিত্র নতুন। ৩৯ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যার পরে গণনায় ৩৯ বর্ষ ১৩শ সংখ্যাকে ৪০ বর্ষ ১ম সংখ্যা বিবেচনা করলে যে-সংখ্যা ৬৮তম বর্ষ ৮ম সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়েছে, সে সংখ্যার গায়ে লেখা থাকতো ৪২শ বর্ষ ২য় সংখ্যা। সেই হিসেবে মোহাম্মদী বছরে ১২টি ধরে মোটামুটি ৪২ বছরে ৪২×১২ + ২ = ৫০৬ সংখ্যার মত প্রকাশিত হয়। ৬৭ আর ৬৮ যাই-ই লেখা হোকনা কেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৮ সনের আগে একুশে ফেব্রুয়ারী উদযাপনের সংবাদ ছাপা হয়েছে বলে জানিনা। ফাল্গুন ১৩৭৪ সংখ্যায় শহীদ দিবসের বিবরণ ও মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। কার্তিক ১৩৭১ (৩৬ বর্ষ প্রথম) সংখ্যা থেকে পত্রিকার চারিত্র বর্জন বা পরিবর্তন করে আজাদের 'মুকুলের মহফিল' বাগবানের নেতৃত্বে মোহাম্মদীতে চালু করা হয়। বিভাগ পূর্ববর্তী মোহাম্মদীতে আকার অনুযায়ী পঠন-সামগ্রী ছিল প্রচুর। সিনেমার নায়িকাদের ছবি ছাপা হতো না। শিশু বা মহিলাদের জন্যও কোন বিশেষ বিভাগ ছিলনা। কিন্তু ১৯৬০ এর দশক থেকে পত্রিকার চাহিদা বৃদ্ধি বা পাঠক আকৃষ্ট করার জন্য নানান কৌশল অবলম্বন করা হয়। প্রথম থেকেই 'চিন্তাধারা' শীর্ষক বিভাগে বিভিন্ন লেখকের বক্তব্য অনেকটা বিতর্কের ন্যায় প্রকাশ করা হতো। 'সংকলন' বিভাগে মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন পত্রিকা অথবা মোহাম্মদীর পুরাতন সংখ্যা থেকে পুণর্মুদ্রণ অথবা সংকলন করা হতো। ২৪শ বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে 'আন্তর্জাতিক পাঠাগার' শীর্ষক বিভাগ নতুন খোলা হয়। বিদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, ইত্যাদির পরিচয়, সাম্প্রতিক ঘটনা, বিশেষ-বিশেষ সম্মেলন প্রভৃতি সম্পর্কে ছোট-ছোট সম্পাদকীয় ধরনের লেখা ও প্রকাশ করা হতো।

৩০শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা থেকে 'খেলাধূলা' বিভাগ চালু করা হয়। দুই পাকিস্তানের বৈষম্য খেলার ক্ষেত্রেও যে কতোটা প্রকট, তা এবং পাকিস্তানী খেলার মাঠের পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। ২৯শ বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে চালু করা হয় 'মাসের খবর'। ৩৪ বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ব্যক্তি-পরিচয়, বন্যাদুর্গতদের এবং প্রখ্যাত বিভিন্ন শিল্পীদের আঁকা ছবি, বিচিত্র বিশ্ব-সংবাদ প্রকাশের জন্য 'পাঁচরঙা' নামের বিভাগ খোলা হয়। ৩৬শ বর্ষ ১৩৭১ থেকে মুকুলের মহফিল ও মহিলা মহফিল এর সঙ্গে 'ফিল্মিস্তান' খুলে সিনেমার সচিত্র রসাত্মক আলোচনা প্রকাশ করা হয়। এতে দীর্ঘদিনের মোহাম্মদী-চারিত্রে চলচ্চিত্রশিল্পের প্রভাব, তথা চিত্রালী-পববর্তীকালের পাকিস্তানী সংস্কৃতিক অঙ্গনে সিনেমা-পত্রিকার দাপট সম্পর্কেও ধারণা জন্মে। সকল সাহিত্য-পত্রিকায়ই সিনেমা জায়গা করে নিয়েছিল। এসব ছাড়া সাহিত্য-পত্রিকা কেউ কিনতো বা পড়তো বলে মনে হয় না। ৬০ এর দশকে এসে 'সম্পাদকীয়' লেখা বন্ধ হয়। ৩২শ বর্ষ ৯ম সংখ্যায় সম্পাদকীয় লেখার পর আর সম্পাদকীয় নেই। ক্রমান্বয়ে ভালো ও প্রধান লেখক ও কবি-সাহিত্যিকেরা মোহাম্মদীতে অনুপস্থিত থাকতে শুরু করেছেন। অজ্ঞাত, অপরিচিত, নতুনদের আগমন হচ্ছে। প্রতি সংখ্যায় লেখক সংখ্যা ও লেখার বিষয়-বৈচিত্র্য কমে আসছে। আগে বহু বিষয়ে ছোট-ছোট লেখা হরেক রকমের শিরোনামে প্রকাশ করা হতো। ষাটের দশক থেকে (৩২শ বর্ষ বা ৩৪ বর্ষ থেকে অবশ্যই) লেখক ও বিষয়বস্তু চোখে পড়ার মতো কমে আসে।। প্রণয়-কাতর নায়িকাদের ছবি, মহিলা, শিশু কিশোরদের জন্য বিচিত্রবিষয় ধারন করে বারোয়ারী চরিত্র হয়ে মোহাম্মদী ক্রমে ধার ভার এবং লক্ষ্যভেদী তিক্ষ্মতা নষ্ট করে ফেলে। ষাটের দশকে তাই প্রধান লেখকেরা সমকাল, পূর্বমেঘ, পূবালী, পরিক্রম ইত্যাদিতে লিখতে পারলে যতটা আত্মপ্রসাদ বা সন্তুষ্টি অনুভব করতেন, এগুলোতে তেমন নয়। তবে অধিকাংশ লেখকই পয়সার জন্য সব পত্রিকাতেই লিখতেন। কারো বা মনোবাঞ্চা থাকতে পারে বহুল প্রচারিত পত্রিকায় ছেপে তাঁর বক্তব্যকে ব্যাপক জনসমক্ষে তুলে ধরার। তাছাড়া সকল পত্রিকার নিজস্ব বা মনোনীত প্রিয় কতিপয় লেখকতো থাকেনই। মোহাম্মদীতেও ছিলেন পাকিস্তান-পন্থী ইসলামী ধারার এক বিরাট লেখকগোষ্ঠী। তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন বিভিন্ন সময়ে ভিন্নমত-পথের অধিকারী লেখকেরাও। নিচের বিবরণ সেকথাই প্রমাণ করে।

২. ক. কবিতা ঃ মোহাম্মদীতে প্রকৃত কবি ছাড়াও অনেক অকবিও কবিতা লিখেছেন। প্রবন্ধ-গল্প লিখিয়েরা এবং 'অধ্যাপক' (কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষক বলতেই অধ্যাপক?) বৃন্দ অনেক কবিতা লিখেছেন। মোটামুটিভাবে মোহাম্মদীর কবিরা হলেন ঃ

বেগম সুফিয়া কামাল, শোএব আহমদ, শাহেদা, খানম, শাহাদৎ হোসেন, তালিম হোসেন, নুরুন্নাহার, হাবীবুর রহমান, মুফাখ্খারুল ইসলাম, আলাউদ্দীন আল আজাদ, সিকানদার আবুজাফর, কাজী আবুল হোসেন, শামসুদ্দীন, জসীমউদ্দীন, সুফী মোতাহার হোসেন, কে. এম. শমসের আলী, আশরাফ সিদ্দিকী; কাদের নওয়াজ, সিদ্দিক আহমদ খান, সৈয়দ বেলায়েত হোসেন চৌধুরী, শ্রী নরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, আহসান হাবীব, কবির আহমদ, মযহারুল ইসলাম, মোহাম্মদ নরুল ইসলাম, শশিভূষণ দাস, আজিজুর রহমান, বেনজীর আহমদ, ছদরুদ্দীন, নূর মোহাম্মদ, সায়েমা চৌধুরী, আ.ন.ম বজলুর রশীদ, বন্দে আলী মিয়া, লতীফা রশীদ, মোহাম্মদ আজিজুল হক, মমতাজুর রহমান, রওশন ইজদানী, আবদুর রশীদ খান, বদরুল হাসান চৌধুরী, ওসমান, মতিউল ইসলাম, রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী, শ্রী মনোমোহন বর্মণ, শ্রী করুণীময়ী বর্মণ, আবদুর রউফ, মঈনুদ্দীন, নেয়ামাল বাসির, সৈয়দ আলী আহসান, কাজী হাসান ইমাম, আলী আসগর, এইচ. এম. আজিজুর রহমান, আনোয়ারা বেগম, এ. এ. রেজাউল করিম, ইমামুর রশীদ, শাহ্ আজহার আলী, মোহাম্মদ সামসুল হক, সাইয়িদ আতিকুল্লাহ, ক্ষিরোদ প্রসাদ কবিরাজ, রোকেয়া ওপেল খানম, ইমামুর রশিদ, কাজী লতিফা হক, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আজহারুল ইসলাম, মোতাসিমবিল্লাহ, আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দীন, আ. কা. শ. নূর মোহাম্মদ, মুযাহিদ আহমদ, আবদুল হাই মাশরেকী, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, জুলফিকার, তরিকুল আলম, চৌধুরী লুৎফর রহমান, শামসুল হক, অর্ধেন্দু দাশগুপ্ত, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, রোকনুজ্জামান খান, নজরুল হক, সালেহা শামসুন্নাহার, নাজির আহমদ, হাসান আজিজুর রহমান, এস. এম. ফয়েজুল হক, প্রভাত বসু, মোকসেদা বেগম, উমরতুল, আফতাবউদ্দীন, হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আশরাফ, এ. এইচ. শামসুদ্দীন, মহিউদ্দীন, বসুধা চক্রবর্তী, ওমর আলী, আবুল ফজল শাহাবুদ্দীন, মোহাম্মদ আবদুর রহমান, মমতাজুর রহমান তরফদার, খোন্দকার আবদুর রহীম, শাহরিয়ার, আতাউর রহমান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মুহাম্মদ আবু বকর, জাহাঙ্গীর খালেদ, মাহমুদুল হক, নাহার, কাজী শামসুল হায়দার, কেশব চট্টোপাধ্যায়, মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল, সরদার আবদুর রাজ্জাক, রোকেয়া সুলতানা, আবদুল মান্নান, আখতার মুহিউদ্দীন, নূর মোহাম্মদ, মোহাম্মদ শামসুর রহমান, সিরাজুল ইসলাম, আলমগীর জলীল, শহীদ আশরাফ উদ্দিন, প্রজেশকুমার রায়, আবু ওবায়দা, আবদুর রহমান, রিজিয়া খাতুন, ওয়াজেদ, রফিক আল আমিন, সুধাংশু শেখর বৈশ্য, শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান, রমেশ দেবনাথ, শামসুল হক কোরায়শী, আবদুল মজিদ, জাহান আরা, আখতার জাহান, মুহম্মদ খুরশেদুল ইসলাম, মাহবুবুর রহমান তালুকদার, আ. ফ. ম. সিরাজ উদ্দৌলা চৌধুরী, বেগম আজীজা নূর মোহাম্মদ, গোলাম মোস্তফা, আল কামাল আবদুল ওহাব, মাহমুদ লস্কর, নুরুন্নাহার বেগম, দীননাথ সেন, মীর আবুল খায়ের, আনিসুল

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম মায়মনী, আবদুস সালাম, জিয়া হায়দার, শ্রীগৌরপদ কবিরাজ, হেমায়েত হোসেন, আবদুস সাত্তার, বঙ্কিম মাহাত, আখতার উল আলম, ওয়াজেদ এ কাদির, তপন ভট্টাচার্য্য, মীর সিরাজুল হুদা, আবু বকর সিদ্দিক, বুলবুল খান মহবুব, মনসুর আহমদ, আবদুন নূর, মনজুরে মওলা, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য, এম. মোফাজ্জল হোসেন, আবদুল মান্নান হাওলাদার, হাসান আবদুল গোফরান, দিলওয়ার, আশরাফ উদ্দীন আহমদ, এম. গোলাম রহমান, দীল আফরোজ আহমদ, জুলফিকার মতিন, কাজী আবদুল বায়েস, মিনতি দেব, অশোক বড়ুয়া, মোহাম্মদ তারেক, আল মাহমুদ, সৈয়দ সফিউল্লাহ, আবু মুসা জাহাঙ্গীর, সৈয়দ ওবায়দুল্লাহ চৌধুরী, সিরাজুদ্দৌলা চৌধুরী, আবুল কাসেম, আবদুল মান্নান সৈয়দ, মাসুদ আহমেদ, মেহেদী হোসেন, কাজী গোলাম আহমদ, মোহাম্মদ বরাত আলী, শাহ মোহাম্মদ সৈয়দুর রহমান, কামরুল আহসান, সাদিক আনওয়ার, মুহাম্মদ মামুন, আবু সাইদ জহুরুল হক, জাহানারা আরজু, ইমাউল হক, ইউছুপ পাশা, শেখ আবদুল জলিল, আবু ওবায়দা, দীনেশচন্দ্র পাল, চৌধুরী গোলাম আকবর, ইজাজ হোসেন, সাইয়ুম মাহবুব, মওলানা জালালউদ্দীন রুমী, মোকসেদা বেগম, তাহমিদুল ইসলাম, ইন্দুভূষণ বিশ্বাস, আলতাফ হোসেন, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, মহাদেব সাহা, হোসনে আরা ফিরোজা বেগম, মাহমুদা মালেক, মহিবুল্লাহ, আবদুশ শহীদ খান, মাজেদা ইসলাম জয়দেবপুরী, আইনুন নাহার, আবুল কালাম ইলিয়াস, ইমরাউল কায়েস, কাজী গোলাম আহমদ, অরবিন্দ কুমার দে, জাহানারা আহমেদ, হুমায়ুন আজাদ, আসমা চৌধুরী, আবুল কাশিম কেশরী, কে. এম. আমীর খসরু, আতোয়ার রহমান, মাহমুদা আলো, সেলিনা হোসেন, হেদায়েত হোসেন মোরশেদ, টি. এইচ. শিকদার, বুদ্ধদেব সরখেল, খালেক-বিন আস্কার, ওয়াহিদা আনওয়ার, রেহেনা বেগম, চৌধুরী শাহরিয়ার মঈন, এম. মোফসেন, আবদুল ওহাব, মোঃ নজরুল ইসলাম, কল্যাণ ব্রত দাশগুপ্ত, এ. কে. জয়নুল আবেদীন, অলিউল্লাহ, ভবেশ রায়, সুকুমার বড়ুয়া, গোলাম মোহাম্মদ মোস্তফা, এম. এ. হালিম, আবুল হোসেন, জেবুন্নেসা খান, মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা, শেখ ফজলুর রহমান, এ. এম. আহসানউল্লাহ, আজিজুল হক এরশাদ, জিয়াউদ্দীন চৌধুরী, বেগম চিন্নাচুন্নেসা, নুরুন্নাহার বেলী, এ. কে. এম. নাসিমুল জামাল, মোহাম্মদ বরাত আলী, মোহাম্মদ মাহবুব আলী কায়জার, মিস জিনাত মহল, দিল আফরোজ ডেইজী, আবুল হোসেন মিয়া, এ বি এম সৈয়দ আহমদ, মুহম্মদ জাহাঙ্গীর খান ইউছুপজয়ী, ওমর আহমদ, বি.এম. আমিনুল ইসলাম, এস. এম. লুৎফর রহমান, মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, আ. শ. ম. বাবর আলী, মোহসীন আহমদ, মোহাম্মদ মোস্তফা, আবদুর রব তালুকদার, মোস্তফা বশীর আহমদ, হাসানুর রহমান, সীমা খান, শেখ মতিয়ার রহমান, শান্তিময় বিশ্বাস, সৈয়দ ইমরুল শাহীন, রমেশ দত্ত, গোলাম মোহাম্মদ মাস্তানা, জালালউদ্দীন জাহাঙ্গীর, শামসুল করিম কায়েশ, কে. এম. আমীর খসরু, আবু আল সাঈদ, নির্মলেন্দু গুণ, তুষার কান্তি সেন, ফরহাদ আহমেদ, আ. কা. মু. আদমউদ্দীন, জীবন চৌধুরী, এহসান চৌধুরী, মহফিল হক, মুস্তাফিজুর রহমান, আবু জাফর আবদুল্লাহ, আবু অনুপম, সিদ্দিকা মাহমুদা, সুলতানা বেগম, রফিক সান্যামত, শহীদুল্লাহ, শামসুল করিম খান, অসীম কুমার সাহা, অমলেন্দু বড়ুয়া, বেগম কোহিনুর মান্নান, ফরিদা মতীন, ছন্দা রহমান, ফরিদা বেগম পুতুল, মুখতারউল হক, আবদুল হাই, অনু ইসলাম, রেখা মাহমুদ, সাযযাদ কাদির, হেনা হাসানাৎ, নীরা কাসেম, সুফিয়া হক, কাজী নুরুন্নবী, সালেহ আহমদ, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, পংকজ কুমার সাহা, নাজমুল আহসান, ইবনে সিরাজ, আবদুল হামিদ, সানাউল হক খান, জাহিদুল হক, আবু মোহাম্মদ ইউনুছ, আতউর রহমান ছামাদ, মুহম্মদ আবদুল আহাদ, খোন্দকার আবদুল মালেক, মোহাম্মদ শরীফ হোসেন, মুহাম্মদ মাতবর আলী, মিজানুর রহমান তালুকদার, বোকন উদ্দিন আহমদ, শামসুর রাহমান বাবু, প্রবোধ নাথ, মান্নান হাশেমী, মুস্তফা নূরুল আমিন, কাজি সালাহউদ্দীন, মোহাম্মদ শরীফ, মোঃ ওবায়েদ উল্লা মীরদা, মোহাম্মদ সারওয়ার, মোহাম্মদ হামিদুল ইসলাম, সাদিক সারওয়ার, আবুল হাসান, মোস্তফা ইকবাল, মেজবাহউদ্দীন আহমদ খান, আবু জোবের, শওকত আনওয়ার, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, রিজওয়ানুল ইসলাম, নূরুল আলম রইসী, রনজিত নিয়োগী, আহমদ মুনির, আল-আমীন, মাহবুব আলতামাস, আহমেদ নূরে আলম, নাসিরুদ্দিন মাহমুদ, ফকির আহমদ, গোলাম সাকলায়েন, বকর আহমদ, মোস্তফা ইকবাল, শাহাদৎ হোসেন বুলবুল, মুহম্মদ নূরুল হুদা, ভূপাল কৃষ্ণ মণ্ডল, মোহাম্মদ ফারুক উদ্দীন, সুমন আল ইউসুফ, গোলাম সাবদার সিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দুস, কঙ্কন নন্দী, মনোয়ার হোসেন ওয়াসী, সায়েদুল ইসলাম, মুহাম্মদ আবু বকর, ইফতেখার রসুল, ওয়াজেদ মজনু, সুমন অরিন্দম, মনোয়ার হোসেন ওয়াসী, শেখ মজিবর রহমান, মুহম্মদ জিল্লুর রহমান, সুশান্ত ঘোষাল, ফারুক রেজা, তব্বির রহমান, দাউদ হায়দার, বনবিহারী বিশ্বাস, বিপ্লব দাশ, মমতাজ বেগম, মোঃ মতিউর রহমান, মোহাম্মদ আলী ফড়িং, জামালউদ্দিন হোসেইন, দেওয়ান আবদুল হামিদ, মোঃ মোখলেছুর রহমান খান, সৈয়দ সুরাইয়া কিবরিয়া, শাহজাদ ফেরদৌস, শামসুজ্জামান মতীন, সঈদ উদ্দীন চৌধুরী, মুশতাক হাবীব, উদয় শংকর রতন, নাজিমউদ্দিন আহমদ, মোঃ নাছির হোসেন প্রমুখ।[১]

এছাড়াও অনেক কবিতা আছে 'মহিলা মহল' ও 'মুকুলের মহফিল' এ। এই দুই বিভাগে প্রকাশিত সকল কবিতা/পদ্য/ছড়ার রচয়িতাদের তালিকা প্রস্তুত এক ক্লান্তিকর কর্ম। তবে সাহিত্যিক মানের বিচারেই কবিদের তালিকায় এদের অধিকাংশ স্থান পাবার উপযুক্ত নয়। উপরের তালিকা থেকেও বুঝা যায় যাঁরা কবিতা লিখেছিলেন মোহাম্মদীতে তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন না তখনকার বাংলার প্রকৃত কবি। কবিতা অনেক অনূদিতও হয়েছে। ধর্মীয়ভাব ও রসের একজন প্রধান অনুবাদক আবদুস সাত্তার খলীল জীবরান এবং অসংখ্য আরবী কবির কবিতা অনুবাদ করে মোহাম্মদীতে প্রকাশ করেছেন।

২. খ. উপন্যাস ঃ সাতচল্লিশ-সত্তর সময়কালে প্রকাশিত মোহাম্মদীর পৃষ্ঠায় দু'চারটে অনূদিত বড় গল্প বা উপন্যাস ছাপা হলেও মৌলিক বাংলা উপন্যাসও বেশ কিছু প্রকাশিত হয়েছে। কোনো-কোনো উপন্যাস বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে ঐতিহাসিক অথবা শৈল্পিক যেকোনো কারণেই হোক—কিছুটা স্থায়ী অথবা অন্তত উচ্চমূল্য লাভ করেছে সন্দেহ নেই। আবুল মনসুর আহমদের 'আবে হায়াত' (৩৪ বর্ষ ৩য় ও তৎপরবর্তী কয়েক সংখ্যায়) ; আবু রুশদ এর 'নোঙর' (৩৬ বর্ষ ৮ম ও তৎপরবর্তী সংখ্যাগুলোতে) এবং ইব্রাহীম খাঁর 'বাতায়ন' (২৬ বর্ষ ৪র্থ ও তৎপরবর্তী কতিপয় সংখ্যায়) প্রভৃতি একালের মোহাম্মদীর পৃষ্ঠাতেই ছাপা হয়েছিল। আরও যেসকল উপন্যাস অথবা উপন্যাস-ধর্মী রচনা আলোচ্যকালের মোহাম্মদীতে ছাপা হয়েছিল—সেগুলো হলো : শওকত ওসমান—ধূলিজাল (২১ বর্ষ ১ম ও তারপর) ; আজহারুল ইসলাম — মনিরার বিরাগ (২১ বর্ষ ৭ম থেকে ক্রমশ) ; আশরাফ উজ্জামান— সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত (২২ বর্ষ ১ম থেকে ক্রমশ) ও কালোছায়া (২৬ বর্ষ ১ম থেকে ক্রমশ) ; রওশন ইজদানী—আল্লাহর অসি (২৩ বর্ষ ৩য় থেকে ক্রমশ) ; আহসান হাবীব—জাফরানী রঙ পায়রা (২৪ বর্ষ ১ম থেকে ক্রমশ) ; হামেদ আহমদ—প্রবাহ (২৫ বর্ষ ১ম থেকে

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমশ) ; আবুল কালাম শামসুদ্দীন—ঝর্ণাধারা (২৬ বর্ষ ১ম থেকে) ; সৈয়দ শাহাদাৎ হোসেন—বাঁকে বাঁকে বয়ে যায় (২৯ বর্ষ ১ম থেকে) ; এবং যতকথা যত গান (৩৩ বর্ষ ১১ থেকে) ; আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী—বান (২৯ বর্ষ ১ম থেকে); মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ—পাণ্ডুর আকাশ (৩০ বর্ষ ১ম থেকে) ; বন্দে আলী মিয়া—অরন্য গোঁধূলী (৩১ বর্ষ ৫ম থেকে) ; আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী—শেষ রজনীর চাঁদ (৩১ বর্ষ ১১ সংখ্যায়) ; জগলুল হায়দার আফরিক—হজরত মহল (৩১ বর্ষ ১২ থেকে ক্রমশ) এবং উদয় আলোর পথে (৩৬ বর্ষ ৩য় থেকে ক্রমশ) ; খোন্দকার আবদুর রহীম—পলাশ ডাঙ্গার উপকথা (৩২ বর্ষ ২য় থেকে ক্রমশ) ; আখতার-উল-আলম—তাহমিনা (৩২ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৬৮); আকান্দাস সিরাজুল ইসলাম—নীল আসমান ধূসর জমীন (৩২ বর্ষ ১১ সংখ্যায়) ; আবদুন নূর—তেতাল্লিশ সিঁড়ি (৩৩ বর্ষ ৩য় থেকে) ; শামসুল হক—মাছকন্যার মন (৩৪ বর্ষ ১১ সংখ্যায়) ; আবু যোহা নূর আহমদ—নানা মন নানা রঙ (৩৬ বর্ষ ১ম থেকে ক্রমশ) ; কাজী গোলাম আহমদ—রানী রোশন বাঈ (৩৭ বর্ষ ১ম-২য় থেকে ক্রমশ) ; জাহাঙ্গীর শাহনওয়াজ—মন-বিহঙ্গী (৩৭শ বর্ষ ৭ম থেকে ক্রমশ) ; আখতার বানু—বিভ্রান্ত বসন্ত (৩৮ বর্ষ ১০ম থেকে ক্রমশ) ; সালাহউদ্দীন চৌধুরী -অসৎ মুহূর্ত যখন (৩৯ বর্ষ ২য়-৩য় থেকে) আবদুল মজিদ ছৈয়দাবাদী—মিলনের পথে (৬৭ বর্ষ ১২ থেকে) এবং শেখ নজিবর রহমান—সোনালী আকাশ (৬৭ বর্ষ ৭ম থেকে)। তাছাড়া এলিজাবেথ পেজ এর রচনা থেকে 'মুক্তি মুখর' শিরোনামে একটি উপন্যাস অনুবাদ করেন সাহানা বেগম (২৯ বর্ষ ২য় সংখ্যার পরও চলে) ; আর স্যার ওয়াল্টার স্কট থেকে মওলা বক্স অনুবাদ করেন 'সার্জন কন্যা' (৩১ বর্ষ ৫ম থেকে)।

২. গ. **নাটক/গীতিনাট্য ঃ** মোহাম্মদীতে গীতিনাট্য খুব বেশী প্রকাশিত হয়নি। কে. এম. শমসের আলী 'গীতিনাট্য' শিরোনামে লিখেছিলেন—'গাঁয়ের পথে' (২১ বর্ষ ৩য় সংখ্যায়) চৌধুরী মোহাম্মদ গোলাম আকবর সাহিত্যভূষণ অনেকগুলো গ্রাম্য-গীতিনাট্য বা নক্শা সংগ্রহ করে মোহাম্মদীতে (৩০ বর্ষ ১, ২, ৩, ৪, ৫ সংখ্যা ও তারপর) প্রকাশ করেছিলেন। আরও কয়েকটি নকশা প্রকাশিত হয় যেমন ওসমান গনির 'তালাক' (৩৪ বর্ষ ২য় সংখ্যা) আ. ন. ম. বজলুর রশীদের কাব্যনাটিকা—'মারুই মারুর কন্যা' (৩৪ বর্ষ ৭ম সংখ্যা) এবং মালিহা কোরেশীর নকশা— 'দৈনন্দিন' (৩৪ বর্ষ ১২শ সংখ্যা)। তাছাড়া সবই একাঙ্কিকা বা 'একাঙ্ক-নাটক' অথবা সম্পূর্ণ নাটিকা বা নাটক। যাঁরা নাট্যরচনায় মোহাম্মদীতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন—তাঁরা হলেন : আবু জাফর শামসুদ্দীন— শনিগ্রহ ও পৃথিবী (২১ বর্ষ ৩ থেকে ক্রমশ) ; নেয়ামাল ওয়াকিল— স্পেন বিজয় (২২ বর্ষ ১০ সংখ্যা) ; আকবর উদ্দীন— নাদির শাহ (২৪ বর্ষ ১ম থেকে ক্রমশ) ; সিকান্দার আবু জাফর—অভিযাত্রী (২৪ বর্ষ ৪র্থ থেকে) ; জহুরুল আলম — মিসেস এম. রহমান (ছোটনাটিকা- ২৪ বর্ষ ৫ম সংখ্যা) ; আবুল কালাম শামসুদ্দীন—আশিয়ানা (২৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা)। আবদুল হক রচনা করেন একাঙ্কিকা- 'দেওয়াল' (২৫ বর্ষ ৩য় সংখ্যা) ; মুফাখ্খারুল ইসলামের একাঙ্কিগুলোর শিরোনাম যথাক্রমে 'তওবাতুন নসূহা (২৬ বর্ষ ৭ম সংখ্যা) ; 'মীর— কুলসুম' (২৯ বর্ষ ১১ সংখ্যা) ইন্টারভিউ (৩৩ বর্ষ ১১ সংখ্যা)। আশকার ইবনে শাইখ দুটি নাটিকা লিখেছিলেন —'শেষ অধ্যায়' (২৯ বর্ষ ১ম থেকে) এবং 'অনুবর্তন' (২৯ বর্ষ ৮ম সংখ্যা) শিরোনামে। চৌধুরী লুৎফর রহমানের একাঙ্কিকা—'ফুলমনি' (২৯ বর্ষ ১০ ম সংখ্যা)। মোহাম্মদ ইউসুফ 'ট্র্যাজেডী' নামেই নাটিকা লিখেছিলেন ৩০ বর্ষ ১০ম সংখ্যায়। ইজাবুদ্দিন আহমদের নাটিকার শিরোনাম 'ইনসাফ' (৩১ বর্ষ ১০ম সংখ্যা) এবং ফেরদৌসী নাজিরের নাটিকার নাম 'লজ্জার কথা' (৩১ বর্ষ ১২শ সংখ্যা)। বেগম জেবু আহমদ— 'বিজাপুর বিজয়িনী' (৩২ বর্ষ ৩য় সংখ্যায়) ; নুরুল মোমেন—'ভাই ভাই সবাই' (৩২ বর্ষ ৫ম সংখ্যায়) ; নূরউল আলম 'সম্পদ' (সম্পূর্ণ নাটক, ৩২ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায়) ; মাহমুদ হাসান— 'আকাশ-বাসর' (৩২ বর্ষ, ৭ম সংখ্যায়; ইবসেনের দি মাষ্টার বিল্ডার এর সাহায্য নিয়ে রচিত, ধারাবাহিক চলে) ; শ্রী অক্রুর চন্দ্র ধর 'ভাষা-কনফারেন্স' (নাটিকা, ৩২ বর্ষ ১০ম সংখ্যায়), খলিল চৌধুরী— অস্তরাগ (সম্পূর্ণ নাটক, ৩২ বর্ষ ১১শ সংখ্যা) ; আখতার উল আলম—'শাদী মোবারক' (সাঁত্রের অনুসরণে, ৩৩ বর্ষ ১০ম থেকে) ; এম. এ. সাত্তার— 'মাটির ডাক' (৩৮ বর্ষ ৬ষ্ঠ থেকে ক্রমশ) ; আবদুল্লাহ আল মামুন—'শপথ' (৩৯ বর্ষ ১৫শ সংখ্যায়) ; সাঈদ আহমদ 'মাইলপোষ্ট' (৬৭ বর্ষ ২য়-৪র্থ সংখ্যায়) এবং মুহম্মদ মকবুল— 'দৈঘ্য গুণণ প্রস্থ' শিরোনামে (৬৭ বর্ষ ৯ম সংখ্যায়) নাটক বা নাটিকা লিখেছিলেন। অনুবাদ বা ভাবানুসরণে রচিত নাটক-নাটিকাও বেশ কিছু মোহাম্মদীতে ছাপা হয়। এই শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যের সুবিখ্যাত লোমহর্ষক একাঙ্ক নাটক ডব্লিউ ডব্লিউ জ্যাকবস এর Monkey's pow এর অনুবাদ করেন আবদুল হক 'বানরের থাবা' শিরোনামে মোহাম্মদীর ২৩ বর্ষ ২য় সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৫৮ তে। সিকান দার আবু জাফর অনুবাদ করেন মরিস বেরিং প্রণীত 'ডিমিউনিটিভ ড্রামা' নামে ১৯১০ সনে প্রকাশিত পঁচিশটি একাঙ্ক নাটিকার নির্বাচিত সংকলন থেকে ক্যাথারিণ পার বা 'আলেকজাণ্ডারের ঘোড়া' (২৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা)। মলিয়ার এর নাটিকা 'জালিয়াৎ' এর তরজমা করেন নূরুল ইসলাম খান (৩৪ বর্ষ ৯ম সংখ্যায়)। তিনি জ্যঁা আসুআইল এর পূর্ণাঙ্গ নাটকও 'চাঁদের বলয়' নামে তরজমা করেছিলেন (৩৪ বর্ষ ১১শ সংখ্যায়)। এরস্কিন কডওয়েল এর নাটক থেকে 'একটি ছোট দিন' অনুবাদ করেছিলেন আবদুল মান্নান সৈয়দ (৩৬ বর্ষ ৩য় সংখ্যায়)। জ্যাঁপল সাঁত্রের থেকে নাট্যানুবাদ করেছিলেন জিয়া হায়দার ও আতাউর রহমান 'দ্বাররুদ্ধ' শিরোনামে (৩৯ বর্ষ ১৮শ সংখ্যা চৈত্র ১৩৭৫)। মোহাম্মদী তৎকালীন প্রধান নাট্য—রচয়িতাদের সাহিত্যকর্ম ছাপতে পেরেছিল এটা এই তালিকা থেকে অনুধাবন করা যায়।

২. ঘ. **পুস্তক-সমালোচনা ঃ** পুস্তক সমালোচনা বিভাগে আলোচিত হয়েছে অনেক বই। তবে সব সংখ্যায় পুস্তক সমালোচনা প্রকাশ করা হয়নি। সিরিয়াস সাহিত্যালোচনার মর্যাদা দেয়া যায় এরকম পুস্তক-সমালোচনা খুব কম আছে। অধিকাংশই ১০/১২/১৫ লাইনের বা এক পৃষ্ঠার মন্তব্য। বিভিন্ন সংখ্যায় আলোচ্য কয়েকটি পুস্তক সমালোচনার কথা উল্লেখ করা হলো ঃ

মতিউল ইসলাম প্রণীত 'মাটির কান্না'; আ.কা.শ নূর মোহাম্মদ প্রণীত কবিতার বই 'আজান'; সিকান্দার আবু জাফর প্রণীত উপন্যাস 'নতুন সকাল' (২১/১), নাজিরুল ইসলাম সুফিয়ান প্রণীত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস' (২১/৩), কয়েক সংখ্যার আলোচিত বই। মৌলবী আলী আহমদ প্রণীত 'বাংলা কলমী পুঁথির বিবরণ' এর আলোচনা ও বহু পত্রিকায় প্রকাশ পায়। মোহাম্মদীতে আলোচনা করেন ইবনে বতুতা। মোহাম্মদ

Dhaka University Institutional Repository

ইসহাক চাখারী প্রণীত উপন্যাস 'মায়ের কলঙ্ক' আলোচনা করেছেন-ইবনে বতুতা। 'দাঙ্গার পাঁচটি গল্প' (মুস্তফা নূরউল ইসলাম ও আলাউদ্দীন আল আজাদ সম্পাদিত) গ্রন্থের আলোচনা লিখেছিলেন আবদুল হক ২২ বর্ষ ৬ সংখ্যায়। রওশন ইজদানীর 'চিনুবিবি' এবং জসীমউদ্দীন প্রণীত-'মাটির কান্না' কাব্যগ্রন্থের আলোচনা করেছেন নূরী। কবি গোলাম মোস্তফা প্রণীত কবিতার বই 'কালাম-ই-ইকবাল' তালিম হোসেন প্রণীত কবিতার বই 'দিশারী' এবং মতিউল ইসলাম প্রণীত কবিতা—'সপ্তকন্যা'র আলোচনা করেন আবদুর রহমান ওসমানী (২৯/১), একই সংখ্যায় আবদুল্লাহ এবনে মজিদ আলোচনা করেন আ.ন.ম বজলুর রশীদ এর 'মরু-সূর্য'। আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রণীত-উপন্যাস 'খরতরঙ্গ'-র আলোচনা করেন আবদুর রহমান ওসমানী (২৯/৩)। কবি মঈনউদ্দীনের 'পালের নাও' গ্রন্থের আলোচনাও করেছিলেন আবদুর রহমান ওসমানী (২৯/৪)। রেনল্ডস থেকে নাসির আলী অনূদিত 'আকাশ যারা করলো জয়' এবং এ.কে.এম মকবুল আহমদ প্রণীত গল্প—'ধূসর মাটি নীল আকাশ' শীর্ষক গ্রন্থের আলোচনা করেন মোহাম্মদীর সম্পাদকীয় কর্মীবৃন্দ (২৯/২)। আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী পরিচয় প্রদান করেন মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ প্রণীত 'কারবালা'র। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ লিখেছেন—মিন্নাত আলী প্রণীত গল্পের বই 'মফস্বল সংবাদ' এর ওপরে। নজরুল হক লিখেছেন—আবদুস সাত্তার প্রণীত-'বৃষ্টিমুখর' কবিতার বইয়ের আলোচনা (৩০/১০)। 'নটীর প্রেম' কাজী মোহাম্মদ ইদরিস প্রণীত বইয়ের আলোচনা (৩২/২)। 'সিন্ধু নীলাবদেশে' জগলুল হায়দার আফরিক প্রণীত বই। আলোচনা করেন আজহারুল ইসলাম। 'দুই সাগরের দেশে' (ভ্রমণ কাহিনী) আনম বজলুর রশীদ প্রণীত একটি বই, আলোচনা করেন লতিফা হিলালী। মুফাখখারুল ইসলাম পুনঃ আলোচনা করেন মোঃ নাজিরুল ইসলাম সুফিয়ানের নতুন দৃষ্টিকোণে রচিত বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসগ্রন্থ— 'বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস' (৩৮/৮)। কবি মঈনউদ্দিন আলোচনা করেন কে. এম. সালাহউদ্দীন প্রণীত কবিতার বই 'এদেশ এ মাটি'।

২. ঙ. **গল্প ঃ** মোহাম্মদীতে গল্প লিখেছেন বাঙলার প্রায় তাবৎ গল্পলিখিয়েরা। তাছাড়া অনুবাদ হয়েছে অনেক—বিশ্বসাহিত্যের প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকদের রচনা থেকে। যেমন পার্লবাক, সমারসেট মম, মোপাসাঁ, কৃষণ চন্দর, এরস্কিন কডওয়েল, এলিজাবেথ পেজ, খাজা আহমদ আব্বাস, প্রেম চান্দ, মাহমুদ তৈমুর প্রমুখের অনেক গল্প অনূদিত হয়েছে। দেশের প্রখ্যাত লেখকেরা মোহাম্মদীর পৃষ্ঠাকে অবহেলা করতে পারেননি। লেখা প্রকাশের এবং লেখক খ্যাতি অর্জনের জন্য তাঁদের অবলম্বন করতে হয়েছে নিয়মিত এই মাসিকপত্রটিকে। আবদুল গনি হাজারী (কেন্দ্র বিন্দু, ২১/১); সিন্দবাদ (কবির প্রিয়া, ২১/১) ; বেগম জেবুন্নেসা (আমি এসেছি, ২২/২) ; জয়পরাজয়, ২২/৪, শুক্তি, ২৩/২) ; আবু রুশদ (মেকী সোনা, ২১/১); শোএব আহমদ (নয়ানতলীর দরিদ্র মোড়ল, ২১/৩ ; রূপী, ২১/১২); কামরুল ইসলাম (আলপিন, ২১/৩ ; এপিঠ-ওপিঠ, ২১/৫); মিন্নত আলী (সরকার বাড়ীর কাহিনী, ২১/৫ ; দূর দৃষ্টি, ২১/৬ ; দেশ, ২১/৭ ; তুফান, ২১/৯ ; মিয়াবাড়ীর কোরবানী, ২২/১ ; চাঁদ, ২৩/৫ ; মাথা, ২৬/৪ ; একটি শুভ বিবাহ, ২৬/৫) ; শামসুল হক (দ্বিতীয় পক্ষ, ২১/৫) ; মুসাফের (দুঃখে যাদের জীবন গড়া, ২১/৬ ; জয়যাত্রা, ২১/৮) ; আতোয়ার রহমান (হেথা নয়, অন্য কোথা, ২১/৬ ; কেন বোন পারুল কাঁদো, ২২/৯ ; একমাসের ব্যবসা, ২২/১২ ; নতুন পাতা, ২৪/১) ; কাজী ফজলুর রহমান (যাত্রী, ২১/৭ ; ফাঁসী, ২১/৯) ; মফিজউল হক (ক্ষয়, ২১/৮ ; রং, ২২/৫) ; আশরাফউজ্জামান (বিস্মৃতি, ২১/৭ ; গাড়ীওয়ালা, ২১/১১) ; জহুরুল ইসলাম (মিথ্যে মিথ্যে গল্প, ২১/৮) ; বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (নীল চোখ, ২১/৯ ; মনে মনে, ২২/১২ ; আরমানিটোলার মাঠে, ২৩/৬) ; আবুল কালাম শামসুদ্দীন (প্রথম হাসির ইতিকথা, ২১/৯ ; বন্যা, ২৩/৯ ; টেলিপ্রিন্টার, ২৩/১১); শাহেদ আলী (মা, ২১/১২ ; রোমের সুলতান, ২৩/৩ ; শয়তান, ২৩/১০ ; বেগম হাসমত রশীদ (তিন তসবীর, ২২/৩ ; সমতল, ২৯/২ ; প্রতিশোধ, ২৯/৭); মোজাম্মেল সিদ্দিক (সেপাই, ২২/২ ; আগুনওয়ালা, ২২/৪ ; অভিন্ন, ২৩/৬ ; অন্তস্রোত, ২৩/১১) ; আবদুল গাফফার চৌধুরী (অকৃত্রিম, ২২/৩ ; মাসকাটাল, ২২/৬ ; বৃত্ত ২২/৮ ; হিসাব, ২২/১১) ; আবু জাঁহাগীর (বালির তাপ, ২২/৪) ; অবনী নন্দী (আলেখ্য, ২২/৫ ; বিভ্রান্ত বসন্ত, ২২/৯); সন্তোষ বসাক (ঝড়ো হাওয়া ২২/৫) ; মাহবুব উল আলম (প্রমাণ সাইজ, ২২/৭ ; ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ২৩/৫) ; হাসান হাফিজুর রহমান (অস্বস্তি, ২২/৮) ; এম. এ. কবির (ভ্রষ্টলগ্ন, ২২/১০); মবিনউদ্দীন আহমদ (দুর্ঘটনা নয়, ২২/১০ ; গল্প নয়, ২২/১২ ; গদ্য কবিতা, ২৫/৩ ; কোর্টের গল্প ৩২/১১) ; হামেদ আহমদ (তিল ও তাল, ২২/১২; বিষ, ৩১/৬) ; আহমদ কবির (বিপর্যয়, ২৩/১ ; আলেখ্য, ২৩/৪ ; অপভ্রংশ, ২৪/৮) ; সৈয়দ আজিজুর রহমান (দুনির্বার, ২৩/১) ; বিশ্রাম, ২৩/৬); মাজেদা খাতুন (গায়ের মহররম, ২৩/৩) ; ছালেহা চাকলাদার (ইরাণী মেয়ে, ২৩/৫) ; আকবর উদ্দীন (সেকাল ও একাল, ২৩/৬) ; মনজুর আহসান (আমি জানি, ২৩/১১); মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (প্রতিক্রিয়া, ২৪/১) ; হাসিনা খাতুন (পাশাপাশি, ২৪/৩); জহুরুল হক (একা একা, ২৪/৪ ; ও, ২৫/১) ; আশরাফ সিদ্দিকী (পুকুরওয়ালা বাড়ী, ২৪/৬) ; আবদুল হক (অনুবাদ করেছেন গোলাম আব্বাসের গল্প— ফলক, ২৪/৮); শওকত ওসমান (দুই শরীক, ২৪/১০ ; স্কেচবুক থেকে, ৩৯/১০) ; সলিমুল হক খান মিল্কি (দিন আর রাত্রি, ২৪/১০) ; শহীদুল্লাহ সাবের (অনুবাদ করেন নিকোলাই গোগোল এর 'উন্মাদের আত্মকথা, ২৪/১১) ; মুহম্মদ মযহারুল কুদ্দুস (স্বপ্নভঙ্গ, ২৪/১১) ; মহিউদ্দিন (অমৃত কলসের গাছ, ২৪/১২) ; কালামিয়া তালুকদার, ২৪/৪ ; মসজিদ, ২৬/৫) ; জাহাঙ্গীর খালেদ (রাতের প্রহরী, ২৫/১ ; অস্বচ্ছ, ২৬/৭) ; মোহাম্মদ সিরাজুল হক (জিরাতি, ২৫/৩) ; খালেদা ফ্যান্সি খানম (অনন্যা, ২৬/১) ; আ. ন. ম বজলুর রশীদ (একটি কাহিনী, ২৬/৩ ; কাঞ্চনমালা, ২৬/৪) ; সরদার আবদুর রাজ্জাক (প্রাগৈতিহাসিক, ২৬/৩) ; এস. হাবীবুর রহমান (অভিনব তরিকা, ২৬/৩) ; সলিমুল্লাহ (নেতা, ২৬/৪) ; মোহাম্মদ আজিজুল হক (বলয়গ্রাস, ২৬/৫) ; কাজী আফসার উদ্দিন আহমদ (রাজহংসী, ২৬/৬ ; বেগমের বিদ্রোহ, ২৯/১১) ; বন্দে আলী মিয়া (অপত্য, ২৬/৬ ; দিবাস্বপ্ন, ২৯/১) ; আবুল হাসানাত (বৃন্তচ্যুত, ২৬/৬ ; শুভাশুভ, ৩১/১০) ; মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক (দুইদিক, ২৬/৭) ; মোহাম্মদ আবদুল আজিজ (ভাবী আইনজ্ঞ, ২৬/৭) ; মুযহারুল ইসলাম (ভিক্ষুক, ২৬/৭) ; আরেফিন (ইলোপ, ২৬/৭); মীর নুরুল ইসলাম (ভোর হলো, ২৯/১১) ; ভবতোষ পাল (রেনু, ২৯/১ ; ছবিঘর, ২৯/৪; রঞ্জনার মা, ৩১/৭); গজনফর আলী (সন্ধি, ২৯/১ ; কন্যা-বিধবা, ৩০/১) ; কাজী মাসুম (সাঁঝের প্রদীপ, ২৯/২) ; মাহবুবুর রহমান (শান্তি, ২৯/২) ; আবদুল ওয়াজেদ খান চৌধুরী (ধারা, ২৯/৩) ; আবু বকর সিদ্দিক (পালের নৌকা, ২৯/৩) ; অতুল রঞ্জন দে (উত্তর শিলা, ২৯/৩ ; নয়া কাসুন্দী, ২৯/৫) ; হামিদুর রহমান (বিষপাতা, ২৯/৪) ; আনোয়ারা বেগম (আলোয়ান, ২৯/৪) ; আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (স্বপ্নভঙ্গ, ২৯/৫ ; আপন-পর, ২৯/৮, কান্না, ৩১/১১) ;

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল হক (ঝরাপাতার গান, ২৯/৫) ; মোয়াজ্জেম হোসেন মোস্তফা (চিঠি, ২৯/৬) ; সত্যরঞ্জন বণিক (পাপমুক্তি, ২৯/৬) ; মাহমুদা চৌধুরী (কালো সায়র, ২৯/৬) ; ওসমান গনি (শেফালী, ২৯/৬) ; মতিন উদ্দীন আহমদ (এজমালী নাটক, ২৯/৭) ; কাজী আবুল কাসেম (চেনাসুর, ২৯/৭) ; শ্রীরাধাশ্যাম সাহা (যে মালা শুকালো, ২৯/৭) ; মফিজউদ্দিন আহমেদ (অনির্বাণ, ২৯/৭) ; হাসনাত আবদুল হাই (নায়ক, ২৯/৮) ; মুজীবুর রহমান (উত্তরাধিকার, ২৯/৮; মেঘ, ৩০/১) ; মাহমুদুল হক (শুধু মন জানে, ২৯/১১) ; মুহূর্তের নায়িকা, ৩১/২) ; শহীদ আখন্দ (অন্তরান্তর, ২৯/১১) ; মীজানুর রহমান (উত্তরণ, ২৯/১১) ; হাসিব চৌধুরী (ডায়েরীর কয়েক পাতা, ৩০/১) ; কাজী আবদুল ওয়াদুদ (পলাতক, ৩০/২) ; আবদুন নুর (নীল তনয়া, ৩০/৪ ; আবার এসো, ৩১/৩) ; গোলাম কাদির (ঠিকানা, ৩০/৪, মানুষের জন্ম, ৩০/৭) ; সামুদ্রিক, ৩১/৭) ; সৈয়দ আবদুস সুলতান (টি, হোসেন, ৩০/৫ ; সুদূরের চিঠি, ৩৯/১৬ ; শোয়ার কামরা, ৩২/৫) ; আনিসুল ইসলাম (প্রমোচন, ৩০/৭) ; নীলুদাস (রাজপুত্র আর রাজকন্যার কাহিনী, ৩০/৮) ; শ্রী সুখময় রায় (ব্যর্থ বসন্ত, ৩০/৮) ; মফিজউদ্দীন আহমদ (মেজকুরসী, ৩০/১০) ; নূরুল ইসলাম খান (দুইটি স্কেচ, ৩০/১০ ; সংযম তীর্থ, ৩০/১১ ও পরবর্তী সংখ্যায়) ; চৌধুরী আব্বাসউদ্দীন (অসম্পূর্ণ, ৩০/১১) ; আমিনুল ইসলাম (ভৌতিক, ৩০/১২) ; জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী (মেঘ ও মাটি, ৩০/১২) ; আবু জাফর শামসুদ্দীন (জমিলা, ৩১/১) ; আবদুর রব সিদ্দিক (বালুচরের ঘর, ৩১/১) ; খাজা জরুল হক (কচুরী পুকুর, ৩১/২) ; রাজিয়া বেগম (উপাধান, ৩১/২) ; আখতার উল আলম (পানিওয়ালী, ৩১/৩) ; সৈয়দ শামসুল খালেক (তৃপ্তি, ৩১/৩) ; আহমদ পারেছউদ্দীন (শাহ সাহেব, ৩১/৪); দ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (সুটকেস, ৩১/৬) ; নাজমুল আলম (দান, ৩১/৭) ; শাহাবুল আলম (গীটারের তার, ৩১/৭) ; আবদুস সাত্তার (আবার মেঘ, ৩১/৭) ; জহির রায়হান (বেড়ি, ৩১/৯ ; রাবেয়া খাতুন (প্রশ্নবোধক, ৩১/১০ ; একটি কাটার জন্য, ৩৩/২) ; তপন ভট্টাচার্য (ধুলোরঙ, ৩১/১২) ; আশীষ কুমার লোহ (হকার, ৩১/১২ ; অতীন্দ্রিয়, ৩২/৩) ; আজহারুল ইসলাম (শান্তিভঙ্গ, ৩৭/৫) ; গোলাম রহমান (ক্যাফে দ্য খোরাসানী, ৩২/১) ; খসরুজ্জামান চৌধুরী (স্বপ্ন শুধু, ৩২/১) ; মোহাম্মদ মোর্ত্তজা (জোলেখা, ৩২/১) ; সুফিয়া খানম (ঝড়, ৩২/৩) ; সরদার জয়েনউদ্দীন (প্রেমময়ী সাপ, ৩২/৪) ; মোহাম্মদ শরীফ রাজা (দুই হৃদয় এক জগত, ৩২/৫) ; দেবেন্দ্র ঈশ্বর (অচেনা, ৩২/৫) ; জলিলুর রহমান চৌধুরী (অনির্বাণ, ৩২/৭) ; বুলবুল ওসমান (খোলস, ৩২/৮) ; মোহাম্মদ সাদেক (অতৃপ্ত, ৩২/৮) ; এ. এ. ফজলুল করিম (ম্যানেজার সাহেব, ৩২/১০) ; জাকারিয়া খোন্দকার (পংকতিলক, ৩২/১০) ; জাহানারা আরজু (কছিরণ দাই, ৩৩/১) ; হাসান ফেরদৌসী (একটি গান, দুইটি সুর, ৩৩/৩); আবুল মনসুর আহমদ (এপ্রিল ফুল, ৩৩/১১) ; বাসুদেব দাস (অমোঘ, ৩৪/৫ ; কায়জু বাদাম, ৩৭/৬) ; তরুণ তালুকদার (নিস্তরঙ্গ প্রহর, ৩৬/১) ; মোনাজাতউদ্দীন (ঈদ একটি অভিশাপ, ৩৬/৪ ; কাপুরুষ, ৩৭/৫) ; মঞ্জুশ্রী চৌধুরী (অন্যপূর্বা, ৩৬/৪) ; আবু আল সাঈদ (সাইকলজিষ্ট ৩৭/৬) ; জামান মুনব (তারপর, ৩৭/৬) ; হেমায়েত হোসেন (অন্যজন, ৩৭/৬) ; রায়হান শরীফ (ওয়াশিংটনের চিঠি, ৩৭/৬) ; আবদুল হামিদ (অপমৃত্যু ৩৭/৩-৪) ; আ. শ. ম. বাবর আলী (আলোর ইশারা, ৩৭/৩-৪) ; শামসুজ্জামান (মুক্তি, ৩৭/৫) ; কাজী ইজাহারুল ইসলাম (অনেক কাছে অনেক দূরে, ৩৭/১০-১১) ; কাজী সিরাজ (উত্তর পুরুষ, ৩৭/১২, ৩৮/১) ; মুহম্মদ মতিয়ার রহমান (নীল আকাশের গান, ৩৭/১২, ৩৮/১) ; আকান্দাস সিরাজুল ইসলাম (খাপছাড়া, ৩৭/১২, ৩৮/১); ফওজিয়া খান (একটি আশার মৃত্যু, ৩৮/২-৪ ; যদি এমন না-হতো, ৩৮/৭); আল আকবর (দাম্পত্যজীবন, ৩৮/২-৪; প্রতিক্রিয়া, ৩৯/৫ ; চান্দুর বৌ শাফি, ৬৭/২-৪) ; নীলুফার হোসেন মীরা (উর্ণনাভ, ৩৮/৫; বিষ, ৩৮/৭) ; মুহম্মদ সিরাজ (একটি নিছক প্রেমের গল্প, ৩৮/৫) ; অসীম কুমার সাহা (গদাই মামার কাণ্ড, ৩৮/৫) ; ফারুক রেজা (আলোর আবর্তে অন্ধকার, ৩৮/৬) ; সালাহউদ্দীন আহমদ (শিউলীস্মৃতি, ৩৮/৬) ; এহসান চৌধুরী (দূর থেকে কাছে, ৩৮/৭) ; শেখ আবদুর রহমান (ভয়, ৩৮/৭) ; মাহমুদ মনসুর (বিক্ষুব্ধ আত্মার সংলাপ, ৩৮/৮) ; শামীম আজাদ (আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু, ৩৮/৮) ; রবিউল হাসান (মা, আমার মা, ৩৮/৮) ; মুনশী শরীফুল হক (চেনামুখের মিছিল, ৩৮/৯) ; বাদল নাগ (আত্মার নির্বাসন, ৩৮/৯) ; জি. এম. কোরায়সী (তুমিই প্রথম, ৩৮/১০) ; জামাল আহমেদ (স্মরণীয়েষু, ৩৮/১০) ; হিমাংশু কীতনীয়া (অবশেষে ব্যর্থতা, ৩৯/২-৩) ; মাহবুব আলতামাস (আনত লজ্জায় যখন দুঃখেরা সমাগত, ৩৯/৫) ; আবদুল মতিন (খদ্দের, ৩৯/৮) ; নূরুল করিম নাসিম (চকিত মৃত্যু, ৩৯/১১) ; মুহম্মদ আশরফ হোসেইন, ৩৯/১১) ; খোন্দকার নূরুল ইসলাম (বাঁশী, ৩৯/১২ ; সন্ধি, ৩৯/১৬) ; অনু ইসলাম (আমি, ৩৯/১২) ; লেহাজ উদ্দীন (নায়িকার সংলাপ, ৩৯/১৩-১৪) ; আ. খ. ম. নুরুন্নবী (ধূপছায়ার মত, ৩৯/১৩-১৪) ; মোহাম্মদ মোফসেন (বিলম্বিত বসন্তের গান, ৩৯/১৩-১৪) ; মনজুর মুরশিদ (ছায়া ঢাকা ভিলা ও শ্রাবণী, ৩৯/১৩-১৪) ;আবু মোহাম্মদ ইউনুছ (পিটুর ডায়েরী, ৩৯/১৬) ; বজলুল হক (দৃষ্টিভ্রম, ৩৯/১৬) ; গাজী ফরিদা আখতার (বেলাভূমির গান, ৩৯/১৬ ; আলোয় আলো, ৬৭/৯) ; আবদুল ওয়াহাব চৌধুরী (আগে গেলেই আগে নয়, ৩৯/১৬) ; হুমায়ুন কবীর (নায়িকা, ৩৯/৮) ; অজয় ভট্টাচার্য (অরণ্যানী, ৬৭/২)-৪) ; কাদের মাহমুদ (বেদনার এনাটোমী, ৬৭/২-৪) ; আলমগীর কবীর (ওয়াঙ ইউয়ান চিয়েন এর 'তিন চিরকুট' শীর্ষক গল্পের অনুবাদ, ৬৭/৫); শাহ আলম (পলাতক প্রার্থনা, ৬৭/৫); আবদুল হাকিম (আশা –মরীচিকা, ৬৭/৭) ; হাসিবা খাতুন (শেষ প্রান্তে, ৬৭/৭) ; আবদুল হাই (সবুজ মন, ৬৭/৭) ; শামসুজ্জামান মতীন (উপক্রত আত্মার কান্না, ৬৭/৭) ; মোঃ আনওয়ারুল ওয়াজেদ (রোজনামচা, ৬৭/৭) ; মাহমুদুল হক দুলাল (প্রেতাত্মার খোঁজে, ৬৭/৯) ; এ. কে. আবদুল মোমেন (বিভ্রাট, ৬৭/৯) ; কাজী জাহান আরা (মুখোশ, ৬৭/৯) ; নূরুল ইসলাম বরিন্দী (বৌদির মন এক যুবকের অবর্তমানে, ৬৭/৯) ; সুশীল সাহা (দুর্বোধ্য কবিতার মতো, ৬৭/৯) ; আবদুল খালেদ জামাল (জীবন কয়েকটি দীর্ঘশ্বাস, ৬৭/৯) ; বিধুভূষণ চক্রবর্তী (স্মৃতিসভা, ৬৭/৯) ; সুনীল কর্মকার (বৃত্তেফেরা, ৬৭/১০) ; শিরীন রহমান (বিষ কালো মন, ৬৭/১০) ; কবিতা দত্ত (এই তার প্রথম সন্তান, ৬৭/১২) ; অধ্যাপক এস. এম. হক (দুঃস্বপ্ন, ৬৭/১২) ; এ. বি. হান্নান (অনেক আশার অন্ধকারে, ৬৮/১) ; শেখ নজিবুর রহমান (অনুভূতি, ৬৮/১); আবদুল হামিদ (স্বপ্ন দেখে দূরে, ৬৮/১) ; সৈয়দা ফেরদৌস আরা খানম (কক্ষচ্যুত নক্ষত্র, ৬৮/১); আনছার উদ্দীন আহমদ (চতুরঙ্গ, ৬৮/৬) ; বনবিহারী বিশ্বাস (শেষলগ্ন, ৬৮/৬) ; নাজমুল আজম কোরেশী (হারিয়েছি যাকে, ৬৮/৬) ; খালেদা শিরিন রাসু (নিহত নিষাদ, ৬৮/৬) ; নাসিমুজ্জামান পান্না (হাসি, ৬৮/৭); এবং মিহির দত্ত (একটি প্রেমের মৃত্যু, ৬৮/৭) গল্প লিখেছিলেন। কবিতার প্রসঙ্গে যা বলেছিলাম, এখানেও তার পুনরুক্তি করতে হচ্ছে যে, মহিলা ও শিশুদের বিভাগে যাঁরা গল্প লিখেছিলেন, তাঁদের সকলের নাম উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, কচি-কাঁচার আসরের সমস্ত লেখাই পাকা নয়। কাঁচা লেখার তালিকা প্রস্তুতের কোনো সাহিত্যিক-শৈল্পিক সার্থকতা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

২. চ. প্রবন্ধ ঃ মোহাম্মদীতে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে অসংখ্য, তার পূর্ণাঙ্গ ফিরিস্তি প্রদান অনেকটা নিরর্থক এবং বস্তুতপক্ষে একঘেয়ে, ক্লান্তিকর। তবে মোটামুটিভাবে খুবই নিম্নমানের রচনার লেখকদের বাদ দিয়ে মোহাম্মদীতে যাঁরা প্রবন্ধ লিখেছিলেন—যাতে চিন্তা বা সমাজ-ভাবনার কিছু পরিচয় রয়েছে—সেগুলোর তালিকা উপস্থাপন করলে, মোহাম্মদীর চিন্তা ও চারিত্রের স্বরূপ স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। লেখকদের নামের সাথে লেখাগুলোর শিরোনামই নির্দেশ করে দেয় যে, বিশেষ লেখক তাঁর রচনায় কি বলতে চেয়েছেন। প্রবন্ধগুলোর স্বরূপ উপলব্ধির জন্য লেখকদের নামকে গুরুত্ব দিয়ে, বর্ণানুক্রম বজায় রেখে উপস্থাপিত করা হয়েছে যাতে, কোনো লেখক আছেন কিনা, বা লিখেছিলেন কীনা, তা জানার জন্য বর্ণের নির্দিষ্ট ভাগ লক্ষ্য করলেই জবাব পাওয়া সম্ভব হয়। অবশ্য রচনার সঙ্গে বর্ষ ও সংখ্যার উল্লেখ থাকায় রচনার বা রচয়িতার প্রবীণত্ব ও অর্বাচীনত্ব অনুধাবনে সহজ হবে। ১৩৫৬ তে ২১ বর্ষ চলছে এবং ১৩৭৭ এ ৬৮তম অর্থাৎ ৪২ বর্ষ শেষ হয়েছে। হিসেবটি মনে রাখলে সংখ্যার ক্রমিক ধরে সময় বোঝা যায়। পত্রিকার চারিত্র মোটামুটি গদ্যে ও প্রবন্ধে ব্যক্ত স্পষ্ট মতামত বা দৃষ্টি ভঙ্গির উপর নির্ভর করে। মোহাম্মদীকে উপলব্ধির জন্য তাই প্রবন্ধগুলোর বিস্তৃত বিবরণ প্রদান আবশ্যক মনে করা হয়েছে। অবশ্য 'চিন্তাধারা' বিভাগে যেসমস্ত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, তাও প্রবন্ধই। তবে 'চিন্তাধারা' বিভাগের কিছু রচনার নাম স্বতন্ত্র উল্লেখ করা হয়েছে, এই কারণে যে পত্রিকাটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ঐ বিভাগে যা প্রকাশ করেছে—তাতে কি বিষয়ে কারা বলতেন—তা জিজ্ঞাসার মধ্যে আসতে পারে। মোহাম্মদীতে লেখেন নি কে? এই প্রশ্নের জবাব খোঁজার কৌতূহল নিয়ে তালিকাটা দেখা যাক ঃ

- অমৃতলাল চক্রবর্তী — 'বান্ধব স্মৃতি (বঙ্গদর্শনযুগের সাহিত্যপত্রিকার আলোচনা/পরিচয়, ২৩/৯); কবি গোবিন্দ চন্দ্র দাস (২৪/১) ; কাজী নজরুল ইসলাম (২৪/১১) ; কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (২৫/৪) ; কবি হরিশচন্দ্র মিত্র (২৫/১১-১২) ; কবি সুলাগাইন (১৮০৬-১৮৫৬) (২৬/১) ; পূর্ব বাংলার প্রথম মাসিকপত্র (২৫/৭) ; গণচেতনার উষাকাল (২৬/২) ;
- অরবিন্দ চক্রবর্তী—কবিতা ও আর্ট (৩১/১০) ; শিল্পে বাস্তবতা (২৯/১) ;
- অক্রুর চন্দ্র ধর — পূর্ব পাকিস্তানের কথ্যভাষা (৩২/৫) ; ইংরেজী শিক্ষার কি হইবে? (৩২/৮, ১৯৬১/১৩৬৮ সনে লেখা) ;
- আবদুল্লাহ আল মুতী সরফুদ্দীন—রাডার ও বাদুড় (২১/১) ; বৈদ্যুতিক চোখ (২২/২) ;
- আব্বাস উদ্দীন আহমদ -- বাঙলার লোক-সঙ্গীত (২১/১) ; গীতিকার নজরুল (৬৭/১) ;
- আবদুল গফুর সিদ্দিকী (ডক্টর)—আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাস (২১/১) ; বিষাদ সিন্ধুর ঐতিহাসিক পটভূমি (২৩/৪ ও পরবর্তী অনেকগুলো সংখ্যায় পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়) ; শহীদ তীতুমীর (২৫/১) ; শহীদরাজ হজরত ইমাম হোসায়েন (২৯/৪) ; বঙ্গানুবাদ পন্দনামাহ্ (৩০/১০) ;
- আবুমোহা নূর আহমদ--খোলাফায়ে রাশেদীন (২১/৩ থেকে আরম্ভ করে কয়েক সংখ্যায়) ; অতীত ও বর্তমানের তুরস্ক (২২/১ থেকে আরম্ভ করে কয়েক সংখ্যায়) ; রাষ্ট্রবিপ্লবে আলেমগণ (২৩/২ থেকে আরম্ভ করে কয়েক সংখ্যায়) ; ঢাকা ও ঢাকার নবাব খান্দান (৩৭/৬ থেকে আরম্ভ করে কয়েক সংখ্যায়) ; মুসলিম জগতের মহিয়সী নারী (৩৬/৯ থেকে আরম্ভ করে কয়েক সংখ্যায়) ;
- আশরাফ সিদ্দিকী—ইসলামের তামদ্দুনিক উত্তরাধিকার (২১/৭); অজ্ঞাতনামা কবি আবদুল হেকিম চৌধুরী (২৩/১১) ; জাতীয় ফোয়ারা ও কবি মোজাম্মেল হক (২৪/৪) ; বরেন্দ্র মিউজিয়ামে ইসলামী সম্পদ (২৪/৬) ; মুন্সী মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন ও 'কৃষকবন্ধু' (২৪/১০) ; কথাসাহিত্যিক একরামুদ্দীন (২৪/১১) ; কবি আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী (২৫/১) ; মহানগরী কর্ডোভা (২৬/৬); জাতীয় রেনেসাঁ ও তরুণের কবি নজরুল (৬৮/২-৩) ;
- আশরাফউজ্জামান—সুরের কবি নজরুল (২১/৮) ; উপন্যাসসাহিত্যে দশ বছর (৩০/৯) ;
- আবুল ফারাহ মোহাম্মদ আবদুল হক- দার্শনিক ইকবাল (২১/৯) ;
- আবুল আশরাফ মোহাম্মদ আবদুস শাকুর—জসীমুদ্দীনের পল্লীকাব্য (২১/১) ;
- আবদুল ওয়াজেদ খান চৌধুরী—বৃটিশ আমলে মুসলিম সমাজ (২২/৩) ;
- আ. ন. ম. বজলুর রশীদ—জামালুদ্দীন আফগানী (২২/৫) ; আসরার ও রমুয (২২/৮) ; স্বর্ণাক্ষর (২২/১১) ; আরব ইতিহাসের পটভূমি (২৩/৩) ; অমর কবি গালিব (২৩/১২) ; সিন্ধুপাঞ্জাবের লোকগাথা (২৪/১) ; পাঞ্জাবের রুমী বুলেহ শাহ (২৪/১১) ; সিন্ধী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ (২৫/২) ; পাঞ্জাবী কাব্যের একটি ধারা (২৫/৪) ; বুলেহ শাহ (২৯/১) ;
- আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ—আলাউলের আত্মবৃত্তান্ত (২১/৮) ; (২২/১) ; (২২/৪); আলাউলের একখানি অখ্যাত গ্রন্থ (২৩/৮); রোসাঙ্গ নগরীর ভৌগলিক অবস্থান (২৪/১) ;
- আবুল খায়ের মোহাম্মদ আইউব আলী—দর্শনের ভিত্তিভূমি (২২/৫) ;
- আবদুল গাফফার চৌধুরী—মন ও চোখ (২২/৫) ; কিংবদন্তীর রাজা (৩৯/৯) ; বর্ণমালা সংস্কার না সংহার ? (৩৯/১২) ;
- আবদুল হক—মোতামের সম্মেলন (২২/৫) ; পাক মুদ্রার শ্রেষ্ঠত্ব (২২/৭) ; নূতন এশিয়া (২২/৮); আধুনিক ইংরেজী সাহিত্য (২৩/১) ; মুসলিম সমাজ কোন্ পথে? (২৩/১১) ; কবিতার ভবিষ্যত (২৪/৫) ; আত্মার অমরত্ব (২৪/১১) ;
- আকবর উদ্দীন—মধ্য প্রাচ্যের তৈল সম্পদ (২২/৬) ; মোছলেম জাহান (২২/৭) ; শহীদ লিয়াকত (২৩/১) ; চাঁদ সড়কে নজরুল (২৩/২) ;
- আবদুস সোবহান (অধ্যাপক)—জালালউদ্দীন রুমী (২২/৮) ; বিশ্বনবুয়তের পটভূমি (২২/১০) ; ইসলামের সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রতিভা (২২/১২) সেনানায়ক হজরত মুহম্মদ (২৩/৩) ;
- আহমদ শরীফ—মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ধারা (২২/১০) ; মহাকবি কায়কোবাদ (২২/১১) ; বাংলা সাহিত্যের মুসলিম ধারায় হিন্দু-প্রভাব (২৩/৩); গণসাহিত্য (২৩/৫) ; বাংলা সাহিত্যের ইসলামমুখী ধারা (২৩/১০) ; বাংলা প্রণয়োপাখ্যানের উৎস (৩২/২) ;

Dhaka University Institutional Repository

- আশরাফ ফারুকী—ইসলামে ব্যক্তিসম্পত্তি (২৩/১০) ; পূর্ব পাকিস্তানের ছোটগল্পের ধারা (৩৪/১১) ;
- আবুল কাসেম, অধ্যাপক—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিপ্লব, বিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তন (২৩/১০) ; আমাদের শিক্ষাজীবন (২৪/১১);
- আবুল কাসেম, ডাক্তার—মওলানা আকরম খাঁ (জীবনী, ৬৭/২-৪) ;
- আহসান হাবীব—মুকাদ্দামা (আবদুর রহমান ইবনে মুহম্মদ ইবনে খালদুন প্রণীত, অনুবাদ, ২৩/১২) ;
- আহমদ হাসান দানী, অধ্যাপক—বঙ্গদেশের সহিত মুসলমানদের যোগাযোগ (২৪/১) ;
- আতোয়ার রহমান—শরৎ সাহিত্যে শিশুর ভূমিকা (২৪/৪) ; পূর্ব পাকিস্তানের উপন্যাস (৩৯/১৩-১৪) ; নজরুলের ছোটগল্প (২৬/৭) ;
- আজমতউল্লাহ, অধ্যাপক—জড়বাদী দর্শন ও ইসলাম (২৫/৮) ;
- আবিদুর রহমান—নজরুল কাব্যের একটা দিক (২৬/৬) ;
- আবদুল কাদির—কায়কোবাদের গীতি কবিতা (২৬/৭) ; সাহিত্য সমালোচক মহম্মদ হবিবর রহমান (২৯/১০) ; পূর্ব পাকিস্তানী কবিতার দশ বছর (৩০/১); ছন্দোদর্শন (৩১/৪) ; আমাদের কাব্য-নাটক (৩৮/২-৪) ; শেখ সাদী (৩৯/১) ; সংগ্রামই জীবন (৩৯/১৭) ;
- আবুল হাসানাত—এক নজরে নজরুল (২৬/৭) ;
- আনিসুল ইসলাম মাহমানী—ঔপন্যাসিক আঁদ্রে জিদ (২৯/১) ;
- আবদুল্লাহ হারুন—আমাদের গ্যাস সম্পদ (২৯/১) ;
- আবদুন নূর—আটলান্টিকের সে হারানো সাম্রাজ্য (২৯/২) ;
- আবদুল মান্নান—উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও পাকিস্তান (২৯/২) ; রাগ সগীতের ক্রমবিকাশ (২৯/৪) ; আমরা ও আমাদের সংস্কৃতি (২৯/৫) ; আমরা ও আমাদের সাহিত্য (২৯/৬) ;
- আবু বকর সিদ্দিক—আদর্শবাদ ও সাহিত্য (২৯/৪) ;
- আলমগীর জলীল—জাতীয় মঙ্গল ও কবি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (২৯/১২); যে ফুল না ফুটিতে (৩০/২) ; ইসলাম-দর্শন (৩০/৩) ; 'নূর অল ইমান সমাজ' (৩০/৪) ; শোককাব্য 'ভাঙ্গাপ্রাণ' ও দাদ আলী (৩০/৫) ; বঙ্গনূর (৩০/৯) ;
- আবদুল লতিফ—গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ (২৯/১২) ;
- আলী আহম্মদ, অধ্যাপক—পুঁথি সাহিত্যের ত্রিধারা (৩০/৯) ;
- আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী—বাংলা সাহিত্যে নজরুল (৩০/৯) ;
- আবদুল গফুর, অধ্যাপক—নজরুল কাব্য প্রতিভা (৩০/১০) ;
- আকবর আলী খান—একেই কি বলে ইতিহাস? (সুলতান মাহমুদ সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগে ক্ষিপ্ত হয়ে লেখা) (৩০/১২) ;
- আখতার উল আলম—ইবনে খালদুন (৩১/৪) ; মহাকবি ইকবাল (৩২/৭) ;
- আবদুল মান্নান তালিব—ইকবালের দৃষ্টিতে আদর্শ মানব (৩১/৬) ;
- আমিনুল ইসলাম, মওলানা—ইকবালের 'মরদে মুমেন' (৩১/৮) ; কায়েদে আজম ও আল্লামা ইকবাল (৩৩/৩); স্বাধীনতা সংগ্রামে আলেম সমাজ (৬৭/৫) ;
- আবুল কালাম শামসুদ্দীন—গল্প উপন্যাসে নজরুল (৩১/৯) ; আজাদী সংগ্রামের এক অধ্যায় (৩১/১১ ও অন্যান্য সংখ্যায়) ;
- আবুল কালাম আজাদ, মওলানা—খোদার একত্ব ও ক্রমবিকাশ (অনুবাদ করেন মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন, ৩১/৯) ; ঈদুল ফেতর (৬৭/৯) ;
- আনওয়ার একবাল কোরেশী, ডাক্তার—সুদ ও এছলাম (৩১/১০) ;
- আশকার ইবনে শাইখ—নাটকের ত্রিধারা (৩১/১১) ;
- আবদুল জলীল খান—সভ্যতার মানদণ্ড ও আমাদের সভ্যতা (৩২/৩); সাহিত্যের যৌক্তিকতা (৩৩/৪) ;
- আনওয়ারুল হক—ইরাকে শিক্ষা—সংস্কার (৩২/৪) ; শিল্পী বেনটনের চিত্রে বাস্তব বাদ (৩২/৫) ;
- আবুল কালাম ইলিয়াস—মানবজীবনে কৌতুক হাস্যের প্রয়োজনীয়তা (৩২/৪) ;
- আজহারুল ইসলাম—জাতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য (৩৪/৭) ; জেহাদী মওলানা আকরম খাঁ (৬৭/৫) ;
- আবদুর রহমান খান—বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ (৩৪/৮) ;
- আবদুল মান্নান সৈয়দ—লেখার খেলা (৩৬/১) ;
- আল্লামা শিবলী নোমানী—প্রাচীন ইসলামী লাইব্রেরীর ইতিহাস (৩৭/৬) ; ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর কয়েকজন হাদীস বিশারদ ছাত্র (৬৭/২-৪) ;
- আবদুল মওদুদ—বেগম হযরত মহলের ফরমান (৩৭/১০-১১) ;
- আনিসুজ্জামান—মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের দান (৩৮/২-৪); মওলানা আকরম খাঁ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক (৩৯/৯) ;
- আমিনুল ইসলাম শারকী—আমাদের তমদ্দুন ও তার মর্মবাণী : সঙ্গীত (৩৮/২-৪) ;
- আল জাবির— বাণিয়ারের চোখে বাদশাহ ঔরঙ্গজেব (৩৮/২-৪) ; প্রৌঢ়ত্ব (৬৮/১) ;
- আ. শ. ম. বাবর আলী- রাজশাহীতে প্রচলিত প্রবাদ ও ছড়া (৩৮/১১-১২) ; মধ্যযুগীয় মুসলমান কবি ছৈয়দ ছোলতান (৩৯/৭) ; নজরুল ইসলাম ও

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্রোহী কবিতা (৬৭/২-৪); অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি সৈয়দ নূরুদ্দিন (৬৭/৯) ; বাংলাদেশ, বাঙালী সমাজ ও বাঙলাভাষার জন্মকথা (৬৮/৭) ;

- আ. ন. ম. আবদুস সোবহান—মহাকবি আলাওল (৩৮/৯) ;
- আবদুল মতিন জালালাবাদী—স্থাপত্যশিল্পে মুঘল বেগমদের দান (৩৮/৯) ;
- আকাদ্দাস সিরাজুল ইসলাম—সালিক মীর (৩৮/১০) ;
- আবুল বাসার—পাকিস্তান অর্জনের ইতিহাস (৩৮/১০) ;
- আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদ্‌ভী—ঈমান ও সৎকাজ (অনুবাদ ; গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, ৩৯/৫) ;
- আবুল ফজল—একটি নাম একটি ইতিহাস (৩৯/৯) ; নজরুল কাব্যের ভূমিকা (৩৯/১১) ;
- আবুল হাশিম— মওলানা সম্পর্কে দু'টি কথা (৩৯/৯) ;
- আবুল মনসুর আহমদ—সশ্রদ্ধ মোবারকবাদ (৩৯/৯) ;
- আওয়াল খান—সেই কালজয়ী সাংবাদিক (ম. মো. আ. খাঁ সম্পর্কে ৩৯/৯) ;
- আবদুল ওয়াহিদ, ডাক্তার—সংহতির একদিক (৩৯/১০) ;
- আতাউর রহমান—বাঙলার বাউল কবি ও দুদ্দুশাহ (৩৯/১৬) ; ধর্ম বিজ্ঞান ও যুক্তি (৬৮/১১) ;
- আবুল কাসেম ফজলুল হক—রূপান্তরের মুখে আমাদের সাহিত্য (৬৭/১) ;
- আ. ন. ম. গোলাম মোস্তফা—শহীদুল্লাহ স্মরণে (৬৭/৫) ;
- আবদুল ওহাব সিদ্দিকী—মহান স্মৃতি (আকরম খাঁর, ৬৭/৭) ;
- আলাউদ্দীন সালাবী—এহুদীদের আচরণের স্বরূপ (৬৭/৭) ;
- আবদুল হক ফারিদী— আমেরিকার শিক্ষা-ব্যবস্থা (২১/১) ; ইকবাল সাহিত্যে মানুষের মর্যাদা (২১/৭) ; জামালুদ্দীন আফগানী (২১/১১) ; শ্রমসাধ্য শিক্ষা (২১/১২) ; স্পেনের শিক্ষাব্যবস্থা (২২/৮) ;
- আবদুল মতিন সিদ্দিকী—জীবাণুদের কথা (৩৯/১৮) ;
- আবদুল কাদির খান, অধ্যাপক—ময়মনসিংহ গীতিকা : গণমুখী সাহিত্য (৬৮/৮) ;
- আবদুল মতিন খান—মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলমান (৬৭/৮) ;
- আবদুল বাসিত—সিলটী উপভাষার কয়েকটি ছড়া ও প্রবাদবাক্য (৬৭/৮) ;
- আবু আরেফ মোহাম্মদ ইসরাইল—প্যালেস্টাইনের ইহুদী (৬৭/৯) ;
- আবু রুশদ—হাবীবুল্লাহ বাহার স্মরণে (৬৭/৯) ;
- আবদুল ওয়ারেছ এছলামী, মওলানা—হজরত নিজামী গঞ্জবী (রহঃ) (৬৮/৫) ; হাকিম ছানাই (রঃ) (৩৯/৬) ;
- আবদুল কারিম খান ফারুকী, হাকিম মওলানা—সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে এছলামী দৃষ্টিভঙ্গী (৬৮/৬) ;
- ইব্রাহীম খাঁ—আমাদের সাহিত্য (২৩/৪) ; ইসলামে জীবন ও মূল্যবোধ (৩০/১০); ইসলাম ও সংস্কৃতি (৩৩/৩) ; সাহিত্যের উপেক্ষিতা (৩৬/১) ; নয়া দিগন্ত (৩৯/২-৩) ; মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (৩৯/৯) ;
- ইলতুৎমিস—অর্থনৈতিক বিকাশের পথে (৩১/১২) .
- এ. কাছেম কেশরী—রাজশাহী জেলার প্রবাদবাক্য (২১/৩) ;
- এস. এম. ছদরুদ্দীন—আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা (২১/১) ; তামুদ্দনিক সৌহার্দ্য (২২/১১) ;
- এ. এ. রেজাউল করীম—পাকিস্তানের সংস্কৃতি ও পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য (২১/৩) ;
- এস. এম. আলী হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক—পাকিস্তানের খাদ্য-সমস্যা (২১/৩) ;
- এম. আবদুল কাদের, ডক্টর—মীরনের মৃত্যু-রহস্য (২১/৫) ; ইউরোপে মোসলেম সভ্যতার প্রসার ও প্রভাব (২১/৯) ; ফ্রান্সে মোসলেম প্রভাব (২১/১২) ; সিসিলিতে মোসলেম প্রভাব (২২/১) ; ইউরোপীয় সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব (২২/২) ; ইউরোপীয় কাব্যে মুসলিম প্রভাব (২২/১১) ; ইউরোপীয় চিত্র-বিদ্যায় মুসলিম প্রভাব (২৩/২) ; ইউরোপীয় স্থাপত্যে মুসলিম প্রভাব (২৩/১১) ; জ্যোতির্বিদ্যায় মুসলিম প্রভাব (২৪/১) ; বিভিন্ন বিজ্ঞানে মুসলিম প্রভাব (২৪/৮) ; ইউরোপীয় ধাতব শিল্পে মুসলিম প্রভাব (২৪/১০); স্পেনীয় মুসলমানদের দর্শনচর্চা (২৯/৬) ; ইউরোপীয় অস্ত্র চিকিৎসায় মুসলিম প্রভাব (৩১/২) ; ক্রীটে ইসলাম (৩১/১২) ; আলবেনীয়ায় ইসলাম (৩২/২) ; বৈদেশিকের চোক্ষে হজরত মুহম্মদ (৩৯/২-৬) ;
- এ. কে. বজলুল হক—জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা (২১/৬) ; ইসলামে তামুদ্দনিক মূল্য (২২/২) ;
- এ. জেড. এম. আশরাফ ফারুকী—মহাকাব্য ও মহাকবি কায়কোবাদ (২২/১১) ;
- এম. এ. আজিজ—মরুর স্বপ্ন (লিবিয়া প্রসঙ্গে, ২৩/৩) ;
- এবনে গোলাম সামাদ—বলাকার দর্শন (রবীন্দ্রনাথের) (২৪/৬) ;
- এ এম আবদুল মান্নান ভূঞা- দার্শনিক ইকবাল (২৬/৬) ;

Dhaka University Institutional Repository

- এস. এম. ইলয়াস—বাস্তব ক্ষেত্রে কমিউনিজম (২৬/৭) ;
- এম. নুরুল মোস্তফা—মোগল দরবারে পারস্য সাহিত্য (২৯/২) ; গৃহযুদ্ধজর্জরিত ইন্দোনেশিয়া (২৯/৮) ;
- এ. টি. এম. নুরুল্লাহ—বিশ্ব সংস্কারে বিশ্বনবী (৩০/৯) ; ইসলামে রাজনীতির স্থান (৩৩/১১) ;
- এম. এ. জামান—ওহাবী আন্দোলন (৩১/২) ;
- এ. এস. এম. হাবীবুর রহমান—নজরুল কাব্যে নারী (৩১/৩) ;
- এম. ছেরাজুল হক, অধ্যক্ষ—রঙপুরের প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠকবি কাজি শাহ হায়াত মামুদ ; জীবন ও কাব্যালোচনা (৩২/১) ;
- এস. আলী মোহাম্মদ—ওমর খৈয়াম (৩২/৯) ;
- এ. কে. এম. দেলওয়ার হোসেন—আইনের শাসন ও দুর্নীতি (৩২/১০) ;
- এম. আজিজুল করিম—জারিগান—কবিগান (৩২/১০) ;
- এম. এ. কাসেম, অধ্যাপক—কৃত্রিম উপগ্রহ (৩২/১১) ;
- এ. এফ. এম. গোলাম কিবরিয়া—ধর্মের প্রয়োজন (৩৬/২) ;
- এম. এ. হাসিব—পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য ও অর্থনৈতিক সমস্যা (৩৬/৯) ; পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি পণ্যের বাজার সমস্যা (৩৭/৮-৯) ;
- এ. কে. এম. মহিউদ্দীন—বিশ্ব ফেডারেশনের পথে মানব সমাজ (৩৭/৬) ; ভারতীয় অর্থনীতির ব্যর্থতা (৩৭/৭) ;
- এ. কিউ. মোহাম্মদ আদামউদ্দীন—চলতিভাষার পুঁথি (৩৮/২-৪) ;
- এ. বি. এম. ছিদ্দিক চৌধুরী—সনদ্বীপের লোক-সাহিত্য (৩৮/১০) ;
- এনামুল হক—স্যার সৈয়দ আহমদ ও নওয়াব আবদুল লতিফ-একটি পর্যালোচনা (৩৯/৭) ;
- এ. টি. এম. রুহুল আমিন আবু—পূর্ব পাকিস্তানের লোক-সাহিত্য (৩৯/১৭) ;
- এম. আর. আখতার (মুকুল)—সংবাদপত্রে সেক্সারশীপের আদি ইতিহাস (৬৭/১) ;
- এ. এফ. এম. আবদুল জলীল—মুঘল শাসন ও বঙ্গদেশের অবস্থা (৬৭/১) ;
- এম. তোরাব আলী—নজরুল কাব্যের মূলসুর (৬৭/৮) ;
- এ. বি. এম. কামালউদ্দীন শামীম—মহাকবি কায়কোবাদ (৬৭/৮) ;
- এ. কে. এম. ফজলুর রহমান—এছলাম ও পাকিস্তান (৬৮/১) ;
- এ. কে. এম. আহমদ উল্লাহ—হজরত মুহম্মদ (দঃ) এর অর্থনৈতিক সংস্কার (৬৮/২-৩) ;
- এ. এম. হারুনর রশিদ, ডক্টর—পরিবর্তন (৬৮/২-৩) ;
- এ. কে. এম. মুজিবুল হক—আকরম খাঁ স্মরণে (৬৮/৫) ;
- ওয়াকিল আহমদ—লোক-সাহিত্যে নীলচাষ (৩৭/৩-৪) ; বাংলা লোক-সাহিত্যে বাদ্যযন্ত্র (৩৭/৭) ;
- ওবায়েদ উল হক—আমাদের স্টাণ্ডার্ড বনাম ঈমাম (৩৯/১৭) ;
- কামাল আতাউর রহমান—শিরাজী ও নজরুল (৩৯/৮) ;
- কাজী মোতাহার হোসেন—বাংলাভাষার সংস্কার (২২/৫) ;
- কাজী আফসারউদ্দীন আহমদ—ইউরোপ আমেরিকার সাহিত্যেতিহাস (২২/৮) ; সোয়াশবছর আগের ইতিকথা (২৯/৫) ;
- কাজী আবদুল মান্নান, অধ্যাপক—কায়কোবাদের গীতিকাব্য (২৩/১২) ; বাংলা মহাকাব্যে কায়কোবাদের মহাশ্মশান (২৪/৬) ; হামিদ আলীর কাসেমবধ কাব্য (৩০/২) ;
- কাজী উবায়দুল আউয়াল—ঐতিহাসিক লাহোর নগরীতে তিনদিন (৬৮/৪) ;
- কুমুদ রঞ্জন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক—পল্লীকবি জসীমউদ্দীন (২৪/৬,৭) ;
- কাজী নুরুল হক— রায়-নন্দিনী (২৪/১১) ; বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তকে ভ্রম-প্রমাদের জবাব (৩২/২) ;
- কুমুদ রঞ্জন সিংহ—শিল্পসৃষ্টি ও সৌন্দর্য বিচার (৩০/১) ;
- কাজী দীন মুহম্মদ—জ্ঞান আলোকের ঝলক (৩০/১০) ; চিঠি (রম্যরচনা, ৩৩/৭) ; মোছলেমবঙ্গের সামাজিক ইতিহাস (পুস্তক-সমালোচনা, ৩৭/৫) ; ক্রান্তিকাল (৩৮/২-৪) ; আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম (৩৯/১৬) ; মানুষ নজরুল (৬৭/১); ইকবাল কাব্যে মানবাধিকার (৬৮/৪) ;
- কাজী আমিনা বেগম—বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস (৩১/১২) ;
- কেনেথ এইচ ক্রাগেল—খ্রীস্টধর্মে ইসলামের প্রভাব (অনুবাদক : আখতার উল আলম, ধারাবাহিক চলে ৩২/৯ থেকে) ;
- কে. এম. শমসের আলী—বগুড়া জেলার প্রবাদবাক্য (৬৭/১০) ;
- খোন্দকার আবদুর রহমান—মুক্তি সংগ্রামে নজরুল কাব্যের ভূমিকা (৬৮/৬) ;
- খালেকদাদ খান—আমাদের লোকসাহিত্য (৬৮/৮) ;

Dhaka University Institutional Repository

- খোন্দকার আবদুর রহীম—ইকবাল ও নজরুল (২৬/৭) ; মুসলিম-সাহিত্যের ধারা (৩০/২)
- খুরশীদ আলম চৌধুরী, অধ্যাপক—যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আধুনিক গতিধারা (৩৮/৫) ;
- খুরশীদ আহমদ, অধ্যাপক—বায়তুল মোকাদ্দাসের পতনে খুনরাঙা আসু (অনুবাদ ঃ গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, ৩৯/২-৩) ;
- খোন্দকার তাফাজ্জাল হোসাইন, অধ্যাপক—একবাল-দর্শন : পুঁজিবাদ ও মার্কসবাদ (২৬/৪) ;
- গোলাম মহিউদ্দীন মোহাজের—বিস্মৃত ইতিহাসের এক অধ্যায় (২৩/৩) ; আল জেবির মুসলমান ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ (২৩/৯) ;
- গোপেশচন্দ্র দত্ত, অধ্যাপক—সাহিত্যের প্রকাশরূপ ও সৃষ্টিরূপ (২৬/১) ; গীতিকবিতায় হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র (৩১/৩) ;
- গোলাম মোস্তফা—ইসলামী সাহিত্য (২৯/১) ; আগামী দিনের ইতিহাস (২৯/৭) ; একটি চিঠি (৩৯/৯) ;
- গোলাম মোশতাক, (ডিপইন এড)— পাগল (৩০/২) ;
- গোলাম সাকলায়েন, অধ্যাপক—কবি নজরুল (২৯/৮) ;
- চন্দ্রকুমার, শ্রী, কাব্যস্মৃতিরত্ন—দুটি শব্দ পর্যালোচনা (৩৯/৮) ; বাংলা বানান (৩৯/১৮)
- চৌধুরী গোলাম আকবর—শিলহট (৩২/৩) ;
- চৌধুরী মোহাম্মদ রহমান—হজরত মোহাম্মদ ও বহু বিবাহ (২১/১২) ;
- ছদরুদ্দীন আহমদ—নজরুল প্রসঙ্গ (৩০/৮) ;
- জোবেদা খানম—আমার বিদেশ ভ্রমণ (২৬/৫) ; যুবসমাজ (৩২/১২) ;
- জাহেদা খানম—শরৎ সাহিত্যে প্রেমের ব্যর্থতা (৬৭/১০) ;
- জাফর আহমদ আনসারী, মওলানা—মুসলিম বিশ্বে ইহুদী চক্রান্ত (৬৭/৮) ;
- জুলফিকার আহমদ কিসমতি—মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (৩৯/১১) ;
- জাফর জাফরভ—বোখারায় ইসলামের শিলালিপি (৩৯/১) ;
- জগলুল হায়দার আফরিক—মুজাহিদ অভ্যুত্থানের পশ্চাৎভূমি (৩০/৩) ; তুর্ক-জার্মান মিশন ও উপজাতীয় এলাকা (৩০/৬) ; তাজ ও মমতাজ (৩০/৯) ; শাহ আবদুল লতিফ ভিটাঈ (৩০/১১) ; তিব্বত (৩১/১২) ;
- জবীর—এরাকে সামরিক অভ্যুত্থান (২৯/১২);
- জসীমউদ্দীন—পূর্ববঙ্গের নক্সীকাঁথা ও শাড়ী (২২/৭) ;
- জমীরউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক—মীর মোশাররফ হোসেন (২৫/৪) ; মহাকবি কায়কোবাদ (২৬/৩) ; শরৎ সাহিত্যে মুসলমান (২৯/৭) ;
- জিয়াউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক—সাহিত্য ও জাতীয়তা (৩০/১২) ;
- জাহিদুল হোসাইন—পূর্ব পাকিস্তানে পৌত্তলিক আরব (৩১/৯) ; গাজীর গান (৩২/১২) ;
- জিতেন্দ্র মোহন চৌধুরী, শ্রী—বিদ্যালয় পাঠ্য-পুস্তকে ভ্রম-প্রমাদ (৩২/১) ;
- তমিজ উদ্দিন আহমদ—রোজার ফিদইয়া (৬৮/১) ;
- তোফায়েল আহমদ—পূর্ব পাকিস্তানের কাগজশিল্পের ইতিবৃত্ত (২৫/৮) ;
- তোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী—মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (৩১/৬) ;
- দীননাথ সেন—নজরুল কাব্য-পরিচয় (২৬/৭) ;
- দুর্গাদাস শীল—বাংলাগদ্যে বিদেশীদের অবদান (৩১/১) ;
- দেওয়ান আবদুল হামিদ— মহাকবি কায়কোবাদ (২২/১১) ; মহররম শরীফের কবি কায়কোবাদ (২৩/৩) ; দার্শনিক বর্ট্র্যাণ্ড রাসেল (৬৭/১১) ; অজ্ঞাতনামা কবি আজিজ উস্ সোবহান (২৫/৫) ;
- দেওয়ান আবদুর রশীদ—অক্সিজেন (২১/৫) ;
- নাজিমউদ্দিন মানিক—বাংলাদেশে মুসলিম বসতি (৩৮/১০) ;
- নাদিম আল জিস্‌র—ধর্ম ও আমাদের শিক্ষিত যুবসমাজ (৩৭/১২, ৩৮/১) ;
- নূরুল আলম রইসী—সমস্যার ভিত্তি (৩১/৬) ;
- নূরুর রহমান—আবদুর রহমান সিদ্দিকী (৩৪/৯) ;
- নূর মোহাম্মদ আজমী—আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা (২৫/২) ; হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলন (৩০/৬); ইসলাম ও পাশ্চাত্য জগত (৩২/১১) ; ফেলিস্তিনে ইহুদী (২১/১২) ; ইসলামী-রাষ্ট্রে অমুসলমানদের অধিকার (২৫/৪) ; ইংরেজী শিক্ষার গোড়ার কথা (২২/৮) ; ইযতেহাদের আবশ্যকতা (২৬/৫) ;
- নজির আহমদ—আধুনিক দুনিয়ায় চিন্তাধারার পটভূমি (২৯/৬) ; জাতীয় জীবনে শিক্ষানীতি (২৯/২) ;
- নূরুল ইসলাম খান—ইকবাল- কাব্যে জীবনদর্শন (৩১/৩) ; সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য (৩৮/৯) ;
- নূরুদ্দিন আহমদ—'কাসিদা-ই-গাওসিয়া' (অনুবাদ, হজরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানীর ...... ৩২/৮) ;

Dhaka University Institutional Repository

- নূরুল ইসলাম —মাওলানা মোহাম্মদ অকরম খাঁ (৬৭/১০) ;
- নূরুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক—আমাদের শিক্ষা ও শিক্ষক (৬৮/২) ;
- নিজাম উদ্দিন আহমদ অধ্যাপক—বাঙ্গালার হিন্দু সমাজ ও বঙ্গ-সাহিত্যের বিবর্তনে মুসলমানদের অবদান (২৩/৬) ; প্রাচীন কবি শাহ হুসেন আলম (২৩/৯) ; বাংলায় মুসলিম প্রভাব (২৪/৯) ;
- ফরিদ উদ্দিন মাসউদ—এছলামভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা কেন? (৬৮/৬) ;
- ফজল আহমদ ছুফী মওলানা—কয়েকজন বিশিষ্ট ছাহাবী (অনুবাদ : এ.বি.এম কামাল উদ্দিন শামীম, ৬৭/১০) ;
- ফজলুল হক—মীর জুমলার আসাম বিজয়ের কাহিনী (৩৯/১২ ও পরপর কয়েক সংখ্যায়) ;
- ফারুক মাহমুদ—চাঁদ প্রজাতন্ত্র (৩৭/৬) ; ক্যামেরুন প্রজাতন্ত্র (৩৭/৭) ;
- বি. কে. মল্লিক এম. এ. বিটি—শিশুশিক্ষা ও মন্টেসরী পদ্ধতি (২৪/৯) ;
- বুজর চেঙ্গু-মেহের—তুরস্কের রাজনৈতিক বিবর্তন (২১/৭) ;
- বসুধা চক্রবর্তী—রবীন্দ্রোত্তর যুগে রবীন্দ্রনাথ (২১/১) ;
- বজলুল করিম—সভ্যতার মূলে (২৪/৩) ; বস্তুজগত ও মন (২৪/৬) ; আশাবাদ ও নিরাশাবাদ (২৪/৯) ;
- বেগম শামসুন্নাহার—পথের কথা (ভ্রমণকাহিনী, ২৪/৫ থেকে ধারাবাহিক চলে) ; ইস্তাম্বুল (২৪/৯) ;
- বার্ট্রাণ্ড রাসেল (থেকে অনুবাদ)—নৈতিক অনুশাসন (২৬/৫) ;
- বে-নজীর আহমদ—অক্রুর চন্দ্রের কাব্য-সাধনা (৩১/৭) ;
- বিশ্বেশ্বর চৌধুরী—বাঙলার বৌদ্ধসমাজ (৩৭/৬, ৭) ;
- বজলুল হক — বাংলাগদ্য গঠনে কেরী সাহেবের দান (৩৭/১২, ৩৮/১) ;
- বোরহানউদ্দিন আহমদ—পুথি সাহিত্যের ধারা (৩৮/২-৪) ;
- বেলায়েত হোসেন—মওলানা আকরম খাঁ ও বাঙ্গালী মুসলমান (৬৭/২-৪) ;
- বেলাল মোহাম্মদ —শাহ আবদুল লতিফ ভিটশাহর মাজার (৬৭/৯) ;
- বদরুদ্দিন উমর— আত্মত্যাগ ও বস্তুবাদ (২৩/১২) ;
- ভবেশ মুখোপাধ্যায়—আধুনিক ইংরেজী নাটক (২২/৭) ; রবীন্দ্র নাটক (২২/৯) ; হেনরিক ইবসেন (২৩/১) ; নাট্যকার মলিয়ের ও আধুনিক কমেডী (২৪/১০) ;
- মুহম্মদ আবদুল হাই—(এম. এন. রায়ের রচনা থেকে অনুবাদিত প্রবন্ধ) —ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা (২১/১) ; এছলামের জয় ও মীর মুশাররফ হোসেন (২৫/১০) ;
- মোহাম্মদ আবদুর রহীম—ইসলামের অর্থনৈতিক কাঠামো (২১/১) ; ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা (২২/৪ ও অন্যান্য সংখ্যায়) ; মার্কসবাদ ও ইসলাম (২৩/৪ ও অন্যান্য সংখ্যায় ধারাবাহিক) ; খিলাফতে রাশেদা (৩০/৬) ; বিজ্ঞানে মুসলিম অবদান (৩০/১০) ; পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলাম (৩০/১১) ; ইসলামী সমাজের বনিয়াদ (৩১/১১) ; শাহ অলিউল্লাহ্ দেহলভীর গ্রন্থাবলী (৩২/১১) ;
- মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, অধ্যাপক—শিশু-শিক্ষা (২১/৩) ; সাহিত্য-প্রসঙ্গ ঃ পূর্ব পাকিস্তানের ষ্টাণ্ডার্ড বাংলা (ঐ), (এই প্রবন্ধের বক্তব্যের প্রতিবাদ লেখেন মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম ২১ বর্ষ ৫ম সংখ্যায়)। 'বাংলার জন্য আরবী হরফ' শিরোনামে 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' বিভাগে আলোচনা করেন আবদুল বারী। 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' বিষয়ে বা শিরোনামে আরো অনেকে আলোচনা করেন। যেমন একজন ডক্টর মহীয়ুদ্দীন লিখেন 'অক্ষর সমস্যা' (২১/৮) ; কিন্তু এসব প্রবন্ধের বক্তব্য অস্পষ্ট। লক্ষ্যও স্থির নিশ্চিত নয়।
- মোহাম্মদ মতিয়ার রহমান—মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানসাধনার ঐতিহাসিক ভূমিকা (২১/৫) ; নজরুল-সাহিত্য প্রসঙ্গে (২১/৮) ; মসজিদের মর্মকথা ও শিল্পকলা (২১/১১) ; ইমাম গাজ্জালী (২৪/৯) ; পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ (৩৪/৮) ;
- মুহম্মদ মতিউর রহমান—পূর্ব পাকিস্তানের লোকসাহিত্য (৩১/১) ; লোকসাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা (৩১/৭) ;
- মুহম্মদ মমতাজুর রহমান তরফদার—মুসলিম কালচার বিজ্ঞানমূলক না কল্পনামূলক (২১/৫) ; ইকবাল-দর্শনের বৈশিষ্ট্য (২১/৬) ;
- মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন—বাংলা সাহিত্যের রূপ (২১/৫, ৯) ; হজরত শাহ জালাল তাব্রেজী (২৩/২) ; বাংলার লোক-সাহিত্য (২৩/৩) ; দিবানে-ই-শামসে-তাব্রিজ (৩২/১) ; ভাওইয়া চটকা ও গম্ভীরা (৩২/৫) ; লালন শাহের গান (৩২/১২) ; অন্ধকবি রুদকী (৩৮/১১-১২) ; জামালুদ্দীন আফগানী (৩৯/১৩-১৪) ; মুশতাক হোসেন (১৮৪১-১৯১৭), (৩৯/১৫) ; আমাদের লোক সংস্কৃতি (৬৮/৮) ;
- মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী—ঢাকা নগরীর গোড়ার কথা (২১/৫) ; আমাদের মুসলিম শিল্প (২৩/১) ; সুন্দরবনের প্রাচীন সভ্যতা (২৫/১) ; কাশ্মীরের রাজনীতি : অতীত ও বর্তমান (২৫/৪) ; বাকেরগঞ্জের কথা (৩০/১২) ; সুয়া আযাদের মোগলকিল্লা (৩১/১১) ; পাকিস্তানের বৃহত্তম দ্বীপ দক্ষিণ শাহবাজপুর (৩১/১২) ; বাকেরগঞ্জের আগা বাকের (৩২/১) ; বাকেরগঞ্জের ইতিহাস (৩২/২) ; সোনালীযুগের সংগ্রাম গড় (৩২/৪) ; বাকেরগঞ্জে ইসলাম (৩২/৭) ; বাংলা সাহিত্যে রামবসু— রহস্য (৩২/১০) ; নিম্নপূর্ব-পাকিস্তানের ঝড়বন্যা (৩২/১২); লাইব্রেরী আন্দোলন (৩৩/৩) ;
- মোহাম্মদ গোলাম রসুল, অধ্যাপক—ইকবাল কাব্য ও মুসলিম জাগরণ (২১/৬) ; ইসলামে রাষ্ট্রনীতি (২৩/১২) ; ইমাম গাযযালীর সুফী-দর্শন (৩৩/৩) ;

Dhaka University Institutional Repository

- মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ্ বাহার—আমাদের সাহিত্য (২১/৬) স্যার সলিমুল্লাহ (২১/১১) ; মওলানা ইসলামাবাদী (২২/৩) ; মোহাম্মদ আলী (২২/৪) ; ইত্যাদি
- মুস্তাফিজুর রহমান—শায়েরে এনকেলাব (২১/৮) ; মুসলিম তমদ্দুনের বুনিয়াদ ও ক্রমবিকাশ (২১/৯) ; পাক বাংলার বাসিন্দা (২১/১১) ; আহকাম ও আকায়াদ (২২/৩); নবুয়ত (২২/৪) ; মওলানা হযরত মোহানী (২২/১১) ; অতীত আমলের বিস্মৃত কথা (২৩/৩) ; সম্রাট আলমগীর ও শাহ আবদুর রহীম (২৩/১০) ; ফরাসী কবি আহমদুল্লাহ মুনীর (২৩/১২) ; মিয়া বশীর আহমদ প্রণীত—প্রবন্ধের অনুবাদ)— মওলানা রুমী ও ইকবাল (২৪/৩) ; ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লেকান (২৪/১০) ; মরহুম আল্লামা সোলায়মান নদভী (২৫/১) ; জর্দানের বাদশাহ্ হোসেন (২৬/৪) ; মোজাদ্দেদে আলফেসানী (২৯/৭) ; হজরত নূহ আলাইহেস সালাম (২৯/১১) ; হজরত ইদ্রিস আলাইহেস্ সালাম (৩০/১) ; হজরত হুদ আলাইহেস সালাম (৩০/৩) ; হজরত সালেহ আলাইহেস সালাম (৩০/৪) ; হজরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালাম (৩০/৫) ; সম্রাট আলমগীরের পত্র (৩১/১) ; তমদ্দুনের তাৎপর্য (৩১/১) ; শাহ অলিউল্লাহর বাণী (৩২/১২) ; রিলিজিয়ানস অব দি ওয়ার্ল্ড (৩৩/১) ;
- মিন্নত আলী—সমাজদরদী-নজরুল (২১/৮) ; ময়মনসিংহ-গীতিকা প্রসঙ্গে (২৬/৫) ;
- মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী, অধ্যাপক—পূর্বপাকিস্তানের বাংলা-সাহিত্যের ভূমিকা (২১/৮) ; 'মিহির' (২৯/৪) ;
- মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী—আন্তর্জাতিক দুনিয়া (২২/১২) ; শিক্ষায় ভাষা-সমস্যা (২৩/৫) ; চলার পথে প্রাচী (২৩/৪ থেকে ক্রমশ) ; ইসলাম চর্চা (২৩/৯) ; প্রাচ্যে-প্রতীচ্যে (২৪/৩) ; আমাদের সমাজব্যবস্থা (২৫/১০) ;
- মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন হোসেন—নব্য তুরস্কের নবপর্যায় (২২/১) ;
- মাহবুবউল আলম— মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (২২/৪) ; প্রাচীন ফতেয়াবাদ রাজ্য (৬৭/৯) ;
- মোহাম্মদ তোহা—ইসলামের জোয়ান অব আর্ক (২২/৪) ;
- মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর—আখিরি চাহার শুম্বা ও তাহার তারিখ (২২/২) ; বাংলা লেখা (২৪/৩) ; পুঁথিসাহিত্যের আদিকবি শাহ গরীবুল্লাহ (২৬/১) ; ইসলাম ও রাজনীতি (১৯৬৪ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে সর্বদলীয় উলামা কনফারেন্সে পঠিত ৩৬/১) ; মুসলিম বিজয় ও বাংলা সাহিত্য (৩৮/২-৪) ; প্রাচীন ভারতের গোবধ (৩৮/৮) ;
- মোহিয়ুদ্দিন, অধ্যাপক—আধুনিক তুরস্কের চিন্তাধারা (অনুবাদ আলবাসীর থেকে) (২২/৯) ; আধুনিক ইরানে ধর্মীয় ভাবধারা (২২/১০) ;
- মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মওলানা—আমাদের ইতিহাস (২১/৩) ; বায়তুল মাল তহবিল (২১/৯ থেকে ক্রমশ) ; এছলামের রাজ্য শাসনবিধান (২২/৩) ; মোছলেমবঙ্গের সামাজিক ইতিহাস (২৩/৫ ফাল্গুন ১৩৫৮ থেকে আরম্ভ, দুই কিস্তি প্রকাশের পর ৮ বছর বন্ধ থেকে আবার ৩২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হয়। ৩৩ ও ৩৪ বর্ষে নিয়মিত বের হয় এবং অচিরেই পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয় এবং ৩৭ বর্ষ ৫ম সংখ্যা মোহাম্মদীতে ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ ঐ পুস্তকের আলোচনা লেখেন।) ; বাগেরহাটের পুরাকীর্তি (২৩/৭) ; বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী শব্দ (২৪/১) ; ছাহাবী আবু হোরায়রা ও তাহার হাদীস বর্ণনা (৩১/১১) ; ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক প্রণীত 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' শীর্ষক বইয়ের ক্রটিনির্দেশ করে লেখেন আজাদে—"অবদান না অপদান?" মোহাম্মদী আজাদ থেকে ঐ লেখা ২৯বর্ষ ২য় সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণ করে। ৩২ বর্ষ ২য় সংখ্যা থেকে 'এছলামের আদর্শ' পুনর্মুদ্রণ করা হয়। মোহাম্মদীর ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার সম্পাদকীয় থেকে আরম্ভ করে মৌলানা আকরম খাঁর অনেক গুরুত্বপূর্ণ রচনা আলোচ্যকালে পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। তখন তিনি লিখতে পারতেন কম। পুনর্মুদ্রণের মাধ্যমে মূল মোহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার চেষ্টা হয়েছে। আকরম খাঁর একটি বিখ্যাত রচনা 'বাইবেলের যীশু খ্রীষ্ট ও কোরআনের হজরত ইছা' প্রকাশিত হয় ৩২ বর্ষ ১১ ও অপরাপর সংখ্যায়। 'এছলামের আদর্শ' ছাপা হয় ৩৮ বর্ষ ২-৪ যুগ্ম সংখ্যায়।
- মোহাম্মদ আজরফ, অধ্যাপক দেওয়ান—লিও টলষ্টয় (২২/১০) ; এ যুগের দাবী (২৪/৫) ; বুদ্ধি ও বোধি (২৪/৮) ; ইসলামী-আন্দোলনের গোড়ার কথা (২৫/৪) ; আধুনিক দর্শনে বোধির স্থান (২৬/৪) ; দর্শনের পুনর্গঠন (২৯/১১) ; আণবিক যুগে ইসলামের মূল্যমান (৩০/৪) ; কম্যুনিজম বনাম ইসলামী সমাজব্যবস্থা (৩০/৯) ; ইসলামী দর্শনে বিবর্তনবাদ (৩২/১১) ; দার্শনিক চিন্তায় আবর্তন (৩৪/২) ;
- মঈনুদ্দীন—মহাকবি কায়কোবাদ সম্পর্কে দুটি কথা (২২/১১) ; পাক-বাংলা সাহিত্যে উপমা (৩০/৬) ; মতিয়ার রহমান খাঁর রস-রচনা (৩০/১২) ; যুগসন্ধিক্ষণে শিশু সাহিত্য (৩২/৪) ;
- মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম—আজাদী সংগ্রামে বর্তমান মরক্কো (২৩/১) ;
- মুহম্মদ আবু তালিব—আমাদের দেশের কথা (২৩/১) ; মুনশী মুহম্মদ মেহেরুল্লাহ (২৩/৯) ; মুনশী খয়রাতুল্লাহ (২৩/১২) ; মহররম শরীফ ও বিষাদসিন্ধু (২৪/৪) ;
- মাহফুজুল হক (ডঃ)—রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ব্যক্তি ও সমাজ (২৩/১) ; ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সমাজ (২৫/৪) ; বাংলাভাষা ও সমস্যা (৩৯/৫);
- মুজতবা নকীযুল্লাহ — বঙ্গের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব (২৩/৩) ; সভ্যতা ও নারী (২৩/৭) ;
- মোহাম্মদ মোস্তফা আলী—যৌনজীবন, বিবাহ ও ইসলাম (২৩/৪) ; যৌনজীবন পর্দা ও ইসলাম (২৩/৭) ; অবাধ যৌনমিলন ও ইসলাম (২৩/১০) ; জন্মনিয়ন্ত্রণ কৃষি-বিজ্ঞান ও ইসলাম (২৩/১২) ; ইসলামে নারীর স্থান (২৪/৪) ;
- মোস্তফা কামাল—ধর্ম ও বিজ্ঞান (২৩/১০) ; কামাল পাশার দেশে (২৪/৩) ;
- মোহাম্মদ সিদ্দিক আলী—মহেঞ্জোদারো (২৪/১) ;
- মজহার উদ্দীন ভূঁইয়া—ইকবালের দর্শন আমল (২৪/৬) ;
- মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন পুরাতত্ত্ববিদ—মহাকবি সৈয়িদ সুলতান (২৪/৭) ;
- মুফাখ্খারুল ইসলাম—সাধক দারা শিকুর ভুল (২৪/৮) ; সেকালের বাঙলায় মুসলিমদের জ্ঞানচর্চা (২৫/২) ; ঐতিহ্যবোধের হেরফের (২৫/৪) ; শায়ের শাহ

Dhaka University Institutional Repository

গরীবুল্লাহর জীবনকাল (২৬/৩) ; শাহ গরীবুল্লাহর আরো একখানি কিতাব (৩২/৩) ; জগত ও আমাদের জীবন (৩৭/৭) ; জাতীয়তাবোধের গণ্ডী (৩৮/৬) ; ইতিহাস চেতনা (৩৮/৭) ; বাংলা সাহিত্যে মুসলমানী মেজাজ (৬৭/৮) ; রংপুরের জিহাদী ঐতিহ্য (৬৭/১৯) ; ইতিহাসচর্চা (৬৭/১২) ; তফছীর কাহিনী (৬৮/২-৩) ;

- মুহম্মদ জহুরুল ইসলাম— (অনুবাদ করেছেন মাহমুদ আল্ লাবোবিদি প্রণীত প্রবন্ধ) বিশ্বের বিবিধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও ইসলাম (২৪/১১) ;
- মোতাহের হোসেন চৌধুরী— অবসাদ (২৫/৩) ; উপভোগক্ষমতা (২৫/১১) ; পাপ স চেতনতা (২৬/৫) ;
- মোজাফফর আহমদ, অধ্যাপক—সংখ্যা বিজ্ঞানের গোড়ার কথা (২৫/৭) ; রেনেসাঁর পথে (২৯/৯) ;
- মুজীবুর রহমান খাঁ—মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (২৬/১) ; তাফছীরুল কোরআন (৩০/৮); আমাদের সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ (৩০/৯) ; আমাদের সাহিত্য (৩১/১) ; আমীর খসরু (৩১/১১) ; মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (৩২/৩) ; আমাদের ভাষাসম্পদ (৩২/৬) ; আমাদের তামদ্দুনিক দ্বন্দ্ব (৩২/১১) ; এক অনন্য সাধারণ প্রতিভা (৩৯/৯) ;
- মোহাম্মদ বজলুর রহমান—আহলে ইতিজাল ও মোতাজিলা দর্শন (২৬/২) ; এলমে তাছাউফ ও আহলে মারেফাত (২৬/২) ;
- মোহাম্মদ নূরুল আলম—জাতীয় জীবনে নজরুলের দান (২৬/২) ;
- মোহাম্মদ রেজাউর রহমান—বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে ইকবালের মতবাদ (২৬/৭) ; ভাবী নাগরিকের সমস্যা (৩১/১০) ;
- মুঈনউদ্দিন খান —মওলানা ফজলে হক খায়রাবাদী (২৯/১) ;
- মোয়াজ্জেম হোসাইন খান—অশ্রুমালা কাব্যে কায়কোবাদের জীবনদর্শন (২৯/৩) ;
- মোহাম্মদ মোশতাক—শিশুমনে হীনমন্যতা (২৯/৪) ; স্মৃতিকে বাড়ানো যায় কি ভাবে (২৯/৬) ; আত্মা ও মনের স্বরূপ (৩০/৭) ; শিশুদের অপরাধপ্রবণতা (৩১/২) ; শিশুরা বদমেজাজী হয় কেন (৩৩/১) ;
- মুযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক—পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক পটভূমিকা (২৯/১০) ;
- মওলা বক্স—ইসলামের দৃষ্টিতে জাতীয়তা (২৯/১০) ; ইসলামী চিত্রশিল্প (৩০/১) ; আধুনিক উর্দু-সাহিত্যে মুসলিম মহিলা (৩০/৭) ;
- মেজবাহ্ উদ্দীন আহমদ—স্বপ্ন ও কল্পনা (২৯/১২) ;
- মোহাম্মদ নাসির আলী—ইবনে বতুতার সফর নামা (৩০/১ থেকে ক্রমশ) ;
- মাইজুদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক—পূর্ব-পাকিস্তানের উপভাষা (৩০/২) ;
- মাহমুদ মোকাররম হোসেন, অধ্যাপক—মরহুম কাজী নওয়াজ খোদা (৩০/৬) ;
- মোহসিন আহমদ—রাজশাহীর পল্লীগীতি (৩০/১০) ;
- মীর আবুল হোসেন—সাহিত্যে অশ্লীলতা (৩০/১২) ;
- মোহাম্মদ মোর্ত্তজা, ডাক্তার—বহুবিবাহের কারণ ও বর্তমান মনোভাব (৩০/১১ থেকে ধারাবাহিক ছাপা হয়) ; আদর্শ, মানবতা ও ডাঃ জিভাগো (৩১/৯) ; পূর্ব পাকিস্তানে চিকিৎসা (৩২/৮ থেকে ধারাবাহিক চলে) ;
- মীর আলতাফ আলী—পল্লীসাহিত্যে প্রেম (৩০/১২) ;
- মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান—শিশুশিক্ষা (৩০/৬) ;
- মোহাম্মদ আবদুল আজিজ—আমাদের লোকসাহিত্যের একদিক (৩০/৭) ;
- মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ —বাংলা কাব্যের ক্রমবিকাশ (৩১/৩) ;
- মোহাম্মদ আবদুল বছির—মানবতাবোধ (৩১/৪, এবং অন্যান্য সংখ্যায়) ;
- মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাশিমপুরী—ধর্ম ও সাহিত্য (৩১/৬) ; ক্ষুধা ও খাদ্য (৩২/৯) ; ইসলামী তাহজিব তমদ্দুন ও মুসলিমসাহিত্য (৩২/১০) ; আজাদী ও মুক্তি (৩২/১১) ; পূর্ব ময়মনসিংহ ও ইহার লোকসাহিত্য (৬৮/৮) ;
- মোহাম্মদ সাখাওয়াৎ হোসেন—ধর্মের মৌলিক সভ্যতা (৩১/৭) ;
- মেদিনীকুমার চৌধুরী শ্রী—গীতায় অবতারবাদ (৩১/১২) ;
- মোহাম্মদ সৈয়দ আলী মিয়া—প্রাচীন কবি মাহমুদ লস্কর আখন্দ (৩২/৮) ;
- মুহম্মদ সিরাজুল হক—জান্নাতাবাদ ও মোয়াজ্জামাবাদ টাকশাল প্রসঙ্গে (৩২/৮) ;
- মাহমুদ লস্কর—আদর্শের সংগ্রাম (৩২/১১) ;
- মোহাম্মদ মোস্তফা আলী—স্বাধীনতা না স্ব-অধীনতা (৩৩/১১) ; সমাজকল্যাণ ও ইসলাম (৩৬/৩) ;
- মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ—আল গাযযালীর অধ্যাত্মসাধনা (৩২/১১) ; ইতিহাসের রক্ত কমল (৩৩/১) ; ইসলামী জীবনাদর্শ ও নিষ্কাম প্রতিরোধ (৩৪/১০) ;
- মাহমুদুল আমীন—কয়েকজন উসমানীয় সুলতান (৩৩/২) ;
- মোস্তফা দৌলত—সমাজতন্ত্র ও পাকিস্তান (৩৬/২) ;
- মোহাম্মদ আবদুল বারী—ঢাকায় প্রাচীন কীর্তি (৩৬/৩) ;
- মুরাদ জামান সরকার—পূর্ব পাকিস্তান রাজস্ব বিভাগ : নতুন পরিকল্পনা (৩৭/৬) ;

Dhaka University Institutional Repository

- মোস্তফা হারুন—স্থাপত্যে মোঘল নারী (৩৭/৩-৪) ; বাবরের কবর (৩৮/৬) ;
- মুহম্মদ আবদুল্লাহ, অধ্যাপক—নজরুল সাহিত্য (৩৭/৮-৯) ;
- মোহাম্মদ রফিক উল আজিজ—মুসলিম দর্শন শাস্ত্রের গোড়ার কথা (৩৮/২-৪) ;
- মোহাম্মদ মহসিন—উনিশ শতকের পুঁথি-কবি মহাম্মদ জমিল (৩৮/২-৪) ;
- মোহাম্মদ রফিকুল হক—মসজিদ স্থাপত্যের ক্রমবিকাশে এছলামী চিন্তাধারার প্রভাব (৩৮/২-৪) ;
- মোহাম্মদ মাতব্বর আলী—বিশ্বজ্ঞানের জ্যোতিকেন্দ্র বোখারা (৩৮/৮) ; সুফি কবি দান্তে (৩৮/১১-১২) ;
- মোহাম্মদ নূরউল হক—নজরুল ইসলামের কবি মানস (৩৮/৮) ;
- মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন—ইতিহাস শাস্ত্রে মুসলমানদের দান (৩৮/৮) ;
- মোহাম্মদ খালেদ ছাইফুল্লাহ ছিদ্দিকী-জগতের প্রাচীনতম গৃহ কা'বা (৩৮/৮) ; বাবা এ বাংলা (আকরম খাঁ, ৩৯/৯) আমাদের আজাদী সংগ্রাম (৩৯/১০) ; পাকিস্তান : এছলামী দর্শন ও কায়েদে আজম (৬৭/১০) ; সংগ্রামী মওলানার জীবনাদর্শ (৬৮/৫) ;
- মুহম্মদ মুজিবর রহমান, অধ্যাপক—কোরআনের ইজাব ও তার ইতিবৃত্ত (৩৮/৯ ও বেশ কয়েক সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে) ; বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা (৬৮/২-৩) ; আলোর পরশে (৬৮/৫) ;
- মোহাম্মদ আবুল খায়ের—মহাকবি ইকবাল ও ছুফীবাদ (৩৯/৬) ; জালালউদ্দীন রুমী ও সুফীবাদ (৩৯/৮) ;
- মোঃ শহীদুল আলম চৌধুরী—ইকবালের রাজনৈতিক দর্শন (৩৯/৮) ;
- মোল্লা আবদুল মালেক—স্মৃতির আলোকে (আকরম খাঁ সম্পর্কে ৩৯/১০) ;
- মুহাম্মদ আবু তালিব—ফকীর আন্দোলনের কথা (৩৯/১১) ;
- মাহমুদুর রহমান মান্না—হজরত ওমরের আমলে ব্যবসায়-বাণিজ্য (৩৯/১২) ;
- মুনীর চৌধুরী—বানান সংস্কার (৩৯/১৫) ;
- মুহম্মদ আলী আজম—বয়স্ক শিক্ষার কার্যক্রম রূপায়ণে (৩৯/১৬) এছলাম প্রচার ও সেবা (৬৮/৭) ;
- মুখলেসুর রহমান, অধ্যক্ষ—আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব (৩৯/১৭) ;
- মুহম্মদ আলী আখন্দ—ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ ও জীবনব্যবস্থা (৩৯/১৭) ;
- মুহম্মদ ইবনে দীদার—আধুনিক বাংলা কাব্য ও কবি জীবনানন্দ দাশ (৩৯/১৮) ;
- মুফতী মুহম্মদ শাফী—ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদবন্টন (অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ সেকান্দর মোমতাজী (৬৭/৫) ;
- মোহাম্মদ রিয়াউল করীম—স্বাধীনতা সংগ্রামের কয়েকটি বিস্মৃত ঘটনা (৬৭/৫) ;
- মীজানুর রহমান চৌধুরী, অধ্যাপক—নজরুল কাব্য-প্রতিভা (৬৭/৫) ;
- মনসুর শা—আল আকছার পাদমূলে (৬৭/৭) ;
- আফতাবুদ্দীন — সৈনিকের ভূমিকায় ফেরেশতা (৬৭/৭) ;
- মুহম্মদ সিকান্দার, অধ্যাপক- প্রথম কেবলা (৬৭/৭) ;
- মোন্তাছির আহমদ রহমানী—ঈদুল ফেতরের তাৎপর্য (৬৭/৯) ;
- মোহাম্মদ আজিমউদ্দীন অধ্যাপক—জাতীয় আন্দোলন ও আমাদের কবি- সাহিত্যিক (৬৭/১০) ;
- মোহাম্মদ আকীল—মজলুমের বন্ধু কবি জীবনানন্দ দাশ (৬৭/১২) ;
- মোহাম্মদ সেকান্দার মোনতাজী—লালদুটি তারা (৬৮/১) ;
- মোহাম্মদ আবদুল জব্বার চন্দনপুরী—এছলামের দৃষ্টিতে শ্রমিক ও মালিক (৬৮/৪) ;
- মোহসিন আহমদ—যুগস্রষ্টা মওলানা আকরম খাঁ (৬৮/৫) ;
- মোহাম্মদ মোকাদ্দেস হোসেন—স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের দান (৬৮/৫) ;
- মোহাম্মদ গরীবুল্লাহ মছরুর ইসলামাবাদী—আজাদী সংগ্রামের ইতিহাস (৬৮/৫) ;
- মোহাম্মদ তকী ওছমানী মওলানা—এছরায়েলী হামলা ও আরবদের পরাজয়ের মূল রহস্য (৬৮/৬) ;
- মোহাম্মদ ফজলুল হক—বয়স্ক শিক্ষা ও তার অর্থ সংগ্রহ (৬৮/৬) ;
- মঈনউদ্দীন আহমেদ চৌধুরী—সাহিত্য জগতে সৈয়দ আলী আহসান একটি প্রতিভা (৬৮/৭) ;
- মোহাম্মদ আতিকুর রহমান—আজাদী সংগ্রামের অগ্নিপুরুষ মওলানা মুহাম্মদ আলী (৬৮/৭) ;
- মোহাম্মদ আজিজুল হক খান—নজরুল প্রসঙ্গে (৬৮/৭) ;
- মোঃ ফজলুর রহমান খাঁ—সাদ জগলুল পাশা (৩১/২) ; উত্তর আফ্রিকা গ্রীক রোম ফিনিসিয় যুগ (৩২//৯ : মুসলিম আফ্রিকা (৩২/১১) ; সভ্যতার মধ্যমনি আরব (৩৩/১) ; ফিনিসিয় হরফ হইতে বাংলা অক্ষর (৩২/৬) ; বিজ্ঞান ও সভ্যতা (৩৪/৪) ; আণবিক বোমা (৩৪/৫) ;

Dhaka University Institutional Repository

- রফিকুর রহমান—ইন্দোনেশিয়ার আজাদী সংগ্রাম (২৯/৩) ;
- রশীদ আল্ ফারুকী—উর্দু-কাব্যে গযল (৩৭/১২, ৩৮/১) ;
- রথীন্দ্র কান্ত ঘটক চৌধুরী—পূর্ব বাংলায় প্রথম মাসিক পত্র, (২৫/৬) ;
- রনেশ দাশগুপ্ত—শিল্পে ও সাহিত্যে জনগণের ভূমিকা (৩৯/১২) ; আনন্দ আর সুন্দরের দুনিয়ার জন্য (৩৯/১৫) ;
- রেজাউল মোস্তফা মুহম্মদ আসফউদ্দৌলা—আলবেরুনী-বাজমী আনসারী (২৩/১২) ; মিসর (২৪/২-৬, ৭ ও অন্যান্য); পাকিস্তানে স্থাপত্যকীর্তি (২৪/৮) ; মধ্যযুগের এ্যারিস্টটল (২৪/১০) ;
- রঞ্জন কুমার দত্ত—বুনিয়াদি শিক্ষা ও প্রতিকূল আবহাওয়া (২১/৭) ;
- রাজিউদ্দীন সিদ্দিকী—শাহ আবদুল লতিফ ভিটাইয়ের সাহিত্যশৈলী (৬৭/১০) ;
- রওশন ইজদানী—ময়মনসিংহের মুর্শিদী, মারফতী ও বাউলসাহিত্য (২২/২) ; বাউল শরৎনাথ (৩১/৩) ; আমাদের পল্লীসাহিত্য (৩১/১২) ; পল্লীসাহিত্যে অবাঞ্ছনীয় মুন্সিয়ানা (৩২/৯) ; পাড়াগাঁয়ের ছড়া (৩৭/১১) ;
- লিওনিদ লিপি লিন—সমরখন্দ : উজবেকিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী (৬৭/৯) ;
- শেখ মোহাম্মদ আহমদ আজহার—সকল ভাষার মূল উৎস আরবী (৩৪/৬) ;
- শাহীন আমজাদ—একটি অনন্যসাধারণ প্রতিভা (এয়াকুব আলী চৌধুরী, ৬৮/২-৩) ;
- শাহ ছহিল উদ্দীন আহমদ—ইসলাম ও আধুনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান (৩১/৩) ; বাগদাদ ধ্বংসের পটভূমি (৩২/২) ; ইসলামের নজরে পাশ্চাত্য সভ্যতার নাম কমিউনিজম (৩২/৭) ; ইসলামের ইতিহাসে একটি জিজ্ঞাসা (৩২/৯) ; নৌশক্তি বহির্বাণিজ্য ও মুসলমান (৩৩/১) ; অর্থনীতি ও সমাজ (৩৪/২) ; ইসলামের শিক্ষণীয় ইতিহাস (৩৬/১) ; পাশ্চাত্যচিন্তাধারা ও শরীয়তের মূল্যমান (৩৪/৭) ; অর্থনীতি ও ইসলাম (৩৪/৫) ; ইত্যাদি ইত্যাদি।
- শিশির কুমার বসাক শ্রী—সাহিত্যিক ও সাংবাদিক অমর চন্দ্র দত্ত (২৩/৩) কালীপ্রসন্ন ঘোষের সঙ্গীতকাব্যে উচ্চাঙ্গের ভাবধারা (২৯/৬) ; রবীন্দ্রনাথের উপর ইংরেজ কবিদের প্রভাব (২৯/৭) ; ঢাকা নগরীর ইতিবৃত্ত (৩০/৮) ;
- শাহ আজহার আলী—সউদী আরব (২২/৩) ; ইঙ্গ-মিশরীয় সুদান (২২/৭) ; ভূগোল বিজ্ঞানে মুসলিম অবদান (২৪/৬) ; সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (২৪/৮) ;
- শামসুল হক কোরায়শী—হজরত শাহ পীর (২৯/২) ;
- শামসুল কবীর—আমার শিশুর জন্য শিক্ষক (২৯/১২) ;
- শেখ শরফুদ্দীন অধ্যক্ষ—আমাদের লিপি ভাষা ও সাহিত্যের ধারা (২১/৭) ; ইসলামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় (২২/১০) ; কবি গালিব (২৩/২) ; মুক্তিসাধনার দুর্গমপথে (২৩/৬) ; ইউরোপে আরব আধিপত্য (২৩/৯) ;
- শেখ ফজলুর রহমান—ব্রাহ্মণ্যবাদ ও ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন (৬৭/৬) ;
- শেখ আবুবকর সিদ্দিক—পল্লীসঙ্গীত (২৯/১) ; ধুয়াগান (৩১/৩) ;
- শওকত আলী—উত্তর-ভাষণ (৬৭/১) ;
- সুলতান আহমদ ভূঁইয়া—প্রাচীন পুঁথির সন্ধানে (২১/৫) ; পূর্ব-পাকিস্তানের একজন অজ্ঞাতনামা কবি (মধ্যযুগের কবি জিন্নত আলী সম্পর্কে আলোচনা, ২১/৬) ; চৌগান জেলার ইতিহাস ও পদ্মাবতী (২২/৬) ; সেকালের বাংলা গদ্য ও মুসলমান লেখক (২২/৯) ; সেখ চান্দ সমস্যা ও তাহার সমাধান (২২/১২) ; শাহ মুহম্মদ সগীর ও তাঁহার ইউসুফ জোলেখা (৩৮/৫) ; বাংলাভাষা ও প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে সুফীবাদের প্রভাব (৩৮/২-৪) ;
- সানাউল্লাহ নূরী—জীবনবাদী কবি নজরুল (২১/৮) ;
- সিরাজুল হক—কবিয়াল আকিলদ্দিন (২৬/৪) ; শিল্পী ও সাহিত্য (২৯/২) ; সৎ-সাহিত্য ও পাঠাগার (২৯/৩) ছোটগল্প-প্রসঙ্গে (৩৭/৩-৪) ;
- সিরাজুল ইসলাম—সমাজ ও বিজ্ঞান (২৩/৯) ;
- সন্তোষ বসাক—উইলিয়াম ফকনার (২২/২) ;
- শ্রী সুরেশচন্দ্র সেন—কারুশিল্পের ক্রমহ্রাস (২৩/১০) ;
- সাদত আলী আখন্দ—রাসুলুল্লাহ (২৩/১১) ; দারোগার দপ্তর (স্মৃতিকথা, ৩২/৩ ও অন্যান্য সংখ্যায়) ;
- সৈয়দ শাহাদাৎ হোসেন—ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাদর্শ (২১/১১) ; জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় শক্তির সীমানির্দেশ (২২/৬) ; ঢাকার সাম্প্রতিক চিত্রকলা (২৩/৫) ; কেনিয়ার নবজাগরণ (২৪/১) ; সমুদ্রতনয়া মালদ্বীপ (২৪/৬) ; নাইজেরিয়া- সমস্যা (২৪/৬) ; বিশ্বানুভূতি (২৪/৯) ;
- সৈয়দ আলী আহসান—সমালোচনার উদ্দেশ্য (২২/৯) ; বাংলা কবিতার আসরে ইকবাল (২২/১০) ; ঢাকা আর্ট গ্রুপের চারুকলা প্রদর্শনী (২৩/৫) ; বাংলা সাহিত্য ও ইকবাল (২৩/৬) ; বাংলা নাট্য-সাহিত্যে মুসলমান (২৩/৮) ; কবিতার কথা (২৪/৬) ; পূর্ব পাকিস্তানের বিশ বছরের কবিতা ঃ একটি দৃষ্টিপাত (৩৯/১৫) ; পদ্মাবতীর পাঠ-বিশ্লেষণ (৬৭/৫) ;
- সৈয়দ আলী আশরাফ—কাব্য-বিচার (২৬/১, ধারাবাহিক চলে দীর্ঘদিন ধরে
- সৈয়দ আমীর আলী(র অনুবাদ)—ইসলামের ইতিহাস (৩২/৬) ;
- সৈয়দ আবদুস সুলতান—গতিধর্মী নজরুল (২৬/৪) ;

Dhaka University Institutional Repository

- সৈয়দ মুর্তাজা আলী—মির্জা ইউসুফ আলী ও 'সৌভাগ্য পরশমনি' (২৯/১২) ; বাংলা দেশে ইসলাম প্রচার (৩৮/৭) ;
- সৈয়দ আফতাব হোসেন—সুফী মেহেরুল্লাহ (৩১/২) ;
- সৈয়দ রফিকুল হক—শান্তি-আন্দোলনের সূতিকাগার (৩৭/১২, ৩৮/১) ;
- সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী—ইসলামী-সংস্কৃতির মৌলিক উপাদান (তরজমা মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান (৩৪/১১) ;
- সৈয়দ মোস্তফা জামাল— মুসলিম জাগরণে মওলানা ইসলামাবাদী (৬৭/৯) ;
- সায়ীদ আহমদ ফরিদ—মানবতার সেবায় হজরত মোহাম্মদ (৬৮/৪) ;
- সিরাজুল ইসলাম কিসমতি—পাকিস্তানের আদর্শ (৩৯/৫) ;
- সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী অধ্যাপক ডক্টর—বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা (২৯/৯) ;
- সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়—ইসলামী সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র পূর্ব-পাকিস্তান (২৯/৮) ; বাংলাকাব্যে ফররুখ আহমদ (৩১/৭) ;
- সুখময় রায়—মনরাজ্য ও ডাঃ ফ্রয়েড (২৯/১১) ;
- সুনীল বরণ দে শ্রী—গোবিন্দদাশের 'কস্তরী' (৩১/১) ;
- হলিমুজ্জামান অধ্যাপক—মির্জা আবদুর রহীম (২১/৬ থেকে ধারাবাহিক কয়েক সংখ্যায় ছাপা হয়) ;
- হেদায়েতুল ইসলাম খান—ইবনে তাইমিয়া (২৪/৮) ;
- হারুনুর রশীদ—উপন্যাস সাহিত্যে নজীবুর রহমান (২৯/৬) ;
- হাবিবুল বাশার—তেসস্ক্রিয়া (২৬/১) ; পরমাণুর সৌরজগত (২৬/২) ;
- হামিদুর রহমান ডাঃ—পূর্ব-পাকিস্তানের সামুদ্রিকসম্পদ (৩০/৩) ;
- হাকিম মীর ওয়াহেদ আলী জাহাঙ্গীরনগরী—হজরত ইদ্রিস আলাইহিস সালাম ও চিকিৎসা বিজ্ঞান (৩০/৩) ;
- হান্স কন (এর প্রবন্ধ অনুবাদ করেন এম. আবদুর রহমান)—আগামী দিনে ইসলাম (৩১/১) ;
- হাকিম আবদুল মান্নান—হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (৩১/১০ ও অন্যান্য সংখ্যায়) ;
- হাসান হাফিজুর রহমান—পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য : পটভূমি : স্বতন্ত্রধারার উৎস (৩২/৭) ;
- হাবিবুর রহমান—ভল্টেয়ার (৩৪/৬) ;
- হাসান জামান—ফিরোজ শাহের আমলের বাইশদুয়ারী মসজিদ (৩৭/১২, ৩৮/১) ; সেকিউলারিজম (৬৮/৪) ;
- হুমায়ুন কবীর—পৃথিবীর অবক্ষয় ও কবি জীবনানন্দ দাশ (৬৭/১০) ;

২.ছ. 'চিন্তাধারা' ঃ এই বিভাগের রচনাগুলো চিন্তা ও বক্তব্য প্রধান। এই বিভাগে প্রকাশিত কতিপয় রচনা নিম্নরূপ ঃ

মোহাম্মদ আলী হোসেন — আধুনিক সাহিত্য-জিজ্ঞাসা (২১/১); এম. আবদুল কাদের — বিবাহ ও সভ্যতা (২১/১); সৈয়দ মান্নান বখ্স — লিবিয়ার জাতীয় আন্দোলন (২১/১); খায়রুল ফয়েজ — ইছলাম বনাম কউনিজম (২১/৩) ; হাবীবুর রহমান — শিক্ষা ও শিক্ষক (২১/৩); আমীর হোসেন আহমদ — পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত শিক্ষা (২১/৫); মরতুজা রেজা চৌধুরী — ইসলামীসংস্কৃতির স্বরূপ (২১/৫); ওবায়দুল হক — রাষ্ট্রগঠনে আমাদের নারীসমাজের দায়িত্ব (২১/৬); অধ্যাপক মোহাম্মদ গোলাম রসুল — ইসলাম ও কম্যুনিজম (২১/৭); রেজাউল হক — মুক্তির পথে নারী (২১/৭); মোসফেকা রহমান — ইসলাম ও নারী (২১/৯); অধ্যাপক এস. এম. ছদরুদ্দীন — শিশু মন ও ভীরুতা (২৩/৩); ক্রোধ ও ঈর্ষা (২৩/৪); ঘৃণা-বিদ্বেষ ও ক্ষমতাস্পৃহা (২৩/৫); মোহাম্মদ আবদুর রহীম — ইসলামী অর্থনীতির দার্শনিক বনিয়াদ (২৩/৮); সায়ীদ জামিল — আত্মত্যাগ ও বস্তুবাদ (২৩/১১); বদরুদ্দিন উমর — আত্মত্যাগ ও বস্তুবাদ (২৩/১২); এবনে গোলাম সামাদ - মানবতার স্বপক্ষে (২৪/৩); ইবনে সিনা — ইসলামী আইনের পটভূমি (২৪/৪); মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী -- আমাদের সাংস্কৃতিক সমস্যা (২৪/৯); সৈয়দ আলী আশরাফ — শিশু ও পিতামাতা (২৪/১০); মোহাম্মদ মোস্তফা আলী - বহুবিবাহের অন্তরালে (২৫/৪); নারী-পুরুষ (২৫/১০); মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল — আমাদের সাহিত্যের ধারা (২৯/৪); মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ — শিক্ষা প্রসঙ্গে (২৯/১২); নূর মোহাম্মদ আজমী — একমাত্র পথ (৩২/৫); জহির বিন কুদ্দুস — সাহিত্যসমালোচনার ধারা (৩৪/২); নুরুল ইসলাম খান — জাতীয় জীবনে গঠন (বুদ্ধিজীবী-সংস্কৃতির কথা) (৩৪/৬); কাজী আমিনা বেগম — আমাদের সাহিত্যাদর্শ (৩৪/১২); অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান — কুরআনের ইযায ও তার ইতিহাস (৬৭/৭); আবদুল মান্নান তালিব — শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন (৬৭/৭); ইত্যাদি।

৩. ভাষা ও সাহিত্য-চিন্তা ঃ ১৯৪৮ সনে ভাষা-আন্দোলন আরম্ভ হবার প্রায় দুবছরের মাথায় ১৯৪৯ সনের ডিসেম্বর মাসে মোহাম্মদী ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। কিন্তু পাকিস্তানের রাজনৈতিক-মঞ্চে মোহাম্মদীসম্পাদকের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের কারণে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাভাষা ও ভাষা-আন্দোলনের পক্ষে জোরদার সংগ্রাম করতে পারেনি। উপরন্তু মওলানা আকরম খাঁ ১৯৪৯ সনে গঠিত প্রাদেশিক সরকারের বাংলাভাষা কমিটির সভাপতি ছিলেন। ঐ কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন 'নওবাহার' পত্রিকার মালিক কবি গোলাম মোস্তফা। উক্ত কমিটির রিপোর্টে উর্দু বা রোমান হরফে তাৎক্ষণিকভাবে বাংলা লেখার কোনো সুপারিশ ছিলনা বটে, তবে অন্তত ২০ বছর পর হলেও উর্দু ভাষাকে প্রয়োজনীয়রূপে সংস্কার করে উর্দু হরফে বাংলা লেখার যে-প্রস্তাব কমিটি করেছিলেন বা করতে বাধ্য হয়েছিলেন — তার করণেই গোলাম মোস্তফার 'নওবাহার' উর্দুর পক্ষে স্পষ্ট সুপারিশ

Dhaka University Institutional Repository

করতে দ্বিধান্বিত হয়নি; এবং তাঁরা বাংলাভাষার নানান দোষ দেখতে পেয়েছিলেন। মোহাম্মদীও উর্দুর বিপক্ষে কোনো কথা বলতে পারেনি — যদিও বাংলার জন্য কিছু সুপারিশ স্বাধীনতার প্রথমদিকে কলকাতা থাকতে করেছিল। ১৯৪৭ সনের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে, ১৩৫৪ সনের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত সংখ্যার 'দফতরীর ভাষারূপে বাংলা' শীর্ষক 'আলোচনা'য় মোহাম্মদী লিখেছিল : "পশ্চিম বাংলায় সরকারী ভাষা বাংলা হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তান সরকারও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে সম্মান দান করিয়া তথাকার সাড়েচার কোটি বাংলাভাষী জনগণের প্রতি সম্মান দেখাইবেন এবং বাংলাভাষার গৌরবময় এক অধ্যায়ের সূচনা করিবেন।[২] কিন্তু পরবর্তীকালে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে এরূপ স্পষ্ট মতামত মোহাম্মদীতে পাওয়া যায়না। কমিটির সুপারিশ বা দিকনির্দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উর্দু ভাষার কিরূপ সংস্কার দরকার, বাংলা ভাষা কিজন্য সহজীকরণের দাবি রাখে এবং মুসলমানী শব্দ কতোটা কি থাকা উচিত—ইত্যাদি বিষয়ে অনেক আলোচনা, নিবন্ধ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করলেও তাতে স্থির নিশ্চিত কোনো বক্তব্য জোরালো ভাষায় প্রকাশিত হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্ত হতে হয়। আলোচনা পাঠে পাঠকের বাংলার প্রতি আকর্ষণ যেন কমে যায়। উপরন্তু অনেক আলোচনায় উর্দুর তারিফই করা হয়েছে বলে ভুল (?) করার অবকাশ থাকে।

১৯৫০ সনে, ২১ বর্ষ ১ সংখ্যায় 'উর্দুর প্রসার' শীর্ষক 'আলোচনা'য় বলা হয় ঃ "দেশ বিভাগের পরে ভারত সরকারের ও ভারতীয় হিন্দু রাজনীতিকদের প্রথম কোপদৃষ্টি পড়ে উর্দু ভাষার উপর। কারণ তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, এছলাম ধর্মের শিক্ষা এবং মোছলেম সমাজের জাতীয় সভ্যতা, তাহাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রধান বাহন হইতেছে উর্দু ভাষা। তাই, সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপকে দেশ হইতে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলার জন্য উর্দু ভাষাকে বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া আশু আবশ্যক। কিন্তু পাকিস্তানের গত তিন বৎসরের ইতিহাস বলিয়া দিতেছে যে, তাহাদের এই উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। বরং দরকারের তাকীদে, মুক্ত পরিবেষ্টনের কল্যাণে এবং হিন্দুভারতের এই আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানে উর্দু ভাষার প্রভাব ও প্রসার দিনদিনই দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। এমনকি মেছর প্রভৃতি দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠনেও, 'পাকিস্তানী মুছলমানের জাতীয় ভাষা' হিসাবে উর্দু শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা সরকারীভাবে প্রবর্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। নানা সঙ্গত ও অসঙ্গত প্রতিবন্ধক বর্তমান থাকা সত্বেও, আমাদের পূর্ব পাকিস্তানেও, উর্দুর প্রসার কিরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে, পাঠকগণের অনেকেই তাহা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। যাহারা মনে করেন যে, কোন প্রকার বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া উর্দুর অগ্রগতিকে ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব ও সঙ্গত, তাঁহারা নিজেদের মতবাদ নিয়া সন্তুষ্ট থাকুন। তাহাদের সঙ্গে কোনও বাদবিতণ্ডায় প্রবত্ত হওয়ার দরকার নাই। কিন্তু আমরা যাহারা মনে করি যে, উর্দু ভাষার প্রসারে বাঁধা দেওয়া দেশবাসীর পক্ষে সম্ভব হইবেনা এবং সঙ্গতও হইবে না, তাহাদিগকে আজ প্রশ্নটার সবদিক সম্বন্ধে ধীরস্থিরভাবে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে—এই পথের সমস্যাগুলির সমাধান নিজেরাই করিয়া লইতে হইবে।"[৩]

সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মোহাম্মদী উর্দু ব্যাকরণের মৌলিক নিয়ম ও নীতি সম্বন্ধে আলোচনা পূর্বক ভাষাকে সহজ করার সুপারিশ করেছিল, যাতে বাঙ্গালী সহজে উর্দু শিখতে পারেন। অতপর আলোচনা করা হয় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কি-পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করলে ন্যায় বিচার হবে, সে সব বিষয়ে। মোহাম্মদীর প্রবন্ধগুলোর শিরোনাম দেখে বিষয় অনুসারে ভাগকরলে দেখা যায় বাংলাসাহিত্যে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে সকলে সচেতন হয়ে নিজেদের ঐতিহ্য অনুসন্ধান করছেন এবং সেসব নিয়ে গর্ব অনুভব করা হচ্ছে, হিন্দুদের একদেশ দর্শী 'বা একচক্ষু-দৃষ্টির তীব্র সমালোচনা নিন্দা এবং প্রতিরোধ করা হয়েছে। মুসলমান লেখকদের উপর হিন্দুদের প্রভাবও আলোচ্য হয়েছে। এজাতীয় প্রবন্ধের মধ্যে আহমদ শরীফের একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা চলে। তিনি রচনাটির আরম্ভই করেছেন এভাবে এইভাষায় : "অনেকেই মনে করেন, বাংলা সাহিত্যের মুসলিম ধারায় হিন্দুয়ানীর প্রভাব এত বেশী যে, তা দিয়ে মুসলিম বাংলার গৌরব করবার কিছুই নেই, এবং ফলে এ সাহিত্য মুসলিম জাতীয় জীবনের প্রেরণার উৎসও হতে পারেনি। যাঁরা এরূপ মনে করেন, তাঁরা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান সম্বন্ধে সম্যক অবগত নন, এবং এ যুগের মুসলিম-রচিত সাহিত্য সম্বন্ধেও সজাগ নন। নতুবা এক কথায় এমন মত প্রকাশ করতে পারতেন না।" অতপর তিনি মধ্যযুগে মুসলিম রচিত সাহিত্যে হিন্দু-প্রভাবের সমাজতাত্ত্বিক কারণ নিরূপণ করে প্রবন্ধের শেষাংশে বলেন ; '.. সুতরাং আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি—ভাবসাদৃশ্য ও উদ্দেশ্যের ঐক্যই মুসলমান কবি সাধককে উপরোক্ত হিন্দুয়ানি বিষয়ের রূপকে তত্ত্বালোচনায় প্রলুব্ধ করেছে।' তিনি আরও বলেন ; 'আধুনিক যুগেও মুসলমান লেখকের রচনায় হিন্দুয়ানীর অভাব নেই ; তাও একই কারণবশত। মুসলমানরা ধর্মাদর্শে আরব্য আর তমদ্দুন-তাহজীবে আরব্যপারসিকপ্রবণ। আরবী ইরানী ও বাঙ্গালীয়াভাবের ত্রিধারার সামঞ্জস্য ঘটিয়ে চিন্তাধারার ত্রিবেণীসঙ্গত করাতে পারেনি বলেই স্বকীয় আদর্শ গড়ে ওঠেনি। ফলে তাদের মননশক্তি পঙ্গু এবং সাহিত্য সাধনা ব্যর্থ। কারণ আমাদের যা কাম্য ছিল, তা আমরা নাগালের মধ্যে পাইনি—চেয়েছিলাম আলীর জুলফিকার, পেয়েছি অর্জুনের গাণ্ডীব ; হামজার তলওয়ার চেয়েছিলাম, পেয়েছি ভীমের গদা, খালেদ, তারেক, সালেহ, মুসাকে পরিচয়ের অভাবে বরণ করতে পারিনি, ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণকে অনিচ্ছায় আদর্শ জীবের গৌরব দান করেছি। সোহরাব-রুস্তম দূরে ছিলেন, তাই রাম-লক্ষ্মণকে আপনজন মনে করেছি। কারবালার মরুপ্রান্তরের ধারণা ছিলনা, তাই কুরুক্ষেত্রকেই সমরক্ষেত্র বলে বেছে নিয়েছি, নীলফোরাতকে পাইনি, ফলে গঙ্গা যমুনাকেই আমাদের কল্পনারাজ্যে পানি যোগানোর কার্যে নিয়োগ করেছি ; জানিনা বলেই ইসলমাইলের জীবন-দান চেয়ে দধীচির আত্মত্যাগকে বড় মনে করেছি ; সীতা সাবিত্রীর সঙ্গে রোজ দেখা হয়, তাই ফাতেমা-রহিমাকে শ্রদ্ধা জানাবার সুযোগ ঘটেনি ; খেজুর গাছ, আতর, মেহেদী রং ও গোলাপের সৌন্দর্যকেও দেখিনি, তাই তালতমাল, চন্দন, আলতা ও পদ্ম আমাদের সৌন্দর্যবোধের প্রতীক হয়ে আছে। দ্রাক্ষাকুঞ্জে বসে বুলবুলের গান শুনবারই বাসনা ছিল কিন্তু সে সাধ কদমতলায় কোকিলের গানেই মিটাতে হয়েছে। এভাবে আপন ঘর ও আপজনের অভাবে নিজের চাল পরের ঘরে সিদ্ধ করে ক্ষুধা নিবৃত্ত করেছি, তাতে রসসৃষ্টি হয়েছে, পিপাসাও যে মেটেনি তাও নয়, তবে উপকৃত হইনি। সাড়া জাগায়নি সমাজ-ধর্ম-রাষ্ট্রক্ষেত্রে কোথাও। এ সাহিত্যে জাতীয় মনের প্রতিচ্ছবি পাইনি, যে অর্থে সাহিত্যকে জাতীয় জীবনের মুকুর বলা হয়, সে অর্থে এ সাহিত্য ব্যর্থ। যা হওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি. যা পেয়েছি তাতে ভাবভঙ্গী, উপমা-অলঙ্কারে হিন্দুয়ানি ঘিরে আছে—যেমন মোশাররফ হোসেন বিষাদ সিন্ধুতে হিন্দুদের দেবির ন্যায় বেহেস্ত থেকে হজরত আলীকে সপরিবারে কারবালার প্রান্তরে নামিয়েছেন, পাহাড় এনে হানিফাকে বন্দী করেছেন. কায়কোবাদ শিব-মন্দির কাব্যে প্রেতনী দেখিয়েছেন. নজরুল ইসলাম 'রক্তাম্বরধারিনী মা' ও কালো মেয়ের বন্দনা পেয়েছেন, তার দারিদ্র্য, সিন্ধু প্রভৃতি প্রায় অধিকাংশ কবিতায় হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী উপাদান বা

Dhaka University Institutional Repository

প্রেরণা জুগিয়েছে। জসীমউদ্দীন শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন, সাহাদাৎ হোসেনের কবিতায়ও লক্ষ্মী, কল্পতরু, মন্দাকীনী, সুরনটি, ত্রিদিব, দর্ব্বাসা প্রভৃতি পৌরাণিক দেব-দৈত্য-মানেসর ঠাঁই হয়েছে। এরূপে অত্যাধুনিক মুসলিম কবিগণও এ প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি' প্রমাণ—সৈয়দ আলী আহসানের 'আর যে বাঁশরী ছিল, শ্রী রাধার নয়নেতে আনিত সে ঘুম।' দোষ তাঁদের নয় শুধু, আমাদের সকলেরই আছে। ... ইসলামী আদর্শ এবং ঐতিহ্যঅজ্ঞতারই কুফল।' উপসংহারে তিনি মন্তব্য করেন ; "আমাদের বাংলা ভাষায় স্বকীয় আদর্শে সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। আদর্শ হবে কোরআনের শিক্ষা, আধার হবে মুসলমানী ঐতিহ্যানুগ, আর বিষয়বস্ত হবে ব্যক্তি বা সমাজ অথবা বৃহদর্থে জগত ও জীবন। এভাবে আমাদের জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় জীবন গড়ে উঠবে। সাম্প্রতিক সাহিত্যে তরুণ কবি ফররুখ আহমদ একান্তভাবে মুসলিম ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কাব্য সাধনা করে পথের দিশারীর গৌরব অর্জন করেছেন।"[৪]

সমকালীন পত্রপত্রিকায় ইসলামী আদর্শের বিরুদ্ধে অথবা পাকিস্তানী তমদ্দুনের বা আদর্শের বিরোধী বক্তব্য প্রকাশিত হলেই মোহাম্মদী তীব্র বেগে খপ করে ধরে সঙ্গেসঙ্গে তুলোধোণা করে ছাড়ত। যেনো কোনো অবস্থাতেই সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রের কোনো অকল্যাণ আঁতাতকারী-মোনাফেক-দেশোদ্রোহীরা করতে না- পারে। এদিক থেকে মোহাম্মদী গ্রুপের হামবড়াভাবটি মাঝেমধ্যে বড় বিরক্তির উদ্রেক করে। দিলরুবা ও সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত (১৩৫৯) ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের সাহিত্য শীর্ষক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মোহাম্মদী এর নানা বক্তব্য সমালোচনা করে লেখে : "......কাজী সাহেবের 'গবেষণা' বাঙলা সাহিত্যের হিন্দু ঐতিহাসিকদের উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণার পুণরাবৃত্তিমাত্র, সত্য উদঘাটনের চিহ্নমাত্র তাতে নাই। এ সম্পর্কে নাজিরুল ইসলাম তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাসে' বলিয়াছেন ; 'পুথি সাহিত্যের ভাষায় আজ আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করার অর্থ এই নয় যে, কেহ ইচ্ছা করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে বিকৃত করিতে চাহিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার চর্চা প্রথম কয়েক শতাব্দী আরবী-ফার্সী জানা লোকই করিয়াছেন। আর করিয়াছেন যাঁহারা ব্রাহ্মণ্যসমাজে নীচু জাতি বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাই।... ইহা আপনি আসিয়া পড়িয়াছিল এবং তখনকার দিনের স্বাভাবিক ভাষাও ছিল ইহাই। ইহাই ছিল তখনকার দিনের চলতি ভাষা। এই চলতি ভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়া সেকালের সাহিত্যিকেরা কিছুমাত্র অন্যায় করেন নাই।" এই ধরণের আলোচনার এক পর্যায়ে মোতাহার হোসেনের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মোহাম্মদী বলে : "এর মতো অসত্য উক্তি আর হইতে পারেনা। বিরোধীপক্ষের উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যা প্রচারে যাঁর বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া আছে, তিনিই মাত্র স্বজাতির এমন গ্লানি প্রচারের আস্পর্দ্ধা দেখাইতে পারেন। মোহাম্মদীতে প্রসঙ্গত আরো বলা হয় : "বর্তমানে যারা এদেশের অনুকরণ-পরায়ণ সাহিত্যিক গুষ্ঠিকে সুস্থ হইতে বলিতেছেন, এবং পাকিস্তান এদেশের চিন্তারাজ্যে যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনিয়াছে, তাহা বুঝিয়া খাঁটি পূর্ব পাকিস্তানীসাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হইতে আহবান জানাইতেছেন, কাজী সাহেব তাঁহাদিগকেও এক হাত লইয়াছেন। তিনি গম্ভীরভাবে তাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন ; আজ আমাদের মনে যে নানারকম সন্দেহ, কুটিলতা, অবিশ্বাস গ্লানি। এর প্রভাব আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনা। আশা করি, নূতন জীবনের টানে আবার আমাদের দৃষ্টিতে পরিচ্ছন্নতা এবং হৃদয়ের ঔদার্য্য ফিরে আসবে। বিশেষ করে বাংলাদেশে শতকরা ত্রিশজন অমুসলমানকে অগ্রাহ্য করে আমরা সাহিত্য বা সমাজ কিছুই পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে পারব না।"

কাজী মোতাহার হোসেনের 'উপদেশ' সম্পর্কে মোহাম্মদীর মন্তব্য : 'উপদেশটা মূল্যবান সন্দেহ নাই। কিন্তু এ উপদেশ তাঁদের জন্যই বেশী প্রয়োজনীয়, যাঁরা পাকিস্তানী আবেষ্টনে সাহিত্যের বহিরঙ্গে একটা পরিবর্তন আসিতে বাধ্য, এই সহজ কথা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, বা ইচ্ছা করিয়াই বুঝিতে চাহেন না। সাহিত্যের চিরন্তন সত্য যা, তার পরিবর্তন কেহই চায়না—চাহিতে পারেনা। কিন্তু স্থানকালপাত্র ভেদে বহিরঙ্গে পরিবর্তন আসিয়াছে—আসিতে বাধ্য। পাকিস্তানবাদ শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে নয়, চিন্তারাজ্যেও একটা পরিবর্তন। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের চেহারায় যাঁরা একটা পরিবর্তন কামনা করিতেছেন তাঁরা দুইশত বৎসরের সাহিত্যিক পরবশতা হইতে পূর্ব্বপাকিস্তানী সাহিত্যের মুক্তির কথাই বলিতেছেন। সেদিনকার সাহিত্যে অনুকরণের বাঁদরামিই বেশী চলিয়াছিল- বিশেষ করিয়া এদেশের মুসলমানদের রচিত সাহিত্যে। পরাণুকরণের এই অভিশাপ হইতে মুক্ত হইতে না-পারিলে পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্য স্বস্থ হইবেনা। এই পরানুকরণের অভিশাপ যাঁহারা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না, পিছনের হাতছানি যাঁহাদিগকে পরানুকরণের মোহগ্রস্ততা-মুক্ত হইতে দিতেছে না, তাঁহাদের মনেই 'সন্দেহ, কুটিলতা, অবিশ্বাস' বাসা বাঁধিয়াছে। ফলে চিন্তাক্ষেত্রে পাকিস্তানবাদের মর্ম্মকথা তাঁরা বুঝিতে পারিতেছেন না।"

বাঙলাদেশে শতকরা ত্রিশজন অমুসলমানকে বাদ দিয়ে সাহিত্য রচনার পরামর্শ অনৌদার্য্যের পরিচায়ক—কাজী মোতাহার হোসেনের এই বক্তব্যও মোহাম্মদী খণ্ডন করে বলেন—'ইহাও অর্থহীন। কারণ পাকিস্তানবাদী কেহ তেমন কথা বলেন না—বলিতেও পারেন না। তবে মুসলমান সাহিত্যব্রতিগণকে যদি বলা হয়, তোমাদের জীবনের কথা, সমাজের কথা, তমদ্দুনের কথা সাহিত্যে সুষ্ঠুরূপে রূপায়িত করিয়া তোলো, তাহা হইলে একথা বলা চলে না যে, ইহা অনুদার পরামর্শ দেওয়া হইল। মুসলমান সাহিত্যিকদের জন্যতো উহাই স্বাভাবিক পথ। রবীন্দ্রনাথ—শরৎচন্দ্র বাঙলার মুসলমানের জীবন আঁকেন নাই বলিয়া আমরা দুঃখ করিতে পারি, কিন্তু সাহিত্যধর্ম পালনে তাঁরা ত্রুটি করিয়াছেন, একথা বলিতে পারিনা। মুসলমান সাহিত্যিকদের পক্ষে মুসলমানদের জীবন আঁকিতে যাওয়াই স্বাভাবিক ; হিন্দুজীবন চিত্রিত করিতে গিয়া তাঁদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা 'পদে পদে রহিয়াছে। নূতন সাহিত্য ব্রতীদের পক্ষে যা সহজ, যা স্বাভাবিক, সেদিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই তো উচিত। শক্তিশালী প্রতিভার পক্ষেই মাত্র বাহিরের সমাজের সফল চিত্র আঁকা সম্ভব। তার বিরোধীতা কে করিতেছে—কে করিতে পারে? কাজেই ঔদার্যের প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে অবান্তর ও হাস্যকর।"[৫]

আবদুল গনি হাজারীর লেখা 'সাহিত্যে বিপন্নবাদ' শীর্ষক এক প্রবন্ধও অগ্রহায়ণ (১৩৫৯) এর সওগাতে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধেরও আলোচনা করে মোহাম্মদী মন্তব্য করেন ; "ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের মতো ইনিও মনে করেন, কলিকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্যধারা থেকে যাঁরা পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্যকে মুক্ত করিয়া নূতন খাতে প্রবর্তিত করার আহবাণ জানাইতেছেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। ইনি ডঃ মোতাহার হোসেনকে এক প্রশংসামূলক সার্টিফিকেটও দিয়া ফেলিয়াছেন। ডঃ মোতাহার হোসেন কৃতার্থ হইবেন আশা করি।[৬]

আবদুল গনি হাজারীর 'সাহিত্যে বিপন্নবাদ' প্রবন্ধের সমালোচনাংশটুকু মোহাম্মদীর দৃষ্টি কোণ উপলব্ধির জন্য এখানে উদ্ধৃত করা সঙ্গত।

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদীর আলোচক লিখেছেন ঃ

"প্রবন্ধের এক স্থানে লেখক বলিয়াছেন ; "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাঁচ বৎসর চলে গেছে। এর মধ্যে পুরাতন সাহিত্যিকদের অধিকাংশই সরেজমিন থেকে সরে পড়েছিলেন। কিছু সংখ্যক নূতন লেখকই বরং আমাদের গত পাঁচ বৎসরের অতঃপর সম্ভাব্য লঙ্কাকর সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব থেকে রক্ষা করেছেন। এজন্য তাঁদের আমি আজ একবার জোরগলায় অভিনন্দন জানাতে চাই। নূতন শিল্পী—সাহিত্যিক বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ক্রমেই এগিয়ে চলছেন। অসারেরা তাই এখন তর্জন গর্জন শুরু করেছেন। নূতনদের অভিসম্পাত দিচ্ছেন, তাদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসের ধোঁয়া ছড়াবার চেষ্টা করছেন। এঁরা নূতন সাহিত্যিকগণকে ঈর্ষার চোখে দেখেন এবং সেইজন্যই এই অবিশ্বাসের জন্ম। কিন্তু আজ পাঁচ বৎসর ধরে ঢাকায়, চট্টগ্রামে, কুমিল্লায়, সিলেটে যদি কেউ সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে কিছু করে থাকেন, তা নূতন শিল্পী ও সাহিত্যিকেরাই করেছেন। আমি তাঁদেরকে আন্তরিক মোবাবকবাদ জানাই।" হাজারীর এই আলোচনার জবাবে মোহাম্মদীর ব্যঙ্গাত্মক বক্তব্য : "কিছু সংখ্যক নূতন সাহিত্যিক যে সত্যিই শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, ও রওশন ইজদানীর কবিতা, শওকত ওসমানের কোনোকোনো গল্প ও নাটক সত্যই উচ্চ-প্রশংসার যোগ্য। অতি-আধুনিকদের মধ্যে আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুর রশীদ খাঁ, মজহারুল ইসলাম প্রভৃতি কবিদের অনেক রচনা আমাদের মনে সত্যই আশা জাগাইয়াছে। অতি আধুনিক প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে সুলতান আহমদ ভূঁইয়ার রচনায় সাহিত্য-সাধকের নির্ভুল ছাপ রহিয়াছে দেখিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি। কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার পর যে-রচনা আমাদিগকে সবচাইতে বেশী আনন্দ দিয়াছে ও আমাদের মনে বিপুল আশা জাগাইয়াছে, তাহা হইতেছে নাজিরুল ইসলামের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস'। এই বিরাট গবেষণামূলক গ্রন্থে তথ্যের দিক দিয়া ত্রুটি হয়ত কিছু কিছু আছে, কিন্তু ইহাতে যে দৃষ্টি কোণ দিয়া সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে, তাহা উচ্চপ্রশংসা পাইবার যোগ্য। পাকিস্তান হওয়ার পর ; পাকিস্তানের সাহিত্যে এযাবত এর চাইতে বড় সাহিত্যিক অবদান আর কিছু পাওয়া যায় নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধ লেখক ইহাদিগকে 'আন্তরিক মোবারকবাদ' জানাইয়াছেন, এরূপ কেহ মনে করিবেন না। কারণ ইহাদের অধিকাংশই চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেটের 'সাংস্কৃতিক' প্রদর্শনীর সাথে জড়িত ছিলেন না বা জড়িত হওয়া অনাবশ্যক মনে করিয়াছিলেন।"

এই আলোচনা থেকেই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় এবং বুঝা যায়, ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লায়, সিলেটে প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতিকর্মীদের দ্বারা যেসকল সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী বা সাহিত্যসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল—সেগুলোকে তাঁরা সুনজরে দেখেননি এবং তাঁরা সেসব আয়োজনকে পাকিস্তানের কল্যাণের জন্যও ভাবতে পারেননি। তাই প্রতিবাদে-প্রতিরোধে সোচ্চার হয়েছেন ঐসকল অনুষ্ঠান পণ্ড করার জন্য। অনুষ্ঠিত সম্মেলন সম্পর্কে জনমনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করার জন্য লেখনী চালনা করেছেন। উপরন্তু তাঁরা স্বাগত জানিয়েছেন পাকিস্তানপন্থী ইসলামী ভাবধারার লোকেরা যেসব উদ্যোগ নিয়েছেন সেসবকে। ১৯৫৭ সনে সিপাহীযুদ্ধের শতবার্ষিকী পালনকে পৃষ্ঠপোষকতা করে সিরাজুদ্দৌলাকে মহান করে তুলে ধরে ছিলেন ১৯৫৭ সনের কাগমারী সম্মেলনকে প্রতিরোধ করেছিলেন ১৯৫৮ সনের চট্টগ্রাম সাহিত্যসম্মেলনকে এবং ১৯৫৯ সনে আইউব খান কর্তৃক 'পাকিস্তান লেখক সংঘ' গঠিত হলে মোহাম্মদী খুব উচ্চ প্রশংসা করে উদ্যোগগুলোকে 'যথার্থ' মূল্যায়ন পূর্বক দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য যে এসব করা হয়েছে, জনগণকে তাই বুঝানো হয়েছিল।

লক্ষণীয় মোহাম্মদী ইচ্ছা করেই প্রগতিশীল ধারার লেখকদের প্রতিভা ও মেধার স্ফুরণকে অস্বীকার করে গেছে। দলীয় লোক হলেই তাকে কালজয়ী লেখক, সাহিত্যিক-প্রতিভা বলে তুলে ধরেছে। কিন্তু কালের বিচারে সেসব কোথায় মিলিয়ে গেছে। যেমন সুলতান আহমদ ভূঁইয়া ছিলেন মোহাম্মদীর দৃষ্টিতে অত্যাধুনিক প্রবন্ধলেখকদের মধ্যে 'নির্ভুল সাহিত্যসাধক।' কিন্তু বাংলাদেশের প্রবন্ধ-সাহিত্যের ইতিহাসে সুলতান আহমদ ভূঁইয়ার কোনো নামই নেই। উপরন্তু আহমদ শরীফের লেখা মোহাম্মদীতে ছাপা হলেও তাঁর প্রাবন্ধিক সত্তা বা প্রতিভার মাত্রা মোহাম্মদী উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। শামসুর রাহমান বা সাইয়িদ আতীকুল্লাহ পঞ্চাশের দশকের প্রধান কবি এবং তাঁরা বাংলাদেশের আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের পুরোধাশ্রেণীর সদস্য। অথচ এঁদের আধুনিক কবিতার আধুনিকত্ব বা মেধার কৃতিত্বও উপলব্ধি করতে মোহাম্মদী ব্যর্থ হয় এবং এদের কাব্য প্রয়াসকে গালাগালি করা হয় 'বাঁদরামী' বলে। কিন্তু ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়েছে। দুঃখের বিষয় মোহাম্মদীর মনোস্কাম সিদ্ধ হয়নি। আধুনিক চিন্তাসমৃদ্ধ সাহিত্যরচনায় বিভাগপরবর্তী কালের পূর্ববাংলার নতুন লেখকদের কৃতিত্ব অপরিসীম-একথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে পটভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। পাকিস্তানবাদী প্রতিষ্ঠিত লেখকেরা হিজরত করে এসে নতুন দেশে আখের গোছাতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা জাবর কাটছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনকালীন অথবা বিভাগপূর্ববর্তীকালীন বক্তব্যসমূহই। নতুন সৃষ্টি তাঁদের থেকে বের হচ্ছিলনা। অথচ নতুন দেশের নতুন সমাজগঠনের জন্য দরকার ছিল নতুন প্রাণ, নতুন রূপের, নতুন স্রষ্টার— আর নতুন শিল্পীর—যাঁরা প্রাণস্পন্দন ফিরিয়ে আনবেন স্থবির, হতাশাগ্রস্ত, বিধ্বস্ত, পঙ্গু, ভঙ্গুর, শোকবিধুর পূর্ববাংলার সমাজদেহে। সৃষ্টি করবেন নতুন রক্ত-সঞ্চালন প্রক্রিয়া। এই 'নতুন প্রাণ' সৃষ্টিতে সক্ষম শিল্পী সাহিত্যিক কবিদের নিতান্তই অভাব যেক্ষেত্রে—সেখানে পূর্ববাংলার পঞ্চাশ দশকের তরুণ লেখকসাহিত্যিক-সংস্কৃতিকর্মীরাই ছিলেন অন্ধের হাতের যষ্ঠী। কিন্তু মোহাম্মদীর বিবেচনায় এঁদের সৃষ্টি হলো বাঁদরের বাঁদরামী আর কলকাতার বস্তাপচা সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণ। হয়তো নবীন এই সাহিত্যশিল্পী সংস্কৃতিকর্মীদের কাজে কর্মেমেধায় প্রতিভার অনন্যসাধারনত্ব তেমন ফুটে ওঠেনি,— হয়তো অনুকরণের বা প্রতিভাধরের প্রভাব কাটিয়ে স্বকীয়তা অর্জনে তাঁরা সক্ষম হননি তখনও—কিন্তু মেধার বা প্রতিভার 'স্পুরণ যে কিছু না কিছু ঘটছিল—তা ধরতে মোহাম্মদী ব্যর্থ হয়েছে এবং নতুনদের স্বাগত জানাবার ঔদার্য তাঁদের মধ্যে সৃষ্টি হয়নি। বরঞ্চ নবীনত্ব, আধুনিকত্ব ইত্যাদিকে কটাক্ষ করতে পারলেই যেনো মোহাম্মদীর সমালোচকেরা আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন। শামসুর রাহমান (১৯২৯) ও সাইয়িদ আতীকুল্লাহর (১৯৩৩) ন্যায় তরুণ লেখকদেরকে আবদুল গনি হজারী (১৯২৫-১৯৭৬) মোবারকবাদ জানিয়েছিলেন ১৯৫২ সনে পূর্ব পাকিস্তানের নতুনসাহিত্যে বলিষ্ঠ পদভরে আবির্ভূত হবার কারণে। পক্ষান্তরে মোহাম্মদী বেছে বেছে ১৯৫২ সনে শামসুর রাহমানের মেফিস্টোফিলিসের প্রতি ফাউস্ট' ও আতীকুল্লাহর 'তিমির বিদার' শীর্ষক কবিতার চরণ উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেন যে ; "পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্যক্ষেত্রে 'বলিষ্ঠ পদক্ষেপে'ই বটে। কলিকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্যের বস্তাপচা চুরিকরা মাল লইয়াই অবশেষে আমাদিগকে গৌরব করিতে হইবে! বর্তমানে

Dhaka University Institutional Repository

কলিকাতায়ও এসব মাল আঁস্তাকুড়ের আবর্জনায় বিসর্জিত হইয়াছে ও হইতেছে। কবে ইহারা বুঝিবেন যে, চুরি করিয়া বা অনুকরণ করিয়া সৃষ্টি হয়না।"

সাইয়িদ আতীকুল্লাহর 'তিমির-বিদার' কবিতার ৫ লাইন উদ্ধৃত করেছিল মোহাম্মদী ; "ভঙ্গুর আকাশে তবু গ্রানিটের রথ/ মন্থর শ্বাস টেনে আয়ুহীন সময়ের ক্লান্ত সরীসৃপ/ তবু চলে, তবু চলে, তবু চলে, /দ্বিধাহীন মিছিলের মুখে জ্বলে, মুখে জ্বলে,/ জ্বলে মুখে একটা প্রণাম।" পরে, মন্তব্য ঃ "অনুকরণের বাঁদরামির ইহাও একটা সুন্দর নিদর্শন। কলিকাতা হইতে আমদানী সাত নকলে-আসল-খাস্তা মাল। এই কবিযশোপ্রার্থীরাই নাকি 'গত পাঁচ বৎসরের সম্ভাব্য লজ্জাকর সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব' (হাজারীর উক্তি) হইতে পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্যকে রক্ষা করিয়াছেন। ইহারাই নাকি ঈর্ষার পাত্র। তবে কৃপার পাত্র কাহারা?"[৭] বলাবাহুল্য মোহাম্মদীর এইসব সমালোচকেরা বর্তমানের বাংলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্র মোটেই ঈর্ষার পাত্র নন। এমনকি কে এই কথা বলেছিলেন তাও কেউ খবর রাখে না আজ।

পূর্ববঙ্গের সাহিত্য ও সংস্কৃতি যখন সত্যিই বিপন্নপ্রায় পশ্চিম পাকিস্তানীদের এবং পাকিস্তানবাদীদের ষড়যন্ত্রে,—তখন মোহাম্মদী বিপন্নবাদীদের বক্তব্যের অসারত্ব প্রমাণে অগ্রসর হয় এবং 'গণ-সাহিত্য' সৃষ্টির দাবিকে পরোক্ষভাবে নিরুৎসাহিত করেন 'সাহিত্য কি শুধুই ইরিট্যান্ট হইবে?' শীর্ষক সম্পাদকীয় লিখে। সাহিত্য বিপন্ন কিনা এসম্পর্কে মোহাম্মদীর অগ্রহায়ণ ১৩৫৯ সংখ্যায় লেখা হয় ; "পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্য ও তমদ্দুন বিপন্ন, এ বিষয়ে একটি তর্ক চলিতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বা কখনও কখনও বাহিরে এই বিতর্কের অভিব্যক্তি মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছে ; তার চাইতেও বড় কথা, ভিতরে ভিতরে এই ক্ষত বিষাক্ত হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা..... (তাই) সমস্যা সম্পর্কে অতি ধীর ও সুস্থভাবে চিন্তা করা উচিত, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই করা হইতেছে না। স্মরণ রাখা উচিত যে, বিপন্নবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুস্থতার লক্ষণ নয় ; ইহা মূলত দুর্বলতার পরিচায়ক। আমাদের সাহিত্য ও তমদ্দুন (সংস্কৃতি) সত্যই বিপন্ন কিনা, এ বিচার করিতে হইলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে যে সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে, তার প্রতি নজর দেওয়া আবশ্যক। সুধী সমালোচকগণের নিরপেক্ষ দৃষ্টি সে দিকে পড়িবে বলিয়া আশা করা যায়। আমরা সে বিষয়ে..... পূর্বেই বলিয়াছি যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্য এখনও সৃষ্টি হয় নাই—মাত্র সৃষ্টির পথে। সুতরাং এই সাহিত্যের বিচার এখনই করা সম্ভব নয়। তবে, একথাও ঠিক যে, অনেক আবর্জনা এবং অবান্তর ও অবাঞ্চিত বস্তু আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাও অস্বাভাবিক নহে; তবে এগুলি বর্জন করা আবশ্যক। আবর্জনা জমিলে স্বাস্থ্যহানি হয়না, একথা কেহই বলিবেন না।"

'নূতন সাহিত্য' শিরোনামে সম্পাদকীয় বক্তব্যে মোহাম্মদীর চিন্তাধারার পরিচয় আছে। "নূতন ও পুরাতন, নবীন ও প্রবীন, প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ায়, এই রকম কতকগুলি শব্দের আড়ালে একটা লড়াইয়ের মহড়া চালাইবার প্রচেষ্টাও দেখা যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে এসব কথাগুলিই অবান্তর। প্রগতির নামে ভিনদেশী জের টানা অথবা নিজস্ব ঐতিহ্যের প্রতি ঔদাসীন্য যেমন সত্যিকার সৃষ্টির সহায়ক নয়, তেমনি পুরাতনের নামে সেকালের সবকিছু আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকা মারাত্মকরূপে ক্ষতিকর। একই কথা বারবার বলিতে হয়—পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে একটা বিশিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে ; সেই আদর্শ রূপায়ণের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে পাকিস্তানীদের উপর।... পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করিতে গিয়া এর বিচিত্র মানুষ ও পরিবেশ ত্যাগ করিয়া মেফিষ্টোফিলিস, গ্রানাইটের রথ ইত্যাদির—পিছনে ছোটার কোন অর্থ আছে কিনা, বলা কঠিন নহে। এদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে এখানকার মানুষ, সমাজ, প্রাকৃতিক পরিবেশ তাদেরই অতীত ও বর্তমানের প্রতি সন্ধানী দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। একথা বোধহয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। ভিনদেশী সাহিত্য হুবহু অনুকরণ ও অনুসরণ করিলেই যে নূতন সাহিত্য গজাইয়া উঠিবে, এ ধারণা পোষণের সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।"

'সাহিত্য কি শুধুই ইরিট্যান্ট হইবে?' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয় ; "বর্তমান যুগ সাধারণ মানুষের যুগ ; রাজা বাদশাহ, আমীর-ওমরাহদের কাল চলিয়া গিয়াছে। সাধারণ মানুষের শোষণ ও বঞ্চণার কথা প্রকাশই নাকি বর্তমান বা নূতন সাহিত্যের একমাত্র দায়িত্ব। কথাটা সত্য ; কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নহে। কেবল শোষণ ও বঞ্চণার চিত্র অঙ্কিত করিয়া যে ইরিট্যান্ট বা উত্তেজনার সৃষ্টি করা হয়, নিছক উত্তেজনার মধ্যে রস বা সৌন্দর্য্যবোধের প্রকাশ কতদূর সম্ভব, তাহা বিবেচনা যোগ্য। দেহে তাপমাত্রার আধিক্য সুস্থতার লক্ষণ নয় ; অনেক ক্ষেত্রে তা এনিমিয়া বা রক্তহীনতার লক্ষণও হইতে পারে। আজিকার এই উত্তেজনা-প্রবণতা রক্তহীনতার লক্ষণ কীনা, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। এমনও হইতে পারে যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তদানীন্তন চলতি ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ার ফলে, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও নূতন পরিস্থিতি প্রহেলিকার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; অনেক ক্ষেত্রেই একটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাব দেখা দিয়াছে। যে ভিতের উপর এতদিন জীবনটা দাঁড়াইয়াছিল, যে পরিবেশের মধ্যে জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল, তা আজ নাই। ইহার দরুণ হতবুদ্ধি হওয়া হয়ত সম্ভব। জাতীয় জীবন যত গড়িয়া উঠিবে, আবর্জনাস্তূপও ততই অপসারিত হবে। নূতন সাহিত্য তখনই সৃষ্টি হইবে। আজিকার যা, সে নূতনও নয়, পুরাতনও নয় ; স্বাদ-গন্ধহীন পাঁচ-মিশেলি খিচুড়ি। সুখের বিষয়, পূর্ব পাকিস্তানে আজ যে সাহিত্য সৃষ্টি শুরু হইয়াছে, তাতে আবর্জনা প্রচুর থাকিলেও কারও কারও শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, ভবিষ্যতে আরও সংযোগ হইবে নিশ্চয়ই এবং তাহাই একদিন বিশাল মহীরূহে পরিণত হইবে। তবে পাকিস্তানী আদর্শ এবং এদেশের জীবন ও পরিবেশের সহিত সঙ্গতি না রাখিয়া যাহা সৃষ্টি করা হইবে, তাহা হইবে নিরর্থক প্রচেষ্টা ; এদেশের সাহিত্যে তার স্থান হইবে না এবং বিশ্ব-সাহিত্যেও নয়।"[৮]

ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অসংখ্য রচনা মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক এবং কালভেদে রচনার বক্তব্য পরিবর্তিত হয়েছে। কখনও কখনও মোহাম্মদী জনগণের মনের বা মুখের কথাটাই বলতে পেরেছে। এদিক থেকে জনসংশ্লিষ্টতা এঁদের ছিল এবং খুব বেশী বিচ্ছিন্ন হতে পারেননি, এঁরা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে। ১৩৫৯ সনের মাঘ সংখ্যা মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী 'ভাষা ও সাহিত্যের সংস্কার' শীর্ষক আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন : "ভাষা কোনগ্রামে থাকবে? মিঞালী জবান বা বাবুয়ানী ভাষাকে সাহিত্যের আসর জুড়ে থাকার অবাধ অধিকার দিয়ে রাখলে সাহিত্যের ভাষা থেকে জনগণ দূরে পড়ে থাকতে বাধ্য হয় ; সুতরাং তা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাধীন সম্পদের মতো অত্যন্ত অল্পসংখ্যক লোকের ব্যবহার্য বা উপভোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। আজকার গণতন্ত্রের যুগে সাহিত্যিক ভাষার এই কৃত্রিম আভিজাত্য আস্তে আস্তে কমিয়ে ফেলতে চেষ্টা করা সকলেরই কর্তব্য। অবশ্যি এ-চেষ্টা খুবই কঠিন ;

Dhaka University Institutional Repository

এবং কোনো অক্ষম ও অসতর্ক সাহিত্যিক এ-কাজে হাত দিতে চাইলে হয়তো ভালোর চাইতে মন্দই বেশী করবেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিমবঙ্গে জন-ভাষার একটা সাধারণ রূপ সহজেই আবিস্কার করা যায় ; কিন্তু জনকথিত ভাষার দিক দিয়ে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে পার্থক্য এত বেশী যে, এই প্রদেশে পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে পার্থক্য এত বেশী যে, এই প্রদেশে জনভাষা বলতে বিশেষ কিছুই বুঝায়না। এই অবস্থার পরিবর্তন হবে ; কিন্তু তা হতে ঢের সময় লাগবে। রাজধানী, শিল্পকেন্দ্র ও বাণিজ্যকেন্দ্রে প্রদেশের বিভিন্ন এলাকার লোক এসে জড়ো হবেই। তাদের পরস্পরের মেলামেশার ফলে ধীরে ধীরে একটা পূর্ববঙ্গীয়, জনভাষা রূপলাভ করবে। সেইটাই হবে এখানকার নতুন এক আদর্শ কথ্যভাষার ভিত্তি। এই প্রক্রিয়া সফল হতে ২/৩ পুরুষ লেগে যেতে পারে। সুতরাং আগামী বহু বৎসর যাবত পশ্চিমবঙ্গীয় আদর্শ কথ্যভাষাই আমাদের সামনে থাকবে। তাহলেও ততোদিন জন-সম্পর্কহীন আভিজাত্যে ভাষাকে অটল রাখার প্রয়োজন নেই। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত জনভাষার যে-সব শব্দ সারা প্রদেশে বোধ্য ও চলনযোগ্য মনে করা সঙ্গত হবে, সেগুলো এখন থেকেই কঠিন বাবুয়ানী ভাষার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে তাকে হালকা করার চেষ্টা হওয়া উচিত।" অতপর তিনি 'সাহিত্যের সংস্কার' প্রসঙ্গে আলোচনায় বলেন : "সাহিত্যের কাঠামো ও বিষয়বস্তুর সংস্কার বা পরিবর্তন সংগত ও সম্ভবপর হলেও তার মূলধর্মের কোনো পরিবর্তন ঘটেনা। মানুষই সাহিত্যের স্রষ্টা এবং সাহিত্য মানুষের জন্যে। এই কারণে সাহিত্য মূলতঃ মানবকল্যাণের ভাবময়, রসঘন বাণীরূপ ছাড়া আর কিছু নয় এবং হতে পারে না। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন সমাজে সাহিত্য যে-রূপই গ্রহণ করুক বা যে বিষয়বস্তুরই বাহন হোক না কেন, তার এই ধর্ম থেকে বিচ্যুতি ঘটতে পারেনা; এবং বলপূর্বক ঘটাতে গেলে তা আর সাহিত্য থাকেনা।এই কারণে পাকিস্তান ইসলামভিত্তিক রাষ্ট্র ঘোষিত হওয়ায় আমাদের সাহিত্যিকদের ভেতর সাহিত্যের সংস্কার বা নবরূপায়ন সম্পর্কে যে আকুল আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, তাকে ঠিক পথে চালানোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অনেকের মনে হয়তো এই-রকম একটা ধারনা কাজ করছে যে, অতপর ইসলামচর্চাই সাহিত্যিকদের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। কিন্তু এই ধারনার বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন। নইলে আমাদের নব-স্রষ্টব্যসাহিত্য স্বধর্ম ত্যাগ করে শুধু একটা প্রচারণার রূপ গ্রহণ করতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে ইসলাম একটা ভাবধারা মাত্র। ইসলাম মানব-মনে কল্যাণ সম্পর্কে যে বিশেষ ধারণা বা প্রবণতা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে, সাহিত্যে তা প্রতিবিম্বিত হলেই ইসলামের প্রতি সাহিত্যিকের কর্তব্য প্রতিপালিত হয়। এর বেশী কিছু করতে গেলে সাহিত্যের অপমৃত্যু ঘটতে বাধ্য। মানে, পূর্ববঙ্গের বাংলাসাহিত্যে পাকিস্তানী যুগে যেটুকু সংস্কার বা পরিবর্তন স্বাভাবিক, তা এই যে, এখনকার সাহিত্যে মুসলিমসমাজের জীবনমন আগের চাইতে বেশী করে চিত্রিত হবে, এবং সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার ভেতর দিয়ে মানবকল্যাণের যে ইংগিত ফুটে উঠবে, তাতেও মর্মত ইসলামের অনুরঞ্জন থাকবে। এর চাইতে অন্যভাবে বা স্থূল আকারে ইসলামপ্রীতি সাহিত্যে চরিতার্থ করতে চাইলে ভুল হবে এবং তার ফলে আমাদের এই প্রদেশের সাহিত্যিক মান খুবই নেমে যাবে। নিছক সাহিত্যিক বিচারে একে লাভ বলা যায়না। আর একটা কথা ... ইসলাম চাইতে হলে যে শুধু বিদেশের পানেই তাকাতে হবে, তা নয় ; আমাদের স্বদেশ, — যার প্রত্যেকটি ধূলিকণা আমাদের কাছে পবিত্র, — তাকেও প্রাণ ভরে দেখতে হবে, এবং ইসলামী মনের বিপুল প্রসারে তাকেও আয়ত্ত করতে হবে, তার থেকেও সেই মনের পুষ্টি সংগ্রহ করতে হবে। ...এ সম্পর্কে একটা আশ্চর্য ব্যাপারের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই এই প্রবন্ধের উপসংহার করি। ইসলামের নামে বিদেশমুখিতা আমাদের ভিতর এতোখানি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, হাতেমতায়ী, সোহরাব—রুস্তম, বাদশাহ নওশেরওয়ান ইত্যাদির কীর্তিকাহিনী পড়তে আমাদের আগ্রহ ও রসবোধ বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত বা সংকুচিত হয় না ; যদিও এঁরা সবাই অমুসলিম ছিলেন ; কিন্তু পাক-ভারত উপমহাদেশের অনুরূপ অমুসলিম কীর্তিমানদের কাহিনী পড়ার আগ্রহকে বর্তমানে আমরা যেন এক ধরনের ইসলাম বিমুখতার লক্ষণ বলে ধরে নিচ্ছি। শুধু তাই নয় ; এদেশের অমুসলিমদের কিস্সা সম্বলিত রচনাগুলোকে বাদ দিয়েই আমাদের সাহিত্য-রস-পিপাসা চরিতার্থ হওয়া উচিত বলে প্রচার করছি এবং তদনুরূপ কর্মপন্থাও অবলম্বন করছি। একে ঠিক সুস্থ মনোভাব বলা চলে কি?

"আমার মনে হয়, ইসলামের প্রেরণায় সাহিত্যের সংস্কারে হাত দিতে হলে মোটের ওপর ইসলামী দৃষ্টি-ভঙ্গী বলতে যে ব্যাপারটী বোঝায়, তাকে আয়ত্ত করাই সব চাইতে বড় প্রয়োজন। সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মানুষ ও প্রকৃতির দিকে তাকাতে শেখাই আসল কাজ। একাজের ক্ষেত্র দেশ, সমাজ, এমনকি সারা বিশ্ব। এছাড়া হিন্দু পুরাকাহিনী থেকে এতো দিন যেভাবে তুলনা, উপমা, রূপক ইত্যাদি নিয়ে নেয়ার প্রথা ছিল, মুসলিম পুরা-কথা থেকেও এখন সেইভাবে ওগুলো নিতে হবে। তবে এর জন্যে হিন্দু পুরাকাহিনীর সংস্রব একদম ত্যাগ করা প্রয়োজন, এই মত অবাধে গ্রহণ করা কঠিন। তাতে সাহিত্যে রস-সৃষ্টির ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে, সাহিত্যের রসা-শ্রয়িতাও হ্রাস পাবে। এই ক্ষুন্নতা-স্বীকার কি সত্যিই অপরিহার্য্য?"[৯]

মোহাম্মদী মুসলমানদের প্রকৃত রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক ইতিহাস রচনার কাজ দ্রুত সমাপনের জন্য সুপারিশ করেছে এবং বাংলাভাষী মুসলমানদের উন্নতির জন্যে কতিপয় প্রস্তাবও পেশ করেছে : যেমন ; (১) বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা করতে হবে (২) পূর্ব পাকিস্তানের তথা বাংলাভাষী মুছলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক ইতিহাস রচনার ব্যবস্থা করতে হবে। (৩) শিক্ষায়তনসমূহের বিভিন্ন স্তরে পূর্বপাকিস্তানের ইতিহাসকে পাঠ্য তালিকাভুক্ত করতে হবে। (৪) বাংলাভাষী মুসলমানগণ কর্তৃক রচিত পাণ্ডুলিপি ও পুস্তকাদির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে। এসব কাজ সরকারী ও বেসরকারী সমবেত প্রচেষ্টায় করা সম্ভব বলে মন্তব্য করা হয়।[১০]

'পূর্ব বাংলার সাহিত্য প্রসঙ্গে নূরুল ইসলাম খান বলেন : পূর্ব বাংলার সমাজ বিভাগপূর্ব যুগের বাংলা সাহিত্যে ছিল উপেক্ষিত, এখন তাই সেই সাহিত্যিকের প্রয়োজন যাঁরা অবহেলিত সমাজ জীবন ঘেঁটে তার পরিপূর্ণ বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও রূপকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তিনি বলেন, "সত্যিকথা বলতে কি, পূর্ব বাংলার আয়তন অনুসারে লেখক সংখ্যা কম। পত্রিকার সংখ্যাও আশানুরূপ নয়। নিত্য নতুন সাহিত্যিকের আগমন হবে আমাদের তরুণতম বংশধরদের মধ্য থেকে—তাই তাদের প্রতিভা বিকশিত করে তোলার জন্য লেখকেরা অভিজ্ঞতা ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করে তুলবেন। তাদের লেখা যখন সরস ও ..... উপযোগী হবে, তখন তাদের তুলে আনা হবে পরিণত সাহিত্যের ক্ষেত্রে। এইরূপে ঘটবে সাহিত্যিকের নিত্য আবির্ভাব।" তাঁরা শুধু শহর জীবনেই অভ্যস্ত থাকবেন না ; তাঁরা আসবেন পল্লী থেকেও ; পল্লীজীবন উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করে সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করবেন তাঁরা। কি কি উপাদান সংগ্রহ করবেন? কিসের অভাব পূর্ব বাংলার সাহিত্যে? লেখকের এই বর্ণনায় তার একটি চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়— "পূর্ব বাংলায় প্রথমেই চোখে পড়ে ভূমিহীন কৃষককূলকে। তাদের সীমাহীন দুর্দশা তারই ফাঁকে আশাভাষা বুনটের কাহিনী—ব্যর্থতা

Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক জীবনের হাসিকান্না, মিলন-বিরহ প্রভৃতিকে সাহিত্যের দরবারে পরিপূর্ণভাবে হাজির করতে হবে। পূর্ব বাংলার বিপুল সংখ্যক নারী-হৃদয়ের রূপকথা গোত্রভেদে নারীর কাহিনী, তার জীবনযাত্রা— তার ক্ষুধা-পিপাসা, আশা-আগ্রহ, মর্মবেদনা ; সংসার জীবনে নারীর অধিকার, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক, বধূ-শাশুড়ী সম্পর্ক আরো কত কি। তারপর পূর্ববাংলার শ্রমিক—কিষাণ-কিষাণী তাদের তপ্ত-রিক্ত-জীবন—অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও আমলাতান্ত্রিক শোষণের মধ্যে জীবন উপভোগের ব্যর্থ চেষ্টা। জীবনের গড্ডালিকা ধারার মধ্যেও মানুষ আনন্দের অনুসরণ করে, তাই এককালে সৃষ্টি হয়েছিল কবিগান, জারী, খেমটা, যাত্রাগান, পালাগান ইত্যাদি। আজ সে সবই লুপ্ত হতে বসেছে। পূর্ব বাংলার শ্রমিক রাখালী তরুণ জীবনের সঙ্গে এদের সংযোগ নষ্ট হতে বসেছে। বৈচিত্রময় এই পূর্ব বাংলা। এর নদীনালা.....নিয়েই.. কাহিনী গড়ে উঠতে পারে। নৈসর্গিক সংগঠনে পূর্ব বাংলার বৈচিত্র বড় কম নয়। দক্ষিণে এর বঙ্গোপসাগর ; তারই তটপ্রান্তে শ্বাপদসংকুল সুন্দরবন—নোনা পানিতে তার শক্ত ধূসর মাটীর নিবিড় বন্ধুত্ব সেখানে, দুঃসাহসী মাল্লাদের জীবন কাটে সেই সাগর আর অরণ্যের সাথে মিতালী করে। বরিশাল, খুলনা, নোয়াখালী, চাটগায়ের দিকে মানুষের জীবন কাটে ভয়ঙ্কর সুন্দরের সঙ্গে অবিরাম পাল্লা দিয়ে।

বৈচিত্র্যময় জীবন-সুন্দরীর কাহিনী কি সেখানে শুনতে পাওয়া যায়না? হাসুলী বাঁকের উপকথার স্থান কি সেখানে নাই? নতুন জীবনের দোলা লাগে বাংলার প্রত্যেক চঞ্চলা ঋতুতে। দিবারাত্রি ঢল নামে, তুফান দিগ্বিজয়ে বার হয়, বসুন্ধরা হর্ষে নেচে ওঠে, পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্রে শুরু হয় কীর্তিনাশা নর্তন। জীবনের রূপালী দোলা, ... পূর্ববাংলার হৃদয় কত অভাবিতভাবে পরিবর্তিত হয়, কে তার খোঁজ রাখে। কাজুরিয়া ধান ও পাট কাটার গান শুরু হয় তখন। জীবনযাত্রার এমনি কত সমাবেশ। এখনো বয়ে গেছে অস্ফুট আমাদের জীবনের দিবা-রাত্রির হাসিকান্না, আমাদের ঘরকুনো মনোবৃত্তির গ্লানি ও লজ্জা — তার মধ্যে শান্ত জীবনের এক ফোটা সৌরভ এখনো রয়ে গেছে। ছন্নছাড়া মানুষের গৃহবন্ধনের গুপ্তকথা ক্ষুদ্রক্ষুদ্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন এই কথা-কাহিনীকে সাহিত্যের মারফতে গেঁথে তুলতে হবে। ০০ শুধু তাই নয়, পূর্ববাংলায় স্বাধীনতা লাভের সাথে সাথে বন্যার মত এসেছে মোহাজের, চলে গেছে বাস্তত্যাগীরা। দুপক্ষের এই গৃহহীনদের অবর্ণনীয় যাতনার মধ্যেও পূর্ব বাংলার গল্পের একাংশ — তারপর রয়েছে বাস্তহীনদের আপন করার মধ্যে একটা সংগোপন আত্মানুভূতি, তারপর স্বাধীনতার স্বাক্ষর। এই আমাদের স্বাধীনতা। পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে আমরা একে কতোখানি পেয়েছি? এই স্বাধীনতাকে যুদ্ধপরবর্তী ও স্বাধীনতা পরবর্তী আমলের কষ্ঠিপাথরে বিচার করা চলে মানুষের মনের মধ্যে। ০০ পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা নতুন জীবন পেয়েছে। বহু মানুষের মিলনে এর মধ্যেও নিত্য নতুন কাহিনীর খাতায় এঁকে রাখা অবশ্য কর্তব্য। এ সমস্ত উপাদান অফুরন্ত পলির মত কালের গতির সাথে সাথে কাহিনীও বেড়ে চলে— নতুন সাহিত্যিকও আসে। প্রবহমান নদী যেমন বারেবারে নতুন নতুন পলি দিতে থাকে, তেমনি নতুননতুন উপাদান, নতুন সাহিত্যদৃষ্টি আমাদের সাহিত্যের দরবার সমৃদ্ধ করে তুলবে; নতুন রশ্মির সাহায্যে আদিগন্ত আলোকিত করে তুলবে।"[১১]

"সাহিত্যে স্বাতন্ত্র' শীর্ষক অপর এক প্রবন্ধে লেখক সাহিত্যের আন্তর্জাতিকতাকে স্বীকার করেও ইসলামী বা মুসলমানী সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন ঃ 'সাহিত্য সকল সমাজের কথাই বলে। ... কলাকৌশল ও উপস্থাপনার ব্যাপারে বৈদেশিক তত্ত্বগত ব্যাপার নতুনত্বের অবতারণা করলে আমরা অবশ্যই গ্রহণ করবো। .... সার্বজনীনতার সাথে আঞ্চলিক সুষম ও সর্বজনগ্রাহ্য বস্তু ও ধারণার পরিবেশন কুশলী হস্তে প্রয়োগ করলে তা কালক্রমে বিদেশী লেখকদের অনুপ্রাণিত করবে এবং তামদ্দুনিক সমন্বয় ও দেশীয় তমদ্দুনে গ্রহণযোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যাবে। নিজেদের সৎগুণাবলী সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে লোক নিন্দার ভয় করে আমাদের আঞ্চলিক ভাষার বিশেষ ধরণের অর্থবহ শব্দ প্রয়োগ ও বিশেষ ধরনের চালচলন ও ধন্যাধারাকে দূরে ঠেকিয়ে রাখলে আমাদের চলবেনা। জীবনযাত্রাতে সমাজই হোক বা দেশই হোক কোনখানেই লেখক সমাজ একটা সুনির্দিষ্ট মান বেঁধে দিতে পারেননা। সামাজিক মূল্যবোধ রূপান্তরশীল ও ব্যক্তিভেদে তার রকমফের তো রয়েছেই। ... আজ আমাদের নিজস্ব সাহিত্যে ও তমদ্দুনে স্বাতন্ত্র আনতে হলে নিজেদের বস্তুনির্ভর কাঠামোটিকে ঠিক রেখে বিশ্বজগতের উন্নয়নশীল ধ্যানধারনা ও কলাকৌশল এমনকি গ্রহণযোগ্য চালচলন আত্মস্থ (ঃডঔপট) করেই আমরা সত্যিকারের সুস্থ সাহিত্য গঠন করতে পারি। আমরা মিলন ও গ্রহণে পরান্মুখ নই। সাহিত্যের সবল ও সজীব কাঠামো গঠন করতে না-পারলে জাতির আত্মার জাগরণ ও উন্নয়ন সম্ভব নয়। একে আরো গঠনমুখী ও সংস্কারবিহীন ভাবে গ্রহণ করতেই হবে।"[১২]

মোহাম্মদী সাহিত্য সংস্কৃতির প্রায় সকল বিষয়েই অভিভাবকসুলভ মতামত বা মন্তব্য দিয়ে অভ্যস্ত সেই প্রথম— বিশ ও ত্রিশের দশক থেকে। ১৯৫৪ সনের সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলন' সম্পর্কেও এঁরা মতামত দিয়েছিলেন। রিপোর্ট করার সময় কাজী আবদুল ওদুদ-এর নামটা শুদ্ধরূপে উল্লেখ করেননি। মোহাম্মদীর পর্যবেক্ষণ : 'যে উদ্দেশ্যে সম্মেলন আহূত হইয়াছিল, তাহা কতটা সফল হইয়াছে, জাতীয় জীবনে উহার মূল্য বা সার্থকতা কতটুকু, জাতিকে সত্যকার পথনির্দেশদানে সম্মেলন সফল হইয়াছে কতটুকু, সাহিত্য সৃষ্টির পথেই বা ইহা কতদূর সার্থক হইয়াছে, এইসব প্রশ্নই মূলত প্রণিধানযোগ্য ও বিবেচনাসাপেক্ষ।' 'সাহিত্যে সর্বদলীয়তা' প্রসঙ্গে মোহাম্মদীর সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে: "সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলন' কথাটা শুনিয়া প্রথমেই থমকিয়া দাঁড়াইতে হয়। রাজনীতি বা পলিটিক্সের অনুরূপ সাহিত্যক্ষেত্রেও বিভিন্ন দল আছে এবং সেইসব দলের সমন্বয়ে একটা সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে — কথাটা নূতন, ধোঁয়াটে; ইহার সঠিক ও সুস্পষ্ট অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে আমাদের মত সাধারণ মানুষের একটু বিলম্ব হয়। সাহিত্য লইয়া যেখানে কারবার, সেখানে মূল্য বিচারের মাপকাঠি একাধিক, একথা দুনিয়ার কোনো সাহিত্যিক বা সাহিত্যিকগোষ্ঠীর জানা নাই। জীবনের প্রকাশভঙ্গী, সুন্দরের রূপায়ন স্থান-কাল-পাত্র ভেদে হয়ত পৃথক হইতে পারে; কিন্তু তাহা সত্যকার সাহিত্য হইল কিনা, সে-বিচারের মাপকাঠি একটিই— তাতে যা উৎরাইল তাহাই স্থায়ী এবং বা উৎরাইল না, সাময়িকভাবে চটকদার হইলেও তাহা আবর্জনাস্তূপে পরিণত হইতে বাধ্য। তাই সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে ও বিবেচনায় সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলন' কথাটি দুর্বোধ্য—বিশেষ করিয়া পূর্ব-পাকিস্তানে, সেখানে সাহিত্য সম্পর্কে আশাবাদী হইবার মত কোন কারণ এখনও ঘটে নাই। সাহিত্য সাহিত্যই—লজিক ফিলজফি, পলিটিক্স বা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স নয়। সাহিত্যে মত বা প্রকাশভঙ্গীতে পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাতে দল হয় এবং সেই কারণে 'সর্বদলীয়' সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা আছে, এরূপ ধারনা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে 'সর্বদলীয়' ব্যাপারগুলি পলিটিক্সের আওতাভুক্ত ; সেখানে 'অল-পার্টিজ' বা 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট' ইত্যাদি করা চলে ; সাহিত্যে তা অচল।'

Dhaka University Institutional Repository

সম্মেলনের উদ্দেশ্য' শীর্ষক কলামে (সম্পাদকীয়তে) বলা হয় ঃ "সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলনের' মত একটা অচল ও অবাস্তব বস্তুকে চালু করার চেষ্টা উদ্দেশ্যমূলক কিনা, এই প্রশ্ন বহুজনের মনে উদয় হইয়াছে। যাঁহারা এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের বক্তব্য ঃ সম্মেলনের কার্যকলাপ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিশেষ বিশেষ মন্তব্য হইতে একমাত্র এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব যে, বিশেষ একটা রাজনৈতিক মতবাদ অর্থাৎ কম্যুনিজম প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়াই জনকয়েক প্রবীণ ব্যক্তিকে সামনে রাখিয়া এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 'সাংস্কৃতিক' অনুষ্ঠানে যে সঙ্গীতাদি পরিবেশিত হইয়াছে, সেগুলি দেখিয়া শুনিয়া এ অভিযোগ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সাহিত্য বলিয়া এগুলিকে দাবী করা হয় নাই, এইটুকু সুখের বিষয়। কিন্তু ইহাকে পূর্ব-পাকিস্তানের 'সংস্কৃতি' বলিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং তাহা কম দুর্ভাগ্যের কথা নয়। তথাকথিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে পাকিস্তানের দূরে থাক, পূর্ব-পাকিস্তানের স্বরূপ ফুটিয়া উঠে নাই, প্রকট হইয়া উঠিয়াছে একটা বিদ্বিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী, বিদেশ হইতে ধারকরা একটা গিল্টি করা দ্রব্য, যাকে খাঁটি বলিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টা হইয়াছে। 'সাংস্কৃতিক' অনুষ্ঠানগুলি যে বিশেষ মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এ-পরিচালনায়, এ অনুষ্ঠানে মস্কো—পিকিং এবং কলিকাতার ধারা সুস্পষ্ট। বহির্মুখী দৃষ্টি লইয়া এই সব পরিচালিত হইয়াছে, এ-অভিযোগ প্রকৃত উদ্যোক্তাগণ অস্বীকার করিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না।

'প্রবীন ও নবীন' শীর্ষক কলামে বলা হয় ঃ 'সর্বদলীয়' কথাটির পিছনে যে বিশেষ অর্থ রহিয়াছে, তাহা 'প্রবীণ' ও 'নবীন' এই শব্দ দুইটির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় বুঝা যাইতেছে। সম্মেলনের যুগ্মসম্পাদকের রিপোর্ট এবং বিভিন্ন অভিভাষণ ও মন্তব্য হইতে দেখা গিয়াছে যে, একটি দল 'প্রবীণ' ও নবীন' সাহিত্যিকদের দুইটি ক্যাম্পে বিভক্ত করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রবীণ ও নবীন এই দুই দল মিলিয়া সম্মেলনের অধিবেশন করিতেছেন। ইহারই অন্তরালে আরও প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, প্রবীণদের দিন অতীত হইয়াছে, এখন নবীনদের যুগ। কাল হিসাবে প্রবীণদের আয়ু অস্তমিত প্রায়, একথা স্বীকার করিতে প্রবীণরা দ্বিধাবোধ করিবেন, এ-আশঙ্কা আমাদের নাই। কিন্তু এই প্রমাণ-প্রচেষ্টার অন্তরালে প্রবীণদের প্রতি যে উপেক্ষা এবং নবীনদের যে ঔদ্ধত্য সুপ্রকট, তাকে জাতির কল্যাণ বলিয়া পরিগণিত করিতে দ্বিধা থাকা স্বাভাবিক। নবীন বহন করিয়া চলে প্রবীণের ধারা এবং সেই কারণেই প্রবীণ অমর, হইয়া থাকে নবীনের মধ্যে। সুতরাং প্রবীণ ও নবীনের মধ্যে অস্বীকৃতির সম্পর্ক কোথায়, তাহা আজ দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে।'

'সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয়' উপশিরোনামে উক্ত সম্পাদকীয়তে বলা হয় : 'সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলনে' যে বিষয়গুলি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তার গুটিকয়েক সংক্ষেপে আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ঃ-

(১) পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বাংলাসাহিত্য এক ও অভিন্ন।

(২) উভয় অঞ্চলের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা; চিন্তাধারা এক ও অভিন্ন।

(৩) পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যের ভাষা ও আদর্শে কোন বৈশিষ্ট্য নাই; পদ্মাতীরের ভাষা অচল, গঙ্গাতীরের ভাষাই হইবে পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যের ভাষা।

(৪) এছলাম অচল, কিন্তু বস্তুবাদ সচল; এছলামী সাহিত্য বলিয়া কিছু হইতে পারেনা, কিন্তু বস্তুবাদী তথা কমুনিস্ট সাহিত্য সত্য।

মোহাম্মদী বলেন, এই সব প্রসঙ্গের আলোচনা সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। আমরাও মনে করি মোহাম্মদ যাযা বলেছে তার সবটা উদ্ধৃত করা সহজ নয়। দু একটি বিষয়ে কেবল সংক্ষেপে মন্তব্য করা হলো ঃ 'গঙ্গাপার ও পদ্মাপার ' শীর্ষক কলামের ভাষ্য :

"ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পশ্চিমবঙ্গের তথা গঙ্গাতীরের বাংলা সাহিত্যের ভাষাকে বর্জন, পদ্মাপারের কথ্য-ভাষাকে সাহিত্যে স্থানদান এবং অত্যধিক আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দের প্রচলনকে বাতুলতা বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। ইহার যে কোন একটিকে বাতুলতা পর্যায়ে স্থান দেওয়াতে আপত্তি নাই। কিন্তু গঙ্গাপার বনাম পদ্মাপারের সমস্যা তাহার মনে কেন উদিত হইয়াছে, তাহার নিরাকরণ দুষ্কর। অতি সাধারণ অ-সাহিত্যিকের মত তিনি এই সব প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তিনি প্রবীণ ব্যক্তি, অন্তত অর্ধ-শতাব্দীর খবর তাঁহার অজানা নয়। প্রাক-পাকিস্তানকালীন পাকিস্তান-আন্দোলন ও সংগ্রাম সম্পর্কে তাহার মতামতও অনেকের সুবিদিত। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক হইতে হিন্দুয়ানী বাংলা এবং মুসলমানি বাংলা সম্পর্কে যে প্রচণ্ড বিতর্ক ও বাদ-প্রতিবাদ চলিয়াছে, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত বলিয়া আমরা মনে করিনা। পাকিস্তানোত্তর কালে গঙ্গাতীরের ভাষা সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া পদ্মাতীরের কথ্যভাষাকে সাহিত্যে চালু করিবেন বা কারণে-অকারণে আবরী-ফার্সী-উর্দু প্রচলন করিবেন, এমন কথা কোন সুস্থবুদ্ধি পূর্ব-পাকিস্তানী বলিয়াছেন, একথা কাহারও জানা নাই। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখক হিসাবে ডাক্তার সাহেবের সম্ভবতঃ একথাও জানা আছে যে, বিগত হাজার বছরের মধ্যে বাংলা ভাষার রূপ বহুবার পরিবর্তিত হইয়াছে। সে-পরিবর্তনের ধারা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, একথা তিনি বলেন ... পদ্মাতীরের কথ্য ভাষাকে হুবহু পূর্বপাকিস্তানীসাহিত্যে স্থান দিতে হইবে, একথাও কেহ বলেন নাই। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তানের বিশেষ পরিবেশের মধ্যে গঙ্গাতীরের ভাষার পরিবর্তন ঘটিবে না, এই মত কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন কি? অবশ্য গঙ্গাতীরমুখী যাহাদের দৃষ্টি, তাহাদের পক্ষে এ কথা বলা অসম্ভব নহে। পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্যের ভাষার ভবিষ্যৎ রূপ সম্পর্কে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া মূঢ়তার পরিচায়ক। যাহা সহজ ও স্বাভাবিকভাবে আসিবে, তাহাই হইবে এই সাহিত্যের ভাষার রূপ। ফরমায়েস দিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না, ভাষাও তৈয়ারী হয়না। পূর্বপাকিস্তানে এখনও কোন ষ্টাণ্ডার্ড ডায়েলেক্ট বা কথ্য ভাষা নাই; বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্য ভাষা পরস্পরের কাছে দুর্বোধ্য। শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে আঞ্চলিক মেলামেশার মাত্রা বৃদ্ধি হইবে। তখন পরস্পরের বোধগম্য একটা Standard Dialect হয়ত তৈয়ারী হইবে। এই কথ্য ভাষার কাঠামোর সহিত গঙ্গাতীরের ভাষার কাঠামোর মিল থাকা স্বাভাবিক; কিন্তু নুতন নুতন শব্দ আমদানী হইলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। পূর্ববঙ্গের বর্তমান সাহিত্যিকগণ এখনও গড়ের মাঠ, বালিগঞ্জ, কলিকাতার Gutters ও Shems এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছেন; পূর্ববঙ্গের জনজীবনে এখনও তাহাদের অনুপ্রাণিত করে নাই। যেদিন তা হইবে, সেদিন এই সব অবান্তর প্রশ্ন তুলিয়া মস্তিস্ক বিব্রত করিবার প্রয়োজন হইবে না। সাহিত্যের ভাষা নির্ণীত হইবে সাহিত্যিকের প্রতিভা এবং বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে।"

Dhaka University Institutional Repository

'এছলামী সাহিত্য' শিরোনামে বলা হয় : 'এছলামের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন এবং নিজেকে এছলাম অনুসারীরূপে পরিচয় না দেওয়ার চেষ্টা নবযুগের রেওয়াজ। সেকালে ভদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে ধুতি চাদর পরিয়া 'জী হাঁ'র পরিবর্তে "আজ্ঞে হ্যাঁ" বলা যেমন রেওয়াজ ছিল, বর্তমানে নিজেকে এছলাম অনুসারী না বলিয়া কম্যুনিষ্ট নেহ্যয়েৎ পক্ষে প্রগতিশীল রূপে পরিচয় দান করাই রেওয়াজ হইয়াছে। আসলে দুইটিই একই বস্তুর এপিঠ ওপিঠ—পরমুখাপেক্ষী, পরানুকরণকারী, স্বাতন্ত্র্যবিহীন মনের পরিচয়। সারা উনিশ শতক জুড়িয়া পাক-ভারত উপমহাদেশের মুছলমান কোন রকমে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে; বাংলাভাষী মুছলমানদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। তার প্রমাণ উনিশ শতকের পুঁথি সাহিত্য। বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে শুরু হয় তাহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা, যাহা পরবর্তীকালে পাকিস্তানে বাস্তব রূপ গ্রহণ করিয়াছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ইহার ইতিহাস আজও লিখিত হয় নাই; অথচ পাকিস্তানী জাতির জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যাহা হউক, আমরা পাঠক ও সুধীবর্গের দৃষ্টি একটি বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করিতে চাই। এছলামী সাহিত্য বলিতে এছলামের নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে রচিত ও গঠিত সাহিত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। এছলাম তথা ধর্ম চিরন্তন সত্যের বাণী বহন করে এবং স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ বিশেষ মানবগোষ্ঠী সেই চিরন্তন সত্যের বাস্তব রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। মানুষ স্বভাবত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ ; কিন্তু এই সঙ্গে একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মানুষ সমস্ত সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে উঠিতেও সক্ষম। ধর্ম্মীয় ক্ষেত্রেও তার প্রকাশ এই স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী হইয়া থাকে। সুতরাং কোন সাহিত্যকে কেবল এছলামী সাহিত্য বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না। এছলাম অনুসারীদের সাহিত্যও তাহাদের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতা অতিক্রম করিয়া চিরন্তন সত্যের বাণীর ধারক ও বাহক হইতে পারে।'

'পাকিস্তানী ও পাক-বাংলা সাহিত্য' শিরোনামের সম্পাদকীয়তে বলা হয় : "সাধারণভাবে মানুষের পরিবেশ সঙ্কীর্ণ - Physical, intellectual, social geographical, এইসব দিক বিবেচনা করিলেই তার সঙ্কীর্ণতার হেতু উপলব্ধি করা যাইবে। কিন্তু এসব ছাড়াইয়া তার একটা বৃহত্তর সত্তা ও অনুভূতি আছে, ইহাও অনস্বীকার্য। ব্যক্তি আছে, তাঁর স্ত্রী-পুত্র আছে; ইহাদের লইয়া সে নিজের পাঁচীল দেওয়া বাড়ীতে বাস করে; কিন্তু তাই বলিয়া সে পল্লী বা পল্লীর বাহিরের দুনিয়াকে অস্বীকার করে না, করিতে পারে না। এছলামী নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী জীবনগঠনের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা। তার অর্থ এ নয় যে, পাকিস্তান বাহিরের জগৎকে অস্বীকার করে। কিন্তু এ-কথাও সত্য যে, পাকিস্তান তার মর্মমূল; ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া পাকিস্তানীর যাত্রা শুরু। পূর্ববঙ্গ বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের আবাসভূমি। এখানে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে, তা হইবে পাকিস্তানী-বাংলা বা পাক-বাংলা সাহিত্য। এছলামের নীতি ও আদর্শ, তার চিরন্তন সত্য পাক-বাংলার জীবনধারার পটভূমিতে রূপায়িত হইবে বাস্তবে। পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত নয়, একথা কেহই বলে না; বৈষ্ণব সাহিত্য বা পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্য বাংলা-ভাষী মুছলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষার, জীবন-বোধ ও জীবনাদর্শের ধারক ও বাহক, একথা বোধ হয় কেহই বলিবেন না। বাংলা-ভাষী প্রত্যেকে বাংলা-সাহিত্যকে স্বীকার করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বাংলা সাহিত্যে স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু মুছলমান তাঁহার 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতকে আপন বলিয়া গ্রহণ করে নাই, করিবে না, করিতে পারে না। বিগত হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যে দুইটি প্রবহমান ধারা সুপরিস্ফুট; উভয়ই সত্য, উভয়ই বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য। একটির স্বীকৃতি অন্যটির অস্বীকৃতি নহে। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ পৃথক হওয়ায় এই দুইটি ধারার প্রকাশ নিজ নিজ বিশিষ্ট ধারায় রূপায়িত হইবার ক্ষেত্র সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং পূর্ববঙ্গের বাংলা সাহিত্য শুধু বাংলাসাহিত্য নয়, শুধু পাকিস্তানী সাহিত্য নয়, ইহাকে পাক-বাংলা সাহিত্যরূপে অভিহিত ও উপলব্ধি করাই সঙ্গত। এই কারণে আমরা প্রত্যেককে তা তিনি দলীয়, অদলীয় বা সর্বদলীয় হউন – আত্মস্থ হইতে আত্মবিশ্লেষণ করিতে, নিজেকে জানিতে ও চিনিতে এবং সর্ব্বোপরি নিজেকে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা দান করিতে অনুরোধ জানাই।"[১৩]

মোহাম্মদী যেসকল লেখক-সাহিত্যিককে আক্রমণ করেছেন, সেই সমস্ত সাহিত্যকদের অনেককেই মোহাম্মদীতে লিখতে দেখা গেছে। মোহাম্মদীও ছেপেছে আক্রান্ত ব্যক্তির লেখা। এই রহস্য অনুধাবন করলে রসা লাভ ঘটে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মোহাম্মদী কর্তৃক আক্রান্ত হলেও তাতে আবার লিখেছেন —, অবশ্য সেই লেখার মর্মকথা মুসলমানদের কৃতিত্ব বর্ণনা। 'মুসলিম বিজয়ও বাংলা সাহিত্য' শীর্ষক এক রচনায় ডঃ শহীদুল্লাহ চর্যাগীতি থেকে ১৮ শতক পর্যন্ত সাহিত্যের আলোচনাপূর্বক মন্তব্য করেছেন— "... মুসলিম রাজত্বে যে বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি হয়, তাই আজ সর্বাঙ্গসুন্দর সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। এর প্রথম উৎসাহদাতা যে মুসলমান সুলতান ও ওমরাহগণ তা আমরা চিরকাল স্মরণ রাখবো।"[১৪]

ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগকে 'ক্রান্তিকাল' আখ্যায়িত করে ঐ নামে প্রবন্ধ লিখে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে তাঁদের অত্যাচারে সাহিত্য –সৃষ্টির পরিবেশ ছিল না - প্রচলিত এই মতবাদ খণ্ডন করেছেন। তিনি লিখেছেন কোন রক্তপাত ঘটানোর প্রয়োজন ছিলনা। "বিনা রক্তপাতে শতেরজন অশ্বারোহীসহ ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী এদেশ দখল করেন। দেশ অত্যাচারে উৎপীড়নে এতটা অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছিল যে কোন বিদেশী শাসককে তাঁরা স্বাগত জানাতে উৎসুক হয়ে রয়েছিল। ... তুর্কীর মুসলমানেরা না-এলে বাংলা আরও ক'শ বছর পিছিয়ে যেত তা কে জানে?"[১৫]

ডক্টর আনিসুজ্জামান 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের দান' শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের কতিপয় উল্লেখযোগ্য কবি ও কাব্যের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে মধ্যযুগের বা মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন। "মুসলমানদের দ্বারা বাংলাদেশ বিজয়ে নতুন যুগের সূচনা কেন হলো, সে কথাটা বলা দরকার। এ দেশে ... মুসলিম বিজয়ের ফলে সংস্কৃত ভাষা তার আগের প্রতিষ্ঠা হারালো। তার জায়গা নিল কোন বিদেশী ভাষা নয় — বাংলা ভাষা। মুসলমান শাসকেরা দেশী কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করলেন, তাঁদেরকে দিয়ে কাব্য রচনা করালেন, পারিতোষিক ও খেতাব দিলেন কবিদের। এমনি করে দেশময় ব্যপ্ত হলো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা। এক প্রাণময় নতুন যুগের সূচনা হলো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে।"[১৬]

শিক্ষা পদ্ধতির আলোচনা প্রসঙ্গে মোহাম্মদীতে বিভিন্ন ভাষা শেখার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। শিক্ষার বয়স এবং কোর্সের মেয়াদ সম্পর্কেও তথ্যভিত্তিক সিরিয়াস আলোচনা অনেক হয়েছে। প্রবন্ধগুলোতে বাংলাভাষা সংস্কার, সহজীকরণ এবং রোমান হরফে বাংলা লেখার নানান হুজুগের

Dhaka University Institutional Repository

সময়ে মোহাম্মদীতে প্রচুর লেখা ছাপা হয়েছে। এতে সরকারী উদ্যোগকে সব সময় নিরঙ্কুশভাবে সমর্থন করা হয়নি। বিশেষ করে আইউব খান, তাঁর শাসনকালে দুই দফায় যেসমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেন, সেগুলোকে উচ্চসিত সমর্থন দেয়া হয়নি। মনে রাখতে হবে, আকরম খাঁ সক্রিয় রাজনীতি থেকে তখন অবসর নিয়েছেন। আর আইউবের পতনকালীন মরণকামড়-এর সময় আকরম খাঁ মৃত্যুশয্যায় এবং অতপর পরলোকগত। মোহাম্মদীতে নানান মতের বেকার তরুণ সাহিত্যিকেরা ভীড় করতেন। তখন চিন্তাধারায়ও এসেছে একটা অস্থিরতা, ওলট-পালটভাব। তাই বাংলা ভাষার সহজীকরণের এবং সংস্কারের বিশেষত পাক-বাংলা সৃষ্টির নিরাপোষ সংগ্রামী মোহাম্মদী আইউব খানের আমলে 'বর্ণমালা সংস্কার' উদ্যোগকে প্রতিরোধ করে দীর্ঘ প্রবন্ধ ছেপেছে 'বর্ণমালা সংস্কার না সংহার?' শিরোনামে। তাতে প্রথমেই বলা হয়েছে : "বাংলা ভাষাকে যখন পাকিস্তানের অন্যতম জাতীয় ভাষারূপে আমাদের জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠার দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছে, ঠিক তখনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক বর্ণমালা সংস্কারের ধূয়া তোলা অনেকের কাছেই তাৎপর্যপূর্ণ মনে হতে পারে। ... সংস্কারের উদ্দেশ্য, কয়েকটি মৌলিক বর্ণের নিধন বা সংহার।'[১৭] এই নিধন বা সংহারের নেপথ্যকাহিনী প্রতিরোধী ভাষায় মোহাম্মদীতে অপর এক লেখক 'বাংলা ভাষা সংস্কারের অন্তরালে' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে জনসমক্ষে তুলে প্রকাশ করেছিলেনঃ "... অনেক রক্তক্ষয়ী করুণ ইতিহাসবিধৃত ভাষা -আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে অবশেষে বাংলাভাষা পাকিস্তানের জাতীয়ভাষার মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়। যে ভাষা আন্দোলনের নিষ্পত্তিমূলক পরিসমাপ্তি বহু পূর্বেই ঘটেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত তারই পুনরুল্লেখ করে প্রদেশবাসীর মনে বিদ্বেষভাব আবার পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হতেই বাংলা ভাষার উপর দিয়ে যে দুর্বার দুর্বিপাক বয়ে গেছে, তারই জ্বলন্ত ইতিহাস ১৯৫২ সনের ২১ শে ফেব্রুয়ারীর রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। অবশেষে রক্তের বিনিময়ে বাংলা তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখার পরও একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী তথাকথিত সাহিত্যসেবীরা বাংলাভাষার বামপন্থীদের (?) চক্রান্তে বাংলার আক্ষরিকরূপ পরিবর্তন করে নতুন ভাষার উদ্ভবে তৎপর হয়ে উঠেছিল। তাদের সমস্ত চক্রান্ত যখন ধূলিস্যাৎ করে বাংলাভাষা তার অস্তিত্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসল, তখনই তার উপর 'বর্ণমালা সংস্কার' নামক ভাষা সংহারের নতুন খড়গউদ্যত। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে বাংলা ভাষাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নমানের আখ্যায়িত করাই যে তাদের উদ্দেশ্য, তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।' লেখক উল্লেখ করেন যে, ১৯৬৮ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর ঢাকায় নজরুল একাডেমী আয়োজিত অনুষ্ঠানে আইউব খান অদূরভবিষ্যতে পাকিস্তানে একটি মাত্র জাতীয় ভাষা গড়ে তোলার আহবান জানান এবং এর অব্যবহিত পরেই লাহোরের আঞ্জুমানই তরক্কী-ই-উর্দুর আয়োজিত ২ দিন ব্যাপী সম্মেলনে প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবের জোর সমর্থন জানিয়ে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার দাবী জানানো হয়। ১লা অক্টোবর ১৯৬৮ প্রেসিডেন্টের মাস-পয়লা বেতার ভাষণে সমগ্র দেশে একটি মাত্র ভাষা সৃষ্টি এবং এক ও অভিন্ন সংস্কৃতি গড়ে তোলার পুনরুল্লেখ করে পাকিস্তানের বিভিন্ন সংস্কৃতির অস্তিত্ব অনৈসলামিক বলে ঘোষণা করেন। বাংলা ভাষার উন্নয়ন প্রশ্নে এক শ্রেণীর সংস্কারধর্মী (?) সাহিত্যানুরাগী যখন উদ্দেশ্যমূলকভাবে বর্ণমালা সংস্কার করে বাংলা ভাষার রূপ রাতারাতি পরিবর্তনে ব্যস্ত, ঠিক তখনই এক ও অভিন্ন জাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি সৃষ্টি করার জোর প্রস্তাব উত্থিত হচ্ছে। সুতরাং বাংলাভাষা সংস্কারের অন্তরালে যে দুরভিসন্ধি কাজ করে যাচ্ছে তা যে অচিরেই বাংলা ভাষাকে নিশ্চিহ্ন করণে সহায়ক হবে, তাতে তর্কের অবকাশ নেই। বস্তুত বাংলা ভাষার উপর এহেন বিপর্যয় আজ নতুন করে দেখা দেয় নাই এবং প্রাণের বিনিময়ে হলেও বাঙ্গালী যে বাংলা ভাষার মান অক্ষুন্ন রাখবে তা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। তবুও বামপন্থীদের চেষ্টার বিরাম নাই।

লেখক আরো বলেন ঃ "শুধু ভাষার প্রশ্নই নয়, এবারে সংস্কৃতির প্রশ্নও জড়িত হয়েছে। জাতীয় সংহতির খাতিরে আঞ্চলিক সংস্কৃতি বিলুপ্তি করণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জাতীয় তমদ্দুন কি হবে তা অবশ্য বিবেচ্য, কিন্তু নিজ নিজ তমদ্দুন বর্জন করে এ সম্পূর্ণ নতুন সংস্কৃতি গ্রহণ করা যে রাতারাতি সম্ভব নয়— তা বলাই বাহুল্য। যে ভৌগলিক কারণে পাকিস্তানে ভিন্ন ভিন্ন তমদ্দুনের উৎপত্তি তাকে অস্বীকার করলে পাকিস্তানের ভৌগলিক সীমারেখাকেও অস্বীকার করা হয়। পাকিস্তানের উভয় অংশে ভৌগলিক অবস্থান হেতু যে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে, তাদের অস্তিত্ব কখনও অস্বীকার করার উপায় নাই। একই দেশে প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি যে অনৈসলামিক নয় — তা সম্প্রতি রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান ইতিহাস সম্মেলনে ভাষণদানকালে প্রবীণ ঐতিহাসিক ডক্টর মাহমুদ হোসেন দ্ব্যর্থহীনভাষায় ঘোষণা করেছেন। বস্তুত সংস্কৃতি ও সংহতি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস - ইহা কখনও একে অপরের পরিপন্থী হতে পারে না। সংস্কৃতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রেম, আবেগ-অনুরাগ ইত্যাদির অভিব্যক্তি। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান-পরস্পর পরস্পরের ভাই ভাই; কিন্তু তাই বলে ইসলাম কখনও আঞ্চলিক কৃষ্টিকে বর্জন করার নির্দেশ দেয় নাই। ইসলাম কখনও ভৌগলিক সীমারেখা অস্বীকার করেনা। এজন্য বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামিক রাষ্ট্রে ধর্মীয় কৃষ্টির সহিত বিভিন্ন আঞ্চলিক কৃষ্টির সহ-অধিষ্ঠান দেখতে পাই — যদিও এ সকল দেশের অধিবাসীদের ধর্মমত একই। উদাহরণস্বরূপ ইরাণ, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, মিশর প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও — তাদের প্রাকইসলামিক কৃষ্টিকেই গর্বের সাথে পালন করছে, কিন্তু এজন্য তাদের ধর্মমত শিথিল হয়েছে বলে জানা নেই।... পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের লেখকদের চিন্তাধারা এক হলেই তাদের বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি এক হতে হবে — এমন নয়। .... সংস্কৃতি যেহেতু সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করেনা। ... বাংলাভাষা সংস্কারের যে প্রকৃতস্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে তাতে প্রদেশবাসীর মনে ভাষা আন্দোলনের পূর্বের ইতিহাসই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। অভিষ্ঠ সিদ্ধির উদ্দেশ্য যারা সংস্কারের নামে বাংলা ভাষার মান ক্ষুন্ন করে বিলুপ্তি সাধনে ব্যস্ত, বাঙালী জনসাধারণ তাদের থেকে সাবধানে থাকলেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবেন।"[১৮]

উপর্যুক্ত রচনাটি যে মোহাম্মদীতে ছাপা হয়েছিল - তা ভাবতে একটু খটকা লাগে। আবুল কাসেম ফজলুল হকের 'রূপান্তরের মুখে আমাদের সাহিত্য' শীর্ষক নিম্নোক্ত প্রবন্ধও যে মোহাম্মদী ছেপেছিল —এটাও বিশ্বাস করতে সামান্য হলেও বেগ পেতে হয়। কম্যুনিজম, সমাজতন্ত্র, চীন-রাশিয়ার সাহিত্যের আদর্শবিরোধী প্রচারে যে-মোহাম্মদী উচ্চকণ্ঠ — সেই মোহাম্মদী বামপন্থীশিবিরের মুক্তবুদ্ধির উপাসাক তরুণ লেখক (কম্যুনিষ্ট নন) আবুল কাসেম ফজলুল হকের এই ব্যতিক্রমী, গতানুগতিকতার মূলে আঘাতকারী বক্তব্য ছেপেছিল এই কারণে যে তখন পাকিস্তানবাদী ধ্যানধারনায় পঁচন ধরেছে এবং পশ্চিমপাকিস্তানীরা যে পূর্ববঙ্গকে সংহত পাকিস্তানের এক সংস্কৃতি ও সাহিত্যাদর্শের নামে যে শোষণ করে চলেছে — তা তারা বুঝতে শিখেছে ব্যাপকভাবে —তাই সারাদেশে আইউব-বিরোধী তথা পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্বশানের দাবিতে উচ্চকিত আন্দোলনএর জোয়ার বয়ে

Dhaka University Institutional Repository

চলেছে। সমাজব্যবস্থাই যেখানে পরিবর্তনের সম্মুখীন—সেখানে সাহিত্যও যে রূপান্তরের প্রত্যাশী তা সকল বিবেকবানই হয়ত উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই নতুন সাহিত্য, যা সমাজ-সভ্যতাকে পাল্টে দেবে, গড়ে তুলবে নতুন মন-মনন— তা সৃষ্টি করার মত যোগ্যতরের আবির্ভাব তখনও ঘটেনি, তাই হয়তো রূপান্তরের সম্ভাবনাই কেবল আলোচিত হচ্ছিল। কিন্তু তার মূল্যও কি কম? লেখক বলেন ঃ 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য এবং পূর্ববাংলার সাহিত্যে যে ধারা আজও অব্যাহত, বিবর্তনের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সে ধারা বর্তমানে এক রূপান্তরের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।' কারণ পরিমাণ ও বহিরঙ্গের দিক থেকে সাহিত্যের প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য পরিলক্ষিত হলেও 'আন্ত-সম্পদের সমৃদ্ধি বিচার করতে গেলেই দেখা যায় পূর্ববাংলার সাহিত্য নিতান্ত দরিদ্র।' এই 'দরিদ্র' সাহিত্যস্রষ্টারা কয়েকভাবে নিজেদেরকে বিভক্ত করে সৃষ্টিতে নিরন্তর সক্রিয় ও সচল থাকলেও কোন দিক থেকেই তাঁরা নতুন প্রাণের ও নবজীবনে প্রাণ সঞ্চারিত করতে পারছেন না। "প্রথমত পূর্ববাংলার অভিজাত সাহিত্যিকদের একাংশ ক্ষয়িষ্ণু পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী সমাজব্যবস্থাজাত জীবনভাবনায় আক্রান্ত। আন্তর্জাতিকতাবাদের অনুসারী হতে গিয়ে তাঁরা স্বদেশের বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছেন; তারা 'শিল্পের জন্য শিল্প' এই শ্লোগানেরই অনুসারী। .... পাকিস্তানোত্তরকালে পূর্ববাংলায় যে কবি সাহিত্যিকেরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, তাদের অধিকাংশই এই শাখার অনুসারী। দ্বিতীয়ত অভিজাত সাহিত্যিকদের আর এক অংশ অতীতের আদর্শের পুনরুজ্জীবনের কথা বলে কার্যত ইতিহাসের চাকাকে পেছনের দিকে ঘুরাতে চান। এখনও তারা সামন্ত যুগের জীবনভাবনায় আচ্ছন্ন — জীবনজগতের প্রতি তাঁরা তাকান মধ্যযুগের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে; অথচ আধুনিকতার আবরণ দিয়ে তাঁরা মধ্যযুগীয় ভাবনা-চিন্তাকে ঢাকতে চান। অতিরিক্ত আরবী-ফার্সী-উর্দু শব্দের অলঙ্কার পরিয়ে বাংলাভাষাকে তারা এছলামী জবানে পরিণত করতে প্রয়াসপর। মধ্যযুগের অলৌকিকতানির্ভর জীবনভাবনাকেই তাঁরা বর্তমানের পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। বিজ্ঞানের অনন্ত সম্ভাবনাকে স্বীকার করতে তাঁরা অনিচ্ছুক। তাঁরা রবীন্দ্রসাহিত্য ও বাংলাসাহিত্যের এক বিরাট অতীতকে বর্জন করার কথা বলেন। এক এক সময় ধর্মীয় আদর্শের একএক রকম বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁরা পশ্চিমা আদর্শের সঙ্গে ইসলামী আদর্শের সমন্বয় সাধনের কথা বলেন। তাদের সৃষ্টির কতটুকু পশ্চিমা আর কতটুকু ইসলামী তা বুঝা মুশকিল। প্রকৃতপক্ষে তাদের সৃষ্টি ইসলামিক নয়, পশ্চিমাও নয়, এবং তার মধ্যে কোন স্বাভাবিক সুস্থ সুন্দর জীবন-জিজ্ঞাসার অভিব্যক্তিও নেই।' তৃতীয়ত 'অভিজাতসাহিত্যিকদের অপর একটি ক্ষুদ্র অংশ যাঁরা ধনবাদী, সামন্তবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী সমাজব্যবস্থাজাত ধ্যান-ধারণার অন্তসারশূন্যতা বুঝতে পেরে ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিলেও দোদুল্যমানচিত্তের পরিচয় দিয়ে প্রায়শ পশ্চিমা ভাবধারার স্রোতেই গা ভাসিয়ে দেন। এঁদের রচনা শিল্পগুণ বিচারে শ্লোগানোত্তীর্ণ হতে পারেনি।" কোন জিনিস গ্রহণ অথবা বর্জন করতে হবে তা তারা জানেন না। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েই হোচট খান। সাহস নিয়ে যাত্রাপথে নির্বিঘ্নে অগ্রসর হবার মেরুদণ্ডও তাঁদের নেই। চতুর্থত অভিজাত বৃত্তের বাইরে সচরাচর অভিজাত পরিবেশে অনালোচিত, উপেক্ষিত অর্ধশিক্ষিত কবিয়াল ও পুঁথিকার শ্রেণীর সাহিত্যস্রষ্টা ও সংস্কৃতিকর্মীর কিছু অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু তাঁরা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সুযোগবঞ্চিত এবং সেকারণে পশ্চাৎবর্তী। তাঁদের পক্ষে এখনও উন্নতমানের সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। অথচ বর্তমান যুগ সামন্তবাদ পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত অবসানের যুগ-বর্তমান যুগ বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানের বিজয়ের যুগ, বিজ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ করার যুগ। আজ প্রয়োজন সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী যুগের ধ্যান-ধারণাকে পরিত্যাগ করা ও সেই সঙ্গে বিজ্ঞানভিত্তিক নতুন বিশ্বদৃষ্টি অনুসন্ধান করা— অর্জন করা এবং সেই নতুন বিশ্বদৃষ্টি নিয়ে জীবন ও জগতকে নতুন করে উপলব্ধি করা। 'অথচ পূর্ববাঙলার সাহিত্যে এর বিপরীত লক্ষণই প্রকট। নতুন বিশ্বদৃষ্টির অনুসন্ধিৎসা হঠাৎ আলোর ঝলকানীর মত এক আধটু দেখা দিয়েই তা আবার নিষ্প্রভ হয়ে যায়।' 'পূর্ববাংলার বর্তমান সাহিত্যের এতিহাসিক পটভূমি' সম্পর্কে লেখক বলেন : "মধুসূদনের সময় থেকে বাংলা সাহিত্যের যে ধারার সূচনা, বর্তমানে সে ধারা তার শৈশব-কৈশোর-যৌবন অতিক্রম করে বার্ধক্যের শেষধাপে এসে পৌঁছেছে। মধুসূদনের সময় ছিল বাংলাসাহিত্যের এ ধারার শৈশব, বঙ্কিমের সময় কৈশোর, রবীন্দ্রনাথের সময় যৌবন এবং কল্লোলের সময় থেকেই এর বার্ধক্যের সূচনা, কিন্তু এই ধারার গর্ভেই আবার জন্ম নিয়েছে নতুন এক ধারা — সে ধারা হল নজরুল-সুকান্ত-মানিক-সুভাষের দ্বারা সূচিত সাম্যবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ধারা এবং এই ধারাতেই বর্তমানে আমরা সেই সব লেখককে পাই যাঁরা সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী যুগের ভাবধারাকে বর্জন করে নতুন মূল্যবোধের অনুসন্ধান করেন, অথচ দোদুল্যচিত্ততার পরিচয় দিয়ে অনেক সময়ই পশ্চিমা ভাবধারার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন। প্রকৃতপক্ষে নজরুল-সুকান্ত -মানিক-সুভাষের দ্বারা, বাংলাসাহিত্যের যে ধারার সূচনা হয়েছিল, পূর্ববাংলার সাহিত্যে সেধারা আজও মোটেই উৎকর্ষ অর্জন করেনি।"

স্বাধীনতা অর্জনের ফলে পূর্ববাংলার সাহিত্যে গুণগত কোন পরিবর্তন আসেনি, এমনকি স্বাধীনতার চেতনায় পুষ্ট তেমন সাহিত্যও পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানে সামান্যই সৃষ্টি হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে মানুষ যে সুখী-সুন্দর সমাজজীবনের স্বপ্ন দেখেছিল, স্বাধীনতা অর্জনের পর সে স্বপ্ন সম্পূর্ণ নস্যাৎ হয়ে যাওয়ার ফলেই হয়তো এটা হয়েছে। ১৯৫২ সনের ভাষা-আন্দোলনের চেতনা পূর্ববাংলার সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য ছাপ রেখে গেছে। সামন্তবাদী জীবনভাবনাকে বিসর্জন দেয়ার এক বলিষ্ঠ প্রয়াস তখন থেকে তরুণ লেখকদের মধ্যে দেখা দেয়। ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী যুগের জীবন ভাবনাকে বিসর্জন দেওয়ার চেষ্টাও লক্ষিত হয়। ... সাম্যবাদী ধারার প্রতিও তরুণ লেখকদের আগ্রহ দেখা দেয়, ভাষা-আন্দোলনের পর থেকে 'আমাদের লেখকেরা পুরোনো মূল্যবোধকে যতটা অস্বীকার করেছেন নতুনের অন্বেষণে ততটা অগ্রসর হননি। ভাষা আন্দোলন যখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সঠিক পথ ধরে যৌক্তিক পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে পারেনি, সাহিত্যও তখন আর প্রগতিশীল পথে অগ্রসর হতে পারেনি — হতাশার অন্ধকারে নিমগ্ন হয়েছে।'

বাঙালী মুসলমান কবিসাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবী-রাজনীতিবিদদের বৃহদাংশ বুর্জোয়া মধ্যশ্রেণীর সদস্য ঔপনিবেশিক আমলে প্রভুভক্ত প্রাণীর মত ইংরেজদের অনুগ্রহের জন্য লালায়িত ছিল। কোন সক্রিয় আদর্শ সামনে নিয়ে সাময়িকভাবেও কোনদিন আপোষহীন হয়ে দাঁড়াতে পারেনি— ইংরেজ প্রভুদের বিরুদ্ধে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই শ্রেণীর যে অংশ ক্ষমতায় গিয়েছে তা আগাগোড়াই সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় লালিত হয়েছে, আর যে অংশ ক্ষমতায় যেতে পারেনি তার বিভিন্ন মতামতে বিভক্ত হয়েও যার তার কোন অংশই কখনও কোন আদর্শে অটল থাকতে পারেনি, কিংবা আদর্শের সন্ধানে একনিষ্ঠ হতে পারেনি — সমগ্র জনগণকে আদর্শের পতাকাতলে একত্রিত করা দূরের কথা। এই শ্রেণী সামগ্রিকভাবে এখন মুমূর্ষ অবস্থায় এসে

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। 'বাংলা সাহিত্যের আধুনিক ধারা যেমন শৈশব-কৈশোর-যৌবন প্রভৃতি স্তর অতিক্রম করে বর্তমানে বার্ধক্যে পৌঁছেছে তেমনি পূর্ববাংলার বর্তমান অভিজাতশ্রেণীও তার জীবনের শৈশব-কৈশোর-যৌবন প্রভৃতি স্তর অতিক্রম করে এখন বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছে। এই শ্রেণীর রাজনীতিকেরা আজ স্ববিরোধী কথা বলেন। যাঁরা ক্ষমতায় আছেন তাঁদেরও কথার সঙ্গে কাজের সঙ্গতি নেই এবং আজকের কথার সঙ্গে কালকের কথা সামঞ্জস্যহীন। আর যাঁরা ক্ষমতায় নেই, তাঁরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হলেও প্রত্যেক দলেরই অবস্থা মূলত এক। কথা ও কাজ পরস্পর সম্পর্কহীন —বক্তব্য পারমপর্যহীন এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর ফাঁকা মস্তিস্ক ও নিবীর্যতার পরিচয়ও আজ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই শ্রেণীর শ্রেণীগত অবস্থানে অটল থেকে তাদের পক্ষে চিন্তার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল নেতৃত্বদান আজ আর সম্ভব নয়। অনুগ্রহলোলুপ, করুণালোভী, আত্মবিক্রীত বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে চিন্তার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল নেতৃত্ব আশা করা আজ বাতুলতা মাত্র। এই শ্রেণীর তরুণদেরও ছাত্রদের একাংশ আজ চরম উচ্ছৃংখল ও উন্মার্গগামী। তবে তরুণদের মধ্য থেকে এবং ছাত্রদের মধ্য থেকে অনেকের শ্রেণীচ্যুত হয়ে জনগণের সঙ্গে মিশে গিয়ে প্রগতিশীল আন্দোলনে অংশ গ্রহণের ও নেতৃত্বদানের সম্ভাবনা রয়েছে। এই শ্রেণীতে যারা আজ ভাল মানুষ বলে এবং প্রগতিশীল বলে পরিচিত, তারা নিতান্ত নিরীহ — বলা চলে এ কেবারেই পৌরুষহীন। প্রগতিশীল ভূমিকায় কোন ক্ষেত্রেই নেতৃত্বদান তাদের পক্ষে সম্ভব না হলেও যদি দেশে কোন বলিষ্ঠ প্রগতিশীল নেতৃত্ব আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে তারা সেই নেতৃত্বের ছায়াতলে দাঁড়াতে হয়তো কুণ্ঠিত হবেন না এবং অনেকে হয়তো সেই নেতৃত্বকে সাহায্য করতেও এগিয়ে আসবেন। যে শ্রমিক কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের উৎপাদনের ওপর নির্ভর করে এই শ্রেণী আজও সমাজের উপরতলায় অবস্থান করছে। তারাও আজ সচেতন হয়ে উঠেছে, 'ভাবছে তোমরা রহিবে তেতলার উপরে আমরা রহিব নীচে, অথচ তোমাদের দেবতা বলিব সে ভরসা আজ মিছে', আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদও আজ দুর্বল হয়ে এসেছে, তাই মৃত্যুর আগে শেষ মরণকামড় দেবার চেষ্টা করলেও বিশ্বজুড়ে জনগণের রুদ্ররোষের সামনে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে বিদেশে ক্ষয়িষ্ণু ধনিক শ্রেণীকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার অবস্থা হয়তো আর বেশীদিন থাকবে না। তাই সব দিক থেকেই এই শ্রেণী আজ সহায়হীন — ইতিহাসের মঞ্চ থেকে এই শ্রেণীর এখন বিদায় নেবার পালা। Classes struggle; Some classes triumph, others are eliminated such is history, souch is the history of civilization for thousands of year." – এই কথা যদি সত্যি হয় তাহলে এই শ্রেণী অবশ্যই ইতিহাসের মঞ্চ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।"

'পূর্ববাঙলার বর্তমান সাহিত্য পরিবেশ' সম্পর্কে লেখক বলেন, 'আধুনিক বাংলাসাহিত্য পূর্ববাংলায় যে রূপ লাভ করেছে, তাতে তার সামনে গতানুগতিক ধারায় বিকাশ লাভের প্রচুর বাহ্য সুযোগ রয়েছে, কিন্তু বিকাশের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা তার নেই। অপর দিকে এ ধারার গর্ভে সাম্যবাদী চেতনায় পুষ্ট যে নতুন ধারা জন্ম নিয়েছে তার সামনে বিকাশের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা অফুরন্ত, কিন্তু বিকাশের পথ বন্ধুর ও কন্টকাকীর্ণ।

সামন্তবাদী পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী যুগের জীবনভাবনাকে সাহিত্যে রূপ দিয়ে প্রকাশ করার মত পত্র-পত্রিকার অভাব নেই। রেডিও, টেলিভিশন থেকে আরম্ভ করে সরকারী বেসরকারী অসংখ্য পত্রপত্রিকা প্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আজ প্রকাশিত হচ্ছে। এ ধরনের বইপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রেও প্রকাশকের অভাব নেই। যে সব বই উন্নতমানের বলে পরিচিত, সেগুলোর পাঠকসংখ্যা ধর্তব্যের প্রায় বাইরে হলেও ক্রেতার অভাব নেই। ... এসব সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের ধনিকেরা এবং সরকার আজ এগিয়ে এসেছেন ... অনেকগুলো সাহিত্যপুরস্কারের ব্যবস্থা হয়েছে ...., সাহিত্যিকদের জন্য সরকারী পৃষ্ঠপোষকাতয় লেখকসংঘ, জাতীয় সংহতি কাউন্সিল, বাংলা একাডেমি, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ও বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচুর অর্থও সরকার ব্যয় করছেন। ব্যয়বহুল অভিজাত হোটেলে আজকাল বেশ ঘনঘন সাহিত্যসভাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে —মৃত্যুর দিন যখন ঘনিয়ে এসেছে, তখন তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আয়োজনের অন্ত নেই। অপর দিকে সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ যে নতুন সাহিত্য-ধারা জন্ম নিয়েছে, তার সামনে বিকাশের পথ কন্টকাকীর্ণ। (উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ) এর বিকাশের পথ আজ অনুকূল নয় — প্রতিকূল। কোন ধনবান ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আজ এ ধারার কোন সাহিত্যকে পুরস্কৃত করার জন্য কিংবা কোন দরদী প্রকাশক এ ধারার সাহিত্য প্রকাশ করার জন্য অপেক্ষা করে নেই। এ ধারার সাহিত্য যদি অভিজাত শ্রেণীর লেখক -লেখিকা ও পাঠকপাঠিকার হাতে পড়ে, তাহলে তাঁরা তাকে অপাংক্তেয় করে রাখেন। বলিষ্ঠতার সঙ্গে এ ধারার সাহিত্য যদি আত্মপ্রকাশ করে তাহলে তার উপর চরম নির্যাতন নেমে আসারই সম্ভাবনা।" লেখক বলেন তথাপি 'বিকাশের অন্তস্থিত সম্ভাবনা বর্তমানে এই ধারারই রয়েছে এবং সে সম্ভাবনা অফুরন্ত'। কিন্তু তাঁর প্রশ্ন : নতুন ধারার সাহিত্য বিকশিত হয়ে ওঠার অন্তরায় সম্পর্কে পরিবেশের অজুহাত কি যুক্তিসিদ্ধ? 'নতুন তো কোনদিন পরিবেশের দাসত্বকে বরণ করে নেয় না — সে হয় পরিবেশের প্রভু। ... পূর্ববাংলার প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ সাহিত্যিকদের' এই শ্রেণীর (প্রগতিশীল বলে পরিচিতদের) মোহ থেকে মুক্ত হতে হবে— নিজেদেরকে এই শ্রেণীর বাইরে এবং বিপুল জনগণের অন্তর্গত বলে ভাবতে হবে এবং মনে রাখতে হবে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত থাকাতে আজ আর কল্যাণ নেই। তাঁদের নতুন সাহিত্য রচনায় অটল থাকতে হলে আপোষহীন ভাবে জনগণের ভূমিকায় দাঁড়াতে হবে — জনগণকে জানতে হবে, জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করতে হবে।' সেজন্য লেখক- লেখিকার শ্রেণীগত অবস্থান ও ভূমিকার প্রশ্নটিকে অবশ্যই আজ একটি মৌলিক ও নীতিগত প্রশ্ন হিসেবে বিবেচনা করার প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন, কারণ অভিজাত শ্রেণীর ভূমিকায় থেকে 'কোন অবস্থাতেই আন্তরিকভাবে নিজেদের সাহিত্যপ্রচেষ্টায় অটল থাকা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবেনা।' তাছাড়া 'প্রগতিশীল বলে পরিচিত'দের বিগত দুই দশকের সামাজিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করে আলোচক বলেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তথা চিন্তার ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা ঐসব প্রতারক প্রগতিশীলদের নেই— "সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অন্যায়, অবিচার, উচ্ছৃংখলতা অব্যবস্থা ও আদর্শহীনতার ফলে আমাদের দেশের মানুষ আজ এক রুদ্ধশ্বাস অবস্থার সম্মুখীন। দেশের বর্তমান অবস্থার তুলনা হতে পারে একমাত্র অন্ধকার যুগের সঙ্গেই। এই সঙ্কটের হাত থেকে দেশকে সমাজকে মানুষকে মুক্ত করার কাজে সাহিত্যিকগণ আজ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পলন করতে পারেন এবং সেভূমিকা পালন নাকরলে আমাদের শিল্পীসাহিত্যিকেরা তাঁদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দেবেন ও তার ফলে ক্রান্তিকালের অবসান ঘটিয়ে দেশে এক গৌরবময় নতুন যুগের সৃষ্টিও সম্ভব হবেনা। বর্তমান সামাজিক সংকটের অবসান ঘটিয়ে এক গৌরবময় নতুন যুগের সৃষ্টির কাজে তরুণদেরকেই আজ এগিয়ে আসতে হবে। সকল প্রকার প্রতিকূলতা ও ব্যর্থতার ভয়কে অগ্রাহ্য করে বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন তরুণসাহিত্যিকেরাই নতুন ধারায় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেন।"[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদীতে রবীন্দ্র-বিরোধীতার স্পষ্ট পরিচয় নেই। বরং একালের মোহাম্মদীতে রবীন্দ্রসাহিত্যের এবং রবীন্দ্র প্রতিভার অনন্যসাধারনত্ব স্বীকার করা হয়েছে। ডক্টর আনিসুজ্জামান 'মওলানা আকরম খাঁ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক' শীর্ষক এক প্রবন্ধে একটি বাক্যে একটি মন্তব্য করেছিলেন : "বলা নিষ্প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রপ্রতিভা মোহাম্মদীর সমাদর লাভ করেনি।"[২০] একথাটিকে কিভাবে বিশ্লেষণ করা চলে? মোহাম্মদী মুসলমান সমাজের জাগরণের মুখপত্র। তাঁরা নিজেদের উন্নতির চিন্তাতে এতই বিভোর যে দিবারাত্র নিজেদের অনুন্নতির কারণ অনুসন্ধান করেছেন। পতনের সম্ভাবনা দেখলেই চিৎকার করে স্বজাতিকে সতর্ক করতে চেয়েছেন। উন্নত সমাজের উন্নত কবির মহত কাব্য প্রতিভার প্রশংসা করার তাঁরা প্রয়োজন বোধ করেননি। কারণ মধু-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ- শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের সমাদর করার লোকের ও পত্রেরও অভাব নেই। বরং মুসলমানদের স্বাতন্ত্র রক্ষা করতে গিয়ে,স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যাঁদেরকে প্রতিপক্ষরূপে চিহ্নিত করতে হয়েছে মধু-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই গর্বের বিষয় ও বস্তু বিধায় স্বাতন্ত্রবাদীরা অন্যত্র প্রাণরস আহরণ করেছেন। তাছাড়া মোহাম্মদীর আয়ুষ্কাল আর পাকিস্তানবাদ-এর উন্মেষ ও পাকিস্তান-আন্দোলন তীব্র হবার কাল এবং পাকিস্তান সৃষ্টির পর তার পরিবর্ধনের সময় পরিসরেই মোহাম্মদীর জন্ম, শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব এবং জ্বরাজীর্ণ বৃদ্ধকালের পর মৃত্যু ঘটেছে। এই সময়ে মুসলমান সমাজ, ইসলাম, ইসলামী-বিশ্ব, পাকিস্তানের মনস্তাত্ত্বিকভিত্তি ইত্যাদি বিষয় নিয়েই উম্মত্ততার মধ্য দিয়ে চলেছে। অতএব রবীন্দ্রসাহিত্যের সমাদর না করার জন্য তাঁদেরকে খুব বেশী দোষ দেয়া যায় না। কিন্তু, যেকথা আগে পূর্ববাংলার অতিআধুনিক কবি-সাহিত্যিক-প্রাবন্ধিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, সেকথারই পুনরুক্তি করে বলতে হয়,—সর্বজনস্বীকৃত প্রতিভাকে যখন তাঁরা হীন বলেন, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন, তখন খুবই বিরক্তি লাগে, মূর্খতার চূড়ান্ত বলে গালি দিতেও ইচ্ছা হয়। ঐরকমই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁদের কোনো কোনো উক্তি বিভাগপূর্ববর্তীকালে অর্থাৎ ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে আছে বটে, এবং তাতে ভাবখানা এমন ফুটে উঠেছে যে, মুসলমানদের মধ্যথেকে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলীর মতো মহান কাব্য অনেকেই লিখেছেন বটে, কিন্তু পুরস্কার পান গীতাঞ্জলীর কবি! নিশ্চয়ই এর মধ্যে গুরুতর পলিটিক্স আছে। সে-যাই হোক, সাতচল্লিশপরবর্তী মোহাম্মদীতে রবীন্দ্রসাহিত্যের ওপরে কতিপয় রচনা প্রকাশ পেয়েছে। এতে রবীন্দ্র-বিদ্বেষ প্রকাশ পায়নি, আর রবীন্দ্র সাহিত্য বর্জনের ধূয়া ওঠার কালে এঁরা চুপচাপ ছিলেন ('মোহাম্মদী'ই বিবেচ্য এখানে, 'আজাদ' নয়)। ২৪ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬০ সংখ্যায় শ্রী মোহিনীমোহন দত্ত 'রবীন্দ্রানুধ্যান'শীর্ষক কলামে লিখেছেন ('সাহিত্য প্রসঙ্গ' ; পৃ ৭২৫) "জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই 'রবি'। বসুধা চক্রবর্তী বর্ষ ২২, সংখ্যা ১ এ ১৯৫০ সনের নভেম্বরে (কার্তিক ১৩৫৭) লিখেছিলেন প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রোত্তরযুগে রবীন্দ্রনাথ'। ভবেশ মুখোপাধ্যায় ২২ বর্ষ ৯ম সংখ্যায় (আষাঢ় ১৩৫৮) লিখেছিলেন 'রবীন্দ্রনাটক' শীর্ষক প্রবন্ধ। মাহফুজুল হক ২৩ বর্ষ ১ম সংখ্যায় (কার্তিক ১৩৫৮) লিখেছিলেন ; "রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ব্যক্তি ও সমাজ"। এবনে গোলাম সামাদ 'বলাকার দর্শন' নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন ২৪ বর্ষ ৬ সংখ্যায় (চৈত্র ১৩৫৯) ; শ্রী শিশিরকুমার বসাক লিখেছিলেন 'রবীন্দ্রনাথের ওপর ইংরেজকবিদের প্রভাব' (বর্ষ ২৯, সংখ্যা ৭, বৈশাখ ১৩৬৫)। এভাবে কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের নিদর্শনও আছে। ২৫ শে বৈশাখ এ রবীন্দ্রনাথের স্তুতি করে কবিতা লিখেছিলেন শামসুল হক (পঁচিশে বৈশাখ, বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৬ চৈত্র ১৩৫৯, পৃ ৪২৮); এবং আ.ন.ম বজলুর রশীদ (পঁচিশে বৈশাখ, ২৪বর্ষ, সংখ্যা ৭, পৃ, ৫১৬); এবং আরও অনেকে । শরৎসাহিত্য এবং আরও অসংখ্য হিন্দুসাহিত্যিককবির কাব্যপ্রতিভার ওপর প্রবন্ধ রচনার নিদর্শন ভুরিভুরি আছে মোহাম্মদীতে। হিন্দুলেখকেরাও অনেক লিখেছেন। এখানে সাহিত্যপত্রিকার চারিত্র খুঁজলে ব্যথ হবার সম্ভাবনা নেই। তবে হ্যাঁ, মোহাম্মদীর লেখকসমালোচকেরা নজরুল, ইকবাল, মীর মোশাররফ হোসেন এবং আধুনিক ও মধ্যযুগীয় মুসলিম কবি সাহিত্যিক, আর আরব-ইরানের সুফী দার্শনিক কবিসাহিত্যিক, রুমী-সাদী-নিজামীর কাব্যপ্রতিভা; এবং পশ্চিম-পাকিস্তানী কবি-সাহিত্যিকদের প্রতি যতোটা অনুরাগী হয়েছিলেন, তাতে বিশেষত্ব আছে। বৈশাখ ১৩৬৮ সনের মোহাম্মদীর সম্পাদকীয়তে লেখা হয় : 'রবীন্দ্রনাথ ও ইকবালের জন্মবার্ষিকী পালন করা দরকার কারণ, ইকবাল পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা কবি। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তবে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী পালন যেন শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রপূজায় পর্যবসিত না হয়— এই দিকে লক্ষ্য রাখা আজ যথার্থ রবীন্দ্রভক্তদেরও কর্তব্য।' (পৃ ৫৮৮); লেখকেরা মনে করতেন মোহাম্মদীতে লিখতে হলে মুসলিমঐতিহ্যে গর্বিত হয়েই লিখতে হবে। এজন্য মোহাম্মদীর বিষয়বস্তু ইসলাম ও মুসলিমপ্রধান। দর্শন হলো মুসলিম বা ইসলামী জাতীয়তাবাদ এবং তার ভৌগলিক ভিত্তি পাকিস্তান।

৪. **সংস্কৃতি -চিন্তা** ঃ সংস্কৃতি-চিন্তার ক্ষেত্রেও তাঁরা এই স্বাতন্ত্র মনে রেখেছেন। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর জীবনের অন্যান্যদিকের ন্যায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও কিছুটা সমস্যা দেখা দেয় এবং মোহাম্মদীর লেখকেরা সেজন্য সংস্কৃতিকসমস্যা সমাধানের পথ অন্বেষণ করেছেন। পাকিস্তানের সংস্কৃতিকে গ্রহণেচ্ছু যুগোপযোগী করা ছাড়া উপায় নেই বলে ব্যাখ্যাতারা মত দিয়েছেন। কারণ দেশের সকল যুগের উপযোগী ধর্ম-দর্শন হিসেবে গণ্য করে ইসলামীরাষ্ট্রেও আধুনিক সংস্কৃতি—চারুকলা, নৃত্য, অভিনয়, সিনেমা (নারী-পুরুষের যৌথ অবশ্যই) সবকিছুকে স্বীকার করে নেবার পক্ষেই মত দেয়া হয়েছে। না দিয়ে উপায় কি? সমাজ পরিবর্তিত, আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে গেলে রাষ্ট্রীয়ভাবেই এসবকে পৃষ্টপোষকতা না করে উপায় নেই। রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্টপোষকতা দান করতে গিয়ে দেখা গেল যাঁরা ইসলামের অনুমোদিত সমাজব্যবস্থার জন্য এককালে সংগ্রাম করেছিলেন তাঁরাই এখন একটি আধুনিক রাষ্ট্রের কর্নধার। তাঁদেরকে বিদেশে গিয়ে অত্যাধুনিক অনৈসলামিক রাষ্ট্রের পতিদের সঙ্গে ওঠাবসা খাওয়া-দাওয়া করতে হয়। সেসব দেশের সাংস্কৃতিক ট্রেডিশনকে অস্বীকার করে মনে মনে ঘৃণা অনুভব করলে ও বিশ্বের একটি অংশের সমাজপতি হিসেবে ঘরের কোণে চুপ করে বসে থাকা চলেনা। একারণেই পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবনে আধুনিকতার সকল বৈশিষ্ট্যকে মেনে নেয়া হয়েছে; পত্রপত্রিকার আলোচনাতেও সেগুলো নামেনে উপায় কি?এ কথা জোরে-সোরে উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ জনমতকে নিরস্ত্র করা হয়েছে, আধুনিক এই সাংস্কৃতিকপ্রভাবকে অনৈসলামিক বলে যাতে হৈ চৈ না করা হয়। প্রতিনিধিত্বকারী কয়েকটি রচনার সারাংশ উদ্ধৃত করে মোহাম্মদীর সাংস্কৃতিক চিন্তা-ভাবনার পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫২ সনের আগষ্ট মাসে আবদুল হক কার্জন হলের এক বিচিত্রানুষ্ঠানে গিয়ে আত্ম জিজ্ঞাসায় লিপ্ত হন ঃ 'এই নাচ গান কি জায়েজ?' অনুষ্ঠানে মুসলমান মেয়ে ও পুরুষ শিল্পীরা মিলে নাচ-গান করলো, মুসলমান মহিলা ও পুরুষ দর্শকদের দ্বারা হলঘরটি ঠাসা ছিল ; আর এই অনুষ্ঠানের আয়োজনও করেছিলেন ইসলামীরাষ্ট্র পাকিস্তানের খোদ সরকারী একটি প্রতিষ্ঠান—যাঁদের পাকিস্তান ও ইসলামের প্রতি আনুগত্য সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন না কোনদিন—; কিন্তু প্রশ্ন হলো "মুসলমান মেয়েদের এই নাচ, আর মুসলমান মেয়ে—পুরুষদের দলবেঁধে ঠাসাঠাসি করে এই নাচ-গান দেখা কি ইসলাম সমর্থন করে?" উত্তরে লেখক নিজেই বলেছেন ঃ 'আমি নিঃসন্দেহেই বলতে পারি যে, নগণ্য ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে, আজকের শিক্ষিত মুসলিমসমাজে এ প্রশ্ন আজ কোনো প্রশ্নই নয়। এ সমাজের জন্য চাই আনন্দের আয়োজন, চাই নাচ, গান, থিয়েটার, সিনেমা। কার্জন হলের যে অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেছি, সেরকম অনুষ্ঠান আজকাল হরহামেশাই হয়ে থাকে, আর এসবের রূপায়ণে অংশ নিয়ে থাকে যেমন মুসলমান পুরুষ, তেমনি মুসলমান নারী। দেখার জন্য ভিড়ও করে উভয় শ্রেণীই, আনন্দ পেলে তারাই হাততালি দেয়, তারপর তাজা মন নিয়ে ফিরে আসে। এসব আজ তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের অপরিহার্য অংগ। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু আছে, একথা কেউ মনে করে না। কিন্তু এও আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে সেই ইসলামপুর গ্রামের লোকগুলো (ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা কঠোরভাবে শাসিত, বিভাগ পূর্ববর্তীকালের মুসলিমবাংলার একটি গ্রাম) যদি এই রাজধানীতে বেড়াতে এসে কৌতূহলবশে সেদিন কার্জন হলে ঢুকতো আর দেখতো যে, মেয়ে-পুরুষের নাচ-গান চলছে, আর সেসব মেয়ে-পুরুষ মুসলমান, তবে ইসলামী রাষ্ট্রে, এসব কাণ্ডকারখানা দেখে তারা শুধু যে আশ্চর্য হতো তাই নয়, ঠাসাঠাসি করে হাততালি দেওয়ার পরিবর্তে 'তওবা তওবা' বলতে বলতে তারা কার্জন হল শূণ্য করে চলে যেত।"

এখন পাকিস্তানের আদর্শ-উদ্দেশ্য অনুযায়ী ইসলামপুর গ্রাম, আর ঢাকার কার্জন হলের অনুষ্ঠানে সমবেতশিল্পী ও দর্শক-শ্রোতৃমণ্ডলী—এই দুটি সমাজের কোনটি ইসলামের অনুবর্তী বলে পাকিস্তানে বিকশিত হতে দেওয়া উচিত? কোন দৃষ্টিভঙ্গী পাকিস্তানের অনুকূল? লেখকের নিঃসন্দেহ জবাব ঃ 'এ প্রশ্নও আজ অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক।' তিনি বলেন—এই বাংলারই মুসলমানেরা জারি-সারি-কবি-মারফতী-ভাটিয়ালী প্রভৃতি গান আবহমানকাল ধরে গেয়ে আসছে আর শুনে আসছে। তারই সঙ্গে প্রতিবেশী (হিন্দু?) সমাজের যাত্রা, থিয়েটার, নৃত্য, উত্তর ও পশ্চিম ভারতের মুসলিম কাওয়াল, ওস্তাদ, সংগীত ও সিনেমাশিল্পী এবং অভিনেত্রীরা বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্তসমাজের বর্তমান সাংস্কৃতিক বিকাশের পথ প্রস্তত করেছে, যা রুদ্ধ করার উপায় আজ আর নেই। এমন একদিন ছিল, যেদিন নাচ, গান, সিনেমা, থিয়েটার, চিত্রকলা, পর্দা, সুদ, বীমা, পোষাক ইত্যাদি নানান রকম সামাজিক প্রশ্ন নিয়ে উত্তপ্ত বাহাস হয়েছে, মসলা-মাসায়েল প্রচারিত হয়েছে। পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, কিন্তু সেসব আজ অতীতের কথা। আজ লাখো লাখো লোক ব্যাংকে টাকা রাখে, সরকারী ঋণপত্র কেনে, এবং সুদ নেয়, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কাউকে উচ্চবাক্য করতে দেখা যায়না।... "দেখেছি, পাড়াগাঁয়ে ইন্সিওরেন্স দালালী ব্যর্থ হয়েছে ; .... অথচ আজ ইসলামিকরাষ্ট্রে শুধু যে ইন্সিওরেন্স কোম্পানীগুলোর পসার বাড়ছে, তাই নয়, যাতে আরও পসার বাড়ে এবং সর্বসাধারণ ইন্সিওরেন্সের সুফল পেতে পারে, সেজন্য সরকার স্বয়ং চেষ্টা করছেন। সেভিংস সার্টিফিকেটে ১০ টাকা খাটালে বার বছর পরে ক' কটাকা পাওয়া যাবে, তারই বিজ্ঞাপনে সরকার দেশ ছেয়ে ফেলেছেন। বিনা বাক্যব্যয়েই যে এসব হচ্ছে, তা নয়। তবে বাক্য ব্যয়ের ধরণটা বদলে যাচ্ছে। ব্যাংক আর ইন্সিওরেন্সের বিরোধিতা যাঁরা করেছেন তাঁরা ইসলামের নামেই করেছেন, আর আজ যাঁরা এসব ব্যবসায়ের পসারের জন্য চেষ্টা করছেন তাঁরাও ইসলামীরাষ্ট্রের স্বার্থে অর্থাৎ শেষপর্যন্ত ইসলামেরই স্বার্থে সেচেষ্টা করছেন এবং সে চেষ্টাকে কেউ খারাপ বলছে না। অর্থাৎ দৃষ্টিভংগীর একটা বিপুল পরিবর্তন এসেছে। এমনি পরিবর্তনের আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি। মাস কয়েক আগে ইসলামিক রিভিউ-এর মলাটে একটা ছবি ছাপা হয়েছিল। ১৯৫১ সালের আজাদী দিবসে করাচীর রাজপথে মহিলা ন্যাশনাল গার্ডদের কুচকাওয়াজের ছবি। গভর্ণর-জেনারেল তাদের অভিবাদন নিচ্ছেন আর অগুণতি লোক রাস্তার দুপাশে থেকে, তিনতলা বাড়ীর প্রত্যেকটি জানালা, বারান্দা আর আলিশায় ভিড় করে তাই দেখছে। আজকের পাকিস্তানের মহিলা ন্যাশনাল গার্ডের কুচ-কাওয়াজ এমনকিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, সত্যিকথা বলতে কি, দেশরক্ষা ব্যবস্থায় তাঁরা আজ অপরিহার্য বলে গণ্য হয়েছেন। কিন্তু লক্ষ্য করার ব্যাপার এই যে, অল্পদিন আগেও স্রেফ ইসলামধর্মের নীতি প্রচার করাই ছিল যেপত্রিকার একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই পত্রিকার মলাটের উপরেই যে শুধু এই ছবি অসংকোচে ছাপা হয়েছে, তাই নয়, ছবির ক্যাপসনে বলা হয়েছে ঃ The picture on the cover is symbolic of the resurgent world of Islam. এ ছবি হচ্ছে মুসলিম জাহানের জাগরণের প্রতীক। ... মোটের উপর, নারীস্বাধীনতা চান আর না চান, ওটা আজ বাস্তব সত্য। পর-পুরুষের সামনে মেয়েদের বের হওয়া ভাল মনে করুন আর মন্দ মনে করুন, ছোট কেরানী থেকে শুরু করে বড় বড় রাষ্ট্রনায়ক এবং রাষ্ট্রদূত পর্যন্ত অনেকেই আজকাল স্ত্রীকে সংগে নিয়ে শুধু যে রাস্তায় হাওয়া খেতে বের হন তাই নয়, মার্কেটিং করেন, সভা-সমিতি ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদেন, এবং নারীপুরুষ নির্বিশেষে অনেক সময় হ্যাণ্ডসেকও করেন। এই নিয়ে নিষ্ফল গুঞ্জন কিছু কিছু শোনা গেলেও, জাতীয় নেত্রীদের ব্যাপারে তারও আজ অস্তিত্ব নেই। বেগম শাহনওয়াজ, ফাতেমা জিন্না বা শায়েস্তা একরামুল্লাহ এঁরা শুধু নারীদের নন, দেশের সর্বসাধারণের শ্রদ্ধেয়া। এঁরা দেশে বিদেশে সফর করেন, সভাসমিতি ও পার্লামেন্টে বক্তৃতা করেন, এতে অস্বাভাবিক কিছু আছে বলে কেউ মনে করেন না। তারপরও মেয়েদের জীবিকার্জনের প্রশ্ন। আস্তে আস্তে এ প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে।... শিক্ষয়িত্রীর আবির্ভাব হয়েছে মধ্যযুগ থেকেই, এযুগে দেখা দিচ্ছেন আস্তে আস্তে মহিলা ডাক্তার, টেলিফোন-অপারেটর, টাইপিষ্ট ও ষ্টেনো-টাইপিষ্ট, রয়টারের রিপোর্টার, একাউন্ট্যন্ট প্রিভেন্টিভ অফিসার, শিল্পপতি, এমনকি এয়ারহোস্টেস, ও সিনেমাঅভিনেত্রী—বিশ্বাস করুন—এই পাকিস্তানেই।... অনেকেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবেন এসব দেখে, শিউরে উঠবেন,...., বলবেন, 'না না এসব আমরা চাইনি, আমরা চেয়েছিলাম ইসলামীরাষ্ট্র, এবং তাই আমরা চাই। কিন্তু এসব যে পুরাদস্তুর অনৈসলামিক। এসব দমন করতে হবে।' কিন্তু বিপদ এইযে, এসব অনৈসলামিক কাণ্ড কারখানারও প্রচুর সমর্থন পাওয়া যাবে। অনেক যুক্তি দেখিয়ে...কোরাণ হাদিসের ব্যাখ্যা করে তাঁরা বলবেন, "... ইসলামের আক্ষরিক ও বিকৃতব্যাখ্যা করে তোমরা প্রগতির পথ রুদ্ধ করতে পারনা। ভুলে যেওনা, ইসলাম সকল দেশের সকল যুগের উপযোগী ধর্ম। ভুলে যেওনা, তোমরাই একদিন স্যার সৈয়দ

Dhaka University Institutional Repository

আহমদকে পদেপদে বাধা দিয়েছিলে, ইংরেজী শিক্ষার বিরোধিতা করেছিলে, ইকবাল-নজরুলকে প্রথমদিকে গোমরাহ বলেছিলেন। ভুলে যেওনা, কায়েদে আজম খাঁটি মুসলমান নন, তিনি নামাজ পড়েন না ইত্যাদি বলে তোমরাই একদিন লীগের সংহতিতে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা করেছিলে," ইত্যাদি। স্থানকালভেদে ইসলামের বিচিত্র রকমের ব্যাখ্যা যুগেযুগে করা হয়েছে, আজও করা হচ্ছে। ইসলামীরাষ্ট্রে পাকিস্তানের আইনকানুনে নারীদের ভোটাধিকার স্বীকার করা হচ্ছে, আবার ইসলামেরই নাম করে মিসরে নারীদের ভোটাধিকার দেওয়া হচ্ছেনা। এ বিশ্বাসও আমি করি যে, মিসরের নারীরা একদিন ভোটাধিকার পাবে, এবং শুধু তাই নয়, ইসলামের নামেই পাবে।"

লেখক অত্যন্ত দূরদৃষ্টির সঙ্গেই লক্ষ্য করেছিলেন যে ঃ 'পাকিস্তানের মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজের যে রূপান্তর দেখা যাচ্ছে, তা ইসলাম অনুমোদিত পথেই ঘটছে কিনা' সে প্রশ্নের মীমাংসা করার সামর্থ কারুরই নেই। কারণ অতীতে এসব সামাজিক প্রশ্ন নিয়ে অনেক বাহাস হয়ে গেছে কিন্তু মীমাংসা হয়নি, অথচ সমাজের রূপান্তরও নিশ্চল হয়ে থাকেনি। "কখনো ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা করে, কখনো বা সেরূপ ব্যাখ্যার অপেক্ষা না করেই মুসলিম মধ্যবিত্তরা আধুনিক জগতের সংস্কৃতি, ভাবধারা ও জীবনযাত্রাপদ্ধতিকে গ্রহণ করেছে এবং করছে। এইটেই আজকের মুসলিম সমাজের প্রবণতা। সামন্তযুগীয় সংস্কৃতি, ভাবধারা ও জীবনযাত্রাপদ্ধতি কখনোবা কিছুটা বিতর্কের পর, কখনোবা নিঃশব্দে পরিত্যক্ত হচ্ছে। অথচ যা পরিত্যক্ত হচ্ছে, তা হয়তো এতদিন ইসলামী সমাজেরই বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হয়েছে এবং আজ পরিত্যাগ করার সময় হয়তো তাকেই ইসলামের বিকৃতি বলে পরিত্যাগ করা হচ্ছে।' পুরাতনকে পরিত্যাগ করার এবং নতুনকে গ্রহণ করার এইযে প্রবণতা, মুসলমানসমাজের এই যে রূপান্তর, এর সবই যে ভাল আর এর সবই যে ইসলাম-অনুমোদিত, তা হয়তো নয়। কিন্তু একে রোধ করা কি আর সম্ভব? "নাচ, গান, সিনেমা, থিয়েটার নারীস্বাধীনতা, এসবই যুগধর্ম। এই যুগধর্মকে কি অস্বীকার করা সম্ভব?" জনাব আবদুল হক বলেন ঃ 'অন্যে যাই মনে করুন, আমি তো তা সম্ভব মনে করিনা। কারণ, এসব নিছক যুগধর্ম বা যুগের হুজুগ নয়। একটা অপ্রতিরোধ্য রূপান্তর রয়েছে এই সামাজিক রূপান্তরের মূলে—সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক রূপান্তর। পাকিস্তানের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি আজ দ্রুত রূপান্তরিত হচ্ছে বুর্জোয়া অর্থনীতিতে, এবং এই বুর্জোয়া অর্থনীতির উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে মুসলিম বুর্জোয়াসমাজ ও মুসলিম মধ্যবিত্তসমাজ, এই অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে উঠেছে তাদের নতুন সংস্কৃতি, ভাবধারা ও জীবনযাত্রা পদ্ধতি। অর্থনীতি বদলে যাবে অথচ সমাজের মানসজগত ও বহিরঙ্গ বদলাবেনা, এটা অসম্ভব। অবশ্য তারই সঙ্গে রয়েছে বিদেশী সমাজ ও সংস্কৃতির অনিবার্য প্রভাব। বায়ু যেমন সর্বগামী, এই প্রভাবও তেমনি সর্বগামী। এ প্রভাব বন্ধ করা যেত, যদি এমন একটা ব্যবস্থা করা সম্ভব হতো যে, উচ্চশিক্ষা, শিল্প, ব্যবসায়, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সম্মেলন—কোনো উপলক্ষেই পাকিস্তান থেকে কাউকে বিদেশে যেতে দেওয়া হবে না এবং বিদেশ থেকেও কেউ এদেশে আসতে পারবেনা, বিদেশ থেকে কোনো সিনেমা বা বই পত্রিকা আমদানী করতে দেওয়া হবেনা, রেডিও ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না, এক কথায় বলতে গেলে, পাকিস্তানকে আট কোটি রবিনসন ক্রুশোর জাতিতে পরিণত করা হবে। সেটা সম্ভব নয়। মুসলিম সমাজে আজ যেসব নতুন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, সেগুলো তাই অনিবার্য, সেগুলোকে ইসলামী বলে স্বীকার করুন চাই না করুন।"

পাকিস্তানের সংস্কৃতিতে ইসলামীভাবাদর্শের সংযোজন নাঘটে যতোসব অনৈসলামিক ভাবধারার সংযোগ হচ্ছে বলে যাঁরা ব্যথিত হৃদয়ে বলবেন, পাকিস্তান যে ইসলামী রাষ্ট্র, তাকি মিথ্যা? পাকিস্তানে গড়ে উঠবে ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী সমাজ, বিকাশ লাভ করবে ইসলামী সংস্কৃতি—এসবই কি নেহাৎ কল্পনা? এর জবাবে লেখক বলেন, এসব কল্পনা বা মিথ্যা যদিও নয়, "তবু এটা কি কল্পনা করা যায় যে পাকিস্তানে ব্যাংক এবং ইন্সিওরেন্স ব্যবসা, সেভিংসসার্টিফিকেট ও গভর্ণমেন্ট লোন ইত্যাদি থাকবেনা, আর থাকলেও তাতে সুদের প্রয়োগ থাকবে না? 'এটা কি কল্পনা করা যায় যে, নিছক ইসলামী কারণেই মহিলা ন্যাশনাল গার্ড, মহিলা ন্যাভাল রিজার্ভ, গার্ল গাইডস ও বু বার্ড ভেঙে দেয়া হবে? এটা কি কখনো কল্পনা করা যায় যে, ভাবীকালের পাকিস্তানে একটি মহিলাকেও বোরখা ছাড়া রাস্তায় বের হতে দেওয়া হবে না, একটি মহিলাকেও রিপোর্টার, টেলিফোন-অপারেটর, টাইপিষ্ট ও ষ্টেনোটাইপিষ্ট, একাউন্ট্যান্ট ও প্রিভেন্টিভ অফিসার, এম. এন. এ ও এম. এল. সি হতে দেয়া হবেনা? মেয়েপুরুষের মিশ্রিত মজলিশে কোনো মেয়ে গান গাইতে পারবেনা, নাচতে পারবে না, থিয়েটারে অভিনয় করতে পারবে না, সিনেমায় অভিনয় করতে পারবে না এবং সাফসুফ কথা—নাচ, গান, থিয়েটার ও সিনেমা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে— এটা কি কল্পনা করা যায়? মেয়েরা অংশ নিক আর না নিক, ইসলামী সংস্কৃতির কথা বিবেচনা করেও তো নাচ, গান, থিয়েটার, সিনেমা, জারি, সারি ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা উচিত। এও কি আশা করা যায় যে, বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য কোনো মেয়েকে বিদেশে পাঠানো হবে না (কারণ বিদেশে পর্দা নেই) এবং দেশে আমাদের নেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্রনায়কদের পত্নী ও বিদেশে আমাদের রাষ্ট্র-প্রতিনিধিদের পত্নী বিনা বোরখায় সামাজিক অনুষ্ঠানে বের হতে পারবেন না? প্যান্ট, কোট, টাই ও হ্যাট পরা এবং দাড়ী কামানো কেরাণী থেকে শুরু করে উচ্চতম রাষ্ট্রনায়ক পর্যন্ত সকলের পক্ষেই নিষিদ্ধ করা কি সম্ভব? মুসলিম সমাজের যে প্রবণতা আজ লক্ষ্য করছি, তাতে মনে হয়, এ সমাজের কাছে এসব প্রশ্ন অপ্রাসংগিক, অনাবশ্যক, প্রতিক্রিয়াশীল। আধুনিক জীবন ছেড়ে মধ্যযুগীয় জীবনে ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন যেমন উঠতে পারে না, আধুনিক জীবনের এই বহিরঙ্গ ও এই সংস্কৃতিকে বর্জন করার প্রশ্নও তেমনি উঠতে পারেনা। মোটের উপর, পক্ষীশাবক আজ ডানা মেলে নয়া দিগন্তের সন্ধানী, তাকে জন্মনীড়ে বেঁধে রাখার চেষ্টা বৃথা।"[২১]

মোহাম্মদীর একজন প্রধান লেখক, চিন্তাবিদ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী 'আমাদের সাংস্কৃতিক সমস্যা' নিয়ে ভেবেছেন গভীরভাবে এবং তিনি জাতির সামনে উপস্থিত করেছিলেন কতিপয় বক্তব্য—যা তখন অবশ্যই গুরুতর ভাবনার পরিচায়ক বলে স্বীকৃত হয়েছিল। বলাবাহুল্য, পাকিস্তানবাদী লেখক হিসেবে বিভাগপূর্বকাল থেকেই মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী পাকিস্তানের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে সুপ্রচুর লিখেছেন। এই প্রবন্ধেও তাঁর ভাবনার আন্তরিকতা পাঠককে স্পর্শ করে। 'সাংস্কৃতিক সমস্যা' নিয়ে আলোচনার প্রারম্ভেই তিনি সংস্কৃতির 'সংজ্ঞা' নিয়ে ভেবেছেন, লিখেছেন ঃ 'সংস্কৃতির সংজ্ঞা যা-ই হোক না কেন, সংস্কৃতি বলতে আমরা এ-যুগে সাধারণত বুঝতে শিখেছি, চারুকলা, সংগীত, নৃত্য ও অভিনয়। অভিনয় বলতে বোঝায় সাধারণত নাট্যাভিনয় ও সিনেমা বা চিত্রাভিনয়।' এ-সম্পর্কে আলোচনা না করলে

Dhaka University Institutional Repository

'সংস্কৃতির কতকাংশ বিঘ্নিত বা কোণঠাসা হয়ে থাকতে বাধ্য হবে'। তার ফলে সাধারণ সমাজের সঙ্গে সংস্কৃতির যোগাযোগ নিবিড় বা ব্যাপক হয়ে উঠবেনা। 'অথচ সমাজের সঙ্গে সংস্কৃতির অবাধ মিল-মিশ না ঘটলে তাকে সাংস্কৃতিক জীবনের সুস্থ বা স্বাভাবিক অবস্থা বলা যায়না।' লেখক বলেন, পাকিস্তানে 'ইসলামের আসন রচিত হবে' একথা সাধারণভাবে সর্বত্র স্বীকৃতিলাভ করার জন্যই সংস্কৃতি সম্পর্কে ভালোভাবে সব কথা ভেবে দেখার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা নাচগান, অভিনয়, চারুকলা, সাহিত্য প্রভৃতির অধিকাংশেরই প্রকাশ ও বিকাশ ইসলামের প্রথম যুগে (প্রসার ও আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের যুগে) সম্ভব ছিলনা। 'কাজেই মক্কীয় ও মদিনীয় ইসলামের প্রধানতম বা একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল কঠোর শাসন ; নিরলস সংগঠন ও নিশ্ছিদ্র নিয়মানুবর্তিতা। যখন বেঁচে থাকা ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করাই সব-চাইতে বড়ো সমস্যারূপে দেখা দেয়, সে-অবস্থায় এছাড়া আর কোনো দিকে মানুষ মনোনিবেশ করার ফুরসৎ বা সুযোগ পায়না। সেটা আসে পরে, যখন আত্মরক্ষার প্রশ্ন আর থাকেনা, কিংবা বিশেষ জোরালো থাকেনা ; এবং শক্তির প্রতিষ্ঠা অনেকখানি সন্দেহাতীত হয়ে দাঁড়ায়। এটা আরবীয় ইসলামের জীবনেও সত্যি হয়েছিল। মদিনীয় যুগের পরবর্তীকালে তার অনুবর্তীদের ভেতর সংস্কৃতির প্রকাশ ধীরে ধীরে দেখা দিতে থাকে। দেশ, কাল ও পাত্রভেদে তাতে অনেক রকমের বৈচিত্র্যও এসে পড়ে। সিনেমার ব্যাপারটা অত্যন্ত আধুনিক যুগের ঘটনা। এছাড়া কৃষ্টিগত জীবনের প্রায় আর সব-কিছুই মুসলিমরা স্বীকার করতে থাকেন। সুতরাং আজকার সমস্যাটা এ নিয়ে নয়। সমস্যা হলো এই যে, কৃষ্টি-সংস্কৃতির যেসব উপকরণ মদিনা-পরবর্তী যুগে মুসলিমরা ক্রমে ক্রমে গ্রহণ বা আয়ত্ত করেছিলেন, তার অনেক কিছুই ইসলামের শাস্ত্রিক ব্যাখ্যাতাদের অনুমোদন পায়নি। ফলে শাস্ত্রীয় ইসলাম ও মুসলিমদের সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যে কালে কালে একটা অসংযোগ বা অসম্মিলন, এমনকি বলতে গেলে একটা বিরুদ্ধতার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এর পরিণতি শুভ হয়নি। সংস্কৃতি অবশ্য মারা পড়েনি, কিন্তু সে কোণগ্রস্ত হয়ে রয়েছে, এবং সমাজের গোটা অবয়বে জায়গা জুড়ে বসতে পায়নি—সহজে, স্বচ্ছন্দে বা বিনা দ্বিধায়। যতোটুকু স্থান সে পেয়েছে, সেখানে শাস্ত্রীয় ইসলামের দিক থেকে তার জন্যে কোনো অভ্যর্থনা নেই, বরং আছে তিরস্কার ও বহিস্কারের উদ্যত দণ্ড।'

এই সমস্যার বা পরিস্থিতির মোকবিলা কিভাবে হবে স্বাধীন পাকিস্তানে? সংস্কৃতি কি এখানে 'চোরাকারবারের শামিল হয়ে থাকবে? না, তাকে খোলা হাওয়ায় চলতে ফিরতে দেয়া হবে?' এই প্রশ্ন সামনে রেখে লেখক প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা শেষে নিজস্ব মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন। 'সাহিত্য' সম্বন্ধে তিনি বলেন, আইনেই অশ্লীল সাহিত্য নিষিদ্ধ রয়েছে। চারুকলা বা চিত্রশিল্প কিন্তু এতোখানি অবাধ বা অনিন্দিত হতে পারেনি। এরও চর্চা ও উপভোগ চলছে, সরকারী পৃষ্ঠপোষণও রয়েছে, তবে মুদ্রা, কারেন্সী, নোট বা ডাক-টিকিটে এখনও প্রাণীর ছবি ছাপা হচ্ছে না। 'গীতবাদ্যও সরকারীভাবে—অন্তত এ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়নি। কিন্তু কখনও হতে পারেনা বা হবে না কি? আর যদি নাও হয়, পাকিস্তানী মুসলিমসমাজে—সাধারণভাবে তার চল্ হতে দেয়া হবে কি? যদি না হয়, সংস্কৃতির এই দিকটা সমাজের এক কোণে পড়ে থাকতে বাধ্য হবে ; সাধারণের সমাদর সে কোনোদিনই পাবেনা। সে-অবস্থায় সংস্কৃতির এই দিক দিয়ে আমাদের গোটা সামাজিক অবয়ব ক্ষুদ্র ও ক্ষুন্ন হয়ে থাকবে। তাকে সমাজের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বলা চলবে কি?' লেখক বলেন, এটা ভরসার কথা যে, ইসলামের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে কেউ কেউ যন্ত্র-সঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীতকে নির্দোষ বলে ফৎওয়া দিয়েছেন। "কিন্তু এও দেখবার বিষয় যে, এইসব শ্রদ্ধাস্পদ ফৎওয়াদাতার মধ্যে সম্ভবত কেউই আজ পর্যন্ত গীত-বাদ্য-চর্চার মজলিসে শরীক হওয়াও পছন্দ করতে পারেননি, পরিবারের গীত-বাদ্যের প্রচলন তো বহুত দূরের কথা। সুতরাং এক্ষেত্রে কিছুটা ভরসা পাওয়া গেলেও সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। মানে, গীত বাদ্যের পিয়াসী মুসলিমদের পক্ষে পারিবারিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে— মাতা, ভগিনী, জায়া, কন্যা ও পিতা-ভ্রাতা-পুত্রের সাহচর্যে সেটা চর্চা বা উপভোগ করার কথা চিন্তা করা সাধারণত সম্ভবপর নয়।"

লেখকের পূর্বোক্ত বক্তব্য সঙ্গীত সম্পর্কে কতকটা বিভ্রান্তিকর, তা তাঁর এই বক্তব্যেও সুপ্রকট। ওয়াজেদ আলীর মতে সঙ্গীত পিপাসা মেটাতে হলে যেতে হবে 'ভদ্র' বা 'কুৎসিৎ' যে কোনো মজলিস বা আস্তানায়। 'শুধু ভদ্র স্থানে যেতে হলে কৃষ্টির প্রকাশ অন্তত সংকীর্ণ বা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে। আর ইতর জায়গায় যেতে হলে তার সংকীর্ণতার ছিদ্র-পথে সমাজদেহে নোংরামি প্রবেশ করবে।' যেনো বেশ্যালয় বা বাঈজী পাড়া ছাড়া নাচ-গান কেউ করেনা এবং গীত-বাদ্য পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে একদমই উপভোগ করা অসম্ভব। গীতবাদ্য প্রসঙ্গে লেখকের এই মন্তব্য খুবই লক্ষণীয় যে এসব শুনতে হলে বেশ্যালয়ে যেতে হবে। যন্ত্র ও কণ্ঠসঙ্গীত সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য : "মোট কথা হলো, যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীত সাধারণভাবে সমাজে অপাংক্তেয় হয়ে থাকবে কিনা, সে-বিষয়ে মত একটা স্থির হওয়াই দরকার। যদি একে চলতে দেয়া না হয়, তাহলে একদম বন্ধ করে দিয়ে সংস্কৃতি র অংগচ্ছেদ ঘটানোর জন্যে অন্ততঃ চেষ্টা পাওয়া সঙ্গত হবে। আর যদি চলতে দেয়াই উচিত ভাবা হয়, সেই অভিমতকে সাধারণভাবে সমাজে চালু হওয়ার সুযোগ দেয়াই ঠিক হবে। যাঁরা সাংস্কৃতিক সম্মেলন বসাতে প্রায়ই উৎসাহ প্রকাশ করে থাকেন, তাঁদের উচিত এসম্পর্কে একটা পরিস্কার সিদ্ধান্ত স্থির করা বা দাবী করা। সমস্যার খানিকটা মনের ভেতর পুষে রেখে এবং বাকী খানিকটা সংকোচে বা নিরাপদ সংকীর্ণতার ভেতর ছড়িয়ে দিয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্যার কোনো সুরাহা হতে পারেনা। যোগ্য ব্যক্তিদের এ সম্বন্ধে আলোচনায় নেমে পড়া একান্ত কর্তব্য। নাচের সমস্যাটিও কম ব্যাপক বা গুরুত্বপূর্ণ নয়। একটা শিল্প হিসেবে নৃত্য মুসলিম কৃষ্টির ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। কিন্তু এর সংগে এমন অনেক প্রশ্ন জড়িয়ে আছে, যেগুলোর সম্বন্ধে আজকার ধারণা সুস্থির হওয়া প্রয়োজন ; এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নৃত্যের সমস্যাটা শুধু পুরুষ জাতির সঙ্গে জড়িত নয়; নারী জাতির সঙ্গেও এর সম্বন্ধ কল্পনা করে মত ঠিক করতে হবে। নাচকে যদি ইসলাম-সম্মত জীবনে স্থান দেয়া সংগত বা সম্ভবপর ভাবা চলে, তাতে পুরুষের মতো নারীরও অংশগ্রহণের প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে দেখা দেবে। এর একটা মীমাংসা হওয়া উচিত।.... নৃত্য কলা গ্রহণীয় হলে তাকে পারিবারিক ও প্রকাশ্য—দুইরূপেই বিচার করতে হবে, এবং নারী-পুরুষ উভয়ের দিক থেকেই দেখতে হবে।... সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে অভিনয়ের প্রসংগটি আরো জটিল, আরো গুরুতর, আরো চিন্তাসাপেক্ষ। গাঁ-গ্রামে জারি, যাত্রা, কবি ইত্যাদি সঙ্গীত ও অভিনয়ের আখড়া পূর্বে যতো সংখ্যায় ছিল, ইসলামের নৈষ্ঠিক রূপের অভিযানের ফলে এখন আর ততো সংখ্যায় নেই। কিন্তু শহরে এগুলো সংস্কৃতির অংগ হিসেবে বেশমতোই মুখ পাচ্ছে ;... শাস্ত্রীয় ইসলামের নৈষ্ঠিকরূপের ব্যাখ্যাতাদের পক্ষথেকে এ সম্পর্কে শ্রুতিযোগ্যভাবে তেমন কিছুই বলা হচ্ছে বলে

Dhaka University Institutional Repository

জানিনে। এটা কিসের লক্ষণ, বলতে পারিনে। হয়তো সংস্কৃতিকামীদের মুকাবিলায় ঐসব ব্যাখ্যাতা আর শক্তি অনুভব করছেন না ; কিংবা হয়তো পাকিস্তানে ইসলামের গৃহে সংস্কৃতির এই প্রকাশকে স্থান দেয়া হবে বলে প্রকারান্তরে বুঝতে দেয়া হচ্ছে। ব্যাপার যাই হোক, শহরে, বাজারে, গঞ্জে, যাত্রা, থিয়েটার ও সিনেমার প্রসার ও প্রভাব প্রাক–পাকিস্তান যুগের চাইতে এখন ঢের বেশী বেড়ে গেছে এবং আরো যাবে বলে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে। এর তাৎপর্য কী?"... সিনেমাকে সংস্কৃতির অংগ হিসেবে পাকিস্তানে স্থান দিতে হলে নারী অভিনেত্রীদের কথাও চিন্তা করতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, অভিনেত্রী কোথায় পাওয়া যাবে? সাধারণ সমাজ থেকে? না, সাধারণ সমাজের সংগে সম্পর্কহীন বিশেষ বিশেষ গৃহ বা পরিবার থেকে? অর্থাৎ জিজ্ঞাসার বিষয়—অভিনেত্রীরা সমাজের স্বাভাবিক অবস্থানে এসে দাঁড়ানোর অধিকার পাবেন কিনা। 'যদি না পান, যাত্রা, থিয়েটার বা সিনেমাকে কৃষ্টির অংগ মনে করার পক্ষে যৌক্তিকতা কি।' অভিনয়শিল্প সমাজ উপভোগ করবে 'অথচ যোগানদার নারী–শিল্পীর সম্মানজনক অবস্থান সমাজে হবেনা, এরূপ পরিস্থিতি প্রশান্তচিত্তে কল্পনা করা, অন্তত–ইসলামের দিক দিয়ে, কঠিন ; অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। সমাজের এক অংশ সুস্থ ও স্বাভাবিক বলে গণ্য হবে, অপর এক অংশ ইতর ও অপাংক্তেয় বিবেচিত হয়ে কোণে পড়ে থাকবে, এই ধরণের ব্যবস্থাপনাকে সমাজসম্পর্কে ইসলামী পরিকল্পনার অন্তর্গত ভাবা চলে না।... আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের এই সব সমস্যা ছাড়াও আর একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। আমাদের গ্রাম্য সংস্কৃতি ও শহুরে সংস্কৃতি অনেকখানি আলাদা হয়ে পড়েছে। গাঁ-গ্রামের সাংস্কৃতিক জীবনে অপরিচ্ছন্নতা ও অশালীনতা দেখা যায়, শহরে পারিপাট্য ও ভদ্র পরিবেশের চাকচিক্য। ইসলাম–পরিকল্পিত সমাজে এই প্রভেদ কি স্বাভাবিক ও সহনীয়? কৃষ্টির মূলভিত্তি হলো শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চা। ইসলামে বিদ্যাচর্চা প্রত্যেকটী মুসলিম পুরুষ এবং প্রত্যেকটী মুসলিম নারীর পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য বলে নির্দেশিত হয়েছে। কিন্তু এতো দিন এই নির্দেশ কার্যত উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। ফলে যেখানে শতকরা প্রায় নব্বইজন মুসলিমের বাস, সেই গ্রামে অশিক্ষা ও অবিদ্যার রাজত্ব চলছে ; বিশেষ করে নারীসমাজকে মূর্খতার আস্তাকুঁড়ে রাখা হয়েছে। শহরের অবস্থা এর চাইতে সামান্য কিছুটা উন্নত। এরই পরিণতিস্বরূপ পাড়াগাঁ ও শহরে সাংস্কৃতিক জীবনের প্রকারে ও প্রকাশে বিরাট ব্যবধান গড়ে উঠেছে। তার কারণ শিল্পী, সাহিত্যিক ও শিক্ষিত লোকদের সমাবেশ ঘটে শহরেই ; এবং সংস্কৃতির উপকরণ ও আয়োজন যাঁদের হাতে, সেই ধনীরাও সুযোগ ও লাভের প্রত্যাশায় ছোটেন সেখানেই। পাকিস্তানের এই ধরণের অব্যবস্থা চলতে থাকবে বা চলতে দেয়া হবে কিনা ; এবং চলতে দেয়া হলে' তার পরিণতি কি হবে তা সমাজ–নায়কদের ভেবে দেখতে হবে।... উপসংহারে লেখকের মন্তব্য ঃ

> "আমার মূল বক্তব্য এই যে, আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রকাশ বলতে যে-যে বিষয় ও বস্তু আমরা বুঝতে চাচ্ছি, তার সঙ্গে ইসলামের এবং প্রত্যেকটী মুসলিম নর ও নারীর সম্পর্ক নির্ণয় করতে হবে। সংস্কৃতির ব্যাপক প্রকাশ ও সমাজের ওপর তার প্রতিক্রিয়ার শেষ পরিণতি সম্পর্কে আজ আমাদের চিন্তা কুণ্ঠিত বা জড়তাগ্রস্ত থাকলে জোড়াতালি বা গোঁজামিল দেখা দিতে বাধ্য। এ অবস্থা সামাজিক স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। সমাজদেহের ওপর সংস্কৃতিকে গোঁদ হয়ে থাকতে দেয়া যায়না। তাকে হয় ছেঁটে ফেলতে হবে, নয়তো সমাজের আবয়বিক স্বাস্থ্যে তাকে পরিশোষণ করে তার অঙ্গশ্রীকে স্বাভাবিক চেহারা দান করতে হবে। নইলে ইসলাম রুগ্ন, দ্বিধাগ্রস্ত, সুতরাং কৃত্রিম বা শক্তিহীন হয়ে শুধু বঞ্চনাই বহন করে চলবে। তার এই অগৌরবকে স্থায়ী করার জন্যেই কি পাকিস্তান কায়েম হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের ... সাংস্কৃতিক সমস্যার.... সম্মুখীন হওয়া ... কর্তব্য।"

পাকিস্তানোত্তর কালের ইসলামী—সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য ঃ'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ইসলাম সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ রূপ নেয়ার পরিবর্তে যেন তার ত্রিধা বিভক্ত হয়ে পড়ার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। এক দল পাশ্চাত্য আধুনিকতাবাদের প্রায় সবটুকুকেই ইসলাম এবং তার বিপরীত প্রায় সবকিছুকেই ইসলাম-বিরোধী বলে প্রচার করছেন। অন্যদল পুরানো শাস্ত্র–ব্যাখ্যাতাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিবেচনায় প্রবৃত্ত হয়ে আধুনিকতাবাদের প্রায় সবকিছুকেই অপাংক্তেয় বলে ব্যবস্থা দিচ্ছেন। তৃতীয় মধ্যপন্থী একদল এই দুই মতবাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুহাত দুদিকে বাড়িয়ে রেখেছেন। এইসবের মধ্যে প্রথমোক্ত দলটিকে নিয়ে সংস্কৃতির দিকদিয়ে কোনো সমস্যা নেই, কেননা তাঁরা সমাজের যেরূপ কল্পনা করছেন, তার ভেতর সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা সর্ববিধ প্রতিক্রিয়া বা পরিণতিই সহনীয়, এমনকি গ্রহণীয়। এক হিসেবে দ্বিতীয় দলটিকে নিয়েও কোনো সমস্যা নেই ; কেননা তাঁরা সংস্কৃতির অধিকাংশকেই বাদ দিয়ে সামাজিক অবয়বের রূপ কল্পনা করতে আগ্রহশীল—যদিও তাঁদের সে আগ্রহ আজ বহুলত উপেক্ষার সম্মুখীন। এই দুই দলে সংঘর্ষ নিবারণের ব্রত নিয়েছেন মধ্যপন্থী দল এবং তাঁদের জন্যেই সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আধুনিকতাবাদের খানিকটা বাদ দিতে তাঁরা উৎসুক ; প্রাচীনপন্থীদেরও অনেক বক্তব্য তাঁরা ঝেড়ে ফেলতে চান। ফলে সংস্কৃতি তে-টানার মধ্যে পড়ে একটা গোঁজা-মিলের আকার নিয়েছে। সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে সিনেমা পর্যন্ত সবখানেই চলছে এই গোঁজামিল। পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য যাঁরা ভাষা ছাড়ছেন এন্তার, আশা করছেন বিস্তর এবং আয়োজন করছেন সুদীর্ঘসূত্রী, এ গোঁজামিলে তাঁরা হয়তো আস্বাদ পাচ্ছেন দেদার ; কিন্তু সমস্যা তার ফলে ঘিরে ধরছে গোটা সমাজজীবনকে। এই সমস্যায় অনেক আশংকা লুকিয়ে আছে। সেগুলো বাঘ হয়ে আমাদের গ্রাস করবে, এরূপ সুযোগ বা সম্ভাবনা থাকতে দেয়া কখনই উচিত নয়।"[২২]

'সংস্কৃতি' নিয়ে অনেক আলোচনাই হয়েছে, কিন্তু ইসলামীধারার সংস্কৃতি ছাপিয়ে আধুনিক বুর্জোয়া সংস্কৃতিই চাঙ্গা হয়ে উঠেছে ; জাগ্রত হয়েছে শোষিত জনগণের সংস্কৃতি-চিন্তা। এগুলোর জন্য অবশ্য ধর্মীয় ভাবধারার পত্রিকার কৃতিত্ব সামান্য। সংস্কৃতিক অঙ্গনের বর্তমান পরিস্থিতির বিবরণ দান করাতেই এঁদের উদ্যোগ বেশিরভাগ সীমিত। সংস্কৃতিকপরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য জোরালো বক্তব্য এঁরা উপস্থাপন করতে পারেন নি। গাড়ী চলে যায়, ধোঁয়া পেছনে পড়ে থাকে। মোহাম্মদীর সংস্কৃতিচিন্তা অনুরূপ—সমাজ এগিয়ে চলেছে—মোহাম্মদী আলোচনা করেছে পরে—কিসের কোনটি কতোটুকু ইসলামিক, কি অনৈসলামিক ইত্যাদি। তবু এঁরা ধর্মভীরুদের কাছে আধুনিক সংস্কৃতিকে গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরীর যুক্তিবুদ্ধি নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছিলেন, এবং এঁদের সংস্কৃতি-জিজ্ঞাসার জবাব দিয়ে পাঠকচাহিদা নিবৃত্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ 'আমাদের সমাজ সংস্কৃতি ও ধর্ম', শীর্ষক প্রবন্ধে 'সংস্কৃতি' শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে পাকিস্তানের সমাজ-ভাবনায় সংস্কৃতি-চিন্তার গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "সংস্কৃতির সাধারণ অর্থ 'শোধন' বা Refinment. এই অর্থ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজীতে এর অর্থ করা হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

থাকে Refined state of the understanding and manners and tartes, plase of this prevalant at a time or place, instilling of if by training. এতদ্ব্যতীত শোধন বা রিফাইনমেন্ট ছাড়া সংস্কৃতির অন্য উপাদানও আছে, যেমন কলা ও কারুকলা, সাহিত্যসৃষ্টি এবং দৈনন্দিন খাদ্যতালিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকারের সাহায্যে অলংকরণ, চুলের বিনাস সাধন, অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া ও ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদিসহ ব্যষ্টিজীবনের যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান, হাবভাব এবং এমনকি জাতি কিংবা সমাজদেহের রীতি-নীতির বিভিন্ন কুসংস্কারগুলোকেও এর সাথেই ধরা হয়ে থাকে।... অবশ্য ইসলাম সংস্কৃতির যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছে তা সত্যি চিত্তাকর্ষক। শহুরে সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত হওয়ার প্রবণতার সাথে সাথেই ইসলাম অভ্যুদয়ের প্রাথমিক অবস্থায় সংস্কৃতির অর্থ আরবী শব্দকোষে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। 'তামাদ্দুন' আরবী শব্দ। একে আমরা ইংরেজী প্রতিশব্দ 'কালচার' অথবা বাংলা প্রতিশব্দ সংস্কৃতি বলে প্রয়োগ করে থাকি। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন, যারা অনুরূপ ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষ করে থাকেন। পরন্তু যদি আপনি 'তামাদ্দুন' এর বুৎপত্তিলব্ধ অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেন এবং স্বীকার করেন, যে, আধুনিক সংস্কৃতির উৎপত্তি শহুরে জীবনে, তাহলে আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে, অন্য যে কোনও শব্দ অপেক্ষা 'তামাদ্দুন'—এর সঙ্গত অর্থ-প্রকাশক। 'তামাদ্দুন' , 'মদিনা', 'শহর' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে, এর অর্থ নগর বা শহর।'

লেখক বলেন, এই "ব্যাখ্যার দ্বারা এই প্রতীয়মান হয় যে, কোন জাতি বা সমাজের মূল ও মোটামুটি জীবন-অভিজ্ঞতার সমষ্টিগত আখ্যাই সংস্কৃতি, তাহলে আমরা আর একটু বাড়িয়ে বলতে পারি যে, জাতির জীবন রূপায়নে ধর্মের দায় শুধু বৃহৎই নয়, বরং সনাতন ও নিয়ত প্রবহমান। আধুনিক জাতি একটা বিশেষ রাষ্ট্রের অধীনে উন্নীত হওয়ায় এবং জাতীয়তায় উপলব্ধি ব্যাপকতা লাভ করায় খৃষ্টান সংস্কৃতি এবং খৃষ্টান সভ্যতা এমনকি বর্তমানকালের শাসনব্যবস্থা পর্য্যন্ত ভাবাবেগের সমুদ্রে পরিণত হয়েছে, বিশেষ করে এটা যখন হিংস্রনীতিতে পৌছে। অন্যান্য ধর্মমতের মতই ইসলামও একটা ইসলামিক ও মুসলিম সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছে যা সর্বাপেক্ষা খাঁটি, ঐতিহাসিক, শক্তিশালী অস্তিত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু অন্যরূপ অন্যান্য ধর্ম কর্তৃক প্রবর্তিত সংস্কৃতি ইসলাম কর্তৃক প্রদত্ত সংস্কৃতির দানের সমকক্ষ হতে পারে না, কেননা সংস্কৃতিতে ইসলামের যে দান তা সরাসরি ব্যাখ্যা ও সুস্পষ্ট সমঝোতার দাবী করতে সক্ষম।... সুতরাং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এবং সমাজে ইসলামের যে ব্যাপক দান তা শুধু কতকগুলি ধর্মীয় বিধিবিধান ও প্রথার মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ নয়, ইসলাম দান করেছে একটা আদর্শ, এ আদর্শ ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে একটা সর্বসম্মত পদ্ধতিও। বিশ্ব উপলব্ধি ও মানবিক জীবন সংগঠনে সমতা রক্ষাকল্পে এ আদর্শ একটা সমাজজাতীয় জীবনপদ্ধতি—সমগ্র বিশ্বের জন্য একই সৃষ্টিকর্তার উপলব্ধি যার উৎপত্তি এক জাতীয়তাবোধের আবশ্যকতার মূল উৎস থেকে উৎসারিত এবং যার মধ্যে নিহিত রয়েছে সৃষ্টিরহস্যের ব্যাখ্যা এবং যে জন্য মানবসমাজে অংশ গ্রহণের আবশ্যকতা যা সমতা রক্ষার জন্য শিরা-উপশিরার মত ক্রিয়াশীল। এজন্যই সংস্কৃতির ইসলামিক উপলব্ধি হচ্ছে একদিকে সত্তার স্বীকৃতি... অন্যদিকে... সর্বোচ্চ আদর্শ ও সামাজিক গঠন তন্ত্র ব্যাপারে উপলব্ধি... ইসলামে আর্টে নগ্নতা এজন্য বর্জন করা হয়েছে, যেহেতু এর দ্বারা ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে অনিষ্টকর ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর যৌন চেতনায় অবাধমিলনকে এজন্য বর্জন করা হয়েছে যাতে করে জীবনের মূলভীতে অশ্লীলতা অনুপ্রবেশ করতে না পারে। জীবনে ও সমাজে শুধু আবশ্যকীয় মৌলিক বিষয়গুলির পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুশীলনের জন্যই ঐ সমূহকে ইসলামিক উপলব্ধির অন্তর্গত করা হয়নি... বিশ্বের এক জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ-জীবনের সমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে। .... যদি উপরোক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে অথবা ইসলামকে বুঝতে চেষ্টা করি এবং আমাদের জাতীয় সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখি তাহলে যেকোন বিরাট রকমের বাধাই আসুক না কেন, তাতে আমাদের ভীত হওয়ার কোনই কারণ নেই।... তাই পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের বিভিন্ন ধরণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে আমাদিগকে একজাতীয়তাবোধে সহায়তা করেছে। আমাদের দুই অঞ্চলের হাজার মাইল ব্যবধানও নিশ্চয়ই দুই ভাইয়ের, যাদের জীবন ইসলামিক মূলনীতির একই সূত্রে গাঁথা, মনের মধ্যে এক ইঞ্চি দূরত্বের ভাবও জাগাতে পারবে না। ইসলামিক এক জাতীয়তা জীবনের বিভিন্ন রকম প্রকারভেদকে অস্বীকার করে না ; যদি তাই হত তাহলে ইসলাম কিছুতেই উপজাতীয় আরবগণ ছাড়াও পশ্চিম দেশের সর্ব পশ্চিম প্রান্ত হতে সুদূর প্রাচ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত সমস্ত মানুষের হৃদয় জয় করতে মোটেই সক্ষম হতনা।... আমাদের দুই অঞ্চলের মধ্যে হাজার মাইলের ব্যবধান হলেও এক আল্লাহর বিশ্বাসই আমাদিগকে দুইটি অঞ্চলের মিলনে একটি সংযুক্ত জাতি সৃষ্টি করে দিয়েছে।"

উপসংহারে লেখক বলেন ঃ "জাতির দুর্বলতার উৎস হচ্ছে এর জীবনদর্শনের অভাব, সেদিক দিয়ে আমরা সুসমৃদ্ধ, উহাই আমাদের শক্তি।... কিন্তু শুধু বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের মূলনীতিগুলিকে বিপুলভাবে গতিদান আমাদের করতেই হবে ... আমাদিগকে খাঁটি মুসলিম তথা প্রকৃত মানুষ বলে প্রমাণিত করতে হবে।' পাকিস্তানের নাগরিকদের জীবনে ইসলামের যথাযথ প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন ইসলামের বুদ্ধিদীপ্ত প্রগতিশীল বা সঠিক ব্যাখ্যার। একাজ শিক্ষিতশ্রেণীর উপর নির্ভরশীল। তথাকথিত 'আলেম'দের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া 'উচিত হবে না'। 'ইসলামের ব্যাখ্যার পরিচালননীতি হবে ইসলামকে বর্তমানবিশ্বের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির (সহায়ক ধর্মাদর্শরূপে) তৈরী করা। আমাদের বেলায় পাকিস্তানকে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পবিষয়ক ব্যাপারে আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্রে উন্নীত করার জন্য ইসলামই হবে আমাদের একমাত্র অস্ত্র। আমরা বিপুল শক্তিতে সমৃদ্ধ একটা নতুন জাতি, আমাদের কোনকিছুরই অভাব নেই, শুধু অভাব হচ্ছে আত্মবিশ্বাসের। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত—আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি! কিন্তু এও সত্য যে, ইতিহাসের মধ্যদিয়ে জীবনের ভ্রমণপথে মানুষ প্রায়ই আত্মশক্তির কথা ভুলে যায়। আমাদের ব্যাপারে, যেখানে আমরা একটা নূতন রাষ্ট্রগঠনে মনোযোগী হয়েছি, আমাদের নিজস্ব শক্তির কথা ভুললে চলবেনা—যে শক্তি আমাদের দর্শনের শক্তি এবং যা প্রকৃত ইসলাম ও এর ইতিহাস সৃষ্টির গৌরবময় ঐতিহ্য।"[২৩]

রনেশ দাশগুপ্ত 'শিল্প ও সাহিত্যে জনগণের ভূমিকা' নির্ণয় করতে গিয়ে সংস্কৃতিক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের অভ্যুদয়-বিপ্লবাত্মক অভ্যুত্থানের জন্য জসীমুদ্দীন ও রমেশ শীলের ন্যায় কবি-শিল্পীর সংস্কৃতিবোধের বিকাশ চেয়েছেন। তিনি এক পর্যায়ে বলেন ঃ "আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারীর গণ-অভ্যুত্থান আমাদের সামনে রেখেছে উপরোক্ত জনতার তাগিদকে। জনতার অধিকার সচেতন সংগ্রাম আমাদের শিল্পীদের বিচ্ছিন্ন মেরুবাসী হতে দিতে পারেনা, দেবেনা। তবু হয়তো শেষ পর্যন্ত একটা প্রশ্ন থাকবে। শিল্পরূপের অবিশ্রান্ত প্রবাহের শরীক হওয়ার ব্যাপারে জনতা কি নিতান্ত তৃতীয়পক্ষ? শিল্পরূপের সৃষ্টির ব্যাপারে তার কি কোন প্রত্যক্ষ সক্রিয় ভূমিকা নেই? সেও কি শিল্পী হতে পারেনা? .... আজ এই সংগ্রামী জাতশিল্পীদের ডাক দিতে হবে। আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক অচলাবস্থা যেখানেসেখানে ঘটছে—সেখানে অভ্যুদয় ঘটানোর জন্যে একতরফা কিছু করার জন্য নয়, সর্বাত্মক মুক্তির জন্যে এই আহ্বান। জনতাকে হতে হবে সচেতন। শিল্পদৃষ্টিসম্পন্ন জনতা। রূপের জগতকে দিতে হবে মূল্য।"[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

৫. সমাজ-চিন্তা : মোহাম্মদীর সমাজ-ভাবনা অবশ্যই বিভাগপূর্ববর্তী কালে অগ্রগতির সহায়ক ছিল। পাকিস্তান-আন্দোলন পাক-ভারতীয় অথবা বিশ্বের মুসলিম সমাজের জন্য জাগরণের বা বিজয়ের পথে একধাপ অগ্রসরের সংগ্রামরূপে বিবেচিত হলে, এই আন্দোলনের দিক নির্দেশ এবং প্রেরণা-সঞ্চারে মোহাম্মদীর যে অবদান— অনুরূপ ভূমিকা বাংলাভাষার খুব কম সংখ্যক পত্রিকার পক্ষে পালন করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু বলাবাহুল্য, ১৯৪৭ সনের পরে দেখা গেলো পূর্ব বাংলার মুসলিম জনগণের জন্য পাকিস্তান সুফল বয়ে আনেনি। অতএব পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসার সাধনাই হলে বাংলার মুসলমানের প্রধান সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা। কিন্তু মোহাম্মদী পাকিস্তানের স্থায়িত্বই চেয়েছে। এদিক থেকে মোহাম্মদীর এই সীমাবদ্ধতা রয়েছে, এবং সত্যিকথা বলতে কি অন্যান্য প্রধান প্রখ্যাত পত্রিকাও বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারেনি। এই সীমাবদ্ধতা বাঙালীর বুদ্ধিজীবী সমাজের ছিল। তবে কিছু কিছু পত্রিকায় পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক আচরণ এবং বাঙালীর স্বার্থবিরোধী কার্যক্রমকে তীব্র ভাষায় প্রতিরোধ-প্রতিবাদ করা হয়েছে। এই বিবেচনাতেই বাঙালীর ভাষা সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অগ্রগতিতে পত্রিকাগুলোর অবদান বিচার করতে হবে। মোহাম্মদীতে কিছু প্রতিবাদ, প্রতিরোধ যে পাওয়া যায়না, তা নয়। তবে মোহাম্মদীর তথ্যনিষ্ঠ বহু আলোচনার মধ্যদিয়ে অন্যান্য পত্রিকাওয়ালারা এবং লেখক-বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় জানতে-বুঝতে পেরেছেন বহুকথা এবং তাঁদের নিজস্ব মতামত গঠনে মোহাম্মদীর আলোচনাগুলো প্রাণরস ও জীবনীশক্তি সরবরাহ করেছে—এই বিবেচনায় মোহাম্মদীর সমাজ-ভাবনার গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া, একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মাসিকপত্রিকার ব্যাপক স্টাবলিশমেন্ট এবং একটি দৈনিক পত্রিকার (আজাদ) সংবাদ, তথ্য, ও মুদ্রণসুবিধার সহযোগিতা লাভ করে মোহাম্মদী সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, কূটনীতি প্রভৃতি বিষয়ে যেসব মতামত মন্তব্য উপস্থিত করেছে—তা খুব কম সংখ্যক বাংলাপত্রিকাই করতে পেরেছে। তাছাড়া অন্যান্য পত্রিকা হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে এক বা দু কিংবা তিন চার বছর মাত্র প্রকাশিত হয়েছে, অথবা নিয়মিত বের হয়েছে ; তারপর হয় অনিয়মিত নয় বন্ধ হয়ে গেছে। পাশাপাশি মোহাম্মদী মোটামুটিভাবে ১৯৪৯ সন থেকে ১৯৭০ সন পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে (বিলম্বে এবং যুগ্ম সংখ্যা হিসেবে প্রকাশের কথা মনে রেখেই বলা হচ্ছে) গোটা পাকিস্তান আমলের সমাজ ও রাজনীতির মোটামুটি সকল প্রধান ঘটনার কথা তাই মোহাম্মদী তার পৃষ্ঠাগুলোতে ধারণ করে আছে, এবং স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মোহাম্মদী প্রায় সকল ঘটনা বা প্রসঙ্গ কিংবা সিদ্ধান্ত অথবা কার্যক্রম সম্পর্কে মতামত বা মন্তব্য প্রদান করেছে।

পাকিস্তানের প্রথম দিকে প্রধান সমস্যা ছিল অধিবাসী বিনিময়ের সমস্যা। এ-প্রসঙ্গে ১৯৪৭ সনের আগষ্ট মাসের আগের আর পরের বক্তব্য যে কতো প্রভেদাত্মক তা তাঁদের নিচের এই আলোচনা থেকেই বোঝা যায়। মনে রাখতে হবে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ, জিন্নাহ ও নেহেরু উভয়ই পাক-ভারত ভাগ হয়ে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হলে অপশনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রে 'হিজরতের' অধিকার নির্বিবাদে মেনে নেয়া হয়েছিল। ভাগ-বাটোয়ারা সম্পর্কে আগের অনেক কথাই বিভাগ-পরবর্তীকালে যে মানা হয়নি তার একটি নমুনা হলো লোক-বিনিময় সমস্যা নতুন করে উত্থাপন এবং তাতে নতুন যুক্তির অবতারণায়। মোহাম্মদী পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত করেছে, এবং বলাবাহুল্য ভারত-সরকারের কার্যাবলীর (বিহেবিয়ার) প্রতিক্রিয়াতেই পাকিস্তান এসব চিন্তা করেছে। ভারত পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষতিপূরণের টাকা দেয়নি, দুই অঞ্চলের অনেক নদীর পানি বন্ধ করে দিয়েছে, আর ১৯৪৮ সনের পাক-ভারত যুদ্ধের কথা এবং কাশ্মির-সমস্যার প্রসঙ্গ মনে রাখলে পাকিস্তানের এই মতান্তরের কারণ বুঝা যায়। পূর্ববঙ্গের হিন্দু অধিবাসী ভারতে গমনের পরিবর্তে ভারতের সকল মুসলমানকে পাকিস্তানে আনার কি সমস্যা মোহাম্মদী তা জনসংখ্যার বিশ্বস্ত পরিসংখ্যাণ তুলে ধরে স্পষ্ট করেই বলে : ১৯৪১ সনের আদমশুমারীর হিসাব মতে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা ছিল মোট ৫৩,০৫,৬৯৬ জন। কলকাতা থেকেই ৫ লক্ষ কর্মচারী পাকিস্তানে চলে আসে। যদি কমও ধরা হয় (৩,০৫,৬৯৬ জন?) তাতেও পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চাশ লক্ষ মুসলমান আছে, তার বেশী নয়। পক্ষান্তরে পূর্ববঙ্গের হিন্দু অধিবাসীদের সংখ্যা মোট ১,০৭,২৭,৯৬৬ জন। সিলেট পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ১০,৭০,০০০ হিন্দু পাকিস্তানে আসে। ফলে ১,১৭,৯৭,৯১৯ জন হিন্দু পাকিস্তানের অধিবাসী। ১৯৪৭ সনে বঙ্গবিভাগের অব্যবহিত পরে, প্রথম চোটেই পূর্ববঙ্গের ৮ লক্ষ লোক কলকাতায় চলে যায়। এর ফলে পূর্ববঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা কোনমতেই ১ কোটির অধিক হতে পারেনা। পশ্চিমবঙ্গের ৫০ লাখ লোক বিনিময় ৫০ লক্ষ পশ্চিম পাস্তিানের হিসাবে জমা হতে পারে। 'হিন্দুস্থানে মুসলমানের সংখ্যা' শীর্ষক উপসম্পাদকীয়তে লেখা হয় : "পাকিস্তানের অর্ধ সরকারী রিপোর্টে দেখিতেছি ১৯৪৯ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৬৬ লাখ মুসলমান হিন্দুস্থান হইতে হিজরত করে পশ্চিম পাকিস্তানে পৌছে। বিহার, কলকাতা, দিল্লী পূর্ব পাঞ্জাব ও দেশীয় রাজ্যসমূহে নিহত মুসলমান এই গণণার বহির্ভূত... ১৯৪৭ সনের প্রথম দিকে বর্তমান হিন্দস্থানী এলাকার যত মুসলমান বাস করিত তাহার মধ্য হইতে—কমবেশী এক কোটি লোক ১৯৪৯ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানে চলে আসে — ১৯৪১ সনের আদমশুমারী অনুসারে সমগ্র ভারতে জনসংখ্যা ছিল ৩৮,৮৯,৯৭,৯৯৫ জন (প্রায় ৩৯ কোটি)। এর মধ্যে ৯,৪০,০০০,০০ জন মুসলমান। আমাদের হিসাবে মোটামুটি ৭কোটি মুসলমান এখন পাকিস্তানে বাস করিতেছে, তাহলে হিন্দুস্থানে মুসলমান ২ কোটি ৪০ লাখের অধিক হয়না। ইহার উপর আরও ১০ লাখ হিসাবের খাতিরে অতিরিক্ত ধরিয়া নিলেও এই সংখ্যা মোট দাঁড়ায় আড়াই কোটি। এই আড়াই কোটির মধ্যে বাংলার প্রাপ্য এক কোটি বাদে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগে পড়ে দেড় কোটি। এ পর্যন্ত প্রায় ৭০ হাজার মুসলমান হিন্দুস্থান হইতে হিজরত করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে। তাহার উপর বর্তমান আড়াই কোটি অর্থাৎ মোটের উপর ৩ কোটি ১৬ লাখ নূতন অধিবাসীকে পশ্চিম পাকিস্তানে স্থান দেওয়া দুঃসাধ্য। অধিবাসী বিনিময়ে ইহাই প্রধানতম সমস্যা। এজন্য হিন্দুস্থানের একটা অঞ্চল পাকিস্তানের হস্তগত হওয়া চাই। বস্তুত ইহা শুধু পূর্ববঙ্গের সমস্যা নহে।"[২৫]

মোহাম্মদী তার পৃষ্ঠাগুলোতে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে চিহ্নিত করে রেখেছে। এম. এন. রায়ের The Historical Role of Islam শীর্ষক গ্রন্থের এই অংশটি তাই মোহাম্মদীর অনুবাদক— লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল : 'একশত বৎসর ব্যাপী দুটো সম্প্রদায় একসঙ্গে একই দেশে বসবাস করলো অথচ পরস্পরের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সহানুভূতির সঙ্গে বুঝবার চেষ্টাই করলো না—পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যিই এমন দৃষ্টান্ত আর মেলেনা। পৃথিবীর কোন সভ্য জাতিই ভারতীয় হিন্দুদের মতো ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে এমন অজ্ঞ নয় এবং ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে এমন ঘৃণার ভাবও

Dhaka University Institutional Repository

পোষণ করেনা। ভারতীয় হিন্দুদের জাতীয়তাবাদীতার আদর্শই হলো আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু ইসলাম তথা মোহম্মদের ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচারে হিন্দুদের এই অপ্রশংসনীয় মনোবৃত্তি আরও উগ্র আকার ধারণ করে। আরবের নবীর জীবন যে বাণী এবং শিক্ষা বহন করে এনেছে তার সম্বন্ধে এদের একটা অত্যন্ত ভুল ধারণা রয়ে গেছে।... ইসলামের এই বিজয় অভিযানের কারণ ছিলো এক অননুভূতপূর্ব বৈপ্লবিক সুরের মধ্যে লুকিয়ে ; গ্রীস, রোম, পারস্য, চীন—এমনকি ভারত বর্ষেরও প্রাচীন সভ্যতায় ঘুণ ধরে যাওয়ায় বিপুল জনসাধারণ যে চরমতম দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন হলো তা থেকে বাঁচিয়ে ইসলাম এক আলো-ঝলকিত দেশের নির্দেশ তাদের দিতে পেরেছিলো বলেই তার এই অনন্যসাধারণ বিস্তার সম্ভব হয়েছিল।'[২৬]

'পাকিস্তানের সংস্কৃতি ও পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে সমাজের দিকে তাকিয়ে লেখকেরা লিখেছিলেন ঃ 'অন্যান্য সভ্যতার গ্রাসকারী প্রভাব থেকে পাকিস্তান ইসলামি সংস্কৃতিকে মুক্ত করে পরিপূর্ণ প্রকাশ দিতে চায়। এই সভ্যতা গড়ে উঠবে পাক-জনসাধারণের ইছলামী জীবনধারার রূপ ও প্রকৃতি থেকে। আমাদের জীবনযাত্রা- প্রণালী এখনো ঠিক ইসলামী হয়ে ওঠেনি হিন্দু ও ইউরোপীয় প্রভাবের কবলে পড়ে। উভয় সভ্যতার শৃঙ্খল থেকে যাঁরা পাকিস্তানের উদ্দেশ্যগত বিশেষ সভ্যতাকে মুক্ত করতে পারেন, তাঁরা হলেন পাকিস্তানের বর্তমান ও ভাবী সাহিত্যিকেরা। পশ্চিম পাকিস্তানের সাহিত্যে মুছলীম সংস্কৃতির প্রভাব অধিকই বলতে হয়—পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে তা বলা চলেনা ; তাই পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যকে আজ কোন পথ ধরে স্বীয় সত্তা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, সে সম্বন্ধে ভাবার সময় এসেছে।'[২৭]

'জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা' শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারের মন্তব্যটিও লক্ষণীয়—এই মতামত ১৯৫০ সনের মার্চ-এপ্রিলের— 'জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা উভয়েই বিশ্বমানবসমাজে প্রচুর প্রয়োজনীয়তা আছে। যেহেতু ইহারা পরস্পরবিরোধী নহে, কাজেই আপনসীমার মধ্যে থাকিয়া উভয়ই মানবসমাজের অশেষ কল্যাণ করিতে পারে। তবে আন্তর্জাতিক মঙ্গলের জন্য জাতীয়তাবাদীগণকে কিছু আত্মত্যাগ করিতে হইবে। তাহা না হইলে ইহার পূর্ণ স্ফুরণ সম্ভব নহে। অতএব নিখিল বিশ্ব মানবের সর্বজনীন মঙ্গল ও শান্তি রক্ষার জন্য প্রত্যেক জাতিরই কিছু আত্মত্যাগ স্বীকার পূর্বক আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ মানিয়া চলা উচিত। তাহা হইলেই আমাদের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ মধুর মিলন ও তজ্জনিত শান্তিকল্যাণ আসিবে।'[২৮]

ইসলাম দিয়ে সমাজতন্ত্রকে এতদিন প্রতিহত করা হয়েছে, কিন্তু ১৯৬৪ সনে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ায় মোহাম্মদী আতঙ্কিত হয়ে পাকিস্তানে ইসলাম কল্যাণকর কি সমাজতন্ত্র কল্যাণকর—সেই প্রশ্নে উচ্চকিত হয়েছে এবং 'সমাজতন্ত্রকে সন্ত্রাসবাদী শক্তি' অথবা 'নিহিলিজমের (Nihilism) এর প্রোগ্রামকে ঠেকানো আবশ্যক হয়ে পড়ে। সমাজতন্ত্রের সাম্যবাদী ভাবধারার প্রশংসা করলেও ব্যবহারিকজীবনে সমাজতন্ত্রের সার্থকতা ও কল্যাণকর ভূমিকা স্বীকার করেননি। 'সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সমাজবাদী ব্যবস্থা অনেক দেশ ও অনেক জাতির পক্ষে কল্যাণ আনার বদলে অকল্যাণ এনেছে বেশী। অবশ্য প্রচলিত সমাজ ও অর্থনীতির ব্যবস্থা চলতে দেওয়া হলেও সন্ত্রাসবাদী শক্তি নিহিলিজমের প্রোগ্রাম নিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। এবং সেই শক্তি যে কমিউনিজম—বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে তার নজির আছে। ১৯১৭ হতে সর্বাত্নবাদী (Totalitarian) দেশগুলিতে যে বিয়োগান্ত নাটক অভিনীত হয়ে আসছে তা কোন বুদ্ধিমানের কাম্য হতে পারে না। তাছাড়া সমাজতন্ত্রের নাম করেই রাশিয়া বা চীন যে কম্যুনিজমকে কবুল করেছে তার পরিণতি সম্পর্কেও আমাদিগকে হুঁশিয়ার হতে হবে। বস্তুত দেশের মধ্যে পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম করে, জনগণের সরকারের দ্বারা সে আদর্শের রূপদান ছাড়া পাকিস্তানের সম্মুখে অন্য কোন পথ খোলা নেই।... সেই জন্য ইসলামের অর্থনীতির ব্যাপক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।'[২৯] 'ধর্মের প্রয়োজন' সম্পর্কেও তাই গুরুত্বের সঙ্গেই মোহাম্মদীতে লেখা হয়েছে ঃ 'জীবনকে যারা ধর্মীয় গণ্ডীর বাইরে রাখতে চায়—তাদের জীবনে কোনদিন শান্তি আসেনা। স্বাধীন মনোভাব—তাদের জীবন থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় ... এবং ধর্মবিমুখ মানুষের একটা বড়কাজ হচ্ছে যে, তারা সমাজে ধ্বংসাত্মক কাজ করাকেই গৌরবের মনে করে,.... মনে মনে খুব তৃপ্তিলাভ করে।'[৩০] সমাজের অবাঞ্ছিত বলে এরা পরিচিত হয়ে থাকে। ধর্মের প্রাণবায়ু ও তার বিচিত্র অনুভূতি থেকে যে সমাজ বঞ্চিত, সে সমাজ নেহায়েত ছোটলোকের সমাজ, অবাঞ্চিত জাতির সমাজ। এ সমাজের জীবনে 'চাওয়া ও পাওয়া' বলতে কিছুই নেই। দৃষ্টিভঙ্গীর বিভ্রম না ঘটলে কোন মানুষই ধর্মকে এড়িয়ে চলার প্রয়াস পায়না। ধর্মবিমুখ লোকদের জীবনযাত্রা ও জীবনপদ্ধতি হচ্ছে একটা হতাশজীবন জীবন। জিজ্ঞাসার কোন সমাধান এধরণের জীবনে মিলেনা। শুধু ধর্মীয় জীবনই এই জিজ্ঞাসার যোগ্য জওয়াব দিতে পারে। 'মানুষের ব্যক্তিগত দুঃখ-দ্বন্দ্বে-সান্ত্বনা, ব্যক্তিগত আকুতির ত্বরিত জবাব কেবলমাত্র ধর্মের কাছেই মিলে।... কম্যুনিষ্ট ছাড়া দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহতে বিশ্বাসী। তবে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানও তাঁর আরাধনার নিয়ম-পদ্ধতি ও ধারা সম্পর্কে ভিন্নতা রয়েছে।' স্যার রেভারেণ্ড রবার্ট আই ওয়েলস-এর ভাষ্যে কম্যুনিজম ও কমিউনিষ্টদের সম্পর্কে বলা হয় ঃ 'শ্রমিক ও সংখ্যালঘুদের মুক্তি সাধক বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে কমুনিষ্টরা প্রকৃতপক্ষে বিশৃঙ্খলা ও সমাজবিরোধী-কার্যকলাপেই লিপ্ত হয়ে আছে। সামাজিক দুর্নীতি-দূরীকরণ এদের লক্ষ্য নয় বরং সামাজিক দুর্নীতির সুযোগ গ্রহণ করে বিশ্বব্যাপী এক বিপ্লব সৃষ্টিই এদের মুখ্য উদ্দেশ্য।'[৩১] এই লক্ষ্যে মোহাম্মদী জোরদারভাবে পুনরায় 'মানবজাতির মুক্তিছনদ কোরআন' এই বক্তব্য প্রমাণের জন্য ডঃ জনসন, কার্লাইল, নলডেক প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিত, দার্শনিকদের সমাজতন্ত্র-বিরোধী বক্তব্য উপস্থাপন করে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করে। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ইসলামের দার্শনিক তুলনায় নয় কেবল, সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রেও যে ইসলাম উৎকৃষ্ট আদর্শ—তাও মোহাম্মদী প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছে। 'অধর্মের প্রবল স্রোতের যুগে ধর্মের নামে, ইসলামের নামে, পাকিস্তান অর্জিত হয়েছে। সুতরাং আমাদের সমাজকল্যাণের কাজেও ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শকে রূপায়িত করতে হবে। বরং ঐ আদর্শের অনুসরণ আমাদের সমাজকল্যাণের কাজকে শুধু যে ত্বরান্বিত করবে, তাই নয়, বরং তাকে সুষ্ঠু ও সুন্দর করে তুলবে। কারণ ইসলামে সমাজ-কল্যাণের সব মৌলিক উপাদানেরই প্রাচুর্য রয়েছে।'[৩২] এছলামকে গুটিকয়েক আচার বা অনুশাসনের আওতায় সীমাবদ্ধ করে দেখলে একটা মস্ত ভুল করা হবে। আধুনিক সভ্যতার বস্তুতান্ত্রিক সংকীর্ণতার জন্য বিশ্বব্যাপী দৈন্য, হানাহানি, ও ভেদ-বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই আবর্জনা মুক্ত করে পৃথিবীতে পুণরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা একমাত্র এছলামের দ্বারাই সম্ভব। এছলামের পথ সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ—এছলামের পথ সহজ, সরল।'[৩৩] আবার ধর্মের বর্তমান অবস্থা হচ্ছে ঃ 'এবাদত যেন একটা আনুষ্ঠানিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।' তাই মুখে ইসলামের সমস্ত জীবন সমস্যার সমাধান রয়েছে বলে স্বীকার করলেও বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় 'জীবন সমস্যার সমাধানের জন্য অন্যত্র ছুটছি। কাজে.... কর্মের এই অনৈক্যই আজকের দিনে

Dhaka University Institutional Repository

মুছলমানের দুর্দশার সব থেকে বড় কারণ। কিন্তু একথা ভুললে চলবেনা.... বিশ্বে এছলামী জীবনদর্শনের মূল্য চিরদিনই সমান থাকবে।'[৩৪] ইসলামের প্রকৃত আদর্শকে বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে হীনস্বার্থ সাধনের হাতিয়াররূপে ব্যবহারের সামাজিক প্রবণতা লক্ষ্য করে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ১৯৬৬ সনে 'এছলামের আদর্শ' সম্বন্ধে আলোচনা করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন ঃ

"ইছলামের আদর্শ কথাটা অত্যন্ত গভীর, অত্যন্ত ব্যাপক। ইছলামের প্রকৃত স্বরূপ সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিলে সে আদর্শের যথাযথ ধারণা করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। অথচ এই উপলব্ধির জন্য জ্ঞানের ও ভাবের মধ্য দিয়া যে সাধনার আবশ্যক হয়, তাহার আয়াস স্বীকারে আমরা অনেক সময় কুণ্ঠিতও হইয়া থাকি .... ফলে অবস্থা এই দাঁড়িয়ে আছে যে, আলোচনার সময় একদল সেই আদর্শকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া নিজেদের ধারণাও সংস্কারের সহিত সামঞ্জস করিয়া লইতে প্রয়াস পাইতেছেন, আর একজন নিজেদের সাময়িক খিয়াল, হুজুগ বা পরিকল্পনার সহিত সেই আদর্শকে অসমঞ্জস মনে করিয়া, সম্মিলিত মুসলমানকে তাহার মায়াপাশ মুক্ত করিয়া ফেলার জন্য ব্যাকুলি প্রকাশ করিতেছেন। এইরূপে এছলামের আদর্শের মারাত্মক সংকট বাঁধাইয়া অথবা অন্যায়রূপে তাহার সংহার সাধনের চেষ্টা করিয়া নিজনিজ শিক্ষা রুচি ও আবশ্যক অনুসারে সাময়িকভাবে বর্তমানে যে স্বস্তি বা তৃপ্তিলাভের চেষ্টা করা হইতেছে, বস্তুত তাহা আত্মবঞ্চনার এবং সামাজিক হিসাবে আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র.... নিজের সংস্কারের সহিত সমঞ্জস করিয়া লওয়ার জন্য তাহার সেই বিরাটতায় গর্ব করিতে যাওয়া যেমন অন্যায়, সাময়িক পরিকল্পনা বিশেষের সহিত অসামঞ্জস্যের আশংকায় তাহাকে অস্বীকার করিতে যাওয়াও সেইরূপ অসমীচীন, অযৌক্তিক। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পরিবর্তনশীল বর্তমানের কল্পিত বাস্তবতার মধ্যে কোন আদর্শকে আবদ্ধ করিতে যাওয়া, আর আদর্শ শব্দের মূল তাৎপর্য্যকে অস্বীকার করা, একই কথা। .... এছলামের আদর্শ এক দিকে যেমন বর্তমানকে অস্বীকার করে না, অন্য দিকে বর্তমানকে মাত্র অবলম্বন করিয়া তাহার মধ্যে সমাপ্ত হইয়া যায় না, সীমাবদ্ধ হইয়া থাকেনা। ভবিষ্যতের অসংখ্য অনাগত বাস্তব নতুনের সৃষ্টির জন্য চিরকালই আদর্শের সদা সর্জ্জন পটীয়সী শক্তির অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকিবে। কোরাণের বর্ণিত বিশ্বমানবের এই অবিরত অপ্রতিহত সাধনাকে, সুনিয়ন্ত্রিত সুপরিচালিত সাফল্যমণ্ডিত করার নিমিত্ত। সে আদর্শের আবশ্যক চিরকালই হইতে থাকিবে।'[৩৫]

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'প্রাচীন ভারতে গোবধ' প্রবন্ধে গরু জবাই নিয়ে (ইসলামী মতে কোরবানীই মূল সমস্যা) হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-এর উপর মন্তব্য করেন ১৯৬৭ সনে পাক-ভারত যুদ্ধের পরে সম্ভবত ভারতে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটেই। প্রাচীন শাস্ত্রাদি পর্যালোচনাপূর্বক উপসংহারে তিনি মন্তব্য করেন ঃ মাংসখাতক (ভারতীয়)জাতি কিরূপে বর্তমানে মাংসবিমুখজাতিতে পরিণত হলো এবং গরু গোমাতারূপে পূজিত হল, এর উত্তর কঠিন নয়। "বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাবে লোকে সম্পূর্ণরূপে না হইলেও অনেকটা নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতি হইয়া উঠে। মহারাজ অশোক রাজ্যমধ্যে যাগযজ্ঞে পশুবধ নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া বৈদিক যুগ হইতেই গরু অতি মূল্যবান সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইত। সেজন্য কেবল যাগযজ্ঞে ও বিশিষ্ট অতিথি সেবার জন্য গোবধ হইত। ক্রমশ যাহা অর্থনৈতিক ছিল, তাহাই ধর্মীয় হইয়া উঠে। রাজশক্তির প্রভাবে কিরূপে খাদ্য পরিবর্তন হয়, তাহার সাক্ষী হাঁস ও মুরগীর মাংসের প্রচলন, যাহা পূর্বে নিষিদ্ধ ছিল। এই কারণেই বন্যবরাহ অধিকাংশ হিন্দু-সমাজে অভক্ষ্য হইয়াছে। আমরা অর্থনৈতিক কারণে দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষ এবং কর্মক্ষম ষাঁড় ও মহিষের রক্ষা প্রয়োজন স্বীকার করি। ... তজ্জন্য সপ্তাহে দু'একদিন মাংসশূণ্য দিন করা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা গোপূজা সমর্থন করিতে পারিনা। তাহা প্রাচীন হিন্দু-শাস্ত্রেও স্বীকার করেনা। একমাত্র গোমাতার উক্ত সন্তান ভিন্ন কেহ গোহত্যা নিবারণের জন্য সত্যাগ্রহ করিতে পারেনা।'[৩৬]

আইউব খানের বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর মাধ্যমে প্রথমে শুরু হয় পরগাছাজীবী ইমামকে কেন্দ্র শিক্ষক রূপে নিয়োগের মাধ্যমে। কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল এঁরা পরগাছাজীবীই বটেনা! মোহাম্মদীর মন্তব্য এ-প্রসঙ্গে ঃ "ঈমাম নামে খ্যাত....শতকরা নব্বইজনের বাঙলাভাষায় জ্ঞান এবং (হিসাব শিক্ষা অর্থাৎ গণিতের উপর) পাণ্ডিত্য দেখে বুঝা গেল, এরা.... নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষাদানে সক্ষম নয়।... সামান্য খুঁটিনাটি ব্যাপারে মিথ্যার বেসাতি চালিয়ে ঈমান বিক্রী করে খেতে ঈমাম (?) শ্রেণীর লোকদের মতন আর কাউকে দেখিনি।" অতএব উপযুক্ত পন্থার মাধ্যমে প্রদেশময় বয়স্কশিক্ষা সম্প্রসারণ করতে হবে।[৩৭] তাঁরা বলেন, ব্যাপক অর্থে শিক্ষকগণ হলেন সমাজের শিক্ষাদাতা এবং .... শিক্ষকগণই সমাজের অগ্রগতির মূলে.... বস্তুত শিক্ষকদের সেবা ও অবদান সমাজের জীবনে সর্বাপেক্ষা মূল্যবাণ।... একথাও সত্য যে সমাজের প্রতি শিক্ষকদের যে কর্তব্য ও দায়িত্ব তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তা পালন করতেও শিক্ষকদের তেমনি নিষ্ঠাবান হওয়া উচিত।'[৩৮]

মোহাম্মদীতে লেখকেরা ইতিহাসচেতনার গুরুত্ব সম্পর্কেও গুরুতর আলোচনা করেছেন। অধ্যক্ষ মুখলেসুর রহমান 'জাতীয় ইতিহাস রচনায় পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারের গুরুত্বকে উপেক্ষা করলে চলবেনা' বলে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। 'তাহলে আমাদের ইতিহাসের ভিত্তি হবে দুর্বল এবং পুরাতাত্ত্বিক সমর্থনের অভাবে তথ্যাদিও হবেনা নির্ভরযোগ্য।'[৩৯]

দেশের সামাজিক অবস্থার বিবর্তন ও পূর্ববাংলার অরিজিন্যাল নাগরিক—দরিদ্র-চাষী-মুসলমানদের সামাজিক ও মানসিক প্রবণতার পরিচয়ও মোহাম্মদীর পাতাতে পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক শাসক, অমুসলমানরা চলে যাওয়ার পর নতুন নবাগত মোহাজের, মুসলমান রিফিউজীরা এসে পূর্ববাংলার বিত্তের বিভিন্ন উৎস এবং শিল্প কারখানাগুলো দখল করে নিল। এদেশের 'আনসার' মুসলমানরা এই মোহাজেরদেরকে 'নতুন সাহেব' আর 'বেগম সাহেবা'রূপে বরণ করে নিল ঃ "মোহাজেরদের মধ্যে ব্যবসায়ী বিত্তশালী শেঠও ছিলেন, আবার রিক্তহস্ত নিঃস্ব দরিদ্রও ছিল। চালচলনে তারা এ্যারিষ্টোক্রেটিক আর মহিলারাও পর্দাবর্জিত, কাজেই এদেশের সরলপ্রকৃতির গরীব জনসাধারণ তাদেরকে বিলেতী সাহেব-মেমদের পর্যায়ে দেখতে লাগলেন ...অনতিবিলম্বেই তারা অমুসলমানদের ফেলে যাওয়া ব্যবসা ও শিল্পকারখানা ধরে নিলেন, বসবাসের জন্য, বড় বড় হালফ্যাশনের ইমারত খাড়া হয়ে গেল ; নতুন মডেলের গাড়ী চালু হলো ; আয়েস আরামের জন্য আধুনিককালের সাজ-সরঞ্জাম সবকিছুই আমদানী হয়ে গেল। স্টাণ্ডার্ড খুবই হাই হয়ে গেল। তদদৃষ্টে নিজেদের নীচ স্টাণ্ডার্ড যেন কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারলেন না। কারণ তারা ভাবতে শুরু করলেন স্টাণ্ডার্ডটাই বুঝি পাকিস্তানী মুসলমানের

Dhaka University Institutional Repository

আসল স্ট্যাণ্ডার্ড।" বাঙ্গালীর মধ্যে অনুকরণপ্রিয়তার সাইকোলজি স্টাডি করে অবাঙ্গালীমুসলমান শিল্পপতিরা নানাবিধ প্রসাধনসামগ্রীর 'কারখানা স্থাপনে যত্নবান হলেন'... গ্রামেগঞ্জের মেয়েরা পর্যন্ত এখন ঠোঁটে রং লাগায় গালে রুজ ঘষে। "অনেকেই চোখে চশমা ও হাতের কবজিতে ঘড়ি। ঘড়ি অপেক্ষা তার বন্ধনীটাই আরো বেশী জমকালো ও দামী।... অথচ পেটে ভাত নেই।' লেখক দুর্নীতির উৎস খুঁজতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন ঃ এই স্টাণ্ডার্ডে উঠার 'দুরাকাঙ্ক্ষা থেকেই উদ্ভব হলো সর্বগ্রাসী দুর্নীতি'। সুনীতির মাধ্যমে অর্থাগম সময়সাপেক্ষ। 'কিন্তু দুর্নীতির কল্যাণে আরব্য উপন্যাসের আশ্চর্য প্রদীপের ন্যায় রাতারাতি ধনী হওয়া যায়।' চুরি-ডাকাতি শিক্ষিত ভদ্রসমাজে নিন্দনীয় কিন্তু ঘুষ-ভেজাল-কালোবাজারি-মুনাফাখোরি, চোরাচালান, চিটিং প্রভৃতি সমাজদেহে নিঃশব্দে প্রবাহিত হচ্ছে ; তা ধরার মত যন্ত্র এখন কারো হাতে নেই। অতএব নিরাপদ। অর্থের লোভে শিশুর জীবনরক্ষাকারী ঔষধও নকল হয়। ভেজালে প্রতাপ নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র সবকিছুতেই। "পাশ্চাত্যের বস্তু তত্ত্ববাদ আমাদের পবিত্র এছলামের অধ্যাত্মবাদকেও একেবারে পঙ্গু করে দিয়ে গেছে। আমাদের উত্তরাধিকারীরা এখন তারই জের খোল আনায় টেনে চলেছে। জাতীয় চরিত্রের অধপতন ঘটেছে। আত্মসংযম হারিয়ে ফেলেছি। ঈমান, শৃঙ্খলা ঐক্যবোধ আমাদের মধ্যে একেবারেই লোপ পেয়েছে। পরিতাপের বিষয় এই যে মুসলমানের মনুষ্যত্বের স্টাণ্ডার্ড কোন অতলে তলিয়ে গেছে। মানবীয় স্টাণ্ডার্ড বেধে দেয়ার জন্যই একদা এছলামের শেষনবী রসুলে করীম দুনিয়ার বুকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।[৪০]

১৯৬৮ সনে ছয় দফা আন্দোলন শুরু হয়ে যাবার পর, আইউব খানের শাসনামলের শেষ দিকে, উন্নয়ন দশকের জাক-জমকের মধ্যে মোহাম্মদীর একজন লেখক 'দেশের সংকটময় পরিস্থিতিতে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা দেখে বিক্ষুব্ধচিত্তে লিখেছিলেন ঃ 'দেশ আজ তমসাচ্ছন্ন। আজ জনসাধারণকে তার মানবাধিকারের জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে। অন্নাভাব, প্রায় সবজিনিসেরই হু হু মূল্যবৃদ্ধি ; শিল্পেবাণিজ্যে মন্দা, বেকার-সমস্যার সম্প্রসারণ ইত্যাদি মিলিয়ে সাধারণ মানুষ আজ ক্ষুব্ধ। এদিকে রাজনীতিবিদরা জনসাধারণের এই ধূমায়িত ক্ষোভকে সংগঠিত করতে পারছেন না। এবং তাঁরা পরস্পর কাদা-ছোঁড়াছুড়ি, দল ভাঙ্গাভাঙ্গি নিয়ে ব্যস্ত। কিছু-কিছু রাজনীতিক জনসাধারণের এই ক্ষুব্ধতার সঠিক মূল্যায়ণ করে সংগ্রামে-যে না-নেমে এসেছিলেন তা নয়, কিন্তু তাঁদের কারাগারে নিক্ষিপ্ত করে এবং বিভিন্ন মামলায় জড়িত করে যখন তাঁদের নির্যাতিত করা হচ্ছে, ঠিক তখনই অন্যান্য রাজনীতিকরা ঠিক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। যুবসমাজ আজ হতাশাগ্রস্ত তাদের শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ ; সম্মুখে বেকারত্ব। তারা আজ মুক্তির পথ পাচ্ছে না। তারা মাঝে-মাঝে ফেটে পড়ছে এবং সরকারের নিপীড়ণের সম্মুখে গুমড়ে গুমড়ে মরছে। আজ আমাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী নীরব। মাঝে মাঝে তাঁরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে দু'চারটে ভাল-ভাল কথা বলার মত দায়সারা কাজ ছাড়া আর কিছুই করছেন না। দেশের সমস্যা প্রকৃত অনুধাবন করে এবং সমস্যার প্রকৃত সমাধান কিভাবে হতে পারে, তা তাঁরা দিতে পারছেন না বা দিচ্ছেন না। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ একটা ভূমিকা রয়েছে।' .... রাজনীতিবিদেরা পড়াশুনা করেন না, কোনোরকম জ্ঞানচর্চার সঙ্গে তারা সম্পৃক্ত নন। বুদ্ধিজীবীদের এক্ষেত্রে করণীয় আছে ; কিন্তু তাঁরাও তা করেন না। লেখক 'বুদ্ধিজীবী'র ভূমিকা সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা তাড়িত হয়েছেন— 'বুদ্ধিজীবী তিনিই, যিনি আমাদের দেশের সত্যিকার সমস্যাগুলো জানেন, যিনি তার ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারা জীবনকে জানতে চেষ্টা করেন, এবং তার মনোভাব তার কর্ম দ্বারা প্রকাশ করেন এবং সমাধানের চেষ্টা করেন...যাঁরা সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ধারক ও বাহক। স্বাধীনতা পূর্বকালে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নগণ্য ছিলনা।... কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে বুদ্ধিজীবীরা কোন ভূমিকাই পালন করছেন না। দেশের মানুষ যখন মুক্তির পথ খুঁজছে রাজনীতিকদের মত তাঁরাও দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন। মনে হয়, জনসাধারনের মত তাঁরাও হতাশাগ্রস্ত। একজন সত্যিকার বুদ্ধিজীবী তিনিই, যিনি বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জানেন, এবং এর সমাধান সম্মিলিতভাবে করতে জানেন ; যিনি জনসাধারণের সৃজনশীল শক্তিতে বিশ্বাস করেন এবং আস্থা রাখেন, যে-বিশ্বাস আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেরণা যুগিয়েছিল, ঠিক সেই বিশ্বাসই আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেবে।[৪১]

রাজনীতিকদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও লেখক বলেন ঃ "রাজনৈতিক ব্যক্তিদের পুরাতন পবিত্র চরিত্র ও চিন্তাধারা আর নাই— জনসেবার স্থানে দেখা দিয়াছে উদরসেবা, আর দেশপ্রেমিকের নেশা ছুটিয়া গিয়া সেখানে স্থান লইয়াছে, রাজনৈতিক রসাল পেশা। শুধু ক্ষমতালাভের সংগ্রামটাই এখন রাজনৈতিক দলের মহাকর্তব্য কর্ম বলিয়া গণ্য হইয়াছে।[৪২]

সহ-শিক্ষার মাধ্যমে তরুণদেরকে 'নৈতিকতাহীন করার বিপক্ষে মোহাম্মদী সোচ্চার ছিল। তাঁদের মতে 'এই সহশিক্ষা আমাদের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত থাকার দরুণ জাতির ভবিষ্যতরা আদর্শচ্যুত, নৈতিকতাবিবর্জিত হয়ে জাতীয় আদর্শের সোপানকে ভেঙ্গে খান খান করে দিচ্ছে। আর প্রতিটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রেমাগার হয়ে গেছে।' এই ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটানো গেলে 'জাতির তরুণরা আশার আলো দেখতে পাবে'। একটি 'ইসলামিয়াত' বই পড়ানো হলেও 'ইসলামী শিক্ষার বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষিতরাও 'দুনিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে—বহুমুখী সমস্যা তাদেরকে বিভ্রান্ত করে দেয়'। বহুমুখী জ্ঞান অর্জনের সুযোগ মাদ্রাসা-শিক্ষাব্যবস্থায় রাখা হয়নি। বিজ্ঞানকেও তেমনিভাবে 'ইসলামীকরণ করা হয়নি। যে জাতির নিজস্ব 'তাহজিব তমদ্দুন' আছে সেজাতি কখনো বিজাতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অপরিবর্তিত রেখে তার নতুন বংশধরদেরকে তা পড়াতে পারেনা। 'প্রচলিত দ্বিমুখী শিক্ষানীতির মাধ্যমে জাতির তরুণরা কিছুতেই জাতীয় আদর্শের দিকে... অগ্রসর হতে সক্ষম হবে না' বলে মোহাম্মদী মন্তব্য করে।[৪৩]

দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ধর্ম, শিক্ষা, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি সকল বিষয়েই মোহাম্মদী বক্তব্য পেশ করেছে, তাদের বক্তব্য কখনও কখনও খুবই প্রাসঙ্গিক ছিল। আবার অনেক মন্তব্য ও বক্তব্য ছিল দলীয় দৃষ্টিকোণের দ্বারা সীমাবদ্ধ। যেমন যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের ফলাফলে মোহাম্মদী স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল, আবার যখন মন্ত্রীসভা বাতিল হলো তখন তাঁরা নানা বিষয়ে মতামত দিয়ে ফ্রন্টের কার্যক্রম ইত্যাদি মূল্যায়নপূর্বক মন্তব্য তথা সমালোচনা উপস্থিত করতে লাগলেন। শেরে বাংলা ফজলুল হক কলকাতা যা যা করেছিলেন বা বলেছিলেন নিষ্করুণ-ক্ষমাহীন

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয়পাকিস্তান সরকারের মনোভাব নিয়ে তার সমালোচনা করেছিলেন মোহাম্মদীর কর্তৃপক্ষ—কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহিত পদক্ষেপগুলো যথার্থ ছিল—এরকমই তাঁদের রায়। তবে বাঙালীর সমাজের প্রগতির জন্য তাঁরা স্বাস্থ্যবান জনসম্পদের গুরুত্বও উপলব্ধি করেছেন। 'স্বাস্থ্যের সঙ্গে খাদ্যের এবং খাদ্যের সঙ্গে কৃষির যোগসূত্র রয়েছে। ফলে প্রত্যক্ষভাবে কৃষির উন্নতির উপরই যে নির্ভর করছে যে কোন জাতির জনস্বাস্থ্য।' 'কৃষির উন্নয়নের আশু প্রয়োজন' বলে পত্রিকা ভেবেছে কিন্তু কৃষি-উন্নয়ন এবং খাদ্য যে কিভাবে ঘটতে পারে এবং পুষ্টিহীন নিঃস্ব মানুষের ক্রয়ক্ষমতা যে কিরূপে বৃদ্ধি পাবে, এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে-সে সম্পর্কে গভীর চিন্তা মোহাম্মদী করতে পারেনি। তাঁরা এই চিন্তায় সীমিত যে ; "জীবন ধারণের জন্য যে খাদ্যের প্রয়োজন তা সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি অথবা কৃষিজাত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল। অতএব কৃষিকেই জাতীয় জীবনের প্রথম প্রয়োজনীয় জিনিস বলে ধরে নিতে হবে।[৪৪] 'পাকিস্তানের মূল সমস্যা কি?' এই প্রশ্নে মোহাম্মদী খাদ্য-সমস্যাকেই 'মূল সমস্যা' রূপে চিহ্নিত করে লিখেছে, 'পূর্ব পাকিস্তানে বিশেষ করে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়, এখানে লোকবসতি ঘন, লোক সংখ্যা বিভিন্ন কারণে ক্রমশ বাড়িতেছে অথচ জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত খাদ্যশস্যের উৎপাদন সমানতালে বৃদ্ধি পাইতেছে না।'[৪৫] সমস্যা সমাধানের জন্য মোহাম্মদী নানাভাবে যুক্তিবুদ্ধি দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাতে কী-ই-বা ফল ফলেছে? এমনকি পাকিস্তানপরবর্তী বাংলাদেশের প্রায় সিকি শতাব্দীর সাধানায়ও এই ভূখণ্ড খাদ্যে, কৃষিতে, শিল্প-বাণিজ্যে উৎপাদনে কোনো অগ্রগতি সাধন করতে পারেনি, এই ব্যর্থতা এদেশের সার্বিক ব্যর্থতার মতো পত্র-পত্রিকাগুলোরও—তারা জনমত এমনভাবে গঠন করতে পারেনি—যাতে সরকার এই দিকে গভীরভাবে আশু সমাধানের পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে বাধ্য হয়।

মোহাম্মদীর প্রাণ-পুরুষ মুসলিম বাংলার অন্যতম পুরোধা, সাহিত্যিক-সাংবাদিক- ব্যক্তিত্ব মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সাফল্যের সঙ্গে মোহাম্মদী-আজাদের সাফল্য একই সুত্রে জড়িয়ে রয়েছে। আকরম খাঁকে মুসলিম জাগরণের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির এক মহান পুরুষ হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর এই পুরুষকারের প্রাণপ্রতিষ্ঠাকারী মাসিক মোহাম্মদী। মওলানা আকরম খাঁর শতবর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে মুসলিম বাঙলার প্রধান চিন্তাবিদ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং কবি-সাহিত্যিক-গবেষকবৃন্দ কলম ধরেছিলেন তাঁর অবদানের মূল্য দিতে, মুল্যায়ন করতে তাঁর চিন্তা ও কর্মাবলীর। চিন্তাবিদ আবুল হাশিম তখন লিখেছিলেন,

> "মাসিক মোহাম্মদীর মাধ্যমে মওলানা সাহেব একদিকে আমাদের সাংস্কৃতিক নিজস্বতা ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্য লেখনী চালনা করিয়াছেন, অন্যদিকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন আত্ম-চেতনায় বলিষ্ঠ এক মুসলিম সাহিত্যিকগোষ্ঠী ; সেদিন মুসলিমসমাজের লেখকমাত্রেই মাসিক মোহাম্মদীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছেন, কারণ 'মোহাম্মদী'ই ছিল তাঁহাদের সাহিত্য-প্রতিভা বিকাশের সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ বাহন। কাজেই পাকিস্তানের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসেও 'মাসিক মোহাম্মদী'র অবদান উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।[৪৬]

২. আল-ইসলাহ (১৯৪৭-৭১)

সংস্কারক ও সেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে সওগাত, মোহাম্মদী, শিখা, মোয়াজ্জিন, গুলিস্তাঁ, বুলবুল ও নওরোজের সমকালে সিলেট থেকে মৌলভী মুহম্মদ নূরুল হক প্রকাশ করেছিলেন মাসিক আল-ইসলাহ্ (১৯৩৪)। সমাজ- সংস্কৃতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে পত্রিকার অনুসৃত ধর্মীয় দর্শন, শিল্প ও রাজনৈতিক আদর্শ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়—উপর্যুক্ত প্রতিষ্ঠান ও পত্রিকাগুলোর সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গিতে মাত্রা ও গুণগত পার্থক্য থাকলেও স্বসমাজের কল্যাণ-সাধনের মূলগত প্রেরণার দিক থেকে তাঁরা ছিলেন সতীর্থ, সহযোদ্ধা। বিশ, ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে বাঙালী মুসলমানের সমাজে যে 'জাগরণ' লক্ষ্য করা যায়— সেই জাগরণের বাণী ও বার্তা আল-ইসলাহ-র পৃষ্ঠাগুলোতেও কিছুনা- কিছু ধ্বনিত ও ঘোষিত হয়েছিল। '............সমাজ' ও 'শিখা'-র প্রধান পুরুষ মনীষী কাজী আবদুল ওদুদের লেখা আল-ইসলাহর প্রথম দিককার সংখ্যাগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৩৮ সনে মনীষী আবুল হুসেনের (জন্ম ঃ ১৮৯৭) অকাল-মৃত্যুতে আল-ইসলাহ গভীর শোক ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল। পাকিস্তান-আন্দোলনের সময়ে আল- ইসলাহ আবার মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মুসলিম লীগ ও মোহাম্মদীর অনুগামী-সহযাত্রীরূপে কাজ করেছিল। শিখা-সওগাত বুলবুল-গুলিস্তাঁ প্রভৃতির সঙ্গে এর সাহিত্যিক আদর্শ ও শিল্প-সংস্কৃতি-ভাবনার সঙ্গতি রয়েছে।'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (ঢাকা, ১৯২৬) এবং 'মোয়াজ্জিন' ও 'খাদেমুল এনসান সমিতি' (১৯২৮, ফরিদপুর কলকাতা)র সুনাম সুখ্যাতি ও তৎপরতায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ইসলাহ-সম্পাদক মুহম্মদ নূরুল হকও। সমাজকল্যাণ ও সামাজিক অগ্রগতির ইতিহাসে ঢাকার সমাজ ও শিখার কর্মকর্তা লেখকগোষ্ঠী এবং সৈয়দ আবদুর রব (১৯০৩-১৯৬৯) ও তাঁর এনসান সমিতি ও 'মোয়াজ্জিন'এর সঙ্গে মুহম্মদ নূরুল হক এবং সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির ভূমিকাকে তাই কোনো অবস্থাতেই গৌণ করে দেখা চলবেনা। অবিভক্ত ভারতের বাঙলায়, এবং পার্শ্ববর্তী আসাম, বিহার ও উড়িষ্যাতে খাদেমুল এনসান সমিতি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনসেবার এক সুমহান আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং তৎকালে অনুরূপ দৃষ্টান্ত আর একটিও ছিলনা। সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি ও মফস্বল (জেলা শহর)-এর সীমিতগণ্ডিতে, সামান্য আর্থিক-যোগ্যতায়, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তারও তুলনা মেলেনা। একারণেই হয়তো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইউব খান ১৯৬৩ সনে ১৭তম স্বাধীনতা দিবসে রাষ্ট্রীয়ভাবে সমিতির সম্পাদক মুহম্মদ নূরুল হককে 'তমঘা-ই-খিদমত' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন। কিন্তু '......মুসলিম সাহিত্য সমিতি' (১৯৩৬) গড়ে উঠেছিল 'আল-ইসলাহ্' (১৯৩৪/১৩৪১) পত্রিকাকে অবলম্বন করে। ১৯৪৭ সনের পূর্বে যুদ্ধের কারণে ইসলাহ কাগজ সংকটের কারণে অনিয়মিত ও বন্ধ ছিল কিছুকালের জন্য। ১৯৪৭ সনের আগষ্ট মাসে এর দশমবর্ষ পঞ্চম সংখ্যা চলছিল। এরপরেও স্বাধীন পাকিস্তানে কাগজ-সংকটের কারণে ১৯৪৭ সনের এপ্রিল থেকে ১৯৪৮ সনের এপ্রিল পর্যন্ত এক বছর পত্রিকা বন্ধ ছিল।[৪৭] এরপরও মধ্যে-মধ্যে অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। দুই-তিন বা চার—

Dhaka University Institutional Repository

এমনকি, ছয় সংখ্যাও একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। যেভাবেই হোক, ১৯৭১ সন (মার্চ) পর্যন্ত পত্রিকার প্রকাশ অব্যাহত ছিল। একাত্তর-পরবর্তীকালেও পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা আছে বলে মনে হয়না। নতুন কালের প্রবণতাকে ধরবার যোগ্যতাই ইসলাহ্ হারিয়ে ফেলেছিল। অবশ্য পত্রিকার অবক্ষয় শুরু হয়েছিল পঞ্চাশের দশক থেকেই। একালে নতুন-নতুন বিষয় ও নাম পাঠককে অধিক আকৃষ্ট করেছে। ৪৭ ও ৭১ এর পূর্ববর্তী দুই পর্বে আল-ইসলাহ্ সামাজিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করেছিল— ইতিহাসে তা প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণাক্ষরেই লিখিত থাকবে। বিশেষত বাঙলা ও বাঙালীর স্বার্থে এই পত্রিকাটি জ্ঞানত আপোষ করতে চায়নি। যদিও মূল-দার্শনিক ভিত্তি ছিল এঁদের 'ইসলাম'; এবং 'সমাজ' বলতে বুঝেছিলেন তাঁরা মুসলমান-সম্প্রদায়। কিন্তু বিজ্ঞান-চিন্তায় এবং সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের সমান অধিকার আর অখণ্ড বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্য সম্পর্কে বিমুখ ও বিরূপ ছিলেন না। মাহেনও মোহাম্মদী তাহজিব দ্যুতি প্রভৃতি পত্রিকায় রবীন্দ্র-সাহিত্য বিস্ময়করভাবে কম চর্চিত বিষয়রূপে পরিগণিত হলেও 'আল-ইসলাহ' এবং 'সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি' রবীন্দ্রচর্চায় বিস্ময়করভাবেই ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছিল। ১৯৬১ সনে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী এই সমিতির পক্ষ থেকেও পালিত হয়েছিল এবং আল-ইসলাহ 'শতবর্ষ পরে' ইত্যাদি শিরোনামে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে রচিত অনেক লেখা প্রকাশিত করেছিল। বিভাগ-পূর্বকালে, পাকিস্তান-আন্দোলনের মোক্ষম-সময়েও ইসলাহ রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে রচনা প্রকাশ করেছে। উর্দুর পরিবর্তে বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে জনমত গঠনে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবর্জনের বিপক্ষে, বাঙলা নববর্ষ উদযাপন এবং বাঙলা ভাষার জন্যে একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয়কাজের সকল স্তরে বাঙলাভাষা প্রচলনের দাবীতে গোটা পাকিস্তানী-আমলে আল-ইসলাহ অনেক প্রাগ্রসর ও প্রতিবাদী বক্তব্য প্রদান করেছে। সামাজিক ভূমিকার দিক দিয়ে এবং ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি-চিন্তার স্বরূপ বিচারেও আল-ইসলাহ্ ঠিক মোহাম্মদী মাহেনও, নওবাহারের সমগোত্রীয় পাকিস্তানী পত্রিকা নয় বটে, তবে পাকিস্তানবাদী পত্রিকার মতোই এঁরা আবার কায়েদে-আজম, ইকবাল, ইসলাম এবং মুসলমান- সমাজ নিয়ে এমন আন্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন যে, পাকিস্তান সরকারের, রাষ্ট্র-প্রধানের দেয়া পুরস্কার বা আর্থিক সাহায্য থেকে কোন সময়ই বঞ্চিত হননি। বাংলা একাডেমী বিভিন্ন পত্রিকায় যখন থেকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া শুরু করে, আল-ইসলাহ্ও তখন থেকে আর্থিক অনুদান লাভ করেছে। জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার মূল উদ্দেশ্য এঁরা উপলব্ধি করতে চাননি, বরঞ্চ সংস্থার কাজে অনেক ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। রচনা নির্বাচনেও খুব পরিচ্ছন্ন শিল্পীসুলভ উচ্চ মানসিকতার পরিচয় দিতে পারেননি। পাকিস্তানবাদী অনেক লেখকের বাঙলা ও বাঙালি-সংস্কৃতি-বিরোধী বহু সাধারণ বা নিম্নমানের রচনাও এতে প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী হয়তো ছিল 'মুক্তমঞ্চ' তৈরী করা। কিন্তু এতে সুনির্দিষ্ট একরৈখিক চরিত্র ফুটে ওঠেনি। এবং এটাই হলো এর প্রধান সীমাবদ্ধতা। বিতর্ক বলতে যা বোঝায়, তা না হয়ে এসব রচনা প্রকাশের জন্য এতে প্রকটিত হয়ে উঠেছে স্ববিরোধিতা। বাঙলার পক্ষেও লড়াই করেছেন। আবার সম্পাদকীয় মন্তব্য ছাড়াই উর্দু-আরবীর সপক্ষীয় রচনাও প্রকাশ করা হয়েছে। অবশ্য এমন হতে পারে যে, আঞ্চলিকভাবে সমিতিতে সকল সদস্যের মত প্রকাশের অধিকার না দিলে পত্রিকা বা সমিতি টিকে থাকতো না। সেজন্যেই অনেক ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতাকে আল-ইসলাহ্ হজম করে নিয়ে এগুতে চেয়েছিল। সেজন্য দেখা যায় অনেক প্রাচীনপন্থীর অনাধুনিকভাষায় রচিত প্রবন্ধ, সমালোচনা এতে প্রকাশিত হয়েছে। সাধু ভাষার রচনা প্রকাশও একে আধুনিক সাহিত্য পত্রিকারূপে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি। এই রকম নানা সীমাবদ্ধতা এবং অনুচ্চ আদর্শের উদাহরণ দেয়া যাবে কিন্তু সদর্থক দিকও এর অনেক আছে।

আল-ইসলাহ্ 'সাহিত্য পত্রিকাই' ছিল। পাঠকদের পক্ষ থেকে ১৯৩৮ সনে (কার্তিক ১৩৪৫) পঞ্চমবর্ষ, প্রথম সংখ্যায় 'ইসলামিক কায়দা কানুন হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে' মর্মে উত্থাপিত এক অভিযোগের জবাবে সম্পাদক বলেন : 'আল ইসলাহ্ সাহিত্য পত্রিকা। ইহাতে গল্প উপন্যাস, প্রবন্ধ কবিতাত থাকিবেই। তবে যতদূর সম্ভব আমরা গর-ইসলামিক মতবাদকে এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। ভ্রমবশত এমন কোন কিছু যদি থাকিয়াই থাকে, তবে সেটা ক্ষমার্হ সন্দেহ নাই।'[৪৮] উপর্যুক্ত আদর্শের কারণে একে ইসলামিক সাহিত্য-পত্রিকা আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। ৬ষ্ঠ বর্ষ ৯ম-১০ম যুগ্মসংখ্যা থেকে আল-ইসলাহ কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি (সিলেট)র 'মাসিক মুখপত্র' রূপে প্রকাশিত হয়। ফলে তাঁরা ইসলামিক আদর্শের বন্ধনে আরো কঠিনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যেটা বিশেষ লক্ষণীয় তাহলো ঃ শিখা ও মুসলিম সাহিত্য সমাজ (ঢাকা) এর আদর্শ অনুসারী ইসলামই এঁদের পাথেয় ছিল। সেজন্য গোঁড়া ইসলামী পত্রিকা একে বলতে হয়ত দ্বিধান্বিত হতে হবে। একটি বিজ্ঞাপণে বলা হয় 'পূর্ব বাঙলা ও আসামের মুসলমান পরিচালিত সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক ...., ইহাতে প্রচলিত শাস্ত্র ব্যাখ্যাকে যুগ-ধর্ম্মী মানব-মনের নবপ্রয়োজনে নবরূপে গ্রহণ, আধুনিক জীবনে ইসলামের নবযুগের বিবিধ সমস্যা ও তার সমাধানের বহুমুখী প্রচেষ্টা, বাঙ্গালী মুসলমানের দুঃসহ জীবনের বেদনার ইতিহাস, অন্ধ সংস্কার গতানুগতিকতা ও গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে কুঠারাঘাত, সত্য ও কল্যাণ জিজ্ঞাসায় নির্ভীকচিত্ততা, ধর্ম্মধ্বজীদের ভণ্ডামীর বিপক্ষে নিসঙ্কোচ সমালোচনা পাইবেন। দেখিবেন— ইহার বীর লেখকগণ গতানুগতিকতার মোহকে কিভাবে কাটাইয়া উঠিয়াছেন। বাস্তবিক আল-ইসলাহ্ মুসলিমবঙ্গ ও আসামের নবজাগরণ ও নব তপস্যার এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে। ...... অশ্লীল অথবা প্রতারণামূলক কোন বিজ্ঞাপন আল-ইসলাহে গৃহীত হয়না।'[৩] উল্লেখ্য, আল-ইসলাহ্ শব্দ দুটির অর্থ সংশোধন বা শুদ্ধিকরণ।

পাকিস্তান জন্মলাভ করতে যাচ্ছে এই সময় অর্থাৎ ১৯৪৭ সনে আল-ইসলাহ্ নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছিল এবং আসামের মুসলিম প্রধান অংশ পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হতে চায় কিনা—সেই প্রশ্নে সংঘটিত 'গণভোটে' পাকিস্তানের পক্ষে ব্যাপক প্রচার প্রপাগাণ্ডা চালায়।[৪৯] প্রচারনায় পত্রিকা মনুষ্যের বসবাসোপযোগী সুখী-সুন্দর পাকিস্তানের স্বপ্ন তুলে ধরেছিল। ফলে পাকিস্তান প্রাপ্তির পর '..... সাহিত্য সমিতি' আনন্দ-উৎসবের এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল, এবং পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ও অন্যান্য রচনায়ও পাকিস্তানকে স্বাগত জানানো হয়। "কায়েদে আজমকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হিসাবে পাইয়া আমাদের আর ভয়ের কিছু রহিলনা। আমরা শুরু হইতেই পরাধীনাতার জিঞ্জীর মুক্ত হইয়া স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইলাম। পাকিস্তান জিন্দাবাদ। কায়েদে আজম জিন্দাবাদ।" পাকিস্তানের আদর্শ-সংক্রান্ত ভাবনা উচ্চকিত হয়েছে যে-কটি উক্তিতে, তাতে

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাহর সমাজ-ভাবনার স্বরূপও বোঝা যায় :

' আমাদের লক্ষ লক্ষ দেশবাসী দুবেলা পেট পুরিয়া খাইতে পায়না। একেই কি বলে সভ্যতা? এই কি উদ্দশ্য পাকিস্তানের? এই যদি হয় পাকিস্তান সে পাকিস্তানে আমার প্রয়োজন নাই। আমাদের জমিদার ও পুঁজিওয়ালাদের যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে, আধুনিক যুগের সমানতালে (আধুনিক মানে সদ্য-স্বাধীন দেশ-এর সমকালকে বোঝানো হয়েছে) চলার তারা অভ্যাস করিবে। যদি তারা তা না পারে আল্লাহ তাদের সহায় হইবেন কিনা 'জানিনা, আমাদের তারা সমর্থন পাইবে না কিছুতেই" (১০ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫৪ পৃ - ১২৯)। সংখ্যালঘু সম্পর্কেও কায়েদের উক্তি উদ্ধৃত করে পত্রিকায় বলা হয় : সকলেই পাকিস্তানের নাগরিক তবে অপপ্রচারে লিপ্ত সংখ্যালঘুরা নাগরিকের মর্যাদা বা অধিকার আশা করিতে পারেনা (পূর্বোক্ত, পৃ- ১৩০)। ইসলাহ্-র রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক ভাবনাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। "কার আয় কতখানি হবে, কে কতটুকু সম্পত্তি পাবে— এ নিয়ে যত তর্ক বিচারই হোক, মনের যত অনৈক্যই থাক- একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে ভাত কাপড় এবং বাসস্থানের উপর মানুষের চিরন্তন অকাট্য দাবী আছে। মানবের সেই অপরিহার্য্য দাবী সর্বাগ্রে পূর্ণ করতে হবে। সমাজে একটি মানুষও যতক্ষণ অনাহারে অথবা অর্দ্ধাহারে দিন কাটাবে, একটি শিশুও যতক্ষণ অনাহারে দুধের অভাবে মাতৃক্রোড়ে কাঁদবে ততক্ষণ মোটরকার, হীরার দুল অথবা পীয়ানো ব্যবহার করার কারও অধিকার থাকতে পারেনা" (সূত্র ঃ পূর্বোক্ত)। ইসলাহ্ হিন্দু-বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাষ্প ছড়ায়নি। সমিতিতে এবং পত্রিকাতে হিন্দু-সম্প্রদায়ের লোকেরা (সাহিত্যিক, অথবা সংস্কৃতিসেবী) সমবেত হতেন। এতে বোঝা যায় ইসলামী মানবতাবাদে আস্থা রেখে সকল মানুষেরই তাঁরা সমানভাবে কল্যাণ কামনা করেছেন। তবে, এবং প্রয়োজনে কঠোরভাবে মুসলিম-বিদ্বেষকে প্রতিরোধও করা হয়েছে। মুসলমান সম্পর্কে আপত্তিকর বক্তব্য যেখানে দেখেছেন, সেখানেই তাঁরা তথ্যকে তুলে ধরে নিন্দাবাক্য উচ্চারণ করেছেন। পাকিস্তানের অমঙ্গল কামনাকারীদেরও নিন্দা-জ্ঞাপন করা হয়েছে বা তাঁদের রাষ্ট্র ও সমাজবিরোধী স্বরূপ উন্মোচন করে দেয়া হয়েছে। ভারতের সরকারের এবং রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের পাকিস্তান বিরোধী মনোভাবকেও নিন্দা করা হয়েছে। মুহম্মদ শাসুল হক নজরুলের অনুকরণে 'মজলুম' শীর্ষক কবিতায় শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি আনুগত্য এবং পুঁজিপতি-বুর্জোয়াদের ধিক্কার জানিয়েছেন : "বাবুসাব কারে বল? কোন সে/ঐশী শক্তির বলে বাবু সাব ওরা হল?" (সূত্র ঃ ১০মবর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৪ পৃ- ২২১)। 'স্বাধীন বাতাস' বা স্বধীনতা প্রাপ্তি পত্রিকার লেখকদেরকে প্রতিবাদী, সংগ্রামী, আত্মসচেতন, আত্মগর্বী, দেশপ্রেমিক এবং স্বশ্রেণীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছে। নতুন দেশের সমাজ-সংস্কৃতি ও সমাজ-ভাবনায় তাই ঘুরে-ফিরে এসেছে 'স্বাধীন পাকিস্তান' এর নানা প্রসঙ্গ— দেশ, জাতি, মানুষ, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষা এবং ধর্মীয় আদর্শ। গল্প, কবিতা, বিভিন্ন ধরণের রচনায় নতুন দেশের আবহাওয়া, স্বাধীনতা সংগ্রামের জের, মোহাজের ও উদ্বাস্ত-সমস্যা, সাম্প্রদায়িক- দাঙ্গা, দেশত্যাগ প্রভৃতির ফলে জনগণ তথা নর-নারীর জীবনের জৈবিক নৈতিক, জীবন-জীবিকা এবং মানসিক সংঘাত-সংঘর্ষ, বিচ্ছিন্নতা,—প্রেমে, বিরহে, লোভে, দুর্নীতিতে কিভাবে মানুষের চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে আল-ইসলাহর পৃষ্ঠাগুলোতে তারও কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

আল-ইসলাহের নিয়মিত লেখক ছিলেন সমিতির সদস্য এবং সিলেটের সকল নতুন পুরাতন, খ্যাত-অখ্যাত, হবু-খ্যাত, উন্নত, মধ্যম, নিম্ন ও অতিসাধারণ শ্রেণীর লিখিয়েরা। তবু অনেক ভালো ভালো রচনাও এতে স্থান পেয়েছে। অনেক লেখক দেশ ও কালের ইতিহাসের উজ্জ্বল স্থান দখল করেছেন। চিন্তাবিদ কাজী আবদুল ওদুদ, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মনীষী আবু সয়ীদ আইউব, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কবি জসীম উদ্দীন, সানাউল হক, ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, ডঃ এম. আবদুল কাদের, এম. আখলাকুর রহমান, মীজানুর রহমান, মোঃ ওয়াজেদ আলী, সৈয়দ মুজতবা আলী, সৈয়দ মুর্ত্তাজা আলী, মাহবুব উল আলম, মুহম্মদ মুসলিম চৌধুরী, দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, দেওয়ান মুহম্মদ আজরফ, অধ্যাপক শাহেদ আলী, মীর্জা আবদুল হাই, এ. জেড. এম. শামসুল আলম, দিলওয়ার, অ.কা.শ. নূর মোহাম্মদ, শ্রী মনোমোহন বর্মণ, সৈয়দ মোস্তফা আলী, মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন, মোহাম্মদ গোলাম আকবর চৌধুরী, মতিনউদ্দীন আহমদ, খান মোহাম্মদ আবদুল হাকীম, মুফাখখারুল ইসলাম, রওশন ইজদানী, আলাউদ্দীন আল আজাদ, আবুল ফজল (বাণী)। মোঃ আহবাব চৌধুরী, ফররুখ আহমদ, ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান, আবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক, আখতার উল আলম, মুহম্মদ নূরুল হক, দেওয়ান আবদুল হামিদ, প্রমুখ লেখকতো লিখেছেনই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নতুন এবং পুরাতন সাধারণ গোছের লেখকেরা আর সিলেট অঞ্চলের প্রায় সব হাতে-খড়ি দেয়া নব্য সাহিত্যিকবৃন্দ ইসলাহে প্রচুর লিখেছেন। হজরত শাহজালাল, কবি নজরুল এবং মুসলমান সম্প্রদায় ও সিলেটের আঞ্চলিক ইতিহাসকে গুরুত্ব দিয়ে ইসলাহ্র বিশেষ বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশিত হয়েছে। অধিকাংশই অতি-সাধারণ কিন্তু অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত এসব রচনা আঞ্চলিকভাবে হলেও সমাজগঠনে কম গুরুত্ব রাখেনি। সিলেট ও আশেপাশের শিক্ষিত লোকদেরকে একটি মানবতাবাদী সমাজ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষশূন্য বাঙালী- সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহশীল করে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল।

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে আল-ইসলাহ্ 'বাঙলার' পক্ষে সবসময় বক্তব্য প্রচার করেছে। সমিতির সাহিত্য-সভায় উর্দু ও বাঙলার বিতর্ক-রও আয়োজন করা হয়েছিল। এতে প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীও বক্তব্য রেখেছেন। একজন গবেষক লিখেছেন : "ভাষা আন্দোলনের ঢেউ ক্রমে ক্রমে পূর্ব বাঙলার মফস্বল শহর, এমনকি গ্রামে-গঞ্জেও ছড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সিলেটের ভূমিকা অগ্রণীর। দেশ-বিভাগের দু'তিন মাসের মধ্যেই মাতৃভাষার আলোচনা সেখানে প্রাধান্য লাভ করে। প্রতিক্রিয়াশীলদের ঘাঁটিও ছিল বেশ শক্ত। তাঁরা ইতিমধ্যে শহরে উর্দু-আঞ্জুমান-স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করছে। এমনি পরিবেশে ১৯৪৭ সনের ৯ই নভেম্বর 'সিলহেটে কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ'-এর উদ্যোগে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় মুহম্মদ মুসলিম চৌধুরী 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন।"[৫১] তিনি রাষ্ট্রভাষার ক্ষেত্রে তমদ্দুন মজলিসের প্রস্তাবের যাথার্থ্য প্রমাণ করে বলেন, তিনি 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' বিতর্কে শরিক হওয়ার গৌরব হতে নিজেকে বঞ্চিত করতে চাননা বলেই এ বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি বলেন জনসংখ্যার অনুপাতে গরিষ্ঠ সংখ্যক জনগণের ভাষা বলে বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করার যুক্তি

Dhaka University Institutional Repository

ধোপে টেকেনা, কিন্তু ভাষার সাহিত্যিক সম্পদে উৎকর্ষের বিচারে বাঙলা রাষ্ট্রভাষা হবার দাবি রাখে। কারণ "বাঙলা ভাষার পক্ষে সবচেয়ে প্রবল যুক্তি হইতেছে এই যে সমৃদ্ধির দিক বিবেচনা করিলে অন্য কোন ভাষাই বাঙলা ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার কাবিল নহে। অতএব কি লোক সংখ্যার দিক, কি ভাষার দিক যে দিক দিয়াই দেখি না কেন বাঙলা ভাষাই যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত ভাষা তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকেনা।...... উর্দু ভাষা পাকিস্তানের কোন প্রদেশের মাতৃভাষা নহে......... তবে অনধিকার চর্চাকারীদের গায়ের জোর প্রবল থাকে, উর্দুভাষারও সে জোরটা রয়েছে"।

একমাত্র রাষ্ট্রভাষা 'বাঙলা' হলে পশ্চিম পাকিস্তানের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হবে বলে তমদ্দুন মজলিশের প্রস্তাব সমর্থন করে তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেন বাঙলা এবং উর্দু অথবা পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যা হয়— তাকে রাষ্ট্রভাষা করা উচিত ঃ "বাংলা ভাষা হইবে পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল কলেজের প্রথম ভাষা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা (খুব সম্ভব উর্দু) হইবে দ্বিতীয় ভাষা এবং ইংরেজী, আরবী এবং সংস্কৃত এই তিনটি ভাষার যে কোনও একটিকে ছাত্রেরা তাহাদের তৃতীয়-ভাষারূপে গ্রহণ করিতে পারিবে। তমদ্দুন মজলিশের প্রস্তাবে কেবল ইংরেজীকে তৃতীয়ভাষা-রূপে গ্রহণ করিবার কথা বলা হইয়াছে। আমরা তিনটী ভাষার একটীকে গ্রহণ করিতে এই কারণে বলিতেছি যে, আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইংরেজি শিখার যেরূপ আবশ্যকতা আছে তেমনি আমাদের ধর্মীয় ভাষার অনুশীলন করারও প্রয়োজন রহিয়াছে; যাঁহারা পাকিস্তানের কর্মচারী হিসাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চাকুরী করিবেন অথবা উচ্চতম বিজ্ঞান-শিক্ষায় যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিবেন তাঁহারা যেমন ইংরেজি ভাষা শিখিবেন, তেমনি যাঁহারা ইসলাম ও হিন্দু-ধর্মে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে চাহিবেন তাঁহারা আরবী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইবেন।" প্রসঙ্গত শিক্ষানীতি সম্পর্কেও তিনি মতামত প্রদান করেন : "বাধ্যতামূলক শিক্ষাকাল অর্থাৎ ১৩/১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়ের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রছাত্রীরা কেবল বাংলা ভাষাই শিখিবে। মুসলমান বালক-বালিকাদের কোরান পড়ার ব্যবস্থা এই সব স্কুলে থাকিবে এবং ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে আবশ্যকীয় বিষয় মাতৃভাষার পাঠ্য-পুস্তক হইতে শিখিবে। যাহারা উচ্চতর শিক্ষালাভ করিতে চাহিবে অথবা উচ্চতর শিক্ষা লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হইবে, তাহাদিগকে বাংলা, পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা এবং ইংরেজী আরবী ও সংস্কৃত এই তিনটী ভাষার একটি অবশ্যই পড়িতে হইবে। এইভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের স্কুল কলেজের প্রথম ভাষা হইবে পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা (সম্ভবত উর্দু), দ্বিতীয়ভাষা হইবে বাংলা এবং তৃতীয় ভাষা ইংরেজী, আরবী, সংস্কৃত এবং গুরুমুখী এই চারটী ভাষার যে কোন একটি।"

কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রভাষা একাধিক হলে কাজের কোন অসুবিধা ঘটবে কিনা সেই প্রশ্নের জবাবে বলেন ঃ "ইউ এনওর মতো পৃথিবীর সব সভ্যজাতির সমবায়ে গঠিত একটা বিরাট প্রতিষ্ঠানের কাজ যখন কোন নির্দিষ্ট রাষ্ট্রভাষা ছাড়াই চলিতেছে, রাশিয়াতে যখন একাধিক রাষ্ট্রভাষা থাকাতেও কাজের কোন অসুবিধা ঘটিতেছে বলিয়া শোনা যায় নাই, তখন আমাদের পাকিস্তানেও দুইটি রাষ্ট্রভাষা দ্বারা রাষ্ট্রের কাজ সম্পন্ন করিতে কোন অসুবিধা হইবে না। এখানে আরও একটি বিষয় ভাবিয়া দেখা দরকার। পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাকে পশ্চিম পাকিস্তানের এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাকে পূর্ব-পাকিস্তানের উচ্চ শিক্ষার্থীদের জন্য বাধ্যতামূলক করা একান্ত আবশ্যক কি না। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের মারফত পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করা হইবে এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে যাহারা চকুরী করিবেন কেবল তাঁহাদেরই দুইটি রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা করিলে চলিতে পারে। তাহা হইলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের খুব অল্প সংখ্যক লোকের পক্ষে উভয় রাষ্ট্রভাষা শিখিবার দরকার হইবে। বাঙ্গাল মুল্লুকের ভাষা শিখিবার প্রয়োজনীয়তা হইতে রেহাই পাইয়া অনেক পশ্চিমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবেন এবং আমরা উচ্চ-শিক্ষার্থী মুসলমান ছাত্রদের জন্য আরবী এবং হিন্দু ছাত্রদের জন্য সংস্কৃত ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে বাধ্যতামূলক করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিব। তখন দ্বিতীয়ভাষা হিসাবে ইংরেজী ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার যে-কোনও একটিকে গ্রহণ করিলেই চলিবে। সাধারণত পূর্ব পাকিস্তানের লোক পূর্ব পাকিস্তানে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের লোক পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হইবেন। যদি পূর্ব পাকিস্তানের কাহাকেও পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত করা হয় তখন তাঁহাকে পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার একটা নির্ধারিত পরীক্ষায় প্রদত্ত সময়ের মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের কেহ পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিলে তাঁহাকে অনুরূপ পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পরীক্ষা পাশ করিতে হইবে।"

উপসংহারে লেখক বলেন ঃ "পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে বাংলা। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা আমাদের শিক্ষার বাহন হইতে পারেনা। যতদিন না পর্যন্ত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থাদি যথেষ্ট পরিমাণে অনূদিত ও রচিত না হইয়াছে ততদিন পর্য্যন্ত বাংলা ও ইংরেজী এই দুই ভাষায়ই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রের কাজ চলিবে।'... ইংরেজী ভাষা শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করার ফলে ...... মাতৃভাষার উন্নতি করার সুযোগ (হারাইয়াছিল আবার আজ অন্য ভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করিলে) পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে।......... আমাদের উদ্ভাবনা শক্তি বিনষ্ট হইবে। .... আমাদের মাতৃভাষা বাংলার প্রাধান্য কমাইয়া যে ভাষা আমাদের স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা বিনষ্ট করিতে চাহিবে, রক্তমাংসের মানুষকে কলের মানুষে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবে, আমরা তাহার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিব। প্রতিপক্ষ যতই প্রবল হউক তাহাতে আমরা দমিব না ; কারণ এখানে রহিয়াছে আমাদের জীবন মরণ-সমস্যা। কেবল একটি ভাষা না জানার জন্য শিক্ষায় ও জ্ঞানে কাহারও চেয়ে পশ্চাৎপদ না হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বর্তমান শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি অশিক্ষিত বনিয়া যাইবে, রাষ্ট্রের কাজের অযোগ্য বিবেচিত হইবে, আর একটি ভাষা জানার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অন্যেরা আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করিবে, আমাদিগকে কৃপার পাত্র মনে করিবে ইহার চেয়ে লজ্জাকর ও অপমানজনক আর কি হইতে পারে?

"সর্বশেষে পূর্ব পাকিস্তানের আলেম সমাজের কাছে আমাদের বিনীত আরজ তাঁহারা যেন উর্দুর পক্ষাবলম্বন করিয়া নিজের পায়ে নিজে কুঠার না মারেন। তাঁহারা কিছুটা উর্দু জানেন, কাজেই উর্দু রাষ্ট্রভাষা হইলে তাঁহাদের ইজ্জত ও প্রতিপত্তি বাড়িবে— এমন যদি তাঁহারা ভাবিয়া থাকেন, তবে আমাদের বিশ্বাস তাঁহারা গোড়াতেই ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন। পশ্চিমা আলেমরা আমাদের দেশের আলেমগণকে সাধারণত অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন, এবং জ্ঞানে যথেষ্ট নিম্ন হইলেও নিজেদের বাঙ্গাল মুল্লুকের আলেমদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাঁহাদের অনেকেরই উর্দু ভাষাটা হয় মাতৃভাষা না হয়

Dhaka University Institutional Repository

লেখ্য ভাষা।..... এই কারণে আমাদের দেশের আলেমরাও তাহাদিগকে যথেষ্ট সমীহ করিয়া চলেন। বর্তমান সময়েই যখন অবস্থা এইরূপ তখন উর্দুর যখন প্রাধান্য স্বীকৃত হইবে, তখন পশ্চিমা মুল্লা মুন্শীরা বাংলাদেশে আসিয়া বাংলার বড় বড় আলেমগণকে স্থানচ্যুত করিয়া ফেলিবে এবং বাঙ্গাল-মুলুকের আলেমদের তলফ-ফুজ (উচ্চারণ) একদম খারাব ইত্যাদি বলিয়া আমাদের দেশের আলেমগণকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবে। সুতরাং পূর্বাহ্নেই সতর্ক হওয়া আবশ্যক।"

পরিশেষে তিনি আলেমসমাজের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, হিন্দু-পণ্ডিত ও সাহিত্যিকরা যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের সার বাংলায় সুলভ করে তুলেছেন, তদ্রূপ ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী-সাহিত্যের সার বাঙালি মুসলমানের নিকট সহজলভ্য করে "জাতির মানসিক বিকার দূর করিবার বিরাট দায়িত্ব (কি তাঁহারা) গ্রহণ করিবেন না?"[৩২]

ডঃ নূরুর রহমান খান একটি প্রবন্ধে লিখেছেন ভাষা-আন্দোলনে সিলেট কেন্দ্রীয় সাহিত্য সংসদ-এর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান ৩০শে নভেম্বর, ১৯৪৭ সনে পূর্ব পাকিস্তানের 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা না উর্দু হওয়া উচিত' শীর্ষক আলোচনার উদ্দেশ্যে সুধীসমাবেশ। এই সমাবেশে ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলীকে আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এক শ্রেণীর প্রচারণার ফলে নির্দিষ্ট দিনে অসংখ্য অবাঞ্ছিত লোকের উপস্থিতিতে মুজতবা আলী তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন শুরু করলে তাদের চাঞ্চল্য উচ্ছৃঙ্খলতার চরমে পৌঁছায় এবং নানা রকম কটূক্তিতে বক্তৃতায় বাধা সৃষ্টি করতে থাকে। এক পর্যায়ে ক্রুদ্ধ আলী সাহেবও বলতে বাধ্য হন, "আপনারা জেনে রাখুন আমার বাড়ীও সিলেট, আমিও সিলেটী পুয়া, দরকার হলে মাথা ফাটাফাটি করতে আমিও জানি, সুতরাং বেশী চেঁচামেচি না করে প্রথমে আপনারা আমার কথা শুনুন, পরে যদি আপনাদের কোন বক্তব্য থাকে সভায় পেশ করুন। অযথা হৈ হুল্লোড় করে অনুষ্ঠানকে পণ্ড করার চেষ্টা করবেন না।" হট্টগোলের মধ্যে শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা অসমাপ্ত রেখে আলী সাহেব সভাস্থল পরিত্যাগ করেন। তিনি সংসদের সেক্রেটারী নূরুল হক সাহেবকে আশ্বস্ত করেন যে, তাঁর সম্পূর্ণ বক্তব্য লিখে পাঠাবেন এবং তা সংসদের মুখপত্রে প্রকাশিত হলে তাঁদের উদ্দিষ্ট সার্থক হবে। মুজতবার এই মূল্যবান ভাষণটি 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় 'পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। পরে এটি আল-ইসলাহ্‌র ১৩৫৬ সনের কার্তিক-চৈত্র, ১১শ বর্ষ, ৭ম- ১২শ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়। তবে পাদটীকায় বলা হয় : "কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য-সংসদের (সিলহট) ১১শ বর্ষের ৩য় সাহিত্য সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ"। অতপর প্রবন্ধটি চট্টগ্রাম ও কলকাতা থেকে যথাক্রমে ১৯৫৬ ও ১৯৭০-এ পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়। (দ্রঃ নূরুর রহমান খান, বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা চেতনা, নিবন্ধমালা, ৩য় খণ্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৭, পৃ. ১২২)।

'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে সৈয়দ মুজতবা আলী প্রথমেই বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে শেষ পর্যন্ত বাঙলা ভাষাই হবে সে সম্বন্ধে আমাদের মনে কখনো কোন সন্দেহ ছিলনা। এবং একথাও নিঃসন্দেহে জানি যে যদিও এখনকার মত বাঙলার দাবী মেনে নেওয়া হয়েছে তবু উর্দুওয়ালারা আবার সুযোগ পেলেই মাথা খাড়া করে উঠতে পারেন। আমরা যে এতদিন এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিনি তার প্রধান কারণ বাঙলা-উর্দু দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক রঙ ধরে নিয়ে দলাদলির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ; সে অবস্থায় সুস্থ মনে, শান্ত চিত্তে বিচার করবার প্রবৃত্তি কোনো পক্ষেরই ছিলনা। আবহাওয়া এখন ফের অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে, এই বেলা উভয় পক্ষের যুক্তিগুলো ভালো করে তলিয়ে দেখে নিলে ভবিষ্যতের অনেক তিক্ততা অর্থহীন দ্বন্দ্ব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে।"

আলোচনার পরিশেষে তিনি মন্তব্য করেন : "তাই আমাদের সবিনয় নিবেদন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান যেন কোনো মহত্তর আদর্শের অনুপ্রেরণায় ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়। পূর্বেই নিবেদন করেছি, গুণীরা সে আদর্শের সন্ধান করবেন। আমার জ্ঞান অভিজ্ঞতা অত্যল্প, কিন্তু নানা দেশের গুণীদের মুখে শুনেছি, নানা সৎ-গ্রন্থে পড়েছি, দীন ইসলাম বলেন, সে আদর্শ হবে রাষ্ট্রের দীন-দুঃখীর সেবা করা। উভয় পাকিস্তান যদি এই আদর্শ সামনে ধরে যে তাদের রাষ্ট্র-ভিত্তি নির্মিত হবে চাষী-মজুরকে অন্ন দিয়ে, দুঃস্থকে সেবা করে, অজ্ঞকে জ্ঞান দান করে, এক কথায় 'সাইল'কে (অভাবে আতুরকে) 'গনী' (অভাবমুক্ত) করে, তাহলে আর ভয় নেই, ভাবনা নেই। উভয় প্রান্তে গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তারা যে ঐক্যসূত্রে সম্মিলিত হবে সে সূত্র ছিন্ন হওয়ার ভয় নেই। সেই মহান আদর্শের দিকে উদ্দীপ্ত করতে পারে সতেজ সবল সাহিত্য। সে জাতীয় সাহিত্য মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষাতে কেউ কখনো নির্মাণ করতে পারেনি। জনগণের মাতৃভাষা উপেক্ষা করে গণরাষ্ট্র কখনই নির্মিত হতে পারেনা। তাঁর উপসংহারের বক্তব্য ঃ যুদ্ধ কাম্য বস্তু নয়। অন্যের বিনাশ বাসনা সর্বথা বর্জনীয়। পাকিস্তান বিনষ্ট হলে ভারতীয় ইউনিয়নের লাভ নেই, ভারতীয় ইউনিয়ন বিনষ্ট হলে পাকিস্তানের লাভ নেই। উভয় রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে বিত্তবান হোক, এই আমাদের প্রধান কাম্য। ইউরোপের তাণ্ডব-লীলা থেকে আমরা কি কোনো শিক্ষা গ্রহণ করব না? শিক্ষাগ্রহণ করি আর নাই করি, কিন্তু আক্রান্ত হওয়ার ভয় অহরহ বুকে পুষে সেই দৃষ্টি-বিন্দু থেকে সর্ব-সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করা মারাত্মক ভুল। বাড়ীতে আগুন লাগার ভয়ে অষ্টপ্রহর চালে জল ঢালা বুদ্ধিমানের কর্ম নয়। আজ যদি আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় মাতৃভাষা বর্জন করি তবে কাল প্রাণ যাওয়ার ভয়ে মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হব।" (আল ইসলাহ, ১১শ বর্ষ, ৭ম-১২শ সংখ্যা, কার্তিক-চৈত্র ১৩৫৬ সন, পৃ-২৪৯-২৭৯)।

আল-ইসলাহের উপর্যুক্ত সংখ্যায় মনীষী আবু সয়ীদ আইউব-এর দুটি রচনা প্রকাশিত হয়। তাঁর 'সাধু ও সজ্জন' শীর্ষক প্রবন্ধটি ('পথের শেষ কোথায়' কলকাতা, ১৩৯০, ৩য় সং, গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে) প্রথম প্রকাশিত হয় আল-ইসলাহে। আবু সয়ীদ আইউব ১৯৫০ সনের ৮ জানুয়ারী, রবিবার পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে 'আঞ্জুমানে এসলাহুল মুসলিমীন এর প্রথম কনফারেন্সের সভাপতির অভিভাষণ হিসেবে এটি পাঠ করেন। তাঁর অপর প্রবন্ধ 'সাম্য ও স্বাধীনতা' চতুরঙ্গ থেকে ইসলাহে সংকলিত হয়। মানবতাবাদের মাহাত্ম্যকীর্তন এবং উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলীর বিশ্লেষণ আর মুক্তবুদ্ধির ভিত্তিতে কাল-মার্ক্সের দর্শনের ও চিন্তাধারার ব্যাপক গভীর পর্যালোচনা এবং রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের ডগমেটিজমের ধারণার

Dhaka University Institutional Repository

কঠোর, যুক্তিভিত্তিক আলোচনা আল-ইসলাহের মনপূত হয়েছিল বুঝা যায়। উচ্চতর মানবিক আদর্শ ও মুক্ত-বুদ্ধির চর্চার প্রতি পাঠকদের ধাবিত করার প্রচেষ্টা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

পাকিস্তানের সাহিত্যের গতিধারা বিশ্লেষণেও ইসলাহর লেখকেরা উন্নতমনের ও রুচিস্নিগ্ধ-চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছিলেন। 'আমাদের সাহিত্যের গতি' শীর্ষক প্রবন্ধে মুহম্মদ মুসলিম চৌধুরী বলেন, আমাদের সাহিত্যে এখনও এমন কোন ধারার সৃষ্টি হয়নি যা জাতির জীবনকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করতে পারে। 'যে পরিবর্তন ভীরু পশ্চাৎমুখী সমাজ সৃষ্টির নূতন নূতন উপাদান যোগাইতে পারেনা সেই সমাজ মানসের প্রভাব ব্যক্তি মানসকে বেশীদূর আগাইয়া লইয়া যাইতে পারেনা। কিন্তু ইহাতেও আবার সন্দেহ নাই যে আমাদের জীবন কেবল একটানা দুঃখেরই নহে যে, আমাদের সাহিত্যিকদের মনে জাগাইয়া তুলিবে শুধু হতাশা আর বিক্ষোভ।..... পরিচয়ের গভীরতা ও সম্পর্কের নিবিড়তা না থাকায় আমাদের সাহিত্যিকরা জীবনের বহুমুখী প্রকাশকে তাহাদের সাহিত্যে রূপায়িত করিতে পারেন নাই।"

লেখক জনগণের সকল স্তরের জীবনের মহত্তম দিককে সাহিত্যের মাধ্যমে প্রতিফলিত করে পাঠকগণকে উজ্জীবিত করার প্রস্তাব দিয়ে বলেন, 'সাহিত্য কোন মতবাদের দাসত্ব করেনা।' শ্রেণী সংগ্রামের যুগে লেখকদের স্ব শ্রেণীর মনের প্রতিনিধিত্ব করার গুরুত্ব বর্ণনা করে তিনি আরো বলেন, 'সমাজ বা শ্রেণীর মনের ভিতর দিয়াই বিশ্বমানবমন প্রকাশ পায় এবং (যে সাহিত্য এই বিশ্বমানবমন রূপায়িত হয়— সে) সাহিত্য হয় বিশ্ব সাহিত্য বা সর্বজনীন সাহিত্য'।

বিজ্ঞানের সঙ্গে ইসলামের সম্বন্ধ সম্পর্কেও লেখক মুক্ত-মনের পরিচয় দিয়েছেন। "বিজ্ঞানের সঙ্গে ইসলামের কোন বিরোধ থাকিতে পারেনা। .... যুগোপযোগী ব্যাখ্যা না হওয়ার ফলে ইসলাম গোটা কয়েক ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং একটা বিশেষ সেন্টিমেন্ট জাগাইয়া তোলার কাজে ব্যবহৃত হইতেছে, মানুষের জীবনকে সুষ্ঠু ও সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে না।" তিনি বলেন : "আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও যখন কোরান সম্পর্কে কথা বলার অধিকার অর্জন করা যায় বরং এই অজ্ঞতাকে শ্লাঘার বিষয় মনে করিতেও যখন বাধেনা তখন মানবজীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান কোরান, হাদিস হইতে পাওয়ার আশা সুদূর পরাহত।" সমাজগঠনে সাহিত্যের ভূমিকা এবং বাঙলা ভাষার 'স্বাভাবিক গতি'র বিশ্লেষণ শেষে উপসংহারে লেখক বলেন "সাহিত্যিকরা যদিও জাতির সমস্যা ও যুগের দাবী অস্বীকার করিতে পারেন না তবুও তাঁহারা আমাদের ফরমাইশ মাফিক সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন এরূপ আশা করা অন্যায়। সাহিত্য বা আর্ট সার্বজনীন। ইহা বিশেষ জাতি বা সমাজের হইয়াও সকল মানুষের ও সর্বকালের।" উন্নতমানের সাহিত্য সৃষ্টির আবশ্যকতায় আশাবাদী লেখক বলেন, ... "এরূপ সার্বজনীন সাহিত্য সৃষ্টি সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয়না জানি, কিন্তু তাই বলিয়া সকলেই কেবল সাময়িক বিষয় নিয়া ব্যস্ত থাকিবেন এমন হইতে পারেনা।" পাকিস্তানের উদ্দেশ্য মাফিক 'ইসলামী' বা 'পাকিস্তানী সাহিত্য' সৃষ্টির ব্যাপারে স্পষ্টতই লেখক বলেন, যেখানে স্বাধীনচিন্তা ও সার্বজনীন সাহিত্য সৃষ্টির পথে নানারকম 'ফতোয়া' ঘোরে--- "সেখানে প্রকৃত আর্ট সৃষ্টি ব্যাহত না হইয়া পারেনা। ...... আজাদী লাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া যেন নূতন চেতনা লাভ করিয়াছে। ...... তবে সুখের বিষয় যুগে যুগে প্রতিক্রিয়া পরাজিত হইয়াছে। এই পরাজয়ের কাহিনী লেখা আছে ওমর খৈয়াম ও হাফেজের রুবাইয়াতে, আছে মোগল স্থাপত্য ও সঙ্গীতে — তাজমহলে, তানসেনে।" (কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের ত্রয়োদশ বৎসরের দ্বিতীয় সাহিত্য সভায় ২৩-১০-১৯৪৯ তারিখে পঠিত প্রবন্ধের শেষাংশ', দ্রঃ আল-ইসলাহ, কার্তিক-চৈত্র ১৩৫৬ সংখ্যা, পৃ-২৯৭)।

মাহবুব উল আলম ' আব্বাসউদ্দীন' শীর্ষক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কোরানের এবং ইসলামের সঙ্গে শিল্প সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ণয় করে পাকিস্তানের আদর্শের সঙ্গে গান-বাজনা নৃত্য-চিত্র ইত্যাদির সংঘাত নেই বলে মন্তব্য করে বলেন ঃ 'নৃত্যের মধ্য দিয়াও পাকিস্তানকে রূপায়িত করা যায়। বরং আমার মনে হয় পাকিস্তানেরও একজন উদয় শংকরের অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন। কোরানের উদার দৃষ্টিভঙ্গী কাহাকেও এবং কিছুকেই অবজ্ঞা করিতে শিক্ষা দেয়না। কোরান সম্পূর্ণতার দাবী করে এবং সত্যই উহা সম্পূর্ণ। কিন্তু অপর কেহ সত্যের অধিকারী নয় এবং আর কিছুতেই সত্য নাই—কোরান এই শিক্ষা দেয়না। পাকিস্তানের সুদৃঢ় ইমারত একমাত্র এই বুনিয়াদের উপরই গড়িয়া উঠিতে পারে।"[৫৩]

দেওয়ান মুহম্মদ আজরফ সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রতিভার গুরুত্ব এবং জীবনে নৈতিকতার প্রতিফলন ঘটে এমন মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির গুরুত্ব বর্ণনা করে প্রবন্ধ লিখেছেন (উপেক্ষিত সাহিত্যিক, ১০ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, পৃ-২৭৭-৭৯), ছোহেল উদ্দীন আহমদ অবক্ষয়- কবলিত পাকিস্তানের সমাজচিত্র তুলে ধরেছেন 'সমাজতন্ত্রের পাকিস্তানী বিবর্তন' 'শীর্ষক প্রবন্ধে (দ্রঃ আল ইসলাহ, ১০ বর্ষ ১১শ সংখ্যা পৌষ ১৩৫৪, পৃ-৩০০-৩০৭)। মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী জাতিগঠনে সংবাদপত্র ও নিজস্ব সংবাদ মাধ্যমের গুরুত্ব বর্ণনা করে প্রবন্ধ লিখেছেন 'সংবাদপত্র' শিরোনামে (১১ বর্ষ, ৭-১১ সংখ্যায়, পৃ-৩০৯)। সিলেটের আঞ্চলিক ইতিহাস এবং হজরত শাহ জালাল' এর উপর অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে,[৫৪] আর সিলেটের লোক-সাহিত্যের বিস্তৃত পরিচয়ও এ পত্রিকায় পাওয়া যায়। ফলে জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্যের দলিল হিসেবে আজও আল-ইসলাহর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

৩. মাহেনও (১৯৪৯-৭১)

১৯৪৯ সনের এপ্রিল মাসে, কিছুদিন আগে-থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রকাশিত কেন্দ্রীয় সরকারের সাহিত্যিক-মুখপত্র (প্রচারপত্র) উর্দু-মাসিক মাহেনও এর একটি বাঙলা সংস্করণ পূর্ববাঙলায় সকল শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সাহিত্যিক-রাজনীতিবিদ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রচারের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়।উদ্দেশ্য অবশ্যই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আর্দশের প্রচার এবং নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ভিত্তিভূমি সুদৃঢ়রূপে তৈরী করা। রাজনীতিতে আধুনিক প্রচার-মাধ্যমের অপরিসীম গুরুত্বের কথা সরকার উপলব্ধি করে এই পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষক, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী, আমলা, সংস্কৃতিকর্মী, লেখক ও সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সুসংগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করার ঐকান্তিক অভিপ্রায় নিয়ে সরকার 'মাহেনও' প্রকাশ করেছিল। সরকারী পত্রিকা বলে এর আয়-ব্যয়ের কোনো চিন্তা ছিলনা। গৌরিসেনের টাকায় কাড়ি কাড়ি লেখা মাসে মাসে ছাপা হয়েছে এবং লেখা ছাপানোর অজুহাতে শিক্ষিতশ্রেণীর সদস্যদের সম্মানী বা পারিশ্রমিক দিয়ে, সরকারমুখী করে তোলার প্রয়োজনকে অর্থব্যয়ের যুক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছিল। সরকারের এই অভিলাষ এদেশের লেখক-সম্প্রদায় কমবেশী পূরণ করেছিলেন। খ্যাতিমান অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিক এই পত্রিকায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়মিত লিখেছেন। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, সুফিয়া কামাল, শওকত ওসমান, আহমদ শরীফ, হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান, আতাউর রহমান, বদরুদ্দিন উমর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আজিজুল হক, এবং একালের গল্প সাহিত্যের প্রধানলেখক সেলিনা হোসেন, কবি আবুল হাসান (মরহুম) সকলেই মাহেনও এর পৃষ্ঠায় লেখা প্রকাশ করতে দিতেন। সৈয়দ আলী আহসান এবং চিহ্নিত পাকিস্তানবাদী লেখক সম্প্রদায় তো লিখতেনই। তবে দেখা যাবে পাশাপাশি প্রগতিশীল বা মানবতাবাদী ধারার পত্রিকাতেও এই সমস্ত লেখক এবং তাঁদের উত্তরসুরী নবীন লেখকেরা পর্যাপ্ত লিখেছেন। আরও দেখা যাবে এক-শ্রেণীর লেখক পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রধান দুটি ধারা— 'সাম্প্রদায়িক' ও 'অসাম্প্রদায়িক' উভয় শ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় সমানতালে নিয়মিত লিখেছেন। ফলে সামাজিক সাংস্কৃতিকভাবে জনগণ মাঝেমধ্যেই বিভ্রান্ত হয়েছেন। বুঝতে পারেননি— কি তাঁদের করা উচিত। কারা কি ভাবছেন, তাও অস্পষ্ট থাকতো অনেক সময়।

'মাহেনও' কথার আক্ষরিক অনুবাদ ('মাহে' মানে চাঁদ, এবং 'নও' মানে নতুন) নতুন চাঁদ-এর ব্যঞ্জনার্থ 'নবযুগ' মনে করা যায়, কিন্তু উদ্যোক্তাদের মাথায় সেটা ছিল কিনা বলা যায় না। 'নতুন চাঁদ' তাঁরা ইসলামী তাৎপর্যেই গ্রহণ করেছিলেন অনুমান করা সঙ্গত। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে পাকিস্তানের সাহিত্যক্ষেত্রে 'নবযুগ' সৃষ্টির (?) প্রত্যাশা নিয়ে মাহেনও সচিত্র মাসিক রূপে আবদুর রশিদ এর সম্পাদনায় 'পাকিস্তান পাবলিকেশনস' এর পক্ষে এম. আরশাদ হোসেন কর্তৃক করাচী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। করাচী বা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হলেও মুদ্রিত হতো ভোলানাথ বসাক কর্তৃক শ্রীকান্ত প্রেস ৫ নয়া বাজার, ঢাকা থেকে। বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে পাঁচ টাকা। প্রতি সংখ্যা আট আনা। সাইজ ৯।।" × ৭।। ইঞ্চি। মাহেনও-র প্রথম সম্পাদক আবদুর রশিদ প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে দ্বিতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদনা করেন। দ্বিতীয় বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যা থেকে চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যাগুলোর অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন মীজানুর রহমান। চতুর্থ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা থেকে চতুর্থ বর্ষ অষ্টম সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদনা করেন অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন। এরপর চতুর্থ বর্ষের নবম সংখ্যা পৌষ ১৩৫৯ থেকে ষোড়শ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত কবি আবদুল কাদির। ষোড়শ বর্ষ নবম সংখ্যা থেকে (পৌষ ১৩৭১ ঃ ডিসেম্বর ১৯৬৪) পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন পাকিস্তান-পন্থী কবি তালিম হোসেন। উপরে যে সংখ্যাগুলোর উল্লেখ নেই, তাতে, সম্পাদক হিসেবে কারো নাম ছিলনা। তবে নামে কিছু এসে যায়না। সরকারী পত্রিকা কার্যালয়ের রুটিনমাফিক ছাপা হয়েছে। কোনো প্রতিবন্ধকার সৃষ্টি হয়নি। মীজানুর রহমান এম.এ. ১৯৪৭ সনে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ছিলেন। তিনি সরকারী অভিপ্রায় অনুসারে তথ্য দফতরের নিয়ন্ত্রণাধীন মাহেনও পত্রিকার অবৈতনিক সম্পাদক হয়েছিলেন। তাতে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা বাতুলতা। বরঞ্চ লক্ষ্য করতে হয় আগ্রহের সঙ্গে যে, পাকিস্তান সরকারের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ে নীতিমালা তিনি কতোখানি বাস্তবায়িত করতে পেরেছিলেন। আবদুর রশিদ একজন সাধারণ লেখক, সরকারের কর্মচারী ছিলেন। তিনি আধুনিক কবিতার (আশরাফ সিদ্দিকীর) যুগ্ম-সম্পাদক আবদুর রশিদ খান নন। অধ্যাপক মুহমদ মনসুরউদ্দীন, কবি আবদুল কাদির এবং কবি তালিম হোসেনের পরিচয় প্রদানের খুব প্রয়োজন পড়েনা। 'হারামনি' (পাঁচ খণ্ডের)-সংকলক এবং বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক প্রখ্যাত অধ্যাপক, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন এবং 'শিখা' গোষ্ঠীর একজন লেখক ও কয়েক সংখ্যা 'শিখা'র সম্পাদক, ছন্দাসিক, কবিবর, সম্পাদক আবদুল কাদিরকে এদেশের প্রায় সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই জানেন। মাহেনও পত্রিকায় কাজ করতেন প্রখ্যাত কবি মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ। যিনি 'পূবালী' সম্পাদনায়ও বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। তবে যে কথা বলা দরকার, তাহলো সম্পাদকদের রচনা নির্বাচনে এবং আদর্শ নির্ধারণে স্বকীয় রুচি ও আদর্শ অনুসরণ করার অধিকার বা ক্ষমতা ছিলনা। সরকারী পত্রিকায়, সরকারের নীতিমালা অণুসরণ করতে হতো। পত্রিকার রচনা নির্বাচনে মতান্তরের কারণে চার সংখ্যার পরে মনসুর উদ্দীনকে অব্যাহতি দেয়া হয়। কায়েদে আজম, মহাকবি ইকবাল, পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকার ভৌগলিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক পরিচয় প্রদান, সরকারের প্রধান ব্যক্তিদের ভাষণ, ছবি, সরকারী ঘোষণা আর উর্দু মাহেনও-এর প্রধান লেখার বাঙালি লেখকদের অনুবাদ পত্রিকার বিরাট অংশ জুড়ে ছাপা হয়েছে। এদেশের লেখকেরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যা লিখেছেন, তার মধ্যে আবার বেশিরভাগই ছিল মধ্যযুগ ও উনিশশতকের বাঙালি-মুসলমান কবি-সাহিতিকদের জীবন ও সাহিত্যের, চিন্তা ও মূল্যবোধের স্বরূপ উপস্থাপন প্রচেষ্টা। আধুনিক সমকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে লিখিত কবিতা, গল্প, উপন্যাস এবং প্রবন্ধ-আলোচনা-সমালোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে এদেশের লেখকেরা বাঙলা সাহিত্যে যে মূল্যবান সংযোজন ঘটিয়েছেন, তারও কিছু মূল্য অবশ্যই আছে। অনেক স্থায়ী শিল্পমূল্যের গল্প কবিতা, এবং ইতিহাসের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক উপন্যাস আর অনালোচিত একটি বিশেষ এলাকা মধ্যযুগের কলমী-পুঁথির পাঠ-উদ্ধার ও সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক-ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ এবং ভবিষ্যত ইতিহাস প্রণয়নের দিক্‌নির্দেশদানের ক্ষেত্রে সহায়ক অনেক প্রবন্ধ, আলোচনা, সমালোচনা এতে প্রকাশিত হয়েছে। এর লেখক ছিলেন পূর্ব বাঙলার সকল খ্যাত, প্রখ্যাত, হবু-খ্যাত অধ্যাপক, গবেষক, কবি-সাহিত্যিক, সংস্কৃতি-সেবী এবং শিল্পীবৃন্দ। ফলে পাকিস্তান সরকারের আদর্শ-বিরোধী না-হয়েও অনেক রচনা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক বিচারের মাপকাঠিতে কিছু মূল্যবান বিবেচিত হয়েছে বা হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

কাজী নজরুল ইসলাম-পরবর্তী বাঙালি মুসলমান রচিত আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে এদিক থেকে মোটামুটিভাবে মাহেনও-এর একটি সদর্থক ভূমিকা রয়েছে। পত্রিকার এই ভূমিকা প্রথমে যেভাবে শুরু হয়েছিল—করাচী থেকে প্রকাশিত হলে কতোটুক তা সম্ভব হতো বলা যায় না। তবে পাঁচটি সংখ্যা সেখান থেকে প্রকাশের পর ঢাকা থেকে যখন ষষ্ঠ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৬ প্রকাশিত হতে আরম্ভ করলো — তখনই এই সুযোগ অবারিত হলো। সম্পাদকীয়তে ঢাকায় আগমন সম্পর্কে (ভাদ্র ১৩৫৬ ৬ষ্ঠ সংখ্যায়) বলা হয় ঃ "আপাতত ঢাকাতে 'মাহেনও'র নিজস্ব দপতর কায়েম হয়েছে। পরিচালনার নতুনতর এনতেজামও করা হয়েছে। 'মাহেনও'কে সর্বাঙ্গ-সুন্দর মাসিক পত্রিকায় পরিণত করা মোনতাজেমগণের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা।.... 'মাহে-নও'-র ক্রমোন্নতির কোশেশ আমাদের কাম্য। ফলাফল আল্লাহর রহমৎ এবং লেখক- লেখিকা ও পাঠক-পাঠিকাগণের সাহায্য সহানুভূতি ও সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। আমরা কামনা করি সকলের নেক্‌নজর হামদর্দী ও মেহেরবানী।" পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একই সূত্রে বলা হয় ঃ "মাহেনও'র আসল মক্‌সাদ নিয়ে কাহারো মনে খট্‌কা রয়েছে বলে মালুম হয়। সাহিত্যের মারফতে আত্ম-চেতনা ও আত্ম-পরিচিতির পরিবেশে পাকিস্তানের খেদমত 'মাহে-নও'র আসল উদ্দেশ্য। পাকিস্তান আমাদের জাতীয় রাষ্ট্র। পাকিস্তানের সোবেহ্ উমিদে শুরু হয়েছে আমাদের নতুনতর জীবনের জয়যাত্রা। আমাদের জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ ও সফলতার জন্য দরকার সাহিত্য ক্ষেত্রে নতুনতর অনুপ্রেরণার সঞ্চার— নতুনতর পরিবেশ ও পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি। 'মাহে-নও' কোশেশ করছে এবং করবে পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের বাসেন্দাগণের মধ্যে আত্মীয়তা এবং পারস্পরিক পরিচিতির সোনালী বন্ধন সৃষ্টি করতে। 'মাহেনও' এশ্‌তেকবাল করে সহযোগিতা করবে সকল সাময়িক পত্রিকার সহিত নিজস্ব নীতির দায়েরাতে। নিজেদের ভাবধারা প্রকাশের জন্য 'মাহেনও' কাহারো উপর কোনও ফরমাশ দিবার আহমিকা রাখেনা। ভাবপ্রকাশের জন্য ভাষা। কে কেমন ভাবে নিজের কথা প্রকাশ করবেন, তা লেখক-লেখিকার নিজস্ব অধিকার এবং দায়িত্ব। কোন্ লেখা কার কতটুকু বোধগম্য, সে বিচারের দায়িত্ব কেউ নিতে পারেনা। অতীতে বাঙলা ভাষা নানা মোড় ঘুরেছে, বর্তমানে শুরু হয়েছে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের নতুন যুগ। নতুন যুগের সাথে তাল ঠুকে চলবার কোশেশ করবে 'মাহেনও'। বিষয়টি নেহায়েৎ গুরুত্বপূর্ণ। যথাসময়ে আমরা আরো বিশদভাবে আলোচনা করবো নতুনতর আবহাওয়া সম্বন্ধে। আজকে বিসমিল্লাহ্ মাত্র।"[৫৫]

মাহেনও-এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় 'কায়েদে আজম রাহ্‌মাতুল্লাহ্ আলাইহে'র উপর 'হিজ এক্সেলেন্সী 'আলহাজ্জ খাজা নাজিমউদ্দিন' এর প্রবন্ধ ছাপা হয়। ১৯৪৯ সনের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির আহ্বায়ক প্রাদেশিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহারের 'অভিভাষণ' এবং জসীমুদ্দীন এর 'পাকিস্তান' ও 'মাহেনও' শীর্ষক কবিতা আর কায়েদে আজম ও তাঁর বর্তমান আত্মীয়-সজনের বংশ পরিচয়, কায়েদে আজমের ইন্তেকাল ও পরবর্তী চল্লিশ দিবসের কার্যক্রমের বিবরণ প্রভৃতি সচিত্র ছাপা হয়। কায়েদে আজম, পাকিস্তানের উন্নয়ন কার্যক্রম এবং পাকিস্তান ও ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংহতি বৃদ্ধিমূলক রচনার এক বিশাল সমাহার হলো মাহেনও। মাহেনও এর লেখক কে ছিলেন না, তাই খুঁজে বের করা এক কষ্টকর কর্ম। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, বেগম সুফিয়া কামাল, বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ, শওকত ওসমান, সৈয়দ আলী আহসান, আহমদ শরীফ, আশরাফ সিদ্দিকী, বেনজীর আহমদ, মুফাখখারুল ইসলাম, উবায়েদুল হক, আবদুর রশীদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবু যোহা নূর আহমদ, মীজানুর রহমান, শাহাদৎ হোসেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, কিরণ শংকর সেনগুপ্ত, আবু জাফর শামসুদ্দীন, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, মীর্জা আ. মু. আবদুল হাই, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, কায়কোবাদ, গোলাম মোস্তফা, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, হাবীবুর রহমান, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, (অধ্যাপক) মুহম্মদ আবদুল হাই, আলাউদ্দীন আল আজাদ, এ. কে. এস. নূর মোহাম্মদ বিদ্যাবিনোদ, সৈয়দ মকসুদ আলী, আল্লামা ইকবাল, কাজী মোতাহার হোসেন, রওশন ইজদানী, সিরাজুর রহমান, বেগম আজীজা এন. মোহাম্মদ, সিদ্দিক আহমদ খান, আশরাফউজ্জামান, মাহবুব জামাল জাহেদী, আহসান হাবীব, মুযহারুল ইসলাম,আবু রুশদ, এম. এ. নান্না, হাসনা আরা, ইবরাহিম খাঁ, আবদুল হাই মাশরেকী, ওহীদুল আলম, ফজলুর রহমান, মোহাম্মদ মোদাব্বের, শামসুর রাহমান, মবিনউদ্দীন আহমদ, আবুল হাসানাত, ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, আবদুল হক, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আবদুর রশীদ খান, মাহবুবউল আলম, রাজিয়া খাতুন, মোঃ মোদাস্সির আলী, বেগম হাশমত রশীদ, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, মযহারুল ইসলাম, সরদার জয়েনউদ্দিন, মোহাম্মদ ইসহাক চাখারী, অধ্যাপক গোলাম রহমান খান, অধ্যাপক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, বিভূতি সেন, মুস্তাফিজুর রহমান, সৈয়দ আবদুল মান্নান, আবুল হোসেন, বেদার উদ্দীন আহমদ, আজহারুল ইসলাম, কাজী ফজলুর রহমান, মতিয়ার রহমান, মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, নজমুল হক খান, চৌধুরী ওসমান, প্রজেশ কুমার রায় এ, এস. এম. আবদুল জলীল, শ্রী মনোমোহন বর্মণ, সুফী মোতাহের হোসেন, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, কাজী দীন মুহম্মদ, সৈয়দ আবদুস সলুতান, আলাউদ্দীন মালিক, কাজী ছুরতেন নেসা, কাজী মোহাম্মদ ইদরিস, খান মুহম্মদ আবদুল হাকিম, মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ, আবদুল মওদুদ, সিকান্দার আবু জাফর, শ্রী করুণাময়ী বর্মণ, সিরাজুল ইসলাম, মোজাম্মেল সিদ্দিক, শোএব আহমদ, আজিজুর রহমান, মিন্নত আলী, সুকুমার ভট্টাচার্য, সুফিয়া আখতার, অধ্যাপক হালিমুজ্জামান, অধ্যাপক আবু তালিব, মোস্তফা কামাল, নূরজাহান খানম, আবদুল ওয়াজেদ খান চৌধুরী, সামসুদ্দিন, বন্দে আলী মিয়া, গাজীউল হক, খোদেজা খাতুন, আবুল ফজল, আনিস চৌধুরী, নেয়ামাল বাসির, কাজি আফসার উদ্দিন আহমদ, খালেকদাদ চৌধুরী, ইমামুর রশীদ, সিন্দবাদ, শাহিদা খাতুন, মোসলেম উদ্দিন, আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ, শ্রীমতী বেলা রায়, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, সৈয়দ এমদাদ আলী, শ্রী শ্যামসুন্দর, লতিফা রশীদ, আহমদ পারেছ উদ্দিন, সৈয়দ আতাউর রহীম, আবদুল কাদের, তরিকুল আলম, আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দীন, ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, জাহানারা আরজু, শাহেদ আলী, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, আনোয়ারা বেগম, মতিনউদ্দিন আহমদ, আকবর উদ্দীন, কুমার কিরণ শংকর মৈত্র, ডক্টর এম. আবদুল কাদের, মমতাজ শিরিন, অধ্যাপক মোতাহের হোসেন চৌধুরী, ওস্তাদ মুহম্মদ হোসেন খসরু, অধ্যাপক বিভূরঞ্জন গুহ, নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, অধ্যাপক শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, কামরুল হাসান, অধ্যাপক আবদুল লতীফ চৌধুরী, সদরুদ্দীন, কাজী কাদের নওয়াজ, সৈয়দ মুর্তজা আলী, চৌধুরী শামসুর রহমান, নীলিমা দাস, মোহাম্মদ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী, ইমাউল হক, মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা, গোলাম সাকলায়েন, চৌধুরী লুৎফর রহমান, আইনুন নাহার বেগম, অধ্যাপক আহমদ হাসান দানী, মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, মতিউল ইসলাম, সুবোধ কুমার রায়, মহিউদ্দীন, মাফরুহা চৌধুরী, আবদুল কাদির, মঈনুদ্দীন, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবুল ফজল শাহাবুদ্দীন, এ. এফ. এম. আবদুল হক ফরিদী, মতি-উল-

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, নূরউল আলম, সৈয়দ আবদুর রব, সানাউল্লাহ নূরী, শেখ ফজলুল করীম, এনায়েত মওলা, ওমর আলী, গযনফর আলী, সৈয়দ আলী আশরাফ, জামালউদ্দীন মোল্লা, কাজী আবদুল ওদুদ, সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, আ. ফ. মু. আবদুল হক, জেবউননেসা আহমদ, আব্দুল্লাহ আল মুতী, মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ, সৈয়দ নূরুদ্দিন, আবু তাহের, আনিসুল হক চৌধুরী, অবনী নন্দী, নীলরতন দাশ, মুস্তফা জামাল, জিয়া হায়দার, আবিদুর রহমান, শামসুল হক কোরায়সী, কায়সুল হক, চৌধুরী ওসমান, অধ্যাপক কাজী আকরম হোসেন, সাহেরা আহমদ, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, জাহিদুল হুসাইন, কামালউদ্দীন খান, সিরাজউদ্দীন চৌধুরী, শহীদ সাবের, কামাল বিন মাহতাব, মুজিবুর রহমান খান, ডক্টর মোহাম্মদ ইসহাক, অধ্যাপক মোহাম্মদ গোলাম রসুল, কাজী নুরুল ইসলাম, লতিফা রশীদ, আবুল হাশেম, এ. কে এম. ফখরুল ইসলাম, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, খালেদা ফ্যান্সী খানম, রোকাইয়া আনোয়ার, অধ্যক্ষ রাশিদুল হাসান, হেমায়েত হোসেন, আবদুস সাত্তার, হাসান আজিজুর রহমান, ডঃ আবদুল্লাহ ফারুক, সৈয়দ আবুল হুদা, জাহিদুল হোসাইন, শরীফ উল হাসান, ডাঃ শফিকুর রহমান, বীরেন্দ্র নাথ মৌলিক, গাজী গিয়াসউদ্দীন, বেগম মাছুমা চৌধুরী, আগা মুহম্মদ আশরাফ, মুহম্মদ সফিউল্লাহ, ডঃ ফৈয়াজ হোসেন খান, বদরুদ্দিন উমর (৯/৭ নৈতিক সংযম (প্র); ৭/১১, কবিতার গতি প্র); কুমারী উষা দাস, মফিজ উল হক, মুযহারুল হক, এস. এন. কিউ জুলফিকার আলী, আবুল মনসুর আহমদ, গোলাম কাসেম, অধ্যাপক মাহফুজুল হক, হামিদুল হক চৌধুরী, নুরুন্নাহার ফয়জুন্নেসা, কবিরুল ইসলাম, জহুরুল হক, মাহমুদ তৈমুর, সাইফুল ইসলাম, কবীর চৌধুরী, সুষমা নার্গিস, রোকেয়া ওপেল খানম, আসলাম সিদ্দিকী, শামসুল হক (সৈয়দ?) ; হাসান জামান, শামসুদ্দীন হায়দার, আবদুল কুদ্দুস, খোন্দকার আবদুর রহিম, মাহমুদুল হক, মমতাজ হাসান, আবুল হাসান সামসুদ্দীন, জাহান আরা বেগম, সরওয়ার জাহান খান, নাজমুল আলম, কাজী ইমদাদুল হক (কবিতা?), টিপু সুলতান, মোহাম্মদ আবদুল আজিজ, কাজী আবুল বাশার, গোপেশ চন্দ্র দত্ত, আবদুর রহমান, আশকার ইবনে শাইখ, নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান, সানাউল হক, ড: আলীম আল রাজী, সিকান্দার দারা শিকোহ, মাহবুবুর রহমান তালুকদার, আবদুল হাফিজ, নুরুল মোমেন, নীলু দাস, এম, ফাতেমা খানম, ডঃ মালেকা আল রাজী, আবদুল আজিজ আল আমীন (কাফেলা সম্পাদক আ, আ, আ, আমান তখন 'আমীন' লেখা হয়েছিল 'মুসলমান' হবার জন্য। তিনি ভাগ্যান্বেষণে এসেছিলেন, এসে 'কাফেলা'ও এখান থেকে বের করেছিলেন। কিন্তু ভালো করতে পারেননি। ভারতের প্রধানতম বাংলাভাষার লেখক সৈয়দ মুস্তফা সিরাজও ১৯৫০ সন পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে চাকুরী উপলক্ষে ছিলেন) নীলুফার বানু, সেলিম চৌধুরী, খুরশেদুল ইসলাম, মঈদউর রহমান, কাজী আবদুল ওয়াদুদ, মোয়াজ্জম হোসেন, কাজী আবুল হোসেন, ইজাবউদ্দীন আহমদ, ফজলুল হক সেলবর্ষী, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ওমর আলী, আনওয়ার উদ্দীন আহমদ, দিল আরা হাশেম, তারাপদ রায়, (৯/১১) সায়েমা চৌধুরী, খন্দকার আবদুর রহিম, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ফখরুজ্জামান চৌধুরী, আতোয়ার রহমান, জাহানারা হাকিম, শওকত আলী, মনির উদ্দীন ইউসুফ, মোহাম্মদ ইউসুফ, মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন কাসেমপুরী, আবু বকর সিদ্দিক, হুমায়ুন কাদির, এবাদত হোসেন, জগলুল হায়দার আফরিক, মিসবাহুল আজিম, আজিজুল হক, নুরুল ইসলাম খান, সাদীকা নাসিম, কাজী মাসুম, মোজাফফর আহমদ (অর্থনীতিবিদ), আফলাতুন, ফেরদাউস খান, নীলরতন দাস, মনজুরে মওলা, মেসবাহুল হক, ড. আমিনা রাহমান, কামাল বিন মাহতাব, লতিফা হিলালী, হাসনাত আবদুল হাই, খগেন্দ্র নাথ দাস, শবনম মুশতারী, সায়েমা চৌধুরী, সাদিকা সাইদ, মোশফেকা মাহমুদ, আবদুর রহমান চৌধুরী, অধ্যাপক আলী আহমদ, আখতার উল আলম, ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম, ফারুক মাহমুদ, দিলওয়ার, ইজাবউদ্দীন আহমদ, রমেন দত্ত, আহমদ ফারুক, জেড এ সুলেরী, সুতলানা রাহমান, জুলফিকার মতিন, ডঃ রফিকুল ইসলাম, এনামুল হক (ডঃ), সালেহা খাতুন, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ব'নজীর আহমদ, আবু ইসহাক, আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ, সৈয়দ জিয়াউর রহমান, আহমদ সিদ্দিকী, মাসুদা চৌধুরী, রিজিয়া সুলতানা (রাজিয়া সুলতানা (?)) সাঈদা খানম, আবদুল মান্নান হাওলাদার, সুলতানা ইব্রাহীম, দেওয়ান আবদুল হামিদ, বুলবুল ওসমান, মোহাম্মদ আবদুল হক, আল মাহমুদ, আঞ্জুমান আরা বেগম, মুনীর চৌধুরী, গোলাম রহমান, শহীদ আখন্দ, আবদুন নূর, আনিসুল ইসলাম, জহির বিন কুদ্দুস, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, শাহাবুদ্দীন আহমদ, রাবেয়া খাতুন, অধ্যাপক রায়হান শরীফ, এম. কে সৈয়দ বক্স, আনোয়ার হুসেইন, আমিনুজ্জামান, আশরাফ ফারুকী, আশীষ কুমার লৌহ, সাদিকা সাইদ, আগা নাসের, রাবেয়া খাতুন, লুৎফুল কবীর, ইসতিয়াক হোসেন, আহমদ মীর, আবদুল্লাহ সাঈদ, হাসান হাফিজুর রহমান, মেহেরুননেসা, ডঃ মমতাজুর রহমান তরফদার, লুৎফুল কবীর, হেলেনা খান, আকবর উদ্দীন, মালেকা বেগম, আহমদ রফিক, আনোয়ার পাশা, ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব (দার্শনিক, একাত্তরের শহীদ), সন্তোষ গুপ্ত, আবদুল গনি হাজারী, কাজী আবদুর রাজ্জাক, হাসান আসকারী, ফজল এ. খোদা, দিলারা জামান, নাজমা চৌধুরী, ফতেহ লোহানী, আবু শাহরিয়ার, মওলানা মুহিউদ্দীন খান, মওলানা আমিনুল ইসলাম, রশীদ আল-ফরুকী, রাজিয়া খান, ফওজিয়া খান, সাঈদা খান, রোকেয়া রহমান কবীর, সেলিমা হোসেন, হোমায়রা হক, একে নাজমুল করীম, হাজেরা নজরুল, ইজাবউদ্দীন আহমদ, অরূপ তালুকদার, আবদুল গফুর, আজিজুল হক প্রধান, ফরিদা হোসেন, রিজিয়া বেগম, রাজিয়া মজিদ, মোবারক হোসেন খান, অধ্যাপক জাহানারা ইমাম, আলতাফ গওহর, শফিকুল আলম, রফিকুন নবী, সুখেন্দু সোম, খালেদা মনযুরএ খোদা, রিজিয়া চৌধুরী, মকবুলা মনজুর, রুনু হক, হেনা ইসলাম, ফারুক রেজা, কাজী খায়রুল বাসার, নীলুফার হোসেন, মীর আবু সালেক, অধ্যাপক বদরুল হাসান, মুহম্মদ সিরাজ, আখতার বানু, আমিনুল ইসলাম বেদু, অরুণাভ সরকার, রিয়াজ আনোয়ার, সাযযাদ কাদির, মীজানুর রহমান শেলী, মুহম্মদ সিরাজ, ডঃ মোহাম্মদ মোহর আলী, বদিউজ্জামান, রোকসানা জামাল, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, সাহানা মওলা, আবদুল বাকী, সৈয়দ আজীজুল হক, সরদার ফজলুল করিম, মাহবুব সাদিক, এম. তোরাব আলী, বশীর আল হেলাল, সিদ্দিকুর রহমান, রফিক নওশাদ, রোকসানা জামাল, তবিবর রহমান, আনিসুর রহমান, মনিরুজ্জামান, সৈয়দ মুস্তফা জায়েদী, মনোয়ারা বেগম, আমিনুর রহমান, আশেকুর রহমান, অধ্যাপিকা দিল আফরোজ বেগম, খসরুজ্জামান চৌধুরী, শামস রাশীদ, আল-ফারুক।৫৬ [illegible] লিখেছেন।

উদ্ধৃত সম্পাদকীয়র ভাষাতেই পত্রিকার নেক 'মকসাদ' এর আভাষ রয়েছে। এই 'মকসাদ' ভাষার ক্ষেত্রে, বলাবাহুল্য, 'বাঙলাভাষা সংস্কার কমিটি'র এবং পাকিস্তানী-সাহিত্যের প্রবর্তকদের সুপারিশ বাস্তবায়নেরই অংগ। সরকারী ষড়যন্ত্রের এন্তেজাম করতে গিয়ে মাহেনও প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রথমবর্ষ সপ্তম সংখ্যায় মাহেনও ঘোষণা করে যে 'আমাদের মাতৃভাষার আলোচনা' পত্রিকাতে নিয়মিতভাবে সাদরে প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

করা হবে। 'আমাদের গোজারেশ' শীর্ষক সম্পাদকীয় ('আমাদের কথা' ইত্যাদি না বলে বলা হতো 'আমাদের গোজারেশ') তে বলা হয় ঃ

"গোজাশ্‌তা এশায়াতে আমরা অতীতে বাঙলা ভাষার নানা মোড় পরিবর্তনের কথা মোখ্‌তাসার ভাবে উল্লেখ করেছিলাম। বাঙলা ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল সকলকে স্বীকার করতেই হবে যে, শৈশবে বাঙলাভাষা মুসলমান বাদশাহ এবং আমীর-ওমরাহদের নেক্‌নজরেই পরওয়ারেশ পেয়েছিল এবং শাহী দরবারের শান-শওকত হাসিল করেছিল।..... ভারতে বৃটিশ রাজত্বের আগ পর্যন্ত মুসলমানী আমলে বাঙলাভাষা ও সাহিত্য মুসলিম প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। ফারসী ভাষা ছিল রাজভাষা এবং সরকারী ভাষা।...... আজও রয়েছে আরবী-ফারসী শব্দের প্রাচুর্য এবং সাবলীল সৌন্দর্য। দুইশত বৎসরের বৃটিশ রাজত্বে সাবেক শব্দের অনেকগুলি ইংরেজী শব্দে পরিবর্তিত হলেও মুসলিম আমলদারীর আলামত মিসমার হয়ে যায়নি....... তথাকথিত শুদ্ধ বাঙলায় রূপান্তরিত হয়নি এবং কখনো হবেনা।...... বাঙলা ভাষা জন্ম হতেই পাঁচ-মিশালী ভাষা। বাঙলা ভাষার জাত নিয়ে নাজ করা নিছক সংস্কার—অসংগতও বলা যেতে পারে। জাতের বালাই নেই বাঙলা ভাষার। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের তাহজীব তমদ্দুনের তায়াল্লুক বর্জিত বাঙলা ভাষা মাশরেকী পাকিস্তানের সাধারণ মাতৃভাষা নয় এবং হবেনা, হতে পারেনা। একথা ভুলে যাওয়া হবে বোকামী।

মাশরেকী বাঙলা বা পাকিস্তানে প্রচলিত মাদেরী-জবানের সন্ধান নিলে দেখা যাবে মুসলমান সমাজের প্রচলিত শব্দ-সমূহের অন্তত আধা-আধি আসলে আরবী- ফারসী ভাষা হতে আমদানী। উর্দু ভাষায়ও এগুলি প্রচলিত। এই সকল শব্দের সমবায়ে গঠিত ভাষাই প্রকৃত প্রস্তাবে মাশরেকী পাকিস্তানের সত্যিকার মাতৃভাষা।...... সাহিত্যিক বাঙলার কথা অবশ্য আলাহিদা। সকল দেশেই সাহিত্যিক ভাষা সাধারণভাবে প্রচলিত মাতৃ-ভাষা হতে মোটামুটি পৃথক- কৃত্রিম

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় আমাদের জাতীয় জীবনে এসেছে নতুনতর জিনদেগীর জোয়ার। আত্মপরিচিতি ব্যতীত আত্মপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব।..... পাকিস্তানের objective Regulation এর মূলনীতি মনে রেখেই আমাদের চলতে হবে। ভুলে গেলে চলবেনা ইসলাম কেবল ধর্ম নয়— জীবনপথের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-বিধি Complete code of life. কোরান শরীফ একাধারে ধর্ম-গ্রন্থ এবং আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য। দুনিয়ার সাহিত্যিক দরবারেও কালামুল্লাহ্‌ কোরাণ শরীফ শ্রেষ্ঠতম আসনের মোস্‌তাহেক। সাহিত্যিক দায়েরাতেও কোরাণ আমাদের আদর্শ এবং অণুপ্রেরণার প্রতীক।..... আজাদীর সোনার কাঠির পরশে আমাদের অবলুপ্ত চেতনা অচিরাৎ ফিরে আসুক 'মাহে-নও' তা সর্বান্তকরণে কামনা করে।"[৫৭]

পরবর্তী সংখ্যায় 'পরিস্কার প্রমাণ' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে আবারও ভাষার আদর্শ কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বলা হয় : 'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে .... আমাদের আলোচনার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যে সকল অভিমত আমাদের হস্তগত হয়েছে, তাতে আমরা আশান্বিত হয়েছি।...... বাঙলা ভাষার বর্ণমালা নিয়ে ইদানীং বেশ জোরালো আলোচনা দেখা যাচ্ছে। .... বর্ণমালার সংস্কারের আবশ্যকতা সর্ববাদীসম্মত। তবে কেমন করে এবং কতোটুকু- এখনো সাব্যস্ত হয়নি। পূর্ব-বাঙলা সরকার এই ব্যাপারে ইতোপূর্বেই একটি কমিটি গঠন করেছেন। কমিটির কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনায় ভরপুর। আমরা কমিটির সদস্যগণের খেদমতে দু'চারটি কথা আরজ করবো।

...... পূর্ব বাঙলার ধর্মানুরাগ কমে যায়নি এবং উবেও যায়নি। ইসলাম এবং পাকিস্তানের জন্য তাঁহাদের দরদ, গরজ ও ফরজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইসলামের বুনিয়াদ কালামুল্লাহ্‌ কোরান শরীফ। কোরান আরবী ভাষায় এবং আরবী হরফে লিখিত কোরাণ শরীফের প্রতি মুসলমানদের দরদ ও সম্মান আলোচনা করে বুঝাবার দরকার করেনা। আধুনিক আলোক-প্রাপ্ত কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে-গোমরাহ্‌ দু'চারজন বুদ্ধিজীবীর কথা অবশ্য আলাহিদা। তাঁহারা আসলে সখাত সলিলে বা গোমারাহীর নাপাক পানিতে নিমজ্জমান। ধর্মভীরু মুসলমানের চোখে কোরান শরীফের ভাষা এবং বর্ণমালা পবিত্র। পবিত্র জিনিসের সহিত সংশ্লিষ্ট বস্তু বা পবিত্র বস্তুর বাহনকে পবিত্র মনে করাই স্বাভাবিক। ধর্মভীরুতা অপরাধ বা অগৌরবের নহে।- শ্রেষ্ঠতম গৌরব। ইন্না আকরামাকুম এনদাল্লাহে আত্‌কাকুম— তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ধর্মভীরু বা মোত্তাকী মানুষই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী সম্মানিত— ইহা হজরত মোহাম্মদ মোস্‌তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সহী হাদীস। সাচ্চা মুসলমানদের নিকট শ্রী-হজরতের হাদীস বিভ্রান্ত-মস্তিস্কের কূট-তর্কের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান ও মর্যাদার মোসতাহেক।"[৫৮]

ধর্মের কথা বলে জনসাধারণকে কিভাবে প্রতারিত করতো পাকিস্তান সরকার—তা মাহেনও এর এইসব বক্তব্যে বুঝা যায়। সরকারী পত্রিকায় সরকারের গঠিত কমিটিকেও প্রভাবিত করা হতো আগাম আলোচনার দ্বারা — "আধুনিক আলোক-প্রাপ্ত মুসলমান পণ্ডিতগণের কথায় কোরান-হাদিসের ভক্ত ও অনুরক্ত মুসলমান জনসাধারণ কোরান শরীফের হরফকে বাঙলা ইংরেজী বা অন্য যে কোন বর্ণমালার চেয়ে বেশী ভক্তি করবে ইহা স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। কোরান শরীফ নাজিল হবার আগে আরবী হরফ পবিত্র কি অপবিত্র ছিল, সে তর্ক বেকার। হজরত মোহাম্মদ মোস্‌তফার মক্কা বিজয়ের আগ পর্যন্ত মক্কার কাবা ছিল বুৎ-খানা।"[৫৯]

ভাষা ও বর্ণমালা সংস্কার সম্পর্কে মাহেনও-এর দৃষ্টিভঙ্গিতো সরকারেরই আদর্শকে প্রতিফলিত করে—, ১৯৪৯ সনের ভাষা ও বর্ণমালার বিতর্ক সম্পর্কে বলা হয় ঃ "ভাষা-এবং বর্ণমালার সমস্যাটি জাতির পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। ভাষা-কমিটির সদস্য সাহেবানদের খেদমতে আমাদের আরজ তাঁহারা যেন সকল দিক বিশেষভাবে বিবেচনা করে এবং মুসলমান জনসাধারণের মনোভাব মনে রেখে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টীর ফয়সালা করেন। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার কল্যাণে আমরা আণবিক বোমার যুগে উপনীত হয়েছি। মনে রাখা দরকার যে মধ্যযুগে ইসলামের নূরাণী আলোকেই আধুনিক সভ্যতা গর্বিত ইউরোপের অন্ধকার বিদূরিত হয়েছিল। গিলটী সোনার সম্মোহনে আমরা যেন আসল সোনার সমাদর ভুলে না যাই।

...... মানুষের জীবন মুশ্‌কিলাতে ভরা। মুশকিলাতের ভয়ে মুষড়ে যাওয়া কাপুরুষতা। বাঙলা হরফের সংস্কার বা পরিবর্তন, বিরাট যুগান্তকারী ব্যাপারে মুশকিলাতের মুকাবিলা করতে হবে, তাহা স্বাভাবিক। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায়ও মুশকিলাত কম ছিলনা। এখনও সকল মুশকিলের অবসান

Dhaka University Institutional Repository

হয়নি।"৬০

১৯৪৯ এর ডিসেম্বর নাগাদ আরবীকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র জোরদার হয়েছিল। এব্যাপারে মাহেনও ভূমিকা পালন করে। আরবী রাষ্ট্রভাষা হবে কিনা সে সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য প্রচার করে। ডিসেম্বর ১৯৪৯ সংখ্যায় 'আরবী ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে এবিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করা হয়। 'আমাদের গোজারেশ' এ 'নতুন আবহাওয়া' সৃষ্টির আনন্দ বার্তা– ঘোষণা করা হয়। লক্ষণীয় মাহেনও–এর লেখকবৃন্দ সরকারী উদ্দেশ্য সার্থক করার জন্য উৎসাহে কত না রচনা লিখেছেন? সাম্পাদকীয়তে বলা হয় ঃ "নতুন বছরকে এস্তেকবাল করতে গিয়ে নতুন আবহাওয়ার কথা মনে পড়ছে। 'এস্তেকবাল' কথাটার এসতেমালই নতুন আবহাওয়ার প্রমাণ। এই সংখ্যায় প্রকাশিত 'আরবী ভাষা' প্রবন্ধে নতুন আবহাওয়ার আরো বেশী সন্ধান পাওয়া যাবে। আরবী জবানকে পাকিস্তানের হুকুমাতী জবান করার নতুন তাহ্‌রীকের প্রতিই ইশারা। আমরা আপাততঃ এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা মোনাসেব মনে করিনা। চারিদিকে দেখছি, উৎসবের সয়লাব। বিষয়টী নেহায়েত গুরুত্বপূর্ণ। 'মাহেনও'র পাঠক-পাঠিকাগণকে আলোচনার অবসর দিবার জন্যই আমরা এই মাসে পহেলা প্রবন্ধ প্রকাশ করলুম।"৬১

মাহেনও এর পৃষ্ঠা সাক্ষী দেয় ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহও আরবী ভাষার পক্ষে একদা কলম ধরেছিলেন। উর্দু সাহিত্যের উপর প্রবন্ধ লিখেছেন (অধ্যক্ষ) মুহম্মদ আবদুল হাই। এবং আরো অনেক বড়বড় পণ্ডিত। শহীদুল্লাহর প্রবন্ধের নামই " আমাদের কওমী যবান-আরবী"। তিনি আরবী ভাষার, ভাষাতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত ও বিবর্তনের ইতিহাস এবং ভৌগলিক বিশাল– পরিমণ্ডলের পরিচয় দিয়ে বলেন ঃ

"রাজনীতির দিক্ হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সমস্ত উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার বিস্তৃত ভূ-ভাগে যে ৬০ কোটি মুসলমান আছে, তাহাদিগকে এক মিল্লাতের (ধর্ম সম্প্রদায়ের নিবিড় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে হইলে আরবী ভাষা অপরিহার্য।" প্রসঙ্গত ইসলাম ধর্মের গণ্ডীবন্ধনে 'ইসলামের' মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে ডঃ শহীদুল্লাহ বলেন, ইসলাম "...... একটী Socio-politico religious system সামাজিক– রাজনৈতিক ধর্মনৈতিক পদ্ধতি। আমরা পাকিস্তানকে কেবল পাক-ভারত উপমহাদেশের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ভাবে ফেলিয়া রাখিতে পারিনা। পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য আজ প্রয়োজন হইয়াছে বিশ্ব-মুসলিম রাষ্ট্র-সংঘ সংঘটন। এই সংগঠনের জন্য আরবী ভাষার একান্ত প্রয়োজন। এই জন্যই আমরা পাকিস্তানের রাষ্ট্রের ভাষা আরবী দেখিতে চাই। ..... বাঙলা ভাষা আরবী অক্ষরে লিখিয়া কিংবা উর্দুভাষা অথবা অন্য কোনও ভাষা দ্বারা আরবী ভাষার প্রয়োজন নিষ্পন্ন করা যাইবে না। মুসলিম জাহানের ঐক্যের জন্য আল্লাহ্ ও আল্লাহের রসুলের (দঃ) ভাষা আরবী চাই। এই আরবীই আমাদের 'কওমী যবান' (জাতীয় ভাষা)।"৬২

শহীদুল্লাহ সাহেবদের মতো ব্যক্তির সমর্থন (?) লাভ করাতেই বুঝি মাহেনও-এর আরবী প্রেমিক, উর্দু-বিমোহিত বাঙলার প্রতি শ্রদ্ধাহীন সম্পাদকেরা দিব্য চোক্ষে দেখেছিলেন একটি নতুন দিন আগত। "সাহিত্যের মোড়" শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয় ঃ "পাকিস্তানের কল্যাণে বাঙলা সাহিত্যের মোড় ঘুরেছে বলে প্রতীয়মান হয়। সাময়িক পরিস্থিতির সহিত সাহিত্যের বিকাশ বিশেষভাবে বিজড়িত। পাকিস্তান আমাদিগকে পরাধীনতার অন্ধকার ও অভিশাপ হতে আজাদীর আলোক ও আশীর্বাদে টেনে এনেছে। আজাদী জাতির বড় নিয়ামত: নতুনতর আলোকের সোবেহ সাদেকে আমরা উপনীত। আত্মভোলা এবং সম্মোহিত কাফেলাকে হাতছানি দিচ্ছে নতুন আলোক, নতুন মনজিল। চলছে কাফেলা নতুন পথে। শতাব্দীর ঘুমের ঘোর কাটিয়ে জেগে উঠেছে 'আসাহাবে কাহাফ'। বাঙলা সাহিত্যের আসরে আমরা দেখছি নূতনতর ইশারা নতুনতর উম্মাদনা, নতুনতর আশা ও আকাংক্ষার প্রাণ চঞ্চল শিহরণ। আমরা মোবারক বাদ জানাই এই নতুনতর শিহরণকে।"৬৩

আবুল ফারাহ 'আরবী ভাষা' রাষ্ট্রভাষা হলে কি লাভ হবে তা যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ "বর্তমানে বাঙগালী মুসলমান শিক্ষার্থীকে অনেকগুলি ভাষার চাপে নিষ্পেষিত হতে হয় ; যথা : বাঙলা, ইংরেজী, আরবী ও উর্দু। মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, সব শিশুর ভাষা-শিক্ষার ক্ষমতা সমান নয়। যাদের ভাষা শিক্ষার স্বাভাবিক প্রবণতা নেই, তাদের উপর তিন-চারটি ভাষা-শিক্ষার চাপ দিয়ে আমরা তাদের মেধা ও প্রতিভাকে অংকুরেই নষ্ট করে দেই,— তারা স্বাভাবিক বিকাশ লাভের সুযোগপায়না। এতে যে বিরাট জাতীয় অপচয় হচ্ছে, তা একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে। আরবী রাষ্ট্রভাষা রূপে গৃহীত হলে সাধারণ লোকের পক্ষে মাতৃভাষা ছাড়া ধর্মকর্ম ও রাজ-কার্যে অংশগ্রহণ করার জন্য শুধু আরবী শিখলেই চলবে। তাছাড়া অধিকাংশ লোক তোতাপাখীর মত না-বুঝে যে কলিমা নামাজ, দোআ-দরুদ আওড়ায় ও খুৎবা বা মীলাদ শুনে, সে অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। মানুষকে 'আকল' বা বুদ্ধি দিয়ে খোদাতাআলা 'আশরাফুল মখলুকাত'— সৃষ্টির সেরারূপে পয়দা করেছেন, না-বুঝে মন্ত্র আওড়িয়ে আমরা খোদ্‌তাআলার সে মহাদানের অবমাননা করছি। ইসলামের বুনিয়াদ ন্যায় ও যুক্তির ওপর স্থাপিত। আরবী শিখে আমরা আমাদের অন্ধভক্তিকে মুক্ত বুদ্ধি ও জ্ঞানের দীপ্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত ও আলোকিত করতে পারব। সমাজ এতদিন আরবী শিক্ষিতদের অবহেলা করেছে। আরবী রাষ্ট্রভাষা হলে তাঁদের ন্যায্য মান ও অধিকার তাঁরা ফিরে পাবেন এবং রাষ্ট্রের খেদমতে তাঁদের কর্মশক্তি ও প্রতিভা নিয়োজিত হতে পারবে, এতে মুসলিম সমাজের ঐক্য ও সংহতি আরো সুদৃঢ় হবে।"

তবে প্রবন্ধকার একাধিক ভাষা শেখার কষ্ট লাঘবের পরামর্শ শেষ পর্যন্ত দিতে পারেননি। তিনি মাতৃভাষা বাঙলা এবং আরবী ছাড়াও ইংরেজী শিক্ষার কথা বলেছেন। তিনটি ভাষা শেখার পরও তাঁর মতেঃ "আরবী রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হলে ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় ও কৃষ্টিগত সুবিধা ছাড়াও আমাদের শিক্ষার্থীরা বহু ভাষার চাপ থেকে মুক্তি পেয়ে তাদের প্রতিভা বিকাশের অধিকতর সুযোগ পাবে।৬৪ ভাষার প্রশ্নে অসংখ্য আলোচনা-সমালোচনা, প্রস্তাব, প্রচেষ্টা, কোশেশ হয়েছে। কিন্তু সেসব ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্র টেকেনি, বাঙলা ভাষা তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু ইতিহাসের উপাদান হিসেবে মাহেনও এর কতিপয় রচনার পরিচয় লিপিবদ্ধ করার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায়না। মীজানুর রহমান যিনি 'মাহেনও' এর সম্পাদক হয়েছিলেন, পাকিস্তানের সামগ্রিক কল্যাণকামনায় তিনি এতটাই উদগ্রীব ছিলেন যে, বলতে লজ্জা পাননি ; বাঙলা তাঁর 'মাদেরী জবান' হলেও বরাবর উর্দু ভাষার অধিকতর চর্চার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। তাই কায়া বজায় রেখে ছায়া বদলের প্রস্তাব করেছিলেন তিনি— কারণ, উর্দু বর্ণমালা ও ইসলামী-ভাবধারার কল্যাণে এবং সে-ভাষার নিজস্ব শক্তি ও সৌন্দর্যের দওলতে মুসলমানের নিকট খুবই আদরণীয়। উর্দু ও বাংলাকে সম্পর্কিত করে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন : "মাশরেকী পাকিস্তানেও উর্দুর কদরদানী ব্যাপক। মুসলমানী বাঙলা এবং মুসলমানী উর্দু শব্দ-সম্পর্কে বলতে গেলে খালাত ভাই। মাশরেকী পাকিস্তানের মুসলমান সমাজে নিত্য প্রচলিত শব্দসমূহের শতকরা ৬০/৭০টী শব্দ উর্দু ভাষাতেও প্রচলিত বলে আমার বিশ্বাস। সাহিত্যিক বাঙলার কথা অবশ্য আলাহিদা। তথাকথিত সাহিত্যিক বাঙলা মাশরেকী পাকিস্তানের সাধারণ মাতৃভাষা নহে, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য। মোকামী জবান এবং আদাবী জবানের পার্থক্য সকল দেশেই বর্তমান। মোকামী জবানই আসলে মাদেরী জবান।" তাঁর মতে উর্দু ও বাঙলার পার্থক্য কেবল লিখন-প্রণালীতে। "মাশরেকী পাকিস্তানের বাঙলা জবানের লিখনরীতির পরিবর্তনের কথা উঠেছে। আরবী হরফে লিখিত হলে মুসলমানী-বাঙলা এবং মুসলমানী-উর্দুর বর্তমান পার্থক্য কালক্রমে বিলোপ পাওয়া বিচিত্র নহে। পাকিস্তানের কল্যাণে আমাদের জীবনে অনেক কিছু পরিবর্তন এসেছে এবং আরো আসবে। রাজনৈতিক আবর্তন বিবর্তনের সহিত ভাষার আবর্তন-বিবর্তন বিশেষভাবে বিজড়িত। ভাব প্রকাশের জন্যই ভাষা। ভাবধারার পরিবর্তনের সংগে সংগে ভাষার পরিবর্তনও আবশ্যকীয়।" লেখকের বক্তব্য : মুসলিম জাতীয়তা ভৌগলিক সীমারেখায় সীমাবদ্ধ নহে।...... ভাবধারার উৎস যেহেতু এক সেহেতু ভাবের বাহন ভাষাও মোটামুটি এক-কেন্দ্রিক হওয়াই স্বাভাবিক। যেহেতু হিন্দীকে - 'হিন্দুস্থানী' বলা হয়েছে, সেহেতু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার নাম 'উর্দুর' পরিবর্তে 'পাকিস্তানী' বলাই সঙ্গত। উর্দুর সপক্ষে মীজানুর রহমান বলেন ঃ "কায়েদে আজম নির্দেশ দিয়ে গেছেন-উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। কায়েদে আজমের নির্দেশ যুক্তিসঙ্গত। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবার কাবেলিয়াত উর্দুর রয়েছে। এই সমস্যার সমাধানের বুনিয়াদ তৈরী হয়ে গেছে। আনজামের এন্তেজাম শুধু বাকী। .... (রাষ্ট্রভাষার নাম) 'পাকিস্তানী', ... গৃহীত হলেই আমার বিশ্বাস মুসলমানী বাঙলা এবং মুসলমানী উর্দুর Ultimate Fusion এর পথ অধিকতর প্রশস্ত হবে। মুসলমানী বাঙলা এবং মুসলমানী উর্দুর সমবায়ে গঠিত হবে Common Script ... মাশরেকী এবং মাগরেবী পাকিস্তানের জবানী সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান এই পথে।" মীজানুর রহমানের মতে—তৎকালীন "পাকিস্তানের সবচেয়ে সমুন্নত ভাষা (হলো) উর্দু এবং বাঙলা। অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষা বাঙলার ন্যায় এতটা বিকশিত নহে।...... পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার নাম পাকিস্তানী রাখা হলে মাশরেকী ও মাগরেবী পাকিস্তানের ভাষাগত সমন্বয়ের পথ সহজ ও কোশাদা হবে। পাকিস্তানী কথাটায় পাকিস্তানের বাসেন্দাগণের প্রাণে যতটা অনুপ্রেরণার সঞ্চার করবে অন্য কোন নামে তাহা সম্ভবপর নহে। অনুপ্রেরণার কথাটা বিশেষভাবে কাবেলে কদর।" পাকিস্তানী বাঙলা ও পাকিস্তানী উর্দু স্বাভাবিকভাবেই চলবে ইসলামী তাহজীব-তমদ্দুনের পথে। ভারতীয়-উর্দু এবং পশ্চিম বাঙলার বাঙলাভাষা চলবে অন্যপথে। দুই বিভিন্নমুখী ভাষার এক নাম অসংগত নহে কি? এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলেও পাকিস্তানী বাঙলা ও পাকিস্তানী উর্দুর নাম পরিবর্তনের আবশ্যকতা অনুভূত হবে।"[৬৫]

মাহেনওর ভাষা-চিন্তা থেকে সাহিত্য-শিল্পের রূপকল্পনার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। পাকিস্তানের মন্ত্রী, সাহিত্যিক-চিন্তাবিদ মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহার 'উত্তরাধিকার' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন ঃ "দেশবিভাগের ফলে সংস্কৃতিক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, পাকিস্তানের সংস্কৃতি- জিজ্ঞাসা তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতির রূপ কি হবে এনিয়ে বহু আলোচনার অবকাশ রয়েছে।..... এই প্রসঙ্গে আমাদের ভেবে দেখা দরকার এই নতুন রাষ্ট্রের কী ঐতিহ্য, কী এর সাংস্কৃতিক ভিত্তি, তমদ্দুনিক বুনিয়াদ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঐতিহ্যের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই আজ মনে পড়ছে আমরা মুস্লিম, আমরা ছিলাম ভারতীয়, বাঙ্গালী, আজ আমরা পাকিস্তানী। পূর্বপাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে বলতে আমাদের দ্বিধা নেই—আমরা মুস্লিম তমদ্দুনের মানস-সন্তান-- ভারতীয় বিশেষ করে বাঙ্গালী সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী।" বাঙলার মুসলমানের বিশিষ্ট ঐতিহ্যের সঙ্গে আরবের সাদৃশ্য কল্পনা করে তিনি আরো বলেন ঃ "আমাদের দেশ নদী মাতৃক, সমুদ্র বিধৌত। আমাদের সভ্যতাও আরব সভ্যতারই মত সাগরমুখি। পূর্ব বাঙ্গালার দুঃসাহসী মুসলমান সব সময়ই শোনে সাগরের ডাক।"[৬৬]

আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রাক-পাকিস্তান আমলের শিল্প-সাহিত্য ধারার পরিবর্তনকে অবশ্যম্ভাবী বলে মন্তব্য করেছেন। কারণ পাকিস্তান তাঁর মতে কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনই ছিলনা। "এদেশে জনসাধারণের চিন্তাধারার একটা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনও এর মূলে ক্রিয়াশীল হয়েছিল।.... এদেশের মানুষের চিন্তারাজ্যের বিপ্লবই মূলতঃ রাজনৈতিক রূপায়ণকে বাস্তব করে তুলেছে।" নতুন প্রজন্মের সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁর আহ্বান ঃ "এদেশের মানুষের জীবনের গভীরে প্রবেশ করে ...... রচনার উপাদান সংগ্রহ করতে হবে..... বিদেশী সাহিত্যের কোনো চরিত্রকে শুধু নাম বদলিয়ে পাকিস্তানী চরিত্র বলে চালাবার চেষ্টা এখানে আর চলবেনা। বিজাতীয় ভাবধারা, বিজাতীয় উপমা রূপক শব্দ কোন কিছুই আর নতুন পোষাক পরে পাকিস্তানী সাহিত্যে চালু হতে পারেনা। —এই উপলব্ধির ভিত্তিতে যে সত্যকার পাকিস্তানী সাহিত্য জন্ম নেবে তারই আয়োজনে আমাদের সাহিতিকগণ নিয়োজিত আছেন, তাতে আমার সন্দেহ নেই।"[৬৭]

আবদুল ওয়াজেদ 'সাহিত্যে পাকিস্তান' শীর্ষক প্রবন্ধে বিভাগপূর্বকালীন স্বাতন্ত্র্যবাদী মুসলমান লেখকদের সুরে সুর মিলিয়ে বলেন : হিন্দু লেখকদের রচনায় মুসলমানদের জীবনচিত্র নেই। যাও আছে, তা হীনভাবে অঙ্কিত। অতএব অখণ্ড বাঙলা সাহিত্য মুসলমানদের আরাধ্য হতে পারেনা। "এতকাল পরে পূর্ব্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা তাদের আত্মবিশ্বাসকে ফিরে পেয়েছে। এখন এমন করে তারা তাদের নিজেদের সাহিত্য গড়তে চায়, যাতে পাকিস্তানবাসী অন্যান্য জাতির সভ্যতার ও কৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে মুসলিম তমদ্দুনের সম্যক বিকাশ হবে। মুসলমান যে একটি প্রগতিশীল জাতি—যার অতীত গৌরব কোন ঐতিহ্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়, আজ আজাদ পাকিস্তানের সাহিত্যকে তা জগতের সামনে তুলে ধরতে হবে। আজ সাহিত্য, ইতিহাস, কলা, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি সব বিষয়েই জাগাতে হবে নূতন অনুসন্ধান-স্পৃহা। আবার গড়তে হবে জাগরণের তাজমহল। আমরা যেন আর অনুন্নত বা কৃপাপ্রার্থী জাতিরূপে অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে না থাকি।"[৬৮]

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী 'নয়া জিন্দেগী' শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের নতুন ...... জীবনে...... প্রাণধর্মকে আবার নতুন করে ফিরে পেতে ইসলাম ধর্মের অনুসরণে খাঁটি মুসলিম রূপে প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন। কারণ, "ইসলাম...... নৈসর্গিক বিকাশের এক মহান সম্ভাবনা। আমাদের নয়া-জিন্দেগীর

Dhaka University Institutional Repository

অর্থই হলো এই সম্ভাবনাকে ভিতরে-বাহিরে-অন্তরে-আচরণে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করা।"[৬৯] ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন.... মুসলিম জীবন ও ইসলামিক সভ্যতার ছাপ বাঙলা সাহিত্যে আশানুরূপ হয়নি বলে 'বর্তমানে বিভক্ত বাঙলায় তা আশা' করেছেন। "বাস্তবদর্শী নবীন স্রষ্টারা নতুন নতুন ঐশ্বর্যে ভাষার ভাণ্ডার পূর্ণ করবেন। এর লক্ষণ চারদিকের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে।"[৭০]

সৈয়দ আলী আহসান পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন ঃ "এই নবলব্ধ আজাদীর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সাহিত্য কিরূপ নেবে?... ভবিষ্যত সাহিত্য কি হবে? দেশভাগের আগে অনুষ্ঠিত বিতর্কে, আলাপ- আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছিল যে, পরিবর্তিত পটভূমিতে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নতুন সাহিত্য চাই।" তবে তিনি অবিভাজ্য-বাঙলা সাহিত্যের উত্তরাধিকার যেন বহু কষ্টে বাধ্য হয়ে স্বীকার করলেও বলেন : "কলকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্য আমাদের নিজেদের হতে পারেনি, তার উপাদানে আমাদের মনের সত্য ধরা পড়েনি। অনেক আগে থেকেই এই সাহিত্য পূর্ব বাঙলার প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও তারকাখচিত আকাশের কথা বলেনি...... (তাই) পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের ধারা সম্পূর্ণ বাঙলার সাহিত্যের ধারা হতে হবে ভিন্ন।"[৭১]

পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের আদর্শ সংক্রান্ত সৈয়দ আলী আহসানের বহুলালোচিত 'পূর্ব পাকিস্তানের বাঙলা সাহিত্যের ধারা" শীর্ষক ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি ছাপা হয় মাহেনও এর তৃতীয় বর্ষ, পঞ্চম .... আগষ্ট ১৯৫১ (ভাদ্র ১৩৫৮) সংখ্যায়। উপর্যুক্ত প্রবন্ধে তিনি বলেন, "একই ভাষাভাষি জনগণকে দুই অংশে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে কেমন দেখায়, তা কেউ কখনো করেনি। অথচ আজ চিরকালের জন্য আলাদা ... হবার পর সাহিত্য ক্ষেত্রেও ... ভিন্ন গোত্রীয় বলে ভাবতে হচ্ছে। .... এখন সমস্যা হয়েছে সাহিত্যে পাকিস্তানী অনুভূতি কতটা জাগ্রত, সত্য ও জীবন্ত করা যায়।" তিনি বলেন একটা কথা স্বীকার করেই "আমাদের নবতম সাহিত্য সাধনায় নামতে হবে, তা হচ্ছে এই, পাকিস্তান একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র।... আদর্শের দিক থেকে এদের মধ্যে কোনো সমন্বয় থাকা বাঞ্চনীয় বলে মনে হচ্ছে না। অনেকে এভাবেও চিন্তা করছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের ভাষাকে পশ্চিমবঙ্গের ভাষা থেকে আলাদা করে ফেলতে হবে।...... একমাত্র ভাষাগত ঐক্যের কারণেই পশ্চিম বঙ্গকে বিদেশ বলে মনে হয়না।.. প্রথমে পার্থক্য ও ব্যবধানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে পরে ঐক্যতত্ত্বের অন্বেষণ করতে হবে। যদি প্রথমেই ঐক্যতত্ত্বের অন্বেষণ করি, তবে রাজনৈতিক অনুভূতিতে বিশৃঙ্খলা আসতে বাধ্য।..... পাকিস্তান হবার পর ইসলামের ইতিহাস শুধু উপাদান আনেনি, নতুন পথের নির্দেশও দিয়েছে। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন ইসলামের আদর্শকে আমরা আমাদের জন্য পথনির্দেশক করেছি, তেমনি তমদ্দুন, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নতুন আশার সঞ্চয়ের জন্য-আমরা ইসলামের দ্বারস্থ হয়েছি।"

প্যাকিস্তানবাদী সাহিত্যের আদর্শ-উদ্দেশ্য ও সিদ্ধি সম্পর্কে ত্রিশ ও চল্লিশের এবং পঞ্চাশ এর দশকের মুসলিম-সাহিত্য চর্চার ধারা আলোচনা করে তিনি 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' বা 'শিখা' -গোষ্ঠীর ভূমিকা সম্পর্কে নৈতিবাচক মনোভাব পোষণ করে বলেন, উর্দু কবি হাফিজ জালান্ধরীর 'শাহানামা-ই-ইসলাম' পাকিস্তানী বাংলা সাহিত্যের পথ প্রদর্শক হতে পারে। দেশ বিভাগের পূর্বে মুসলমান লেখকেরা হিন্দু-ভাবধারায় দীক্ষিত ছিলেন। "এই দীক্ষার চরম নিদর্শন মেলে ঢাকার মুসলমান (মুসলিম?) সাহিত্য সমাজের তথাকথিত মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনে। ইসলামী নীতিবোধকে লাঞ্চিত করে যে মুক্তবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা তা বিকৃত মনসের সৃষ্টি, তাতে নতুনত্বের উন্মত্ততা আছে; কিন্তু স্থির বিবেচনার প্রশান্তি নেই। এই মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনকে বাংলার মুসলমান কখনও স্বীকার করে নেয়নি। কেননা তাদের ধারণায় এ-আন্দোলন প্রকৃত প্রস্তাবে বুদ্ধিকে শিথিল করেছে এবং সাহিত্য-ক্ষেত্রে জীবনবোধকে অস্বীকার করেছে। সত্যিকারভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জীবন, পরিবেশ ও ভাবধারাকে সাহিত্যে রূপ দেবার প্রথম প্রয়াস দেখা যায় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' স্থাপনের সময় (১৯৪৩)। ....স্পষ্টভাবে সাহিত্যে ইসলামী আদর্শের বিকাশের আরম্ভ এই সময় থেকেই।..... কাব্য ও সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দক্ষতা যে বড় কথা নয়, বরঞ্চ বড় কথা হল একটা ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার—এ বিশ্বাস এখন অধিকাংশ পাকিস্তানী সাহিত্যিকদের হয়েছে। হয়ত অনেকে ভুলে যাচ্ছেন যে, উত্তরাধিকারের সঙ্গে প্রতিভার সংমিশ্রণ থাকা দরকার; কিন্তু এই ভুলে যাওয়াটা সাময়িক। আজকের দিনে পরিবর্তিত পটভূমিকায় জীবন যখন নতুন করে শুরু করলাম তখন সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শের কথা কিছুদিনের জন্য ভুলে থাকাই বরঞ্চ মঙ্গলের। পশ্চিম বঙ্গের সামনে তো কোন সমস্যাই নেই। তাঁদেরই চেষ্টায় যে সাহিত্য...... সেই সাহিত্য তাঁদেরই রয়েছে। সেই সাহিত্যের প্রাক্তন ধারাই আজও অব্যাহত। সম্পূর্ণ বাংলা যদি তাঁদের হাতছাড়া হতো, আর উড়িষ্যার মাটীতে যদি তাঁদের বসতি স্থাপন করতে হতো, তবে তাঁদের সাহিত্য কিরূপ নিতো তা কল্পনা করে দেখা যেতে পারে। আধুনিক বাংলা সাহিত্য হচ্ছে কলকাতা কেন্দ্রিক।...... বিভাগের পর..... কলকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্যও আমাদের জন্য অর্থহীন হয়েছে।...... পাঠ করবো..... উপভোগ করবো...... কিন্তু তাকে কখনও আমাদের সাহিত্য বল্‌ব না। এটা কোনও গুরুতর সমস্যা নয়। ইংলণ্ডের সাহিত্য যে অর্থে আমাদের সাহিত্য নয়, পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যও অবিকল সেই অর্থেই আমাদের সাহিত্য হবেনা।..... এক ভাষায় লেখা হলেই সমস্ত কিছু এক হয়ে যায় না। ভাব-সম্পদ ও জীবনের মূল্য নিরূপনের দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদাই থাকে। মনে রাখতে হবে যে, পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিলো স্বাতন্ত্র্যবোধের উপর ভিত্তি করে। এই স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় মিলবে আমাদের সাহিত্যে ও কাব্যে। সুতরাং প্রাক্তন বঙ্গের দুই অংশের মধ্যে সংস্কৃতিগত ঐক্য আসতে পারেনা— শুধুমাত্র সংস্কৃতিগত বোঝাপড়া হলেও হতে পারে। আমরা আদর্শের ক্ষেত্রে মিলিত হতে চাইনে, কিন্তু একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই।" বাংলা ভাষায় আরবী-ফার্সী শব্দের বহুল প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি বলেন ঠিকই আছে, এমন কিছু খারাপ বা পরিচিত গতির বিরুদ্ধ কিছু ঘটছেনা। প্রাক্তন উভয় বাংলার সাহিত্যের ভাণ্ডারে সকলেরই সমান অধিকার আছে, "কিন্তু এই অধিকার থাকার অর্থ এই নয় যে, সেই সাহিত্যের ট্রাডিশনও আমরা গ্রহণ করবো। নতুন রাষ্ট্রের স্থিতির প্রয়োজনে আমরা আমাদের সাহিত্যে নতুন জীবন ও ভাবধারার প্রকাশ খুঁজবো। সে সংগে এটাও সত্য যে, আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার এবং হয়তো বা জাতীয় সংহতির জন্য যদি প্রয়োজন হয়, আমরা রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছি। সাহিত্যের চাইতে রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রয়োজন আমাদের বেশী। শিল্প আজ আমাদের কাছে তত্বহেতু। নিছক সাহিত্য-বিলাস খুব কম লোকই এখন করছে।..... বর্তমান পরিবেশ ও রাষ্ট্রীয় অনুভূতিকে ভুলে যেয়ে আমাদের পক্ষে সাহিত্য-চর্চা করা সম্ভবপর নয়। দুনিয়ার কোনো মহৎ সাহিত্যই শুধুমাত্র সৌন্দর্যসৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয়না।"[৭২] আবুজাফর শামসুদ্দীনও এই ধরণের কথাই বলেছিলেন ঃ 'পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের ভূমিকা হবে' "এত দিন

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলিত কলকাতা কেন্দ্রিক ভাষা (ও সাহিত্য) থেকে ভিন্ন'।[৭৩] রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে মিছিলে গুলি-চালানাকারী মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের ৩রা মার্চ ১৯৫২ সনের বেতার-ভাষণ প্রকাশ করায় মাহেনও এর দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যায়। নূরুল আমীন তাঁর বক্তৃতায় ভাষা বা একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনকে 'কম্যুনিষ্ট বিদেশী চরদের...... ধ্বংসাত্মক চক্রান্ত' বলে অভিহিত করেছিলেন।[৭৪] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটিকে 'জাতীয় ও সামাজিক জীবনের নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে' ইতিহাস রচনার গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য মাহেনও-এর পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়।[৭৫] ইসলামী ভাবধারায় পুষ্ট পাকিস্তানের 'নতুন সাহিত্য' সৃষ্টির পরামর্শ আছে মাহেনও এর প্রায় সকল লেখকের রচনায়।[৭৬] তবে কোনো-কোনো লেখক-যে তখনকার সাহিত্য-পরিস্থিতিতে সত্যকথাও উচ্চারণ করেননি, তা নয়। সিদ্দিক আহমদ খান 'আজকের সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলাদেশের সাহিত্যের দৈন্য তুলে ধরে বলেন, আমাদের সাহিত্যে এমন কোনো বিশেষ স্ফূরণ ঘটেনি—যা দিয়ে নতুনত্বের কিছুটা গর্ব করা যায়। সাহিত্যিকরা কেবল যেন অভ্যাসবশত লিখে চলেছেন, যাতে উন্নত সাহিত্য সৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। স্বাধীনতা পরবর্তী সাহিত্যপত্রিকা এবং অজস্র সাহিত্যের প্রসূণকে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁর একটি প্রবন্ধে বলা হয়, "যে সাহিত্য জাতির মান নির্ণয় করে, এখন সেটা ব্যবসায়ের মানও ঠিক করছে.... তাই সাহিত্য ভরে উঠেছে দুর্নীতিতে। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূলে তাঁরা এমন সব সাহিত্যের পরিবেশন করছেন যা সাহিত্যত নয়ই বরং নিজেদের দৈন্যের নগ্নরূপ।" প্রতিভাধরের সাধনায় এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে, স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টি হবে। তাঁর একটি সঙ্গত প্রশ্ন— ব্যবসায়িক কারণে কষ্ট-কল্পিত লেখা কিভাবে স্থায়ী হতে পারে?[৭৭] লেখকের এই প্রশ্ন যে তৎকালের সাহিত্য-পরিস্থিতিতে বিরক্ত একজন সমালোচকের— তা বলাই বাহুল্য। শিশু সাহিত্য নিয়ে যাঁরা লিখেছেন, তাঁদেরও প্রত্যাশা ছিল— 'নিষ্কলুষ আনন্দ' জোগাতে পারে, এমন সাহিত্য সৃষ্টির জন্য দেশের সাহিত্যিকরা কাজে অবতীর্ণ হবেন।[৭৮] সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন লেখক গোষ্ঠীর মূল বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে 'আমাদের হুঁশিয়ারী' শীর্ষক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর প্রবন্ধে : 'পাকিস্তানের সংরক্ষণ ও সংগঠনের' কাজ চলাকালীন সময়ে 'ইসলাম'কে রক্ষার জন্য পাকিস্তানীদের সর্বাত্মকভাবে (পাক-ভারত উপমহাদেশে) ব্রাহ্মণ্যবাদের মুকাবিলা করার জন্য শক্তি অর্জন করতে হবে।[৭৯]

পাকিস্তানের সরকারী পত্রিকা হিসেবে সকল বিষয়ে মতামত জ্ঞাপনের দায়িত্ব মাহেনও পালন করেছিল। শিক্ষা, অর্থনীতি, নাচ-গান, শিল্প-সাহিত্য, কলা- বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস সকল ব্যাপারেই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মাহেনও তার বক্তব্য উপস্থাপন করেছে। পত্রিকাটির প্রভাব প্রচারগুণে সমাজে ব্যাপক হয়েছিল। 'পূর্ব পাকিস্তানের মাধ্যমিক শিক্ষা সমস্যা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধের বক্তব্য ছিল, "বর্তমানে পাকিস্তানের অধিবাসী এবং শিক্ষার্থীর . . . অন্তত .... ৮৫ জন মুসলিম।...... সম্ভবত এক তৃতীয়াংশ মাদ্রাসায় ও অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ ইংরেজী স্কুলে শিক্ষা পায়। একদিকে মাদ্রাসার শিক্ষায় ছাত্রদের অধিকাংশই বর্তমানে দুনিয়ার পক্ষে কতকটা Misfit হইয়া গড়িয়া উঠে। আবার ইংরেজী স্কুলগুলিতে ধর্ম্মীয় শিক্ষার অভাব।.... ঐ ২/৩ অংশ ছাত্র ও যুবক নিজেদের তাহজীব-তমদ্দুন ভুলিয়া এক অমুসলমানী মনোভাব গড়িয়া তুলে। .... এই দুই বিপরীতমুখী প্রভাব হইতে আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদিগকে রক্ষা করিতে হইলে সকল শ্রেণীর ছাত্রদিগকে সমবেতভাবে একই ধরণের স্কুলে অন্তত কিছু কাল যাবত শিক্ষা দিতে হইবে। এই শিক্ষা ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত হওয়া বাঞ্চনীয়।.... অন্যান্য প্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলির ন্যায় এই সকল শিক্ষার পরিকল্পনা বিষয়ে সরকার ও শিক্ষায়তনগুলির মধ্যে নিবিড় সহযোগিতা রাখিতে হইবে।"[৮০]

'শিক্ষার সংস্কার' বিষয়ে লিখিত এক প্রবন্ধে দেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান আদর্শ সম্পর্কে বেশ গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ রেখেছিলেন 'মাহেনও' এর লেখক জনৈক আবদুর রহমান। তিনি শিশু, বয়স্ক, নারী—সকলের জন্যই পাকিস্তানের উপযুক্ত নাগরিক হবার মতো শিক্ষাদানের জন্য গৃহে, মক্তবে, মাদ্রাসায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং স্কুল-কলেজে শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করার কথা বলেন। তবে শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের মাধ্যম সম্পর্কে বলেন তা হবে মাতৃভাষায়। 'মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংরেজীর স্থান রাখতে হবে ; এবং উচ্চ -শিক্ষায় ইংরেজী ও মাতৃভাষা উভয়কে কিছুকালের জন্য শিক্ষার বাহন করতে হবে।" প্রসঙ্গত তিনি রোমান অক্ষরে বাংলা লিখে সরলী-করণের পরামর্শও দিয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সমালোচনা করে লেখক বলেন ;

"বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণেও পরিবর্তন আবশ্যক; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরম্ভ হয়েছিল Teaching University রূপে, এবং অল্পদিনের মধ্যে নামও করেছিল বেশ। কিন্তু আস্তে আস্তে এর ভেতর রাজনীতি ঢুকে যায় ; ফলে বড় বড় অধ্যাপকেরও মন বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। ক্ষমতার এমনি মাদকতা যে একবার এর আস্বাদন পেলে যাকে নিষ্কাম পুরুষ বলে মনে হয় সেও প্রলুব্ধ হয়ে উঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের শাসন ক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত রাখতে হবে, তবেই তাঁদের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেওয়া হবে। দেশের নতুন পরিস্থিতিতে (১৯৪৯) বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা আরো জটিল হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক প্রকৃতি অক্ষুন্ন রাখলে তার থেকে যা আশা করা যেত, এখন তা হয়ত আকাশ কুসুম হবে। আমার মনে হয়, এখনো তার পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত আর তার উপর যে নতুন ভার চাপানো হয়েছে তার জন্য রাজশাহী ও চট্টগ্রামে দুটো affiliating University স্থাপন করা উচিত।" এছাড়া বিজ্ঞানচর্চার জন্য দুই পাকিস্তানে দুইটি বিজ্ঞান গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও করা হয়। ছাত্রদের মজ্জাগত নকল-প্রবণতা দূরীকরণের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন।[৮১]

জমিদারী প্রথার সামাজিক ব্যাধি কৃষক আন্দোলনের চাপে দূরীকরণের পদক্ষেপ নেয়া হলেও মাহেনও কিন্তু ব্যবস্থাটি রহিতকরণের উদ্যোগকে সমর্থন করেছিল। সরকারী ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি না-দিয়েও অবশ্য তাঁদের উপায় ছিলনা। তবু 'চিরস্থায়ী ব্যবস্থার গোর দেওয়া হয়েছে' বলে তাঁরা সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। মাহেনও আশা প্রকাশ করে : "পূর্ব পাকের কৃষক সমাজে আবার দেখা দেউক প্রাচুর্য্য, আর সম্পদ ও গৌরব বাড়ুক সমগ্র রাষ্ট্রের।"[৮২]

পাকিস্তানের 'নূতন অবস্থায় ইতিহাস' নূতন করে প্রণয়ন করতে হবে বলেও এই পত্রিকার প্রধান লেখকেরা মত ব্যক্ত করেছিলেন। সৈয়দ

Dhaka University Institutional Repository

সাজ্জাদ হোসায়েন বলেন ঃ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তামাদ্দুনিক জীবনকে নতুনভাবে গড়ে তোলার সমস্যা হচ্ছে পাকিস্তান-উত্তর নতুন সামাজিক সমস্যাবলীর অন্যতম সমস্যা। তাঁর মতে 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হলো ঃ "একটা বিশিষ্ট জীবনাদর্শ, একটা বিশিষ্ট তমদ্দুনকে বাঁচিয়ে তোলা।" তাই পাকিস্তান সৃষ্টির পর "আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যাকেই নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হচ্ছে এবং তার নতুন সমাধানও আবিষ্কার করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে।" কারণ "অবিভক্ত ভারতে আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জীবনকে দেখেছি এবং বিচার করেছি পাকিস্তানের নূতন পরিপ্রেক্ষিতে তার মূল্য কিছুই নেই ; কারণ তখন আমাদের নিজস্ব জাতীয় অস্তিত্ব বলে কোন অস্তিত্ব ছিলনা এবং জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোন কিছু বিবেচনা করবার প্রয়োজন তখন ঘটেনি। সে প্রয়োজন যদিও আমরা কখনও অনুভব করতাম প্রকাশ্যে সে-কথা স্বীকার করবার এবং তামাদ্দুনিক জীবনে সেই অনুভূতিকে রূপায়িত করবার সুযোগের অভাব ছিল। আজ রহমানুর রহীমের অনুগ্রহে সে অবস্থা আমাদের নেই। তাই আমাদের সবকিছু সম্বন্ধেই নতুন করে ভাবতে হচ্ছে।" তামাদ্দুনিক সমস্যার দিক থেকে "বড় দায়িত্ব হচ্ছে ইতিহাস পুনর্লিখনের সমস্যা। অবিভক্ত ভারতে আমাদের যেমন জাতীয় জীবন বলে কিছু ছিলনা তেমনি জাতীয় ইতিহাসও আমাদের ছিলনা। বরং বহুক্ষেত্রে আমরা ভারতের অখণ্ডত্বে আঘাত লাগবে বলে নিজেদের ইতিহাসের বহু ঘটনাকে বিকৃত করেছি বা করতে বাধ্য হয়েছি।" অতএব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এখন এবং ভবিষ্যতে আর সেভাবে যে 'ইতিহাস পড়া চলবেনা, তা বলাই বাহুল্য।" 'ভবিষ্যতে পাকিস্তানী অথবা আরও পরিস্কারভাবে মুসলমান হিসাবে আমাদের ইতিহাস বিচার করতে হবে।'

'ইতিহাস কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন ঃ " ইতিহাস অর্থ অতীতের ঘটনার তালিকা নয়, অতীতের ঘটনার অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা। অতীতের যে ঘটনার সঙ্গে বর্তমানের কোন যোগ নেই— যার কোন অর্থ নেই— সে ইতিহাস নয়। পৃথিবীর সর্ব প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রীক হিরোডোটাস যখন ইতিহাস লেখেন তিনিও ইতিহাসকে এভাবেই বিচার করে গেছেন, থ্যিসিডিডিসেরও এর ব্যতিক্রম নন। গিবনের রোমক সাম্রাজ্যের ইতিহাসে তথ্যের দিক থেকে বহু ত্রুটী আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু তবু তার মূল্য কমেনি ; কারণ গিবন রোমান ইতিহাসকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন এবং সে ব্যাখ্যার মূল্য রয়েছে।" এই পটভূমিকায় "পাকিস্তানের ইতিহাস-বেত্তার প্রধানতম কর্তব্য হবে ইসলামের পরিপ্রেক্ষিতে পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস-রচনা। অবিভক্ত ভারতে আমরা 'ভারতীয়' হবার ব্যর্থ চেষ্টায় প্রাক্-ইসলামিক যুগের বহু অনিশ্চিত তথ্যকে ইতিহাসের মর্য্যাদা দিয়েছি। আমাদের পাঠ্য-পুস্তকে হর্ষবর্দ্ধন, চন্দ্রগুপ্ত অথবা অশোককে যে স্থান দেওয়া হয় সে স্থান সত্যিকার ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তাঁদের বিচার করলে তাঁরা হয়ত পাবেন না। তাছাড়া প্রাক্-ইসলামিক যুগে তাঁদের স্থান যাই হোক, পাকিস্তানের পাঠ্য-পুস্তকে সে-স্থান তাঁরা পেতেই পারেন না। তারপর মুসলমান যুগের বহু ঘটনা সম্বন্ধেও আমাদের দৃষ্টি-ভঙ্গি আমুল পরিবর্তন করতে হবে।"

প্রসঙ্গত লেখক আকবর এবং আওরঙ্গজীবের উল্লেখ করে বলেন ঃ "আকবর ইসলামকে ভারতের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার চেষ্টা করেছেন যথাসাধ্য ; আর আওরঙ্গজীব ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সংগ্রাম করেছেন আজীবন। অথচ নিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে এ যাবৎ আকবরকেই আওরঙ্গজীবের উপর স্থান দেওয়া হয়েছে। মুসলমান ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে যে এ-নিরপেক্ষতা সর্বনাশকর তা বোধ হয় না-বললেও চলে। এরকমের উদাহরণ পাক-ভারত উপ-মহাদেশের ইতিহাসে আরও অনেক মিলবে।"

ইতিহাসের বিভ্রান্তি প্রসঙ্গে লেখক ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন বলেন ঃ "এযাবৎ ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাসকে এসলামের সাধারণ ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে আসছি। তার ফল হয়েছে এই যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হয়ে গেছে সংকীর্ণ এবং ভৌগলিক জাতীয়তার মাপকাঠিতে ইউরোপীয় আদর্শে আমরা ইতিহাসের সমস্ত ঘটনাকে বিচার করতে শিখেছি। আরব, মিশর, ফেলিস্তিন, ইরাণ প্রভৃতি দেশের ইতিহাসকে আমাদের আলাদাভাবে দেখতে হচ্ছে এবং এসমস্ত দেশে মুসলমান বাস করে একথা আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি বললে অতিশয়োক্তি করা হবে।..... আরও মারাত্মক পরিণাম হচ্ছে..... মধ্যযুগীয় এসলামের সমস্ত ইতিহাস আমরা ভুলতে বসেছি এবং সভ্যতায় ইউরোপের দান সম্পর্কে আমাদের মনে অনেক অতিরঞ্জিত ধারণা দানা বেঁধেছে। ইউরোপীয় কায়দায় আমরা মধ্য- যুগকে অন্ধকার-যুগ আখ্যা দিচ্ছি অথচ একথা কখনও আমাদের স্মরণ হয়না যে ইউরোপের পক্ষে যেটা অন্ধকার যুগ এস্লামের ইতিহাসে অর্থাৎ এশিয়ার ইতিহাসে সেটা সবচেয়ে আলোকময় যুগ। সে যুগে সভ্যতার কেন্দ্র ছিল এশিয়ায় ইউরোপে নয়। এধরনের ভুল-ত্রুটী আমাদের ইতিহাসে রয়েছে প্রচুর।" তাই "পাকিস্তানী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যখন আমরা ইতিহাস লিখতে বসব তখন এ সমস্ত ভুল-ত্রুটী সংশোধন করাই হবে আমাদের প্রধান কাজ। এ কাজ অবিলম্বেই আমাদের শুরু করা কর্তব্য, কারণ এসমস্ত ত্রুটী-বিচ্যুতি যতদিন থাকবে ততদিন আমাদের তামাদ্দুনিক জাগরণ ব্যাহত হয়ে থাকবে।"[৮৩]

মাহেনও এর পাতায় কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতি, পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পর্যালোচনা করা হতো, কখনো প্রবন্ধে, কখনও সম্পাদকীয়-নিবন্ধে। কিন্তু এই-সমস্ত আলোচনায় পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক-সামাজিক অগ্রগতির প্রশ্নে পশ্চিম-পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কঠোর সমালোচনা অথবা পূর্ব বঙ্গের জনসাধারণের জাগৃতির লক্ষে অনুপ্রেরণা বা দিক্ নির্দেশমূলক বক্তব্য বা ভাষার ইঙ্গিত, কখনো দেয়া হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর পূর্ববঙ্গের প্রতি অর্থনৈতিক মনোভাব স্পষ্ট হলেও পত্রিকার আলোচনায় সেসবের কোন চিত্র প্রকটিত হয়নি ; বরঞ্চ পূর্ববঙ্গের স্বার্থকে আড়াল করে রাখার প্রচেষ্টা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটি আলোচনা লক্ষ্য করা যাক— 'সাড়ে চার বছর একটা জাতির বা দেশের জীবনে কিছুই নয়, কিন্তু এ-সময়ের মধ্যে পূর্ব বাংলা প্রগতির পথে যতখানি এগিয়ে গেছে তা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এ সময়ের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের যে উন্নয়ন হয়েছে তা বিচার করার সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, যেসব জেলা নিয়ে এই প্রদেশ গঠিত সেগুলো অবিভক্ত বাংলার সবচেয়ে অনুন্নত জেলা ছিল। দেশ বিভাগ যখন হলো, তখন শিল্প ও ব্যবসায়ের কেন্দ্রগুলো সবই অন্তর্ভুক্ত হলো পশ্চিমবঙ্গের, আর শুধু সেইসব জেলাই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলো যেগুলোর একমাত্র কাজ ছিল কাঁচামাল উৎপাদন করা। আজাদীলাভের অব্যবহিত পরে দুর্লঙ্ঘনীয় বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে সরকার এই অনুন্নত প্রদেশের উন্নয়নের কাজে হাত দেন। কোনো কোনো মহলের ধারণা যে, এ প্রদেশের উন্নয়নের প্রতি কেন্দ্রীয়

Dhaka University Institutional Repository

সরকার যথাযথ মনোযোগ দেননি। কিন্তু গত চার বছরের সরকারী কার্যক্রমের আলোচনা করলেই বোঝা যাবে যে এ ধারনা ভুল।" দুই প্রদেশের তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করে ঐ আলোচনার উপসংহারে মন্তব্য করা হয় ঃ "এই পর্যালোচনা থেকে সহজে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদাই যত্নশীল। একান্ত অনুন্নত অবস্থা থেকে এই প্রদেশ প্রগতির পথে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে, একথা বিদেশী পর্যটকেরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে থাকেন।"[৮৪] উপর্যুক্ত রচনা প্রকাশের তিন বছর পর ১৯৫৪ তেও সম্পাদকীয় বক্তব্যে একই ধরণের বক্তব্য 'পাকিস্তানের বাজেট' শীর্ষক আলোচনায়— "পাকিস্তানের অর্থনীতিতে উন্নতি ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা বাজেটে সহজেই চোখে পড়বে'।[৮৫] দেশরক্ষা খাতে পূর্ব-পাকিস্তানকে অর্থবরাদ্দ করা হতো নামেমাত্র এবং নিরাপত্তাহীনতার জন্য এবং দেশরক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই বলে ছয়দফা আন্দোলনের জের পাকিস্তানকে বিভক্ত করে দিলেও মাহেনও এর আলোচনার সুর ছিল এরূপ : "এবারকার বাজেটে দেশরক্ষা খাতে মাশরেকী পাকিস্তানের জন্য যে বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে তজ্জন্য আমরা শুকরিয়া আদায় করছি।"[৮৬] চট্টগ্রাম পূর্ববঙ্গের একটি অঙ্গ, তার ভৌগলিক, বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রিক গুরুত্ব ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা। অথচ সেই নগরীর উন্নয়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ১১.০০ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি একই অর্থ-বছরে পশ্চিম-পাকিস্তানের একটি শহর বেলুচিস্তান এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৩৭.০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে বাংলা ভাষায় বাঙালিদের লেখা নিয়ে প্রকাশিত এই মাহেনও পত্রিকায় এই প্রসঙ্গে নিরুত্তাপকণ্ঠে বলা হয় : "আপাতত দৃষ্টিতে মনে হবে চট্টগ্রাম-বন্দরের আধুনিক গুরুত্বের অনুপাতে ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণটা যেন সঙ্গতি রক্ষা করেনা। এসম্বন্ধে 'উজীরে মালিয়াত (অর্থমন্ত্রী) যে বিবৃতি দিয়েছেন সেটা প্রনিধানযোগ্য। চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ কর্তৃক এখনো চূড়ান্তভাবে তৈরী হয়নি। এমতাবস্থায় আন্দাজী অর্থবরাদ্দের কোনো মানে হয়না..... গোলাম মোহাম্মদ সাহেব আশ্বাস দিয়াছেন যে, চট্টগ্রামের জন্য পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে তিনি আবশ্যকীয় অতিরিক্ত অর্থ মঞ্জুর করবেন। এতে বোঝাই যাচ্ছে যে চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব সম্বন্ধে তিনি আদৌ উদাসীন নন।"[৮৭] দেশরক্ষা, শিক্ষা, উন্নয়ন সকল বিষয়ের বাজেট সমালোচনাতেই এই রকম দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুট।

পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় স্বাধীনতা-পরবর্তী পূর্ববঙ্গের সাহিত্য-পরিস্থিতির বর্ণনা পূর্বক 'মাহেনও'-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল : "একটা প্রথম শ্রেণীর বাংলা মাসিক পত্রিকার আবশ্যকতা বহুদিন হইতেই বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছিল, পূর্ব-পাকিস্তানে আজ দেড় ব্যসর যাবৎ সময় ও কালোপযোগী বই, পুস্তক, খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্রিকার অভাব অনেকটা দুর্ভিক্ষের আকার ধারণ করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবেনা। নবলব্ধ আজাদীর সঙ্গে-সঙ্গে যে নূতন ভাবধারার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সুন্দর, সুষ্ঠু ও নিয়মিতভাবে জনসাধারণের সামনে পেশ করিবার উদ্দেশ্য নিয়েই 'মাহেনও' এর জন্ম।.... অবিভক্ত বাংলা, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত কয়েকটী নামকরা বাংলা মাসিক পত্রিকার উপর নির্ভরশীল ছিল। দেশবিভাগের পর ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করায় মাশরেকী পাকিস্তানবাসী সেই সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইল। তাছাড়া, পাকিস্তান এখন আলাদা রাষ্ট্র। হিন্দুস্থানের কলিকাতা নগরী হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকাসমূহে পাকিস্তানী তার নিজের আদর্শের তাহজীবের ও তামাদ্দুনের, কোন কিছুরই সাক্ষাৎ পায়না। অন্যদিকে আমাদের যেই এক আধখানা মাসিকপত্রিকা ছিল সেইগুলিও রোজরোজ ক্ষীণকলেবরে পরিণত হইয়া বিলীন হইল। তাই তীক্ষ্মভাবে অনুভূত হইল একখানা মাসিক পত্রিকার আবশ্যকতা। দেখা দিল সমস্যা। তারপর আল্লাহর রহমতে সমস্যার ফয়সালা করিয়াই আজ বাংলার সাহিত্যিক ও পাঠকদের সামনে 'মাহেনও' লইয়া হাজির হইলাম। প্রচার বা কোন কিছুর মামুলী প্রোপাগাণ্ডা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ইহার আদর্শ পাকিস্তানের তাহজিব ও তামাদ্দুন। ইহার উদ্দেশ্য দেশের প্রবীণ সাহিত্যিকদিগকে কদর দেওয়া ও নয়া আজাদীর আবহাওয়া-পরিপুষ্ট নবীন লেখকলেখিকা সৃষ্টি করা। বিগত যুগের সাহিত্যিকদের আদর্শে আজাদীর রংফলাইয়া অনাগত যুগের সাহিত্যিক জন্ম নিলেই আমরা আমাদের চেষ্টা সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। এই জন্যই ইস্‌তেকবাল জানাইতেছি প্রবীণ ও নবীন লেখক-লেখিকাদিগকে সমভাবে।.... তারপর মাশ্‌রেকী ও মাগরেবী পাকিস্তানের মধ্যে বিরাট ব্যবধান দূরত্বের মাপকাঠিতে আদর্শ ও ভাবরাজ্যে কোন ব্যবধান আছে বলিয়া আজ আর মনে করা যায়না। তাই একাংশের চিন্তাধারা অপর অংশে পরিবেশন করিতে হইবে। 'মাহেনও'-এর মারফতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে পশ্চিমাঞ্চলকে দেখিবে, বুঝিবে, আর খোদ বাংলা 'মাহেনও' পশ্চিমাঞ্চলের ক্রোড়ে বসিয়া নিজের স্বত্তা বুঝাইয়া দিবে। কথাটা আরও একটু খোলসা করিয়া বলি। আমাদের বাংলা 'মাহেনও'-এ প্রকাশিত মূল্যবান প্রবন্ধগুলি ইংরেজী 'পাকিস্তান' ও উর্দু 'মাহেনও' ও সিন্ধী 'নই-জিন্দেগী' তে তর্জমা করিয়া প্রকাশ করিবার ব্যবস্থাও হইবে।..... জনগণের সন্তুষ্টিই আমাদের কাম্য ও লেখক-লেখিকাদের সহানুভূতিই আমাদের সম্পদ।"[৮৮]

'মাহেনও' পাকিস্তানের তাহজীব-তমদ্দুন গঠনে সহায়তা করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছে। কারণ, তাঁরা বুঝেছিলেন 'সংস্কৃতি ও সাহিত্য জাতীয় বুনিয়াদ গঠনের আসল বুনিয়াদ'। 'সেই বুনিয়াদ রচনা করে পাকিস্তানকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে এ-পত্রিকা দেশের প্রতিটি লেখক, শিল্পী, ভাবুক, চিন্তাশীল, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিককে' দিয়ে লিখিয়েছেন। তাঁদের সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। মাহেনও ছিল পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র পত্রিকা যার প্রচার সংখ্যা ছিল 'অনতিক্রম্য'। এই পত্রিকার আদর্শ বুঝে সকল লেখকই পাকিস্তানের তাহজিব-তমদ্দুন এবং রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের কথা স্মরণে রেখে গোটা পাকিস্তানী আমল ধরে সাহিত্যচর্চা করেছেন। রচনা মুদ্রণের এবং সম্মানীর আশায় লেখকেরা 'মাহেনও'-এর উপর্যুক্ত ঘোষিত আদর্শকে ব্যাহত না-করে বিষয় ও বক্তব্য নিয়ন্ত্রণ করতেন। কবি শামসুর রাহমানের মতো অন্যতম প্রধান বাঙালি কবিও ১৯৭১ সনের শেষমুহূর্তে, যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হবার-ক্ষণে উপনীত— কবিতা লিখেছেন মাহেনও এর জন্য 'আজাদ পকিস্তান/ আমাদের ওয়াতান/ শান্তির দেশ সুন্দর এই' পাকিস্তান। জুলাই ১৯৭১ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর এই কবিতাটি মাহেনও-এর আদর্শ বাস্তবায়নের সাফল্য নির্ণয়ের জন্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো। শামসুর রাহমানের নিম্নোক্ত কবিতার সঙ্গে অপূর্ব মিল পাকিস্তানবাদী কবি, ফররুখ আহমদের 'মাহেনও'-এর একই পৃষ্ঠায় (একই সংখ্যায়) মুদ্রিত কবিতার—

Dhaka University Institutional Repository

"শান্তির দেশ সুন্দর এই
আমাদের ওয়াতান।
আজাদ পাকিস্তান।।
বিপদ বাধাকে করি নির্ভয়
শক্তি সাহস চির দুর্জয়
এ পাক জমিন ভাল যে বেসেছে
হাসিমুখে তাজা প্রাণ।।
নতুন আশার স্বপ্ন রঙীন
আমরা এনেছি উজ্জ্বল দিন
গ্রামে বন্দরে সবখানে আজ
নবজীবনের গান।"[৮৯]

"আজাদ পাকিস্তান
আসমানে যার ঝাণ্ডা ওড়ে হিলালী নিশান
বীর মুজাহিদ আনলো যারে
তপ্ত বুকের রক্ত ধারে,
লাখো শহীদ প্রাণ দিয়ে ভাই
পেলো খোদার দান।। ......"[৯০]

মাহেনও এর অপর লক্ষ্য নতুন লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে বাঙলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো — তাও ব্যর্থ হয়নি। লিখেছেন প্রতিষ্ঠিত এবং নতুন আবির্ভূত প্রায় তাবৎ লেখকেরা। মাহেনওএ লিখে বাংলা সাহিত্যের শ্রী কিছু বৃদ্ধি অবশ্যই করেছেন তাঁরা। সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ, সরদার জয়েনউদ্দীন, শওকত ওসমান প্রমুখের বহু-খ্যাত অনেক গল্প, (যেমন 'পাগড়ী') এবং আবুল ফজলের 'রাঙা প্রভাত' এর ন্যায় উপন্যাস এই পত্রিকায়ই প্রকাশিত হয়েছে। দাঙ্গা ও দেশবিভাগ-এর প্রেক্ষাপটে মোহাজের, বস্তিবাসী প্রভৃতির জীবনচিত্র বাংলা সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে। 'মাহেনও' এর মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান এবং মুসলিম-বিশ্বের পরিচয় লাভের সুযোগও হয়েছিল বাঙালি পাঠকের।

মাহেনও আজাদী যুগের প্রথম দিকের পত্রিকা বিধায় এতে কিছু সামজচিত্র ঠাঁই পেয়েছে। পত্রিকা প্রকাশের অন্তরায় সম্পর্কে বলা হয় বাংলাদেশে তখন পর্যন্ত 'ব্লক' তৈরীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। 'এখনও মাহেনও এর ব্লক তৈরী করে আনতে হয় করাচী থেকে। ভারত সরকার Metal Restrictions orders বলে পাকিস্তানে মেটাল-জিনিস আমদানী বা রফতানী কড়াকড়ি করে দেয়। পূর্ব বাংলায় এ্যামেচার ফটোগ্রাফার-এর অভাবে ভালো ফটো পেতে বেগ পেতে হয়।"

'মাহেনও' পত্রিকায় বঙ্গাব্দ উল্লেখ করেছিল। পরে খ্রীষ্টাব্দ হয়েছিল। এর পর আবার হিজরী সংযুক্ত হয়। প্রচ্ছদে মসজিদের ছবি থাকত। ভিতরে বিভিন্ন প্রদেশের ফল এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের নানা ছবি দেয়া হতো। কখনও কখনও মন্ত্রী, উজীর-নাজীরের ছবি থাকতো। প্রথম দিকে বিজ্ঞাপন ছাপা হতো না। তৃতীয় বর্ষ থেকে বিজ্ঞাপনের হার দিয়ে বিজ্ঞাপন দেবার আহ্বান জানানো হয়েছিল। নজরুলের ছবি, হস্তলিপি, চাঁদতারা--পতাকা প্রভৃতি থাকতো। প্রথম বর্ষে ইংরেজী মাসের পহেলা সপ্তাহে বের হতো। তৃতীয় বর্ষ থেকে বাংলা মাসের পহেলা সপ্তাহে প্রকাশ পায়। সম্পাদক, প্রকাশক ইত্যাদি পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে নিয়মও পাল্টায়। প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথকে একবার (তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা) সম্পাদকীয়তে (জন্মতিথি বৈশাখে) শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয় 'বাংলার কবি সম্রাট', 'বাংলা সাহিত্যের সৌরাধিপতি', "শুধু বাংলার নন, সারা প্রাচ্যেরই গৌরব, ইত্যাদি গুণবাচক শব্দদ্বারা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপর কোনো প্রবন্ধ মাহেনও ছাপেনি। বরং রবীন্দ্রনাথকে বর্জনের জন্য লেখা ছেপেছে। ষাটদশকে রবীন্দ্র-বিতর্কের উত্তেজনার সময় মাহেনও এ-বিষয়ে নিশ্চুপ থেকেছে। যদিও হিন্দু লেখকদের রচনাও এতে প্রকাশিত হয়েছে অনেক। তারাপদ রায়, দার্শনিক জে-সি-দেব, কিরণ শংকর সেনগুপ্ত প্রমুখের অনেক রচনা এতে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাঁদের কাঙ্ক্ষিত (মাহেনওএর) নিজস্ব লেখকগোষ্ঠী গড়ে ওঠেনি। কোনো সাহিত্যিক-আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয় মাহেনও। 'ইখওয়ানে আদব' নামে একটি নতুন বিভাগ সাহিত্যিক ভ্রাতৃত্ব বা Literary brotherhood সৃষ্টির জন্য তাখাল্লুম বা ছদ্মনামে সাহিত্যালোচনায় আগ্রহীদের পত্রের মাধ্যমে সাহিত্যালোচনার জন্য খোলা হয়েছিল এবং 'সাহিত্যিক গোষ্ঠী' সৃষ্টির জন্য 'নতুন চারা রোপন করা হয়েছে' বলে সম্পাদকীয়তে বলাও হয়েছিল। কিন্তু কোনো সুফল পাওয়া সম্ভবপর হয়নি। 'পাকিস্তান পাবলিকেশনস' থেকে 'পাকিস্তান', 'আলবশীর', 'মাহেনও' প্রভৃতি যতো পত্রিকাই প্রকাশ করুক, তাতে প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যসেবার লক্ষ্য কি ছিল আর ফল কোন দিকে কতোটা হয়েছে; এবং দেশের লোকেরা পাকিস্তানকে কিভাবে পেতে চেয়েছিল, আর কিচোখে দেখেছিল আজাদ-পাকিস্তানকে, তা জানার জন্যে, এবং সমাজতাত্ত্বিক ও গবেষকদের কৌতূহলের অনন্ত উৎসরূপে 'মাহেনও'এর গুরুত্ব আজও কম নয়।[৯১]

৪. দিলরুবা (১৩৫৬/১৯৪৯-১৯৬৪/১৩৭০)

মাহেনও এর পরে মাসে দিলরুবা আবির্ভূত হয়েই সাহিত্য-জগতের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই পত্রিকা প্রকাশের নেপথ্যে কাজ করেছিল একটি মহত্তম অনুভূতি- 'প্রেম'। ব্যক্তিগত প্রেম সার্বজনীন মানব প্রেমের-রূপে জনকল্যাণের ব্রত নিয়ে সর্বস্তরের মানুষের মননে অনুরণন তুলতে চেয়েছিল বলেই হয়তো এর লক্ষ্য-আদর্শে তার গভীর প্রতিফলন ঘটেছিল। উদ্যম নিঃশেষ হবার প্রাককালেও তাই তার যেটুকু রেষ ছিল, তাও মূল্যবান বিবেচিত হয়েছিল। সমাজের কথা ভেবেছিল বলে সকল বিষয়েই দিলরুবা বক্তব্য উপস্থাপন করতে নিঃসঙ্কোচ ছিল। এতে ঘটেছিল বহু মুক্ত-বুদ্ধির ধারক-বাহক-লেখকদের সমাবেশ। বারে বারে সম্পাদক ও সম্পাদনা-পরিষদের সদস্য পরিবর্তন হলেও কেন্দ্রীয় ব্যক্তি ছিলেন একজন এ এইচ এম আবদুল কাদের— মিসেস দিলরুবার স্বামী, যিনি অকালে প্রিয়তমা শ্ত্রীর বিয়োগে ব্যথাতুর- হৃদয় নিয়ে শ্ত্রীর স্মৃতি ও আর্দশকে স্থায়ীভাবে ব্যাপ্ত করে দিতে চেয়েছিলেন সাহিত্যের মাধ্যমে, দেশ ও সমাজের হিত সাধনের কাজে। লক্ষ্যণীয়, অনেকেই শ্ত্রীর মৃত্যুর পরে

Dhaka University Institutional Repository

স্মৃতি– রক্ষার জন্য অনেক কিছু করেন, কিন্তু স্ত্রীর নামে সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশ করে সাহিত্যের উন্নতির মাধ্যমে দেশের সেবার মহত্তম-পন্থা অবলম্বন করেছিলেন আমাদের জানা মতে এই একজন। দিলরুবার সত্বাধিকারী আবদুল কাদের ঢাকা সেন্ট্রাল ল' কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। শিখা বা মাহেনও-র সম্পাদক এবং দিলরুবা শীর্ষক কাব্য-গ্রন্থের রচয়িতা, কবি ছান্দসিক আবদুল কাদের তিনি নন। মোহাম্মদী-সওগাতের প্রথম-দিককার সংখ্যাগুলোরত মুসলিম সভ্যাতার পরিচয় মূলক অনেক রচনার লেখক এবং বহু গ্রন্থের প্রণেতা সরকারী চাকুরে (মেজিস্ট্রেট) ডঃ এম আবদুল কাদেরও তিনি নন। আইনজীবী এ. এইচ এম, আবদুল কাদেরের স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় প্রথম সন্তান প্রসব কালে কলকাতায় ১৯৪৬ সালে মারা গিয়েছিলেন। অবিভক্ত ভারতের সিভিল সার্ভিসের কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দিলরুবা মেজিস্ট্রেট হিসেবে কর্ম জীবনে প্রবেশ করেন। মৃত্যুর পর তাঁর সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজসেবার দ্বারা তাঁর স্মৃতিকে অমর করে রাখার উদ্দেশ্যেই স্বামী আবদুল কাদের স্ত্রীর নামে পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বটে; তবে একান্তভাবে এটা মহিলাদের সাহিত্যপত্রিকা ছিলনা । যদিও শিশু ও নারীদের সাহিত্য-চর্চায় এ পত্রিকা পরে বিশেষ নজর দিয়েছিল। অনেক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে এবং বিশেষ বিভাগ খুলে ও (মহিলা বিভাগ ও সবুজ সংঘ) সম্পাদনা-পরিষদে খ্যাতনাম্নী মহিলাসাহিত্যিকদের সংশ্লিষ্ট করে এবং নারী জাতির নানা সমস্যা ইত্যাদি ব্যাপারে অনেক রচনা প্রকাশের মাধ্যমে দেশের নারী প্রগতিতে দিলরুবা কিছু মূল্যবান অবদান রাখলেও সার্বিকভাবে তা যে ভূমিকা পালন করে তা আরও ব্যাপক। বেসরকারী বা ব্যক্তিক উদ্যোগের কোন পত্রিকাই দিলরুবার ন্যায় দীর্ঘ পনের বছর যাবত প্রকাশিত হতে পারেনি। শুধু বাংলা মাসিক দিলরুবাই নয়, অনন্তর তিনি (আদুল কাদের) উর্দু ও ইংরেজীতেও 'দিলরুবা' প্রকাশিত করেন; পাকিস্তান সরকার যেমন উর্দু মাহেনও এবং ইংরেজীতে সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেছিল। অতএব উদ্যোক্তা দুঃসাহস করেছিলেন সরকারী পত্রিকা 'মাহেনও' এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকার। কিন্তু ইংরেজী ও উর্দু 'দিলরুবা' ইতিহাসের পাতায় অন্তর্ভুক্তি পায়নি। আর 'মাহেনও' এর মতো সরকারের সহায়ক উদ্দেশ্যমূলক পত্রিকা হিসেবেও 'দিলরুবা' চিহ্নিত হতে পারেনি। বরং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সরকার –বিরোধী বা বাঙ্গালীর স্বার্থমুখী বক্তব্যই প্রচার করেছে। বাঙলা ভাষার পক্ষে প্রথমাবধি এঁরা মতামত ব্যক্ত করেছেন। একুশে ফেব্রুয়ারীর গনহত্যাকে নিন্দা করেছেন। শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন দিলরুবার-আদর্শ নিয়ন্ত্রকেরা; আর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনেও তাঁরা আনন্দ লাভ করেছিলেন। মুসলিম-লীগের স্বৈরতন্ত্র নিপাত থাক – তাও তাঁরা মোলায়েম ভাষায় উচ্চারণ করেছেন। ১৯৬২ সনের ছাত্র আন্দোলনকেও দিলরুবার সম্পাদকীয় বক্তব্য সমর্থন না করে পারেনি। শহীদ মিনার গড়ার এবং শহীদ দিবসের সরকারী স্বীকৃতির ব্যাপারে (গভর্ণর আজম খানের সময়) যে-সমস্ত বক্তব্য দিলরুবা প্রদান করেছে– তাতে একে গণ-বিরোধী বলবার কোনো উপায় নেই। বাংলা একাডেমী, ইসলামিক একাডেমী এবং লেখক সংঘের সমালোচনায়ও মুক্ত-বুদ্ধির পরিচয় দিতে দিলরুবা কার্পণ্য করেনি। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁরা যে মতামত ব্যক্ত করতেন, তাতে মাহেনও এর অনেক লেখকদের মত 'বাংলা মাদেরী জবান হলেও উর্দুই আমি ভালোবাসি'- ধরনের মনোভাব প্রকাশ পায়নি। তথাপি এই পত্রিকা পুরো না হলেও অনেকটাই পাকিস্তানবাদী, এবং বেশীর ভাগ ইসলাম-পন্থী। ইসলামী-ধারার গণতন্ত্র তাঁরা সব সময়ই পছন্দ করেছেন। (সাতচল্লিশের পর ১৯৫৪ পর্যন্ত) দীর্ঘদিন পাকিস্তানে নির্বাচন দেয়া হয়নি বলে দিলরুবা সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছে। ১৯৫৬ ও ৬২ সনের শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করাতেও 'দিলরুবা' নিশ্চুপ থাকতে পারেনি। কখনও কখনও সুরে দৃষ্টিভঙ্গিতে মোহাম্মদীর সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষিত হলেও কোথাও-কোথাও 'দিলরুবা'আবার প্রগতিশীলদের মতোই কথা বলেছিল। তবে মার্কসবাদ দিলরুবা কখনোই সমর্থন করেনি। রাশিয়া-চীনের থেকে আমেরিকার প্রতিই সম্পাদকের আনুগত্য বেশী প্রকাশিত হয়েছে। আর কোরআন মজিদের অনুবাদ ও প্রচার এবং ইকবাল-নজরুল কায়েদে আজম-এর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল গভীর। কিন্তু রবীন্দ্রবিরোধী তাঁরা ছিলেননা আবার। আইউব খানের রোমান হরফ প্রবর্তনের প্রস্তাবকে যেভাবেই হোক আদর্শে ঐক্য না রেখে তাঁরা সমর্থন করে বসেছিলেন। লেখক ও সাহিত্য-শিল্পীদের আইউবী-পৃষ্ঠপোষণের উদ্দেশ্যমূলক স্কীমকেও দিলরুবা সজোরে নিন্দা জানাতে পারেনি। বরং একটা সময়ে তাঁদেরকে ভারী আপোষকামী বলেই মনে হয়। কিজন্য আপোষ করতে চাচ্ছিলেন, আর কিজন্যই বা পরে গণমুখী হয়ে পড়লেন - এটা গভীর অনুসন্ধানের বিষয় নয়, যেটা বড়— তাহলো, এঁরা খুব ক্ষতিকর, পশ্চাৎপদ, প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্য প্রচার করতে তৎপর হননি। তখন অনেকেই এরকম উল্টো-পাল্টা ভেবেছেন। সামরিক শাসনের ভয়েও, অনেকে ব্যবসার স্বার্থে বা গা বাঁচাবার তাগিদে, অনেক সময় গায়ে-পড়ে তোয়াজ তোষামোদে বক্তব্য প্রচার করতে উদ্যত ছিলেন। এসব সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে যেটুকু স্ববিরোধীতা এর মধ্যে লক্ষ্যগোচর হয়— তা বিভ্রান্তির মতো মনে করলে এর অসংখ্য সদগুণ পাঠক ও গবেষককে অভিভূত না করে পারে না। এগুলোর মধ্যে প্রথমেই দৃষ্টি কাড়ে প্রতিটি (জাতীয়ভাবে) তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে এঁরা মতামত প্রদান করেছেন। জনমত গঠন করতে চেয়েছেন জনগণের স্বার্থের এবং প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রেখেই। কিন্তু একেবারেই পত্রিকার ব্যবসায়িক দিক ভুলে গিয়ে কোনো কাজ করতে তাঁরা চাননি, এটাও মনে রাখতে হবে। লেখকদের সম্মানী বা পারিশ্রমিক দিতে চাইতেন না মালিক জনাব আবদুল কাদের। লোক বুঝে আবার অনেককেই তা দেয়া হতো বিজ্ঞাপনদাতাদেরকে আগে কপি সরবরাহ করে পরে লেখকদের কপি প্রেরণ বা প্রদানের কথা চিন্তা করতেন বলেও জানা গেছে।[৯২] সেজন্য পরের দিকে পত্রিকার আকার আকৃতি, মান ক্ষয়ে নড়বড়ে হয় যায়।

যে পনের বছর চলেছিল পত্রিকা, তার প্রথমার্ধ যদি উজ্জীবনের কাল হয়— শেষার্ধ তাহলে অবক্ষয়ের। ১০, ১১, ১২ ও ১৩ বর্ষের প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে মান পড়ে গেছে বলে পত্রিকার পক্ষ থেকেই আফসোস করে অথবা কৈফিয়তের ঢংয়ে কারণ ব্যাখ্যা করে এসব কথা বলা হয়েছে। কৈফিয়তে অবশ্য পূর্ববাংলার সাহিত্য পত্রিকার প্রধান (Common) সমস্যা বা অন্তরায়গুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সাহিত্যপত্রিকায় বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়না। কাগজ ও মুদ্রণ ব্যবস্থা ব্যয়বহুল। সরকারের সাহিত্য বা শিল্পনীতিতে সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশ কামনার পরিচয় ছিল না। এন্তার সব সমস্যার কথা বলা হয়েছে। অনিয়মিত হয়ে পড়েছে সেজন্য। যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশ করে ধারা বজায় রাখা হয়েছে। মাসের নির্দিষ্ট দিনে দ্বিতীয়ার্ধের খুব কম সংখ্যক সংখ্যাই পাঠক বা গ্রাহকদের নিকট পৌছেছে। তবু এই পত্রিকা মোহাম্মদী-আল ইসলাহ-সওগাত-মাহেনও ব্যতীত দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশিত পূর্ববাংলার একমাত্র বেসরকারী বাংলা মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। সমকাল দিলরুবার আট বছর পরে প্রকাশিত হয়েছিল এবং একাত্তরের যুদ্ধের পূর্বে

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধের পূর্বে মাত্র ১৩ বছর অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবার সুযোগ পায়। স্বাধীনতার (১৯৭১) পরবর্তী সংখ্যাগুলোর হিসেব কষলে বলতে হবে দীর্ঘ জীবনের মাপকাঠিতে দিলরুবার একমাত্র সহযাত্রী অপর বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-সমকাল। অবশ্য সওগাত-মোহাম্মদীর কথা এখানে আনা হচ্ছেনা। এ দুটি পত্রিকা বিভাগ পূর্বকালেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তাছাড়া পরিক্রম, পূবালী ও পূর্বমেঘ যথাক্রমে ৮, ৭ ও ১১ বছর চলেছিল। এর পর আর কোন পত্রিকাই নেই— যা দীর্ঘদিন চলেছিল।

দিলরুবার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৫৬ সনে। পরিচালক সমিতির যে বিবরণ দেয়া হয়— তাতে দেখা যায়, প্রকাশের পূর্বে একটি সমিতির মতো সংস্থা তৈরী করা হয়েছিল। অতএব উদ্যোগটি সুপরিকল্পিত ছিল। এর প্রথম সংখ্যায় উল্লিখিত সমিতির সদস্য ছিলেন বেশীর ভাগই সম্ভ্রান্ত বাঙালি-মুসলিম মহিলা। (১) বেগম রওশন আখতার খানম (চেয়ারপার্সন), (২) বেগম সাইদা করিম (কোষাধ্যক্ষা); (৩) সৈয়দা সাকিনা ইসলাম খান; (৪) বেগম আসিয়া রহমান; (৫) সম্পাদক দিলরুবা; (৬) মিঃ মজবুল আল হোসায়েন; (৭) ফরিদ আহমদ, (৮) মিঃ আবুল হোসেন চৌধুরী, (৯) ম্যানেজার ও পরিচালক সমিতির সেক্রেটারী বেগম রাবেয়া এম. হোসেন; (১০) সহ-সেক্রেটারী এ. এন. এম. শামসুদ্দীন; (১১) এসিস্টান্ট ম্যানেজার সৈয়দ মঞ্জুর আলী, (১২) রেজা হোসেন খান প্রমুখ। এই সঙ্গে বিভিন্ন জেলা প্রতিনিধিদের নামও ছাপা হয়। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা প্রকাশের ত্রিবিধ-উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছিল :

"প্রথম উদ্দেশ্য বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের দৈন্য দূর করবার চেষ্টা করা। বাংলা ভাষায় এ দৈন্যের কৈফিয়ৎ তুলে অনেকেই আজকাল মাদেরী জবান ছেড়ে অন্য ভাষার দিকে নজর দিচ্ছেন. এ দৈন্য যে সত্যিই আছে তা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেটার কারণ হচ্ছে এতকাল এত অধিকাংশ মুসলিম অশিক্ষিত ছিলেন আর তার ফলে মাতৃভাষার চর্চা তাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করেনি। আজ আমাদের কাছে এটাই স্বাভাবিক আর সহজ বলে মনে হয় যে, আমরা এ ভাষার পরিপুষ্টি সাধনে তৎপর হব। এতে মুসলিম জাতীয় জীবনের কাহিনীর চিত্রন চাই, ইসলামের দর্শন, সমাজনীতি প্রভৃতির আলোচনা চাই, এর কাব্য-চর্চার পিছনে নতুন জীবন-দর্শন প্রয়োজন: তবেই এ-ভাষা আর দীনহীন থাকবেনা— আমাদের জাতীয় ভাবের সত্যকার বাহক হবে।

"আমাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্যের গতিপথ নির্দেশের চেষ্টা করা। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে চিরকালই একটা ভাবগত বৈষম্য ছিল। আজাদী লাভের পর সেটাই স্পষ্ট হয়ে চোখে ধরা দিচ্ছে। এদেশের অধিকাংশ অধিবাসীর যোগ মাটির সংগে, নদীর সংগে, এঁদের চালচলতি সবই মুসলমানী কায়দায় গড়ে উঠেছে, কারণ সংখ্যায় মুসলমানেরা অত্যধিক আমাদের সাহিত্যে এরূপ প্রকাশিত হত বাধ্য। তবে আমাদের পত্রিকায় যে এখনই সেরূপ ধরা দিয়েছে তা বলতে সাহস করিনে, কারণ এখনও আমাদের ওপর পশ্চিম বাংলার সাহিত্যিক প্রভাব খুবই প্রবল। এ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে কিছু সময় লাগবে। লাগুক, ক্ষতি নেই, কিন্তু কাটিয়ে ওঠাই দরকার

"আমাদের তৃতীয় উদ্দেশ্য পত্রিকার দ্বারা ভবিষ্যতে কোন সমাজ সেবার কাজ করা যায় কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা। এ পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে বেগম দিলরুবা কাদেরের স্মৃতিকে স্মরণ করে: তিনি অল্প বয়সেই কলিকাতার লেডী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পেয়েছিলেন, কিন্তু বেশীদিন জীবিত ছিলেন না; প্রসব সংকটে ১৯৪৬ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন: তিনি বিদ্যোৎসাহী, তীক্ষ্ন-বুদ্ধিসম্পন্না বহুগুণান্বিতা ছিলেন। নারী শিক্ষার দিকে তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বিশেষ কিছু তিনি করে যেতে পারেন নি। তাঁরই সম্পদ ও আদর্শ কেন্দ্র করে তাঁরই আত্মার প্রেরণায় 'দিলরুবা' প্রকাশিত হল। ভবিষ্যতে.. লভ্যাংশ দ্বারা সমাজের কল্যাণ সাধন বিশেষত নারী শিক্ষা ও দুঃস্থ মানবতার সেবা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য — তাছাড়া আজ তাঁর মৃত্যুর পর শুধুমাত্র তাঁর নাম স্মরণ করে পত্রিকা প্রকাশ অর্থহীন।'

পত্রিকার পক্ষ থেকে বলা হয় : তাঁদের এ উদ্দেশ্যের সফলতা নির্ভর করে কতকটা তাঁদের ওপর, কিন্তু অনেকটাই নবীন লেখক ও পাঠকদের ওপর। তবে লিখিয়েদের আদর্শ হবে স্বদেশী। "যারা নয়া নয়া লিখছেন তাদের উচিত পশ্চিম বাংলায় বর্দ্ধিত সাহিত্যকে আদর্শ না করে নতুন একটা আদর্শ গড়ে তোলা। ঢাকা শহরের ইট কাঠ পাটকেলের মধ্যেও যেন তাদের সাহিত্য সীমাবদ্ধ না হয় — তারা যেন বিশাল দেশকে চেনেন ...'

উপরোক্ত বক্তব্যে পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গী বোঝা যায়। ১৯৪৯ সনের দেশের সমাজ-সভ্যতার-গতি প্রকৃতি সম্পর্কেও উপর্যুক্ত সম্পাদকীয়-বক্তব্যে একটি চিত্র পাওয়া যায়: " নানা বিভাগে দেশ এখন বহুধাবিচ্ছিন্ন. সব চাইতে বড় বিভেদ আধুনিক শিক্ষিত সমাজ আর গ্রাম্য চাষী সমাজের মধ্যে। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল তা এ বিভেদ কখনও সৃষ্টি করত না; তার কারণ শিক্ষিতেরা আধুনিক কালের মত বিজাতীয় শিক্ষা লাভও করতেন না, আবার শিক্ষা লাভ করার উদ্দেশ্য তাদের জ্ঞান অর্জনই ছিল। বর্তমান কালের মত চাকুরী অন্বেষণ ছিলনা। আমরা আজকাল যে শিক্ষালাভ করে থাকি, সে শিক্ষার সঙ্গে আমাদের দেশের, আমাদের জাতির প্রাণের যোগ নেই। আমাদের জাতির মূলভিত্তি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের কোন যোগাযোগ নেই। তার জন্যই যাঁরা এ শিক্ষা লাভ করেন তাদের সঙ্গে দেশের অধিকাংশ লোকের যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে আসে, দ্বিতীয়ত: এ শিক্ষা বিজাতীয় শিক্ষা। পাশ্চাত্য বস্তুতন্ত্র ঐ শিক্ষার পশ্চাতে কাজ করছে। ফলে এ শিক্ষার সংস্পর্শে যাঁরাই আসছেন তাঁরাই কিছু না কিছু সেই বস্তুতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। সেই বস্তুতন্ত্রের সঙ্গে আমাদের ধর্মের, আমাদের মনোভাবের চিরকালের বিরোধ। তাই সেই বস্তুতন্ত্র আমাদেরকে দেশের অধিকাংশের থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে: এ ছাড়াও আছে আমাদের চাকুরীর উদ্দেশ্যে শিক্ষালাভ করা .... আমাদের এ দুরবস্থা দূর করতে পারি কি হলে? প্রথম কথাই হচ্ছে আমাদের উচ্চশিক্ষিত সমাজকে নিয়ে। তাঁদের মনে রাখা উচিত যে নূতন ভাবে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা দরকার কিন্তু সে পরিকল্পনার পূর্বে চিন্তা করতে হবে আমাদের সমাজের কথা, আমাদের জাতির কথা এবং আমাদের ধর্মের কথা। —— কোরআন শরীফে সেই জীবনাদর্শ প্রচারিত হয়েছে— রসুলের জীবনে ও কার্য্যাবলীতে তার রূপায়ন ... কিন্তু এই আদর্শের সঙ্গে আমাদের কর্ম্ম-পদ্ধতির যোগসূত্র হারিয়ে গেছে। আমাদের চিন্তা অন্যমুখী। যে চিন্তাশক্তির সাহায্যে ইসলামী সভ্যতার প্রারম্ভে মুসলমানেরা তাঁদের জীবনের সঙ্গে আদর্শের যোগ খুঁজে পেতেন আজ আমাদের মধ্যে সেই চিন্তাশক্তির অভাব ঘটেছে। —— পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিকতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ যে কমিউনিজম —— সেই কমিউনিজম ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী। — আমাদের সমাজনীতি অর্থনীতি সমস্ত পাঠ্যবই-ই পাশ্চাত্য

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের হয়ে থাকে। পাকিস্তানে নূতন ইসলামিক স্কুল অব ইকোনমিক্স এর উদ্ভব সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করা দরকার এবং সেপথে গবেষণা চালানোর জন্য নবীন ছাত্রদের উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন।"[৯৩]

দিলরুবার প্রথম যাত্রায় বলা হয়, 'আবুল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক দি সিটি প্রেস, ১৬/৩ কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক বি. কে. রায় লেন বংশী বাজার, ঢাকা হইতে প্রকাশিত'। ষষ্ঠ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা থেকে। ভালো নিউজপ্রিন্ট, ডাবল কলাম, সাড়ে ছয় ' × সাড়ে নয় ' সাইজ চুয়ান্ন পৃষ্ঠায় পত্রিকা প্রকাশিত হতো। দ্বিতীয় সংখ্যায় সম্পাদক হিসেবে নাম মুদ্রিত হয় সৈয়দ আলী আশরাফ–এর। যুগ্ম–সম্পাদিকা ঃ বেগম জেরিনা আলিম। প্রথম বর্ষ চতুর্থ, ঈদ ও আজাদী সংখ্যার সম্পাদকমণ্ডলীতে নাম মুদ্রিত হয় অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ; ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন; ডক্টর এস. হেদায়েতুল্লাহ; বেগম সুফিয়া কামাল; অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ প্রমুখের। কর্মসচিব : মজবুল আল হোসায়েন। পরের (১/৫) সংখ্যাতেই এঁদের নাম মুদ্রিত হয়নি। সম্পাদক হিসেবে নাম ছাপা হয় অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন এবং যুগ্ম সম্পাদিকা : বেগম সুফিয়া কামাল–এর। তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যার (মে ১৯৫১) 'আমাদের কথা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয় ঃ " তৃতীয় বর্ষের সূচনায় সম্পাদনা পরিষদ নূতন করিয়া গঠিত হইল। বিদায় লইলেন ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, সম্পাদনা–সচিব জনাব আবুল হোসেন চৌধুরী। যোগদান করিলেন বেগম মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা ও বেগম দৌলতন্নেছা খাতুন —— দিলরুবার মূলে রহিয়াছে নারী সংস্কৃতির উন্নয়নে সম্ভবমত সহায়তা করা। ঠিক ইহাকে মহিলাদের মুখপত্র করিয়া নয় বরং সাধারণের আসরে বিশেষ ও প্রচুর স্থানের সন্নিবেশ করিয়া ... কাগজের দুর্লভ্য দিলরুবার অঙ্গ–সৌষ্ঠব বর্দ্ধনে বেশ ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে।"[৯৪]

ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার হয় কখনো কখনো যে, তিনি শিখা–গোষ্ঠীর সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট, মুক্তবুদ্ধির আন্দোলন–প্রভাবিত বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সাহিত্যিক–সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। পাকিস্তানের সময়সীমার মধ্যে প্রদত্ত বক্তৃতারাজি এবং রচিত প্রবন্ধ ইত্যাদির মধ্যে, বিশেষ করে প্রথমার্ধ ১৯৬০ নাগাদ ইসলামী ভাবধারার মুসলিম প্রধান অঞ্চল পূর্ব বাঙলার বাঙলা সাহিত্যে নতুন ও স্বতন্ত্র জীবন-ভাবনা রূপায়নের পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করলেও তিনি মোটামুটিভাবে বাঙালি-সংস্কৃতি ও অবিভাজ্য বঙ্গসাহিত্যের বুকে কুঠারাঘাত করার বিরোধী ছিলেন। মুক্তবুদ্ধির ধারক যে তিনি--সেকথাও ভুলতে পারেননি একেবারে। সেইজন্যেই হয়তো মতান্তর ঘটেছিল, কিন্তু কলহ বা কাঁদা–ছোঁড়াছুঁড়ি করতে তাঁদের রুচিতে হয়তো বাঁধতো। তাই বিদায় উপলক্ষে তিনি আভাসে বললেও হীনতর অর্থে অভিযোগ করে দিলরুবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। পরের সংখ্যাগুলোতেও তাই মোতাহার- তনয়া সনজিদা খাতুন (পরে ডক্টর) এর রচনা ছাপা হয়েছে। কাজী মোতাহার হোসেন সম্পাদনা পরিষদ থেকে বিদায় উপলক্ষে বলেন :

> "চিন্তার স্বাধীনতা সাহিত্যিক অগ্রগতির একটা প্রধান শর্ত, এই চিন্তা প্রকাশ করবার একটা ক্ষেত্র মাসিকপত্রিকা। এর মারফতে অনেকেই নতুন চিন্তা পরিবেশন করেছেন। অবশ্য চিন্তার ধারা নতুন হলেই তার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ হয়না। তারজন্য বিচার আবশ্যক। এই সাহিত্যিক বিচারের সুযোগ দেবার জন্য আমরা নিজেদের মতের সম্পূর্ণ অনুকূল না-হলেও কোনও কোনও বিষয় প্রকাশ করেছি। তার কারণ দশজনের বিচারে আমাদের পূর্বগঠিত মতামতের পরিবর্তন হওয়া আশ্চর্য নয়। 'বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা' এর একটা দৃষ্টান্ত। এজন্য অধৈর্য না হয়ে বরং যুক্তির আশ্রয় নিয়ে নানা দিক দিয়ে জিনিসটা বুঝতে চেষ্টা করলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। আমরা ভিন্ন মতাবলম্বীদের রচনা প্রকাশ করেছি। আমাদের বিশ্বাস এই হচ্ছে সাময়িক পত্রিকার সাধারণ শিষ্টাচার সম্মত পন্থা।"[৯৫]

নতুন সম্পাদিকার যোগদান উপলক্ষে বেগম মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা বলেন : "সাধারণ সাহিত্যচর্চায় নারী ও পুরুষের কোন তফাৎ নাই; তবুও জননী ও গৃহিনীর গুরু–দায়িত্ব —— নারী কিছুটা পশ্চাৎপদ। দিলরুবার পৃষ্ঠায় নারীর বিশেষ স্থান আছে এবং ঘর ও ঘরণীতে উহা সীমাবদ্ধ নহে। সাহিত্যসেবা এবং বিশেষভাবে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।"[৯৬] তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরূপে নাম ছাপা হয় মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা; দৌলতন্নেসা খাতুন; এস. রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক : এ. এইচ. এম. আদুল কাদের। তৃতীয় বর্ষ পঞ্চম সংখ্যার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পূর্বোক্ত তিনজনের সঙ্গে যুক্ত হন আজহারুল ইসলাম ও আবদুল্লাহ আল মুতী। তৃতীয় বর্ষ দশম সংখ্যায় সম্পাদক হিসেবে কেবল এ. এইচ. এম. আবদুল কাদের এর নাম ছাপা হয়। পরের সংখ্যাতেই আবার সম্পাদনা পরিষদের সদস্য হিসেবে আবু রাফেদ ও দৌলতন্নেসা খাতুন এর নাম যোগ হয়। সাধারণ সম্পাদক, আবদুল কাদের। পরবর্তী (৩/১২) সংখ্যাতেই আবার পূর্বোক্তদের সঙ্গে ফয়েজ আহমদ এর নাম সংযুক্ত হয়। চতুর্থ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় দুই সদস্য বিশিষ্ট সম্পাদনা পরিষদের নাম ঘোষিত হয়। এঁরা হলেন দৌলতন্নেসা খাতুন এবং ফয়েজ আহমদ। 'বিশেষ সহকারী' মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা এবং আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী। রূপসজ্জায় ঃ আমিনুল ইসলাম এবং প্রচ্ছদশিল্পী আনোয়ারুল হক। ৬ষ্ঠ বর্ষের ৫ম সংখ্যায় (ভাদ্র ১৩৬১) সাধারণ সম্পাদক এ. এইচ. এম. আবদুল কাদের এবং ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইজাব উদ্দিন আহমদ। ১৩ বর্ষের সপ্তম সংখ্যায় (কার্তিক ১৩৬৮) 'সহকারী' রূপে নাম ছাপা হয় রাবেয়া চৌধুরী ও মাহমুদ যকীয়ুল্লাহ-র। বিভিন্ন সংখ্যায় বিভিন্ন জনের নাম সম্পাদনা ও প্রকাশনার সঙ্গে সংযুক্ত হলেও মূল নেতৃত্বে কাদের সাহেব ছিলেন বলে পনের বৎসর যাবত দিলরুবা একনাগাড়ে প্রকাশিত হতে পেরেছিল। এবং পত্রিকাটি সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ, রাজনীতি, রাষ্ট্রীয়-ভাবনায় কালিক চাহিদার পরিচয় দিতে চেয়েছিল। পত্রিকার বিষয় ও আঙ্গিক পরিকল্পনায় বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব সৃষ্টির চেষ্টা ছিল। এর লেখক–সূচীতে রয়েছেন অসংখ্য নবীন–প্রবীণ শিশু–মহিলা অখ্যাত –প্রখ্যাত লিখিয়েরা। নামজাদা ইসলামী চিন্তাবিদ, মুসলিম সভ্যতার বিষয়ে রচনার লেখকবৃন্দও রয়েছেন এই তালিকায়। দিলরুবার লেখক–গোষ্ঠীতে রয়েছেন : শাহেদ আবদুর রহিম, অধ্যক্ষ শেখ শরফুদ্দীন, আবুল ফজল, বেগম শামসুন্নাহার (মাহমুদ), ফররুখ আহমদ, কিরণ শংকর সেনগুপ্ত, সৈয়দ আলী আশরাফ, রওশন ইজদানী, আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুর রশীদ খান, রাশীদুল হাসান, সৈয়দ আলী আহসান, আবদুল মওদুদ, অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ, নূরুল মোমেন, ডাঃ এ. কে. এম. আবদুল ওয়াহেদ, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, শাহাদাৎ হোসেন, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ,

Dhaka University Institutional Repository

মুফাখখারুল ইসলাম, অধ্যাপক অমিয় ভূষণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক মোহাম্মদ ওসমান গনি, মনোরমগুহ ঠাকুরতা, মঈনুদ্দীন, ফতেহ লোহানী, মোহিতলাল মজুমদার, খোন্দাকার আবদুল হামিদ, জাহানারা আরজু, খোদেজা খাতুন, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিম, শামসুর রাহমান, অধ্যাপক আবদুল্লাহ ফারুক, মাহবুব জামাল জাহেদী, শাহেদা খানম, এ. কে. এস. নূর মোহাম্মদ বিদ্যাবিনোদ, আকবর হোসেন, জসিমউদ্দীন, মনোজ রায় চৌধুরী, বেগম হাসমত রশীদ, বেগম আজীজা এন. মোহাম্মদ, মুহম্মদ আবু তালিব, আবু রুশদ, ডঃ এম. আবদুল কাদের, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহার, মোহাম্মদ আজরফ, হাবীবুর রহমান, আহসান হাবীব, এ. কে. এম. আতোয়ার রহমান, কাজী আকরম হোসেন, শ্রী মনোমোহন বর্মণ, সৈয়দ আবদুস সুলতান, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মীজানুর রহমান, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আবুজ জোহা নূর আহমদ, এম. ছদরুদ্দীন, শওকত ওসমান, আশরাফ উজজামান, সুফী মোতাহার হোসেন, সিদ্দিক আহমদ খান, সনজীদা খাতুন, আবদুল হাই মাশরেকী, বেগম রোকাইয়া আনওয়ার, শাহেদ আলী, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, খুরশীদ জাবীন, মুযহারুল ইসলাম, সায়েমা চৌধুরী, আজহারুল ইসলাম, আশকার ইবনে শাইখ, গাজীউল হক, রোকেয়া ওপেল খানম, নৃত্যলাল লাহিড়ী, আবদুল্লাহ আল মুতী, ওহীদুল আলম, এস. এম. তরীকুল আলম, আশীষ চক্রবর্তী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, অধ্যাপক মোহাম্মদ ইদরিস আলী, দৌলতন্নেসা খাতুন, সেরাজউদ্দিন আহমদ, আবদুল গাফফার চৌধুরী, নুরুন্নাহার, শ্রীঅর্ধেন্দুদাশগুপ্ত, কর্ণিকা দে, নাজির আহমদ, রণজিৎগুহ, আমিনুল হক, মুরতাজা বশীর, জহিব বিন কুদ্দুস, কে. এম. শমসের আলী, আবু বকর খান, মমতাজুর রহমান, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, বিমলকুমার সেনগুপ্ত, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, নূর আহাম্মদ খাঁ, রিজিয়া খাতুন, ডলি খান, মনিরুজ্জামান খান, মুনীর চৌধুরী, ফয়েজ আহমদ, মাহবুব উল আলম, রেনুকা দত্ত, কাজী আফছার উদ্দিন আহমদ, সরদার জয়েনউদ্দীন, আবু জাফর শামসুদ্দীন, সমর সেন, খুরশীদ খানম, রোকনুজ্জামান খান, মিন্নত আলী, রাবেয়া খাতুন, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, আবদুল মতিন, মোতাসিম বিল্লাহ, শ্রী করুণাময়ী বর্ম্মণ, মোহাম্মদ আজিজুল হক, মোহামদ কায়সুল হক, আহমদ শরীফ, গোলাম রহমান, শ্রী সুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য, সিরাজ খান, আলী আকসাদ, মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, এবনে গোলাম সামাদ, খুরশেদী খানম, আবুল হোসেন, আবদুল কাদির, বেনজীর আহমদ, ইমামুর রশীদ, ফজলে লোহানী, হাসান আজিজুর রহমান, সালেহ আহমদ, সৈয়দ মুস্তাফা হোসেন, হাসান হাফিজুর রহমান, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আতাউল হক, মুজতবা নকীযুল্লাহ, ফজলুল হক সেলবর্ষী, আতাহার আহমদ, অশোক বড়ুয়া, রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী, লুতফুল হায়দার চৌধুরী, সাজেদুল করিম, ওমর আলী,আবদুল ওয়াজেদ খান চৌধুরী, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, মোল্লা এবাদত হোসেন, আবুল ফজল শাহাবুদ্দীন, বন্দে আলী মিয়া; আব্বাসউদ্দীন আহমদ, রমেন্দ্রঘটক চৌধুরী, মোঃ মোখলেছুর রহমান, তবিবর রহমান, চৌধুরী মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান, লুৎফর রহমান, ওয়াজেদ মজনু, শেখ নেছারউদ্দীন আহমদ, প্রতিভা মুৎসুদ্দী, শ্রীদুলাল কৃষ্ণ পাল, নিগার মমতাজ, মহীউদ্দীন, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, তোফায়েল আহমদ, শামসুদ্দীন, আবিদুর রহমান, সিরাজুল হক, রাশিদা খান, মোহাম্মদ নূরুল আবছার, কাজী লতিফা হক, কাজী আবুল হোসেন, মোস্তফা জামাল, চৌধুরী ওসমান, মোহাম্মদ মামুন, আল মাহমুদ, শ্রী নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, লতিফা রশীদ, হেমায়েত হোসেন, আবদুস সাত্তার, নাজমা বেগম, দীল-আফরোজ আহমদ, আল কালাম আবদুল ওহাব, আবদুন নূর, তাহের আহমদ মজুমদার, শ্রী সুধাংশু শেখর বৈশ্য, আকবর উদ্দীন, আমিনা মাহমুদ, আবু সুফিয়ান, কাদের নওয়াজ, কামাল বিন মাহতাব, গজনফর আলী, কাজী আবুল বাশার, গোলাম সাকলায়েন, খোন্দকার মাসুদার রাহমান, কাজী লতিফা হক, বেগম জেবু আহমদ, সুরাইয়া বেগম, রেবেকা সুলতানা, মমতাজ হাসান, আনোয়ারা খাতুন, হাসিনা মাহমুদ, মাফরুহা চৌধুরী, সাহেরা আহমদ, রিজিয়া সুলতানা, বদরুন্নেসা আবদুল্লাহ, বেগম রওশন আরা, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুলতানা রাজিয়া; জোবেদা খানম; লায়লা আর্জুমান্দ বানু, লতিফা রশীদ, আনিসুল ইসলাম, কিরণ শংকর মৈত্র; মতিনউদ্দীন আহমদ, কামাল বিন মাহতাব, শামসুল হক দেওয়ান, অনিল বড়ুয়া, মোহাম্মদ ইসমাইল, মওলানা আমিনুল ইসলাম, আবু বকর সিদ্দিক, বেগম রাজিয়া মাহবুব, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, জাহাঙ্গীর শাহনেওয়াজ, মনিরুজ্জামান, মাহমুদ যকীযুল্লাহ, হাসান গোফরান, মীর আবুল খায়ের, আল- ফারুক, মনোয়ারা বেগম, আলমগীর জলীল, আবদুল করিম, আনোয়ার পাশা, খগেন্দ্র নাথ দাস, রহিমা আখতার বানু, দিলওয়ার প্রমুখ।[৯৭]

উপর্যুক্ত তালিকা থেকে দেখা যায় পূর্ব বাঙলার প্রধান লেখকেরা মাহেনও-র মতো এতেও রচনা প্রকাশের জন্য এসেছেন। পঞ্চাশ ও ষাট দশকের নতুন প্রধান লেখক-গোষ্ঠীর অনেক সদস্য- শামসুর রাহমান, আহমদ শরীফ, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, হাসান হাফিজুর রহমান, আল মাহমুদ, আবু হেনা মোস্তফা কামাল প্রমুখ দিলরুবায় আধুনিক-সাহিত্য চর্চা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, আধুনিক শিল্পকলা ও কথাসাহিত্য-সাধনার বিচারে দিলরুবার ভূমিকা গৌন নয়। জ্যৈষ্ঠমাসের দ্বিতীয় (প্রথম বর্ষের ১৩৫৬) সংখ্যাতে কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য, সাহিত্য-চিন্তা ও শিল্পের উৎকর্ষ-অপকর্ষের আলোচনায় দিলরুবার লেখকেরা এদেশে নজরুল চর্চার ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা সংযোগ করেছিলেন। কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর নিকট লিখিত 'নজরুলের পত্রাবলী' সংকলিত করেছিলেন — যা বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল এবং পূর্ব বাঙলার পত্র-পত্রিকায় নজরুলের অপ্রকাশিত পত্র-মুদ্রণ এর প্রয়াস দিলরুবাই প্রথম গ্রহণ করেছিল।[৯৮] কাজী মোতাহার হোসেন 'নজরুলের জীবন ও কাব্য' সম্পর্কেও দিলরুবাতে আলোচনা করেন। ১৯৪৯ সনের জুন মাসের আগে এদেশ থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় নজরুল-চর্চা তখনও ব্যাপকভাবে দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে দিলরুবার এই নজরুল সংখ্যাটি (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, ১/২) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজী মোতাহার হোসেন ব্যতীত এই সংখ্যায় লিখেছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল (কবিতা — তুমি সকলের পরমাত্মীয়); শাহাদাৎ হোসেন (স্মৃতি— পুরানো কথা); সৈয়দ আলী আহসান (প্রবন্ধ— নজরুল ইসলাম, এটি তাঁর অপ্রকাশিত বইয়ের পাণ্ডুলিপি থেকে, ভূমিকাংশ; তিনি একালের অপরাপর পত্রিকাতেও নজরুল সম্পর্কে যা লিখেছেন, তাও তাঁর এই অপ্রকাশিত বইয়ের পাণ্ডুলিপি, পাদটীকায় সেতথ্য উল্লেখ করে ছাপা হয়েছে; —দেখা যাবে); আনম বজলুর রশীদ (কবিতা — বিদ্রোহী নজরুল); কিরণশংকর সেনগুপ্ত (প্রবন্ধ — নবযৌবনের কবি নজরুল); মুফাখ্‌খারুল ইসলাম (কবিতা — আবির্ভাব); অধ্যাপক অমিয়ভূষন চক্রবর্তী (প্রবন্ধ - আমার প্রণাম); অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ (প্রবন্ধ — নজরুলের সর্বশেষ কাব্য); আশরাফ সিদ্দিকী (কবিতা — কাজী নজরুল ইসলাম); অধ্যাপক মোহাম্মদ ওসমান গনি (প্রবন্ধ — বিপ্লবী কবি নজরুল); মনোরম গুহ ঠাকুরতা (প্রবন্ধ — নজরুল স্মৃতি); মঈনুদ্দীন (প্রবন্ধ — নজরুল প্রসঙ্গে); রওশন ইজদানী (কবিতা — বিদ্রোহী কবি নজরুল); ফতেহ লোহানী (প্রবন্ধ — গীতিকার নজরুল); মোহিতলাল মজুমদার

Dhaka University Institutional Repository

(প্রবন্ধ — নজরুল কাব্যের প্রাথমিক বিচার — পুনর্মুদ্রণ/সংকলন); খোন্দকার আবদুল হামীদ (প্রবন্ধ — নজরুল ইসলাম); জাহানারা আরজু (কবিতা — জেগে ওঠ তুমি কবি); খোদেজা খাতুন (প্রবন্ধ — নজরুল কাব্যে নারী); এস. এম. আবদুল জলিল (কবিতা — কথা কও কবি); নাজীর আহমদ (প্রবন্ধ — বাংলা সঙ্গীতে রবীন্দ্র ও নজরুল-যুগ); রাশিদুল হাসান (প্রবন্ধ — হাস্যরসিক নজরুল); আবুল ফজল (প্রবন্ধ— নাট্যকার নজরুল) প্রভৃতি। প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে নজরুল জন্মজয়ন্তীতে দিলরুবা বিশেষ আয়োজন করেছে। তাছাড়া মাঝে মধ্যে নজরুল- আলোচনা এবং সম্পাদকীয়তে নজরুলের বিষয়ে নানান গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রচার করা হয়েছে। নওবাহারে নজরুল সম্পর্কে প্রকাশিত গোলাম মোস্তফার প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্যকে দিলরুবা প্রতিরোধ করেছে। সব মিলিয়ে দিলরুবা নজরুল চর্চায় বিশেষ অবদান রাখে। রবীন্দ্রনাথের ওপর লিখিত কিছু প্রবন্ধও দিলরুবা প্রকাশ করেছে। ধারাবাহিকভাবে শ্রী নরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 'দরদী রবীন্দ্রনাথ' ৬ষ্ঠ বর্ষের ৬, ৭, ৮ প্রভৃতি সংখ্যায় ছাপা হয়েছে — যাতে পূর্ববঙ্গের স্মৃতিময় স্থান শাহ্জাদপুর সম্পর্কে অনেক কথা রয়েছে। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান 'ক্ষণিকা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ' (১৩/১) শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রফেসর আহমদ শরীফ লিখেছিলেন (৩/১১) 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প'।

দ্বিতীয় বর্ষ ১০ম মাঘ ১৩৫৭ সংখ্যা বিশেষ চিত্রকলা প্রদর্শনীর ওপর প্রকাশ করে দিলরুবা সুধীজনের অশেষ প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এ সংখ্যায় আবদুল্লাহ আলমুতী আলাউদ্দীন আলআজাদ, অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী এবং অজিতকুমার গুহ 'ঢাকা গ্রুপ চিত্র প্রদর্শনী'র সমালোচনা কিংবা পরিচয়মূলক যে চারটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন তা পূর্ববাঙলার পাঠকদের শিল্প-রস-পিপাসা নিবৃত্তিতে সহায়তা করেছিল। ১৯৫২ সনের ১১ মার্চ ঢাকা আর্ট গ্রুপের সৌজন্যে ঢাকা যাদুঘরে এদেশের শিল্পীদের যে চিত্র প্রদর্শনী হয় তার ওপরও বিশেষ আয়োজন করে দিলরুবা। তৃতীয় বর্ষের একাদশ সংখ্যায় (মাঘ ১৩৫৮) আশরাফ সিদ্দিকী 'চিত্র প্রদর্শনীর' বিস্তারিত পরিচয়মূলক সমালোচনা লেখেন এবং প্রদর্শিত ছবির প্রতিচিত্র সংকলন করে দিলরুবা পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিল। ছায়া- ছবির জগতের খবরা-খবর ছবি ও ছবির সমালোচনা এবং জাতিগঠনে ছায়া- ছবির ভূমিকা বিষয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও নিবন্ধ প্রকাশ করে দিক-নির্দেশ দানের প্রয়াস গ্রহণ করেছিল দিলরুবা। পরিচ্ছন্ন রুচির সিনেমা নির্মাণে সামাজিক দায়িত্ব পালনের পথে চিত্রজগতের কর্তাব্যক্তিদের মনোযোগ বা দৃষ্টি আকর্ষণে প্রবন্ধ বা আলোচনাগুলোর প্রভাব পড়েছে নিঃসন্দেহে। অন্তত এটা বলা চলে যে দর্শকদের মধ্যে ভালো ছবির প্রতি শ্রদ্ধা বোধ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন পত্রিকার আলোচকেরা। কিন্তু আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রে দেশে অপসংস্কৃতির জোয়ার সৃষ্টির জন্য হলিউড-বোম্বের সংস্কৃতি আমদানীর যে প্রচেষ্টা তখন সরকারীভাবে গৃহীত হয়েছিল, সেই জোয়ারের মুখে এইসব আলোচনা সত্যি কোন প্রাণ পেতে পারেনি, কিন্তু শুভ উদ্যোগ আর আন্তরিক চেষ্টার মূল্য না দিয়ে পারা যায় না। শিশুদের জন্য 'সবুজ সংঘ' এবং মহিলাদের জন্য 'মহিলা মহল' খুলে দিলরুবা দ্বিতীয় বর্ষ থেকেই কার্যক্রম বহুমুখী করে তোলে।[৯৯] অষ্টম বর্ষের ৭ম-৮ম (যুগ্ম) 'মহিলা' এবং দ্বাদশ শিশু-সংখ্যা (চৈত্র ১৩৬৩) অত্যন্ত মূল্যবান। দিলরুবার আজাদী সংখ্যা; পাকিস্তান দিবস সংখ্যা ও ঈদ সংখ্যাগুলোও বিশেষ আদরের বিবেচিত হতো। চতুর্থ বর্ষের চতুর্থ (শ্রাবণ ১৩৫৯), বিপুলায়তন (২০০ পৃষ্ঠার) বিশেষ সংখ্যাটি এগুলোর মধ্যে অন্যতম। আবদুল গাফফার চৌধুরীর 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান' শীর্ষক পূর্ণাঙ্গ প্রখ্যাত উপন্যাসটি এ-সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়। দৌলতন্নেসা খাতুনের 'পথের পরশ' শীর্ষক সম্পূর্ণ উপন্যাস, সৈয়দ আলী আহসানের 'চাহার দরবেশ' এবং আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের 'ইউসুফ-জুলেখা', 'আলাওল' এবং অন্যান্য প্রমুখের মধ্যযুগীয় কবি ও সাহিত্যের উপর লিখিত আলোচনাসমূহ দিলরুবাতেই প্রকাশিত হয়। আহমদ শরীফ (পরে ডক্টর) ইসলামী বিষয় নিয়ে দিলরুবাতে লিখলেও মানবতাবাদী দৃষ্টিতে ইসলামে নারীর অবস্থান বা মর্যাদার বিষয়ে লিখে সমাজের নারী-বিদ্বেষী মনোভাব (এক শ্রেণীর প্রচারক সাধারণত ধর্মের নামে নারীকে পাপের আকর হিসেবে গণ্য করে পর্দার অন্তরালে, গৃহে অন্তরীণ রাখার এবং সর্বদা পরিহার করে চলার উপদেশ দিয়ে নারী যেন মানুষ নয়, কেবলই নারী— এমন ধারণা সমাজে সৃষ্টি করাতেই নারীর অধিকার ও মর্যাদার আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়া উচিত) দূরীকরণের প্রয়াস পেয়েছেন। এ পত্রিকার মহিলা লেখকেরাও নারীর অধিকার বিষয়ে উপর্যুপরি বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামের পর্দাপ্রথার আলোচনা-সমালোচনা এবং খাঁটি ইসলামের অনুসন্ধান-প্রচেষ্টার দ্বারা সমাজ অন্ধ-কুসংস্কার থেকে মুক্তির দিশা কিছু না কিছু পেয়েছিল বলতেই হয়। আহমদ শরীফ লিখেছেন ঃ "হজরত মুহম্মদ ব্যক্তিগত জীবনে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি বলতেন ফুল, সুগন্ধ ও নারী আল্লাহর শ্রেষ্ঠ দান। ..... আগেকার ধারণায় পুরুষের দৈহিক ভোগের প্রয়োজনেই ঘরে ঘরে নারী লালিত ও পালিত হতো — এখন দেহ গৌণ ; মন মুখ্য ; এখন আগে প্রেম, পরে কাম।.... (তবে) Chastity ও Morality সম্বন্ধে ব্যক্তির ও সমাজের ধারণা পরিবর্তিত না হলে পুরুষের পক্ষে নারীর সমাধিকার স্বীকার করা আজো কার্যত সম্ভব হবে না।"[১০০]

ভাষা-বিতর্কে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেই বোঝা যায় বাঙলা ভাষার স্বাভাবিক বিকাশেই 'দিলরুবা' আস্থাশীল ছিল। এর বিকৃতি -সাধনের প্রয়াসে এঁদের সমর্থন ছিল না। ১৯৫২ সনের মাঘ ১৩৫৮ সংখ্যায়, ... গুলি চালনার পরে দিলরুবা লিখেছিল ..... "..... শুরু হইল রাষ্ট্রভাষা- আন্দোলন, সে-আন্দোলনের পুরোভাগে রহিয়াছে চির-উদ্যমশীল ছাত্রদল—কিন্তু তাহাদের পেছনে রহিয়াছে পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রেরণা—গ্রাম্য জনসাধারণ করাচীর শিরীন-উর্দু বুলির সম্মোহনে মাতৃভাষার কথা ভুলিতে পারেনা। কাজেই তাহাদের সন্তানরাই করিতেছে বাংলার দাবী।"[১০১] ১৩৬৮ সনের (১৯৬২, মার্চ) সংখ্যায় বাংলা ভাষা ও একুশে ফেব্রুয়ারী সম্পর্কে সম্পাদক 'আমাদের কথা'য় বলেন শহীদদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দান করা উচিত। "বাংলা ভাষার ইতিহাসে ২১শে ফেব্রুয়ারী একটি স্মরণীয় দিন।..... কিন্তু সংগ্রামের এই গৌরবময় দিনটিকে সরকার এতদিন ইহার স্বাভাবিক মর্যাদা দান করেন নাই। ...... দশ বৎসর পর আজ তাহা সার্থকরূপ লাভ করিয়াছে। এবং ইতিহাসের এমনই পরিহাস যে— সে স্বীকৃতি দান করিলেন স্বয়ং সামরিক সরকার। জনমতের স্বীকৃতিদান কোনও শাসক গোষ্ঠীর দুর্বলতার পরিচায়ক নহে—বরং জনমতকে শ্রদ্ধা করিয়া চলাই প্রকৃষ্ট রাজনীতি।........ আশা করি ২১শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর লেঃ জেনারেল আজম খানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় দফতরে উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করিবে এবং ইহা একটি রাষ্ট্রীয় উৎসব দিবস বলিয়া পরিগণিত হইবে।.... যে সরকার শহীদদের স্মৃতিফলক (শহীদ মিনার) নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে, সে সরকার যথার্থভাবেই শহীদানের ওয়ারীশানদের জন্য পেনশন নির্দিষ্ট করিতে পারেন।... সর্বশেষে আমরা সরকারকে বাংলা সাহিত্য পত্রিকাগুলির উৎকর্ষ সাধনে অগ্রণী

হইতে অনুরোধ করিব।.... সরকারী সাহিত্য পত্রিকাগুলির লোকসানের টাকা সরকারী তহবিল হইতে ... পূর্ণ করা হয়.... সেমতে সরকার পত্রপত্রিকা নির্বিশেষে সকল প্রকাশিত সাহিত্য-পত্রিকাকেই স্কুল-কলেজ এবং সাধারণ পাঠাগারগুলির তালিকাভুক্ত করিবেন। ইহাতে দেশের সাধারণ সাহিত্যের চর্চা বৃদ্ধি পাইবে। পাঠক সমাজ বাড়িয়া উঠিবে এবং বাংলা সাহিত্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করিবে।"[১০২]

পূর্ব বাঙলার প্রগতিশীল সংস্কৃতি-সম্মেলনগুলোর প্রতি দিলরুবা শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করেছে। মাহেনও-র মতো নিশ্চুপ থেকে যেতে চায়নি। মোহাম্মদীর মতো আক্রমণও করেনি। বরং আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখের বক্তৃতার পূর্ণবিবরণ প্রকাশ করে এবং বিভিন্নভাবে সাংস্কৃতিক-জীবনে উজ্জীবনের নানা প্রয়াস পেয়েছে দিলরুবা। একটি সম্পাদকীয়তে সাংস্কৃতিক-দৃষ্টিভঙ্গী কিভাবে ধরা দিয়েছে দেখা যাক :

"সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা আমরা পাকিস্তান জন্ম লইবার সঙ্গে সঙ্গেই পাইয়াছি। এই আমাদের ধারণা। কিন্তু সংস্কৃতির কোনো সংজ্ঞা এখনও নিরূপিত হয় নাই। উর্দু ও বাংলার বোঝাপড়া, আরবী হরফে বাংলা লেখার বচসা এখনও শেষ হয় নাই। যে রাষ্ট্রে একাধিক ভাষা বর্তমান এবং যে রাষ্ট্রের ভৌগলিক পরিবেশ বিভিন্ন, সেখানকার সংস্কৃতি এক হইতে পারেনা। সুতরাং এক বিশেষ ছাঁচে সব কয়টী প্রদেশকে ঢালাই করিতে চাওয়া অর্থই সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা খর্ব করা। আমরা চাই ইসলামী সংস্কৃতির মাধ্যমে পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হউক। যতদিন আমরা এই সকল দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া নিজেদেরকে স্বাধীন মনে না করিতে পারিব ততদিন আমরা শুধু পাকিস্তানী হইবার গৌরবই করিয়া যাইব। সংস্কৃতি ও ভাষা এক নয়, ভাষা ও সাহিত্যও এক নয়। সুতরাং কাহারও ব্যক্তিগত সংস্কৃতি বা প্রাদেশিক সংস্কৃতিতে হস্তক্ষেপ করাও আজাদীর বরখেলাপ। পাকিস্তানে চাই আমরা এমন আজাদী যাহাতে এই সব ধরণের নিরাপত্তা বজায় থাকিবে। আমরা তখন বুক ফুলাইয়া বলিব, আজাদ পাকিস্তান জিন্দাবাদ।"[১০৩]

সমাজের প্রতিটি ব্যাপারেই দিলরুবা স্পষ্ট মতামত প্রদান করেছিল বলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয়-ভাবনার দিক থেকে ইতিহাসে এ পত্রিকা বিশেষ মূল্য পেয়ে থাকবে। শিক্ষা-ব্যবস্থার অধপতন রোধ করার জন্য শিক্ষকদের প্রতি প্রকৃত শিক্ষকতার আদর্শ অনুসরণের এবং সরকারকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করেছে। 'প্রাইভেট টিউশনি' বর্তমানে আমাদের প্রধান সামাজিক-ব্যাধি। কিন্তু ১৯৪৯-৫০ এর দিকেই এই ব্যবস্থা অবক্ষয়ের শেষ পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। দিলরুবা প্রাইভেট টিউশনি, খাতা দেখে পয়সার ধান্দা করা, তা নিয়ে দুর্নীতিতে লিপ্ত হওয়া, টেকস্ট বই ছেপে, পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্তির কূটিল রাজনীতি দ্বারা সমাজ শিক্ষা সংস্কৃতি নৈতিকতা প্রভৃতির ধ্বংসসাধনের প্রয়াসকে দিলরুবা নানাভাবে সমালোচনা বা নিন্দা করেছে।[১০৪] এ থেকে তাঁদের নিঃসঙ্কোচ নিরাপোষ মনোভাব ধরা পড়ে, এবং পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। সমাজভাবনায় কাতর 'দিলরুবা' লিখেছে, পাকিস্তানের ৪ বৎসর বয়স হলো। কিন্তু স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্যায়ণ জাতি করতে পারলোনা। রাজনৈতিক পাকিস্তানের 'সত্তা অনুভব' করলেও কায়ীক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক- সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি কতোটা হয়েছে সে প্রশ্নই বড়। .... "স্বাধীনতা শব্দের অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা নহে বরং নিরাপত্তা— কায়ীক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক। জাতি ও ব্যক্তি প্রত্যেকের বেলায়ই ইহা প্রযোজ্য। জাতিগত ব্যাপারে পাকিস্তান এই তিনটী বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কতটুকু কৃতকার্য্য হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে বাজেটে দেশরক্ষা বরাদ্দ প্রত্যেক বারই প্রাধান্য পাইয়াছে। জল, স্থল ও হাওয়ায় পাকশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা সেজন্য মাননীয় দেশরক্ষা-সচীবকে মোবারকবাদ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু পরক্ষণেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দেশরক্ষা ব্যবস্থা ও সরঞ্জাম একরূপ নহে। পূর্ব পাকিস্তানে জনবল থাকিলেও তেমন কোনও অস্ত্র ও বারুদের কারখানা এখানে নাই। আর যদি পাকিস্তানের একটী অংগ—তথা পূর্ব পাকিস্তান বিকলই রহিল তবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ব্যাঘাত হইতে বাধ্য। এদিক দিয়া আমরা পূর্বপাক-প্রধানমন্ত্রী ও পাক দেশরক্ষা-সচিবকে আরও সক্রীয় হইতে অনুরোধ করি। দুর্যোগে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে রসদ আনাইয়া পূবপাক রক্ষা করা কঠিন হইবে একথা কি তাহারা জানেন না? যদি জানেন তবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক সম্পদ কেন সমপর্যায়ে বর্দ্ধিত করেন নাই? পাকিস্তানের এই দুইটি অংগের ব্যবধানের দিকে চাহিয়া আত্মরক্ষার জন্য ইহাদেরকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করিয়া তোলা তো রাষ্ট্র নেতাদের ফরজ কাজ। এ কর্তব্যে নীতিগত ঘোষণায় তাঁহারা আমাদের সহিত একমত হইলেও তাঁহাদের মন্থর-গতি আমাদিগকে উতলা করিয়া তুলিয়াছে। এই তো গেলো বাহ্যিক নিরাপত্তা। তারপর আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা। ওদিক দিয়াও পাকিস্তান লাভের পর আমাদের বিশেষ কিছু উন্নতি হয় নাই।... বন্দুকের আওয়াজ করিলে চোরের হাত হইতে.... পাল্টা আওয়াজ শুনিতে হইয়াছে...... দুর্নীতির জন্য আজ পুলিশ, আইন আদালত বা সিভিল সাপ্লাইকে শুধু দোষী করিলে চলিবে না। আমাদিগকে আজ জাতীয় দুর্নীতি পাইয়া বসিয়াছে। .... দেশের এমন কোন বিভাগ নাই যেখানে অল্পবিস্তর দুর্নীতি প্রবেশ না করিয়াছে। জাতির মানসিকতা এত বিকৃত হইয়াছে যে পয়সা (ঘুষ) ছাড়া কোন কাজ হয় এ ধারণাও আমাদের মন হইতে উঠিয়া গিয়াছে .... পয়সা কড়ির লেনদেন ছাড়াও দুর্নীতির একসভ্য সংস্করণ আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। কর্মচারীদিগকে ভেট বা পুষ্পমাল্য বা পার্টি দিয়া দাতা তাহাদের সহিত যে প্রীতি স্থাপন করেন ... (তাহাও) দুর্নীতির সংজ্ঞাভুক্ত করিতে অনুরোধ করিতেছি (পাকিস্তান দিবসে); অন্যথায় আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে বাধ্য। পদস্থ সরকারী কর্মচারীগণও যেন নিজেদেরকে এসকল অযাচিত প্রভাব হইতে মুক্ত রাখেন।"[১০৫]

'লীগ রাজনীতি' শিরোনামে সম্পাদকীয় লিখে ১৯৫২ সনের জানয়ারী মাসে ভাষা-আন্দোলনের পূর্বক্ষণে এই পত্রিকা লিখেছিল : "প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে মুসলিম লীগের জন্ম। কায়েদে আজমের নেতৃত্বে লীগ পাকিস্তানের বুনিয়াদ পত্তন করিয়া ইহার গন্তব্যে উপনীত হইয়াছে। এই সাফল্যের পর লীগের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এ প্রশ্ন একাধিকবার উঠিয়াছে. রাষ্ট্রশাসন-ব্যাপারে দলাদলি থাকিবেই। সুতরাং একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে পাকিস্তানের নির্বাচন ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় লীগের মর্যাদা ব্যাহত হইবে— একথা উঠিলে পাকিস্তানের বুনিয়াদ এখনও কাঁচা সুতরাং লীগের এখনও প্রয়োজন আছে,— এই যুক্তিই প্রাধান্য পাইল। কিন্তু লীগের সংগঠন যতই আগাইতে আরম্ভ করিয়াছে ততই দলাদলি বাড়িয়া চলিয়াছে..... পাকিস্তানের সকল প্রদেশেই নির্বাচন অনেক দিন আগেই ফরজ হইয়া গিয়াছে। তবু নির্বাচন দিবার ইচ্ছা সরকারের এতদিন হয় নাই কেন? নির্বাচনে লীগ অর্থাৎ সরকারী দল যাহাতে পরাজিত না হইয়া যায় সেইরূপ পরিবেশ করিলে তারপর নির্বাচনের প্রশ্ন উঠিবে...... আর যদি কাহারও কথা বন্ধ করিতে চান তবে ১৪৪ ধারা দিয়া মুখ বন্ধ করিতে প্রয়াস পান ; কিন্তু এই ১৪৪ ধারার নীতি বা বিরোধী দলকে নিশ্চিহ্ন করার নীতি মোটেই গণতন্ত্রী আদর্শের সহায়ক নহে।"[১০৬]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫২ সনের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন (আইসেন হাওয়ার নির্বাচিত হন) প্রসঙ্গে দিলরুবা পাকিস্তানের নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রখর মন্তব্য উপস্থিত করেন ; "আমাদের নেতৃবর্গ কেন এসম্বন্ধে সজাগ নহেন তাহা ভাবিয়া পাওয়া মুস্কিল। স্বাধীনতার আজ পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হইল কিন্তু এখনও পর্যন্ত নির্বাচনের কোন সাড়া নাই। শাসনতন্ত্রের রূপ এখনও প্রকাশ পাইল না।"[১০৭]

৫. নওবাহার (ভাদ্র ১৩৫৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯-- বৈশাখ ১৩৬০ এপ্রিল ১৯৫৩)

'তারানা-ই-পাকিস্তান' (১৯৪৮) প্রণেতা কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭- ১৯৬৪) তদীয় স্ত্রী মাহফুজা খাতুনের সম্পাদকত্বে নওবাহার প্রকাশ করেছিলেন পাকিস্তানের জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি ও সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয়- আদর্শের বাস্তব প্রতিফলন ঘটাবার উদ্দেশ্য। বিজাতীয় আদর্শের প্রভাব বিমোচন, বিদূরণ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ তথা হিন্দুয়ানীর নিন্দা ও প্রতিবাদ - প্রতিরোধ— আর রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক আচার- আচরণের সমালোচনার দ্বারা মুসলিম-জাতি গঠন তথা পাকিস্তানী আদর্শের উজ্জীবন-প্রচেষ্টায় গোলাম মোস্তফা 'নওবাহার'কে উৎসর্গ করেছিলেন এবং প্রায় চার বৎসর তা চালু রাখতে পেরেছিলেন। এই মাসিক পত্রিকা প্রকারান্তরে গোলাম মোস্তফার ব্যক্তিগত মতপথ রুচি-অভিরুচিরই একান্ত দর্পন। হিন্দু-বিদ্বেষ এবং পাকিস্তানের জাতীয় কবি হিসেবে নজরুল ইসলামের সাহিত্যের ত্রুটি-নির্দেশ, আর যাঁরাই গোলাম মোস্তফার স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন(?) তাঁদেরই কুৎসা রটনায় নওবাহার তৎপর ছিল। তবে প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানী তাহজিব-তমদ্দুনকে অস্বীকার করেনি বা নগ্নভাবে প্রচারও করেনি এমন অনেক গল্প-কবিতা-উপন্যাস ও সাধারণ রচনা এতে প্রকাশিত হয়েছে। এবং সেগুলোর অনেকাংশ বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ীত্ব লাভ করেছে। এ-কারণে নওবাহার-এর কিছু সদর্থক ভূমিকা ও মর্যাদা স্বীকার করতেই হবে। তা ছাড়া আর যতোরকমের বক্তব্য আছে — তা খুবই প্রতিক্রিয়াশীল আর পশ্চাৎঅভিমুখী। তৎকালীন পূর্ববাঙলার সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিতর্কের স্বরূপ জানার জন্য এগুলোর আলোচনা বা পুনর্পাঠের কিছু আবশ্যকতাও রয়েছে। সে যাই হোক, গোলাম মোস্তফার কারণেই 'নওবাহার' প্রথম শ্রেণীর লেখকদের কিছু ভাল রচনাও পেয়েছিল; এবং এতে সমাজ রাজনীতি সংস্কৃতি শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে যে সমস্ত রচনা প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে বলিষ্ঠ ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছে সমাজের হোমরা চোমরাদের। ফলে পত্রিকার পাঠক ও প্রচার বেশ জুটেছিল। দৈনিক আজাদ ও মৌলানা আকরম খাঁ-গ্রুপের বিরুদ্ধে যেরকম খোলামেলা কুৎসা রটনা করা হয়েছে — তা তখন এবং এখনও বেশ আগ্রহ ও কৌতুকের উদ্রেক করে। অগত্যা এবং ঐ ধরনের পত্রিকার তরুণ লেখকেরা কবি মোস্তফাকে 'গোলমাল মোস্তফা' বলে ক্ষেপাতেন। রাগে, অপমানে ক্ষোভে এঁদের তিনি 'চাবুক মারার' পরামর্শ দিয়েছিলেন। আধুনিক সাহিত্যের বিশেষ করে কাজী নজরুলের মুসলমানীকরণের যে প্রয়াস গোলাম মোস্তফা গ্রহণ করেছিলেন-- এবং নজরুলের পরিবর্তে তাঁরই যে জাতীয় কবি হবার যোগ্যতা রয়েছে — এইরূপ আত্মপ্রচারে তিনি এমনই নির্লজ্জ হয়ে পড়েছিলেন যে, তখনই তা সকলের প্রচণ্ড হাসির খোরাক জুগিয়েছিল। নজরুল-বিদ্বেষ ও নজরুল-বিরোধীতার কারণে, আর নজরুলের কাব্য-সাহিত্যের হিন্দুয়ানী অংশ বর্জনের এবং মুসলমানীকরণের সেই বিতর্কের ইতিহাসের জন্য এখনও 'নওবাহার' বিশেষ আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমেই চলে আসে। এই পত্রিকার সার্বিক পরিচয় তাই ইতিহাসে মূল্যবান বিবেচিত হবে।

নওবাহার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ১৩৫৬ সনের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, সম্পাদক হিসেবে নাম প্রকাশ পেতো মাহফুজা খাতুন-এর। 'পরিচালনায় কবি গোলাম মোস্তফা'। ভাদ্র মাস হতে বর্ষ শুরু হয়ে প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে বের হবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পূর্ব বাংলার খুব কম পত্রিকাই নিয়মিত যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছে। বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ছয় টাকা বারো আনা। প্রতি সংখ্যা আট আনা। নওবাহার মুসলিম বেঙ্গল প্রেস, ৪৬ নং জিন্দাবাহার ফার্স্ট লেন থেকে এম. আবদুর রশিদ দ্বারা মুদ্রিত এবং ৯৫ ইসলামপুর রোড, ঢাকা ১ থেকে মহিউদ্দীন আহমদ কর্তৃক প্রকাশিত হতো। চৈত্র ১৩৫৬ থেকে মোহাম্মদ ইসরাইল হোসেন কর্তৃক মুদ্রিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা (পৌষ ১৩৫৭) থেকে মহিউদ্দীন আহমদ এর নাম পরিবর্তিত হয়ে প্রকাশক হিসেবে ছাপা হয় সৈয়দ মুজিবুল হক-এর নাম। তৃতীয় বর্ষ ৬ষ্ঠ -৭ম সংখ্যা থেকে ইসরাইল হোসেন কর্তৃক একাধারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় নওবাহার নিজের সম্পর্কে সম্পাদকীয়তে লেখে : "নওবাহারের প্রকাশ ... আমাদের জীবনে আনে কল্যাণ। এক হাতে সে ভাঙে, আর এক হাতে গড়ে। এই ভাঙা-গড়ার মধ্যেই তো জীবন। নওবাহার আসে তরুণের বেশে। প্রাণের প্রাচুর্যে সে শক্তিমান। পুরাতন কে সে ভয় করেনা। কারো সাথেই তার দ্বন্দ্ব নেই। যে সর্বজয়ী, তার মনে কোন ... কারও প্রতিই বিরাগ থাকেনা। পুরাতনকে কেন সে স্বতন্ত্র মনে করিবে? পুরাতন ও নতুনের মধ্যে সে তাই কোন সীমা রেখা টানেনা। যে তরুণ বৃদ্ধকেও তার যাদুস্পর্শে তরুণ করিয়া না লইতে পারে, সে আবার কিসের তরুণ?' সম্পাদক তাঁদের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে বলেন : "নওবাহারের পশ্চাতে আছে একটা বিশেষ লক্ষ্য ও আদর্শের প্রেরণা। আমরা দিতে চাই একটা cultural drive, গড়িতে চাই একটা আদর্শ তমুদ্দনিক পাকিস্তান। আমাদের কাব্যে ও সাহিত্যে যদি পাকিস্তান না আসে তবে বৃথাই হইবে এই বাহিরের আয়োজন। —— আমরা চাই এমন একদল কবি সাহিত্যিককে যারা এই বন্ধুর পথ দিয়া অগ্রসর হইবেন। সাহিত্য ও সাহিত্যিক দুই-ই আমরা গড়িতে চাই। নওবাহারের ইহাই প্রধান লক্ষ্য।" কিন্তু নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইতেছে : 'আমাদের কবি সাহিত্যিকদের একটি অংশ এখনও বিভ্রান্ত হইয়া বিপথে ঘুরিতেছেন।"

এই সংখ্যায় কবি প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক ডঃ মুযহারুল ইসলাম লেখেন, "ঢাকার সব ভালো মাসিকেই লিখছি : তবু নওবাহারকেই বেশী ভাল লাগে। কেননা যে পথ আমরা খুঁজছি সে পথের নির্দেশ নওবাহার বেশী করে দিচ্ছে। সেটি দেশের ও সমাজের খাঁটি ইসলামী রূপ। আমরা Progress এ বিশ্বাস করি ততটুকু --যতটুকু ইসলাম সমর্থন করে। ইসলাম সর্বদাই Progressive -- চির নতুন।" যারা ইসলামী ভাবধারায়

Dhaka University Institutional Repository

চলেনা,—যৌনতা, নোংরামী এবং কমিউনিজমের ধ্যান-ধারনা প্রকাশ করে, এবং মান্যগণ্য প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মুখোশ উন্মোচন করে দেয়, মানহানি ঘটায়— বিশেষত অগত্যা- সীমান্ত প্রভৃতি পত্রিকা,— তাদের কার্যক্রমের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গভীর ক্ষোভ ও দুঃখ-ভারাক্রান্ত কণ্ঠে আবেগাতিশয্যে সম্পাদকীয় লিখে বলা হয় ঃ "অচিরে এই দুর্নীতি বন্ধ করুন। শুধু কাগজ বন্ধ করিয়া দেওয়াই এহেন অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি নয়। —– চাবুক মারা উচিত।"১০৮

নওবাহারের চার বছরের সকল সংখ্যা নিয়মিত প্রকাশিত হয়নি। কোনও-কোনওটা যুগ্ম-সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়ে ধারা বজায় রেখেছে। কাগজে মোটামুটি ভালো ছাপা গেট আপ ইত্যাদি ছিল। কিন্তু ধরলেই বোঝা যেত এটা কোনো আত্মগর্বী স্বাতন্ত্র্যঅভিলাষী মাষ্টার সাহেবের বৈঠকখানা- - যেখানে বিশুদ্ধ নন্দনতত্ত্ব, সৌন্দর্য ও রূপের চর্চা-অনুশীলন হলেও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে নিজেদের বক্তব্য শ্রেণীস্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকেই উচ্চারণ করা হতো। জনগণের প্রতিনিধিত্ব তাঁরা করতে চাইতেন না। জনগণের বিবেচনাকে সবসময় সম্মানও দেখানো হয়নি। তাঁরা এমন সাম্প্রদায়িক ছিলেন যে, হিন্দুদেরকে পাকিস্তানী নাগরিক হিসেবে গণনাই করতে চাননি। শত্রু হিসেবে দেখেছেন। নিজেদের বা বাঙালির সংখ্যাগরিষ্ঠতা কমিয়ে দেবার জন্য হিন্দুদেরকে বাদ দিয়ে পশ্চিমের সঙ্গে (পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে তুলনায় পূর্ব পাকিস্তান মোট জনংখ্যার হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ৫৬% হলেও মুসলমানের হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানীদের দাবীই অগ্রগন্য) সম্পর্ক স্থাপন করেছেন অনুগ্রহ-প্রার্থী হিসেবে। স্বকীয়তা এবং স্বনির্ভরতার মেরুদণ্ড তাঁদের (কবি গোলাম মোস্তফা গংদের) ছিলনা। বাঙালী জাতির বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিত্ব মর্যাদার বোধকে নওবাহার তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলা ও উর্দুর বিতর্কে ১৯৫২ সনে নওবাহার উল্টো প্রশ্ন করেছে: "বাংলা ভাষা কি অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে?' অতপর লিখেছেন নওবাহারের সম্পাদক : "বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন চলিতেছে। মাতৃভাষার প্রতি বাঙ্গালী মুসলমানদের অকৃত্রিম অনুরাগেরই ইহা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ অনুরাগ অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি — রাষ্ট্র পরিচালনায় আবেগের স্থান নাই। —– কাজেই 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিলেই চলিবেনা। আন্দোলনকারীদেরকে ধীরস্থির ভাবে নিম্নের কথাগুলি ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি । -- - বড় যুক্তি - মেজরিটি -- কিন্তু এই অস্ত্রকে আমরা খুব কার্যকরী মনে করিনা। আদর্শের বিচারে গণভোট চলেনা। গণভোট লইতে গেলে পাকিস্তানই পাইতামনা। তবু —- বিচার করিয়া দেখি —– ১৯৫১ সনের সেন্সাস রিপোর্টে পাকিস্তানের লোকসংখ্যা : সর্বমোট = ৭,৫৬,৩৬,০০০

পূর্ব পাকিস্তানে সর্বমোট =	৪,১৯,৩২,০০০
পশ্চিম পাকিস্তানে সর্বমোট =	৩,৩৭,০৪,০০০
পূর্বপাকিস্তানে মুসলমান মোট=	৩,২২,২৭,০০০
পূর্বপাকিস্তানে অমুসলমান মোট=	৯২,৩৯,০০০
পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলমান মোট=	৩,২৭,৩২,০০০
পশ্চিম পাকিস্তানে অমুসলমান মোট=	৯,৭২,০০০

এই হিসাবে উর্দু-বাংলার প্রশ্ন যদি শুধু পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, 'তবে আমরা হারিয়া যাইব'। কারণ মুসলমান হিসাবে সেখানে আমরা মাইনরিটি। 'মেজরিটি হইতে পারি যদি হিন্দুদের সঙ্গে প্যাক্ট করি —– কিন্তু এই চুক্তির অর্থ ও তাৎপর্য গুরুতর। ইহা রীতিমত বিদ্রোহী হইবার প্রস্তুতি, পাকিস্তানের লক্ষ্য ও আদর্শ পরিপন্থী।' পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানদের ফেলে পূর্ব বাংলার হিন্দুদের সঙ্গে প্যাক্ট এর কি পরিণাম হতে পারে তা অনুমান করা যায়,যদি মনে করি যে তারা পাকিস্তান আন্দোলনে বিরোধীতা করেছিল।১০৯

নওবাহারের নজরুল-চর্চার পরিচয় জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ সংখ্যা থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধার করলেই বোঝা যাবে। সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখের নজরুল সংক্রান্ত রচনা এই সংখ্যাতে ছাপা হয়েছে, মাঝে-মধ্যেই নজরুলের ওপর প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ রচনায় নজরুলকে পাকিস্তানী আদর্শের প্রতিকূল বলে প্রচার করা হয়েছে। আষাঢ় ১৩৫৯ সংখ্যার সূত্র ধরে অগ্রসর হলেই ভালো হয়— 'নজরুল ও আমরা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে : নজরুল-ভক্তদের মধ্যে প্রকারভেদ আছে-- সত্যিকার ভক্তদের সম্বন্ধে আমাদের কোন অশ্রদ্ধা নেই; কিন্তু অন্ধ বা অতি-ভক্তদের আমরা কোন মর্যাদা দেইনা — তারা কিছু না জেনে বুঝেই মতামত দেন, পাছে অজ্ঞ বলে লোকে তাই। একদল আছেন যাঁরা নজরুলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে নিজকে বড় করতে চান, নজরুল বার্ষিকীতে অনেকেরই প্রয়াস এই রকমের। এদের আত্মপ্রচার পীড়াদায়ক। "আর একদল আরও সাংঘাতিক। ইহারা কমিউনিস্ট দল। কবি নজরুল সেখানে বড় নয় - 'সাম্যবাদী' সর্বহারাদের নজরুলই সেখানে বড়। অন্য আর একদলের খবরও আমরা রাখি - তাঁহারা এক সংস্কৃতির উদগাতা। পাকিস্তানে থাকিয়াও তাঁহারা চায় হিন্দু-মুসলিম কৃষ্টির হর-গৌরীরূপ। নজরুল-প্রীতি এইরূপে নানাখাতে প্রবাহিত হইতেছে এবং দুস্থ কবিকে লইয়া অনেকেই অনেক মতলব হাসিল করিয়া লইতেছেন। —- অনেকেরই আন্তরিকতা নাই। —- নজরুল সম্বন্ধে এই সমস্ত ভিতরকার কথা জানাইয়া দিবার পর এবং 'নজরুল-কাব্যের অবাঞ্ছিত অংশ' সমূহ দেখাইয়া দিবার পর নজরুল সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই। — নজরুল সম্বন্ধে আমাদের কোন বিরাগ নাই — তাঁহার উপর লিখিত কবিতা প্রবন্ধাদি নওবাহারে ছাপাইতে শুরু করিয়াছি —–।"১১০

নজরুল-প্রীতি সম্পর্কে মওলানা আকরম খাঁ বনাম গোলাম মোস্তফা তথা 'আজাদ ভার্সেস নওবাহার' এর লড়াই এর স্বরূপ কেমন ছিল তাও জানা যায়। গোলাম মোস্তফা ও তদনুরাগী সম্প্রদায়ের নজরুলের বিদ্বেষ-মূলক সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হয়েছিল 'আজাদ'। নওবাহারের উক্তি "নজরুল ইসলাম এ যুগের একজন ক্ষণজন্মা প্রতিভা সন্দেহ নাই। অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুর-শিল্পী এবং রসস্রষ্টা হিসাবে তিনি চিরদিন আমাদের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবেন। তবে পাকিস্তানের পরিবর্তিত মনোভঙ্গিমায় এবং নতুন পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কাব্য কতটুকু স্বীকৃতি পাইবে, বলা কঠিন।"— এই উক্তির প্রতিবাদ করেছিল আজাদ-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। তাঁরা লেখেন : 'গোলাম মোস্তফা 'ইসলাম ও পাকিস্তানের আলোকে নজরুলের কাব্যের উপর মন্তব্য

Dhaka University Institutional Repository

করিয়াছেন।' অতএব এবার গোলাম মোস্তফা আজাদ ও আকরম খাঁর গুমোর ফাঁস করে দিতে উঠে পড়ে লেগে যান। নওবাহারে ঘোষণা করা হয় 'নজরুল (ইসলাম?) অপেক্ষা ইসলাম বড়ো।' যাঁরা জেনে শুনে এর বিরুদ্ধতা করেন তাঁরা 'ইসলাম-দ্রোহী' এবং 'রাষ্ট্রদ্রোহী'। গোলাম মোস্তফা আজাদে প্রতিবাদ পাঠালে তা না ছাপার প্রেক্ষিতে নওবারহার বলে গোলাম মোস্তফা মোনাফেক নন। আজাদ তথা আকরম খাঁ এক কালে নজরুলকে 'কাফের' ফতোয়া দিয়েছিলেন। পরে তিনিই নজরুলকে সামনে নিয়ে আসেন (পাকিস্তানের জাতীয় কবি বানানোর জন্য?)। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় মওলানা আকরম খাঁ বলেন, "বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হইলে আমি হইব প্রথম শহীদ"। পরে তিনিই তলে তলে করাচি গিয়ে উর্দু ও আরবী হরফে বাংলা সমর্থন করেন। 'আজাদ -গ্রুপের মওলানা প্রীতিও এই শ্রেণীর। সওগাত -এ যাহারা দিনের পর দিন মওলানা সাহেবের কুৎস্য ও গালাগালি করিয়াছে, আজাদে তাহারাই এখন অনুগত ভৃত্য--- কবি সাহেবের বিরুদ্ধে আজাদ আরও কত কি করিয়াছে ---- প্রয়োজন হইলে তাহা আমরা ব্যক্ত করিয়া দিব।'১১১

মোস্তফা সাহেব শিক্ষক হিসেবে শিক্ষা বিভাগের যাবতীয় কাজের কৃতিত্বও আশা করতেন। কিন্তু তা থেকে বঞ্চিত হলে ক্ষেপে যেতেন 'আজাদ' এর ওপর। 'আজাদ অফিসে সরকারী মিটিং' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয়তে বলা হয় : "---- এই অনাচার শিক্ষাবিভাগ সংক্রান্ত। অন্য কোন বিভাগে এই 'মওলানা প্রীতি' নাই। যে বিভাগটি অতি দুর্বল, সেইটিরই দোওয়া-তাবিজের প্রয়োজন। রোগ কঠিন, রোগীর বাঁচিবার কোন আশা নাই, তাই এখন ঝাঁড়ফুকের বরকতে যদি বাঁচা যায় — শিক্ষা বিভাগ এই চেষ্টায় আছেন। ভাষা, শিক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে শিক্ষা বিভাগ মহাপাপী, তাই তাহারা মওলানা সাহেবের কাছে মুরীদ হইয়াছেন। ---- তাঁর হাতে আছে 'এসমে আজম'— আজাদ'। আজাদ চুপত সব চুপ।! কিন্তু আজাদ ও মৌলানার ভিত্তি কেঁপে উঠেছে।"১১২

ভাষা-চিন্তা প্রসঙ্গে 'রাষ্ট্রভাষা আরবী' প্রসঙ্গে ১৯৫০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে নওবাহার ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখ কর্তৃক আরবীকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ইস্তেহারকে সমর্থন করার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বলেন : "আমরা দেখিয়া খুশি হইলাম যে, যে-গ্রুপ এতদিন বাংলা কালচারকেই বড় করিয়া দেখিয়া আসিতেছিলেন এবং যাহার উৎকট মোহে পড়িয়া উর্দুকে পর্যন্ত বরদাস্ত করিতে পারেন নাই, সেই গ্রুপই আজ একধাপ উচুতে উঠিয়া আরবীকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ---- এতে বুঝা যায় তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ---- এতদিনে তাঁহারা পাকিস্তানের লক্ষ্য ও আদর্শের সন্ধান পাইয়াছেন। উর্দুকে তাঁহারা সমর্থন করুন আর নাই করুন, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে সমর্থন করিবার মনোবলকে তাঁহারা হারাইয়াছেন ; --- স্বীকৃতির স্বাক্ষর আছে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি রূপে ---- ডক্টর সাহেব যে উৎকট জাতীয়তাবাদের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকেই ক্ষুন্ন হইয়াছিলেন। 'আগে বাঙালী পরে মুসলমান' এই নীতি সেদিন তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। সুখের বিষয় এই নূতন প্রস্তাব দ্বারা পূর্বের সেই ভ্রান্ত ও বিকৃত মত খণ্ডিত হইয়া গেল। ---- মুবারকবাদ। এখন সকল মুসলমানের দৃষ্টি ও লক্ষ্য একমুখীন।"১১৩

হিন্দু-মুসলমানের প্রসঙ্গে ১৯৫০ সনের দাঙ্গার প্রেক্ষিতে নওবাহারের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচ্য। — ফাল্গুন ১৩৫৬ সংখ্যায় 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা' 'কমিউনিস্ট পার্টি ও বর্তমান দাঙ্গা' এবং 'দাঙ্গার প্রকৃত কারণ' প্রভৃতি শিরোনামে নওবাহার বলেন : দাঙ্গা মাত্র তিন ঘন্টা চলেছিল। সরকার দমন করে ফেলেন দাঙ্গাকে। কখনই উস্কানী দেয়া হয়নি। বরং ইসলামের দৃষ্টিতে দাঙ্গাকে নিন্দনীয় বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা 'ঢাকা চলো' শ্লোগান দিয়ে দাঙ্গা বাঁধিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের এই কাজ নিন্দনীয়। ঢাকায় এবংকলকাতায় দাঙ্গার সময় হিন্দু ও মুসলমানকে ইংরেজ, শিখ ও মাড়োয়ারীরা রক্ষা করেছেন। বাস্তত্যাগী পূর্ববঙ্গের হিন্দুরাই আসলে দাঙ্গা বাধায়। তাদেরকে সরকার (ভারত) উস্কানী দেয়। নিজেরাও জায়গা করে নেবার আশায় বাস্তত্যাগীরা মিথ্যা অত্যাচারের কথা বলে। কমিউনিস্টরাও দাঙ্গার সময় সাম্যবাদী থাকেননা -- হিন্দু হয়ে যান। অর্থাৎ প্রকৃত কমিউনিস্টদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অসাম্প্রদায়িক থাকতে পারেন না। 'দাঙ্গার প্রকৃত কারণ' হলো— "দাঙ্গা না বাধাইয়া ভারত গভর্ণমেন্টের উপায় ছিলনা। ভারতের অভ্যন্তরে যে বিপ্লবাগ্নি ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে, প্যাটেল তাহাকে কৌশলে এই সাম্প্রদায়িক খাতে বহাইয়া দিলেন। ---- পূর্ববঙ্গে কোন কিছু না ঘটিলেও পশ্মিবঙ্গের দাঙ্গা অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। প্ল্যান করিয়াই বাগেরহাটের কমিউনিস্ট হাঙ্গামা শুরু করা হইয়াছিল ---- এই দাঙ্গা সর্দার প্যাটেলের পরিকল্পিত। ভারতের বেকার সমস্যা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, মন্দার জন্য বিপ্লবের বন্যায় ভারত ছয়লাব হয়ে যাবে ভয়ে 'সাম্প্রদায়িকতার খাল কেটে এই অগ্নিস্রোতকে পাকিস্তানের দিকে বহাইয়া দিলেন। আরও একটি ব্যাপার - র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদে দেখা যাইতেছে যে, ভারত ডোমিনিয়নের প্রায় সব সীমান্তেই মুসলমানেরা সংখ্যা গরিষ্ঠ। পশ্চিম ভারতে কাশ্মির, পশ্চিম বাংলায় মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগণা, মালদা, ইত্যাদি হিন্দু-ভারতের এটাও একটা আতঙ্কের কারণ। পশ্চিমবঙ্গের নিরাপত্তার জন্য ঐ সমস্ত সীমান্ত হইতে মুসলিম বিতাড়ন তাই সর্দার প্যাটেলের বুদ্ধিতে অপরিহার্য। সরকারী ভাবে করতে গেলে নানা সমস্যা। 'দাঙ্গা চালু রাখ' নীতিই ভারতের কূটনীতি। পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা শান্তিতে থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গা চলবে।১১৪

১৯৫১ সনের হরিখোলার মাঠের ইতিহাস খ্যাত সাংস্কৃতিক-সম্মেলনের পূর্বে ১৯৫০ সনের ২১ ও ২২ জানুয়ারী চট্টগ্রামে আরও একটি শিল্প প্রদর্শনী হয়েছিল। ওই সম্মেলনের সভাপতিও ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। তাঁর বক্তব্যকে ব্যঙ্গ করে নওবাহার লিখেছে : "---- তিনি সকলকে উপদেশ দিয়াছেন বাংলা সাহিত্যের 'অতীত ঐতিহ্য' ও ধারাবাহিকতাকে অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য। সাহিত্যবিশারদ বলিতেছেন : "কোন দেশেরই ইতিহাস খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন নহে। দেশের সাহিত্য, রাজনীতি ও সমাজজীবনের ঐতিহ্য ও তমদ্দুন নির্ভর করে এই ধারাবাহিকতার উপর, তার পরিচয় গ্রহণ ও তাকে আত্মস্থ করার শক্তির উপর। জারজ সন্তান নিন্দিত, কারণ সে বিচ্ছিন্ন, সে ভূঁইফোড়, তার কোন অতীত, কোন ধারাবাহিকতা নাই। — পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যিক উত্তরাধিকারীগণ যদি ভূঁইফোড়ের বিড়ম্বিত ভূমিকায় অভিনয় করিতে না চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আমাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্য ও তার ধারাবাহিক গতি-প্রবাহের সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে, তাকে গ্রহণ করিতে হইবে, হজম করিতে হইবে।"

১৯৪৮ সনের ৩১শে ডিসেম্বর ও ১৯৪৯ সনের পয়লা জানুয়ারীতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাহিত্য- সম্মেলনের সূত্র টেনে ১৯৫১ সনের চট্টগ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

সাংস্কৃতিক সম্মেলন প্রসঙ্গে নওবাহার লিখেছে : "এবার ইসলামাবাদে (চট্টগ্রাম) দ্বিতীয় সম্মেলন হইল। দেখা যাইতেছে, উভয় সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ একই সুরে বাধা। একজন বলেন মা প্রকৃতি আমাদের বুকে বাঙ্গালিত্বের যে ছাপ মারিয়া দিয়াছেন, তাহা টুপী-দাড়ি-লুঙ্গি দিয়া ঢাকা যাইবেনা। আর একজনত এই টুপি-দাড়ি-লুঙ্গি পরা সাহিত্যিকদিগকে 'জারজ' ও 'বাদর' বলিয়া গালাগালি দিয়া ফেলিয়াছেন। এই শ্রেণীর উদ্ভট পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের বাড়াবাড়ির ফলেইত বাংলো ভাষার প্রতি বাঙালী মুসলমানের বিতৃষ্ণা জাগিতেছে এবং আরবী ও উর্দুর অনুকূলে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। যে ভাষার সহিত আমার নাড়ীর যোগ রহিবেনা, আমার জীবন ও দর্শন যে ভাষায় রূপায়িত হইবেনা, সে ভাষা কেমন করিয়া আমার মাতৃভাষা হইবে? বিজাতীয় পরিবেশ ও ধ্যান-ধারনা লইয়া কি করিয়া একটা জাতির সাহিত্য রচনা করা চলে? জাতি ও তার সাহিত্য এক ধর্মাবলম্বী হওয়া চাই। মাতৃভাষার কাজ হইল জাতির ধর্ম্ম, আদর্শ, ধ্যান ও স্বপ্নকে রূপ দেওয়া। হিন্দুরা তাহা করিয়াছে, মুসলমানদিগকেও তাহা করিতে হইবে। অন্য কোন কারণে নয়, মুসলমানদের জাতীয় জীবনের সংগঠন, সংরক্ষণ ও পরিপুষ্টির জন্যই ইহার প্রয়োজন। —— নজরুল ইসলাম কি করিয়াছেন? দেব-দেবীর বেলায় তিনি আদৌ বিদ্রোহী নন। তিনি বিদ্রোহী শুধু খোদার বেলায়। কাজেই মাইকেল –বঙ্কিম–রবীন্দ্রনাথকে আমরা বুঝি, কিন্তু নজরুল ইসলামকে বুঝিনা। — কাজেই সাহিত্য বিশারদের কথা ও উপমার কোন মূল্য নাই। —– আমরা জনাব সাহিত্যবিশারদ সাহেবকে সতর্ক করিয়া দিতেছি। তিনি যেন নীরব হইয়া থাকেন। পুথি সাহিত্য লইয়া তিনি যেন বেশী চেঁচামেচি না করেন। পুথি–সাহিত্যের অধিকাংশই আমাদের কলঙ্কের ও অগৌরবের, কাজেই আমরা আর সেখানে ফিরিয়া যাইবনা। পুথি সাহিত্যের মধ্যে আমরা কেন প্রেরণা খুঁজিব? আমাদের প্রেরণার অনন্ত উৎস যেখানে আছে, সেখানে নিশ্চয়ই আমরা তাহা গ্রহণ করিব, কিন্তু মুসলমান কবির নাম দেখিলেই আমরা আর উল্লসিত হইব না। —– ঐসব কাব্যে আজকার দিনে আমাদের কোন পাথেয় নাই। কাজেই সাহিত্য বিশারদের পুথির কান্নায় আমাদের হৃদয় বিগলিত হইবেনা। তিনি তার প্রাচীন পুথির সঞ্চয়কে সাবধানে রাখিয়া দিন; আমরা পরে সেগুলি যাদুঘরে রাখিয়া দিব। — আমরা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এবং তাঁহার মতাবলম্বী পণ্ডিতদিগের এ-হেন বিকৃত আদর্শ ও পথ- নির্দেশের জন্য তীব্র নিন্দা করিতেছি। সাহিত্যের গতি–পথ ও লক্ষ্যের সন্ধান তাঁহারাই দিতে পারেন যাঁহারা স্বাপ্নিক ও সত্যদ্রষ্টা। পরপদলেহনকারীদের এ কাজ নয়। পাকিস্তানের আকাশে –বাতাসে আজ কি সুর ধ্বনিত হইতেছে? মিনারে মিনারে কোন্ আজান শোনা যাইতেছে; কোন রঙে আজ আমাদের মন রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, এসব খবর যাঁহারা না রাখেন, তাঁহারা যেন কাব্য–সাহিত্যের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে কোন কথা না বলেন।"

পুথি–সাহিত্যের ব্যর্থতার কথা প্রমাণ দিতে গিয়ে নওবাহার সৈয়দ আলী আহসানের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন : "বিকৃত জীবনধারা ও অপরিচিত ঐতিহ্যের কাছে মুসলমান যখন নতি স্বীকার করেছে, তখন সে মুসলমান হিসেবে পরিচিত হবার অধিকারও হারিয়েছে। সে পরাজয়ের কাহিনী আমাদের স্মরণ করবার নয়; ভুলে যাবার। নতুন পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের পরিচয় আমরা যে–ভাবে প্রকাশ করব, সেই প্রকাশ রূপের অতীতের ক্লেদ উদঘাটিত হবেনা।"[১১৫]

সমাজচিন্তায় নওবাহার স্বকীয় উদ্দেশ্য কখনও বিস্মৃত হয়নি। বিশ্বনবীর রচয়িতা পয়গম্বর হজরত ইব্রাহীম (আঃ), ইউসুফ (আঃ), ও হজরত আজরাইল ফিরিশতাসহ আহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) ছবি সম্বলিত আবুল মনসুর আহমদ প্রণীত (কলকাতা থেকে প্রকাশিত) 'ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া' শীর্ষক বইটি সম্পর্কে ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আলেম সমাজ ও পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁরা হুমকি দিতে কার্পণ্য করেননি— "বিষয়টি গুরুতর। এরপর যদি কোন অমুসলমান গ্রন্থকার তাঁহাদের পুস্তকে কোন পয়গম্বরের ছবি ছাপেন বা নাট্যমঞ্চে তাঁহাদের অভিনয় দেখান, তাহা হইলে মুসলিম সমাজ বা পাকিস্তান গভর্ণমেন্টের কিছু বলিবার থাকিবে কি?"[১১৬]

পাকিস্তানের রাষ্ট্র–পরিচালনের 'মুলনীতি কমিটির মূলে' এবং 'ইসলামী শাসনতন্ত্র কিরূপ হইবে' এবং শিক্ষার নিয়মনীতি, সিলেবাস, ইত্যাদি সম্পর্কে নওবাহার পর্যাপ্ত পরামর্শ দিয়েছিল। ১৯৫০ সনের ডিসেম্বর নাগাদ প্রাকশিত (পৌষ ১৩৫৭) সংখ্যায় নওবাহার ইসলামী গণতন্ত্রের পক্ষে মত দিয়ে বলেন Head of the state এর হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকবে, কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুকরণে ক্ষমতা মজলিশ–ই শূরা–র হাতে দিলেই ভাল হবে। ডিক্টেটরের ক্ষমতা চেক করার জন্য জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা দেওয়া উচিত নয়। নওবাহার গণতন্ত্রের বিপক্ষে কথা বলেছে। নওবাহার কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রীয় চিন্তায়ও যে স্বচ্ছ ছিলেন না, বাঙ্গালীত্বের এবং বাঙালি জাতি ও তার সংস্কৃতির উপর খড়গ হস্ত ছিলেন — আর মওলানা মওদুদীর প্রতি আনুগত্য (শ্রদ্ধা) পোষণ করতেন তা মোটামুটি স্পষ্টই বোঝা যায়। ইসলামের নামে মুসলমানিত্বের অজুহাতে তাঁরা সব ব্যাপারে ছিলেন অন্ধ। অগণতান্ত্রিকতা, স্বজাতির বৃহত্তর স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীনতা তাঁদের চিন্তাধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য। মুলনীতি কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পূর্ব–পাকিস্তানে তুমুল আন্দোলন হয়। ঐ কমিটি রিপোর্টে পূর্ব পাকিস্তানকে 'জিম্মী' বানিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু নওবাহার স্পষ্ট করে এর কোন বিরোধীতা করেনি। আকরম খাঁর আজাদ ও মোহাম্মদী পত্রিকায় লেখা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানীদের আন্দোলন দেখে 'প্রাদেশিক' বলে এদেশীয়দের নিন্দা করা ঠিক নয়। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া আজাদের সূত্র উল্লেখ করে লিখেছিলেন : "ইসলামে সত্যই কোন প্রাদেশিকতা নাই; মানি, এবং সেরূপ মনোভাব যদি আমাদের মধ্যে কাহারও থাকে, তবে তাহাকেও আমরা নিন্দা করি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানকেও তাহা বুঝা উচিত। পূর্ব পাকিস্তানীদের ন্যায্য অধিকার না মানা এবং তাহাদের হাতে বেশী ক্ষমতা দিতে ভয় পাওয়াও কি প্রাদেশিকতা নয়? একই অন্যায় করাচীতে ঘটিলে ইসলামী হয়, আর ঢাকায় ঘটিলে প্রাদেশিক হয়, এ লজিক আমরা বুঝিতে পারিনা।"[১১৭]

নওবাহারের লেখক–গোষ্ঠীর সদস্য গল্প উপন্যাস কবিতা অনেক লিখেছেন। এই তালিকায় রয়েছেন — কবি গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, এ কে এম নুরুল ইসলাম, আবুল ফজল, এম. এ. আজম, মীজানুর রহমান, বেগম সুফিয়া কামাল, শ্রী মনোমোহন বর্মণ, শওকত ওসমান, সুস্মিতা আনোয়ার, সৈয়দ এমদাদ আলী, নুরুল ইসলাম, আশরাফউজজামান চৌধুরী, আব্বাসউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মুস্তাফা আনওয়ার, মুফাখখারুল ইসলাম, শ্রী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, আবু তাহের, করিম উদ্দিন আহমদ, হামেদ আহমদ, মবিন উদ্দীন আহমদ, ডাঃ মোহাম্মদ হোসেন, হাবীবুর রহমান, রওশন ইজদানী, আমিনা খাতুন, কাজী গোলাম আকবর, আহসান হাবীব, ডঃ এম. আবদুল কাদের, এস. ওয়াজেদ আলী, এ. কে. এম আতোয়ার

Dhaka University Institutional Repository

রহমান (আতোয়ার রহমান), কে এম. শমসের আলী, সৈয়দ আলী আহসান, জিল্লুর রহমান সিদ্দীকী, ইব্রাহীন খলীল, আবুল কালাম মুস্তাফা, এ. কে. এস. নূর মোহাম্মদ বিদ্যাবিনোদ, মোহাম্মদ মোবারক আলী আখন্দ, চৌধুরী ওসমান, খলীলুর রহমান চৌধুরী, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, রাবেয়া খাতুন, সৈয়দ মুজিবুল হক, আবদুল মওদুদ, মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহার, শ্রীমতী বেলা রায়, সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মোহাম্মদ আতিয়ার রহমান, ফজলুল সালাম, আবু জোহা নূর আহমদ, জাহানারা আরজু, শাহ আজহার আলী, আবুল হাশেম, মোহাম্মদ আবুল খায়ের, কণিকা দে, মুয্হারুল ইসলাম, এইচ. এম. আজিজুর রহমান, এ. এফ এম. আবদুল হক, কুমারী রওশন আরা বেগম, ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী, মোঃ সিরাজুদ্দীন কাশিমপুরী, ডঃ মুহীযুদ্দীন, ইব্রাহীম খাঁ, তোজাম্মেল হক, আজহারুল ইসলাম, অধ্যাপক জমীর উদ্দীন আহমদ, আনিসুল হক চৌধুরী, সাদ আহমদ, মিরজা আ. মু. আবদুল হাই, আবদুর রশীদ খান, এস. এম. ছদরুদ্দীন, আবদুল হক ফরিদী, আশরাফ সিদ্দিকী, মতিউল ইসলাম, মোস্তফা কামাল, এস, এম, এ. রশীদ, মোসলেহ উদ্দীন, মুতাজিদুর রহমান, অধ্যাপক মোঃ গোলাম রসুল, নুরুন্নাহার, মোঃ মমতাজুর রহমান, শ্রী গোপেশ্বর সাহা, জসীমউদ্দীন, বেগম আজিজা এন মোহাম্মদ, রোকেয়া সুলতানা, আবদুল মুত্তালিব, আবদুল হাই মাশরেকী, শ্রী মহেন্দ্র সান্যাল, এম, এ. আজম, কসিরুদ্দীন, মুহম্মদ আবু তালিব, কাজী সুরতেনন্নেসা, শ্রী করুণাময়ী বর্মন, সাহানা বেগম, রৌশন আরা বেগম, আতিয়ার রহমান, (আবু) ইসহাক, মোহাম্মদ আবদুল জব্বার খান, মুহম্মদ আবদুল হাকিম, এস. এম. আবদুল জলীল, আবু জাফর ওবাইদুল্লাহ, শরীফ আবদুল কাদির, অধ্যাপক আসহাব উদ্দীন আহমদ, খবীরউদ্দীন আহমদ, কাজী শামসুল হুদা, এ. টি. এম. আনিসুজ্জামান (ডঃ), মাহফুজা খাতুন, শামসুল হক মোল্লা, আবদুর রশীদ ওয়াসেক পুরী, আবদুর রশীদ, আবু জাফর শামসুদ্দীন, মোজাম্মেল সিদ্দিক, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য রত্ন, মতিউল ইসলাম, মুসলেহ উদ্দীন আহমদ, অতুলচন্দ্র দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম (কবিতা — ওমর খৈয়াম), লুৎফুন্নেছা, এম. এ. সোবহান, অধ্যাপক আহমদ শরীফ (২/৮), সিকান্দার আবু জাফর, মোহাম্মদ আহ্বাব চৌধুরী, এস. সুফিয়া সাহিত্যরত্ন, কে. এ. এম. আবদুল্লাহ, শামসুন্নাহার, কাদের নওয়াজ, এ. এন. জহিরুল আলম, এস. এম. এ. রাজ্জাক, মোহাম্মদ আজিল হক, মতিউর রহমান, মিন্নত আলী, সিরাজুল হক, মোহাম্মদ কায়সুল হক, আবদুল ওহাব চৌধুরী, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, সৈয়দ নাজমুল হক, নাজমা বেগম, জেবউন নেসা খানম, অধ্যাপক শ্রী অবিনাশ চন্দ্র পাল, শ্রী সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, মমতাজ বেগম, জাহান আরা বেগম, আছিয়া খাতুন, আরজুমন্দ বানু, অতুল চন্দ্র দত্ত, বেগম হালিমা রশিদ, মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (পুনর্মুদ্রণ), আবু হেনা মোস্তফা কামাল, সৈয়দ মেহরাব চৌধুরী, মোঃ শামসুদ্দোহা চৌধুরী, আসাদুজ্জামান, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, চৌধুরী লুৎফর রহমান, গোলাম সাকলায়েন, সুলতান আহমদ ভূঁইয়া, বেগম মাছুমা চৌধুরী, আবদুল মালেক চৌধুরী, ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শাহ ছহিল উদ্দীন আহমদ, রশীদা বেগম, ডাঃ এ মালেক, শ্রী বিবেকানন্দ পাল প্রমুখ।[১১৮]

কবি গোলাম মোস্তফা প্রতি সংখ্যাতেই কুরআন মজীদের স্বকৃত বঙ্গানুবাদ ছাপাতেন। নওবাহারের লেখক তালিকায় পূর্ববাংলার তখনকার প্রধান লেখকদের প্রায় সকলকেই লিখতে দেখা যায়। ধারাবাহিক উপন্যাস লিখেছেন পূর্ব বাংলার প্রধান কথা-শিল্পীরা। শওকত ওসমানের 'আরবের বন্ধু' আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ী' আশরাফ সিদ্দিকীর 'গলির ধারের ছেলেটি' এবং আতোয়ার রহমান, মির্জা আবদুল হাই প্রমুখের অনেক ভালো-ভালো গল্প এ পত্রিকাতেই ছাপা হয়েছিল। আবদুল মওদুদ-এর ওহাবী আন্দোলনের ইতিহাস এই পত্রিকায় ছাপা হয়। তাছাড়া এতে কবি ও দার্শনিক ইকবালের সাহিত্যের ব্যাপক পরিচয় প্রদান ও তাঁর দর্শনের চর্চা করা হয়েছে। 'বঙ্কিম কি শিল্পী?' শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক জমীর উদ্দীন আহমদ বলেছিলেন তাঁর অনেক বই-ই রসোত্তীর্ণ হয়নি।[১১৯] এই ধরনের মন্তব্য এবং নজরুল-সাহিত্যের অশৈল্পিক অরসিক ইসলামিক পাকিস্তানবাদী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পত্রিকার সাহিত্যাদর্শকে খাটো করেছে সন্দেহ নেই। পত্রিকার সম্পাদকের আদর্শই যে প্রধানত পত্রিকাতে প্রতিফলিত হয়— তার প্রমাণ হলো যে-নওবাহার আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে যাচ্ছে- তাই ভাবে নিন্দা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছিলো -- সেই পত্রিকার পাতায় আহমদ শরীফ পাকিস্তানী আদর্শের অনুসারী মুসলিম-ঐতিহ্য-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গীতে লিখেছেন প্রবন্ধ— 'পাকিস্তানের সাহিত্যের আদর্শ' (২/৮) এবং 'বাংলা সাহিত্যের হিন্দু ইতিহাসকার ও মুসলমান' (৪/৪)। প্রবন্ধের বক্তব্যের এবং প্রেরণায় কালিক ও বাস্তব সত্য যথেষ্ট থাকলেও রচনার প্রেরণা এবং তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি সার্বিকভাবে মিলিয়ে পড়লে উপলব্ধি করা যায় তিনিও পাকিস্তানের নাগরিক এবং জাতিতে মুসলমান বাঙালি: "— চারদিক থেকে ধ্বনি উঠছে— ইসলামী সাহিত্য চাই। ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইসলামী তমদ্দুন-তাহজীব- ঐতিহ্য - আদর্শ প্রতিফলিত করাই হবে আমাদের সাহিত্যিকদের ব্রত। কিন্তু (ইসলামী আদর্শ প্রতিফলিত করা বড়) সাধনা সাপেক্ষ। —— ইসলামের এই আদর্শ ইসলামী-আধারে দেশী পরিবেশে অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজের সমস্যা অন্য কথায় জগৎ ও জীবনের সমস্যা, কোরআন ও মুসলিম ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেশী পরিবেশে রূপায়িত করতে পারলেই পাকিস্তানে সত্যিকার ইসলামী সাহিত্য — অন্য অর্থে বিশ্বজনীন সাহিত্য সৃষ্টি হবে। তার আগে প্রয়োজন — ইসলামের শিক্ষা ও মর্ম্ম-বাণীকে একান্তভাবে গ্রহণ করা, আত্মস্থ করা, হজম, করা। তাহলে বিনা আয়াসে স্বভাবতই রচনা স্থায়ী হয়ে উঠবে। ইসলামের সৌন্দর্যের তারিফ মুখের বুলিতে নয় — যদি দিলের বুলি দ্বারা করা যায় তবে সাহিত্য আপনা-থেকে ইসলামী রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে উঠবে। আর ইসলামী হলেই তা হবে সাবজনীন সাহিত্য। কেননা ইসলামী আদর্শ হচ্ছে দেশকালপাত্র নিরপেক্ষ এবং সাহিত্যের প্রধান উপকরণ হচ্ছে মানুষ— ইসলামের মূলনীতির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবনের সমস্যা বিচার ও সমাধান প্রচেষ্টার মধ্যেই ইসলামী বা পাকিস্তানী সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে। যেমন উপনিষদের মর্মবাণী ফুটেছে রবীন্দ্রকাব্যে আর কোরআনের নির্যাস পাচ্ছি ইকবালের সাহিত্যে।"[১২০] এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সমালোচনা করে আহমদ শরীফ লিখেছেন ঃ "ডঃ সুকুমার সেন ও তাঁহার সমগোত্রীয়রা সত্য ও বিচার নিরপেক্ষ নিজস্ব অভিমত গায়ের জোরে আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে, আমাদের স্বীকৃতি আদায় করে নিচ্ছেন। আমরা এতিম অসহায়ের মত তাঁরা যা বলছেন তাই মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু আর কতদিন বাংলার মুসলমান হিন্দু-অভিভাবকত্বে এতিম হয়ে থাকবে? হিন্দুরাই বা আর কতদিন মুসলমানদের দাবিয়ে রাখবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে? বাংলার মুসলমান হিন্দুদের সাথে সাথেই বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন।"[১২১]

Dhaka University Institutional Repository

৬. তাহজিব (এপ্রিল ১৯৫০/বৈশাখ ১৩৫৭--আশ্বিন ১৩৫৭)

'তাহজিব' 'তমদ্দুন প্রেস' (৫০ লালবাগ রোড, ঢাকা) থেকে ছাপা হতো, আর চিন্তাচেতনায় যুক্তিবাদী- ইসলামী ধারার সন্নিকটবর্তী ছিল। এদিক থেকে, এবং কালিক প্রেক্ষাপটে 'তাহজিব' এর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। কারণ ওহ্যবী আন্দোলনের রেশপূর্ণ বাংলার ইসলামী ভাবধারায় পঞ্চাশ দশকের পাকিস্তানের স্থান ও কালগত বিচারে (ধর্মভিত্তিক যদিও) বদ্ধদৃষ্টির পরিচয় না-দেয়ার মধ্যে কিছু অগ্রবর্তিতার মর্যাদা নিহিত আছে। অবশ্য এটা হয়েছিল সম্ভবত বাঙলার ইসলামী চিন্তাধারায় পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী মওলানা মওদুদীর রাজনৈতিক-আদলের ইসলামী-চিন্তাধারার প্রভাব তখন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল বলে। বাঙলাদেশ পাকিস্তানের রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হবার কারণে এখানেও (পূর্ব বাংলায়) মওদুদীর সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত হয় এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রসার লাভ করে। স্বাধীনতার পরে-পরে মওলানা মওদুদী খাঁটি ইসলামী আদর্শের রাষ্ট্রপরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং রাষ্ট্রকর্তৃক তাঁকে বেশ ক'বছর তখন কারাগারে আটক থাকতে হয়েছিল। এরই প্রভাব আবিষ্কার করা হয়তো কষ্টকর নয় নওবাহার, দ্যুতি, ইমরোজ, তাহজিব, সাপ্তাহিক সৈনিক ও তমদ্দুন মজলিশ। ইসলামী ধারার ইত্যাদি প্রভৃতি পত্রিকার কোনো-কোনো লেখক ও কোনো-কোনো প্রধান ব্যক্তিদের চিন্তা-চেতনাতে ওহ্যবী, মওদুদী এবং শরীয়ত-পন্থার প্রভাব মিশ্র-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। এর সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির প্রত্যক্ষ চাপও স্থির থাকতে দেয়নি চিন্তার কেন্দ্র বিন্দুকে; নানা সময়ে দিক পরিবর্তন করেছে। ফলে চিন্তার মাত্রা বিচারে সূক্ষ্মভাবে কোনো ঐক্য রক্ষিত হয়নি। তবে ইসলামের মোটা শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত সকলেই— তাতে সন্দেহ নেই। তাহজিব এর যুক্তিবাদী চিন্তার প্রকৃতি সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করতে গিয়েই উপর্যুক্ত কথাগুলো মনে হয়েছে। তবে মওদুদীর প্রতি তাহজিবের অনুরাগ গভীর বা তাহজিবে মওলানা মওদুদীর চিন্তাধারার প্রভাব প্রকট—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মওলানা মওদুদীর কারা মুক্তির উপরে তাহজিবের প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (মে ১৯৫০, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭) সম্পাদকীয় লেখা হয়। সম্পাদকীয়তে সরকারের ভুলত্রুটি সংশোধন করা হতো। বিরূপ অথবা বিরোধীদলীয় দৃষ্টিবিন্দুতে কৌতুকপূর্ণ সমালোচনা করা হতো বিভিন্ন বিষয়ে। মওদুদীর কারা মুক্তির উপর লিখিত সম্পাদকীয় পড়লে দৃষ্টিভঙ্গিতে তাহজিবকে পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সমর্থক বলে মনে হয়। পাকিস্তানের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার নানা প্রসঙ্গের সমালোচনায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তাবেদারী অনুকারীর বৈশ্যবৃত্তি বলে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য হানা হয় এবং খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্ররূপে পাকিস্তানকে কায়েম করার লক্ষ্যে করণীয় কি, তা নির্দেশ করা হয়। "মুখে ইসলামী রাষ্ট্রের বুলি আর কাজে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুকরণ ও তাহাদের পরিত্যাজ্য শাসনযন্ত্র চালু রাখার চেষ্টা করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা দীর্ঘকাল চলিতে পারেনা। বর্তমানে পাকিস্তানে যে সমাজব্যবস্থা চালু রহিয়াছে তাহা ইসলামী নীতির বুনিয়াদে জাতি গঠনের অনুকূল নয়, ... পাকিস্তানকে খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইলে বর্তমান সামাজিক কাঠামো আমূল পরিবর্তন করা প্রয়োজন। ইহা অত্যন্ত কঠোর কর্তব্য সন্দেহ নাই। তথাপি উহাতে আমাদের ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিলে চলিবে না। দেশকে সঠিকভাবে গঠন করিতে হইলে চাই গণচেতনা। ইহা আনয়ন করিতে প্রয়োজন সুষ্ঠু সাহিত্যের। রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্রে রূপায়িত করিতে হইলে রাষ্ট্রের কর্মচারী ও জনসাধারণের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা বিস্তার অপরিহার্য কর্তব্য। ইসলামী শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রয়োজন সাহিত্যের।... মওদুদী বহু সংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন... জামায়াতে ইসলামীর মারফতে...... প্রচার করিতেছেন। এদিক দিয়া তিনি পাকিস্তানী জনগণের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।.... আল্লামার কারামুক্তিতে আমরা আন্তরিক আনন্দ লাভ করিয়াছি। তাহার সুযোগ্য নেতৃত্বে পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্রে রূপায়িত করার আন্দোলন সাফল্য মণ্ডিত হউক।"[১২২]

'তাহজিব' এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ১৩৫৭ সনের বৈশাখে প্রকাশিত হয়। নানা রকম নিয়ম কানুন প্রচার করা হয় নিয়মিত মাসিক এর মতো। কিন্তু যেহেতু ৬টি সংখ্যা পরপর প্রকাশিত হয়ে পাঠক-দরবারে আসা হঠাৎ বন্ধ করে দেয়ায়— একটি বছরের ১২টি সংখ্যাও প্রকাশিত হয়নি, তাই বিস্তারিত ফিরিস্তি অনাবশ্যক। বৈশাখ থেকে বর্ষ আরম্ভ হয়ে মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশের আশ্বাস দেয়া হয়েছিল। বার্ষিক মূল্য ধরা হয় সডাক ছয় টাকা। ষান্মাসিক তিনটাকা, প্রতি সংখ্যা আট আনা। সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ আবদুল মান্নান (জন্ম বাখরগঞ্জ ১৯১৪, মৃত্যু ১৯৮০)। ইনি অনেক গল্প কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ সেকালে লিখেছেন, পরে পাকিস্তান তথ্য-দপ্তরে কাজ পেয়েছিলেন। সাংবাদিকগিরি করেও তাঁকে খেতে হয়েছিল। তাহজিব ছাড়াও তিনি 'সাপ্তাহিক নয়া জামানা' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। গুলে বকাওলী (১৯৫৩) মহাকবি ইকবাল, সোনালী যুগের কাহিনী আরও কতিপয় বই তাঁর প্রকাশিত হয়েছিল।[১২৩]

তাহজিবে 'পৃষ্ঠপোষক' হিসেবে নাম ছাপা হতো হাকীম মওলবী আবদুল জব্বারের। 'রূপায়ন'-শিল্পী ছিলেন মাহমুদ আলম বেগ। সম্পাদক কর্তৃক তমদ্দুন প্রেস ৫০ লালবাগ রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। 'তাহজিব অফিস' হিসেবে তমদ্দুন প্রেস এর ঠিকানাই দেয়া হয়েছিল। ১নং আবুল হাসানাৎ রোড (ম্যানেজারের কার্যালয়) এর ঠিকানাও দেয়া হয়েছিল। পৃষ্ঠপোষকের নাম বড় হরফে ছাপা হতো বলে আর্থিক নির্ভরতার বিষয়টি অনুমান করা যায়। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখা হয়; "পাকিস্তান রাষ্ট্রের সম্মুখে আজ যে সংকট সন্ধিক্ষণের সূচনা হয়েছে তারই ভেতর দিয়ে আজ আমাদের যাত্রা শুরু। আড়াই বছর আগে আমরা জীবন-মরণ সংগ্রামের ভিতর দিয়ে অর্জন করেছি আমাদের আপন-ভূমির আজাদী। পাকিস্তানের ন্যায় পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্ম বিশ্বের ইতিহাসে অভূতপূর্ব।"

তাহজিবের দৃষ্টিতে পাকিস্তান কেমন, কী জিনিস ছিল— তা স্পষ্ট হয় নিম্নোক্ত এই বক্তব্যে : 'মুসলিম ভারত' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন প্রথম আত্মপ্রকাশ লাভ করেছিল মুসলিম লীগের মঞ্চ থেকে প্রাচ্যের দার্শনিক কবি ইকবালের অভিভাষণে। ১৯৪০ সালে লাহোর লীগ অধিবেশনে গৃহীত পাকিস্তান প্রস্তাবে সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করলো আল্লামা ইকবালের কল্পনা। তারপর জিন্নাহ্ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিম জাতি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন—পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। নবজাত রাষ্ট্রের সামনে সমস্যা বিভিন্ন। "তার সমাধানের জন্য জাতির প্রত্যেকটি নাগরিককে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। ভিতর ও বাইরে আমাদের রাষ্ট্রের

Dhaka University Institutional Repository

দুশমনের অন্ত নেই।... আমাদের আপাতত কর্তব্য হবে ভিতরের দুশমন দমন করা। আমাদের কওমী জিন্দেগীতে দুর্নীতির চাইতে বড় দুশমন আর কিছুই নেই। সেই দুর্নীতি ও পরাজিত মনোবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করার জন্য আমাদের অবিরাম সংগ্রাম চালাতে হবে। পাকিস্তানের দিকে দিকে এই অভিযান চালাতে হবে অব্যাহত গতিতে। 'তাহজিব' আমাদের জাতীয় জীবনের সব গলদ দূর করে সুষ্ঠুভাবে জাতি গঠনের ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবে। আমরা এই নয়া অভিযানে দেশবাসী জনগণকে কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-চিন্তানায়ক সকলকে আমন্ত্রণ করছি সহযোগিতার জন্য। আল্লাহ আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করুণ। .... ১৩৫৭ বাংলা সনের নওরোজে আমাদের দীর্ঘকালের পরিকল্পিত সাহিত্য পত্রিকা..... আত্মপ্রকাশ করিল। আজাদ পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংগঠনকার্যে দেশবাসী জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এই পত্রিকার উদ্দেশ্য।"[১২৪]

সম্পাদকীয়তে পত্রিকার রাষ্ট্র-ভাবনার স্বরূপ স্পষ্টতই ফুটে উঠেছে ; "পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র, উহাকে সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্রে রূপায়িত করার কর্তব্য কঠোর হইলেও অপরিহার্য। তাহার জন্য যেমন জাতির অপরিহার্য অঙ্গ ব্যক্তিকে (ফএরস্তঅন) আত্মসচেতন ও বলিষ্ঠ করিতে হইবে, তেমনই ইসলামী আদর্শে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে। এই ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের উপরই আমাদের জাতীয় সংহতি গড়িয়া উঠিবে। প্রত্যেক নাগরিক নিজেকে দেশ ও জাতির গৌরব রক্ষার কঠোর সংগ্রামের সৈনিক বলিয়া মনে করিলে ও বলিষ্ঠ আত্মচেতনার অধিকারী হইলে তবেই আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত্তিমূল মজবুত হইবে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদর্শ হইবে উহাই। বিলাসের সাহিত্য আমাদের জাতি গঠনের অনুকূল নয়। আমাদের কবি-সাহিত্যিক -দার্শনিক ও চিন্তানায়করাই জাতির পথ নির্দেশ করিবেন।"[১২৫]

'পাকিস্তানের বেতার' এ অনুষ্ঠান প্রচারের নিম্নমানের এবং ভিতরে 'কোন্দল'- 'গোলযোগের' কঠোর সমালোচনা করে বলা হয় 'আশা করি' কর্তৃপক্ষ জাতির প্রেরণা সঞ্চারের অনুকূল কওমী-সংগীত, ইসলামী-নীতিমূলক নাটিকা ও রাষ্ট্র- গঠনমূলক আলোচনার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া প্রেমের গান ও সস্তা নাটিকা (অর্থহীন হাস্যরসের) অভিনয় কমাইতে চেষ্টা করিবেন।'

১৯৫০ সনের দাঙ্গার বিষয়ে তৎকালের সকল সাহিত্য-পত্রিকাই মতামত ব্যক্ত করেছে। মোটামুটিভাবে দেখা যায় দাঙ্গা যে এদেশের মানুষ সাধারণভাবে চায়না—তাই-ই ফুটে উঠেছে সমস্ত পত্রিকার ভাষ্যগুলোতে। তাহজিবও দাঙ্গার উস্কানীদানের জন্য পশ্চিম বাংলার ভূমিকাকে মন্দ বলেছে। আরও বলা হয়েছে এদেশে দাঙ্গা না হলেও দাঙ্গার কথা যারা বলে বেড়িয়েছে তাদের অধিকাংশই বাস্তুত্যাগী, দুই নৌকায় পা দিয়ে চলে যারা—তারা। তবে 'ইমরোজ' এবং 'তাহজিব'-এরা এদেশের সুযোগ-সন্ধানী কতিপয় দুষ্টলোকের ভূমিকাকে নিন্দা করেছেন। ইকবালের স্মৃতিবার্ষিকী ছাড়াও রমজান, ও ইকবালের সাহিত্য এবং জিন্না ও পাকিস্তানের প্রশাসন, রাজনীতি, সাংস্কৃতিক-অংগন, প্রচার বিভাগ, বেতার, সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি, পাক-ভারত চুক্তি, পূর্ববঙ্গের নতুন গভর্ণর, উদ্বাস্তু ও মোহাজের-সমস্যা এবং 'সাহিত্যে শয়তানী' বা বৈশ্যবৃত্তি, অবক্ষয়, 'ব্যক্তি-স্বাধীনতার নমুনা', বাঙলা ভাষার বানান সংস্কার, পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থা, ইসলামী ইতিহাস উপেক্ষিত কেন, পাকিস্তানের মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট : পূর্বপাকিস্তানে গণবিক্ষোভ' প্রভৃতি শিরোনামে প্রাসঙ্গিক আলোচনা-সমালোচনার দ্বারা মতামত দিয়ে পূর্ববাঙলার সামাজিক- রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক স্বার্থ ও বাঙলা সাহিত্যের উন্নতি-অগ্রগতির জন্য তাহজিবের প্রচেষ্টা মোটামুটি প্রশংসনীয়। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মানবতাবাদী দর্শনে আস্থাশীল লেখকবৃন্দের 'মুক্তি' পত্রিকার উচ্ছসিত, প্রশংসাত্মক সমালোচনা প্রকাশ করার মধ্য দিয়েও এঁদের উদার-নৈতিক সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা প্রকাশিত হয়েছে। তরীকুল আলম লিখিত এই সমালোচনায়— 'মুক্তি'-র ন্যায় উচ্চ-আদর্শের উন্নত-মানের সাহিত্য পত্রিকাটি কি শেষকালে টিকে থাকবে? — এই সংশয়ে শঙ্কিত হয়ে ব্যক্ত হয়েছে এই উক্তি : "আমাদের এই নিতান্ত দুর্ভাগা দেশে ভালো সাময়িকপত্রের আয়ু অত্যন্ত ক্ষীণ। এই ক্ষীণ আয়ুর থেকে মুক্তির মুক্তিলাভ সংস্কৃতি-অনুরাগী মাত্রেরই কাম্য। সাহিত্য-ক্ষেত্রের গতানুগতিকতার বেদনাদায়ক অনুভূতি থেকে রেহাই পাবার একটা পথ-সঙ্কেত মুক্তি দিয়েছে।... প্রগতি বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের তথাকথিত আওয়াজে মুষড়ে যাওয়া মন 'মুক্তির' প্রগতি-অনুসারী আন্দোলনকে অভিনন্দিত করছে। সাহিত্যিক মান নির্ধারণের একটা সুস্পষ্টতা প্রদর্শনে মুক্তির শুভ প্রচেষ্টা আন্তরিক ধন্যবাদার্হ।"[১২৬] উদারতার কারণেই তাহজিবে মুক্তির মত বামপন্থী পত্রিকার প্রশংসা ছাপা হয়েছে সন্দেহ নেই।

একালের সকল পত্রিকার মতোই তাহজিবও তৎকালের প্রধান কবি ফররুখ আহমদের 'পাকস্তুকুমত' শীর্ষক কবিতা ধারণ করে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন হাবীবুর রহমানও প্রায় প্রত্যেক পত্রিকাতেই লিখেছেন। শামসুর রাহমানের লেখাও দেখা যায় অনেক পত্রিকাতে, প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই। হায়াত দারাজ খান পশ্চিম পাকিস্তানের কবি। তাঁর লেখাও এদেশের বাংলা পত্রিকায় অনূদিত হতো। তরীকুল আলম, জহুরুল আলম এবং আনোয়ারা বেগম তিন ভাই-বোন একই সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে এসেছিলেন। গল্প কবিতা লিখতেন। তাহজিবে এঁদের সকলের লেখাই ছাপা হয়েছে। বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের গল্প 'স্বাদ' (১/১) ; আবুল কালাম শামসুদ্দীনের গল্প 'পথ জানা নাই' (১/১) ; এবং 'কাশবনের কন্যা' শীর্ষক প্রখ্যাত উপন্যাস তাহজিবেই ধারাবাহিক (প্রথমবর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে —) প্রকাশিত হয়। আর এক খ্যাতিমান কথা-শিল্পী শাহেদ আলীর বহুল পঠিত 'একই সমতলে' (১/৪) ; ভাঙ্গন (১/২) ; প্রভৃতি গল্পও এতে ছাপা হয়। পূর্ব বাংলার, বিশেষ করে ঢাকার সন্তান-কবি-লেখক-সাহিত্যিক কিরণ শংকর সেনগুপ্ত তৎকালের পূর্ববঙ্গের সকল শ্রেণীর পত্রিকাতেই কবিতা লিখতেন, তাহজিবেও লিখেছেন। আশরাফ সিদ্দিকী, মুফাখখারুল ইসলাম, আহসান হাবীব, আতোয়ার রহমান, হাসান জামান, রওশন ইজদানী, আবু রুশদ, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী প্রমুখ শক্তিশালী লেখকেরা যেমন এতে লিখেছেন, তেমনি উর্দু বাতচিতের অনুরাগী মীজানুর রহমানের মতো 'মাদেরী জবান'-বিরোধী লেখকের রচনাও তাহজিব ছেপেছে। তখন এই রকম ছিল,— হিন্দু লেখকেরা লিখেছেন; আবার পাকিস্তান, ইসলাম ও উর্দুর ওকালতী করেন— তাঁদেরও লেখা ছেপেছেন পত্রিকার সম্পাদকেরা। বিশেষ দৃঢ় কোনো মহৎ মটোর অভাব এবং পাকিস্তানে সকলের গভীর আস্থা— এটাই ছিল সঙ্গতিহীনতার প্রধান কারণ। শিখার মতো পত্রিকা একালে খুব কম প্রকাশিত হয়েছে। হাসান হাফিজুর রহমান তাহজিবে লিখলেও একেবারে ভুলে যেতে পারেননি তাঁর স্বকীয়ত্ব।

আহমদ শরীফ নওবাহারে লিখলেও তিনি যে কালে আহমদ শরীফ হবেন — তা বোঝা যায়। অর্থাৎ একালের আহমদ শরীফের রচনা-বৈশিষ্ট্য নওবাহারের এবং পঞ্চাশ-বায়ান্নোর সময়কালের রচনাতেও হয়েছে প্রকটিত। তাহ্‌জিবের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যাতে হাসান হাফিজুর রহমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল, শিরোনাম : 'পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যের ভূমিকা'। ১৯৫০ সনের বাংলাদেশে এমন গদ্য তখন অনেকেই লিখতে পারতেন না। হাসান হাফিজুর রহমানের (১৯৩২-৮৩) বয়সই বা তখন কতো। কিন্তু চিন্তা ও ভাষার দিক থেকে কে বলবে যে তিনি তখনো 'টিন এজার' মাত্র? তাঁর এই রচনাটি এখনও অগ্রন্থিত। কাঁচা বয়সের কাঁচা লেখা বলেই হয়তো এর প্রতি কোন গুরুত্ব ছিল না। তবে গবেষণার জন্য লেখাটা গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যের রীতি, ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রচলিত বিতর্ককে সামনে রেখে প্রগতিশীলতাকে সমর্থন করে উপর্যুক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন ;

"রসের খাতিরে ও প্রয়োজনের তাগিদে যেমন দেশকাল পাত্রের বাদ-বিচার আমরা করিনি, সৃষ্টির বেলাতেও তেমনি একটা মৌলিকতাকে নিরপেক্ষ স্বীকৃতি দিতে হবে। নতুন সাহিত্য গড়ার নামে হাতুড়ী পেটানোর বুকফাটা আহবানেই এই মৌলিকতার জরায়ুর কোষে ঘুমন্ত ভ্রুণ খানখান হয়ে ফেটে পড়বে এ যেমন সহসা আশা করা যায় না, তেমনি নৈরাশ্যের কালো শিরার চাবুক খেয়ে নীল হয়ে যাওয়াকেও ক্ষমা করতে পারিনি। 'স্বাধীনতা' যদি নতুন পরিবেশের সৃষ্টি করেই থাকে, 'উত্তীর্ণ' সাহিত্যে তা ধরা পড়বেই, কেননা জনতার অগ্রগতির সঙ্গে পা মিলিয়ে এর আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখ ও সংগ্রামকে যে চিত্রায়িত করে তুলছে সেইতো সাহিত্য, এগিয়ে চলাই এর মৌলিকতা এবং এ মৌলিকতা নিরপেক্ষ..... এ সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে কোন উত্তীর্ণ শিল্প কর্ম্ম সমকালীন পরিস্থিতিকে ভাস্কর্য দেবে, কিন্তু এরা হাতিয়ার হতে পারে না। তাহলে সূচিত ঐতিহ্যের স্বকীয়তা থাকবে কি করে? আজকের সাহিত্য শুধু আজকের জন্যেই নয়— বিপ্লবের পরেও শিল্প-সাহিত্য টেকে এবং টিকবে। কারণ বিপ্লব ঐতিহ্যকে ধ্বংস করেনা, বিকৃতও করেনা। এ যেমন সমাজকে নতুন রূপ দেয়, ঐতিহ্যকেও নতুন কাঠামোয় সার্থক করে তোলে। অপর পক্ষে এই ঐতিহ্যই তো সাহিত্যকে চলার শক্তি যোগায়।..... ভাব ও সাহিত্য— সংস্কৃতির ভেতরও এক বিশ্বজনীন অনুভূতির সংযোগ ঘটেছে ; আমরা এই যে এক যুগে সাহিত্যের উত্তরাধিকারী বলে যারা ভাবতে চাই তারা যদি সমগ্র বিশ্বসাহিত্যকে নিজেদের সম্পত্তি ধরে নিই তবে ভুল করবোনা মোটেই। সেই হিসেবে সংস্কৃতির এই নবতর উত্তরাধিকারী আমরা সবচেয়ে বেশী সমৃদ্ধিশালী। .... রাজনীতি আধিপত্য করছে সমাজের উপর। সাহিত্যও এখন রাজনীতিকে এড়িয়ে এগিয়ে চলার খামখেয়ালী কথা ভাবতে পারেনা— এবং এওতো চোখ মেললেই দেখছি রাজনীতি এখন ঘরের কোণে মাথা ঠুকে মরছে না, আর সারা বিশ্বকে নিয়ে ঘর বাধবার জন্য লেগে গেছে।

..... ধনিক ও সর্বহারার সংঘর্ষ হচ্ছে ; সেটা ভালো, পৃথিবীর সভ্যতাও মুক্তির জন্যে যার প্রয়োজন তার জয় হবেই। ... সুতরাং কোন পরিস্থিতিই আমাদের প্রগতিশীল সৃষ্টির কাজের (পথে) অসহযোগ আনতে পারেনা। আমরা যদি পূর্বপাকিস্তানের নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করার নামে এর এই স্বাভাবিকভাবে পরিণতিমুখী ভাষা, ভাব ও রচনারীতিকে সম্বন্ধহীন কোন কাঠামোয় ভেঙ্গেচুরে নতুন প্রচেষ্টা চালাই তবে তাদের প্রতিক্রিয়াশীলতা ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না। জনগণের স্বাভাবিক পরিবর্ধমান চেতনা ও মননের উৎকর্ষ থেকে ধারা কেটে প্রগতিরই পরিপন্থী হয়ে পড়ব আমরা। এই মুখোসী স্বাধীনতাকেই কায়েমী করার উদ্দেশ্য থাকলেই আমাদের বিভ্রান্ত ও পঙ্গু করার এই রকম একটা ষড়যন্ত্র উঠতে পারে। জনচেতনাকে ভয় করাতেই এর কারণ আর জনচেতনাকে আচ্ছন্ন করতেই এর উদ্ভব। বিভিন্ন জাতির ভেতর সাম্য এবং ঐক্য আনার যে কথা উঠেছে তাকে রূপায়িত করার জন্যে যদি স্বাভাবিক বিবর্তনের উর্ধেও কোন অজুহাত থাকে তা ঐ ঐতিহ্যের ভেতর দিয়েই আসতে পারে। জোর দেব আমরা সেইখানে। জাতীয় অক্ষর সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে লোপ করার দূরভিসন্ধিকে কোন ক্ষমাই নেই। এ হলো হামলা। ধ্বংস করা হবে ঐতিহ্যকে যা তিলেতিলে গড়ে উঠেছে। আজকের মৌলিক ও নতুন সাহিত্য হবে কেবলমাত্র তাই যা এই যুগচেতনাকে চিহ্নিত করে। এই যুগচেতনায় অসন্তোষ, অস্বস্তি, ঘৃণা এবং এরই সঙ্গে পাশাপাশি জাগরী সংগ্রামী পৌরষ। একদিকে অর্থনৈতিক চাপে সাধারণের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা বিলোপ অন্য দিকে অপচয়-বিলাস। এর থেকে ধোকা দিয়ে কোন পারিকল্পিত প্রয়াসেরই মুখোসগুলো নির্মম আঘাতে একবার ছিন্নমার করে দিই যেন। সাহিত্যকে ভালোবাসলে এযুগটাকে বিকৃত করলে চলবেনা; এই.... বলি : প্রত্যেক যুগ-সূচিত অবস্থাই সেই সময়ের ঐতিহ্যের স্বকীয়তায় পূরক। পরে এই বিভিন্নতাই এক সাধারণ রূপ নিচ্ছে। আর সাহিত্য নিরপেক্ষভাবে যুগচিহ্নবহন করে এক অখণ্ড শিল্পকর্ম্মে হচ্ছে সংঘবদ্ধ। সেই জন্যেই সাহিত্য একদিকে যেমন কলাসমৃদ্ধ রসসৃষ্টি অন্যদিকে তেমনি একটি প্রয়োজনীয় শিল্পকর্ম্ম যা আমাদের অভিজ্ঞতা, মননের ও রুচির প্রতীক।

এতখানি বলতেই হলো, কেননা আমাদের সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন আকাশে কোন শকুনের ছায়া কাঁপতে দেখলে আমরা চঞ্চল হয়ে উঠবোই— আমরা যারা দেশকে ভালবাসি—দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে যারা আপনার করে জেনেছি। এখানে এরকম সবদলকেই উদ্দেশ্য করছি যারা সাহিত্যকে শুধুই সাময়িক সত্বাহীন হাতিয়ার করতে চায় আর যারা জনজাগ্রত সাহিত্যের একেবারে ধ্বংস চায়। আমরা তো স্বীকার করিই যুগের কামনাকে নিরপেক্ষ বিচার করতে এবং একে ঘোষণা করতে উত্তীর্ণ সাহিত্য কখনও ভুল করেনা, আর ভুল করেনা দেখেই তো সে বেঁচে থাকে।.... নিরপেক্ষ বিচার করতে যেয়ে সাহিত্যিক যে নিরপেক্ষই রয়ে যাবেন শেষ পর্যন্ত এত নয়ই। যুগচেতনার সত্যকে আবিস্কার করার দায়িত্বে তিনি নিরপেক্ষ— কোন বিভ্রান্তকারী প্ররোচনাই তাকে টলাবে না। ঠিকঠাক আবিষ্কার করলে সে সত্যকে স্বার্থক করার জন্যে সংগ্রামী হতেও পারেন তিনি। এবং এর জন্যে উচিত ও নির্ভুল পন্থাই তিনি নেবেন এবং ঘোষণাও করবেন সাহিত্যে।

বাংলা সাহিত্যকে দুভাগ করে ফেলছি ; কারণ, বাংলার বুক চিরে দ্বিখণ্ড হয়ে গেছে ; এর সমাজ, রাষ্ট্রচিন্তা এবং বৈদেশিক সংযোগ যখন বিচ্ছিন্ন, এর সাহিত্যও যে আলাদা মোড় নেবে এ এমন কিছু চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবার মতো বিষয় নয়। অথচ এর ফলেই বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সমৃদ্ধ অংশটাকে আমরা হারিয়ে ফেল্লাম এরকম ধরে নেয়ারও কোন অজুহাত নেই। এ প্রস্তাবটায় এটুকু নিছক সত্য যে বাংলা সাহিত্য দুভাগ হয়ে গেছে ; দুধারায় এরা বয়ে চলবে এখন, হয়ত ভাষারও বিভিন্নতা আসবে এদের ভেতর ; ব্যস্ ; এরচেয়ে একটুকরো কথাও বেশী নেই এতে। বিশ্ব-সাহিত্য- সংস্কৃতিকে সম্পত্তি বলে ভাবতে পারি, প্রতিবেশী বাংলা সাহিত্যও তেমনি, (এর সঙ্গে আমাদের) সম্পর্ক গভীর নয় এরকম মনে করার কোন কারণ কোনদিন ঘটবে বলে

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাস রাখিনে। বিশেষ করে ভাষাগত ঐক্য থাকার জন্যেই আমাদের সম্বন্ধ আরও অবিচ্ছেদ্য, গূঢ় ও গভীর।

হিন্দু ভাবপ্রধান আওতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিছক বাংলা ভাষাতেই ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করার প্রচেষ্টাকেই ধরা যাক : 'বাংলা ভাষাতেই দুটো বিভিন্ন সামাজিক চিত্রাঙ্কন চলছে— তখন দেশ ছিল অখণ্ড ; জনগণের অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষাও ছিল এক। অথচ জীবনধারার পদ্ধতির, ঘরকন্যার রুচির, ধর্ম্মগত চিন্তার কি এপিঠ ওপিঠ না দেখেছি! কিন্তু এতেই কি বলতে পারি এই দ্বিমুখী সাধনায় বাংলা ভাষার মূলগত ঐতিহ্যিক ঐক্য অসংহত হয়ে পড়েছিল? রচনারীতির বিভিন্নতা ছিল— ভাবধারারও বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করিনা অথচ এর অন্তস্রোতা ঐতিহ্যিক পরিশীলন কি সমানভাবে পরিপুষ্ট ও বিতরিত হয়নি? সমান উৎকর্ষ লাভ করেনি?"[১২৭]

আলোচ্য লেখকদের বাইরেও অনেক লেখক তাহজিবের সূচীপত্র দখল করেছিলেন। পাকিস্তান আমলে বাংলা একাডেমী পুরস্কার-প্রাপ্ত পাকিস্তানবাদী-নাট্যকার আশকার ইবনে শাইখের নাটক 'শাহের জাদী' তাহজিবের প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া লিখেছেন : মমতাজ বেগম; মাহমুদ আলম বেগ; নুরুদ্দিন আহমদ; আবদুর রশীদ খান; এ. কে. এস. নূর মোহাম্মদ ; ডঃ এম আবদুল কাদের ; অধ্যাপক অমূল্য কুমার দাসগুপ্ত ; ডাঃ মোহাম্মদ হোসেন ; অধ্যাপক আবু তালিব ; মোহাম্মদ আবদুর রহীম ; আবদুল গফুর ; নাজির আহমদ ; মোহাম্মদ মামুন ; অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ; আহসান হাবীব ; আবদুর রশীদ খান ; বদরুল হাসান ; সিদ্দিক আহমদ খান ; মোহাম্মদ ফরিদউদ্দীন ; কামরুল ইসলাম ; মাহফুজুল হক ; আবদুল গনি মাহমুদ, অচিন্ত্য চক্রবর্তী, মতিউল ইসলাম ; মুযহারুল ইসলাম ; মোহাম্মদ আমীন খান ; নুরুন্নাহার ; জাহানারা আরজু ; মীর খুরশেদ আলম ; আহমদ ফরিদ উদ্দীন ; দৌলতন্নেসা খাতুন ; মোসলেম উদ্দীন ; মোস্তফা কামাল ; শ্রীমন্মথনাথ সরকার, মাহমুদুল হক, সৈয়দ মকসুদ আলী প্রমুখ।

অনেক গল্প, কবিতা এতে রসের যোগান দিয়েছিল আর নিবৃত্ত করেছিল পাঠকের মানসিক ক্ষুধা-তৃষ্ণা। সমাজের নানা বিষয় আলোচিত হওয়ায় সচেতনতা বৃদ্ধি করেছিল নি:সন্দেহে। লেখকদের লিখবার সুযোগ যেখানে যে দেশে এখনও সীমিত— সেখানে সে দেশে তাহজিব এর প্লাটফর্মে শিক্ষানবীশ লেখকেরা লিখে হাত পাকাবার অবকাশ পেয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দেশের সমাজের মানুষের কথা যেভাবে যা ভেবেছিলেন তা প্রকাশ করতে পেরেছিলেন তাহজিবের মাধ্যমে, এটা কম কথা নয়।

৭. দ্যুতি (প্রথম পর্যায় ১৩৫৬-৫৭ ; দ্বিতীয় পর্যায় ১৩৫৮-৬০)

প্রথমে 'দ্যুতি' আবেদ আলীর সম্পাদনায় ভাদ্র ১৩৫৬ (১৯৪৯ সনের আগষ্ট) মাসে হামেদ শফিউল ইসলাম কর্তৃক ১১৫ সেগুন বাগান, রমনা, ঢাকা ইয়াং পিপলস্ এসোসিয়েশন 'এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়। ক্লাবের (Y.P.A) পক্ষ থেকে প্রথমে বলা হয় "শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক দিক দিয়া শিশুদিগকে সর্বোতভাবে উন্নত করিবার মহান ব্রত লইয়া প্রতিষ্ঠানটি কলিকাতাস্থ পার্ক সার্কাস নামক অঞ্চলে ১৯৪৫ সনের নভেম্বর মাসে জন্ম লাভ করে। দেশ বিভাগের পর প্রধান শাখা ঢাকায় স্থানান্তরিত হয় এবং প্রতিষ্ঠানটিকে তরুণ ও শিশু উভয়ের জন্য সম্প্রসারিত করা হয়। ক্লাবের তরুণদের জন্য যে শাখা স্থাপিত হয় তাহার নূতন নাম করণ করা হয় ইয়ং পিপলস এসোসিয়েশন এবং ইহারই সাংস্কৃতিক বিভাগ হইতে সমগ্র বাংলার তরুণ সমাজের নিকট সংস্কৃতিমূলক মাসিক 'দ্যুতি' প্রকাশিত হইল।" ঢাকায় এঁরা হাসান শফী স্মৃতি ফুটবল লীগ ও স্যার নাসিম আলী মেমোরিয়াল ফুটবল প্রতিযোগিতা চালু করেন (১৯৪৮)। খেলাগুলিতে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও রাজনীতিক জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার ও তৎকালীন গভর্ণর সভাপতিত্ব করেছিলেন। পনেরই আগষ্ট ১৯৪৮ এ 'স্বাধীনতা দিবস' উদযাপন করা হয় ক্লাবের পক্ষ থেকে। তাছাড়া কায়েদে আজমের মহাপ্রয়াণে (১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮) শোক সভা ও নানা সাহিত্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড তথা — কবিতা আবৃত্তি, নাটক অভিনয় করানো হয়। 'দ্যুতি' প্রকাশের পূর্বে তাঁরা কিছুকাল 'শিখা' নামে একটি পাক্ষিক দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। প্রথম দিকের 'দ্যুতি' শীর্ষক পত্রিকার 'কৈফিয়ত' শিরোনামের সম্পাদকীয়তে বলা হয় : "অনেক মাসিক পত্রিকা আত্ম প্রকাশ করেছে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় এবং অন্যান্য মফস্বল শহরে, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের পর্যায়ভুক্ত ছেলেমেয়েদের জন্যে একটিও কাগজ প্রকাশিত হয়নি। আজকের ছাত্র-ছাত্রীসমাজের অবচেতনাতে যে বহুমুখী প্রতিভা লুক্কায়িত আছে, তাকে আঁধার থেকে আলোতে আনবার জন্যে আজ 'দ্যুতি'র প্রয়োজন হইয়াছে।" এতে আরও বলা হয়; 'শিশুদের জন্য পত্রিকা দুএকটি প্রকাশিত হয়েছে- কিন্তু তরুণদের জন্য সাহিত্যচর্চার কোন ক্ষেত্র নেই,-তরুণরা নানা অলস-চিন্তায় তাদের প্রতিভা বিসর্জন দিচ্ছে এবং নৈতিক আর চারিত্রিক অবনতি ঘটাচ্ছে। মফস্বল শহরের অবস্থা আরও খারাপ। অথচ সাহিত্য মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত জরুরী।' কারণ এর মধ্য দিয়েই মানুষের সমাজের ইতিহাসের পরিবর্তন সাধিত হয়। "তাই আজকে যখন পূর্ব পাকিস্তানে তরুণদল অন্ধকারে তলিয়ে যাবার যোগাড় করেছে অতি দ্রুত তালে তখন প্রায় একাকী আমরা একদল তরুণ এই ভীষণ গতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তাকে রোধ করবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম ; জানিনা কতদূর সফল হবে আমাদের এই সাধনা। কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি করবনা আমরা কোনক্রমেই। সাহিত্যই জাতীয় জীবনের অগ্রগতির প্রধান সহায়। যুগে যুগে দেশে দেশে, সাহিত্যই জাতির প্রাণে যুগিয়ে এসেছে প্রেরণার প্রবাহ এবং তার ফলেই জগতের সর্বত্র দেখা গিয়েছে পরিবর্তনের সফলতা। এজন্যেই আমরাও সাহিত্যের মধ্যদিয়েই আমাদের মত তরুণদের সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে নিবিড় অন্তরঙ্গতার মধ্যে স্বাধীন দেশের সত্যিকার আদর্শ অধিবাসী হয়ে উঠতে সংকল্প করেছি। আশা করি সকলের কাছ থেকেই যোগ্য সাড়া পাব।"[১২৮]

'আমাদের কথায় পত্রিকাটি স্বকীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে গিয়ে যা বলেছে, তাতে তাঁদের সমাজভাবনা এবং তৎকালীন (১৯৪৮-১৯৪৯) পরিবেশের স্বরূপ কিছুটা জানতে সাহায্য করে ঃ "স্বাধীনতার চেয়ে শ্রেষ্ঠবস্তু জগতে আর কিছুই নেই,...... স্বাধীনতার মধ্যেই প্রাণীর স্বার্থকতা। মানুষ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তাই স্বাধীনতাকে সে জীবনের শ্রেষ্ঠতম অবদান বলে গ্রহণ করে ; আর পরাধীনতা হতে মুক্তি পাবার জন্য প্রাণ দেয় অকুণ্ঠিতচিত্তে। দ্বিধাহীন চিত্তে

Dhaka University Institutional Repository

অগণিত বীর রক্ত দিয়েছে। তাই পেয়েছি আমরা স্বাধীনতা দুটি বছর আগে। মৃত প্রায় জাতির জীবনে সেদিন উঠেছিল বিরাট আলোড়ন—জনসাধারণের বুকে জেগেছিল বিপুল সাড়া আশা ; আজ তারা মানুষের মত বাঁচবে। কিন্তু আজ দুটি বছর পরে তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে- খাওয়া, পরা, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যা থেকে তারা দুশো বছর বঞ্চিত, আজও তারা তা পেলো না কেন তাদের জাতীয় সরকারের কাছ থেকে? মাঠে খেটে চলেছে চাষী, শ্রমিক কাজ করে চলেছে নানা কলকারখানায়, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সর্বশক্তি নিয়োগ করে বাঁচিয়ে রেখেছে জাতীয় সরকারকে। এই বন্ধ্যা কর্ম্মধারা আজ কোন পথে প্রবাহিত? কে ভোগ করছে তাদের পরিশ্রমের ফল? স্বাধীনতা পাওয়ার আগে রাজশক্তি তাদের এই কর্ম্মফল ভোগ করত কিন্তু আজ তো তারা নেই, তবু কেন তারা বঞ্চিত? কেন বঞ্চিত তারা খাওয়াপরা থেকে? সুস্থ জীবন থেকে? এ প্রশ্নের সমাধান নেই—ক্ষুব্ধ জাগ্রত জনতা আজ এ প্রশ্নের সমাধান চায় তাদের জাতীয় সরকারের কাছ থেকে। আমাদের ঐকান্তিক কামনা, যেন জাতীয় সরকার শিশু রাষ্ট্র ও নানা অসুবিধা আপত্তির কথা তুলে.... এ প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে না যান— তাঁরা যেন নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেন এই প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।"[১২৯]

'আমাদের ভবিষ্যত সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে তৎকালীন বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক মোহাম্মদ মোদাব্বের সংস্কৃতি ও সাহিত্য-জগতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ছড়ি ঘুরানোকে নিন্দা করেছেন। সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে সংস্কৃতির রূপায়ণ করার পক্ষে মত ব্যক্ত করে তিনি বলেন, সাহিত্যশিল্প স্রষ্ঠাদের কল্যাণধর্ম সামনে রেখে সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করতে হবে। "মানবতা বোধ হইবে তাহার ভিত্তি। ধর্ম্ম, জাতি, সম্প্রদায় ও শ্রেণীর উর্ধে থাকিয়া যে সমাজকে অবলোকন করিবে, সেই হইবে সত্য দ্রষ্টা, সেই স্রষ্টা। সংস্কৃতির স্বার্থক রূপায়ণ তাহার দ্বারাই সম্ভব।"[১৩০]

'স্বাধীনতার অর্থ' শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী ব্যাপক জনগণের জীবনের স্বস্তি ও উন্নতিকে স্বাধীনতা বলে বুঝাতে চেয়েছেন এবং উপসংহারে মন্তব্য করেছেন। "সুতরাং আজকের দিনে স্বাধীনতার অর্থ কি এ প্রশ্নের একটা জবাব আমাদের খাড়া করতেই হবে।"[১৩১] দ্যুতিতে প্রগতিশীল কথা চিন্তা ছিল নিঃসন্দেহে। 'দ্যুতি' নামকরণ সার্থক হবারই কথা ছিল। 'অগত্যা' (আষাঢ় ১৩৫৬) পত্রিকার সঙ্গে এঁরা আদর্শগত এবং গন্তব্যগত ঐক্য ও সাযুজ্য লক্ষ্য করেছিলেন বলেই অগত্যাকে 'সহযোগী' পত্রিকা বলে উল্লেখ করেছিলেন তাঁরা। অবশ্য পরক্ষণেই আবার সংশোধনী দিয়ে 'সহযোগী' কথাটা বাদ দিয়ে পড়ার জন্য পাঠককে অনুরোধ করেছিলেন। জনৈক পাঠিকা চিঠিপত্র ('যোগাযোগ' বিভাগে) পত্র লিখেছিলেন ঃ "মাস খানেক আগে ভাল পত্রিকার অভাব দূর করবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নেহাৎ যেন বাধ্য হয়েই 'অগত্যা' বের হলো। আর তার পরেই আপনারা হঠাৎ চারদিক আলো করে বেরিয়ে পড়ছেন। এখন অগত্যা মহাশয় কি তবে অগত্যা বিদায় নেবেন?" এ-প্রেক্ষিতে 'দ্যুতি'র বক্তব্য : "দেখুন অগত্যা' আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ, সুতরাং তাকে নিয়ে রসিকতা করে বেয়াদপি করতে চাইনা। (তবে) ভালো পত্রিকা চালানোর গুরুভার 'অগত্যা'র কাঁধে আর সইছিলনা। তাই আমরা তা বহন করতে এগিয়ে এসেছি। তবে একেবারেই লাঘব করলে আমাদের উপর বেশী চাপ পড়বে, তাই তাকে বিদায় নিতে আমরা বলব না। তবে নামটা, আমাদেরটা প্রকাশের পর অর্থহীন হয়ে পড়ল কি বলেন?"

দ্যুতির 'দেশের সাংস্কৃতিক উন্নতি'... শীর্ষক রচনায় বল হয় ঃ 'নিজেদের বাঁচাতে' সাংস্কৃতিক উন্নতির দুর্গমপথে নিষ্ঠার সঙ্গে আলো দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হিসেবে আত্ম প্রকাশ করেছে। তবে তা 'সংকেতের' মত করবেনা আবর্জনা সৃষ্টি। তাঁরা আরও বলেন : 'দ্যুতি' পড়লেই আপনার সে অশংকা দূর হবে, 'সংকেতের মত 'দ্যুতি' সাহিত্যে আবর্জনা সৃষ্টি করবেনা। বরং সাহিত্যে আবর্জনা সৃষ্টিকারী এইরূপ পত্রিকাগুলোকে নির্মূল করবে। 'দ্যুতি কেবল খ্যাতিসম্পন্ন লেখকলেখিকাদের লেখা দিয়ে পূর্ণ করবার' ইচ্ছা পোষণ করেনি। যাঁরা নবীণ ও অখ্যাত দ্যুতি তাঁদের 'অসুবিধা' দূর করতে চায়। 'লেখা প্রকাশের ব্যাপারে লিখিত বস্তুর উপরই লক্ষ্য রাখি—লেখক বা লেখিকার খ্যাতির উপর নয়। প্রকাশযোগ্য হলে আমরা প্রত্যেকেরই লেখা ছাপাই। তবে আমরা আশা করছি যে তরুণ সমাজেই দ্যুতি বেশী আদৃত হবে।..... মাসিক পত্রিকা এবং সাময়িক পত্রিকাজগতে যে অন্ধকার পরিব্যাপ্ত রয়েছে ..... 'দ্যুতি' তাতে আলো দেখাবে—এ-বিশ্বাস আমাদের আছে, আর আছে বলেই তা কার্যকরী করেছি।'

'দ্যুতি'র প্রথম সংখ্যা কায়েদে আজমের ছবি প্রচ্ছদে ধারণ করে স্বাধীনতা সংখ্যারূপে (আগষ্ট '৪৯) প্রকাশিত হয়। একদল যুবকের নাম উৎকীর্ণ 'দ্যুতি'র সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন মতিউর রহমান চৌধুরী। ইহ্‌সানুল হক, আজিজুল জলিল, মাহমুদ হাসান, মোসলেহ্ উদ্দীন আহমদ। উপদেষ্টা : হরিপদ দে ; সংগঠন সভাপতি : আবেদ আলী। কর্মপরিষদের সদস্য ছিলেন হামেদ সফিউল ইসলাম (ম্যানেজার) ; কাজী শামসুজ্জামান ('প্রচারে ও বিজ্ঞাপনে') ; আহমদ শামসুল ইসলাম ('প্রধান উপদেষ্টা')। উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে ছিল - "দ্যুতি সাংস্কৃতিক পত্রিকা ; তরুণ লেখক লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়াই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। ইহা কোন রাজনৈতিক দলীয় পত্রিকা নহে। সাম্প্রদায়িকতার কোন চিহ্নই এখানে নাই। বাংলা ভাষার সেবা ও উন্নতি বিধান ইহার চরম লক্ষ্য।" নিয়মাবলীতে বলা হয় : বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হবে। ভাদ্র থেকে বর্ষ আরম্ভ। বার্ষিক চাঁদা ৬ টাকা। প্রতি সংখ্যা আট আনা। ক্লাবের সদস্যদের জন্য প্রতি সংখ্যা ছয় আনা।

ইয়ং পিপলস এসোসিয়েশন ও চিলড্রেনস ওন ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন গভর্ণর স্বয়ং ফিরোজ খান নুন। সেজন্যেই গভর্ণমেন্টের বিরূপ সমালোচনাকারী অগত্যাকে তাঁরা 'সহযোগী' পরিচয় দিয়েও অস্বীকার করতে চেয়েছেন। ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে উল্লেখিত হয় গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক চ্যামারস বোর্ণ ; পৃষ্ঠপোষক ; অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ ; জনাব লাবিব উদ্দীন সিদ্দিকী ; সভাপতি ঃ জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার। সহ সভাপতি ; জনাব এম. এ. জব্বার, জনাব পানাউল্লাহ আহমদ এবং জনাব ওয়াজেদ আলী সরকার। সাধারণ সম্পাদক ঃ জনাব আহমদ শামসুল ইসলাম। নানান পদাধিকারী ছিলেন আরও কতিপয় যেমন ; এম. এ. সামাদ, শামসুজ্জামান, নাজীর আফজাল, আবদুস শুকুর, সুজাউল ইসলাম প্রমুখ।

দ্যুতির প্রথম পর্যায়ে সম্ভবত পাঁচটি সংখ্যা বের হয়েছিল। কিন্তু অনুসন্ধানে দুটি সংখ্যা মাত্র পাওয়া যায়। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার পরের দুটি সংখ্যা পাওয়া যায়নি। প্রথম বর্ষ ঈদ সংখ্যা প্রকাশিত হয় আষাঢ় ১৩৫৭ তে। এ সংখ্যার সম্পাদক এ. কিউ. এম. মোসলেহউদ্দীন। এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে প্রকাশক কাজী শামসুজ্জামান। মোঃ আবদুর রহমান কর্তৃক ইস্ট বেঙ্গল প্রেস, ২৬৮নং নবাবপুর রোড থেকে মুদ্রিত হয়। অনিয়মিতভাবে

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত হয় বলে পাঠকেরা চিঠিতে অভিযোগও করেছেন, কিন্তু কোনো সদুত্তর দেয়া হয়নি। ক্লাবের ঠিকানা ২৫ নং পল্টন লাইনে স্থানান্তরিত হয় বলে আষাঢ় ১৩৫৭ সংখ্যায় বলা হয়। ১৯৫০-৫১ সনের সভাপতিও ছিলেন মন্ত্রী হাবীবুল্লাহ বাহার। পৃষ্ঠপোষক গভর্ণর ফিরোজ খান নুন। ক্লাবের পক্ষ থেকে খেলাধুলা, ব্যায়াম ইত্যাদি পরিচালিত হতো। নজরুল-রবীন্দ্র-ইকবাল দিবস যথারীতি পালন করা হতো। রবীন্দ্রনাথের উপর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা করে পুরস্কার দেয়া হয়েছে ক্লাব থেকে। নজরুলের আরোগ্য কামনা করে সরকারকে নানান ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করতো পত্রিকাটি। কবিকে ঢাকায় আনার অনুরোধ তাঁরা করেছিলেন তখন পঞ্চাশের পূর্বে। মোহাজেরদের আর্থিক সাহায্যার্থে বিচিত্রানুষ্ঠানও করা হয়েছিল বলে পত্রিকাপাঠে জানা যায়। পত্রিকার উদ্দেশ্য ক্লাবের মতই জনকল্যাণকর ছিল। ঢাকা বেতারের কড়া সমালোচনা করে উর্দুর অনুষ্ঠানাধিক্যের জন্য নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। ১৯৪৮ থেকে পঞ্চাশের দশকের প্রায় সকল বাংলাভাষী পত্রপত্রিকায় নিয়মিতভাবে ঢাকা বেতারে উর্দু-জবানী-প্রোগ্রামের সংখ্যাধিক্যে বিরক্ত হয়ে কঠোর সমালোচনা করা হতো, এটা কি বাংলাভাষী কোনো দেশের অনুষ্ঠান কিনা তাই-ই বোঝার উপায়নেই। — এই ছিল আক্ষেপের মূল কারণ। এটা যেনো উর্দু মাদেরীজবানের কোনো দেশ। মতিউর রহমান চৌধুরীর কটি কথা 'দ্যুতি'র আলোচ্য (আষাঢ় ১৩৫৭) সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত করলে দৃষ্টি ভঙ্গীটা বোঝা যাবে — "পূর্ব পাকিস্তানের এই বেতার প্রতিষ্ঠানটি সত্যিই আমাদের কিনা উহার প্রোগ্রাম শুনিলে সন্দেহ জাগে। 'মাশরেকী পাকিস্তান' 'ঢাকেকি আওয়াজ' শুনিতে শুনিতে কান ঝালাপালা হইয়া উঠিয়াছে। মাগরেবী পাকিস্তানের মাগরেবী ভাষায় প্রোগ্রাম দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।... পাকিস্তানের লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৬০ লক্ষ ... ইহার মধ্যে পূর্বপাকিস্তানে বাস করে ৪ কোটির উপর— পাকিস্তানে মোট ৪'টি বেতার কেন্দ্র, রহিয়াছে। আর এই দুর্ভাগা পূর্ববাংলার ৪ কোটি অপদার্থের জন্য রহিয়াছে মাত্র ১টি। পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো কেন্দ্র হইতেই বাংলার আওয়াজটুকু পর্যন্ত পাওয়া যায় না— আর এখানের বেতারে উর্দুর কার্যসূচীর পর কার্যসূচী—তদুপরি আবার উর্দুর সবক। ইহাতে কি আমাদের মনে একটুও দুঃখ হয়না? চিরদিনই কি এই ব্যবস্থা চলিবে?... আশা করিয়াছিলাম পাকিস্তান হাছেল হইবার পর আমাদের ঢাকার বেতার আমাদের বেতার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। কিন্তু এইসব দেখিয়া আমাদের কি মনে হইতেছে? উর্দু প্রচারের এতগুলি কেন্দ্র থাকিতে কেন আবার মাগরেবী পাকিস্তানের উপরিওয়ালা কর্তৃপক্ষীয়রা ইহার উপর হাত দিলেন তাহা পূর্ববঙ্গবাসীরা জানিতে চায়। আমাদের মাতৃভাষা আমরা কোনদিনই নিষ্পেষিত হইতে দিতে পারিনা—তা উর্দু অন্যের কাছে যতই শ্রুতিমধুর হউক। আমাদের ভাষা আমাদের কাছে প্রাণের বস্তু। এমনিভাবে এ প্রদেশের অর্ধবাসী ও ভাষার প্রতি অবজ্ঞা দেখাইতে থাকিলে ঢাকা বেতারের ভবিষ্যৎ অন্ধকার সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত। এইরূপ প্রচার ভবিষ্যতে বন্ধ করিতে আমরা রেডিও পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাই।"

দ্যুতি প্রথম পর্যায়ের সংখ্যাগুলোতে সমাজের স্বার্থে বেশ উচিত কথাই বলতে চেয়েছিল ঃ " সম্প্রতি আবার খবর রটিয়াছে এখানকার সংবাদ বিভাগকে নাকি রাজধানী করাচীতে লইয়া যাওয়া হইতেছে। যাহা আমরা সন্দেহ করিয়াছিলাম তাহাই হইল। পূর্ব বাংলার খবর আগে যতটুকু প্রকাশ পাইত ২০০০ মাইল দূরের ক্ষীণ আওয়াজে তাহাও আর শুনিব কিনা সন্দেহ। এ বিষয়ে আমাদের জাতীয় সরকারের একটা কর্তব্য ও দায়িত্ব রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। উর্দু প্রোগ্রাম এর এইরূপ ব্যাপক প্রচার যাহাতে বন্ধ হয় তাহার ব্যবস্থা আমাদের জাতীয় সরকারকে অতি সত্বর করিতেই হইবে।"[১৩২]

চিঠিপত্র, প্রশ্নোত্তর, এবং ব্যাঙ্গাত্মক রচনায় হাস্য ও ব্যঙ্গরসের মাধ্যমে সমাজ ও সাহিত্যের খবর ও মন্তব্য অনেকটা অগত্যার স্টাইলে ব্যক্ত করা হতো। 'সংকেত'কে তারা 'আবর্জনা সৃষ্টিকারী' এবং 'অগত্যার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে' বলে মন্তব্য করেছেন। 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি তাঁদেরকে ক্রমে কওমী করে দিয়েছে। 'দ্যুতি' প্রথম পর্যায়ের লেখা ও লেখকসূচীতে রয়েছেন কবি হাবিবুর রহমান (কবিতা, হাতী) ; মোহাম্মদ মোদাব্বের (প্রবন্ধ, আমাদের ভবিষ্যত সংস্কৃতি) ; মাহমুদ হাসান (গল্প, গান শেখার সখ, পথের দেখা) ; মনোজ রায় চৌধুরী (কবিতা, তারুণ্যের গান) ; অধ্যাপক অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী (প্রবন্ধ, স্বাধীনতার অর্থ) ; আবদুল জলীল (গল্প, মোহাজের) ; সাইয়িদ আতীকুল্লাহ (কবিতা, কেন এ জাগৃতি তব) ; এ. কে. এম. আমিনুল হক (গল্প, বিলেতের লক্ষী) ; ডাঃ হরিনাথ দে (প্রবন্ধ, আমাদের অন্ন সমস্যা) ; মতিউর রহমান চৌধুরী (সমালোচনা, রেডিও প্যাকিস্তান, ঢাকা) ; মোসলেহ উদ্দীন আহমদ (গল্প, হারিয়ে গেছে যারা) ; এস. আহমদ হোসেন (প্রবন্ধ, হজরতের জাতি সংঘ) ; শামসুল ইসলাম (নিবন্ধ, পূর্ব পাকিস্তানের খেলাধূলা) ; আবু জোহা নুর আহমদ (কবিতা, ঈদ ও প্রিয়া) ; গোফরানউদ্দীন (প্রবন্ধ, ধর্ম্মে উদাসীনতা) ; শফিউল ইসলাম (গল্প, এ্যাকসিডেন্ট) ; শফিকুর রহমান (গল্প, গরীব ধনী ও খুনী বনাম ঈদ) ; জহরত আরা খানম (কবিতা, অনশন ধর্ম্মঘট) প্রভৃতি।

'দ্যুতি' নবপর্যায়ে ওবায়েদ আসকার এর সম্পাদনায় ফাল্গুন ১৩৫৮ সনে কাজী শামসুজ্জামান কর্তৃক ঢাকার ১৯ নং আজিমপুর রোডস্থ 'আমাদের প্রেস' থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। পরিচালনায় ছিলেন মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ও আহমদ সিরাজ। বার্ষিক চাঁদা ছিল ৪।।. টাকা ; ছমাসের ২।৵. আনা ; প্রতি কপি ।৵. আনা। বিভিন্ন সংখ্যায় সহ-সম্পাদক হিসেবে নাম ছাপা হয় আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দীন ; সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ; চৌধুরী লুৎফর রহমান ; মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ প্রমুখের। নব পর্যায় প্রথম বর্ষ সপ্তম সংখ্যায় ব্যবস্থাপনায় হাসান ইকবাল এর নাম ছাপা হয়। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর নাম ছাপা হয় প্রথম বর্ষ নবম সংখ্যা থেকে। আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দীনের নাম একবার ছাপা হয়েই বাদ যায়। এই পর্যায়ের দ্যুতির কোথাও উল্লেখ করা হয়নি পূর্ববর্তী দ্যুতির সঙ্গে এই দ্যুতির কি সম্পর্ক, সাদৃশ্য বৈশাদৃশ্য বা যোগসূত্র। তবে আজিমপুর এবং সেগুন বাগান খুব দূরে নয় এবং পত্রিকার কোনো অধ্যায়ের রচনাই তুলনায় গৌণ নয়। পরের দ্যুতির পূর্বসূরী প্রথম দ্যুতি হতেই পারে। সেজন্য পরের অধ্যায়কে 'নবপর্যায়' বলা চলে। নবপর্যায়ের 'দ্যুতি'র প্রাথমিক-ভাষ্যে বলা হয় 'ব্যক্তিমালিকানার ছাপ নিয়ে নয়, নিঃস্বার্থ সাহিত্যিকদের সাধারণ সম্পত্তি হিসাবে "দ্যুতি" প্রকাশিত হলো। পত্রপত্রিকার অকালমৃত্যুর বাজারেও এ দুঃসাহসিক উদ্যমের পেছনে রয়েছে আমাদের দুর্জয় ঈমান, নিঃস্বার্থ সাধনার মৃত্যু নেই। পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম শ্রেণীর মাসিকের অভাব মোচনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে 'দ্যুতির' আত্মপ্রকাশ। এ প্রতিশ্রুতির মর্যাদা বিচারের ভার রইল সুধীবৃন্দের ওপর। স্বার্থ নয়, আদর্শই হবে 'দ্যূতি'র একমাত্র অবলম্বন। পূর্ব পাকিস্তানে আদর্শভিত্তিক বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নিয়েই দ্যূতির যাত্রা শুরু হল।"

Dhaka University Institutional Repository

নবপর্যায়ের প্রথম সংখ্যায় একুশে ফেব্রুয়ারীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছিল : "সাড়ে চারকোটি মানুষের দাবীকে প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে, যেসব বীর শহীদ বুকের তপ্ত লহু ঢেলে রাজপথ রঞ্জিত করে দিয়ে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার সংগ্রামকে এগিয়ে দিয়ে গেল, তাদের মহান সংগ্রামী ইতিহাস আগামীদিনে চলার পথের দিশারী হোক।"

এই পর্যায়ে 'দ্যুতি' বছর দুয়েক চলেছিল। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৫৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সনে। প্রাপ্ত শেষ দ্বিতীয় বর্ষ দশম একাদশ যুগ্ম-সংখ্যা বের হয় অগ্রহায়ণ ১৩৬০ সংখ্যারূপে, ১৯৫৪ সনের পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের (২৩ এপ্রিল থেকে ২৬ এপ্রিল) ঢাকা (কার্জন হলে) সম্মেলনের ঘোষণা হবার পর, (হয়ত চুয়ান্ন সনের ফেব্রুয়ারী নাগাদ দ্বিতীয় বর্ষের পূর্বে প্রথম বর্ষের (একাদশ সংখ্যায় ; মাঝখানে একটি যুগ্ম সংখ্যা হয়ে যাওয়ায় এটাই প্রথম বর্ষের শেষ সংখ্যা) 'দ্যুতি' লিখেছে : "একদা দ্যুতি সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলবার যে প্রতিজ্ঞা নিয়ে এর সমস্যা-সঙ্কুল যাত্রাপথে পা বাড়িয়েছিল, একটি বৎসরের প্রান্তে এসে পুনর্বার দ্যুতি সে প্রতিজ্ঞাকেই স্মরণ করছে। দ্যুতি কোন ব্যবসায়ী পত্রিকা নয়। পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্বকে ঘুচিয়ে দেবার অঙ্গীকার নিয়ে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, দ্যুতি তাঁদেরই মুখপত্র। দ্যুতিকে অনাগতকালের বন্ধুর পথে চালিয়ে নেবার দায়িত্বও তাঁদেরই।—— পূর্ববঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্রে আজ যে নতুন চেতনার সঞ্চার হয়েছে দ্যুতি তাতে যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবার জন্য দ্বিতীয় বৎসরেও এগিয়ে যাবে। নতুন লেখক লেখিকাদের জন্য 'দ্যুতি'র দ্বার সব সময়ে উন্মুক্ত থাকবে।"

বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত অনেক রচনায় দ্যুতিকে বলা হয়েছে তমদ্দুন মজলিশের মুখপত্র। কিন্তু তমদ্দুন মজলিসের সঙ্গে সম্পৃক্ততা দ্যুতির লেখকগোষ্ঠীর কারো কারো গভীরভাবে থাকলেও ; এবং কারো কারো মনের উপরে পরোক্ষভাবে তমদ্দুন মজলিশের ভাবাদর্শগত প্রভাব থেকে থাকলেও তমদ্দুন মজলিশের মুখপত্র এটা ছিলনা। তমদ্দুন মজলিশ ইসলামী সংগঠন হলেও এর সদস্যরা উচ্চতর খাঁটি ইসলামী চিন্তায় বিশ্বাসী ছিলেন বলে আজাদীউত্তর পাকিস্তানের প্রথম সংগঠন হিসেবে পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সরকারের কার্যাবলীর সমালোচনায় সাহস ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সনের ১লা সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিশ এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল জাতীয় আন্দোলন শুরু করার জন্য ; দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানোর মতো 'পাকিস্তানী গন্ধ আছে' এমন একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রেরণা থেকে। আবুল কাসেম এর ১৯ নং আজিমপুর এর বাসায় তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হয়। তাঁর, 'আমাদের প্রেস'ও ঐ ঠিকানায় ছিল। দ্যুতির কার্যালয়ও ছিল ১৯ নং আজিমপুরে। প্রথম বৈঠকের গঠনতন্ত্রে ইসলাম সম্পর্কে উগ্র মনোভাব বা বদ্ধদৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ছিলনা, কেবল "আলোচনা ও প্রচারের ভিতর দিয়ে যুক্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত সর্বাঙ্গসুন্দর ধর্মভিত্তিক সাম্যবাদের দিকে মানব সমাজকে এগিয়ে নেওয়া"র কাজে সহায়তা করার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ধর্ম সম্পর্কে তাঁদের উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সমাজ জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে "ইসলামকে আদর্শ ধর্ম বলে বিবেচনা করা হয়' এবং একমাত্র ইসলামী পথেই যে দেশের মুক্তি আসতে পারে সে-কথা উল্লেখ করা হয়। ফলে পরের গঠনতন্ত্রে 'ইসলামী সমাজতন্ত্রবাদ' কথাটি ব্যবহৃত হয়। প্রথম থেকেই তাঁদের 'ইসলামী সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি.... প্রচ্ছন্ন আগ্রহ ছিল।'[১৩৩] তাই 'দ্যুতির' রচনাবলীতে ইসলামী সমাজব্যবস্থার প্রতি আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পগুলোতে ঘুষ খাওয়াকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। হাসান জামান 'ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ইসলাম' শীর্ষক প্রবন্ধে ইসলামী সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিই সকলকে আহ্বান জানান। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব ইতিহাসে স্বীকৃত। তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগেই বাংলা ভাষার দাবীতে প্রথম সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল। এসব কথা মনে করলে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ গঠনের ইতিহাসে তমদ্দুন মজলিশের গুরুদায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনও এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তান-বিরোধী আন্দোলনের উদ্গাতা হিসেবে তমদ্দুন মজলিশকে দায়ী করেছিলেন।[১৩৪] সেজন্য তমদ্দুন-পন্থী দ্যুতির বাংলাভাষা ও রাষ্ট্রভাষা-সংক্রান্ত আলোচনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। তাছাড়া খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্রও যে পাকিস্তান নয়—তাও দ্যুতির আলোচনায় ফুটে উঠেছিল। কিন্তু তখন পাকিস্তানের প্রতি জনগণের সন্দেহ ঘোরতর ছিলনা, বরং মোহ ছিল এবং পাকিস্তানের দীর্ঘ জীবনের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকারে জনগণ প্রস্তুত ছিলেন। আলোচনার স্বার্থে উল্লেখ প্রয়োজন ঃ মজলিশের নেতা ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম। সংযুক্ত ছিলেন অধ্যাপক শাহেদ আলী, অধ্যাপক আবদুল গফুর, হাসান ইকবাল, সানাউল্লাহ নূরী, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া, অধ্যাপক আবু হেনা মোস্তফা কামাল, অধ্যাপক বদরুদ্দিন উমর, এনামুল হক, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, আজিজুর রহমান, এ. কে. এম. আহসান প্রমুখ তমদ্দুন মজলিশের আয়ুষ্কালের সবটাতে অথবা আংশিক সময়ে জড়িত ছিলেন। সৈনিক ও দ্যুতি পত্রিকার সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁদের অনেকে তমদ্দুন মজলিশের নীতি-আদর্শের সমর্থক ও কর্মী ছিলেন। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, মোস্তফা কামাল, আনোয়ার উদ্দিন, ফেরদৌসী বেগম, মাহফুজুল হক, তালুকদার মনিরুজ্জামান প্রমুখ ছিলেন এমনি কর্মী। তবে শিক্ষিত যুবসমাজে ও ছাত্রদের মধ্যে মজলিশ-কর্মী সমর্থক থাকলেও ব্যাপক জনপ্রিয়তা মজলিশ বা দ্যুতির ছিলনা। নিছক সাহিত্য পত্রিকাই ছিল দ্যুতি। তবে কোনো সাহিত্যান্দোলন গড়ে তোলা দ্যুতির পক্ষে সম্ভব হয়নি।[১৩৫]

'দ্যুতি'তে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কবিতা লিখেছেন ঃ ফররুখ আহমদ ; আবদুর রশীদ খান ; আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীন ; আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী ; চৌধুরী লুৎফর রহমান ; তরীকুল আলম ; কবীর উদ্দীন আহমদ ; আবদুল হাই মাশরেকী ; প্রজেশ কুমার রায় ; আজীজুল হক ; মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ; আনোয়ারা বেগম ; আজিজুর রহমান ; এরশাদ হোসেন ; আশরাফ সিদ্দিকী ; রওশন ইজদানী ; এস. এম. আবদুল জলীল; মোহাম্মদ মামুন ; আবু হেনা মোস্তফা কামাল ; মফিজউদ্দীন আহমদ ; আবু তালিব ; মোহাম্মদ আজিজুল হক ; নুরুন্নাহার বেগম ; খোন্দকার আবদুর রহিম ; মুযহারুল ইসলাম ; জহুরুল হক ; নাজমুল হক ; আল মাহমুদ প্রমুখ' প্রবন্ধ লিখেছিলেন অধ্যাপক মোতাহের হোসেন চৌধুরী (অসুয়া, ১/১ ; নজরুল ইসলাম ও রেনেসাঁস ১/৪) ; অধ্যাপক আবুল কাসেম (আধুনিক বিজ্ঞানের গতি, ১/১) ; সানাউল্লাহ নূরী আলবার্ট আইনষ্টানের প্রবন্ধ অনুবাদ করেছেন (বুদ্ধিজীবীদের প্রতি১/১) ; ডঃ কাজী মোতাহের হোসেন (বিজ্ঞান ১/২) ; অধ্যাপক হাসান জামান (ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ইসলাম ১/২) ; বদরুদ্দীন উমর (ইসলামীসমাজ ও রাষ্ট্র ১/৩; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ২/১০-১১) ; মোস্তফা কামাল (ইকবালের কাব্যে কাব্য-সৌন্দর্য ১/৩) ; মাহফুজুল হক (রবীন্দ্রনাথ ও মানুষ ১/৩) ; মাহবুবউল আলম

Dhaka University Institutional Repository

(নজরুল জয়ন্তী, ১/৪) ; আহমদ ফরিদ উদ্দীন (আধুনিক মন, ১/৫) ; আতোয়ার রহমান (তৌহিদবাদ ; বাংলা কাব্য ও নজরুল, ১/৫ ; একটুকরো মন, ২/২) ; অধ্যাপক মোহাম্মদ আজরফ (ইতিহাসের ধারা, ১/৬ ; এযুগের দৃষ্টিতে মার্কসবাদ, ২/৭-৮) ; ভবেশ মুখোপাধ্যায় (বার্নাডশ, ১/৮) ; আবদুর রশীদ খান (পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক কাব্য-সাহিত্য, ১/৯) ; আহমদ ফরিদউদ্দীন (সমসাময়িক ইসলামী চিন্তাধারা, ১/৯ ; আদর্শ ও আদর্শবাদী ২/৯) ; শাহেদ আলী (আমাদের কথা-সাহিত্য, ১/১০) ; আতাউল হক (শয়ের চিঠি, অনুবাদ ও আলোচনা, ১/১১) ; রওশন ইজদানী (গণ-সাহিত্যের ভিত্তি, ১/১১) ; অধ্যাপক আবুল কাসেম (সাহিত্যের শ্রেণী-বিভাগ, ১/১১) ; কামরুল হাসান (জয়নুল আবেদীন, অনুবাদ নূরুল আলম, নিউ ভেলুজ থেকে, ২/২) ; আল্লামা ইকবাল (ইসলামী আইন ও যুক্তিপ্রয়োগ, অনুবাদ সোলায়মান খান, ২/৪) ; অনির্বাণ ছদ্মনাম (রবীন্দ্রনাথ, ২/৪) ; মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ (আধুনিক বাংলা কবিতার সমস্যা, ২/৭-৮) ; মোজাফফর আহমদ (সভ্যতা, ২/৯) ; অধ্যাপক সৈয়দ বদরুদ্দিন হুসেন (সাহিত্যের নবজন্ম, ১/৭) ; প্রমুখ। দ্যুতিতে গল্প লিখেছেন : সৈয়দ মকসুদ আলী (সেতার, ১/১ ; চাবুক, ১/৩ ; মোনালিসা, ১/৯ ; চাচী আম্মা, ২/২) ; শাহেদ আলী (পাগল, ১/১ ; ওরা, ২/৭)-৮ ; কৌটা, ২/২) ; কাজী ফজলুর রহমান (কান্না, ১/১) ; আতোয়ার রহমান (নুন খাই যার, ১/২) ; কাছাকাছি, ১/৯ ; যথা সময়, (২/৭-৮) ; মোপার্সা (প্রতিকৃতি, অনুবাদক মোহাম্মদ আজিজুল হক, ১/৪) ; গোলাম আহমদ (ঝরা গানের কান্না, ১/৪) ; সৈয়দ আতাউর রহিম (আতংক, ১/৫) ; আবদুর রহমান (দৃষ্টি, ১/৬) ; ইব্রাহীম খাঁ (মানুষ, ১/৭) ; মুযহারুল ইসলাম (একটি জীবন, ১/৮) ; মোজাম্মেল সিদ্দিক (অনুরণন, ১/৮) ; রাবেয়া খাতুন (লেখক, ১/৯) ; মীর্জা আ. মু. আবদুল হাই (মেহেরজানের মা, ১/১০) ; আবদুল গাফফার চৌধুরী (অমর্ত, ১/১০) ; দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (হেজাজী হাওয়া, ১/১১) ; দোঁদে (ফ্রান্সের লেখক, পরিণাম, অনুবাদক, মোহাম্মদ আজিজুল হক, ২/২) ; শফিকা হুসেন (সন্ধ্যারাতের রূপকথা, ২/৪) ; সৈয়দ বদরুদ্দিন হুসেন (ওয়েসিস, ২/৪) ; মীজানুর রহমান (লালশিখা, ২/৪) ; আবদুর রহমান (ছাই-চাপা, ২/৯) ; লুৎফর রহমান (ছাতাওয়ালা, ২/৯) ; জাহাঙ্গীর খালেক (প্রশ্ন, ২/১০-১১) ইত্যাদি। পরবর্তী কয়েক সংখ্যায় ; প্রখ্যাত নাট্যকার আশকার ইবনে শাইখের 'বিদ্রোহী পদ্মা' ১/৭ ও পরবর্তী কয়েক সংখ্যায় এবং 'দুরন্ত ঢেউ', (১/৬) ; এবং ওবায়েদ আসকার প্রণীত নাটক 'কর্ডোভার আগে' (২/১০-১১); সানাউল্লাহ নূরীর উপন্যাস 'আন্ধার মানিকের রাজকন্যা' (১/২) এতে প্রকাশ পায়। বদরুদ্দিন মুনির, আশরাফ সিদ্দিকী, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, কাজী ফজলুর রহমান, মফিজউদ্দিন আহমদ, মীর আবুল হোসেন, মোহাম্মদ রিয়াছত আলী, আতোয়ার রহমান, আহমদ ফারুক, সেলিম চৌধুরী, নুরুল আলম, আহমদুর রহমান, লুৎফুল হায়দর চৌধুরী প্রমুখের অনেক পুস্তকসমালোচনা, সংস্কৃতিসংবাদ এবং ব্যক্তিগত নিবন্ধ প্রভৃতি দ্যুতির বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করেছিল। শাহেদ আলীর 'জিব্রাইলের ডানা' বইয়ের সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকৃত আলোচনায় মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। তখন তিনিও টীন-এজার লেখক ছিলেন। এছাড়াও দ্যুতিতে প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদা শংকর রায় বিতর্ক বিভাগে পাকিস্তানের জাতীয় সমস্যা, সাম্প্রদায়িকতা, হিন্দু-মুসলমানের আন্তঃ সম্পর্ক এবং ভারতীয় উপমহাদেশের জনচিন্তায় জাতীয়তাবোধের মোড়পরিবর্তন সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনার শুরু করেন। এই বিষয়ে পরপর চার-পাঁচটি সংখ্যাতে বিতর্ক জমে ওঠে। অংশ নেন আবদুল গফুর (১/২) ; নুরুল আফছার (১/৩) ; মীর আবুল হোসেন (১/৪) ; ওমর কোরায়শী (১/৫) প্রমুখ। অন্নদাশংকর রায় কলকাতা বসে নিয়মিত 'দ্যুতি' পেতেন এবং দ্যুতি-সম্পর্কে তাঁর কিছু কৌতূহল ছিল- কারণ দ্যুতির সময়কালে এমন গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা-চর্চা এদেশের খুব কমসংখ্যক সাময়িকপত্রই করত। তিনি একটি চিঠিতে লিখেছেনও যে, প্রবন্ধগুলো "উচ্চাঙ্গের হচ্ছে আর গল্পগুলো তারিফ করার মতো।"[১৩৬] তাছাড়া একথা ভুললে চলবে না যে, তমদ্দুন-মজলিশের সঙ্গে ওৎপ্রোতসম্পর্কে বা আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা না-থাকলেও মজলিশের চিন্তাধারার প্রভাব দ্যুতির কর্ণধার এবং লেখকবৃন্দের উপর গভীরভাবে ক্রিয়া করেছিল। দেখাই যাচ্ছে মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ আগাগোড়া ইসলামী ধারার লেখক ও সংস্কৃতি-কর্মী। তিনি ছিলেন এর একজন কর্ণধার এবং তমদ্দুন মজলিশের প্রধান ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক আবুল কাসেমের বাড়ীতেই ছিল মজলিশের কার্যালয় ও মুদ্রাকর 'আমাদের প্রেস'। আমাদের প্রেসই ছিল দ্যুতির (মুদ্রক ও) প্রকাশক। অতএব মজলিশের সঙ্গে দ্যুতির যোগসূত্র ঘোষিত না-হলেও আত্মিক-সম্পর্কে সম্পর্কিত। মজলিশ ছিল তখনকার পূর্ব বাংলার প্রথম প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন। এর প্রথম দিককার কার্যাবলী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'বাংলা ভাষার দাবীতে প্রথম সংগ্রাম পরিষদ তাঁদের উদ্যোগেই গঠিত হয়। আন্দোলনের সাংগঠনিক দিকটির প্রতি লক্ষ্য রাখার ফলে ভাষা-আন্দোলনকে সাংস্কৃতিক আলোচনার ক্ষেত্র থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে উত্তীর্ণ করার ব্যাপারেও তাঁদের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য।' রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময়ে এবং যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পূর্ববর্তীকালে প্রকাশিত দ্যুতির ভাষা-চিন্তাও প্রগতিশীল ছিল। তবে তাতে ছিল মওলানা মওদুদীর প্রভাব ; আর ইসলামী-সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থা। মার্কসবাদের তাঁরা প্রতিরোধক ছিলেন। লেখকদের তালিকা এবং বিষয়গুলোর শিরোনাম থেকেও বুঝতে পারা যায় এঁদের চিন্তার স্বতন্ত্র প্রকৃতি। মোটামুটিভাবে বিরুদ্ধমতও তাঁরা বিতর্কের উদ্দেশ্যে হলেও প্রকাশ করতেন। যেমন শ্রীযুক্ত অন্নদাশংকরের 'নুতন অধ্যায়' এর অনেক মন্তব্যের সঙ্গে একমত না হয়েও "উত্থাপিত প্রশ্নগুলো সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ মারফৎ দ্যুতিতে শীঘ্রই বিস্তারিত আলোচনা শুরু" করার লক্ষ্যে সম্পাদকেরা তা প্রকাশ করা হয়েছিল।[১৩৭]

লেখকদের তাকিদের সঙ্গে রচনার শিরোনাম থেকে একথা পরিস্কার বোঝা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁরা কট্টর বর্জনবাদী দৃষ্টিবিন্দু এবং মনোভাব পোষণ করতেন না। নজরুল ইসলামের সাহিত্য-শিল্প-জীবন এবং তাঁর প্রতি দেশ ও সমাজ-রাষ্ট্রের দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য সম্পর্কে শিল্পসুলভভাষায় যুক্তিসিদ্ধপন্থায় আলোচনা করা হয়েছে। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর আলোচনার কথা বিশেষভাবেই স্মরণযোগ্য। তিনি বার্ট্রাণ্ড রাসেল এর দি কনকোয়েষ্ট অব হ্যাপীনেস গ্রন্থের অবলম্বনে অনেক প্রবন্ধ রচনা (অনুবাদ?) করেছিলেন। —যা তাঁর মৃত্যু পরবর্তীতে 'সুখ' নামের গ্রন্থে সংকলিত হয়। দ্যুতিতে 'কোন ইংরেজ লেখকের অনুসরণে' পাদটীকা যুক্ত করে তিনি লিখেছিলেন 'অসূয়া' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ যার মূলতাগিদ 'ভালোবাসা'র চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা অর্থাৎ দাঙ্গা-বিক্ষুব্ধ সমাজে মানবতাবোধের উন্মেষ ঘটানো। 'অসূয়া'কেও যে প্রগতির সহায়ক শক্তি ও প্রেরণারূপে দেখা যায়, মোতাহের হোসেন চৌধুরী তা বাঙ্গালীর চোখের সামনে তুলে ধরেন। যদিও মূল লেকক বার্ট্রাণ্ড রাসেলের নাম না-জানিয়ে কেবল 'কোন ইংরেজ লেখকের অনুসরণে' উল্লেখ করে প্রবন্ধটির আয়োজন করেছেন, লেখক লিখেছেন 'দুঃখের অন্যতম হেতু অসূয়া।... মানুষের গূঢ় প্রবৃত্তিসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম। এর মূলে রয়েছে বাঁচা ও বৃদ্ধির প্রেরণা ; তাই এর প্রতি শ্রদ্ধা বিনম্র দৃষ্টিতে না তাকালে অন্যায় করা হবে। বিদ্বেষ

Dhaka University Institutional Repository

মাত্রই পাপ—একথা স্বীকার করলে প্রগতি অসম্ভব হয়ে পড়ে—সভ্যতা থমকে দাঁড়ায়।' উপসংহারে তিনি বলেন : 'এই দৃষ্টিভঙ্গির দরুণ বর্তমান যুগে সুখের উপাদান আদিম সমাজ থেকে হাজার গুণ বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও, মানুষ সুখের মুখ দেখতে পাচ্ছে না—যা হয়েছের চেয়ে যাহতে পারতোর প্রতি বেশী নজর দেওয়া হচ্ছে বলে বস্তুবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে কেবলই দুঃখের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছে। সুখকে জীবনের লক্ষ্য না করে ইপ্সিত ও প্রতিপত্তিকে লক্ষ্য করার এই শাস্তি।... এই নৈরাশ্যব্যঞ্জক অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রধান উপায় হৃদয়ের সম্প্রসারণ। সভ্য যুগে যেমন বুদ্ধিকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে, হৃদয়কেও তেমনি সম্প্রসারিত করা দরকার। নইলে বাঁচার আনন্দ পাওয়া কঠিন। কেননা হৃদয়ই আমাদের জনয়িত্রী, বুদ্ধি নয়। ভালবাসার শক্তি আয়ত্ব করতে না পারলে আনন্দ চিরদিনের মতো পর থেকে যাবে।" তিনি বলেন, "জীবন বুদ্ধি ও হৃদয় উভয়ের এজমালি সম্পত্তি। কিন্তু এযুগে বুদ্ধির বড় বাড় বেড়েছে ; হৃদয়কে উপোসী রেখে সে জীবনের সমস্ত রস শুসে নিচ্ছে। অথচ রস পানের কায়দাই তার জানা নেই। তাই জীবনের বিকৃতি ঘটেছে। এই বিকৃতি থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় বুদ্ধির কর্ষণার সঙ্গে-সঙ্গে হৃদয়ের কর্ষণকেও মেনে নেয়া।' 'ভালোবাসা' সম্পর্কে বলেন ; 'সুখের হেতু ভালবাসা। তাই ভালোবাসা বৃদ্ধির সঙ্গে সুখ বৃদ্ধি হবে, আর সুখ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্বেষ দূর হতে থাকবে। বিদ্বেষকে মন্দজানা এবং ভালবাসাকে কাম্য মনে করা সুস্থ জীবন বিকাশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।... ভালোবাসা স্বর্গীয়, সত্য, ন্যায়—এধরনের বড় কথা না বলে যদি স্রেফ বলা হত : ভালবাসাই সুখ, ভালবাসাই জীবন— তো পৃথিবীর ভাগ্য হয়তো এত নিদারণ হতো না।[১৩৮]

বিজ্ঞানী-সাহিত্যিক ডক্টর কাজী মোতাহের হোসেন বিজ্ঞানের আলোচনা করেছেন ; এবং আইনস্টাইনের 'Out of my letter years' গ্রন্থের A massage to the intellectuals শীর্ষক প্রবন্ধের (বুদ্ধিজীবীদের প্রতি) অনুবাদ করেছেন সানাউল্লাহ নূরী। বদরুদ্দীন উমর এবং হাসান জামান 'ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ইসলাম' প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এসব প্রবন্ধের মূলবক্তব্য পাকিস্তানকে খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠার নানা অন্তরায়, সমস্যা ও সম্ভাবনার চিত্র অঙ্কন। দেশের বেশীরভাগ মানুষ মুসলমান হলেই যে ইসলামী রাষ্ট্র হয়না তাও ফুটিয়ে তোলা। পশ্চিম পাকিস্তানের লেখক সৈয়দ মোজাফফর উদ্দীন নদভীর Islamic State and Pakistan গ্রন্থের আলোচনার মূলসুরও তাই। নদভী মওদুদী-প্রভাবিত লেখক এবং তিনি ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করবার জন্যে বইটা লিখেছিলেন। 'আধুনিক দুনিয়ার চিন্তায় ধর্মের সংস্কার সঙ্গে ইসলামের যে সঙ্গতি নেই তা নদভী সাহেব কোরাণ-হাদীসের নির্দেশ ও ইবনে খালদুনের লেখা থেকে সপ্রমাণ করেছেন।..... মানুষ প্রত্যেকেই এক একজন খলিফা—মানুষের সামনে রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা। ইসলামের গণতান্ত্রিক নীতি, আধুনিক গণতন্ত্রের সঙ্গে ইসলামী খিলাফতের পার্থক্য, প্রকৃত ইসলামী সমাজের সংগঠনের ধারা, সরকারী বিভাগগুলির নিজস্ব অধিকার ও স্বাতন্ত্র—এইসবের সংক্ষেপ অথচ মনোজ্ঞ আলোচনা আছে বইখানিতে। গ্রন্থের আলোচক হাসান জামান-এর সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিটাও লক্ষণীয় "..... অধ্যক্ষ নদভী সাহেব ইংগিত করেছেন (পৃ ১০৫) যে, ব্যক্তির নেতাকে সবসময়ে কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম হতেই হবে। আমাদের মতে জাতির নেতা ইমাম না হলেও ইসলামী সমাজ হবে যদি নাকি প্রকৃত ইসলামী নীতির ওপরে সমাজ সংগঠিত হয়। ভাষা-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনাটি (পৃ ১০৭) আরও একটু পরিস্কার হলে ভালো হত।' (দ্যুতি, ১/১, পৃ ৬৬) দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের 'এ যুগের দৃষ্টিতে মার্কসবাদ', এবং 'ইতিহাসের ধারা' এবং আল্লামা ইকবাল এর প্রবন্ধ 'ইসলামী আইন ও যুক্তি প্রয়োগ' (অনুবাদক : সোলায়মান খান); আহমদ ফরিদউদ্দীনের প্রবন্ধ 'আধুনিক মন' ; 'সাময়িক ইসলামী চিন্তাধারা'; 'আদর্শ ও আদর্শবাদী'; ও অধ্যাপক সৈয়দ বদরুদ্দীন হুসেন প্রণীত 'সাহিত্যের নবজন্ম' ; কাজী ফজলুর রহমানের 'আধুনিক সাহিত্য' শিরোনামের বিতর্ক ; এবং 'পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক কাব্য-সাহিত্য' (আবদুর রশীদ খান প্রণীত) ; 'আমাদের কথা-সাহিত্য' (শাহেদ আলী) ; 'গণসাহিত্যের ভিত্তি' (রওশন ইজদানী) ; 'সাহিত্যের শ্রেণী বিভাগ' (অধ্যাপক আবুল কাসেম) ; 'আধুনিক বাংলা কবিতার সমস্যা' (মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ) ; 'সভ্যতা' (মোজাফফর আহমদ) ; 'ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য' (বদরুদ্দিন উমর) প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং রবীন্দ্রনাথ ও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের চিন্তাধারার পর্যালোচনা দ্বারা নবসৃষ্ট রাষ্ট্র পাকিস্তানের সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয়নীতি প্রভৃতির দিকনির্দেশ-দানের প্রচেষ্টা যা প্রকট হয়ে উঠেছে— তাতে গভীর আন্তরিকতায় দেশের হিতের চিন্তা-প্রেরণায় কাতরতার পরিচয় সুপরিস্ফুট। কিন্তু যেটা বিরুদ্ধ-স্রোত বলে মনে হয়, তাহচ্ছে ইসলামী-সমাজব্যবস্থার প্রতি এদেশের ভাসা-ভাসা ধর্মভীরুমানুষের কোনো গভীর আস্থা সৃষ্টি হয়নি। হয়তো আধুনিক বিশ্বে ধর্মের বাধন আর শক্তও হবেনা। 'ধর্ম' পলিটিক্সের বিষয় হয়েই থাকবে। সমাজের গতি আধুনিক বুর্জোয়া কিংবা গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিই অভিব্যক্ত হচ্ছে দেখা যায়। সেদিক থেকে দ্যুতির প্রয়াস ব্যর্থ বটে, কিন্তু তখনতো সেটাই ছিল প্রধান ধারা এবং এঁদের বক্তব্য তাই জনগণকে মতামত সংগঠনে উদ্বুদ্ধ করতো বলে দাবি করা যায়। এ দাবী গ্রাহ্য হলে দ্যুতির সমকালে সামাজিক উপযোগিতা সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই সৃষ্ট উপযোগে দেখা যায় ইসলামী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ব্যতিরেকে অনাধুনিক চিন্তা তাঁদের মধ্যে খুব কম ছিল। বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য যা দ্যুতিতে প্রকাশিত হয়েছে– তার কথাই যদি ধরা হয়, দেখা যাবে ন্যায্যতার বিবেচনায় এই বক্তব্য অত্যন্ত সুবিবেচনা প্রসূত : ১৯৫২ সনের ফাল্গুন সংখ্যা ছিল নবপর্যায় দ্যুতির প্রথম সংখ্যা। এটাতে 'আমাদের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় : "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে। সরকার উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করেছেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত অনুযায়ীই সরকার পরিচালিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণের প্রাদেশিক ভাষা হলেও তারা উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী; কাজেই পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দুই যে সরকারী ভাষা হবে এবং উর্দুই যে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবে তাতে দ্বিধা প্রকাশ করার কিছুই নেই। ঠিক একই নীতিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শতকরা ৫৬ জন বাংলা ভাষাভাষীর মতামতকেও অস্বীকার করার কোন ক্ষমতা কোন গণতান্ত্রিক সরকারের থাকতে পারেনা।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে বিগত ১৯৪৮ সনে সারা পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল আন্দোলন হয়ে গেছে। জনমতের চাপে পড়ে তদানীন্তন প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী জনাব খাজা নাজিমুদ্দিন বাংলা ভাষার দাবীকে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারীভাবে সে প্রতিশ্রুতি ও প্রস্তাব কার্যকরী করা হয়নি। শুধু তাই নয়, জনাব খাজা নাজিমুদ্দিন পাক প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পূর্ববঙ্গে এসে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার অভিমত প্রকাশ করে গেছেন। তার প্রতিবাদস্বরূপ গোটা প্রদেশেই

Dhaka University Institutional Repository

তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। প্রদেশের ছাত্ররা শোভাযাত্রা, ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বাংলা ভাষার ন্যায্য অধিকার দাবী করছেন। আমরা আশা করি সরকার গণদাবীকে উপেক্ষা করে—সমস্যা প্রপীড়িত পাকিস্তানকে আরো সমস্যা-সংকুল করে তুলবেন না।"[১৩৯]

পাশাপাশি ১৯৫২ সনের আসন্ন আন্তর্জাতিক 'ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন', ঢাকা-র উপর মন্তব্য করতে গিয়ে দ্যুতি সমর্থন করেছে তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগকে : "...পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানব্যাপী সম্মেলনের জোর প্রস্তুতি চলছে। পাকিস্তানের চার বছরের ইতিহাসে এ ধরণের প্রচেষ্টা এই প্রথম। সম্মেলনের প্রচারপত্র থেকে যতদুর জানা যায়, বর্তমান দুনিয়ার আদর্শিক দ্বন্দ্বের মধ্যখানে ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য। ইসলামী আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে ইসলামের জীবন-পদ্ধতি ও সমাজ-ব্যবস্থার যুগোপযোগী কার্যকরীরূপ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। অন্যদিকে ইসলামী আন্দোলনকে এগিয়ে নেবার জন্যে ইসলাম-পন্থীদের সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ হওয়াও অপরিহার্য। এই দ্বিবিধ মৌলিক প্রয়োজনের তাগিদেই তমদ্দুন মজলিশের কর্মকর্তারা এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের প্রচেষ্টা অত্যন্ত শুভ ও প্রশংসনীয়। বর্তমান দুনিয়ার বুদ্ধিজীবীমহলে চিন্তার নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। মনীষীদের চিন্তারাজ্য থেকে মানবজীবনের সামগ্রিক দৃষ্টিভংগি নির্বাসিত হয়েছে। ফলে সারা দুনিয়ায় মানুষের জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি ও, নিরাপত্তার পরিবর্তে হানাহানি, রক্তারক্তি ও বিশৃঙ্খলাই স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে। এ বিপর্যয় ও অনিবার্য ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি পেতে হলে বলিষ্ঠ ও বৃহত্তর জীবনাদর্শের প্রয়োজন। এ সম্মেলন এমনি সামগ্রিক ও বলিষ্ঠ জীবনাদর্শের সন্ধান দেবে। এজন্যেই সম্মেলনের উদ্যোক্তারা পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতিবান, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, ছাত্র-যুবক ও সমাজ-কর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থন দাবী করেন।'

'দ্যুতি মনে করে সামাজিক অগ্রগতির জন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলন অপরিহার্য। উদ্যোক্তারা বলেন ; 'এই সম্মেলন পাকিস্তানে একটা সুস্থ ও সবল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্ম দেবে।'[১৪০] উল্লেখ্য, ১৯৫২ সনের ১৭-২০শে অক্টোবর ঢাকার কার্জন হলে যে 'ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়, তা প্রথমে ঐ সনের মার্চ মাসের ১২, ১৩ ও ১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। দ্যুতিতে এই প্রোগ্রাম-অনুযায়ী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বলেই উপর্যুক্ত পর্যালোচনা লেখা হয়েছিল। আরও বলা হয়েছিল : 'সম্মেলনে সাহিত্য, লোককলা, সমাজবিজ্ঞান, ইসলামী আন্দোলন ও মহিলা পাঁচটি অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছে। সম্মেলনের প্রত্যেকটি অধিবেশনের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন সভাপতিও মনোনীত করা হয়েছে। সম্মেলনে পূর্ববঙ্গের বাইরে পশ্চিম পাকিস্তান, পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য জায়গায় চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীগণ যোগদান করবেন'।[১৪১]

কি কারণে সম্মেলন পিছিয়েছিল তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়না বটে, তবে নানা গ্রন্থে সম্মেলনের বর্ণনা নানা রকম লেখা হয়েছে।[১৪২] কিন্তু দ্যুতির প্রথম বর্ষ, অষ্টম, কার্তিক ১৩৫৯ সংখ্যায় অনুষ্ঠান-পরবর্তী-বিবরণে লেখা হয় : "গত ১৭-২০শে অক্টোবরর (১৯৫২) ঢাকার কার্জন হলে অভূতপূর্ব সাফল্যের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ কর্তৃক আয়োজিত 'ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন' হয়ে গেল। এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন : সিরিয়ার আহমদ বিন আহমদ, লাহোরের নসরুল্লাহ খান আজিজ, পাকিস্তানের মজহারউদ্দীন সিদ্দিকী, লণ্ডনের ওকিং মসজিদের প্রাক্তন ইমাম জনাব আফতাবুদ্দিন ; এছাড়াও .... আহবানে সাড়া দিয়েছেন অসংখ্য শিল্পী, সাহিত্যিক, কর্মী ও চিন্তাবিদ। এই সম্মেলনের চারদিনব্যাপী অধিবেশন শুধু পাকিস্তানের নয়—প্রাচ্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ও অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন সাংস্কৃতিক জগতে একটি সুদূর-প্রসারী আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। যে আদর্শকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের সৃষ্টি— তার জন্য এমন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অবশম্ভাবি হয়ে পড়েছিল।... চারদিনব্যাপী এতগুলি শাখা, এতগুলি অধিবেশন অন্যকোন সাংস্কৃতিক সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। সাহিত্য, লোক-সংস্কৃতি, সমাজ-বিজ্ঞান, ইসলামী আন্দোলন, মহিলা অধিবেশন, প্রকাশ্য সম্মেলন, প্রতিনিধি-সম্মেলন, কর্মী- সম্মেলন, মফঃস্বলের কবি, জারী, বাউল, গাজী প্রভৃতি লোক-সংস্কৃতির অপূর্ব অনুষ্ঠান, প্রায় প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত একই সময়ে একাধিক অধিবেশন—সত্যিই অপূর্ব। এর অভিভাষণগুলিও অপূর্ব ও অসাধারণ। প্রায় চল্লিশটি অভিভাষণের মধ্যে সবকটিই মননশীলতায়, যুক্তিবিজ্ঞানে ও সমস্যা-সমাধানের ইংগিতে সম্পদশালী।... এরকম সুষ্ঠু সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যত বেশী হয় ততই আমাদের জন্য মঙ্গল।"[১৪৩]

বলা দরকার, অভিভাষণগুলোর কয়েকটি দ্যুতিতে প্রকাশিত হয়, কিন্তু সব ভাষণ ছাপা হয়নি। তার আগেই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকার আয়ুবৃদ্ধি হলে সম্মেলনের সকল না-হলেও অধিকাংশ ভাষণ, প্রবন্ধ এতে ছাপা হতো, এবং তা হতো পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক-আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। 'আধুনিক মন' শীর্ষক প্রবন্ধে আহমদ ফরিদউদ্দিন লিখেছিলেন আধুনিক মনকে আজ মুক্ত হতে হবে সব রকমের 'পূর্ব নির্ধারিত' ধারণা থেকে ; বিচারের মাপকাঠি হিসেবে নিতে হবে কেবলমাত্র বিজ্ঞানকেই। তবেই আধুনিক মন অতি আধুনিক কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে সত্যিকার 'আধুনিক' হতে পারবে। প্রকৃত কল্যাণের সূচনা হবে।[১৪৪]

একই ধারণা ব্যক্ত হয়েছে 'সাহিত্যের নবজন্ম' শীর্ষক প্রবন্ধেও। ১৯৪৭ এর দেশভাগের পর যুক্তিবাদী মন নিয়ে দেশের জন্য কল্যাণকর, প্রকৃত স্বদেশী (গণসাহিত্য?)-সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে বলে মতামত ব্যক্ত করা হয়। "দেখতে পেয়েছি দেশব্যাপী হিন্দুমধ্যবিত্ত সমাজের দেশত্যাগ.... সঙ্গে সঙ্গে নির্বাসিত হয়েছে তারই সৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য। কৃত্রিমতা থেকে নিস্কৃতি পেয়েছে পূর্ব বাংলার আগামী সাহিত্য।.... পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গড়ে তুলতে হবে পূর্ব বাংলার সাহিত্যের নব কলেবর—অবহেলিত মুসলিম গণজীবনের প্রতিবিম্ব হিসেবে।... পারস্যের নন্দনকাননে আর ফোরাতের উপকূলে এ নতুন সাহিত্যের উপকরণ অন্বেষণ করলে চলবেনা।.... মুসলিম বাংলার আছে নিজস্ব ভৌগলিক রূপ, নিজস্ব ইতিহাস, ভিন্নজীবন-প্রণালী, আচার-ব্যবহার, তমদ্দুনের ধারা.... পূর্ব বাংলার এ স্বকীয় বিশিষ্ট রূপটিই ধরা পড়বে আগামীদিনের নতুন সাহিত্যে।"[১৪৫]

দ্যুতির সমাজ-ভাবনা ও রাষ্ট্রচিন্তা ফুটে উঠেছে এতে মুদ্রিত সমগ্র সাহিত্যে। বাংলাভাষার এবং ইসলামী সমাজব্যবস্থার পক্ষে তাঁরা ছিলেন, তবে অন্যান্য ব্যাপারে উচিত কথা বলতে পরোয়া করেননি। ১৯৫২ সনে পূর্ব বাংলায় শুধু অসন্তোষ ও পুলিশের গুলি চলেছিল তা ঠিক নয়, পশ্চিম পাকিস্তানেও চরম অসন্তোষ বিরাজ করছিল ; এই প্রেক্ষিতেই দ্যুতিতে করাচীতে ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণ এর সংবাদ এবং সম্পাদকীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে

Dhaka University Institutional Repository

গণতান্ত্রিকতার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতে দেখা যায়। করাচীতে বেতন কমানো, বাসস্থানের ব্যবস্থা, সরকারের শিক্ষা-সংকোচননীতি প্রত্যাহারের দাবীতে ছাত্র-মিছিলে গুলীবর্ষণ করা হয়েছিল। এর প্রতিবাদ করে দ্যুতি লেখে : 'যখনই কোন দাবী তোলা হবে তখনই গুলীবর্ষণের মধ্যদিয়ে তার প্রত্যুত্তর দেওয়া হবে এই যদি আমাদের সরকারের নীতি হয় তবে তার চেয়ে লজ্জা এবং কলঙ্কের বিষয় আর কি হতে পারে? আমরা করাচীর শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তাদের দাবীর প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এই নির্মম গুলিবর্ষণের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে সরকারের এই রকম ঘৃণ্য-নীতির পরিবর্তন দাবী করছি।"[১৪৬]

দ্যুতির আকর্ষণীয় আলোচনাগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'নতুন অধ্যায়'। উল্লেখ করা হয়েছে যে, অন্নদাশংকর রায় এ আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। তাঁর আলোচনার মূল বক্তব্য ছিল পাকিস্তান হওয়ার পর মুসলমানেরা ক্রমশ জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠবেন। তুরস্ক প্রভৃতি দেশের দৃষ্টান্ত টেনে তিনি বলেন ; "একথা বললে সত্যের অপলাপ হবেনা যে ভারতরাষ্ট্রে সম্প্রদায়িকতা পরাস্ত হচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষতা জয়ী হচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তানেও কি তাই হচ্ছে? হ্যাঁ, পাকিস্তানেও তাই হতে যাচ্ছে। পাকিস্তান থেকে যাঁরা আন্তর্জাতিক সভাসমিতিতে যোগ দিচ্ছেন, যাঁরা রাষ্ট্রদূত হয়েছেন, যাঁরা বাণিজ্য উপলক্ষে দেশবিদেশ ঘুরছেন, তাঁরা পরিচয় দিতে অভ্যস্ত হচ্ছেন পাকিস্তানী ন্যাশনাল বলে। ইরাণে, ইরাকে, তুর্কীতে, মিশরে তাঁরা মুসলমান বলে পরিচয় দিলে কেউ তাঁদের দিকে ফিরে তাকাবেন না, কারণ, কোটি কোটি মুসলমানের মধ্যে তাঁরা এমন কিছু বিশিষ্ট নন। কিন্তু যেই তাঁরা পরিচয় দেন যে তাঁরা পাকিস্তানী অমনি তাঁরা বিশিষ্ট আসন পান। তাঁদের মর্যাদা তাঁদের নেশনের মর্যাদার উপর নির্ভর, তাঁদের ধর্মের মর্যাদার উপর নয়। তাই যদি হলো তবে প্যান-ইসলামের তাৎপর্য রইল কোথায়? প্যান ইসলাম থেকেই পাকিস্তানের জন্ম, কিন্তু পাকিস্তান দিনে দিনে সাবালক হয়ে উঠছে, জননীর কোলে চিরকাল সে থাকবে না, থাকতে পারে না।'

'জিম্মী' সমস্যাকে পাকিস্তানের প্রধান-সমস্যা অভিহিত করে তিনি বলেন ঃ "ভারতীয় মুসলমানের দোটানা এভাবেই (ভারত বিভক্ত হয়ে) মিটল। অখণ্ড মুসলমানসমাজ দুভাগ হয়ে গেল। এক ভাগ ভারতীয় মহাসমাজের অঙ্গ। আরেক ভাগ পাকিস্তানী মহাসমাজের অঙ্গ। মহাসমাজ হচ্ছে বহুসমাজের সমষ্টি। একটিমাত্র সমাজের সংকীর্ণ দুর্গ নয়। পাকিস্তান তার জাতীয় পতাকায় অমুসলমানদের জন্যে স্থান রেখেছে। অমুসলমানরাও পাকিস্তানী ন্যাশনাল। কেন যে তাঁদের 'জিম্মী' বলা হচ্ছে তার অর্থ আমার কাছে দুর্বোধ্য। প্রত্যেক দেশেই কতক লোক আছে যাদের সংখ্যা বেশী নয়, যারা মাইনরিটি। ইংলণ্ডের ক্যাথলিকরা সংখ্যায় কম, ফ্রান্সের প্রোটেষ্টানটরা সংখ্যায় কম। তা বলে কি কেউ তাদের 'জিম্মী' বলে? ভারতের খৃষ্টান, পার্শী, শিখদের যদি 'জিম্মী' বা সেই রকম কোনো একটা শব্দে অভিহিত করা হয় তাহলে কি তাঁরা আপত্তি করবেন না? ভারতের মুসলমানরা যে আপত্তি করবেন এ-বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে? মাইনরিটি হলেই যদি মানুষ 'জিম্মী' হয় তাহলে দেশের বনিয়াদে ফাটল ধরে, দেশ কোনো দিন দৃঢ় হয়না। সিরিয়াতে, মিশরে, চিরকাল বহু খ্রীষ্টানের বাস। যখন মুসলমান ছিলনা তখনো খ্রীষ্টান ছিল। এরা সেই খ্রীষ্টানের বংশধর। কেউ কি তা বলে এদের 'জিম্মী' মনে করে? পাকিস্তানে যেদিন মুসলমান ছিলনা সেদিন হিন্দু ছিল। আজ তাদের দেশ পাকিস্তান হয়েছে বলে কি তারা 'জিম্মী' হবে?

আর একটু তলিয়ে ভাবা যাক। রাষ্ট্র চলে সর্বসাধারণের ট্যাক্সে। কোনো একটি সম্প্রদায়ের প্রতি তার কোনো বিশেষ দায়িত্ব নেই। পুলিশ রক্ষা করতে বাধ্য প্রত্যেকটি অধিবাসীকে। তাই যদি হয় তবে একদল মানুষ আরেকদল মানুষের 'জিম্মী' হতে যাবে কোন দুঃখে। রাষ্ট্রই বা কেন মাইনরিটিকে জিম্মায় রাখবে ; মেজরিটিকে জিম্মায় রাখবে না? আমার মনে হয় এসব পুরাতন শব্দ অভিধানের পৃষ্ঠা থেকে আহরণ করে ব্যবহার করা হচ্ছে নতুন অধ্যায়ের মর্ম না বুঝে। এযুগে কেউ কারো 'জিম্মী' নয়। প্রত্যেকের ট্যাক্সে রাজ্য চলে, প্রত্যেকেরই প্রাপ্য যা অপরে প্রাপ্য। ইংলণ্ডে আজকাল নিষ্কর্মা বলে কেউ নেই। যার কাজ নেই রাষ্ট্র তাকে কাজ জোগায়। আধুনিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব কেবল খুন জখম থেকে বাঁচানো নয়, খাইয়ে পরিয়ে লিখিয়ে পড়িয়ে কাজ জুগিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দে রাখা। তেমনি আধুনিক নাগরিকের দায়িত্ব রাষ্ট্রের জন্যে সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত থাকা। 'জিম্মী'র কাছ থেকে এত বড় ত্যাগ কেউ প্রত্যাশা করে কি? 'জিম্মী'র জন্যেই বা কোন রাষ্ট্র কবে এসব করেছে?

পাকিস্তানের প্রধান সমস্যা এই 'জিম্মী' সমস্যা। মাইনরিটিকে জিম্মী করে রাখলে কনষ্টিটিউশনে সমান অধিকার দেওয়া বৃথা। সমান অধিকার না দিলে বা এক হাতে দিয়ে আরেক হাতে কেড়ে নিলে এ যুগের মাইনরিটি চুপ করে থাকবে না, দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জগতের জনমত মাইনরিটি সমস্যার এ জাতীয় সমাধান আদৌ সমর্থন করবেনা। পাকিস্তানে যেসব হিন্দু স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাস করে আসছেন, যাঁরা মোগলের কাছে মানসম্মান পেয়েছেন, যাঁরা ইংরাজের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন তাঁরা যদি সেখানে ভারতীয় ন্যাশনালিষ্ট হিসাবে থাকতে চান তাহলে তাঁদের সমস্যা কেউ মেটাতে পারবেনা। কিন্তু তাঁরা যদি সেখানে পাকিস্তানী ন্যাশনালিষ্ট রূপে নিজেদের স্থান করে নিতে রাজী হন তাহলে বিশ্ব তাঁদের সহায়। ইতিহাস তাঁদের সহায়। পাকিস্তানেরই চিন্তাশীল মুসলমান তাঁদের সহায়। একদিন পাকিস্তানের কনষ্টিটিউশনও তাঁদের সহায় হবে। 'জিম্মী' হয়ে থাকতে হবে না তাঁদের।"

মুসলমান-সমাজের মধ্যে 'ন্যাশনালিজম' এর বিকাশ সম্পর্কে শ্রী অন্নদাশংকর রায় বলেন : "ন্যাশনালিজম মুসলমানের মনে সহজে ঢোকেনা। সেইজন্যে পাকিস্তানের প্রয়োজন ছিল। পাকিস্তান হওয়ার ফলে চারকোটি মুসলমান একদিনেই ভারতীয় ন্যাশনালিষ্ট হয়ে গেছেন। নয়তো এঁদের ভারতীয় ন্যাশনালিষ্ট করে তুলতে আমাদের দশ বিশ বছর লাগত। বাকী ছয় কোটি মুসলমান হয়েছেন পাকিস্তানী ন্যাশনালিষ্ট, এটাও ইসলামের ইতিহাসে যুগ পরিবর্তনের সূচনা। এর অনুরূপ ঘটনার জন্যে যেতে হয় ইউরোপের ইতিহাসে, যেদিন প্রোটেষ্টান্ট রিফরমেশন শুরু হয়। এত বড় একটা ব্যাপারের জন্য কিছু দাম না দিলে কি চলে? দেশ বিভাগ হচ্ছে সেই দাম। তার জন্যে আমাদের মনে ক্ষোভ আছে, এ ব্যথা আমরা এ জীবনে ভুলবনা। কিন্তু ব্যথা কি মুসলমানেরা কম পেলেন? এই যে তাঁদের অখণ্ড সমাজ দ্বিখণ্ড হয়ে গেল এ ব্যথা পাকিস্তানী মুসলমানদের মনে লাগছেনা, কিন্তু এখানকার মুসলমানদের মনে লাগছে বৈকি। আমরা স্বভাবত অসংহত। কিন্তু তাঁরা স্বভাবত সুসংহত। তাঁদের সংহতি ভেঙ্গে গেল তাঁদেরই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে। অনুশোচনার জন্যে তখন সময় পাননি। এবার তার সময় আসবে।" (তিনি আরও মন্তব্য করেন) ; "পাকিস্তান হচ্ছে সেটেলড্ ফ্যাক্ট্। তাকে আনসেট্ল্ করা চলবেনা। একবার আমরা সেট্লড্ ফ্যাক্ট্কে আনসেটল

Dhaka University Institutional Repository

করতে গিয়ে বোকা বনে গেছি। আরেকবার সে ভুল করব না। ভারতের ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস দুই ইতিহাস পাশাপাশি কাজ করছে। এটা আমাদের মালুম ছিলনা। ইসলামের ইতিহাসকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। তা যদি করি তাহলে দেখব পাকিস্তানের মাটিতে একদিন কামাল পাশার আবির্ভাব হয়েছে, তাঁর তলোয়ারের খোঁচায় এমন সব সামাজিক পরিবর্তন ঘটছে যা আমাদের সাহসে কুলোত না। বহুবিবাহ রদ হয়েছে, এক বিবাহ কায়েম হয়েছে, বোরখার বালাই নেই, আরবীতে নামাজ পড়া হয়না, কোরান পড়া হয় বাংলায়, মোল্লারা বোলার হ্যাট পরে, ফেজ মাথায় দিলে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়, পীর সাহেবেরা নিরুদ্দেশ। 'এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন আসিবে সেদিন আসিবে'।"[১৪৭]

পরবর্তী চার সংখ্যায় উপরের প্রবন্ধের পক্ষে–বিপক্ষে সমালোচনা, তর্ক–বিতর্ক চলে। আবদুল গফুর অন্নদা শংকর রায়ের প্রবন্ধের বক্তব্য খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন (দ্যুতি, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা) ভৌগলিক সীমাকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবাদ তা মানবসমাজকে সংকীর্ণতা শিক্ষা দিয়েছে। ফল হয়েছে এক জাতি কর্তৃক অন্য জাতির স্বাধীনতা হরণ ও শোষণ। তাঁর মতে একটি মহান আদর্শের ভিত্তিতে মানবসমাজের একত্র হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। ফ্রান্সের কমিউনিষ্ট ও ভারতের কমিউনিষ্টদের মধ্যে যে আদর্শগত ঐক্যবোধ রয়েছে তাই ভৌগলিক জাতীয়তার মূলে কুঠার হেনেছে। জনাব গফুর আরও বলেন : প্রকৃত ধর্ম — সে ইসলাম হোক আর হিন্দুধর্মই হোক—তা তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী। সাম্প্রদায়িকতা রোধ করতে গিয়ে মহাত্মা গান্ধী হিন্দু হয়েও হিন্দুদের হাতেই নিহত হন।

তৃতীয় আলোচক নূরুল আফছার আবদুল গফুরের মতামত পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন, বিশ্বাসের উপর জাতীয়তা গড়ে উঠতে পারেনা, সাধারণ স্বার্থবোধের দ্বারাই তা সম্ভব। তিনি বলেন, সহজ কথায় ইন্দোনেশিয়ান-নাগরিক সেখানকার মসজিদে বসে, মিশরীয়রা মিশরে, পাকিস্তানীরা পাকিস্তানেরই কোন মসজিদে বসে আল্লাহর ধ্যান ধারণা করবেন ; এর জন্য সবাইকে মিলে একরাষ্ট্র তৈরী করতে হবে—এমন একটি বিশ্বাস সৃষ্টি কি একান্তই প্রয়োজন বা সম্ভব ?

চতুর্থ আলোচনাকারী মীর আবুল হোসেন তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অধিকতর নিরপেক্ষতার সঙ্গে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। পঞ্চম আলোচনায় ওমর কোরায়শী অন্নদা শংকর ও আবদুল গফুরের বক্তব্যের পর্যালোচনা করে বলেন, পাকিস্তান হবার পরে মুসলমানেরা অধিকতর জাতীয়তাবাদী হয়ে পড়বেন—অন্নদা শংকরের এই বক্তব্যে সত্য রয়েছে এবং পাকিস্তানের মুসলমানরাও যে অধিকতর পাকিস্তানী হয়ে পড়বেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবে একথার অর্থ এই নয় যে পাকিস্তানের মুসলমানরা আদর্শগতভাবে অন্য দেশের মুসলমানদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করবেনা, একথাও ঠিক নয়—এখানেও পাকিস্তানের ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস পাশাপাশি কাজ করবে। আবদুল গফুর অন্নদাশংকর রায়ের বক্তব্যের ভ্রান্ত বা অন্যতর অথবা ভিন্নতর ব্যাখ্যা করেছেন বলেও উক্ত আলোচক মত ব্যক্ত করেন। জনাব কোরায়শী বলেন, জিম্মী সমস্যাকে পাকিস্তানের মূল সমস্যা বলা ঠিক নয়।[১৪৮]

পাকিস্তানের জন্মক্ষণে বা শিশু-অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্র ও পাকিস্তানী সাহিত্য সৃষ্টির বদ্ধ চিন্তার সন্ধিক্ষণে আইনষ্টাইনের এই কথাগুলো অবশ্যই জ্ঞানের উন্নতমাত্রার প্রতি খেয়াল করতে শিখিয়েছিল : "গতকালকের মনোভাব ও অবস্থার সহিত আজকের মনোভাব ও অবস্থার তুলনা হয়না। আবার আজকের মনোভাব ও অবস্থা আগামী কালে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। এই সত্য ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের মানুষকে সচেতন করার তাগিদ এসেছে আজ বুদ্ধিজীবীদের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে বিবদমান ও শ্রান্ত মানবজাতির জন্য একটি বিরাট শান্তির নীড় রচনার ভারও পড়েছে তাঁদের উপর। আর কখনও বুদ্ধিজীবীদের উপর এত বড় সামাজিক কার্যক্রম ও এতবড় গুরু-দায়িত্বের ভার পড়েনি। বিভিন্ন জাতির সংকীর্ণ ও সংস্কারাচ্ছন্ন জাতীয় ঐতিহ্যকে বৈপ্লবিক পর্যায়ে রূপান্তরিত করে তাকে মানুষের সার্বজনীন কল্যাণের ক্ষেত্রে প্রসারিত করতে হবে। এজন্য সর্বাগ্রে বুদ্ধিজীবীদের নিজস্ব জাতীয় সংকীর্ণতার উর্ধে উঠতে হবে। এই বৃহত্তরের অভিযান চালানোর মত মনোবল ও সাহস কি তাঁদের আছে? এক অসাধারণ কর্মসূচী গ্রহণের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আজ এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও, দুদিন পরে অনুরূপ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবেই। কিন্তু সেদিন আজকের পৃথিবীর বৃহত্তর অংশের ধ্বংসস্তূপের উপরই তার বুনিয়াদ পত্তন হবে। বিশ্বব্যাপী এইরূপ একটা দারুন সংকট সৃষ্টির বিনিময়ে আমরা বর্তমান আন্তর্জাতিক অরাজকতার অবসান ঘটাতে চাইনে। এ সংকটের পরিণতি এমনি ধ্বংসলীলার সৃষ্টি করবে, যা আজ কেউ কল্পনাও করতে পারে না। এ আমরা আশা করিনা— আশা করতে পারিনা। কাজেই পূর্বাহ্নেই আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। সময় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, সত্যিই যদি কাজ করতে হয়— তাহলে এখুনি আমাদের নেমে পড়তে হবে।"[১৪৯]

১৯৫৯ সনে আইউব খান 'পাকিস্তান লেখক সংঘ' গড়েছিলেন ইতিহাসে জানা যায়। ১৯৫৩ সনের ডিসেম্বরে 'পূর্ব-বঙ্গ লেখক সংঘ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল—এবং মফস্বলীয় বিভিন্ন শহরে তার শাখা-প্রশাখাও গড়ে উঠেছিল বলে দ্যুতি পাঠে জানা যায়। কিন্তু এই সংগঠনটির কোনো পরিচয় অন্য কোনো ইতিহাসের আলোচনায় বা পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে জানা যায় না। দ্যুতির দ্বিতীয় বর্ষ ১০ম-১১শ যুগ্ম অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৫৯ সংখ্যায় 'সংস্কৃতি সংবাদ' বিভাগে 'পূর্ববঙ্গ লেখক সংঘ' প্রসঙ্গে বলা হয় ; "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববঙ্গে অনেকগুলো সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে। কিন্তু সংখ্যার দিক থেকে উল্লেখযোগ্য হলেও নগন্য সংখ্যক প্রতিষ্ঠান ছাড়া বাকীগুলোর কর্মতৎপরতা একেবারেই ক্ষীণ। আবার এমন প্রতিষ্ঠানও আছে যেগুলোর প্রাথমিক সাংগঠনিক পর্যায়ের পর প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা একেবারেই স্তব্ধ ও নিঃশ্চেষ্ট হয়ে গেছেন। ফলে প্রতিষ্ঠানে ভাঙন ধরেছে দ্রুতবেগে। এসব প্রতিষ্ঠান টিকে না থাকবারও কারণ একাধিক। সাংগঠনিক, অর্থনৈতিক ও আদর্শগত সমস্যার সংঘাতের ফলেই এসব প্রতিষ্ঠান টিকে থাকেনি বা টিকে থাকলেও অগ্রগতি লাভ করেনি। কাজেই সংখ্যার দিক থেকে নগণ্য না হলেও সুষ্ঠু ও কর্মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা পূর্ববঙ্গে এখনো অনুভূত হচ্ছে। এই প্রয়োজনের তাগিদেই পূর্ববঙ্গের তরুণ সাহিত্যিকদের উদ্যোগে সম্প্রতি ঢাকা শহরে 'পূর্ববঙ্গ লেখক সংঘ' নামে একটি নতুন সাহিত্য–প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে এর এলাকা শুধু ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ নয়। ইতিমধ্যেই প্রদেশের কয়েকটি মফঃস্বল শহরে এর শাখা গঠিত হয়েছে।[১৫০]

'পূর্ব বঙ্গ লেখক সংঘের' উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে বলা হয় ঃ এরলক্ষ্য উদারতার মাধ্যমে মানবতা ও ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে পূর্ব বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য-আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করা। 'সংঘের প্রধানতম উদ্দেশ্যই হলো প্রদেশের বিভিন্ন স্থানের সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে সাহিত্য আন্দোলনকে ব্যাপকতর করা। এদিক থেকে এই নতুন সংঘের কর্ম-চাঞ্চল্য ইতিমধ্যেই প্রদেশের সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং অনেক তরুণসাহিত্যিক সংঘের সংস্পর্শে এসে গেছেন।....পূর্ববঙ্গ লেখক সংঘের কর্মতৎপরতা অনেক ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ্য করছি। তাই সংঘের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে আমরা বলতে চাই যে, অতীতে সংস্কৃতিকর্মীর অভাব, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, আদর্শগত সংঘাত ও পারস্পরিক সমঝোতার অভাবে যেসব প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলো থেকে তাঁরা সহজেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন এবং তাদের সংঘকে সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের বহুবিধ সমস্যা সম্পর্কে তাঁরা সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখবেন —এই আশা করি।" (সূত্র ; পূর্বোক্ত)

উপর্যুক্ত প্রতিবেদন ছাপা হয় দ্যুতির যে-সংখ্যায়, সেটিই প্রাপ্ত শেষ সংখ্যা। 'ক্রমশঃ' প্রকাশিত হবে বলে ওবায়েদ আশকারের নাটক 'কর্ডোভার আগে' এই সংখ্যায়ই ছাপা হয়েছিল। ১৯৫৪ সনের প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মেলন (ঢাকা কার্জন হলে যেটা অনুষ্ঠিত হয়) এর সিদ্ধান্ত ও উদ্দেশ্য প্রচারিত হবার পরে দ্যুতিতে 'সংস্কৃতি সংবাদ' কলামে (২/১০-১১) সম্মেলনের সাফল্য কামনা করা হয়েছিল। কিন্তু এরপর হঠাৎই দ্যুতি বন্ধ হয়ে যায়। অন্যান্য পত্রপত্রিকায়ও 'পূর্ববঙ্গ লেখক সংঘের' কোনো খবর জানা যায়নি। ফলে এর ইতিহাস দ্যুতির পাতাই ধারণ করে আছে। এসব নানা কারণে এবং অনেক মূল্যবান রচনা দ্বারা বাঙলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের নানা প্রসঙ্গ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনায় এনে দ্যুতি কালের প্রয়োজনকে যতো সীমিত সামর্থেই হোকনা কেন মোকাবিলার প্রয়াস গ্রহণ করেছিল।

৮. পূরবী (শ্রাবণ, ১৩৬৭/আগষ্ট, ১৯৬০)

'পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড, পূর্ব পাকিস্তান শাখার মুখপত্র' প্রথমে 'পূরবী নামে 'ত্রৈমাসিক' সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল নওবহারসম্পাদক কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪) এবং মুসলিম ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণকামীগবেষক, অধ্যাপক (অধ্যক্ষ), মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের (১৯১৯-৬৯) যুগ্মসম্পাদনায়। গিল্ডের পূর্বাঞ্চল শাখার অফিস বর্ধমান হাউস (এখন বাংলা একাডেমী), ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে দীর্ঘ যাত্রার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। কিন্তু, পূরবীর একটিমাত্র সংখ্যাই প্রকাশিত হয়েছিল। পরে 'লেখক সংঘ পত্রিকা' নামে এক বছর চলে এই পত্রিকা রূপান্তরিত হয় 'পরিক্রম'-এ। পরিক্রমের ইতিহাস জানার জন্যই 'পূরবী' ও 'লেখক সংঘ পত্রিকা' সম্পর্কে আলাদাভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

পূরবীর প্রথম সংকলনটি ক্রাউন ৮ এর ১ সাইজে ৪২ পৃষ্ঠার ছিল। দাম একটাকা। প্রথম রচনা ছিল কবি গোলাম মোস্তফাকৃত ইকবালের 'শিকওয়া ও জবাবই-শিকওয়া'। এরপর 'কায়কোবাদ' সম্পর্কে সৈয়দ মুর্তজা আলীর প্রবন্ধ এবং প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ লিখিত 'আমাদের সাহিত্য'; মতিনউদ্দীন আহমদের ব্যঙ্গ-রচনা 'বর্ষাতি' ; বেগম ইউসুফ জামাল হোসেন-এর আলোচনা 'আদমজী প্রাইজ' ইত্যাদি। বেগম ইউসুফের আলোচনায় পাকিস্তানের বিভিন্ন সাহিত্য-পুরস্কার প্রবর্তনের ইতিহাস আছে। এই রচনায় জানা যায় লেখক সংঘ স্থাপিত হওয়ার পর—'আদমজী পুরস্কার' সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবর্তিত হবার ফলে সাহিত্যিকদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। বলাবাহুল্য এরপর বিভিন্ন ব্যক্তি, কোম্পানী ও প্রতিষ্ঠান সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজসেবার জন্য পাকিস্তান আমলে বেশকিছু পুরস্কার প্রদানের রীতির প্রচলন করেন। লেখক সংঘের উদ্যোগে 'দাউদ পুরস্কার' প্রবর্তিত হয়। পূবালী পত্রিকার সম্পাদক নূরুল ইসলাম ও অনুপ্রাণিত হয়ে বার্ষিক 'পূবালী পুরস্কার' (১০০০ টাকার) প্রদানের কথাও ঘোষণা করেন। আইউব খান বিভিন্ন খেতাব ও পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। রাইটার্স গিল্ডের সংবাদ বিভাগে কার্যবিবরণী আর সম্পাদকীয়তে পূরবীর উদ্দেশ্য-আদর্শ ব্যক্ত হয়েছিল। সম্পাদকীয়তে বলা হয় ঃ

"পূরবীর নামকরণের মধ্যে একটা তাৎপর্য আছে। পূরবী বেলা শেষের সুর। অস্তগামী সূর্যের বিদায়-রাগে এসুর অনুরঞ্জিত। এ সুরে বিদায় ও অবসানের করুণ মুর্চ্ছনা আছে। কিন্তু সত্যই কি এ অস্তগমনের সুর? সত্যই কি সূর্যের কোন উদয়াস্ত আছে? ভৌগলিক সীমারেখা টানিয়া আমরা আকাশকে খণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের দৃষ্টিও তাই সংকীর্ণ হইয়াছে। এই সীমা প্রাচীর তুলিয়া দিলে কোথায়ও অস্ত নাই, উদয় নাই, পূর্ব নাই, পশ্চিম নাই। সব তখন একাকার হইয়া যায়, এক মহান ঐক্যের মধ্যে সব খণ্ডতা বিলীন হইয়া যায়। পূর্বাচলকে যখন একান্ত আপনার বলিয়া ভাবি তখনই অস্তাচলকে দেখিয়া দুঃখ পাই। কিন্তু এক আকাশের অস্ত ত আর-এক আকাশের উদয়। সূর্য যেখানে ডুবিয়া যায়, সেখান হইতেই ত পশ্চিম-আকাশের উদয়-প্রভাত সূচিত হয়। কাজেই পূর্ব-পশ্চিমকে এক করিয়া দেখিলে কারো মনেই কোন খেদ থাকেনা। মুসলমানের স্বদেশ তাই মাটির স্বদেশ নয় ; ভৌগলিক স্বদেশ-প্রেমকে অতিক্রম করিয়া সে করে বৃহত্তর মানব-প্রেমের সাধনা—মনের দিকচক্রবালের সম্প্রসারণের সাধনা। সূর্যের সংগেই একমাত্র তার তুলনা হইতে পারে। কবি ইকবাল তাই সত্যই বলিয়াছেন ;

"জাহাঁ মৈ আহলে ইমাঁ সুরাতে খুরশীদ জিতে হুঁয়ে/ ইধার ডুবে উধার নিক্‌লে, উধার ডুবে ইধার নিক্‌লে।" অর্থাৎ এই দুনিয়ায় সূর্যসম সুরাৎ হল মুমিনদের এদিক যদি যায় ডুবে ত ওদিক আবার উঠবে ফের। 'পূরবী'র মর্মবাণীতে এই সুরই ধ্বনিত হইবে। যুগমনের স্বপ্নও তাই। আজ আমরা এক নতুন যুগের প্রবেশ দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। এ যুগ নভো-ভ্রমণের যুগ। চাঁদে-চাঁদে-গ্রহে-গ্রহে তারায়-তারায় ফিরিবার যুগ। প্রাচীন পৃথিবীর চৌহদ্দী, রূপ ও গঠন আজ তাই অনেক খানি মূল্য হীন প্রমাণিত হইতেছে। আজ অজানাকে জানিবার দিন, না-দেখাকে দেখিবার দিন। কাজেই প্রচলিত ভূগোলের আলোকে এই পৃথিবীকে একান্ত করিয়া দেখা আর চলিবে না। আমাদের দৃষ্টিকোণকে খানিকটা পরিবর্তিত করিতেই হইবে। আমাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে যে সুর এখনও অনাহত রহিয়াছে, তাহাকে আবার জাগাইতে হইবে। পূরবী এই নূতন সুর সাধনায় যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করিবে।"

Dhaka University Institutional Repository

'পূরবী' পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের পূর্বাঞ্চল শাখার মুখপত্র হলেও 'আপাতত ইহা ত্রৈমাসিক রূপে প্রকাশিত হইবে।...মূলত একখানি সাহিত্যপত্রিকাই হইবে। তবে....গিল্ডের যাবতীয় সংবাদ ও তথ্য এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। পূর্বপাকিস্তান শাখা গিল্ডের সেক্রেটারী ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল এবং ইডেন প্রেস ৪২/এ হাটখোলা রোড, ঢাকা থেকে এ. আর, খান কর্তৃক মুদ্রিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য এটা পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারে অর্থে ও নিয়ন্ত্রণে বি. এন. আর-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে মাহেনও-এর মতো সরকারী কর্মচারীদের ব্যবস্থাপনায় এটি ছিলনা। সায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কিছু স্বাধীনতা তাঁরা ভোগ করতেন। ভোটাভোটির মাধ্যমে কর্মকর্তা/সম্পাদনা পরিষদ/কার্যকরী পরিষদ গঠিত হতো।

৯. লেখক সংঘ পত্রিকা (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮/এপ্রিল-মে ১৯৬১--চৈত্র ১৩৬৮/ মার্চ-এপ্রিল ১৯৬২)

লেখক সংঘের বাংলা মুখপত্র 'পূরবী' নামে মাত্র একটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর এটা 'লেখক সংঘ পত্রিকা' নামে প্রকাশিত হয়। 'লেখক সংঘ পত্রিকা' নামে এগারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ তে। প্রথম ও দ্বিতীয় -তৃতীয় যুগ্ম সংখ্যায় সম্পাদক হিসেবে কবি গোলাম মোস্তফার নাম এককভাবে মুদ্রিত হয়। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সরে যাবার কারণ কি তা আজ আর স্পষ্ট করে কেউ জানাবেন না। তবে পত্রিকার পাতাতেই বিভিন্ন গ্রুপের দলাদলি-কষাকষি-রেষারেষি বা প্রবল প্রতিযোগিতা ছিল বলে জানা যায়। লেখক সংঘ পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যা থেকে গোলাম মোস্তফার সঙ্গে কবি বেগম সুফিয়া কামালের নামও ছাপা হয়। 'লেখক সংঘ পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যাতে 'আমাদের কথা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয় : "পত্রিকা আরো আগেই প্রকাশ করা উচিত ছিল। কিন্তু নিয়মিত মাসিকরূপে পত্রিকা প্রকাশ করতে হলে আনুষঙ্গিক আয়োজন করতে হয় অনেকখানি। পত্রিকার নামকরণ সম্বন্ধেও মতবিরোধ ছিল। তাই সকল মতের সমন্বয় করতে কিছুটা বিলম্ব ঘটেছে। "লেখক সংখ পত্রিকা' শেষ সিদ্ধান্তের ফল। 'লেখক সংঘ পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যার পৃষ্ঠা ছিল ৮০। পরের যুগ্মসংখ্যার পৃষ্ঠা ছিল ১২০। পরেরটার পৃষ্ঠা ৬৬। মোহাম্মদীর মতো পৃষ্ঠা সংখ্যায় ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছিল। ৯টি খণ্ডে (একাদশ সংখ্যা) মোট ৬৯০ পৃষ্ঠা ছাপা হয়েছিল। সুফিয়া কামাল লেখক সংঘ পত্রিকার যুগ্মসম্পাদকরূপে শেষ পর্যন্ত ছিলেন। এই পত্রিকা আশরাফউজ্জামান খান কর্তৃক পাকিস্তান লেখক সংঘ, পূর্ব পাকিস্তান শাখার অফিস, বর্ধমান হাউস থেকে প্রকাশিত এবং পূর্ববঙ্গ প্রেস, ২ জিন্দাবাহার ২য় লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। দাম পঁচাত্তর পয়সা, একটাকা ইত্যাদি রাখা হয়েছিল। বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৯, ৪ মাস বন্ধ থেকে এই পত্রিকাই পরে 'পরিক্রম' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক সংঘের চরিত্র-লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং সীমাবদ্ধতা বোঝার জন্য সহায়ক হবে "পাকিস্তান লেখক সংঘের শপথপত্র"র মর্ম অনুধাবন করলে— সংঘের সদস্য হতে হলে এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন প্রাথমিক শর্ত হিসেবে গণ্য হতো ঃ

"দেশের প্রচলিত সকল ভাষার প্রতিনিধি আমরা পাকিস্তানের লেখকগণ আমাদের মাতৃভূমির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, মর্যাদা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক শান্তি এবং মানবজাতির বিকাশের কার্যে আত্মোৎসর্গের শপথ গ্রহণ করছি।

জাতিসংঘ রচিত মানবাধিকারের সনদে আমরা বিশ্বাসী। লেখক হিসাবে স্বাধীনভাবে মতামত স্থাপন ও প্রচারের অধিকার আমাদের একটি মৌলিক অধিকার। এ অধিকার অক্ষুন্ন রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর: কারণ এ অধিকারের অভাবে সৃষ্টিধর্মী রচনা অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে।

সত্যের যথাযথ রূপায়ণ, দেশাত্মবোধের অনুশীলন আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং মানুষের মধ্যে উন্নততর সম্পর্ক স্থাপন করার মহান কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা সজাগ, কারণ মানবজাতির মর্যাদা ও সুখসাচ্ছন্দ্য পারস্পারিক সহযোগিতা ও উন্নততর সম্পর্কের উপরই নির্ভরশীল।

লেখক হিসাবে আমরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে এমন একটি সুখী ও সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করছি যেখানে সকলের জন্য অবাধে সমান সুযোগ সুবিধা থাকবে এবং যার ফলে ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা মানবিক গুণাবলী ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা বিকাশের সহায়ক হবে। কাজেই আমরা বিজ্ঞানের উন্নতিকে পৃথিবীতে শান্তি ও সম্পদ বৃদ্ধির উপায় বলে বিশ্বাস করি।" 'লেখক সংঘ পত্রিকা'র প্রথম পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত এই শপথ বাক্যে পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেও গোলাম মোস্তফার সম্পাদিত সংঘমুখপত্র (লে. স. প.) তে স্বাধীনতার অর্থ দুই পাকিস্তান মিলে স্বাধীনপাকিস্তানের আদর্শই বুঝানো হয়েছে। এর রচনাবলী দ্বারা ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চার প্রাধান্য বোঝা যায়। এর লেখক ও লেখার পরিচয় নেয়া যাক। লেখক সংঘ পত্রিকার কবি ও কবিতা ঃ

সৈয়দ আলী আহসান (একাকী, ১/১ ; অনেক ঘনিষ্ঠতায়, ১/৮-৯) ; আখতার-উল আলম (কোহিনুর, ১/১০ ঘুম : ঘুম ১/৪, এই মন এই রৌদ্রের দিন ১/৭; শেলী তুমি, ১/১০) ; আ.ন.ম. বজলুর রশীদ; নাথিয়া গলি, ১/১; আমার ওতান, ১/৭ ; মধ্য রাত্রি, ১/৮-৯) ; আবদুর রশীদ খান (ইকবালের যবুর-ই-আলম থেকে অনুবাদ, ১/১ ; বিন্দু ১/৭) ; সুফিয়া কামাল (উদয়ের দেশ, ১/১) ; জসীম উদ্দীন (দুই ফুল, ১/২-৩) ; বন্দে আলী মিয়া (লগ্ন শেষে, ১/২-৩ ; পৃথিবী ধূসর হলো, ১/১০) ; প্রজেশ কুমার রায় (সনেট, ১/২-৩) ; জাহানারা আরজু (জিজ্ঞাসা, ১/২-৩ ; রৌদ্রগান, ১/১১) ; আবদুল কাদির (ডোবা, ১/৪) ; মাহবুব তালুকদার (আত্মহত্যার আগে, ১/৪; সম্রাট, ১/৫) ; রাশিদা জামান (বৃষ্টি, ১/৪) ; কাদের নওয়াজ (প্রিয়া, ১/৫) ; তালিম হোসেন (দুটি গান, ১/৫; দুটিগান, ১/৮-৯) ; শামসুল হক কোরায়শী (শরতরাতে, ১/৫ ; অলস মুহূর্তের কবিতা ১/৮-৯) ; বেনজীর আহমদ (মুক্তি বিহঙ্গম, ১/৬) ; মরতুজা (সুকন্যা কঙ্কার স্বপ্ন, ১/৬) ; হাবিবুর রহমান (দেহের খিমায়, ১/৭ ; কোথায় থাকি, ১/১১) ; নূর মুহম্মদ মিঞা (সে ছিল অভিমানী, ১/৭) ; গোলাম মোস্তফা (আলাওল, ১/৮-৯) ; আবু সাঈদ জহুরুল হক (যে কথা ভাবছি, ১/৮-৯) ; আহসান হাবীব (ঈর্ষার আলোকে আমি, ১/১০) ; আজিজুর রহমান (দুটি গান, ১/১০) ; বদরুন্নেসা আবদুল্লাহ (শতাব্দীর চাঁদ, ১/১১) ;

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা নুরুদ্দীন আহমদ (অনুবাদ, ইকবালের বাল-ই- জিব্রীল থেকে, সাকীনামা; মসজিদ-ই- কারতোবা (ইকবাল ১/৮-৯) ;

এই পত্রিকা গদ্য-প্রধান ছিল। গল্প লিখেছিলেন শওকত ওসমান (প্রস্তর ফলক ; একটি রাগিনী, ১/১ ; স্কেচবুক থেকে : জন্তুকথা, হামেদ আহমদ (ঋণ পরিশোধ, ১/১ ১/৫); মতিনউদ্দীন আহমদ (পাগলী, ১/২-৩) ; সুবোধ দাসগুপ্ত (বস্তুমামার গাড়ী, ১/২-৩) ; আহমদ রফিক (শেষ দেখা, ১/৪) ; মোহাম্মদ নাসির আলী (আইসক্রীম, ১/৪) ; রাবেয়া খাতুন (শ্বেতকপোতী, ১/৫) ; কৃষণ চন্দর (চীনা পাখী, অনুবাদ : কাজী মাসুম, ১/৬) ; বেগম সুলতানা ইসলাম (মলি, ১/৬) ; হুমায়ুন খান (প্রথম প্রেম, ১/৬) ; আবু জাফর শামসুদ্দীন (একজোড়া প্যান্ট, ১/৭) ; বুলবুল ওসমান (সংশয়, ১/৭) ; আহমদ রফিক (বিষন্ন কোণ, ১/৮-৯) ; শিকার, ১/১১) ; কুদরতুল্লাহ্ শাহাব (শেষ পর্যন্ত, উর্দু থেকে অনু ; ফখরুজ্জামান চৌধুরী, ১/১০) ; শহীদ আখন্দ (দৃষ্টি, ১/১০) ; কাজী মোস্তফিজুর রহমান, (রাত্রির নরক, ১/১১) ; আশরাফউজ্জামানের ধারবাহিক উপন্যাস 'ডাকিনা পদ্মা' প্রথম সংখ্যা থেকেই ধারাবাহিক এতে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধকার ও রচনার শিরোনাম ঃ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (ফারসীর বাংলা দখল, ১/১ ; কবি আলাওল, ১/১১) ; মুহম্মদ আবু তালিব (পঞ্চদশ শতকের কবি শ্রী মুহম্মদ কালা ও তাঁর কাব্য ১/১) ; আবদুল কাদির (বিষাঙ্কুর কাব্য ; শ্রী সেখ জোহাদ রেহিম প্রণীত), ১/১ ; আতোয়ার রহমান (বাংলাদেশের গ্রাম্য ছড়া, ১/১ ; মেয়েলীগানে সমাজচিত্র ১/৮-৯), দেওয়ান আবদুল হামিদ ; (কবি সৈয়দ এমদাদ আলী, ১/১) ; হাসান জামান (মুসলিম চিন্তাধারায় ইকবালের অবদান, ১/২-৩) ; আশরাফ সিদ্দিকী (লোক-বিজ্ঞান, ১/২-৩) ; মুজিবুর রহমান খাঁ (ভাষা ও শিক্ষা-সংকটের এক অধ্যায়, ১/২-৩) ; মোস্তফা কামাল বার-এট-ল (স্থিতিশীল শাসনতন্ত্রের জন্যে, ১/২-৩) ; হাবিবুর রহমান (আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে, ১/২-৩) ; আবুল ফজল (নৃত্য শিল্পী বুলবুল চৌধুরী, ১/২-৩) ; রফিকুল ইসলাম (নজরুল ইসলামের গান, ১/২-৩) ; গোলাম মোস্তফা (আর্য-থিওরী, ১/৪) ; আধুনিক কবিতা, ১/৮-৯ ; সমালোচনার সমালোচনা, ১/১০) ; মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (যুগমানস ও কবি কায়কোবাদ, ১/৪) ; আবু যোহা নূর আহমদ (সুদানের রাষ্ট্রনায়ক মেহেদী, জীবনী, ১/৪ (মিসরের রাষ্ট্রনেতা যাগলুল, ১/৮-৯) ; রওশন ইজদানী (মোমেনশাহীর পল্লীগীতিনাট্য, ১/৪) ; আ. ন. ম. বজলুর রশীদ (শাহ লতীফ, ১/৫) ; আজহারুল ইসলাম (পারসীসাহিত্যে হিন্দুর দান, ১/৫) ; মাহফুজউল্লাহ (মোহাম্মদ?) ('সাহিত্য ও জাতীয়চেতনা', সংলাপের ১/১ সংখ্যায় প্রকাশিত ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়ায়, ১/৫) ; সৈয়দ মুর্তজা আলী (নবনূর, ১/৬) ; গোলাম রসুল (ইকবাল-নজরুল-রবীন্দ্রনাথের শিল্প ও জীবনবোধ, ১/৭) ; জগলুল হায়দার আফ্রিক (আবুল ফারায ও কিতাবুল আমানী, ১/৭) ; মুহম্মদ আবদুল হাই (আলাওলের সেকান্দার নামা, ১/৮-৯) ; মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন (সৈয়দ আলাওল, ১/৮-৯) ; গোলাম সাকলায়েন ((সেখ জুমনউদ্দীন, ১/৮-৯) ; ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন (আমার সাহিত্যিক জীবনের অভিজ্ঞতা (স্মৃতি), ১/৮-৯) ; ইব্রাহীম খাঁ (তক্ষশীলার পথে (ভ্রমণ), ১/৮-৯) ; জসীমউদ্দীন (করাচী-মুলতানে কয়েকদিন ভ্রমণ, ১/১০) ; খোদেজা খাতুন (শত পথ সহস্র পথিক, ১/১০) ; আনোয়ারুল করিম (বাউল কবি লালান শাহ, ১/১০ ও পরবর্তী সংখ্যা) ; শীলা ম্যাকডোনাফ (আধুনিক সাহিত্যে ধর্মীয় চেতনা, অনুবাদ : আখতার উল আলম, ১/১১) ; ডাঃ গিরিশচন্দ্র বড়ুয়া (পালি বৌদ্ধ সাহিত্যে জাতকোপাখ্যান, ১/১১) ;

উপরের তালিকা থেকে দেখা যায় ইকবালের অনুবাদ, ইসলামীসাহিত্য, মধ্য ও আধুনিক যুগের মুসলিম লেখক, পাকিস্তান ভ্রমণ ইত্যাদি বিষয়ে পাকিস্তানবাদী লেখকদের স্বকীয়দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত আলোচনাই লেখক সংঘ পত্রিকায় মুখ্যভাবে জায়গা পেয়েছে। অপরাপর পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার বাদ-প্রতিবাদ বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও এবং বেশ কিছু বইয়ের আলোচনাও এতে স্থান পায়। সংলাপে ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের প্রবন্ধের 'সাহিত্য ও জাতীয় চেতনা' শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা করেছেন মাহফুজ উল্লাহ। 'কষ্টি পাথর' ছদ্মনামে সংলাপের (১/১) সমালোচনাও করা হয়েছে কঠোরভাবে। এতে বলা হয় বিএন আর এর মাধ্যমে প্রকাশিত সংলাপে পাকিস্তানী আদর্শ অনুপস্থিত থাকাটা দুঃখজনক। (১/৪); মাহফুজউল্লাহ বলেন, ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোয়ায়েন 'সাহিত্য ও জাতীয় চেতনা' শিরোনামে প্রবন্ধ লিখেছেন, যাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তিনি পাকিস্তানের সাহিত্য ও এতে প্রতিফলিত জাতীয় চেতনার স্বরূপ উদঘাটন করে কোনো সমালোচনা বা মতামত উপস্থাপিত করবেন, কিন্তু তিনি বিভিন্ন দেশের নানান সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় জাতীয় চেতনার আলোচনা করে অনেকটা চোখ ঠারানোর কাজ করেছেন।[১৫১] যাহোক, লেখক সংঘ পত্রিকা- দেখা যায়, কানাইয়া লাল কাপুর এর রচনা থেকে 'কাজ' নামে একটি নাট্যাংশের অনুবাদ করেছিলেন কাজী মাসুম (১/৮-৯) ; তাছাড়া ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'ফার্সীর বাংলা দখল (১/১) শীর্ষক রচনাটিরও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন মীজানুর রহমান (১/২-৩)। ডঃ শহীদুল্লাহও তাঁর জবাব দিয়েছিলেন ঐ সংখ্যাতেই। দেয়া হয়েছিল : আল্লামা ইকবালের স্ট্রে রিফ্লেকশন (আলোচক গোলাম মোস্তফা) ; কাজী আকরম হোসেন প্রণীত 'দেউয়ান-ই-হাফিজ' (আলোচক : মোহাম্মদ মনসুরউদ্দীন) ; আ. ন. ম. বজলুর রশীদ প্রণীত 'পথ বেঁধে দিল' (আলোচক মাফরুহা চৌধুরী) ; রশীদ করীম প্রণীত 'উত্তম পুরুষ' (আলোচক ; আহসান হাবীব) ; মোঃ গোলাম হোসেনের 'কাব্য যুথিকা' (আলোচক ; ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন) ; নজরুল রচনা সম্ভার' (আলোচক : আবুল ফজল) ; আবদুর রহমান প্রণীত 'কোরআন ও জীবনদর্শন' (আলোচক ; গোলাম মোস্তফা) ; হরিনারায়ণ নন্দীর কবিতার বই 'আকাশ মাটি মানুষ' (আলোচক : আবদুল কাদির) ; মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের হারামনি (আলোচক : রফিকুল ইসলাম) ; মওলানা মুহম্মদ আবু বকর প্রণীত 'কায়িদ নামা' (আলোচক : শাহাবুদ্দীন আহমদ) ; কবি হাবীবুর রহমানকৃত কাব্য 'উপাস্ত' (আলোচক কষ্ঠিপাথর) ; এবং আহমদ রফিক প্রণীত 'শিল্প সংস্কৃতি জীবন' (আলোচক : শাহাবুদ্দীন আহমদ) প্রভৃতি গ্রন্থের পরিচয় পরিচিতি মন্তব্যসহ।

এই পত্রিকায় কণ্ঠসঙ্গীতশিল্পী ও বিশিষ্ট সংস্কৃতিসেবী আব্বাসউদ্দীন এবং শেরেবাংলার মৃত্যুতে সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১০. পরিক্রম (১৯৬২-৭০)

লেখক সংঘ পত্রিকাই 'পরিক্রম' নাম ধারণ করে। ১৯৬২ সনের সেপ্টেম্বরে এর দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (১৯৩৬) ও রফিকুল ইসলামের (১৯৩৪) যুগ্মসম্পাদনায়। এঁরা তখন তরুণ অধ্যাপক এবং লেখক হিসেবে সাহিত্যসমাজের দৃষ্টিতে এসেছিলেন। দুজনই অতিবাল্যাবস্থা থেকে ঢাকার আলো-বাতাসের সঙ্গে পরিচিত। 'লেখক সংঘ পত্রিকা'র সম্পাদক কবি গোলাম মোস্তফা সংঘের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধের আভাস দিয়েছিলেন। পত্রিকার নামকরণ এবং সংঘের কর্তৃত্ব নিয়েও সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। প্রাচীনপন্থী ও অত্যাধুনিকদের মধ্যে বিরোধের পরিণতিতে অবশেষে প্রাচীনদের পরিবর্তে আধুনিক-তরুণদের প্রভাব ও ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে সংঘ মুখপত্র 'পরিক্রম' নাম গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ পাকিস্তানের আদর্শ-প্রচারের সীমিত গণ্ডীতেই কেবল তাঁরা আবদ্ধ থাকতে চাননি। সাহিত্য সংস্কৃতিজগতের বিশ্বরূপ পরিদর্শনের অভিপ্সা ও অভিব্যক্ত হয়েছিল তাঁদের এই নামকরণের বা নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। 'পরিক্রম' শব্দের আক্ষরিক অর্থ কিছু হলেও সাফল্য লাভ করেছিল। কারণ পাকিস্তানবাদী ধ্যানধারণা এবং দুই দিগন্তের ঐক্যসাধনের ব্রত নিয়ে প্রথমে মুখপত্রটি (লে.স.প.) প্রকাশিত হলেও, কৃতিত্বের এবং আদর্শ-নিয়ন্ত্রণের ভার তরুণদের হাতে চলে আসায় বিশ্বজনীন সাহিত্যসংস্কৃতিভাবনার দ্যুতি এবং মাঝে-মধ্যে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদী চেতনাধারা এতে সচকিত হয়ে উঠেছিল। সমালোচনার ক্ষেত্রে স্বাধীন ও মুক্তবুদ্ধির চর্চার কিছু পরিচয় তাই এতে দুর্লক্ষ হয়নি।

লেখক সংঘের মুখপত্র প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল মাসিক আকারে। কিন্তু তিনটি পর্বে, তিনটি নামে এই মুখপত্রটির মাত্র ৫২টি, অথবা ৫১ (১ + ৯ + ৪১ = ৫১) ও হতে পারে প্রকাশিত হয়। হবার কথা ছিল সাড়ে দশ বছরের ১২৬টি। চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা আগস্ট ১৯৬৫তে প্রকাশিত হয়। এবং ১৯৬৫র নভেম্বরে প্রকাশিত হয় চতুর্থ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা। চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা অনুসন্ধানে পাওয়া যায়নি। না-পাওয়া গেলেও সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর ১৯৬৫ তে দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার কথা। কিন্তু মাসিকপত্রিকা দুই মাসে তিনটি প্রকাশিত হয় কিভাবে? চতুর্থ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে মাঝখানের সংখ্যাগুলো যথারীতি প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। সম্পাদক জানান, আবদুল মান্নান সৈয়দ সুধীনদত্তের ওপর ঐ দুই সংখ্যায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তবে দুটি সংখ্যাই হয়ত প্রকাশিত হয়ে থাকবে। এটি তাঁদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী খেয়ালহীনতার জন্যে ঘটিত একটি অনিয়ম। যেমন অনিয়ম লক্ষ্য করা যায় চতুর্থ বর্ষের কয়েকটি সংখ্যার প্রকাশের সন তারিখে এবং পত্রিকার গায়ে লিখিত বর্ষ ও সংখ্যার নম্বরে। চতুর্থ বর্ষ প্রথম থেকে একাদশ সংখ্যা আবদুল গনি হাজারীর সম্পদানায় প্রকাশিত হয়। এসময়ে ৮ম, ৯ম ১০ম, ১১শ ও ১২শ সংখ্যায় বিরাট অনিয়ম ঘটে। চতুর্থ বর্ষ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ-সপ্তম (যুগ্ম) ৮ম ও ৯ম-১২শ (যুগ্ম) সংখ্যা প্রকাশিত হয় যথাক্রমে শ্রাবণ ১৩৭২ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ পর্যন্ত সময়কালে। পঞ্চম বর্ষ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় জুলাই-আগষ্ট ১৯৬৮ অর্থাৎ আষাঢ়-শ্রাবণ ও শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে। কিন্তু মাঝখানে চতুর্থ বর্ষ অষ্টম, চতুর্থ বর্ষ নবম-একাদশ ও চতুর্থ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা (তিনটি খণ্ডে) আবার প্রকাশিত হয় যথাক্রমে আশ্বিন-কার্তিক ১৩৭৪, পৌষ-ফাল্গুন ১৩৭৪ ও চৈত্র ১৩৭৪, শ্রাবণ ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে। এই সংখ্যাগুলো বিষয়বস্তুতে ডুপ্লিকেট নয়। কিন্তু সংখ্যার হিসাব এমন গরমিলে ভরা কেনো তা বুঝা যায়না। যাহোক, পরিক্রম নিয়মিত বের হয়নি। সম্পাদনার দায়িত্বও কেউ গুরুত্ব দিয়ে পালন করেন নি। সরকারী পত্রিকা বা দলীয় মুখপত্রে যাঁদের নাম ছাপা হয়েছে, তাঁরাই যে সবকিছু দেখাশোনা করেছেন সব সময়, তা নয়। সহযোগী, সহকারী এবং বেতনভুক অথবা সৌখিন তরুণ এ্যামেচার সাহিত্যসেবী, সহকারীদের উপরই ন্যস্ত থেকেছে দায়িত্বাবলী। সেকারণে এবং অনিয়মিত অর্থ বরাদ্দের ফলে পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়নি। সম্পাদকীয়তেও কোনো গুরুতর উদ্দেশ্য আদর্শ ব্যক্ত করা হয়নি। অথবা গুরুত্ব দিয়ে সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সম্পাদকগণ প্রায়ই কোনো বক্তব্য উপস্থিত করেননি। ভালো লেখকদের পয়সার জন্য দেয়া অনেকগুলো লেখার মধ্য থেকে বেছেবেছে ভালো লেখা সমূহ মুদ্রণ করা হয়েছে। সেই কাজ হয়েছে অনেকটা অফিসিয়াল রুটিন ওয়ার্কের মতো, যেমন হয়েছে মাহেনও-এ।· তবে মাহেনও খোদ সরকারী আর পরিক্রম বেসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ছিল বলে এখানে কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত মতামত কার্যকরভাবে প্রয়োগের সুযোগ ছিল বলে মাত্রাগতভাবে তারতম্য ছিল দুই পত্রিকার কর্ম ও চিন্তাগত পদ্ধতিতে।

'পুরবী'সহ 'লেখক সংঘ পত্রিকা'র এগারোটি সংখ্যাকে মিলিয়ে একবছর ধরে, দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা হিসেবে 'পরিক্রম' নামের পত্রিকার প্রথম পত্রটি প্রকাশিত হয় ভাদ্র ১৩৬৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ সনে। যুগ্ম সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং রফিকুল ইসলাম। পরিচিতিতে লেখা হয়েছিল 'পরিক্রম পাকিস্তান লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখার মাসিক সাহিত্য ও সংস্কৃতিপত্র'। ইংরেজী মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (সাধারণত, এবং অধিকাংশত বাংলা পত্রিকাসমূহ বাংলা মাস সনই অনুসরণ করেছে বা করে থাকে ; এঁরা ইংরেজী মাস অনুসরণ করতেন কেনো?)। সেপ্টেম্বরে বর্ষশুরু (পুরবী শ্রাবণ মাসে বেরিয়েছিল, সে হিসেবেও সেপ্টেম্বর বর্ষ শুরুর সঙ্গতি বা সূত্র পাওয়া যায়না। এই নিয়ম কেবল 'পরিক্রম' এর জন্যই প্রযোজ্য। অথচ পরিক্রম প্রথম বছরে দ্বিতীয় বর্ষ হিসেবেই যাত্রা আরম্ভ করলো সম্ভবত সরকারী হিসাব (অডিট) মিলানোর জন্য। পরিক্রমের প্রতি সংখ্যার দাম '৫০ পয়সা।' 'প্রকাশিত মতামত লেখকদের ; লেখক সংঘের তাতে কোনো দায়িত্ব নেই'। আসকার ইবনে শাইখ কর্তৃক বর্ধমান হাউস ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত ও পূর্ববঙ্গ প্রেস, ২ জিন্দাবাহার দ্বিতীয় লেন, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, রফিকুল ইসলাম ও আশকার ইবনে শাইখ ই বেশীর ভাগ সময় দায়িত্ব পালন করেন। প্রকাশক ও মুদ্রকের ঠিকানাও বর্ধমান হাউস ও পূর্ববঙ্গ প্রেসই অধিকাংশ ক্ষেত্রে, মাঝেমধ্যে পরিবতন লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয়বর্ষ প্রথম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ১৯৬২ থেকে তৃতীয় বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা জানুয়ারী ১৯৬৫ পর্যন্ত— দুই বছরের সম্পাদক ও প্রকাশক অপরিবর্তিত ছিলেন। এপর্বে তাঁরা মোট ২০টি পুস্তিকা প্রকাশ করতে পারলেও তাঁদের দুবছর ছিলো উনত্রিশ মাসের। এরপর ফেব্রুয়ারী থেকে জুলাই ১৯৬৫ পর্যন্ত পত্রিকা বন্ধ ছিল। অতপর সম্পাদনা পরিষদের পরিবর্তন ঘটে। চতুর্থবর্ষ প্রথমসংখ্যা শ্রাবণ ১৩৭২ আগষ্ট ১৯৬৫তে আবদুল গনি হাজারীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তার সম্পাদনায় জানুয়ারী ১৯৬৮ ফাল্গুন ১৩৭৪? ফেব্রুয়ারী হলে সঙ্গত হয়)

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত পরিক্রমের মাত্র ৯টি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। অতপর সম্পাদক হন হাসান হাফিজুর রহমান। গরমিল হিসেবের চতুর্থ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৭৪ থেকে শ্রাবণ ১৩৭৫/ফেব্রুয়ারী থেকে জুন ১৯৬৮ সংখ্যাটি প্রথম তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই সময় পরিক্রম 'সমকাল মুদ্রায়ণ' থেকে মুদ্রিত হতো। তাঁর সম্পাদকত্বে মাত্র চারটি পুস্তিকা (৪/১২ ; ৫/১-২ ; ৫/৩-৪ ; ৫/৫) প্রকাশিত হয়। সময়ক্ষেপণ হয় ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ থেকে নভেম্বর ১৯৬৮ পর্যন্ত দশ মাস। এরপর পঞ্চম বর্ষ ষষ্ঠ-সপ্তম ডিসেম্বর ১৯৬৮ থেকে জানুয়ারী ১৯৬৯ পর্যন্ত সময়ের যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর একক সম্পাদনায়। এই সময় পরিক্রমে দীর্ঘ সম্পাদনা-পরিষদের নাম ছাপা হয়। এই পরিষদের সদস্য ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান, সৈয়দ মুর্তজা আলী, আহমদ শরীফ, আবদুল গনি হাজারী, আবদুর রশীদ খান, জাহানারা আরজু প্রমুখ। এর পরের সংখ্যাতে সম্পাদনাপরিষদ থেকে হাসান হাফিজুর রহমানের নাম বাদ দিয়ে বাদবাকীদের নাম ছাপা হয়। প্রথম থেকেই পরিক্রম আশকার ইবনে শাইখ সংঘের পক্ষে প্রকাশ করে আসছিলেন। ফেব্রুয়ারী-মে ১৯৭০ এ প্রকাশিত (৬/৮-১১) সংখ্যাটি সংঘের পক্ষে প্রকাশ করেন বজলুর রহমান। পরিক্রম পত্রিকার শেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় দীর্ঘ বিলম্বে ১৯৭০ সনের ডিসেম্বরে (সম্ভবত জানুয়ারী ১৯৭১ হবে। ৬ষ্ঠ বর্ষ ১২শ এবং ৭ম বর্ষ ১ম-৬ষ্ঠ জুন-ডিসেম্বর ১৯৭০/আষাঢ়-পৌষ ১৩৭৭ ৭ সংখ্যা একত্রে)। অন্তিম-সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। নতুন নাম ও সম্পাদনা পরিষদে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। শেষটিতে সম্পদানা পরিষদের সদস্য হিসেবে নাম ছাপা হয় সরদার ফজলুল করিম, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, রাজিয়া খান, নেয়ামাল বাসীর ও শামসুল হকের। এইবার কার্যালয়ও পরিবর্তিত হয় ; সংঘ অফিস ৩৭ তোপখানা রোড, ঢাকা -২ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। মুদ্রকও পরিবর্তিত হয়েছিল শেষকালে। কথাকলি প্রিন্টার্স এণ্ড প্যাকেজেস, ঢাকা-২ থেকে শেষ সংখ্যাটি মুদ্রিত হয়। পরিবর্তিত ষ্টাইলে এক কলামের পরিবর্তে দুই কলামে লেখা ছাপা হয়েছিল। পরিক্রমে সম্পদানা সহযোগী হিসেবে নাম ছাপা হয়েছিল শাহাবুদ্দীন আহমদ, রশীদ হায়দার, কাজী মোঃ নুরুজ্জামান, প্রমুখের। আবদুল গনি হাজারীর সম্পাদকত্বে প্রকাশের কালে পরিক্রমের 'যুগ্ম সম্পাদনা'য় ছিলেন জাহানার আরজু ও লুৎফুল হায়দার চৌধুরী। সহযোগী আবুল হাসানাত। সম্পাদনার মানয়া-ই থাক— কাগজ, কভার, ছাপা, বাঁধাই উন্নতমানের ছিল। এর সাইজ প্রথমে রয়েল ডিমাই ১/৮ ছিল। পরে-আকারে বড় হয়েছিল হাজারীর সময়ে। পরিক্রমের প্রচ্ছদ শিল্পী ছিলেন কালাম মাহমুদ, আবদুর রউফ, কাইয়ুম চৌধুরী, দেবদাস চক্রবর্তী, আমানুল হক প্রমুখ। পরিক্রমের পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রতিবারে নতুন করে এক থেকে আরম্ভ করা হয়েছে আবার ১২ সংখ্যার নম্বর ক্রমিক অনুসারেও দেয়া হয়েছে (হাজারীর কালে ১২ সংখ্যার পৃষ্ঠ ধারাবাহিক ছিল)। পুস্তিকাগুলো একশো পৃষ্ঠার উপরে পঁচিশ-ত্রিশ পর্যন্তও হতো, তবে মাঝেমধ্যে কমও হয়েছে। এইভাবে পাকিস্তান লেখক সংঘের মাসিক মুখপত্রটি সাড়ে দশ বছরে শ্রাবণ ১৩৬৭ থেকে পৌষ ১৩৭৭) ১২৬টি পুস্তিকার স্থলে মাত্র ৫১টি পুস্তিকা বহু সম্পাদকের সম্পাদনায় এবং নানাজনের নানারূপ সাহায্য-সহযোগিতায় প্রকাশিত হয়ে হয়ে অবশেষে মুক্তি- সংগ্রামের দ্বারপ্রান্তে এসে যাত্রা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাঙালীদের প্রতি আর সবকাজে বিমাতাসুলভ আচরণের জন্য অভিযুক্ত হলেও বাঙালীবুদ্ধিজীবী ও লেখকদের প্রতি সদাচারের জন্য প্রশংসিত হওয়ার অধিকারী। সংঘের মধ্যে এতো দ্বন্দ্ব-বিরোধ, গণ্ডগোল, ষড়যন্ত্রের খবর জানা থাকলেও সরকার সংযম প্রদর্শন করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর্যন্ত—এমনকি গণঅভ্যুত্থানে (১৯৬৯) বাঙালীদের মানসিকতা সুস্পষ্ট হয়ে যাবার পরেও পূর্বাঞ্চল শাখার বুদ্ধিজীবীদের বাংলাসাহিত্যি সাধনার রসদ বন্ধ করে দেয়নি।

পুরবী বা লেখকসংঘের যে সম্পাদকীয়উদ্দেশ্য-আদর্শ ছিল—বস্তুগতভাবে তাই-ই পরিক্রমের নীতিগত দর্শন। তবে লেখার গুণ বিচার করতে গিয়েই নির্বাচকমণ্ডলী পাকিস্তানবাদী প্রাচীনদের পরিবর্তে নবীন এবং বয়স্ক অথচ অত্যাধুনিকমনস্ক লেখকদের রচনা নির্বাচন করেছেন বেশী। এই লেখকমণ্ডলী উচ্চশিক্ষিত, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক উচ্চস্তরে তাঁদের গতায়ত এবং দেশবিদেশ পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতাও আছে অধিকাংশের। ফলে পত্রিকার বৈশিষ্ট্যে আধুনিকতার রঙ বেশী ফুটেছিল। মাসিক পত্রিকার মধ্যে নিউজপ্রিন্টে ছাপা মোহাম্মদী, সওগাত, পূবালীর সংখ্যাগুলো তাঁদের আদর্শ হয়নি। পরিচয়, চতুরঙ্গ, সমকাল এঁদের সামনে ছিল। আর ছিল দেশের গবেষণাপত্রিকাসমূহ। সম্পাদক ও লেখকেরা বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ প্রভৃতির গবেষণা জার্নালের এবং উত্তম বা প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাগুলোর কথা সব সময়ই স্মরণে রেখেছেন। ফলে এতে বৈদগ্ধ ও সাহিত্যবৈশিষ্ট্যে মানগত উত্তরণ সম্ভভ হয়েছিল। আবদুল গনি হাজারী যখন সম্পাদক হন তখন চতুর্থ বর্ষ প্রথম, কিন্তু পরিক্রমের তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা একটি সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। এতে পত্রিকার নীতি স্পষ্ট পুনর্ব্যক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার নানা সংকট সম্পর্কেও ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন। পত্রিকার মান পড়ে যাওয়া সম্পর্কেও তাঁর মন্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, তিনি পূর্বপাকিস্তানের বাংলাসাহিত্যের সার্বিক প্রেক্ষাপটকে মনে রেখেই কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন। সাতচল্লিশের পরের পূর্ব বাংলার সাহিত্যসংস্কৃতি সাধনার নানা ব্যাপারেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। মুকৃতি সওগাত প্রভৃতির সম্পাদনা ও সমালোচনার কথা এখানে স্মরণযোগ্য। পূর্ববাংলার সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অধোগতি রোধ ও উন্নয়ন ঘটাবার লক্ষ্যে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়। পরিক্রমের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করার পরে বিষয় ও বস্তুতে কিঞ্চিৎ উন্নতি ঘটে ; সাহিত্যপত্রিকার আবহ তৈরী হয়। তিনি উল্লেখ করেন : "প্রথম থেকেই পরিক্রম কেন্দ্রীয় লেখক সংঘের আর্থিক বরাদ্দের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু নানা কারণে এই অর্থ পরিক্রমের হাতে নিয়মিত আসেনি, ফলে তার নিয়মিত প্রকাশও বারবার ব্যাহত হয়েছে...নতুন কার্যকরী সংসদ এবারে স্থির করেছেন বরাদ্দ অর্থের অনিয়মিত প্রাপ্তির ফলে পত্রিকার প্রকাশ যাতে পুনঃপুন ব্যাহত না হয় তার জন্য পত্রিকাটিকে যতদূর সম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার চেষ্টা করা হবে। এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পরিক্রমের চতুর্থ বর্ষ শুরু হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা পেলে পরিক্রম এখন থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবে (কিন্তু বলাবাহুল্য এরপর আরও অনিয়মিতই হয়ে ছিল)। পত্রিকার 'মান কি হওয়া উচিত' এ প্রশ্নের ব্যাখাদানকালে তিনি বলেন : "একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, পরিক্রম' কোন বিশেষ সাহিত্যিকগোষ্ঠীর পত্রিকা নয়। মত নির্বিশেষে পূর্ব পাকিস্তানের সকল লেখকেরই প্রকাশের মাধ্যম এই পত্রিকা। এতে তাই প্রবীণ ও তরুণ সকল লেখকের প্রকাশযোগ্য রচনাই স্থান পাবে। তাছাড়া পরিক্রমের মারফত যাতে সারা পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সাহিত্যসাধনার একটা পরিচয় পাওয়া যায়, সে চেষ্টা করা হবে। পূর্ব বাংলার সাহিত্যের সাম্প্রতিক মান অনুযায়ী পরিক্রমের মান যদি তাতে খানিকটা খাটো হয়ই তাতে বিব্রত বা নিরাশ হওয়া

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তিযুক্ত বলে সম্পাদকগণ মনে করেন না।'

পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন : 'আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের দেশের সাহিত্যকর্ম এবং সাম্প্রতিক চিন্তাধারার সঙ্গে পাঠকসাধারণের যোগাযোগ সাধন করা। এই উদ্দেশ্য সাধিত হলে আমাদের দায়িত্ব পালিত হয়েছে বলে মনে করবো।' একটি বিজ্ঞাপনের ভাষা থেকে বোঝা যায় পরিক্রম 'বুদ্ধিজীবীদের পত্রিকা' হতে চেয়েছিল, গণমানুষের নয়। বল হয় ' পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীদের নিকট আপনার পণ্যকে পরিচিতি করুন। বিজ্ঞাপনের জন্য' পরিক্রমকে লিখুন-ইত্যাদি।

পরিক্রম এ কবিতা লিখেছিলেন সৈয়দ আলী আহসান, শামসুর রাহমান, আবদুর রশীদ খান, আহসান হাবীব, সানাউল হক, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, জিয়া হায়দার, ফজল শাহাবুদ্দীন, আলাউদ্দীন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, হেমায়েত হোসেন, সেবাব্রত চৌধুরী, হাসান হাফিজুর রহমান, আবদুস সাত্তার, মাসুদ আহমেদ, হায়াৎ সাইফ, আবুদল হাই মাশরেকী, শাহজাহান হাফিজ, রাজিয়া খান, ইমরুল চৌধুরী, জিনাত আরা মালিক, মোহাম্মদ মামুন, তরিকুল আলম, আজীজুল হক, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, আতাউর রহমান, ইজাজ হোসেন, সিকান্দার আবু জাফর, লতিফা হিলালী, সৈয়দ আলী তকী, সৈয়দ আকরম হোসেন, জাহানারা আরজু, নঈমা বেগম, মযহারুল ইসলাম, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, নচিকেতা ভরদ্বাজ, আহমদ আবদুল গফুর আত্তার, জসীমউদ্দীন, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সৈয়দ আলী আশরাফ, কাশীনাথ রায়, বন্দে আলী মিয়া, আবুবকর সিদ্দিক, মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান, আবুল হাসান, মহাদেব সাহা, সুব্রত বড়ুয়া, রুবী চক্রবর্তী, ওমর আলী, নির্মলেন্দু গুণ, মাশুকুর রহমান চৌধুরী, শহীদ কাদরী, আহসান আহমদ আশক, হুমায়ুন আজাদ, হুমায়ুন কবির, আবদুল গনি হাজারী, মাহবুব সাদিক, কবিরুল ইসলাম, মুহম্মদ নূরুল হুদা, নীলুফার বানু, মনোমোহন বর্মণ, শাহজাদ ফিরদাউস, আবদুহ্ মাহমুদ, আখতার হুসেন, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, আবদুল কাদির, বর্ণালী চৌধুরী, অসীম সাহা, দাউদ হায়দার প্রমুখ।

পরিক্রমের গল্পকারগণ হলেন, শওকত ওসমান, আবুদল গাফফার চৌধুরী, হাসান আজিজুল হক, সৈয়দ শামসুল হক, শাহেদ আলী, আবদুশ শাকুর, সানাউল হক, আহমদ রফিক, নুরুল ইসলাম খান, মিরজা আ. মু. আবদুল হাই, জিয়া হায়দার, হেমায়েত হোসেন, আনিস চৌধুরী, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, নাজমুল আলম, শহীদ আখন্দ, নুরুল আলম, শামসুন্নাহার, মজবুলুল হোসেন মিজরাব, জাহানারা হাকিম, ফাতেমা চৌধুরী, রশীদ হায়দার, মীজানুর রহমান, আবু জাফর শামসুদ্দীন, জিনাত আরা মালিক, আবদুল মতীন, জাহানারা হাকিম, রেজাউর রহমান, মোজাম্মেল সিদ্দিক, দিলারা হাশেম, শফিকুর রহমান, মিজানুর রহমান শেলী, রাবেয়া খাতুন, মুহম্মদ সিরাজ, এ. এন. সফিউদ্দীন আহমদ, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, শওকত আলী, মাহবুব তালুকদার, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, কাজী খায়রুল বাশার, আনোয়ারা পাশা, হুমায়ুন কাদির, মাফরুহা চৌধুরী, সৈয়দ আকরম হোসেন, লায়লা সামাদ, নজরুল ইসলাম চৌধুরী, আফসারুন্নেসা, আহমেদ শামসুদ্দীন প্রমুখ।[১৫২]

পরিক্রমে কয়েকটি নাটক ও উপন্যাস লিখেছিলেন কিংবা অনুবাদ করেছিলেন প্রখ্যাত কথাশিল্পী ও নাট্যকারগণ। জঁ জিরাদুর নাটক 'হেকটর' শিরোনামে ধারাবাহিক অনূদিত হয় দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা থেকে। অনুবাদক কবীর চৌধুরী। আবু রুশদ্ প্রণীত উপন্যাস 'উদ্‌গম', দ্বিতীয় বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে। লর্ড ভানসেনির নাটক 'চোখ' অনুবাদ করেন কবীর চৌধুরী দ্বিতীয় বর্ষ নবম সংখ্যা থেকে। 'দি থিং' নাটকের অনুবাদ করেন বজলুল করিম, এর ভূমিকা লেখেন সাঈদ আহমদ। রশিদ হায়দার এর উপন্যাস 'আমি জুলেখা ও মা' ছাপা হয় তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে। শওকত ওসমানের নাটক 'দুই পথিক' তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ছাপা হয়। সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাস 'অচেনা' ছাপা হয় তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ-সপ্তম যুগ্ম সংখ্যায়। শম ও কেসীর নাটক 'ব্যাচেলর ফ্লাট' অনুবাদ করেন হারুন অর রশীদ। ছাপা হয় উপর্যুক্ত সংখ্যায়। রাজিয়া খানের উপন্যাস 'চিত্রকাব্য' প্রকাশিত হয় তৃতীয় বর্ষ একাদশ সংখ্যা থেকে। দীর্ঘদিন ধরে ছাপা হয়। ওবায়েদ উল হকের নাটক 'ঘরোয়া' ছাপা হয় চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে। আশকার ইবনে শাইখের নাটক 'প্রচ্ছদ পট' চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে ছাপা হয়। জ্যাঁ কক্‌তার নাটক অর্ফিয়ুস অনুবাদ করেন আমীর আলী (৪/৯-১২)। আহমদ আবু তাহেরের একাঙ্কিকা 'কাকতাড়ুয়া' রচিত হয় 'একটি মার্কিন একাঙ্কিকার অনুসরণে' (পূর্বোক্ত)। আশকার ইবনে শাইখের নাটক 'কর্ডোভার আগে' ধারাবাহিক ছাপা হয় উপর্যুক্ত সংখ্যা থেকে। মুনীর চৌধুরীর প্রখ্যাত অনুবাদ 'মুখরা রমনী বশীকরণ' (শেকস্‌পীয়র থেকে) পঞ্চম বর্ষ ষষ্ঠ-সপ্তম যগ্ম সংখ্যা থেকে ক্রমশঃ ছাপা হয়। হাফেজুল খায়েরীর নাটক 'লোকটি' অনুবাদ করেন কাজী মাসুম (৬/৫-৭) প্রমুখ। উপর্যুক্ত নাটকের বেশীরভাগই অনুবাদ। প্রবন্ধ-উপন্যাস-কবিতা-গল্পও অনেক অনূদিত হয়েছে-- যেসকল বিদেশীবিভাষী সাহিত্যিকদার্শনিকের রচনা অনূদিত হয়েছে তাঁরা হলেন : ভার্জিনিয়া উলফ (মথটির মৃত্যু, গল্প, অনুবাদ : আহসানুল হক, ২/১) ; ই. ই. কামিংস (কবিতা, অনুবাদ, শামসুর রাহমান, ২/২) ; এ্যান্টনী হার্টলে (প্রবন্ধ, ইংলেণ্ডের বুদ্ধিজীবী, অনুবাদক : নূরুল ইসলাম, ২/৩) ; ওমর আবি রাবিয়াহ (কবিতা, অনু: আবদুস সাত্তার, ২/৩) ; জন স্টেইন বেক (গল্প, অনু: রেজাউর রহমান, ২/৪) ; জ্বাবরা জ্বাবরা (গল্প, অনুবাদ আহমদ মনজুর, ২/৫) ; রবার্ট ফ্রস্ট (কবিতা, অনুবাদ ঃ শামসুর রাহমান, ২/৬) ; উইলিয়াম আর্নেষ্ট হেনেলি (কবিতা, অনুবাদ : মনোমোহন বর্মণ, ২/৬) ; বরিস পাস্তারনাক (কবিতা, অনুবাদ : সানাউল হক, ২/৭) ; কার্ল ম্যান হাইম (প্রবন্ধ, অনুবাদ ঃ বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, ২(৯) ; এ্যান্টনী থোয়েট (কবিতা, অনু ঃ সন্তোষগুপ্ত, ২/১০) ; রুমি (কবিতা, হেমায়েত হোসেন, ২/১০) ; আন্দ্রে মোরায়া (প্রবন্ধ : অনু: আবু জাফর শামসুদ্দীন, ২/১০) ; উইলিয়াম ম্যানসম (গল্প, অনুবাদ : আবদার রশীদ, ৩/২) ; ফয়েজ আহমদ ফয়েজ (বক্তৃতা, অনুবাদ, কাজী মাসুম, ৩/৩) ; রাজন্দ্রে সিং বেদী (গল্প, অনুবাদ, কাজী মাসুম, ৩/৯) ; মার্জরী রলিংস (গল্প, নীলিমা ইব্রাহীম, ৩/১০) ; মাইনার মারিয়া রিলকে (কবিতা, জহুরুল হক, ৩/১১) ; ফখরুজ্জামান চৌধুরী, ৪/৮) ; ডন মোরেস (কবিতা, আবু আহমদ আবদুল্লাহ, ৩/১১) ; রাজারাও (গল্প, অনুবাদ, মোহাম্মদ আজিজুল হক, ৪/৯-১২) ; আন্তন চেকভ (গল্প, অনুবাদ আবুল হাসানাত, ৪/৮) ; এইচ. জি. ওয়েলস (গল্প, অনুবাদ কাজী রফিকুল হক, ৪/১২) ; মুকতার লুবিস (গল্প, অনুবাদ আলামগীর রহমান, ৫/৬-৭) ; প্লেটো (রিপাবলিক, অনুবাদ : সরদার ফজলুল করিম ধারাবাহিক অনেক সংখ্যায়)) ; বর্ট্রাণ্ড

Dhaka University Institutional Repository

রাসেল (আত্মজীবনী, অনুবাদ : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ৫/১০-১২) ;

'পরিক্রম' যখন হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, তখন নভেম্বর ১৯৬৮ তে, (ছয় দফা আন্দোলন, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে পাকিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদির পরে, সমাজের গতি যখন গণমুখী ভাবধারায় প্রবাহিত ; তখন) লেখক সংঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত 'আফ্রো এশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি উৎসব' উপলক্ষে প্রকাশিত (উৎসব সংখ্যা) সংকলনের সাহিত্য ও সংস্কৃতিক গুরুত্ব অপরিসীম বিবেচিত হবে কারণ বিশ্বসাহিত্যের চর্চার বিকাশে এটা সদর্থক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। এই সংখ্যায় (৫/৫) হাসান আজিজুল হক প্রণীত 'আফ্রো এশিয়ার গণমুখী সাহিত্যের ভূমিকা' আহমেদ হুমায়ুন রচিত 'আফ্রো এশীয় সাহিত্য আন্দোলন : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা' ; মোহাম্মদ সফদার মীর রচিত ও কাজী মোহাম্মদ নুরুজ্জামান অনূদিত 'আফ্রো এশীয় সাহিত্য আন্দোলন' শীর্ষক তিনটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। 'আফ্রো-এশীয় কবিতাগুচ্ছ' তে স্থান পায় ইয়েভগেনী ইয়েভতুশেঙ্কো (রাশিয়া, হত্যার আজাদী, অনুবাদ : সিকান্দার আবু জাফর) ; জর্জ আউলোর উইলিয়ামস (ঘানা, বিস্মৃত কমরেডদের কোরাস, অনুবাদ : আবদুল গনি হাজারী); জোসেফ-ই কারিউকি (কেনিয়া, নবজীবন অনুঃ ঐ); আঁতয় বোজার বোলাম্বা (কংগো-লিওপোওভিল, একমুঠো সংবাদ, ঐ.) ; জে ক্র্যাভি রিস্হ (মোজাম্বিক, অজ্ঞাত নাগরিকের কবিতা, ঐ) ; কালুঙ্গানো (মোজাম্বিক, কালো মায়ের স্বপ্ন, অনুবাদ ; শামসুর রাহমান) ; সিমহান (কোরিয়া, যখন আসবে সেদিন, ঐ) ; ই-সাঙ-হোয়া (ঐ, বসন্ত কি আসে অপহৃত মাঠে, ঐ) ; মুস্তফা মাহমুদ (লেবানন, সাদা রুমাল, অনুবাদ : আবদুস সাত্তার) ; আলফায়তুরী (মিশর, বৃষ্টির নীচে, ঐ) ; ইব্রাহীম তাউশন (ফেলিস্তিন, পারাবাত, ঐ) ; শাওকী বাগদাদী (সিরিয়া, আমাদের স্বপ্ন, ঐ) বুলান্দ আল হায়দারী (ইরাক, ধ্যানের নায়ক, ঐ) ; আবুল কাসেম শাবী (তিউনিস, বাঁচার মুহূর্তে, ঐ) ; মাওসেতুঙ (চীন, বন্ধুর জবাবে ; সংগ্রামী মহিলারা ; বসন্তে গাথা ; রূপকথার গুহা ; শাওশানে ফিরে এসে ; অনুবাদক : ফজল শাহাবুদ্দীন) ; ইশিকাওয়া তাকুবোকু (জাপান, যৌবনের গাথা, অনুবাদ : শহীদ কাদরী) ; ইয়োসানো আকীকু (ঐ, আমার গানেরা, ঐ) ; নিকানো শিগে হারু, ঐ) ; নাকা হারা চুইয়া (ঐ, মৃত্যুর মুহূর্তে, ঐ) ; টাকামুরা কোতারো (ঐ, শীত এলো, ঐ) ; নাজিম হিকমত (তুরস্ক, প্রমিথিউসের ডাক ; জেলখানার চিঠি ; এখন প্রশ্ন ; অনুবাদক : সুভাষ মুখোপাধ্যায়) ; হোচিমিন (ভিয়েতনাম, একটি অভিযান, আমার কণ্ঠে যে গান, শ্বেত কবরী, কোন এক সুন্দর সকালে, ভিয়েত নামের মানুষ জাগছে, অনুবাদক : কমলেশ সেন) ; এবং হো চিংচী তিও-ইর নাটক 'শ্বেতকুন্তলা' নামে অনুবাদ করেন আ.ন.ম. গোলাম মোস্তফা।

১৯৬৮ সনে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদকত্বে 'পরিক্রম' প্রকাশকালে পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল, সেটি হচ্ছে 'মহাকবি স্মরণোৎসব'। এই সেমিনারে (বা উৎসবে) উপমহাদেশের উর্দু ও বাংলা সাহিত্যের পাঁচজন খ্যাতনামা কবির স্মরণে (১৯৬৮ সনের জুলাই মাসে) পাঁচদিনব্যাপী আলোচনা সমালোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে পঠিত প্রবন্ধ ও সভাপতির ভাষণগুলোর সমন্বয়ে প্রকাশিত হয়েছিল পরিক্রমের মহাকবি স্মরণোৎসব সংখ্যা (৫/১-২); এতে আনিসুজ্জামান (রবীন্দ্রনাথ) ; মনির উদ্দীন ইউসুফ (ইকবাল); শওকত ওসমান (মধুসূদন দত্ত) ; মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (মধুসূদনের আধুনিকতা ও সমকাল); বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (নজরুল ইসলাম); রফিকুল ইসলাম (নজরুল ইসলাম ও আমরা); আবদুল ওয়াহাব (গালিব) ; আহসান আহমদ আশক (গালিব); প্রমুখের প্রবন্ধাবলী ও অনুষ্ঠানের সভাপতিগণ যথা আবুল হাশিম (রবীন্দ্র দিবস); ড ঃ মুহম্মদ এনামুল হক (ইকবাল দিবস); বিচারপতি এস. এম. মুর্শেদ (গালিবদিবস) ; মুনীর চৌধুরী (মাইকেল মধুসুদন দিবস); এবং আবদুল কাদির (নজরুল দিবস) এর বক্তৃতার সার-সংকলন করা হয়। এই সমস্ত রচনায় কবিদের চিন্তাধারার সঙ্গে বর্তমান কালের সম্পৃক্ততা এবং সমাজের কল্যাণে তা চর্চার আবশ্যকতা পরিস্ফুট হয়েছিল। পরিশিষ্টে ছাপা হয়েছিল সামাজিকভাবে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার পরে লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ। যেমন : আবুল হাশিম—বাংলা সাহিত্য (পুনর্মুদ্রণ) ; ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন—বাংলা ভাষা সমস্যা (পুনর্মুদ্রণ) ; ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক— বাংলা ভাষার সংস্কার (পুনর্মুদ্রণ) ; মুনীর চৌধুরী— বানান সংস্কার (পুনর্মুদ্রণ) ইত্যাদি।

পরিক্রমের অপরাপর প্রবন্ধগুলোও অপরিসীম গুরুত্বের। এই প্রবন্ধগুলো বাঙালীর মননসাধনার ইতিহাসে স্মরণীয়। লেখকগণের মধ্যে রয়েছেন বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রাবন্ধিকবৃন্দ। লেখকদের নামের সাথে রচনার শিরোনাম উল্লেখ করা হলো বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা গ্রহণের জন্যে। [১৫৩]

কবীর চৌধুরী-উইলিয়াম ফকনার (২/১) ; সিনক্লেয়ার লিউইস (২/৮) ; সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী—পনের বছরের সাহিত্য (২/১) ; হাউসম্যানের সাহিত্যসমালোচনা (৩/১০) ; কাজী আবদুল ওদুদ (৭/১-৬) ; হাসান হাফিজুর রহমান—নজরুল মানসের একদিক ; একটি প্রশ্ন (২/১) ; মোহাম্মদ সিদ্দিক খান—গ্রন্থ, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থবিক্রেতা (২/২) ; কক্সবাজারের প্রতিষ্ঠাতা হিরাম বক্স (২/১১-১২) ; ক্যানিহিল (৩/৪-৭) ; ফাওয়াবাতার দুটি উপন্যাস (৬/৮-১১) ; আলাউদ্দীন আল-আজাদ—সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পকলা (২/২) ; আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ - কাজী দৌলত (২/২) ; এ্যান্টনী হার্টলে— ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবী (অনুবাদ : নুরুল ইসলাম (২/৩) ; মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ—বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন (২/৩) ; নজরুলকাব্যের শিল্পরূপ : চিত্রকল্পের ব্যবহার (৫/৩-৪) ; আবু হেনা মোস্তফা কামাল—গীতিকার, তাঁর সমস্যা (২/৩) ; হুসনে আরা হক—জন স্টেইনবেক (২/৪) ; হারুনউর রশীদ—ফ্রস্টকাব্যের কয়েকটি দিক (২/৪) ; তিনটি কবিতা প্রসঙ্গে (২/৭) ; আলী আনোয়ার — বৃটেনের বুদ্ধিজীবী (২/৪) ; মোহাম্মদ আজরফ — সাংস্কৃতিকসম্পদের উত্তরাধিকার (২/৪) ; ধর্মের সংকট (৩/৮) ; মেহরাব আলী—উইলিয়াম কেরী ও দিনাজপুর (২/৪) ; আহসানুল হক- চসার ও আধুনিকতা (২/৬) ; আবুল ফজল- উপন্যাসে একটি নতুন উপলব্ধি (২/৬) ; মানবতার সৈনিক (৫/৮-৯) ; সৈয়দ মুজতবা আলী— সিলেটী (২/৬) ; বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর—আলবেয়ার কামু ও অস্তিত্ববাদ (২/৭) ; আধুনিক কবিতার জীবনদর্শন (৪/৫) ; নিঃসঙ্গ যাত্রা (৪/৮) ; একজন সংব্যক্তির হৃদয় (কাজী আবদুল ওদুদ প্রসঙ্গে (৭/১-৬) ; আবদুস সাত্তার— আধুনিক আরবী সাহিত্য (২/৭) ; আবুহেনা— অ্যারিস্টোফেনিসের কমেডি (২/৮) ; সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন- রবার্ট ফ্রস্ট, (অনুবাদ : রেজাউর রহমান (২/৯) ; কার্ল ম্যানহাইম— সংস্কৃতির গণতন্ত্রীকরণ, অনুবাদ : বো.উ.খা.জা, (২/৯) ; আমীর আলী- ইকবাল, শিকওয়া ও তার বাংলা অনুবাদ

Dhaka University Institutional Repository

(২/১০) ; এস. এন. কিউ. জুলফিকার আলী— মাতৃভাষার ব্যবহার (২/১০) ; মনে পড়ে (৩/৯) ; কাজী আবদুল ওদুদ (৭/১-৬) ; পূর্ণেন্দু দস্তিদার — চট্টগ্রামের প্রাচীন সাহিত্যসম্পদ (২/১০) ; আঁদ্রে মোরায়া— প্রস্ত এবং তাঁর শিল্পবোধ অনুবাদ : আ. জা. শামসুদ্দীন (২/১০) ; সাজ্জাদ ইউসুফ— অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ (২/১১—১২) ; আবদুল মান্নান—আজকের রাগ-সঙ্গীত (২/১২) ; রফিকুল ইসলাম-বাংলা বানান বনাম বাঙলা একাডেমী (৩/১) ; শাহাবুদ্দীন আহমদ—আমীর হোসেন চৌধুরী (৩/২) ; আবদুল হাফিজ—কবিতা, ধর্ম ও সমাজ (৩/৩) ; হাসান আজিজুল হক—পূর্ব পাকিস্তানের কথাসাহিত্যে চিন্তার সংকট (৩/৯) ; হায়াৎ মামুদ—মৃত্যুচিন্তা : তিনজন অসবর্ণ কবি (৩/৯) ; সারওয়ার মুর্শিদ—তুলনামূলক সাহিত্যপ্রসঙ্গ (৩/১১) ; রাজেন্দ্রনাথ দাশ-শেক্সপীয়ার ও বাংলা নাটক (৩/১২) ; মাহফুজুল হক— বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা (৪/১) ; মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী—মধুসুদনের কবিমানস (৪/১) ; মুহম্মদ আবু তালিব—লালনশাহ্ ও লালনগীতির পুনর্বিচার (৪/১) ; লালনচরিতমানস ও শেষ জীবন (৪/৯-১২) ; খোদেজা খাতুন — পূর্ব পাকিস্তানের বিয়ের গান (৪/৮) ; আতোয়ার রহমান — পরিভাষা-সমস্যা (৪/৮) ; দিগদর্শন (৪/৯-১২) ; আবদুল মান্নান সৈয়দ—উত্তর বৈরিক ক্যারাভান (৪/৯-১২) ; ওবায়েদ উল হক—নাটক প্রসঙ্গে দু'চার কথা (৪/৯-১২) ; গোলাম সামদানী কোরায়সী— তৎসমপ্রীতির দৌরাত্ম (৪/৯-১২) ; বদিউজ্জামান — লোকসাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞান (৪/৯-১১) ; শামসুল হক—হাবীবুল্লাহ বাহার ও বুলবুল পত্রিকা (৪/৯-১১) সৈয়দ মুর্তাজা আলী— (স্মৃতি) আমাদের কালের কথা (৪/১ ও অন্যান্য) ; কলকাতায় ছাত্রজীবন (৪/৯-১১) ; সুবোধ দাশগুপ্ত— খাদ্যপরিস্থিতি ও জমি-পরিকল্পনা (৪/৯-১১) ; আহমদ শরীফ— অন্ন ও আনন্দ (৪/১২) ; ইতিহাস পাঠকের দু'একটি জিজ্ঞাসা (৫/৩-৪) ; একটি প্রত্যয়ের পুনর্বিবেচনা (৫/৬-৭) ; জীবন সমাজ ও সাহিত্য (৬/১-২) ; খাদ্যসংকট ও বিশ্বসমস্যা (৭/১-৬) ; শওকত ওসমান— সংস্কৃতির অন্বেষা (৪/১২) ; আহমদ হুমায়ুন— আলোকিত বৃত্তে আত্মজিজ্ঞাসা (৪/১২) ; সানাউল হক— পাহাড় (৪/১২) ; মুনীর চৌধুরী — বাংলা বানান ও বর্ণমালা সংস্কার সমস্যা (৫/৩-৪) ; ওয়াকিল আহমদ—বাংলা ভাষা সংস্কার প্রসঙ্গ (৫/৩-৪) ; মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন— দৌলতকাজীর সতীময়না ও লোর চন্দ্রানী (৫/৮-৯) ; আবদুল হক— প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঃ সামাজিক প্রশ্ন (৫/১০-১২) ; সাহিত্য ও সরকার (৬/৩-৪) ; আবুল কাসেম ফজলুল হক—জ্ঞানতাপস মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (৬/১-২) ; আহসানুল হক—উইক্লিফ ও বাইবেল অনুবাদ (৬/৫-৭) ; আবুল কালাম—একটি বিষবস্তুর সমর্থনে (৬/৫-৭) ; অজয় রায়— সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আমাদের ভাষা (৬/৮-১১) ; আবু জাফর— সুকান্তের কাব্যপরিচয় (৬/৮-১১) ; আনিসুজ্জামান— কাজী আবদুল ওদুদ (৭/১-৬) ; আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ— কাজী আবদুল ওদুদ (৭/১-৬) গোলাম মুরশীদ— বাংলা সন ও পহেলা বৈশাখ (৭/১-৬) ;

পরিক্রমের প্রবন্ধ সমূহ পূর্ব বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যপরিস্থিতির আন্তরিক সমালোচক, দিক্‌দর্শক ও উন্নতিঅগ্রগতির সহায়ক হতে পেরেছিল। বাংলাভাষার ওপর ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ-প্রতিরোধে মুনীর চৌধুরীর ভূমিকা স্মরণীয়। বাংলা একাডেমীর প্রস্তাবের বিপক্ষে মুনীর চৌধুরী দৈনিক 'পাকিস্তান' পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তা পরিক্রম পুনর্মুদ্রণ করে। রফিকুল ইসলামও লিখেছিলেন এ বিষয়ে। একুশে ফেব্রুয়ারীর চেতনার যাঁরা ধারক-বাহক তাঁদের অধিকাংশই পরিক্রমে লিখেছেন। মুক্তবুদ্ধির সাধক ও প্রচারক কাজী আবদুল ওদুদের মৃত্যুতে পরিক্রম বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে একটি সংখ্যা প্রকাশ করেছিল (৭/১-৬)। প্রকৃতপক্ষে পরিক্রমের পরিচালক ও লেখকমণ্ডলীর সদস্যরাই ঐকালের প্রগতিশীল বলে আত্মপরিচয়দানকারী লেখক। অতএব তাঁদের রচনায় গোঁড়ামী কুসংস্কার এবং অন্ধ প্রতিক্রিয়াশীলতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রশ্রয় পায়নি; বরং বাঙালীর স্বার্থসচেতনতার পরিচয় পাওয়া যাবে। এদিক থেকে পরিক্রমের পেছনে অর্থব্যয় সরকারের ক্ষতিরই কারণ হয়েছে। কিন্তু রচনার আদর্শ ও লেখকদের যাপিতজীবনের লক্ষ্য ও সামাজি-রাজনৈতিক ভূমিকায় অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যাবে। এবং এঁদের উদ্দেশ্য করেই পাকিস্তান সরকারের তথ্য সচিব ও লেখক সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারী জেনারেল, বিশিষ্ট লেখক, উর্দুভাষী কুদরতুল্লাহ শাহাব মন্তব্য করেছিলেন এই বলে যে, লেখকেরা একমত প্রচার করবেন অথচ অন্য মতবাদানুযায়ী জীবন যাপনের কবি সুলভ স্বাধীনতা নেবেন — এ চলতে পারে না। শুধু শাহাব আর আইউব খান নন, সেকালে বাঙ্গালী সমালোচকদের দৃষ্টির ও এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। আর এই বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধও পরিক্রমেই ছাপা হয়েছে। অবশ্য তখন সম্পাদক ছিলেন আবদুল গনি হাজারী। সমাজের অবক্ষয় দেখে তিনি কবিতা ও নানা গদ্য-আলোচনায় এ বিষয়ে লিখেছিলেন। তাঁর হাতদিয়ে বুদ্ধিজীবীদের এই সমালোচনাও যে প্রকাশিত হবে—তাতে তাই বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু এখানে বলে রাখা ভালো যে ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনার দ্বারা পরোক্ষভাবে সমাজ গঠনে বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি সজাগ করা হয়েছিল। মাহফুজুল হক 'বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন ঃ

"আমাদের রাজনৈতিক জীবনের নীতিহীনতা ও লক্ষ্যহীনতা এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সোজা পথ হিসেবে আমরা রাজনীতিবিদদের উপর সকল দোষ চাপিয়ে পরিত্রাণ পেতে চাই। একথা অনস্বীকার্য যে, দেশের অনগ্রসরতা বা বিশৃঙ্খলার প্রধান দায়িত্ব নেতৃবৃন্দের। দেশকে গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞায় যাঁরা জনগণের ভোটে ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন তাঁদের দায়িত্ব সব চেয়ে বেশী এবং যাঁদের নীতিহীনতা ও স্বার্থবাদিতার জন্য দেশে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে দেশ তাঁদের কোনদিনই ক্ষমা করতে পারেনা। তাই দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব রাজনীতিবিদদেরই কাঁধে ; কিন্তু একথা আমরা যেন ভুলে না যাই যে, কোন একটি শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতাই দেশের সমূহ ক্ষতি সাধন করতে পারেনা যদিনা তাদের দুস্কৃতির পেছনে সমর্থন ও সাহায্য আসে অন্য শ্রেণী থেকে। রাজনীতিবিদেরা নিজেদের দোষ স্খালন করতে গিয়ে অন্য আর এক শ্রেণীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন সরকারী কর্মচারী। পাকিস্তানের স্থিতিহীন রাজনৈতিক জীবনের সুযোগ গ্রহণ করে তাঁরাও এদেশের অশেষ ক্ষতি সাধন করেছেন। নিজেদের ব্যক্তিগত সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে ও শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখতে গিয়ে তাঁরাও রাজনীতিবিদদের মত সময় সময় দলীয় কোন্দলে অংশ নিয়েছেন এবং দুর্নীতিতে রাজনীতি বিদদের সাহায্য করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, আমাদের বর্তমান দুরবস্থার জন্য শুধু কি এ দু'শ্রেণীই একমাত্র দায়ী?

যে শ্রেণী নির্বিকারভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে বা যারা এখনও জনসমক্ষে নিজেদের কৈফিয়ৎ দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি সে শ্রেণী হল তথাকথিত বুদ্ধিজীবীশ্রেণী। রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যর্থতার চেয়েও যে ব্যর্থতা জাতি হিসেবে আমাদের প্রাণহীন ও মেরুদণ্ডবিহীন করে তোলার জন্য দায়ী তা হচ্ছে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের ব্যর্থতা, আমাদের সংস্কৃতিসেবীদের স্বচ্ছ মত ও পথের অভাব। অথচ অন্যের দোষ সম্পর্কে তাঁরাই সবচেয়ে বেশী উচ্চকণ্ঠ।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব কিছু নয় যদি সে জাতির প্রাণরস শুকিয়ে না যায়। জাতীয় জীবনের ফল্গু ধারা যেখানে নীতিহীন পথে দিশেহারা না হয়ে নির্দিষ্ট বাঁকে প্রবাহিত হয়, সেজাতি সাময়িক পরাজয় ও ব্যর্থতাকে জয় করে আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।' লেখক ফরাসী ও জার্মানীর উদাহরণ টেনে বলেন : 'অতীতের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব সত্ত্বেও আজকের ফরাসী দেশ অগ্রগতির পথে চলেছে, পুর্ণোদ্যমে, দু'দুটি মহাসমরে বিধ্বস্ত জার্মানী আজ সকলের ঈর্ষার বস্তু। কিন্তু আমাদের রোগমুক্তির যেন কোন আশাই নেই। তার কারণ কি? আমাদের শিরদাঁড়া কোথায় যেন বেঁকে বসেছে, আমাদের মত ও পথের কোন স্পষ্ট নিশানা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। চিন্তার ক্ষেত্রে এ অরাজকতা এ অস্পষ্টতা ও দিকহীনতার জন্য দায়ী কে? এ ব্যাপারে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা কি তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন? ... সামান্য লাভের জন্য বুদ্ধিজীবীশ্রেণীও দলীয়কোন্দলের সুযোগ গ্রহণ করেছে পুরোপুরী।... আজকের দিনে তাই আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন সবচাইতে বেশী ; কর্তব্যের পথে জাতিকে সজাগ করার যে দায়িত্ব বুদ্ধিজীবীদের উপর ন্যস্ত সে দায়িত্ব সৎভাবে পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে আমরা পালন করেছি কি?"[১৫৪]

আহমদ শরীফ, আবদুল হক, শওকত ওসমান প্রমুখ দেশের সাংস্কৃতিক সংকটকালে বিবেকের দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলেন। তখন তাঁরা লিখেছিলেন মুক্তবুদ্ধির তাড়ণায় যেসমস্ত রচনা তার অনেকাংশ পরিক্রমেও বিধৃত। আহমদ শরীফের গুরুত্বপূর্ণ ৫/৬ টি প্রবন্ধ এতে প্রকাশ পায়। যেমন ঃ অন্ন ও আনন্দ, ইতিহাসপাঠকের দুএকটি জিজ্ঞাসা, একটি প্রত্যয়ের পুনর্বিবেচনা, জীবন সমাজ ও সাহিত্য এবং খাদ্যসংকট ও বিশ্বসমস্যা ইত্যাদি। এগুলোর মর্ম ও দর্শন প্রগতিশীলতার পথে পাঠকশ্রেণীকে উদ্বুদ্ধ করে। 'অন্ন ও আনন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেন : "জীবনে সমাজে রাষ্ট্রে যখনই গ্লানি ও বিপর্যয় আসে, তখনই সাধারণ নায়কেরা মানুষকে স্বধর্মে তথা পিতৃপুরুষের ধর্মে নিষ্ঠ হতে উপদেশ দেন, তাঁদের মতে একমাত্র এ পথেই বিপদমুক্তি সম্ভব। সবদেশে সবযুগেই সাধারণ মানুষের ধারণায় সংকট উদ্ধারের এ-ই একমাত্র উপায়। তাঁরা যদি নতুন ধর্মের প্রবর্তন চাইতেন, অন্তত গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করতেন, তাহলেই সুবুদ্ধির পরিচয় দিতেন। মোহগ্রস্তচিত্তে পুরনোই শ্রদ্ধেয় ; নতুন মাত্রেই অবজ্ঞেয় ও অনভিপ্রেত।"[১৫৫]

'জীবন সমাজ ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে সাহিত্যাদর্শ বিশ্লেষণ করে আহমদ শরীফ বলেন : "সাহিত্যে সমাজচিত্র দেয়া মানে যা আছে, কেবল তাই চিত্রিত করা নয়—যা হওয়া উচিত তারই সংকেত দেয়া—প্রেরণা দেয়া, নইলে রচনা নকশাই থেকে যায়। তেমনি ভাষা ও বাক-ভঙ্গি যেমনটি আছে তেমনটিই রক্ষার প্রয়াসেই লেখকের কর্তব্য সীমিত রাখলে চলেনা, তার উন্নয়ন ও বিকাশের চেষ্টাও করতে হয়। সংস্কৃতিও যা আছে তা নয়, যা কাম্য তারই দিশা দান সাহিত্যিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। অতএব, দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচর্যা ও দেশের মানুষের জীবনের সঙ্গে শিল্পীসাহিতিকের জীবনের যোগাসাধন মানে দেশের সমাজ-সংস্কৃতির বর্তমান স্বরূপ তুলে ধরা নয়, বাঞ্ছিত সমাজ সংস্কৃতির রূপ এঁকে দেয়া। এজন্য বাকজাল বিস্তার কিংবা কাল্পনিক অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টির ও চরিত্রাঙ্কনের প্রয়োজন নেই। বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতির অসঙ্গত, অসুন্দর ও অকল্যানপ্রসূ দিক উদঘাটিত হলেই এ উদ্দেশ্য সহজেই সিদ্ধ হয়। প্রীতি ও প্রত্যয়ই এ কর্মে সাফল্যের সম্বল। কেননা প্রীতিহীন হৃদয় ও প্রত্যয়হীন কর্ম দু-ই অসার্থক। যাঁরা দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির অতীতরূপের ধ্যানে আসক্ত, কিংবা বর্তমান রূপের অনুরাগী ও অনুগত ; তাঁরা জীবনবিমুখ, প্রগতি-ভীরু। তাঁদের বুদ্ধিস্বল্প, দৃষ্টি ক্ষীণ ও বোধ অগভীর। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমন লোকের সংখ্যা যত কম হয়, ততই মঙ্গল।"[১৫৬]

পরিক্রমের পুস্তক সমালোচনাগুলো কম প্রবন্ধের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এর প্রতিটি পুস্তক-আলোচনাই ছোটখাটো প্রবন্ধের মতো। এস. এন. কিউ জুলফিকার আলী লিওনেল অলরয় প্রণীত Sout of the sun ভোরের পাখীর কাকলীর উপর লিখেছিলেন। জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা আলেচনা করেন 'অনুন্নত দেশে বুদ্ধিজীবী' শিরোনামে The intelectual between tradition and modernity : The Indian situation by Edward shils. Mouton & Co. The Hunge 1961 অবলম্বনে। আমীর আলী লরেন্স ডারেল (Justice : Farst part of Alexandira Quartirs by lawrance Durrell) অবলম্বনে লেখেন 'চতুর্মাত্রিক বিচার'। গোলাম সাকলায়েন ডঃ অজিত কুমার ঘোষ প্রণীত 'বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা' শীর্ষক গ্রন্থের আলোচনা লেখেন 'বাংলায় হাস্যরসের সাহিত্য' শিরোনামে। শাহাবুদ্দীন আহমদ লেখেন আহসান হাবীবের 'ছায়া হরিণ' সম্পর্কে। লতিফা হিলালীর 'এক আকাশ অনেক তারা'র আলোচনা করেন মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ। আবদুল আহাদ প্রণীত 'নবদিগন্তের গান'-এর উপর লেখেন রফিকুল ইসলাম।' সঙ্গীত ও সঙ্গীত সমালোচনা' করেন ওয়াহিদুল হক। বিভাগীয় আলোচনায় বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর চিত্রপ্রদর্শণীর সমালোচনা লেখেন। 'দুরূহ নাটকের মঞ্চ সাফল্য' শিরোনামে নাট্যসমালোচনা করেন আতাউস সামাদ (২/১) ; C.P. Snow র The Affair এর ওপর লেখেন এস. এন. কিউ. জুলফিকার আলী। Erich Maria Remarque প্রণীত The Black obelisk এর আলোচনা করেন ফখরুজ্জামান চৌধুরী। আহসান হাবীবের 'আরন্য নীলিমা'র ওপর লেখেন আনিসুজ্জামান। সৈয়দ শামসুল হকের বই 'একদা এক রাজ্যে'র আলোচনা লেখেন শাহাবুদ্দীন আহমদ। সানাউল হক প্রণীত 'পুতুল সৈনিক' এর আলোচনা করেন মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ। বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, হাসান হাফিজুর রহমান, রফিকুল ইসলাম ও সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী 'সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব' বিষয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধের ওপর তর্ক-বিতর্ক করেন (২/২)। (পেঙ্গুইন প্রকাশিত ফ.ঘ. যওডএওতসএ প্রণীত performing Flea র উপর লেখেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (মুখ ও মুখশ্রী, ২/৩)। পেঙ্গুইনের বই- Welliam Golding প্রণীত Lord of the flies এর ওপর লেখেন আবু হেনা (পতনের ইতিহাস, ২/৩)। শওকত ওসমান প্রণীত ক্রীতদাসের হাসির ওপর আলোকপাত করেন রফিকুল ইসলাম (২/৩)। বি.ডি. হাবীবুল্লাহ প্রণীত শেরে বাংলার জীবনীর সমালোচনা করেন নীলিমা ইব্রাহীম। রাজিয়া মাহবুব-এর 'স্বনির্বাচিত গল্প' সম্বন্ধে লেখেন আবু হেনা (ভাবালুতাহীন মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ২/৩)। শংকর এর চৌরঙ্গীর আলোচনা করেন ফখরুজ্জামান চৌধুরী। আবদুল হকের 'ক্রান্তিকাল' লুতফুল হায়দার চৌধুরী আর মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' শীর্ষক প্রবন্ধের ওপর তর্ক-বিতর্ক করেন আনিসুজ্জামান ও মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ (২/৩)।

এমনিভাবে প্রত্যেক সংখ্যায় চার-পাঁচ কিংবা ছয়-সাতটি গ্রন্থের ওপর আলোচনা-সমালোচনায় পরিক্রমও হয়ে উঠেছে পূর্ব বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যসংস্কৃতির ইতিহাসের একটি দলিল। এই পত্রিকার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় গ্রহণ বিস্তৃত পরিসরের দাবি করে।[১৫৭]

১১. সংলাপ (১৯৬১--১৯৭০)

পাকিস্তান সরকারের আমলা ও কবি,এবং খাঁটিপাকিস্তানবাদী প্রখ্যাত পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবী আবুল হোসেন (১৯২২) ও সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের (১৯২১) যুগ্ম সম্পাদনায় ত্রৈমাসিক সংলাপ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬১ সনের আগষ্ট ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে। সংলাপ প্রথম পর্যায়ে বছর দুই নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল, তাতেই এ-পত্রিকা পূর্ববাংলার সাময়িকপত্রের ইতিহাসে স্থায়ী আসন করে নিতে পেরেছিল। কারণ 'সাহিত্যে বিদ্যা-বৈদগ্ধের বুনিয়াদ সুদৃঢ় করার কাজে সংলাপ মনোযোগ দিয়েছিলেন। সস্তাজনপ্রিয় রচনা তার লক্ষ্য নয়।' আর সস্তা, নগ্ন পাকিস্তানী ভাব বা জাতীয়তাবাদী চিন্তা হতে প্রচার করা হয়নি বলে লেখক সংঘ পত্রিকার প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (ভাদ্র ১৩৬৮) 'কষ্ঠি পাথর' ছদ্মনামে কোনো খাস-পাকিস্তানবাদীসমালোচক সংলাপের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন : 'সংলাপের একটি বৈশিষ্ট্য আমাদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে',—সেটি হচ্ছে তার সমাজ-বিকেন্দ্রিক মনোভাব। সবাই জানেন, পাকিস্তান একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র।.... সে আদর্শ-রাষ্ট্র ও আদর্শসংস্কৃতি গড়ে (তুলবার)... কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্যে (সরকার) Bureu of National Reconstraction (BNR) স্থাপন করেছেন।' সেই BNR তথা পাকিস্তান সরকারের পয়সায়, পাকিস্তানের (পূর্ব পাকিস্তান) তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন পাবলিকেশন ও ফিচার বিভাগের প্রধান, অনুগত সরকারী কর্মচারী, কবি আবুল হোসেন এবং পাকিস্তান হাসিলের আগেই যিনি 'পাকিস্তানবাদী' লেখক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেই প্রখ্যাত ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের সম্পাদিত পত্রিকায় কিনা পাকিস্তানের আদর্শ -উদ্দেশ্য কিছুই ব্যক্ত হলো না? পাকিস্তান সরকারের অর্থে প্রকাশিত সহযোগী পত্রিকা সম্পর্কে লেখক সংঘ পত্রিকার এই আক্ষেপ তাই খুবই সংগত ছিল। তাঁরা দেখেছিলেন, সংলাপে 'গঠনমূল কোন প্রেরণা' 'অনুপস্থিত'।

তবে সংঘের পত্রিকায় অতি বাড়াবাড়ি সমালোচনা হয়েছিল। সংলাপ পাকিস্তানবাদী ধ্যানধারণায় আঘাত করার জন্য অবশ্যই প্রকাশিত হয়নি। পাকিস্তান-বিরোধী কোনো রচনা এর কোনো সংখ্যাতেই নেই। কবি আবুল হোসেন এবং সৈয়দ সাজ্জাদ হেসায়েন উভয়েই ছিলেন উচ্চশিল্পবোধসম্পন্ন সাহিত্যসেবক অর্থাৎ লেখক। বিদ্যাবৈদগ্ধ তাঁদের উচ্চকোটিরই ছিল নিঃসন্দেহে। তাই শিল্পগুণ ক্ষুন্ন করে কোনো শ্লোগানধর্মী রচনা সম্পাদকেরা প্রকাশ করতে চাননি। ফলে নিবেদিতপ্রাণ পাকিস্তান-সেবকেরা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন সংলাপে পাকিস্তানী বাধাগদ বা শ্লোগান নেই বলে।

'সংলাপ' বেরিয়েছিল BNR এর মাধ্যমে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে। আবুল হোসেনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের সহযোগে উচ্চস্তরের বুদ্ধিজীবীলেখকদের রচনা নিয়ে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করার জন্য। প্রচার মাধ্যমের সহযোগে পাকিস্তান সরকার পূর্ব ও পশ্চিমকে এক রাখতে চেয়েছিল ; আর দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল বাঙালী-সংস্কৃতির সম্মোহন থেকে। এজন্য মাহেনও শ্রেণীর মাসিক, জেলাপরিষদের পাক্ষিক এবং নানান সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকাসমূহ বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সরকারের পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে নিয়ে নেয়া হয়েছিল। তাছাড়া প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স এ্যাক্ট খুব সোচ্চার ছিল। লেখক সংঘের মাধ্যমেও সাহিত্যিকদের জড়ো করা হয়েছিল। বিএনআর বই লিখিয়ে লেখকদের অনেক রয়্যালটি দিয়েছিল। সংলাপও লেখকদেরকে টাকা দিত। লেখা সংগ্রহ করতেন কবি আবুল হোসেন, ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন বলেন, 'লেখার জন্য টাকা দেওয়া হত বলে লেখা পাওয়া সমস্যা ছিলনা।'[১৫৯] 'সংলাপ'-জাতীয় অনেক পত্রিকাই তখন বিভিন্ন ভাষায় বেরিয়েছিল। তবে ১৯৬২ সনে আবুল হোসেন লিয়েনে ব্যাংকক চলে গেলে ওসমান গনি সম্পাদকপরিষদের সদস্য হন। তাঁর সাতমসজিদ রোডের ঠিকানা থেকে পত্রিকা প্রকাশিত হত। মাঝখানে কয়েক বছর সংলাপ (১৯৬৪-৬৯) বন্ধ ছিল। প্রথম দফায় ৮টি সংখ্যা বেরিয়েছিল। কিন্তু প্রথম পাঁচটির বেশী পাওয়া যায়নি। ১৯৬৯ সনের দিকে সংলাপ নতুন উদ্যোগে বের হয়ে একবছর (অক্টোবর ৬৯ থেকে-সেপ্টেম্বর ১৯৭০) চলেছিল। ১৯৭১ সনের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে, বিএনআর উঠে যায় বা ইচ্ছা করেই সরকার পত্রিকায় ফাইন্যান্স বন্ধ করে দিলে সংলাপ উঠে যায়। অতএব ৮ + ৪ = ১২ টি সংখ্যা সংলাপের বাজারে এসেছিল। তবে সবকটি সংখ্যা এখন আর পাওয়া যাবেনা। কারণ সংশ্লিষ্ট অনেকেই এখন পাক-সরকারের অর্থে পত্রিকা প্রকাশের কথা স্বীকার করতে চাননা (ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ব্যতিক্রম) কেউবা বলে বসেন, সাজ্জাদ হোসায়েন সাহেবের সঙ্গে 'প্রীতির সম্পর্ক' ছিলনা।[১৬০]

অতএব সংলাপের সব কপির বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। তবে যাইহোক, কবি আবুল হোসেন এক সাক্ষাৎকারে বলেন ; সরকারী কর্মচারীর সম্পাদক হওয়া সাজেনা। লিখিত অনুমতি নিয়ে সরকারের টাকায় চতুরঙ্গের দৃষ্টান্তে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে একটি ভালোসাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের লক্ষ্যে প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে সংলাপ বের হয়েছিল। বস্তুত পূর্ববঙ্গের ত্রৈমাসিক কাগজগুলোর মধ্যে সংলাপ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয় বটে, তবে 'চতুরঙ্গ' সাজা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই পত্রিকা গর্বের না হয়ে এখন অনেকের জন্যেই গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংলাপ 'ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রিকা' প্রকাশের ঠিকানা দেয়া হয়েছিল ৪২/২ হাটখোলা রোড, ঢাকা-৩। ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত আর ইডেন প্রেস ঢাকা থেকে মুদ্রিত হতো। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১ টাকা ২৫ পয়সা। বার্ষিক মূল্য ৫ টাকা। সব সংখ্যায় মূল্য লেখা হতো না। বিনামূল্যেই হয়ত বিতরিত হতো। পৃষ্ঠা ১১২ ১/৮ সাইজ। প্রচ্ছদ ও অঙ্গ সজ্জায় ছিলেন শিল্পী আবদুর রউফ। 'সংলাপে প্রকাশিত রচনার মতামতের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য সংশ্লিষ্ট লেখকরাই দায়ী সম্পদাকীয় কর্তৃপক্ষ নন', এই ছিল সম্পাদকীয় ঘোষণা। আর 'গুণবিচারে লেখা নির্বাচিত হত। রাজনৈতিক কারণে কোন লেখা প্রত্যাখ্যাত হয়নি।'[১৬১] বিজ্ঞাপনসমেত উন্নতমানের কার্টিজ কাগজে ছাপা হত। সবকিছু পরিচ্ছন্ন, রুচিস্নিগ্ধ ছিল। তৎকালে ওমন পত্রিকা হঠাৎ হাতে আসতো। প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯, জুন ১৯৬২) সম্পাদকীয় ঠিকানা উল্লেখ করা হয় ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের বাসভবন ১০৯ নাজিমউদ্দীন রোড ও আবুল হোসেনের সরকারী বাসা ২৫৪ ই আজিমপুর স্টেট, ঢাকা। নবপর্যায়ে ১৯৬৯ সনে প্রকাশিত সংখ্যায় (তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) 'প্রধান অফিস' এর ঠিকানা দেয়া হয় ৭৫৭ ডি সাতমসজিদ রোড, ঢাকা-২ এর অধ্যাপক ওসমান গনির ঠিকানা।

প্রাপ্ত সংখ্যাগুলোতে **কবিতা লিখেছিলেন** : আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, সানাউল হক, শামসুর রাহমান, আবুল হোসেন, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, ফজল শাহাবুদ্দীন, সৈয়দ আলী আহসান, আল মাহমুদ, সেলিম রেজা, শহীদ কাদরী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মযহারুল ইসলাম, আ.ন.ম বজলুর রশীদ, সৈয়দ আলী তকী, মুহম্মদ নুরুল হুদা, আবুল হাসান সেলিম রেজা, প্রমুখ।

সংলাপের গল্পকার : শওকত ওসমান (শিকার, ১/১; উদ্বৃত্ত, ১/৪) ; মার্ক টোয়েন (দেশ পাউণ্ডের নোট, অনুবাদ : সাহানা হোসেন, ১/১) ; আবু রুশদ (খোরোশভ, ১/২; প্রত্যাখ্যান, ৩/৩) ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (কেরায়া, ১/২) ; সৈয়দ শামসুলহক (মিলিত মুখ, ১/৩) ; এঙ্গার্স উইলসন (অতিথি, ১/৩) ; আলবার্টো মোরাভিয়া (গরমের দিনে, অনুবাদ : কবীর চৌধুরী, ১/৪) ; আবদুর রহমান (উত্তরণ, ৩/১) ; জীবন দর্শন, ৩য় বর্ষ, জুন সংখ্যা ১৯৭০) ; সৈয়দ আলী নকী (দুটি কবুতর, পূর্বোক্ত, বেলাএত, ৩/৩) ; প্রমুখ।

প্রবন্ধকার : সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন—সাহিত্য ও জাতীয় চেতনা, ১/১ ; সাম্প্রতিক নাটক, ১/৪ ; ইংরেজীর কথা, ২/১ ; সাম্প্রতিক সাহিত্যে বিরোধিবাদ, ৩/১ ; নূতন বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা, ৩/৩ ; সমাবর্তন বক্তৃতা (বা. র, উপাচার্য হিসেবে, তৃতীয় বর্ষ জুন ১৯৭০) ; আসকীণ বি চাইল্ড—আরব মোহাজের সমস্যা, ১/১ ; রশীদ করীম— লেডীচ্যাটার লিজ লাভার, ১/১ ; গ্যারীকুপার ; ১/১ ; নূরুল ইসলাম—পাকিস্তানের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় ভূমিকা, ১/২ ; সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী—লেডীচ্যাটারলিজ লাভার প্রসঙ্গে, ১/২ ; গুস্তেভ লাঁব-জনতা, অনুবাদ— নূরমহম্মদ মিঞা, ২/১ ; সমকালীন কথা সাহিত্যের আঙ্গিক, ১/৩ ; নজরুল ইসলামের গদ্য ৩/১ ; মুহম্মদ ওসমানগনি—জ্ঞান, বুদ্ধি ও পরিবেশ, জুন ১৯৭০ সংখ্যা ; আবুল হোসেন—যে ঐতিহ্য নজরুল ইসলাম, ৩/১ ; রাশীদুল হাসান —প্রথম মহাসমরে ইংরেজী কবিতা, ৩/১ ; ঔপন্যাসিক ফরস্টারের ধ্যানধারণা, জুন ১৯৭০ সংখ্যা ; কাজী দীন মুহম্মদ—বাংলা ভাষায় 'না', ৩/১ ; 'সাদৃশ্য', ৩/৩ ; শাহাবুদ্দীন আহমদ—গদ্যে উপমা, ৩/৩ ; গোলাম সাকলায়েন—আমাদের সাহিত্যপত্রিকা ও সাহিত্যিকগোষ্ঠী, ৩/২ ; মুহম্মদ সিদ্দিক খান—ম্যাকলুহানের আহ্বান জুন ১৯৭০ সংখ্যা;

সংলাপ অনেক ভালো ভালো কবিতা, গল্প ও উপন্যাস প্রকাশের কৃতিত্বের দাবিদার। রশীদ করীম প্রণীত উপন্যাস 'প্রসন্ন পাষান' (২/১) ; এবং সৈয়দ শামসুল হক বিরচিত 'রক্ত গোলাপ' (২/১) ; উপন্যাসটি সংলাপেই প্রকাশিত হয়। মুনীর চৌধুরীর 'দণ্ডধর' (১/২) ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'একটি বিচারকের কাহিনী' (১/৩) ; নাটকও এতেই ছাপা হয়। পুস্তক সমালোচনার বিভাগ খুবই সমৃদ্ধ ছিল। অনেক বইয়ের দীর্ঘ আলোচনা প্রবন্ধাকারে লিখেছেন সাহিত্যসমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত সমালোচকগণ। আলোচিত গ্রন্থাবলীও এদেশের প্রধান লেখকদের লেখা নির্বাচিত কবিতা, গল্প বা প্রবন্ধ কিংবা সমালোচনা মূলক বই থেকে নেয়া। সাহিত্যপত্রিকা চতুরঙ্গর অনুসৃতিই হোক, অথবা একালের পাকিস্তানী সাহিত্যপত্রিকার নতুন দায়িত্বই বলি—নবগঠিত পূর্ববঙ্গীয় সাহিত্যসমাজের চিত্র এই আলোচনাগুলোর সমাবেশ ঘটালে পাওয়া সম্ভব হবে। গ্রন্থপ্রকাশের সমকালে কিভাবে তাকে গ্রহণ করা হয়েছিল-তা এবং সাহিত্য সমাজের গতি সমালোচকেরা কিভাবে নির্দেশ করছেন, সেসব জানার জন্য এসবের কি গুরুত্ব কম?

সংলাপ আলোচিত গ্রন্থসমূহ এবং সমালোচকদের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো,—এ ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ অব বেঙ্গলী ম্যানাসক্রীপ্ট—মুহম্মদ এনামুল হক। শওকত ওসমানের জননী—আবু রুশদ। রশীদ করীমের উত্তমপুরুষ—সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। কলিনউইলসনস রিচুয়াল ইনদি ডাক—সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (১/১)। আবদুর রাজ্জাকের কন্যাকুমারী—কবীর চৌধুরী। সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা—বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর। গ্রাহাম গ্রীনের উপন্যাস বার্ণট আউট কেস— সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (১/২)। আবদুল গাফফার চৌধুরীর 'চন্দ্রদীপের উপাখ্যান'—আনিসুজ্জামান। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের মিক্সড গিল—আবু রুশদ। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন সম্পাদিত প্রেজেন্টিং পাকিস্তানী পোয়েট্রি—ঐ। সি.পি. স্নোর দি কনসকুয়েনস অব দি রিচ—সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন। আবদুল গাফফার চৌধুরীর শেষ রজনীর চাঁদ—কবীর চৌধুরী (১/৩)। আহসান হাবীব প্রণীত আরণ্য নীলিমা—রশীদ করীম। কালচার এণ্ড সোসাইটি—সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। আহসান হাবীব প্রণীত ছায়া হরিণ ; সৈয়দ আলী আহসান প্রণীত একক সংন্ধ্যায় বসন্ত ; আলাউদ্দীন আল আজাদ প্রণীত মানচিত্র ; সৈয়দ শামসুল হক প্রণীত একদা এক রাজ্যে ; ওমর আলী প্রণীত এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি ; তালিম হোসেন প্রণীত শাহীন ; হাবীবুর রহমান প্রণীত উপান্ত—আবুরুশদ (আলোচক)। মুনীর চৌধুরী, আশকার ইবনে শাইখ, ও নুরুল মোমেন প্রণীত নাটক যথাক্রমে রক্তাক্ত প্রান্তর ; রক্তপদ্ম ও নয়াখান্দান—ইবনে ইনশা ছদ্ম নামে আলোচনা করেন (১/৪)। আলাউদ্দীন আল আজাদের 'কর্ণফুলী' ; আবদুল গাফফার চোধুরীর 'নাম নাজানা ভোর' ; সৈয়দ শামসুল হকের 'অনুপম দিন' ; শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' —কবীর চৌধুরী আলোচক। আশকার ইবনে শাইখ সম্পাদিত নবজীবনের গান ও আবদুল আহাদ সুরারোপিত (লায়লা আর্জুমান্দকৃত স্বরলিপিসহ) 'নবদিগন্তের গান'—আবু হেনা মোস্তফা কামাল (২/১)। আবু রুশদ প্রণীত উপন্যাস 'অনিশ্চিত রাগিনী'—আনোয়ার পাশা। খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস প্রণীত 'কতো ছবি কতো গান'—গোলাম সাকলায়েন। আনোয়ার পাশা ও প্রণীত 'নীড়-সন্ধানী' ও 'নিশুতিরাতের গাথা'—মুহম্মদ নুরুল হুদা (৩/১)। টি. এস. ইলিয়ট থ্রু পাকিস্তানী আইস, সৈয়দ আলী আশরাফ সম্পাদিত—সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের গল্পগ্রন্থ 'দূর দুরান্ত' ও 'বিশাল ক্রোধ'—পূর্বোক্ত। বিচারপতি আবদুল মওদুদ প্রণীত মধ্যবিত্ত সমাজের ক্রমবিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর—কাজী আবদুল মান্নান। ইত্যাদি। সমকাল, পূর্বমেঘ, নাগরিক, পরিক্রম, সংলাপ এর পুস্তক সমালোচনা বিভাগ

Dhaka University Institutional Repository

সত্যিই উন্নত ছিল। ঐ কালের পত্রিকায় এমন আর সচরাচর দেখা যায়না।

সাক্ষাৎকার কালে (আগষ্ট ১৯৯১) ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন সমাজের উন্নতির জন্য ইংরেজীর প্রাধান্য প্রসঙ্গে বলেন পাকিস্তানের উন্নতির জন্য ইংরেজীর মূল্য আমি বিশ্বাস করতাম। যেহেতু আমরা পাকিস্তানে বিশ্বাসী ছিলাম, সেহেতু পাকিস্তানের স্থায়ীত্বের জন্য আমাদের ইংরেজীকে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু তখন আমরা এই রাষ্ট্রভাষার বিভেদ সৃষ্টি করে...দেশটাকে দুভাগ করেছি। এই ভুল ইণ্ডিয়া করেনি। এখনও আমি বিশ্বাস করি উচ্চশিক্ষার বাহন একমাত্র ইংরেজীই হওয়া উচিত। ইংরেজী না থাকার ফলে যা হয়েছে বা হচ্ছে, তাহলো এম. এ. পাশ করার পরও থেকে যাচ্ছে অশিক্ষিত। ইণ্ডিয়ার উচ্চশিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী কিন্তু রাষ্ট্রভাষা হিন্দী। ফলে তাঁরা অনেক উন্নত হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের সময়ে তিনি মত পোষণ করতেন বাংলা থাকার পরও বাঙালির উর্দু শেখা উচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি হলো সম্পাদকের। অতএব সংলাপের ভাষা ও সাহিত্যচিন্তা সম্পর্কে সংক্ষেপেই পরিস্কার অনুমান করা যায়। উচ্চস্তরের বুদ্ধিজীবী লেখক সাহিত্যিকদের যুক্তি ও মতের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য সংলাপে দেখা যায় প্রথম শ্রেণীর লেখক ও লেখা নিয়েই এঁদের সকল ভাবনা-চিন্তা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে। এতে দ্বিতীয়শ্রেণীর কোনো সাহিত্যপ্রয়াসের স্থান সজ্ঞানে দেয়া হয়নি। উচ্চস্তরের পাঠকশ্রেণীর সামনে ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ইংরেজীর রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি বিষয়ে ওকালতি করেছিলেন। এই বিষয়ে সংলাপে (২/১) 'ইংরেজীর কথা' প্রবন্ধ লিখে উর্দু-বাংলার বিতর্ক মীমাংসা করতে চেয়েছিলেন পাকিস্তানের ভবিষ্যত স্থায়ীত্বর কথা চিন্তা করে। উর্দু ও বাংলার সমান মর্যাদা প্রাদেশিকভাবে নির্ণয় করে ইংরেজীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিলে বাঙালীর জাতীয়তাবোধে এত তীব্র আঘাত লাগতো না; আর জাগতো না ঘুমন্ত সিংহের ন্যায়। ফলে পাকিস্তান আরও দীর্ঘস্থায়ী হতো। এই বোধ থেকেই 'ইংরেজীর কথা' তিনি ভেবেছিলেন। ১৯৬৩ সনের জুনে (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০) প্রকাশিত সংলাপে (২/১) তিনি উল্লেখ করেন ঃ

"পত্র-পত্রিকায় একথা মাঝে মাঝে বলা হয় যে, ইংরেজী মাতৃভাষার উৎকর্ষের পথে বিঘ্ন স্বরূপ। অভিযোগটির অর্থ এই যে ইংরেজীর দৌরাত্মে মাতৃভাষার চর্চা করতে আমরা অপারগ বা অনিচ্ছুক এবং ইংরেজী আমাদের প্রাঙ্গণ থেকে অপসৃত হলে মাতৃভাষা আরও দ্রুত অগ্রসর হত। এ অভিযোগেও যুক্তির চেয়ে আবেগ রয়েছে বেশী। শুধু তাই নয় সত্যেরও এ ঘোরতর অপলাপ। প্রথমত ঃ ইংরেজী হাতে পেয়ে এদেশের লোক বিদেশী ভাষায় সাহিত্য চর্চায় মেতে উঠেছিল এর কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। প্রমাণ যেটুকু রয়েছে তাতে একথাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে ইংরেজী প্রবর্তনের পূর্বে বাংলা উর্দু ও হিন্দীতে গদ্যসাহিত্য বলে কিছু ছিলনা। এবং ইংরেজ আমলে যে নতুন যুগের সূচনা হল এই সাহিত্যগুলির ইতিহাসে সেটা প্রধানত ইংরেজী ভাষা শিক্ষারই প্রতিক্রিয়া।...এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা কর্তব্য যে পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষে যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইংরেজী ভাষাকে বাদ দিয়ে তার কল্পনা করা কঠিন। পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের যে ভাষাগত ও তমদ্দুনিক দূরত্ব ও ব্যবধান রয়েছে, ইউরোপে অনুরূপ দূরত্ব এবং ব্যবধানের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। যে জাতীয় চেতনার অভিব্যক্তি বর্তমান পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ, ইংরেজীর অবর্তমানে সেটা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। অতএব বিদেশী ভাষা হলেও ইংরেজী আমাদের জাতীয় জীবনের সাথে এমন নিবিড়ভাবে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে যে একে এখন পরিহার করতে গেলে আমাদের জাতীয় চেতনার মূলেই আঘাত করতে হবে। ইংরেজীকে আমরা বিদেশী ভাষা বলতে অভ্যস্ত। কিন্তু বহু বৎসরের প্রয়োগ ও ব্যবহারের ফলে এটা যে চলতি অর্থে বিদেশী ভাষা আর নেই, একথা স্বীকার করতে কুন্ঠিত হব কেন? মানুষের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবনে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্যই শুধু আবেগপ্রণোদিত হয়ে এ সম্বন্ধে কোন কিছু করতে যাওয়ার অর্থ বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করা। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে নতুন আত্মমর্যাদাবোধ এসেছে, সুতরাং আমরা মাতৃভাষাকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইব এই তো স্বাভাবিক। কিন্তু কোন প্রস্তুতি ব্যতিরেকে হঠাৎ পরিবর্তনের মোহে যদি আমরা মেতে উঠি তাতে শুধু বিপর্যয়ই ডেকে আনা হবে। শাসন ব্যবস্থার যেসব ক্ষেত্রে এখনও ইংরেজী ব্যবহৃত হয় বাংলা বা উর্দু সেখানে প্রয়োগ করতে গেলে অদূর ভবিষ্যতে কোন কল্যাণের আশা নেই। বরঞ্চ এই পরিবর্তনের ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় বিস্তর অসুবিধা ঘটবে, জাতীয় সংহতির ভিত্তিও হবে দুর্বল। এবং বিনিময়ে দেশের জনগণের কোন আর্থিক মঙ্গলের প্রতিশ্রুতিও কেউ দিতে পারবেনা।" ১৬২

শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজীর অপরিহার্য্যতা প্রসঙ্গে আলোচনায় তিনি বলেন, "আদর্শের দিক দিয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আমরা বাংলা এবং উর্দুর ব্যবহারের কথা ভাবতে পারি। কিন্তু সেজন্য প্রয়োজন দীর্ঘ প্রস্তুতির। ভারতীয় হায়দ্রাবাদে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে স্বদেশী ভাষায় উচ্চশিক্ষা দানের প্রস্তাব যতটা সহজ শোনায় কার্যত সেটা ততটা সহজ এবং ফলপ্রসূ নয়। হায়দ্রাবাদ আবার ইংরেজীতে ফিরে গেছে। সেখানে যাঁরা লেখাপড়া করেছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কলা বা বিজ্ঞানে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি বা নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেননি। সুতরাং পাকিস্তানে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে অগ্রসর হওয়াই বোধ হয় শ্রেয়। করাচীর উর্দু কলেজে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা কলেজে আধুনিক শিক্ষার উচ্চস্তরে দেশীয়ভাষা ব্যবহারের যে চেষ্টা চলেছে তার ফলাফলের অপেক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে পৌনপুনিক পরিবর্তনের ফলে যে অবস্থা বিরাজমান তা অরাজকতার নামান্তর মাত্র। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েও নানা কারণে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটেছে। এ অবস্থায় অনতিবিলম্বে শিক্ষার মাধ্য পরিবর্তন করতে গেলে সমূহ অমঙ্গলের আশঙ্কা।"[১৬৩]

সংলাপ সে-কালে উচ্চস্তরের সাহিত্যপত্রিকা হিসেবে সমকালীন অপরাপর সাহিত্য পত্রেতে আলোচিত-সমালোচিত হয়েছিল। এর রচনাবলীও প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছে। বিশেষ করে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের বিভিন্ন প্রবন্ধ বা সমালোচনা পাঠক-সমালোচকদের পুনরায় কলম ধরতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। 'সাহিত্য ও জাতীয় চেতনা' শীর্ষক রচনার প্রতিক্রিয়া লিখেছিলেন মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ লেখক সংঘ পত্রিকার প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যায়। (ইংরেজীর কথা) রচনার প্রেক্ষিতে 'পূবালী'তে অন্তত দুটি রচনা প্রকাশিত হয়। নূরুল ইসলাম খান 'ইংরেজীর কথা' ও আবুল কাসেম ফজলুল হক (ইংরেজীর কথা ও বাংলা প্রচলনের সমস্যা') এগুলোর রচয়িতা। পত্রিকার প্রভাব ছিল যে এই সব রচনাই তার উজ্জ্বল প্রমাণ।[১৬৪]

Dhaka University Institutional Repository

১২. উত্তর-অন্বেষা (১৯৬৭-৭০)

'উত্তর-অন্বেষা' ত্রৈমাসিক পত্রিকাগুলোর মধ্যে বিশিষ্ট আসন দাবি করে। সে-দাবী জোরালো হতে পেরেছিল, কারণ এর প্রাণ-পুরুষ ছিলেন বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, সম্পাদক, অধ্যাপক ও গবেষক—ডক্টর মযহারুল ইসলাম (১৯২৮)। তিনি তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 'প্রফেসর ও অধ্যক্ষ'। ১৯৫৯ সন থেকে তিনি বাংলা বিভাগের গবেষণা-মুখপত্র ষান্মাসিক 'সাহিত্যিকী' সম্পাদনা করে আসছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারে (পাকিস্তান) আর্থিক সহযোগিতায়। পাকিস্তান-সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের লোকলোর (Lolkore) (ফোক্‌লোর?) গবেষণা (পূর্ব পাকিস্তানের ফোকলোর সম্পর্কে) কেন্দ্রেরও তিনি তখন সর্বাধিকারী। সম্পাদনা এবং অর্থযোজনার ব্যাপক অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি ১৯৬৭ সনে সৃজনশীল সাহিত্যপত্রিকা 'উত্তর-অন্বেষা'র প্রকাশে আত্মনিয়োগ করে সহজেই সাফল্য লাভ করেছিলেন। স্টাবলিশমেন্টের এবং প্রাতিষ্ঠানিক পদাধিকারীর (অধ্যক্ষ, পরিচালক ইত্যাদি) সকল সুযোগ-সুবিধা এই পত্রিকাতে তিনি প্রয়োগ করার ক্ষমতা পেয়েছিলেন। ফলে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ সন পর্যন্ত পুরো তিন বছর, নিয়মিতভাবে উত্তমকাগজে (মোটা কার্টিজ পেপারে) সুন্দর ছাপা ও প্রচ্ছদে মোটাআকৃতির (শতাধিক পৃষ্ঠায়) সমকালের ভালো সংখ্যাগুলোর বহিরাঙ্গিকসৌষ্ঠবের সমমানে উত্তর অন্বেষা প্রকাশ করেন। সম্পাদককে সহযোগিতা করারও তখন লোকের অভাব ছিলনা। যোগ্য ছাত্র এবং তরুণ-সহকর্মীদের ব্যাপক সাহচার্য তিনি পত্রিকা প্রকাশের কালে লাভ করেছিলেন।[১৬৫] 'সুনিকেত মল্লার' পত্রিকার সম্পাদক এবং বাংলা বিভাগের ছাত্র মোহসিন রেজা ছিলেন এর প্রকাশক। মুদ্রক মোহাম্মদ আবদুর রশীদ খান (কবি নন?)। প্রচ্ছদশিল্পী কাইয়ুম চোধুরী। প্রেস ; আইডিয়াল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, গ্রেটার রোড, কাজীরগঞ্জ, রাজশাহী। মূল্য একটাকা। ১২১, ১০৯, ১১৭, ১০৮, ৭০, ৭৮ ইত্যাদি হলো এই পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যার পৃষ্ঠা।

যাইহোক কোনো সন্দেহ নেই, উত্তর অন্বেষা যোগ্য প্রাজ্ঞ মনের ফসল। সাইজ, কাগজ, প্রচ্ছদ, ছাপার মানের দিক থেকে সুরুচির ভারিক্কী পরিচয় বহন করতো। অবশ্য একটি গবেষণা পত্রিকার সম্পাদক এবং শিক্ষকের 'চারিত্র' এই সৃজনশীল বা মননধর্মী পত্রিকায়ও ফুটে উঠেছিল। বিজ্ঞাপন বেশ ভালো পাওয়া যেতো। তবে নিজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যে সকল বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে, তাতে 'ডক্টর' 'প্রফেসর' ও 'অধ্যক্ষ মযহারুল ইসলাম' যতোটা মুখ্য হয়ে উঠেছিল, ততোটা হননি সম্পাদক ও কবি, সমালোচক বা সাহিত্যিক মযহারুল ইসলাম। তারপরও কথা থেকে যায়। ছয় দফা আন্দোলন (১৯৬৬ থেকে—) শুরু হয়ে যাবার পরও রাজনীতি ও সংস্কৃতি বিষয়ে এঁদের দায়িত্ববোধ, সমাজগঠনমূলক কোনো বক্তব্য ছিলনা। নির্বীর্য নিরপেক্ষ গবেষণাপত্রিকা 'সাহিত্যিকী'র সহোদরাই যেন উত্তর অন্বেষা। অবশ্য ছাত্ররাজনীতি ও সমকালীন সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে করণীয় সম্পর্কে লিখিত বদরুদ্দীন উমরের স্পষ্ট মতামতের একটি রচনা মযহারুল ইসলামের এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই ছাপা হয়েছিল বলে কেউ কেউ এর ভূমিকাকে অন্যরূপেও বিশ্লেষণের প্রয়াস পেতে পারেন। কিন্তু বদরুদ্দিন উমরের প্রবন্ধের প্রেক্ষিতে সম্পাদক পরবর্তী সংখ্যায় যে বক্তব্য দেন এবং প্রতিক্রিয়া প্রকাশের যে ব্যবস্থা করেন, তাতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, উত্তর অন্বেষা পূর্ববঙ্গের ব্যাপক সাধারণ জনগণের স্বার্থের অনুকূলপক্ষীয় রাজনীতি-সংস্কৃতির প্রচারক হতে চায়নি। এবং যাঁরা এই ধরনের বক্তব্য প্রচার করতে চান তাঁদেরকে উত্তর-অন্বেষা আক্রমণ করতে চায়। যেমন ইবনে আদম ছদ্মনামে বদরুদ্দিন উমরকে আক্রমণ করেছেন মযহারুল ইসলাম বা তাঁর অনুরাগী কোনো গবেষক, পণ্ডিত, অধ্যাপক বুদ্ধিজীবী বা দেশপ্রেমিক নাগরিক। অবশ্য ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানের পরে আইউব খানের বিদায়ের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট নতুন রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতিতে উত্তর-অন্বেষার ভূমিকা ও চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সঙ্গীত বর্জন সম্পর্কে পজেটিভ প্রবন্ধ ছেপে বক্তব্যের আর একুশে ফেব্রুয়ারী তথা বায়ান্ন সনের ঘটনার উপর দুচারটে রচনা প্রকাশ করে তাঁরা বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী পন্থীদের সঙ্গে এক কাতারে সামিল হয়েছিলেন। উনসত্তর পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলোতে রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চার বা একুশে ফেব্রুয়ারীর পক্ষে কোন রচনা প্রকাশিত হয়নি। এতে পত্রিকার ভূমিকা মহিয়ান হয়ে ওঠেনি। এঁরা বক্তব্য প্রকাশ করেছেন ঘটনা-উত্তর পরিস্থিতির তালে তাল মিলিয়ে। সংকটকালে কোনো আদর্শ বা দিক্‌দর্শন দিতে উত্তর অন্বেষা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল। বাঙ্গালীদের ঘোর দুর্দিনে, বায়ান্ন, চুয়ান্ন, একষট্টি চৌষট্টি ছেষট্টি-আটষট্টিতে উত্তর-অন্বেষার সম্পাদকের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক সামাজিক অবস্থান ছিল অবাঙ্গালীদের স্বার্থের অনুকূলে। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের লোকলোর গবেষণার নামে অভিসন্দর্ভ লিখেছিলেন 'The Pulse of the (Bengalee) People' সম্পর্কে। (এই বইয়ের চিন্তা ও তথ্য কোন্ দেশের উপকারে আসবে? আসছে?)

উত্তর-অন্বেষার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪, এপ্রিল-জুন ১৯৬৭তে; আর তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ যুগ্ম সংখ্যা কার্তিক-চৈত্র ১৩৭৬ এ (১৯৭০ এর মার্চ-এপ্রিল নাগাদ, জুনেও হতেপারে) প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকায় কোনো সম্পাদকীয় বা উদ্দেশ্য, আদর্শ, লক্ষ্য, যাত্রা, ভূমিকা ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো বক্তব্যই দেয়া হয়নি। একগুচ্ছ কবিতা, গল্প, আর কয়েকটি প্রবন্ধের একত্রে সংকলনই করা হয়েছে। সংকলিত রচনাবলীর মধ্য থেকে পত্রিকার চরিত্র-লক্ষণ বা স্বভাব কিংবা Pulse of the Magajine অনসন্ধান করতে হবে'সমকালীন সমকাল' নাগরিক, কণ্ঠস্বর প্রভৃতি পত্রিকার মতো আধুনিক কবিতা অধিক মাত্রায় মুদ্রিত হয়েছিল উত্তর-অন্বেষায়। খুব যত্নে অনেক বইয়ের সমালোচনাও প্রকাশিত করা হয়। এই কালের পত্রপত্রিকায় বহুল পরিমাণে পুস্তক-পরিচিতি বা আলোচনা-সমালোচনার (পুস্তকের, সাহিত্যের) রেওয়াজ দেখা যায়। এতে সাহিত্যসমাজ গড়ে উঠছে প্রতীয়মান হয়। আর অনেক লেখকের ভালো ভালো বই প্রকাশের ট্রেডিশনও গড়ে উঠছে বলে প্রতীয়মান হয়। সে যাই হোক,— উত্তর-অন্বেষায় বহুসংখ্যক কবির প্রচুর কবিতা নয়, মুষ্টিমেয় কবির গুচ্ছ-গুচ্ছ কবিতা ছাপা হয়েছে ;—এর মধ্যে সিংহভাগই কবি-সম্পাদক মযহারুল ইসলামের। তিনি ব্যতীত আর যাঁরা কবিতা লিখেছেন, তাঁদের নাম—সিকান্দার আবু জাফর, আতাউর রহমান, চৌধুরী ওসমান, আবু বকর সিদ্দিক, হেমায়েত হোসেন, হায়াৎ মামুদ, দিলওয়ার হোসেন, মোহসিন রেজা, আবুল হাসান, মহাদেব সাহা, আবু তাহের, এম. আমিনুল ইসলাম, শহীদুল

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম, এবনে গোলাম সামাদ, আলফাতুন নিসা, আল মাহমুদ, হায়াৎ সাইদ, আহসান হাবীব, সৈয়দ আলী আহসান, শামসুর রাহমান, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, শাহনূর খান, সৈয়দ মাহতাব উদ্দীন আহম্মদ, আবদার রশীদ, অ্যাডাম ভাসিক (প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য, অনুবাদ আলী আনোয়ার) ফররুখ আহমদ, রেজাউল হক, মুস্তাফিজ, জুলফিকার মতিন, কাজী রব, শেখ আতাউর রহমান, মুহম্মদ নুরুল হুদা, বজলুল করিম বাহার, হুমায়ুন কবির, মুহম্মদ রফিকুজ্জামান, আবদুর রশিদ খান, জুলফিকার মতিন, বিষ্ণু দে, জিয়া হায়দার, ফজলুল হক সরকার, জাহিদ হোসেন, আফজাল চৌধুরী, আবদুল গনি হাজারী, হাসান হাফিজুর রহমান, ফজল শাহাবুদ্দীন, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ফজল-এ-খোদা, প্রমুখ।

গল্প লিখেছিলেন আবদুস শাকুর (নৈসর্গিক, ১/১) ; আবদার রশীদ (দ্বিতীয় বিধাতা রূপান্তর, ১/১ ১/২; কুসমাদপি, ১/৩ ; ত্রিধা, ১/৪) ; সেলিনা হোসেন (গোলাপ ফোটা সকাল, ১/১ ; শেষ প্রলাপ ; রক্তের গভীরে, ১/৪) ; মুস্তাফিজ (পথ খোঁজে পথ, ১/১) ; জুলফিকার মতিন (মায়া-কাঞ্চন, ১/২ ; পথের মেলার কাঠের পুতুল, ৩/২) ; মুহম্মদ ফজলুল হক, (শেষ যন্ত্রণা, ১/৩); আলফাতুন নিসা (ম্যাকিবাবা ১/২ ; রক্ত-মূল্য, ১/৩) ; দ্বিতীয় প্রেম ১/৪) ; সিরাজউদ্দীন আহমেদ (খুনী, ১/৪ ; রাত নামে, ৩/১) ; রিওনোসুকো আকু তাগাওয়া (উনোসুকে ঃ একটি পুরুষ ; অনুবাদ ; সাইদুর রহমান, ৩/১) ; অসিত রায় চৌধুরী (বিপন্ন যখন, ৩/২) ; আজিজুল হক (আত্মহনন এবং মৃত্যুর মতো, ৩/৩-৪) ; মোহসিন রেজা (সীমানা পেরিয়ে, ৩/৩-৪) ; প্রমুখ। এতে প্রবন্ধ লিখেছিলেন হায়াৎ সাইদ 'সাম্প্রতিক উন্মীলন সমূহ, ১/১) ; মামুদ শামস- (জীবনানন্দ দাশ ; বোধের কবি, ১/১) ; আবদুল হাফিজ (ইয়ুঙ প্রসঙ্গে, ১/১); এবনে গোলাম সামাদ-(সোরেন কিয়ের্কগার্ড, ১/২); ব্রনিসল্ ক্যাম্পার ম্যালিনোওস্কি (তাঁর Sex, Culture and মটা শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্গত 'বিজ্ঞান ও ধর্ম' প্রবন্ধের অনুবাদক আবদু হাফিজ, ১/৩) ; ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান ('আমাদের গল্প সাহিত্য', ১/৩), আবুবকর সিদ্দিক ('এক বিনষ্ট কুমারের উৎসর্গ', ১/৩) ; সারোয়ার জাহান (বাংলোগীতির রূপান্তর, ১/৩ থেকে ক্রমশ) ; খোন্দকার সিরাজুল হক (কথা সাহিত্যিক কাজী ইমদাদুল হক, ১/৪) ; আবদুল মালেক খান (শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে লোক-সঙ্গীতের প্রভাব, ১/৪, বাংলা গানের রূপরেখা, ৩/৩-৪) ; শেখ আতাউর রহমান (বড়ে গোলাম আলী খা, ১/৪) ; আবু সাইয়িদ (বাংলাকাব্যে গণচেতনা ; উৎস থেকে (অর্থাৎ প্রাচীনকাল, চর্যাপদ থেকে সাম্প্রতিক কাল নয়), ৩/২; ভাষা আন্দোলন ঃ পটভূমি, ৩/৩-৪) ; আলী আনোয়ার (কবিতা প্রসংগ ; সাম্প্রতিক ভাবনা, ৩/২) : সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় (সে আগুন ছড়িয়ে গেলো সবখানে, ৩/৩-৪) ; জুলফিকার মতিন (বিভ্রান্ত আরম্ভ, ৩/৩-৪) ; প্রমুখ।

উত্তর-অন্বেষার সমগ্র লেখার গড় মান ভালো। এরমধ্যে দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাসের চর্চা হয়েছে। সমকালীন প্রেক্ষাপটে সরাসরি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বক্তব্যপ্রধান স্পর্শকাতর প্রবন্ধ না-থাকলেও মুদ্রিত রচনা মোটামুটি পঠনোপযোগী ছিল হতেপারে তা কাগজ ও পরিচ্ছন্ন ছাপার গুণে। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনার একটা মূল্য তাই অবশ্যই আছে। এই পত্রিকায় গ্রন্থ সমালোচনা প্রকাশিত হলে গ্রন্থকারগণ কিঞ্চিৎ হলেও গর্ববোধ করতেন, যেমন করতেন 'সংলাপে' আলোচিত গ্রন্থের রচয়িতারা। কারণ এই সকল পত্রিকার সম্পদাক-কর্ণধারগণ সাহিত্য তথা শিক্ষিত সমাজের পুরোহিত শ্রেণীর লোক। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটা বিভাগের জাঁদরেল অধ্যক্ষ এবং উপাচার্যও ছিলেন। এই পত্রিকায় আলোচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে—হামিদা রহমান প্রণীত স্বাতী (কবিতা) ; জাহান আরা বেগম প্রণীত ইচ্ছার অরণ্যে (কবিতা, ১/১, আলোচক মযহারুল ইসলাম) ; মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ প্রণীত অন্ধকারে একা (কতবতা, ১/১, আলোচক ঃ খোন্দকার সিরাজুল হক) ; সাদত আলী আখন্দ প্রণীত 'তেরো নম্বরে পাঁচ বছর' (স্মৃতিকথা, ১/১, আলোচক ; আবদুল হাফিজ) ; আবদুল হাফিজ প্রণীত 'লোক কাহিনীর দিক্-দিগন্ত (প্রবন্ধ, ১/৩, আলোচক : আবদুর রহীম খোন্দকার) ; হাসান আজিজুল হক প্রণীত 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ (গল্প, ১/৩ , আলোচক : মোহসিন রেজা) ; মুহম্মদ আবু তালিব প্রণীত লালন শাহ ও লালন গীতিকা (১ম খণ্ড) (প্রবন্ধ, ১/৪, আলোচক, মুহম্মদ আবদুল হাফিজ) ; আতাউর রহমান প্রণীত কবি নজরুল (১ম খণ্ড) (প্রবন্ধ, ১/৪ ; আলোচক : খোন্দকার সিরাজুল হক) ; আইনুদ্দীন আহমেদ প্রণীত এবং মুহম্মদ আবদুল হাফিজ সম্পাদিত 'অন্য দিন অন্য কবিতা (কবিতা, ৩/১, আলোচক : আফজাল চৌধুরী) ; বিজয়া দাশগুপ্তা (কলকাতা) প্রণীত আমার প্রভুর জন্য (কবিতা, ৩/১, আলোচক : মুহম্মদ আবদুল হাফিজ) ; মোহাম্মদ নাসির আলী প্রণীত যোগাযোগ (গল্প, ঐ) ; এবাদত হোসেন প্রণীত পদাবলী সমীক্ষা (সমালোচনা, ঐ, আলোচক ; মোহসিন রেজা) ; মোহাম্মদ নাসির আলী প্রণীত লেবু মামার সপ্তকাণ্ড (গল্প, ঐ, আলোচক ; নুরুন্নাহার হাফিজ) ; নাজিম মাহমুদ ও সাধন সরকার প্রণীত 'চেতনার সৈকতে' (কবিতা, ৩/২ ; আলোচক ঃ শেখ আতাউর রহমান) ; আবদুর রশিদ খান প্রণীত নিরন্তর স্বর (পুর্বোক্ত) ইত্যাদি। মুহম্মদ আবদুল খালেক পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের সুসম্পর্ক স্থাপন ও সাংস্কৃতিক চুক্তি হওয়ার পর চীনের বৃত্তি নিয়ে পিকিং ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছিলেন। চীনে গিয়েই তিনি ভ্রমণ কাহিনী লিখে পাঠাচ্ছিলেন অগ্রজকে ; উত্তর-অন্বেষায় এই বিস্তারিত, খুঁটিনাটি ভ্রমণকাহিনী বা দিনপঞ্জী 'পদ্মা থেকে ইয়াংসি' শিরোনামে ছাপা হয়েছিল ধারাবাহিকভাবে প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা (শ্রাবণ—আশ্বিন ১৩৭৪) থেকে। মোহসিন রেজার নাটিকা 'বিষন্ন প্রেক্ষিত' ছাপা হয়েছিল উপর্যুক্ত (১/২) সংখ্যাতেই। ম্যাক্সিম গোর্কির নাটক ইয়েগর বুলিকভ ও অন্যান্য ছাপা হয়েছিল তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৬)। শুধু উত্তর-অন্বেষার নয়, ঐকালের কবিতা বিষয়ক সকল আলোচনা শুরু হতো টি এস. ইলিয়ট থেকে। প্রবন্ধ বা পুস্তক-সমালোচনার সর্বত্র প্রায় কমন এই অভ্যাস (রীতি)। তৃতীয় বর্ষে গিয়ে উত্তর-অন্বেষার সূচীপত্র কণ্ঠস্বরের অনুকরণে গদ্যের স্তবকের মতো সাজিয়ে দেয়া হতো। এর আগে সূচীপত্র ছিল গবেষণা পত্রিকার মতো। পরলোকগত অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের (অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) মৃত্যুতে (৩ রা ১৯৬৯) উত্তর-অন্বেষা গভীর শোক প্রকাশ করে।

প্রবন্ধগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ইয়ুঙ প্রসঙ্গে'। ফ্রয়েড ও ইয়ুঙের চিন্তাধারা সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নৃতাত্ত্বিক ব্রনিসল ক্যাম্পার ম্যালিনোওস্কির রচনা থেকে অনুবাদটি বিবিসি থেকে প্রচারিত হয়েছিল এবং ১৯৩০ সনে The Listener পত্রিকায় ২৯শে অক্টোবর প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এটি ম্যালিনোওস্কির Sex, Culture and মটা শীর্ষক গ্রন্থে মুদ্রিত হয়। মুল বিষয় আদিম সমাজের ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ক চিন্তা ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির চিত্র বিশ্লেষণ। মযহারুল ইসলাম কবিতার বই আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন যে (১৯৬৭) পোষাক-আষাক,

Dhaka University Institutional Repository

চলনে-বলনে-দর্শনে মহিলারা মডার্ণ বা সম্মুখঅভিসারী হলেও, চিন্তার দিক থেকে তাঁরা পশ্চাৎগামীই বটেন।[১]

উত্তর অন্বেষার তিন বছরের সূচীর মধ্যে উল্লখযোগ্য হলো : বদরুদ্দীন উমর প্রণীত 'ছাত্র রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন' শীর্ষক প্রবন্ধ—যেটি প্রথম সংখ্যাতেই (প্রথম বর্ষের) প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলেন 'ছাত্র রাজনীতি সব ক্ষেত্রেই দেশের সাধারণ রাজনৈতিক অবস্থার সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। পূর্ব পাকিস্তান সেদিক থেকে ব্যতিক্রম নয়।.... একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ছাত্র রাজনীতি যে দেশে যত বেশী প্রবল ও প্রতাপশালী সেদেশে সাধারণ রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাব ও সংগঠন ততখানি দুর্বল। এর কারণ সেদেশের বিবিধ সমস্যার সমাধান সম্পর্কে বৃহত্তর রাজনৈতিক জীবনক্ষেত্রে যদি গঠমূলক চিন্তা এবং সাংগঠনিক প্রচেষ্টা না থাকে তা হলে সমাজের মধ্যে শিক্ষা এবং আদর্শবাদিতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছাত্র সম্প্রদায়ই সেখানে আবির্ভূত হয় রাজনৈতিক শক্তির ভূমিকায়।...দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি যথার্থভাবে বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণের প্রতি তাদের প্রচেষ্টাকে পরিচালিত করে তাহলে ছাত্র রাজনীতি সাধারণভাবে খুব বেশী প্রভাবশালী হতে পারেনা। কিন্তু এর অন্যথা হলে সেটা সহজেই সম্ভব হয়। এমনকি অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোন দেশে বৃহৎ এবং সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলসমূহ সুষ্ঠুভাবে নানা ক্রিয়াকর্ম পরিচালনা করা সত্বেও কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে উপেক্ষা করলে সেই বিশেষ ক্ষেত্রে ছাত্র রাজনীতির প্রভাব সে দেশে নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি লাভ করে। এটাই প্রধান কারণ যার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েৎনাম যুদ্ধকে উপলক্ষ্য করে সেখানকার ছাত্রসম্প্রদায় আজ রাজনৈতিক জীবনক্ষেত্রে অনেকখানি সক্রিয়।' আলোচক আরও বলেন তবে..."পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তার মধ্যে আজ যথেষ্ট সুবিধাবাদ, নৈরাজ্য এবং বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। এর জন্য ছাত্রদের নিজেদের দেশের সামগ্রিক অবস্থাই অনেক বেশী দায়ী।'.... ছাত্র রাজনীতির আচ্ছন্নতার কারণ বিশ্লেষণ করে লেখক বলেন, 'এ দেশের মধ্যবিত্তের মধ্যে সুবিধাবাদের আধিপত্য উৎকটভাবে বৃদ্ধিলাভ করেছে এবং তার দ্বারা ছাত্র সম্প্রদায়ও এখন দারুণভাবে আচ্ছন্ন.... এখনকার ছাত্রেরা (তাই) আগের থেকে রাজনীতিক্ষেত্রে অনেক বেশী সক্রিয় হলেও তাদের মধ্যে যথার্থ আত্মত্যাগ এবং স্বার্থহীনতার উদাহরণ খুব উল্লেখযোগ্য নয়। যারা ছাত্ররূপে রাজনীতিতে অংশ নেয় এবং দেশের কল্যাণ কামনা করে এ বিষয়ে তাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আশু সুবিধার কথা চিন্তা না করে সমাজের সামগ্রিক মঙ্গলের পরিপ্রেক্ষিতে যদি তারা তাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে তাহলেই এ দুর্বলতা তারা অনেকাংশে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হবে। শুধু তাই নয়, সে অবস্থায় তাদের চিন্তা এবং কর্মের মধ্যে নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা এবং মধ্যবিত্তসুলভ সুবিধাবাদের পরিবর্তে দেখা দেবে সুস্থ সমাজ চেতনা এবং সুশৃঙ্খলাবদ্ধ চিন্তা। একমাত্র তখনই তারা সক্ষম হবে বিভিন্ন সমস্যা ও ঘটনার প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীল চরিত্র এবং শত্রু–মিত্রের ভেদাভেদ নির্ণয় করতে। অন্যথায় শত্রুকে মিত্র ও মিত্রকে শত্রু জ্ঞান করে এবং নানান সমস্যার যথার্থ চরিত্র নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়ে তারা নিজেদের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে সৃষ্টি করবে নৈরাজ্য যার ফলে দেশের প্রগতিশীল শক্তির পরিবর্তে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহই হবে অধিকতর সমৃদ্ধ ও শক্তিসম্পন্ন।'

ছাত্রদের রাজনীতি করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ছাত্র রাজনীতির ভিতর থেকে মধ্যবিত্তসুলভ সুবিধাবাদী চিন্তাধারার বিলুপ্তি সম্ভব না হলেও বর্তমান অবস্থায় ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না-করে 'বিরত হওয়া অসম্ভব। কারণ রাজনীতিক্ষেত্রে ছাত্রদের প্রভাব স্বাভাবিক না হলেও সেটা দেশের সামগ্রিক দুরবস্থার অন্যতম উপসর্গ। দেশের বর্তমান আর্থিক ও রাজনৈতিক দুরবস্থার অবসান না ঘটলে ছাত্র রাজনীতির এ প্রভাবের অবসানও কিছুতেই ঘটবে না। কাজেই ছাত্রেরা রাজনীতির করবে।' এবং এই প্রশ্নের বিচার সব দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে 'নানা অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে এ রাজনীতি কিভাবে দেশের কল্যাণ সাধন করতে পারে।'

রাজনীতির সঙ্গে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সম্পর্ক নির্ণয় করে বদরুদ্দিন উমর বলেন, প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো সুস্থ সাংস্কৃতিক জীবন গঠনের আন্দোলন। দেখা গেছে, কোন কোন ক্ষেত্রে 'সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলন। দেখা গেছে, কোন কোন ক্ষেত্রে 'সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলন ব্যতীত কোন সুস্থ রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পূর্ণ অসম্ভব। পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।'

পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে ঐ প্রবন্ধের শেষাংশে লেখক বলেন : "পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক জীবন আজ পক্ষাঘাতগ্রস্ত। প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাই এই সংকটের প্রধান কারণ। পাকিস্তান আদর্শবাদী এবং ইসলামী রাষ্ট্র এই অজুহাতে ইচ্ছাকৃতভাবে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে, বিশেষতঃ নিম্নপর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে। এর ফলে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সাথে পূর্ব পাকিস্তানী ছাত্রদের যোগাযোগ সব দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছে। বাংলা ভাষার রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ হয়ে দাঁড়িয়েছে নিতান্তই মৌখিক ব্যাপার। কারণ বাংলা ভাষা যে সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের বাহন সেই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে বাংলা ভাষাকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে এক শ্রেণীর লোক আজ দারুণ সচেষ্ট। এ প্রচেষ্টা যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক তাতে সন্দেহ নেই। পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতিকে পঙ্গু করে তার সমগ্র চিন্তাভাবনার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার জাল বিস্তার করতে সক্ষম হলে সত্য অর্থে এদেশের লোকের পক্ষে কোন প্রগতিশীল আন্দোলনের সূত্রপাত পর্যন্ত করা সম্ভব হবেনা একথা খুব সহজবোধ্য। সাম্প্রদাকিতাকে সহস্র উপায়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করার প্রচেষ্টা পাকিস্তানে অত্যন্ত সক্রিয় এবং যথেষ্ট কার্যকরী। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি দান করলেও সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির প্রভাব সৃষ্টি দ্বারা তারা বাংলাভাষার সত্যিকার চর্চা এদেশে আজ বন্ধ করতে উদ্যত। সাংস্কৃতিক জীবনে এই সূক্ষ্ম রাজনৈতিক চাল পূর্ব পাকিস্তানে অনেকাংশে সফল হয়েছে। এজন্যই পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্রেরা নিজেদের ক্ষতিসাধন না করে রমজানের সময় ইস্কুল কলেজ করলেও পূর্ব পাকিস্তানে রমজানের ছুটি 'ধর্মীয় কারণে' অবশ্যই হতে হয়। এবং সেটা হয় প্রধাণতঃ ছাত্রদের দাবীর জোরে। এজন্যই পশ্চিম পাকিস্তানে রবিবার ইস্কুল কলেজ বন্ধ থাকলেও পূর্ব পাকিস্তানে শুক্রবার হলো সাপ্তাহিক ছুটির দিন। এই জন্য আমরা আরবী ফারসীবহুল উদ্ভট বাংলাতে লেখা যে কোন বইকে ইসলামী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ মনে করে আত্মহারা হই এবং সংস্কৃত সম্বলিত বাংলাতে লেখা সাহিত্যকে বিজাতীয় এবং বিধর্মী জ্ঞানে বর্জন করার আওয়াজ তুলি। এই সাম্প্রদায়িক প্রভাবের জন্যই আমরা প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারীতে মাতৃভাষার জন্য অশ্রুপাত করলেও নানাভাবে সেই মাতৃভাষার চর্চা এবং প্রগতিকে বন্ধ এবং রুদ্ধ করার প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে দ্বিধাবোধ করিনা। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসম্প্রদায় সমাজতান্ত্বিক কারণে রাজনীতি করবে। কিন্তু ছাত্রেরা যদি তাদের এবং সমগ্র দেশের রাজনীতিকে সুস্থ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে বর্তমানের কলুষিত

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক আবহাওয়াকে পরিচ্ছন্ন করতে চায় তাহলে তাদেরকে আজ সাংস্কৃতিক জীবনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে...জীবনকে পঙ্গু করার জন্য কোন শক্তি কত বিভিন্ন উপায়ে এখন সক্রিয় এবং এ শক্তি সমূহকে বিনাশ করার উপায় কি?"১৬৭

এই প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবাদ ছাপা হয় উত্তর-অন্বেষার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায়। লেখক ইবনে আদম (ছদ্মনাম?) এর রচনার শীর্ষে নোটে সম্পাদক কর্তৃক লেখা হয় ; 'বদরুদ্দীন ওমরের (উমর?) প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সম্পাদক একমত ছিলেন না।' ইবনে আদমের লেখা প্রসঙ্গেও সম্পাদক বলেন ঃ 'বলাবাহুল্য এই লেখাটির বক্তব্যের সঙ্গেও সম্পাদক একমত নন। তথাপি মূলত...সমস্যাটি জটিল এবং বিতর্কমূলক বলেই...অবগতির জন্য প্রকাশ করলাম'। এই কথা সম্পাদক নোটে লিখলেও ভাষাগত তাৎপর্য পরীক্ষা করলে মযহারুল ইসলাম কাউকে দিয়ে যে এই প্রবন্ধ লিখিয়েছেন তা বোঝা যায়। ইবনে আদম বদরুদ্দীন উমরকে সরাসরি আক্রমণ করে উপদেশাত্মকভঙ্গিতে বলেন, 'ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত কিনা এ প্রশ্নটি একটি বিস্ফোরক বিষয়.... কোন জটিল সমস্যা সম্পর্কিত আলোচনায় বা গবেষণামূলক নিবন্ধে পণ্ডিত ব্যক্তিরা সাধারণত চূড়ান্ত রায় দেয়া বা শেষ কথা বলা থেকে বিরত থাকেন। জ্ঞানের রাজ্যে শেষ কথা বলে কিছু নেই। কিন্তু উমর.... শেষ রায় দিয়েছেন।.... প্রয়োজন সমাজকে সমস্ত দিক থেকে ব্যাপক ভাবে নিষ্ঠাসহ জানবার এবং সমাজ সম্পর্কে বিস্তৃত ও গভীর গবেষণার। উমর সাহেবের প্রবন্ধে সেই নিষ্ঠা ও গবেষণার একান্ত অভাব .... তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান এই দইটি সম্মিলিত বিভাগের অধ্যক্ষ। প্রবন্ধটিতে এমন কতকগুলো ফাঁক রয়েছে যাতে করে মনে হতে পারে প্রবন্ধ লেখকের না-রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, না সমাজবিজ্ঞানে উচ্চতর বৈজ্ঞানিক শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটেছে (বা) সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যথার্থ গবেষণারীতির সাথে অন্তরঙ্গতা জন্মেছে। আমার এই উক্তি শুধু যে বাস্তব সত্যের ওপর ভিত্তি করেই নির্মিত তা নয়, উমর সাহেব তাঁর প্রবন্ধেও নিজেকে এমনিভাবেই অনাবৃত করেছেন। তাঁর কয়েকটি উক্তি থেকে একথার প্রমাণ মিলবে।... আসলে যদি অধ্যক্ষ উমর সমাজবিজ্ঞানে বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হতেন, তবে তিনি বোধ করি দেশের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাতের জন্য ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে তার চূড়ান্ত যোগাযোগ স্থাপন করে একটি অপূর্ব থিওরী দাঁড় করাতেন না... সমাজবিজ্ঞানের সাথে ইতিহাসবিজ্ঞানের যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, বদরুদ্দিন উমরের আলোচনায় তার কোন প্রমাণ নেই। অথচ তিনি তা না করে 'পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যা এবং আন্দোলনসমূহকে বিশ্লেষণ' করে 'মধ্যবিত্ত কেন্দ্রিক রাজনীতির অর্থ' আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় গলদঘর্ম হয়েছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যা এবং আন্দোলন সমূহকে বিশ্লেষণে করতে হলে ইতিহাসের আশ্রয় অপরিহার্য। পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যা হঠাৎ করে মাটি ভেদ করে গজায়নি.... সাম্প্রতিক সমস্যার মূল নিহিত রয়েছে প্রাক্তন কালের কঙ্কর বহুল অবয়বে। সুতরাং এই সমস্যার বিশ্লেষণ পশ্চাতের ধারাকে স্মরণ না করলে বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ এবং অবৈজ্ঞানিক হতে বাধ্য। অধ্যক্ষ উমরের উক্তিসমূহ তার নগ্ন প্রমাণে সমৃদ্ধ।... তাঁর সমগ্র বক্তব্যে সাধনার স্বাক্ষর নিদারুণভাবে অনুপস্থিত।.... বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই দুইটি বিভাগের একক অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত থেকেও বদরুদ্দিন উমর ছাত্র-ছাত্রীদের সাক্ষাৎ রাজনীতি সমর্থন করেছেন" বলেও ইবনে আদম বদরুদ্দিন উমরকে সমালোচনার তীব্র তীক্ষ্ম বাণে জর্জরিত করেছেন। আদম লিখেছেন : "অধ্যক্ষ উমর যে উপদেশ দিয়েছেন, ছাত্র-ছাত্রীদের যদি সে উপদেশ যথাযথ ভাবে পালন করতে হয়, তবে বোধকরি তাদের রাজনৈতিক সংগঠন, আন্দোলন ও কার্যকলাপ ছাড়া আর কিছুই করবার থাকেনা। অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে নির্ধারিত পাঠ্য তালিকা অনুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জন করবার এবং জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিজেদেরকে গড়ে তুলবার যে প্রাথমিক দায়িত্ব তা আর তাদের পক্ষে পালন করা সম্ভব হয়ে উঠবে না। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনীতি ক্ষেত্রে কর্মপন্থা নির্ধারণের যে উপদেশ দিয়েছেন তা যদি বাস্তবায়িত করতে হয়, তবে বোধকরি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগ, এমনকি রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ পর্যন্ত তুলে দিয়ে একটি মাত্র বিভাগই খোলা রাখতে হয়... সে হোল রাজনীতি শিক্ষা বিভাগ। অবশ্যি অধ্যক্ষ উমর যে ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনৈতিক সংগঠন মজবুত করে কর্মপন্থা নির্ধারণের উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন এমন নয় ....ছাত্রছাত্রীরা যদি "জীবনকে পঙ্গুকারী সক্রিয় শক্তিসমূহকে বিনাশের" আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবে শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে তাদের জীবন গঠনের কার্যকলাপ কতটুকু স্বার্থকভাবে সম্পন্ন করতে তারা সমর্থ হবে সে কথা অধ্যক্ষ উমরের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত ছিল, এমন দাবী নিশ্চয়ই ছাত্রছাত্রীদের পিতামাতা....করতে পারেন।...এমনি অনেকগুলো অসাধারণ এবং অসংলগ্ন উক্তিতে গড়ে উঠেছে অধ্যক্ষ উমরের আলোচ্য প্রবন্ধটি।...তাঁর অসাবধান সিদ্ধান্তগুলো সম্বন্ধে অনেক কথাই বলার আছে, অবকাশ আছে তীব্র সমালোচনার। কিন্তু তাতে অযথা প্রবন্ধটির এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধ লেখকের উপর অস্বাভাবিক গুরুত্ব দেয়া হবে বিবেচনায় এখানেই শেষ করছি।"১৬৮

এই রচনায় চলতি গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে মুখ ফিরিয়ে অগণতান্ত্রিকতার সমর্থন করা হয়েছে। কিন্তু উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পর সুর পাল্টে রবীন্দ্রসাহিত্যের মাহাত্ম্যকীর্তনে পত্রিকা মগ্ন হয়ে পড়ে। আবদুল হাফিজ লিখেছেন ঃ

"সাম্প্রতিক কালে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানে অহেতুক একটি বিরোধিতার সৃষ্টি হয়েছিল, বেতারে রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী উত্থাপিত হয়েছিল এবং প্রকৃতপক্ষে নিষিদ্ধ না হলেও রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারের হার নিদারুণভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর পক্ষে—বিপক্ষে দুদল লোক লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছিলেন ; বিরোধীপক্ষের বক্তব্য ছিল এই যে রবীন্দ্রনাথ পাকিস্তানী সংস্কৃতির কোনো স্বাক্ষর বহন করেন না। রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও মৃত্যু দুই-ই ঘটে পরাধীন ভারতে। কাজেই তাঁর পক্ষে পাকিস্তানী সংস্কৃতির বিরোধীতা করবার কোনো প্রশ্ন ওঠেনা। রবীন্দ্রনাথ পাক-ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার, কিন্তু একথার মাধ্যমে এ-ও বোঝায়না যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজনীন নন। আজকের যুগে রবীন্দ্রনাথের বাণী সত্যিকার অর্থেই বিশ্ববাণী। সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্য বিশ্বমানুষের সাহিত্য ; তাই বলে তাঁর সাহিত্যে কি বিশেষ দেশ-কালের কথা নেই? শেক্সপীয়র যে-অর্থে ইংল্যাণ্ডবাসী, রবীন্দ্রনাথ সে-অর্থেই পাক-ভারত উপমহাদেশের অধিবাসী। শেক্সপীয়র যে-অর্থে বিশ্বের, রবীন্দ্রনাথও সেই অর্থেই বিশ্বের। শেক্সপীয়রকে খৃস্টান কবি বা খ্রীস্টান নাট্যকার বললে যে দোষ দুষ্টতা হয়, রবীন্দ্রনাথকে হিন্দুকবি বা ব্রাহ্ম কবি বললে সেই দোষদুষ্টতার সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ বাঙালী বটে (ন) কিন্তু তাঁকে শুধুমাত্র বাংলার কবি বলা যায়না। অন্যদিকে আমাদের সংস্কৃতি ও মননের তিনিই বিশ্বপ্রতিনিধি। রবীন্দ্রনাথকে যদি পাকিস্তানী সংস্কৃতির বিরোধী আখ্যা দিই, তাহলে নজরুলই বা কোন্ গুণে আমাদের জাতীয় কবি হন? সুখের কথা, ইতিমধ্যেই রবীন্দ্রবিরোধীতার উত্তেজনা হ্রাস পেয়েছে, রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গে যে কুসংস্কারের সৃষ্টি হয়েছিল, তাও

Dhaka University Institutional Repository

কেটে গেছে এবং শুভবুদ্ধির জয়লাভ ঘটেছে। এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের খণ্ডিত বিচার করে আমরা আর একটি নজির স্থাপন করেছি।...রবীন্দ্রবিরোধিতার মূলসূত্রগুলো এত হাল্কা কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত যে সামান্য আঘাতেই তা ভেঙ্গে পড়বার কথা।... বাঙালীর গর্ব শুধু এতটুক যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পসাধনা বাঙলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন।।.... যুগে যুগে প্রতিভাবান মানুষ (তাঁর প্রতি) ঈর্ষান্বিত বোধ করবেন, বারেবারেই হয়তো সৃষ্টি হবে নতুন বিরোধিতা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চিরকাল নানা জাতির শেষ শিল্পী হিসেবে বেঁচে থাকবেন, আমরা যদি তাঁর অমর শিল্প-সাধনাকে রক্ষা না করি, সেভার গ্রহণ করবে সমগ্র বিশ্ব।"[১৬৯]

লেখক প্রসঙ্গত রবীন্দ্রবিরোধীতার প্রাক্তন ইতিহাস স্মরণ করে ডি-এল রায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ গোঁড়াদৃষ্টির সমালোচক এবং কমিউনিস্টদের বুর্জোয়া বলে প্রত্যাখ্যান করার প্রস্তাবকে আর শিবনারায়ণ রায়, নিরোদচন্দ্র চৌধুরী ও তরুণতরদের রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের বিষয় ও ঘটনা নিয়ে 'তথ্যানুসন্ধানের' প্রবণতার সমালোচনা করে বলেন ঃ 'পাকিস্তানের কিছু কিছু লোকও সবশেষে রবীন্দ্রবিরোধিতার ক্ষেত্রে এক গোঁড়া সাম্প্রদায়িকতার পত্তন করেছেন। বলা বাহুল্য এতসব চক্রান্ত ও আঘাত সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ বেঁচে আছেন এবং কারো পরোয়া না করেই।'[১৭০]

আবদুল হাফিজ আরো বলেন ঃ "....সোভিয়েত রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর সমাদর প্রমাণ করে যে রবীন্দ্রনাথের লেখায় প্রগতিশীল মানবতাবাদী প্রেরণা এত অঢেল যে তার জুড়ি মেলা ভার। মার্কসবাদীদের সেই বিশেষ চক্রটি আজ আর নেই, কিন্তু সেকালে রবীন্দ্র বিরোধিতার ক্ষেত্রে এরা একটি পটু প্রচারণার ঢালাও ব্যবস্থা করেছিলেন। একারণেই রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর বিচারে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী অপরিহার্য—অপরিহার্য তাঁর লেখার সামগ্রিক অধ্যয়ন ও নিরন্তর চর্চা।"[১৭১]

তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় চতুর্থ, কার্তিক –চৈত্র ১৩৭৬ সংখ্যায় 'একুশের স্মৃতি' কথাটা লাল কালিতে, আর সূচীপত্রের পাতায় শীর্ষে 'মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাঙলা ভাষা' উক্তি উদ্ধৃত করে মোহাম্মদীর মতোই অনেকটা রূপান্তরের মুখে যে সমাজ ও সাহিত্য—তার স্বীকার করে নিয়েছিল। সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় 'সে আগুন ছড়িয়ে গেলো সবখানে' তো বায়ান্নোর ঘটনা বর্ণনা করেছেন স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে। তবে এসবই বহু পরে স্বাধীনতার লাল সূর্য উদয়ের পূর্বক্ষণে। উত্তর অণ্বেষা সমাজ সাহিত্যও সংস্কৃতির রূপান্তরের প্রক্রিয়ায়, মুক্তি সংগ্রামে সামিল হতে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। যদিও সমাজের ব্যাপক ভাঙাচোরা, উত্থান-পতন ও বিপর্যয়-বিক্ষোভের পর আলোকময় পরিস্থিতিতে উত্তোরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেলেই এটি প্রকাশিত হয়েছিল।

পূর্বোক্ত ধারার কতিপয় অপ্রধান পত্রিকা

১. নওরোজ (১৯৪২-৭০) ২. জাগরী (১৯৫৬); ৩. অতএব (১৯৬০);
৪. প্রবাহ (১৯৬১); ৫. দিগন্ত (১৯৬৬); ৬. অভিযান (১৯৫৪-৬৪);

১. নওরোজ (১৯৪২-৭১)

কলকাতা থেকে ১৯২৭ সনে আফজাল-উল হকের সম্পাদনায় 'নওরোজ' নামে মাসিকসাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের পরও কেনো একই নামে ১৯৪২ সনে আবার দিনাজপুর থেকে 'নওরোজ' বের হলো, তার অনেক কারণ অনুমান করা যায় ; কিন্তু অনুমানভিত্তিক কথার কি মূল্য? কেবল এই মাত্র বলা চলে যে, কলকাতার নওরোজের সঙ্গে আফজাল উল হক ছাড়াও মোসলেম উদ্দিন শেখ প্রমুখ সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রাপ্তব্য কলকাতাই শেষ সংখ্যা নওরোজের মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন মোসলেম উদ্দিন শেখ। এঁদের কারো ঘনিষ্ট, অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি দিনাজপুরী–নওরোজের উদ্যোক্তা হলে সূত্র সবই পাওয়া যায়।

দিনাজপুর থেকে সাতচল্লিশের আগে ১৯৪২ সনের ফেব্রুয়ারীতে নওরোজ প্রকাশিত হয় উনত্রিশত্রিশের দিকে প্রতিষ্ঠিত দিনাজপুর–এর স্যার নাজিম উদ্দিন মুসলিম হল এবং লাইব্রেরীর মুখপত্ররূপে। পরের বছর (বৈশাখ ১৩৫০) থেকে নওরোজকে দিনাজপুরের ইকবাল সোসাইটিরও মুখপত্র (যুগ্মভাবে) রূপে গণ্য করা হয়। ('মহাকবি, মহাদার্শনিক এবং মহামনীষী আল্লামা ইকবালের প্রাণচঞ্চল বাণী প্রচারে নওরোজ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।') বিভাগপূর্ববর্তীকালের প্রথমভাগের নওরোজে সম্পাদক হিসেবে নাম মুদ্রিত হতো মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেন বি.এল-এর। পাকিস্তান-আমলের নওরোজের সম্পাদক হিসেবে মোঃ হেমায়েত আলীর নাম প্রকাশিত হয়। নওরোজ আর্ট প্রিন্টিং লিঃ দিনাজপুর, পূর্ব পাকিস্তান থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। 'চীফ এডিটর' ছিলেন হাসান আলী আহমেদ এম. এ. বি. এল।

মান–বিবেচনায় প্রথম দিককার (১৯৪২-৪৭) নওরোজকে মাসিক সাহিত্যপত্রিকার গুরুত্ব দেয়া গেলেও কোনো অবস্থাতেই প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাসিক এটা হতে পারেনি। তৃতীয় শ্রেণীর সাহিত্যপত্রিকা হিসেবেই এর অবস্থান ছিল। অনুন্নত পশ্চাৎপদ বিজলী-বাতিবিহীন দিনাজপুর থেকে গৃহীত এই সাহিত্যিকসাংস্কৃতিক উদ্যোগের অপরিসীম গুরুত্ব তবু কিছু স্বীকার করতে হবে। কলকাতা বা ঢাকা থেকে বহু দূরবর্তী অশিক্ষা এবং অর্থে-বিত্তে সংস্কৃতির দিক থেকে অনগ্রসর এলাকার মানুষদের মধ্যে শিল্পসাহিত্য সৃষ্টির একটা তাগিদ বা প্রেরণা, কিংবা চাঞ্চল্য ও আগ্রহ নওরোজ সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

করেছিল এবং এই প্রাণ-চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল নাজিম উদ্দীন হলকে কেন্দ্র করে। সেখানকার সংস্কৃতিবান মানুষদের মনের মুক্তি এবং সাহিত্য-শিল্প অনুশীলনের কেন্দ্র হিসেবে 'ইকবাল সোসাইটি' এবং 'স্যার নাজিম উদ্দীন মুসলিম হল এণ্ড লাইব্রেরী'র ভূমিকা সাগরের মধ্যে ভরসার দ্বীপের মত অনেকটা। একারণেই আইউব খান সমাজসেবায় ন্যাজিম-উদ্দীন হলের গুরুত্ব স্বীকার করে নওরোজের সম্পাদক হেমায়েত আলীকে তথমা-ই-খিদমত উপাধি দান করেছিলেন। উল্লেখ্য, হেমায়েত আলী নাজিম-উদ্দীন হলের সেক্রেটারী ছিলেন। পরে তিনি পত্রিকারও সম্পাদক হন। সামাজিক সাংস্কৃতিকভাবে তাঁরা দেশের কল্যাণ কামনা করতেন এবং কিছু কিছু কাজও করেছিলেন। তাঁরই স্বীকৃতি স্বরূপ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ঐ পুরস্কার দেন। ইতিহাসে নাজিমউদ্দীন হলের কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃত হবে সন্দেহ নাই। বিভাগপূর্ববর্তীকালের নওরোজ ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলিত অসাম্প্রদায়িক প্রয়াস। তখন সরকারী সাহায্য পাওয়া যেতো ; আর সরকারী অফিসার ছিলেন অধিকাংশ হিন্দু। সাতচল্লিশের পরে এঁদের (নওরোজের) প্রধান উদ্দেশ্য হয় পাকিস্তানের আদর্শকে রূপায়িত করা। তবে কখনও কখনও তাঁরা কিছু ভালো লেখাও দেশের স্বীকৃত সাহিত্যিক-লেখকদের নিকট থেকে নিয়ে, পেয়ে ছাপাতেন। এঁদের তালিকায় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ থেকে মুফাখখারুল ইসলাম, লায়লা সামাদ প্রমুখ রয়েছেন। তবে অধিকাংশ লেখকই (আল-ইসলাহ্‌র লেখক যেমন সিলেটকেন্দ্রিক, তেমনি নওরোজের লেখকগোষ্ঠীর সদস্য) দিনাজপুর এলাকার। এদিক থেকে নওরোজ একটি আঞ্চলিক সাহিত্যপত্রিকার বেশী অগ্রসর হতে পারেনি। এঁরা সব সময় সরকারের প্রশ্রয় ও দানের প্রত্যাশী থাকলেও (বাংলা একাডেমীর বিএনআর প্রভৃতির আর্থিক সাহায্যও তাঁরা পেতেন) ১৯৫২ ও ১৯৫৪ সনের ভাষা আন্দোলনের ন্যায় গণতান্ত্রিকআন্দোলন এবং সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলন (ঢাকা) কে সমর্থন করেছিলেন। দিনাজপুরেও তাঁরা বিভিন্ন স্থানের লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, কবি, সম্পাদকদের দাওয়াত করে বিভিন্ন সময় সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেছেন। এখানে পঠিত প্রবন্ধগুলো তাঁদের পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। বলা প্রয়োজন নিউজপ্রিন্টের কাগজে, ১৬, ১৮, ২০, ২২, ২৬, ২৮, ৩২ ও ৪০ পৃষ্ঠার সংখ্যাই বেশী। পত্রিকা খুবই অনিয়মিত; অতি সাধারণমানের ছাপা হওয়ায় ঠিক দৃষ্টি আকর্ষণ করতো না। তবু ১৯৪২ থেকে ১৯৭০-৭১ সন পর্যন্ত একটি কেন্দ্র থেকে একটি পত্রিকা একদল সাহিত-সংস্কৃতিকর্মীর দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, একটি এলাকার মানুষের সুখ-দুঃখের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তুলে ধরে যে-সামাজিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা পালন করেছে তার ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যগুরুত্ব একেবারে ফেলে দেবার মতো নয়।

২. জাগরী (১৯৫৬)

নারায়ণগঞ্জ থেকে 'জাগরী' বের হয়েছিল বহুলোকের নাম বুকে ধারণ করে, কিন্তু বেশিদিন চলেনি। ১৯৫৬ থেকে ৬০ পর্যন্ত দেশে অসৃষ্টিশীলঅস্থিরতা বিরাজ করছিলো। বিশেষ করে যুক্তফ্রন্টমন্ত্রীসভা ভেঙ্গে যাবার পর প্রায় এক-দু-বছর রাজনৈতিক নেতাদের দলত্যাগ, স্বার্থ নিয়ে হানাহানি, কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্র, সামরিক শাসন জারী ইত্যাদি ঘটনা এই সময়ে ঘটেছিল। প্রকৃতপক্ষে তখন 'মোহাম্মদী' ছাড়া আর কোন সাহিত্যপত্রিকাই এদেশ থেকে প্রকাশিত হচ্ছিলনা। সওগাত ১৯৫৩ থেকে প্রকাশ আরম্ভ করলেও খুবই অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ১৩৬৫ থেকে সওগাত নিয়মিত প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিতে পেরেছিল, এবং তার ৪ মাস আগে (ভাদ্র ১৩৬৪) থেকে সমকাল বের হতে থাকে। ফলে 'জাগরী' স্থায়ী হতে পারেনি। কিন্তু পরে এই পত্রিকার সম্পাদক হেমায়েত হোসেন 'সাহিত্য' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। কিছু দিন ধরে বেশকটি সংখ্যা তার বের হয়েছিল। অর্থাৎ কিছুটা স্থায়িত্ব সেটির কপালে জুটেছিল। সম্পাদক 'জাগরী' থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা নিয়ে 'সাহিত্য' সম্পাদনায় হাত দিয়েছিলেন বলেই হয়তো তাঁর দ্বিতীয় উদ্যোগ তুলনামূলকভাবে বেশী মূল্যের হতে পেরেছিল।[২০১]

'জাগরী' 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি মাসিক' ছিল। এর একটি বড়, দীর্ঘ সম্পাদনা পরিষদ গঠিত হয়েছিল। এটি সম্ভবত কোনো সাংস্কৃতিক সংস্থার মুখপত্র ছিল। কিন্তু পত্রিকায় সেকথা বলা হয়নি। 'জাগরী' নামের সংস্কৃতি ও সাহিত্যিক সংগঠনের 'কমিটি' ধরে নিলে এই বড় 'পরিষদ' এর তাৎপর্য খুঁজে পেতে সহজ হয়। সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ছিলেন—বেগম শেফালী আহমদ, সিরাজুল হক, গজনফর আলী, মধুসূদন মিত্র ; প্রধান সম্পাদক ঃ হেমায়েত হোসেন ; কর্ম পরিষদ ঃ সভাপতি—জনাব আবদুর রহমান এম. এ. ; সহ-সভাপতি—জনাব আবদুল জব্বার, বি.এ. বিটি, ডিপ-ইন-এড (এডিনবরা) ; মিস সাফিয়া খান এম. এ. ; সহ-সম্পাদক ঃ জনাব শামসুল হুদা এম. এ. ; জনাব আবদুল আলীম বি. এ ; প্রচারসম্পাদক ঃ জনাব রেজাউর রহমান ; কার্যালয় সম্পাদক ঃ জনাব নুরুদ্দিন আহমদ বি. এ ; সদস্য ঃ বাবু খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক বি. এ. বিটি ; আবদুল আউয়াল এম. এম. সি ; ফিরোজ আল মুজাহিদ এম. এ ; কাজী তাজুদ্দিন আহমদ এম. এ. ; বেগম রোকাইয়া খাতুন বি. এ. বিটি ; জনাব সুলতান আহমদ মল্লিক ; খাদেমুজ্জামান; কাজী নুরুল ইসলাম ; অজিজুল হক ; মোস্তফা সারওয়ার ; সুলতান মাহমুদ ; মিস লুৎফুন্নাহার বেগম প্রমুখ।

পত্রিকার শীর্ষে মটো হিসেবে হাদীসের এই বানী উদ্ধৃত হয়েছিল ঃ 'বিদ্বানের দোয়াতের কালি শহীদের লোহুর চেয়েও পবিত্র।' লেখকদের জন্য বলা হয়েছিল ঃ 'সুচিন্তিত, মৌলিক, মানসম্পন্ন লেখার গুরুত্ব দেয়া হয়। বিতর্কমূলক রচনা প্রকাশেও পরিষদের আপত্তি থাকবেনা।' কভারে রেজিস্ট্রেশন নম্বর এর জায়গা খালি ছিল, কিন্তু নম্বর হয়তো পাওয়া যায়নি শেষ পর্যন্ত। পত্রিকাটি হেমায়েত হোসেন কর্তৃক জিনাত প্রেস, নারায়ণগঞ্জ থেকে মুদ্রিত ; এবং এমাজউদ্দিন আহমদ কর্তৃক দেওভোগ পাকা রোড নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হতো ; মূল্য ছিল আট আনা।

পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় কবিতা লিখেছিলেন ঃ ফররুখ আহমদ (ঝড়ের ইশারা ওরা জানে) ; আশরাফ সিদ্দিকী (হেমন্ত) ; লতিফা রশীদ (উত্তর ফাল্গুনী) ; খোন্দকার আবদুর রহীম (এপারের ভোর) ; হেমায়েত হোসেন (প্রেম ঃ পৃথিবী ঃ অনুভব) ; কবিয়াল আকিলউদ্দিন (একটি মারফতী গান) ; কাজী নুরুল ইসলাম (আমার যন্ত্রণা কে !) ; বেগম শেফালী আহমদ (কাক জোৎস্নায়)। প্রবন্ধ লিখেছিলেন ঃ আহসান হাবীব (পূর্ব বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

কাব্য-সাহিত্য) ; সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (লোকশিল্পের ভবিষ্যত) ; ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন (বাংলাসাহিত্যে মুসলমানদের দান ; ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলনে পঠিত)। 'সংবুদ্ধ' নামের একজন লেখকের 'পূর্ববঙ্গের কথাসাহিত্য' শীর্ষক একটি লেখা ক্রমশঃ সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হবে মর্মেও বলা হয় এবং প্রথম সংখ্যায় এক কিস্তি প্রকাশিত হয়।। গল্প লিখেছিলেন ঃ মিন্নাত আলী (চেনা ও জানা) ; মোপার্সা (শাদীর সওগাত, অনুবাদক আবদুর রহমান) ; গজনফর আলী (অনিরুদ্ধ) ; সিরাজুল হক (আধুনিক মন)।

সম্পাদকীয়তে বলা হয় "সাহিত্য শাশ্বত জীবনেরই অনুরণন। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সমষ্টিজীবন পর্যন্ত তার পরিব্যপ্তি। পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে তার প্রকার ভেদ। রাষ্ট্রীয় পারিপার্শিকতার ছাপও তাই সেখানে সুস্পষ্ট হতে বাধ্য। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আজ আমরা আজাদ। কিন্তু যে বিপুল প্রাণবন্যার জন্যে রাষ্ট্রীয়কাঠামোয় এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল—স্বভাবতই আশা করা গিয়েছিল তার দুকূলপ্লাবী ঢেউ এসে লাগবে আমাদের সমাজজীবনে, ভাবধারায়, সাহিত্যসাধনায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা নিরাশ হয়েছি। উন্নতজীবন যাপনে যেমন হয়েছি ব্যর্থ, সাহিত্যেও তেমনি হয়েছি অবহেলিত। তার কারণ নানাবিধ।... মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, মুখের ভাষার প্রতি যে গভীর প্রেম থাকলে, অকাতরে জীবন বিলিয়ে দেওয়া যায় বুলেটের সামনে, যে তারুণ্য, যে উন্মাদনা থাকলে লাখো-লাখো নিরন্ন-নিরক্ষর লোককে জাগিয়ে দেওয়া যায়, যে দুর্বার তেজ থাকলে প্রাণে-প্রাণে আনা যায় গভীর উত্তেজনা—সে তারুণ্যের ছাপ, সে উন্মাদনা, সে সতেজ প্রাণের উর্মিদোলা আমাদের সাহিত্যে আসেনি, সে প্রবল গণচেতনা প্রতিফলিত হয়নি আমাদের সাহিত্যে, দুকূলপ্লাবি সে জোয়ারের গতিবেগ, আমাদের কবি সাহিত্যিকদের কলমে আসতে পারেনি।... কিন্তু এখনো এমন কিছুসংখ্যক তরুণ লেখকদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে যে আমাদের সাহিত্যের ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশান্বিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে।... এখন শুধু পরিস্থিতি সৃষ্টির অপেক্ষা। আজকের এই বাস্তববাদীসাহিত্যে বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের মূক বেদনা রূপ পাচ্ছে। জনগণের বেঁচে থাকার দাবী নিয়ে রচিত হচ্ছে সাহিত্য। অনেকেই ইতিমধ্যে তাঁদের লেখায় সে দাবীকে তুলে ধরেছেন। তাঁরা স্বীকার করতে পেরেছেন, বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের .... এই পুঞ্জীভূত বেদনার সমুদ্র পার হয়ে .... আসতে হবে। ভয় করোনা কোন আঘাতকে .... মৃত্যুকে ... এই পরিপ্রেক্ষিতে অনেক আশা অনেক স্বপ্ন নিয়ে 'জাগরী'র যাত্রা শুরু হলো। জানি, এর সামনে দাঁড়াবে আঁধার প্রাচীর, দীর্ঘ পথ হবে বন্ধুর দুর্গম, মানবতার শত্রুদের বিষাক্তনিশ্বাসে এর স্বাভাবিক বাঁচবার দাবী হবে ক্ষুণ্ন, বাঁকেবাঁকে কালবৈশাখী দিবে হানা, রাত্রি আনবে অন্ধকার, তবু আমাদের প্রতিজ্ঞা, আমাদের উদ্যম আমাদের আশা একদিন জয়যুক্ত করবেই আমাদের প্রচেষ্টাকে।' জাগরীর বিশ্বাস ছিল : 'সমস্ত আঁধার ছিন্ন করে অমারাত্রির নিশ্ছেদ্য সমস্ত তিমির ভেদ করে পূবাশার নবীন দ্যুতি উঁকি দিবেই। রাত্রি শেষে রাঙাপ্রভাত এক উজ্জ্বল দিন আসবেই। সূর্য উঠবে— সাহিত্যের পথে সামগ্রিকভাবে মানবতার কল্যাণ-সাধনের পথে আমরা এগিয়ে চলবই।'[২০২]

নারায়নগঞ্জ থেকে এর আগে 'কৃষ্টি' বেরিয়েছিল, কিন্তু সেটার পরিনামও জাগরীর মতোই হয়েছিল। জাগরীর একাধিক সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায়নি। তবে জাগরীর কর্মকর্তাদের দাবী ছিল নারায়নগঞ্জ থেকে তাঁরাই প্রথম মাসিকপত্রিকা প্রকাশের এইরকম একটি উদ্যোগ নিয়েছেন। কথাটি যে ঠিক নয়— কৃষ্টি তার প্রমাণ। দ্বিতীয়বারেও সাময়িকপত্র-সাধনায় নারায়নগঞ্জ তেমন স্থায়ী স্বাক্ষর রাখতে পারেনি। তবে তৃতীয়বারে গুরুত্বপূর্ণ না হলেও মোটামুটিভাবে উল্লেখ করার মতো একটি সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশিত হতে পেরেছিল— জাগরীর ব্যর্থতার আলোকপাতকালে এটুকুই সান্ত্বনা।

৩. অতএব (১৯৬০-৬২)

আঞ্চলিকপত্রিকা হিসেবে বাংলা সাহিত্য ও সাময়িকপত্রিকার ইতিহাসে অতএব এর গুরুত্বও কিছু স্বীকার করা দরকার। কারণ এতে সাহিত্যচর্চার একটি আন্তরিক পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এটি সাধারণ একটি মফস্বলীয় সাহিত্যপত্রিকাই; এর বড় মর্যাদা সে লাভ করতে পারেনি। উদ্যোগের মধ্যে উচ্চমানের পত্রিকার পরিকল্পনা বা চিন্তাধারা ছিল বলে মনে হয় না। সম্পাদকের সেরূপ যোগ্যতাও ছিলনা। তবে এটি ঠিক—ঐকালে ঢাকা থেকেই যেখানে উন্নতমানের পত্রিকা প্রকাশ করা খুব কঠিন কাজ ছিল, সেখানে বগুড়ার মত একটি মফস্বল জিলা শহর থেকে প্রথমশ্রেণীর কোন সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশিত হবে—এরূপ কল্পনাও করা হতোনা। সম্ভবও ছিলনা। আজও এদেশের প্রধান লেখকেরা ঢাকাবাসী। বগুড়ায় তখন কবি আতাউর রহমান, লুৎফর রহমান সরকার এরকম দুএকজন তরুণ কবিসাহিত্যিক কর্মোপলক্ষে বসবাস করতেন—এর থেকে বেশী সুযোগ-সুবিধা ভালো লেখা পাওয়ার ক্ষেত্রে ছিলনা। এই অবস্থায় রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আর রাজধানীতে বসবাসকারী কবি-সাহিত্যিকদের কাছ থেকে ডাকে বা অন্যকোন উপায়ে কিছুকিছু ভালো লেখা সংগ্রহ করে বগুড়ার আজিজুল হক কলেজের বাংলার শিক্ষক মহসীন আলী দেওয়ান (১৯৩৯-৭১) প্রকাশ করেছিলেন 'অতএব' নামের একটি 'মাসিক সাহিত্য'পত্রিকা। জন্মতারিখ থেকেই বোঝা যায় ১৯৬০ সনে সম্পাদক খুবই তরুণ ছিলেন। অবশ্য সার্টিফিকেটের বয়স অনুসারে জন্ম ১৯৩৯ হলেও প্রকৃত বয়স এর থেকে দু-চার বৎসর বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। সে হিসেবেও যা আসে, তাতে ফজলে লোহানীদের 'অগত্যা'র প্রভাব 'অতএব'এ কল্পনা করা সহজ হয়। তাছাড়া নানান চুটকীজাতীয় প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ইত্যাদি থেকে 'অগত্যার' অনুকরণের স্পষ্ট লক্ষণ অতএব-এ আছে। বলাবাহুল্য 'অগত্যা' আর 'অতএব' এর নামকরণের মধ্যেও একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তবে চিন্তাধারায় এঁরা পাকিস্তানবাদী, ইসলামীতমুদ্দুনের পক্ষপাতী ছিলেন। ডঃ মযহারুল ইসলামের 'সাহিত্যপথে' শীর্ষক বইয়ের আলোচনাকালে তা স্পষ্ট করেই ধরা পড়েছে—"... এখনও পূর্ব পাকিস্তানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ হয় নাই। এই কুহেলিকার যুগে যেকোন মত ও পথের নির্দেশিকার বিশেষ মূল্য আছে। ডক্টর মযহারুল ইসলাম মনে-প্রাণে ইসলামীসংস্কৃতি ও জীবনধারায় বিশ্বাসী। মতামত প্রকাশে তাঁহার সিনসিয়ারিটি নযীরহীন।..... গ্রন্থকার যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন তাহা আমাদের নূতন চিন্তার পথ করিয়া দিয়াছে..... সমকালীন সুনাম-কাঙাল সাহিত্যসেবীরা ডক্টর মযহারুল ইসলামের উপর খড়গহস্ত হইবেন..... ইহাতে লেখক ধৈর্যধারণ করিলে সমাজের উপকার করিবেন।'[২০৩]

Dhaka University Institutional Repository

'অতএব'এর প্রথম সংখ্যা আগষ্ট ১৯৬০সনে প্রকাশিত হয়। দুই বছর নিয়মিত চলেছিল। কিন্তু এর মান খুবই সাধারণ; বলাচলে কলেজ বা স্কুলের বার্ষিকী কিংবা কোনো সোসাইটি সমিতির মুখপত্রের ন্যায়। কোনো উন্নত চিন্তা ও সাহিত্যরুচি এইসব সাময়িকী ইত্যাদিতে থাকেনা । তবে সবলেখাই যে এর নগণ্য তা নয়—সেজন্যই এর গুরুত্ব। সাইজ ১১× ৮ ইঞ্চি। নিউজপ্রিন্ট। পৃষ্ঠা সংখ্যা কখনও ১৬, ২৮ ইত্যাদি নওরোজের মতো। নওরোজের মতই এই পত্রিকাও বাংলা একাডেমী ইত্যাদির আর্থিক সহযোগিতা প্রত্যাশী ছিল। উদ্যোক্তারা নানাভাবে সরকারের করুণা প্রার্থনা করেছেন এবং সর্বত্র বঞ্চিত হননি। প্রথম বর্ষে ১২টি সংখ্যা প্রকাশিত হলেও অনেক সংখ্যার গায়ে কোনো তারিখ দেয়া থাকতো না। অনিয়মিত বের হতো বলে এইরকম হতো। অনুদানএর হিসাব বা ইউটিলাইজেশন দেখাবার জন্যে নামেমাত্র সংখ্যা পুরণ করা হতো বলেই অনুমান। তাই সাইজ ও পৃষ্ঠাসংখ্যা সবসময় এক থাকেনি। বিচিত্র হয়েছে। সম্পাদকের নিজের নোট বইয়ের ও অন্যান্য বাণিজ্যিকবিজ্ঞাপনে কিছুটা বৈচিত্র সৃষ্টি হতো অবশ্য। একটি নিয়মিত বিভাগ 'সোনালী আসর' এ ছোটদের লেখা প্রকাশ করা হতো। ধরনধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল 'কচি কাঁচার আসর' এর মতো। 'বগুড়া কচিকাঁচা' মেলার সাহিত্যবিভাগ হিসেবে এটি প্রকাশিত হতো এবং পরিচালনা করতেন সাদিক আনওয়ার ও (শুধুমাত্র) আনওয়ার। এই বিভাগে চিঠিপত্র লেখা হতো দাদাভাই এর কচিকাঁচার আসর এর মতো। ছোটদেরকে উৎসাহিত বা পৃষ্ঠপোকতাদান মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তবে পত্রিকার উদ্দেশ্যও ছিল 'নতুন লেখকদের উৎসাহ দেওয়া।' 'আপনাদের পশ্নের জবাবে' বিভাগে 'কয়াল' নামে 'অগত্যার' মতো কৌতুক ও সাহিত্যরসসহ জবাব দেয়া হতো। তবে কোনো বিদ্রূপ ও খোঁচা তাতে তেমন থাকতো না, কারণ সেই দু:সাহস দেখালে সরকারী ও সামাজিক শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হতে হতো। সত্য কথা বললে বহু লোকে শত্রু হয়। যাইহোক, এসবের মধ্যে সমকালীন তথ্যচিত্র কিছু পাওয়া যায় বটে, তবে প্রশ্নোত্তরে তাঁদের বৈদগ্ধ ছিলনা।

'অতএব সাহিত্য সমিতি' ছিল বেশ সক্রিয়। বিভিন্ন জেলা শহরে, বিশেষত, বগুড়া, ঢাকা, খুলনা ও রাজশাহীতে এর অনেক শাখা ছিল। সমিতির সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ থাকতেন বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকেরা। পত্রিকার মাধ্যমে সমিতি গঠন ও তার পরিচয় প্রদান করা হতো। যেমন 'বই' পত্রিকায় 'গ্রন্থ সুহৃদ সমিতি' গঠনের সংবাদ ও সভ্যদের নাম ঠিকানা ছাপা হয়। মহসীন আলী দেওয়ানের সঙ্গে সহকারী সম্পাদক হিসেবে বিভিন্ন সময় নাম ছাপা হয়েছে—সাদিক আনওয়ার, আনওয়ার ও রহীম চৌধুরীর। প্রচ্ছদ আঁকতেন শওকত কামাল, মোহাম্মদ হোসেন প্রমুখ। আর্ট এণ্ড পাবলিসিটি বগুড়া থেকে মহসীন দেওয়ান কর্তৃক প্রকাশিত হতো এবং বগুড়া লিথোগ্রাফিক প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড থেকে খোন্দকার আবু নাছের কর্তৃক ১ থেকে ৬ সংখ্যা পর্যন্ত মুদ্রিত হয়েছে। ৭ম সংখ্যা বগুড়া সাধনা প্রেস থেকে মোঃ নুরুল আলম কর্তৃক মুদ্রিত হয়। সমিতির পরিচালক ছিলেন আমানুল্লাহ খান। সভ্য হবার ফরম ছিল পত্রিকার মধ্যে। এসব পত্রিকার বিক্রি বা কাটতি বাড়াবার কৌশল বলেই মনে হয়। পরের দিকে ছবিসহ সিনেমার খবরও দেয়া হতো। ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যায় বলা হয় ; "সিনেমা পত্রিকার চল বেশী, এই বিবেচনায় অতএবকে ধর্মান্তরিত করবার প্রস্তাব এসেছে ঢের। আমাদের শুভানুধ্যায়ীদের প্রস্তাব আমরা বিবেচনা করে ঢাকায় আমাদের প্রতিনিধি মনোনীত করেছি সিনেমাসংবাদ পরিবেশনের জন্য। এবার থেকে বরাবর সিনেমা সংবাদ, সিনেমা সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি বিভাগ চালানো হবে। অবশ্যি আমরা এ ব্যাপারে ঢাকাস্থ স্টুডিও ও চিত্রপরিবেশনকারীদের সহযোগিতা কামনা করছি।'[২০৪] ১০ম সংখ্যায় (১ম বর্ষ) 'সাহিত্যিক পরিচিতি' শিরোনামের নিচে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সংক্ষিপ্ত জীবনী ছাপা হয় এবং বলা হয় এরপর থেকে 'পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিকদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের সংবাদ বা জীবনী ও সাহিত্যকর্ম বের হতে থাকবে।'[২০৫] 'অতএব সাহিত্য সমিতি' গঠনের নিয়মাবলীতে বলা হয়: ' যে কোন শিক্ষক, বাংলা একাডেমীর সদস্য, লেখক সংঘের সদস্য, নজরুল-ইকবাল একাডেমীর সদস্যকে সভাপতি/ কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করে যে কোন সংখ্যক সাহিত্যামোদীকে নিয়ে অতত্রব সাহিত্যসমিতি গঠন করা যায়। সমিতির সভায় পঠিত বা মনোনীত লেখা অতএব-এ ছাপা হবে। নতুন কে উৎসাহ দেবার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। যতজন সদস্যকে নিয়ে 'অতত্রব সমিতি' গঠিত হবে ততোকপি অতত্রব পত্রিকা অর্ধেক মূল্যে পাঠানো হবে।'

অতএব-এ যাঁরা লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক নীলরতন সেন, সাদিক আনওয়ার, শাহ আনিসুর রহমান, এ.কে. মকবুল আহমদ, সিদ্দিক হোসেন, খাজা জহুরুল হক, সৈয়দ আফতাব হোসেন, রহীম চৌধুরী, আনওয়ার, এস. কে. এম. রোস্তম আলী, ফেরদৌসী নাজির, আমানউল্লাহ খান, আতাউর রহমান, ম্যাথু আরনল্ড (অনুবাদ), কে.জি.মোস্তফা, আহমদ সাত্তার, মোঃ তবারক হোসেন, অধ্যাপক গোলাম রসুল, রায়হেনা রহমান, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, ড ঃ মযহারুল ইসলাম, মনজুর আলম, মতিয়ার রহমান, ক্ষিতীন্দ্র নাথ রায়, অধ্যাপক মোয়াজ্জম হোসেন চৌধুরী, মোবায়েদুর রহমান, শামসুজজামান চৌধুরী, কে. এম. শমসের আলী, শেখ আমজাদ হোসেন, কে.এম. সালাহউদ্দীন, ইব্রাহীম খাঁ, আ.কা.শ. নুর মোহাম্মদ, অধ্যাপক তরিকুল আলম, সন্তোষ কুমার দেব, লুৎফর রহমান (সরকার); শুভেন্দু মিত্র, ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিব, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান, আহমেদ ফারুক, প্রমুখ। ডক্টর মযহারুল ইসলাম কবিতা লিখেছিলেন অতএব শিরোনামেই

'অতএব তোমাদের হাতে হাত রেখে পথ চলা হোলনা।/ এ দেশে বসত করে তোমরা তাকিয়ে থাকো আরেক জগতে
তোমাদের মন-বুদ্ধি সকল রেখেছ বেঁধে ।/ বহুদুর হতে আরেক আকাশ;
আরেক বাতাস ..../অতএব আজ বলি খোলসা জবান ....
এবার দাঁড়াতে হবে অটল বিশ্বাস বুকে লয়ে / এই মাটি আমাদের মদিনার সুমহান আলো
যুগে যুগে কালে কালে এদেশ রাঙালো / সে আলোতে প্রাণ ভরে এমাটিকে ভালোবেসে আর
মস্তক উন্নত করে দৃপ্ত পায়ে পথ চলবার/ এসেছে সময়
অতএব আর নয় বৃথা কালক্ষয়/ এসো এসো এসো যারা দেশ-হিত-ব্রতে বিশ্বাসী
এই হীন আয়োজন সমূলে বিনাশী।'[২০৬]

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী জীবনাদর্শে পাকিস্তানকে ভালোবাসার উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন কবি,তাই বলে 'সাহিত্যে যৌনবোধ' কতোটা থাকা উচিত সেসব আলোচনাও অতএবে হয়েছে।২০৭ এবং জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের ন্যায় প্রথমসারির কথাশিল্পীর লেখা গল্পও অতএবএ ছাপা হয়েছে। মোটামুটি ভাবে কিছু পঠিতব্য বিষয় পত্রিকাটিতে ছিল, কিন্তু পত্রিকার স্টাণ্ডার্ড উন্নত এবং নিয়মিত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তবু এই প্রয়াসের কিছু মূল্য নাদিলে জাতির প্রতি পালিত তাঁদের কর্তব্যের ঋণ অস্বীকার করা হয়।

৪. প্রবাহ (১৯৬১)

'ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্য-মাসিক' হলেও প্রবাহ সাধারণ সাহিত্য-মাসিকের মতোই হয়েছিল। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কবি জসীম উদ্দীন, অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই, আবদুর রহমান খাঁ, কবি মঈনুদ্দীন প্রমুখের আশীর্বাণী নিয়ে এস. এম. রহমানের সম্পাদনায় (এবং প্রকাশনায়) ১৭৫ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও তাঁর দ্বারাই লিবার্টি প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৭/১, টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা-৩ থেকে মুদ্রিত হয়ে নিউজপ্রিন্ট কাগজে ১/১৬ সাইজের ৫২ পৃষ্ঠায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। সহকারী সম্পাদক ছিলেন কাজী নাসির উদ্দিন আহমদ ও শরফুল আজিজ। পত্রিকায় লিখেছিলেন একালের একজন বিশিষ্ট কলামিষ্ট, সম্পাদক ও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও শ্রম-সমস্যা বিষয়ের লেখক শাহ আবদুল হালিম (১৯৩৫-৮৯) (ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্য); এবং শামসুল হুদা (গল্প, কষ্টিপাথর) ; সুব্রত চৌধুরী (গল্প, স্মরণী) এবং জহিরুল হক, কাজী মাসুম, হানিফ খান, কে. এম. সালাহউদ্দীন, দিলারা আহমদ, দেওয়ান মুস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ। সম্পাদকীয়-উদ্দেশ্য ছিল ঃ পত্রিকার মাধ্যমে প্রতিভাবান তরুণস্রষ্টা শিল্পীলেখকদের প্রতিভা বিকাশের প্রচেষ্টা চালানো। ছাপার ভুল আছে। শিক্ষানবীশীর কাঁচা ছাপও আছে এর রচনাবলীতে, তবে ভাষায় ধর্মীয়ভাব আনার বা সহজ বাংলা করার কোন কোশেশ নেই। তবু কিছু ভালো লেখাও তাতে স্থান পেয়েছে,—শাহ আবদুল হালিম, (তখন ছাত্র তরুণ) এর রচনায় পাকিস্তানকে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের পাকিস্তানী তমদ্দুনের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে—

"আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে করে নবসৃষ্টির উম্মাদনায় বা কারও অপচেষ্টায় গণজীবন ও জাতীয় ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে আমাদের সৃষ্ট সাহিত্য ধ্বংসাত্মক ভূমিকা গ্রহণ না-করে।... আমাদের জীবনে শিক্ষা, আদর্শ, পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতার যে প্রভাব, জীবন সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা, এবং জীবনে দেশ ও কালের প্রভাবের বাস্তব প্রতিফলন হল আমাদের সংস্কৃতির উৎস। তাই সংস্কৃতি আমাদের পূর্ণ জীবনের সাক্ষ্য বহন করে—সাক্ষ্য বহন করে আমাদের দেশকাল, জাতি ও জীবন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা, বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের। তাই আমরা যে গান গাই, যে কবিতা লিখি, যে নাটক মঞ্চস্থ করি, যে বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করি— সেসবই হল আমাদের সংস্কৃতিবোধের বাস্তবায়ন। তাই এইগুলিকে এই প্রকাশের বা বাস্তবায়নের মাধ্যমকে সংস্কৃতি বলে অভিহিত করতে চাইলে ভুল করা হবে। কাজেই অনেক সময় দেখা যায় যে, আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে...আমাদের দেশকাল, পারিপার্শ্বিকতা, বিশ্বাস, অনুভূতি, ধ্যানধারণা ও আদর্শবাদের কোন ছাপই বহন করেনা। এগুলো বিশেষ অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রমূলক। আমাদের সৃষ্ট সাহিত্য ও শিল্পকলায় 'দারিদ্র্যের' দোহাই দিয়ে 'একভাষাভাষী ও অখণ্ড বঙ্গসংস্কৃতি' বা যাকিছু ভাল তাই গ্রহিতব্য বলে আমাদের দেশের সুস্থ সাংস্কৃতিকবোধকে পঙ্গু করে ফেলার মাধ্যমে আমাদের মানসিকতা ও জাতীয়তাবোধকে দুর্বল করে দেওয়া হয়। এই দুর্বলতা থেকেই হীনমন্যতাবোধের অগ্রগতি, শিল্প ও সাহিত্যসৃষ্টিপথে মহা অন্তরায়। আর এই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই পরমুখাপেক্ষীতা ও হীনমন্যতাবোধের মধ্যে জাতীয় উন্নতির আশা-আকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট ও আজাদী বিপন্ন হওয়ার বীজ নিহিত রয়েছে। চিন্তাশক্তির ঔদার্য ও স্বকীয়তা জাতীয় আজাদীর প্রাণস্পন্দন স্বরূপ। একে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য যে গভীর ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করা হয়েছে চারদিকে তাকে ছিন্ন করতেই হবে।'২০৮

হেমায়েত হোসেন সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'প্রবাহের' বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে। তাতে পত্রিকাটি কিছুকাল নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে বলে প্রমাণ হয়, কিন্তু সংরক্ষণের অভাবে আজ তার ইতিহাস হারিয়ে গেছে।

৫. দিগন্ত (১৯৬৬)

আজাদ পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে প্রবাসী ব্যবসায়ী-চাকরীজীবীদের দ্বারা একটি সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, তাঁরা রাজনীতি করতেন না ; কিন্তু ক্রমে তাঁরা নিজেদের হীনদশা উপলব্ধি করে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সেটা ষাটের পরের দশকের ঘটনা। ১৯৫৩-৫৮ সনে বেগম এম. ই. খান কর্তৃক মহসিন আর্ট প্রেস, ৯৯২ পিএইবি কলোনী, করাচী থেকে মুদ্রিত হয়ে ২৯ বন্দর রোড, করাচী থেকে যখন 'দিগন্ত' বাংলামাসিক সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদিত ও প্রকাশিত হতো--তখন পশ্চিম পাকিস্তানের বাঙ্গালীরা সাতন্ত্র্যবাদী হননি, বরং পাকিস্তানের সুবাদে দেশ থেকে বহুদূরে লাহোর, করাচী, পাঞ্জাব, রাওয়ালপিণ্ডিতে অবস্থানের সুযোগ পেয়ে তাঁদের অনেকেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন, সেজন্য পাকিস্তানের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্যের সীমা ছিলনা। আর তাঁরা যেনো মনে করতেন,—পাকিস্তান মানে হলো পশ্চিম পাকিস্তান। তাঁদের দেশ পূর্ব বাংলা একটা উপপাকিস্তান অথবা মূল পাকিস্তানের লেজুড় মাত্র। সেজন্য তাঁদের কাছে কায়েদে আজম, লিয়াকত এবং পাকিস্তানের অবাঙ্গালী রথী-মহারথীরা প্রতিভাত হতেন 'মহান' হিসেবে। পশ্চিমপাকিস্তানী দিগন্তের পাতা পঠন-পাঠনের পর তাই-ই মনে হয়। সদর্থক ভূমিকায় দেখতে গেলে বাংলা রচনা বহু তাঁরা মুদ্রিত করেছেন, বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন—এটাই বড় কথা।

সে-যাই হোক, পশ্চিমপাকিস্তান থেকে যে, 'দিগন্ত' প্রকাশিত হতো—তাতে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রমুখের ন্যায় তরুণ

Dhaka University Institutional Repository

কবি-সাহিত্যিকেরা বেশ লিখেছিলেন। ইবরাহীম খাঁদের মতো প্রবীণেরাও লিখেছেন। পত্রিকার সার্কুলেশন কম ছিল না। তার খ্যাতি সিলেট পৌঁছাবার কথাই। কিন্তু তারপরও সিলেটের মৌলভীবাজার থেকে কেনো আবার 'দিগন্ত' নামে পত্রিকা বের হলো বুঝা মুশকিল। তবে করচী থেকে বেগম এম. ই. খান কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত দিগন্ত তখন (১৯৬৬) চালু ছিলনা। আর পূর্ব বঙ্গের একটি প্রান্ত হিসেবে সিলেটের মৌলভীবাজার থেকে 'দিগন্ত' নাম দিয়ে পত্রিকা প্রকাশের জন্য এই নামকরণের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল বুঝিবা এই যে, দিগন্তবাসীরাও পাকিস্তানে নিশ্চুপ হয়ে বসে নেই। তাঁরাও সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে দেশের ও দশের খেদমত করতে চান। তাই তাঁদের আন্তরিকতার মূল্য আছে। আর একটি ঐতিহাকিতাও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে—সেজন্যই পাকিস্তান আমলের বাংলা সাহিত্যপত্রিকার আলোচনাকালে 'দিগন্ত'র উল্লেখ প্রাসঙ্গিকতার দাবী করতে পারে। সিলেটের দিগন্তকর্তৃপক্ষের বা এঁদের লেখক-শুভানুধ্যায়ীদের দাবি ছিল যে মৌলভীবাজার থেকে সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে এটাই তাঁদের প্রথম পদক্ষেপ।[২০৯] "মৌলভী বাজার শহর, তথা মহকুমা হইতে আজ পর্যন্ত কোনো সাহিত্য পত্রিকা বাহির হয় নাই।... (তবে) প্রায় বৎসর ত্রিশেক পূর্বে মৌলভীবাজার শহর হইতে মৌলভীবাজারবাসী দ্বিজেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয় 'অভিযান' নামে (১৯৩৫ হবে, কারণ ১৯৬৫ সনে বলা হচ্ছে ত্রিশ বৎসর পূর্বে) একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। উহা বেশ কয়েক বৎসর চলিয়াছিল। কিছু কিছু সাহিত্য বিষয়ে আলোচনাও অভিযানে থাকিত। বিশেষত শারদীয় সংখ্যাগুলি সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতায় ভরপুর থাকিত।... অতপর আর কোন সাহিত্যিক প্রচেষ্টা হয় নাই—তবে কুলাউড়া হইতে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা কিছুদিনের জন্য প্রকাশিত হয়—কিন্তু তাহার আয়ুও ক্ষীণ ছিল। পাঁচ বৎসর পূর্বে (১৯৬০?) মৌলভীবাজার শহরে সাপ্তাহিক 'অগ্রদূতের' আবির্ভাব হয়—এই পত্রিকায় সাহিত্যবিষয়ক অনেক প্রবন্ধ , গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হয়।... বর্তমানে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।... তরুণগণ আজ যে বার্ষিকী (মৌলভী বাজার থেকে দিগন্ত) প্রকাশের চেষ্টা করিতেছেন—তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হউক।"[২১০]

'দিগন্ত'র দাবী বা উপর্যুক্ত বক্তব্য যথার্থ নয়। মহকুমা পর্যায় থেকেই কেবল নয়, নাটোরের গুরুদাসপুর থানার মত একটি মফস্বল এলাকা থেকেও (বার্ষিকী হলেও) সাহিত্যপত্রিকা নিয়মিত একদশক বা যুগেরও অধিক কাল ধরে প্রকাশিত হয়েছে। যাই হোক, মৌলভীবাজার, নাটোর, দিনাজপুর, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ব্যক্তিগত বা বেসরকারী উদ্যোগের অসংখ্য সাময়িক-সাহিত্য যে প্রকাশের প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল—তার মূলে ছিল একটি নতুন দেশ, বা রাষ্ট্র পাওয়ার আনন্দানুভূতি।

দিগন্তে একাত্তরের শহীদ শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-৭১) আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন। ০৩. ০২. ১৯৬৬ তারিখে স্বাক্ষরিত বাণীতে তিনি লেখেন : "দিগন্তে আজ নতুন দিগন্তের হাতছানি ; অনেক তারার মেলা। তার সাথে যোগ দিল আর একটি তারা 'দিগন্ত'। দিগন্ত তাই ছুটে চলুক নতুন সূর্যের পানে।' দিগন্তর সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল : "মানব সভ্যতার ধারক এবং বাহক হচ্ছে তার সংস্কৃতি, আর তা হচ্ছে মানুষের বিভিন্নমুখী চিন্তাধারা, আচারআচরণ ও বিশ্বাসেরই প্রতিফলন। শুধু তাই নয়, সংস্কৃতি দেশীয় এবং জাতীয় চিন্তাধারার অভিব্যক্তিও বটে। এই মতে আস্থাবান থেকেই এই ক্ষুদ্র সাহিত্য-সংকলনটি প্রকাশ করতে প্রয়াস পেয়েছি।... দিগন্তের নিয়মিত প্রকাশনার জন্য 'তরুণ সংঘ' নামক একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা গঠন করা হয়েছে। দেশবাসীর কাছ থেকে সর্ব প্রকার সাহায্য পাবো বলেই দৃঢ় বিশ্বাস, বছর বছর যথাকালে এপত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব এতদঞ্চলের গুণীজ্ঞানীদের এবং বিশেষ করে তরুণসম্প্রদায়েরই। আশা করি তাঁরা তাঁদের ভবিষ্যত দায়িত্ব নিয়মিত এবং যথাযথভাবেই পালন করে যাবেন। আমাদের এ প্রচেষ্টার ফলে এ দেশের স্থানীয় সাহিত্যিকগণ এবং অন্যান্যরা যদি কিছুমাত্র লাভবান হন, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।"

পত্রিকাটি প্রকাশের নেপথ্যে সাহায্য করেছিলেন একজন বিশিষ্ট স্কুল-শিক্ষক আবদুল ওয়াহাব চৌধুরী এবং প্রখ্যাত কবি দিলওয়ার। দিলওয়ার 'দিগন্তবাণী' শিরোনামে একটি কবিতাও লিখেছিলেন : 'দূর দিগন্ত কোন্ কথা কয় শোনো/ সুদূর প্রসারী মনের চিবুক ছুঁয়ে/হে সাথী, তোমরা রশ্মির জাল বোনো, ধূসর বেদনা উষর মরুতে ধুয়ে।/; ..... দিগন্তে আনে হৃদয়ের বিস্তার : /ডোবা চেতনায় ছড়ায় সিন্ধুসাধ ; চলে বুঝি তাই সি-গাল এর অভিসার,/ ঘোচে সীমালীন প্রজ্ঞার অপবাদ।/'[২১১]

পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আবদুল কাদির মাহমুদ। সহ-সম্পাদক ছিলেন নজরুল ইসলাম। উপদেষ্টা পরিষদে ছিলেন : সৈয়দ মোস্তফা আলী (অবৈতনিক হাকিম) ; আবদুল ওয়াহাব চৌধুরী বি.এ. বিটি ; শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ অর্জুন (শিক্ষক) ; বোরহানউদ্দীন খান (কার্যকরী সম্পাদক মৌলভীবাজার পাবলিক লাইব্রেরী) ; বিভাগীয় সম্পাদনা পরিষদ ; এন আই আজিজুল হক ইকবাল (গল্প) ; সৈয়দ এ. কে. রিয়াজুদ্দীন আলী (প্রবন্ধ) ; এস. এম. জামান ; গাজী গোলাম সরওয়ার হাদি (কবিতা) ; দেওয়ান সুয়েল আফজাল, সৈয়দ নেছার আহমদ ও সফিকুল হক চৌধুরী (বিবিধ) প্রমুখ। দিগন্ত সুরমা প্রিন্টার্স, জিন্দাবাজার, সিলেট থেকে মুদ্রিত হতো। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৬। মূল্য এবং প্রচ্ছদ শিল্পীর নামোল্লেখ নেই। পত্রিকাটি কতোদিন বেরিয়েছিল অনুসন্ধানে জানা যায়নি।

৬. অভিযান (১৯৫৪-৬৪)

তৎকালীন নাটোর মহাকুমার অন্তর্গত গুরুদাসপুর থানা থেকে নিয়মিত প্রায় একযুগ ধরে প্রকাশিত হয়েছিল বার্ষিক 'অভিযান'। পত্রিকাটির সাহিত্যকৌশল্পিক স্টাণ্ডার্ড খুব উন্নত না-হলেও উদ্যোগের বলিষ্ঠতা এবং আন্তরিকতার মহানুভবতায় এটির মূল্য যেমন আছে, তেমনি একটি সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্যগুরুত্ব আছে। কারণ থানা থেকে প্রকাশিত পত্রিকার নমুনা ঐকালে পাওয়া ভার। সামাজিক দিক থেকে এঁরা সরকারী প্রশ্রয়পুষ্ট ছিলেন বলে প্রগতিশীল ব্যতিক্রমী চিন্তাধারার পরিচয় এতে পাওয়া যাবেনা। কারণ তাঁরা নিজেরাই বলেছেন : গুরুদাসপুর থানা শিক্ষা-সংঘ 'রাজনীতির সহিত সম্পর্ক বিহীন একটি শিক্ষা, কৃষ্টি ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান।' সরকারের কর্মকর্তাদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ও

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক ধ্যান-ধারণা তথা ইসলামী প্রজাতন্ত্রর মুসলিমতমদ্দুন প্রচারের ব্রত নিয়ে এটি সংগঠিত হয়। তাঁদের ঘোষণা ছিল ঃ "এলাকার শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ, যুবক, ছাত্র ও বিদ্যোৎসাহী সমাজকর্মীদের সমবায়ে ১৯৫৪ সনের ২৮ মে এই সংঘ (গুরুদাসপুর থানা শিক্ষা সংঘ) গঠিত হয়। বর্তমানে রাজশাহী পাবনা চলনবিল এলাকার বিভিন্ন থানার অনেকেই এই সংঘের সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। হিন্দু-মুসলিম জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যে কোন স্থানের যে কোন ব্যক্তি এই সংঘের সদস্য হইতে পারেন।" উপর্যুক্ত সংঘের মুখপত্ররূপে 'অভিযানের' প্রথম বার্ষিক সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সনে। পত্রিকার 'পরিচিতি'তে বলাহয় ঃ 'অভিযান .... সংঘের বার্ষিক পত্রিকা।...সংঘের সদস্য, পৃষ্টপোষক, হিতাকাঙ্ক্ষী ও অভিযাত্রীর শিবিরের ভাইবোনদের লেখা অভিযানে গৃহীত হয়।... সমাজসেবার মহানব্রত নিয়ে অভিযানের পদক্ষেপ। দেশের অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ; দুর্নীতি প্রভৃতি বিদূরিত করিয়া কালিমামুক্ত আদর্শসমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করাই অভিযানের উদ্দেশ্য। অভিযান বিক্রয়-লব্ধ অর্থদ্বারা অভাবগ্রস্ত ছাত্রদের সাহায্য তহবিলই পুষ্ট হয়।...এতদ্ব্যতীত নৈশবিদ্যালয়, দাতব্যচিকিৎসালয়, পাঠাগার পরিচালনা এবং অন্যান্য সমাজসেবামূলক কাজে সংঘ সাধ্যমত চেষ্টিত আছে। সংঘের কাজে মুগ্ধ হইয়াই দেশ-বিদেশের অনেক মহাপ্রাণবিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অনেক সাহায্য করিয়াছেন।"[১১২]

অভিযানের সম্পাদক ছিলেন মোঃ আকবর হোসেন বিএ ; এম. আর পোদ্দার কর্তৃক মুদ্রিত হতো নাটোর টাউন প্রেস রাজশাহী থেকে। প্রকাশক ঃ এম. এ. হামিদ। মূল্য ১ টাকা। অভিযানের শীর্ষে লেখা ছিল 'পাকিস্তানে নবযুগ প্রবর্তনে'। অভিযানের লেখকসূচীতে তাই বলে ভালো ভালো লেখকদের নামও দেখা যায়। বিষয়বস্তু ও চিন্তাধারায় সমাজের সমকালীন চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। মুফাখ্খারুল ইসলাম, আ.ক.শ নূর মোহাম্মদ, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আখতার উল আলম, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, গোলাম সাকলায়েন, সৈয়দ মোর্তজা আলী প্রমুখ লেখকদের রচনাও এতে থাকতো। সংক্ষেপে মন্তব্য হলো—পরিচ্ছন্ন ছাপায় উত্তরবঙ্গের ঐ এলাকায় কিশোর, তরুণ, শিক্ষা ও সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি-অনুরাগীদের রচনায় সাদা কাগজে, প্রায় দেড়শ পৃষ্ঠার আকারে অভিযান প্রতিবছর প্রকাশিত হয়ে দীর্ঘ ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল। আজও তুলনামূলকভাবে উন্নত সমাজব্যবস্থায় বাংলাদেশের কোন অঞ্চল বা প্রতিষ্ঠান থেকে দীর্ঘ একদশক বা যুগব্যাপী একটি সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যেখানে কষ্টকর এবং অনেক সময়ই অসম্ভব হয়ে দেখা দেয়—সেখানে ৪০ বৎসর পূর্বে গুরুদাসপুর এর ন্যায় একটি অজপাড়াগাঁ থেকে যে তা সম্ভব করে তুলেছিলেন কতিপয় সংস্কৃতিপ্রেমী— পাকিস্তানবাদী ধ্যানধারণার অনুকূলে চিন্তা করলেও তার অসাধারণ মূল্য আছে।

তথ্যপঞ্জি :

১. পত্রিকার ২১ বর্ষ ১ সংখ্যার সূচী থেকে ৬৮ বর্ষ ৮ সংখ্যার সূচীপত্র অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে যাঁরা কবিতা লিখেছেন, তাঁদের নাম পর্যায়ক্রমে উল্লেখপূর্বক তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে ১৯৪৭ সনে কারা লিখতেন আর ১৯৭০ সনে কারা আসছেন বুঝা যায়। নাটক, উপন্যাস এবং গল্পগুলোও অনুরূপভাবে, পত্রিকার প্রথম থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধগুলোর ক্ষেত্রে ব্যাপকতার কারণে যাতে বুঝতে সহজ হয় সেজন্য বর্ণানুক্রমিকতা অনুসৃত হয়েছে

২. মাসিক মোহাম্মদী, ২০ বর্ষ ১২সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫৪, পৃ ১০৩১

৩. পূর্বোক্ত, বর্ষ ২১, সংখ্যা ১১, ভাদ্র, ১৩৫৭, পৃ ৬৮৩-৮৪

৪. আহমদ শরীফ, বাংলা সাহিত্যের মুসলিম ধারায় হিন্দুপ্রভাব, পূর্বোক্ত, ২৩ বর্ষ ৩ সংখ্যা, (সাহিত্য প্রসঙ্গ) পৌষ ১৩৫৮, পৃ ১৮০-৮২

৫. মাসিক মোহাম্মদী, 'সহযোগী সাহিত্য' বিভাগ, ২৪ বর্ষ ১ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৯, পৃ ৮৭-৮৯

৬. মোহাম্মদীর এইসব আলোচনায় ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের নামের বানান বারবার 'মোতাহের' লেখা হচ্ছে। ডক্টর কে ডাক্তার লিখছেন অবশ্য 'ডক্টর' কে 'ডাক্তার' বলা বা লেখার রেওয়াজ আগে ছিল. এটা তাঁদের নিন্দার দিক। এমন ভুল করা উচিত নয়। সাহিত্যে বিরোধীপক্ষের কবি-সাহিত্যিকের নামও শুদ্ধ করে লেখার মহান ট্রেডিশন থাকা সত্ত্বেও এমনভাবে বিকৃত বানানে লেখা মোহাম্মদীর লেখকদেরকেই হীনমন্যতায় পেয়ে আছে বলে ভাবতে কষ্ট হলেও, না ভেবে উপায় নেই। 'তুমি অধম হইবে বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?'

৭. মাসিক মোহাম্মদী, ২৪ বর্ষ ১ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৯, পৃ ৮৯-৯০

৮. পূর্বোক্ত, ২৪ বর্ষ, ২ সংখ্যা, পৃ ১৬৯-৭০

৯. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, ভাষা ও সাহিত্যের সংস্কার, পূর্বোক্ত, ২৪ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৯, পৃ ২৫৩-৫৯

১০. পূর্বোক্ত, মাঘ ১৩৫৯, পৃ ৩৩১

১১. নূরুল ইসলাম খান, পূর্ব বাংলার সাহিত্য, পূর্বোক্ত, ২৪ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৬০, পৃ ৮৮৫-৮৬

১২. পূর্বোক্ত, সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য, পূর্বোক্ত, ৩৮ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭৪, পৃ ৪৮৪

১৩. পূর্বোক্ত, ২৫ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬১, পৃ ৫৩৪-৩৭

১৪. ডক্টর শহীদুল্লাহ, মুসলিম বিজয় ও বাংলা সাহিত্য, পূর্বোক্ত, ৩৮ বর্ষ, ২-৪ যুগ্ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-মাঘ ১৩৭৩, পৃ ৬১

১৫. ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, ক্রান্তিকাল, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৩

১৬. ডক্টর আনিসুজ্জামান, মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে মুসলমানদের দান, পূর্বোক্ত, পৃ ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

১৭. আবদুল গাফফার চৌধুরী, বর্ণমালা সংস্কার না সংহার?, পূর্বোক্ত, ৩৯ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৭৫, পৃ ৭৬৫-৭৮২

১৮. আবদুল হামিদ, সাময়িক প্রসঙ্গ— বাংলা ভাষা সংস্কারের অন্তরালে, পূর্বোক্ত, ৩৯ বর্ষ, ১৩-১৪ সংখ্যা কার্তিক অগ্রহায়ণ ১৩৭৫, পৃ ৯০৫-৭

১৯. আবুল কাসেম ফজলুল হক, রূপান্তরের মুখে আমাদের সাহিত্য, পূর্বোক্ত, ৬৭ বর্ষ, ১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৭৬ (এপ্রিল ১৯৬৯) পৃ ১-৯

২০. ডক্টর আনিসুজ্জামান, মওলানা আকরম খাঁ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক, পূর্বোক্ত, ৩৯ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭৫, পৃ ৫১৬

২১. আবদুল হক, মুসলিম সমাজ কোন্‌পথে?, পূর্বোক্ত, ২৩ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৯, পৃ ৬৪৯-৫২

২২. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আমাদের সাংস্কৃতিক সমস্যা ('চিন্তাধারা') ; পূর্বোক্ত, ২৪ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬০, পৃ ৭১৭-২০

২৩. ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, আমাদের সমাজ সংস্কৃতি ও ধর্ম; পূর্বোক্ত, ৩৯ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, মাঘ ১৩৭৫, পৃ ১০০৭-১০

২৪. রণেশ দাসগুপ্ত, শিল্পে ও সাহিত্যে জনগণের ভূমিকা, পূর্বোক্ত, ৩৯ বর্ষ ১২ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৭৫, পৃ ৭৮৩-৮৪

২৫. সম্পাদকীয় ('আলোচনা') পূর্বোক্ত, ২১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা পৌষ ১৩৫৬, পৃ ২০০

২৬. এম. এন. রায়ের The Historical role of Islam এর থেকে 'ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা' নামে অনুবাদ করেন মুহম্মদ আবদুল হাই, পূর্বোক্ত, ২১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৪, পৃ ২৭

২৭. এ. এ. রেজাউল করিম, পাকিস্তানের সংস্কৃতি ও পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্য, পূর্বোক্ত, ২১ বর্ষ ৩ সংখ্যা পৌষ ১৩৫৬, পৃ ১৫১

২৮. এ. কে. বজলুল হক, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা, পূর্বোক্ত, ২১ বর্ষ ৬ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৫৬, পৃ ৩৫৯

২৯. মোস্তফা দৌলত, সমাজতন্ত্র ও পাকিস্তান, পূর্বোক্ত, ৩৬ বর্ষ, ২ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৭১, পৃ ৭১

৩০. এ. এফ. এম. গোলাম কিবরীয়া, ধর্মের প্রয়োজন, পূর্বোক্ত পৃ ৮২

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ ৮৪

৩২. মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, সমাজকল্যাণ ও ইসলাম, মোহাম্মদী, ৩৬ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, পৌষ ১৩৭১, পৃ ২৪৭

৩৩. হাফিজ মোহাম্মদ, বর্তমান পৃথিবীতে এছলামী জীবনদর্শনের ভূমিকা, পূর্বোক্ত, ৩৬ বর্ষ ৫ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৭১, পৃ ৩২৭

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ ৩২৮

৩৫. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, এছলামের আদর্শ, পূর্বোক্ত, ৩৮ বর্ষ ২-৪ যুগ্ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ সংখ্যা ১৩৭৩, পৃ ১-২

৩৬. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাচীন ভারতে গোবধ ; পূর্বোক্ত, ৩৮ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪, পৃ ৪০৩

৩৭. মুহম্মদ আলী আজম, বয়স্ক শিক্ষার কার্যক্রম রূপায়ণে, পূর্বোক্ত, ৩৯ বর্ষ ১৬ সংখ্যা, মাঘ ১৩৭৫, পৃ ১০২৯

৩৮. অধ্যাপক মুহম্মদ হজরত আলী, শিক্ষক ও সমাজ, পূর্বোক্ত, পৃ ১০৬৬

৩৯. অধ্যক্ষ মুখলেসুর রহমান, আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব, পূর্বোক্ত, ৩৯ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৭৫, পৃ ১০৭৭

৪০. ওবায়েদ উল হক, আমাদের স্টাণ্ডার্ড বনাম ঈমান, পূর্বোক্ত, পৃ ১০৯৩

৪১. মেসবাহ উদ্দীন আহমেদ, দেশের সংকটময় পরিস্থিতিতে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা, পূর্বোক্ত, পৃ ১১৫৪

৪২. ড. এ. এম. হারুনুর রশীদ, পরিবর্তন, পূর্বোক্ত, ৬৮ বর্ষ, ২-৩ সংখ্যা, পৃ ১৩০

৪৩. মুহাম্মদ রেজাউল করিম (সুধা), আমাদের শিক্ষা ও ইহার আদর্শিক পুনর্গঠন, পূর্বোক্ত, ৩৯ বর্ষ ১৮ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৭৫, পৃ ১২০৩

৪৪. এস. এম. ইদরিস, পুষ্টিহীনতা ও প্রতিকার, পূর্বোক্ত, ৩৬ বর্ষ, ৩ সংখ্যা ১৩৭১, পৃ ১০০০

৪৫. অধ্যাপক এস. এম. আলী হায়দার চৌধুরী, পাকিস্তানের খাদ্যসমস্যা, পূর্বোক্ত, ২১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, পৃ ১৫৯

৪৬. আবুল হাশিম, মওলানা সম্পর্কে দুটি কথা, পূর্বোক্ত, ৩৯ বর্ষ ৯ (বিশেষ) সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭৫, পৃ ৫৩৪

৪৭. আল ইসলাহ ১১ বর্ষ ১ সংখ্যা বৈশাখ ১৩৫৬, মে ১৯৪৯ সংখ্যায় বলা হয় 'দীর্ঘ এক বৎসর নীরবতার পর আল ইসলাহ পুনঃ প্রকাশিত হল... ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ নতুন রাষ্ট্রের এক প্রান্তে এক মফস্বল শহরে বসে কাগজ জোগাড় করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়েছিল। অনেক সাধ্যসাধনার পরে এবং অনেক বিলম্বে হলেও—কাগজ পেতে সমর্থ হয়েছি (পৃ. ৩৬)'

৪৮. আল ইসলাহ, ৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪৫

৪৯. পূর্বোক্ত, ৬ বর্ষ ৯-১০ সংখ্যা, ১৩৪৬

৫০. গণভোটের তারিখ ছিল ৬ ও ৭ জুলাই ১৯৪৭। পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে ২৩৯৬১৯ এবং বিপক্ষে (ভারতে থাকার পক্ষে) ভোট পড়ে ১৮৪,০৪১ টি। পাকিস্তানবাদীরা বেশী ভোট পান ৫৫৫৭৮ টি। সূত্র ঃ আল ইসলাহ শ্রাবণ ১৩৫৪ (১০/৪) সংখ্যা

৫১. ডঃ নুরুর রহমান খান, বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা-চেতনা রাষ্ট্রভাষাচিন্তা ও সৈয়দ মুজতবা আলী, নিবন্ধমালা, তৃতীয় খণ্ড, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭, পৃ ১২১

৫২. মুহম্মদ মুসলিম চৌধুরী, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, আল ইসলাহ ১০ বর্ষ, ৭ সংখ্যা কার্তিক ১৩৫৪, পৃ ২২২-২৩৩। প্রবন্ধটি কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের (সিলেট) ১১ বর্ষের ২ সভায় ৯/১১/৪৭ খ্রীস্টাব্দে পঠিত হয়

৫৩. মাহবুব উল আলম, আব্বাসউদ্দীন, আল ইসলাহ, ১১ বর্ষ, ৭-১২ সংখ্যা, কার্তিক-চৈত্র ১৩৫৬, পৃ ৩১৮-২০

Dhaka University Institutional Repository

৫৪. ছাব্বিশ বর্ষের সংখ্যাগুলোর রচনা সবই হজরত শাহজালাল এর ওপর। সম্পাদক মুহম্মদ নূরুল হক সিলেটের পল্লীকবিগণএর বিস্তৃত ইতিহাস এতে সংকলিত করেছেন। শ্রীহট্টের ইতিহাস নিয়ে লিখেছেন অনেক লেখক। একটি অঞ্চলের অজানা ইতিহাস প্রণয়নের গুরুদায়িত্ব আল ইসলাহ সম্পন্ন করেছে বলে স্বীকার করতে হবে। সিলেটের ইতিহাস পূর্বেকার আসামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল—একথা মনে করলে সাতচল্লিশ পরবর্তীকালের সাধনার স্বতন্ত্র মূল্য স্বীকৃত হবে

৫৫. মাহেনও, ১ বর্ষ ৬ সংখ্যা ভাদ্র ১৩৫৬, পৃ ৫৪

৫৬. দীর্ঘ ২৩ বছর (প্রায়) ধরে ২৭৫ টি সংখ্যায় নিয়মিতলেখকেরা প্রতিমাসে অথবা এক দু'তিন মাস পরে পরে লিখেছেন। যাঁরা শিশু ছিলেন ১৯৪৯ সনে, ষাট দশকে তাঁরা লেখক হয়ে মাহেনওএ লেখা দিয়েছেন। সংখ্যার ধারাক্রম অনুসারে নতুন লেখকদের নাম একবার করে লেখা হয়েছে। লেখকদের আগমনের সময় অনুসারে নাম আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এই জ্যেষ্ঠতা কেবল 'মাহেনও' এর লেখক হিসেবে অনুসরণযোগ্য

৫৭. আমাদের গোজারেশ, মাহেনও, ১বর্ষ ৭ সংখ্যা আশ্বিন ১৩৫৬

৫৮. পূর্বোক্ত, ৮ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৬, পৃ ৫২-৫৪

৫৯. পূর্বোক্ত

৬০. পূর্বোক্ত, পৃ ৫৫

৬১. পূর্বোক্ত, ৯ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৬

৬২. ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আমাদের কওমী যবান—আবরী; পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ ১০ সংখ্যা পৌষ ১৩৫৬, পৃ ৩

৬৩. আমাদের গোজারেশ, পূর্বোক্ত, পৃ ৫৫

৬৪. আবুল ফারাহ, আবরীভাষা, পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ ৯ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৫৬, পৃ ৫৩

৬৫. মীজানুর রহমান, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার নাম, পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ ৫ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫৬, পৃ ৯৪

৬৬. মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহার, উত্তরাধিকার : পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ ২ সংখ্যা বৈশাখ ১৩৫৬, পৃ ৪৭

৬৭. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, পাকিস্তানে শিল্পসাহিত্যের সম্ভাবনা, পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ ৩ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, পৃ ৫

৬৮. আবদুল ওয়াজেদ, সাহিত্যে পাকিস্তান, পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ ৪ সংখ্যা আষাঢ় ১৩৫৬, পৃ ৫২

৬৯. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, নয়া-জিন্দেগী, পূর্বোক্ত, ১বর্ষ ৫ সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৫৬, পৃ ৯

৭০. ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, বাংলাসাহিত্যের অতীত ও বর্তমান, পূর্বোক্ত, পৃ১১২

৭১. সৈয়দ আলী আহসান, পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃ ১১৮

৭২. সৈয়দ আলী আহসান, পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাসাহিত্যের ধারা, পূর্বোক্ত ৩ বর্ষ ৫ সংখ্যা, আগস্ট ১৯৫১, পৃ ৫০-৫৪

৭৩. আবু জাফর শামসুদ্দীন, পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যের ভূমিকা, পূর্বোক্ত ৫ বর্ষ ১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬০, পৃ ৫৩

৭৪. মাহেনও ৪ বর্ষ ১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৯, এপ্রিল ১৯৫২, পৃ ৪৫-৪৮

৭৫. আমাদের গোজারেশ, পূর্বোক্ত,৪ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৫৩, পৃ ৫৬

৭৬. মাহেনও, ৪ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৫৩র 'আমাদের জাতীয়তা' শীর্ষক সম্পাদকীয় এবং মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচিত 'নতুন সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

৭৭. সিদ্দিক আহমদ খান, আজকের সাহিত্য, পূর্বোক্ত, ২ বর্ষ ২ সংখ্যা, মে ১৯৫০, পৃ ৫৩

৭৮. মোহাম্মদ মোদাব্বের, পূর্ববাংলা সাহিত্যের ধারা (শিশু সাহিত্য), পূর্বোক্ত, ২ বর্ষ ১১ সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৫০, পৃ ৩৪

৭৯. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আমাদের হুঁশিয়ারী , পূর্বোক্ত, ৬ বর্ষ ৫ সংখ্যা, পৃ ৭৪

৮০. আবদুল ওয়াজেদ খান চৌধুরী, পূর্বপাকিস্তানের মাধ্যমিকশিক্ষা-সমস্যা, পূর্বোক্ত, ২ বর্ষ ৯ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৫০, পৃ ৫০

৮১. আবদুর রহমান, শিক্ষার সংস্কার, পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ ৪ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৫৬, পৃ ২৬-২৭

৮২. মাহেনও, মার্চ ১৯৫০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

৮৩. সৈয়দ সাজজাদ হোসায়েন, নূতন অবস্থায় ইতিহাস, পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ ১২ সংখ্যা, মার্চ ১৯৫০, পৃ ২-৩

৮৪. আবদুল হক, কেন্দ্রীয় সরকার ও পূর্ব পাকিস্তান, পূর্বোক্ত ৩ বর্ষ ১২ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৫৮, পৃ ২১-২৫

৮৫. আমাদের গোজারেশ ('পাকিস্তানের বাজেট'), পূর্বোক্ত, ৬ বর্ষ ১ সংখ্যা এপ্রিল ১৯৫৪, পৃ ৫৬

৮৬. পূর্বোক্ত

৮৭. মাহেনও, বৈশাখ ১৩৫৬, পৃ ৩

৮৮. পূর্বোক্ত (সম্পাদকীয়), ১ বর্ষ ১ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৫৫

৮৯. শামসুর রাহমান, আজাদ পাকিস্তান, মাহেনও, ২৩ বর্ষ ৪ সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৭৮, পৃ ৩১। এই কবিতাটি রেডিও পাকিস্তানেও তিনি পাঠ করেন। কবিতার পাদটীকায় লেখা আছে 'রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা থেকে প্রচারিত'

৯০. ফররুখ আহমদ, আজাদ পাকিস্তান, পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৯১. পাকিস্তান পাবলিকেশনস থেকে ইংরেজীতে প্রথমশ্রেণীর ত্রৈমাসিক প্রকাশিত হতো—নাম Pakistan. আরবী পত্রিকা ছিল 'আলবশীর' উর্দু 'মাহেনও' এবং বাংলা 'মাহেনও' ছাড়া আরো একটি বার্ষিক পত্রিকা ছিল 'Pakistan. সরকারী নিয়ন্ত্রণে আরও পত্রিকা থাকলেও এগুলো ছিল সাহিত্যপত্রিকা।

৯২. জনাব আতোয়ার রহমান ১৫.২.১৯৯৪ তারিখে বলেন, তিনি দিলরুবায় গল্প লেখার জন্য ১০ টাকা সম্মানী পেতেন। তবে সকলকে দেয়া হতোনা। লেখা প্রকাশের পর পত্রিকার কপি সংগ্রহ করতে গেলে কাদের সাহেব বলেন, আগে বিজ্ঞাপনদাতাদের দিয়ে নিতে হবে; পরে লেখকদের কপি সরবরাহ করা হবে। আতোয়ার রহমান এতে ক্ষুব্ধ হন। কারণ, শুধু বিজ্ঞাপন দিয়ে পত্রিকা চলেনা ; আবার শুধু লেখাও প্রকাশ করা যায় না। চাই দুটোর মধ্যে সুসামঞ্জস্যবিধান। কখনও কখনও সম্পাদকেরা অর্থকড়ি বিষয়ের প্রতি বেশী মনোযোগী হয়ে পড়লে লেখকদের প্রতি (বা সাহিত্যের প্রতি) শ্রদ্ধা ক্ষুন্ন হয়। এঅবস্থায় সাহিত্যপ্রকাশ সাহিত্যসেবা বা সংস্কৃতি সাধনার ন্যায় মহৎ দেশেরকাজের পরিবর্তে, 'সাহিত্য বা সংস্কৃতি ব্যবসায়ে' পরিণত হয়। সম্মানী যে সকলকে দেয়া হতো না তার প্রমাণ সম্পাদকীয়তে বারবার বলা হয়েছে লেখকদেরকে সম্মানী দিতে পারেননা বলে পত্রিকার মান ধরে রাখা যাচ্ছেনা। দ্রষ্টব্য দিলরুবার দশম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়, পৃ ৫৬

৯৩. সম্পাদকীয়, দিলরুবা, ১ বর্ষ ১ সংখ্যা বৈশাখ ১৩৫৬

৯৪. 'আমাদের কথা' (সম্পাদকীয়) পূর্বোক্ত, ৩ বর্ষ ১ সংখ্যা বৈশাখ ১৩৫৮, পৃ ৫৪

৯৫. পূর্বোক্ত

৯৬. পূর্বোক্ত

৯৭. পত্রিকার কালানুক্রম অনুযায়ী প্রথম থেকে উল্লেখযোগ্য লেখকদের নাম একবার করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বলা দরকার লেখকদের বয়স এখানে অনুসৃত নয়

৯৮. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, পূর্বপাকিস্তানের সাময়িকপত্র, আমাদের সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ ২৪১

৯৯. দিরুবার দ্বিতীয় বর্ষ ৩য়-৪র্থ (আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৫৭) যুগ্মসংখ্যায় বলা হয় আগামী ভাদ্র সংখ্যা থেকে মহিলাদের 'মহিলা মহল' ও শিশুদের জন্য 'সবুজ সংঘ' খোলা হবে। দ্বিতীয় বর্ষ পঞ্চম ভাদ্র ১৩৫৭ সংখ্যা থেকে 'ঘরণী' (মহিলাদের) ও 'সবুজ সংঘ' খোলা হয়। এতে ছোটদের উপযোগী বড়দের রচনা এবং ছোটদের জন্য শিশু কিশোরদের লেখাও প্রকাশ করা হয়. 'ছায়ালোক' খোলা হয় তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে।

১০০. আহমদ শরীফ, ইসলামে নারীর মর্যাদা, দিলরুবা, ১৩বর্ষ ১১ সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৬৮, পৃ ১৯

১০১. আমাদের কথা, পূর্বোক্ত, ৩ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৮, পৃ ৭৮০

১০২. পূর্বোক্ত, ১৩ বর্ষ ১১ সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৬৮, পৃ ৫৬

১০৩. পূর্বোক্ত, ৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৫৮, পৃ ৩৩৯-৪০

১০৪. পূর্বোক্ত, ৩ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৫৮-র আমাদের কথা (পৃ ২১৩-১৫) দেখা যেতে পারে।

১০৫. ১০০ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য, পৃ ৩৩৮-৩৯

১০৬. পূর্বোক্ত, ৩ বর্ষ ৯ সংখ্যা, পৃ ৬৪১-৪২

১০৭. পূর্বোক্ত, ৪ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৯, পৃ ৫৩০

১০৮. সম্পাদকীয়, নওবাহার, ২ বর্ষ ১ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৭, পৃ ৪৮

১০৯. পূর্বোক্ত, ৩ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৫৯, পৃ ৩৮৮-৩৯১

১১০. পূর্বোক্ত

১১১. পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭, পৃ ৬২৮

১১২. পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৭ সম্পাদকীয় আলোচনা দ্রষ্টব্য

১১৩. পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫৬, পৃ ৪৪৮

১১৪. পূর্বোক্ত, পৃ ৪৪৫

১১৫. সম্পাদকীয়, পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ ৬ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৬, পৃ ১৯০-৯২

১১৬. নওবাহার ১ বর্ষ ৫ সংখ্যা, পৌষ ১৩৫৬, পৃ ৩৩৪

১১৭. মাহেনও, ২ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, পৌষ ১৩৫৭, পৃ ২৮৭

১১৮. লেখক-তালিকা পত্রিকার সূচীপত্র অনুসারে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে প্রস্তুত করা হয়েছে

১১৯. অধ্যাপক জমীর উদ্দীন আহমদ, বঙ্কিম কি শিল্পী?, নওবাহার ২ বর্ষ, ২ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫৭

১২০. আহমদ শরীফ, পাকিস্তানের সাহিত্যের আদর্শ, পূর্বোক্ত, ২ বর্ষ ৮ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৫৭, পৃ ৪১৩-১৪

১২১. পূর্বোক্ত, বাংলাসাহিত্যের হিন্দুইতিহাসকার ও মুসলমান, পূর্বোক্ত, ৪ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫৯, পৃ ১৫৬

১২২. তাহজিব (সম্পাদকীয়), ১ বর্ষ ২ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭

১২৩. চরিতাভিধান, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫, পৃ ২৮০

১২৪. সম্পাদকীয়, তাহজিব, ১ বর্ষ ১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৭

Dhaka University Institutional Repository

১২৫. পূর্বোক্ত

১২৬. তরীকুল আলম লিখিত মুকতির সমালোচনা প্রকাশিত হয় তাহজীবের ১ বর্ষ, ৬ সংখ্যা ১৩৫৭-র আশ্বিনএ, পৃ ৩৯১

১২৭. হাসান হাফিজুর রহমান, পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের ভূমিকা, তাহজিব ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৭, পৃ ৩৮

১২৮. দ্যুতি ('কৈফিয়ত'), সম্পাদক আরেফ আলী, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৬, পৃ ৩৩

১২৯. পূর্বোক্ত ('আমাদের কথা')

১৩০. মোহাম্মদ মোদাব্বের, আমাদের ভবিষ্যত সংস্কৃতি, পূর্বোক্ত, পৃ ১৭

১৩১. অধ্যাপক অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী, স্বাধীনতার অর্থ, পূর্বোক্ত, পৃ ৯

১৩২. দ্যুতি, (উপরোক্ত), ১ বর্ষ ১ সংখ্যা ভাদ্র ১৩৫৬, পৃ ১০

১৩৩. রেজোয়ান হোসেন সিদ্দিকী, পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক উদ্যোগ, পাণ্ডুলিপি ৫ খণ্ড, ১৩৮২ ; সম্পাদক আনিসুজ্জামান, বাংলাসাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ ৫৩

১৩৪. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারকালে জানা যায়

১৩৫. রেজোয়ান হোসেন সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত, পৃ ৮৯

১৩৬. অন্নদাশংকর রায় এর পত্র দ্যুতির প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যায় (ভাদ্র ১৩৫৯) প্রকাশিত হয়।

১৩৭. দ্যুতির প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার 'বিতর্কিকা' বিভাগের শিরোনাম ছিল 'নতুন অধ্যায়'। সম্পাদক বলেন : 'দ্যুতির 'বিতর্কিকা' শীর্ষক ফোরামে বিভিন্নমতের আলোচনা-সমালোচনা পত্রস্থ করা হবে। সেই অনুসারে এবার শ্রীযুক্ত অন্নদাশংকর রায়ের 'নতুন অধ্যায়' প্রকাশ করা যাচ্ছে। বলাবাহুল্য, আমরা এ নিবন্ধে প্রকাশিত অনেক মন্তব্যের সহিত একমত নই। আমরা বিশ্বাস করি, এতে প্রকাশিত অনেক মন্তব্যই ইসলাম ও মুসলিম-মন সম্পর্কে ভ্রান্তধারনা প্রসূত।'

১৩৮. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, অসূয়া, দ্যুতি, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫৮, পৃ ১২-১৩

১৩৯. দ্যুতি, পূর্বোক্ত, সম্পাদকের দৃষ্টিতে, পৃ ৬০

১৪০. পূর্বোক্ত, পৃ ৬১

১৪১. পূর্বোক্ত

১৪২. সাইদ-উর রহমান এর 'পূর্ববাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা' শীর্ষক গ্রন্থে (পৃ ৩৭-৩৮) বলা হয়েছে : 'সম্মেলনটি সমাজবিজ্ঞান, ইসলামীআন্দোলন, লোক-সংস্কৃতি, সাহিত্যঅধিবেশন ও বিচিত্রানুষ্ঠান—এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকার কয়েকজন এবং সিরিয়ার একজন প্রতিনিধি এতে অংশ নেন।'

১৪৩. দ্যুতি, ১ বর্ষ ৮ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৯, পৃ ৪২৩ (সম্পাদকের দৃষ্টিতে)

১৪৪. আহমদ ফরিদ উদ্দীন, আধুনিক মন (প্র), ১ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, (শ্রাবণ ১৩৫৯), পৃ ২৪৪।

১৪৫. সৈয়দ বদরুদ্দীন হুসেন, সাহিত্যের নবজন্ম (প্র) ; দ্যুতি, ১ বর্ষ ১১ সংখ্যা আশ্বিন ১৩৫৯, পৃ ৩৭১

১৪৬. দ্যুতি, ১ বর্ষ ১১ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৯, সম্পাদকীয়

১৪৭. অন্নদা শংকর রায়, নতুন অধ্যায়, দ্যুতি, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, পৃ ৫৫-৫৯

১৪৮. আবদুল গফুর, নুরুল আফছার, মীর আবুল হোসেন, ওমর কোরায়শী প্রমুখের আলোচনাগুলো ছাপা হয় ১ বর্ষ ২-৫ সংখ্যায়। সম্পাদক পঞ্চম সংখ্যায় বিতর্ক বন্ধ করে দেন।

১৪৯. আলবার্ট আইনস্টাইনের Out of my letter years গ্রন্থের A massage to the intellectuals শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবাদ করেন সানাউল্লাহ নুরী। প্রকাশিত হয় দ্যুতির প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫৮তে ; পৃ ৩৮

১৫০. দ্যুতি (সংস্কৃতি-সংবাদ), ২ বর্ষ, ১০-১১ সংখ্যা, ১৩৬০ প্রতিবেদনটি লিখেছিলেন নুরুল আলম

১৫১. কষ্টিপাথরকৃত সংলাপের সমালোচনা প্রকাশিত হয় 'লেখক সংঘ পত্রিকা'র ১ম বর্ষ ৪ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৬৮ সংখ্যায়। গোলাম মোস্তাফা তখন সম্পাদক; তাঁর অনুপ্রেরণা কিংবা নিজস্বপ্ররোচনায় কেউ লিখে থাকবেন এটি। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর প্রতিক্রিয়া 'সাহিত্য ও জাতীয় চেতনা' প্রকাশিত হয় ঐ পত্রিকার ১/৫ আশ্বিন ১৩৬৮ সংখ্যায়

১৫২. কবি ও গল্পকারদের নামগুলো পত্রিকার ক্রম অনুসারে আদি থেকে অন্ত পদ্ধতিতে সাজানো হয়েছে

১৫৩. উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে সজ্জিত

১৫৪. মাহফুজুল হক, বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা, পরিক্রম, ৪ বর্ষ, ১ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭২, পৃ ১-৬

১৫৫. আহমদ শরীফ, অন্ন ও আনন্দ, পূর্বোক্ত, ৪ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী-জুন ১৯৬৮, পৃ

১৫৬. পূর্বোক্ত, জীবন সমাজ ও সাহিত্য, পূর্বোক্ত, ৬ বর্ষ ১-২ সংখ্যা, জুলাই-আগষ্ট, ১৯৬৯, পৃ

১৫৭. পরিক্রমে শতাধিক গ্রন্থের পরিচয় ও প্রাসঙ্গিক মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে নিবন্ধের আকারে। সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক আরও প্রায় অর্ধশত আলোচনা-সমালোচনা এতে প্রকাশিত হয়েছে। পরিক্রমের লেখকসূচীতে বাছাবাছা লেখকদের নাম দেখা যায়। অতএব-এই আলোচনাসমূহ সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

কালের ছবিও ঐ সাহিত্যে ধরা পড়েছে। সাহিত্য, সংস্কৃতি মননসাধনা আর জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্রাঙ্কনের প্রচেষ্টায় 'পরিক্রম' তৎপর ছিল। উল্লেখ্য এইসকল আলোচনার প্রায় অর্ধেকটা বিদেশীসাহিত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের ওপরে বা প্রসঙ্গে।

১৫৮. গোলাম সাকলায়েন, আমাদের সাহিত্যপত্রিকা ও সাহিত্যিক গোষ্ঠী, সংলাপ ৩ বর্ষ জুন সংখ্যা, ১৯৭০, পৃ ৮২

১৫৯. ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ০৩.০৮.১৯৯১ তারিখের সাক্ষাৎকারের বর্তমান অনুসন্ধানকারীকে জানান।

১৬০. ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন নিজেকে 'পাকিস্তানবাদী চিন্তক বা ভাবুক বলে পরিচয় দিতে সংকোচ কিংবা দ্বিধা লজ্জা করেন না। তিনি মনে করেন পাকিস্তান ভাঙ্গা ঠিক হয়নি। এজন্য তিনি মনে প্রাণে কষ্টবোধ করেন। কবি আবুল হোসেন ০৭-০৭-১৯৯১ তারিখের সাক্ষাৎকারে বলেন, সাজ্জাদ সাহেবের সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক ছিলনা। কলকাতা থেকেও না, এখানে এসেওনা। তবে পত্রিকার যৌথ সম্পাদনার ঐতিহাসিক সত্যতা অস্বীকার করতে পারেননা বলেই আবার বলেন, ইংরেজী বিভাগের কনফারেন্সে প্র উদ্যোক্তাদের প্রধানব্যক্তিত্ব অধ্যক্ষ প্রফেসর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের আমন্ত্রণের প্রেক্ষিতে অংশগ্রহণ করার পর থেকে 'হৃদ্যতা বাড়ে'

১৬১. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ১১-০৮-১৯৯১ তারিখের সাক্ষাৎকারের বলেন।

১৬২. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, ইংরেজীর কথা, সংলাপ, ২ বর্ষ, ১ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০ পৃ ৮৯-৯০

১৬৩. পূর্বোক্ত

১৬৪. নূরুল ইসলাম খানেরও রচনা পুবালীর ৫ বর্ষ ৩ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৭০ ও আবুল কাসেম ফজলুল হকের রচনা ৫ বর্ষ ১২ সংখ্যা ভাদ্র ১৩৭২ সনে প্রকাশিত হয়

১৬৫. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ও 'যাত্রী'- সম্পাদক ডঃ খোন্দকার সিরাজুল হক ০৬-০৭-১৯৯১ তারিখের পত্রে জানান ন্যাপ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য আবদুল খাফিজ এবং তিনি উত্তর-অন্বেষা প্রকাশের ব্যাপারে সহযোগিতা করতেন। আরো অনেকেই করতেন, যেমন মোহসিন রেজা।

১৬৬. ডঃ মযহারুল ইসলাম, হামিদা রহমান ও জাহানারা বেগমের সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ সমালোচনাকালে উল্লেখ করেন। দ্রঃ উত্তর অন্বেষা, ১ বর্ষ ১ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪, পৃ ১০৭

১৬৭. বদরুদ্দিন উমর, ছাত্র রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, পূর্বোক্ত, পৃ ১৫

১৬৮. ইবনে আদম, 'ছাত্ররাজনীত ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন' প্রসঙ্গে, পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ ২ সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪, পৃ ৭০

১৬৯. আবদুল হাফিজ, রবীন্দ্র বিরোধিতাঃ একটি ভূমিকা, পূর্বোক্ত,৩ বর্ষ ১ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪, পৃ ১৯-২৭

১৭০. পূর্বোক্ত, পৃ ১৯

১৭১. পূর্বোক্ত

১৭২. হেমায়েত হোসেন সম্পাদিত দুটি পত্রিকা দুই অধ্যায়ে বিন্যস্ত করার কারণ হলো, জাগরীতে তুলনামূলকভাবে মৌলিকত্ব কম। আর মোহাম্মদী-মাহেনও ইত্যাদির প্রভাব এতে বেশী।

১৭৩. সম্পাদকীয়, জাগরী, ১ বর্ষ ১ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৬০, পৃ ৪২-৪৩

১৭৪. এম. এ. দেওয়ান, সমকালীন সাহিত্য প্রসঙ্গে, অতএব, ১ বর্ষ ৭ সংখ্যা, (তারিখ বিহীন) পৃ ১৮৩

১৭৫. সম্পাদকীয়, অতএব, ১ বর্ষ ১০ সংখ্যা

১৭৬. 'সাহিত্যিক পরিচিতি', পূর্বোক্ত

১৭৭. ডঃ মযহারুল ইসলাম, অতএব (কবিতা), পূর্বোক্ত, ৪ সংখ্যা, পৃ ৭৬

১৭৮. অধ্যাপক নীলরতন সেন, সাহিত্য ও যৌনবোধ, পূর্বোক্ত, ২য় সংখ্যা, পৃ ১৬-১৯

১৭৯. শাহ আবদুল হালিম, ধর্ম সংস্কৃতি ও সাহিত্য, প্রবাহ ১ বর্ষ ১ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৬১, পৃ ১৩

১৮০. সম্পাদকীয়, দিগন্ত, বার্ষিকী, ১৯৬৬ মৌলভী বাজার

১৮১. সৈয়দ মোস্তফা আলী, মৌলভী বাজারের সাহিত্যপত্রিকা, পূর্বোক্ত

১৮২. দিলওয়ার, দিগন্তবাণী (কবিতা), পূর্বোক্ত

১৮৩. সম্পাদকীয় , বার্ষিক অভিযান (গুরুদাসপুর, নাটোর)

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

মানবতাবাদী ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার সাহিত্যপত্রিকা

প্রস্তাবনা

বিশ ও ত্রিশের দশকে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যপত্রিকা (১৯১৮) ; সওগাত (১৯১৮) ; ধূমকেতু (১৯২২) ; সাম্যবাদী (১৯২৩) ; শিখা (১৯২৭) ; নওরোজ (১৯২৭) ; জাগরণ (১৯২৮) ; সঞ্চয় (১৯২৮) ; মোয়াজ্জিন (১৯২৮) ; জয়তী (১৯৩০) ; বুলবুল (১৯৩৩) প্রভৃতি মুসলিম সম্পাদিত ও প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকা প্রগতিশীল মানবতাবাদী ধারার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে স্বাতন্ত্র্যবাদী, পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী, ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী ধারাই প্রবল হয়ে ওঠে এবং এমনকি সওগাত ও অন্যান্য প্রগতিশীল পত্রপত্রিকার লেখকেরা পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত তো বটেই, ষাটের দশকেও বলা চলে, পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী মনোভাবের পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছিলেন। তবু এই মানবতাবাদী ধারাটি কখনই একেবারে শুকিয়ে যায়নি। প্রগতিবাদের প্রতি অনুরাগী কতিপয় সাহিত্যপত্রিকা ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত সময়ে মাঝে মাঝে আবির্ভূত হয়ে দু'চার পাচ সংখ্যা কিংবা কখনও দু'চার বছর অনিয়মিতভাবে বেরিয়েই বন্ধ হয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু তাতে অসাম্প্রাদায়িক মানবতাবাদীতার প্রতি সহানুভূতিশীল বা উদারপন্থী চিন্তাধারার পরিচয় দুর্লক্ষ নয়। (পঞ্চম অধ্যায়ে এসকল পত্রিকার পরিচয় আছে)। তবে ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী, পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী মাহেনও মোহাম্মদীর সঙ্গে একগোত্রে বিবেচনা করা চলেনা, আবার মার্কসবাদ বা সমাজতন্ত্রের উগ্র প্রবর্তক কিংবা সমর্থকও নয়, পক্ষান্তরে পাকিস্তানকে অস্বীকার নাকরে জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক- আকুতি নিয়ে কতিপয় পত্রিকা সাতচল্লিশের পরে পূর্ববাংলা থেকে প্রকাশিত হয়েছে— সেগুলোর সংখ্যা খুব বেশী নয়। পাকিস্তান আমলে বাংলাভাষায় প্রকাশিত সাহিত্য কিংবা সাহিত্যবিষয়ক পত্রপত্রিকা যতো বেরিয়েছিল—তার মধ্যে এগুলোর সংখ্যানুপাত নগণ্য। প্রকাশের সময়ও প্রায় ষাটের দশক; সাতচল্লিশ থেকে 'ইমরোজ' এবং নবপর্যায়ে 'সওগাত' ছাড়া সাতান্ন সনে 'সমকাল' প্রকাশের আগে পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার পত্রিকার সংখ্যা এতই কম ছিল যে 'সমকাল' 'পূর্বমেঘ' পূবালী, প্রকাশিত না-হলে এই ধারার পত্রিকার তেমন গুরুত্ব স্বীকার নাকরলেও চলতো।

সমকালের আগে প্রকাশিত পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচ্য কতিপয় পত্রিকা—সীমান্ত, কৃষ্টি, সংকেত, অগত্যা, মুক্তি, পরিচিতি, যাত্রিক, স্প ন্দন এবং অন্ন চাই আলো চাই, দিশারী, প্রাচী, মেঘনা ইত্যাদি ছাড়া মানবতাবাদী ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার কোনো উল্লেখযোগ্য পত্রিকা নেই।'মার্কসীয় মতবাদ প্রভাবিত কতিপয় সাহিত্যপত্রিকা' যদি আলাদা ভাবে আলোচনা না-করা হতো, তাহলে সমকাল পর্যন্ত এই ধারাটি গড়ে উঠতো কৃষ্টি-সীমান্ত-সংকেত-অগত্যা-অন্ন চাই আলো চাই-দিশারী-মুক্তি-ইমরোজ-পরিচিতি-সওগাত-যাত্রিক-স্পন্দন-মেঘনা-প্রাচী ইত্যাদি পত্রিকা নিয়ে। সমকাল বের হবার পরে এর প্রভাবে কতিপয় সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল এবং তারা সমকালকে অনুকরণ-অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল । এই সকল পত্রিকার মধ্যে উল্লেখ্য উত্তরণ-পূবালী-পূর্বমেঘ-কণ্ঠস্বর-পলিমাটি-নাগরিক-সাহিত্য-যাত্রী-সুন্দরম-স্বাক্ষর-স্বদেশ-পূর্বলেখ-মেঘনা; এবং বিবর্তন-পরিচয়-বর্তমান-বিচিত্রিতা-বনানী-সুনিকেত মল্লার-একান্ত-ছোটগল্প-সুরভি- কিছুধ্বনি-পূবার্শা-সাম্প্রতিক-বালার্ক ইত্যাদি। কিন্তু একটু উচ্চগ্রামে মার্কসীয় মতবাদী ধ্যান-ধারনা রয়েছে, এমন পত্রিকাগুলোকে আলাদা করে নেয়ার ফলে পূর্ববঙ্গের সাহিত্যপত্রিকার মধ্যে 'মানবতাবাদী ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী' চিন্তাধারার প্রচারকদল গঠিত হয়েছে ইমরোজ, সওগাত, সমকাল ,পূবালী, পূর্বমেঘ, কণ্ঠস্বর এবং অন্নচাই আলোচাই, দিশারী, প্রাচী, পরিচিতি, বিবর্তন, পরিচয়, বই বিচিত্রা, যুববাণী, বর্তমান,বিচিত্রিতা, গণমন, সৈকত, মৌসুম, বর্ণালী, বই, বনানী, সুনিকেত মল্লার, একান্ত, ছোটগল্প, সুরভি, কিছুধ্বনি, পূর্বাশা, সাম্প্রতিক, বালার্ক প্রভৃতি পত্রিকা নিয়ে। এগুলোর কোনোটা খুবই সাধারণ আবার এগুলোর বাইরেও কিঞ্চিৎ-মূল্যের সাহিত্যপত্রিকাও কিছু আছে এবং সেগুলো মানবতাবাদ বা বাঙালি জাতীয়তাবাদ উভয়ই সমান গুরুত্ব অথবা কোনটার প্রতি বেশী বা কম মনোযোগ দিয়ে হয়তো রচনা প্রকাশ করেছে। কিন্তু প্রধান পত্রিকা সওগাত, ইমরোজ, সমকাল, পূর্বমেঘ, পূবালী, কণ্ঠস্বর-ই। এর বাইরে আর যেসকল সাহিত্যপত্রিকাকে সমকালের ধারায় ফেলা চলে তারমধ্যেও যেগুলো প্রধান এবং কিছুটাও অন্তত স্থায়ী মূল্য লাভ করেছিলো— সেগুলোকে ও 'এ ধারার কতিপয় অপ্রধান পত্রিকা' এবং 'এ ধারার কিছু পত্রিকাপ্রয়াস' শিরোনামের উপ-অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'অপ্রধান পত্রিকা'র মধ্যে বিবেচনা করা হয়েছে মেঘনা (১৯৫৭); সাহিত্য (১৯৬০-৬৩); যাত্রী (১৯৬০-৬২); সুন্দরম (১৯৬৩) ; স্বাক্ষর (১৯৬৩-৬৬) ; স্বদেশ (১৯৬৩-৭০) ; পূর্বলেখ (১৯৬৬-৬৭) এবং মেঘনা (চট্টগ্রাম ১৯৬৭-৭০)কে।'এ ধারার কিছু পত্রিকাপ্রয়াস'-এর মধ্যে বিবেচনা করা হয়েছে অন্নচাই আলোচাই (১৯৪৯) ; দিশারী (১৯৫০) ; প্রাচী (১৯৫৭) ; পরিচিতি (১৯৫৯) ; বিবর্তন (১৯৬০) ; পরিচয় (১৯৬০) ; বইবিচিত্রা (১৯৬০) ; যুববাণী (১৯৬০) ; বর্তমান (১৯৬২) ; বিচিত্রিতা (১৯৬২) ; গণমন (১৯৬৩) ; সৈকত (১৯৬৩) ; সাম্প্রতিক (১৯৬৩-৭০) ; মৌসুম (১৯৬৪) ; বর্ণালী (১৯৬৪) ; বই (১৯৬৫) ; বনানী (৯১৬৬-৬৯) ; সুনিকেত মল্লার (১৯৬৭-৭০) ; একান্ত (১৯৬৭) ; ছোটগল্প (১৯৬৭-৬৮) ; সুরভি (১৯৬৮) ; কিছুধ্বনি (১৯৭০) ; পূর্বাশা (১৯৭০) এবং বালার্ক (১৯৭০) ইত্যাদি।

বলা আবশ্যক যে, সওগাত ১৯৪৭-৭১ পর্বের যেকালে (১৯৫২) ঢাকা থেকে পুনরায় প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে, সেই হিসেবে 'ইমরোজ' (১৯৪৯-

Dhaka University Institutional Repository

৫৪)কে প্রথমে উল্লেখ করার দরকার হয়। কিন্তু সওগাতের শিকড় প্রোথিত ইতিহাসের গভীরে ; ১৯১৮ সনে এর প্রকাশনার যাত্রারম্ভ—সেই বিবেচনায় মোহাম্মদীর ন্যায় ঐতিহ্যবাহী সওগাতকে তার ধারার প্রথম পত্রিকা হিসেবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। আল-ইসলাহ, মাহেনও, দিলরুবার হিসাব অন্যভাবে করলেও মোহাম্মদীর ক্রমিক অন্যরকম (৭) হতো ; কিন্তু প্রথম প্রকাশের কাল ধরে তৃতীয় অধ্যায়েও মোহাম্মদী ও আল-ইসলাহর স্থান পূর্ববাংলা থেকে সাতচল্লিশের পরে প্রকাশের বিবেচনায় ঐ ধারায় মাহেনও এবং এই ধারায় ইমরোজ প্রথম হয়। 'মানবতাবাদী ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারা'র প্রধান পত্রিকা সওগাত (১৯১৮-৮০) ; ইমরোজ (১৯৪৯-৫৪) ; সমকাল (১৯৫৭-৭৭) ; পূবালী (১৯৬০-৬৭) ; পূর্বমেঘ (১৯৬০-৭০) এবং কণ্ঠস্বর (১৯৬৫-৮৬) — এগুলোই তাই প্রথমে আলোচনার জন্য বেছে নেয়া হয়েছে।

১. সওগাত (১৯১৮-৮০)

ক. ১৯১৮, ১৩২৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে মুসলিম বাংলার প্রগতিশীল ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যপত্রিকা সওগাত আত্মপ্রকাশ করেছিল যখন ; তখনকার মুসলিম সমাজকে এক কথায় অধপতিত বলা চলে। সেই সমাজকে আলোর মুখ, মুক্তির দিশা দেখাবার সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকেই সওগাত বের হয়েছিল এবং সফল হয়েছিল। সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অগ্রগতিতে সওগাতের সাধনা সকল মহলই একবাক্যে উচ্চমূল্যে স্বীকার করে থাকেন। কিন্তু মোহাম্মদীর ন্যায় সওগাতের স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের (সাতচল্লিশ পরবর্তী) ভূমিকাও প্রথম অধ্যায়ের তুলনায় হীন। মুসলিম সমাজে যখন 'আধুনিক' ভাবনা-চিন্তার নিতান্ত অভাব, তখন এই পত্রিকাই ছিল সর্বাধুনিক সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজ-ভাবনার প্রধান অবলম্বন। সওগাত এর সার্বিক ভূমিকা সংক্ষেপে তাই 'বিপ্লবী' ছিল এবং 'শিখা'র অনুপ্রেরক সওগাতের সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনও (১৮৮৯-১৯৯৪) 'শিখা' বা 'মুসলিম সাহিত্যসমাজ' এর কর্তাব্যক্তিদের ন্যায় 'সওগাত' বের করার ফলে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের রক্ষণশীল গোঁড়াদের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন যে সওগাতকে হতে হয়েছিল, সেকাহিনী আজ ইতিহাসের অন্তর্গত। নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে পঁয়ত্রিশতম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পূর্বে নানা কারণে সওগাতের প্রকাশনা স্থগিত থেকেছে কিংবা অনিয়মিত হয়েছে। ১৯১৮ সনে সওগাত বের হলেও প্রকৃত যাত্রারম্ভ তার ১৯২৬ সন থেকে। নভেম্বর ১৯৪৯ বা অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ পর্যন্ত মোটামুটিভাবে ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে এর প্রকাশনা অব্যাহত থাকে। অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ তে ৩৩ বর্ষ ১ম সংখ্যা কলকাতা থেকেই বের হয়। এরপর পত্রিকাসহ সওগাত-এর মালিক সম্পাদক-প্রকাশক-মুদ্রক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন ঢাকায় স্থানান্তরিত হন। হাসান হাফিজুর রহমানের প্রেরণায় সওগাত ঢাকা থেকে পুণরায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু এবারও পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে সওগাত-সম্পাদক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ১৯৫২ সনে ঢাকার প্রগতিশীল লেখকদের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' গঠন। এই সংগঠনটি প্রকৃত প্রস্তাবে নাসিরউদ্দীন সাহেবের আনুকূল্যে কাজ করার প্রাথমিক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলো। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন লিখেছেন :

'দেশ বিভাগের পর ১৯৫০ সালের মে মাসে সওগাত কার্যালয় ও সওগাত প্রেস কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। এখানে এসে আমি এক সমস্যাসংকুল পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম।... বাংলা হরফ আর চলবেনা..... এরূপ অস্বাভাবিক' পরিস্থিতিতে সওগাত আর বের করবেন কিনা ভাবছিলেন, ... সে-সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে 'কোনো সক্রিয় সাহিত্য প্রতিষ্ঠান ছিলনা।' এমন দুর্দিনে ১৯৫৩ সালের গোড়ার দিকে হাসান হাফিজুর রহমান কয়েকজন তরুণসহ ৬৬ নং লয়াল স্ট্রীটস্থ সওগাত কার্যালয়ে নাসিরউদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 'সওগাত সাহিত্য মজলিস' এর অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান। সওগাত কার্যালয়-সংলগ্ন একটি প্রশস্ত ঘর ও সম্মুখে খোলা জায়গা ছিল। ওখানেই.... তাঁদের নবপ্রতিষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' এর কাজ আরম্ভ হলো। 'হাসান হাফিজুর রহমানের প্রস্তাবে কলকাতার সওগাতের ভূমিকার পুনরুজ্জীবনে আনন্দিত হয়ে' তাঁরই 'পূর্ণসহযোগিতায়' নাসিরউদ্দিন পুনরায় শুরু করেন সওগাতের প্রকাশনা। 'হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে ঢাকার কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক দলেদলে এসে ভীড় জমালেন... তরুণদের উৎসাহ উদ্যম দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। সাহিত্যিক ও সাহিত্যসৃষ্টির যে আনন্দ আমাকে সারাজীবন অভিভূত করে রেখেছে, বৃদ্ধ বয়সে আবার তা করার সৌভাগ্য হলো এদের সংস্পর্শ লাভ করে। এখানে হাসান নিজে লিখেছেন এবং কবি সাহিত্যিকদের ধরে ধরে লিখিয়েছেন। ফলে অতিক্রান্ত সৃষ্টি হয়েছিল এক প্রগতিশীল ও শক্তিশালী সাহিত্যিক গোষ্ঠীর। হাসানের সহযোগিতায় ক্রমান্বয়ে কয়েক বছর সওগাত বের হয়েছিল। যে লেখক গোষ্ঠীকে তিনি সংঘবদ্ধ করেছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক বা সংস্কৃতিসেবীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।'১

হাসান হাফিজুর রহমান লিখেছেন : "আমরা ধূমকেতুর মত তেজে প্রখর, কিন্তু নিরাবলম্ব। ঠাঁই ছিলনা, তাই আমরা সংগঠিত ছিলামনা। অসংগঠিত আমরা প্রবল উত্তেজনায় অস্থির... কিন্তু সংহত নই বলে শক্তি ও তাৎপর্যকে অপরের অনুভবে তীব্র করে তুলতে পারছিলাম না। সেই সময় 'প্রগতি লেখক সংঘ' ভেঙে গেছে। তরুণ সাহিত্যিকদের নতুন চেতনা নতুন বক্তব্যের সংগঠিত মাধ্যমের খোঁজে আমরা ছটফট করছি। সময়টা ১৯৫২ সাল, ভাষা আন্দোলনের তুমুল মুহূর্ত। সেই সময়ে (ইউনিভার্সিটির ছাত্র) আমি হঠাৎ সওগাত প্রকাশনালয়ের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ি। (আগে তিনি সওগাতে গল্প-কবিতা দু'একটি লিখেছেন).... সওগাতে আসর বসার জায়গা মিললো.... সেই সুযোগে তরুণ সাহিত্যকর্মীদের ভীড় জমতে লাগলো সওগাতকে কেন্দ্র করে ; আমরা কতিপয় ক্ষুধার্ত সাহিত্যিক নাসিরউদ্দিন সাহেবের আতিথেয়তার উপর অনবরতই হামলা করতে শুরু করলাম। সওগাতে তরুণদের যাতায়াত নিয়মিত হয়ে উঠল। ভিড়ও বাড়তে লাগলো।.... নাসিরউদ্দিন সাহেবকে কেন্দ্র করে প্রগতিশীল সাহিত্যিকেরা সওগাতের প্লাটফর্মে একত্র হয়েছিলাম এটাই বড় কথা। নাসিরউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আমাদের এই যোগাযোগ প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের এক স্বর্ণপ্রসূ ভবিষ্যতের দ্বার খুলে দিল। আমরা 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' গড়ে তুললাম সেই ১৯৫২

Dhaka University Institutional Repository

সনেই। প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের প্রথম সংগঠন নাসিরউদ্দিন সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠিত হলো।.... নাসিরউদ্দিন সাহেবের কাছে এদেশের সাহিত্যে সংস্কৃতির ইতিহাস অশেষ ঋণী।... পাকিস্তানের আগেও যেমন, তেমনি পাকিস্তানের পরেও, সওগাতই এই দেশের প্রথম প্রগতিশীল সাহিত্য সংস্কৃতির মুখপত্র হয়ে উঠেছিল।"[২]

ঢাকা থেকে প্রকাশিত সওগাতের 'সাময়িকী' বিভাগে সম্পাদকীয় ঘোষণায় বলা হয় ঃ

"সওগাত তার জীবনের সুদীর্ঘ সময় কলিকাতায় কাটাইয়া আজ আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে পূর্বপাকিস্তানের রাজধানী হইতে নবপর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করিল। কোনো নূতন সাময়িকপত্র বাহির করিতে হইলে তার লক্ষ্য, নীতি ও আদর্শ প্রথম হইতেই পাঠক-সমাজকে জানাইয়া দেওয়ার রেওয়াজ আছে। কিন্তু সওগাতের ন্যায় একখানি পুরাতন পত্রিকা পুনঃপ্রকাশের বেলায় তার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়না, কেননা এর দীর্ঘ জীবনের মত ও পথের পরিচয় বাংলা সাহিত্যামোদী পাঠকসমাজে সুপরিজ্ঞাত। তথাপি অপেক্ষাকৃত নবীন পাঠকদের জন্য আমরা সংক্ষেপে এইটুকু বলিয়া রাখি যে, ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি ও চিন্তা-চর্চার ক্ষেত্রে 'সওগাত' চিরদিনই গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতার উর্ধে থাকিয়া উদার মত ও পথের অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে এবং আল্লাহর ইচ্ছা হইলে এখনও তাহাই করিতে থাকিবে। বস্তুত আমাদের বিশ্বাস, নিযুক্ত চিন্তা ও উদার মানবতার পরমাশ্রয় ত্যাগ করিয়া কোনো প্রকৃত সাহিত্যধর্মী সৃষ্টি সম্ভব নয়। গর্ব না করিয়া অতীতের পানে চাহিয়া আমরা কিছুটা তৃপ্তির সহিত স্মরণ করিতে পারি যে, বাংলাভাষী মুসলিম সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদী সমাজে আজ যতোটুকু মুক্ত বুদ্ধি ও উদার চিন্তা প্রসার লাভ করিয়াছে, তার জন্য কৃতিত্বের একটা বড়ো অংশ সওগাতের প্রাপ্য। আমরা আশা করি, উদারপন্থীদে মধ্যে আজ যাঁহারা অপেক্ষাকৃত প্রবীণ কবি ও সাহিত্যিকের স্তরে উন্নীত হইয়া সকলের শ্রদ্ধা পাইতেছেন, তাঁহাদের অধিকংশই একথা স্বীকার করিবেন যে, তাঁহারা যেমন সওগাতকে শক্তি ও সম্পদ দান করিয়াছেন, তেমনি সওগাতও অকুতোভয়ে ঝঞ্ঝার প্রচণ্ড তাণ্ডব সহিয়াও তাঁহাদের জন্য একটা নিশ্চিন্ত নীড় রচনা করিয়াছেন ; তাঁহাদের মুক্তকণ্ঠের কল-কাকলী স্তব্ধ হইতে দেয় নাই। এর বেশী গৌরব আমরা দাবী করিনা এবং কেহ এইটুকু সান্ত্বনা হইতে আমাদের বঞ্চিত করিতে চাহিলে তাঁহার সে অধিকারও আমরা স্বীকার করিনা।" আরও বলা হয় : 'দেশ ও সমাজের খেদমৎ এক সুকঠিন ব্রত। উপরে আল্লাহর করুণা এবং নিম্নে আল্লাহর দরদী বান্দাদের সাহায্য-সহানুভূতি অনুক্ষণ আশা করিয়া এই কঠোর ব্রত উদ্‌যাপনই আমাদের সাধনার পরম লক্ষ্য হইয়া রহিল।'[৩]

১৩৫৯ সনের অগ্রহায়ণ মাসে সওগাত পুনপ্রকাশিত হলেও ১৩৬৫ বা ১৯৫৮ সন পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হতে পারেনি। অগ্রহায়ণ (১৩৬৫) সংখ্যার 'সাময়িকী'তে বলা হয় ঃ "তবু স্বীকার করিতেই হইবে যে, এদেশের সাময়িকপত্রিকার যে সাধারণ ভাগ্য, সওগাতও তাহার কবল হইতে নিস্কৃতি পায় নাই। প্রেস, কাগজ, কালি, ছাপার যাবতীয় সরঞ্জামের দুষ্প্রাপ্যতার অসুবিধাতো আছেই ; উপরন্তু লেখার অভাবটাও কম নয়। আমাদের লেখকগণ জীবিকার সংগ্রামে এতই ব্যস্ত, অনেকেই লেখাটাকে সার্বক্ষনিক সাধনা হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না ; অথচ সার্বক্ষণিক সাধনা ব্যতীত কোন দেশের সাহিত্যই ঐশ্বর্যমণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারেনা। গত দশ-এগারো বৎসরে পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য যে আশানুরূপভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই, ইহাই হইল তাহার একটা প্রধান কারণ। তবু নানারকম অসুবিধা সত্বেও গভীর উদ্যমে বুক বাঁধিয়া আমরা আবার নূতনভাবে সওগাত প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখন হইতে সওগাত প্রত্যেক বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইবে। আমাদের আনুষঙ্গিক বাঁধা-বিপত্তিগুলি অনেকটা কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছি বলিয়াই এই আশ্বাস যথার্থ। কাজেই আমরা আশা করি, সওগাত আমাদের সুধী লেখক ও পাঠকবর্গের শুভেচ্ছা, প্রীতি ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবেনা।"[৪]

সওগাত-কর্তৃপক্ষের এই আশ্বাস প্রকৃতপক্ষেই 'যথার্থ' হয়েছিল। ১৯৭০ সন পর্যন্ত সওগাত নিয়মিতই প্রকাশিত হয়েছিল, এবং এমনকি ১৯৭১ সনেও সওগাত প্রকাশিত হয়। তবে একাত্তর সনের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পত্রিকা বন্ধ থাকে। মাঘ-ফাল্গুন ১৩৭৭ সংখ্যায় 'একুশে ফেব্রুয়ারী স্মরণে' শীর্ষক আলোচনায় লেখা হয় : "... একুশে ফেব্রুয়ারী আজ আর বছরের ক্যালেণ্ডারের বারবার ফিরে আসা একটি দিন নয়— এ আমাদের ঐতিহ্যের অন্তর্গত জীবনে ধ্রুবতারার মত নিশ্চিত একটি সত্য। এ দিনটিতে তাই বারবার আমরা ফিরে আসি নিজের কাছে। আত্মসমালোচনার কষ্ঠিপাথরে যাচাই করতে চাই নিজের বিবেক ও সাধনাকে।"[৫]

এরপর পত্রিকা বন্ধ হয়ে আশ্বিন ১৩৭৮-এ যুদ্ধের মধ্যে অর্থাৎ অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭১ এ, '৫৩ বর্ষ আশ্বিন ১৩৭৮' চিহ্নিত হয়ে সংখ্যা নম্বর ছাড়াই বের হয়। তবে এতে নতুন লেখা তেমন ছিলনা, অধিকাংশই পুনর্মুদ্রণ এবং সম্পাদকীয় দপ্তরে জমাকৃত ৭১-পূর্ববর্তী রচনা। '৫৩ বর্ষ কার্তিক ১৩৭৮' সংখ্যা বের হয়েছিল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মৃত্যুর পর 'ওয়ালীউল্লাহ সংখ্যা'রূপে। সওগাতের সঙ্গে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর সম্পর্ক ও তাঁর লেখা গল্প সংকলন করাই ঐ সংখ্যার উদ্দেশ্য বা বিষয়বস্তু। বাংলাদেশ আমলে ৫৪ বর্ষ চলেছে, অনিয়মিত হয় বলে সংখ্যা উল্লেখ না করে তখন মাসের নাম উল্লেখ করা হতো। ১৩৭৯ সনে শ্রাবণ ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যা বের হয়েছিল '৫৪ বর্ষের হিসেবে। অনিয়মিতভাবে ১৯৭৫ পর্যন্ত, তারপর বিশেষ বিশেষ সময়ে সওগাত বের হতো ; অধিকাংশই যুক্ত সংখ্যা ; নতুন বাংলাদেশ-আমলের প্রাণস্পন্দনহীন এই সংখ্যাগুলো কখন বের হতো অনেকেই খবর রাখতেন না, রাখার প্রয়োজনও ছিলনা। অবশ্য ১৯৬৮তে যখন এর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হয়, তখন বা তার কিছু পূর্ব থেকেই তার এই জীর্ণদশা। হাসান হাফিজুর রহমান 'সওগাতের অর্ধশতাব্দী' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন : "মাসিক পত্রিকা 'সওগাত' পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করেছে। আমরা এখন এমন এক সময়ের উত্তরণে অবস্থান করছি যখন 'সওগাত'-এর পঞ্চাশ বছর বয়সে পদার্পণ কিংবা 'সওগাতে'র প্রথম প্রকাশ কোনো কিছুই আমাদের কাছে বিশেষ অর্থে চাঞ্চল্যকর নয়। 'সওগাত' আজকাল বেরোয় কিনা, এও হয়তো আমরা খোঁজ রাখার আদৌ চাড়া অনুভব করিনা। বিশেষত তরুণদের কাছেতো 'সওগাত' নামের কোনো তাৎপর্যই নেই। এ এক নির্ঘাৎ সত্য। আমার মনে হয় এ নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই। প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভূমিকা থাকে। একদিন না একদিন সে ভূমিকারও অবসান ঘটে। তখন তা চলে যায় বাতিলের দলে। আজকের পঞ্চাশ বছরের বুড়ো সওগাতও হয়তো তেমনি বাতিলের দলে নির্বাসিত হয়েছে, এযুগের নতুন মনের লোকের কাছে, নবীন সাহিত্যরসিকের কাছে।"[৬]

তবে তিনি এও লিখেছেন—'কিন্তু কিছু ঘটনা আছে, কিছু ভূমিকা আছে যার বর্তমান ফুরিয়ে যায় বটে, কিন্তু অতীত হিসেবে, ঐতিহ্য

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে তা কোনদিনই ফুরোয়না।' 'সওগাতের আত্মপ্রকাশ তেমনি এক বিরল ঘটনা।' আলোচক অতীত ঐতিহ্যের কথা এই প্রবন্ধে স্মরণ করলেও অন্যত্র বিভাগ পরবর্তীকালের উজ্জ্বল ভূমিকাও স্মরণ করেছেন। অতএব সমকাল প্রকাশের আগে, অন্তত পূবালী-পূর্বমেঘ প্রকাশের পূর্বপর্যন্ত—অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হলেও আলোচ্যকালের প্রথম পর্বে এর একটি উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের অগ্রগতিতে অনন্যসাধারণ ভূমিকা রাখার অভিপ্রায়ও তার ছিল, কিন্তু সম্পাদকের মতোই সওগাতেরও তখন বয়স হয়েছিল। আর প্রবীণের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব জড়ত্ব এনে দেয় সকল কাজে ; সওগাতকেও তাই নানান ব্যাপারে কম-বাক্, দ্বিধান্বিত, কম সোচ্চার দেখতে পাওয়া যায়। যেমন রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাংলাই যে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে, বা হওয়া উচিত একথা তাঁরা বলতে কুণ্ঠিত ছিলেন, বরং উর্দুর প্রাধান্য স্বীকার করতেই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু এরপর তাদের জড়ত্ব খানিক কেটে যায়। তবে ১৯৫৮-র পর সওগাত যখন নিয়মিত বের হয় একনাগাড়ে প্রায় একযুগ (১৩৬৫ থেকে ৭৭) তখন তাঁরা উগ্রতার পরিচয় দেননি। আইউব খানের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণের সচিত্র বিবরণ ছাপা হতো সাময়িকী বিভাগে। 'চলতি দুনিয়া'তেও মুসলিম বিশ্বের এবং অন্যান্য দেশ সমূহের (তবে অধিকাংশই প্রাচ্যের) ঘটনাবলী সচিত্র প্রকাশ করা হতো অনেকটা বিভাগ-পূর্ববর্তীকালের স্টাইলে। পাকিস্তান সরকার বিরাগ হয় এমন বক্তব্য তাতে আসতোনা। উপরন্ত এই সময়ে তাঁদের প্রকাশিত রচনাবলীতে 'পূবালী'র ন্যায় জীবন ও সমাজ দৃষ্টির ক্ষেত্রে মিশ্র ভূমিকার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা ইসলাম, মুসলমান, মুসলিম বিশ্ব, পাকিস্তানের স্বার্থ, ভারতের শত্রুতা ইত্যাদি যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি আবুল ফজল, আবদুল হক প্রমুখের মুক্তবুদ্ধির আলোচনাও সওগাতে ছেপেছেন। কিছু ভালো স্মৃতিকথা যেমন আবুল ফজলের 'রেখাচিত্র', 'লেখকের রোজনামচা', গাজী শামছুর রহমানের 'আইনের চোখে' এবং আবুল হাসানাতের 'ফসলের ঘ্রাণ', হুমায়ুন কাদিরের 'দূরের আকাশ', জাহাঙ্গীর শাহনওয়াজের 'মনমাঝি' এবং আবদুর রহমানের 'বাস-কণ্ডাক্টর', নুরুল ইসলাম খানের 'এক আকাশ লক্ষ তারা' ; রশীদ আল ফারুকীর 'কেন্দ্রবিন্দুতে প্রত্যাবর্তন' প্রভৃতি উপন্যাস আর অনুদিত একগুচ্ছ রচনা—নাটক, কবিতা, উপন্যাস, গল্প সওগাত প্রকাশ করেছে। এসবের দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক এবং আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ সেগুলো। এইসব বিবেচনায় সওগাতের অবদানকে একেবারে খাটো করে দেখা ঠিক হবেনা, কারণ নিয়মিত মাসে মাসে প্রকাশিত এদেশের পত্রিকার সংখ্যা খুব বেশী নয়। সেখানে 'সওগাত' মাসে মাসে প্রকাশিত হয়েছে, মাঝারি, সাধারণ লেখকদের রচনা প্রকাশের বিরাট-ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। অতএব সার্বিক বিবেচনায় এর গুরুত্ব অপরিসীমই বটে। তাছাড়া এদেশে ভালো লেখকদের সংখ্যানুপাতও নগণ্য, নিয়মিত মাসিক পত্রিকার সকল লেখাই 'ভালো' দিয়ে ভরা যায়না। নিয়মিত নির্দিষ্ট দিনে বের করার জন্য তাকে কিছু রচনা দিয়ে পত্রিকার সাইজ ঠিক রাখতেই হয়েছে। তবু মুনীর চৌধুরী, আসকার ইবনে শাইখ প্রমুখের অনুবাদ এবং সওগাতের পুরাতন ফাইলের প্রধান একাংশ বিভাগপরবর্তীকালের সওগাতে পুরনো বা অতীতের কথা হিসেবে ছেপে সাহিত্যসমাজে অগ্রগতির সহায়ক ভূমিকাই রেখেছে সওগাত। তাছাড়া ১৯৫২ সনের পরে, ১৯৫৪র নির্বাচনের সময়ে, কাগমারী সম্মেলনের কালে সওগাতের বক্তব্য প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্যই ছিল। এই সময়ে সওগাত 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' এবং 'সমকালে'র লেখকদেরও রচনা প্রকাশের 'প্লাটফরম'রূপে কাজ করেছে, পরে সমকাল, পূর্বমেঘ, পূবালী পরিক্রম, সংলাপ, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি সাহিত্যপত্রিকা বের হতে আরম্ভ করলে অত্যাধুনিক তরুণদের নিকট ওগুলোর প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায় ; অনুসরণ অনুকরণের বিষয়বস্তুও সেগুলোতেই থাকতো। তবু সওগাতের লেখার তালিকা প্রস্তুত করলে নিতান্ত নগণ্য-মূল্যের পত্রিকা হিসেবে গণ্য হয় বলে মনে হয়না।

খ. সওগাত ১৯১৮ সনে যাত্রারম্ভ করে বলে রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কালের অনেক লেখককেই সওগাতের জন্য লিখবার অনুরোধ করা হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লেখকেরাই এতে লিখেছেন— এবং দীর্ঘ জীবনে সওগাত পুরনো সংখ্যা থেকে অনেক রচনাই পুনর্মুদ্রিত করেছে। একথা মনে রেখে তালিকা দেখতে হয়। কবিতা লিখেছেন বা সংকলিত করা হয়েছে যাঁদের কবিতা তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ, শামসুর রাহমান, আবুল হোসেন, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, ফয়েজ আহমদ, আশরাফ সিদ্দিকী, হাসান হাফিজুর রহমান, রথীন্দ্র কান্ত ঘটক চৌধুরী, ইমামুর রশীদ, শ্রী মনোমোহন বর্মণ, সুফী মোতাহার হোসেন, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, অশনি মজুমদার, সালেহ আহমদ, সৈয়দ শামসুল হক, শহীদ কাদরী, মুস্তফা জামাল, আবুল ফজল শাহাবুদ্দীন, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আল মাহমুদ, জামালউদ্দীন মোল্লা, আহসান হাবীব, ওমর আলী, আলাউদ্দীন আল আজাদ, আবু বকর সিদ্দিক, নুরুল ইসলাম সন্ত, ফারুক মাহমুদ, হাবিব আকরব, হুমায়ুন কাদির, মীর আবুল খায়ের, আশুতোষ পাল, রমেশ দেবনাথ, আতাউর রহমান, মুস্তফা মাহমুদ, আবদুল মজিদ, দিলওয়ার, জিয়া হায়দার, আবদুস সাত্তার, শহীদ আখন্দ, হাবীবুর রহমান. আমজাদ হোসেন, অতুল রঞ্জন, লতিফা হিলালী, তালিম হোসেন, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, শামসুল আলম, আবদুল হাই মাশরেকী, মুফাখখারুল ইসলাম, আবদুল কাদির খান, আবু সাইদ জহুরুল হক, তরীকুল আলম, মোহাম্মদ মামুন, প্রজেশ কুমার রায়, আহমদ ছাত্তার, খোন্দকার রফিকুল হক, নুরুল হক, নুরুল আরেফিন, দেওয়ান গোলাম মরতুজা, বেগম সুফিয়া কামাল, আবদুল বারি, মধুসূদন মিত্র, অশোক বড়ুয়া, নচিকেতা ভরদ্বাজ, আখতার উল আলম, মোহাম্মদ রফিকুল আজিজ, তবিবর রহমান, নুরুল আরেফিন, খয়রাত হোসেন, লালা শামসুল ইসলাম, হামিদুজ্জামান খান চৌধুরী, মহীউদ্দীন, কাজী গোলাম আহমদ, আবু কায়সার, মহিবুল্লাহ, সন্তোষ গুপ্ত, ইমরুল কায়েস, মযহারুল ইসলাম, নাহিদ সালাম, মির্জা এ. কে. এম. শামসুল ইসলাম, ফজল-এ-খোদা, অরুণাভ সরকার, নুরুল আমীন খান, শুভ্রাংশু দেবনাথ, শশাঙ্ক পাল, মাহবুবা, সাজ্জাদ কাদির, খোন্দকার মোসলেমা নুরুল ইসলাম, আবদুল কাদির, আ.কা.শ নূর মোহাম্মদ, আবদুর রশিদ খান, জুলফিকার মতিন, খান আজিজুল হক, সাদিক আনওয়ার, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর খান ইউসুফ জাঈ, শহীদুজ্জামান খান, মুস্তফা নূরউল আমিন, অরবিন্দ কুমার দে, কে. এম. আমীর খসরু। সৈয়দ আকরম হোসেন, কে. এম. শমসের আলী, হায়াৎ মামুদ, খুরশিদ আনোয়ার খান, আজিজুল হক প্রধান, সিরাজউদ্দিন চৌধুরী, হাসানুর রহমান, মেজবাহউদ্দিন আহমদ খান, আবুল কাসেম ভূঁইয়া, মীর সিরাজ হুদা, শামসুজ্জামান মতিন, সেলিম আহমদ, শামসুদ্দীন, জিল্লুর রহমান, মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, কাজল দে, আবদুল বারী কোরেশী, সৈয়দ আলী তকী, লুৎফর রহমান, রাজিয়া ফসিহ আহমদ, সিকানদার দারা শিকোহ, বযলুল হক, গোলাম কুদ্দুস, শাহজাহান হাফিজ, কাজল মাহমুদ, রনজিৎ কুমার সেন, আবু তাহের, ফখরুজ্জামান, শাহযাদা

Dhaka University Institutional Repository

ফিরদাউস, খান মুহম্মদ শাহজাহান, নির্মলেন্দু গুণ, মতিউল ইসলাম, কায়কোবাদ, গোলাম মোস্তফা, শাহাদাৎ হোসেন, কালিদাস রায়, ফরহাদ আহমদ, আনোয়ার পাশা, বন্দে আলী মিয়া, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, জসীমউদ্দীন, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবুল হাসান, মনিরুজ্জামান, ইউসুফ সাদেক, সুব্রত বড়ুয়া, দাউদ হায়দার প্রমুখ।

সওগাতের কবিরা এতে গল্পও লিখেছেন। বিভিন্ন লেখার তালিকা থেকে দেখা যায়, প্রবন্ধ, আলোচনাও তাঁরা লিখেছেন। গল্প লিখেছেন অগাল্পিকেরাও, যেমন অকবিদের কবিতাও আছে।

শওকত ওসমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সিরাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ কাসেম, সৈয়দ শামসুল হক, মিন্নাত আলী, আবু মোহাম্মদ শেখ শাহরিয়ার মুরশিদ, আতাউল হক, আবদুল গাফফার চৌধুরী, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, সরদার আবদুর রাজ্জাক, জহির রায়হান, শহীদ সাবের, কাজী নুরুল ইসলাম, সৈয়দ আবদুস সুলতন, হুমায়ুন কাদির, মুরতজা আলী, হাসনাত আবদুল হাই, গোলাম কাদির, আবুল হাসানাত, হোসেন মীর মোশাররফ, আল ফারুক, সাজেদুল করিম, রাবেয়া খাতুন, ইয়ার মোহাম্মদ, ওমর আলী, আবদুন নূর, আবু শাহরিয়ার, শ্রীবামা ঠাকুর, মনিরুজ্জামান, আখতারুজ্জামন ইলিয়াস, অতুল রঞ্জন দে, শওকত আলী, শহীদ আখন্দ, মাহবুবুর রহমান তালুকদার, ফখরুজ্জামান চৌধুরী, আবুল কালাম মঞ্জুর মোর্শেদ, সেতারা হক, মোজাফফর হোসেন, সাইফুল ইসলাম, নজরুল হক, মীর আবুল হোসেন, মাফরুহা চৌধুরী, নিধন ডি. রোজারিও, ইবনে মারজী, নুরুল ইসলাম খান, ফজলুল হাসান ইউসুফ, আমিনুল ইসলাম, আবদুল মান্নান খান, মধুসূদন মিত্র, মাহমুদ শাহ কোরেশী, হাসান ফেরদৌসী, আকান্দস সিরাজুল ইসলাম, আহমদ রফিক, মোস্তফা জামসীদ আহমদ, মুহম্মদ শামছুর রহমান, আশীষ কুমার লোহ, আবদুল মোতালেব, মাহমুদ হাসান, কাজী মুস্তাফিজুর রহমান, শামসুজ্জামান, আলমগীর হাদী, বুলবুল ওসমান, আজিজুল হক, নিলু দাস, আবুল খায়ের, শেখ আবদুল মালেক, সেকান্দার হায়াত, জিয়াউল আবেদীন, আলমগীর হাদী, অরূপ তালুকদার, এম. এ. কিউ আকবর আলী, আবদুল আজিজ আল আমান, ইউসুফ হায়দার, শাহ আলম, মফিজুর রহমান, খায়রুল বাশার, অশোক বড়ুয়া, গিয়াসউদ্দীন হায়দার চৌধুরী, সাদত আলী আখন্দ, সাইমুম মাহবুব, রাবিয়া খাতুন, নুরুল আমিন খান, শাহ আলম, মিঠু চৌধুরী, হারুনুর রশীদ, সিরাজউদ্দীন আহমদ, আলমগীর হায়দার, ইবনে সাঈদ, আবদুস সালাম, বযলুর রহমান, দেওয়ান গোলাম মরতুজা, সালেহ আহমদ, জহিরুল আলম, সরদার জয়েন উদ্দিন, জাফর আহমদ ওয়ানী, জামান মনির, শেখ আবদুর রহমান, মোহাম্মদ ফজলুল হক, অরূপ তালুকদার, গিয়াস উদ্দিন আহমদ, মাহমুদুল হক, খোন্দকার আবু বাকার, আলম কোরায়শী, আফজালউদ্দীন শিকদার, মোহাম্মদ ফজলুল হক তালুকদার, কাজী নুরুন্নবী, জোবেদ আলী, মোনাজাত উদ্দীন, খোন্দকার আবদুর রহিম, অধ্যাপক জি. এম. কোরেশী, শফিকুল কবির, নাজমুল হাসান, ফারুক রেজা, এ. কে. এম. শামসুল আলম, হেমায়েত হোসেন, সৈয়দ শওকত আলী, রশীদ আল ফারুকী, আবু আল সাঈদ, মুস্তফা নূরউল আমিন, বাসুদেব দাস, মেজর নাসিম শেখ, গাজী ফারুক আহমেদ, আখতারউন্নবী, মঞ্জুর বিন হারুন, মোহাম্মদ জানে আলম, জহুরুল ইসলাম, ফওজিয়া খান, মোহাম্মদ সিরাজ, আফিফুর রিফাই, গোলাম কাসেম, গোলাম আব্বাস, আনোয়ার সিদ্দিকী, এম. তোরাব আলী, মনসুর আহমদ, সৈয়দ এমদাদ আলী, আবুল মনসুর আহমদ, মশকুর হুসেইন ইয়াদ, সাদেক হেদায়েত, রবিন সমাদ্দার, একরামউদ্দীন, বারেক আবদুল্লাহ, আখতারউন্ননবী, শাহরিয়ার কবির, আহমদ আশরাফ, গোলাম কাসেম, শরিফুল হক, মোহাম্মদ গোলাম মুস্তফা, নজরুল ইসলাম চৌধুরী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (মৃত্যু উপলক্ষে গল্পগুচ্ছ, কার্তিক ১৩৭৮ প্রমুখ।[৭]

সওগাতে প্রধান কথাশিল্পীদের কিংবা নাট্যকারদের রচনা তেমন প্রকাশিত হয়নি। অতি-আধুনিকমনস্করা সদ্যপ্রকাশিত পত্রিকার ঔজ্জ্বল্যে বেশী আকৃষ্ট হয়েছেন। এতে কমশক্তিধরেরাই মোহাম্মদীর মতো ভীড় করেছেন বেশী। প্রকাশিত ধারাবাহিক রচনাগুলো হচ্ছে ঃ

আবুল ফজল— রেখাচিত্র (৪৬/৯); আষাঢ় ৭৩ (৪৯/৮) এ বন্ধ 'লেখকের রোজ নামচা' (৪৯ক/৯ থেকে)

আবুল হাসানাত — ফসলের ঘ্রাণ (ধারাবাহিক উপন্যাস, ৫০/৬) ;

আবদুর রহমান — বাস কণ্ডাক্টর (ধারাবাহিক উপন্যাস, ৫১/৪) ;

আবদুল্লাহ ইউসুফ ইমাম — দার্শনিক দাদু (৪২/৪) ;

গোলাম গফুর — 'দিনের মানুষ রাতের আলোয়' (অপরাধ মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসোপম ধারাবাহিক রচনা, ৪২/১ থেকে) ;

জাহাঙ্গীর শাহনওয়াজ — মনমাঝি (৪৬/২ থেকে ধারাবাহিক) ;

নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান—ভ্রমণ (৪৭/১০) ;

নুরুল ইসলাম খান— এক আকাশ লক্ষ তারা (ধারাবাহিক উপন্যাস, ৪৮/১ থেকে) ;

ফ্রাঁসোয়া সাগাঁ — বিদায় ত্রিস্তেস (অনুবাদ ফখরুজ্জামান চৌধুরী (৪২/১) ;

মুহম্মদ শামসুর রহমান — 'আইনের চোখে' (মনস্তাত্ত্বিক খণ্ড গল্প, ধারাবাহিক ৪২/২ পৌষ ১৩৬৯ থেকে)। গাজী শামসুর রহমান একই শিরোনামে ৪৭ বর্ষ থেকে লেখেন। তবে দুজন একই লেখক।

রশীদ আল ফারুকী — কেন্দ্রবিন্দুতে প্রত্যাবর্তন (ধারাবাহিক উপন্যাস ৪৯ক/৭ থেকে) ;

হুমায়ুন কাদির — দূরের আকাশ (৪২/১ থেকে ধারাবাহিক) ;

নাটক, নাটিকা, একাঙ্কিকা, গীতি–নাট্য, কাব্য–নাট্য ইত্যাদি যা পাকিস্তানী–সওগাতে ছাপা হয়েছে, মোটামুটিভাবে তা হচ্ছে —

আসকার ইবনে শাইখ — মৃত্যুক্ষুধা (কাজী নজরুলের উপন্যাসের নাট্যরূপ, ৪১/১) ; পরিবার (একাঙ্কিকা, ৫০/১১) ;

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল হক — ফেরদৌসী (৪৫/১ থেকে ধারাবাহিক) ;

আলাউদ্দীন আল আজাদ — ইহুদীদের মেয়ে (কাব্যনাটক, ৪৫/৩) ;

আবু আল সাঈদ — আকাশে অনেক রঙ (নাটিকা, ৪৯ক/১) ; ত্রিভুজ (নাটিকা, ৫০/৩) ;

আবদুর রহমান — লেখক ও নেপোলিয়ন (নাটক, ৫১/১ থেকে) ;

ইবরাহীম খাঁ — মর্মর স্বপ্ন (পু.মু. ৫১/৪) ;

ইকরাম আজম — যমজ আত্মা (নাটক, ৫০/৮ অনুবাদ মিজান উদ্দিন আহমদ) ;

এ. ই. খলিলুর রহমান — মোহরের চেয়ে দামী (ব্যঙ্গ নাটিকা ৫০/২) ;

কাজী নুরুন্নবী — চলিষ্ণু (একাঙ্কিকা ৪৯/৯) ;

খোন্দকার আবদুর রহিম — হিসেবী বর (৪২/১০) ;

জহুরুল ইসলাম — আহসান (৪৯/৮) ; চাঁদের দেশে (৪৯/১২) ; রক্তমাখা অঙ্গুরী (একাঙ্কিকা, ৫২/৩) ; অনন্য মন (৫২/১০) ;

তাওফিক আল হাকীম — দ্বন্দ্ব (আরবী একাঙ্কিকা, অনুবাদকের নাম অনুক্ত, ৪৬/৬) ;

তাওফিক আল হাকিম — নিগ্রো (একাঙ্কিকা, ৪২/১২) ;

ফওজিয়া খান — শেষ বিকেলে (নাটিকা, ৪৯ক/৩) ;

ভূপতি রঞ্জন দে — ঘোলাটে পৃথিবী (৪৯/১) ;

মাহমদু হাসান — শ'এর দি ডেভিল্স্ ডিসাইপল্ নাটকের অনুবাদ — 'শয়তানের সাকরেদ' (৪২/১) ;

মুনীর চৌধুরী — শ'এর নাটক ইউ নেভার ক্যান টেল —এর রূপান্তর 'কেউ কিছু বলতে পারে না' (৪১/৬) ;

মোহাম্মদ আজগর খান— 'অবশেষে' (নাটক, ৫০/৫) ;

শিশির মিত্র — জাপানী নাটক 'নো' (৪৯ক/১২) ;

সালেহ মোস্তফা জামাল — আলফ্রেড সুট্রো থেকে 'বিয়ে হল স্থির' (৪১/৮) ;

দুটো রম্য রচনা চোখে পড়েছে তার একটির লেখক ভ্রমর – মধু হুল মোম (৪১/১) ; এবং মতিনউদ্দীন আহমদ এর 'চোখ' (৪১/১) ;

সওগাতে প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গদ্য যাঁরা লিখেছেন ; তাঁরা হলেন ঃ

- অজিত কুমার গুহ — পূর্ববাংলার কাব্যপাঠের ভূমিকা (৪১/২) ;
- অরবিন্দ চক্রবর্তী — কবিতার সংজ্ঞা (৪২/১১) ; আধুনিক বাংলা কবিতার একদিক; পাঠান লোক সঙ্গীত (৪৬/১) ; সাহিত্যে অশ্লীলতা প্রসঙ্গে (৪৬/১০) ;
- অরূপ তালুকদার — সাহিত্য : আদর্শবাদ ও বাস্তববাদ (৪৫/৯) ; বাখরগঞ্জ জিলার লোকসাহিত্য (৪৬/৪-৫) ;
- অনুরঞ্জন সরকার — অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের মাপকাঠি (৪৬/৮);
- অশোক বড়ুয়া — রবীন্দ্রনাথের একদিক (৪৭/১১);
- অজয় কুমার দে — বিজ্ঞানের আর্দশ মানুষ (৪৯ক /৫);
- অশ্বিনীকুমার সেন — আকবর বাদশাহের সন্তানসন্ততি (৫১/৪) ;
- অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় — কুমুদ রঞ্জন মল্লিক (৫৩/২);
- আবদুল্লাহ আলমুতী — বিজ্ঞানী দার্শনিক ইবনে সিনা (৩৫/১); জীব বিজ্ঞানে বিপ্লব (৩৫/৮-৯); পাকিস্তানের ভাষা-সমস্যার একদিক (৩৬/৪); নক্ষত্র রহস্য (৩৭/২);
- আবদুস সালাম — ইতিহাসপাঠে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা (৪৮/১২);
- আবদুল গনি হাজারী — শিল্প ও সংস্কৃতি (৩৫/১);
- আবুল হুসেন — আমাদের কর্তব্য কি (পু.মু. ৫১/৮); মুক্তির কথা (পু.নু. ৫২/৩ ও অন্যান্য);
- আনিসুজ্জামান — শিল্প ও সংস্কৃতি (৩৫/১); বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তাবোধ : নাটকে (৪৬/৮); মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান (৪৯ক/৩);
- আতোয়ার রহমান — বাংলা ভাষার অক্ষরান্তর (উর্দুতে রূপান্তর, ৩৫/৮-৯ ও অন্যান্য); পূর্ববাংলার লোক-কাহিনী (৩৬/১২); কথাশিল্পী হেমিংওয়ে (৩৭/২) ; নজরুলের দৃষ্টিতে সাহিত্য (৪২/৭) ; মেয়েলি গানে অর্থনৈতিক তথ্য (৪৫/১) ; বারোমাসীতে নারী ও প্রকৃতি (৪৫/৮) ; বাংলার ব্রতকথা (৪৬/৪-৫) ; চট্টগ্রামের ধাঁধা (৪৭/৩) ; মুসলিম শিশু সাহিত্যে গদ্যের বিকাশ (৪৯ক/৭) ;
- আবদুল গফুর সিদ্দিকী — শহীদ আব্বাস আলী ও তাঁহার সহচরগণের জীবনচরিতের উপাদান (৩৬/১২) ;
- আবুল মনসুর আহমদ — সাহিত্য ও যুগধর্ম (পু.মু. ৫১/১২) ;
- আবদুল হক — চিন্তার অগ্রসরণ (৩৭/২) ; নজরুল ও ফারসী সাহিত্য (৪২/৭) ; জাতীয় চরিতকথা ৪৭/২) ; ইতিহাস সাধনা (৫০/১); সাহিত্য উপভোগ ও সংস্কৃতি (৫০/৩) ; সংখ্যা ও উৎকর্ষ (৫২/১) ; কাজী আবদুল ওদুদ : বিচিত্র অনুরাগ (৫৩/২) ;
- আবদুল হক ফরিদী — ওবায়দ জাকানী (৫২/১১) ;
- আশুতোষ পাল — বাস্তব সাহিত্যের স্বরূপ (৩৭/২) ; বাস্তব সমাজ ও প্রগতি সাহিত্য (৩৭/৪-৫) ;
- আবদুল কাদের — ময়মনসিংহ গীতিকার একটি চরিত্র (৪১/২) ;

Dhaka University Institutional Repository

- আনোয়ারুল আজিম — নজরুল কাব্যে জাতীয় সংহতি (৪৯ক/৭) ; ছোটগল্প রচয়িতা নজরুল (৫০/৯) ; জাতীয় সংহতিতে নজরুল কাব্যের ভূমিকা (৫১/৩) ; শিশু-সাহিত্যে নজরুল (৫১/৭) ; ভিনদেশী প্রেমের কবি ও নজরুল (৫২/৭) ;
- আনোয়ার কামাল — সমকালীন গল্প উপন্যাসে সামাজিক সমস্যা (৪১/২) ;
- আহমদ শরীফ — আধুনিক কবিতার কথা ৪১/৩) ; বৈষ্ণব মতবাদ ও বাংলা সাহিত্য (৪১/৮) ; পাকিস্তানের চিত্রকলা (অগ্রহায়ণ ১৩৬৬) ; সাহিত্যের রূপপ্রতীক (৪২/১) ; মধ্যযুগের বাংলা তত্ত্বসাহিত্যের উপক্রমণিকা (৪২/৪) ; যুগন্ধর কবি নজরুল (৪২/৭) ; জেহাদের স্বরূপ (৪২/৯) ; বিশ্বের নাগরিক (৪২/১১) ; মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যের খসড়াচিত্র (৪৫/৬) ;
- আবু মহামেদ হাবীবুল্লাহ — মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ : নগর ও রাষ্ট্র (পু. মু. ৪১/৩);
- আলাউদ্দীন আল আজাদ — সমকালীন কবিতা প্রসঙ্গে (৪১/৩) ;
- আবদুর রহমান — উইলিয়াম ফকনার (৪১/৬) ; হেন্‌রী ওয়াডস ওয়ার্থ লংফেলো (৪১/৭) ; জনস্টেইনবেক-জীবনী (৪১/৮) ;
- আবু জোবায়ের — আত্মদর্শন (৪১/৭) ;
- আনোয়ার কামাল — সাহিত্য ও সাহিত্যিক (অগ্রহায়ণ ১৩৬৬) ;
- আবদুল মওদুদ — খান বাহাদুর খান (৪২/১) ; ইকবাল ও মওলানা রুমী (৪২/৪) ; যোদ্ধা কবি খুশহাল খান ঘটক (৪৮/১১) ;
- আবদুল গফুর — নজরুল কাব্য দ্বি-সরণি (৫০/৭) ;
- অবাদুল গফুর সিদ্দিকী — বাংলা সাহিত্যের কথা (৫১/৩) ;
- আবদুল কাদির — ঐতিহ্যের ধারা ও সাহিত্যের নবরূপায়ণ (আশ্বিন ১৩৬৭) ; নজরুল জীবনের এক অধ্যায় (৪২/৭) ; আমাদের কাব্য পরিক্রমা (৪৭/৮) ; আল বাত্তানী (৪৭/৯) ; মুসলিম সাহিত্য সমাজ (৫৫/১) ;
- আবদুস সাত্তার — সাম্প্রতিক আরবী কবি ও তাঁদের কাব্য (৪২/৮) ; সাম্প্রতিক আরব চিত্রশিল্পী (৪২/১১) ; পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচিত্র মানুষ (৪৬/৯); মুরং উপজাতি (৪৬/১১) ; খুশহাল খান ঘটক (৪৭/৪) ; কাচানাগা (৪৮/৮) ; আধুনিক আরবী নাট্যসাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি (৪৯ক/১) ; মনোমুগ্ধকর পার্বত্য চট্টগ্রাম (৪৯ক/৩) ;
- আরীফ আস-সাইয়িদী — আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে (৪২/৮) ;
- আবুল ফজল — ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ (৪২/৯) ; নজরুল কাব্যের ভূমিকা (৫০/৭) ; ইসলাম কী জয় (৫১/৯) ;
- আমিনুজ্জামান — বাঁধনহারা উপন্যাস ও নজরুল (৪৭/১১) ;
- আবুল কালাম শামসুদ্দীন — নবযুগের অগ্রপথিক নজরুল (৪২/৯) ; নজরুল ইসলাম (৪৫/৬) ; আলবেরুণীর জ্ঞান-সাধনা (৪৭/১১) ; ম্যাক্সিমগোর্কী জীবনবাদী সাহিত্যিক (৫০/৫) ; মহাশ্মশান কাব্য (৫১/১১) ;
- আশরাফ সিদ্দিকী — রূপকথার পরিভ্রমণ পাকিস্তান থেকে ইউরোপ (৪৫/১) ; ষোড়শতম এশীয় সম্মেলন ও পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য (৪৭/৭) ;
- আবদুল মতিন জালালাবাদী — কবি কাব কাসিদা বানাত সু আদ (৪৯ক/১) ; হাদীস সংকলনের ইতিহাস (৪৯ক/৭) ; দাসপ্রথা যুগে যুগে (৪৯ক/৭) ; ইসলাম ও বিজ্ঞান (৫০/৬) ;
- আবদুল মালেক — সাহিত্যিকের বিবেক (৪২/১০) ;
- আ. শ. ম. বাবর আলী — সাতক্ষীরার উপভাষা (৪৯/৭) ; সাতক্ষীরার প্রচলিত প্রবাদ ও ছড়া (৪৯/১১) ; দোভাষী পুথির ভাষা (৪৯ক/৫) ; যশোরের প্রচলিত প্রবাদ ও ছড়া (৪৯ক/৮) ; পূর্ব পাকিস্তানের লোক-কাহিনীর এক অমর নায়িকা মলুয়া (৪৯ক/১-১১) ; মদিনা (৪৯ক/১২) ; পূর্বপাকিস্তানের লোক কাহিনী দেওয়ান ভাবনার নায়িকা (৫০/২) ; চট্টগ্রাম জেলার প্রচলিত প্রবাদ ও ছড়া (৫০/৩) ; লোককাহিনী ও কাব্য-নাটিকা (৫০/৪) ; মধ্যযুগের মুসলিম কবি সৈয়দ সুলতান (৫০/৫) ; ময়মনসিংহ জেলার প্রচলিত প্রবাদ ও ছড়া (৫০/৯) ; রংপুর জেলার বিয়ের গান (৫০/১১) ; শাবারিদখান (৫১/৪) ; গানের রাজা নজরুল (৫১/৭) ; মধ্যযুগীয় মুসলিম কবি নসরুল্লাহ্ খান (৫১/৯) ; বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রণয়কাব্য (৫১/১১) ; কবি শেখ চান্দ (৫২/১) ; বগুড়া জেলার বিয়ের গান (৫২/১২) ; আমেরিকার লোকসাহিত্য (আশ্বিন ১৩৭৮) ;
- আসকার ইবনে শাইখ - নাট্যকারের স্বাধীনতা (৪২/১০) ;
- আকরাম হোসেন — সুন্দরবনের প্রাচীনত্ব (৪৯ক/১) ;
- আ. ন. ম. বজলুর রশিদ — সিন্ধুর সুফী সাধনা (৪৫/২) ; রবীন্দ্রকাব্যে মঙ্গল-অমঙ্গলবোধ (৫২/৬) ;
- আনিসুর রহমান — 'অদৃশ্য কলেজ' ও 'বিজ্ঞান সংঘের উদ্ভব' (৫০/১০) ;
- আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ — ঠকচাচা : একটি চরিত্র (৪৫/২) ;
- আবদুল কাদির খান — সালভেডর দ্য ম্যাডা বিয়াগা (৪৫/২) ; মুসলিম স্থাপত্য শিল্প ; পাশ্চাত্য (৪৫/৫) ; শেরে-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক (৪৫/৬) ; মধ্যযুগের মুসলিম কবি (৪৫/৭) ; বাংলা সাহিত্যের অনুকার যুগ (৪৫/৯) ; রবীন্দ্র-নজরুল সম্পর্ক (৪৯ক/১১) ; ময়মনসিংহের কবি-সাহিত্যিক (৫২/১১) ;
- আবদুল আহাদ — আধুনিক যুগের বাংলাগানে মুসলমানের অবদান (৪৫/২, রফিকুল ইসলাম সহযোগে, ক্রমশ) ;
- আমিনুল ইসলাম বেদু — পুতুল নাচের ইতিকথা ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (৪৫/৪) ; রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প (৪৫/৮) ; লরেন্স ও লেডি চ্যাটারলিজ লাভার (৪৭/৪) ; রবীন্দ্রকাব্যে বাঙালীচিত্ত (৪৭/৮) ; আধুনিক দৃষ্টিতে ছোটগল্পের সংজ্ঞা ও মনোধর্মীতা (৪৮/৪) ;
- আবদুল হক খোন্দকার — শীত থেকে উত্তাপ (৪৫/৭) ; সমুদ্রের রাসায়নিক সম্পদ (৪৫/৯) ;
- আবু জাফর — সতের শতকের মুসলিম সাহিত্যসাধনা (৪৫/৯) ;
- আবদুর রাজ্জাক খসরু — মনীপুরী নৃত্য (৪৬/৪-৫) শৈলশৃঙ্গ : গিলগিট ও হুনজা (৪৬/৭) ; সংগ্রামী কুর্দি উপজাতি (৪৯ক/১) ; মনোরম কারা কোরাম (৪৯ক/৫) ; চেতনার তীরের শহর গুজরাত (৪৯ক/৮) ; ঐন্দ্রজালিক মারী (৪৯ক/৯) ; সীমান্তবর্তী এলাকার মাটি ও মানুষ (৫০/১) ;

আবুল কালাম ইলিয়াস — সন্দীপের লোক-গীতি (৪৬/৭) ;

- আশফাক উল আলম — ঢাকাই মসলিন (আশ্বিন ১৩৭৮) ;

Dhaka University Institutional Repository

- আ. শ. ম. আবদুর রউফ — লোকসাহিত্যের একদিক (৫০/৮) ; আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস (৫০/৯) ;
- আবদুল ওয়ারেস ইসলামী — মওলানা রুমী (৫০/৭) ;
- আবদুল্লাহ হাসান — প্রকৃতির ধ্বংসলীলা (৪৬/৮) ;
- আবদুল্লাহ সাঈদ — ইরাকের কুর্দী উপজাতি (৪৯ক/১২) ;
- আবদুল হামিদ — বাংলা ভাষায় পর্তুগীজ দান (৪৬/৮) ; রাসেলের সমাজদর্শন (৪৬/১০) ; প্রকৃতি ও মানুষ (৪৬/১২) ; প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একদিক (৪৭/৩) ; লোকসাহিত্যে ধাঁধা (৪৮/১) ;
- আলমগীর নূরুল হুদা — আমাদের সাহিত্য (৪৬/১০) ;
- আনোয়ারুল করীম — রবীন্দ্রনাথ ও লালনশাহ (৪৯/৪) ; পূর্বপাকিস্তানের লোকসাহিত্যও লোকসঙ্গীত (৪৯ক/১) ;
- আনোয়ার এনায়েতুল্লাহ — সিন্ধুর লোকশিল্প (৪৬/১০) ;
- আবদুল আজিজ আল আমান — পত্রসাহিত্যে নজরুল (৪২/১২) ; অভিনেতা নজরুল (৪৬/১১) ; নজরুল ও শনিবারের চিঠি (৪৮/৭) ;
- আবদুর রহমান — আয়না (৪৬/১২) ;
- আখতার উল আলম — ইসলামের দৃষ্টিতে কালচার (৪৭/১) ; যুগমানস ও নজরুল ইসলাম (৪৭/৭) ;
- আজিজুল হক – পূর্বপাকিস্তানী সাহিত্য ঃ সতর্কতাচর্চা প্রসঙ্গে (৪৭/৬) ;
- আলমগীর জলীল — পাবনা জেলার লোকভাষা (৪৭/৬) ; উত্তরবঙ্গের মাদারের গান (৪৮/১) ;
- আলতাফ্ হোসেন — বাংলা সাহিত্যে নজরুল (৪৭/৭) ;
- আতাউর রহমান — রাজশাহী জেলার লোক–সঙ্গীত ঃ গম্ভীরা (৪৭/৯) ;
- আবদুর রাজ্জাক — 'বিরাগসঙ্গীত' (৫০/৪) ;
- আবদুর রহমান খান — লোক–সাহিত্যে ছড়া (৪৭/১০) ;
- আমজাদ হোসেন — প্রাচীন যুগের কবি মীননাথ (৪৭/১০) ;
- আহমদ জাফর — টি. এস. এলিয়ট (৪৮/৩) ;
- আফছার উদ্দীন শেখ — আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের পটভূমি (৪৮/৬) ;
- আবুল কাসেম — চট্টগ্রামী লোক সাহিত্যে প্রবাদ (৪৮/৭) ;
- আবদুস সোবহান কোরাইশী — রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম (৪৯/১১) ;
- আবদুল বারী কোরেশী — পাঞ্জাবের মরমী কবি মধুলাল হোসেন (৪৯ক/৮) ;
- আলী নাসির জায়দী — সম্মোহনী শক্তির গোড়ার কথা (৫০/২) ;
- আইউব আলী — আমাদের সাহিত্য ও সাহিত্য পুরস্কার (৫০/৯) ;
- আবেদ হোসেন খান — পাক–ভারতে উচ্চাঙ্গ–সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ (৫১/১) ;
- আকরাম হোসেন — পূর্বপাকিস্তানে প্রথম মুসলিম আগমন (৫১/৩) ;
- ইব্রাহীম খাঁ — আমাদের ভাষা সাহিত্য ও সমাজ (৪৯ক/৫) ;
- ইমামুর রশিদ — জীবনানন্দ দাশ প্রসঙ্গে (৪১/২) ;
- ইবনে খুদী — স্যার সৈয়দ পত্রাবলী (৪৫/৬) ;
- ইমরুল কায়েস চৌধুরী, অধ্যাপক — মুসলিম রাষ্ট্রে পারস্য সংস্কৃতির প্রভাব (৪৬/৫) ;
- ইমাজউদ্দিন আহমদ — মৌলিক অধিকার (৪৬/৬) ;
- ইউসুফ হায়দার — বংগের নাম পূর্বপাকিস্তান (৪৭/৩ ও অন্যান্যে ধারাবাহিক) ;
- ইজাজ হোসেন — কবি জসীমউদ্দীন ও তাঁর কাব্যাদর্শ (৪৭/৯) ;
- ইসমাইল হোসেন সিরাজী — আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় প্রতিষ্ঠা (৫১/১) ;
- এম. আবদুল হাই — হজরত আবদুল কাদের জিলানীর সূফীবাদ (৩৫/১) ;
- এম. আবদুল কাদের (ডক্টর) — ইউরোপীয় শিল্পে মুসলিম প্রভাব (৩৫/৮–৯) ; ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলিম প্রভাব (৩৬/৪ ও অন্যান্য) ; ইউরোপীয় দর্শনে মুসলিম প্রভাব (৩৭/২ ; ৩৭/৪–৫) ; ইবনে রুশদের দর্শন ও তাঁর প্রভাব (৪৮/২ এবং অন্যান্য) ;
- এস. ওয়াজেদ আলী — তরুণ ও প্রবীণ (পুনর্মুদ্রণ, ৫২/১২) ;
- এস. এন. কিউ. জুলফিকার আলী — আমার পড়া কয়েকটি বই (৪২/৩ ও বিভিন্ন সংখ্যায়) ;
- এ. কে. শামসুল আলম — শিশু–সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ (৪২/৬) ;
- এ. ই. খলিলুর রহমান — সেক্সপীয়রের নাটকে রাজচরিত্র (৪৫/৯) ; এইচ. জি. ওয়েলস (৪৫/১০) ; বাংলাগদ্যের সূচনা (৪৬/৩) ; জীবনের ছন্দ (৪৬/১০) ; অপরাধীর রাজ্য (৪৮/২) ; মরণজয়ী ভিয়েতনাম (৪৯/৪) ; সিন্ধুউপত্যাকার দেশ (৪৯/৫) ; বাজার দর যুগে যুগে (৪৯/১০) ; বর্তমান যুগ ও লেখকের ভূমিকা (৪৯ক/১২) ;
- এ. কে. মকবুল আহমদ — মোমেনশাহী জেলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি (৪৫/৯) ;
- এ. বি. এম. সিদ্দিক চৌধুরী — বজরার ঐতিহাসিক মসজিদ (৪৯/৪) ;
- এইস. এম. মোরশেদ — বিশ্বে আপনার স্থান (ইংরেজী প্রবন্ধ, পত্রিকা বাংলা করে ছাপে, ৪৫/১২) ;
- এস. এম. হাবীবুর রহমান — বাংলা ভাষায় ক্রমবর্ধমান বানান ভুল (৪৫/১২) ;

Dhaka University Institutional Repository

- এ. কে. এম. শামসুর রহমান — কৃত্রিম উপগ্রহ ও মহাশূণ্য অভিযান (৪৬/২) ;
- এম. এ. মোহাম্মদ ইছহাক — ইকবাল সাহিত্যে মানবতাবোধ (৪৬/৩) ;
- এ. এফ. এম. খলিলুর রহমান — রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিযুগ (৪৬/৬) ;
- এ. এম. তোরাব — আশরাফ আতরাফ (৫২/৯) ;
- এম. আকবর আলী — আর রাজী ও তাঁর 'আদমুদ খালদুদ তালিম' গ্রন্থ (৪৭/৬) ; রাসায়নিক কার্যে মুসলমান (৪৭/৮) ; বিজ্ঞানে মুসলমানের দান : কিতাবুল আশরার (৪৮/৭ ও অন্যান্য) ;
- এ. এন. এম. মাহমুদ খান — অতীতের ঐশ্বর্য : কবরের দেশ (৪৭/১২) ;
- এম. তোরাব আলী — পুথি সাহিত্যের অবদান (৪৮/৩) ; মীর মোশাররফ হোসেনের দৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্য ও সমাজ (৪৮/৫) ; নবাবী আমলের কথা (৪৯/১) ; অনল প্রবাহের কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী (৪৯/৯) ; আমাদের পল্লী সাহিত্য (৪৯ক/৮) ;
- এম. আবদুর রহীম — জাতীয় জাগরণে নজরুলের ভূমিকা (৪৮/৭) ;
- এ. কে. এম. সিদ্দিকুর রহমান — আত্মদর্শন (৪৭/১১) ; সভ্যতার সংকট (৪৮/১) ;
- এস. এম. সালাহউদ্দীন — হাদ্রামাউতের জীবনধারা (৪৮/৩) ;
- এস. এম. নূরুল ইসলাম — ঐতিহ্যবাহী চীনা মুসলমান (৪৮/৫) ; আলজিরিয়া : রাজনৈতিক পট পরিবর্তন (৪৮/৯) ; কাশ্মীরের মুক্তি সংগ্রাম : ঐতিহাসিক পটভূমি (৪৮/১১) ; বিপ্লবোত্তর চীন (৪৮/১২) ; ইন্দোনেশিয়া (৪৯/১) ;
- এ. এম. হাফেজুল্লাহ ভূঁইয়া — ইকবাল : রবীন্দ্রনাথ : নীটশে (৪৮/৭) ;
- এম. আবদুল খালেক — রবীন্দ্রনাথের গদ্যকাব্য (৪৯/১১) ;
- এ. বি. এম. সিদ্দিক চৌধুরী — আমাদের শিক্ষা ও সাহিত্য প্রসঙ্গে (৪৯/১) ;
- এ.কে. এম. ফজলুল হক - সাহিত্য ও অর্থনৈতিক জীবন (৪৯ক/৯) ;
- এ. এফ. এম. আবদুল জলীল — সুন্দরবনের পুরাকালীন জনপদ (৪৯ক/৯)
- এ. এইচ. হাফিজউদ্দীন আহমদ — বাংলাভাষা : উৎপত্তি ও প্রাচীন সাহিত্য নিদর্শন (৫০/৭) ;
- এ. এইচ. আলী আসগর — নজরুল কাব্যের একদিক (৫০/৯) ; নজরুল কাব্যের একদিক (৫০/১১) ;
- এ. কে. এম. ইনামুল হক — সংগীতে মুসলিম স্পেন (৫১/৩) ;
- ওয়াকিল আহমদ — লোকবিজ্ঞানীর দায়িত্ব (৪৯ক/৪) ; সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা (৫০/৩) ;
- ওসমান জামান — সাহিত্যে গণমুখীনতার সমস্যা (৩৫/৮–৯) ;
- ওবায়দুল হক সরকার — জাতীয় সংহতিসাধনে নাট্যশিল্পের দায়িত্ব (৪৯ক/৮) ;
- ওয়াইজউদ্দিন — বিশ্বক্ষুধা (৪৫/৭) ;
- কাজী মোতাহার হোসেন - পূর্ববাংলার সাহিত্য (৩৫/১) ; মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রসঙ্গে (৪৯/৬) ; সাহিত্য সৃষ্টির পরিবেশ (৪৯ক/৪) ; কবি ও বৈজ্ঞানিক (৫২/২, পু.মু) ;

কামরুল হাসান — শিল্প ও সংস্কৃতি (৩৫/১) ;

- কবির আহমদ — উর্দু গজল ও হযরত মোহানী (৪৭/১২) ; আলাওল পরিচিতি (৪৮/৮) ;
- কবিরউদ্দিন আহমেদ — লাইসেঙ্কো বিতর্ক (৩৬/৫) ; নতুন পৃথিবীর ছবি (৪১/২) ; চট্টগ্রামী বাংলার আঞ্চলিক তথ্য (৪৮/২) ;
- কাজী মোজাম্মেল হক — জাতীয়তাবাদী কঙ্গো (৪২/২) ;
- কাজী আবদুল ওদুদ — ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম (৫১/৮, পু.ম) ; সাহিত্যের স্বরূপ (৫৩/৩-৪) ;
- কামালউদ্দীন — সাম্প্রতিক আসাম-দাঙ্গা (৪২/২) ; রাষ্ট্র-ধর্ম সম্পর্কে (৪২/৬) ; ইসলামী সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপ্রসঙ্গে (৪২/৭) ; বিপ্লব ও সমাজ জীবন (৪২/১০) ; দেহ (৪২/১২) ; জোর যার (৪৫/৫) ; চট্টগ্রামের ছড়া ও রনা বৈশিষ্ট্য (৪৫/৬) ; ইসলামের সার্বজনীন (৪৬/১) ; সাম্প্রদায়িকতা (৪৭/৯) ; ইকবালের দৃষ্টিতে ইজতিহাদ (৫০/১১) ;
- কল্যাণ কুমার সোম — রবীন্দ্রকাব্যে আত্মোপলব্ধি (৪২/৬) ;
- কুমুদ রঞ্জন মল্লিক — মুসলমান (পু.মু. ৫১/৪) ;
- কাজি মোস্তফা — আমাদের গদ্যসাহিত্য (৪২/১১) ;
- কে. এম. আমীর খসরু — ইকবালের শিল্পদৃষ্টি (৪৯/১২) ;
- কামিল আবু সুয়ান — ইবনে সিনা (সংকলিত, ৪৬/১) ;
- কাজী সিরাজুল হক — পল্লীসাহিত্য ও আমাদের দায়িত্ব (৪৬/৬) ;
- কাজী ফরহাদ হোসেন — বিজ্ঞান অভিযানের সাফল্য (৪৭/১০) ; শিল্পী ও সাহিত্যিক (৪৯ক/৩) ; মানবতা : রবীন্দ্র-নজরুল (৪৯ক/৬) ; বিশ্বসাহিত্য ও নোবেল প্রাইজ (৪৯ক/১১) ;
- কাজী মুশফিকুদ্দিন খাদেম — সেলিবিস দ্বীপের মানুষ (৪৯/১০) ;
- কাজী সিরাজ — বাঙলা সাহিত্যে তুর্কী প্রভাব (৪৯/১১) ;
- কাজী খায়রুল বাশার — সমাজ মন মানুষ (৪৯/১২) ; আমাদের সমাজমানস ও সামাজিক মানুষ (৪৯ক/১) ;
- কাজী শফিউদ্দীন আহমদ — নবাব স্যার ফারুকী (৪৯ক/২) ; গারো ও হাজং উপজাতির কথা (৪৯ক/৫) ;
- কাজী নুরুন্নবী — সাহিত্যের ভাষা (৪৯ক/৩) ; সাম্প্রতিক সাহিত্যে দুর্বোধ্যতা (৫১/৭) ;
- কিউ এহিয়া — বিজ্ঞানে আরব জাতির দান (৫০/৮) ; বিজ্ঞানের চিন্তাধারা (৫২/৯) ;

Dhaka University Institutional Repository

- কাজী নজরুল ইসলাম — তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা (৫১/৭) ;
- কামরুল হাসান ভুঁইয়া — সুকান্ত ছড়া থেকে কবিতায় (৫২/১২) ;
- কাজী আকরম হোসেন — আব্বাসীয় যুগ (৫৩/৩-৪) ;
- খোন্দকার আবদুর রহিম — কাব্যের রূপান্তর ও সমস্যা (৪১/৬) ; কালান্তরের রবীন্দ্রনাথ (৪২/৮) ; গদ্যসাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি (৪২/১১) ; উপন্যাসের শিল্পরীতিতে 'আবদুল্লাহ' (৪৫/১ ও অন্যান্য) ; বইপড়া (৪৫/১২) ;
- খায়রুল বশর — বাংলাসাহিত্যে মুসলিম ঔপন্যাসিকের ধারা (অগ্রহায়ণ ১৩৬৬) ;
- খলিলুর রহমান অধ্যাপক — পূর্বপাকিস্তানের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি (৪৫/৪)
- খালেদা সালাহউদ্দীন — 'আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা' (রসরচনা, ৪৫/৭) ;
- খোন্দকার গোলাম আহমদ — মোসলেম তত্ত্ব : খোলাফায়ে রাশেদীন (পু.মু, ৫১/২) ; ইসলামের শাসননীতি (পু.মু, ৫২/১২) ;
- গোলাম মোস্তফা — প্রেমিক কবি নজরুল (৫২/৭) ;
- গোলাম সাকলায়েন — বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (৩৬/১২) ; একজন অজ্ঞাতনামা মুসলমান কবি (অগ্রহায়ণ ১৩৬৬) ; বাংলা সাহিত্যের আধুনিক ধারা (৪২/১১) ; মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য (৫২/১) ;
- গোলাম রসুল — সভ্যতা ও ইসলাম (৪২/৮) ;
- গোলাম মুস্তফা কামাল — ট্যাডিবাদ (৪৯/৮) ; স্বকীয়তার প্রতিষ্ঠা (৪৯/১০) ; ধর্ম ও আধুনিকতা (৪৯/১১) ; সমস্যার সংকোচন ও বাংলাভাষা প্রসঙ্গে (৪৯ক/১) ; ইতিহাসের ছিদ্রপথে ইসলাম ও ইউরোপীয় পুনর্জাগরণ (৪৯ক/১) ; আধুনিক কবি ও কবিতা (৪৯ক/৫) ; রবীন্দ্রনাথ : বিমিশ্র অনুরাগ (৪৯ক/৬) ; আধুনিক কাব্যের ভূমিকা (৪৯ক/১০ ; মোগল আমলের আমোদ — প্রমোদ (৪৯ক/১২) ; পাকিস্তানী জাতীয়তা ও আমরা (৫০/৩) ব্যক্তিত্ব ও জাতীয় সম্ভাবনা (৫০/৬) ; জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা (৫০/৯) ; আমাদের সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন (৫১/১) ; বর্তমানের শিল্পভাবনা (৫১/১০) ; সভ্যতার মিলন (৫২/১) ; নজরুল কাব্যের নবমূল্যায়ন (৫২/৩) ; জাতীয় সংহতি (৫২/৯) ; স্বরূপ (৫২/৬) ; নজরুল কাব্যের ভূমিকা (৫২/৭) ; সাধারণ পাঠাগার ও জাতীয় সম্ভাবনার চলচ্চিত্র ও কথাসাহিত্য (৫২/১০) ; আধুনিক সভ্যতা ও আধুনিক মন (৫২/১১) ; সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা ও কতিপয় প্রসঙ্গ (৫২/১২) ;
- চৌধুরী গোলাম আকবর — সিলহট মণ্ডলবী বাজারের গ্রাম্য প্রবাদ (৪৬/১) ; লোক-সাহিত্যের ছড়ায় পুরাতত্ত্ব (৪৭/১১) ;
- জামিল আহমেদ — কবি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ওমর খৈয়াম (৩৫/১০-১১) ;
- জাফর আলম — দার্শনিক কবি ইকবাল (৫০/৩) ;
- জাফলুল আহমদ চৌধুরী — ইকবাল কাব্যের বিশেষত্ব (৪১/৬) ;
- জয়নাল আবেদীন — শিল্প ও সংস্কৃতি (৪১/৭) ; উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে মুসলিম চিত্রকলা (৪৬/৮) ; মুঘলচিত্রে প্রতিকৃতি (৪৬/১২) ; মুঘল ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বৈশিষ্ট্য (৪৭/৪) ; মুহম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যু (৪৭৯১২) ; মুঘলসম্রাট বাবরের মৃত্যুরহস্য (৪৯/৮) ;
- জিয়াউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক — আমাদের সংস্কৃতির একদিক (৩৬/২) ; পাকিস্তান সংগ্রামে নজরুলের দান (৪৬/৭) ;
- জাবিদ জামাল — 'ভবিষ্যতের লক্ষ্য আশা' ; শিশুচিত্র শিল্প (৪৬/৬) ;
- জহির বিন কুদ্দুস — মোমেনশাহী জেলার প্রথম সাংবাদিক-প্রচেষ্টা (৪৬/৯) ; আলকিন্দি (৪৭/১০) ;
- জালালউদ্দীন আহমেদ — বাংলা সনেট (৪৯/১২) ;
- জহুরুল ইসলাম — পল্লীকবি কুশাই বিশ্বাস (৪৯ক/১) ;
- জালালউদ্দিন আকবর — করতোয়া নদীর প্রাচীনত্ব (৪৯ক/৪) ;
- জোবেদ আলী — ইংরেজী কবি জিওফে চসার (৪৯ক/১০) ; আরবী কবি আবুল আলা মা আরবী (৫০/১১) ; মরণরে (৫২/১) ;
- জেড. এ. তোফায়েল — বরেন্দ্র যাদুঘর (৫০/৩) ;
- জহুরুল হক -- পরিচ্ছন্নতা ও আমরা (৫০/৬) ;
- ডাক্তার লুৎফর রহমান — ধর্মের বেদনা (পু.মু. ৫১/২) ; মানুষের ধর্ম (ঐ, ৫১/৪) ; ভদ্রতা (ঐ, ৫১/৮) ; মানবজীবন (পু.মু. ৫১/১২) ;
- তাসাদ্দক লোহানী — 'শিকওয়া' ও 'জওয়াবের' কবি ইকবাল (৩/৪-৫);
- তোফায়েল আহমদ, অধ্যক্ষ — জীবিকার ব্যয় যুগেযুগে (৪৬/৩);
- তাফাজ্জল হোসেন — একটি আদর্শ চিন্তা (৪৯/৯); পূর্ব পাকিস্তানে সাহিত্য-সাধনা (৫০/৮);
- তরিকুল ইসলাম — বই পড়ি কেন? (রম্য রচনা, ৪৯ক/৬);
- তাজুল ইসলাম — পরম জীবানু (৫১/৩);
- তরীকুল আলম — জীবনের মূল্য (৫২/২);
- তবিবর রহমান —দৈব বিদ্যায় আরব জাতি (৫২/৯);
- তাহের উদ্দিন আহমেদ — বাড়ন্ত মানব সমাজ (৫২/১০);
- দলীল উদ্দিন আহমদ — সম্রাট জাহাঙ্গীরের কলঙ্ক (৫৩/২);
- দিনেশ দাশ — রাষ্ট্র সমাজ ও লেখক (৩৬/১২);
- দেলওয়ার হোসেন খান — পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলিম সাহিত্যিকদের অবদান (৪৬/৯);
- দেওয়ান আবদুল হামিদ—বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ (৪৬/৬); জওহর লাল নেহেরু (৪৭/৮); কবি গোলাম মোস্তাফা (৪৭/১২); মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী (৪৯/৬); সাহিত্যিক এস. ওয়াজেদ আলী, (৪৯ক/৮) ;
- দীনেশ চন্দ্র সেন — বঙ্গ ভাষার উপর মুসলমানদের প্রভাব (পুরনো সওগাত থেকে পু.মু; ৫২/১)

Dhaka University Institutional Repository

- নাজমুল করিম — বাঙ্গালা ভাষায় মুসলিম অবদান (৪১/২);
- নাজিরুল ইসলাম —মুসলমান সাহিত্য (৫২/৩);
- নুরুল আলম রইসী —পাঠকের দায়িত্ব (আশ্বিন ১৩৬৭);
- নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক — মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পটভূমি (৪৬/৬);
- নুরুল ইসলাম খান —মংগোল বিজয় (৪৬/১০);
- নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য —রবীন্দ্রনাথ ও জীবনদেবতা (৪৭/৬);
- নজিবর রহমান আব্বাসী —জাতীয় সাহিত্যে ছোট গল্পের ধারা (৫১/৯);
- নলিনীকান্ত ভট্টশালী — কবি কায়কোবাদের মহাশশ্মান কাব্য (৫১/১১);
- নজরুল সিদ্দিকী —আমরা হাসি কেন? (৫২/৬);
- প্রজেশ কুমার রায় — সভাপতি হওয়ার বিপদ (৪৫/৬);
- ফজলুর রহমান খাঁ — প্রাচীন মিশরের ভাস্কর্য ও সুকুমার শিল্প (৪২/২); নিগ্রো সভ্যতায় আরবীয় প্রভাব (৪২/২); সভ্যতার সুকুমার বৃত্তির কেন্দ্র: প্রাচীন পারস্য (৪২/৪); প্রাচীন যুগের মূর্তির রাজা স্ফিংস (৪২/৬); সিন্ধু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য (৪২/৮); ভাষা ও বর্ণমালা (৪২/৯); ভাস্কর্যের অমরাবতী: নুবিয়া (৪২/১২);
- ফখরুজ্জামান চৌধুরী — পূর্ব পাকিস্তানের চিত্রকলা (৪৫/৭);
- ফকির মোহাম্মদ আবদুস সালাম — ফরিদপুরের ছড়া ও শ্লোক (৫০/৪);
- ফারুক মাহমুদ—মুসলিম জগৎ : ইন্দোনেশীয়া (৫০/৬);
- ফজলুর রহমান — বিদ্রোহী (৫১/৭);
- বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর—ভূত (৩৫/ ৮–৯); আধুনিক কবিতার জীবনদর্শন (৪৭/১);
- বদরুদ্দীন উমর —মুক্তি (৩৬/৪); আত্মনিয়ন্ত্রণ ও গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ (সংকলন, ৪৯/৯);
- রাণীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় —বিজ্ঞান ও তাহার ভবিষ্যৎ (৪১/৬);
- বদিউজ্জামান — পাক–ভারতে মুসলিম পরিচালিত সংবাদপত্র (৪৫/৭);
- বশিরুদ্দীন —পাঠান লোকশিল্প (৪৭/১০);
- বযলুর রহমান — শব্দ রহস্য (বিজ্ঞান বিষয়ক , ৪৮/২); বার্ট্রা গু রাসেলের সংশয়বাদ ও তার নিরসন (৪৮/১০); যুগস্রষ্টা কবি নযরুল (৪৯/৭) ; মহাকবি ইকবাল (৪৯/৮); বাউল দর্শন ৪৯/৯); মধুসূদনের কবি প্রতিভা (৪৯ক/১); বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ (৪৯ক/১);
- বিমলেন্দু চৌধুরী — সাহিত্য ও সাহিত্যিকের দায়িত্ব (৪৯/১২);
- বঙ্কিম চন্দ্র লাহিড়ী —প্রাচীন ভারতে মাংস আহার ও বর্তমান হিন্দু–মুসলমান বিরোধ (৫২/৩);
- বশির আহমদ খান —শিশুচিত্র অংকন ও একটি প্রদর্শনী (৫০/১); • বাহার — পুণ্যকথা (পু.মু. ৫১/৮) ;
- ভূঁইয়া বযলুর রহমান —ইসলাম, সুফী কবি ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ (৪৮/৬); অতীন্দ্রিয় বাদ(৪৮/৯);
- মুহম্মদ শহীদুল্লাহ — মুসলিম বীর সেনানী তারিক বিন যিয়াদ (৪৯ক/১২);
- মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী —পুথি সাহিত্যের সূচনা (৩৫/৮–৯); 'বুদ্ধির মুক্তি' (৩৬/৪); গীতিকাব্য (৩৭/২);
- মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন — ইসলাম ধর্ম প্রচারে সিরাজীর অবদান (৪৬/৫);
- মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ —ইসলাম ও মুক্তবুদ্ধি (৫২/৬); মহাকবি ফরিদউদ্দীন আত্তারের শেষ জীবন (৫৩/২) ;
- মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী —আমাদের বাংলা ভাষা (৩৫/৮–৯); বাঙ্গালার মুসলমান (৫১/৪); চিন্তাধারা (৫১/৯); মোল্লারাজ্য (৫৩/৩–৪);
- মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম — ছেলে ভুলানো ছড়া (৪৯/১);
- মন্মথনাথ সরকার এম. এ. — হিন্দু স্বাদেশিকতায় পুতুলপূজা (আশ্বিন ১৩৭৮ পু.মু.) ;
- মুজতবা নকীযুল্লাহ — আরবী হরফের জন্মকথা (৩৬/৫) ;
- মুনতাসির — বৈষ্ণব সাহিত্য (৪৯/৯) ;
- মুর্তজা হুমায়ুন — পূর্ববাংলার কবিতার ভবিষ্যৎ (৩৬/৫) ;
- মোহাম্মদ সিরাজউদ্দীন কাশিমপুরী — উপমা প্রয়োগে অপমান (৪৯/৭) ;
- মোহাম্মদ মতিয়র রহমান — শিল্প ও সংস্কৃতি (৩৬/১২) ; সুবে বাংলার ইতিহাসের ছিন্নপৃষ্ঠা (৪৮/৪ থেকে ধারাবাহিক); সাম্প্রতিক পাকভারত সংঘর্ষের ঐতিহাসিক পটভূমি (৪৯/৭) ; ইসলামী সমাজব্যবস্থা (৪৯/৮) ; সাহিত্যে জীবনবাদ (৪৯/১) ; আমাদের সাহিত্যের আদর্শ (৪৯ক/৬) ; জমিদার রবীন্দ্রনাথ (৪৯ক/৮) ;
- মোহাম্মদ আজরফ — ইতিহাসের সাক্ষ্য (৪১/১) ; ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব (৪১/৩) ; ও অন্যান্য) ; রবীন্দ্রনাথ ও মরমীবাদ (৪৫/৯) ; বাংলাকাব্যে দার্শনিক চিন্তা (৪৬/৯) ; একজন মনীষী প্রসঙ্গে (৪৭/৩) ; সাহিত্য সমাজ ও রাষ্ট্র (৪৯/১) ; ইসলামী দর্শনে বিবর্তনবাদ (৪৯/৬) ;
- মতিন উদ্দিন আহমদ — যবন (৫৩/২) ;
- মমতাজুর রহমান তরফদার — ইতস্তত (৪১/৩) ;
- মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক — বাংলা লোক–সাহিত্যে ধাধা (৪৮/৫) ;
- মীর আবুল হোসেন — আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গদ্য কবিতার স্থান (৪৯ক/৯) ;
- মীর আবু সালেক — সাওতালী লোক–সঙ্গীত (৪১/৩) ; উনবিংশ শতাব্দীর যুগধর্ম ও মুসলিম কবি-সাহিত্যিক (৪২/৮) ;
- মালিহা খাতুন — ইকবাল কাব্যে মানবতা (৪২/১) ;

Dhaka University Institutional Repository

- মেজবাহউদ্দীন আহমদ খান — শিশু সাহিত্যে নজরুল (৪৯ক/৪) ; পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় কায়েদে আজমের দান (৪৯ক/৮) ;
- মহিউদ্দীন — মন ও মানুষ (স্মৃতিকথা, ৪২/১ থেকে ধারাবাহিক, ৪২/২) ;
- মনিরুজ্জামান — নাটক ও ইতিহাস (৫১/১০) ; বাংলাগদ্যের পরিবর্তন (৫২/৩) ;
- মযহারুল ইসলাম — যাযাবরের দৃষ্টিপাত প্রসঙ্গে (৪৭/৯) ; পূর্বপাকিস্তানের সমকালীন সাহিত্য (৫০/১২) ;
- মনওয়ার হোসেন — মরমী শিল্পী দ্য লাক্রোয়া (৪৯ক/১২) ;
- মাহমুদুল হক — ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সমাজ (৪৯/৭) ;
- মুহম্মদ আবদুল হাই — আমাদের সাহিত্য–মানস : নৈরাশ্যবাদ (৪১/৬) ; বরিস পাস্তারনাক (অগ্রহায়ণ ১৩৬৬) ; সাহিত্যে ধর্ম (৫০/১) ;
- মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন — কুষ্টিয়ার দুইজন সাধক কবি (৫৩/২) ;
- মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় — আদিমকালে পুস্তক–ব্যবসায় (সংকলন, ৪১/৬) ;
- মোহাম্মদ ইমরুল কায়েস চৌধুরী (অধ্যাপক) — ইখওয়ানুস সাফা (৪৮/৮) ;
- মোহাম্মদ মোর্তজা — 'ভাষাররূপ' (৪১/৬) ; সাহিত্য সম্পর্কে (৪১/৮) ; ছোটগল্প সম্পর্কে (৪২/১২) ;
- মোহাম্মদ আবদুল হক — বরিশাল জেলার প্রবাদ ও ছড়া (৪৮/১০) ;
- মোহাম্মদ ইসহাক — ভবিতব্য (অদৃষ্টবাদ সম্পর্কে, ৪১/৮) ;
- মোহাম্মদ ইদরিস — ওমর খৈয়ামের দৃষ্টিতে 'মানুষ' (৪৬/৮) ; মহুয়া (৪৬/১২) ; রসবাজ 'বীরবল' ও মোল্লা দোপেয়াজা (৪৭/১২) ; আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা (৪৮/৮) ; শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানের ভূমিকা (৪৮/১০) ; সাহিত্যে জীবনবোধ (৪৯ক/৪) ; বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাব (৪৯ক/১২) ;
- মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ — আমাদের কাব্যাদর্শের পটভূমি (৪২/২) ; পূর্ব পাকিস্তানের কাব্যসাহিত্য : সনেট (৪২/৬) ; নজরুল ইসলাম ও বাংলা কাব্যে নবচেতনা (৪২/৭) ; কবিতায় প্রকৃতি (৪২/১০) ; মীর মশাররফ হোসেন ও বাংলা কাব্যে মুসলিম সাধনার পটভূমি (৪৫/২) ; ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও বাংলাগদ্যে আরবী–ফার্সী শব্দ (৪৬/২) ; নজরুল অনুসারী কবি গোষ্ঠী (৪৬/৭) ; বাংলা উপন্যাস প্রসঙ্গে (৪৬/১০) ; সমকালীন কবিতার পটভূমি (৪৭/১২) ; আধুনিক বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপরেখা (৪৮/৯) ; বাংলাভাষা ; বিবর্তনের এক অধ্যায় (৪৯/৫) ; মুসলিম ঐতিহ্যমূলক কবিতা (৪৯ক/১) ; নজরুল কাব্যের জাতীয় চরিত্র (৪৯ক/৭) ; মধুসূদনের মেঘনাদবধ (৫০/২) ; মধুসূদন ও ঐতিহ্যবোধ (৫১/৪) ; রবীন্দ্রপ্রতিভা (৫১/৬) ;
- মুহম্মদ ওয়ালীউল্লাহ — ডায়েনার মন্দির (৪১/৯) ;
- মুহম্মদ আবদুল্লাহ — ইকবালের নয়া জাহান (৪৯/৬) ;
- মুরতাজা আলী — লোকসঙ্গীত সম্মেলন (৪২/৫) ;
- মুসা মসিহ — হালফ্যাশনের ডাইরী (৪২/১২) ;
- মুফাখখারুল ইসলাম — সুফিগিরি ও ফকিরী (৪৫/৫) ; ইসলামী মারেফাতের আদি তরীকাহ (৪৫/৮) ; প্রথম বাংলা মসনবী কাব্য (৪৬/১) ; পূর্বপাকিস্তানে উয়ায়সীয়া তরাকীর প্রবর্তন (৪৬/৬) ; বীরত্বের প্রতীক–হাকীম বিন জাবালা (৪৬/১১) করটিয়া (৪৭/৭) ;
- মোহম্মদ মামুন — কবিতা ও আর্ট (৪৬/২) ;
- মোহাম্মদ মোহর আলী (৪৯/৫) ;
- মোহাম্মদ আবদুল বাসার — মীর মোশাররফ হোসেনের সাহিত্য প্রতিভা (৪৬/২) ;
- মোহাম্মদ আবদুল জব্বার — মৌমাছিদের সমাজব্যবস্থা (৪৯ক/৬) ;
- মোজাফফর হোসেন — শেষ বয়সের কাব্যে রবীন্দ্রনাথ (৪৬/৬) ;
- মুহম্মদ শাহজাহান — কয়লার কালি (৪৬/৩) ; দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকা (৪৬/১২) ; বিজ্ঞান গবেষণার ধারা (৪৯/৩ ক্রমশ) ;
- মীর সোহরাব আলী — করটিয়ার সংস্কৃতি ও সাহিত্যসাধনা (৪৬/১১) ;
- মোবারক আলী খান — বাঙ্গালা সন (৫২/৬) ;
- মোহাম্মদ গোলাম রসুল — সুফী সাধনায় স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব (৪৭/১০) ; ইসলামী সুফীবাদের স্বরূপ (৪৯ক/৮) ; সাহিত্যের স্বরূপ এবং সাম্প্রতিক সাহিত্যের গতি–প্রকৃতি (৫১/১১) ; নিরপেক্ষ ইতিহাসের আলোকে আওরঙ্গজেব (পু.ম, আশ্বিন ১৩৭৮) ;
- মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম — সাহিত্য ও জাতীয় চেতনা (৪৭/১১) ;
- মোহাম্মদ রফিকুল আজিজ — মুঘলচিত্র শিল্পে মীর সৈয়দ আলীর অবদান (৪৮/১) ; জগৎ শেঠের বংশ (৪৮/৪) ; উনবিংশ শতাব্দীর কবিয়াল হোসেন শেখ (৪৯ক/১১) ; রবীন্দ্রনাথের উর্বশী ও বিজয়িনী (৫০/২) ;
- মোহাম্মদ তোরাব আলী — স্বপ্নপ্রসঙ্গ (৪৮/১) ;
- মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার — জাতীয় জীবনে পরিচ্ছন্নতার ভূমিকা (৪৯ক/৭) ;
- মতিউর রহমান বসুনিয়া — রঙপুরের মুসলিম সাহিত্যিক (৪৮/৪) ;
- মোহাম্মদ ফজলুর রহমান — ইসলামের মূলনীতি (৪৮/১২) ; মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সুলতান–সুবাদের স্তুতি (৫১/৮) ; সভ্যতার সংকট ও রবীন্দ্রনাথ (৫১/১২) ; বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান (৫১/২) ; মধ্য বাংলা সাহিত্যে মহাকবি আলাওল (৫১/৩) ; ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা (৫২/১০) ; কিভাবে আপনার দেহ আপনাকে সুস্থ রাখে (৫৩/২) ; মাইকেল প্রতিভা (৫৩/৩–৪) ;
- মির্জা নূরুল হুদা — শিল্পায়নে পূর্ব পাকিনের ভারী শিল্প (৪৯/২) ;
- মির্জা ফরহাত উল্লাহ বেগ — উহ্ (৪৯/৫) ;
- মোজাম্মেল হক — ভাষার উৎপত্তি ও সাহিত্যের গতি (পুনর্মুদ্রণ, ৫১/২) ;
- মোস্তফা হারুন — কায়েদে আজমের শেষ দিনগুলো (৪৯ক/১) ; ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ (৫০/৪) ;

Dhaka University Institutional Repository

- মুহম্মদ সিরাজ -- শব্দ থেকে ধ্বনি (৪৯ক/৪) ; আমাদের লোক-সাহিত্য (৪৯ক/৫) ; শিশু ও শিক্ষা-সমস্যা (৫০/৪) ;
- মুহম্মদ রেজাউর রহমান — সমাজ ও আমাদের দায়িত্ব (৪৯ক/৫) ;
- মোহাম্মদ আবু তাহের — সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা ও স্বদেশ চেতনা (৫০/২) ; রবীন্দ্রকাব্যে পল্লীরচিত্র (৫০/৬) ; আমাদের অনুবাদ সাহিত্য : কবিতা (৫০/৮) ; আমাদের বিভাগোত্তর সাহিত্য (৫১/১) ; কায়কোবাদ ও মুসলিম ঐতিহ্যচেতনা (৫১/৮) ;
- মোহাম্মদ একরামুল হক — পল্লীকবি জসীমউদ্দিন (৫০/৪) ;
- মুহম্মদ সাঈদ উর রহমান — বাংলা সাহিত্যে মুসলিম শাসনের প্রতিক্রিয়া (৫০/৫) ; বাংলা উপন্যাসে বিধবার প্রেম (৫০/১১) ; গ্রাম্য মেয়েলি গান (৫১/৪) ; বিভিন্ন রামায়নে রামচরিত্রের বিবর্তন (৫২/৬) ;
- মিহির উন্নিসা — আমাদের রঙ্গমঞ্চের দশবছর (৫০/৬) ;
- মোহাম্মদ আসলাম — গোর্কীসাহিত্যের একদিক ৫০/৭) ;
- মোহাম্মদ নাজির হোসেন — আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পটভূমি (৫২/৯) ;
- মুহম্মদ আবু তালিব — ফকির আন্দোলনের কথা (৫০/৮) ;
- মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম — সমনদার থেকে 'ময়নামতী (৫০/১১) ;
- মাহমুদুর রহমান মান্না — লোককাহিনী বিজড়িত মহাস্থান (৫০/১২) ;
- মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান — আধুনিক কাব্যে লোকসাহিত্যের প্রভাব (৫১/২) ;
- মঈনুদ্দীন — শিশু সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ (৫১/২) ;
- মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী -- হজরতের সত্যসাধনা (পু.মু. ৫১/৬) ; মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতা ও হিন্দুর জাতীয়তা (পু.মু. ৫২/১০) ;
- মোহাম্মদ মোসলেম — লোকসঙ্গীত ও নৃত্যে আমাদের ঐতিহ্য (৫১/৬) ;
- মোহাম্মদ রুস্তম আলী — বিদ্যাসাগর মানসের একদিক : শেষ বয়সের রচনা (৫১/৮) ; বাউলগানে মানবতা ও আধুনিক চেতনা (৫২/২) ; শরৎ সাহিত্যের জয় পরাজয় (৫২/৭) ; নজরুল কাব্যে বিপর্যয় (৫৩/৩-৪) ;
- মোস্তফা হাবীব আহসান — রসায়নবিদ্যায় মুসলমানের দান (৫১/১১) ;
- মোহাম্মদ মজিবুর রহমান — আরবী সাহিত্যের মোপাসাঁ : মুহম্মদ তাইমুর (৫২/১) ;
- মোহাম্মদ শামসুদ্দীন এসহাক — জাতীয় সাহিত্যে পুথির স্থান (৫২/২) ;
- মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী — বাঙ্গালা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দের স্থান (৫২/১১) ;
- মোহাম্মদ ছালেহ উদ্দিন আহাম্মদ — রসায়ন বিজ্ঞানে মুসলমান (৫৩/৩-৪) ;
- রামানুজ পাল — নৈবেদ্যকাব্যে রবীন্দ্রমানস (৩৭/৪-৫) ;
- রনেশ দাসগুপ্ত — শিল্পীর কোন এক ধরণের বিক্ষোভ (৪১/২) ;
- রফিকুল ইসলাম — পারী (৪২/২) ; আধুনিক বাংলাগানে মুসলমানদের অবদান (আবদুল আহাদ সহযোগে, ৪৫/৪) ; বাংলা কাব্য-সাহিত্যে বিবর্তনের ধারা (৪৯/৯) ;
- রফিক আজাদ — পূর্ববাংলার সমকালীন গল্প সাহিত্য (৪৫/১২) ;
- রফিকুল আলম — মনোবিজ্ঞানের ধারা (৪৭/৩) ;
- রেজা-ই-নূর — মহাশূণ্য চারণে মানুষ (৪৮/১) ; বিজ্ঞানের অগ্রগতি (৪৮/৩) ;
- রশিদ আল ফারুকী — যুগস্রষ্টা নজরুল : বিদ্রোহী (৪৯/৭) ; উর্দু সাহিত্যের রূপ ও রেখা (৪৯ক/১) ; মোজাম্মিল হকের উপন্যাস : জোহরা (৪৯ক/১২) ;
- রফিউদ্দীন আহমদ সেলিম — মুসলিম বঙ্গে বর্গী প্রভাব (৪৯ক/১০) ;
- রাজ্জাক ইবনে ইয়াকুব — কবিতা ও ছন্দ (৫১/১১) ;
- শামসুর রাহমান — পূর্ব বাংলার কবিতার ভবিষ্যৎ (৩৬/৪) ;
- শামসুদ্দীন আবুল কালাম — পূর্ব বাংলার সমকালীন গল্প উপন্যাসে সামাজিক সমস্যা (ঢা.বি. ইংরেজী বিভাগের সৌজন্যে, ৪১/১) ;
- শামসুল ইসলাম — রুসুয়া ও আধুনিক উর্দু উপন্যাস (৪৬/১) ;
- শামসুল হুদা চৌধুরী — নানীর যুগে ভাষা (৪/১) ;
- শাহেদ আলী — নজরুলের কবি প্রতিভার বৈশিষ্ট্য (৪৫/৬) ; পূর্ব পাকিস্তানে 'বাংলাভাষার উন্নয়ন (৪৯ক/১১) ;
- শামসুদ্দীন আহমদ — 'কালচর' (৪৫/৭) ; জাতীয় সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের দায়িত্ব (৪৬/৯) ;
- শামসুল হক — 'কৃষকবন্ধু' ও 'বুড়ীর সুতা' (৪৬/৭) ; 'রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ' (৪৬/১১) ; মুসতানসিরিয়া মাদ্রাসা ও তাঁর গ্রন্থাগারে (৫১/৭) ; উমাইয়া আমলের আরবী গদ্য সাহিত্য (৫১/৯) ;
- শেখ এ. টি. এম. রুহুল আমিন — সুজা বাদশাহর মসজিদ (৪৮/৬) ;
- শেখ লুৎফর রহমান — সুরস্রষ্টা নজরুল (৪৬/১) ;
- শেখ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, অধ্যাপক — কারবালার কাহিনী : একটি প্রতিশোধ (৪৯ক/৬) ;
- শেখ আবুবকর সিদ্দিক — পল্লীর স্মৃতি-সাহিত্য (৪৭/১) ;
- শেখ আবদুর রহমান — লিখেলিখে টাকার মানুষ (৪৮/৪) ;
- শফিউল আলম — একটি ব্যতিক্রমী কণ্ঠস্বর : বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (৫৩/৩-৪) ;
- শমসের উদ্দীন আহমদ — দক্ষিণ চট্টগ্রামে রোসাঙ্গী প্রভাব (৪৭/৭) ; একজন সাহিত্যিক প্রসঙ্গে (৪৮/২) ;
- শাহ্ লতীফ আফী আনহু — বাউলগানে সমকালীন সমাজচিত্র (৪৯/২) ;

- শাহাবুদ্দীন আহমদ — কাব্যানুবাদ (৫১/২) ;
- শাহাদাৎ হোসেন — কবি ওমর খৈয়াম (৫২/১২) ;
- সাইদ উর রহমান — রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা (৪৮/৯) ; ইরাণের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার (৪৯/২) ;
- সাইফুর রহমান দায় — প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতীক : তক্ষশীলা আবিষ্কার কাহিনী (পু.মু. ৫১/২) ;
- সিকান্দার দারা শিকোহ — পূর্ব পাকিস্তানের চলচ্চিত্র শিল্প (৫০/১) ;
- সাদেক আলী — রবীন্দ্র সাহিত্যের মূল্যায়ণ (৫১/১০) ;
- সামীয়ুল ইসলাম — উত্তরবঙ্গের মেয়েলীগীত (৫১/১১ ও অন্যান্য) ;
- উত্তরবঙ্গের লোকগীতি (৫২/১) ; লোকসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের অবদান (৫২/৯) ;
- সেলিম আলদীন — ও'নীলের একটি নাটক প্রসঙ্গে (৫২/১২) ;
- সরদার লুৎফর রহমান — বাংলাসাহিত্যে মুসলিম জাতীয়তাবোধ (৪২/২) ; মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র (আশ্বিন ১৩৬৭) ;
- সরদার ফজলুল করিম — রবীন্দ্রকাব্যে মৃত্যু-রহস্য (৪২/৬) ;
- সাদত আলী আখন্দ — ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের দুইটি ধারা (৪৯/১ থেকে) ; ইতিহাসের নিগ্রহ (৫২/১২) ;
- সুশোভন আনওয়ার আলী — মধ্যযুগের আরবী উপন্যাস-চরিত্র (একটি ইংরেজী প্রবন্ধের অনুসরণে, ৪৬/৫) ;
- সৌমেন্দ্র কুমার ভদ্র — বিবর্তন (বাদ) (৪৬/৫) ;
- সুনীল কুমার দে — সমকালীন শিশু সাহিত্যের সমস্যা (৪২/৪) ;
- সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় — সাহিত্যিকের স্বাধীনতা (৩৬/৪) ; নজরুল কাব্যের গণচেতনা (৩৬/১২) ; 'সাতসাগরের মাঝি' (৪১/৯) ; প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথ (৪২/৬) ; মোজাম্মেল হক প্রসঙ্গে (৫১/১২) ;
- সুফী মোতাহার হোসেন — প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাস (৪৯/৪) ;
- সৈয়দ মুরতাজা আলী — দেওয়ানা মদিনা (৪২/৫) ; শাহ আবদুল লতিফ (৪৯ক/৯) ; ছোটগল্প (৫১/১০) ;
- সৈয়দ মাহমুদ আলী — মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের দান (৪৯/১০) ;
- সৈয়দ হুমায়ুন বখত — নাসিরনগর হবিগঞ্জের গ্রাম্য প্রবাদ (৪৬/২) ;
- সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসেন — ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (৪৬/১২) ;
- সৈয়দ ফজলুল বারী — পশ্চিম পাকিস্তানী সাহিত্যে লোকগীতির স্থান (৪৭/৩) ;
- সৈয়দ আকরম হোসেন — 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' (৪৯/১০) ;
- সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন — আমাদের সামাজিক জীবন (৪৯ক/৬) ;
- সৈয়দ হোসেন — ইসলামে গণতন্ত্র (৫১/৮, পু.মু.) ;
- সৈয়দ এমদাদ আলী — মহাশশ্মান কাব্য-সমালোচনা (৫১/১১) ;
- হাসান জামান ডঃ — আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে (৪৮/৮) ; জীবনদর্শনে ধর্মের ভূমিকা (৪৮/১২) ; আজাদী সংগ্রামের এক অধ্যায় (৪৯/২) ;
- হাবিব আকবর — লোকরহস্য (৪১/৩) ;
- হেরম্ব চক্রবর্তী — শিল্প ও সংস্কৃতি (রবীন্দ্র-প্রশান্তি) (৪১/৬) ;
- হাসান হাফিজুর রহমান — আমাদের কাব্যাদর্শের পটভূমি (রেডিওর সৌজন্যে, ৪১/৯) ;
- হরিনারায়ণ দে — দুগ্ধে বৃদ্ধি চন্দ্র (৪৫/৫) ;
- হরিপদ দে — অবোধ (৫০/২) ;
- হেমায়েত হোসেন — মোগল হেরেমে শিক্ষার আলো (৪৬/৭) ;
- হাফিজ হোসিয়ারপুরী — হৃদ বর্ণনায় কাশ্মিরের কবিগণ (৪৭/১১) ;
- হুমায়ুন আবদুল হাই — বিশ্ব মুসলিম সংঘ (৪৯/৫) ;
- হাসান আজিজুর রহমান — আধুনিক বাংলা কবিতা (৪৯ক/৯) ;
- হাবিবুর রহমান মিলন — প্যালেষ্টাইন : অতীত ও বর্তমান (৫১/৪) ;

সওগাতে যে সকল বিদেশী লেখার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা হলো ঃ

- অমরলাল হিঙ্গোরানী —'স্বাক্ষী' (সিন্ধী-গল্পের অনুবাদ, মোহাম্মদ আজীজুল হক ৪২/৫);
- আহসান হাবীব — তুর্কী কবিতা (৪/১৩);

Dhaka University Institutional Repository

- আলফ্রেড দোঁদে — শেষ দিনের পড়া (অনুবাদ, ফখরুজ্জামান চৌধুরী আশ্বিন ১৩৬৭);
- আরেফ নিয়াজি — শরবত না চা (গল্প অনুবাদ সাবিতআলী ৪৫/২);
- আলী সলীম, ডক্টর — আরবী ভাষার গতি-প্রকৃতি (আবদুস সাত্তার অনূদিত ৪৫/৭);
- আল মুতানাববী — একটি সিদ্ধান্ত (কবিতা, অনুবাদ আবদুস সাত্তার ৪৬/১);
- আসকার আলী শাহ — পশতু কবিতা ও রহমান বাবা (অনুবাদক কামালউদ্দিন খান ৪৬/৬);
- আহমদ সুবেদ — ওঝা (গল্প অনুবাদ আতোয়ার রহমান ৪৬/১১);
- আলবার্তো মোরাভিয়া — কেন? (অনুবাদ গোলাম গফুর, ৪৭/৫);
- আওরঙ্গজেব, সম্রাট — মোল্লা শাহের নিকট লিখিতপত্র (অনুবাদ আলম কোরায়শী ৪৭/৭);
- আর্নল্ড টয়েনবি — ধর্ম, সাম্যবাদ ও সভ্যতা (অনুবাদ কামালউদ্দিন খান ৪৮/৩);
- আবুল আলী আল মা আরবী — বন্ধুদের প্রতি (অনুবাদক? ৪৮/৪);
- আহমেদ আলী — এপিঠ ওপিঠ (অনুবাদ রশীদ আল ফারুকী ৪৮/১১);
- আঁরি অ এমিল — প্রকৃতির শব (?, ৫০/৪);
- আসগর বাট — পাকিস্তানে উর্দু নাটকের বিশ বছর (অনুবাদ গোলাম সোবহান ৫১/৮);
- আলবার্ট আইনষ্টাইন — জগৎকে যা দেখলাম (অনুবাদ হেলালউদ্দীন ৫২/৩) ;
- ইব্রাহীম জালিস — অভিশপ্তা (গল্প অনুবাদ আমানুল কাদের, ৪৫/৩);
- ইন্তেজার হোসেন — নিষিদ্ধ দরজা (গল্প অনুবাদ আতোয়ার রহমান, ৪৫/৪);
- ইবন আল-মু. তাজ — সাড়া (কবিতা?, ৪৫/১২);
- ইস্কান্দার জুলকারনাইন — নাগরকন্যা (৪৬/২, অনু?);
- ইরেন ড্যানিয়েল — কুলক্ষণ (গল্প অনু? ৪৭/৩);
- ইবনে ড্যানিয়েল — শেষ পরিচয় (অনু ?, ৪৮/২);
- ইলিয়া পেরেৎস্কি — প্রাচ্যের দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থভাণ্ডার (? ৫০/৬);
- উমর ব্যারণ এরেন ফেল্স—ইসলামের দৃষ্টিতে নারী (অনুবাদ মোহাম্মদ বাহাদুর ৩৫/১০-১১);
- উইলিয়াম আর পোক—আরবী সাহিত্য সংস্কৃতির ধারা (৪৫/১২);
- এজরা পাউণ্ড — জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য (অনুবাদ আবদুল হক ৩৬/৫) ;
- এডগার এলেন পো —প্রলাপী (অনুবাদ. অতুল রঞ্জন দে ৪১/১);
- এরিখ মারিয়া রেমাক— (গল্প অনুবাদ আনোয়ার জাহিদ ৪১/২);
- ও হেনরী — কুড়ি বছর পরে (গল্প অনুবাদক জামালুদ্দীন ৩৬/৪);
- ওয়াজেদ শামসুল হাসান — কবি হযরত মোহানী (অনুবাদক আবদুল বারি কোরেশী ৪৮/৮);
- এরস্কিন কডওয়েল — বিলম্বিত বসন্ত (অনুবাদক? ৪৬/২);
- এ. বি. রাজপুত —মুরঙ্গদের বিবাহরীতি (৪৭/৯); হুঞ্জা উপত্যকা (৪৭/১২) ; আধুনিক যুগের শিল্পী আহমদ পারভেজ (৪৯/১১ অনুবাদক অনুক্ত);
- এম. আমজাদ আলী — লোকসঙ্গীতে সিন্ধু (Pakistan Quqrterly থেকে অনুবাদ সাবের আহমদ, ৪৬/২);
- এস. এ. কিউ. হোসাইনী — ইবনে আল আরাবীর আধ্যাত্মিক চিন্তা (অনুবাদ মোহাম্মদ ইদরিস, ৪৬/১১);
- এ. এল. ক্রোধার— বিজ্ঞান সমীক্ষায় কালচার (অনুবাদ এ. ই. খলিলুর রহমান ৪৭/৪); সংস্কৃতির মূল্যবোধ (অনুবাদ ঐ ৪৮/১);
- এফ. এই সাইদা— নাথিয়াগলি (অনুবাদ আবদুল বারি কোরেশী, ৪৯ক/১০);
- এফ. কুজনেটসভ — বুটজুতো (গল্প শাহনূর মোহাম্মদ ৪৭/১১);
- এ. জি. চৌধুরী— পাশ্চাত্য সাহিত্যে 'যাজাল' এর প্রভাব (অনুবাদক এ. ই. খলিলুর রহমান ৪৮/৫); ইউরোপীয় সাহিত্যে বিদেশী প্রভাব (অনুবাদ ঐ, ৪৮/৬) ;
- এস. এম. শরীফ — ইকবালের সংস্পর্শে (অনুবাদক মোহাম্মদ আজিজুল হক ৪৮/৫);
- কার্লস্যাণ্ডবার্গ — ঘাসের প্রার্থনা (অনু? ৪১/৩);
- কৃষণ চন্দর — একটুকরো রুটি (গল্প অনুবাদ আমীর আলী ৪২/১); একটি চিঠি : ভালবাসা (অনুবাদ আমীর আলী, ৪২/৬); ফুলদানী (গল্প অনুবাদ আতোয়ার রহমান, ৪৫/৯) ; করিম খান (অনুবাদ মোস্তাফা হারুন, ৪৭/২); লাখপতি (?৪৮/৩); শিকার (?৪৯/৯), লণ্ডনের একটি সন্ধ্যা (? ৪৯ক/২); চীনা পাখা (অনুবাদ আখতার উননবী, ৫১/১২);
- কাজী মুজাম্মিল হক— বাংলাদেশে মুসলিম পুনর্জাগরণ (৪৭/৩);

Dhaka University Institutional Repository

- কান্তি কুমার — প্রত্যাবর্তন (অনুবাদ মুহম্মদ আবদুর রব ৪৯/১০);
- কলিরয় জোনস —আত্মহননের গানের ভূমিকা (অনুবাদ আবুল হাসান ৫১/২);
- খাজা আহমদ আব্বাস— একমণ চাল (গল্প অনুবাদক মিলি হোসেন ৩৭/২); হাতের ময়লা (অনুবাদক আখতার উন্নবী ৪৮/১০);
- গোলাম আব্বাস —উচ্ছেদ (গল্প অনুবাদ মোহাম্মদ আজিজুল হক, ৪১/৭);
- চক্রবর্তী রাজা গোপালচারী— গণনা শাস্ত্রের সত্যমিথ্যা (অনু?,ভাদ্র ১৩৬৭)
- চাম্পুন — মহাপৌষ (অনুবাদ ফউজুল কামাল, ৪৭/১২);
- চিউ. কে. ভিয়েন — একটি রহস্যময় রাত (?, ৪৮/১১);
- জন রবিনসন — একটি আদর্শের কথা (?, ৪৯/৫);
- জন ডাক — প্রেতচ্ছায়া (অনুবাদক মাহমুদ হাসান ৪২/৪);
- জোসেফ বি বার্জেসল — নিও প্রেটেনিজম (অনু?, ৪৮/৯);
- জিবরান খলীল জিবরান — বালি ও ফেনা (কাব্য, অনুবাদ আবদুস সাত্তার ৪৯/৪ থেকে);
- জিরাল্ড ক্রুশ – আলবানিয়ার বৃদ্ধ লোকটি (অনুবাদক মুহম্মদ আবদুর রব ৫১/৭);
- জি. ডি. মরিসন— বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও ধর্ম (অনুবাদক জিয়াউদ্দীন আহমদ ৪২/৫);
- জুলিয়া ফিগুস্ – কবিতাবিহীন মধ্যরাত্রি (?, ৫১/১);
- জনবেরী — শ্রোতা (অনুবাদ মুনতাসির ৫১/৯);
- টি. এস. এলিয়ট — জে আলফ্রেড প্রফ্রকের প্রেমগীতি (অনুবাদ মাহমুদ হাসান, আশ্বিন ১৩৬৭);
- ডি. এইচ. লরেন্স — প্রেম (অনুবাদক মাহমুদ হাসান ৪১/২); সন্ধ্যার দেশ (? ৪৫/৭);
- ডব্লিউ. আর. ইংগ — রোমান্টিসিজম কি? (অনুবাদক আবদুল্লাহ আবু মাসুম আশ্বিন ১৩৬৭);
- তাহওয়ার আলী খান — সুন্দরবন (অনুবাদক আবদুল কাদির খান ৪৮/৮);
- দয়াল সেনা — নতুন বাইবেল (গল্প অনুবাদক কাজী মাসুম ৪১/৭);
- নরম্যান ভিন সেন্ট পিল — সমালোচনার মাপকাঠি (অনুবাদক মোহাম্মদ ইদরিস ৪৮/৬);
- নগুয়েন ভান দং ও স্পার্তাক বেগল — মুক্তি সংগ্রামী ভিয়েৎনামী (? ৪৯/৮);
- প্রেম চন্দ — মুক্তিজি (গল্প অনুবাদ মোস্তফা হারুণ ৪৬/৯); নির্ভর (গল্প অনুবাদক আহমদ শাহাব, ৪৭/৭); বড়ভাই (গল্প অনুবাদক আখতার উননবী ৪৮/৫); দীর্ঘায়ু (অনু ঐ, ৪৯/৫);
- ফিলিপ বেন্টলে — প্রেম ও পয়সা (অনুবাদ এ. কে. এম. সামসুল আলম ৪৮/৬ থেকে ক্রমশ);
- বার্ট্রাণ্ড রাসেল — সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের পটভূমি (অনুবাদক এ. কে. এম. সিদ্দিকুর রহমান, ৫০/৯);
- বাহাদুর শাহ — কবিতা (অনুবাদক মনিরুজ্জামান, ৪২/১১);
- বদরউদ্দিন মোহাম্মদ উমর — উদারনৈতিকতার প্রয়োজন (অনুবাদক আবদুল লতিফ ৪৬/১) ;
- বাকনার ট্রেডইক — প্রাচীন মিশরীয় সাহিত্যের উপাদান (অনুবাদক মোহাম্মদ ইদরিস ৪৭/১);
- মুলক রাজ আনন্দ – সংঘাত (গল্প অনুবাদক মাহমুদ শাহ কোরেশী ৩৬/১২); দুস্থ ছেলে (অনুবাদক ফারুক মোজাম্মেল ৪১/১);
- মোপাসাঁ — চাঁদনী রাত (গল্প অনুবাদক মোহাম্মদ মোফাজ্জল হোসায়েন ৩৭/৪–৫); ইশারা (গল্প অগ্রহায়ণ ১৩৬৬);
- মুহম্মদ ইকবাল, ডক্টর — সুফী প্রজ্ঞানের বিভিন্ন দিক (কামালউদ্দীন খান অনূদিত ৪৫/১) ; তত্ত্বদর্শন (অনুবাদক পূর্বোক্ত, ৪৫/৩);
- মাহমুদ হাসমী —বালটিস্তানের লোক-গীতি (অনুবাদক আমানুল কাদের ৪৬/৩);
- মার্ক টোয়েন — বিজ্ঞান বনাম ভাগ্য (অনুবাদক দেলোয়ার হোসেন ৫০/৩);
- মেজর চার্লস স্টুয়ার্ট — হুমায়ুন জীবন-স্মৃতি (অনুবাদ মোহাম্মদ মতিয়ার রহমান ৫০/৩);
- মাশউদ আশয়র — উদাসীন (অনুবাদক আনিসুর রহমান ৫১/২);
- মোমতাজ শিরিন — নীলকমল (গল্প অনুবাদক এনায়েত মণ্ডল ৪৬/১২);
- মোহাম্মদ আবমাজ্যুক পিকথল — ইসলামী দৃষ্টিতে ভ্রাতৃত্ব (অনুবাদক মোহাম্মদ ইদরিস ৪৭/২);
- যোশী হোতা — যুদ্ধোত্তর জাপানী সাহিত্যের ধারা (৪১/৩);
- রাহুল সাংকৃত্যায়ন — ভলগা থেকে গংগা (অনুবাদক ফজলে লোহানী ৩৬/১২);
- রিউনসুকো আকুতাগাওয়া — রশোমন (? ৪২/১২);
- রবিনসন জেফার্স — কুয়াশার নৌকা (কবিতা, অনুবাদক আমিরুল ইসলাম ৪১/৬);
- রয়ফুলার —প্রমিথিউস (কবিতা অনুবাদক মাহমুদ হাসান ৪১/৭);

Dhaka University Institutional Repository

- রামপাল — একটি স্বীকৃতি (?, ৪৯ক/৩);
- রাজিয়া সাজ্জাদ জহির — সেকালের মেয়ে (উর্দু থেকে অনুবাদ নেয়ামাল বাসির, আশ্বিন ৬৭);
- লর্ড বয়েনওর — নতুন পৃথিবীর জন্যে (? ৪৯/৩);
- লিও টলষ্টয় — আমার স্বীকারোক্তি (আত্মজীবনী, ৪১/৯); সব হারিয়ে পেয়েছি সুখ (অনুবাদক আবদুল মান্নান কোরাইশী ৪৭/৪);
- রবার্ট এণ্ড্রুস মিলিকান — 'বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ' (৪৬/৭);
- সারওয়ার সাওলাত — মাসুদ ওয়াজির ও মোহম্মদ (অনুবাদক আকরাম হোসেন ৪৭/৫);
- সাদত হাসান মান্টো — মাহমুদা (গল্প অনুবাদক আনিসুল ইসলাম ৪৫/১); সম্মানের প্রশ্ন, ৪৯ক/১); শারিফন (? ৪৯ক/৯); মৃত পৌরুষ (?, ৪৯ক/১২); পাথরের স্বাদ (অনুবাদক কাজী মাসুম ৫০/১ থেকে; ক্রমশঃ);
- সাজ্জাদ জহির — একটি চিঠি (অনুবাদক নেয়ামাল বাসির ৩৬/৫);
- স্টিফেন ক্রেইন — কবর (অনু? ৪৭/১১);
- শেকস্‌পীয়র — কবিতা (অনুঃ মাহমুদ হাসান, ৪১/৭);
- ষ্টানলি নেলপুল — মধ্যযুগের মুসলিম মানসিকতা (মিনহাজ-ই-সিরাজ; তাবরকাত ই নাসির); থেকে আখতার উল আলম ৪৮/২ থেকে ক্রমশ);
- শাহেদ হোসেন রাজ্জাকী — ধর্মীয় চিন্তার উন্মেষে স্যার সৈয়দ আহমদ (অনুবাদক মোহাম্মদ সাদেক, ৪৭/২);
- সলিম খান জিম্বী — সিন্ধী লোকগীতি (অনুবাদ আকরাম হোসেন, ৪৮/১১);
- সতীশ বোওরা — একটি নীরব মুহূর্ত (অনুবাদ মুহম্মদ আবদুর রব, ৪৯/৭);
- সৈয়দ নাসিরুদ্দিন হায়দার রিজভী — আবু জাফর গেফারী (অনুবাদ কাজী মুস্তাফিজুর রহমান, ৪৭/১);
- স্যামুয়েল স্মাইল্‌স — আত্মসাহায্য (অনু হেমায়েত হোসেন, ৪৯ক/৩ থেকে);
- সমীর হাসান আল মাসুমী — ইখওয়ানউস্ সাফা (অনুবাদ এ. ই. খলিলুর রহমান ৫০/৫);
- সমার সেট মম— পলায়ন (অনুবাদ খালেদুর রহমান, ৫১/১০);
- হোসেন কুলী — অন্তিম চিকিৎসা (অনুবাদ মুহম্মদ মজিবর রহমান ৫০/১০);
- হোসেন রউফ — শেখ আবদুল কাদের জিলানী-জীবনী (অনুবাদক খোন্দকার হারুনর রশীদ, ৩৬/১২);
- হানিফ ফওক, অধ্যাপক — পূর্বপাকিস্তানে উর্দুসাহিত্য (অনুবাদ নেয়ামাল বাসির ৩৭/৪-৫);
- হামিদ কাশ্মিরী — পর্দা (অনুবাদ আখতারউননবী ৪৮/৮);
- হায়রুল্লা ওরস — ইস্তাম্বুলের রত্নাগার (? ৪৯/৮);
- হামিদ যুলদশেভ - বোখারা : পাষাণে রচিত এক অমর কবিতা (৫০/১১);

পুস্তক সমালোচনা ও সওগাতে কিছু হয়েছে, তবে সমকালের সমালোচনার ন্যায় ভালো বইয়ের উন্নতমানের আলোচনা নয়, প্রাপ্ত বইয়ের সাধারণ আলোচনাই এগুলো। কিছু ভালো সমালোচনা আছে।

- আ. ন. ম. বজলুর রশীদ — 'মনিদ্বীপ' (৫০/১১); 'শঙ্কিত-আলোকে' (৫১/৩) ;
- আনোয়ারুল হক খান — 'শাশ্বতবঙ্গ' কা. আ. ওদুদ প্রণীত (৩৫/১);
- আবদুস সাত্তার — 'ছয়সঙ্গী' কবীর চৌধুরী অনূদিত (৪৭/৭); 'মোহসীনে আজম ও মোহসেনীন' (৪৮/৯); ' বাংলাকাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য' (৪৮/১০); 'হুইটম্যানের কবিতা' (৪৮/১১); 'সমকালীন সাহিত্যের ধারা' (৪৮/১২); 'প্রজ্ঞান চর্চায় ইরান' (ঐ) ; 'ছয় ঋতু সাত রং' (৪৯/১); 'তাজকেরাতুল আম্বিয়া' (৪৯/১); 'পাখীর বাসা'; 'মহুয়া' (৪৯/৪); 'হেজাজের সওগাত'; 'ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব (৪৯/৮); 'হাতেম তায়ী' (৪৯/৯); 'দীঘল ঘুমের পৌষ' (৪৯/১২); খলীল জীবরানের বই 'বৈকালিক মন' (৪২/১০) ; 'কুলসুম' আবদুল হাই মাশরেকীর (৪২/১১); 'অনুরাগ' ইমাউল হক প্রণীত (৪৫/৪); 'দুর্লভ দিন' (৪৫/৯); 'নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা' (৪৬/৯); 'সীন্ধু নীলাভ দেশে' (৪৬/১০); 'দৃষ্টি' (৪৭/১); 'উদাত্ত পৃথিবী' (৪৭/১১); 'লোক সাহিত্য' (৪৮/২); 'আমাদের প্রাচীন শিল্প' (৪৮/৫); 'বাঘ : বন : বন্দুক' (৪৮/৭); 'নজরুল রচনাবলী' (৪৯ক/৮); শটঅরস ইন টাএ ঢঅরকনএসস (৫১/৬); 'লালনশাহ ও লালনগীতিকা (৫১/১০) ;
- আবদুল গনি হাজারী — ডক্টর শহীদুল্লাহর 'ইকবাল' (৪১/১২);
- আনিসুজ্জামান — 'সাগর সৈকতে' আহমদ শামসউদ্দীন প্রণীত (৪৭/৮); 'কবর' ; 'দণ্ড কারণ্য' (৪৯ক/৩)
- আনোয়ারুল আজিম — 'বিম্বিত প্রহর' (৫১/১০);
- আনোয়ারা সুলতানা— 'স্কুলে মাতৃভাষা শিক্ষণ' (৫২/৯);
- আবুল হাসানাত — 'করাচীর চিঠি' রাজিয়া মজিদ প্রণীত (৪১/৮); 'বৃষ্টিঝরা গান' মুহম্মদ শামছুর রহমান প্রণীত (৪২/৩);
- আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ — 'মিতিরাস্তিক' (৪৯ক/২); 'প্রজ্ঞান চর্চায় ইরান' (৪৯ক/৯) ;

Dhaka University Institutional Repository

- আজহার ইসলাম —'সাহিত্য শিল্প' (৫১/১২);
- আহমদ জাফর — 'নজরুল সাহিত্য' মীর আবুল হোসেন প্রণীত (৪১/৯); 'সাতনরী' হাসিনা হক অনূদিত (৪২/৫); 'সংলাপ' ত্রৈ. মা. সা. প (৪২/১০);
- আবদুল কাদির — 'ঐতিহ্যের ধারা ও সাহিত্যের নবরূপায়ণ' (আশ্বিন ১৩৬৭); 'প্রাচ্যের রহস্যনগরী' (৪৯/৬);
- আবদার রশীদ — 'সীমান্তের সংলাপ' (৫০/১২); 'তেরো নম্বরে পাঁচ বছর' (৫১/৮);
- আকবর আলী — 'জবানবন্দী' আবুল কালাম আজাদ প্রণীত, আখতার ফারুক অনূদিত (আশ্বিন ১৩৬৭);
- আনিস সিদ্দিকী — 'সুন্দরবনের ইতিহাস' (৪৯ক/১০);
- আবুল হোসেন — 'ক্ষীয়মান' আবদুস শাকুর প্রণীত (৪২/৩); 'ইউরোপের দেশে দেশে' আবদুল মতীন প্রণীত (৪২/৭);
- আমিনুল ইসলাম বেদু — 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (৫২/২);
- আরীফ আস্-সাইয়িদী — 'লেখক সংঘ পত্রিকা' (৪২/৯);
- আবু শাহরিয়ার — আবদুর রশিদ খান ও মোহাম্মদ মামুন সম্পাদিত 'প্রেমের কবিতা' (৪২/১২);
- আবদুন নূর — ' অচেনা দিগন্ত' হাসান ফেরদাউস প্রণীত (৪৫/১); 'প্রত্যাগত' (নাটক, ৪৫/২);
- আবদুল বারী — 'পৃথিবী আমার আমি পৃথিবীর' (৪৫/৭);
- আবদুল লতিফ — 'মুখর প্রান্তর' (৪৫/৭);
- আশরাফ সিদ্দিকী— 'বাউল গান ও দুদ্দুশাহ'; 'যশোর খুলনার ছড়া', (লোকসাহিত্য-৪ বাংলা একাডেমীর বই, ৫০/৬);
- আতোয়ার রহমান —'হাট্টিমাটিম' (৪৫/৯); 'ঝড়ের দেশ' (৪৬/৮);
- আহমদ মজহার — 'অগ্নিদিনের বর্ষা' (৪৭/১২);
- আল কামাল আবদুল ওহাব— 'সীমান্তের চিঠি' (৫০/৬); 'শাহবারিদ খান গ্রন্থাবলী' (৫০/৭);
- আবদুল কাদির খান—' দেখে এলাম রাশিয়া'; 'উত্তর আকাশের তারা' (৪৫/৫); 'শাহীন' (৪৬/১); মাছরাঙা', 'রাতনিঝঝুম'; 'তাক ডুমাডুম' (৪৬/১১); 'পাকিস্তানের আধুনিক সেরা গল্প' (৪৮/৭); 'শীতে বসন্তে' (৪৮ক/১১);
- আবুল ফজল — 'আরণ্য জনপদে' (৪৯ক/১২);
- আবদুল মজিদ —' এক আকাশে অনেক তারা (৪৫/১১);
- আবদুল হামিদ —'খাদ্যের সন্ধানে' (৪৮/৯);
- আলী হোসেন —'একঝাঁক পাখী' (৫২/১);
- আনোয়ারুজ্জামান খান —'শেষ পর্বে শ্রীকান্ত' (৪৫/১১);
- আবদুল গফুর — 'রৌদ্র ঝরা গান' (৪৯ক/১); 'অন্ধকারে একা' (৪৯ক/৩); 'রোকেয়ার নিজের বাড়ী' (৫০/৯);
- আমীর খসরু— 'শতাব্দীর শত কবিতা' (৪৫/১২); 'শান্তির সপক্ষে আমাদের কবিরা' (৪৬/২); 'অমৎসর' (৪৭/৮); 'অর্থনীতির গোড়ার কথা' (৪৭/১২); 'নিরুদ্দেশের পথে' (৪৮/৯); 'বিজয় অভিযান' (৪৮/১০); 'বুনোমেঘ কথা কয়' (৪৯/৪); 'সাঁঝ আকাশের তারা' (৪৯ক/১২);
- আবদুর রহমান—'গীতাঞ্জাম' (৪৫/১২);
- আমীর খসরু চৌধুরী — 'ইচ্ছার অরণ্যে' (৪৯ক/৩); 'নদীর নাম তিসতা' (৪৯ক/১১);
- আবদুল্লাহ সায়ীদ — 'পুষ্পবীথি' (৪৬/১২); 'খোলামন' (৪৭/৪); 'লোকলোকান্তর' (৪৭/১০); 'জীবনাভিসার' (৪৭/১১); 'রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা' (৪৮/১); 'নয়া জাতিস্রষ্টা হজরত মুহম্মদ' (৪৮/৮); 'নজরুল ইসলাম' (৪৯/৭); 'চির উন্নত শির' (৪৯/১১); 'বাংলা হামদ ও নাত সঞ্চয়ন' (৪৯ক/৭); 'পুর্বপাকিস্তানের লোকগীতিকা' (৫০/৪);
- আবদুল হাই — 'আকাশে অনেক নীল' (৪৭/২);
- আবদুর রাজ্জাক খসরু — 'পরিবার গঠনে নারী' (৪৭/৫); 'উত্তরণ' (৪৭/১); 'জীবন ও কোরান' (৪৮/৫); 'পুর্বপাকিস্তানে ইসলামের আলো' (৪৯/৬); 'মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র' (৪৯/১০); 'কাব্যের স্বভাব' (৪৯/১২);
- আবদুর রাজ্জাক — 'রূপরঙ্গ' (৫০/৮);
- ইবরাহীম খাঁ — 'আরণ্যজনপদে' (৪৯/১০);
- ইকবাল হাসান — 'নীলস্বপ্ন' জাহানারা আরজু প্রণীত (৪৬/৩);
- ইবনে হাসান—'কলতান' (৪৯ক/৯);
- এস. এন. কিউ. জুলফিকার আলী —'ভাষা ও সাহিত্য' মুহম্মদ আবদুল হাই প্রণীত (৪১/৯); 'একে একে এক' (৫১/৯);
- এস. এম. নুরুল ইসলাম —'অরণ্য' হাসান ফেরদাউস প্রণীত (৪২/৭); 'নয়ছয়' শামসুল হক প্রণীত (৪২/১১);
- এম. তোরাব আলী — 'কিছুধ্বনি' (৫১/৮);
- ইমরুল কায়েস — 'পূর্ব বাংলার কবিতা' (মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও আবুহেনা মোস্তফা কামাল সম্পাদিত ৩৭/২);

Dhaka University Institutional Repository

- ওয়ালীউজ্জামান —'শিল্পসংস্কৃতি জীবন' আহমদ রফিক প্রণীত (৪২/১);
- কামালউদ্দীন — 'রাঙাপ্রভাত' আবুল ফজল প্রণীত (৪২/৪); 'দিগন্তের তরঙ্গ' (৪৮/৬); 'প্রবালদ্বীপ' (৪৮/৬);
- কামালউদ্দীন খান — 'মীর-মানস' (৪৯/১); 'উত্তর বসন্ত' (৫০/১); 'নয়া সড়ক' (৫০/১); 'সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল' (৫০/৪); 'কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলী' (৫০/২); 'নজরুল রচনাবলী' (৫১/৪); 'পিতা' (৫১/১১); 'নজরুল রচনাবলী' – ৩য় খণ্ড (৫২/৭);
- কাজী মোতাহার হোসেন — 'এক শতাব্দী' (শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের জীবন ও কর্ম, ৪৬/২);
- কাজী আমীন আহমদ —'দুই সাগরের দেশে' (৪৬/১);
- কাজী দীন মুহম্মদ — 'গোধূলির স্বপ্ন' ; 'পথ ও পৃথিবী' (৪৮/১); 'পূর্বপাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' (৫০/১); 'ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' (৫০/১) ; 'দেশকালপাত্র' (৫১/২); 'রক্তাক্ত অধ্যায়' (৫১/৭);
- কাজী সিরাজ — দুই সুর (৪৯/৯);
- খালেকদাদ চৌধুরী—'পিজরাপোল'; 'জুনুআপা ও অন্যান্য গল্প' — শওকত ওসমান প্রণীত (৩৫/১);
- গোলাম রহমান মল্লিক — 'হুইটম্যান থেকে হেহিংওয়ে' (৪২/২);
- গাজী শামসুর রহমান –'মেহের জুলেখা'; 'রাজধানীর ইতিকথা' (৪৮/১০);
- গোলাম মুস্তফা কামাল — 'ইনক্বেলাব' (৪৯ক/৭);
- গোলাম রহমান — 'সংযুক্তা' ; ' অনেক তারার হাতছানি' (৫০/১০); 'অনেক রঙের আকাশ' (৫০/১১);
- জাহানারা ফারুক – 'ধানকমল' (৫১/১১);
- জাহানারা ইমাম — 'শাহ আবদুল লতীফ ভিটাই' (জীবন ও কাব্যানুবাদ, ৫২/১);
- জামিল চৌধুরী — 'বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন' (৪১/৩);
- জামান — 'সমুদ্রে শিশির'— মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল প্রণীত (৪২/৫);
- তালিম হোসেন — 'ক্রান্তিকাল' (৪৬/৭);
- নাঈমউদ্দীন —'জীবন ও প্রেম' (৪৮/৯);
- নাজির আহমদ — 'প্রেমে পড়েছি কৃষ্ণচূড়ার' (৪৬/৮);
- নুরুল ইসলাম — 'তওহীদ' বযলুর রহমান বি. টি. প্রণীত (৪২/৮); 'প্রত্যাগত'; 'শিল্পীর মন' মহীউদ্দীন প্রণীত (৪৫/২); 'আমার খামার' (৪৮/৮);
- ফখরুজ্জামান চৌধুরী — 'শীতবসন্তে' (৫০/১১);
- বদিউদ্দিন মোল্লা —'সাহিত্য শিল্প' (৫০/১০);
- বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর— 'উপাত্ত' (৪৫/৬);
- ফখরুজ্জামান চৌধুরী— 'জুলেখার মন' (অগ্রহায়ণ ১৩৬৬); 'মীরা মিত্র' সিদ্ধার্থ মৈত্রেয় প্রণীত উপন্যাস (৪২/১); 'অন্বেষা' আবু শাহরিয়ার প্রণীত উপন্যাস (৪২/২);
- মোস্তফা কামাল —'জিব্রাইলের ডানা' শাহেদ আলী প্রণীত (৩৫/১০–১১);
- মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী — 'আরণ্য নীলিমা' আহসান হাবীব প্রণীত (৪৬/৪–৫); 'আমার সোনার দেশ' ; 'সীমান্ত শিবিরে' (৪৯ক/৪); 'ঢাকাই মসলিন' (৫০/১);
- মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ— 'দিগন্তের পথে একা' মহীউদ্দীন প্রণীত (আশ্বিন ১৩৬৭); 'দৃষ্টি' (৪৯/১); 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' (৫১/১);
- মুহম্মদ ওসমান গনি — 'পথ বেধে দিল' আ. ন. ম. বজলুর রশীদ প্রণীত (৪৭/৯);
- মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান — আ. ন. ম. বজলুর রশীদ প্রনীত 'রবীন্দ্রনাথ' (৪৫/৩);
- মোহাম্মদ ফজলুর রহমান — 'রবীন্দ্রনাথ : হিন্দুধর্ম ও জাতীয়তাবাদ' (৫২/১); 'সুখ' (৫৩/২);
- মোহাম্মদ আলী — 'ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা' (৪২/৬);
- মীর আবুল খায়ের — তারাপদ রায় প্রণীত, 'তোমার প্রতিমা' (৪৫/৩);
- মোহাম্মদ মতিয়র রহমান — 'মহাস্থান ময়নামতী পাহাড়পুর' (৪৯ক/৬);
- মখদুম-ই-মুলক মাশরাফী —'ভাষাসমস্যা ও অন্যান্য প্রসঙ্গে: (৫২/৩); 'উচ্চারণ' (৫২/১০)
- মেরী আহমদ — 'মন মনান্তরে' (৪৬/৮); 'মেহের নিগার ও অন্যান্যিকা' (৪৭/৩);
- মেরী মনোয়ার — 'ত্রিমাত্রিক' (৪৯ক/২);
- মুনীর চৌধুরী —'প্রবাহ' (৪৮/৮); 'রেখাচিত্র' (৪৯ক/৫);
- মোজাফফর হোসেন —'ফ্রন্টের কবিতা' (৪৯/৭);
- মোশাররফ হোসেন — 'ধ্বংস পাহাড়' (৪৯ক/১) ;

Dhaka University Institutional Repository

- মোহাম্মদ মুস্তীবুর রহমান — 'কাব্যে আমপারা'(৫২/৭);
- মোহাম্মদ শামসুজ্জামান খান — 'আশার নাম মৃগতৃষ্ণিকা (৪৯ক/৫)
- রনেশ দাশগুপ্ত— 'অন্ধকার সিঁড়ি' আলাউদ্দীন আল আজাদ প্রণীত (৪/১);
- মোহাম্মদ আবদুর রশিদ মিয়া — 'পলাশডাঙ্গার উপকথা' (৪৯ক/৭);
- রওশন আরা — 'রঙ ও রেখা' (৫১/৩);
- রোকেয়া বারী — 'মৌসুমী মন' (৫৩/আশ্বিন ৭৮) ;
- রশীদ হায়দার — 'চরিত্রহননির অধিকার' (৫০/১); 'আরবী কবিতা' (৫০/৭);
- শাহাবুদ্দীন আহমদ — 'অন্বেষণ' (৪৭/৯) ;
- শেখ আবদুর রহমান - 'নানকুর বোধি' (৪৯ক/৩) ;
- শেরিদ আতিয়ার রহমান — 'পথ ও পৃথিবী' (৫২/১২) ;
- সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় — 'বন্দীমুহূর্ত' আবদুর রশীদ খান প্রণীত (৪২/৮) ; 'অনিদ্র পলাশ' (৪৯ক/৮) ;
- সানাউল্লাহ নূরী — 'পূর্ব পাকিস্তানের লোককাহিনী' (৩৫/১০-১১) ;
- সেলিম চৌধুরী — 'আমার প্রথম প্রেম' মিন্নাত আলীর রস-রচনা (৪২/৩) ;
- সৈয়দ ফজলুল বারী — 'নটীর প্রেম' কাজী মোহাম্মদ ইদরিস প্রণীত (৪২/৭) ; 'কন্যাকুমারী' আবদুর রাজ্জাক প্রণীত (৪২/১০) ; 'মৃত্তিকা' (৪৫/১২) ; রাজিয়া মাহবুবের 'স্বনির্বাচিত গল্প' (৪৬/২) ; 'ভরানদীর বাঁকে' জাহানারা হক লিখিত উপন্যাস (৪৬/৬) ; 'অরণ্যের সুর' (৪৭/৪) ; 'বিখ্যাত ব্যক্তিদের সংগ্রাম ও সাধনা' (৪৯/৯) ; জওয়াত ওয়া বানাতুন নবী (৪৯/৭) ;
- সৈয়দ নুরুল ইসলাম — 'রূপময় পশ্চিম পাকিস্তান' (৪৭/১) ;
- সৈয়দ আবদুল বারী — 'বেদনার এই বালুচরে' (৪৭/২) ; 'রমনার কবি' কে. এম. শমসের আলী প্রণীত (৪৭/৭) ; 'ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ গল্প' (৪৭/১০) ; ছোটদের 'বিশ্বনবী' (৪৭/১১) ; আওরঙ্গজেব (৪৮/৬) ;
- হুমায়ুন খালিদ — 'পাকিস্তানের উপজাতি' (৪৭/৫) ; 'ইকবাল মানস' (৪৮/২) ; 'হলদে লতা' (৪৮/৩) ;
- হোসনে আরা খানম — 'পথ ও পৃথিবী' (৪৮/৪) ; 'রূপান্তর' ৫২/৬) ;
- হাসান হাফিজুর রহমান — হাকলবেরী দিনের দুঃসাহসিক অভিযান (৪৯ক/৪) ;
- হাবিবুর রহমান — 'স্বাতী' হামিদা রহমান প্রণীত (৪৯ক/৭) ;
- হাবিবুল্লাহ হাবীব — 'সখিনা প্রয়াণ কাব্য' (৫২/৯) ;

গ. সওগাতের সাহিত্যিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা

সাহিত্য

সওগাতের পাকিস্তান আমলের ভূমিকাও প্রগতিশীলই ছিল। আবুল ফজল, আবদুল কাদের, আবুল হুসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, আবদুল হক, আহমদ শরীফ, আতোয়ার রহমান, আবদুল গনি হাজারী, আনিসুজ্জামান, আবদুল্লাহ আল মুতী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবুল হাসানাত, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুল কাদির খান, আবদুল মওদুদ, আবদুল আহাদ, আতাউর রহমান, ওবায়দুল হক সরকার, কামরুল হাসান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মোহাম্মদ আজরফ, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, মোহাম্মদ মোর্তজা, মযহারুল ইসলাম, মতিন উদ্দীন আহমদ, মহিউদ্দিন, মনিরুজ্জামান, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, মোহাম্মদ ইদরিস, মুফাখখারুল ইসলাম, রনেশদাশ গুপ্ত, রফিকুল ইসলাম, রফিক আজাদ, রশিদ আল-ফারুকী, শামসুর রাহমান, শাহেদ আলী, শামসুল হক, সেলিম আলদীন, সরদার ফজলুল করিম, সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, সুফী মোতাহার হোসেন, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, হাসান হাফিজুর রহমান, হাসান জামান প্রমুখ পূর্ববাংলার তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে সাহিত্যের নানা সমস্যা ও সংকট এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করেছেন। স্পষ্টতই আধুনিক কালের বিশ্বসাহিত্যের মানদণ্ড তাঁদের সামনে থাকলেও পাকিস্তানী বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ কি হবে তা নিয়ে যে প্রধান বিতর্ক তৎকালে প্রচলিত ছিল, - সে বিষয়ও তাঁরা এড়িয়ে যেতে পারেননি বলে কালিক প্রতিফলন ঘটেছে। তবে অন্যান্যের তুলনায় কালের বিবেচনায় সওগাতের আদর্শ মোটামুটিভাবে প্রগতিশীল ছিল। সওগাতের প্রধান লেখকেরা সাম্প্রদায়িক কূপমণ্ডুকতা দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলেন না। এঁদের মধ্যে যাঁরা তরুণতর ছিলেন, তাঁরা পাকিস্তানী বাংলা সৃষ্টির পদক্ষেপকে একদম সমর্থন করতে পারেননি। ভাষা ও সাহিত্যের আদর্শ খুঁজতে গিয়ে বাংলা সাহিত্যের মূলধারা থেকেও তাঁরা বিচ্যুত হননি। নতুন দেশে বাংলা সাহিত্য যে নতুন রূপের সন্ধান করবে এ বিষয়ে তাঁরা মোটামুটিভাবে নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন বলে 'ইসলামী' বা 'পাকিস্তানী' সাহিত্যচর্চার প্রয়াসকে সমালোচনা করে সমগ্র বাংলার সাহিত্যাদর্শ ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা যে কল্যাণকর হবে না — তাও ১৯৫২ সনে প্রকাশিত এর প্রথম সংখ্যার 'সাময়িকী'তে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছিল। আজাদ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অভাবিত

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব ঘটনায় মুসলমানদের মন নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল হয়ে উঠবে, এতে বিষ্ময়ের কিছু নেই, 'কিন্তু.... এই স্বাভাবিক আলোড়নের মধ্যেও সাহিত্যিক চিত্তকে অচঞ্চল রাখিতে না পারিলে সাহিত্যের বিশ্বজনীন ধর্ম হইতে স্খলন ঘটিবার আশংকা প্রবল হইয়া দেখা দিবে।... হিন্দু-সাহিত্য, মুসলিম সাহিত্য, খৃষ্টান- সাহিত্য নাম দিয়া সাহিত্যকে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করা চলেনা। সকল দেশ, সকল জাতি ও সকল ধর্মের উর্ধে মানুষের সাহিত্য-সাধনার প্রশস্ত ক্ষেত্র বিরাজমান। এই ক্ষেত্র যিনি কর্ষণ করিতে ব্রতী হইবেন, প্রকৃত সাহিত্যিকের আসন তাঁহারই প্রাপ্য।' অবশ্য ইসলামী আদর্শকে আগের মতোই বর্জনীয় মনে করা হয়না — "তবে এও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, চিন্তার ক্ষেত্রে মানুষের সর্বাংগীন কল্যাণকে রূপ দেওয়া এবং সেই কল্যাণের দিকে মানব-মনে একটা বলিষ্ঠ প্রবণতা জাগাইয়া তোলার সাধনায় ইসলাম সাহিত্যকে যথেষ্ট শক্তি দান করিতে পারে — যদি তিনি দীর্ঘ যুগ সঞ্চিত অন্ধতা ও কুসংস্কারের জঞ্জাল সরাইয়া তার প্রাণের মনি-কোঠায় প্রবেশ করিতে পারেন। এ বড় কঠিন কাজ। অতীতে মুসলিম নামধারীরাই ইসলামের গতিশীলতা অবুদ্ধি ও কুবুদ্ধির প্ররোচনায় স্তব্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাই সে মানবধর্ম বা মানবের স্বাভাবিক ফিৎরৎ নামে অভিহিত হইয়াও মানবীয় জগতের প্রকৃতিগত চলিষ্ণুতার সহিত তাল রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। তাই আজ অসহায় মুসলিম গতিধর্মী ইসলামের পংগুকৃত রূপকে নিরুপায় ভালাবাসা দিয়া গতির সবটুকুকে দুর্গতি নামে গালি পাড়িতেছে।' এজন্যই সওগাতের আশঙ্কা : 'এই মনোভাব কোনো সাহিত্যিককে তাঁর ব্যক্তিগত কল্যাণ-বৃদ্ধিকে বিশ্ব-মানবতার দিকে প্রসারিত করিতে সাহায্য করিবে বলিয়া আমাদের ধারণা হয় না।' সুতরাং 'পাকিস্তানে ইসলামীয়ানায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইবে, — এই ধ্বনির অর্থ, ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য প্রকৃত সাহিত্যিকচিত্তের অধিকারীদের অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। স্থূল ধর্মীয় প্রচারণা আর সাহিত্য এক জিনিস নয়। সাহিত্য যে কল্যাণের আশ্রয়, ধর্মের অনাবিল মৌলিক প্রবণতা তার চর্চায় সাহিত্যিক মন ও দৃষ্টিতে সূক্ষ্মভাবে একটা বিশিষ্ট ভংগিমা আনিয়া দিতে পারে মাত্র। পাকিস্তানে সাহিত্যের নূতন ধারা বলিয়া যাহা বুঝানোর চেষ্টা করা হইতেছে, খাঁটি সাহিত্যিকের কাছে তার মতলব এর চেয়ে বেশী বা এর থেকে অন্য কিছু নয়।'[৮]

উপরের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় বাংলা সাহিত্যের ভাষার, শব্দের ও রীতির স্বাভাবিকতাকে পূর্ববাংলার সাহিত্যেরও বৈশিষ্ট্যরূপে মেনে নিয়ে অখণ্ড বাঙলা সাহিত্যের নবপর্যায়ের আন্দোলনকারী, বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের যাত্রাপথের সহযাত্রী 'সওগাত' হয়েছিল। তবে এও সত্য যে সাহিত্যক্ষেত্রে মতপথের ও আদর্শের বিভাজনকে সওগাত দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করতে পারে নি। সংকরভূমিকার জন্যই ইসলামী বা পাকিস্তানী বাংলা সাহিত্যের সমর্থকদের রচনাও সওগাতে ছাপা হয়েছে। এ কারণে সাহিত্যের নবযাত্রায় 'সওগাতের' স্ববিরোধীতা লক্ষণীয়।

বাঙলা ভাষার রাষ্ট্রীয় আদর্শের ও মর্যাদার প্রশ্নেও সওগাত প্রথমদিকে মোটেই দূরদৃষ্টির পরিচয় দেয়নি। বাঙলাভাষার রূপের প্রশ্নে যেমন দেয়া হয়েছিল। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের পর বাঙলাকে 'প্রাদেশিক ভাষা'র মর্যাদায় স্বীকার করে আরবীকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে মেনে নেয়ার জন্য জোর সুপারিশ করা হয়েছিল। সাহিত্যের 'রূপের' প্রশ্নে তাঁদের যে ভাষাগত সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়, বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার প্রশ্নে তা অনুপস্থিত। "পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের ন্যায় রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের ব্যাপারটাও অযথা বিলম্বিত হইয়াছে। তবে এ দুটা ব্যাপারে একটা পার্থক্য দেখা যাইতেছে। শাসনতন্ত্র প্রস্তুত না-হওয়ায় তা এখনও চালু হয় নাই ; কিন্তু রাষ্ট্রভাষা নির্ধারিত না-হইলেও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ধরিয়া তা পূর্ববঙ্গে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হইতে বাধ্যতামূলক করার আদেশ জারি হইয়াছে। এরূপ আদেশের যৌক্তিকতা বা কারণ পরম্পরা আমরা অবগত নই। তবে এর ফলে বিশেষতঃ পাকিস্তানের উচ্চতম কর্তৃপক্ষীয় মহলের কাহারও কাহারও চিন্তাহীন উক্তির প্রতিক্রিয়ায় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে এই প্রদেশে এক প্রবল আন্দোলন চলিয়াছে এবং তার একটা দুঃখজনক পরিণতিও ঘটিয়া গিয়াছে। আমরা জানি, জনমতের চাপে আমাদের প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণের জন্য সুপারিশ করিয়া এখানকার ব্যবস্থা পরিষদে একটা সর্বসম্মত প্রস্তাব পাশ করাইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গণপরিষদে পাক-প্রধানমন্ত্রী জনাব খাজা নাজিমউদ্দীন তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের সময় এ সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে বলিয়া তিনি ব্যাপারটা একরূপ ধামা-চাপা দিয়াছিলেন। এখনও তা সেই অবস্থায়ই পড়িয়া আছে, অথচ, সংবাদে প্রকাশ, পাক শাসনতন্ত্র রচনায় আর বিলম্ব করা হইবেনা। শাসনতন্ত্র রচনার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রভাষাও নির্ধারিত হইয়া যাইবে, এরূপ ধারণা স্বাভাবিক। তাই সংবাদপত্রে দেখা যাইতেছে, এই প্রদেশের স্থানে-স্থানে বিভিন্ন সভাসমিতিতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী আবার উত্থাপিত হইতেছে। সুতরাং আমাদের উচ্চতম রাষ্ট্রনেতাদের পক্ষে বাংলা ভাষার দাবী সম্পর্কে সুবিবেচনার পরিচয় দেওয়া উচিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।" এতোসব ভালো কথা বলার পর পত্রিকাটির যুক্তি : "গোটা পাকিস্তানের লোকসংখ্যা কিঞ্চিদধিক সাড়ে সাত কোটী। তন্মধ্যে পূর্ববঙ্গেই প্রায় সোয়াচার কোটী লোকের বাস। এরূপ বিপুল জনসংখ্যার অধিকারী একটী প্রদেশের জনমতের দাবী উপেক্ষা করা রাজনীতিকোচিত কার্য হইবে, কেহই এমন কথা বলিবেন না। বিশেষতঃ যে জনমতের পশ্চাতে আমাদের ভবিষ্যত আশা-ভরসার স্থল তরুণ-তরুণীদের সংকল্পবদ্ধ মনোভাব বিদ্যমান, তা কখনই অবহেলার বস্তু নয়। সন্তুষ্ট পূর্ববংগই পাকিস্তানের শক্তির কারণ হইবে। অসন্তুষ্ট বা বিক্ষুব্ধ পূর্ববংগ নয়। এটা এত সহজ কথা যে, পাক-প্রধানমন্ত্রী ও পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ও ভ্রাতৃস্থানীয় নেতৃবৃন্দের তা না বুঝিবার কারণ দেখা যায়না। অবশ্য শুধু উর্দুকে কিংবা একসংগে উর্দু ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিলে তাতে পাকিস্তানের সবগুলি প্রদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষা-সমস্যার জটিলতার বৃদ্ধি পাইবে কিনা এবং তাতে পাকিস্তানের জাতীয় মনীষা ও মনস্বিতার পূর্ণ বিকাশের পথে মারাত্মক বাধা সৃষ্টি হইবে কিনা, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি এই গুরুতর প্রশ্নেরও সম্মুখীন হইয়াছেন। ধর্মভাষা হিসাবে আরবী পাকিস্তানের সর্বত্র অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় গণ্য হওয়ায় তাঁহারা মনে করিতেছেন, বাংলা ও উর্দুকে যথোচিত প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া ধর্মভাষা আরবীকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা সঙ্গত হইবে। এই অভিমতের সমর্থনে তাঁহারা যে যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছেন, তা ছেদন করা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।.. যাহোক, আমরা আশা করি, পাক গণপরিষদের সদস্যবৃন্দ, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এবং নেতৃস্থানীয় তরুণ-দল শুধু এক একটা ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত না-হইয়া শান্তচিত্ত ও উদার দৃষ্টিভংগি লইয়া জাতীয় জীবনের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নটীর সমাধান করিতে অগ্রসর হইবেন। নতুবা নানা দিক দিয়া ভবিষ্যতে আমাদের সকলেরই প্রিয় রাষ্ট্র পাকিস্তানের ভীষণ ক্ষতি হইতে পারে।"[৯]

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগ পরবর্তীকালের সাহিত্যিক এবং লেখকদের মধ্যে ভাবনার বিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায় সাহিত্যের প্রকৃতি নিয়ে বিতর্কে। ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীলেরা ইতিহাসের বিবর্তন ধারার প্রেক্ষিতে মানুষের জীবন-ধারণ ব্যবস্থার বিকাশের ধারাকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে যা কিছু এর প্রতিবাদী তাকে উচ্ছেদ করার পক্ষপাতী ছিলেন। যে মূল উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে সমাজের উত্থান-পতনের সম্ভাবনা নিহিত, তাকে সমাজের অস্তিত্ব এবং বিকাশের স্বার্থে অধিকতর বলিষ্ঠ করার লক্ষ্যে ব্যপৃত হতে হবে বলে তাঁদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হলো-- ধনতন্ত্রবাদের উচ্ছেদ চাই; এবং সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার বিকাশ প্রয়োজন। এজন্যে পূর্ববাংলার সাহিত্যের ভবিষ্যত রূপ সম্বন্ধেও দুইদলের বক্তব্য ও মতাদর্শে দুটি পৃথক ধারায় স্বাতন্ত্র লাভ করলো। একদলে ইসলামী বা ধর্মীয় আদর্শে পুষ্ট পূর্ববাংলার সাহিত্যকে মানুষের জীবনধারণ ব্যবস্থা ও মানস-গঠন কর্মের মূল-দর্শন রূপে প্রয়োগের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় দলের লেখকচিন্তকেরা মনে করলেন পূর্ববাংলার মানুষের জীবন ধারণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নতুনতম আদর্শে নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য। তাঁরা পূর্ববাংলার সাহিত্যকে পৃথিবীর ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল দেশগুলির আদর্শে মানুষের জীবনব্যবস্থাকে সুপরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করে পরম মুক্তির পথ শ্রেণীহীন সমাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করার পক্ষপাতি ছিলেন। তবে "ধর্ম নিরপেক্ষ প্রগতিশীল... সাহিত্যিকদের মধ্যে... দুটো বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। কিছুসংখ্যক... 'ব্যক্তি'ই থেকে যেতে চান, বাকী অন্যান্য লেখকেরা মূল সামাজিক দৃষ্টির সমগ্রতা নিজেদের চোখে আরোপ করতে প্রয়াসী হন ; অর্থাৎ নিছক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার চাইতে তাঁরা সামাজিক মানুষের ব্যাপক অভিজ্ঞতা থেকেই সাহিত্যের উপাদান আহরণের চেষ্টা করেন। এর ফলে বড় রকমের ভুল করার সম্ভাবনা একেবারেই থাকেনা, এবং কোন দায়িত্ব একলা করে নিজের ঘাড়ে নিতে হয়না।"-

সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধানের জন্য অবিভক্ত ভৌগলিক বাংলার সামগ্রিকতার প্রভাব এড়িয়ে "সত্যিসত্যি কোন নতুন চিন্তা প্রবর্তন করার যুক্তিসহ প্রয়োজন আছে কিনা" সেসম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেছেন এবং তর্কের বিষয় বলে মনে করেছেন। তাঁরা প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন : "এই প্রশ্নেরই অন্যতম প্রধান শাখা হিসাবে পূর্ব বাংলার বর্তমান কালের বাংলাদেশের ভৌগলিক এবং জাতিগত সামগ্রিকতাকে অগ্রাহ্য করে নতুনতর কোন সাহিত্য পূর্ব বাংলার সাহিত্য নামে নবতর পদ্ধতিতে রচিত হবে কিনা সেকথা বিচার করে দেখতে হবে। কারণ পূর্ববাংলার বর্তমান শাসক সম্প্রদায়ের বিভাগপূর্বকালীন সাধনা ছিল রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করা ; রাষ্ট্রনীতি-সম্পৃক্ত সাংস্কৃতিক জীবনকে নতুন কোন ছাঁদে পুনর্গঠন করার কোন পরিকল্পনা তাঁদের ছিলনা। বিভাগোত্তর পূর্ববাংলায় পাকিস্তানীরূপ দানের প্রয়াস নতুন করে গৃহীত হলো। কেউ পাকিস্তানী চরিত্র দিয়ে অর্থাৎ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিকে সৃষ্টি করতে রাজী হলেন, কেউ হলেন না।"[১০] কিন্তু একথা ঠিক যে দেশ বিভাগের পর কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলা সাহিত্য 'ভাষা ও ভাবের দিক দিয়ে পশ্চিম বাংলার সাহিত্যের থেকে কিছু স্বাতন্ত্র" অর্জন করে ফেলে। ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন আশা করেছেন : "এই স্বাতন্ত্র ক্রমে আরও দানা বাঁধবে। অনেক নতুন সাহিত্যিকের মধ্যে উদ্দীপনা আর প্রতিশ্রুতি দেখা যাচ্ছে।"

'পূর্ববাংলার সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি সরকারকে বাংলাভাষার বিরুদ্ধাচরণের জন্য সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হননা। 'কিন্তু ইসলাম ধর্মের প্রতি আনুগত্য থেকে তিনি ইসলামীভাববর্জিত পাকিস্তানী আদর্শ-বিচ্যুত সাহিত্যকেও পছন্দ করেননি। উপরোক্ত প্রবন্ধটি ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সাহিত্য অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ রূপে তিনি পাঠ করেছিলেন। মধ্যযুগের সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম শাসক অমাত্যদের অবদানের উল্লেখ করে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর হীনমন্যতার অভিযোগ উত্থাপন করে তিনি বলেন ঃ "বর্তমান বিদ্বিষ্ট পরিবেশের ভিতর থেকে এই ব্যাপার লক্ষ্য করলে সত্যিই আমাদের পূর্ববর্তীদের ঔদার্যের প্রশংসা না করে পারা যায়না।" তবে লেখক সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা আক্রান্ত ছিলেন না বলে বলতে দ্বিধান্বিত হননি : "বিশেষ করে বাংলাদেশে শতকরা বিশজন অমুসলমানকে অগ্রাহ্য করে আমরা সাহিত্য বা সমাজ কিছুই পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে পারব না। এই দিক দিয়ে পশ্চিমপাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব বাংলার সমস্যা ভিন্ন ধরনের, এবং দায়িত্বও অনেক বেশী।' বাংলা গদ্য সম্পর্কেও তিনি যুক্তিশীলতার পরিচয় দেন। গদ্য-সাহিত্য হিন্দু-লেখক-সাহিত্যিকদের দ্বারা পুষ্ট হয়েছে বলে হিন্দু-সভ্যতার পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাতে ; কিন্তু এ থেকে "একথা কিছুতেই প্রমাণিত হয়না যে, বাংলা গদ্যসাহিত্য কেবল হিন্দু সভ্যতার বাহন হবারই উপযুক্ত— মুসলিম তমদ্দুন বহন করবার যোগ্যতা এর নেই। ভাষা মানুষ সৃষ্টি করে, এতে যে বোল বলান যায় সেই বোলই বলে।" তিনি আরও মন্তব্য করেন ঃ "দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার লক্ষ্য টাকা উর্দু-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্যয় করছেন অথচ, বাংলা ভাষার সাহায্যে ইসলামী তমদ্দুন প্রচার করা-- যার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী— তারজন্য উল্লেখযোগ্য কিছুই করছেন না। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের চৈতন্যদয় না হলে পূর্ববাংলা আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে না... অদূর ভবিষ্যতে আমাদের নবযুগের সাহিত্যিকদের কল্যাণে আপনা হতেই মুসলমানের চিন্তাভাবনা ও জাতীয় আদর্শ পর্যাপ্ত পরিমাণে এ ভাষায় এসে পড়বে এবং তার ফলে ভাষার রূপও ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিকভাবেই বদলে যাবে। এরজন্য বাংলা বর্জন নয় এর বহুল চর্চাই আবশ্যক।"

তিনি আরও বলেন, ধর্মপ্রাণ সাহিত্য চাই--ধর্মান্ধ নয়। "গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, চিত্র, প্রভৃতির মারফত আমাদের সাহিত্যিকেরা দেশের লোকের চোখ ফুটিয়ে দিবেন। মোট কথা, জীবনের সব দিকেই সাহিত্যিকদের সত্যদৃষ্টির সন্ধানী আলোক ফেলতে হবে।... সাহিত্যে কেউ উপেক্ষিত হবেনা। সুপুষ্ট সাহিত্যে যেমন যুবক-যুবতীর প্রেম কাহিনী বা মনস্তত্ত্ব থাকবে তেমনি শিশুর রঙ্গীণ স্বপ্ন, কর্মীর কর্মচাঞ্চল্য, আর বৃদ্ধের অভিজ্ঞতাও স্থান পাবে।"[১১]

'সাহিত্যে বিপন্নবাদ' শীর্ষক আলোচনায় আবদুল গনি হাজারী — যে আলোচনা করেন, তা মোহাম্মদীর প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়। বলাবাহুল্য, কাজী মোতাহার হোসেনের উপর্যুক্ত প্রবন্ধকেও মোহাম্মদী কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। আবদুল গনি হাজারী বলেন : "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাঁচ বছর চলে গেছে। এর মধ্যে পুরাতন সাহিত্যিকদের অধিকাংশই সরেজমীন থেকে সরে পড়েছিলেন। কিছু সংখ্যক নতুন লেখকই বরং আমাদের গত পাঁচ বৎসরের অত:পর সম্ভাব্য-লজ্জাকর সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব থেকে রক্ষা করেছেন। এজন্য তাঁদের আমি আজ একবার জোর গলায় অভিনন্দন জানাতে

Dhaka University Institutional Repository

চাই। আজ যাঁরা সাহিত্যে শাসনের খাড়া তুলে এগিয়ে এসেছেন গত পাঁচ বছর ধরে তাঁরা নিজেদের মধ্যে স্বার্থের কোন্দলে ব্যস্ত ছিলেন। আজ তাঁদের অনেকে মোটা মোটা গদীতে আসীন, এখন তাঁদের নজর পড়েছে অনেক-আগেকার-চষে আসা ক্ষেতের দিকে। সেখানে আজ নতুনেরা আসর জমিয়েছে। কিন্তু সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাজত্ব করবার একটা দাঁও এভাবে ফসকে যেতে দেওয়া যায়না। তাই নতুনেরা যে সাহিত্যই সৃষ্টি করুক, যে সভাই করুক, যে সংগঠনই করুক তার পেছনে যুক্তবঙ্গ আন্দোলন ও পররাষ্ট্রানুগত্যের নিদর্শন দেখতে হবেই।" সৈয়দ আলী আহসানদের ন্যায় ইসলামী সংস্কৃতির প্রবর্তক ও অনুসারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন ঃ

"তাঁরা তাঁদের এই রাজত্বের দাবীর পোষকতার জন্য ইসলামকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করছেন। কিন্তু আমরা-ত জানি তাঁদের কে কতখানি ইসলামী আদর্শে ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনা করেন। কথায় ও কাজেকর্মে স্ববিরোধী হওয়াও বর্তমান সমাজের একশ্রেণীর লোকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।"

আবদুল গনি হাজারী সৈয়দ আলী আহসানের একটি আলোচনার মূল বক্তব্য উদ্ধৃত করে আহসান শ্রেণীর লেখকসাহিত্যিকদের 'বিপন্ন'বাদের জবাব দিতে গিয়ে বলেন : "পূর্ব বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একশ্রেণীর সাহিত্যবাজ যে বিপন্নবাদের ধুয়া তুলেছেন তা এখন আর কোন সংবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে উপেক্ষা করা সমীচীন হবে না। এই শ্রেণীর লোকেরা চিরকালই তাঁদের কায়েমী স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটবার সম্ভাবনা দেখলে কোন না কোন কিছু বিপন্ন হয়েছে বলে হৈ চৈ করে লোকসাধারণের দৃষ্টি বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেছেন সর্বদেশে। কাজেই এঁদের সম্বন্ধে আমাদের পূর্বাহ্নেই সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল হওয়া প্রয়োজন।"

আলী আহসানের কথিত প্রবন্ধে পূর্ব বাংলার সংস্কৃতিকে বিপন্ন করে তোলার অভিযোগে প্রগতিশীল ও নতুন শিল্পী-সাহিত্যিকদের নানান অন্যায় ও কুৎসিৎ ভাষায় গালাগালি করা হয়েছিল ঃ "পূর্ব-পাকিস্তানের চিন্তাক্ষেত্রে আজ চরম নৈরাজ্য চলছে— ধর্মবোধের ক্ষেত্রে এক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছে যার একমাত্র উদ্দেশ্য মানবমনের ধর্মগত বিশ্বাসের উচ্ছেদ। সংস্কৃতি অর্থ এদের কাছে মানুষের এক বিশেষ ধরণের পরিপূর্ণতা যা মানুষে মানুষে সমন্বয়বোধকে এবং সর্বক্ষেত্রের সর্বপ্রকার চিন্তাকে অবলম্বন করেই বিকশিত। বর্তমানে এর অর্থ আমাদের দেশে দাঁড়িয়েছে — পূর্বতন সম্পূর্ণ বাংলার সমন্বয়গত চিন্তাধারাকে অনুসরণ করা এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতির মধ্যে এক প্রকার ঐক্যতত্ত্ব নির্ণয় করে শাশ্বতবঙ্গের প্রতিষ্ঠা করা।"

এর জবাবে আবদুল গনি হাজারী সওগাতে লিখেছিলেন — 'জনাব আহসান যে ভয়ের কথা উচ্চারণ করেছেন সেগুলো অমূলক এবং বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। তবু তাঁদের মনে যখন এই নৈরাজ্যের বোঝা একবার চেপেছে তখন এ থেকে মুক্তি পাওয়াও তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক'। 'এ মুক্তি তখনই আসবে যখন আমরা নিছক নির্দেশ নয়, আমাদের আদর্শ-সমন্বিত যথার্থ সাহিত্যরস পরিবেশন করতে পারবো'। এই সাহিত্য-রস পরিবেশনের উপায় উদ্ভাবন সম্পর্কেও সৈয়দ আলী আহসান এক ফিরিস্তি দিয়েছিলেন ঃ

১. পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য পূর্বতন সম্পূর্ণ বাংলার সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। পূর্বতন ধারার পোষকতা না করে নতুন ধারার সৃষ্টি করতে হবে।
২. আমাদের নতুন সাহিত্য মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে।
৩. ইসলামের নিশ্চিন্ত একত্ববাদ, নিত্যক্রিয়াকর্ম-পদ্ধতি এবং ধর্মীয় আদর্শ আমাদের নতুন সাহিত্যে স্ফূর্তি পাবে।
৪. ইসলামের প্রবহমান ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে আমাদের সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করবো।
৫. পূর্ব বাংলার পল্লীজীবনকে জাগ্রত রাখতে হবে আমাদের কল্পনায়।
৬. পুথি সাহিত্যকে অবলম্বন করবো নতুন সাহিত্যের উপাদান হিসেবে।
৭. কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যের উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করে পূর্ববাংলার পরিবেশ এবং জীবনকে ক্রমান্বয়ে আমাদের সাহিত্যে রূপ দিতে হবে।
৮. আমাদের সাহিত্যের ভাষার পরিবর্তন হতে বাধ্য।
৯. সর্বোপরি বিশ্বের সমস্ত শোভন এবং কল্যাণপ্রদ বস্তুকে আমাদের উত্তরাধিকার বলে গ্রহণ করতে পারি। হাদিসের উক্তি স্মরণ রাখতে হবে—সমস্ত কল্যাণপ্রদ বস্তুই মোমেনের মীরাশ।

আবদুল গনি হাজারী সুশৃংখলভাবে একে একে আলী আহসানের বক্তব্যের একদেশ দর্শী চিন্তার অসারতার পরিচয় তুলে ধরেছেন। আসলে এইসব আলোচনায় সৈয়দ আলী আহসানের নানান কপট উক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তিনি ভাষার কোন পরিবর্তন নিজের সাহিত্যে আনেননি অথচ ভাষার পরিবর্তন কামনা করেন এবং অবশ্যম্ভাবী বলে মন্তব্য করে রাজনৈতিক স্বার্থে পরিবর্তনকারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন, উসকানী দেন, অথবা তাঁদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন বা হক ভাষায় 'দালালী' করেন। আলোচক হাজারী সাহেবের মন্তব্য :

"এই 'বাতুল' প্রস্তাব কখনো অনুসরণ করা সম্ভব নয়। নজরুল সাহিত্যও 'পূর্বতন সম্পূর্ণ বাংলার সাহিত্য'। আলী আহসানের সৃষ্টিতো সর্বোভাবে রাবিন্দ্রিক।'

বাংলা সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করার বক্তব্য অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং সাম্প্রদায়িক চেতনাজাত। শুধু মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনভাবনা সাহিত্যের অঙ্গীভূত হবে— এই বক্তব্যে, হিন্দু, বৌদ্ধ, চাকমা, হাজং, নানকার সকলেরই ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে। 'সম্পূর্ণ বাংলার' হিন্দু-সাহিত্যিকদেরকে তাঁরা এককালে যেকারণে মুসলিমবর্জিত এবং মুসলিমদেরকে হেয় করা হয়েছে বলে গালাগলি করতেন, আজ রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে তাঁরা নিজেরাই কায়েমী স্বার্থী হিসেবে সেইসব সাহিত্যিকের আসনে জাঁকিয়ে বসেছেন। 'নীতিবোধের দিক দিয়ে এখন আর তাই তাঁদের ঠেকবে না।'আবদুল গনি হাজারী সৈয়দ আলী আহসানের বক্তব্যে দৃষ্টিভঙ্গীর সংকীর্ণতা এবং 'চিন্তার অপরিচ্ছন্নতা' লক্ষ্য করে মন্তব্য করেন :

Dhaka University Institutional Repository

"সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁরা আদপেই এ পর্যন্ত কিছু করেননি, একথা সকলেরই জানা। যখনি তাঁরা কিছু করতে যান অন্তর্দ্বন্দ্বে তাঁদের আয়োজন ভেঙে পড়ে। অথচ এদিকে নতুন শিল্পী-সাহিত্যিক বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ক্রমেই এগিয়ে চলেছেন, অসারেরা তাই এখন তর্জন-গর্জন শুরু করেছেন, নতুনদের অভিসম্পাত দিচ্ছেন, তাদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসের ধোঁয়া ছড়াবার চেষ্টা করছেন। এঁরা নতুন সাহিত্যিকগণকে ঈর্ষার চোখে দেখেন এবং সেই জন্যই এই অবিশ্বাসের জন্ম। কিন্তু আজ পাঁচ বৎসর ধরে ঢাকায়, চট্টগ্রামে, কুমিল্লায়, সিলেটে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে যদি কেউ কিছু করে থাকেন —তো নতুন শিল্পী ও সাহিত্যিকেরাই তা করেছেন। আমি তাঁদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। আর জানাই সেইসব প্রবীণ সাহিত্যকগণকে যাঁরা সাহিত্যবাজদের দলে ভীড়ে সাহিত্যের অবমাননা করেননি, নতুনকে আহ্বান করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন—জনাব মাহ্‌বুব-উল-আলম, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, মওলানা আকরম খাঁ, (আকরম খাঁর নামকেনো হলো?) আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, আবুল ফজল, সুফিয়া কামাল প্রমুখ সাহিত্যরথীগণ।"[১২]

সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি, সাহিত্যের আঙ্গিকই লক্ষ্যণীয়, নাকি বিষয়বস্তু বিবেচ্য ; প্রধানত এই বিষয়ে আনিসুজ্জামানের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ছাপা হয় 'প্রগতি সাহিত্য প্রসঙ্গে' শিরোনামে।

প্রগতি সাহিত্যিকেরা মনীষী হাডসন এর সাহিত্য সংক্রান্ত বিখ্যাত উক্তি : 'It is an expression of life through the medium of language.–এর মূল উপজীব্য অনুসরণে জীবনের অভিব্যক্তি বা প্রাণের প্রকাশকেই সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য বলে চিত্রিত করে বলেন— কিন্তু 'গণ' বা গণসাহিত্যের আতঙ্কে একশ্রেণীর সাহিত্যিক যে Art for arts sake শিল্প শিল্পের জন্য, সৌন্দর্যবোধ ও সৌন্দর্য সৃষ্টিই যে সাহিত্য বা শিল্পের একমাত্র করণীয়— এই মতবাদের প্রবর্তন করেন, তাকে সৎ-সাহিত্যিকেরা প্রকারান্তরে মেনে নিতে পারেননি। উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন না থেকে আপন বিবেক ও সোন্দর্যবোধ দ্বারা চালিত হয়ে সৎ-সাহিত্যিক যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তাতেও কিন্তু জীবনকে বা প্রাণের স্ফূর্তিকে কেউ অস্বীকার করতে পারেননি—যাঁরা এর বাইরে উদ্দেশ্যমাফিক গণজীবনকে অস্বীকার করে সাহিত্য রচনা করেন, তাঁরা অসৎ সাহিত্যিক বা শিল্পী এবং বিশেষ রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র হিসেবে চিহ্নিত হবেন, সন্দেহ নেই। 'সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের' ইশতেহার এর মূল বক্তব্য : সাহিত্য হবে প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র এবং তাতে জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সর্ববিধ কলার নিবিড় সংযোগ থাকবে ; "যা কিছু আমাদের বিচারবুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করে, সমাজব্যবস্থা ও রীতিনীতিতে যুক্তিসঙ্গত পরীক্ষা করে আমাদের কর্মিষ্ঠ, শৃংখলাপটু, সমাজের রূপান্তরক্ষম করে, তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করবো।" — এই উক্তি উদ্ধৃত করে প্রগতিশীল লেখক-শিল্পীদের সাহিত্য-চিন্তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, ইশতেহারের মূলবক্তব্যে সৎ-সাহিত্যিক মাত্রেই একমত হলেও কোনো কোনো বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ আছে, যেমন আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর সমন্বয় বা স্বাতন্ত্রের প্রাধান্য। পূর্ববঙ্গের প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক মহলেও বিষয়বস্তুর প্রাধান্য নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। আঙ্গিক ও বক্তব্যকে একেবারেই তাঁরা পাত্তা দিতে চাননি। তাই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার দাবী সমকালীন সাহিত্যের প্রধান চাহিদা হিসেবে দেখা দিয়েছিল। এই প্রেক্ষিতে উক্ত আলোচনা সাহিত্যস্রষ্টাদের চিন্তার পরিমার্জনে এবং সাহিত্যকর্মীদের কর্মপন্থা নির্ধারণে দিকনির্দেশের কাজ করেছে, আর পূর্ব বাংলার সৎসাহিত্যিকদের স্ফূর্তিতে ও উত্তম-সাহিত্যের বিকাশে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। আনিসুজ্জামান লিখেছেন : "মানুষের জন্যে লেখাটাকে যখন কর্তব্য বলে মনে করা হয়, সেক্ষেত্রে আঙ্গিকের আগে বিষয়বস্তুর প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য দিতে হবে ; কিন্তু যে কোন মতেই আঙ্গিককে অবহেলা করা যায়না। তাই প্রথমে বিষয়বস্তু, তারপরে আঙ্গিক।... আমরা নিশ্চয়ই এই চাই না যে, আমরা স্থানীয় দৈনিকে রবিবারে বা দুএকটা মাসিকপত্রে নিভৃতে প্রগতি সাহিত্য সৃষ্টি করি, আর বিশ্বসাহিত্যের দরবারে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যগুলো সম্মান পাক। তাই বহির্বিশ্বে প্রগতিশীল সাহিত্য যাতে আদৃত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হলে, সাহিত্যে আঙ্গিকগত শ্রেষ্ঠত্বের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। নইলে, দেশগত হিসেবে, আমাদের সাহিত্যের মান নীচু, এ ধারণা হওয়া বিচিত্র নয়।"

আনিসুজ্জামান অবশ্য আঙ্গিকের প্রতি লক্ষ্য রাখার অর্থে আঙ্গিক-সর্বস্বতাকে বোঝান নি। বরং পূর্ব বাংলায় বিষয়বস্তুর চেয়ে আঙ্গিকইযে বেশী অনুসৃত হচ্ছে সেই প্রবণতাও লক্ষ্যণীয় বলে "এটা কিন্তু খুবই খারাপ" মন্তব্য করেছেন। পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন (১৯৫২) এ ডঃ মুস্তফা নুরুল ইসলাম এই রকম একটি অভিযোগই উত্থাপন করেছিলেন : "পূর্ববঙ্গের সমাজ-সচেতন সাহিত্যিকেরা যথেষ্ট সচেতন নন এবং পূর্ববঙ্গের অনেক লেখকই বিষয়বস্তুর চেয়ে আঙ্গিকের দিকে নজর দিচ্ছেন বেশী।" উপরোক্ত পরিস্থিতিতে চীনের বিখ্যাত লেখক চাউ-ইয়াং এর একটি উক্তি- 'আঙ্গিক কৌশল অবশ্যই আয়ত্ব করতে হবে, কিন্তু আঙ্গিকসর্বস্বতা এড়াতে হবে' উল্লেখ করে বলেন 'বিষয় ও আঙ্গিককে বিচ্ছিন্ন করা চাউ-ইয়াং এর মতে ভুল— 'আমাদের প্রগতি সাহিত্যিকদেরও উচিত তাঁর সাথে একমত হওয়া।'

পূর্ব বাংলায় প্রগতি সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বজনগ্রাহ্যতার ব্যাপারে দ্বিমত ছিল, এখনও আছে, বিশেষ করে কবিতার দুর্বোধ্যতা বা অসহজবোধ্যতার বিষয়টি এখানে দীর্ঘদিনের আলোচ্য বিষয়। "এঁরা নব্বইজনের জন্যে লেখেন, অথচ নিরানব্বই জন এঁদের লেখা বুঝতে পারেন না।.... আমাদের প্রগতি কবিরা, যাঁরা এই ধাঁচে লেখেন, ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে যদি কাব্যসাহিত্যকে আরেকটু সহজ করে তোলেন, সেটাই বাঞ্চনীয় হবে।"

অতিবাম কবিতার 'রীতিমতো ইশতেহার' প্রবণতা কবিতাকে অকবিতা করে তুলেছে। প্রগতিশীল ভাবধারা থাকা সত্বেও এঁদের রচনা যেসব দোষে দুষ্ট, প্রগতি সাহিত্যিকদের উচিত, সেগুলো নির্দিষ্ট করে তাঁদের লেখাগুলোকে সাহিত্যের পর্যায়ে টেনে আনা।' বিগতকালের সাহিত্যকে ঐতিহ্যরূপে গ্রহণ ও বিবেচনাকালে স্বকালের প্রেক্ষিতে বিবেচনার নীতি গ্রহণ করাই সঙ্গত হবে বলে মত ব্যক্ত করে আনিসুজ্জামান বলেন 'শেক্সপীয়রের রচনায় সাধারণের জীবন চিত্রিত হয়নি বলে শেক্সপীয়রকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব হাস্যকর।' বঙ্কিম সাম্প্রদায়িক ছিলেন এবং তাঁর সাহিত্য সাম্প্রদায়িকতাস্পৃষ্ট ; অতএব 'বঙ্কিম অপাংক্তেয়" অখণ্ড-বাংলার মুসলিমসাহিত্যিকদের এই কমন অভিযোগের ঢেউ পূর্ববাংলায় বিভাগ-পরবর্তীকালেও প্রচণ্ড শ্লোগান

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি করেছিল— যার জের এখনও (১৯৯৪) সমান তালে বিদ্যমান। কিন্তু 'প্রগতি সাহিত্য প্রসঙ্গে'র লেখক ১৯৫২ সনে এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেন ঃ 'একথা বললে সত্যিই ভুল করা হবে। আমাদেরকে দেখতে হবে কোন পরিপ্রেক্ষিতে বা কোন পটভূমিকার মধ্যে এবং কেন শেক্সপীয়র সাধারণ জীবন নিয়ে লেখেননি বা বঙ্কিম-সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা স্থান পেল। এবং এই বিচারকে জনপ্রিয় করে তোলাও প্রগতি সাহিত্যিকদের কর্তব্য। আবার রবীন্দ্রনাথের কেবল প্রশ্ন, ঐকতান, রাশিয়ার চিঠি, আর হিজলী-জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারের প্রতিবাদকেই আমরা গ্রহণ করব, বাকী অংশ নয়, এটাও ঠিক নয়। অবশ্য এঁদের রচনায় সাধারণ মানুষের প্রতি এবং চলতি সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ বা যা কিছু প্রগতি সাহিত্যের চরিত্রের আওতার মধ্যে পড়ে, তার ওপরেই প্রগতি লেখকদেরকে জোর দিতে হবে।" তিনি আরও বলেন, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য শ্রেণীর সঙ্গে বসবাস করার নীতিও গ্রহণযোগ্য— অবশ্য এটিকে তিনি তার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিজাত মতামত বলে যোগ্য ব্যক্তিদের আলোচনার জন্যে এক্ষেত্রে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।[১৩]

১৯৫৮ সনে রোমান হরফে বাংলা প্রবর্তনের ষড়যন্ত্রের কালে সওগাত এর ভূমিকা ছিল এরূপ ঃ "ভাষার মত প্রত্যেক প্রকারের হরফেরও নিজস্ব চরিত্র আছে, আছে বৈশিষ্ট্য ও সৌকর্য ; সুতরাং ভূঁয়ো আন্তর্জাতিকতার মোহে তাহার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন জাতীয় বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকরই হইবে। বাংলাভাষা রোমান হরফে লিখিত হইলে দুনিয়ার উন্নত ভাষা-সমূহের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইবে, এ ধারণা ভুল ; কারণ, ইউরোপ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার বহু ভাষাই রোমান হরফে লিখিত, কিন্তু তাই বলিয়া অনুশীলন ব্যতীত এক ভাষার লোক অন্য ভাষায় তার প্রকাশ করিতে পারে না, এমনকি বাইরের চেহারা এক রকম হওয়া সত্ত্বেও যথার্থ উচ্চারণের সহিত পাঠও করিতে অক্ষম। তাহা ছাড়া, বাংলাদেশের এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হইল নিরক্ষরতা যেদেশে শতকরা পঁচাশি জন মানুষ লিখিতে পড়িতে জানেনা, তাহার সম্মুখে হরফ পাল্টানোর পরিকল্পনা উপস্থিত হওয়া হাস্যকর। আগে লোক শিক্ষিত হোক, যদি আদৌ প্রয়োজন হয়, অক্ষর সংস্কারের প্রশ্ন তখনই উঠিবে।"[১৪]

মোহাম্মদ মোর্তজা 'ভাষার রূপ' শীর্ষক প্রবন্ধও ঐ সময়ে (১৯৫৮) লিখেছিলেন, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাভাষার রূপ কি হবে সে বিষয়ে নানা রকম তর্ক হয়েছিল, হিন্দুর বাংলা না মুসলমানের বাংলায় এদেশের লোকেরা ভাব প্রকাশ করবে, কিংবা প্রযুক্তিবিদ্যা ও সাহিত্যসৃষ্টির জন্য কোন ধরণের বাংলাভাষা ব্যবহার করা আবশ্যক? —এই প্রশ্নের জবাবে লেখক বলেন, প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে ধর্মীয়, পশ্চিম বা পূর্ববাংলার ভাষা বিভাগের প্রশ্ন অর্থহীন, তর্কটা আসলে সাহিত্যের ভাষার রূপ নিয়ে। তাঁর মতে কোন লেখকের হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশের আগ্রহের আধিক্য এবং বলবার বিষয়ে পরিস্কার ধারণা থাকলে ভাষা কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় না। ভাষাটা তখন হয়ে যায় স্বতস্ফূর্ত। লেখক তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করেই ভাষাকে রূপদান করেন। ভাষার সমস্যা সাহিত্যিকের নিজস্ব সমস্যা, বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে যেকোন ভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে ; আপত্তি শুধু অপ্রয়োজনে। ভবিষ্যতে একদিন বাংলা সাহিত্যের ভাষা তার নিজের গতিপথ স্থির করে নেবে, মোটকথা... 'ইহাকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারিলে বাঁচিয়া থাকিবেন নচেৎ মৃত্যু অনিবার্য। প্রচারণার জোরে মারিয়া ফেলিবার অথবা বাঁচাইয়া রাখিবার প্রচেষ্টা বাতুলতা মাত্র। যাঁহারা এই বিতর্ক তুলিয়া সময় ও শক্তি ব্যয় করিতেছেন, তাঁহারা নিরস্ত্র হউন। ইহাতে কোন মঙ্গলতো হইতেছেইনা বরং হইতে পারে, এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা নিরাসক্ত মন লইয়া কাজ করিলে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিতেন, কিন্তু ইহা দ্বারা প্রভাবিত হইবার ফলে স্তিমিত হইয়া আসিতেছেন। কেননা, আজ হউক, কাল হউক—এই বিতর্ক শুরু হইয়া যাইবেই এবং প্রকৃত সাহিত্য তাহার নিজস্ব ধারায় আপনার ভবিষ্যত গতিপথ স্থির করিয়া লইবে।"[১৫]

মোহাম্মদ মোর্তজা 'সাহিত্য সম্পর্কে' আলোচনায় জাতির অগ্রগতিতে সাহিত্য তথা সাহিত্য পত্রিকার ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অন্য এক সংখ্যায় লিখেছেন ঃ "কোন এক মানবগোষ্ঠীতে (সমাজ বা জাতি অর্থে) সভ্যতা কতখানি উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিয়াছে তাহার পরিমাপ কি? নানাভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়া থাকে।... উত্তরের মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছে, সংশ্লিষ্টগোষ্ঠীতে সমসময়ে কতগুলি সাহিত্যপত্রিকা চালু থাকে তাহার তুলনামূলক হিসাবই হইতেছে সেই গোষ্ঠীর সভ্যতার বিবর্তনিক পর্যায়ের পরিমাপ। সহজ কথায় বলা চলে, সাহিত্যপত্রিকার সংখ্যা সামাজিক অবস্থার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন। আপনি যদি কোন রাজধানীতে গিয়া তথায় প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকাগুলির একটা হিসাব সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে সেই দেশের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা আপনার হইয়া যাইবে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত স্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী সাহিত্যও এই হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে ইহারা একে অপরের সহিত কাঁধ মিলাইয়া অগ্রসর হয়।

সাহিত্যপত্রিকা অর্থে সাহিত্যের এত গুরুত্ব কেন? কারণ, সাহিত্যে মানুষের-জীবন আলেখ্য প্রকাশ পায়, যেখানে সভ্যতা যত উচ্চস্তরে উঠিতে পারিয়াছে, সেখানে জীবন ততই কর্মচঞ্চল ; ততই ব্যাপক ও গভীরভাবে সে তাহার পরিধি বিস্তারিত করিয়া দিয়াছে ; তাহার প্রকাশও সেইজন্য ব্যাপক হইয়া উঠিতে বাধ্য। পরবর্তী প্রশ্ন হইতেছে, এই জীবনালেখ্য বলিতে কি বুঝায়— এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে জীবনের অপরিহার্য প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার জীবনের অবশ্যম্ভাবী প্রকৃতি হইতেছে গতি ; জনপ্রিয় ভাষায় বলা হয় প্রগতি। অর্থাৎ স্থিতির সহিত জীবনের কোন সম্পর্ক নাই। কেননা, জীবনে স্থিতির অর্থ জীবনের ক্ষয়, পরে পরিসমাপ্তি... মৃত্যু। সেইজন্য গতি ব্যতীত জীবনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়না। জীবন-আলেখ্য হইতেছে এর গতির অভিপ্রকাশ। সাহিত্যে তাহাই প্রতিফলিত হয়।..... কিন্তু এসবের মধ্যে সাহিত্যের একটা সত্য প্রকাশ পায় যাহা সর্বক্ষেত্রে সমান। তাহা হইতেছে মানুষকে পরিবর্তিত করিয়া দিবার ক্ষমতা। বস্তুত কোন সাহিত্যিককে যদি মর্যাদা পাইতে হয় তবে পাঠক-পাঠিকাকে পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতা তাঁর থাকা চাই। এই পরিবর্তন যৎসামান্য হইতে পারে, কিংবা ব্যাপকও হইতে পারে। এই পরিবর্তনের ফলে পাঠক (বা পাঠিকা) লেখকের (বা লেখিকার) শত্রুতে পরিণত হইতে পারে কিংবা মিত্রও হইতে পারে। 'কিন্তু তাহাকে পরিবর্তিত হইতেই হইবে তা সে পরিবর্তন যে কোন প্রকৃতির এবং যে কোন ধরণের হউক না কেন। নচেৎ মানের ক্ষেত্রে সে সাহিত্যের মান উচ্চ নহে। পড়িবার পূর্বে ও পরে যদি পাঠক একই ব্যক্তি রহিয়া যায়, তবে সে সাহিত্য অনেক খানি অর্থহীন।"[১৬]

ফজলুর রহমান খাঁ 'ভাষা ও বর্ণমালা' প্রসঙ্গে (১৯৬১) প্রাচীন যুগের বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর ভাষা ও বর্ণমালার আলোচনা-শেষে মন্তব্য

Dhaka University Institutional Repository

করেন : "আজকাল একদল লোক বেশীসংখ্যক লোকের ভাষাকে বা বর্ণমালাকে দেশে চালু করার কথা বলে থাকেন। কিন্তু প্রত্যেক দেশ ও ভাষায় সবচেয়ে আদিম যে জিনিস তা হচ্ছে ধ্বনি। প্রকৃতিজাত ধ্বনিকে বজায় রেখে সমাজে বর্ণমালার পরিবর্তন খুবই দুরূহ ব্যাপার। অন্তত রোমান অক্ষর চালু হওয়ায় তুরস্কে তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তুরস্কে রোমান হরফ চালু হওয়ার সময়, সাময়িকভাবে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল সত্য, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা কতকগুলি গুরুতর অসুবিধারও সূচনা করেছে। আর মুসলিম জাহান বিশেষ করে আরব দেশগুলির যে তুরস্ক মাত্র ২৫ বছর পূর্বেও ছিল শাসকের জাতি, তারা এখন শত্রুরূপে পরিগণিত হয়। তুর্কী নেতাদের 'দেশী' আরবী অক্ষরের বদলে বিদেশী রোমান হরফ গ্রহণই এই ব্যবধানকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।"[১৭]

'পূর্বপাকিস্তানী সাহিত্য ঃ সতর্কতাচর্চা প্রসঙ্গে' জনৈক আজীজুল হক মনে করেন 'পশ্চিম বাংলার আধুনিক সাহিত্যের চেয়ে পূর্ববাংলার সাহিত্য অতিশয় হীন এবং পূর্ববাংলার সাহিত্যের মর্যাদা পশ্চিম বাংলার সাহিত্যিকদের প্রশংসা ও নিন্দার ওপর নির্ভরশীল — এমন সরাসরি হীনমন্য ধারণা আমরা এখন পোষণ করছিনা। একথা আজ সবাই বিশ্বাস করেন যে, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের লালন-পালন বৃদ্ধি ও পরিনতিসাধনের ভার পূর্ববাংলার ওপরই রয়েছে এবং আমাদের সাহিত্যের সার্থকতা ও ব্যর্থতা বিচার করতে এখন নির্ভরযোগ্য নবীন ও প্রবীণ সমালোচক আমাদের দেশেই রয়েছেন।.... আমরা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উপযুক্ত মর্যাদা লাভের দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছি.... এ প্রসঙ্গে একটা কথা অবশ্যই আমাদের ভেবে দেখবার প্রয়োজন আছে। বাংলাভাষা পশ্চিম বাংলায়ও প্রচলিত। সেখানেও উন্নত সাহিত্য অনেক রচিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। পশ্চিম বাংলা বিদেশে যতখানি নিজের প্রচার করে আমরা তা করি কি? পশ্চিম বাংলার সাধনায় ও প্রচারে অর্জিত বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদার ভাগে আমাদের কতখানি অধিকার আছে? যখনই আমরা 'বিশ্বসাহিত্য? উচ্চারণ করি তখনই দেশ থেকে বিদেশ পর্যন্ত আমাদের দায়িত্বক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে পড়ে.... বিদেশেও নিজমর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই বিশ্বগৌরবের অধিকারী হব।"[১৮]

'সাহিত্য ও জাতীয় চেতনা' শীর্ষক প্রবন্ধে মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম বলেন : "সাহিত্যিকগণ সামাজিক। তাই সমাজের অগ্রগতির তাগিদে তাদের নিজস্ব রচনায় নিজের জ্ঞানবিশ্বাসমতে একটা মতবাদ প্রচারিত হওয়া স্বাভাবিক। সাহিত্যিক তার নিজস্ব সৃষ্টি থেকে সুন্দরের যে রূপ দেখতে পান তাকেই প্রতিফলিত করতে চান সাহিত্যে। কেননা 'হৃদয়বৃত্তির রাজ্যে অবগাহন' করে বাস্তব নিরপেক্ষ সাহিত্য রচনার দিন আজ যে অতিক্রান্ত! একথা অস্বীকার করা যুগধর্মকে অস্বীকার করারই সামিল। ... আজ আমরা আজাদ। জীবনে অসংখ্য কর্তব্যের মোকাবিলা করে আমাদেরকে চেতনার পথে এগিয়ে যেতে হবে. আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবে সাহিত্য এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এদিকে সাহিত্যের নির্মল আনন্দধারায় অসুন্দরের ক্লেদ মুছে দিয়ে নতুনপ্রানের সঞ্চার করতে হবে, অন্যদিকে বাস্তবকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে আর্টের শ্রেষ্ঠত্ব দিতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমেই আমাদের জাতীয় চেতনার পথ সুগম হতে পারে। কেননা, সাহিত্যই আমাদের ভুলত্রুটি শুধরিয়ে চলার পথে নির্দেশ দিবে।"[১৯]

আবদুল হক ১৯৬৮ সনে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ হবার যুগ-সন্ধিক্ষণে 'সওগাত'এর পাতায় লিখেছিলেন 'সাহিত্য-উপভোগ ও সংস্কৃতি' শীর্ষক একটি গুরুত্বপুর্ণ প্রবন্ধ। 'যাঁদের চিন্তায় ও অনুভবে নীতিবাদ ধর্মবাদ অথবা নানারকমের গোঁড়া রাজনৈতিক আদর্শের একান্ত এবং সার্বভৌম আধিপত্য এবং যাঁরা এইসব 'বাদ' এর অথবা রাজনৈতিক আদর্শের গজকাঠিতে সাহিত্যের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপতে উৎসাহী তাঁরা সাহিত্যের পাঠক নন। কয়েকটি প্রাথমিক শর্ত পালন না করলে যেমন কেউ নিজেকে প্রকৃত নীতিবাদী অথবা ধর্মবাদী অথবা রাজনৈতিক আদর্শবাদী বলে দাবি করতে পারেন না, তেমনি কয়েকটি প্রাথমিক শর্ত পালন না করলে কেউ প্রকৃত রসজ্ঞ সাহিত্য পাঠক হতে পারেন না। সাহিত্যউপভোগের একটি প্রাথমিক শর্ত এই যে, সাহিত্যকে সাহিত্য হিসাবে নিতে হবে। শুধু এভাবেই সাহিত্য উপভোগ করা সম্ভব। এভাবে নিতে না পারলে সাহিত্য উপভোগ করা সুকঠিন এবং সাহিত্যের প্রকৃত রসজ্ঞ পাঠক হওয়া প্রায় অসম্ভব, কেননা পৃথিবীতে, এমনকি যে কোন দেশে ও সমাজে নৈতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক আদর্শ এক নয়, বহু এবং অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পর-বিরুদ্ধ।'[২০]

সমাজ

সমাজের সকল ব্যাপারেই এদের মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু 'সাহিত্য সংঘ' বা সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান যে সমাজের কল্যাণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সে-চিন্তা থেকে বিভাগ পরবর্তীকলের পূর্ব-পাকিস্তানে নতুন সমাজের উন্নতির জন্য সওগাতের বক্তব্য গঠনমূলক কল্যাণাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভাষা পেলো ; সঙ্গে-সঙ্গে ইতিহাসের তথ্যও বিবৃত করেছে— ১৯৫২ সন পর্যন্ত জাতীয় সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান এদেশে গড়ে ওঠেনি এবং আমাদের সমাজের চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীরা সে বিষয়ে তৎপরও হননি তেমন করে। অখণ্ড বাংলার হিন্দু-মুসলমান স্বসম্প্রদায়ের অথবা অখণ্ড বাঙালি সমাজের কল্যাণ কামনায় জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছিল সাহিত্যিক সংস্কৃতিকর্মীদের নেতৃত্বে— যেমন মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি , বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ইত্যাদি তেমনি প্রতিষ্ঠান পূর্ব-পাকিস্তানের জাতীয় সাহিত্য তথা পূর্বপাকিস্তানী জাতির কল্যাণের জন্যও যে অত্যাবশ্যক সে কথা 'সওগাত' উচ্চারণ করেছে সাহিত্য সমাজের উন্নতির তাগিদে। 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা দুঃখ ও বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, ঢাকায় সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দ এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও কোনো সাহিত্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। পূর্ববংগে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য, লোক সাহিত্য, গ্রাম্য সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার ও গবেষণার অবসর প্রচুর। কিন্তু কলিকাতার বংগীয় সাহিত্য পরিষদের ন্যায় একটা শক্তিশালী সাহিত্য প্রতিষ্ঠান ঢাকায় গড়িয়া না উঠিলে একাজ কখনই সমম্পন্ন হইতে পারেনা। যদি স্মরণ রাখা যায় যে সাহিত্যই জাতীয় জীবনের মূল উৎস, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে আর আদৌ বিলম্ব করা উচিত নয়। আমাদের বিশ্বাস , ঢাকাস্থ প্রবীণ ও শক্তিমান প্রভাবশালী সাহিত্যিকবৃন্দ যদি একটা কমিটি গঠন করিয়া এই শুভ কার্যে আন্তরিকতার সহিত হস্তক্ষেপ করেন, সারা পূর্ববংগের সমর্থ সাহিত্যামোদী ব্যক্তিরা তাতে তো সাহায্য করিবেনই, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টদ্বয়ও সেকাজে এককালীন ও পৌনপুনিক সাহায্য যথেষ্ট পরিমানে দান করিতে উদ্বুদ্ধ হইবেন। আমাদের আরও বিশ্বাস মত ও পথ নির্বিশেষে সকল সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদী ভ্রাতাই অকুণ্ঠভাবে সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইবেন।'

Dhaka University Institutional Repository

এই আলোচনায় প্রসঙ্গত: কবি-সাহিত্যিকদের গোত্রীয় বা শ্রেণীগত এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের একটি চিত্রও ফুটে উঠেছে: "আমরা অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার সহিত শুনিয়াছি যে, পূর্ববঙ্গের বিশেষত: ঢাকায় সমবেত সাহিত্যিকগণের মধ্যে ব্যক্তিগত ও দলগত রেষারেষি অত্যন্ত প্রবল। এজন্য রাজধানীতে এ পর্যন্ত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহিত্য সভা গঠিত হইলেও কোনো বৃহৎ, শক্তিশালী ও সার্বজনীন সমিতি বা পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছেনা। এ সংবাদ সত্য হইলে এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কী হইতে পারে? যাহারা জাতির স্রষ্টা, তাহাঁদের মন যদি কোনো প্রশস্ত ক্ষেত্রে মিলিত হইতে না পারে, তাহা হইলে আর আমাদের আশা কোথায়? যাহোক, আমরা আশা করি, সুধী সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদী ভ্রাতৃবৃন্দ আমাদের এই প্রস্তাবটি যথোচিত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং সঙ্গত বুঝিলে অবিলম্বে এসম্পর্কে একটা সুষ্ঠু কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে আগাইয়া আসিবেন।"[২১]

রাজনৈতিক ব্যাপারেও সওগাত মতামত ব্যক্ত করেছে। মুসলিম লীগের সমালোচনায় সওগাত : "মুসলিম লীগ যেভাবে সংগ্রাম চালাইয়া পাকিস্তান অর্জন করিয়াছিল, ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। এই অসামান্য কৃতিত্বের জন্য পাকিস্তানীরা লীগ প্রতিষ্ঠানকে যথেষ্ট সম্মান প্রর্দশন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার পর হইতে একাধিক কারণে মুসলিম লীগ জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও সংস্পর্শ হইতে ক্রমশ: দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। আমাদের ধারনা এই যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাষ্ট্র-সচিবদের হাতে লীগের কর্ম-কর্তৃত্ব তুলিয়া দিলেই পরিস্থিতি বদলাইয়া যাইবেনা। যখন কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দেশবাসীর সম্মুখে আশা -আকাঙ্ক্ষায় দীপ্তিমান কোনো মোহনীয় রাজনৈতিক লক্ষ্য মশালের মতো জ্বালাইয়া রাখে , জনসাধারণ অন্যসব কিছু ভুলিয়া পতঙ্গের মতো তাহার পানে ছুটিয়া চলে। কিন্তু সেই রাজনৈতিক অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ার পর জনগণ জীবনের স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরিয়া আসে এবং সেই প্রতিষ্ঠানের কাছে বিবিধ জীবন -সমস্যার সমাধান আশা করিতে থাকে। এই আশা পূর্ণ না হইলে তাহারা প্রতিষ্ঠানের পূর্বেকার রাজনৈতিক কৃতিত্ব বিস্মৃত হয় এবং তার প্রতি বিরক্ত ও বিতৃষ্ণ হইয়া পড়ে। মন্ত্রীদের হাতে কর্ম -কর্তৃত্ব অর্পণ করিয়াই জনমানসিকতার এই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া রোধ করা যায়না । তার জন্য চাই জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ। মুসলিম লীগের বর্তমান নেতারা যদি তা করিতে অগ্রসর না হন, ইসলাম বা পূর্ববর্তী মহান নেতাদের নামে শুধু ঐক্য, বিশ্বাস ও শৃঙ্খলার আহবান উচ্চারণ করিয়া বিশেষ ফল লাভ হইবে বলিয়া আমাদের আশা হয়না, কেননা ঐ আহবান সংগ্রামকালের উপযোগী, কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখেই সমাপ্ত হইয়াছে। লীগকে আজ অসময়োপযোগী আহবান জানাইয়া নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া স্বস্তিকর কর্ম-তালিকা গ্রহণ পূর্বক তা কার্যে পরিণত করিতে অবিরাম চেষ্টা চালাইয়াই জনগমন আর্কষণ করিতে হইবে। কিন্তু এ করিতে গেলেই অর্থনৈতিক শ্রেনী-স্বার্থের সংঘর্ষ স্বাভাবিক ভাবে দেখা দিবে। একথা সত্য যে, বনিক, জমিদার, জায়গীরদার প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের সাধারণতঃ জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী হইতে দেখা যায়। লীগের বর্তমান নেতৃত্বের মধ্যেও এ স্বাভাবিক।... লীগ ও জনগণের স্বার্থ এক, শুধু মুখে মুখে এই কথা বলিয়া তাঁহাদের মন ভিজাইবার চেষ্টা করিলে তা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর।" জনসাধারণের আর্থিক ও সামাজিক মুক্তির পক্ষে সওগাত কথা বলেছে এবং লীগের জনগণের স্বার্থবিরুদ্ধ অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতির সমর্থন করা হয়নি; বরং তাঁদের প্রয়াস যে বেশীদিন স্থায়ী হবার নয়, সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়ে সেকথাও বলা হয়েছে।

কৃষি-অর্থনীতি-শিক্ষা সকল ব্যাপারেই সওগাত সমালোচনা করেছে, যেমন পাট-সংকট। পাটের মূল্য না পাবার জন্য কৃষকদের দুর্ভোগের কারণ অনুসন্ধান করে তা থেকে মুক্তির উপায় উদ্ভাবনের জন্য সওগাত সুশৃঙ্খল-সুযৌক্তিক মতামত পেশ করেছে। সমাজের কল্যাণের সঙ্গে কৃষক-সম্প্রদায়ের কল্যাণও জড়িত। সওগাতের সমাজচিন্তায় পাট-সংকট কেন্দ্র করে 'পাটের কথা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে ব্যক্ত হয়েছে :

"পাটের ব্যাপারে আজ যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে, এর জন্য প্রধানতঃ তিনটি পক্ষকে আমরা দায়ী মনে করি, প্রথম পক্ষ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য বিভাগ। এই বিভাগের কর্তারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হালচাল বা গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারেন নাই। পারিলে পাটের সংকট সম্বন্ধে তাঁহারা পূর্বাহ্নেই সতর্ক হইতেন, দ্বিতীয় পক্ষ খোদ পাট-চাষীরা ও দুর্নীতিপরায়ণ পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণকারীরা। পল্লীগ্রাম সম্পর্কে তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন, অসংখ্য চাষী লাইসেন্স রিনিউ (ডএনএয়) না করিয়া এবং সম্পূর্ণ বিনা লাইসেন্সে প্রভূত পরিমাণ জমিতে পাট-চাষ করিয়াছে; কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ নিয়ন্ত্রণকারীরা সে সংবাদ সরকারকে জানান নাই। ফলে সরকারী হিসাবের অতিরিক্ত হাজার হাজার মণ পাট বাজার নিম্নাভিমুখী করিতে সাহায্য করিয়াছে ; তৃতীয় পক্ষ হীন স্বার্থপর ব্যাপারী ও ব্যবসায়ীর দল। সরকার নিয়োজিত বহু এজেন্টও এই দলভুক্ত। তাহারা চাষীদের দারিদ্র্যজনিত অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া সরকার নির্ধারিত মূল্য দিতে অস্বীকার করে কিংবা পাট ওজন করার সময় দাঁড়িপাল্লার কারসাজির সাহায্যে এক মণ পাট পঁচিশ-ত্রিশ সের বানাইয়া লয় এবং চাষী এতে আপত্তি করিলে তার পাট কিনিয়া লইতে অসম্মত হয়, আবার সরকারী এজেন্টরা সাধারণতঃ মহকুমা-সদরে বসিয়াই পাট কিনিয়া থাকেন, পল্লীগ্রামে পদধূলি দেননা, এই সুযোগে ব্যাপারীরা অভাবের তাড়নায় উন্মত্ত চাষীদের নিকট হইতে যথেচ্ছ মূল্যে পাট খরিদ করে শুনিয়াছি, পূর্ববঙ্গের প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নে মাল্টিপারপাস সোসাইটি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু এটা সবাই জানেন যে, ইউনিয়ন প্রেসিডেন্টদের শতকরা প্রায় নিরানব্বইজনই ধড়িবাজ, শয়তান ও নররাক্ষসবিশেষ, কাজেই মাল্টিপারপাস সোসাইটিগুলির কতক কতক পাট কিনিতে নামিলেও সেখানে চাষীদের জবাই করার ব্যবস্থাই হইয়া থাকে। লাইসেন্স বহির্ভূত জমিতে উৎপন্ন পাট সম্পর্কে এব্যাপার আরও সহজ এইভাবেই আজ এদেশে পাটের বাজারে ঘোরতর সংকট দেখা দিয়াছে। সুতরাং যাঁহারা পাট সম্পর্কে মাথা ঘামাইতেছেন, তাঁহাদের আগাগোড়া সমস্ত কথাই ভাবিয়া দেখিতে হইবে; শুধু সরকারের কাছে দাবী উত্থাপন করিলে কিংবা এর দোষ, ওর দোষ বলিয়া কণ্ঠ বিদীর্ণ করিলে ফললাভ হইবেনা। পাট সংকটের প্রতিকার সর্বাত্মকভাবে করিতে পারিলেই তা সুসম্পন্ন হইবে ; শুধু একদিকে ঠেলা দিলে অন্যদিকে তা স্ফোটকের আকারে আত্মপ্রকাশ করিবে, ইহা নিশ্চিত।"[২২]

মুসলিম লীগের বা সরকারের এমন কঠোর, কার্যকর সমালোচনা খুব কম পত্রিকাতেই পাওয়া যায়। বিশেষ করে সওগাতের এই পর্যায়ে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদসংশ্লিষ্ট প্রগতিশীল তরুণ সাহিত্যকর্মীগণ কাজ করতেন, মেধাবী আলোচনা তাই আঘাত করতে পারতো। মুসলিম লীগের কোনো খাতির করা আলোচনা এঁরা ছাপেননি। কারণ লীগ-বিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাব সওগাতে বেশী ছিল বিভাগপূর্ববর্তীকালের ন্যায় পাকিস্তান

Dhaka University Institutional Repository

আমলের প্রথমার্ধেও। ১৯৫৪র সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সমালোচনা করতে গিয়ে সওগাত সম্পাদকীয়তে উচ্ছসিত কণ্ঠে যে বক্তব্য রাখে — তাতেই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে ওঠে —

"... মুসলিম লীগের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটিয়াছে এবং যুক্তফ্রন্ট আশাতীত রূপ সাফল্য লাভ করিয়াছে। প্রথমেই আমরা জনমতের এই বিপুল বিজয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। একথা আজ নিঃসন্দেহে ও নির্বিবাদে বলা যাইতে পারে যে, পূর্ববংগবাসীদের প্রতিনিধিত্ব করার কোন অধিকারই আর মুসলিমলীগের নাই। .... দেশের রাজনৈতিক স্বাস্থ্যের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ইহাতে উল্লসিত না হইয়া পারা যায়না।আমাদের যতোদূর জানা আছে, দেশবাসীর বিরাগভাজন কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে— বিশেষতঃ ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে, নির্বাচনে এতোখানি ভীষণভাবে পরাজিত হওয়ার দৃষ্টান্ত আধুনিক গণতন্ত্রের ইতিহাসে বিরল। প্রাদেশিক লীগ সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী তাঁহার সমস্ত মন্ত্রীসভাসহ নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন। তাঁহাদের কাহারো কাহারো এবং অন্যান্য বহুলীগ প্রার্থীর জামানতের টাকা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হইয়াছে. সুতরাং এই নির্বাচনকে 'বিনা রক্তপাতে বিপ্লব' বলিলেও আজ অত্যুক্তি হয়না।

মুসলিম লীগের এই শোচনীয় পরাজয়ের কারণ কি? প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আজ এই প্রশ্ন আলোচিত হইতেছে। মুসলিম লীগ নির্বাচনে জয়লাভের জন্য বৈধ অবৈধ কোন উপায় অবলম্বনেই ত্রুটি করে নাই। .... অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্ররিপ্রেক্ষিততেই মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিয়া দিবার প্রবল গণদাবী উপেক্ষা করিয়া নূরুল আমিন সরকার জোরপূর্বক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। সরকারী তহবিল ও শাসন-যন্ত্রের সাহায্যে প্রদেশব্যাপী বিপুল অর্থব্যয়ে নির্বাচনী সফর ও প্রচারকার্য চালাইয়াছেন। কাইউম খাঁ, সর্দার নিশতার হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের ছোটবড় সকল লীগ নেতা, মায় মিস জিন্নাহ পর্যন্ত বৃদ্ধা বয়সে লীগের পক্ষে ওকালতির জন্য পূর্ববাংলায় টানিয়া আনিয়াছেন। ইহা ছাড়া বিনা অজুহাতে ও বিনা বিচারে প্রদেশব্যাপী বিরোধীদলের হাজার হাজার কর্মী, এমনকি নির্বাচন-প্রার্থীদের পর্যন্ত গ্রেফতার এবং সবশেষে ভাড়াটিয়া সংবাদপত্রের সাহায্যে যুক্তফ্রন্টের নেতাদের বিরুদ্ধে ভারত হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ, ইসলাম-বিরোধীতা ও দেশদ্রোহিতার প্রচারকার্য চালাইয়া জনমতকে বিভ্রান্ত করারও কম চেষ্টা হয় নাই। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও লীগের অবধারিত পরাজয় রোধ করা যায় নাই। দীর্ঘ সাত বছর পর লীগ চক্রের শোষণ ও শাসনে রিক্ত,অতিষ্ঠ পূর্ববাংলার সাড়ে চার কোটী মানুষ আশ্বস্ত হইয়া শুনিয়াছে স্বৈরাচারী শাসক লীগের অপমৃত্যু হইয়াছে। একুশ দফার ভিত্তিতে জনসাধারণের সার্বিক উন্নতি সাধনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যুক্তফ্রন্ট দল প্রদেশের শাসন ভার গ্রহণ করিতে যাইতেছেন। প্রদেশে মুসলিম লীগের এই পরাজয় শুধু পূর্ববংগের পক্ষেই নয়, গোটা পাকিস্তানের পক্ষেই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও গভীর অর্থব্যঞ্জক; ইহার মধ্যে বিজয়ী দলের পক্ষেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের ইংগিত নিহিত রহিয়াছে।"

'পরাজয়ের কারণ কি?' শীর্ষক আলোচনায় বলা হয় : "পূর্ববাংলার সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের আশাতীত সাফল্যে শুধুমাত্র পাকিস্তানের রাজনীতি ক্ষেত্রেই নয়, বিশ্বের ছোটবড় সকল রাষ্ট্রেই বিস্ময় ও আলোড়ণ সৃষ্টি হইয়াছে। বৃটিশ মহল ইহাকে পূর্ববাংলার গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের আশাপ্রদ বিকাশ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। দেশের মানুষ যে তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন, প্রদেশের সাম্প্রতিক নির্বাচনই তাহার প্রমাণ। ... নির্বাচনী ফলাফল সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য হইল, 'পূর্ববাংলার জনসাধারণ মুসলিম লীগের তথাকথিত ধর্ম-স্বরস্ব আবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়া যুক্তফ্রন্টের গণতান্ত্রিক আবেদনে সাড়া দিয়াছে।' আমাদের মনে হয় উক্ত মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করিলেই মুসলিম লীগের প্রতি জনগণের অনাস্থা ও উহার কারণ বোঝা যাইবে। পাকিস্তান আন্দোলন সৃষ্টির যতই ধর্মভিত্তিক ব্যাখ্যাই দেওয়া হউক না কেন, একথা আজ প্রমাণিত যে অবিভক্ত ভারতের অনুন্নত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সুস্থ, স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠালাভ এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশী ও বিদেশী শোষক সম্প্রদায়ের শাসন হইতে আত্মরক্ষার জন্য নিজেদের হোমল্যাণ্ডের দাবী তুলিয়াছিল। গত সাত বছরে মুসলিম লীগ শাসনে তাহাদের এই আশা পূর্ণ হয় নাই। উপরন্তু অযোগ্য লীগ শাসনে দেশের যে চরম দূরবস্থা দেখা দিয়াছে, উহার ফলে আপামর জনসাধরণের জীবন ধারনের সামান্য ক্ষমতাও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেশের এই ভয়াবহ সংকট এতবেশী আলোচিত হইয়াছে যে, এ সম্পর্কে নূতন করিয়া আলোচনা অবান্তর।"

দেশের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁরা মন্তব্য করেন — "দেশের কৃষিজাত প্রতিটি পণ্যের মূল্য হ্রাস, নিত্যনৈমিত্তিক দ্রব্যের অসম্ভব দাম, কর বৃদ্ধি, শিক্ষা-সংকোচন, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, কাপড়, কাগজ ও ঔষধের অভাব প্রভৃতি সমস্যা আজ দেশকে এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে যে, কোনো সভ্যদেশে এ অবস্থা কল্পনা করাও অসম্ভব। কোন রকমে বাঁচিয়া থাকিবার এই ক্লেশকর পরিস্থিতিতে দেশের দূরবর্তী পল্লীর অজ্ঞ, সরলমতি, মানুষও সচেতন না হইয়া পারে নাই। কিন্তু মানুষ যত সচেতন হইয়াছে, ক্ষমতাসীন লীগ চক্র ততই কঠোর দমননীতি মারফৎ গণবিক্ষোভ রোধ করার চেষ্টা করিয়াছেন। দেশের সমস্যা সমাধানে অক্ষম সরকার উপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে শাসনক্ষমতা তুলিয়া দিবার গণতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ না করিয়া পুলিশী-শক্তিতে দেশ শাসনের যে বৃটিশ নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, জনমতকে উহা আরও বিক্ষুব্ধ ও শক্তিশালী করিয়াছে। শুধুমাত্র সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে নহে, পূর্ববাংলার ন্যূনতম স্বার্থের প্রতিও লীগ নেতৃবৃন্দের নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতা জনসাধারণকে তাহাদের প্রতি ক্ষমাহীন করিয়া তুলিয়াছিল। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র-ভাষা করার সার্বজনীন দাবী দমনকল্পে নূরুল আমীন সরকারের হত্যাকাণ্ড প্রদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিয়াছে. শাসনতন্ত্র প্রণয়নে বিলম্ব, মূলনীতি-রিপোর্টে বারবার পূর্ববাংলার স্বার্থ উপেক্ষা, গত সাত বৎসরে এই সকল অবিস্মরণীয় কীর্তিই লীগ সরকারের পরাজয়ের কারণ। তাই এবার ধর্ম ও ইসলামের নামে মুসলিম লীগের সকল প্রচারণার জবাবে উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবন গঠনের স্বাভাবিক আকাংক্ষায় পূর্ববাংলার মানুষ যুক্তফ্রন্টকে জয়যুক্ত করিয়াছে।"

'নীতি ও নেতৃত্ব' সম্পর্কে ... " ... এই সংকটময় মুহূর্তে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে পুনর্গঠনের জন্য কঠোর বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন। প্রদেশবাসীর কাছে যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ তাহাদের যে সাংগঠনিক একুশ দফা কর্মসূচী পেশ করিয়াছিলেন, নির্বাচন অন্তে উহা কার্যকরী করার জন্য আজ তাহাদিগকে তাহাদের নীতিনিষ্ঠা ও সততার পরীক্ষা দিতে হইবে। যদি নেতৃবৃন্দ এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাহা হইলে আমরা জোরের সহিত বলিতে পারি পূর্ববাংলার জীবনে নবযুগের সূচনা হইবে ; জনসাধারণের গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের পূর্ণ বিকাশ লাভ ঘটিয়া রাষ্ট্রীয় জীবনে সমৃদ্ধ ভবিষৎ আলোকপাত করিবে। কিন্তু শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি দ্বারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া কেহ যদি ক্ষমতালাভ করিতেই চাহিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কেও সতর্ক

Dhaka University Institutional Repository

করার প্রয়োজন রহিয়াছে। .... জনগণ এই নির্বাচনে ব্যক্তি বিশেষ বা দল বিশেষকে ভোট দেয় নাই — সাত বছরের পুঞ্জিভূত অসন্তোষ, বিক্ষোভ, হতাশা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে তাহারা ঐক্যবদ্ধভাবে ভোট দিয়াছে. কিন্তু তাহাদের এই আস্থা ব্যর্থ হইলে প্রদেশব্যাপী এই গণ-চেতনা আবার রুখিয়া উঠিবে। লীগ চক্রের শোচনীয় পরিণাম সামনে রাখিয়া এই সত্য কাহারো পক্ষে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নহে।"[২৩]

আন্তর্জাতিক রাজনীতি অর্থনীতি এবং পররাষ্ট্রীয় নীতি সম্পর্কে সওগাত 'চলতি দুনিয়া'য় নিয়মিত আলোচনা করেছে। 'সাময়িকী' বিভাগেও তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতেন। 'কাশ্মীর সমস্যা' বিষয়ে একটি সম্পাদকীয়তে সওগাত লিখেছে ঃ

ভারত বিভাগের পর কাশ্মীর নিয়ে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হতোনা যদি ভৌগলিক ও কৃষ্টিগতভাবে সামঞ্জস্য ও ঐক্যবিবেচনায় পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মীরকে দিয়ে দেয়া হতো; কিংবা বঙ্গ যদি বিভাগ না করা হতো তাহলে বাঙলা ও বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতিকে চিরস্থায়ী দ্বন্দ্ব বিরোধ ও সরকারী বিভেদাত্মক সন্দেহপ্রবণ নীতির যাঁতাকলে পিষ্টও হতে হতোনা । কিন্তু ইংরেজ কর্মকর্তা মেনন ও মাউন্টব্যাটেন এর ষড়যন্ত্র ও স্বশ্রেণীর স্বার্থের প্রেষণে এই দুটি স্থায়ী সমস্যা ভারত বিভাগের কালে সৃষ্টি করে দেয়া হয় সাম্রাজ্যবাদী কূটচক্রে। তাতে সহায়তা করেন ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ— হিন্দু, মুসলমান উভয়সম্প্রদায়। অবশ্য পূর্ববাংলার কোনো প্রতিনিধি ভারত বিভাগকালে সক্রিয় ভূমিকা যেমন রাখতে পারেননি, তেমনি কাশ্মীরী কোনো নেতাও ছিলেননা। ফলে কাশ্মীরের হিন্দু রাজার সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির কারণে কাশ্মীর ভারত এর ভাগে পড়ে যায়। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা ছিল — ভারত ও পাকিস্তানের বড় লাট একসঙ্গে হবেন কিন্তু জিন্নাহর কারণে তা না হওয়ায় তিনি অপমানিত বোধ করে চক্রান্তপূর্বক ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাক-ভারতে এ বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শে ভারত জাতিসংঘে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করে। — মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ কাশ্মীর-সমস্যা নিয়ে অতঃপর কূটনৈতিক খেলা জুড়ে দেয়। সে খেলা এখনও চলছে — ভারত প্রথমাবধি জাতিসংঘের গণভোট সংক্রান্ত প্রস্তাব নানা ছল-ছুতায় অস্বীকার করে। জাতিসংঘ কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বের পরিণতিতে কাশ্মীরের ভাগ্য নিয়ে চিন্তিত নয় কখনই — কারণ তাঁরা তখন চেয়েছিল যেমন এখনও চায় যাতে রাশিয়ার প্রভাবে এ অঞ্চলে কমিউনিজমের প্রভাব বিস্তারিত না হয় । ..." এই সম্ভাবনায় যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সদলে রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় মাতিয়া উঠিয়াছে — তাই আজ কাশ্মীর-বিরোধে পাকিস্তান ও কাশ্মীরের প্রতি সুবিচারের কোনো গুরুত্বই যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নাই; বরং পরিস্কার বুঝা যাইতেছে যে জাতিসংঘের অন্তহীন তর্ক-বিতর্কের অবসরে কাশ্মীর গ্রাস করিতে দিয়াও যদি ভারতকে সদলে টানিতে পারা যায়, তাতেও তার আপত্তি হইবেনা। কাশ্মীর সম্পর্কে জাতিসংঘ তথা যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা আজ ইহাই। ইহা বুঝিয়াই আজ পাকিস্তানকে তার কর্তব্য নিধারণ করিতে হইবে।"[২৪]

বিশ্বপরিস্থিতিও সওগাত খুব সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং যৌক্তিকভাবে সমালোচনা করে জনমতকে সাম্রাজ্যবাদীদের বিপক্ষে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। আন্তর্জাতিক শান্তি-যুদ্ধের সম্ভাব্যতা এবং সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা করে 'আন্তর্জাতিক শান্তি' শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যে স্পষ্টতই বলা হয় যে, যুদ্ধের পরিবর্তে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সংকল্প বিশ্বের সকল শক্তিশালী রাষ্ট্রনেতারাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছেন, আবার সঙ্গে-সঙ্গে যুদ্ধের জন্য সামগ্রিক প্রস্তুতিও চালিয়ে যাচ্ছেন। আন্তর্জাতিক দুনিয়ার এটাই বৈশিষ্ট্য। পৃথিবী আজ স্পষ্টত দুটি ব্লকে বিভক্ত — প্রথমত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র ও তার লেজুড় বৃটেন ও ফ্রান্স। দ্বিতীয়ত সমাজতান্ত্রিক ও সম্প্রসারণবাদী ব্লক—রাশিয়া এবং তাঁর লেজুড় এশিয়ার চীন ও পূর্ব ইউরোপের কতকগুলি রাষ্ট্র। দুই দলের একে অপরকে শান্তির শত্রু ও সম্ভাব্য আক্রমণকারী আখ্যা দিয়ে স্ব স্ব যুদ্ধ প্রস্তুতির যৌক্তিকতা সপ্রমাণ করতে চায় এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে চলেছে। ফলে বিশ্ব শান্তি বিপন্নই থেকে যাচ্ছে। সওগাত এই পরিস্থিতিতে মন্তব্য করেছে :

> "বস্তুত জগতে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের শেষ চিহ্ন মুছিয়া না যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে করার যথেষ্ট ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। মালয়, ইন্দোচীন, মরক্কো, তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া, মিসর, সুদান, ইরান প্রভৃতি দেশের অতীত ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিলে এটা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায় যে, শান্তির বিপরীত পথে চলিয়াই পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যস্বার্থীরা শান্তির ফাঁকা বুলি আওড়াইতেছেন। জগতের প্রতেক জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নির্বিবাদে ভোগ করার অধিকার আছে কিন্তু পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা নানারূপ ভুঁয়া অজু হাতে (এবং প্রকৃত প্রস্তাবে পশুশক্তি বলে) উপরোক্ত দেশসমূহের নিজেদের শাসন ও শোষণের অবাধ সুযোগ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। ফলে শান্তি তরবারির ঘায়ে আহত হইয়া আর্তনাদ করিতেছে। পক্ষান্তরে সমূহবাদীরা মনে করিতে পারেন যে, যুদ্ধে মানুষের যে-অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্গতি ঘটে সেটা সমূহবাদের সম্প্রসারণের সম্পূর্ণ অনুকূল। এইজন্য যুদ্ধ হয়ত তাদেরও অকাম্য নয়। বিশেষত পুঁজিবাদ যখন সমূহবাদের মূলোচ্ছেদ করিতে সততই-সমুৎসুক, সে অবস্থায় সামরিক সংঘর্ষ হয়তো শেষপর্যন্ত পরিহার করা যাইবেনা। তবে একটা কথা এই যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যস্বার্থীদের শোষণ মানুষের অশেষ দুর্গতি টানিয়া আনে। সেও সমূহবাদের প্রসার-বৃদ্ধির অনুকূলে আস্থা সৃষ্টি করে। সুতরাং আক্রান্ত না হইলে সমূহবাদী ব্লক সমরে অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন অপরিহার্য নাও ভাবিতে পারে। কিন্তু পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যস্বার্থী ব্লক রাজনৈতিক স্বাধীনতাকামী জাতিগুলোকে দাবাইয়া রাখিতে চাহিবেই। সুতরাং যুদ্ধকে তাঁহারা কোনক্রমেই পরিহার্য ভাবিতে পারেনা। এই দিক দিয়া বিচার করিলে সমূহবাদীদের তুলনায় পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যস্বার্থীদের শান্তি বাণী কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়। তবে এও নিশ্চিত যে সমূহবাদীরা যুদ্ধের জন্য অপ্রস্তুত থাকিবে না। সুতরাং আন্তর্জাতিক শান্তি আজ নির্ভরযোগ্য কোনো ব্যাপার নয়।"[২৫]

পাক-মার্কিন সম্পর্কের পর্যালোচনা করে ১৯৫৪তে সওগাত তখনকার নানা চুক্তির মাধ্যমে পাকিস্তানকে আমেরিকার তাবেদার বানানোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়— "যাহোক একথা হয়তো সত্য যে, আমাদের বর্তমান অবস্থায় ইংগ-মার্কিন অথবা তার বিপরীত সমূহবাদী ব্লকের দ্বারস্থ না হইয়া উপায়ান্তর নাই। কিন্তু আমাদের নেতারা সমূহবাদীদের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন নানা কারণে পছন্দ করেন না ; এবং এও সত্য যে সমূহবাদী

Dhaka University Institutional Repository

ব্লকের নিকট হইতে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সকল রকমের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার আশাও হয়তো করা যায়না। এই পরিস্থিতিতে অন্য কোন তৃতীয় বিকল্প সম্ভবপর বিবেচিত না হওয়াতেই পাকিস্তান বাধ্য হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের সমীপস্থ হইয়াছে। যাঁহারা নিরপেক্ষে থাকার নীতি উত্তম মনে করেন, তাঁহাদের বক্তব্য অশ্রদ্ধেয় না হইলেও ঐরূপ নীতির ফলে এদেশের অভাব ও দুর্বলতা দ্রুত কাটাইয়া ওঠার পথ দেখা যায়না। অথচ প্রবল প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের মনোভাব এমন অস্বস্তিকর যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার দ্রুত বর্ধমান শক্তির পাশাপাশি দাঁড়াইয়া শক্তি অর্জনের সাধনায় ধীরগতি অবলম্বন করার ফল পাকিস্তানের পক্ষে বিপজ্জনক হইতে পারে। তুরস্কও এই অবস্থায় পড়িয়া যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারস্থ হইয়াছে। যাহোক এও একেবারে মিথ্যা নয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রদত্ত বিবিধ প্রকার সাহায্যের সংগে সংগে সেদেশ হইতে বিবিধ 'মিশন' আমাদের দেশে আসিবে এবং তার ফলে আমাদের নিজস্ব বুদ্ধি স্বাধীনভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্র সংকুচিত হইয়া পড়িবে। কিন্তু আমরা এও দেখিতেছি যে, ভারত নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া প্রচার করিলেও ক্রমশ রুশ-চীন ব্লকের নিকটবর্তী হইতেছে। অর্থাৎ নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন সম্ভবত আর বাস্তব রাজনীতির কথা থাকিতেছে না। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারস্থ হইয়াও তার 'উপনিবেশে' পরিণত নাহওয়ার চেষ্টা যথাসাধ্য চালাইয়া যাওয়া ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর কি, জনাব ফজলুর রহমান বা বিরোধী দলের নেতারা তা বুঝাইয়া বলিলে দেশবাসীর কাছে ব্যাপারটা একটু পরিস্কার হইয়া যাইত। যাহোক, একথা বলা আবশ্যক যে, আমরা মার্কিন-ভক্ত মোটেই নয় ; কিংবা ভক্তির প্রাবল্যেই এইসব মন্তব্য করিতেছি না। এদেশের স্বার্থে স্বাধীনভাবে যাহা বুঝিতেছি, তাহাই বলিলাম মাত্র।"[২৬]

বলা হয়েছে যে সমাজের ও সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রতিটি প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে সওগাত পারতপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছে। ১৯৫৪ সনে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সমর্থক ছিল বলে ইত্তেফাক সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। তখন সওগাত দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে প্রকারান্তরে গভীর ধিক্কার জানায় এই অপসিদ্ধান্তকে। প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়— 'ইহা কিরূপ গণতন্ত্র?-এ জিজ্ঞাসার উত্তর কে দিবে?... ৯২(ক) ধারাকে অযথা রূঢ় করিয়া তোলার প্রয়োজন কি?' 'সাংবাদিকতার আদর্শ' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয় ঃ সরকারী হামলা হইতে বিভিন্ন সংবাদপত্রের নিজস্ব মতামত প্রকাশের অধিকার অনাহত রাখার ব্যাপারে তাঁহাদের ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ তোলার প্রথা খুবই ন্যায়সঙ্গত।'[২৭] তাঁদের আক্ষেপ ছিল 'আজিও সমাজ-মানস নির্বিঘ্নে সাহিত্যিসৃষ্টির অনুকূল হয় নাই'[২৮] বলে। তাই দুর্নীতির প্রশ্নে 'সিভিল সাপ্লাই' বিভাগের বন্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলা হয় : 'সিভিল সাপ্লাইয়ের কল্যাণে সমাজ-জীবনে দুর্নীতি অভূতপূর্ব আকারে দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষের সময় এই বিভাগের কর্মকর্তারা মানুষের চরম বিপদের সুযোগে যেরূপ অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করিয়াছে, তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া মুশকিল।' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে এই বিভাগটি সমাজে দুর্নীতির পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে বলে এর বিলুপ্তি কামনা করলেও সওগাত এর ১০ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিতেও পরামর্শ দেয়। তবে তাঁদের শেষ বক্তব্য "পূর্ববঙ্গ সরকার সিভিল সাপ্লাই বিভাগ তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। দেরীতে হইলেও এই সিদ্ধান্তটি অভিনন্দনযোগ্য সন্দেহ নাই।' 'কালো বাজার' শব্দটি যুদ্ধপূর্ব সময়ে এদেশে একেবারেই অপরিচিত ছিল। ১৯৫৫ সনের বন্যার জন্যও সরকারকে দায়ী করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়।[২৯]

রবীন্দ্রনাথ ও পঁচিশে বৈশাখ সম্পর্কে সওগাতের দৃষ্টিভঙ্গি সামরিক শাসনের মধ্যে প্রকাশিত সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়েছে— "আমাদের এখানকার একশ্রেণীর একদেশদর্শী লোকের মনে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা (অথবা উদ্দেশ্যমূলক) রহিয়াছে যে, পূর্ববঙ্গবাসীদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লইয়া গর্ব করিবার কিছু নাই। এইরূপ ধারণা সার্বজনীন প্রতিভাকে দেশকালপাত্রের ক্ষুদ্রগণ্ডিতে আবদ্ধ করিয়া ক্ষুদ্র চোক্ষে দেখিবার অভ্যাসমাত্র। ইহার মূলে কোন সততা বা নৈতিকতাবোধ নাই।... এখানে বসিয়াও যাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক প্রভাবের কল্পিত-নজুর ভয়ে কাঁপেন, তাঁহারা আসলে হীনমন্যতারোগে ভুগিতেছেন এবং তাঁহাদের আত্মবিশ্বাসের মেরুদণ্ড বলিতে কিছু নাই। ইহাদের কাছে আমাদের একমাত্র জিজ্ঞাসা, বিপুল ও বিচিত্র বাংলাসাহিত্যের গত এক শতাব্দীর ঐতিহ্য আমাদের ন্যায্যপাওনা ত্যাগ করিব আমরা কোন্ যুক্তিতে?"[৩০]

উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সওগাত আগাগোড়াই বাস্তবসম্মত উদারদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে। প্রথম দিককার সওগাতে তাঁর কবিতা ছাপা হয়েছে। মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে এবং পরেও তাঁর এবং তাঁর সাহিত্যের ওপর লেখা প্রকাশ করেছে (লেখকদের এবং রচনার বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

আইউব খানের প্রচেষ্টায় 'লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হলে সওগাত সমর্থন করেছিল। "বর্তমান কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষের আগ্রহ দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। প্রেসিডেন্ট আইউব খান সাহিত্যের জন্য ইতিমধ্যেই একটি ফাণ্ড খুলিয়াছেন। ইহাতে দেশের দুস্থ লেখকদের কিছু উপকার হইবে।' তবে বি. এন. আর এর সহযোগিতায় বৈদেশিক (সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার) অর্থ সাহায্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন যে সাহিত্য-সেমিনারের আয়োজন করেন, তার সমালোচনায় সওগাত লিখেছে : "সেমিনারে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান, ইহার কারণ কি? এদেশের সমকালীন সাহিত্যের ধারা হইতে তাঁহারা কোনো নির্দিষ্ট তথ্য আহরণ করিতে চান কিনা তাহা আমরা জানিনা।'[৩১]

'অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাস' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে দেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে ভাবনার পরিচয় রয়েছে— "দেশের অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাসের প্রশ্নে আমাদের বক্তব্য হইল, বর্তমান অবস্থায় দুইটি দিকের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত: এক হইল ভূমিসংস্কার এবং অন্য হইল, ভারী শিল্পের চেয়ে নিত্যব্যবহার্য্য শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের উপর মনোযোগ দেওয়া। ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে বলা যায়, কৃষকদের স্বার্থরক্ষাই হইবে ইহার মৌলিক লক্ষ্য। প্রয়োজন হইলে অসমতল ভূমি, বন, জঙ্গল, জলা আবাদের উপযুক্ত করিয়া কৃষকদের মধ্যে বন্টন করিতে হইবে এবং কৃষি উৎপাদনের মধ্যে আধুনিক কৃষি-পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতির প্রচলন করিতে হইবে। এদেশের শতকরা আশি জনই কৃষক, সুতরাং কৃষকদের মঙ্গল সমগ্র দেশের মঙ্গল। আর নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের চাহিদা মিটাইবার জন্য এদেশের মহান কুটির শিল্পের ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন।"[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

আবুল ফজল প্রমুখের রচনায় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর 'রেখাচিত্রের' একাংশে তিনি আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, এদেশে সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস দীর্ঘ ও বহু ব্যাপক। আর দেশের পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে তার সংখ্যাতীত দলিল।'[৩৩]

দেশে আরোপযোগ্য শিক্ষা-সংস্কার প্রয়াসের সমালোচনা করেছে সওগাত : 'আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার যে প্রয়োজন, এ বিষয়ে দ্বিমত নাই। কিন্তু ঠিক কিভাবে সংস্কারকার্যে অগ্রসর হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে সরকারী ও বেসরকারী উভয় মহলেই চিন্তার অস্পষ্টতা ও অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ, পূর্ববঙ্গ সরকার শিক্ষা-বিভাগীয় কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর পরামর্শক্রমে শিক্ষা-ব্যবস্থার ব্যাপক-সংস্কারে উদ্যোগী হইতেছেন। প্রকাশ, ক্রমে ক্রমে সমস্ত উচ্চবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ে কৃষি, পশু-পালন, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এজন্য পাঠ্যতালিকা পরিবর্তন করার প্রয়োজন হইবে ; তবে সেই সঙ্গে যাতে শিক্ষার্থীদের উপর শিক্ষণীয় বিষয়ের মাত্রাতিরিক্ত চাপ না পড়ে, সেদিকেও নজর রাখা হইবে। কলেজীয় স্তরের শিক্ষাতেও কারিগরী শিক্ষার ওপর নজর দেওয়া হইবে। এই সরকারী পরকিল্পনা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ না পাওয়া পর্যন্ত সুষ্ঠু মতামত প্রকাশ করা চলেনা। তবে একথা সাধারণ ভাবে সত্য যে, এযুগে কোন জাতি শুধু কলা ও সাহিত্যের সম্বল লইয়া বাঁচিতে পারেনা। যাহোক,.... আশাকরি,.... সরকার শিক্ষার স্তর ও ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা বা প্রবণতা বিচার না করিয়া একধার হইতে সকল স্তরে—সকল পাঠার্থীকে বিজ্ঞান ও কারিগরীর দিকে ঠেলিয়া দিতে চেষ্টা করিবেন না। তার ফল ভালো হওয়ার কথা নয়। অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের প্রাথমিক, মধ্য ও মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষার জন্য কতোটুকু স্থান রাখা হইয়াছে এবং কলেজীয় স্তরেই বা কিভাবে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে ; তাছাড়া কারিগরী দক্ষতার জন্য কতোখানি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এসব দেখিয়া শুনিয়া এবং আমাদের দেশের বিশেষ অবস্থার সহিত সেগুলির কতোখানি সামঞ্জস্য রক্ষা করা চলে, তাহা বুঝিয়া এ ব্যাপারে পদক্ষেপ করা উচিত।'[৩৪] মাতৃভাষায় উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে[৩৫], সমকালীন সংস্কার প্রয়াসকে এবং শিক্ষা-বিভাগের নানা কার্যক্রমকে সওগাতে সমালোচনা করা হয়েছে, আর নারীশিক্ষা ও নারীর অধিকার বিষয়ে অনুপ্রেরণামূলক রচনাও ছাপা হয়েছে।

সংস্কৃতির অর্থ যদি হয় সার্বিকভাবে একটি জাতির জীবন ও মননসাধনার বিভিন্নরূপের প্রকাশ— তাহলে সওগাতের ইতিহাস, দর্শন, কলা, শিল্প, নৃতত্ত্ব সকল বিষয়ের আলোচনার দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, বাঙালির জাতীয় চারিত্র গঠন, পরিস্ফুটন এবং বিকাশের লক্ষ্যে সওগাতে মূল্যবান আলোচনা অনেক হয়েছে ; বাঙলাভাষার বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান লেখক-চিন্তকদের আলোচনা, বিশ্লেষণ এবং চিন্তার প্রক্ষেপণ-প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে সওগাত বাংলাদেশের মননসাধনায় অসাধারণ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি তার ছিল ; এবং তৎসঙ্গে বাঙালি মুসলিম জাতি গঠনের লক্ষ্য তাঁদের মুখ্য হয়েছিল। সাহিত্যপ্রয়াসেও উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা, পুস্তক-সমালোচনা, বিশ্ব-সাহিত্যের অনুবাদ ছেপে এবং মুসলিম বিশ্বের চিন্তানায়কদের সাহিত্য শিল্প ও দর্শনের, আর ইসলামী ধ্যান-ধারণাসহ এশিয়ার মুসলমানদের (পশ্চিমপাকিস্তানসহ) জাতীয় বিকাশের ধারার সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে সওগাত বাংলাদেশের মন, মনন ও চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। এই মূল্যবান অবদানের জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'সওগাত' স্থায়ী মূল্য লাভ করেছে।

২. ইমরোজ (১৯৪৯-৫৪)

পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রগুলোর মধ্যে 'ইমরোজ' এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করবার যোগ্যতা রাখলেও, পত্রিকাটি এখনও অপমূল্যায়িত বা অপরীক্ষিত। মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম কেবলমাত্র এই জানিয়েছেন যে : 'ইমরোজ প্রায় পাঁচ বৎসর কাল নিয়মিত প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি খ্যাতনামা লেখক-লেখিকাদের রচনায় সমৃদ্ধ ছিল। সম্ভবত আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ী' উপন্যাসটি এই পত্রিকায়ই প্রথম প্রকাশিত হয়।'[৩৬] গোলাম সাকলায়েন অন্যত্র লিখেছেন : 'ইমরোজের সম্পাদক ছিলেন কবি খান মঈনুদ্দীন ... যে কবছর .. চালু ছিল... নিউজপ্রিন্টেই বেরুতো। হাতে নিলে পাঠকের মন ভরতো না, তবে পাঠক-চিত্তকে পরিতৃপ্ত করবার মতো রচনা যথেষ্টই থাকতো। ... ইমরোজের .. লেখক নিয়মিত ... অন্যান্য সাহিত্যপত্রিকাতেও লিখতেন ... পশ্চিম বাংলার নামকরা লেখক(রাও) ... লিখতেন .. ইমরোজকে কেন্দ্র করে তাই বলে কোন সাহিত্যিকগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়নি। বিশেষ কোন মটো তার ছিলনা।'[৩৭]

উপর্যুক্ত বক্তব্য অনেকটা মনগড়া। উন্নতমানের রচনায় ভরা থাকতো বটে, তবে 'সূর্যদীঘল বাড়ী' ইমরোজে নয় — নওবাহারে ছাপা হয়েছিল। ইমরোজের পাঁচ বছরের আয়ুষ্কালের পঞ্চম বর্ষে মাত্র সম্পদকরূপে কবি মঈনুদ্দীনের নাম ছাপা হয়েছিল। প্রথম দুবছর সাত মাস মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ ; তৃতীয় বর্ষের অষ্টম-নবম সংখ্যা আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৫৯ থেকে চতুর্থ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৬০ পর্যন্ত শেখ আবদুল হাকিম এবং পঞ্চম বর্ষ প্রথম, অগ্রহায়ণ ১৩৬০ সংখ্যা থেকে মঈনুদ্দীন এর নাম সম্পাদক হিসেবে ছাপা হয়। পত্রিকাটির প্রথম চার বছরের কাগজ ভালো (সাদা, পাকশি) ছিল। সাইজ ছিল ডাবল ডিমাই ১/৮। পৃষ্ঠা ৬৪ এবং মাঝেমধ্যে বেশী বা কম। 'পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক শ্রেষ্ঠ মাসিক' কথাটা তাঁরা পত্রিকার ইনারে ব্যবহার করতেন। নিয়মাবলীতে বলা হয় ঃ 'রচনা প্রকাশনা বিষয়ে সম্পাদকীয় উপদেষ্টামণ্ডলীর মতামতই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। পত্রিকা প্রতিমাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। ইমরোজের কার্যাধ্যক্ষের ঠিকানা ছিল ৩৭ বাংলাবাজার ঢাকা। মোহাম্মদ আবদুল খালেক কর্তৃক ঢাকা বাংলাবাজার প্রেসিডেন্সী প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। অনুসন্ধানে জানা যায় পত্রিকাটি পরিচালনা করতেন প্রকৃতপক্ষে প্রখ্যাত পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরীর সত্ত্বাধিকারী শ্রী অনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ.।[৩৮] তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্র ছিলেন তবে সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থও তিনি লিখেছেন। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত বইয়ের বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে তাঁর নামের আগে 'সুসাহিত্যিক' বিশেষণ প্রয়োগপূর্বক বীরত্বে বাঙ্গালী, ব্যায়ামে বাঙ্গালী, বিজ্ঞানে বাঙ্গালী, যুগের মানুষ, যুগের আলো, বৈজ্ঞানিক জগদীশ,

Dhaka University Institutional Repository

কপালকুণ্ডলা (সংক্ষিপ্ত), আনন্দমঠ (সংক্ষিপ্ত) রবীন্দ্রনাথ, কেনারাম প্রভৃতি বইয়ের রচয়িতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমরোজের পাতাতেই এইসব বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে। 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক একটি বই অনিলচন্দ্র ঘোষ ১৯৬১সনে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীতে প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী থেকে স্বনামে প্রকাশ করেছিলেন। কাজী আবদুল ওদুদকৃত 'ব্যবহারিক শব্দকোষ' গ্রন্থেও অনিল ঘোষের নাম পাওয়া যাচ্ছে বলে সম্প্রতি গবেষকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। তা হবারই কথা ; কারণ ১৯৫০-৫২ সনের দিকে 'ব্যবহারিক শব্দকোষে'র গায়ে কেবলমাত্র কাজী আবদুল ওদুদের নামই ছিল। অথচ পরবর্তীতে কাজী আবদুল ওদুদ ও অনিল চন্দ্র ঘোষ-এর নাম মুদ্রিত হয়েছে। ফলে এই কাজের কৃতিত্ব নিয়ে জল্পনা-কল্পনার সূত্রপাত হয়েছে। তবে অনিল ঘোষের প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরীর সাহিত্যপত্রিকা ইমরোজের বহু সংখ্যায় এই বিজ্ঞাপনটি ছাপা হয়েছে : 'পূর্বপাকিস্তানের প্রথম অভিধান। খ্যাতনামা সাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদ এম. এ প্রণীত ব্যবহারিক শব্দকোষ। পূর্বপাকিস্তানের উপযোগী নুতন বাংলা অভিধান। গ্রন্থকারের দীর্ঘ একনিষ্ঠ পরিশ্রমের ফল।বহু নুতন আরবী, ফারসী, উর্দু শব্দের মূল উচ্চারণসহ বিশদ ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ। হাজার পৃষ্ঠার উপর। শুদ্ধ ছাপা ও সুন্দর বাঁধাই। এখন পূর্বপাকিস্তানে ইহা না হইলে চলিবেনা। পুরাতন কোন অভিধানেই নবীন পাকিস্তানের ভাষা-সম্পদের পরিচয় মিলিবেনা। এই অভিধান না দেখিয়া এবার অন্য বই কিনিবেন না।' তাছাড়া এই পত্রিকায় 'ব্যবহারিক শব্দকোষ' এর আলোচনাও আছে (৪র্থ বর্ষ ১১ সংখ্যা)।

অনুসন্ধানে আরও জানা যায় অনিলচন্দ্র ঘোষ নিজে লিখতেন না। তিনি অর্থের বিনিময়ে পাণ্ডুলিপি তৈরী করিয়ে নিতেন। সৌখিন ব্যবসায়ী ছিলেন। বয়সের দিক থেকে তিনি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) অথবা আবুল ফজল (১৯০৩-৮৩)-এঁদের সমবয়সী ছিলেন। ১৯৬৬-৬৭ নাগাদ তিনি পাকিস্তান ছেড়ে সম্ভবত ভারতে চলে যান। এই সময়ের পর আর তিনি ঢাকায় ছিলেন না।[৩৯] উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরীর শাখা কলকাতাতেও ছিল। ইমরোজে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'মুকুল' পত্রিকার সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক এর নাম অনিলচন্দ্র ঘোষ। একথা স্পষ্টতোই ধারণা করা চলে যে অনিলঘোষ ব্যবসায়ী হলেও সাহিত্যসংস্কৃতি ও সমাজসেবার প্রতি তাঁর খেয়াল ছিল। সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংকটের কালে তিনি একটি প্রথমশ্রেণীর সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সামাজিক সংকট প্রতিরোধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। পত্রিকার দ্বারা তিনি হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত হননি। তবে সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারটাকে সদর্থক একটা কর্ম মনে করলে; বিশেষ করে সেই ১৯৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩ ও ৫৪ সনের মতো অসৃষ্টিশীল, বন্ধ্যা সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে যখন অসাম্প্রদায়িক, বাংলা ভাষার সপক্ষে সুপারিশকারী নিয়মিত কোনো বলিষ্ঠ পত্রিকা ছিলনা, মাঝে-মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছিল সীমান্ত, অগত্যা, মুকৃতি, যাত্রিক, স্পন্দন— কিন্তু এঁদের শক্তি তেমন জোরদার ছিল কৈ? এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াসের সঙ্গে মিলেছিল শক্তিশালী সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনার 'ইমরোজ' ; ফলে দলে ভারী নাহলেও শক্তি জুগিয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী আর বায়ান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারির সংগ্রামীদের। যদিও এঁদের বিপক্ষে ছিল একঝাঁক শক্তিশালী নিয়মিত ও অনিয়মিত পত্রিকা। সওগাত প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৩তে প্রকাশিত হলেও ১৯৫৮ সন পর্যন্ত অনিয়মিত ছিল। আর সামরিক শাসনের সময়ে বৃদ্ধ সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন ততোটা বিপ্লবীও হতে পারেননি। তাছাড়া সওগাত ১৯৪৯ সনে কলকাতার জীবন শেষ করে ঢাকা এসে যখন বের হয়নি, বন্ধ— তখন এখান থেকে নিয়মিত মাসিকের আকারে প্রকারে ও সামর্থে প্রকাশিত হচ্ছিল ইমরোজ এবং এতে বাঙালির জীবনভাবনা অকপটে রূপ পাচ্ছিলো। তাই নানান ঐতিহাসিক সামাজিক কারণের সমন্বয়ে ইমরোজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী একটি মাসিক সাহিত্যপত্রিকা ছিল, তা বলতেই হবে। মোহাম্মদী, মাহেনও, আল-ইসলাহ, নওবাহার, দ্যুতি, তাহজিবের সাধনা ছিল যেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার, সেখানে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক আধুনিক রাষ্ট্র ও মাতৃভাষার নির্বাধ-নিঃশঙ্কচর্চার উপযোগী সাহিত্যপরিবেশ সৃষ্টিতে ইমরোজ সুদৃঢ় অবস্থান নিয়েছিল। সমকালীন যুগের দাবী মেটানোর বিচারে এর মূল্য তাই অপরিসীম। 'ইমরোজ' কথার মানেও 'আজকে' ঠওডঅ্‌ অতএব এর সুস্পষ্ট বা 'বিশেষ কোনো মটো ছিলনা' কথাটা ঠিক বলে মনে হয়না। গোষ্ঠীতৈরীতে সফল না হলেও ইমরোজ এদেশের প্রধান লেখক চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবীদের রচনার সঙ্গে স্বকীয় সম্পাদকীয় বক্তব্য দ্বারা যোদ্ধার মনোভাব নিয়ে তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক সংকট মোকাবিলা করতে চেয়েছিল — তাঁদের 'মটো' ছিল বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা, বাঙালির স্বার্থ রক্ষা করা। অবশ্য একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে তৎকালে বাঙালিপনা বিশেষ ভীতির বিষয় ছিল। কমিউনিস্টরা নিগৃহিত হচ্ছিলেন। সাধারণ মানবতাবাদী লেখকচিন্তকেরাও উচিত কথা বলতে পারতেন না। পাকিস্তানের ভণ্ড সরকারের দুরভিসন্ধি প্রকাশ হয়ে পড়ে এমন যুক্তিসিদ্ধ কথা বললে ভারতের দালাল বিচ্ছিন্নতাবাদী দুই বাংলার আঁতাতকারী কমিউনিস্ট বলে চিহ্নিত হতে হতো। তখন কমিউনিস্টরা পাকিস্তানবাদীদের শত্রুরূপে গণ্য হতেন। 'বাঙালি'রাও বটে। আর হিন্দু হলেতো কথাই নেই। বিশেষ সন্দেহের পাত্র তাঁরা। ফলে মুসলমান সমাজের কাছে বক্তব্য গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য অনিল ঘোষ মুসলমান সম্পাদক নিয়োগ করে মুসলমান কর্মচারীর দ্বারা প্রকাশ করেছিলেন নামে-ধামে চেহারায়—প্রচ্ছদে ইত্যাদিতে মুসলমানদের পত্রিকা বলে মনে হয় এমন একটি পত্রিকা। মাহেনও, নওবাহার, নওরোজ প্রভৃতির মতোই শুনতে ইমরোজ। অনেকেই তাই নাম শুনে এটাকে ঐ ধারার পত্রিকা বলে ভুল করতেন বা করছেন। যাহেক, ইমরোজের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়ভাষ্যে পত্রিকার উদ্দেশ্য আদর্শ লক্ষ এবং বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের যে চিন্তাধারা উপস্থাপিত করেছেন, তাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই পত্রিকা কি ভূমিকা পালন করতে চায় ঃ—

"ইমরোজ প্রকাশিত হচ্ছে। ইতিপূর্বে পূর্বপাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা থেকে আরও কয়েকখানি বাংলা মাসিক বেরিয়েছে। আজ চলার পথে অগ্রজদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ইমরোজ কোন দল বা ব্যক্তিবিশেষের পত্রিকা নয়। এর উদ্দেশ্য হবে সত্যিকার সাহিত্য প্রচার। নূতনত্বের সম্ভাবনাপূর্ণ মৌলিক রচনা পরিবেশনের দিকেই ইমরোজ বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে। উচ্চরুচির গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, রস-রচনা, প্রবন্ধ ও ইসলামীয় দৃষ্টি ও সংস্কৃতিমূলক আলোচনা ইমরোজ-এ নিয়মিত প্রকাশিত হবে। বিভিন্ন দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাংগালী পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য বিভিন্ন দেশের অনুবাদ সাহিত্যও এর অংগীভূত থাকবে। আমাদের চলার পথে আজ সকলের সহানুভূতি আমাদের পাথেয়।

স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার সংগে সংগে রাজনীতি–চর্চার ক্ষেত্র আজ সীমাবদ্ধ। বর্তমানে হট্টগোলের পরিবর্তে গঠনমূলক কর্মপন্থা অনুসরণের প্রয়োজনীয়তাই বেশী। আমাদের নতুন রাষ্ট্রকে সকল দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করে তুলবার কাজে আমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে। সাহিত্য, শিল্প ও জ্ঞান–বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের উপরই রাষ্ট্রের আসল উন্নতি নির্ভর করে। রাষ্ট্রগঠনে ও রূপায়নে ভাষা ও সাহিত্যের স্থান প্রথম। নূতন রাষ্ট্রে, নতুনতম পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের চর্চা আমরা একটি প্রধান জাতীয় কর্তব্য বলেই মনে করি। সাহিত্যের মধ্য দিয়েই স্বাধীন পাকিস্তানের জনগণের ভাষা ও আশা আত্মপ্রকাশ করবে; নূতন সাহিত্য দানা বাঁধবে, দেখা দেবে নিত্যনবনব চিন্তাধারা, বলিষ্ঠতর কল্পনা।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচনা হয়েছে। এতোকাল এ সাহিত্য ছিল কলিকাতাকেন্দ্রিক। সেখানকার জীবন যাত্রার সুস্পষ্ট ছাপ ছিলো বাংলা সাহিত্যের সর্বাংগে। এ নামাবলী ছাড়া অন্যকিছুর সাহিত্য বলে পরিচিত হবার অধিকার ছিলো না। পূর্ববংগের বহু প্রতিভাশালী লেখককে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে কৃত্রিমতার অনুসরণ করতে হয়েছে। ' ঢাকার বাংগাল কলকাত্তাইয়া বনিয়া গিয়াছেন।' ফলে পূর্ববংগের জনগণের ভাবধারা, বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিতে পারে নাই। যে বাংলা সাহিত্যের হওয়া উচিত ছিলো বাংলার সমগ্র জনগণের সাহিত্য সে তা না হয়ে হয়েছে বাংলার অংশ বিশেষের ও বিশেষ করে সম্প্রদায় বিশেষের সাহিত্য। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হওয়াতে এ অস্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বাংলা সাহিত্য সত্যিকার জনগণের সাহিত্য হওয়ার সুযোগ এসেছে।

আজ রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন যে শুভ সুযোগ এনেছে তার সদ্ব্যবহার করতে হবে। এর সঙ্গে সংগতি রেখে, রাষ্ট্রের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতকে লক্ষ্য করে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। একাজ চেঁচামেচি অথবা বিতর্কের নয় — মুখ্যত এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে শক্তিশালী লেখক ও চিন্তা–নায়কদের যাঁরা দ্রষ্টা ও স্রষ্টা হিসেবে স্বাধীন পূর্বপাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যকে রূপদান করবেন।

পূর্ববংগে সাহিত্যের উপাদান প্রচুর। পল্লীগীতি, বাউল গান, গ্রাম্য ছড়া মেয়েলী গান ইত্যাদি লোক-সাহিত্যের মূল্য যথেষ্ট। এগুলো পূর্ববঙ্গের নিজস্ব সম্পদ এবং গর্বের জিনিস। বিভিন্ন সংঘাতের মধ্যেও এগুলো বেঁচে রয়েছে। একে আজ নতুন দৃষ্টিভংগী নিয়ে রূপায়িত করতে হবে; যাতে এ নতুন পরিবেষ্টনীতে নতুন রাষ্ট্রের সহায়ক হয়ে উঠে, এ রাষ্ট্রের কল্যাণকর কাজের জন্যে জনগণকে উজ্জীবিত করে তুলতে পারে।

পূর্ববঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে একটি শুভ লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমূল পরিবর্তনের মাঝখানে এখাকার সাহিত্যে এখনো কোন সম্রাট বা ডিক্টেটর এর অভ্যুদয় সম্ভবপর হয়নি। অবশ্যি পূর্বপাকিস্তানের নূতন সাহিত্যের শৈশবাবস্থায় কারো কারো মনে সে মসনদ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ছিলোনা একথা জোর করে বলা চলে না। হয়তো দুএকজনের মনে অভিষিক্ত হওয়ার গুপ্ত বাসনা ছিলো কিন্তু আজ দেশের চেহারা বদলে গেছে, আজকের দিনে তা আর সম্ভব নয়। আজকের দিনে পূর্ববংগের সাহিত্য হবে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই নব সূচনার প্রারম্ভে দেখা দিয়েছে কতকগুলো অন্তরায়। যে শক্তিমান অংশ এতদিন একে পোষণ করে আসছিলেন তাঁরা আজ রাজনীতির খাতিরে উদার মানসিকতাকে বিসর্জন দিয়ে সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ গণ্ডীর দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে তার পূর্ব ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেই সিংহাসনের অধিকারীকে পূজা করতে অগ্রসর হচ্ছে— সংস্কৃত ও হিন্দীই আজ তার লক্ষ্য। নিঃস্বার্থভাবে গড়ে উঠলেই সত্যিকার সাহিত্য গড়ে উঠে– –অন্যের মন যুগিয়ে চলতে শুরু করলেই সাহিত্যের ঘটে অবনতি। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে এই অবনতির সূচনা দেখা দিয়েছে—তার সাহিত্যের স্থানে জায়গা পাচ্ছে অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা। বাংলার সাহিত্য এখন সত্যিকার সাহিত্য হিসেবে বেঁচে থাকতে পারে একমাত্র পূর্বপাকিস্তানে।

পূর্ববঙ্গের বাংলা সাহিত্যের সমুজ্জ্বল সম্ভাবনার সম্মুখে দেখা দিয়েছে ক্ষুদ্র একটা কালো মেঘ। উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে এই আওয়াজ শুনেই কোন কোন মহল থেকে ধর্মের ধুয়া ধরে বাংলা ভাষাকে নস্যাৎ করবার প্রয়াস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নিজেদের সাময়িক সুবিধা বা স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে তাঁরা যে ইসলামদ্রোহিতাই করছেন তা উপলব্ধি করার ক্ষমতাও তাঁরা হারিয়ে ফেলছেন। তাঁরা ভুলে বসে আছেন যে ইসলাম কোন ভাষা বিশেষের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনা। যে ধর্ম বিশ্বপ্লাবী, মহান, পবিত্র ও শক্তিশালী তাকে কোনো একটা ভাষার মধ্যে আবদ্ধ রাখার কল্পনা সেই ধর্ম-দ্রোহীতারই সামিল। এর সর্বত্র বিস্তার করার জন্যে দরকার সর্বভাষায় এ ধর্মের চর্চা ও অনুশীলন।

চার কোটি মুসলমানের মাতৃভাষা হয়েও যদি বাংলা সাহিত্য ও ভাষার মধ্যে ইসলামিক আদর্শ যথাযোগ্য স্থান না পেয়ে থাকে ভাষা ও সাহিত্য তার জন্যে দায়ী হতে পারেনা। ইসলাম প্রবর্তনের পূর্বেকার আরবী ভাষায় কোন ইসলামিক আদর্শ ছিলনা। অনৈসলামিক আরবীভাষার রূপ না বদলিয়েই ইসলামিক ভাষায় পরিণত হয়েছিল, বাংলা ভাষারও তেমন না হওয়ার কোন কারণই থাকতে পারেনা । কোন ভাবধারা ভাষা ও সাহিত্যে স্থান পাবে তা নির্ভর করে সেই ভাষাভাষী চিন্তানায়কদের উপর । বাংলা ভাষার ইসলামিক আদর্শের অভাবের জন্যে দায়ী এই চার কোটী লোকের নেতা বলে পরিচয় দিয়েও এতদিন যাঁরা আভিজাত্যের উচ্চ শিখরে বসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ছেড়ে অন্য ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেছেন। এই অস্বাভাবিক ও অবাঞ্ছিত অবস্থার পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তানকে সচেতন করে তুলতে হবে। তার ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে ইসলামিক আদর্শ ও ভাবধারা ফুটিয়ে তুলতে হবে । তবেই এ ভাষা ও সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ ও সর্বসুন্দর হতে পারবে। ইমরোজ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এই সর্বসুন্দর করবার উদ্দেশ্য নিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে। এই উদ্দেশ্য সফল করতেই আত্মনিয়োগ করবে।"[৪০]

ইমরোজে কবিতা লিখেছিলেন : কাজী নজরুল ইসলাম, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, প্রজেশ কুমার রায়, জসীমউদ্দিন, শাহাদৎ হোসেন, এ. এন. এম. বজলুর রশীদ, খোন্দকার মাসুদার রাহমান, আবদুল হাফিজ (অনুবাদ, হাফিজের দীওয়ান থেকে), বেগম সুফিয়া কামাল, শ্রী সুবোধ কুমার রায়, আবদুল কাদির, ওহীদুল আলম, শামসুদ্দীন, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, মনোজ রায় চৌধুরী, আবুল হাশেম, শ্রী করুণাময়ী হালদার, সিরাজুল হক, দেওয়ান গোলাম মরতুজা, এ. কে. এম. নুর মোহাম্মদ বিদ্যাবিনোদ, এম. এ. হাকিম, আবদুর রউফ, বদরুদ্দীন, বেনজীর আহমদ, শেখ আবদুল হাকিম, এস. এম.

Dhaka University Institutional Repository

রবি, সুফী মোতাহার হোসেন, অরুণ সরকার, আবু তাহের, আবদুল মুত্তালিব, শ্রী নীলরতন দাশ, মুযহারুল ইসলাম, সৈয়দ আলী আহসান, অমিয় ভূষণ চক্রবর্তী, শ্রী করুণাময়ী বর্মণ, জুলফিকার, ইউসুফ হায়দার শামসুন নাহার (সালেহা), শ্রী বিমল চন্দ্র ঘোষ, কুমার কিরনশংকর মৈত্র, মনীষা রায়, কল্যাণ চৌধুরী, শ্রী বেনু গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী চৌধুরী, শ্রী রমেন্দ্র দত্ত, শ্রী রণধীর বড়ুয়া, রথীন্দ্র কান্ত ঘটক চৌধুরী, মফিজউল হক, আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, আনোয়ারুল কবির, শ্রী বাণীকর, আবদুস সাত্তার,শ্রী বিবেকানন্দ পাল, এ. এইচ. এম শামসুদ্দীন, সুশীল রায়, শ্রী সেবাব্রত চৌধুরী , জহির বিন কুদুস, শ্রী মালিনী বসু, কাজী গোলাম আহমদ, এবং আজিজুল হাকিম প্রমুখ।[৪১]

গল্প লিখেছিলেন : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (চুল,১/১); নেশাদ বানু , স্টিফেন জিক (অনুবাদ: মাহবুব জামাল জাহেদী, 'ইনভিজিবল কালেকসন',১/১); হামেদ আহমদ (নতুন বৌ, ২/২ ইত্যাদি); মবিনউদ্দীন আহমদ (পাগলা বাবা,১/২ ; ১/৮ পাজ) ; আশরাফউজ্জামান (নতুন দিগন্ত, ১/২; কলঙ্ক ১/৯); আহমদ পারেছউদ্দিন (লেখক,১/৩; প্রায়শ্চিত্ত, ১/৫; আজরাইলের সহিত কয়েক মুহূর্ত, ১/৬-৭ইত্যাদি) ; বেগম নারগিস বানু, পারভীন আহমদ, দৌলতননেছা খাতুন (বাদলার রাতে, ১/৪; ভাগ্যি চোর এসেছিল, ১/২); বেগম সফুরা আহমদ (সখি সংবাদ, ১/৪ ও অন্যান্য) ; মির্জা আ. মু. আবদুল হাই (যোগাযোগ, ১/৮; অবধারিত, ১/১০); বেগম হাশমত রশীদ (যে নদী মরুপথে হারাল ধারা, ১/৯ ইত্যাদি); আবদুর রহমান, মোসলেমা খাতুন, আবদুল লতিফ, মনজুর রশীদ, বিশ্বদূত, এরশাদ হোসেন, মিন্টু, নওয়াজেশ আহমদ নওয়াদভী, কাউন্ট দ্য গবিনিয়ো (অনুবাদ, শাহান আরা, মাইকেল এঞ্জেলো, ২/২); শ্রীরাধারাণী দে, ফরিদউদ্দিন আহমদ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (বিদূষক, ৩/১); আশা দেবী, আতোয়ার রহমান (পোয়াল পালা, ৩/৫); কাজী আফসার উদ্দিন আহমদ (অভিসার ৩/৭, রোশনাই, ৩/১২) অবনী নন্দী (বিপ্রলব্ধ, ৩/৮-৯, গরল, ৪/৮); শাহানারা (ফেরিওয়ালা, ৩/৮-৯); ছৈয়দ আবদুস সুলতান (অভিমান, ৩/১০-১১; মৌলবী সাব, ৪/৪; কয়েদী, ৪/৭); সব্যসাচী, শ্রীমঞ্জুশ্রী চৌধুরী, মোঃ আবদুল খালেক, আবদুল হাফিজ (অন্তরাগ, ৪/৮ ইত্যাদি); মোহাম্মদ জিন্নাত আলী, শ্রীউৎফুল্ল রায়, (নালিশ, ৪/৯-১০ অনন্যা, ৪/১১;) আনোয়ার হোসেন (খেলা, ৪/৯-১০); নিয়তিরাণী দত্ত, শ্রীসুশান্ত কুমার রায়, আহমদ (এ নামে কে লিখতেন, হামেদ আহমদ না আহমদ পারেছউদ্দীন? পারেছউদ্দিন অনেক গল্প লিখেছেন), লুৎফর রহমান, সৈয়দ বদরুদ্দীন হোসেন প্রমুখ।[৪২]

ইমরোজে কবিতার চেয়ে গল্প উপন্যাস নাকট বেশী ছাপা হয়েছে। সে তুলনায় প্রবন্ধ গৌণ নয়। আর দীর্ঘ সম্পাদকীয় লেখা হয়েছেপ্রায় প্রতি সংখ্যায়। বক্তব্যপ্রধান পত্রিকা এটি নিসন্দেহে। উপন্যাস কিংবা উপন্যাসধর্মী রচনা এতে লিখেছেন যাঁরা তাঁরা হচ্ছেন ঃ নওশাবা (অন্দর ও বাহির, ১/১ থেকে) ; হামেদ আহমদ (ক্রন্দসী, ১/১ থেকে) ; খলিলুর রহমান চৌধুরী (প্রত্যাখ্যান, ১/৮ থেকে); আহমদ পারেছ উদ্দিন (নতুন যুগের মানুষ, ১/১২ থেকে; বাঙ্গালী, ২/৩ থেকে, মুক্তি, ৩/৪ থেকে); মবিনউদ্দীন আহমদ (খোলস, ২/১ থেকে); শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (কয়লাকুঠির দেশ, ৩/১ থেকে); কাজী আফসার উদ্দিন আহমদ (নোনা পানির ঢেউ, ৪/১ থেকে); আলাউদ্দিন খান (মুসাফির, ৪/১); শ্রীসুশান্ত কুমার রায় (অনুবাদ করেছিলেন কোনাল ডায়ারের উপন্যাস 'নৌসন্ধি রহস্য' ৪/৪ থেকে) ; এক বা একাধিক অঙ্কের নাটক বা নাটিকাও কম প্রকাশিত হয়নি। এ তালিকায় আছেন আবুল ফজল। তাঁর 'কায়েদে আজম' শীর্ষক নাটকের অপ্রকাশিত দৃশ্য প্রকাশিত হয় প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যায়। তাঁর 'পাকিস্তান' শীর্ষক নাটিকা প্রকাশিত হয় প্রথম বর্ষ ষষ্ঠ –সপ্তম সংখ্যায়। বেগম সুফিয়া আহমদ এর নাটিকা 'ঘুঘু' প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বর্ষ অষ্টম সংখ্যায়। মির্জা আ. মু. আবদুল হাইয়ের 'পণ্য' প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা থেকে; দৌলতননেছা খাতুনের একাঙ্ক নাটক 'বৈজ্ঞানিক' প্রকাশিত হয় প্রথম বর্ষ নবম সংখ্যা থেকে এবং 'ম্লেচ্ছ মালাউন' দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ-পঞ্চম সংখ্যা থেকে। আহমদ পারেছউদ্দীনও লিখেছেন একাঙ্ক নাটক 'ঝড়ের রাতে' তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে; শ্রী প্রবোধ কুমার বসু 'মাধব-মালঞ্চ' তৃতীয় বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যায়; মবিনউদ্দিন আহমদ 'নাক' চতুর্থ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যায়; ডাক্তার মোহাম্মদ হোসেন চতুর্থ বর্ষ নবম-দশম সংখ্যা থেকে ক্রমশ লেখেন 'তিনবন্ধু'। হেনা প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় রূপক নাটিকা লিখেছিলেন 'সবুজের স্বপ্ন'; ওহীদুল আলম কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে লিখেছিলেন 'বিদ্রোহী কবি' পঞ্চম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যায়। তাছাড়া মাহবুবুল আলম নক্সা লেখেন 'পাড়াগাঁয়ের ধাঁধাঁ' (৩/৬)। আপটন সিন ক্লেয়ারের তিনঅঙ্কের নাটক Giants struggle এর অনুবাদ করেন আবদুল হাফিজ (২/১০-১১)। ইমরোজের প্রবন্ধকারদের মধ্যে রয়েছেন বাঙলাভাষার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ লেখক। তালিকাটা নিম্নরূপ ঃ

- অমৃতলাল চক্রবর্তী— সাময়িক সাহিত্যের ধারা (৫/৩-৪) ;
- অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী— অপ্রিয় নাটকের প্রিয় নাট্যকার বার্নাডশ (২/২) ;
- অজিত কুমার গুহ — কায়কোবাদের কাব্যসৃষ্টির পটভূমিকা (২/১০-১১) ;
- আবদুল হক ফরিদী — সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা (১/১১) ; আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী (২/১) ;
- আবদুল কাদির — রেয়ন (১/৪) ;
- আবদুল হাকিম এম. এ. (ক্যান্টাব) — বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয় (১/৩) ;
- আলা ফরিদ আহমদ — বাংলা বর্ণমালা ও বানান পদ্ধতির সংস্কার (২/৪) ;
- আনিসুজ্জামান — পূর্ববাংলার শিশুসাহিত্য (৪/৮) ;
- আমিনুল ইসলাম চৌধুরী — ইসলামী গণতন্ত্র (৪/৯-১০); রবীন্দ্রপরিচিতি (৫/৬) ;
- ইবরাহীম খাঁ — জীবনস্মৃতি (৩/১) ; আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে দুটিকথা (১৬, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সনে কুমিল্লায় পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ, ৩/৪) ;
- এম. এ. জব্বার — মাধ্যমিক শিক্ষা ও অঙ্ক (১/২) ; আমাদের পরিভাষা সমস্যা (১/৪); বিশ্বরহস্য সন্ধানে দুশো ইঞ্চি দূরবীণ (১/৮); নিউটনের অগ্রদূত

Dhaka University Institutional Repository

ডেকার্টে (২/৬-৭ থেকে) ;

- এম. আকবর আলী — আরব রাসায়নিক নাম ও পরিচিতি (১/২) ; আরব রসায়নে ভারতীয় প্রভাব (১/৪ থেকে ক্রমশ) ; রসায়নের প্রথমপর্ব (১/৩ থেকে ক্রমশ) ; আরব রসায়নের উৎস (৩/২-৩ থেকে ক্রমশ) ; রাসায়নিক রাজী (৩/৮-৯ থেকে ক্রমশ) ;
- এবরাহিম আবদুল কাদের আল মবেনী — উম্মি (১/৩ অনুবাদক ডক্টর মুহম্মদ এছহাক) ;
- এ. এন. এম. বজলুর রশীদ— সিদ্ধিকবি শাহ আবদুল লতীফের জীবন ও কাব্য (১/৪) ; মাসুয়ী ও পুনহু (২/২); সুরের মুক্তি (৩/৮-৯) ;
- এম. আবদুল কাদের — কোম্পানীর অযোধ্যানীতি (১/৪) ; আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকালয় (১/৯) ; য়িহুদীদের উপর মুসলিম প্রভাব (২/৬-৭) ; ইউরোপীয় ভাষায় মুসলিম প্রভাব (২/১০-১১) ; ইউরোপীয় রাজনীতিতে মুসলিম প্রভাব (৩/৪) ; আরব জাতির সঙ্গীত সাহিত্য (৩/৮-৯) ; ইতিহাস-ভূগোলে মুসলিম প্রভাব (৩/১২) ; সোনালী যুগের স্পেন (৫/৫) ;
- এস. এম. ছদরুদ্দীন— ভূগোল শিক্ষা (১/১০) ;
- এম. এন. এ. হেনা— ইন্দোনেশীয়ায় ইসলাম (অনুবাদ, ২/১০) ;
- এস. এ. জাফর নদভী — মুসলিম সাম্রাজ্যে পাক-ভারতের পাঠাগার (৩/১২) ;
- ওহীদুল আলম — আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (২/৯) ;
- কাজী মোতাহার হোসেন — বাঙ্গালী মুসলমানের কাব্যসাধনা (৫/৫)
- কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় — পাকিস্তানের খাদ্যসমস্যা (১/১ ও পরের কয়েক সংখ্যায়) ;
- কিরণ শংকর রায় — নজরুল ইসলাম (১/৯) ;
- কমলাকান্ত ঘোষ —রবীন্দ্রনাথের সহিত কয়েটি দিন (৫/৬) ;
- কাজী আফসার উদ্দীন আহমদ— লরেন্স সত্যান্বেষণ (২/৯) ; জীবনশিল্পী শেকভ (৩/১ থেকে ধারাবাহিক);
- খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন — নজরুল জীবনের এক অধ্যায় (৩/৭) ;
- গোপেশ চন্দ্র দত্ত— রবীন্দ্রকাব্যে দুঃখদেবতা (৫/১) ; রূপছন্দা ও কবি শাহাদাৎ হোসেনের কবি দৃষ্টি (৫/৩-৪) ; বাস্তবসমাজ ও সাহিত্য-জগত (৫/৫) ;
- জহির বিন কুদ্দুস — বাংলা নাটক ও শাহাদাৎ হোসেন (৫/৩-৪) ; মহাকবি মাইকেলের চতুর্দশপদীর বৈশিষ্ট্য (৫/৫) ;
- তাজিক — নীৎসে, ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথের জীবনের আদর্শ (১/৯);
- দেওয়ান আবদুল হামিদ — শাহাদাৎ হোসেনের রূপায়ন (৫/৩-৪) ;
- নূরুল আকবর — প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে মুসলমান (১/১০ ও অন্যান্য); মঙ্গোল আক্রমণের আগে পূর্ব ইউরোপে ইসলাম (২/১২);
- প্রবোধচন্দ্র সেন — অচলায়তন (৪/৭); চিঠি (৩/১০-১১);
- বিশ্বদূত —আন্তঃডোমিনিয়ন ফুটবল ম্যাচ (১/২); হিন্দুস্থানের পথে (১/৪); ইতিহাসের প্রত্যাবর্তন (২/১০-১১) ;
- ভবেশ নন্দী — বেলুচিস্তানে দিনকয়েক (৩/১) ;
- মুহম্মদ শহীদুল্লাহ — সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা (১/১) ; উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম মুসলমান গদ্য-লেখক (২/১০-১১); বাংলাভাষার জাতি (৩/২-৩) ; বিদ্যাপতির পদাবলীর সংস্করণ (৩/৮-৯) ; বৌদ্ধযুগে বাঙ্গালার সমাজচিত্র (৭০০-১১০০) (৪/১) ; গোরক্ষনাথ দেবের হাচাই (৪/৯-১০ থেকে ক্রমশ) ; মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পদের অনুবাদ (৫/১ থেকে ধারাবাহিক) ;
- মুহম্মদ আবদুল হাই — কবিগুরু আলাওল (১/৪) ;
- মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ — খোলাফায়ে রাশেদীনের রাজনীতি (১/৩) ; মোঘল যুগের রাজনীতি (১/১২ থেকে ধারাবাহিক) ;
- মুহম্মদ এনামুল হক — সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে পল্লীসংস্কৃতির উৎস নিরূপণ (২/২ এবং অন্যান্য) ;
- মকছুদুর রহমান হিলালী — জাতি গঠনে নাট্যমঞ্চের দান (২/৮) ;
- মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন — বাংলার লোকসাহিত্য (২/৮ থেকে ক্রমশ) ; মোহাম্মদ রুহুল আমিন (৪/৮) ; দিবানে শামছে তাব্রিজ (৫/১ থেকে ক্রমশ);
- মোহাম্মদ গোলাম রসুল— চিকিৎসাবিদ্যায় অমুসলিম অবদান (৩/৫) ;
- মালিক আবু হেনা — আমাদের শিক্ষাসমস্যা (৩/৮-৯) ;
- মনীষা রায় — বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুলের দান (৩/১০-১১) ;
- মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী — শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী (৪/৬); বাংলা ভাষার কথা (৫/৩-৪) ; বিশ্বকবি স্মরণে (৫/৬);
- যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত — পুরনো কথা, ঢাকার ইতিহাস (৩/১) ;
- রেজাউল করিম — মিশরের শিক্ষাসাধনায় অন্ধকবির দান (৩/২-৩) ;
- হরেন্দ্র চন্দ্র পাল — উর্দুভাষার বিভিন্ন নাম পরিচিতি ও ইহাদের প্রকারভেদ (৪/৭) ; সুফী কবি জালাল উদ্দিন রুমী (৪/৮) ; উর্দু কবি তক্কী মীর (৪/৯-১০) ; মরমীয়া কাব্য ও মীর আনিস ও মীর্জা দবির (৫/৩-৪) ; রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' নাটকের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব (৫/৬) ;
- শামসুন্নাহার মাহমুদ — প্রাচীন মুসলিম সভ্যতা ও পাকিস্তান (৪/৭)

Dhaka University Institutional Repository

• শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী— নজরুলকাব্যে নারী (১/৯) ;
• শাহ এফ. রহমান — আমেরিকার প্রবাসকাহিনী (১/২ ও অন্যান্য) ; আমেরিকার ভ্রমণ কাহিনী (১/৪ থেকে ক্রমশ) ;
• সৈয়দ আলী আহসান — নজরুল ইসলাম (১/২) ; পূর্বপাকিস্তানের আধুনিক গীতিকবিতা (২/৩) ;
• সুরেন্দ্র মোহন পঞ্চতীর্থ — তৌহিদ বা একত্ববাদ (১/১২) ; প্রাচীন যুগে কৃষি -চর্চা (৩/৭) ; গীতায় মহাপুরুষ (৪/৪) ;
• সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — মিসরের রাজা ইখনাটেন (৫/৩-৪) ইত্যাদি।

ইমরোজের লেখক ও বিষয়বস্তুতে প্রতীয়মান হয় হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থে বা কল্যাণে এর পাতায় জ্ঞানের চর্চায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অসাম্প্রদায়িক মানবিক চেতনা এর প্রতিটি রচনার মূল প্রেরণা। বাংলাভাষা ও বাংলাদেশকে তাঁরা আলোচনার মুখ্য কেন্দ্র ধরে অগ্রসর হয়েছেন। তবে তাতে রাষ্ট্রদ্রোহীতা ছিলনা। নিজ স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে কেউ অসন্তুষ্ট হলেও তাতে কিছু এসে যায়না এমনই মনোভাব।

ইমরোজের কাগজ অধিকাংশ সংখ্যাতে সাদা ভালো মানের ছিল।প্রচ্ছদ ও আনুসঙ্গিক অঙ্গসৌষ্ঠবে মোহাম্মদী- সওগাতের বৃটিশ- আমলের মান বজায় রেখেছিল। ডাবল ডিমাই ১/৮ সাইজের আট ফরমা তাঁদের পরিসর ছিল। কিরণ শংকর সেনগুপ্তের 'স্মরণী' শীর্ষক কবিতা বিশেষ কাগজে সর্বপ্রথমে কায়েদে আজমের ছবির উপরে ছাপা হয়েছিল। কবিতার মূল প্রেরণা কায়েদে আজমের মরণে শোকজ্ঞাপন বা তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো। শেষ দুটি লাইন ঃ " শোষণের পীড়নের চক্র থেকে মুক্তি শুধু আজ/ হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত, জনতাই তুলেছে আওয়াজ।' তাছাড়া কাজী নজরুলের 'আশীর্বাদ' শীর্ষক কবিতাটি শ্রীহট্টের শ্রীযুক্তা লীলাবতী মজুমদারকে লিখিত। তাঁর অনুমতিক্রমে অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের সৌজন্যে এতে ছাপা হয়েছিল — " তোমার কণ্ঠে বাঁধিয়াছে — নীড় সুরের দেশের পাখী সুরেশ্বরের হস্তে বাঁধুক, তোমার সুরের রাখী।' দশ লাইনের কবিতার শেষ দুচরণ ছিল এরূপ : "তুমি আনিয়াছ সুরধনী ছানি যে সুরের রূপলীলা/তারি রঙে তুমি অশ্রুর মেঘে কর নিশি রঙ্গীলা।[৪৩] এছাড়া রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিও এতে ছাপা হয়েছিল। সিলেটের উপেন্দ্রনাথ কর গীতাঞ্জলীর বিরূপ সমালোচনার প্রতিবাদ লেখেছিলেন। এরই ('গীতাঞ্জলী সমালোচনা প্রতিবাদ') প্রাপ্তি স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০ই আশ্বিন ১৩২১ সনে এই চিঠি শ্রীকরকে লিখেছিলেন। এটিও মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের সৌজন্যে ছাপা হয় (১/৫)। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীকে লিখিত প্রবোধচন্দ্র সেনের পত্রও ইমরোজ ছেপেছে। বেশ কিছু পুস্তক সমালোচনা হয়েছে তারমধ্যে উল্লেখ্য আলী আহমদ-এর 'বাংলা কলমী পুঁথির বিবরণ; 'পাকজীবন'। শেষোক্ত বইয়ের লেখক মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহার ও শ্রী অনিল চন্দ্র ঘোষ। অনিল চন্দ্র ঘোষ শুধু কাজী আবদুল ওদুদের সঙ্গে শব্দকোষই প্রণয়ন করেননি, হাবীবুল্লাহ বাহারের যুগ্ম লেখকও হয়েছিলেন। প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা থেকে মোহাম্মদ আবিদ আলী বোখারী শরীফ থেকে অনুবাদ প্রকাশ করতে থাকেন। অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সংগৃহীত পল্লীসংগীতও ধারাবাহিক ছাপা হয়েছে। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথ, হিন্দুসাহিতিক ও হিন্দুরচিত সাহিত্য এতে ছাপা হয়েছে, পাশাপাশি পাকিস্তানের প্রতি অনগত ইসলামী বিষয়ও প্রচুর ছাপা হয়েছে। এম. এ. জব্বার ও এম. আকবর আলী অথবা অন্য কোনো মুসলমান লেখকের মুসলিম ঐতিহ্য বিষয়ে লেখা প্রবন্ধও ছাপা হয়েছে প্রায় প্রতি সংখ্যায়। তৃতীয় বর্ষ থেকে ছোটদের আসর এবং মহিলা মহল চালু হয়। এতে যাঁরা লিখতেন তাঁদের মধ্যে ফয়েজ আহমদ, ওমর আলী, ফরিদা বেগম, বেগম জেবু আহমদ, নীলিমা বসু, ক্ষিতীশচন্দ্র রায় প্রমুখের কথা উল্লেখনীয়।

'ইমরোজ' বাংলাভাষা, বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি তথা জাতীয় উন্নতি - অগ্রগতির জন্যে চেষ্টিত ছিল। স্বাধীনতার পরও দুই সম্প্রদায়ের মনের বিদ্বেষবিষ দূর হয়নি, সাহিত্যেও তা পূর্বের ন্যায় ক্রিয়া করেই চলতে লাগলো। এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের প্রায় শত্রুরূপে চিহ্নিত হচ্ছিল--তখন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নিকট থেকে সংগ্রহ করেছিলেন ' সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা' শীর্ষক প্রবন্ধ। ১৯৫০ সনের দাঙ্গার কালে তাঁরা স্পষ্ট করেই মতামত জানিয়েছিলেন এই দাঙ্গার জন্য তাঁরা 'দুঃখিত ও লজ্জিত'। দাঙ্গাকারীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়, এর ইতিহাস আছে, 'তাদের জানা উচিত হিন্দুস্থানের মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে তার জন্য পাকিস্তানী অমুসলিমদের দায়ী করা ন্যায় সঙ্গত নয়। তাছাড়া এখানে অমুসলিমদের উপর কোন অত্যাচার করার অর্থই ভারতীয় মুসলমানদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়ান। যাহোক, এই দুঃখের মধ্যেও আমাদের আনন্দ ও গর্ববোধ হচ্ছে .. দুচারজন ছাড়া মুসলিম মাত্রেই এই উম্মত্ততার বাধা দিয়েছেন। অনেকেই নিজের প্রাণ বিপন্ন করেও অমুসলিমদের সর্বোতোভাবে রক্ষা করেছেন।[৪৪]

ইমরোজ অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সম্পাদকীয়-বক্তব্যে পাকিস্তানের বাজেটের সমালোচনায় বলেছে — 'এখানকার মন্ত্রীসাহেবদের মন্ত্রীত্বের চিন্তাই মুখ্য দেশের চিন্তা গৌণ' বলে বাজেট-এ কি হলো আর না হলো তা দেখার বা ভাবার সময় তাঁরা পাননা।[৪৫] কর্মচারী ছাঁটাই নীতির সমালোচনা করে ইমরোজ লিখেছে : 'অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরগুলিতে কর্মচারী ছাঁটাইয়ের নীতি অনুসৃত হচ্ছে বা হতে চলেছে। প্রকাশ যে স্বল্পবেতনভুক কর্মচারীদের দিকেই ছাঁটাইয়ের কাঁচি সমুদ্যত। নীতি হিসাবে এ মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। অধিক বেতনভোগীদের বেতন সাময়িকভাবে হ্রাস করে দিয়ে এসমস্যার সমাধান সম্ভবপর করে তোলা উচিত বলে আমরা মনে করি। ব্যাপক ছাঁটাইয়ের ফলে বেকার সমস্যা দেখা দিবে, তার ভয়াবহ রূপ কল্পনা করা কি খুব কঠিন বলে মনে হয়?[৪৬]

স্কুল, কলেজ তথা শিক্ষাব্যবস্থার ভয়াবহ অধোগতি দেখে শঙ্কিত 'ইমরোজ' লিখেছে ঃ "পূর্বপাকিস্তানের শিক্ষার গতি সম্বন্ধে আমরা দৈনন্দিনই হতাশ হয়ে পড়ছি। ছেলেমেয়েদের class IV থেকেই উর্দুভাষা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া বাংলার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রভৃতির বয়সের অনুপযোগী বিষয় শিখতে বাধ্য করে শিশু মস্তিষ্কের উপর যে অযথা চাপ দেওয়া হচ্ছে তাতে সাধারণভাবে পূর্ণাঙ্গ মননশীল ব্যক্তিত্বের গড়ে ওঠা আশা করা যায়না। এর উপর class VI থেকে ইংরেজী ও class VII হতে আরবী চাপান হয়েছে। এই মানসিক চাপের উপর জুটেছে স্কুলের অভাব অনটন। প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষকের অভাব এখনও ঘুচে নাই, অনেক স্কুলই পতোনোন্মুখ।সরকারী স্কুলগুলির অবস্থা সর্বত্রই ভাল বলা চলেনা। এই ঢাকা শহরের বুকের উপরে অবস্থিত

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাবাজার গার্লস স্কুলের কয়েকটি শ্রেণী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে স্কুল দালানের অবস্থা অতি শোচনীয় বলে। কলেজিয়েট স্কুলের দালানটির অবস্থাও তথৈবচ। শুধু স্কুলের নয়, কলেজের অবস্থাও তেমনি শোচনীয়। এই ঢাকা শহরের বুকে শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা বিভাগের চোখের উপর ঢাকা কলেজ বসছে কতকগুলি অপরিসর রুমের মধ্যে। ইডেন কলেজের মেয়েদের নিজেদের কলেজে Science পড়বার কোন ব্যবস্থা নেই। অনেক মেয়েকে বাধ্য হয়ে Science পড়া থেকে নিরস্ত থাকতে হয়। এসমস্ত দেখে কেউ যদি শিক্ষা বিভাগের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ না করে তাকে দোষ দেওয়া যায় কি?[৪৭]

মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড গণিতের একটি পরিভাষা করে প্রচার করেছিল। ইমরোজেও তা মুদ্রিত হয়। কিন্তু আর কোনো বিষয়ের পরিভাষা নাহলে চলবে কি করে? শিক্ষার কোনো পরিবেশ পরিস্থিতি নেই বলে তাদের আক্ষেপের অন্ত নেই। শুধু শিক্ষার নয়। খাদ্য সমস্যা নিয়েও তাঁরা দীর্ঘ প্রবন্ধ ছেপেছেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকেছেন। স্বাধীন স্বনির্ভর জাতি গঠনের প্রতি ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। নারী সমাজের কিছু আশা আকাঙ্ক্ষার স্বরূপও এতে ধারণ করে আছে। রাহেলা বেগম ১৯৫২ সনের ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের মহিলা অধিবেশনে 'নারী প্রগতি ও তার মর্যাদা' বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁর এই অভিভাষণটি ইমরোজ গুরুত্ব প্রদান করে ছেপেছিল (৩/১২)। 'অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে নারীর স্থান' নিয়েও পত্রিকাটি ভেবেছিল দেখা যায় (রেবেকা সুলতানা, ৫/২)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি.সি কেনো বিদেশী বিভাষী হবেন স্বাধীনতার পরেও? এই স্বাদেশিক চিন্তার প্রকাশ রয়েছে ইমরোজে : 'বিদেশী অধ্যাপক ডক্টর ডব্লিউ এ জেঙ্কিনসনকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ করা হয়েছে। এপদের জন্যে পাকিস্তানে যোগ্য লোকের অভাব ঘটেছে বলে আমরা মনে করিনা। স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এ দায়িত্বের জন্য লোক বাছাই করলে আমাদের পূর্ববাংলায়ও হয়তো উপযুক্ত লোক পাওয়া সম্ভবপর হতো। শিক্ষার মান উন্নয়ন একান্ত আবশ্যক।'[৪৮] আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এর মৃত্যু প্রসঙ্গেও তাঁরা বক্তব্য উপস্থিত করেছেন এবং নতুন দেশের আইনসভার ভোটার তালিকা পাকিস্তানে এই প্রথম ছাপা হলো ; কিন্তু মুদ্রণক্রটি এবং ভোটার তালিকা থেকে পাকিস্তানের 'অনেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের নাম বাদ পড়ায় তাঁদের নাগরিক অধিকারও ক্ষুন্ন হয়েছে' বলে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবার জন্যও প্রস্তাব করা হয়েছে।[৪৯] বি.এ. পাশের আগে ছাত্ররাজনীতি না করার ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের প্রশংসা করেনি ইমরোজ, তাঁরা বলেন, এ সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক-বঙ্গবিভাগের কার্যকলাপ অনুসরণযোগ্য: ... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরও মনে রাখা উচিত যে বিশ্ববিদ্যালয় গভর্নমেন্টের অফিস নয়; এটা স্বতন্ত্র জগত যা গভর্নমেন্টের খেয়াল খুশীর বাইরে শুধু সংস্কৃতি নিয়ে কাল কাটাবে।[৫০] বাংলাভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, — রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রমুখের জন্ম মৃত্যু উপলক্ষে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেই তাঁরা ক্ষান্ত হননি— ১৯৫২ সনের একুশে ফেব্রুয়ারীর শহীদদের রক্ত দেখেও তাঁরা বিচলিত, অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন; 'বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দানের জন্য যে সমস্ত তরুণ বীর শহীদ হয়েছেন আমরা তাঁদের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ তসলিম জানিয়ে এই কথাই শুধু বলব, তাঁদের এই আত্মোৎসর্গ ব্যর্থ হয় নাই, ব্যর্থ হবার নয়। যতদিন দুনিয়ার বুকে বাংলাভাষা জীবিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত তাঁদের এ কোরবানীর কথা মেঘ-গম্ভীর শোকবিহ্বল ভাষায় বিঘোষিত হবে।'[৫১]

ইমরোজ পাকিস্তান অর্জনের অব্যবহিত কালের পত্রিকা। তৎকালে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি ধ্বংসের যে পাঁয়তারা চলে তার বিরুদ্ধে প্রতিমাসে তাঁরা সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। বাংলাভাষাপ্রেমিক জনগণকে তাঁরা নৈতিকশক্তি, সাহস ও যুক্তিবুদ্ধি অনুপ্রেরণা যুগিয়ে কালের দাবি মিটিয়েছেন। ফলে এটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতি এবং পূর্ববঙ্গের জনগণের চেতনার ধারক ও স্মারকরূপেই বিবেচিত হতো। মূকের ব্যথা ভাষা ও অভিব্যক্তি পেয়েছিল এই মুখপত্রে। বিভাগ পূর্ববর্তীকালের মুসলমান লেখকের সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা নেই বলে 'পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যের ইতিহাস থেকে তাঁদের নাম ছেটে ফেলে দিতে হবে, এমন মনোভাবকে নিশ্চয়ই সাহিত্যিক মনোভাব বলা চলেনা, ঐতিহাসিক মনোভাব তো এ নয়ই। মুসলিম ভাবধারা প্রচলনকারী হিসেবে গৌরব করবার দাবী বিগত যুগের সাহিত্যিক কেন—প্রবল প্রতাপশালী বাদশাহদেরই কার কতখানি সে বিচার করতে বসলে নিশ্চয়ই হতাশ হতে হবে। ... (তখন) মুসলিমরাও যে অমুসলিমদের চেয়ে জ্ঞানে বিজ্ঞানে কম নয় নিজেদের সাধ্যমত তারই প্রমাণ দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের সেই প্রচেষ্টাকে অগৌরবের বলা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ মনোভাবের পরিচয় নয়। তাঁরা আরও বলেন, 'ধর্মের নামে ভাষার নাম কোথাও প্রচলিত আছে কিনা জানিনা, ...কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে কেউ কেউ সাহিত্যে অপাংক্তেয় বাংলা লেখার মধ্যে, স্থানেঅস্থানে দুর্বোধ্য আরবী ফারসী উর্দু ছড়িয়ে দিয়ে তাকেই মুসলমানী বাংলা বলে চালাতে চেষ্টা করেছেন। কোন সাহিত্যরসিকই একে বাঞ্ছনীয় মনে করবেন না। .... নজরুল কাব্যে পাকিস্তানী ভাবধারা নেই বলে যাঁরা বীতরাগ দেখাচ্ছেন তাঁরা একটা কথা মনে রাখলে ভাল করবেন। প্রকৃত সাহিত্য সর্বযুগের সর্বদেশের জন্য কোন এক স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা। ... শেক্সপীয়র ... মুসলমান অধিবাসীদের জন্য ভাবেন নি। কিন্তু বাংলার মুসলমানেরাও তাঁর নাটক পড়ে আনন্দ পায় এবং প্রশংসাও করে। মুসলমানী নয় বলে ছুঁড়ে ফেলে দিবার ব্যবস্থা করে না।' নজরুল জন্ম বার্ষিকীতে—'দুই একজন সাহিত্যিকের এই মনোভাবের পরিচয় পেয়ে আমরা সত্যিই দুঃখিত।' বাঙ্গালী মুসলমানদের দুর্ভাগ্যের জন্য বাঙ্গালী মুসলমানই দায়ী—নিজেদের গৌরব ক্ষুন্ন করতে তাঁরা তৎপর হয়ে উঠেছেন।' পত্রিকায় আরও বলা হয়—'পূর্বপাকিস্তানে বাংলা ভাষার ভবিষ্যত অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সন্ধিহান হয়ে উঠেছি। শুধু ভাষাই নয় এখানকার শিক্ষা সম্বন্ধেও আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি। কেন্দ্রীয় পাকিস্তান শিক্ষা দপ্তরের কার্যকলাপে মনে হয় পূর্বপাকিস্তানের শিক্ষা অগ্রসর হোক এ তাঁরা চাননা।'[৫২] শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়েও তাঁরা চিন্তিত ছিলেন বারে বারে এ বিষয়ে আলোচনা থেকে একথা নি:সন্দেহে বলা চলে ।

'পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্য কি ধরনের হবে এ নিয়ে আজকাল দুই-চারটি লেখা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ... কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মুক্ত মন ও মুক্তবুদ্ধির পরিচয় এতে কমই পাওয়া যাচ্ছে। গতানুগতিক .... পূর্বের .... কথা ইনিয়ে বিনিয়ে আওড়ান অথবা কোন রাজনৈতিক মতবাদের সমর্থন বা কোন রাজনীতিকের মনস্তুষ্টির জন্য কোন কিছু বলাই, এতে রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাহিত্য সংস্কৃতি ও রাজনীতি এক জিনিস নয়। একথাটা তাঁরা ভুলে যান বলেই এই সমস্ত গুলিয়ে ফেলেন ... 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে নূতনের আবির্ভাব কোন সময়েই পুরাতনের আনন্দদায়ক নয়। এখানেও নতুন আসে পুরাতনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে। ... পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্যিকদের মধ্যে নতুন ভাবও নতুন ব্যঞ্জনা দেখা দিয়েছে, পুরাতনপন্থীরা তার জন্য চেঁচামেচিও

Dhaka University Institutional Repository

লাগিয়ে দিয়েছেন। আমাদের মতে এ চেঁচামেচিও নিরর্থক; নূতন সব সময়েই আসবে আর তার মধ্যে যদি বাঁচবার ও বেড়ে ওঠবার জীবনীশক্তি থাকে, তাহলে সে বাঁচবে ও বেড়ে উঠবে, কেউ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেনা। অন্যথায় সে এমনি ঝরে পড়ে যাবে।'

'পূর্বপাকিস্তানের তামুদ্দনিক সংকট দেখা দিয়েছে বলে যাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করছিলেন তাঁদের প্রজ্ঞার প্রতি ইমরোজ শ্রদ্ধাপোষণ করলেও বলেন শঙ্কিতজনেরা 'যুক্তিধারা বুঝে উঠতে পারেনি'। 'পাকিস্তান সবেমাত্র গড়ে উঠছে। পাকিস্তানী তমুদ্দুনও গড়ে উঠবে। এর তমদ্দুনের মধ্যে সংকট দেখা দেওয়ার কোন কথাই ওঠেনা; সমস্ত তমুদ্দুনের শ্রেষ্ঠ ভাবধারা নিয়েই এ গড়ে উঠবে। এই গড়ে ওঠার পথে নানা তমুদ্দুন, নানা ভাবধারা এসে দেখা দিবে, হানা দেবে এবং এই সমস্তের সংঘর্ষের ও সহযোগিতার ফলেই হবে নূতন তমুদ্দুনের উদ্ভব। এই দেখে ভয় খেয়ে গেলে সমস্ত নূতনের আবির্ভাবকেই ভয়াবহ বলতে হয় এবং নূতন কিছু করবার প্রচেষ্টা ছেড়ে দিয়ে স্থানু হয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায়ও থাকেনা।'

পূর্বপাকিস্তানের তামুদ্দনিক সংকট এসেছে মনে করে যাঁরা অতিমাত্রায় বিচলিত হয়ে পড়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে ইমরোজের বক্তব্য : 'তাঁদের দুএকজনের চিন্তাধারা অত্যন্ত হাস্যোদ্দীপক'। 'অতিসাধারণ প্রচলিত বাংলা শব্দকে উর্দু বা হিন্দী করে না বললে পাকিস্তানের তমুদ্দুন নষ্ট হয়ে যাবে বলে যারা মনে করেন আমরা তাদের দলে নই। আকাশকে আকাশ না লিখে পারসী শব্দ আসমান লিখলে, পৃথিবীকে জমিন বলে লিখলে পাকিস্তানের তমদ্দুন ঠিক থাকবে বলে যারা মনে করেন বা প্রচার করেন তাঁরা যত বড় ডিগ্রী ও পদধারীই হোন বা কেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর কোন প্রশংসাই আমরা করতে পারিনা। আমাদের মনে হয় এ তাদের inferiority complex এবং দুনিয়ার cultural History র সঙ্গে অতিমাত্রায় অপরিচয়ের ফল। ... পানি শব্দটির মধ্যে মুসলমানিত্ব কিছুই নেই ... হিন্দুরা (ভারতে) পানি বলার জন্যে ... নাপাকও হয়ে যায় নাই ... পানিকে জল বললেই তাদের পানি নাপাক হয়ে যাবে, বা তাদের মুসলমানিত্ব বরবাদ হবে এবং তারা হিন্দু সংস্কৃতি প্রভাবান্বিত হয়ে পড়বে এ আমরা বিশ্বাস করিনা ; হয়ত কেউ করে না কিন্তু তবু পাঠ্যপুস্তকের জল সম্বন্ধীয় সমস্ত শব্দকে পানিতে পরিণত করতে হবে, জলীয় বাষ্পকে পানীয় বাষ্প করতে হবে এমনি নির্দেশের মধ্যে আর যাই হোক বিজ্ঞতা নেই, ইসলামিত্ব তো নেইই।[৫৩]

'সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা' শীর্ষক প্রবন্ধে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছেন সমকালীন সমাজের দিকে তাকিয়ে ঃ "সাহিত্যিক বিশ্বমানবের স্বজাতি। কাজেই তিনি অসাম্প্রদায়িক। ... মোটকথা বাংলা ভাষায় জবরদস্তি করে যেমন অপ্রচলিত অনাবশ্যক আরবী পারসী শব্দের ব্যবহার অসঙ্গত, তেমনি অপ্রচলিত অনাবশ্যক সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করাও অসঙ্গত। বে-দরকারে ইংরেজীর খিচুড়ি করাও তেমনি আমার অসহ্য। আমি এসব নিন্দা করি ; কিন্তু যা বাংলায় এসে গেছে, যা বাংলার হাড়ে মাসে ঢুকে গেছে, তা আরবী, পারসী, তুর্কি, পর্তুগীজ, ডচ, ফরাসী, ইংরেজী, আর্য্য বা অনার্য্য যাহোক, তাতে আমি আপত্তি করিনা। আমি বাংলা ভাষাকেই চাই, তাকে শুদ্ধি বা খত্না করবার পক্ষপাতী নই। সে যাই হোক সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা বলতে আমি বুঝি সাহিত্যের ভিতর দিয়ে অন্য সম্প্রদায় বা ধর্ম্ম বিশেষের বিরুদ্ধে - প্রোপাগাণ্ডা চালান, কোন জাতির ঐতিহাসিক চরিত্রকে বা কোন ধর্মাবলম্বীর সম্মানিত পুরুষদের হীন বা বিকৃত করা। দেশের সাম্প্রদায়িক বিবাদের মূলে এই সাম্প্রদায়িক সাহিত্য। দুঃখের সঙ্গে আমি বলতে বাধ্য যে বাংলার হিন্দু লেখকেরা এর সূত্রপাত করেন। তারপর মুসলমান লেখকেরা গালির বদলে গালি শুরু করেন। এর জন্য অবশ্য ব্রিটিশের ভেদনীতি ছিল অনেকটা দায়ী। আমরা পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতা বিষবর্জিত 'পাকসাফ' সাহিত্য চাই—দেশের মঙ্গলের জন্য, দশের মঙ্গলের জন্য। সাহিত্য যদি সত্য ও শিব হয়, তবে তা সুন্দর হবেই। নয়ত সে সাহিত্যই হবেনা, হবে একটা অপসাহিত্য। আমরা যদি বাংলাভাষা থেকে এই অপসাহিত্য দূর করতে পারি, তবে প্রকৃত সাহিত্যের সেবা হবে, সত্য-শিব-সুন্দরের অর্চনা হবে, পাকিস্তানের মঙ্গল হবে।[৫৪]

৩. সমকাল (১৯৫৭-৭৭)

ক 'সমাচারদর্পণ' থেকে আজকের 'সুন্দরম' কিংবা 'লোকায়ত' পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকাসমূহের মধ্যে 'সমকাল' নিসন্দেহে প্রধানতম গুটিকয়েকের একটি। তারপর মুসলিম সম্পাদিত সাময়িকপত্রের অথবা পূর্বপাকিস্তান থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকার ইতিহাসে, চার-পাঁচটি পত্রিকার নাম যদি মর্যাদা বা গুরুত্বের বিবেচনায় আগে উল্লেখ করতে হয়— তারমধ্যেও সমকালের স্থান প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় কি চতুর্থ হওয়া উচিত — এনিয়ে বিতর্ক হবে। কেউ বলবেন 'সওগাত', শিখা', 'মোহাম্মদী' এবং তারপরই সমকাল হবে, কেউ অন্যভাবে সাজাবেন। তবে বিভাগপূর্ব কালের এবং সমগ্র বাংলা সাহিত্যের বিবেচনায় স্থান নির্ণয়-প্রয়াস আপাতত স্থগিত রাখলে যেহেতু চলছে — সেহেতু সাতচল্লিশ-একাত্তর পর্বে পূর্ববাংলা থেকে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকার গণ্ডিতেই বিচার করা সঙ্গত। পূর্ববাংলার পত্রপত্রিকা সম্পর্কে এদেশের প্রধান লেখক-গবেষকদের মধ্যে যে কেউ-ই মন্তব্য করতে গিয়েছেন, তিনিই একে সর্বপ্রধান, সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাধিক গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ সাহিত্যপত্রিকা হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। গোলাম সাকলায়েন সরল বাংলা ভাষায় লিখেছেন ঃ ' সমকাল পূর্বপাকিস্তানের সেরা মাসিক পত্রিকা[৫৫] মোহাম্মদ আবদুল কাইউম লিখেছেন : 'পূর্ব পাকিস্তানের সাময়িকপত্রের ইতিহাসে এই পত্রিকাটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫৬] সওগাত ও সমকালের এককালীন সহকারী এবং সহযোগী সম্পাদক এবং বাংলাদেশ-আমলের 'সমকালের' সম্পাদক ; বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম-এর দলিলপত্রের, একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম সংকলন এবং আরও অসংখ্য ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম এবং সংগঠন ও পত্রপত্রিকার সংগঠক, সম্পাদক, কবি, সমালোচক হাসান হাফিজুর রহমান 'সওগাত থেকে সমকাল' শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখেছেন : 'সওগাতকে তৎকালীন প্রগতিশীল বাস্তবতার মানসপুত্র বলে অভিহিত করা গেলেও পাকিস্তান আন্দোলনকে সওগাত সমর্থন করে বলে অসাম্প্রদায়িক, যুক্তিনিষ্ঠ মুক্ত-বুদ্ধির চর্চাকারী হিসেবে 'শিখার' মত ... মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতিবাদির অকৃত্রিম চারিত্র সওগাত ও এর সম্পাদকের ছিল বলে 'মুসলিম সাহিত্যসমাজে'র মতোই ... প্রতিষ্ঠিত হলো অসাম্প্রদায়িক মানবিক অসাম্যবিরোধী এবং স্বাধীন ও

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তচিন্তার সংগ্রামে উৎসর্গীত সাহিত্যপ্রতিষ্ঠান 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'। 'শিখারই অন্যতম সম্পাদক কাজী মোতাহের হোসেন এর সভাপতি , ... ঢাকা থেকে নতুন করে প্রকাশিত সওগাতেরই কার্যালয়ে এবং এরই কিছুকাল পরে ১৯৫৭ সনে 'সিকান্দার আবু জাফরের নেতৃত্বে ও সম্পাদনায় 'সমকাল' প্রকাশ করতে শুরু করেন। আশ্চর্য যোগাযোগ বলতে হবে। পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ এবং সমকাল বস্তুত মুসলিম সাহিত্যসমাজ, শিখা এবং সওগাতেরই উত্তরসূরী, ঐতিহ্যধারায় পুষ্ঠ; পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে এই তরুণ দল এবং নবীন পত্রিকার যাত্রা শুরুও হলো শিখা আর সওগাতের সম্পাদকদ্বয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সমন্বয়ী হাত ধরে। যে মানবিক মূল্যবোধ সওগাতে ভিত্তি পেয়েছিল, চল্লিশ বছর পরে সমকালে তা নতুন উদ্ভাবনা খুঁজে পেল। সওগাতের নেতৃত্বের অবসান ঘটেছিল, সমকালের নেতৃত্ব শুরু হলো।'

সমকাল সম্পর্কে হাসান হাফিজুর রহমান আরও লিখেছেন : 'সমকাল সবদিক দিয়েই একটি আধুনিক পত্রিকা। সওগাত এবং শিখা যে আধুনিকতার জন্যে সংগ্রাম করেছে তারই পরিপূর্ণ ফসল একে বলা যায়। শিখা গোষ্ঠীর যে চিন্তাধারা পত্রস্থ না করতে পারার অভিযোগে সওগাতকে ধিক্কারের ভাষা শুনতে হয়েছে, সমকালকে সে সংকটের মুখোমুখি হতে হয়নি। সে স্তর জাতিগত ভাবে আমরা পেরিয়ে এসেছিলাম। সমকাল শুধু অসাম্প্রদায়িক নয়, ধর্ম নিরপেক্ষও। সমকাল বিষয়বস্তুর পরিবেশনে স্বেচ্ছাধর্মী এবং অগ্রসর জীবন চেতনা ও সংগ্রামের মুখপত্র হয়ে উঠতেও দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। এ-ক্ষেত্রে জাতিগত বিমূর্ত মূল্যবোধের অগ্রসরতার সঙ্গেই যোগস্থাপন সে করেছে। কিন্তু একটি মৌলিক প্রশ্নে সওগাতের মত তাকেও গোড়া-ঘেঁষা সংকটে ব্যতিব্যস্ত হতে হয়েছে। এবং তা হলো জাতীয়তার প্রশ্ন।পাকিস্তানের আগে বাঙালি মুসলমান স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উত্তেজিত ছিল।পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে-পরেই দেখা গেল স্বাতন্ত্রই মুক্তি নয়। দুর্বল বাঙালি ন্যাশনালিটি প্রবল পাঞ্জাবী ন্যাশনালিটির বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জায়গায় নতুনভাবে দেখা দিল আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। সমকাল এ প্রশ্নে নিজে একাধিকবার বিপদ বরণ করেও সাহসিক এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এ প্রশ্নের সমাধানে স্বাধীন বাঙালি জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব। এ-উদ্ভবে সমকালও তার কৃতিত্ব-চিহ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছে, এ শিরোপা সমকালকে দিতে হবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা সত্য যে, সমকাল-ও ছাপতে পারেনা, তা দেখা দিয়েছিল। তাই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, সকল লেখাই ছাপা যাবে, তেমন স্বাভাবিক যুগ কবে আসবে, তেমন কাগজের অবাধ প্রকাশ কবে সম্ভব হবে?' সমকালের সাহিত্যিক অবদান সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন : 'বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্যকে সংগঠিত ও দৃঢ়ভিত্তিক করার ব্যাপারেও সমকালের অবদান পুরোধার মর্যাদা দাবী করতে পারে। সমকাল এ প্রচেষ্টায় সফল না হলে উত্তরণ এবং কণ্ঠস্বর এর মতো সাহিত্যনির্ভর এবং শিল্পসজ্ঞান সাময়িকীর প্রকাশ এবং স্বাক্ষর সুনিতেক মল্লার এর মতো অজস্র স্বাধীকার প্রমত্ত লিটলম্যাগাজিনের অবাধ বিচরণ সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ।'[৫৭]

হায়াৎ মামুদ, 'সিকান্দার আবু জাফর' শীর্ষক পুস্তকের 'সমকাল পত্রিকা ও আনুষঙ্গিক' অধ্যায়ে লিখেছেন, 'তাঁর অক্ষয় কীর্তি 'সমকাল' নামে একটি মাসিক সাহিত্যপত্র সম্পাদনা ও পত্রিকাটিকে ঘিরে সমকালীন সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগৎ পরিচালনা।' সমকালের 'জন্ম ইতিহাস' বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন : 'কবি হাসান হাফিজুর রহমান পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি অনেকদিন ধরেই একটি সাহিত্যপত্র প্রকাশের কথা ভাবছিলেন, কিন্তু অর্থের অভাবে তাঁর ইচ্ছা ফলবতী হবার কোনো উপায় ছিলনা। এ-সময়ে তাঁর সঙ্গে সিকান্দার আবু জাফরের আলাপ ঘটিয়ে দেন শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী। ঠিক হয়, পত্রিকা বেরুবে, যাবতীয় আর্থিক ঝক্কি সিকান্দার আবু জাফর বহন করবেন, সম্পাদনার প্রত্যক্ষ দায়-দায়িত্ব হাসান হাফিজুর রহমানের, তবে সম্পাদক হিসেবে নাম যাবে তাঁর, হাসান থাকবেন সহযোগী সম্পাদক। হাসান তা সানন্দে মেনে নিয়েছিলেন। এভাবেই পত্রিকাটি বেরিয়েছিল।'[৫৮] কিন্তু সিকান্দার আবু জাফরের (১৯১৯-৭৫) ঘনিষ্ঠ বন্ধু সমবয়সী, প্রখ্যাত লেখক চিন্তক, আবদুল হক (১৯১৮) লিখেছেন :

'আমি যতদূর জানি, সিকানদার আবু জাফর 'সমকাল' প্রকাশের কথা ভাবছিলেন ১৯৪৭ সালের গোড়া থেকে। একথা তিনিই আমাকে বলেছিলেন ঐ সময়ে। তাঁর সঙ্গে তখনো পরিচয় হয়নি, চাক্ষুস দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত না, তবু তিনি একদিন আমাকে জানিয়েছিলেন তাঁর ঐ ইচ্ছার কথা। আমি সেই সময়ে তাঁর প্রথম (এবং শেষ) উপন্যাস 'নতুন সকাল'-এর সমালোচনা লিখেছিলাম 'সওগাত'-এ, উপন্যাসটি যে ভালো হয়নি এই ছিল আমার কথা। একদিন হঠাৎ তিনি ফোন করলেন 'সওগাত' অফিসে (আমি তখন 'সওগাত-এ কাজ করছি); কিন্তু ঐ বিরূপ সমালোচনার জন্য কোনো অভিযোগই করলেন না। খানিকক্ষণ আলাপ হলো, আমার কিছু ব্যক্তিগত তথ্য জানতে চাইলেন, তারপর তাঁর অপ্রকাশিত পত্রিকায় লেখার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলেন। সেই তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়।' আবদুল হক লিখেছেন আরো : ' আমার ধারনা, 'সমকাল' নামটি জাফর সাহেবের মনে এসেছিল ঐ সময়ে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ-সম্পাদিত একটি ইংরেজী সাহিত্যপত্রিকার নাম থেকে। পত্রিকাটির নাম ছিল 'কনটেমপোর্যারি'। ১৯৪৭ সালের অথবা হয়তো আরো আগেকার পরিকল্পনা : ১৯৫৭ সালের আগষ্টে, বাংলা ১৩৬৪ সনের ভাদ্র মাসে 'সমকাল' এর প্রথম সংখ্যার আবির্ভাব। প্রথম কয়েক বছরে সহযোগী-সম্পাদক ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান, প্রুফ দেখতে সহায়তা করতেন কবি আল মাহমুদ। পরের কয়েক বছর সহযোগী সম্পাদক ছিলেন ইসমাইল মোহাম্মদ। শেষের দিকে জাফর সাহেব একাই সব-কিছু করতেন। সমকাল-এর মান উন্নত রাখতে সহযোগীদের অবদান কম ছিলনা, তাঁদের পরিচ্ছন্ন দৃষ্টির পরিচয় ঐ পত্রিকায় লেখার আয়োজনে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু সব কিছুকে ব্যাপ্ত করে আছে যাঁর উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্ব তিনি সিকানদার আবু জাফর। সমকাল এর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল প্রতি সংখ্যার জন্য নূতন প্রচ্ছদ চাই; আরেকটি বৈশিষ্ট্য কার্ট্রিজ কাগজে ছাপতে হবে। মুদ্রণের অসুবিধা ছিল, প্রথম কয়েক বছরে অপরের প্রেসে, পরে নিজস্ব মুদ্রায়ণে পত্রিকা ছাপা হতো, তবু পত্রিকার প্রকাশনা প্রায়ই বিলম্বিত হয়েছে, নূতন প্রচ্ছদ অঙ্কন এবং কার্ট্রিজ কাগজ সংগ্রহে বিলম্বের জন্য। 'সমকাল'এর তের বছর জীবনের এই একটা কাহিনী। প্রথমদিকে কিছু সংখ্যা নিউজপ্রিন্টে ছাপা হয়েছিল, তারপর কাগজ ও প্রচ্ছদের ব্যাপারে তিনি সহজে আপোষ করতে চাইতেন না। এই ছিল পত্রিকার অনিয়মিত প্রকাশনার একটা কারণ। তবে অন্যান্য কারণও ছিল। তারমধ্যে একটি হচ্ছে এরূপ পত্রিকাকে ধারণ করতে পারে এমন একটা বিস্তীর্ণ সংস্কৃতিবান সমাজের অভাব। ... তবু 'সমকাল' এর প্রতিটি সংখ্যার জন্য আমরা পথ চেয়ে থেকেছি — পাঠক হিসাবে এবং লেখক হিসাবে। সমকাল-এ এমন অনেক কিছু লিখেছি যা ঐ পত্রিকা প্রকাশিত না হলে হয়তো কখনো লিখতাম না; আর কোনো পত্রিকাই সেসব লেখা কখনো ছাপতো না। আমার মতো আরও অনেক লেখক এই কথাই বলবেন। কোনো কোনো মানুষকে বিশ্বাস করে মন খুলে সব কথা বলা যায়; 'সমকাল' ছিল সেই রকম পত্রিকা। সেই দুর্দিনে ওখানে মন খুলে যা - কিছু বলবার তা বলা যেত। জানা ছিল এজন্য ঝড়-ঝাপটা যা-ই আসুক তিনি কারো পরোয়া করবেন না। এই অন্তরঙ্গ চিন্তাপ্রকাশের মূল্য 'সমকাল' কে দিতে

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। তেরো বছরের জীবনে 'সমকাল' এর দুটি সংখ্যা (অন্তত চারটি) বাজেয়াফত হয়। ১৯৬৬ সালের আরো একটি সংখ্যা বাজেয়াফত হতে হতেও হয়নি। এই সংখ্যাটির জন্যই জাফর সাহেবের নিরাপত্তা এবং 'সমকাল' এর অস্তিত্ব সবচেয়ে বেশী বিপন্ন হয়েছিল। বেনামীতে আমার যে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য তিনি পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে পড়েছিলেন,তা আমার 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। প্রকৃত লেখকের নাম প্রকাশ করতে তিনি অসম্মত হওয়ায় কর্তৃপক্ষ তাঁকে যে হয়রানি করেছিল তার বিবরণ ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় দেওয়া হয়েছে, এবং সম্প্রতি এ প্রসঙ্গে বিভিন্নপত্র-পত্রিকায় কয়েকজন লেখক লিখেছেন।'[৫৯]

সম্পাদকের চারিত্রের উপর পত্রিকার ভূমিকা এবং বৈশিষ্ট্যের মাত্রা নির্ধারিত হয়। উনিশ শতকে এমন কতিপয় মহান সম্পাদক আবির্ভূত হয়েছিলেন বলেই বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি দ্রুত বিকশিত হয়ে উন্নততর স্তরে পৌঁছুতে পেরেছিল। 'সংবাদ প্রভাকর', 'তত্ত্ববোধিনী', 'বঙ্গদর্শন' এবং বিশ শতকের 'সবুজপত্র', 'সওগাত', 'শিখা', 'কল্লোল', 'বুলবুল', 'চতুরঙ্গ' ,'পরিচয়' 'কবিতা' 'মোহাম্মদী ' 'সমকাল' প্রভৃতি পত্রিকার বৈশিষ্ট্য প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পাদকদের ব্যক্তিত্বের কারণেই সৃষ্টি হয়েছিল। সিকানদার আবু জাফরের মৌলিক সৃজনশীল কালজয়ী সাহিত্যপ্রতিভা এবং জাতসম্পাদকের প্রায় নজীরবিহীন বৈশিষ্ট্যই সমকালকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার তথা সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বের ভাগিদার করে রেখেছে। সিকানদার আবু জাফরের সম্পাদক চারিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আবদুল হক লিখেছেন : 'সাতষট্টির গোড়ার দিকে, আই বি র লোক যখন আমার বাসায় এবং অফিসে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলো, তখন একদিন শওকত ওসমান সাহেবকে সে-কথা জানালাম, এবং বললাম, জাফর সাহেবকে এখন অনুরোধ করা উচিত তিনি যেন আমার হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি নষ্ট করে ফেলেন। আমার ধারণা ছিল, যে-লেখাটা নিয়ে এত কানাঘুষা চলছে তার লেখকের নাম শওকত ওসমান জানেন, কিন্তু দেখলাম তিনি জানেন না, বরং আমিই যে সেই দাগী ব্যক্তি তা জেনে খানিকটা বিস্মিত হলেন। আমার বলার কথা এই যে, তাঁর মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছেও জাফর সাহেব সেই দাগী লেখকের নাম ফাঁস করেননি।'৬০ আবুল ফজল লিখেছিলেন : " আজ আমরা সবাই অসম্ভব ভীরুতার শিকার। এ ভীরুতার প্রধান শিকার সম্পাদকরাই। সিকানদার আবু জাফরের মতো তাঁরা যদি একটু সাহসী হতে পারতেন, সাহসিক ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতেন তাহলে আমাদের সাহিত্যের এ দুর্দশা কিছুতেই ঘটতো না। দেখেছি, লেখকেরা সাহসী হতে পারলেও, সম্পাদক আর পত্রিকা-মালিকরা তা সাহস করে ছাপতে পারেননা, অর্থাৎ ছাপতে সাহস করেননা। ফলে আমাদের সাহিত্য এক অচলায়তনের সম্মুখীন।

লেখা ছাপা না হলে কোন প্রতিভাবান লেখকই নতুন লেখার প্রেরণা পেতে পারেন না। ছাপা না-ছাপার কথা না-ভেবে, তোয়াক্কা না করে তিনি শুধু লিখে যাবেন, এ স্রেফ এক অস্বাভাবিক ও অসম্ভব প্রত্যাশা। সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব যেমন সৎ ও উচ্চমানের লেখা প্রকাশ করা, তেমনি নতুন লেখক সৃষ্টিও। বলাবাহুল্য, প্রকাশের পথেই নতুন লেখক জন্মে থাকেন। সিকানদার আবু জাফরের 'সমকাল' বহু নতুন লেখকের জন্ম দিয়েছে।'[৬১]

উল্লেখ্য, আবদুল হক স্বনামে অনেক লিখেছেন, আবার 'আবু রায়হান' এবং 'আবু আহসান' নামেও বাঙালিজাতীয়তাবাদী চেতনাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে লিখেছিলেন বেশকিছু সময়োপযোগী লেখা। আরও অনেক লেখার মতো এইসব লেখায় বাঙালিসমাজকে জাগিয়ে দেয়া হচ্ছিল, প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের শোষণ ও বৈষম্য- অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে এবং বাঙালির জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে উচ্চারণ করা হচ্ছিল সাবধানতামূলক শাশ্বত সেই সত্যভাষণ, যেনো জাতির বিবেক কথা বলে চলেছেন আত্মবিস্মৃত দেশবাসীর কানের কাছে গিয়ে। এসব কারণেই পত্রিকা সরকারী রোষের কবলে পড়ে। জাতির উচ্চকণ্ঠ বিবেক, চিন্তাবিদ আবুল ফজল ষাটের দশকে, সামরিক শাসনের সেই ভয়ঙ্কর দুর্দিনে লেখক-শিল্পীর স্বাধীনতা এবং বাঙালির সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক অবরোধ অবস্থার বিরুদ্ধে লিখেছিলেন কালের দাবি মিটিয়ে দুর্দান্ত সব অনল-বর্ষী স্পষ্টতই বিপ্লবাত্মক সকল প্রবন্ধ। আবুল ফজল 'সাহিত্যের সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন ঃ

> "এযুগের সাহিত্যিক শিল্পীরা কালের ও রাষ্ট্রের যুপকাষ্ঠে এক রকম বলি বললেই চলে। শহীদ তাঁরা নন, তাঁরা আজ হাড়ি কাঠের বলি। স্বাধীনতার পর দেশের যা অবস্থা হয়েছে, সেই অবস্থার যুপকাষ্ঠে সাহিত্যিক শিল্পীরাই হচ্ছেন নির্ভেজাল বলি। স্বাধীনতার পর থেকেই ভাষার ওপর চলেছে এক উৎপাত — যে ভাষা হচ্ছে সাহিত্যিকদের আত্মপ্রকাশের প্রথম ও প্রধান হাতিয়ার। যে আবেগ ও প্রেরণা মহৎ রচনার প্রাণ, যা সাহিত্য শিল্পীকে রচনায় করে তোলে উদ্বুদ্ধ, যা নিয়ে আসে এক অনির্বচনীয় তন্ময়তা তা আজ অনুপস্থিত— দেশের জন্য ও দেশের মানুষের জন্য সেই আবেগ ও প্রেরণা আজ রুদ্ধগতি। দেশ বা জাতির কোন চেহারাই আজ আমাদের মানসপটে ফুটে ওঠেনা। আবেগ ও প্রেরণার দেশগত ও জাতিগত ঐক্যবোধ আজ নিশ্চিহ্ন। ফলে আমাদের বাহিরে ও ভিতরে সর্বত্র এক নৈরাজ্য। এ অবস্থা সাহিত্য-শিল্পের অনুকূল অবস্থা মোটেও নয়— না সাহিত্য-সৃষ্টির না সাহিত্য উপভোগের। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে বিখ্যাত আইরিশ কবি W.B. Yeats — 'Popular memory' ও 'Ancient Imagination'-এর প্রয়োজনের কথা বলেছেন। ... আজ আমাদের Popular Memory ও Ancient Imagination খণ্ডিত, শিল্পীর মন-মানস বিপর্যস্ত, ছিন্নমূল ও নোঙরহীন। এ অবস্থায় উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হতে পারে কিনা জিজ্ঞাস্য। আমাদের যা কিছু উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বা রচনা সবই আমরা যখন বাঙালি ছিলাম তখনকার ... গত এগার বছরে আমাদের প্রবীণরা যেমন কিছু সৃষ্টি করতে পারেননি, তেমনি পারেননি তরুণরাও। এমনকি জয়নুল আবেদিনেরও যা কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি তাও সব স্বাধীনতার আগেই আঁকা। সাহিত্য যতখানি জীবনের সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছবি ততখানি নয়। 'ব্যক্তির' প্রাধান্য ছবিতে অনেক বেশী। তাই মনে হয় বর্তমান পরিবেশে ছবির ভবিষ্যৎ কিছুটা উজ্জ্বল হলেও সাহিত্যের মোটেও নয়। জাতির পুরনো ঐতিহ্য, প্রবহমান স্মৃতি ও কল্পনা ছবির ক্ষেত্রেও যে কতখানি প্রেরণার উৎস হতে পারে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতি শিল্পীর বহু নামকরা ছবিই তার দৃষ্টান্ত। পুরনো স্মৃতি ও কল্পনা অবলম্বন করে আবদুর রহমান চাঘতাই বহু স্মরণীয় ছবি এঁকেছেন। কিন্তু চাঘতাইর জন্য যা স্বাভাবিক জয়নুল আবেদিনের জন্য তা স্বাভাবিক না-ও হতে পারে। উভয়ের 'স্মৃতি' ও 'কল্পনার' ঐতিহ্য এক নয়, তার উপর নন উভয়ে এক 'স্কুলের' শিল্পী — দুইয়ের মন-মানস ও ধ্যান-ধারনার পটভূমিও ভিন্নতর। তাই উভয়ের ছবি সম্পূর্ণ আলাদা জাতের ও আলাদা জগতের।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা কি লিখলে, কেমন করে লিখলে শাসকদের বিষনজরে পড়বনা তাও আমাদের এক দুশ্চিন্তা। ফলে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, বিনা আবেগ ও বিনা প্রেরণায় আমরা সাহিত্যিকরাও বহু শ্লোগান আউড়িয়েছি এই এগার বছর ধরে। তা সত্বেও সাহিত্যের অগ্রগতির চেয়ে পশ্চাদগতিই হয়েছে বেশী।

বরং যাঁরা এসব বেশী করে আউড়িয়েছেন তাঁদের পদক্ষেপ সামনের চেয়ে পেছনের দিকেই হয়েছে দ্রুততর। কারণ পেশাগত তথা অর্থকরী আবেগ ও প্রেরণা ছাড়া এ সবের পেছনে আন্তরিকতার লেশমাত্রও ছিলনা; যে আন্তরিকতা হচ্ছে সাহিত্য-শিল্পের প্রাথমিক শর্ত। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা আমাদের মনের আন্তরিকতাকে শুধু যে অঙ্কুরিত হতে দেয়নি তা নয়, যা ছিল সহজাত তাকেও অনেকখানি বিনষ্ট করে ছেড়েছে। আর বলেছি আমাদের নতুন 'স্মৃতি' ও 'কল্পনা' ঐতিহ্যে পরিণত হয়ে, আবেগ ও প্রেরণায় অনুরঞ্জিত হয়ে, সাহিত্যের উপকরণ হয়ে উঠতে বেশ সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। জাতির মন-মানস স্থিরতা পেতে ও স্থির হয়ে যা আত্মস্থ করার তা আত্মস্থ করতে, যা বর্জন করার তা বর্জন করতে বেশ সময় নিয়ে থাকে। এই ভাবে 'গ্রহণ' ও 'বর্জনের' ফলে জাতীয় 'স্মৃতি' ও 'কল্পনা' স্থিতি লাভ করে। দেশ যেমন আমাদের ছোট হয় গেছে, আমাদের আবেগ, প্রেরণা ও উপকরণের ক্ষেত্রও হয়ে পড়েছে ক্ষুদ্র, এমনকি পাঠকও হয়ে পড়েছে শোচনীয় রূপে সীমিত। ভাল ছাত্র ও বড় ক্লাস যেমন অধ্যাপককে ভাল অধ্যাপক হওয়ার ও পঠনীয় বিষয় সম্বন্ধে সর্বাংগীন প্রস্তুতির তাগিদ দিয়ে থাকে, তেমনি ভাল তথ্য, সমঝদার পাঠক ও বহু পাঠক সাহিত্যিককে রচনার মান উন্নয়নের প্রেরণা জুগিয়ে থাকে। ইংরেজি সাহিত্য এর এক বড় দৃষ্টান্ত। আমাদের মনের সামনে, চোখের সামনে পাকিস্তান বলে কোন দেশ নেই, আছে পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তান। সমগ্র পাকিস্তানের পটভূমিতে, তার ঐতিহ্য ও মানুষের জীবন নিয়ে কিছু লেখা আজ কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। মন মানসে আমরা আজ হয় পূর্ব পাকিস্তানী না হয় পশ্চিম পাকিস্তানী, এ সত্যকে অস্বীকার করা রাজনৈতিক সুবিধাবাদ হতে পারে কিন্তু বাস্তববোধের পরিচায়ক নয়। আমরা হয় পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক, না হয় পশ্চিম পাকিস্তানের সাহিত্যিক। সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের সাহিত্যিক আমরা কেউ নয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাহিত্যের শুধু যে ভাষা পৃথক তা নয় — তার মন-মেজাজ, জীবন-জিজ্ঞাসা, এমনকি দৃষ্টিভংগী আর শিল্পরূপ পৃথক। পাকিস্তানের দুই অংশের ইতিহাস ভুগোল ও ঐতিহ্য সম্পূর্ণ আলাদা। দুই অংশের মধ্যে ভৌগলিক দূরত্ব এত দুস্তর যে কল্পনায়ও সাধারণ নাগরিক একটার সঙ্গে আর একটার যোগসাজস করতে অক্ষম এই দূরত্ব প্রাকৃতিক বলেই আরো দুর্লঙ্ঘ্য। ইংরেজের সঙ্গে আমেরিকাবাসীর যতখানি মিল আমাদের ততখানি মিলও নেই। ওদের বংশ এক, ধর্ম এক, ভাষা এক, আচার-বিচার, পোশাক-পরিচ্ছদ পর্যন্ত প্রায় এক। তবু ওরা এক রাষ্ট্র বা এক জাতি হতে পারেনি। আমাদের ত এক ধর্ম ছাড়া সব ব্যাপারেই গরমিল। এক মাত্র ধর্মই যদি রাষ্ট্র বা জাতির মূল ভিত্তি হয় তা হলে আফগানিস্তান আর পাকিস্তান এক রাষ্ট্র বা এক জাতি নয় কেন? ইংরেজ আর ফরাসীই বা নয় কেন? অথচ ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের মাঝখানে একটি মাত্র খালের ব্যবধান, যে খাল পূর্ব পাকিস্তানের ব্রজেন দাসও সাঁতরে পার হতে পারে।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে শুধু ইতিহাস ভুগোলের যে পার্থক্য তা নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনা এবং ধ্যান-ধারণায়ও রয়েছে আসমান-জমিন ফরখ। পশ্চিম পাকিস্তান পুরোপুরিই সামন্ততান্ত্রিক— পূর্বপাকিস্তান তার ঠিক উল্টো, একদম সাধারণ মানুষের দেশ এটা। সামন্ততান্ত্রিক অবস্থার প্রধান গলদ তা মর্মান্তিক ভাবেই ব্যক্তিগত স্বার্থকেন্দ্রিক।

এত সব বৈষম্য রয়েছে বলেই ত পাকিস্তানের রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে কিছুতেই স্থিতিশীলতা আসছে না। কেন্দ্রে রাজনৈতিক ব্যারোমিটারের ওঠা নামার সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশের রাজনৈতিক ব্যারোমিটারও বিনা কারণে ওঠানামা করে, করতে বাধ্য হয়। ফলে কোথাও স্থিতিশীলতা ও আর্থিক নিরাপত্তার চেহারা দেখা যাচ্ছেনা। সাহিত্যিক-শিল্পীদের সামনে এই ত আজ দেশের রাষ্ট্র-রূপ। এই রূপ সাহিত্য রচনার অনুকূল কিছুতেই নয়।

ব্যক্তিগত প্রতিভার বিচ্ছিন্ন ও খুচরো কিছু কিছু ফসল যে এ অবস্থায় ফলে না তা নয় কিছু ভাল গল্প-কবিতা এখানে ওখানে হয়ত লেখা হতে পারে, হচ্ছেও। কিন্তু বৃহত্তর পরিধিতে ব্যাপকতর হবে মহত্তর সাহিত্য— যে সাহিত্যে দেশ ও জাতির জীবন-জিজ্ঞাসা ও আত্মোপলব্ধি রূপায়িত হয়ে ওঠে, জাতীয় মন-মানস ও আত্মা প্রতিফলিত হয় তা কিছুতেই সম্ভব নয়। যে কোন বড় সৃষ্টির জন্য আর তার সমঝদারি তথা Appreciation এর জন্য যে অনুকূল পরিবেশ দরকার তা আজ কোথায়? গুণগ্রাহিতার কোন লক্ষণ আজ কোথাও পরিলক্ষিত হচ্ছে কি? প্রেসিডেন্টের পুরস্কার বড়, বয়স্ক ও veteran দের জন্য তোলা থাক। আমি সাধারণ, মাঝারি ও তরুণ লেখকদের কথা বলছি — এঁদের জন্য অনুকূল পরিবেশ চাই। প্রকাশক, ক্রেতা ও সাধারণ পাঠকের আনুকূল্য ছাড়া এসব লেখক লেখক হিসেবে বাঁচতে পারেন না; এঁদের লেখায় আসতে পারে না ক্রমোন্নতি। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন বিষয়ে এঁরাই একাগ্র সাধনায় সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও প্রসার বাড়িয়ে থাকেন; শেক্সপিয়র বা রবীন্দ্রনাথ আর কয়টা?— সংখ্যাতীত মাঝারি লেখকরাই পৃথিবীব্যাপী সাহিত্যকে গড়ে তুলেছেন ও দিয়েছেন বৈচিত্র্য। আমাদেরও এই মাঝারিদের সাধনা-নিষ্ঠার উপর নির্ভর করতে হবে। জীবন ও জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে যে যে-মতই পোষণ করুক অথবা রাজনৈকি ধ্যান-ধারণা যার যেমনই হোক— দল মত নির্বিশেষে সব লেখককে লেখার স্বাধীনতা দিতে হবে। এখন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার জন্য বিশেষ করে পাকিস্তানের দুই অংশে দৃষ্টিভংগীর যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে, তার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের লেখকরা কিছুতেই দ্বিধামুক্ত হতে পারছে না। এমন কি দক্ষিণপন্থী মন্ত্রীসভা কায়েম হলে বামপন্থী লেখকদের বুক দুরু দুরু করতে থাকে আবার বামপন্থী মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে দক্ষিণ-পন্থী লেখকদের মুখ কালো হয়ে যায়।

সাহিত্যের মূল্য ও ভূমিকা বুঝতে হলে সাহিত্যকে সাহিত্য হিসেবে দেখার একটা নির্লিপ্ত দৃষ্টিভংগী অত্যাবশ্যক। রাজনৈতিক দল ও সুবিধাসন্ধানীরা এই দৃষ্টিভংগী আয়ত্ত করতে পারছে না বলে আজ সাহিত্যিক, সাহিত্য প্রতিষ্ঠান ও সাহিত্য সম্পর্কিত অনুষ্ঠানাদি এক অবাঞ্ছিত শিকারের লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়েছে। ফলে জাত লেখক ও সাহিত্যসেবীরা আজ অনেকটা দিশেহারা। সব দেশের মত আমাদের দেশের ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও জাতীয়তার সুষ্ঠু রূপ গ্রহণের উপর নির্ভরশীল। এ যদ্দিন না হচ্ছে তদ্দিন সাহিত্য ও সাহিত্যিকের দুর্গতির অবসান ঘটবে না। বর্তমানে যাঁরা প্রগতিশীল বলে পরিচিত ও যাঁরা লেখায় কিছুটা তেল-নুন-লাকড়ীর কথা বলেন, তাঁদের পক্ষে কোন সাহিত্যানুষ্ঠানে যোগ দেওয়া পর্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পড়েছে। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, কাগমারী — যে কয়টা বড় আকারের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে, যদিও এর কোনটাই নিছক বামপন্থীদের অনুষ্ঠান ছিল না, তবুও এর প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে পাকিস্তান বিরোধিতার ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ তোলা হয়েছে। প্রতিটি অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার কোন কোন দৈনিক প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে। তারপর দিনের পর দিন চলতে থাকে নিন্দার খেউড়। এ হচ্ছে এই অভিযোগের প্যাটার্ণ।' এঁদের চোখা নিন্দা হচ্ছে 'ওরা কমিউনিষ্ট ভারতের দালাল অথবা যুক্তবঙ্গের সমর্থক।' কোন যুক্তি নেই, কোন প্রমাণ নেই — একটা Rational উক্তি পর্যন্ত নেই। শুধু কটূক্তি ! এঁদের মনে এ প্রশ্ন উদয় হয় না যে — আমাদের অত বড় গোয়েন্দা বিভাগ কি করতে আছে? এ সব ত তাঁদের কাজ। অতগুলি ভারতের দালাল আর কমিউনিষ্ট এখানে অত বড় বড় সভা করে বেড়াচ্ছেন আর তাঁরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছেন, এটা তাঁদের পক্ষে কিছুমাত্র প্রশংসার কথা নয়! আশ্চর্যের বিষয় — যুক্তবঙ্গের ধুয়া আজ পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ-পন্থীদের হাতে একটা মোটা লাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা সুযোগ সুবিধামত তাঁরা বামপন্থী লেখক ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের মাথায় ভাঙতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন না। স্বয়ং শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও এই লাঠির ঘা থেকে বাঁচতে পারেননি। অথচ বামপন্থী রাজনৈতিক মতবাদের তাঁর চেয়ে বড় দুশমন বোধ করি আর দ্বিতীয়টি নেই।মুস্কিল হচ্ছে সুবিধাবাদী রাজনীতি ন্যায় সত্য ধর্ম কিছুরই তোয়াক্কা করে না। ফলে 'ইসলাম' ও 'পাকিস্তান ' শব্দ দুটিও আজ এঁদের সুবিধা হাসিলের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। .... এরা নিজস্ব লজিক দিয়েই ম্যাজিক দেখান— কেউ মেষশাবক কে? কেউ আমাদের মত বাঙালকে। 'ইসলাম' ও 'পাকিস্তান' আজ এইভাবে এঁদের মুখে ম্যাজিক-বুলিতে পরিণত হয়েছে।তাই এ-দুটি শব্দকে নিজেদের ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার দিকে চোখ রেখে ইচ্ছামতো বাঁকানো হচ্ছে, মোচড়ানো হচ্ছে, ব্যবহার করা হচ্ছে।"

পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্যের সংকট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, দেশের রাষ্ট্ররূপ স্থিতিশীল ও সুস্থভাবে গড়ে উঠছেনা বলে সাহিত্যিকরাও আজ সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ থেকে বঞ্চিত। নিকট ভবিষ্যতেও অনুকূল পরিবেশের কোন রকম আভাস দেখতে পাওয়া যাচ্ছেনা বলে সর্বাংগীন হতাশার মধ্যে জীবন্মৃত অবস্থায় কোন রকমে তাঁরা বেঁচে আছেন। 'সাহিত্যকে পেশা হিসেবে নেওয়ার আশা আজ পাকিস্তানে রীতিমত দুরাশাই।' ফলে প্রবীণেরা হয়ে পড়েছেন হতাশাগ্রস্ত 'দিশেহারা'। সকলেরই প্রশ্ন কেন লিখবো, কার জন্য লিখবো, কে ছাপবে, কে পড়বে? বাঙালির সামনে কোনো রাষ্ট্রাদর্শ নেই বলেই সাহিত্যাদর্শ কিংবা সাহিত্যসৃষ্টির পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। লক্ষ্যণীয়, 'পাকিস্তান আন্দোলন ও তার সাফল্য প্রতিভাবান শিল্পী-সাহিত্যিকদের মন-মানসে কোন নতুন জোয়ার আনতে পারেনি, অন্তরের অন্তস্থলকে গভীরভাবে নাড়া দেয়নি কারো, খুলে যায়নি তাদের চোখের সামনে সাহিত্য-শিল্পের কোন নুতন দিগন্ত-রেখা। স্বাধীনতার অরুণোদয়ে কারো মন-মানস হয়নি মুখর — নূতন আবেগে কারো উদাত্ত কণ্ঠ হয়ে ওঠেনি উচ্ছ্বসিত। কবি চিত্তের উল্লাস কতখানি উচ্ছ্বসিত ও কলমুখর হতে পারে তার নিদর্শন নজরুলের 'প্রলয়োল্লাস'। ... আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ ও সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা ও পরিবেশের ... যে কোন Great moment হারিয়ে যাওয়ারই কথা। জীবিকার প্রাথমিক স্বাধীনতাটুকুও যদি না থাকে শিল্পী আত্মস্থ হবেন কি করে, কি করে হবেন বেপরওয়া? ... বেপরওয়া মনোভাবের উত্তরাধিকারী ছাড়া বড় সাহিত্য, মহৎ সাহিত্য রচিত হতে পারে কিনা এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বলাবাহুল্য অনুকূল পরিবেশই তেমন মনোভাবের জন্ম দিতে পারে।'[৬২] সাংস্কৃতিক সংকটের এবং 'সংস্কৃতি' নিয়ে বিতর্কের কালে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ-চিত্তেই তিনি লিখেছিলেন অখণ্ড পাকিস্তানী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে —

"আমাদের' কথাটি বিষয়টিকে করে তুলেছে আরো জটিলতর। আমাদের সংজ্ঞা কি? আমরা কারা? কাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারী? আমাদের অনেক পরিচয় — আমরা পাকিস্তানী, আমরা পূর্ব পাকিস্তানী, আমরা মুসলমান, সবার উপরে আমরা আধুনিক মানুষ অর্থাৎ সামগ্রিক অর্থে আমরা আধুনিক বিশ্বের বাসিন্দা। এই 'আমরা'র সঙ্গে 'অন্য আমরা'র মিল যতখানি বিরোধ তার চেয়ে অনেক বেশী। সংস্কৃতির যদি কোন বহিরঙ্গ থাকে, যদি থাকে বাইরের চেহারা , তাহলে তাতে এ বিরোধ অধিকতর প্রকট। বরং শেষোক্ত আমরার মধ্যে অর্থাৎ আমরা যেখানে আধুনিক মানুষ সেখানে আমাদের পরস্পরের মিল অনেক বেশী — বাইরের যেমন ভিতরেও এ মিল অনেক বেশী লক্ষ্যগোচর. ... সেকালে বাপের সংস্কৃতি আর একেলে পুত্রের সংস্কৃতি কিংবা সেকেলে শাশুড়ী আর একেলে পুত্রবধূর সংস্কৃতিও সম্পূর্ণ আলাদা —বহিরঙ্গে যেমন অন্তরঙ্গেও তেমনি আলাদা। বলা বাহুল্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শব্দেরও অর্থ বদলায়, শব্দও বহমান নদীর মত। জীবন আর সামাজিক ধারনার রদবদলেরও সঙ্গে-সঙ্গে শব্দের তথা তার অর্থের বদলও অনিবার্য। জীবনের প্রয়োজন আর চাহিদা যেমন আজ অসম্ভব বেড়ে গেছে তেমনি মনের দিগন্তও বেড়েছে অবিশ্বাস্যরূপে। উত্তরাধিকার কথাটারও সীমা আজ তাই আর আগের মত সীমিত হয়ে নেই, নেই আগের মত গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা ভূগোলে আবদ্ধ হয়ে। কোন উত্তরাধিকারকেই আর আজ ওভাবে বেঁধে রাখা যাবে না। বেঁধে রাখতে গেলে কূপমণ্ডুকতাই হবে পরিণতি। আধুনিক যুগে, আধুনিক বিশ্বে, কূপমণ্ডুকের স্থান নেই। কূপমণ্ডুকতা মানে নিজের হাতে নিজের কবর খোঁড়া। আজকের দিনে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমার বা আমাদের কথাটার বিশেষ মূল্য আছে বলে মনে হয়না কারণ, আগের দিনের মত আজ আর কিছুই স্থিতিশীল নয়, বিশেষ করে সদ্য স্বাধীনতা- প্রাপ্ত, নতুন করে জেগে ওঠা নির্মীয়মান দেশগুলিতে। এসব দেশের শাসক আর সচেতন শ্রেণী তাকিয়ে আছে অগ্রসর ও উন্নত দেশগুলির দিকে এবং তারই অনুকরণ করছে নানাভাবে. ... মনে হয় সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার কথাটা আজ অনেকখানি অর্থহীন হয়ে পড়েছে। 'আমাদের' কথাটার যেমন ব্যাখ্যা প্রয়োজন তেমনি 'সংস্কৃতি' কথাটারও নতুন ব্যাখা আবশ্যক।"[৬৩]

আবুল ফজলের এই 'বেপরওয়া' রচনার ন্যায় বহু রচনাই 'সমকাল' প্রকাশ করেছিল। 'শিল্পীর প্রতি সমাজের কর্তব্য', 'লেখকের স্বাধীনতা ও সামাজিক দায়িত্ব', 'আমাদের সাহিত্যের ঐতিহ্য'; 'ধর্ম ও রাষ্ট্র'; 'মুসলিম স্বাতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ'; 'মানবতন্ত্র', 'আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার' প্রভৃতি প্রসঙ্গে বহু জিজ্ঞাসা, তাড়না ও জাগরণমূলক নানা লেখায় তিনি পাকিস্তানের অস্তিত্বের মূলে অনবরত আঘাত হেনে চলেছিলেন। আবদুল হকও স্বনামে এবং 'আবু রায়হান', 'আবু আহসান' ছদ্মনামে লিখেছিলেন সমগ্র সমকালের চিন্তামূলক রচনার এক বৃহদাংশ। বিস্তারিত তালিকায় দেখা যায় সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজ দেশ ও রাষ্ট্র বিষয়ে তিনিও যেসমস্ত প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং সমকালে ছাপা হয়েছিল, তাতে পূর্বের সঙ্গে তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল এবং জাতীয়তার প্রশ্নে ঘুমন্ত বাঙালিকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করে তোলা হচ্ছিলো।আবদুল হক— 'রাজনীতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি'; 'সাহিত্যক মূল্যবোধ', 'ভাষা স্বদেশ সত্তা', 'নেতৃত্ব ও গণচেতনা', 'বাঙালি মুসলমান ঃ

Dhaka University Institutional Repository

-ভূমিকা ও নিয়তি'; 'পূর্বপাকিস্তান : বাংলাদেশ'; 'শিক্ষায়োজন : বৈষম্য ও সংস্কৃতি'; 'যুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িকতা' প্রভৃতি বিষয়ে লিখেছিলেন যা, তাও পাকিস্তান সরকারকে ভাঙনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। বাধ্য হয়েই কয়েকটি সংখ্যা (অন্তত ৪টি) তাই পাকিস্তান সরকার বাজেয়াপ্ত করতে বাধ্য হয়েছিল। আবদুল হক 'রাজনীতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি' শীর্ষক আলোচনায় বলেন : 'রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব শিল্পী-সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক কর্মীদের হাতে ন্যস্ত হওয়া উচিত। মনে পড়ছে, প্লেটো রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন দার্শনিকের হাতে। আমার বক্তব্য অবশ্য অতখানি অবাস্তব নয়। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে, জাতি ও রাষ্ট্র পরিচালনের গুরুভার যাঁদের স্কন্ধে ন্যস্ত শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা তাঁদের জন্য একান্ত বাঞ্চনীয়। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অবদান দিয়ে বহু শতাব্দীতে বহু দেশে অনেকেই জাতির ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, তেমন যদি হয় তবে ভালই, যদি অতটা না হয় তবু এ চর্চার সুফল এই যে, এতে দেশ জাতি ও সমাজ শ্রীমণ্ডিত হয়। এ চর্চা রাজনীতির অনেক ভীষণতাকেও কোমলতায় মণ্ডিত করতে পারে বলে মনে হয়। .... যে ব্যক্তি গান ভালবাসেনা সে মানুষ খুন করতেও পারে। আমাদের প্রাক্তন নেতৃসমাজ শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন এবং এই কারণে সুকুমার মনোভঙ্গী এবং দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ছিল তাঁদের মধ্যে বড় বেশী। তাঁরা ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, অথবা অন্যান্য মহৎনীতির কথা বলতেন এবং একটু বেশী করেই বলতেন, কিন্তু আসলে তাঁরা ছিলেন — ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল — অবিশ্বাস্য রকমে বস্তুতান্ত্রিক। শুধু আধ্যাত্মিকতার বিপরীত অর্থেই বস্তুতান্ত্রিক কথাটা ব্যবহার করছিনা। সূক্ষ্ম চেতনা, চিন্তা ও মূল্যবোধ তাঁদের জগতে ছিল একান্তই বিরল। রাজনৈতিক কূটচালের উল্লেখ আমি করব না, সকলেই জানেন এই কূটচালের মধ্যেও সূক্ষ্মতা থাকতনা। রাজনীতির বাইরেও সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা নৈতিক সবক্ষেত্রেই তাঁদের চিন্তা ছিল স্থূল এবং বক্তব্য ছিল আরও স্থূল। অতএব স্বভাবতই তাঁরা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারে-কাছে ঘেঁষতেন না এবং দেশের মনন জগতের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিতে তাঁদের অবদানও অতি নগণ্য।জাতি এক্ষেত্রে তাদের কাছে কোন প্রেরণাও পায়নি, পেয়েছে বরং মূল্যবোধের বিপর্যয়।' এই পরিস্থিতিতে সমাজের দিকে তাকিয়ে লেখকের মন্তব্য ঃ "ভুল করে হোক আর ঠিক করেই হোক সাধারণ মানুষ--জনসমাজের শিক্ষিত অংশেরই সাধারণ মানুষ — দেশের নেতৃবৃন্দের জীবনধারা অনুসরণ করে থাকে। তাঁদের অনুগ্রহেরও প্রত্যাশী তাঁরা। অতএব যে দেশের নেতৃসমাজ নিছক স্বার্থের প্রেরণায় বহু রূপের উপাসক (বিপ্লবপূর্বককালের রাজনীতিকদের অনেক দোষের মধ্যে এই একটি দোষ বড় ছিল যে, তাঁরা এমন ভাল কথা নেই যা বলতেন না, এবং এমন ভাল কথা বলতেন না যা হাওয়ার গতি বুঝে অম্লানবদনে পাল্টে না দিতেন) অধিকন্তু শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংগে সম্পর্কহীন,— সে দেশের সমাজের মানসিক অধোগতির সীমা থাকেনা এবং মানসিক অধোগতি যখন হয় তখন অন্য অধোগতিই বা ঠেকায় কে? অবশ্য প্যারাডক্সও আছে — 'নেতৃসমাজের প্রভাব জাতির ওপর পড়ে ঠিকই কিন্তু জাতি সেই রকম নেতাই পেয়ে থাকে যার সে উপযুক্ত। .... মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সমাজ যতদিন নিজের অপচয় ও অবক্ষয় বোধ করতে না পারবে এবং নিজেকে সৃষ্টিমুখর করতে না পারবে ততদিন উত্তম নেতৃসমাজ সে সৃষ্টি করতে পারবে না ; অপকৃষ্ট নেতৃত্বই হবে তার নিয়তি। মূল্যবোধের বাহন শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে মনে প্রাণে নিতে না-পারলে এবং মননধারা ও মূল্যবোধের উত্তম ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে না পারলে কোনো সমাজেরই ভবিষ্যৎ নেই।"[৬৪]

আবু রায়হান ছদ্মনামে আবদুল হক সমকালের অগ্রহায়ণ ১৩৭১ সংখ্যায় (হয়তো ২/৩ মাস পরে ফালগুনেই প্রকাশিত হবে, নচেৎ ১৯৬৫র জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের সমালোচনা ছাপা হয় কি করে?) পয়ষট্টির ২ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলে মিস জিন্নাহর পরাজয়ের প্রেক্ষিতে পূর্বপাকিস্তানের স্বার্থ সমুন্নত রাখার ব্যাপারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্পষ্টতই উচ্চারণ করেন ঃ সম্মিলিত বিরোধীদল 'পরিতাপের বিষয়, পূর্বপাকিস্তানের নিজস্ব সুবিদিত অভিযোগগুলির প্রশ্নে তার প্রতি অবিচারগুলির প্রশ্নে এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের প্রশ্নে নির্বাচনী অভিযোগকালে সম্মিলিত বিরোধীদলের নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণই নীরব ছিলেন। এই দলের নিখিল পাকিস্তান ঐক্যের খাতিরে এবং প্রতিপক্ষের ভয়ে এসব প্রশ্নের ওপর বেশী জোর দেওয়া সঙ্গত ছিলনা — এই বলবেন অনেকে। কিন্তু এখানে এবং এখন, স্পষ্ট চিন্তার প্রয়োজন আছে। পাকিস্তান ঐতিহাসিক কারণ পরম্পরায় এক রাষ্ট্র হলেও, চোখ বুঁজে বাস্তবকে অস্বীকার না-করলে একথা মানতেই হবে যে, রাষ্ট্রের দুই অংশ আসলে সহস্রাধিক মাইল দ্বারা বিভক্ত দুটি স্বতন্ত্র দেশ এবং এই দু দেশের অধিবাসীরাও স্বতন্ত্র মানবগোষ্ঠী। এদের প্রাকৃতিক পরিবেশ স্বতন্ত্র, সমস্যা স্বতন্ত্র, প্রগতির ধারা স্বতন্ত্র, এদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অন্যবিধ সুযোগ-সুবিধারও বিপুল বৈষম্য বর্তমান। এই সব কারণে তাদের স্বার্থ একরকম হতে পারে না। এই মৌলিক কথাটা উপলব্ধি না করলে পূর্বপাকিস্তানীদের দুঃখ কোনো কালে ঘুচবে না।

সার্বজনীন ভোটাধিকারের অর্থ পূর্বপাকিস্তানে ভোটের সংখ্যা বেশী হওয়া এবং প্রত্যক্ষ ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অর্থ আজ হোক কাল হোক, কোনো পূর্বপাকিস্তানী প্রার্থীর নির্বাচিত হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত পশ্চিমপাকিস্তানের প্রাধান্য বর্তমান অপেক্ষা অনেক খর্ব হয়ে যাওয়া, অতএব ওখানে কিছু গণতন্ত্রমনা লোক থাকলেও অধিকাংশ লোক সার্বজনীন ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন চাইতে পারেনা। এই বাস্তব পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে নিখিল পাকিস্তান ভিত্তিতে নির্বাচনী ঐক্য গড়তে গিয়ে পূর্বপাকিস্তানের মৌলস্বার্থকে চাপা দেওয়া হয়েছে এবং তার ফল এখন এই প্রদেশের জনসাধারণকেই ভুগতে হবে।

বস্তুত এযাবৎ লব্ধ আমাদের রাজনৈতিক ও অন্যবিধ অভিজ্ঞতা একথাই বলে যে, একান্তভাবে পূর্বপাকিস্তানের অভিযোগগুলো এবং তার প্রতিকারস্বরূপ স্বায়ত্বশাসনের দাবীকে সর্বাগ্রগণ্য করে এবং তার সঙ্গে সাম্প্রতিক নির্বাচনের অন্যান্য লক্ষ্য সংযুক্ত করে এ প্রদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্য গঠন করা উচিত ছিল। পশ্চিমপাকিস্তানের মানুষ কতোটা তা মানতো না মানতো তা বড় প্রশ্ন ছিল না (প্রাদেশিক দাবী দূরে থাক, সার্বজনীন দাবীগুলির প্রতিও তারা সাম্প্রতিক নির্বাচনে ব্যাপক সমর্থন জানায়নি)। পূর্বপাকিস্তানের নিজস্ব কর্মসূচী নিয়ে এ প্রদেশের দলগুলির নির্বাচনে নামা উচিত ছিল। এতে অবিলম্বে সাফল্য আসুক বা না আসুক, পূর্বপাকিস্তানের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠারও পথ সুগম হতো। এর একটা অনুষঙ্গ হতো পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক তৎপরতার স্নায়ুকেন্দ্র এ প্রদেশেই স্থাপন করা এবং পশ্চিমপাকিস্তানে তার তৎপরতা প্রসারিত করা মাত্র। সম্মিলিত বিরোধীদল বস্তুত পূর্বপাকিস্তানেই গঠিত হয়েছিল। কিন্তু পরে তার নেতৃত্ব করাচীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল পশ্চিমপাকিস্তানের ভোটের আশায়

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্যই এর আরেকটি অপরিহার্য অনুসঙ্গ হতো প্রেসিডেন্ট পদের জন্য একজন যোগ্য পূর্বপাকিস্তানী প্রার্থী দাঁড় করানো পূর্বপাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ একটি অবাস্তব কাজ করেছেন এই যে, তাঁরা সম্মিলিত হয়ে একজন যোগ্য পূর্বপাকিস্তানীকে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করাননি: এ-প্রদেশে যোগ্য লোক কেউ ছিলেন না একথা শুধু বহুধাবিভক্ত রাজনৈতিক দলগুলির ঈর্ষাপরায়ণ এবং হীনমন্যতায় আচ্ছন্ন নেতৃবৃন্দই বলতে পারেন। সাম্প্রতিক নির্বাচনের তাৎপর্য পর্যালোচনার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটা বিবেচনা করা এবং আত্মজিজ্ঞাসায় নিয়োজিত হওয়া এখন তাঁদের প্রধান কর্তব্য। এবডোকৃত নেতাদের বাইরেও প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্য লোক এ প্রদেশে একাধিক ছিলেন। দলীয় সংস্কার ও দলীয় স্বার্থবোধ থেকে মুক্ত অনেক রাজনীতি-সচেতন ব্যক্তিই তাঁদের নাম বলতে পারবেন। .... অতএব, সাম্প্রতিক এবং অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুত হওয়া দায়িত্ব-সচেতন ব্যক্তিদের কর্তব্য। কালপ্রবাহ স্তম্ভিত হয়ে নেই ! শত ব্যর্থতা সত্ত্বেও সময় অবারণগতিতে ঠিকই এগিয়ে চলছে। একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, উভয় পাকিস্তানে গৃহিতব্য এরূপ ব্যক্তিত্বের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। কায়েদে আজম ও লিয়াকত আলী, খাজা নাজিমুদ্দীন ও সোহরাওয়ার্দী, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, চুন্দ্রিগড় ও ফিরোজ খান নুন, এঁদের কেউ দেশপ্রেম, সততা, ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতাবলে, কেউ প্রথমোক্তদের সাহচর্যের স্মৃতিবশত কেউ কূটকৌশল ও ক্ষমতা বলে এবং কেউবা নিছক রাজনৈতিক ঘটনাচক্রে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে দুএকজন ছাড়া এঁদের কেউ পূর্ব পাকিস্তানী নন, এবং যাঁরা পূর্ব পাকিস্তানী তাঁরাও বাঙালি নন। এঁদের অন্তত অর্ধেক বাঙালি হওয়া উচিত ছিল ঃ কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। এমনকি এযাবৎ পূর্ব পাকিস্তানে নিযুক্ত গভর্ণরদের এক তৃতীয়াংশও বাঙালি নন। এটা এ রাষ্ট্রের শতকরা ৫৫ জনের পক্ষে আদৌ গৌরবের কথা নয়। এর পেছনে নানা রকম কূট কৌশলের ব্যাপার আছে, কিন্তু এটা বাঙালির অতি-সাফল্যের অন্তর্দ্বন্দ্বের এবং রাষ্ট্রীয় অভিভাবকের জন্যে সর্বদা পশ্চিমের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকারও প্রমাণ। কিন্তু এমন আর কতদিন চলবে? ....ভবিষ্যতের কথা মনে রেখে পূর্বপাকিস্তানে যোগ্য নেতৃত্বের অনুশীলন ও বিকাশের সাধনা ব্যতীত গত্যন্তর নেই।"৬৫

১৩ বর্ষ ১ ভাদ্র ১৩৭৬ সংখ্যায় উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ঘটে যাবার পরে সঠিক দিগন্তের পথে জাতির সংগ্রামের সময় 'নেতৃত্ব ও গণচেতনা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করেছিলেন জনগণের ভূমিকা কি হওয়া উচিত। তিনি বলেছিলেন জনগণ যেমন নেতৃত্ব কামনা করে বা জনগণ যেমন নেতৃত্ব সৃষ্টিতে সক্ষম, তেমন নেতৃত্বই সাধারণত লাভ করে থাকে। তবু কখনও কখনও অসাধারণ ব্যক্তির জন্মলাভ হলে তাঁর দ্বারাও জনগণ সঠিকতা অর্জনের লক্ষে সংগঠিত হয়ে থাকে। তবে 'জাতির কল্যাণকামী অসাধারণ ব্যক্তির আবির্ভাব জাতির জন্য সৌভাগ্য; ঠিক প্রয়োজনের সময় আবির্ভাব আরও সৌভাগ্য। কিন্তু এইরূপ সৌভাগ্য সচরাচর ঘটেনা বলেই জাতিকে শেষ পর্যন্ত তার অন্তর্নিহিত শক্তির উপরেই নির্ভর করতে হয়; এবং এছাড়া গত্যন্তর থাকেনা: কোনো জাতি যদি জনসংখ্যায় যথেষ্ট হয়, যদি তার বিশেষ সত্তা এবং সত্তা-চেতনা, বিশেষ ঐতিহ্য ও ঐতিহ্য-চেতনা এবং অস্তিত্ব রক্ষার সংকল্প থাকে, তার জীবনদর্শন ও সামাজিক প্রথা আত্মঘাতী না হয়, যুগপৎ পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান এবং তার নিজের প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তনের ক্ষমতা যদি তার থাকে তবে সে বেঁচে থাকতে পারে। তার একটি বিশেষ ভূগোলও থাকা অত্যাবশক, তবে বিশেষ ভুভাগ না থাকলেও উল্লিখিত চরিত্র লক্ষণগুলি থাকলে সে বেঁচে থাকতে পারে এবং কোনো কোনো সময় পুনপ্রতিষ্ঠিতও হতে পারে, যেমন ইহুদীরা হতে পেরেছে। এসব শর্তপূরণ না হলে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে হয় অথবা কোনো প্রাগৈতিহাসিক জাতির ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন রূপে বেঁচে থাকতে হয়। স্বাধীন জাতি অপেক্ষা পরাধীন জাতির বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী, বিশেষত যদি সে জাতির নিজস্ব একটা উন্নত ভাষা, সংস্কৃতি এবং নিয়তি-চেতনা না থাকে। শাসক-জাতির একটা স্বভাব হচ্ছে তার অধীন জাতির আত্মচেতনায় এবং সংস্কৃতিতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা এবং তাকে নিজস্ব সংস্কৃতির আজ্ঞাবহ দাস করার প্রয়াস পাওয়া: অন্যদিকে জাতি যখন রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীন তখনও ক্ষমতারুঢ় বিশেষ শাসক-সম্প্রদায় বা ব্যক্তি নানারূপ কূটকৌশলে জাতিকে আজ্ঞাবাহী গদর্ভরূপে ব্যবহার করার প্রয়াস পায়। নির্জিত মানব গোষ্ঠী তখনও সংহত বোধ করতে পারে অবিচল নিয়তি-চেতনায়, প্রার্থিত স্থির লক্ষ্যে আর ঐ গিরিশীর্ষে উপনীত হওয়ার নিরন্তর স্তবে। একেক রকম পরিস্থিতিতে জাতীয় লক্ষ্য একেক রকম হতে পারে; স্বাধীনতা, অথবা নিছক আত্মরক্ষা, অথবা জাতি যখন স্বাধীন তখন শাসক সম্প্রদায় বা ক্ষমতারুঢ় ব্যক্তির সৃষ্টিঅবরুদ্ধ পরিবেশ থেকে মুক্তি, সৃষ্টিধর্মী অবাধ মানবীয় সম্ভাবনায় উত্তরণ, বিশিষ্ট মানবগোষ্ঠীরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা, জাতির বৈপ্লবিক রূপান্তর । এরূপ ক্ষেত্রে অসাধারণ ব্যক্তির নেতৃত্ব লাভ প্রার্থিত লক্ষ্যের সম্পূরণ নিশ্চিত ও দ্রুত করতে পারে, কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক মানুষ সচেতন নিষ্ঠাবান এবং কর্মিষ্ঠ হলে সেরূপ নেতৃত্বের অভাব সত্ত্বেও জাতি তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দ্বার উম্মুক্ত রাখতে পারে এবং প্রার্থিত লক্ষ্যের অন্তত আংশিক সম্পূরণ আশা করতে পারে।'৬৬

খ উপর্যুক্ত আলোচনা থেকেই উপলব্ধি করা যায় যে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক আমলের অবরুদ্ধ সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সাহিত্যিক অবস্থা থেকে মুক্তি বা উত্তরণের সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকেই সিকানদার আবু জাফর স্বদেশপ্রেমিক, কালজয়ী-সাহিত্যিক-প্রতিভা নিয়ে সমকালের ন্যায় একটি সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের তাগিদ বোধ করেছিলেন। এই তাগিদ তাঁর রাজনৈতিক সচেতনসত্ত্বার সঙ্গে তৎপ্রোতভাবে সংমিশ্রিত ছিল বলেই সমকাল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি মস্তবড় হাতিয়ার রূপে বাঙালির জীবনে প্রাণরস সঞ্জীব রাখতে সচেষ্ট ও সফল হয়েছিল। বলা আবশ্যক তাতে সাহিতপত্রিকা হিসেবে তৎকালের অপরাপর পত্রিকার তুলনায় সমকালের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে। পত্রিকা প্রকাশের লক্ষ্য ও আদর্শ বিবৃতির কালেও সম্পাদকের সেই সচেতনতা খুবই লক্ষ্যযোগ্য: তিনি প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার সম্পাকীয় কলামে লিখেছেন ঃ

"ঢাকা থেকে নতুন সাময়িকপত্রিকা হরদম বার হচ্ছে। কাজেই আমাদের চেষ্টায় 'সমকাল' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা এমন কিছু বিষ্ময়কর সংবাদ নয়। অন্যান্য কাগজের মত 'সমকাল'ও কয়েক মাস পরে বন্ধ হয়ে যাবেনা এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েও কোনো লাভ নেই। কারণ তা কেউ বিশ্বাস করবেনা। আসলে বিশ্বাস করে বারবার কেউ ঠকতে চায়না। আর ইতিমধ্যেই বন্ধু-বান্ধব শুভানুধ্যায়ী প্রায় সকলেই একবাক্যে রায় দিয়েছেন যে, 'সমকাল' চলতেই পারেনা। পাঠক নেই, বিজ্ঞাপন পাওয়া যাবেনা। অতএব টেনেটুনে বড় জোর তিনমাস। তারপর বিলুপ্ত পত্রিকার তালিকায় আর একটি সংখ্যা যোগ হবে।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব পাকিস্তানে একটি সুরুচিপূর্ণ সাহিত্যপত্রিকার একান্ত অভাব। শুধু পাঠকদের পড়া এবং চিন্তার খোরাক জোগাবার জন্যেই নয়, কবি সাহিত্যিকদের দিয়ে লেখাবার তাগিদের জন্যেও একাধিক সাহিত্যপত্রিকার প্রয়োজন। আংশিক ভাবে হলেও সেই প্রয়োজন মেটাবার দুঃসাহস নিয়ে নয়, সেই প্রয়োজনের কথা স্মরণে রেখেই আমরা 'সমকাল' প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। সমকাল যাতে করে ব্যাপক সংখ্যক পাঠকের সাংস্কৃতিক মানসের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে সেদিকটায় আমরা বিশেষ লক্ষ্য রাখতে পারব বলেই আশা করি। আমাদের কোনো 'দল' নেই; কাজেই আমাদের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ দল-নিরপেক্ষ হবে। তবে মত-নিরপেক্ষ হবে কিনা সে-কথা বলা কঠিন; কারণ 'ঘন ঘন মতান্তরের রাজত্বে' বসে মতামত সম্বন্ধে দৃঢ় মত পোষণ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু আমাদের এই উদ্যোগে আমরা দলমত নির্বিশেষে সকলের সর্বপ্রকার সহযোগিতা কামনা করব।

'মতান্তরের রাজত্ব' সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করেছি তার সত্যতা কোনো প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা। আমাদের আশে-পাশে নিত্যই ঘন ঘন মতান্তর ঘটছে; দলীয় মত অনুসরণ করতে না-পেরে দল গ্রুপে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। (রাজনৈতিক দলের কথাই বলছি বিশেষ ভাবে। কারণ রাজনীতির সঙ্গে সমাজজীবনের প্রত্যেকটি স্তরের সম্পর্ক নিতান্ত ঘনিষ্ঠ হওয়ায় রাজনীতিই সবক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে।) গ্রুপ আবার তস্য গ্রুপ হয়ে অপর দলের অন্য গ্রুপের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নতুন দলের সৃষ্টি করছে। বলাবাহুল্য মতের চেহারাও পাল্টাচ্ছে সেইসঙ্গে। দেশবাসী সাধারণ মানুষের মতামতও মতান্তরের ঘূর্ণিতে পড়ে বেদম মার খাচ্ছে। এর ভেতরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিহাস হলো এই যে, মতান্তর যতই হোক 'দোহাই' কিন্তু একই ঃ রাষ্ট্রের অখণ্ডতা, দেশবাসীর বৃহত্তর স্বার্থ, দেশের সমৃদ্ধি এবং অগ্রগতি। কিন্তু কার দেশ? কিসে তার সমৃদ্ধি? দেশবাসীর বৃহত্তর স্বার্থের মন্ত্র কোথায় নিহিত? এই 'দোহাই দর্শন' অন্ধের 'হস্তীদর্শন' ছাড়া আর কিছু কি না তা বলা কঠিন। এই জন্যেই অসহিষ্ণু কণ্ঠে কেউ কেউ বলে উঠছেন ঃ

তাল গাছে ধান ফলবেনা,
ধানগাছে ধান ফলাতেই হবে
অন্য চেষ্টা চলবেনা।
আশ্বাসবাণী তালপ্রাংশু
হতে পারে উচুঁ তার চেয়ে,
তবু এটা ঠিক জীবন বাঁচবে
রোজ কয়মুঠো ভাত খেয়ে।

আর যাই হোক আশ্বাস খেয়ে
একটিও প্রাণ বাঁচবেনা।
স্বদেশপ্রেমের শিঙে ফুঁকলেও
কবরের লাশ নাচবেনা।
দেশ যদি থাকে — মানুষ থাকবে
তবে আর কেনো পথ খোঁজা?
পথ খোলা আছে সবার সামনে
আছে শুধু আজো চোখ-বোঁজা।'৬৭

মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ, এ. কে. নাজমুল করিম, শামসুর রাহমান, আবুল হোসেন, শওকত ওসমান, আলাউদ্দীন আল আজাদ, কাজী দীন মুহম্মদ, আনিসুজ্জামান, কামরুল হাসান, আবদুল্লাহ আলমুতী, কাজী মোতাহার হোসেন, আবদুল গনি হাজারী, আহমদ হাসান দানী প্রমুখের প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি লেখা নিয়ে সমকালের প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই পাঠকসমাজ এমন একটি পরিচ্ছন্ন-রুচির, শিল্পসম্মত সাহিত্যপত্রিকা লুফে নিয়েছিলেন, কিন্তু 'রঙবাজ' বুদ্ধিজীবীসমাজ বিরূপ সমালোচনা করতে ছাড়লেন না প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল অর্থাৎ বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও পাকিস্তানবাদী লেখকদের একত্র সমাবেশ কেন ঘটানো হলো এই বলে। এর জবাবে সম্পাদক দ্বিতীয় সংখ্যায় যে বক্তব্য উপস্থাপন করেন— দল-বিভক্ত অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সমকালের দৃষ্টিকোণ বুঝতে তা সহায়তা করে ঃ

"প্রথম সংখ্যা সমকাল বিভিন্ন অঞ্চলের পাঠকেরা মোটামুটি প্রশংসার সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন। অন্ততঃ একথা কেউ বলেন নি যে কাগজটা একেবারে অচল। তবে কাগজে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখা সম্বন্ধে অনেকেই অনেক রকম আলোচনা করেছেন; কোনো লেখা যে, তেমন উঁচুদরের হয়নি একথা কোনো-কোনো পাঠক একরকম খোলাখুলিই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। পাঠকদের মতামতের সঙ্গে আমাদের মতের মিল অমিল দুইই আছে, কিন্তু তা নিয়ে এখানে কোনো তর্ক তুলবো না। কারণ, আমরা জানি, প্রতি মাসের কাগজ সবগুলো প্রথম শ্রেণীর লেখা দিয়ে সমৃদ্ধ করা সময়-সাপেক্ষ। অবশ্য তার জন্যে আমাদের চেষ্টার অন্ত নেই। যাঁরা জানেন এবং লেখেন তাঁদের কাছে আমরা নিয়মিত ধর্ণা দিচ্ছি। যাঁরা জানেন, কিন্তু লিখবার উৎসাহ পাননা, তাঁদের মনে লেখার আবেগ জাগাবার জন্যে আমরা উৎসাহ জোগাচ্ছি। যাঁরা জানার এবং লেখার রাজ্যে নবাগত তাঁদেরকেও আমরা তাগিদ দিচ্ছি অনেক জানায় সমৃদ্ধিশালী হয়ে, অনেক লেখা দিয়ে আমাদের সাহিত্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তুলতে। অর্থাৎ স্থায়ী স্বাক্ষর রাখতে পারবেন এমন লেখক খুঁজে বার করবার দায়িত্বও সমকাল কিছুটা নিয়েছে। এ-কাজ অবশ্য কঠিন কিন্তু আমাদের সংকল্পও তেমন শিথিল নয়। তাছাড়া আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের দেশে সত্যিকার সুস্থ সাহিত্যপরিবেশ গড়ে তোলার জন্যে সাহিত্যামোদী পাঠকদের অকুণ্ঠ সমর্থন আমরা পাবো।

সমকালের লেখকগোষ্ঠী সম্বন্ধে কোনো মহলের আলাপ-আলোচনা আমাদের কানে এসেছে। এই আলোচনা প্রধানত 'রঙ-নির্ণয়' সম্বন্ধে। অর্থাৎ অমুক লেখক 'লাল', অমুক লেখক 'সবুজ', অমুক 'ঈষৎ লাল' ইত্যাদি। বর্ণ নির্ণয় যাঁদের সমালোচনার মাপকাঠি তাঁরা নিজেরা 'বর্ণচোরা' না হলে পুরোপুটি 'লাল' হয়ে যেতেন। কারণ 'পাকামীর' পরিণতি ত লালই। অর্থাৎ পেকেই ত লাল হয়; অবশ্য 'ইঁচড়ে -পাকা' না হলে, বর্ণান্ধ নন- এঁরা আসলে 'বর্ণ-বিলাসী' (বর্ণসংকরও হতে পারেন)। বর্ণজ্ঞানের কিঞ্চিৎ অভাব থাকায় বর্ণ সংকটে পড়ে মাঝে মাঝে এঁদের বর্ণাতঙ্ক উপস্থিত হয়। সে অবস্থায় এঁরা বর্ণিনী কলালক্ষ্মীর বরস্পর্শে বৃশ্চিকালী সংশ্লেষের প্রবল কণ্ডুয়ণ অনুভব করেন। এঁদের চোখে ফুটে ওঠে 'সাতরঙ' নয় 'একরঙের' রঙধনু। এই বর্ণনাতীত ব্যাপারে আমাদের কোনো কৌতূহল নেই। বর্ণ-বৈষম্যের ভিত্তিতে কিছু-সংখ্যক লেখক নিয়ে গোষ্ঠী তৈরীও আমাদের উদ্দেশ্য নয়; সমকালের পাতায় আমরা তাঁদের নিয়েই আসর জমাবো যাঁরা বর্ণের বারবরদার নন; সত্যিকার বার্ণিক।'৬৮

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পাদক সমকালের রচনা নির্বাচন করেছেন। বলা চলে লেখক নির্বাচন করে বিষয় দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র যেমন করতেন বঙ্গদর্শনে। বিষয় ও লেখক সূচীর দিকে তাকালেই সমকালের চরিত্র অনেকটা সহজে উপলব্ধি করা যায়।

সমকালে যাঁদের কবিতা ছাপা হয়েছে, তাঁরা হলেন — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম (পুনর্মুদ্রণ) ; শামসুর রাহমান, আবুল হোসেন, সিকানদার আবু জাফর, হাসান হাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বিমলচন্দ্র ঘোষ, ইমামুর রশীদ, আল মাহমুদ, আবু বকর সিদ্দিক, আলী আশরাফ, ফজলে লোহানী, আলাউদ্দীন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, সেবাব্রত চৌধুরী, সালেহ আহমদ, সানাউল হক, শহীদ কাদরী, আবুল কাসেম রহিমউদ্দীন, মীর আবুল খায়ের, আহসান হাবীব, জিয়া হায়দার, বেগম সুফিয়া কামাল, অরুণিমা স্যান্যাল, ওমর আলী, আমজাদ হোসেন, হামিদুজ্জামান খান চৌধুরী, কমলেশ সেন, শওকত আলী, মুহম্মদ আখতার, সৈয়দ আলী আহসান, আজীজুল হক, ফররুখ আহমদ, আল আজাদ, ইমরুল চৌধুরী, বেনজীর আহমদ, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুসুম কর, আবদুল গনি হাজারী, শামসুন্নাহার, হাসান আবদুল গোফরান, দেবব্রত দত্ত, তবিবর রহমান, আবদুস সাত্তার, প্রশান্ত ঘোষাল, রওশন আরা জামান, জাহানারা হাকিম, আবু জাফর শামসুদ্দীন, মনিরুজ্জামান, হায়াৎ সাইফ, হায়াৎ মামুদ, আসফউদদৌলা, এনামুল হক, নচিকেতা ভরদ্বাজ, সৈয়দ মোতাহার হোসেন চৌধুরী, আবদুল কাদির, ইমাউল হক, মযহারুল ইসলাম, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, আতাউর রহমান, ফজল শাহাবুদ্দীন, মাহবুব তালুকদার, মাসুদ আহমেদ, রফিক আজাদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আসাদ চৌধুরী, মফিজুল আলম, শাহজাহান হাফিজ, আফজাল চৌধুরী, মোহাম্মদ রফিক, ফারুক আলমগীর, সৈয়দ নুরুদ্দিন, হেমায়েত হোসেন, সুব্রত বড়ুয়া, সৈয়দ আলী আশরাফ, আবদুর রশীদ খান, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, লতিফা হিলালী, জাহানারা আরজু, বেলাল মোহাম্মদ, জিনাত আরা মালিক, মনজুরে মওলা, মাহমুদ শাহ কোরেশী, এহসান চৌধুরী, সুধাংশু দেবনাথ, সুরাইয়া কামাল, নির্মলেন্দু গুণ, মোহাম্মদ রফিক, ইবনে রউফ, আবুল হাসান, সিরাজউদদৌলা চৌধুরী, কায়সুল হক, জিল্লুর রহমান, ফরহাদ মজহার, হেনা হাসানাৎ, আখতার হুসেন, মহাদেব সাহা, রাজিয়া খান, হোসেন উদ্দিন হোসেন, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, প্রমুখ।

যাঁরা গল্প লিখেছেন ঃ শওকত ওসমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আহমদ কবির, গোপাল বিশ্বাস, বনমালী গোস্বামী, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, হুমায়ুন কাদির, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, জহির রায়হান, সত্যেন সেন, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, সিরাজুল ইসলাম, আবু ইসহাক, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, সরদার জয়েনউদ্দিন, টিপু সুলতান, আবু বকর সিদ্দিক, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আবু রুশদ, ফজলুল হাসান ইউসুফ, শওকত আলী, আবদুল হক, ফজল শাহাবুদ্দীন, আনিসুল ইসলাম, আফলাতুন, মাহবুবুর রহমান তালুকদার, আবদুল গাফফার চৌধুরী, তপন ভট্টাচার্য, আবদুল জব্বার, জিয়াউল হক, আবু জাহাঙ্গীর, মফিজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ আবদুস সুলতান, রাবেয়া খাতুন, জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী, অশোক বড়ুয়া, হাসান আজীজুল হক, মাহবুব হোসেন, মাসুদ আহমেদ, সাইফুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা রহমান, আশীষ কুমার লোহ, আবদুস সাত্তার, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আবদুর রাজ্জাক, শহিদুর রহমান, মুহম্মদ আযীয, দিব্যেন্দু দাশগুপ্ত, জাহানারা হাকিম, সিকানদার আবু জাফর, মমতাজউদ্দিন আহমদ, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, হাসান হাফিজুর রহমান, আবুল হাসানাত, ইসমাইল মোহাম্মদ, মন্মথ নন্দী, শাহেদ আলী, আহমেদুর রহমান, জিয়া হায়দার, বুলবুল ওসমান, রাইসুল জুহলা, নীলু দাস, মুর্তজা বশীর, আবদুল মান্নান সৈয়দ, ইমরুল চৌধুরী, সৈয়দ আবদুস সামাদ, বশীর আল হেলাল, সুব্রত বড়ুয়া, অরূপ তালুকদার, সারওয়ার আলতাফ, সিরাজউদ্দিন আহমদ, মুহম্মদ সিরাজ, শামসুল আলম, আবুল মোমেন, নির্মলেন্দু গুণ, শামসুল আলম সাঈদ ;

উপন্যাস লিখেছিলেন ঃ রশীদ করীম (উত্তমপুরুষ, ৩/৬ থেকে ক্রমশ) ; শওকত ওসমান (সমাগম, ৪/২ থেকে ক্রমশ) ; আবদুর রাজ্জাক (কাঁচপোকা ও তেলাপোকা, ৬/১ থেকে ক্রমশ) ; সৈয়দ শামসুল হক (জেসমিন রোড, ১১/১-৩ থেকে ক্রমশ, উপন্যাসটি অসম্পূর্ণ থাকে, কারণ লেখক পরের অংশ ঠিকমতো সরবরাহ করেননি) ; ইত্যাদি। কাজী মাসুম উর্দু সাহিত্যের বিখ্যাত উপন্যাস অনুবাদ করেন 'উমরাওজানআদা' (মূল লেখক মির্জা মুহম্মদ হাদী রুসুয়া, ইংরেজী অনুবাদ থেকে বাংলায় করা হয়, ৮/৩ থেকে ধারাবাহিক) শিরোনামে এবং আবদুল মান্নান সৈয়দ আরব্য উপন্যাসের একটি গল্পের থীম নিয়ে ছোট উপন্যাস লিখেছিলেন ধারাবাহিকভাবে ১১/৪-৬ থেকে 'পরিপ্রেক্ষিতের দাস-দাসী' শিরোনামে। শওকত ওসমান, আবদুল হক, আনিস চৌধুরী, সিকানদার আবু জাফর, সৈয়দ আলী আহসান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, মোবাশ্বের আলী, বুলবুল ওসমান, আবদল মান্নান সৈয়দ প্রমুখ কতিপয় খ্যাতনামা নাটকের অনুবাদ, অনুসরণ অথবা প্রণয়ণ করেছিলেন। আনাতোল ফ্রাঁস অবলম্বনে শওকত ওসমান লিখেছিলেন 'কর্ণচূর্ণ' (১/৪) ; তিনি আন্তন চেকভের 'দি বিয়ার' অনুসরণে লিখেছিলেন 'ইস্কাটনের বিবি' (১/৯)। তাঁর ধারাবাহিক প্রহসনের নাম 'দেশের ঠিকানা' (১১/৭-৯ থেকে)। আবদুল হক হেনরিক ইবসেনের An Enemy of the people এর অনুবাদ করেন 'গণশত্রু' শিরোনামে (৫/৬-৮)। আনিস চৌধুরীর 'এ্যালবাম' ও 'মানচিত্র', সমকালেই প্রকাশিত হয় (২/৭ ও অন্যান্য)। সিকানদার আবু জাফর এর একাঙ্ক নাটিকা 'মাকড়সা' (৩/৮) ; রূপক নাটক 'শকুন্ত উপাখ্যান' (৫/৩-৫) ; এবং জন্ এম. সীনজ প্রণীত নাটকের অনুবাদ 'পশ্চিমের পারাবাত' (৬/৯ থেকে ক্রমশ) এতে প্রকাশিত হয়। সৈয়দ আলী আহসান সফোক্লিসের 'ইডিপাস' অনুবাদ করেছিলেন (ভূমিকাসহ) ৫/৩-৫ থেকে। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর একাঙ্কিকা 'উজানে মৃত্যু' প্রকাশিত হয় ৬ বর্ষ ১০ সংখ্যায়। সফোক্লিসের অন্যতম নাটক 'এন্টিগোনী' অনুবাদ করেন (ভূমিকাসহ) মোবাশ্বের আলী ((১২/১০-১২ থেকে) এবং জন্ এম. সীনজ এর অন্য একটি একাঙ্ক নাটক অনুবাদ করেন সম্ভবত সিকান্দার আবু জাফর 'সমুদ্রের ডাক' শিরোনামে (৬/৮)। তরুণতর লেখক বুলবুল ওসমান 'সমান্তরাল' (৮/১) এবং আবদুল মান্নান সৈয়দ 'এসো অসম্ভব এসো' (একাঙ্ক, ১০/৬-৮) ; 'বিশ্বাসের তরু' (কাব্যনাটক, ১২/৭-৯) ; 'না ফেরেশতা, না শয়তান' (১৩/১ থেকে ক্রমশ) ইত্যাদি নাটকও সমকালের জন্যই লিখেছিলেন।

'বিতর্ক' শিরোনাম দিয়ে কয়েকটি মূল্যবান আলোচনা প্রকাশ করা হয়। ৩ বর্ষ ৫ সংখ্যায় তপন ভট্টাচার্যের 'ইতিহাস' শীর্ষক গল্প সম্পর্কে লেখেন এ. বি. খীসা। সৈয়দ আলতাফ হোসেন 'সমাজ ও সংস্কৃতি' শিরোনাম দিয়ে কাজী আবদুল ওদুদ ও আবুল কালাম শামসুদ্দীনের চিঠিপত্র উদ্ধৃত করে বিশশতকের বাংলা সাহিত্য ও সাময়িকপত্রে বিধৃত সমাজচিন্তার পরিচয়, আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছিলেন ২ বর্ষ ৬ সংখ্যায়। পাকিস্তানের সংস্কৃতি তথা মূলগত ঐক্য প্রসঙ্গে 'ডন' পত্রিকায় গোলাম মোস্তফা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এ. বি. রাজপুত এবং আতিয়ার রহমান ও মোহাম্মদ সিরাজউদ্দীন

Dhaka University Institutional Repository

'ডন' পত্রিকাতেই গোলাম মোস্তফার বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন। এসব তর্ক বিতর্ক বাংলা ভাষায় ছাপা হয় সমকালের ২ বর্ষ ৮, ও ১০ সংখ্যায়। মঈদুল হাসান ও শামসুল হুদা আলকাজী অর্থনীতির বিষয়ে লিখেছিলেন ; 'অনুন্নত দেশে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সাহায্য-পরিকল্পনা' (১/৫-৬) এবং 'মজুরী নিয়ন্ত্রণ' শিরোনামে। তাছাড়া প্রায় সকল প্রবন্ধ, নিবন্ধে রাজনীতি অর্থনীতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিবার আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও আলোচনা লিখেছিলেন যাঁরা, তাঁদের নাম রচনার নাম ও সংখ্যার উল্লেখ করা হলো ঃ

- অজিত কুমার গুহ— সমকালীন কথা সাহিত্যের ধারা (২/৪) ; মোতাহের স্মৃতি (২/২) ;
- অশোক বড়ুয়া—যে প্রেম সম্মুখপানে (৪/৯) ;
- অরূপ তালুকদার—পাঠকের প্রতিক্রিয়া (১০/৯-১২) ;
- অরুণ কুমার তালুকদার—শেষ সপ্তক ও তার কবিমানস পরিচয় (৪/৯) ;
- অসিত কুমার ভট্টাচার্য—একটি গ্রন্থ : একটি লেখক (৫/২) ;
- আবদুল হক—সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা (১/৭-৮) ; নামায়ন (১/১০) ; সাহিত্যের দিগন্ত (১/১১-১২) ; নাটক ও সাহিত্য (২/৪) ; রাজনীতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি (২/৯) ; নজরুলের গল্প ও উপন্যাস (২/১০) ; পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যিক (৩/১) ; রাসেল ও যাজক সম্প্রদায় (৩/১১) ; সাহিত্যিক মূল্যবোধ (৪/১০) ; শিখার সন্ধানে (৫/৩-৫ ও অন্যান্য) ; প্রত্যয়ের সাহিত্য (১০/৩-৫) ; ভাষা স্বদেশ সত্তা (১০/৬-৮) ; নেতৃত্ব ও গণচেতনা (১৩/১) ; কাজী আবদুল ওদুদ : স্মৃতি (১৩/৩-১২) ;
- আবু রায়হান—নির্বাচন ; একটি দৃষ্টিকোণ (৮/৪) ;
- আবু আহসান—বাঙালি মুসলমান : ভূমিকা ও নিয়তি (৬/৮) ; পূর্বপাকিস্তান : বাংলাদেশ (৭/৫-৭) ; শিক্ষায়োজন : বৈষম্য ও সংস্কৃতি (৭/১১-১২) ; যুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িকতা (৮/৯-১২, ১৯৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধের পরে লেখা) ; মুসলিম জাতীয়তাবাদ; পুন: নিরীক্ষা (৯/১-৪); সাম্প্রদায়িকতা ও সংস্কৃতি (৯/৫-৮);
- আবুল ফজল — এক অজ্ঞাত লেখিকা : ফাতেমা খানম (১/৪ ও অন্যান্য); কাজী আবদুল ওদুদ : সাহিত্য ও মতাদর্শ (১/১১-১২ ও অন্যান্য); সাহিত্যের সংকট (২/৫); শিল্পীর প্রতি সমাজের কর্তব্য (ফরস্টার অবলম্বনে, ২/১০); দুজন আধুনিক কবি: জীবনানন্দ দাস ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (৪/১); রবীন্দ্রনাথ ও ধর্ম (৪/৯); লেখকের স্বাধীনতা ও সামাজিক দায়িত্ব (৪/১১); আমাদের সাহিত্যের ঐতিহ্য (৫/৬-৮); ধর্ম ও রাষ্ট্র (৬/৯); মুসলিম স্বাতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ (৬/১২); মানবতন্ত্র (৭/৫-৭); আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার: একটি জিজ্ঞাসা (৮/৩); সমালোচনা (১০/৩-৫);
- আবু জাফর শামসুদ্দীন — সমকালীন সাহিত্য (৭/১); আমাদের কবিতা (৭/২ থেকে ক্রমশ); পাঠকের প্রতিক্রিয়া (১০/১-২);
- আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ—অভিভাষণ (সংকলন, ৪/২) ;
- আবদুস সালাম, বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক— দারিদ্রের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানীর সংগ্রাম (১৩শ বিজ্ঞান সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ, ৪/৬) ;
- আবদুল মতীন—উমর-মানস (১/৪ ও অন্যান্য) ; সমকালীন পৃথিবী (২/৭ ও অন্যান্য) ;
- আহমদ শরীফ—পুথিসাহিত্য ঃ মনোহর মধুমালতী (১/৩) ; জাতীয় জীবনে লোকসাহিত্যের মূল্য (১/৭-৮) ; কথাসাহিত্যে সমস্যা ও এর বিষয়বস্তু (২/৪ ও অন্যান্য) ; ভাষার কথা (৩/২) ; ইংরেজ আমলে মুসলিম মানসের পরিচয়সূত্র (কাজী আবদুল ওদুদ প্রণীত 'বাংলার জাগরণ' পাঠের প্রতিক্রিয়ায়, ৩/৭) ;
- আহসান হাবীব—পূর্ববাংলার সমকালীন কাব্যের ধারা ও সমস্যা (২/২) ;
- আহসানুল হক— শর নাটক (২/২);
- আবদুল্লাহ আল মুতী— আন্তর্জাতিক ভূতত্ত্ব বিষয় (১/১) ; পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা-সপ্তাহ (১/৪) ; পরমাণু শক্তির তেজস্ক্রিয় প্রভাব (বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ, পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ-এ পঠিত, ২/৩) ;
- আলাউদ্দীন আল আজাদ—ভাষার রূপ ও রূপান্তর (১/১০) ; উপন্যাসে জীবনচিত্রন (১/১১-১২) ; কবিতা ও ঐতিহ্য (কবিতা সংখ্যা ১৩৭১-৭২) ;
- আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন—সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা (১৩৩৪ সনের সওগাত থেকে পুনর্মুদ্রণ, ২/৫) ;
- আবদুল মওদুদ—বাংলা সাহিত্যের চর্চায় মুসলমান (২/১১ ও অন্যান্য) ;
- আনিসুজ্জামান—নজরুল ইসলাম ও তাঁর কবিতা (১/১ ও অন্যান্য) ; শেখ ফজলুল করিম ও তাঁর গদ্য রচনা (২/১০) ; মরহুম আবদুল গফুর সিদ্দিকী (জীবন কথা, ৩/৪) ; 'ইংরেজ আমলে মুসলিমমানসের পরিচয়সূত্র' (আহমদ শরীফের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায়, ৩/৮) ; বাংলা ভাষা ও বাংলার মুসলমান (৪/৭) ; শ্রদ্ধাঞ্জলি : প্রমীলা নজরুল (৫/১২) ;
- আবদুল কাদির—বাংলাভাষা ও নজরুল ইসলাম (১/১০) ; ছয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামান (৩/২) ; ছন্দসমীক্ষণ (৩/৪ থেকে ধারাবাহিক) ; নজরুলের কবিতায় দেশ প্রেম (৭/৫-৭) ; বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য (কবিতা সংখ্যা ১৩৭১-৭২) ; বাউলের ভাবসাধনা (১০/৯-১২) ;
- আবদুল মতিন খান—আণবিক শক্তি ও সমাজ প্রসঙ্গে (১/৪) ; ঐতিহাসিক ইসলাম ও বিশ্বকমিউনিজম (১/১১-১২) ; পৃথিবীতে মানুষ (বিজ্ঞানবিষয়ক, ৩/১) ; বিশ্ব ইতিহাসের রূপরেখা (৩/৩ ও অন্যান্য) ; কলিকালের কথকতা (৪/৪) ; লাইব্রেরী সম্মেলন (৪/৬) ; সম্ভাবনা সম্ভার (৬/৮) ; সভ্যতাউত্তর সমাজ (৭/৮-১০) ;
- আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ—ঢাকার ইতিহাস (৩/৮) ;
- আশরাফ সিদ্দিকী—ইভনিং ইন প্যারিস (রম্যরচনা, ৩/৯) ;

Dhaka University Institutional Repository

- আবদুল গনি হাজারী—পাকিস্তানী আদর্শ (১/৫-৬) ; মধ্যরাত্রের সূর্য (৪/৬ থেকে ক্রমশ) ; সংস্কৃতি চিন্তা (৮/৩ থেকে ক্রমশ) ; বন্দীবিবেকসমাজ ও কবিমানস (কবিতা সংখ্যা ১৩৭১-৭২) ; ঐতিহ্য সন্ধানে আমরা (১৩/৩-১২) ;
- আতোয়ার রহমান—নীলমিথুন (১/২) ; পাঠকের প্রতিক্রিয়া (১১/৪-৬) ;
- আবদুর রাজ্জাক —চিত্রকলার একদিক (১/৩) ;
- আবদুল আহাদ —পল্লীসঙ্গীত ও আমরা (১/৪) ;
- আবুল হাসান শামসুদ্দীন—জনগণের শেক্সপীয়র (৪/৮) ;
- আখতার হামিদ খান—রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে (৪/৯) ;
- আবদুস সাত্তার — যুগ প্রবৃত্তি ও নজরুল মানস (৪/১০) ;
- আবদুল করীম —বাংলার সুলতানদের মুদ্রায় খলিফার স্বীকৃতি (৫/১) ;
- আবুল এহ্সান —অন্য পৃথিবী (৬/১ থেকে ক্রমশ) ;
- আবুল হাসানাৎ — মীর মোশাররফ হোসেন (৮/৩) ;
- আবদুল মান্নান সৈয়দ — সাম্প্রতিক কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ (কবিতা সংখ্যা ১৩৭১-৭২) ; আধুনিক সাহিত্যের মূলসূত্র (৮/৯-১২) ; রবীন্দ্রনায়ন : তাঁর শিল্প সাহিত্যতত্ত্বের ত্রিবেণী (১০/৯-১২) ; উড়োনচণ্ডি কবিনটেশ : তাঁর চিত্রকল্প (১২/৭-৯) ; যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : 'রুদ্রনৃত্যের ঝংকার' (১৩/৩-১২) ;
- আমিনুল ইসলাম বেদু— পাঠকের প্রতিক্রিয়া (সমকাল প্রসঙ্গে, ৯/৫-৮) ;
- আ. শ. ম. বাবর আলী— পাঠকের প্রতিক্রিয়া (৯/৯-১২) ;
- আবদুল কাদির মাহমুদ— পাঠকের প্রতিক্রিয়া (১০/১-২) ;
- আবু বকর সিদ্দিক— পাঠকের প্রতিক্রিয়া (১০/৬-৮) ; সোনা নহে রূপা নহে বাপা এ বাঙ্গা পিতল (১১/১০-১২) ;
- আবদুল মতিন সরকার— ইতিহাসের পটভূমিকায় শিল্প (১১/৪-৬) ;
- আবু জোবের— জীবনানন্দ দাশের কবিতা (১৩/২) ;
- আহমেদুর রহমান— আমাদের সংস্কৃতির একদিক (৬/৯) ; লৌহশ্বর্ণ সমাচার (৬/১২) ;
- ইসমাইল মোহাম্মদ— নাট্যকলার ক্রমবিকাশ (১৩/৩-১২) ;
- এ. কে. নাজমুল করীম— ভাষা ও কালচার (১/১) ; বাঙ্গালী মুসলিম সংস্কৃতি (১/৫-৬) ; বাংলাভাষা ও বাঙ্গালী মুসলমান (২/১) ; সমাজবিজ্ঞান প্রদর্শনী (৩/৫) ;
- এবনে গোলাম সামাদ— সমকালীন দর্শনের ধারা (১/৩) ; আধুনিক চিত্রকলা (১/৫-৬) ; রাষ্ট্র ও সাহিত্য (১/৭-৮) ; গ্রহলোক ও সজীবজগত (২/১) ; ডারউইন ও জীব বিবর্তনবাদ (২/২) ; কবিতার সত্তা (২/৪) ; শিল্পকলার ইতিহাস (২/১১) ; সমাজ-সংস্কৃতি জাতি (৩/৯) ; ধর্মের কথা (৩/১১) ; মহাকাশে অভিযান (১/৯) ; ছবি আঁকার গোড়ার কথা (১/১০) ; কয়েকটি প্রাচীন সভ্যতা ও তার ধর্ম (৪/২) ; শিল্পীতীর্থ পারী (৪/৮) ; ফরাসী জীবন, ফরাসী কবিতা (৪/১০); মানুষের দেশ (৪/১১) ; পারির চিঠি (৫/১) ; বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা (৫/২) ; রাষ্ট্র রাজনীতি ও বৈজ্ঞানিক (৬/১) ; সাহিত্য প্রসঙ্গে (৬/৩) ; পারির চিঠি (৬/১০) ; ধর্ম রাষ্ট্র জীবন (৭/১১) ; জন্তুরা (৭/৫-৭) ; প্রগতির অর্থ (৭/১১-১২) ; পারীর চিঠি (৮/১) ; ইউরোপ : জীবন ও যৌন জীবন (৮/২) ; বোদলেয়ারের কাব্য দর্শন (কবিতা সংখ্যা ১৩৭১-৭২) ; সংস্কৃতি ও মূল্যচেতনা (১০/১-২) ; আত্মপক্ষ (১০/৬-৮) ; মূল্য চেতনা (১০/৯-১২) ; বার্ট্রাণ্ড রাসেল (১১/১-৩) ; ম্যাক্সিম গোর্কী (১১/৪-৬); আত্মপক্ষ (১১/৪-৬) ; কাব্য ও মননশীলতা (১২/১০-১২) ;
- এ. কে. এম. সিদ্দিকুর রহমান— সমালোচক টি. এস. এলিয়ট (৬/৮) ; ঐতিহাসিক নাটকের পটভূমি ও শেক্সপীয়র (৬/১); অন্তর্দ্বন্দ্ব ও শেক্সপীয়রের বিয়োগান্ত নাটকের ধারা (৬/১২) ; যুগেযুগে সমালোচনার ধারা ও শেক্সপীয়র (৭/২) ; আধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষা-সমস্যা (৮/২) ; জ্যাঁপল সাত্রের নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে (৮/৪) ; কবির অন্তর্জগত ও বহির্বিশ্ব (৯/৫-৮) ; পাঠকের প্রতিক্রিয়া (১০/১-২) ; শিল্পীর দৃষ্টিকোণ : মোহময়ী মোনালিসা (১০/৩-৫) ; সংস্কৃতিচিন্তা (১১/১-৩) ; সামাজিক বিবর্তন ও ছাত্রবিপ্লব (১১/১০-১২) ; শেকসপীয়র রহস্য (১২/৪-৬) ; সাম্প্রতিক দৃষ্টিকোণ ও নজরুল কাব্যমানসের পুনর্নিরিক্ষা (১২/১০-১২) ;
- এ. এন. এম. আতাউল হক— ইতিহাস (৬/৯) ; বৃটিশ বৈদেশিক নীতির ধারা (৭/১) ;
- এস. এম. লুৎফর রহমান— বাউল ও লালনশাহ (১২/৪-৬) ;
- এমাজউদ্দিন আহমদ— ইউরোপীয় সাধারণ বাজার ও পাকিস্তান (৬/৯) ;
- এম. আবদুল্লাহ— ইতিহাসের লুপ্তধারা (২/৯) ;
- এ. হালিম ডক্টর— আমীর কসরু (৩/৪) ;
- এনায়েত আলম— চট্টগ্রামে জাহাঙ্গীরের চিত্র প্রদর্শনী (১/৪) ;
- এ. এস. এন. কিউ. জুলফিকার আলী— শিক্ষাসংস্কারক রবীন্দ্রনাথ (৪/৯) ;
- এস. এম. মুর্শেদ— রবীন্দ্রনাথ (অভিভাষণ, ৪/৯) ;

Dhaka University Institutional Repository

- কবীর চৌধুরী— সমকালীন নাটকের সমস্যার কথা (২/৫) ; পূর্ব পাকিস্তানের সমকালীন সাহিত্যে ঐতিহ্যের ভূমিকা (৪/৮) ; মুসলিম রেনেসাঁ ও কাজী নজরুল ইসলাম (৪/১০) ; যান্ত্রিক সমাজে লেখকের ভূমিকা (৪/১) ; লেখক এবং সমালোচক (৫/১) ;
- কাজী মোতাহার হোসেন— দাবা খেলা (১/১) ; শিক্ষা প্রসঙ্গে (২/৬) ;
- কামাল চৌধুরী— কবি জীবন (কাজি নজরুল ইসলামের পর্যালোচনা, ২/১০) ;
- কাজী আবদুল ওদুদ— 'ইংরেজ আমলে মুসলিম-মানসের পরিচয়-সূত্র' (আহমদ শরীফের সমোলোচনার প্রেক্ষিতে একটি চিঠি, ৩/৮) ;
- কাজী দীন মুহম্মদ— পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি (১/১) ;
- কামরুল হাসান — পূর্ব বাংলার শিল্পসৃষ্টির ধারা (১/১) ;
- কাইউম চৌধুরী— চলচ্চিত্রের গোড়াপত্তন (১/২) ;
- কামালউদ্দীন খান— কোরআনের একটি কমিউনিস্ট ভাষ্য (১/১০) ; সমসাময়িক উর্দু সাহিত্যের ধারা (৪/১) ;
- কাজী মুহম্মদ শীশ— দ্বিতীয় চিন্তা : সাহিত্যের অগ্রগতি ও পাঠক (৬/৪)
- কাজী সাহিদ হাসান— মতামত : পাঠকের প্রতিক্রিয়া (৯/৯-১২) ;
- কাজল মাহমুদ—পাঠকের প্রতিক্রিয়া (১০/৯-১২) ;
- খামুরাখি—মতামত : পাঠকের প্রতিক্রিয়া (৯/৯-১২) ; সমালোচনা : আত্মপক্ষ (১০/৬-৮) ইভান তুর্গেণিভ (১২/৪-৬) ;
- খান আতাউর রহমান—রাজধানী (১/৭-৮) ;
- জহুরুল হক— মানবিক পরমাণবিক (২/৫) ;
- জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা— রবীন্দ্রসাহিত্য মূল্যায়নের সমস্যা (৪/৯) ;
- জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত— আত্মজীবনী (৯/১-৪) ; পাঠকের প্রতিক্রিয়া (সমকাল প্রসঙ্গে, ৯/১-৪) ;
- জ্যোতিধর— পাঠকের প্রতিক্রিয়া (১০/৩-৫) ;
- জাহানারা হাকিম— দ্বিতীয় চিন্তা (৯/৯-১২) ;
- জামাল খান— সৃজন নিবিড় ভুবন ও চলচ্চিত্র (চলচ্চিত্র শিল্প বিষয়ে, ১১/৭-৯) ; চলচ্চিত্র অর্থনীতি : পরিবেশক-প্রদর্শকচক্র (১২/৭-৯ ও অন্যান্য) ;
- দ্বিজেন শর্মা— পূর্ববাংলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে (১/২, পাঠকের প্রতিক্রিয়া) ; বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার বিচার (১/৩) ; জীবন রহস্যের প্রথমপাঠ (১/৯) ; তমসার শেষ অঙ্কে (৩/৭) ; বিপ্লবী বিজ্ঞানের শেষ নায়ক (চালর্স ডারউইনের বইয়ের অংশ, ৬/৩) ; প্রজাতির উৎস সন্ধানে (৬/৫-৭) ; পূর্বধ্যানী পিতামহ : চার্লস ডারউইন (৭/২) ; চার্লস ডারউইনের সহযাত্রী (৭/৮—১০ ও অন্যান্য) ;
- দানিয়েল হোসেন খান— ফ্রান্সের চিঠি (ভ্রমণ, ২/৭ ও অন্যান্য) ; ঝলমলে মাটির নীচে লণ্ডনের পৃথিবী (৩/১১ থেকে ক্রমশ) ; ইংলণ্ডের চিঠি (৪/৩) ; জার্মানির চিঠি (৪/৪) ;
- দিলওয়ার হোসেন— পাঠকের প্রতিক্রিয়া (বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের ১১/১২র নজরুল সংক্রান্ত রচনার, ১২/১-৩) ;
- নুরুল হক— পাঠকের প্রতিক্রিয়া (১০/৩-৫) ;
- নির্মলেন্দু গুণ— পাঠকের প্রতিক্রিয়া (১০/৩-৫) ;
- পুর্ন্দেদু দস্তিদার— চট্টগ্রামের এক বিবাহিত কুমার বিপ্লবী নেতা (সূর্যসেনের জীবন, ৭/৩-৪) ;
- ফখরুজ্জামান চৌধুরী— বরিস পাস্তারনাক (দেশেবিদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন আলোচনার সারাংশ, ২/৬) ; সাহিত্যসমীক্ষা (২/৭) ; সাহিত্য বিচারে রবীন্দ্রনাথ (৪/৯) ;
- ফতেহ লোহানী— জেকব এপস্টাইন (জীবনস্মৃতি, ৩/২) ;
- বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর— নাজমার জন্য (ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, ১/৪) ; কবিতার ভাষা (২/৫) ; কাব্যবিবেচনা ও ইতিহাসচেতনা (৩/১) ; ডক্টর জিভাগো (৪/৩) ; পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতি (৪/১০) ; বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা (৪/১১) ; বুদ্ধিজীবী প্রসঙ্গে (৫/১) ; নজরুল ইসলাম (১১/১০-১২) ; জয়নুল আবেদীন : তাঁর মূল্যায়ন (১২/৪-৬) ; কবিতা এখন (১২/১০-১২ থেকে ক্রমশ) ;
- বযলুর রহমান— সমকালীন পল্লীকবি ও সাধক (৩/৫) ; বাউল গানের ঐতিহ্য (৩/১১) ; বিশ্ববাউল পরিক্রমা (৪/৮) ; পাঠকের প্রতিক্রিয়া (১১/১-৩);
- বেলাল চৌধুরী— ডিজাইন প্রতিযোগিতা প্রসঙ্গে (৩/১২) ;
- বুলবুল ওসমান— বইএর মলাট (৪/৪) ; 'ভ্যালু' বা 'গুণ' (৫/২) ; সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (৬/১) ; সমাজতন্ত্রের পক্ষে বিপক্ষে (৭/৮-১০) ; আধুনিক বাংলা কাব্যে চাঁদের জন্ম ও মৃত্যু (কবিতা সংখ্যা ১৩৭১-৭২) ; ধর্মের সমাজতত্ত্ব (৮/৯-১২ ও অন্যান্যে ক্রমশ) ;
- বদরুল হক— উদ্বৃতি ব্যবহার কলা (৯/৫-৮) ;
- বশির আল হেলাল— কবিতাক্রান্ত গল্পপ্রতিভা : হাসান আজীজল হক (১৩/২) ;
- মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন—আমাদের লোকসঙ্গীত সাধনা (৩/৩ ও অন্যান্য) ; ভাওয়াইয়া, চটকা ও গম্ভীরা (৩/৪) ; প্রাচীন কবিওয়ালা (৫/৩-৫) ;
- মুহম্মদ শহীদুল্লাহ— গল্পের রূপান্তর (২/১০) ; মদন বাউল ও লালন শাহের কাব্যে আত্মনিবেদনের সুর (৩/১) ; বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ (৪/৯) ; পাঠকের প্রতিক্রিয়া (১০/৬-৮) ;

Dhaka University Institutional Repository

- মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ্— প্রথম গণবিপ্লব (১/১) ;
- মোতাহের হোসেন চৌধুরী— নজরুল ইসলামের ভূমিকা ('সংস্কৃতি কথা' থেকে পুনর্মুদ্রণ, ৩/১০) ; মেরুদণ্ড (১/১১-১২ ;
- মুহম্মদ তকীয়ুল্লাহ্— আণবিক শক্তি ও সমাজ (১/২) ;
- মোহাম্মদ হাফিজ— পাঠকের প্রতিক্রিয়া (সমকাল প্রসঙ্গে, ১০/১-২) ;
- মুহম্মদ জহুরুল ইসলাম— পাক-ভারতের ইতিহাস (১/৩) ;
- মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম— পূর্ব বাংলায় সাংস্কৃতিক সমস্যা (১/৭-৮) ; কবিতার দেশ (২/৬) ; মহাকবির মৃত্যু (২/৭) ;
- মুহম্মদ আবদুল হাই— তোষামোদের ভাষা (১/৭-৮) রাজনীতির ভাষা ১/১০); রোমান বনাম বাংলা হরফ (২/৮) ;
- মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা— স্ফুরণীর পড়তি-কণা (বিজ্ঞান বিষয়ক, পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সেমিনারে পঠিত, ২/৩) ; বাংলাভাষা ও রবীন্দ্রনাথ (৪/৯) ;
- মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন— কোটফিজির প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের গুরুত্ব (১/১০) সোয়াতের খননকার্য প্রসঙ্গে (২/৪) ;
- মাহবুবউল আলম— সংস্কৃতি প্রসঙ্গ (রাইটার্স গিল্ডের সভায় পশ্চিম পাকিস্তানে গমন প্রসঙ্গে, ২/৭) ;
- মুহম্মদ এনামুল হক— রোমান অক্ষর সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব (২/৮) ; আবুল ফজল সংবর্ধনা (৩/৬) ;
- মনিরুজ্জামান— ভাষাতত্ত্ব আধুনিক (৬/১১) ; শব্দের ইতিবৃত্ত (৭/১) ; পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের ভাষা- সমস্যা (৭/২) ;
- মুয়ীনউদ্দীন আহমদ খান— তীতুমীরের সংগ্রাম (২/৯ থেকে ক্রমশ) ;
- মুনীর চৌধুরী— ভাষা কমিটির সোপারিশ প্রসঙ্গে (২/৯) ;
- মোহাম্মদ আজিজুল হক চৌধুরী— দেওয়ানা মদিনা (লোকসাহিত্য, ২/১১) ;
- মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল— 'শেখ ফজলুল করিম ও তাঁর গদ্য রচনা' (আনিসুজ্জামানের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে, 'বিতর্ক', ২/১১) ;
- মারুফ হোসেন, ডাক্তার— বাঙ্গালী মুসলমানের নবজাগরণের একযুগ (মনীষী আবুল হুসেনের স্মৃতিবার্ষিকীতে, ১/৩) ;
- মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান— গল্পগুচ্ছের মুসলিম চরিত্র (৪/৯) ;
- মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেন খান— রবীন্দ্রকাব্যে শেষ অধ্যায়ে মানবতাবোধ (৪/৯) ;
- মীর্জা হারুন অর রশীদ— রবীন্দ্রকাব্যে অপূর্ণতার বেদনা (৪/৯) ;
- মোবাশ্বের আলী— প্যাস্টারনাক ও ডাক্তার জিভাগো (৪/১১) ; ডস্টয়ভস্কি (৬/২) ; মধুসূদনের বিশ্ব (৬/৪) ; মেঘনাদবধকাব্যে বিধি ও বিশ্ববিধান (৬/৫-৭) ; সফোক্লিস ও রাজা ইডিপাস (১১/৭-৯) ; নাট্যকার চেকভ (১২/১-৩) ;
- মাজহারুল ইসলাম— পূর্ব পাকিস্তানের স্থাপত্য : একটি সাধারণ আলোচনা (বাংলা একাডেমীতে পঠিত, ৫/৬-৮) ;
- মোহিতলাল মজুমদার— বাঙালী মুসলমানের কাব্য-সাধনা (কবিতা সংখ্যা ১৩৭১-৭২) ; কবি আবদুল কাদিরকে লিখিত পত্রের অংশবিশেষ, ১৩৪৩/১৯৩৬ সনের পরে লিখিত) ;
- মিজানুর রহমান— পাঠকের মতামত (৯/৯-১২) ;
- মুহম্মদ নুরুল হুদা— পাঠকের প্রতিক্রিয়া (১০/৯-১২) ;
- মমতাজুর রহমান তরফদার— ইতিহাস লেখার সমস্যা (সংকলিত, ১১/১-৩) ;
- মাহমুদ আল জামান— পাঠকের প্রতিক্রিয়া (১১/৭-৯) ;
- মমতাজ উদ্দিন আহমেদ— বরকনের বিয়ে (ঐ, ১/১০) ; দিব্যদৃষ্টি (রম্যরচনা, ১৩/১) ;
- মাহফুজুল হক— মোতাহের হোসেন চৌধুরী (২/২) ;
- মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী— আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন (স্মরণে, ৩/১২) ; রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (৪/৯) ; রবীন্দ্রনাথের ধর্ম (৬/১১) ;
- মাইজুদ্দীন আহম্মদ— নজরুল মানস ও আমাদের দৃষ্টিকোণ (৪/৫) ;
- যতীন সরকার— পাঠকের প্রতিক্রিয়া (১০/৩-৫) ;
- রফিক আজাদ— পাঠকের প্রতিক্রিয়া (সমকাল প্রসঙ্গে, ৯/৫-৮) ;
- রফিকুল ইসলাম— পূর্বপাকিস্তানের সমকালীন সাহিত্য ও নীলিমা ইব্রাহীম (৪/৩) ; আধুনিক ভাষাতত্ত্ব ও বাংলাভাষা (৪/৪) ;
- রশীদ আল ফারুকী— উর্দু ছোটগল্পের গতি ও প্রকৃতি (৯/৯-১২) ;
- রাজিব আহসান চৌধুরী— সমালোচনা : পাঠকের প্রতিক্রিয়া (১০/৩-৫) ;
- রাজিয়া সুলতানা— সিন্ধু হিল্লোলে নজরুল (১৩/২) ;
- রহিম উদ্দিন সিদ্দিকী — কবি সালভাতোর কোয়াসিমোদা (৩/৫) ;
- রবিউদ্দিন আহমদ— ইটালি থেকে চিঠি (২/৪) ;
- শওকত ওসমান— ইকবালের ভূমিকা (১/২) ; সুন্দরের অন্বেষণ (১/৫-৬); মোতাহের হোসেন চৌধুরী (২/২); কুকুরের ভাষা (৪/৬) ; উত্তমর্ণ পূর্বসূরী (৪/৯) ; অভিভাষণ (রাইটার্স গিল্ড এর সংবর্ধনার উত্তরে, ৬/৯) ; পাঠকের প্রতিক্রিয়া (১০/১-২) ; নৈতিকতার সমস্যা (১০/৬-৮) ; ভাষা-প্রতীক

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ (১১/১-৩) ; ম্যাক্সিম গোর্কী (১১/৪-৬) ; আত্মপক্ষ (১১/৭-৯) ; হুমায়ুন কবির (মৃত্যুর পরে, ১৩/২) ;

- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— ভাগ্য বিড়ম্বিত লেখকসম্প্রদায় (২/৯) ;
- শাহ লতীফ় আফী আনহু— বাউল কবি দুদ্দুশাহ (৩/৮) ; বাংলা গীতিসাহিত্যে বাউলগান (৩/৯) ; বাউলগানে 'মানুষ' শব্দের ব্যাখ্যা (৩/১১) ; বাউল-দর্শনের সূত্রসংকেত (৪/৪) ;
- শাহাবুদ্দীন আহমদ— মহৎ কবিতা আর মননশীল কবি (১০/৯-১২) ;
- শহীদ সাবের— সাহিত্যের বাস্তবতা (১/২) ;
- শফিক আহমেদ খান— বিজ্ঞান সম্মেলন (৪/৬) ; জিন-এর রাসায়নিক গঠন ও বংশগতিতে এর ভূমিকা (৫/১) ;
- শাহেদ সোহরাওয়ার্দী— সমাজ সচেতনতা ও লেখকের ওপর তার প্রভাব (৪/১) ;
- সত্যেন সেন— ভাওয়ালী আন্দোলনের নেতা জয়চন্দ্র সরকার (১/১১-১২) ;
- সাজ্জাদুর রশীদ— 'বাংলা সাহিত্যের চর্চায় মুসলমান' (৩/২) ;
- সাজেদুল করীম— রম্যসাহিত্য নামকরণ প্রসঙ্গে (১/৫-৬) ;
- সাদেক খান— তরুণশিল্পী সম্প্রদায়ের রোজ নামচার এক অধ্যায় (১/৭-৮) ;
- সন্‌জিদা খাতুন — সত্যেন্দ্রনাথ (১/৯ ; ১২/৪-৬) ;
- শাহেদ কামাল— আমাদের কাল ও তার সঙ্গীত (১১/৭-৯) ; প্রতিভা এবং ক্রমবিস্মরণ (বুলবুল চৌধুরী, ১৩/২) ;
- সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী— ব্যঙ্গ ও রম্য রচনা (১/৫-৬) ; নজরুল ইসলামের কবিতা (১/১০) ; মোতাহের হোসেন চৌধুরী (২/২) ;
- সানাউল হক— শাড়ী (১/৭-৮) ; কাক (১/৯) ; সেতার ১/১১-১২) ; সমঝদার (২/৪) ; বন্দর থেকে বন্দরে (২/১২ ও অন্যান্যে ক্রমশ) ; মিল ও অমিল (৪/১০) ; ডায়রীর কয়টি পাতা (৬/১) ; স্ত্রী (৬/৪) ; পরচর্চা (৭/২) ; বরিস পাস্তারনাক : তাঁর কবিতা (৮/১) ; কান্না (১১/১-৩) ; মোহসেন, আমি ও পাঁচটি পাখি (১১/৪-৬) ; আমার বন্ধুরা (১১/১০-১২) ; সাপ (১২/১০-১২) ; টান টানা ও টানি (১৩/২) ;
- শামসুল হুদা আল কাজী— এশিয়ার জনবৃদ্ধি এবং খাদ্য সংকট (৬/১১) ;
- সাইদুর রহমান— প্রগতির দর্শন (৭/৩-৪) ;
- সাইদা সফিনাজ— পাঠকের প্রতিক্রিয়া (১০/৩-৫) ;
- সারওয়ার হোসেন— মানুষের নামে (৮/৩) ;
- সিকান্দার আবু জাফর— হালখাতা (৩/৯) ;
- সাইয়েদ আবদুল হাই— বিধেয়কের শ্রেণীবিভাগে একটি নূতন পরিকল্পনা (৪/১২) ;
- সৈয়দ জাহাঙ্গীর— সমকালীন আমেরিকার চিত্রকলা (১/১১-১২) ; 'সমকালের' প্রচ্ছদচিত্র (৩/১) ; শিল্পপ্রদর্শনী ও শিল্পী (৩/৩) ;
- সৈয়দ আলী আহসান— মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ চরিত্রের পূর্ণতা (৪/৭) ; মেঘনাদবধকাব্যে উপমা (৪/৮) ; সাহিত্যে পূর্বসূরী (৫/১২) ; পদ্মাবতীর উপাখ্যান (৬/৩) ; জায়সী ও আলাওল (৬/৪ থেকে ক্রমশ) ; মধুমালতী একটি ফারসী পুঁথি (১২/১০-১২) ;
- সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন— রবীন্দ্রনাথ ও পূর্বপাকিস্তান (৪/৯) ;
- সৈয়দ নুরুদ্দিন— রবীন্দ্রনাথ (৪/৯) ;
- সৈয়দ এমদাদ আলী— মোজাম্মেল হক ও রেয়াজউদ্দীন (৫/৯-১১) ;
- সৈয়দ শামসুল হক— যুদ্ধোত্তর ইংরেজী কবিতা ও তার অনিষ্ট (কবিতা সংখ্যা ১৩৭১-৭২) ;
- হাসান হাফিজুর রহমান- আধুনিক কবিতার লক্ষণ (১/৭-৮) ; কবিতার বিষয়বস্তু (২/৩) ; বাংলা কাব্যে মূল্যবোধের বিবর্তন ও রবীন্দ্রনাথ (৪/৯) ; একটি সম্ভাবনা : একটি অপচয় (৪/১০) ; স্বাধীনতা-উত্তর কালের কাব্যপরিস্থিতি (৬/৭) ; আমাদের সাহিত্য : বিভ্রান্তি উৎক্রান্তি (৬/১০) ; সাম্প্রতিক কবিতা : কতিপয় প্রবণতা এবং এ সংক্রান্ত সংকট (৭/১) ; মূল্যবোধের জন্যে (৭/২) ; গোলাম মোস্তফা (৮/২) ; পূর্ব পাকিস্তানের কবিতা : কাব্য বিচার (কবিতা সংখ্যা ১৩৭১-৭২) ; বাঙালি ও বাঙালি সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ (৯/১-৪) ;
- হুমায়ুন আহমেদ— দ্বিতীয়চিন্তা : প্রমীলা নজরুল (৫/১২) ;
- হায়াৎ মামুদ— পাঠকের প্রতিক্রিয়া : আত্মপক্ষ (১০/৩-৫) ;
  চিরজন অসমর্থ কবি (৮/৯-১২)

অনুবাদ ঃ

- আহমদ হাসান দানী— আমাদের শিক্ষা সমস্যা (প্রবন্ধ, অনুবাদ চাকলাদার মাহবুব উল আলম, ১/৪) ; পাকিস্তানে ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা (প্রবন্ধ, অনুবাদ মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন, ১/৭-৮) ; সিপাহী বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য, (অনুবাদকের নাম নেই, ২/১২) ; মধ্যযুগের বাংলায় মুসলিম সমাজ (অনুবাদ মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন, ৩/২) ;
- আয়াজ আসমী— নিমকহারাম (গল্প, অনুবাদ নেয়ামাল বাসির, ১/৭-৮) ;
- আন্তন চেকভ— ডার্লিং (গল্প, অনুবাদ অশোক বড়ুয়া, ২/৫) ; থিয়েটার দেখে এসে (অনুবাদ সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, ২/১২) ;

Dhaka University Institutional Repository

- আর্থার স্নিজলার— অবিবাহিত বন্ধুটির জন্য (গল্প, অনুবাদ অশোক বড়ুয়া, ২/৭) ;
- আলেকজান্ডার লার্নেট হলেনিয়া— মোনালিসা (গল্প, পূর্বোক্ত, ৩/৪) ;
- আইরিন গ্রোনৌস্কি— অস্ট্রেলিয়ার আধুনিক নাটক (প্রবন্ধ, অনুবাদক অনুক্ত, ৬/১) ;
- আলেকজান্ডার ইলিয়ট— সত্যোপলব্ধি (প্রবন্ধ, অনুবাদ ইসমাইল মোহাম্মদ, ৬/২) ;
- আহমদ নদীম কাসমী— ঘর থেকে ঘরে (গল্প, অনুবাদ কাজী মাসুম, ৬/২) ;
- আইভর উইন্টার্স— জে. ভি. কানিংহামের কবিতা (প্রবন্ধ, অনুবাদ ইসমাইল মোহাম্মদ, ৭/২) ;
- আধুনিক সোভিয়েট কবিতা— টাইমস্ লিটারেরি সাপ্লিমেন্ট থেকে অনুবাদ করেন হুমায়ুন আহমেদ, ৭/২) ;
- আবুল আলা আলমা, আরবী— আরবী বন্ধুদের প্রতি (কবিতা, অনুবাদ আবদুস সাত্তার, কবিতা সংখ্যা ১৩৭১-৭২) ;
- আহমদ জাকী আবু শাফী— চিরন্তনী (ঐ) ;
- আর্ল ওয়ারেণ— আন্তর্জাতিক আইন, শান্তির দিকনির্দেশ (প্রবন্ধ, অনুবাদ এ কে এম সিদ্দিকুর রহমান, ১০/১-২) ;
- আলবার্ট আইনস্টাইন— ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং বিজ্ঞান (১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে রচিত, অনুবাদ শওকত ওসমান, ১১/১০-১২) ;
- আবুল কালাম আজাদ মাওলানা— দার্শনিক বিষয়ক পত্রের অনুবাদ (তাজাকলম, ২/১১) ;
- আঁদ্রে মারোয়া— প্রেমকলা (প্রবন্ধ, অনুবাদ চৌধুরী মনজুর মুর্শেদ, ১৩/১) ; Ander Maurois রচিত If lovis XVI had an atom of firmness. অনুবাদক অনুক্ত, ৩/১০) ;
- ইমরাউল কায়েস— এতটা জেনেও আমি (কবিতা , আবদুস সাত্তার, ২/৭ ও অন্যান্য) ;
- ইব্রাহীম শোকরাল্লাহ— মা (গল্প, আরবী থেকে অনুবাদ, আবদুস সাত্তার, ২/১০) ;
- ই. এম. ফরস্টার— শিল্পীর প্রতি সমাজের কর্তব্য (প্রবন্ধ, অনুবাদ আবুল ফজল, ২/১০) ;
- ইউসুফ শারানী— দারাইব গলি (গল্প, অনুবাদ আবদুস সাত্তার, ৩/১) ;
- মুহম্মদ ইকবাল (মহাকবি)— কবিতা (অনুবাদ আবুল হোসেন, ৩/৭) ;
- ইভানগল— প্রেমের কবিতা (ফরাসী থেকে অনুবাদ সৈয়দ আলী আহসান, ৪/৫) ; চারটি প্রেমের কবিতা (অনুবাদ, সানাউল হক, ৯/১-৪) ;
- ই. ই. কামিংস— কবিতা (অনুবাদ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ৬/২) ;
- ইয়েভতুশেংকো— জনতা (কবিতা, অনুবাদক অনুক্ত, ৮/৪) ;
- উইলিয়াম এন. লক— যন্ত্রের সাহায্যে অনুবাদ (বিজ্ঞান বিষয়ক, ২/২ ; অনুবাদক অনুক্ত) ;
- উইলিয়াম শেক্সপীয়ার— ওথেলো (অনুবাদক অনুক্ত, ৪/২ থেকে ক্রমশ) ;
- উইলিয়াম মার্চ— একটি যোগ অঙ্ক (গল্প, অনুবাদ ইসমাইল মোহাম্মদ, ৬/৮) ;
- এলিসন ম্যাকলিয়ড— পাথর ছুঁড়োনা (গল্প, অনুবাদ আনোয়ার জাহিদ, ২/১) ;
- এমিলি জোলা— প্রেমের গল্পের রাত (গল্প, অনুবাদ গোলাম গফুর, ২/৬) ;
- এফ. এইচ. খান (ডঃ)— পূর্ব পাকিস্তান লক্ষ লক্ষ বৎসরে (প্রবন্ধ, অনুবাদ ফরিদউদ্দিন আহমেদ, ৩/১) ;
- এডওয়ার্ড অমাস— চক্ষুবিন্যাস (অনুবাদ : সানাউল হক, ৪/১১) ;
- এডগার এলান পো— কবিতা (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান অনূদিত, ৬/২) ;
- এডনাসেন্ট— কবিতা (ঐ) ;
- এ্যালেন টেড— কবিতা (ঐ) ;
- এলিজাবেথ অনরাইট— নদীতীরের বাড়িটা (গল্প, আবদুল মতিন খান, ৬/৩) ;
- য়েভ জেনি য়েবতুশেংকো— আলোক (কবিতা, অনুবাদ হুমায়ুন আহমেদ, ৬/১০) ;
- ও' হেনরী— জীবনস্বপ্ন (গল্প, অনুবাদ জিয়াউল হক, ১/২) ;
- ওয়াল্ট হুইটম্যান— জন্তরা (কবিতা, অনুবাদ আবদুল কাদির, ৫/১) ; জনৈক নারী অপেক্ষমানা (কবিতা, অনুবাদ সৈয়দ আলী আহসান, ৬/২) ;
- ওমর আবুরীশা— একটি নারী একটি মূর্তি (কবিতা, অনুবাদ আবদুস সাত্তার, কবিতা সংখ্যা ১৩৭১-৭২) ;
- ক্লিনটন এস. বারহামস্ (জুনিয়র, মিচিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি)— দি ওল্ডম্যান এণ্ড দি সী : আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে (প্রবন্ধ, অনুবাদ ইসমাইল মোহাম্মদ ৬/৪) ;
- ক্লেয়ার গল— ইভানকে (কবিতা, অনুবাদ সৈয়দ আলী আশরাফ, ৪/১০) ;
- কৃষণ চন্দর— পারাবাতের পত্র (গল্প, অনুবাদ কাজী মাসুম, ৪/৪) ; পালকী (ঐ, ৪/৮) ; মনকারো মীতা (ঐ, ৫/২) ; দুর্গন্ধে ভরা (ঐ, ৬/৭) ;
- কে. কুটুম্ব রাও— মুক্তি (গল্প, অনুবাদ মোহাম্মদ আজিজুল হক, ৪/৩) ;
- কনরাড আইকেন— কলহ (কবিতা, অনুবাদ আবদুল হক, ৩/১০) ;
- খলিল জীবরান— সমুদ্রের গান (কবিতা, অনুবাদ আবদুস সাত্তার, ১/৯) ; মানবগীতি, (কবিতা, মোহাম্মদ সারওয়ার জাহান, ১০/৩-৫) ;

Dhaka University Institutional Repository

- খাজা আহমদ আব্বাস— চার মন চারপথ (গল্প, অনুবাদ কাজী মাসুম, ৩/৯ থেকে ক্রমশ) ; ডেডলেটার (ঐ, ৫/১২) ; চারগাছি সোনার চুড়ি (ঐ, ৬/১২) ফেরৎ টিকিট (গল্প, অনুবাদ রশীদ আল ফারুকী, ৮/২) ;
- গ্যাই দ্য মোপার্সা— বেচাকেনা (গল্প, অনুবাদ হাসিনা মাহমুদ, ৩/৫) ; সংকট (গল্প, অনুবাদ আবুল হাসানাত, ৪/৬) ; অনুতাপ (ঐ, ৪/১০) ; জুলফাকা (Mononcle Jules এর অনুবাদ এবনে গোলাম সামাদ, ৫/৬-৮) ;
- গীয়োম এ্যাপোলিয়ন— কবিতা (ভূমিকাসহ অনুবাদ মফিজুল আলম, ১০/১-২) ;
- জুল রেনার্দ— কেক (গল্প, অনুবাদ চাকলাদার মাহবুব উল আলম, ১/৫-৬) ;
- জেকভ ওয়াজার ম্যান— অভিসারিকা (গল্প, অনুবাদ অশোক বড়ুয়া, ৩/২) ;
- জে. এ. ফার্গুসন— ক্যাম্পবেল অব কিলমোহর (নাটক, অনুবাদ সিকান্দার আবু জাফর, ৩/৩) ;
- জ্যা জাক রুশো— সমাজসংস্থা (প্রবন্ধ, অনুবাদ নূর মুহম্মদ মিয়া, ৩/৪ থেকে ধারাবাহিক) ;
- জন গলস্‌ওয়ার্দী— বিবেক (প্রবন্ধ, অনুবাদ খোরশেদ আলম, ৩/৭) ;
- জে. সি. স্কোয়ার— J. C. Squir লিখিত If it had been discovered in 1930 that the Bacon realy did Shakespear যদি ১৯৩০ সালে আবিষ্কৃত হত যে বেকনই শেক্সপীয়র (অনুবাদক অনুক্ত, ৩/৭) ;
- জন স্টেইনবেক— বন্যা (গল্প, অনুবাদ সিকান্দার আবু জাফর, ৪/১২) ; সাপ (গল্প, অনুবাদক অনুক্ত ১৩/১) ;
- জেমস্‌ এ. হালবার্ট— আধুনিক লাইব্রেরী সম্পর্কিত সমস্যা, ৪/৬) ;
- জেনিন অবয়ার — রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা (ফরাসী থেকে ইংরেজী জেমস্‌ এ হালবার্ট, ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ হাসান হাফিজুর রহমান, ৪/১২) ;
- জোস দ্য লা কোয়ম্রা — উত্তাপ (গল্প, অনুবাদ আনোয়ার জাহিদ, ৬/১) ;
- জন গ্রীললিদ — কবিতা (অনুবাদ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ৬/২) ;
- জর্জ গারোরী — কবিতা (অনুবাদ হায়াৎ মামুদ, ৬/১১) ;
- জে. এম. সীনজ— সমুদ্রের ডাক (একাঙ্কিকা, অনুবাদক অনুক্ত, ৬/৮) ;
- জর্জ, ডব্লিউ কর্ণার— বিজ্ঞান ও যৌননীতি (অনুবাদ ইসমাইল মোহাম্মদ, ৬/১০) ;
- জেরহার্ড হপ্তমান— 'হ্যানেল' (রূপক নাটক, অনুবাদক পূর্বোক্ত, ৭/৫-৭ ও অন্যান্য ; 'বীভার কোট' (নাটক, অনুবাদক পূর্বোক্ত, ৭/১১-১২ থেকে) ;
- ডি. এইচ. লরেন্স— নগ্ন মনুষ্যত্ব (কবিতা, অনুবাদ সানাউল হক, ৪/১১) ;
- ডন. এ. শাঙ্কে— দক্ষ গুপ্তচরের দশটি অনুজ্ঞা (অনুবাদক অনুক্ত, ৮/২) ;
- নাফিজ আল ইয়াজেজী— ভালবাসা (কবিতা, অনুবাদ আবদুস সাত্তার, কবিতা সংখ্যা ১৩৭১-৭২) ;
- নাজার রাব্বানী— নারীর পাশে (কবিতা, অনুবাদ আবদুস সাত্তার, ২/৫) ;
- পম্পার মেরিমি— মাতিয়ো ফালকনে (প্রবন্ধ, অনুবাদক অনুক্ত, ৭/২ থেকে ক্রমশ) ;
- পার্ল এস. বাক— জন্মতিথি (গল্প অনুবাদ আনোয়ার জাহিদ, ১/৯) ; বুড়ো দৈত্য (অনুবাদক অনুক্ত, ৭/৮-১০) ;
- প্যাট্রিস লুমুম্বা— আফ্রিকার হৃদয়ে সূর্যোদয় (কবিতা, অনুবাদক অনুক্ত, ৪/৭) ;
- ফ্রেডারিক হেওর্লিন— কবিতা (অনুবাদক হায়াৎ মামুদ, ৬/৮) ; কবিতা ও প্রবন্ধ (রুটি এবং মদ অনুবাদ করেন রফিক আজাদ, ৭/৩-৪ ও ৮/১) ;
- ফ্রান্তিসেক হালাল— বৃদ্ধা রমনীরা (কবিতা, অনুবাদক আবদুল গনি হাজারী, ৬/৪) ;
- ফিলিপ্‌ আলফার্ড— ভিখারী (গল্প, অনুবাদক এম. আখলাকুর রহমান ও রওশন আরা রহমান, ৬/১১) ;
- ফ্রাঁসোআ রাবেলা— জিজ্ঞাসা (কবিতা, অনুবাদ সিকান্দার আবু জাফর, ৪/৪) ;
- ব্রুনো সাকি, ডাক্তার— স্পুটনিক (বিজ্ঞান-প্রবন্ধ, অনুবাদক মঈদুল হাসান, ১/৩) ;
- বারনাড রুডভস্কী— কথাশিল্পী (ব্যঙ্গরচনা, অনুবাদ সিকান্দার আবু জাফর, ২/৮) ;
- ব্রেট হার্ট— মিগলস্‌ (গল্প, অনুবাদ পূর্বোক্ত, ৪/১১) ;
- বার্টোল্ড ব্রেখৎ—গ্রন্থদাহ (জার্মান কবি ও নাট্যকারের অনুবাদ শওকত ওসমান, ৬/২) ;
- বরিস পাস্তারন্যাক— কবিতা (অনুবাদক সানাউল হক, ৬/৫-৭) ;
- বার্ণার্ড ম্যালামুড— ধার (গল্প অনুবাদক অনুক্ত, ১১/১-৩) ;
- বার্ট্রাণ্ড রাসেল— সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের পটভূমি (The ways in which culture die' প্রবন্ধের অনুবাদক এ. কে. এম. সিদ্দিকুর রহমান, ১১/৪-৬) ;
- ফেদারিকো গারথিয়া লোরকা— দুটি কবিতা (অনুবাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ৯/১-৪) ;
- ভিন্‌সেন্ট মিলে— কবিতা (অনুবাদক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ৬/২) ;
- ভল্টেয়ার— মানবভাগ্য (কবিতা, অনুবাদক আবুল ফজল, কবিতা সংখ্যা ১৩৭১-৭২) ;
- মিলিটজা পোয়ারস্কায়া— সোবিয়েট নাটমঞ্চে দৃশ্য-পরিকল্পনা (প্রবন্ধ, অনুবাদক ইসমাইল মোহাম্মদ, ৬/১) ;

Dhaka University Institutional Repository

- মাভিস্ হিথ্ মিলার— ক্যাফেতে স্কাণ্ডাল (গল্প, অনুবাদ জহুরুল হক, ৩/১২) ;
- মার্ক টোয়েন— পিটকেয়ার্ণের বিদ্রোহ (গল্প, অনুবাদক অনুক্ত, ২/৪) ;
- ম্যামিন সিবিরিয়াক— উত্তর নেই (গল্প, অনুবাদক অশোক বড়ুয়া, ২/৩) ;
- মালিক আবদুল আজিজ— জালিয়ানওয়ালা বাগের ইতিবৃত্ত (অনুবাদ কাজী মাসুম, ২/১২) ;
- মুন্সী প্রেমচাঁদ— বড়বাবু (গল্প, অনুবাদ : কাজী মাসুম, ৭/৩-৪) ; নষ্ট নীড় (ঐ, ৮/১) ;
- মির্জা মুহম্মদ হাদী রসুয়া— উমরাওজান আদা (উর্দু উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন কাজী মাসুম, ৮/৩ থেকে ক্রমশ) ;
- মাহবুবা— নাম (কবিতা, অনুবাদক আবদুস সাত্তার, কবিতাসংখ্যা ১৩৭১-৭২) ;
- ম্যাক্সিম গোর্কি—সুন্দরী মেয়ে ফ্রান্স (গল্প, অনুবাদ পুর্নেন্দু দস্তিদার (১০/১-২) ;
- মমতাজ শিরীণ — বড়গল্প : একটি ভিন্ন প্রকৃতির শিল্পকর্ম (উর্দু প্রবন্ধের অনুবাদ রশীদ আল ফারুকী, ১২/১-৩) ;
- রবার্ট ই. শেরউড— টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম (গল্প অনুবাদক অনুক্ত, ৭/১১-১২) ;
- রিচার্ড এবর হার্ট — ভ্রান্তিবিলাস (কবিতা, ১১/১-৩) ;
- রবার্ট ফ্রস্ট— কবিতা (আবুল হোসেন একগুচ্ছ কবিতা অনুবাদ করেন ২/৪, ও কবিতা সংখ্যা ১৩৭১-৭২ এ) ; সুনিল কুমার মুখোপাধ্যায় (৬/৯) ; মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ৬/২) ;
- রশিদ রিজভিয়া— কান্নার সায়র (গল্প, অনুবাদক সৈয়দ আবদুস সামাদ, ৩/৬) ;
- লিওটলস্টয়— শয়তানের অনুচর (গল্প, অনুবাদক অনুক্ত, ১/১০) ;
- লি হৌচু— (কবির সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ) কয়েকটি কবিতা (অনুবাদক আহমদ সাত্তার, ৫/৩-৫) ;
- সিগমণ্ড ফ্রয়েড— যুদ্ধ কেনো? (প্রবন্ধ, অনুবাদক : ইসমাইল মোহাম্মদ, ৬/১২) ;
- স্যাজন পার্স—মেরিনা (কবিতা, এলিয়ট থেকে অনুবাদ ফখরুজ্জামান চৌধুরী, ৪/৫) ;
- সারওয়াত আবোযা— শরণাগত (গল্প, অনুবাদক কামালউদ্দিন, ২/১১) ;
- সমারসেট মম— পলায়ন (গল্প, অনুবাদক আনোয়ার জাহিদ, ১/১) ;
- সোফোক্লিস — ইডিপাস ও এন্টিগোনী (ভূমিকাসহ অনুবাদ করেন সৈয়দ আলী আহসান ও মোবাশ্বের আলী, যথাক্রমে ৫/৩-৫ ও ১২/১০-১২ থেকে ক্রমশ);
- সাদত হাসান মান্টো — ধোঁয়া (গল্প, অনুবাদক নেয়ামাল বাসির, ১/৩) ; বাবু গোপীনাথ (গল্প, অনুবাদক অনুক্ত, ৬/১০) ;

(অনুবাদকের নাম নাথাকলেও বুঝা যায় সম্পাদকই অনুবাদ করেন, ২/৯) ;
ন অনুবাদক ইসমাইল মোহাম্মদ, ৮/২) ;
াদক ফকরুজ্জামান চৌধুরী, ১/৩) ;
শোর মুহূর্তে (কবিতা, অনুবাদক আবদুস সাত্তার, ২/৩) ;
। (গল্প, অনুবাদক অশোক বড়ুয়া, ২/৯) ;
, ৪/৪) ;
(গল্প, অনুবাদক রাইসুল জুহালা, ৪/৭) ;
অনুবাদক আবদুল কাদির, ৫/১) ;
বিন (প্রবন্ধ, অনুবাদক অনুক্ত, ৫/২) ;
ী ও ইসলামী সাহিত্য-ঐতিহ্যের প্রভাব (উর্দু থেকে কাজী মাসুম অনূদিত, বাংলা একাডেমীর পঠিত ; ৫/৯-১১) ;
াম্মদ মনিরুজ্জামান, ৬/২) ;

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

না বিভাগটি উন্নত সাহিত্যাদর্শ স্থাপন করে। প্রতিটি আলোচনা-ই
সকল আলোচক যেসব বইয়ের আলোচনা লেখেন, তা নিম্নরূপ ঃ

হক প্রণীত 'নদী ও মানুষের কবিতা' (১/১) ; আহসান হাবীব সম্পাদিত 'বিদেশের সেরা গল্প' (১/৪) ; কাজী মোহাম্মদ (৪/২) ; এম. এ. এইচ. ইসপাহানী প্রণীত 27 Days in chaina (৪/৪) ; আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রণীত 'দৃষ্টিকোণ' (৩/১) ; ... ৮' (৩/৫) ;

- আনিসুজ্জামান— সত্যেন সেন প্রণীত 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী' (১/৯) ; আতোয়ার রহমান প্রণীত 'সাঝের বেলার রূপকথা' (৩/১) ; এণ্ডারসন প্রণীত 'তুষার রাণী' ও তাজাকলম প্রণীত' চেনামানুষের ইতিহাস' (৩/১) ; মুহম্মদ আবদুল হাই প্রণীত 'তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা' (৩/৯) ; আব্বাস উদ্দীনের 'আমার শিল্পীজীবনের কথা' (৩/১০) ; জহুরুল হকের 'মনুবর্ণালী' (৭/৫-৭) ; মোহাম্মদ মোর্তজা প্রণীত 'চরিত্রহানীর অধিকার' (১০/৯-১২) ;
- আবদুল হক— জহুরুল হক প্রণীত 'সাত সাঁতার' (২/১) ; মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ প্রণীত 'জুলেখার মন' (৩/২) ; আবদুস সাত্তার প্রণীত 'বৃষ্টিমুখর' (৩/২)

Dhaka University Institutional Repository

; 'নজরুল সম্ভার' (৪/১১) ; আবু ইসহাক প্রণীত 'মহাপতঙ্গ' ; 'হারেম' (৭/৩-৪) ; আবদুল কাদির সম্পাদিত 'মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী' (৭/৩-৪) ;

- আবদুল মওদুদ— 'সাহিত্য পত্রিকা (২/২) ;
- আবদুল কাদির— চৌধুরী শামসুর রহমান প্রণীত 'পঁচিশ বছর' (৩/১) ;
- আবদুল মতিন খান— আবুল মনসুর আহমদ প্রণীত 'গালিভরের সফরনামা' (৩/৫) ; রাজিয়া খান প্রণীত 'অনুকল্প' (এ. এম. কে. নামে, ৩/৬) ; আবু শাহরিয়ার প্রণীত 'অন্বেষা' (৪/২) ; 'টি বি আজ সারে' (৪/৭) ;
- আল মাহমুদ— আবদুর রশীদ খান প্রণীত 'বন্দীমুহূর্ত' (৫/৯-১১) ; তালিম হোসেন প্রণীত 'শাহীন' (৬/২) ; 'স্পেনীয় ছোট গল্প' (৯/৫-৮) ; সৈয়দ আলী আহসান প্রণীত 'উচ্চারণ' (১২/৭-৯) ;
- আবুল ফজল— ডক্টর সুশীল কুমার গুপ্ত প্রণীত 'নজরুল চরিত মানস' (৪/৬) ; কয়েকটি স্বল্পায়ু সাহিত্যপত্রিকা প্রসঙ্গে (৪/১২) ; সুচরিত চৌধুরী প্রণীত 'আকাশে অনেক ঘযুড়ি' (৫/২) ; অজিত কুমার ভট্টাচার্য প্রণীত 'বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা' (৭/১১-১২) ; আনোয়ার পাশা প্রণীত 'নদী নিঃশেষিত হলে' (৭/১১-১২) ;
- আবদুল কাদের— এম. এ. ওহাব প্রণীত 'দেখে এলাম রাশিয়া' (৫/২) ;
- আবু জাফর শামসুদ্দীন— সৈয়দ আলী আহসান অনূদিত 'হুইটম্যানের কবিতা' (৮/৯-১২) ;
- আনোয়ার পাশা– রশীদ আল ফারুকী প্রণীত 'রুচি ও প্রগতি' (১৩/২) ;
- আবদুল মান্নান সৈয়দ— আলাউদ্দীন আল আজাদ প্রণীত 'ক্ষুধা ও আশা' (৯/১-৪) ; শহীদ আখন্দের 'পান্না হলো সবুজ' (৯/৫-৮) ; বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'আধুনিক কাব্য সংগ্রহ' (৯/৯-১২) ; মোতাহের হোসেন চৌধুরী প্রণীত 'সংস্কৃতি কথা' ও 'সভ্যতা' (১০/১-২) ; সৈয়দ আলী আশরাফ সম্পাদিত' নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়' (১১/১০-১২) ; রনেশ দাস গুপ্ত প্রণীত ' শিল্পীর স্বাধীনতা ১২/১-৩) ; 'কৃষ্ণ থিয়েটার' (১২/১০-১২) ;
- ইসমাইল মোহাম্মদ— নুরুল মোমেন প্রণীত 'নয়া খন্দান' ও মুনীর চৌধুরী রচিত 'রক্তাক্ত প্রান্তর' (৬/১) ; শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' (৬/২) ; কবীর চৌধুরী অনূদিত 'পাঁচটি একাঙ্কিকা' (৬/৩) ; ফররুখ শিয়র প্রণীত 'সামনের পৃথিবী' (৬/৮) ; শিব শংকর মিত্রের গল্প (৬/৯) ; নীলিমা ইব্রাহীম প্রণীত 'শাহী এলাকার পথে পথে' (৬/১১) ; মুমতাজ জাহান বেগম সিদ্দিকী প্রণীত মসউদুর রহমান অনূদিত 'পরিবার গঠনে নারী' (৭/১) ; শাহেদ আলী প্রণীত 'একই সমতলে' ও আবু জাফর শামসুদ্দীন প্রণীত 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' (৭/২) ; রশীদ করীমের 'প্রসন্নপাষাণ' (৭/৫-৭) ; কোতোয়াল প্রণীত ' যা দেখেছি' (৭/৮-১০) ; আবদুল হক প্রণীত 'ক্রান্তিকাল' (৮/১) ; সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী রচিত 'অন্বেষণ' (৮/১) ; শফিউল হক এর 'জনতা জাগে' এবং কামাল আহমেদ প্রণীত 'শরমলাগে' (৮/২) ; সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজউদদৌলা' (৯/১-৪) ; মুহম্মদ সিদ্দিক খান প্রণীত 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা' (৯/৫-৮) ; 'মহাকবি আলাউল' সিকান্দার আবুজাফর প্রণীত (৯/৯-১২) ; আবদুল হক অনূদিত 'পুতুলের সংসার' (১০/৩-৫) ; হাসান আজীজুল হকের 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' (১২/১-৩) ;
- এ. আর— 'কাজের কথা' পরিবার কল্যাণ সেবা সংস্থা প্রকাশিত (৪/১০;
- এবনে গোলাম সামাদ — রাজিয়া মজিদ প্রণীত 'করাচীর চিঠি' (৩/১) ; রূপম চৌধুরী অনূদিত 'বিজ্ঞান বিচিত্রা' (৩/৩) ; ডাঃ এম. এ. করীম প্রণীত 'যৌনবিজ্ঞান বিকৃতি ও চিকিৎসা' (৩/৮) ; 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' (১১/৪-৬) ;
- কাজী দীন মুহম্মদ— মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রণীত 'কবি আলাউল' (৬/৪) ;
- কামালউদ্দীন (খান?)— খানমুহম্মদ মঈনুদ্দীন প্রণীত 'যুগস্রষ্টা নজরুল' (১/১১-১২) ; আবুল ফজলের 'রাঙ্গা প্রভাত' (২/৬) ; দৌলতুন্নেসা খাতুন প্রণীত 'পথের পরশ' (২/৯) ; আতাহার আহমদ প্রণীত 'উন্মোচন' (২/১২) ; পূর্বোক্ত লেখকের 'সূর্যের নীচে' (৩/৫) ; মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ প্রণীত 'নবীগৃহ সংবাদ' ও 'কারবালা' (৩/১২) ; খানবাহাদুর আবদুল হাকিম প্রণীত 'সার্থক শিক্ষা' (৪/২) ; তাজাকলম অনূদিত কয়েকটি বই (৪/৮) ; বযলুর রহমান প্রণীত 'তওহীদ' (৪/১০) ; বযলুর রহমান প্রণীত 'জিজ্ঞাসা' (১১/১-৩) ; আহমদ শরীফ প্রণীত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা' (১৩/২) ;
- খাদুরাব্বি— মীর আবুল হোসেন প্রণীত 'নজরুল সাহিত্য' (৩/১১) ; 'পূর্বমেঘ' এবং 'সাহিত্যপত্র' (৩/১২) ; 'সাম্প্রতিক কবিতা কতিপয় প্রবণতা এবং এসংক্রান্ত সংকট' (৭/৩-৪) ; বদরুদ্দিন উমর প্রণীত 'সাম্প্রদায়িকতা' (১০/১-২) ;
- চাকলাদার মাহবুব উল আলম— আহমদ হাসান দানী রচিত ইংরেজী বই 'ঢাকা' (১/১) ; নাজমুল করীম প্রণীত Changing society in India & Pakistan (১/২) ;
- জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত— আলাউদ্দীন আল আজাদ প্রণীত 'কর্ণফুলী (৬/১২);
- জাহানারা হাকিম— নুরুল ইসলাম খান প্রণীত 'মেহের জুলেখা (৮/৯-১২); নাজমুল আলম প্রণীত 'একটি অচল আনি' (১০/৬-৮); আবদুল হক প্রণীত 'রোকেয়ার নিজের বাড়ী' (১০/৯-১২);
- নারায়ণ চৌধুরী — আবুল ফজল প্রণীত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতিসাধনা' (৫/৩-৫);
- ফজল হাসান ইউসুফ— ৫টি বার্ষিকীর আলোচনা (২/৮);
- ফখরুজ্জামান চৌধুরী — দেবব্রত মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'ধারা থেকে মধু' (২/৯); 'বিশ্বত্রাস চেঙ্গিস খান' (৩/৩); Helen Keller প্রণীত The story of my life; জসীমউদ্দীন প্রণীত 'ডালিম কুমার' মাহমুদ মোকাররম হোসেন প্রণীত 'সূর্য স্বপ্ন (৪/৬); 'বাণ ও 'ক্ষীয়মান' (৪/৮);

Dhaka University Institutional Repository

- বুলবুল ওসমান— আবদুর রহমান প্রণীত 'খোলা মন' (৭/৮–১০); 'আধুনিক চিন্তাধারা' আবুল কাসেম প্রণীত (৮/৪); ফররুখ আহমদ প্রণীত 'পাখির গান' (১০/১–২); সন্‌জিদা খাতুন ও আবদুল গাফফার চৌধুরী সম্পাদিত (আহমেদুর রহমানের) স্মরণ (১০/৩–৫); আবু জাফর শামসুদ্দীন প্রণীত 'শেষ রাত্রির তারা' (১০/৯–১২);
- বেনামী —বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের 'অবিচ্ছিন্ন ' (৪/১);
- বদরুল হাসান— মোহাম্মদ ঈমানুদ্দীন অনূদিত 'হারবেনী' (৩/৪);
- বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর— ইবনে রশীদ প্রণীত 'ফালগুনকরা' (৩/২); মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা প্রণীত 'পসারিণী' (৩/৯); শওকত ওসমান প্রণীত 'জননী' (৪/১১); আবদুল কাদির প্রণীত 'উত্তর বসন্ত' (১১/১–৩); পূর্বোক্ত লেখকের 'নেত্রপথ' (১১/৪–৬); আবদুর রশীদ খান প্রণীত 'মহুয়া' (১১/৭–৯); জ্যোতিপ্রকাশ দত্তর 'দুর্বিনীত কাল' ও 'বহেনা সুবাতাস' (১২/১০–১২);
- মাহবুব-জামিল— Sociology and Social Research in Pakistan মোহাম্মদ আফসারউদ্দীন সম্পাদিত (৯/৫–৮);
- মেজবাহ উদ্দীন আহমেদ— 'বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন' প্রসঙ্গে (২/৪);
- মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান— সন্‌জিদা খাতুনের 'কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' (২/৫); সৈয়দ আলী আশরাফ প্রণীত 'চৈত্র যখন' (২/৮); অজিত স্যান্নাল প্রণীত 'দুই দেশ দুই মন'। শওকত ওসমান প্রণীত 'তারা দুইজন'; আহমেদুর রহমান অনূদিত ওয়াল্টার লর্ড প্রণীত 'তরঙ্গ নীলরাত্রি' (২/১০); জামসেদ ফয়েজী প্রণীত 'শিলালিপি'; আবুল হোসেন চৌধুরী অনূদিত জ্যাকলণ্ডন প্রণীত 'অরণ্যের ডাক' (২/১২); মুহম্মদ আবদুল হাই অনূদিত 'ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান' (৩/২); 'মিলিত সংসার'; 'অভ্যুদয় দাওয়াল'; 'ফুলকলি' (৫/১); 'পূর্বলেখ' (১০/৩–৫);
- মুহম্মদ আবদুল হাই — কাজী আবদুল ওদুদ প্রণীত 'নদীবক্ষে' (৩/১);
- মুনীর চৌধুরী— আবদুল গাফফার চৌধুরী প্রণীত'সম্রাটের ছবি' (৩/৪);
- মনিরুজ্জামান — আতাউর রহমান প্রণীত 'কবি নজরুল' (১১/৭–৯);
- মহাদেব সাহা — দিলওয়ার হোসেন প্রণীত 'দ্বিতীয় সূর্য শুক্লপক্ষের' (১৩/১);
- রফিকুল ইসলাম — পূর্ব পাকিস্তানের সমকালীন মঞ্চ ও নাটকাভিনয় (২/৩); 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (৪/৫);
- রশীদ আল ফারুকী — 'হাতেমতায়ী' (১০/৬–৮); বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১২/৪–৬);
- রনেশ দাসগুপ্ত — 'সম্ভবা অনন্যা' (৬/১০); শহীদুল্লাহ কায়সারের 'রাজবন্দীর রোজনামচা' (৬/১);
- শাহাবুদ্দীন আহমদ — মযহারুল ইসলাম প্রণীত 'বিচ্ছিন্ন প্রতিলিপি' ও 'আর্তনাদে বিবর্ণ' (১৩/৩–১২);
- সরদার ফজলুল করিম — মমতাজুর রহমান তরফদার প্রণীত 'ইতিহাসের দর্শন' (১৩/২);
- শওকত ওসমান — নবোকভ প্রণীত লোলিটা (৩/৭); Arthur Knight প্রণীত 'The liveliet Art' (৩/১১); ইলিয়াস ফারুক প্রণীত 'Nothingness (৬/১০); আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রণীত 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' (১০/৬–৮);
- শওকত আলী – আবুল হাসান শামসুদ্দীন প্রণীত' মুখর প্রান্তর' (৫/৯–১১); আসকার ইবনে শাইখ প্রণীত 'রক্তপদ্ম' (৫/১২);
- সন্‌জিদা খাতুন — সত্যেন সেন প্রণীত 'রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ' (৮/৯–১২); হালিমা খাতুন প্রণীত 'সোনা পুতুলের বিয়ে' (১০/৩–৫); বুলবুল ওসমানের 'কানা মামা' (১০/৬–৮);
- সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী — সৈয়দ আলী আশরাফ প্রণীত 'কাব্যপরিচয়' (১/২); তালিম হোসেন প্রণীত 'দিশারী' (১/৩); প্রেম পরিবার ও সুখী জীবন Plutarch : Selected essays on love, the family and the good life. A new translation by Moses Hades (১/৭–৮); মঈদুর রহমান প্রণীত 'ময়ূরের পা' (২/৭);
- সাইয়িদ আতীকুল্লাহ — মুহম্মদ আবদুল হাই প্রণীত 'বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন' (২/৩);
- সেবাব্রত চৌধুরী — সৈয়দ আলী আহসান ও সৈয়দ আলী আশরাফ অনূদিত ক্লেয়ারগল ও ইভানগল এর 'প্রেমের কবিতা' (৬/৫–৭);
- হাসান আজিজুল হক — জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত প্রণীত 'দুর্বিনীতকাল' (১০/৩–৫);

- হাসান হাফিজুর রহমান — আবদুল গনি হাজারী প্রণীত, 'সামান্য ধন' (২/১১) 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' (৪/১১); 'কন্যাকুমারী' ও 'উত্তমপুরুষ' (৪/১২); অপুর সংসার (চিত্রসমালোচনা) (৫/১); হাবীবুর রহমান প্রণীত 'উপান্ত' (৫/৬–৮);

Dhaka University Institutional Repository

গ সমকাল নিয়মিত প্রকাশিত হয়নি, খুব দীর্ঘসময় ধরেও চলেনি। আগষ্ট ১৯৫৭ (ভাদ্র ১৩৬৪)তে প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা এবং ত্রয়োদশ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৭৭ এ প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যা প্রকাশের কথা ছিল ১৯৭০ সনের আগস্ট মাসে। কিন্তু চিরাচরিত অনিয়মের নিয়মে ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার কিছু পূর্বে এটি বের হয়। এরপরে চতুর্দশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা যন্ত্রস্থ অবস্থায় সিকান্দার আবু জাফর প্রাণভয়ে ভারত গমন করলে আর প্রকাশিত হয়নি। এই অপ্রকাশিত সংখ্যা সম্পর্কে আবদুল হক লিখেছেন ঃ বেনামীতে লেখার পরামর্শ পেয়ে বছর তিনেক ছেড়ে দিয়েছিলাম — 'কিন্তু সত্তর সালে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম। .... তাই সাতষট্টির সেই হয়রানী সত্ত্বেও জাফর সাহেব সত্তরের শেষপ্রান্তে আমার আরেকটি বেনামী প্রবন্ধ ছাপতে সম্মত হয়েছিলেন। সেটি মুদ্রিত হয়েও প্রকাশিত হলোনা, 'সমকাল'-এর সেই অপ্রকাশিত সংখ্যার কথা না লিখলে কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অপ্রকাশিত সংখ্যাটি হচ্ছে 'চতুর্দশ বর্ষ ১ম-৭ম সংখ্যা, ১৩৭৭'। অর্থাৎ যথারীতি সেই অনিয়ম, তার ফলে যুক্ত সংখ্যা। প্রথম ৩২ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হয়েছিল, ৩৩-৩৪ পৃষ্ঠা ছিল কম্পোজ-কৃত অবস্থায়। ১ থেকে ৩৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত একটি মাত্র প্রবন্ধ শিরোনাম 'ইসলামী রাষ্ট্র : কল্পনা ও বাস্তব'। পরবর্তী দু' পৃষ্ঠায় 'স্বীকারোক্তি' নামে একটি ছোট লেখা। .... সুদীর্ঘ প্রথম প্রবন্ধটি তিনচার কিস্তিতে ছাপানো যেত, তবু জাফর সাহেব একটিমাত্র সংখ্যায় প্রকাশ করতে সম্মত হয়েছিলেন, তার ইতিহাসটি এই : তাঁকে বলেছিলাম প্রথম কিস্তি মুদ্রিত হওয়ার পরেই পত্রিকা নিষিদ্ধ হয়ে যেতে পারে, অথবা অন্য রকম হয়রানি শুরু হতে পারে, তাহলে অনেক কথাই অকথিত থেকে যাবে। যদি তাই হয়, তাহলে একটিমাত্র সংখ্যায় সম্পূর্ণ প্রবন্ধটা প্রকাশিত হওয়া ভালো। তারপর যাই ঘটুক, প্রবন্ধটি অন্তত পাঠকদের কাছে গিয়ে পৌছুবে। তিনি এই যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন। গোটা প্রবন্ধটাই একটি মাত্র সংখ্যায় ছেপেছিলেন। একাত্তরের পঁচিশে মার্চে খবর পেলাম এটি ছাপা শেষ হয়েছে। সংখ্যাটি যদি তার আগেই বেরিয়ে যেত তাহলে একাত্তরে কি কি ঘটতে পারতো তা শুধু অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু বেরোয়নি। তারপর সেই রক্তাক্ত নয় মাস। জাফর সাহেব কোলকাতা চলে গিয়েছিলেন ; .... তারপর বাহাত্তরের মাঝামাঝিতে অকস্মাৎ সাক্ষাৎ। তখন পাকিস্তান নেই, তার রাষ্ট্রনীতিও নেই, প্রবন্ধটি অতএব অবান্তর। তবু ঐ প্রবন্ধ নিয়েই তিনি 'সমকাল' প্রকাশের ইচ্ছা জ্ঞাপন করলেন, কেননা তার একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। প্রবন্ধটি আবু রায়হান ছদ্মনামে মুদ্রিত হয়েছিল .... কিন্তু পত্রিকা আর বেরোলোনা। দেড় বছর পর তিয়াত্তরের নভেম্বরে একদিন ছাপানো এবং কম্পোজ করা পৃষ্ঠাগুলি নিয়ে এসেছিলাম। 'সমকাল' পুনরায় প্রকাশের সম্ভাবনা তখন সামান্য। .... সেদিন তিনি অবশ্য চুয়াত্তরের মার্চের দিকে পত্রিকা পুন ঃ প্রকাশের একটা ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন। 'সমকাল' আর বেরোবেনা, একথা তিনি ভাবতে পারছিলেন না। বাংলাদেশের তৎকালীন পরিস্থিতিতে 'সমকাল'-এ কি ধরনের লেখা প্রকাশিত হওয়া উচিত তাই নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছিল। এর কিছুদিন আগে একটা চিঠিতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'সমকাল'-এ না লিখতে পারি, 'সমকাল'কে নিয়ে তো লিখতে পারি? কিন্তু এ ব্যাপারে বোধ হয় তাঁর কোনো সংশয় ছিলনা। তিনি পুনরায় পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প জ্ঞাপন করে ৫ই অক্টোবর ('৭৪) একটা ছাপানো চিঠি বিলি করেছিলেন এবং এ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার জন্য ১০ই অক্টোবর পাবলিক লাইব্রেরী মিলায়তনে লেখক ও শিল্পীদের একটা সম্মেলনেরও আয়োজন করেছিলেন। ঐ সম্মেলনে আমি যেতে পারিনি। ভরসা ছিল হয়তো আবার পত্রিকা প্রকাশিত হবে। কিন্তু তা আর হয়নি। 'সমকাল'এ লেখার দিন সমাপ্ত : এখন 'সমকাল'-কে নিয়েই আমরা লিখছি, কেননা 'সমকাল' আজ ইতিহাস, এবং 'সমকাল'- এর স্রষ্টাও তাই।'[৭০]

পূর্বমেঘের অন্যতর সম্পাদক প্রফেসর মুস্তাফা নূরউল ইসলাম লিখেছেন : উনিশ শো বাহাত্তুরের দিকে, ... সন্ধ্যের সময় 'সমকাল' অফিসে গিয়েছি। দেখি, ম্লান আলোকিত ঘরে জাফর ভাই একা বসে রয়েছেন। চাদ্দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হল, এ একটা নির্বাসিত এলাকা। আসবাবপত্র জীর্ণ, প্রেসের যন্ত্রপাতি নীরব, কেমন নির্জনতা, এখানকার সবকিছু যেন চুরি হয়ে গিয়েছে। বিষন্নভাবে হাসলেন জাফর ভাই। ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, আয়। তারপর ঝালমুড়ি আনালেন, চা-পান আনালেন। আমরা 'সমকাল' নিয়ে আলাপ করলাম। বললাম, আবার 'সমকাল' বার করুন। আমরা রয়েছি, খেটে দেব। তিনি বললেন, না, ও আর হয়না। দ্বিতীয়বার হয়না।[৭১]

সমকাল প্রথমে বের হয় ১৩ অভয় দাস লেন থেকে ; মুদ্রণালয় : আল হেলাল প্রেস। প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক সিকানদার আবু জাফর। চার সংখ্যা আল হেলাল প্রেস থেকে ছাপা হয়। 'সমকাল প্রকাশনী' থেকে প্রকাশের কথা লেখা হয়েছে ১ বর্ষ ৩ সংখ্যা থেকে। ১ বর্ষ ৫-৬ (যুগ্ম, পৌষ-মাঘ ১৩৬৪) সংখ্যা থেকে আল হেলাল প্রেস পাল্টে যায়। দি বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩/৪ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ২ বর্ষ ১ সংখ্যা থেকে ৩য়— ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক ১৩৬৫ সংখ্যা ছাপা হয়েছে ২ রমাকান্ত নন্দী লেনস্থ পাইওনিয়ার প্রেস থেকে। 'সমকাল মুদ্রায়ণ' থেকে মুদ্রিত হতে শুরু করে ২ বর্ষ ৪ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৬৫ থেকে। ঠিকানা ১৩ অভয় দাস লেন। ৩ বর্ষ ৭ সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৬৬ থেকে সমকাল মুদ্রায়ণের ঠিকানা পাল্টে মতিঝিল রোড, ঢাকা-২ হয়। ১৯৬২-র ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল, ১৩৬৮র মাঘ-চৈত্র; ৫ বর্ষ ৬-৮ সংখ্যায় সমকালে ঠিকানা পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। পরিবর্তিত ঠিকানা ৩৬ এ টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা-২। এই ঠিকানাই পরে পাল্টে এখনকার ৭, ডি.আই.টি এভেনিউ হয়। ১৯৭৫ পর্যন্ত সমকাল মুদ্রায়ণ ওখানেই ছিল। এটি ছিল, সমকালের জন্য সরকার থেকে কেনা জমিতে স্থাপিত প্রকাশনালয়। যা হোক, হাসান হাফিজুর রহমানের নাম সহযোগী সম্পাদক হিসেবে ১ বর্ষ ১ সংখ্যা থেকে ৩ বর্ষ, ১ সংখ্যা পর্যন্ত ছাপা হয়। ১৯৭৭ সনে নব পর্যায়ের 'সমকাল' এর প্রথমার্ধে তাঁর নাম সম্পাদক হিসেবে ছাপা হয়। আত্মিক সম্পর্ক সমকালের সঙ্গে তাঁর আগাগোড়া ছিল একথা নিশ্চিত করেই তাই বলা যায়।

সমকাল সিকানদার আবু জাফরের সম্পানায় ১৩ বছরে মোট ৯১ টি পুস্তিকা বের হয়েছিল। প্রথম বর্ষে ৯টি (১ বর্ষ ৫-৬, ৭-৮, ১১-১২ যুগ্ম) + দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে ১২ টি করে নিয়মিত ৩৬ টি + পঞ্চম বৎসরে ৬টি (৫ বর্ষ ৩-৫; ৬-৮, ৯-১১ যুগ্ম) + ষষ্ঠ বর্ষে ১০টি (৬ বর্ষ ৫-৭ যুগ্ম) + অষ্টম বর্ষে ৬টি (এই বছরে ১ থেকে ৪ সংখ্যা নিয়মিত বের হয়, এ বছরই 'কবিতা সংখ্যা ১৩৭১-৭২' প্রকাশিত হয়, ৫, ৬, ৭ ও ৮ সংখ্যা একত্রে গণ্য করে। এরপর ৯-১২ সংখ্যা বৈশাখ-শ্রাবণ ৪ মাস কভার করে প্রকাশিত হয়। এখানে অসংগতি হচ্ছে ১৩৭২ সনের বৈশাখ মাসের হিসাব

Dhaka University Institutional Repository

কবিতা সংখ্যায় ধরা হয়, কিন্তু বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৭২ সংখ্যা বের হয়। হয়তো ধারণা ছিল ৭২ সনের কিয়দংশ এতে চলে যাবে) + নবম বর্ষে ৩টি (৯ বর্ষ ১-৪; ৫-৮; ৯-১২ যুগ্ম) + দশম বর্ষে ৪টি (১০ বর্ষ ১-২; ৩-৫; ৬-৮; ৯-১২ যুগ্ম) + একাদশ বর্ষে ৪টি (১১ বর্ষ ১-৩; ৪-৬; ৭-৯; ১০-১২ যুগ্ম) + দ্বাদশ বর্ষে ৪টি (১২ বর্ষ ১-৩; ৪-৬; ৭-৯; ১০-১২ যুগ্ম) + ত্রয়োদশ বর্ষে ৩ টি (১৩ বর্ষ ৩-১২ যুগ্ম; ১ ও ২ সংখ্যা নিয়মিত বের হয়) = মোট ৯১ টি। সমকাল ১৮ বর্ষ নবপর্যায়ের প্রথম সংখ্যা প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের মৃত্যুর পর ১৯৭৫ এর পর মাঘ ১৩৮২ তে প্রকাশিত হলে প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সিকান্‌দার আবু জাফরের নাম শীর্ষে মুদ্রিত হয়। সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান জানান ডিক্লিয়ারেশন সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ঘোষণা অনুযায়ী সমকাল বের হয়নি। পৌষ ১৩৮৩ পর্যন্ত তাঁর সম্পাদনায় ১২ টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তাঁর সম্পাদনায় ১৯শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা আষাঢ় ১৩৮৪ পর্যন্ত নিয়মিত বের হয়। অতপর 'বিশেষ সংখ্যা' বের হয় শ্রাবণ ১৩৮৪ তে। এই সংখ্যায় প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সিকানদার আবু জাফর, সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি আবু জাফর শামসুদ্দীন এবং সম্পাদক হিসেবে ইসমাইল মোহাম্মদ এর নাম ছাপা হয়। এভাবে ১৯ বর্ষ ১২ সংখ্যা পৌষ ১৩৮৪তে বের হয়। তখন এর দাম ছিল তিনটাকা, সাদা কাগজ। প্রথমে এর দাম ছিল আট আনা, পরে দশআনা এবং তারও পরে একটাকা হয়েছিল। দ্বিতীয় বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যায় 'সমকাল সম্পর্কে জ্ঞাতব্য'তে বলা হয়— 'সমকাল প্রতি ইংরেজী মাসের ২ তারিখে প্রকাশিত হয়। এজেন্ট এবং গ্রাহকদের কাগজ পাঠানো হয় ২ থেকে ৫ তারিখের ভেতর। এই হিসাবে নির্ধারিত সময়ে কাগজ না পেলে ডাক-বিভাগ এবং আমাদের কাছে অভিযোগ জানানো দরকার। বার্ষিক চাঁদার হার ছয় টাকা। ষান্মাসিক সাড়ে তিন টাকা। যে কোন মাস থেকে গ্রাহক হওয়া চলে। ডাক-ব্যয় লাগেনা। কিন্তু ভি. পি. খরচ গ্রাহকদের দিতে হয়। কাজেই চাঁদার টাকা মনিঅর্ডারে অগ্রিম পাঠানো ভালো। নমুনা সংখ্যার জন্যে দশ আনার ডাক টিকেট পাঠাতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রাহকদের জন্য সমকালের চাঁদার হার বার্ষিক আট টাকা। .... নমুনা সংখ্যা পাঠানো হয়না। ডাকটিকিট থাকলে যে কোন লেখা সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মতামত জানানো হয়। লেখা পাবার তিন সপ্তাহের ভেতর ডাকটিকিট না পেলে অমনোনীত লেখা দু মাস পরে নষ্ট করে ফেলা হয়।' সমকালের প্রতি সংখ্যা নতুন নতুন প্রচ্ছদে শোভিত হতো। শিল্পী ছিলেন দেবদাস চক্রবর্তী, এ. মুকতাদির, কাইউম চৌধুরী, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, রশীদ চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, আবদুল বাসেত এবং আমিনুল ইসলাম, কামরুল হাসান, সৈয়দ জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

ঘ সমকালের বিষয়বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়, এবং এই পত্রিকাটি সামনে রেখেই উচ্চারণ করা যায় : 'একটি জাতির সর্বাঙ্গীন জীবনসাধনা বহুমুখী— অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত পর্যন্ত, সামরিক কর্মকাণ্ড থেকে ললিতকলার চর্চা পর্যন্ত তা ব্যাপ্ত। সাহিত্য সাধনা এই বহুমুখী বহুব্যাপ্ত সার্বিক কর্মধারারই একটি অংশমাত্র। তবে সাহিত্যের পরিধিও সর্বব্যাপী ; .... জীবন জগতের সকল বিষয়ই সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে। একটি জাতির সাহিত্যের সুস্থ বিকাশ ও পূর্ণ স্ফূর্তির অপরিহার্য শর্ত হিসাবে দরকার সেই জাতির সার্বিক জীবনানুশীলনের অভিজ্ঞতা, এবং সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি সর্বমুখী জ্ঞানের গভীরতর অনুশীলন। বলাবাহুল্য যে সমাজে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি মানবিক জ্ঞানের সকল শাখার পর্যাপ্ত চর্চা নেই, নেই জ্ঞানচর্চার সঙ্গে উন্নত জীবন ও উন্নত সমাজ গঠনের বাস্তব কর্মের যোগ, সে-সমাজে সাহিত্য কখনও পুষ্টি ও স্ফূর্তি লাভ করতে পারেনা। সাহিত্য জীবন ও সমাজের সঙ্গে যেমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত, তেমনি যুক্ত সর্ব প্রকার মানবিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সঙ্গেও। এজন্যই সাহিত্যবিচারের পটভূমি হিসাবে জ্ঞানানুশীলনের ধারাও অবশ্য বিবেচ্য। এই বিবেচনার অভাবে সাহিত্যের আলোচনা হয়ে পড়ে তাৎপর্যহীন এবং সাহিত্য হয় ক্ষীণপ্রাণ, বিবর্ণ, ফ্যাকাশে।'[৭২]

প্রচ্ছদের ব্যাপারে তাঁরা এতই সচেতন ছিলেন যে সমকালের প্রচ্ছদ নিয়েও সমকালে আলোচনা প্রকাশ পেয়েছে। উদ্ধৃতি ব্যবহার কলা, গোয়েন্দা বিভাগের লোকেদের জন্য মাননীয় অনুজ্ঞা, যৌনবিজ্ঞান, স্থাপত্য, শিল্পকলা, সিনেমা, নাটক, সঙ্গীত, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রাদর্শ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সাহিত্য ও চিন্তাধারার ঐতিহ্য বা বিবর্তনের ইতিহাস, এক কথায় জাতি গঠনের জন্য আবশ্যকীয় সকল বিষয়ই সিকানদার আবু জাফর সমকালে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। আবদুল হকও মন্তব্য করেছেন ঃ 'এটা কোনক্রমেই দক্ষিণপন্থী পত্রিকা ছিল না', আবার 'বামপন্থী সাহিত্যপত্রও তাকে বলা চলেনা। .... অবরুদ্ধ মানসিকতা মুক্ত লেখক ও পাঠকসমাজের পত্রিকা ছিল ... বিশুদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা করার ইচ্ছা ... ছিলনা, বাংলাদেশীয় মানসের সামগ্রিক স্ফুরণ ছিল তাঁর লক্ষ্য। সমাজজীবনের বহু বিস্তীর্ণ দিগন্তকে তিনি এর সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন।' প্রথম বর্ষের একাদশ দ্বাদশ সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই বিস্তৃত দৃষ্টিপাতের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছিল। 'সাহিত্যের মাধ্যমে গৃহ এবং রাস্তানির্মাণ, শহর পরিকল্পনা, নদী সম্পদ, বিদ্যুৎশক্তি, জনস্বাস্থ্য এবং এই ধরনের আরও বহু বিষয়ে লেখা জোগাড় করার চেষ্টা তিনি করেছিলেন, 'ইঞ্জিনিয়ার' আর্কিটেক্ট, চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানবান' ব্যক্তিবর্গ বাংলায় যদি লিখতে না-ই পারেন, তবু তাঁরা অন্তত ইংরেজীতে লিখুন, 'ভাষান্তরিত করব আমরা' : এমনি ব্যাপক উদ্যোগ ছিল সম্পাদকের। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের সূচনা, সম্পাদকীয়-বক্তব্য স্মরণে চলে আসে। কিন্তু কালের চাহিদা মেটাতে সমকাল নিতান্তই মৌলিক চিন্তা ও কর্ম ছিল। বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করলে বলতে হয়, কিছু বিস্তৃত অর্থে সামাজিক প্রয়োজনের সকল দিকই সংস্কৃতিপ্রয়াসের অঙ্গ। কিন্তু এউদ্যোগ পুরোমাত্রায় সফল হয়নি। 'প্রতিশ্রুতি দিয়েও প্রায়শ: কেউ কথা রাখেননি। এই জ্ঞানী ব্যক্তিবৃন্দ 'কতকগুলি উচ্চকণ্ঠ বাক্‌যন্ত্র মাত্র'— এই মন্তব্য ঐ সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। 'সঙ্গীত এবং শিল্পকলা সম্পর্কিত কোনো পত্রিকা তখন ছিলনা, এখনও নেই, এই দুটি বিষয়েও নিয়মিত আলোচনা তিনি ছাপতে পেরেছিলেন, কিন্তু এক্ষেত্রেও যথেষ্ট সাড়া পাননি।'

'সমকাল এর ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধে আবদুল হক লিখেছেন : 'বিশুদ্ধ সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বাংলা ভাষার প্রকাশন ও ধারন ক্ষমতাকে তিনি সমাজের যাবতীয় মৌলিক দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিদ্যা অবধি ব্যপ্ত করতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে সাফল্য আসেনি, তবে 'সমকাল'-এর মূল ভূমিকা — এদেশে কবিতা প্রবন্ধ কথাসাহিত্য সমালোচনার অপরিমেয় সম্ভাবনা আবিষ্কার — এতটা আর কোন পত্রিকা করেনি। সাহিত্যের এই সব বিভাগের কথা সাহিত্য হিসাবেই লেখা হবে, তবে পত্রিকা হিসাবে সমকাল এর একটি ভূমিকা এখানে উল্লেখ করা উচিত — সেটি হচ্ছে সমালোচনা। 'প্রবাসী', 'সওগাত' এবং আরো অনেক প্রবীণ পত্রিকা এক্ষেত্রে যা দিয়েছে তা হচ্ছে শুধ গ্রন্থ-পরিচয় 'পরিচয়' (পঞ্চাশের কিছু অংশ

Dhaka University Institutional Repository

অবধি), 'কবিতা' এবং 'চতুরঙ্গ' দিয়েছে গ্রন্থ-সমালোচনা, যা-সাহিত্য সমালোচনারই অন্তর্গত। ইংলণ্ডে টি. এস. এলিয়টের সম্পাদনায় 'ক্রাইটেরিয়ান', এফ. আর লিভিসের সম্পাদনায় 'স্ক্রুটিনি' এবং ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় আরও অনেক অভিজাত সাহিত্যপত্রিকা অনেক বছর আগেই এরূপ সমালোচনা দিয়েছে (এবং এখনও দিয়ে যাচ্ছে)যা মৌলিক প্রবন্ধের মতোই সাহিত্য হয়ে উঠেছে। এরূপ সমালোচনা ঠিক সমালোচিত লেখক ও গ্রন্থের পরিচয় দেয় না। ঐ লেখক এবং গ্রন্থের মূল্যায়নকে উপলক্ষ করে নিজেই স্বতন্ত্র সাহিত্য হয়ে ওঠে। 'সমকাল' গ্রন্থ-সমালোচনাকে ঐসব বিদেশী পত্রিকার সমপর্যায়ে উন্নীত করতে পেরেছে বলা যায়না; কোনো সাহিত্যের সমালোচনা বিভাগ কতোটা উন্নত হবে তা নির্ভর করে সেই সাহিত্য নিজে সমগ্রভাবে কতোটা উন্নত তার উপর। বাংলাদেশের সাহিত্য পরিমাণ এবং গুণগত ভাবে এখনো দ্বিতীয় পর্যায়েই উন্নীত হতে পারেনি; অতএব এদেশের সমালোচনা সাহিত্যের খুব উল্লেখনীয়ভাবে উন্নত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই সমালোচনা/সাহিত্যের গ্রন্থ পরিচয় অপেক্ষা উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করার প্রথম কৃতিত্ব 'সমকাল' এর। যেমন সাহিত্য, তেমনি সংস্কৃতিচিন্তার মধ্যযুগীয় মানসিকতা অতিক্রম করে আধুনিকতা এবং ভবিষ্যৎমুখীনতার উন্মীলনে 'সমকাল' সহায়তা করেছে। এদেশের রাজনৈতিক চিন্তায়ও তার ভূমিকা এই রকম; বিশেষ করে, রাষ্ট্রচিন্তায় বাঙালী জাতীয়তাবাদের উন্মেষে, 'সমকাল' এর ভূমিকা উল্লেখনীয় ছিল। সাহিত্য সংস্কৃতি রাজনীতি অথবা অন্য যে-কোনো প্রসঙ্গে সর্বাধুনিক অভিমত এবং অন্তরঙ্গ চিন্তার নির্ভয়ে প্রকাশ করতে হলে 'সমকাল'-এ লিখতে হবে, এই আমরা লেখক-সম্প্রদায় ধরে নিয়েছিলাম। এদেশের সাহিত্যে আধুনিকতাকে আরও অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে আরও কোনো কোনো পত্রিকা কাজ করেছে; বিশেষ করে 'কণ্ঠস্বর'-এর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হবে; কিন্তু সত্তরের পূর্ব অবধি এদেশের সাহিত্যে যাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তাঁদের কৃতিত্ব নির্মাণে 'সমকাল' এর ভূমিকাই ছিল সর্বপ্রধান।'৭১

৬ সমকালের শিল্পসাহিত্য চিন্তা তথা রচনা-পরিচয় দেবার পূর্বে একটা কথা স্মরণ করতে হয়, যে বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ বপন করেছিল, সে বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের চেতনা সমকালের মূল প্রেরণা ছিল বলে বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্যসৃষ্টিতে সমকালের ভূমিকা সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েছিল। পঞ্চাশের দশকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক-প্রতিভা এবং চল্লিশের দশকের প্রগতিশীল লেখকবৃন্দ; আর ষাটের দশকের তরুণেরা ছিলেন সমকালের লেখক। এঁদেরই কণ্ঠ থেকে নিসৃত হয়েছে 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' এবং 'সংগ্রাম চলবেই' ইত্যাদি কবিতা ও গান। অসংখ্য কালজয়ী কবিতার মতো এগুলোও সমকালেই ছাপা হয়েছিলো— "নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলজ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছো আমার সত্তায়/মমতা নামের প্লুত প্রদেশের শ্যামলিমা তোমাকে নিবিড়/ঘিরে রয় সর্বদাই। কালো রাত পোহানোর পরের প্রহরে/শিউলী শৈশবে 'পাখী সব করে রব' বলে মদনমোহন/তর্কালঙ্কার কী ধীরোদাত্ত স্বরে প্রত্যহ দিতেন ডাক। তুমি আর আমি,/ অবিচ্ছিন্ন ; পরস্পর মমতায় লীন,/ঘুরেছি কাননে তাঁর নেচে নেচে, যেখানে কুসুম-কলি সবই/ফোটে,জোটে অলি ঋতুর সংকেতে। . . . .

তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে, কী থাকে আমার?
উনিশ শো বায়ান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহিয়সী।
সে-ফুলের একটি পাপড়িও ছিন্ন হলে আমার সত্তার দিকে
কত নোংরা হাতের হিংস্রতা ধেয়ে আসে।
এখন তোমাকে নিয়ে খেঙরার নোংরামি,
এখন তোমাকে ঘিরে খিস্তি-খেউড়ের পৌষ-মাস!
তোমার মুখের দিকে আজ আর যায়না তাকানো,
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।'৭৪

১৯৬১ সনে 'রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী' পালন, তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানী বাঙালিদের সামনে এক চ্যালেঞ্জরূপে দেখা দিয়েছিল। সমকাল 'রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী' সংখ্যায় (৪ বর্ষ ৯ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৮) শতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির অনুষ্ঠানের সভাপতি এস. এম. মুর্শেদের ভাষণ, ঐ অনুষ্ঠানে পঠিত অপরাপর কতিপয় প্রবন্ধ এবং কবিতা সহ প্রকাশ করা হয়। এই সংখ্যায় যে সকল লেখকের রচনা প্রকাশ পায়, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবুল ফজল, শওকত ওসমান, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, এস. এন. কিউ. জুলফিকার আলী, আবু রুশদ, হাসান হাফিজুর রহমান, ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ডঃ মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, আখতার হামিদ খান, সৈয়দ আলী আহসান, শামসুর রাহমান প্রমুখ। এই সংখ্যায় পাকিস্তানবাদী চিন্তক-লেখক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনও লিখেছিলেন : 'পাকিস্তানবাসী হিসেবে আমরা একটা আলাদা জাতি। আমাদের সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য আছে — এ অনস্বীকার্য। কিন্তু ভাষার দিক থেকে অন্য কোন জাতির সঙ্গে আমাদের মিল রয়েছে বলেই আমাদের জাতীয়তাবোধ ক্ষুণ্ন হতে পারে, একথাটা সহজে গ্রহণ করা মুশকিল। আমাদের মনে যদি নিজেদের বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে কোন সংশয় না থাকে তবে রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোন ভারতীয় কবি বা সাহিত্যিকের রচনা সাহিত্য হিসেবে গ্রহণ করতে আমাদের আপত্তি থাকবে কেন? .... যে বাংলা ভাষা নিয়ে আমরা গর্ব করি, রবীন্দ্রনাথের কাছে তার ঋণ অপরিসীম, এ সত্যটি যেন কখনই ভুলে না যাই। বাংলা ভাষাকে তিনি তাঁর নিজের সাধনার দ্বারা মধ্যযুগ থেকে বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেছেন, যার ফলে আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে বাংলা স্থান পেয়েছে। — এর নজীর পাক-ভারত উপমহাদেশের আর কোন সাহিত্যে নেই, হিন্দী-মারাঠী-তামিল-তেলেগু কোন ভাষায়ই নেই। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের যা অবশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

থাকে তা নিয়ে ঘরের নিভৃতে হয়ত আলোচনা করা যায়, কিন্তু দুনিয়ায় জাহির করবার মত কিছু থাকেনা।'৭৫

সৈয়দ আলী আহসান কবিতা লিখেছিলেন :
'রবীন্দ্রনাথকে' শিরোনামে --

"কোন আগামীকালে
বৃহত্তর সূর্য অথবা উজ্জ্বলতর আলো
আমার দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করবে কি করবে না?
পরিচিত ফুল, সমুদ্র এবং পাহাড়
ভবিষ্যতে নতুন পৃথিবী হবে কি হবেনা?
সূর্য হয়তো বরফ হবে
যখন আমি অন্ধকারের বিস্তার--
পৃথিবীতে অনেক পানি
যখন আমি অনেক কবিতায়
আকাশ দেখলাম
পৃথিবীর মলিনতায় অশ্রুবিন্দুতে
চোখ স্বচ্ছ হলো
এবং তুমি হে আকাশ
সব মুহূর্তেই হৃদয়ের নীলাম্বর।"৭৬

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণাদায়ক 'সংগ্রাম চলবেই' কবিতা ও গানটি সিকান্দার আবু জাফরের এবং সমকালের --

"জনতার সংগ্রাম চলবেই।
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।।
হতমানে অপমানে নয়, সুখ সম্মানে
বাঁচবার অধিকার কাড়তে
দাস্যের নির্মোক ছাড়তে
অগণিত মানুষের প্রাণপণ যুদ্ধ
চলবেই চলবেই,
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।

প্রতারণা প্রলভোন প্রলেপে
হ'কনা আঁধার নিশ্ছিদ্র
আমরা ত সময়ের সারথী
নিশিদিন কাটাবো বিনিদ্র
দিয়েছি ত, শান্তি আরোও দেবো স্বস্তি
দিয়েছি ত, সম্ভ্রম আরও দেবো অস্থি
প্রয়োজন হলে দেবো একনদী রক্ত।
হ'ক না পথের বাধা প্রস্তর শক্ত,
অবিরাম যাত্রার চির সংঘর্ষে
একদিন সে পাহাড় টলবেই।
চলবেই চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।"৭৭

'সমকালে' অনেক বির্তক হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে। লেখক এবং পাঠকদের মতামত খোলামেলা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয় সমকালের শেষার্ধে, কিন্তু প্রথম সংখ্যা থেকেই গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে বিরোধী মতের লেখকদের রচনাও স্থান দেওয়া হয়েছে তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে সত্যান্বেষণের অথবা পাঠকদের চিন্তার সীমাবর্ধনের অভিপ্রায়ে। পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী চিন্তক-লেখক-সমালোচক ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদের নিকট থেকে সম্পাদক প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার জন্যেই লেখা নিয়েছিলেন 'পূর্ববাংলার সংস্কৃতি' শিরোনামে। এই প্রবন্ধে কাজী দীন মুহম্মদ বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর উৎপত্তি এবং বিকাশের ধারা বর্ণনা করে কার্ল মার্কসের সামাজিক বিপ্লবের দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। শেষাংশে পূর্বপাকিস্তানের সংস্কৃতি সম্পর্কে বলেন ঃ

"আমাদের পক্ষে সুবিধা এই যে, ইসলাম আমাদের কালচরকে সমগ্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। আর নিয়ন্ত্রিত করে বলেই এর প্রভাব আমাদের জীবনে এত বেশী যে, আমাদের কালচরের বিকাশ-ক্ষেত্রে আমরা পদে পদে এর কাছে ঋণী। আমাদের জগৎ ও জীবনবোধ হল আমাদের ইডিওলজি। স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের মনে যে জিজ্ঞাসা জাগে-- শুধু তারই নাম রিলিজিয়ন নয়। এর খানিকটা ইডিওলজির অন্তর্গত আর খানিকটা আচারগত-- একথা যতদুর সত্য, তার চাইতে বেশী সত্য আমাদের জীবনবোধের সামগ্রিক ধারণা ও কর্মজগতে তার প্রকাশের ব্যপ্তি ও বাস্তবায়নে এর মোটামুটি প্রভাব। এখানে পাশ্চাত্য মনীষী টি. এস. এলিয়টের একটা কথা স্মরণ করতে হয়। তিনি বলেছেন যে, ক্যাথলিক চার্চ ও ক্যাথলিক সংস্কৃতিই বর্তমান পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রাণ। আমরাও তাঁর প্রতিধ্বনি করে বলতে পারি, মুসলিম সংস্কৃতির প্রাণ সেই ইসলামী আরবীয় কালচর, আর আমাদের সংস্কৃতির উৎস মুসলিম সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ধারা থেকেই উজ্জীবিত হবে। কিন্তু একথাও যে সর্বৈব প্রযোজ্য নয়, সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদ তা নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না। তাই দেখি চীন, জাভা, মালয়, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরাক, ইরান, আরব ও তুরস্কের সকল মুসলিম ধর্মত: এক হওয়া সত্বেও প্রাত্যহিক বাস্তব জীবনযাত্রা ও সৃষ্টিধারায় তাঁদের বিকাশ পরিবর্তমানই নয় শুধু -- যথেষ্ট পৃথকও। কিন্তু আমরা আগে বাঙালী পরে মুসলমান, না আগে মুসলমান পরে বাঙ্গালী এ কথা জোর করে বলার চাইতে বরং একথা মেনে নেয়া সহজ যে, আমরা মুসলমানও বাঙ্গালীও। আমরা মুসলমান কাজেই কোন বিশেষ দেশ বা কালের বিশেষ গণ্ডীর তাছিরের তুলনায় ইসলামী তাছির আমাদের ভিতর বাহির, চিন্তা ও কর্ম আমাদের ইডিওলজি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিপুষ্ট; তবে ভৌগলিক অবস্থান ও আবহাওয়া আমাদের মধ্যে যে পরিবর্তন এনে দেয় তা মৌলক পরিবর্তন নয় নিশ্চয়ই। বাইরের দিক থেকে আমাদের বস্তু-সত্ত্বার মধ্যে তার তাছির কাজ করে। তাই আমাদের কালচরকে আমরা নিঃসন্দেহে একটা ছককাটা কোঠায় ফেলতে পারিনা, সেকথা বলাই বাহুল্য। একথা

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের স্বীকার করে নিতে আপত্তিও থাকতে পারেনা যে, রিলিজিয়ন ও কালচরের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে; আর 'রিলিজিয়ন অপরিবর্তনীয় এবং কালচর বিকাশশীল'। তবুও রিলিজিয়ন দিয়ে যে কালচরের নামকরণ চলে না বা ঠিক বিজ্ঞানসম্মত নয় একথা সর্বতোভাবে মেনে নেওয়া যায়না। এখানেই ভাবনার দিক থেকে আমাদের মানসিকতার বিরোধ।

আমাদের দেশের ও জীবনের উপর দিয়ে কয়েকটি কালচরের প্লাবন এসে গিয়েছে এবং তাতে করে সমাজের মূল কাঠামোতে, সংস্কৃতি এবং সভ্যতায়ও সংস্কার এসেছে, একথা ঐতিহাসিক সত্য। এদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের প্রভুত্বের কালেই ইসলাম ধর্মের আগমন। মুসলিম বিজয়ী বেশে এদেশে এলেও বিজয়ী ব্যক্তির সংখ্যা খুব বেশী ছিলনা। তাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় যে, 'আসলে বেশীর ভাগ বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গলাদেশেরই মানুষ; যারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন তাদের সন্তান সন্তুতি এবং সেজন্যই এদেশীয় রূপটি ভুলতে পারা সহজ হয়নি। বিশেষ করে ইসলাম সাম্যবাদের পক্ষপাতি বলে আর বিদ্যমান হিন্দুধর্ম বৈষম্য ও অধিকারভেদের উপর গঠিত বলে বিজিত জনগণ নবাগত উদার ধর্মের দিকে আকর্ষণ অনুভব করে আসবেন — এতে বিচিত্র কি? বিজয়ী রাজধর্ম ইসলামের আওতায় অভিজাত এবং অনভিজাত দুই শ্রেণীই ভীড় করে থাকবে। কিন্তু যেহেতু আগে থেকেই সমাজের তলানির শ্রেণীই ছিল সংখ্যায় বেশী, সেজন্য পরেও বেশীরভাগই নীচে পড়ে রইল। ধর্মের ক্ষেত্রে বিভেদ নাথাকা সত্বেও বৈষয়িক ব্যাপারে দরিদ্র মুসলমান একদিনেই সমান হয়ে উঠতে পারলনা। আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যেতে পারে; এতদিন রাজত্ব করে এবং সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে এতটা প্রভাব বিস্তার করেও কর্মজীবনেও সমতা ও সুষ্ঠু বাস্তব সমাজব্যবস্থায় পুরোপুরি সার্থকতা আনতে পারেননি মুসলমান নৃপতিগণ। আর এতে অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্যের ছাপও পড়েনি ততটা। মুষ্টিমেয় মুসলমান— অভিজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, আর বাদবাকী সব তথাকথিত জনগণ। আজও এর খুব বেশী পরিবর্তন হয়েছে মনে করা যেতে পারেনা।

পশ্চিম পাকিস্তানে বিভাগপূর্ব সমাজব্যবস্থায় যে কারণে দুটো শ্রেণী রয়েছে, অভিজাত ও নিম্ন (মজদুর) শ্রেণী— সে স্বাভাবিক কারণেই এখানে বাংলায়ও দুটি মাত্র শ্রেণীর উদ্ভবই ইসলামের আওতায় সহজ হয়ে উঠেছিল। মাঝখানের মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠলেও তার মেরুদণ্ড খুব শক্ত ছিলনা। ওয়ারেশী আইন ও মুসলমানী জীবনযাত্রা-পদ্ধতি : আয়েসী মনোভাব ও অভ্যাস সহজেই অবস্থাপন্ন মুসলমানকেও মধ্যবিত্ত অবস্থা থেকে নিচে নামিয়ে আনত। আমাদের সমাজের এই আর্থিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে উৎপাদক হিসেবে শ্রমসাধ্য অনেক কাজেই মুসলমান অগ্রণী ছিল, এখনও আছে। পরিশ্রমী সাধারণ মুসলমানই নিজেদের শ্রম ও দক্ষতার পরিচয় তখনও দিত, এখনও দিচ্ছে— সন্দেহ নাই। সূক্ষ্ম বয়নশিল্প, সেলাই, সূচীশিল্প, স্থাপত্যশিল্প ও নানাবিধ কুটির ও নৌশিল্প এসবের মধ্যেই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্মক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তব ধনসৃষ্টির ক্ষেত্রে, কৃষি ও কারুশিল্পে, শ্রমসাধ্য কর্মে মুসলমান জনগণ এখনও আমাদের জীবনে মুখ্য স্থান জুড়ে আছে।

আর মানস-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, সাহিত্য ও চারুশিল্পেও কি মুসলমান পিছিয়ে রয়েছে? প্রাধান্য অর্জন করতে না পারলেও মধ্যযুগের মুসলমান এ ব্যাপারে কম অগ্রসর ছিলেন এমন কথা বলা চলে না। আরবী ফারসী চর্চা ছাড়াও এদেশীয় কাব্যসাহিত্যে তাঁদের দান কম নয়। কাজী দৌলত, আলাওয়াল, সৈয়দ সুলতান, জয়নুদ্দীন, মোহাম্মদ খান, শাহ মুহম্মদ সগীর এসব কবিদের ছাড়াও ভাবনার ক্ষেত্রে চিন্তাশীল মনীষীর অভাব ছিলনা। সাধারণ 'লোক'-উৎপাদক শ্রেণীরও দান এ বিভাগে নগণ্য নয়। লৌকিকগান, কবিতা, ছড়া, গাথা, গীতিকা, সারি, জারি, ভাটিয়ালী এসব রচনার ক্ষেত্রে মুসলমানই ছিল অগ্রণী। মুসলিম কেবল সংখ্যায় বেশী নয় বাস্তব কর্মক্ষেত্র থেকে আরম্ভ করে চিন্তার জগৎ পর্যন্ত সর্বত্র মুসলমান ছিল পথিকৃৎ। এ লোক-সঙ্গীত, লোক -সংস্কৃতি ও লোককাব্য ক্ষেত্রে তাদেরই হাত থাকত বেশী —'এখনো তা আছে অনেক খানে —অনেক দিকে'। .... আধুনিক যুগে ইংরেজ-কৃষ্টি ও সভ্যতা নাড়া দিয়েছে আমাদের মনন-ভিত্তিকে। তবু আমরা ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্যবোধের খপ্পরে ততটা পড়ে যাইনি। কিন্তু আমরা হয়তো অতীতের ইতিহাস কাজে লাগিয়ে, সত্যিকার শিক্ষার মর্যাদা বুঝতে পারি, আর জানতে পারি আমাদের জাতীয় অমর্যাদার স্বরূপ। কিন্তু বেশীরভাগই যে বাস্তব জীবন সংগ্রামে ঘর্মাক্ত ক্লান্ত জনগণ তাদের কাছে — রেশন, সিভিল সাপ্লাই, মিল — এসব ছাড়া পাশ্চাত্যপ্রভাবের যা অর্থ তা হচ্ছে- নিঃশেষ হওয়া, নাফরমান হওয়া। বাস্তব তহবিলের দিকে শূন্য আর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দিক দিয়ে ঈমানের অবিশ্বস্ততা ছাড়া তাদের কাছে— এর অন্য অর্থ নেই। তাদের সম্যক শিক্ষার প্রকৃত অর্থ এখনো বুঝানো হয়নি — বুঝানো হয়নি সত্যিকার ধর্মের শাশ্বত স্বরূপ। অতএব তাদের মধ্য থেকে উদ্ভূত কতিপয় অভিজাত যদি শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবমাননা করে, তবে তার থেকে স্বভাবতই তারা তার অর্থ বের করে নেয় এভাবে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এরা নিজেদের সংস্কৃতি ও মানস স্ফূর্তির ব্যাপারে আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে তারা স্থির করতে পারছেনা তাদের পথ কি। সুবিধা অসুবিধা যাই হোক, তাদের হল চালনা, এবং বাঁশের বেতের কাঁচের মাটির সূতার নানা শিল্পকর্ম এগিয়ে চলেছে আগেরই মত - কেবল কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে। কিন্তু তাদের সে শান্তি সুখের দিন চলে গিয়েছে- যখন তারা আপন মনের সুখে যাত্রা, ভাসান, ও পুঁথি পড়ার আসর জমিয়ে আনন্দে বিভোর হয়ে জীবন চালাত, যখন তারা বাপমায়ের নামে ফাতেহা করতে দুদশগ্রামের ছেলে বুড়ো সবাইকে দাওয়াত দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করত, যখন তারা ওয়াজের মহফেল করে জৌনপুর অমৃতসর-ফেরৎ মৌলানা বা পীর মোর্শেদের মুখে আরব, ইরান-তুরানের ইতিকথা কেচ্ছা শুনতে শুনতে রাত ভোর করে দিয়ে ছওয়াব হাসিলের ফায়দা উঠাত— সেদিন আর নাই। সে পুরোনো সমাজ নাই। সে শান্তি-সমৃদ্ধিও আর নাই। এখন মানুষ শহরমুখো ভূমিহীন কৃষক যারা পরের বাড়ীতে কৃষাণ খেটে দিনগুজরান করতো তাদের ধরতে হচ্ছে রিকশা, অথবা মিল বা ওয়ার্কসপের মজুরের কাজ। কর্মগতিকে কাজেই ধর্ম বিকাশের ক্ষতি না হলেও, ধর্মকর্মের আচার-অনুষ্ঠানে এসেছে শৈথিল্য। ছেলে বা মেয়ের বিয়েতে যেখানে গ্রামে জেয়াফৎ না দিলে লোকের মুখ থাকত না, এখন সেখানে গোপনে শুধুমাত্র ছেলেটিকে ডেকে মোল্লাজিকে একটা টাকা দিয়ে শরা পড়িয়ে কাজ চালানো হয়। নৌকা বাইচে হাডুডু খেলায়, ঈদে এবং অপরাপর উৎসবে অনুষ্ঠানে নেই আগের সেই প্রাণস্পন্দন, নেই উৎসাহ কোলাহল। ইংরেজের ফেলে যাওয়া রসহীন আঁকের 'ছোবরা' টির যেখানে যেটুকু রসের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে— তাতেই নব্যশিক্ষিতরা (আনকলচরড্ নয়) ভাগ বসাচ্ছে — তাদের খাতায় শূন্য পড়ছে। এই যে অবস্থা এইত হল আজকার দিনের সাধারণ উৎপাদকের

Dhaka University Institutional Repository

জীবন ও জগতের প্রতি-দৃষ্টিভঙ্গি। এসকল অবস্থার পেছনে কোন বিপ্লবের বারুদ জমা হয়ে হয়ে পুঞ্জিভূত ধোঁয়া ঘনিয়ে আসছে এবং কোন পথেই বা এর আত্মস্ফূর্তি সেকথা ভাববার দিন এসেছে— নয় কি?"৭৮

এই লেখার প্রতিক্রিয়ায় দ্বিজেন শর্মা পরের সংখ্যাতে লেখা পাঠান। বিতর্ক শিরোনামে তাঁর লেখাটি ছাপা হয়। লেখক বলেন ঃ

কাজী দীন মুহম্মদের 'আলোচনা স্পষ্টতই বিজ্ঞান সম্মত নয়, একান্ত নিজেরই কল্পনাপ্রসূত। ... বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও গভীর আলোচনার মধ্যে যে প্রবন্ধের শুরু তার এই পরিণতি লেখকের মুক্তবুদ্ধি সম্পর্কে স্বভাবতই আমাদেরও সন্দেহ সৃষ্টি করে।' লেখক বলেন 'মধ্যযুগ ধর্মসংস্কৃতির যুগ।.... শিল্প-বিপ্লবোত্তর ইউরোপকে এলিয়টী দৃষ্টিভংগী নিয়ে বিচার আজ যেমন ভ্রান্তিপুষ্ট তেমনি পূর্বপাকিস্তানের কালচারের বিচারও ইসলামের মানদণ্ডে নির্ভুল হতে পারে না। ইউরোপ ধর্ম-সংস্কৃতির যুগ উত্তীর্ণ হয়েছে। তার সংস্কৃতির পরিচয় আজ ধর্মের মানদণ্ডে বিচার্য নয়। আমাদের দেশেও ধর্ম-সংস্কৃতি আজ কালান্তরের পর্বে। তাই এখানেও ধর্ম আজ সংস্কৃতির পূর্ণ অর্থ বহন করতে অক্ষম। ধর্ম আজ সংস্কৃতির সমগ্র রূপ নয়— তার অংশ মাত্র। এর স্বীকৃতি আমাদের কর্মে ও চিন্তায় সর্বত্র প্রতিফলিত। লেখক অবশ্য একে পাশ্চাত্যের অনুকৃতি বলে নিন্দা করেছেন। কিন্তু সর্বত্র তা সত্য নয়। এর সৃষ্টিশীল অবদানগুলি বিচ্যুতি নয়, আসলে প্রয়োজনের নতুন তাগিদেরই স্বীকৃতি। 'ধর্ম নিরপেক্ষ ঐতিহ্যবোধের খপ্পরে ততটা যে আমরা পড়ে যাইনি'— এতে গর্ব ও গৌরবের কতটুকু কারণ আছে তা নিয়ে অবশ্যই বিতর্ক চলতে পারে। কিন্তু আসলে এই ঐতিহ্যবোধের সংগে যে আমাদের পশ্চাৎপদ কৃষি অর্থনীতি আর আনুষঙ্গিক ব্যপ্তি- সমৃদ্ধি-উল্লাস-বিক্ষোভহীন শান্তশিষ্ট ভদ্র জীবন জড়িয়ে আছে, এসত্য অস্বীকার করা কঠিন। এযদি গৌরবের বিষয় হয় তবে এখানেই আমাদের দুর্বলতা নিহিত।

বাংলা সংস্কৃতির মৌলিক দুর্বলতা তার ফিউডাল উৎপাদন পদ্ধতি, তার স্থবির গ্রাম্য সমাজ, দুর্নিবার ব্যপ্তি ও বিশাল জীবন চেতনার অভাব। এ বৈশিষ্ট্য হিন্দু শাসন থেকে মুসলমান রাজত্ব অবধি অক্ষুন্ন রয়েছে। ইংরেজ শাসনে এদেশের সাবেকী অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে। ধনতন্ত্রের প্রচণ্ড শোষণে গ্রামবাংলা তথা তার সংস্কৃতির চরম লাঞ্ছনা ঘটে। অথচ নতুন তার স্থান গ্রহণ করেনি। তাই গভীর তিক্ততা ও বিদ্বেষের মধ্যদিয়েই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয়। যে সংস্কৃতি ফিউডাল ইউরোপকে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব ও চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়েছে তাঁকে আমরা তাই যথাযথ মুল্যে গ্রহণ করতে পারিনি। আমাদের দেশবাসীর স্মৃতিতে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠণ আর বর্বর অত্যাচার যে গভীর রেখাপাত করেছে, ইউরোপের কোন কাব্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান তা ঢেকে দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই লেখক যখন ইউরোপীয় সংস্কৃতির আলোচনায় বলেন, 'পাশ্চাত্য প্রভাবের যা অর্থ তা হচ্ছে, নিঃশেষ হওয়া 'নাফরমান হওয়া', তখন তিনি নিঃশেষে আমাদের জাতীয় সেন্টিমেন্টের প্রতিধ্বনি করেন। .... আমাদের ফিউডাল সংস্কৃতির কাল বহু পূর্বেই উত্তীর্ণ হয়েছে। যে সংস্কৃতির ধারা আমরা আজ বহন করছি তার সঠিক গোত্র নির্ণয় অসম্ভব। ঔপনিবেশিক প্রয়োজনেই এর সৃষ্টি। কর্ণওয়ালিসী ভূমি-ব্যবস্থা, গ্রামবাংলার নির্বিশেষ ধ্বংস, শিল্পের স্বল্প পরীক্ষিত বিকাশ, মধ্যবিত্ত ও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সৃষ্টি, জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা আন্দোলন, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, এমনি ভালমন্দের জটিল সমাবেশই বাংলার আধুনিক সংস্কৃতি। স্ববিরোধিতা এবং সীমাবদ্ধতাই এর দুর্বলতা। তাই আজকে স্বাধীনতা লাভের পর এ সংস্কৃতির পরিবর্তনের প্রশ্ন অনিবার্যভাবেই আসে। প্রবন্ধকার শুধুমাত্র এর ইঙ্গিতই দিয়েছেন। কিন্তু সমস্যা যেখানে জাতীয় জীবনের সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত সেখানে ইংগিত যথেষ্ট নয়। এ কথা সত্য যে সংস্কৃতি ফরমাইসমাফিক তৈরী করা যায়না। তার নৈর্ব্যক্তিক উপাদানগুলি অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণাতীত, শুধুমাত্র ব্যক্তিক প্রচেষ্টা নির্ভর দিকগুলিকে আমরা বুদ্ধি ও দক্ষতার সংগে ব্যবহার করতে পারি। আয়ত্বাধীন ক্ষমতার সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের মধ্যেই আমাদের সাফল্য নিহিত। আগামী দিনে আমাদের সংস্কৃতির রূপ কি হবে এ নিয়ে এখনই চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ তাই অনর্থক। এই মুহূর্তে আমাদের কর্তব্য নির্ধারণই এই ক্ষেত্রেসব চেয়ে প্রধান প্রশ্ন।

ইউরোপীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। কিন্তু তার দুর্বলতাও আজ লুকানো নেই। .... সে সংস্কৃতির দুর্বলতা আজ বিশ্বমানবের কাছে স্পষ্ট। তাকে গ্রহণের মধ্যে কোন কল্যাণ থাকতে পারেনা।

সদ্যমুক্ত এশিয়া আফ্রিকার জাতিগুলির সামনে এ সংকট আজ প্রকট। মানুষ প্রকৃতির নিয়ম থেকে আবিষ্কারের মধ্যেই তার দাসত্ব থেকে মুক্তির পথ খুঁজছে। ইতিহাসের গভীর অধ্যয়নের মধ্যেই আজ তেমনি নতুনতর সত্যের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে, যে জন্য সামন্ততন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ধনতন্ত্রের অন্ধকার গলি না মাড়িয়েও সম্ভব।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিকাশের মধ্যে জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠন সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান, রাষ্ট্রকাঠামোর গণতন্ত্রীকরণ, কুশিক্ষা ও মুর্খতার বিলুপ্তি সাধন, সৃজনীশক্তির অবাধ স্ফুরণের মধ্যে দিয়েই আমরা শান্তিপূর্ণভাবে নতুন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারি।

যে অবস্থায় আমাদের দেশ আজ এসে পৌঁছেছে সেখানে সংস্কৃতির সুস্থ বিকাশ সম্ভব নয়। তাই সামন্তমুখীনতা ও ভীরুতা পিছনে ফেলে আজ দেশের অগ্রগামী সৈনিকদের সাথে সংস্কৃতিকর্মীকেও কাঁধ মিলাতে হবে। এ সংকট আমরা সমবেত প্রচেষ্টাতেই শুধু উত্তীর্ণ হতে পারি। রাজনীতিক, সমাজকর্মী, শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী সবাই ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতিকর্মী। সংস্কৃতির সর্বব্যাপ্ত সংকট অবসানের মধ্যেই আমাদের কর্ম ও উদ্যোগের অকল্পিত দিগন্ত উন্মোচনের সম্ভাবনা নিহিত। সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতেই আমাদের আজ এগিয়ে আসতে হবে।'৭৯

আবদুল গনি হাজারী 'সংস্কৃতি-চিন্তা' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধের (ধারাবাহিক ভাবে কয়েক সংখ্যায়) 'পটভূমি' বর্ণনা করতে গিয়ে 'সংস্কৃতি'র প্রসঙ্গটি যে বিশ্লেষণ করেছেন তার মধ্যদিয়ে একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে ঃ

"ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম যখন মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়, পৃথিবীর এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তা এক নতুন অধ্যায়ের উদ্বোধন করে যায়। তখনও একবার "অনেকে বাস্তত্যাগী হইয়া পুঁথিপত্র ধনজন লইয়া নেপাল ও বঙ্গে আশ্রয় লয়।' তখনও সমাজব্যবস্থা এর

Dhaka University Institutional Repository

ফলে ভেঙ্গে পড়েছিল, বহুকাল ধরে শিল্প সাহিত্য মুর্ছিত হয়েছিল। কিন্তু তারপর ক্রমশঃ যে নতুন জীবন-বোধ জন্ম নিয়েছিল তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে স্বর্ণযুগের পত্তন করে গেল।

এর সাতশ বছর পর বাংলাদেশ যখন আর একবার মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির হাতে এলো, তখন আমরা বিশ শতকের মধ্যাহ্নে। স্থান ও কাল তখন মানুষের কর্তৃত্বের অধীন। মানুষ এগিয়ে চলেছে অবিশ্বাস্য গতিতে। এই গতির উত্তরাধিকার নিয়ে আমরা স্বাধীন হলাম, পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তর রাষ্ট্রের নিয়ন্তা হলাম।

বক্তিয়ার শাহ, কি ইলিয়াস শাহ কিংবা হুসেন শাহের যুগের তুলনায় আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকার রাখি। তাই রাষ্ট্রের নিয়ন্তা যখন আমরা হলাম নানা সম্ভাবনার স্বপ্নে আমরা তখন স্ফীতবক্ষ। আমরা এক অমোঘ গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস-স্রষ্টা আমরা পাক-ভারত উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনসমাজের — অর্থাৎ বাঙালি জাতির বৃহত্তর অংশ। জাতিভেদ, শ্রেণীভেদহীন, শোষণ-পীড়নহীন এই স্বর্ণবিপ্লব সাধনের প্রতিশ্রুতি ছিল আমাদের ঃ আমরা এক নতুন দেশ, নতুন জাতি, নতুন সমাজ ও সংস্কৃতির জন্ম দেব।

এর সংগে তুলনা করলে সুলতানী যুগের মুসলিম শাসক সম্প্রদায়কে দেখি: একের পর এক যুদ্ধ-বিগ্রহে সর্বদালিপ্ত,ভবিষৎ সমাজ বা সংস্কৃতি সম্পর্কে পরিকল্পনাহীন, স্থানীয় হিন্দু ভৌমিক শক্তির ওপর অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নির্ভরশীল। তবু সেই শ্লথগতির দিনে শাসকের এমন অস্থিরতা সত্ত্বেও কি করে সেকালে এমন সহস্রায়ু সমাজব্যবস্থা এবং সংস্কৃতির জন্ম হলো? অথচ আমরা কেন এই জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে সকল ক্ষমতা হাতে পেয়েও এত কল্পনা ও পরিকল্পনা সত্ত্বেও গত সতের বছর ধরে কোন কৃতির ক্ষেত্রেই সার্থক পদক্ষেপ করতে পারিনি? সর্বশেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় আমরা সত্যিকারভাবে আমাদের সমাজব্যবস্থায়, আমাদের জীবন-যাত্রার পদ্ধতিতে উদ্দিষ্ট পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়েছি বলেই এমন হয়েছে।

'সংস্কৃতি'র ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন : 'সংস্কৃতি' কথাটাকে এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এবং সংস্কৃতির আলোচনা অর্থপূর্ণ হতে পারে শুধু যদি একে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়। এই অর্থে সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের কৃতি বা কর্মের নিদর্শন। আমরা যখন প্রাচীনকালের মানুষের সংস্কৃতি অধ্যয়ন করি তখন কোন যুগের মানুষের সমাজব্যবস্থা, জীবিকার উপকরণ ও মানব সম্পদকে বিবেচনার মধ্যে গ্রহণ করি। সংস্কৃতি তাই সভ্যতার চাইতে প্রাচীন। সমাজ যখন গড়ে ওঠেনি, অর্থৎ সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়নি তখনও মানুষকে জীবিকার চেষ্টা করতে হয়েছে। নানাভাবে তার নিদর্শন রেখে গিয়েছে সে, যেমন আদিম মানুষের ইতিকথার গুহাচিত্র এক সাংস্কৃতিক উল্লেখ। এই অর্থেই এখানে আমরা গত সতের বছরের সংস্কৃতির কথা আলোচনা করব। এবং সেজন্যে আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিকে এক নজর তাকানো প্রয়োজন।'[৮০]

বুলবুল ওসমান 'ধর্মের সমাজতত্ত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন ঃ "ধর্ম ও বিজ্ঞান সহাবস্থান করতে পারে কিনা এ সম্বন্ধে বলা যায় একই লোক বৈজ্ঞানিক আবার ধর্মীয় রীতি-নীতিও মেনে চলে। এই একটি উদাহরণ থেকেই বলা চলে ধর্ম ও বিজ্ঞান সহাবস্থান করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এরকম কত দিন চলবে? সমাজতন্ত্রী দেশগুলো ধর্মীয় রীতিনীতি না মেনেই বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দে বাস করছে। তাছাড়া অসমাজতন্ত্রী দেশেও বহুলোক কোনরকম ধর্মীয় বিশ্বাস ছাড়াই জীবন যাপন করে। এ সব দেখে মনে হচ্ছে ধর্ম এক সময় বিজ্ঞানের কাছে সম্পূর্ণভাবেই মাথা নত করে দেবে। তবে প্রথা বা সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে ধর্ম টিকে থাকলেও তা মোড় নেবে উৎসব ও অনুষ্ঠানে। পূর্বের সেই প্রার্থনার ভঙ্গী আর থাকতে পারেনা। যাদু বিশ্বাস ও ধর্ম তখনি এসেছে যখন মানুষ প্রকৃতির বহু কিছু জানতে পারছেনা এবং নিজেকে বড় অসহায় মনে করছে। কিন্তু বিজ্ঞান মানুষকে পৃথিবীর জাগতিক নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে সুষ্ঠু ধারণা দিয়ে আসছে। এখন মানুষ আর আগের মত শিশু নয়, ধর্ম যেন তাকে করে রেখেছিল দরজায় দাঁড়ানো ভিখিরীর মত। ভিখিরী তার কাছেই ভিক্ষা চায় সে যা চাচ্ছে যার কাছে তা আছে. কিন্তু সব মানুষের কাছে যখন আহার্য বস্তু থাকবে তখন যেমন ভিখিরী খুঁজে পাওয়া যাবেনা, বিজ্ঞানও যখন সবকিছুই মানুষকে দিতে পারবে তখন ধর্মের প্রয়োজনটা কোথায় থাকবে? বিজ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্তির পরও মানুষের যদি কোন মানসিক শূন্যতাবোধ দেখা দেয় তা দাঁড়াবে দার্শনিক বোধে বা বিশ্বাসে। কারণ ধর্ম সৃষ্টির সময় মানুষ যে পর্যায়ে ছিল বিজ্ঞানের পূর্ণতাপ্রাপ্তির পর মানুষের সেই মনোভাব আশা করা বাতুলতা।"[৮১]

প্রতিটি পৃষ্ঠা পঠনোপযোগী এবং আলোচনা যোগ্য রচনায়ভরা সাহিত্য পত্রিকার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিতে গেলে পর্যাপ্ত পরিসর প্রয়োজন। কিন্তু এখানে সে সুযোগ নেই। তবে উদ্ধৃত রচনাংশ থেকে স্পষ্টতই সমকালকে উপলব্ধি বা বিচার করা সহজ বলে ভাবতে কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়। এসবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সমকাল বাংলাদেশের সাহিত্য, জীবনদর্শন, কৃষ্টি ও চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন করে একত্রে কিছুর নির্বিরোধ সংযোজন ঘটিয়েছে। সমকালের পাতাতেই 'খামুরাবি' ছদ্মনামে জনৈক লিখেছিলেন ঃ

'সমকালই একমাত্র কাগজ যাকে ঘিরে এই হতাশাপ্লাবিত, ক্লান্তিভরা, উদ্দেশ্যবিহীন দেশে চলেছে কিছু সাহিত্যচর্চা। এছাড়া সমকাল এর পাতায় সম্প্রতি আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের জাতীয় ইতিহাসকে, সমাজসংগঠন ও রাজনীতির ধারাকে বুঝে দেখবার, বিষয়গতভাবে আলোচনা করবার একটা প্রচেষ্টা। এটা সৃজনী সাহিত্য না হলেও এর প্রয়োজন আজ অপরিসীম। কারণ এই পথেই ঘটতে পারে আমাদের আত্মজ্ঞান।'[২৮] বস্তুত এউক্তিতে অতিরঞ্জন কতোটুকু আছে তা অনুসন্ধানসাপেক্ষ।

৪. পূবালী (১৯৬০-৬৭)

সাতচল্লিশ -একাত্তর পর্বে পূর্ববাংলা থেকে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকাগুলোর মধ্যে 'পূবালী' নাম করেছিলো এবং সকল শ্রেণীর সাহিত্যকর্মীর নিকটই আদৃত ছিল। বস্তুত প্রকাশের অব্যবহিত পরেই এই পত্রিকা জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌছতে সক্ষম হয়েছিল। এতে মিশেছিল দুটো বা তিনটে ধারা,—

Dhaka University Institutional Repository

কারণ এর মালিক–প্রকাশক–সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, যিনি ওসমানিয়া বুক ডিপো (১৬/১৮ বাবুবাজার ঢাকা ১) র সত্ত্বাধিকারী এবং পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রগতিশীল ধারার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর চিন্তা ও কর্মে গোঁড়ামী তথা পাকিস্তানী সংস্কৃতির পক্ষে অন্ধ সমর্থনদানের প্রবণতা ছিল না। তবে এর বেতনভুক 'সহযোগী' বা নির্বাহী–সম্পাদক ছিলেন কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লা। তিনি মাহেনও এর কর্মচারীরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তমদ্দুন মজলিশ–দ্যুতি– সৈনিক এবং ইসলামী, পাকিস্তানবাদী চিন্তানায়কদের সঙ্গেও তাঁর আত্মিক সম্পর্ক ছিল। নিজস্ব দৃষ্টিকোণের বিচারে তিনি পূর্বপাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির চিন্তা ও কর্মের সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন। ফলে পূবালীর সাহিত্য সংস্কৃতি ও সামাজিক চিন্তায় মিশ্রণ ঘটেছিল মানবতাবাদী প্রগতিশীল ধারার সঙ্গে ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী চিন্তাধারার।পূর্ববাংলার প্রধান লেখকদের রচনা এতে প্রকাশিত হয়েছিল যাঁরা মতপথে বিভিন্ন ধারা ও দর্শনের সমর্থক ছিলেন। পত্রিকার মালিকের সুব্যবস্থিত প্রকাশনা–সংস্থা ছিল। তদুপরি লেখার জন্য পয়সা দেয়া হতো। ফলে বড় ও প্রতিষ্ঠিত লেখকদের পক্ষে বাস্তব কারণেই পূবালীর আমন্ত্রণ পরিহার করা সম্ভবপর ছিলনা। কাজে–কাজেই দলমত নির্বিশেষে ভালোরচনার আধার হয়ে পূবালী মানবতাবাদী ধারার একটি পত্রিকার আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছিল। সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পত্রিকা এটি হয়নি। সমকালও কোনো বিশেষ 'রঙের' প্রচারক হতে চায়নি। কোনো কোনো সমালোচক এটিকে সমকালের সঙ্গে প্রায় সমান মর্যাদার পত্রিকা হিসেবে ও সেজন্য উল্লেখ করেছেন।[৮৩] ডক্টর মুস্তাফা নুরউল ইসলাম এক সাক্ষাৎকারে বলেন: মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম চিন্তাচেতনায় উদারপন্থী ছিলেন। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামীলীগের এম.পি. হয়েছিলেন । অতএব অনুদারপন্থী ছিলেন না । যাঁরা হযরতের জীবনী ছাপেন, তাঁরা 'পূবালী' নামের পত্রিকা প্রকাশ করেন বিষয়টি বুঝতে হবে; চিন্তাটা দেশপ্রেমী।[৮৪] সাংবাদিক সিরাজউদ্দিন হোসেন, হাসান হাফিজুর রহমান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আবুল ফজল, আবদুল কাদির, আহমদ শরীফ, আবদুল গনি হাজারী, সরদার জয়েন উদ্দিন, শওকত আলী, মুনীর চৌধুরী, আনোয়ার প্যাশা, মুহম্মদ এনামুল হক, শওকত ওসমান, ফররুখ আহমদ, জসীম উদ্দীন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সকলেই পূবালীতে লিখেছেন। পূর্ববাংলায় প্রায় সাতটি বছর মাসিক হিসেবে নিয়মিত প্রকাশের পত্রিকার সংখ্যা খুব বেশী নেই। হাতে গোনাই বলতে হবে।এই হাতে গোনা পত্রিকার মধ্যে পূবালী অন্যতম। যুগ্ম সংখ্যা মাঝে মাঝে প্রকাশিত হলেও প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে সপ্তম বর্ষ সপ্তম সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পূবালী প্রকাশিত হয়েছিল। তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটি বছরে অনিয়মিত হয়নি বল্লেই চলে। দুটি সংখ্যা (৪/৫–৬ ও ৫/৫–৬) মাত্র যুগ্ন বের হয়। ফলে ৫ ×১২=৬০–২=৫৮টি পুস্তিকা বেরিয়েছিল। ষষ্ঠবর্ষে ৮টি পুস্তিকায় বর্ষ শেষ হয়েছে। সপ্তম বর্ষে ৪টি পুস্তিকায় সপ্তম সংখ্যা পর্যন্ত বেরিয়েছিলে বলে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়। চৈত্র ১৩৭৩ পর্যন্ত বের হয়েই এর আয়ু শেষ হয় অর্থাৎ ১৯৬৭ সনের মার্চ–এপ্রিল নাগাদ দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেলে ধীরে ধীরে সম্ভবত নুরুল ইসলামের সঙ্গে মতান্তর হয়ে থাকবে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লার । কারণ দুজনের রাজনৈতিক বিশ্বাস দুধরনের হলেও রাজনৈতিক চর্চা দেশে আগে ছিলনা বলে এক সঙ্গে কাজ করা সম্ভব হয়েছিল, পরে দেশে রাজনৈতিক কাজকর্ম পুনরুজ্জীবন লাভ করে। নুরুল ইসলাম হয়তো অন্য কাজে ব্যস্ত বেশী হয়ে থাকবেন, ফলে পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। এইরকম একটা ধারনা সাহিত্যসমাজে চালু আছে যে, পূবালী ১৯৭০ -৭১ পর্যন্ত চলেছিল, কিন্তু তা ঠিক নয়। সমকালের ১৩ বর্ষের শেষ সংখ্যায় একটি আলোচনায় পুবালী কে 'আধুনালুপ্ত' (২৫৭পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) পত্রিকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সে যাই হোক 'পুবালী' নামের পত্রিকাটি বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবধারার ছিল নামেই প্রমাণ। পূর্বাপূর্বী একটা ভাব পুবালী নামের মধ্যে অবশ্যই ছিল। উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টার মধ্যেও সাহিত্য ও সমাজসেবার খাঁটি একটা প্রেরণা ছিল, দেশের সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যিক পরিস্থিতির পরিবর্তন করে নতুন অবস্থায় উন্নতকরণের সেই প্রেরণা এর সর্বত্রই লক্ষনীয়। আশ্বিন ১৩৬৭। সেপ্টেম্বর ১৯৬০ সনে প্রকাশিত পূবালীর প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় তাঁদের এই উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত ও হয়েছে। কিন্তু একটি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত বের করা কি খুবই সহজ কথা? বিশেষ করে উর্দু ভাষার পত্রিকাগুলোকে সরকার যেখানে অযাচিত পৃষ্ঠপোষকতা দান করতে চায়, আর বাঙলা ভাষার পত্রিকাগুলোর কণ্ঠরোধ করার প্রচেষ্টায় যেখানে কোন গাফিলতি নেই , সেখান থেকে বাংলা মাসিক সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ করা এবং তাতে স্বাধীন সাংবাদিকবৃত্তির চরিতার্থতা সৃষ্টি এবং শিল্পস্রষ্টার নিরপেক্ষ উচ্চারণর অভিলাষ–অভিপ্রায় বাধাগ্রস্ত হবে সেটাই স্বাভাবিক । এই বেদনাঘন অনুভব পূবালীর দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশকের নিবেদন–এও মূর্ত হয়েছে। .... 'গত এক বছর অদম্য প্রেরণা ও সাংস্কৃতিক স্পৃহা নিয়ে পুবালীকে সর্বাঙ্গীন বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে পথ কেটে এগিয়ে আসতে হয়েছে। পূর্ব –পাকিস্তানের সৃজ্যমান সাহিত্য –সংস্কৃতির অগ্রগতির পথ রচনা এবং তার সুষ্ঠু বিকাশের ক্ষেত্র অবারিত করার দায়িত্ব নিয়েই পুবালী র আত্মপ্রকাশ; গত এক বছর এ দায়িত্ব প্রতিপালনে পূবালী যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে তার এ সংগ্রাম পূর্ব–পাকিস্তানের সাহিত্যিক, সংস্কৃতিসেবী ও সাহিত্য মনা পাঠকবৃন্দ অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে এসেছে । তাদের এ সমর্থনই পুবালীকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ ও পরিনামে সাফল্যমণ্ডিত করেছে। গত এক বছর 'পূবালী'কে নানা ফ্রন্টে সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যক্ষেত্রে রম্যতাপ্রয়াসী প্রচেষ্টা এবং হালকা সিনেমা পত্রিকার অবারিত আত্মপ্রকাশের ফলে সুষ্ঠু সাহিত্য–সংস্কৃতিমূলক পত্রিকার অকালমৃত্যু প্রায় বিধিলিপি হয়ে দাঁড়িয়েছে; সিনেমা ও রম্যপত্রিকার রাজত্ব যেখানে একচ্ছত্র ও অবারিত, সেখানে সাহিত্য–সংস্কৃতিমূলক পত্রিকার ক্ষীণপ্রাণতা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু পাঠক–রুচির নিম্নগামিতা বোধ করে তাকে সুস্থ সাহিত্যের রসাস্বাদনে অভ্যস্ত করে তোলার দায়িত্ব দেশের সাহিত্যিক ও সুধীবৃন্দের।' প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয় ঃ

"সহিত্য সংস্কৃতির উপাদান হলেও সংস্কৃতির পরিপূরক ও পরিপোষক হিসেবে সাহিত্যের স্থান সর্বাগ্রে। .... তাছাড়া বুদ্ধিবৃত্তির সাথে এর অতি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় মননশীলতার ক্রমবিকাশে সাহিত্য একান্তই অপরিহার্য। তবে প্রত্যেক দেশেই সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সাহিত্যসৃষ্টি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তার উপর আবার রয়েছে ভৌগলিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাব। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাবকে উপেক্ষা করে সাহিত্য কোনখানেই গড়ে ওঠেনি বা গড়ে উঠতে পারে না। এর জন্ম ও পুষ্টি সবখানেই পরিবেশের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই সাহিত্য সৃষ্টির পরিবেশ যে এখনো আশানুরূপ অনুকূল হয়ে ওঠেনি, তা বলা নিশ্চয়ই অতিশয়োক্তি হবেনা। আমাদের পত্রিকাকে অবলম্বন করে সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত হয় ও সাহিত্য বিকাশ লাভ করে। সাহিত্যের

Dhaka University Institutional Repository

ধারাকে ঠিক পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব সাময়িক পত্রপত্রিকাগুলোরই। আজাদী লাভের পর বহু পত্রপত্রিকা এখানে আত্মপ্রকাশ করেছে। এদের মধ্যে সবগুলোই যে ঠিকমতো টিকে আছে বা টিকে গেছে, তা নয়। কিন্তু একথা ঠিক যে এগুলির বর্তমান সংখ্যা প্রয়োজনানুপাতে নৈরাশ্যজনক নয়। এর উপর নতুন নতুন মাসিক, দ্বিমাসিক, পত্রিকা একটি দুটি করে ক্রমশ চালু হচ্ছে। তবে একথাও ঠিক যে যথাযোগ্যভাবে নিজনিজ ভূমিকা-পালনের ব্যাপারে অনেক পত্রপত্রিকার ক্ষেত্রেই অভিযোগ ও পাল্টাঅভিযোগ শোনা যায়। এসবই অবশ্য কোন বিশেষ মতামতকে কেন্দ্র করে থাকার কারণে। সাহিত্য সৃষ্টিতে কোন বিশেষ মতামতকে প্রশ্রয় ও প্রাধান্য দেওয়া উচিত কিনা, তা নিয়ে এক বিরাট মতভেদ রয়েছে। এ মতভেদের কোনদিন অবসান হবে কিনা, তা নিশ্চয় করে কেউই বলতে পারেনা। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে কোন পত্র-পত্রিকার পরিচালকদের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব নেই। অভিযোগ যা শোনা যায় তা রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে। এখানে একদিকে যেমন অভিযোগ আছে, তেমনি আর এক দিকে পাল্টা অভিযোগও আছে। নিজ নিজ স্বাধীন মত প্রকাশে ও নিজ নিজ মত অনুযায়ী কোন বিশেষ ধারাকে অবলম্বন করার ব্যাপারে অন্ততঃ সাহিত্যক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন না তোলাই আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি। কারণ, সাধারণ নীতিবোধ প্রত্যেকটি পত্রপত্রিকার কাছ থেকেই দেশবাসী আশা করে। সাহিত্যক্ষেত্রে কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রতি গুরুত্ব না দেবার নীতি গ্রহণ করেই 'পূবালীর আত্মপ্রকাশ। অন্যান্য সাময়িকীগুলোর সাথে মিলিতভাবে কাজ করে যাওয়াই আমাদের আন্তরিক বাসনা। তবে আমাদের আন্তরিকতা যতই থাকনা কেন, পত্রিকা হিসাবে পূবালীর সাফল্য নির্ভর করে আমাদের লেখক-লেখিকা ও পাঠকসমাজের সহানুভূতি ও সহযোগিতার উপর। আমাদের লেখকলেখিকাদের কাছ থেকে সহানুভূতি ও সহযোগিতা পাবো এই আশা নিয়েই আমরা সাহিত্যসেবার ক্ষেত্রে অন্যান্য সাময়িকীগুলোর সাথে শরীক হবার সাহস করেছি। আমাদের এই প্রথম সংখ্যায় যাঁরা লেখা দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন, তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমাদের ঢাকা বেতার কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষদেরও আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ না জানিয়ে পারিনা। জনাব মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর 'বাংলা সাহিত্যে নজরুলের দান' জনাব আশকার ইবনে শাইখের 'কাব্যনাটকের সম্ভাবনা', জনাব আহমদ শরীফের 'লালনশাহ' ও সৈয়দা সুলতানা আরার 'জাতি গঠনে নারী' এই চারটি প্রবন্ধ প্রকাশের অনুমতি দেয়ায় আমরা সত্যই ঢাকা বেতার কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।[৮৫] বলাবাহুল্য, ঐ চারটি প্রবন্ধ রেডিও-কথিকা হিসেবে প্রচারিত হলেও রচনাগুলো সাহিত্যগুণ সম্পন্ন ছিল।

বলা হয়েছে যে, পূবালী প্রকাশের পরে -পরেই জনপ্রিয়তা লাভে ধন্য হয়েছিল। পত্রিকার পাতাতেও এর প্রতিধ্বনি অনুরণিত হয়ে আছে। প্রথম বর্ষ দশম সংখ্যায় 'প্রকাশকের কথায় বলা হয় : 'পূবালী বিদগ্ধজনের প্রশংসা ও অভিনন্দন লাভ করায় এও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, দলীয় গোষ্ঠী বা সংকীর্ণ শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যপত্রিকার প্রকাশ অপেক্ষা সুস্থ জাতীয় মানসিকতা এবং সাহিত্যিক মূল্যমানের ভিত্তিতে সাহিত্যপত্রিকার প্রকাশই সকলের কাম্য। ... পাঠক পাঠিকাদের সুবিধার জন্য আমরা একটি বিশেষ কনসেশনের ব্যবস্থা করেছি। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৮ টাকার স্থলে মাত্র ১৩.৫০ টাকায় তিন বৎসরের এককালীন গ্রাহক করা হবে। দেশে সুস্থ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক মানসিকতা ও নূতন নূতন পাঠক সৃষ্টি করে বৃহত্তর সাহিত্য পরিমণ্ডল গড়ে তোলার উদ্দেশ্য এই ব্রত গ্রহণ করতে হয়েছে। দেশে সাহিত্যের অনুকূল পরিবেশে গড়ে তোলার জন্যই এই বৃহত্তর পাঠক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা অপরিহার্য। এটাকে আমরা একটা জাতীয় দায়িত্ব বলেই মনে করি।[৮৬]

সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজের অগ্রগতিতে 'পূবালী'কে নিবেদন করেই উদ্যোক্তারা ক্ষান্ত হননি। সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তাঁরা বেসরকারী পর্যায়ের 'সাহিত্য-পুরস্কার'ও প্রবর্তন করেছিলেন। 'লেখক সংঘ পত্রিকা'র কার্তিক ১৩৬৮ সংখ্যার সম্পাদকীয় থেকে জানা যায় : " পূবালীপত্রিকার সম্পাদক জনাব নূরুল ইসলাম সাহিত্যের উন্নতিকল্পে বাৎসরিক ১০০০ (এক হাজার) টাকার একটি পুরস্কার ঘোষণা করেছেন ... এই শ্রেণীর বেসরকারী পুরস্কার পূর্বপাকিস্তানে এই-ই প্রথম।' লেখক সংঘ পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে পূবালী কর্তৃপক্ষের এই নয়াব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়ে বলা হয় : পাকিস্তানে এতদিন এ ধরণের কোন পুরস্কার ছিলনা। লীগ গভর্ণমেন্ট বা আওয়ামী লীগ গভর্ণমেন্ট কবি সাহিত্যিক বা শিল্পীদের প্রতি কোন দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন বোধ করেননি। বর্তমান গভর্ণমেন্টের (আইউব খাঁর) আমলেই লেখক ও শিল্পীরা স্বীকৃতি পাওয়া শুরু করেছেন।' গুণীজনদিগকে খেতাব ও পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। প্রেসিডেন্টস মেডেল ফর প্রাইড অফ পারফরমেন্স' একটি উল্লেখযোগ্য সরকারী পদক। এই পদকের সঙ্গে পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী বা সাহিত্যিককে প্রেসিডেন্ট ৫০০০ (পাঁচ হাজার) থেকে ২০,০০০ (বিশ হাজার) পর্যন্ত অর্থ-পুরস্কারও দান করেন। সম্প্রতি পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের চেষ্টায় 'আদমজী প্রাইজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উর্দু ও বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার জন্য আদমজী হাউস প্রতি বৎসর ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা পুরস্কার দান করছেন। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে এতবড় মর্যাদাসম্পন্ন পুরস্কার আর নাই।বলা বাহুল্য এই পুরস্কার দ্বারা লেখকদের মর্যাদা, শক্তি ও সম্ভাবনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য আদমজী পুরস্কারের কর্তৃপক্ষ নিঃসন্দেহে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র। পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের তরফ থেকেও প্রতি বছর একহাজার টাকা মূল্যের পাঁচটি পুরস্কার দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।[৮৭]

বলা প্রয়োজন ষাটের দশক সাহিত্য-পুরস্কার নিয়ে দলাদলি হানাহানি গালাগালি এবং তীব্র প্রতিযোগিতার যুগ ছিল। আইউব খানের মাথায় এটি আগে এসেছিল, নাকি তাঁর পশ্চিম-পাকিস্তানী সচিবদের মনে কথাটি বস্‌কে খুশি করার জন্যে তৈরি হয়েছিল তা আজ আর জানার উপায় নেই। তবে এই অদ্ভুত কৌশলটি আইউব খান এর আমলে উদ্ভব ও প্রসার লাভ করে ব্যাপক ভাবে। পাকিস্তানবাদী লেখকচিন্তাবিদগণ সাহিত্যের উন্নতির জন্য 'রাষ্ট্রীয় সাহায্য' বিষয়টিকে শ্রদ্ধেয় ও সমাজের জন্য কল্যাণকর রূপে প্রচারের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। পূবালীতে 'পুরস্কার' বিষয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। পূবালী অবশ্য চেয়েছে আন্তরিকভাবে পুরস্কার-পৃষ্ঠপোষকতা-উৎসাহ দিয়ে শিল্পী সাহিত্যিকদের সৃষ্টিশীলতাকে লালন করতে অথবা পুষ্টি জোগাতে। আহমদ ফারুক, আনোয়ার আহমদ, ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন প্রমুখ ঐকালের সাহিত্য-পুরস্কারের নিয়মরীতিদুর্নীতির সমালোচনা করে একটি সুস্থ সুন্দর নিয়ম প্রবর্তনের পক্ষপাতিত্ব করেছেন। এতে করে পূবালীর অভিপ্রায়টা বুঝা যায়। আর সেই কারণে 'পূবালী'ও পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছিল। তৃতীয় বর্ষ দশম সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৭০) 'পূবালী'তেই জানা যায় 'পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং অগ্রগতিতে 'পূবালীর বিশিষ্ট ভূমিকা ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্প্রতি পূর্বপাকিস্তান সরকারের জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো 'পূবালী'কে একহাজার

Dhaka University Institutional Repository

টাকার একটি পুরস্কার প্রদান করেছেন।' ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন 'সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় সাহায্য' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন এ বিষয়ে গত কয়েক বৎসর ধরে অনেক আলোচনা হলেও এ নিয়ে পৌনপুনিক আলোচনার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায়না। 'রাষ্ট্রীয় সাহায্য সম্পর্কে আজ যাঁরা সন্দিহান তাঁদের প্রধান আপত্তি সাহায্যে নয়, সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র যে নিয়ন্ত্রণাধিকার দাবী করে বসে সেটাতে। .... অনুন্নত দেশে যেখানে পৃষ্ঠাপোষকতার অভাবে শিল্পের অপমৃত্যু ঘটবার আশংকা রয়েছে সেখানে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া উপায়ে নেই। সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকায় আমরা এমনই একটা সংকটে পড়েছি। শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখাবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের অদম্য কিন্তু আমরা জানি কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় সাহায্য না হলে শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা মুস্কিল হবে। এ সমস্যার কোন সর্বগ্রাহ্য সমাধান আছে কিনা সন্দেহ। আজকাল অনেক দেশে নানাভাবে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোথাও কোথাও প্রতিশ্রুতিশীল লেখকদের ভাতা ইত্যাদি দিয়ে উৎসাহিত করবার চেষ্টা হচ্ছে। এতে সাহিত্যের অকল্যাণ ঘটবার কোন সম্ভাবনা আমি দেখিনা, যদি যাঁরা এ সাহায্য বিতরণ করেন তাঁদের মধ্যে সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি সত্যিকারের আনুগত্য থাকে। রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লেখকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে বলেই হস্তক্ষেপ করাটাকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে মেনে নিতে হবে এমন কোন কথা নেই। ... অপরপক্ষে রাষ্ট্রীয় সাহায্যে সাহিত্যের অবনতি ঘটবে বলে যে ধারণা সেটা কতদূর সত্য তা নির্ভর করে সাহিত্যিকের উপর। যে ব্যক্তি সরকারের সাহায্য লাভের প্রত্যাশায় শুধু প্রচার কার্য করেন তাকে সাহিত্যিক বলা যায় কিনা সন্দেহ। সাহিত্যের পবিত্রতা রক্ষা করার দায়িত্ব সাহিত্যিকেরই। আমরা সাধারণত আশা করি যে বিবেক বলে একটা বস্তু তার থাকবে। যদি তা না থাকে সেটা চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। তবে সেজন্য সম্পূর্ণ দোষ রাষ্ট্রের উপর চাপিয়ে দেওয়া কোনক্রমেই সমীচীন হতে পারেনা। .... যে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের যৌক্তিকতা সম্পর্কে যাঁদের উন্নাসিকতার অন্ত নেই তাঁরাই ব্যক্তিগতভাবে ও দলগত স্বার্থের খাতিরে অথবা কখন কোন ভুল ধারনার বশবর্তী হয়ে সাহিত্যের কন্ঠরোধ করবার পক্ষপাতী। শিল্পী ও সাহিত্যিক নিজেরা যদি পরমত সহিষ্ণুতায় বিশ্বাসী না হন তবে সে সমাজে শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হবেই। আজ আমাদের সমস্যা রাষ্ট্রের সাহায্যের সম্ভাব্য পরিণাম কি হতে পারে তা নয়; কারণ এর কুফল কি হতে পারে বিশ্বের অনেক স্থানে আমরা দেখেছি,এ সম্বন্ধে কোন মতবিরোধের অবকাশ নেই। কিন্তু আমরা নিজেরা যদি সাহিত্য ও শিল্পের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি তবে এই পরিণাম কখনও বাস্তব হয়ে উঠবে না। কারণ রাষ্ট্র সমাজে প্রবহমান চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার নীতি নির্ধারিত করেন। সাময়িকভাবে কোন কোন দেশে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলেও শিল্পের সাধনা সম্পর্কে এটাই হল শেষ কথা। পাকিস্তানে সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় সাহায্য প্রয়োজন আছে। কিন্তু সাহিত্য যদি উন্মুক্ত নেত্রে এবং সজাগচিত্তে এই সাহায্য গ্রহণ করতে পারে, তাহলে আশংকার কোন কারণ নেই।'[৮৮]

পাকিস্তান আমলে সাহিত্য-পুরস্কারগুলো নিয়ন্ত্রিত হতো সরকারঘেষা প্রবীণদের দ্বারা ; আর অধিকাংশ পুরস্কার প্রবর্তক ছিলেন কায়েমী স্বার্থের সপক্ষশক্তি। এখানে তাই অনিয়ম ছিল। এসবের সমলোচনা করে আহমদ ফারুক লিখেছেন ঃ

'সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি'র ফলে যে পরিস্থিতির মারাত্মক উদ্ভব হয় তার সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গোপালকৃষ্ণ আদিগার বলেন, "সরকারী উদ্যোগে একটি মাঝারী ধরনের বইকে শ্রেষ্ঠ বইয়ের সম্মান দেওয়ার অর্থ হল অকিঞ্চিৎকর জিনিসকে অসামান্য করে তুলে ধরা। এতে শুধু সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে যে এক ধরনের ভ্রান্তমানের সৃষ্টি হয়, তাই নয়, মূল্যবোধেরও চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটে। ফলে সাধারণ পাঠকের মনে একটি বই সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। এ ধরনের বিভ্রান্তি ক্রমান্বয়ে ঘটতে থাকলে অবশেষে তা নিরোধ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। অবশ্য বর্তমানে আমাদের জন্যে সান্ত্বনার কথা এই যে, কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যিকার ক্ষমতাশীল ও প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিককেও সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রবীণদের তালিকা ফুরিয়ে গেলে স্বভাবতই অপেক্ষাকৃত তরুণ সাহিত্যিকদের পুরস্কার দানের পালা আসবে; কিন্তু পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছে তাতে ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, তরুণ সাহিত্যিকেরা ভবিষ্যতে পুরস্কার লাভের আশায় যে কোন প্রচেষ্টা ও পন্থা অবলম্বন করতে দ্বিধাবোধ করবেন না, ফলে তাঁদের সামনে পুরস্কারের লোভটি বড় হয়ে দেখা দেবে, সৃজনশীল সাহিত্য প্রয়াস গৌণ হয়ে যাবে। কারণ, প্রবীণেরা যে পরিবেশে সাহিত্য-সাধনা করেছেন সেখানে সাহিত্যপুরস্কারের কোন লোভ ছিলনা, তাঁরা প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই সাহিত্য সাধনা করেছেন। কিন্তু বর্তমানের তরুণদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। তাঁরা সাহিত্য-পুরস্কার প্রাপ্তির দিকেই তাঁদের সকল শিল্প-প্রয়াস নিয়োজিত রাখছেন। .... পুরস্কার পাওয়ার বিপদের চেয়েও আশঙ্কার বড় কারণ এই যে, একজন সত্যিকার সৃজনশীল লেখকও হয়তো পুরস্কারের লোভে যে কোন ধরনের রচনায় উদ্যোগী হয়ে উঠবে। ফলে তাঁর সত্যিকার অনুপ্রেরণার সৃষ্টির বদলে তিনি পণ্যদ্রব্যশ্রেণীর রচনায় আত্মনিয়োগ করবেন এবং তখনি সাহিত্য পণ্যদ্রব্যে পরিণত হবে।'[৮৯]

খ. পত্রিকার নিয়মাবলী'তে বলা হয় ঃ প্রত্যেক বাংলা মাসের ৫ তারিখে পূবালী নিয়মিত প্রকাশিত হয়। চাঁদার হার বার্ষিক ছয় টাকা, ষান্মাসিক তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা। প্রতি সংখ্যা পঞ্চাশ পয়সা। 'পূবালী'র কার্যালয় ছিল, ৬৮ বেচারাম দেউড়ী, ঢাকা ১। সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম কর্তৃক কালচারাল প্রেস ১৪- ১৫ বাবু বাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। নিজউপ্রিন্ট কাগজে, পৌনে এগার ইঞ্চি × সোয়া আট ইঞ্চি সাইজে ৬৪, ৬৬, ৭০, ৭২ কিংবা ৮০ এবং বিশেষ সংখ্যায় ততোধিক পৃষ্ঠা থাকতো। 'প্রচ্ছদ' নিত্যনতুন উন্নত তবে পাতলা কাগজে ছাপা হতো। পরিচ্ছন্ন রুচিশীল পত্রিকা হিসেবেই 'পূবালী' প্রকাশিত হতো। এর প্রচ্ছদ শিল্পী ছিলেন পূর্ববাংলার প্রধান শিল্পীবৃন্দ। 'অঙ্গসজ্জা' বা 'অভ্যন্তরীণ অঙ্গসজ্জা'য় ছিলেন বিভিন্ন সংখ্যায় আবদুর রউফ, আবদুস সবুর, মোহাম্মদ ইদ্রিস, দীপেন বসু, হাশেম খান, কাইউম চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী, আহমদ ফজলুল করীম, কালাম মাহমুদ, কাজী আবুল কাসেম, আশীষ চৌধুরী প্রমুখ এবং স্টুডিও পাশা। বিজ্ঞাপন তারা মোটামুটি ভালোই পেতেন। তাছাড়া নিজেদের প্রকাশিত বইয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়েছিল এর প্রকাশক-মালিক সম্পাদকদের।

পূবালীর পৃষ্ঠায় বাংলাদেশের কবি সাহিত্যিক প্রাবন্ধিকদের অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তৎকালে মোহাম্মদী-মাহেনও-দিলরুবা এবং সওগাত সমকাল কটিমাত্র মাসিক কাগজ ছিলো। 'নবগঠিত দেশের সৃজ্যমান সাহিত্য' গড়ে তোলার কাজে এগুলো পর্যাপ্ত ছিলো তা বলা চলেনা। তাই পূবালীর পৃষ্ঠাতে লেখকদের আত্ম-প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টির অবকাশ ছিলো এবং কালের, যুগের, দেশের দাবী ছিলো সাহিত্যসেবার জন্য এগিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আসবেন দেশপ্রেমিক কর্মীবৃন্দ। বস্তুত পূবালী সেই দাবী মিটিয়েছিল। অনেক স্থায়ী মূল্যের কাব্য, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটিকা, একাঙ্কিকা, কথিকা, আলোচনা, অনুবাদ-সাহিত্য এতে ছাপা হয়েছিল। প্রতিমাসে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকায় নানা শিরোনামে ছোটবড় যতো রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, সেসবের বিবরণ বা পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে লেখক ও লেখার পরিচয় দিলে পত্রিকাটির ভূমিকা সম্পর্কে মোটামুটিভাবে সাধারণ একাট ধারণা গড়ে ওঠা সম্ভব। সেই বিবেচনাতে নিম্নে শ্রেণীবিন্যাসিত তথ্যাবলী উল্লেখ করা হলো। এতে দেখা যাবে অনেক লেখকই সকল শাখাতে বিচরণ করেছেন। মুক্ত হস্তে তাঁরা কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক লিখেছেন, পুস্তক-পরিচয় দিয়েছেন, বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় এবং অনুবাদকর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন।

পূবালীতে কবিতা লিখেছিলেন ঃ বেগম সুফিয়া কামাল, আবদুল কাদির, শামসুর রাহমান, ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, তালিম হোসেন, আবদুল হাই মাশরেকী, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, হাসান হাফিজুর রহমান, ফজল শাহাবুদ্দিন, এনামুল হক, আবদুর রশীদ খান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, ওমর আলী, দিলওয়ার, প্রজেশকুমার রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আবদুল গাফফার চৌধুরী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, ইমরুল চৌধুরী, আতাউর রহমান, অতুল রঞ্জন দে, সাদিকীন, কে, জি, মোস্তফা, আসাদুল্লাহ খান গালিব, আহমদ সাত্তার, মোহাম্মদ মামুন, জিয়া হায়দার, আল মাহমুদ, হাবীবুর রহমান, আবদুল মজিদ, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, শহীদ কাদরী, মুস্তফা জামাল, হেমায়েত হোসেন, গোলাম রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবদুস সাত্তার, আনোয়ার পাশা, মোহাম্মদ মামুন, সুশীল কুমার গুপ্ত, আবু শাহরিয়ার, লতিফা হিলালী, আবু কায়সার, কায়সুল হক, শাহেদ আলী, সন্তোষ গুপ্ত, সৈয়দ শামসুল হক, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, হামিদুজ্জামান খান চৌধুরী, বে-নজীর আহমদ, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, মযহারুল ইসলাম, সঞ্জয় বড়ুয়া, নচিকেতা ভরদ্বাজ, আজহারুল ইসলাম, তরীকুল আলম, ওমর আবু রীশা, হায়াৎ মামুদ, আনোয়ার পাশা, রফিক আজাদ, জসীম উদ্দীন, ফতেহ লোহানী, সৈয়দ আলী আহসান, প্রশান্ত ঘোষাল, সেলিম সারওয়ার, আখতার হুসেন, রফিক আজাদ, শশাংক পাল, শহীদুর রহমান, ফারুক মাহমুদ, আবদুল কাদের, আখতারুল আলম প্রমুখ।[৯০]

গল্প লিখেছিলেন ঃ নাজমুল আলম, আশরাফউজ্জামান, মকবুলা ইউসুফ, আবদুল গাফফার চৌধুরী, খোরশেদ আনোয়ার জিলানী, সাদিকা সাঈদ, শওকত ওসমান, মোয়াজ্জেম হোসেন, সরদার জয়েনউদ্দীন, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, মীর আবুল হোসেন, আবদুস সাত্তার, মোহাম্মদ আজিজুল হক, সোফিয়া মিরজা, জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী, ফজল শাহাবুদ্দিন, আবু ইসহাক, রাজেন্দর সিংবেদী, বোরহানউদ্দীন খানজাহাঙ্গীর, বুলবুল ওসমান, হামেদ আহমদ, সুধীর চৌধুরী, কাজী আবুল হোসেন, আবদুল হক, আবদুস সালাম, নূরুল ইসলাম খান, হুমায়ুন খান, আনিসুল ইসলাম, শওকত আলী, আশীষ কুমার লোহ, জিয়াউদ্দীন আহমদ, মমতাজ শিরীন, কলিম আনোয়ার, ইসহাক চাখারী, মনিরউদ্দিন ইউসুফ, নিত্যচক্রবর্তী, আহমদ রফিক, এ. টি. এম. আনিসুজ্জামান, আজিজুল হক, কাজী মুস্তাফিজুর রহমান, আতোয়ার রহমান, সিকান্দার দারা শিকোহ, নির্মল চট্টোপ্যাদ্যায়, এ. বাসির, এরশাদ হোসেন,কামাল বিন মাহতাব, হুমায়ুন কাদির, আমীনুজ্জামান, নূরউল আলম, আবদুল মান্নান খান, মবিনউদ্দিন আহমদ, মুস্তফা জামসীদ আহমদ, শাহেদ আলী, আশরাফ আলম, আমিনুল ইসলাম, অমৃত প্রীতম, মিরজা আ.মু. আবদুল হাই, মোজাম্মেল সিদ্দিক, সেলিমউদ্দিন আহমদ, আতাউর রহমান, ওমর আলী, দিলওয়ার, আবদুল হাই মাশরেকী, মুহম্মদ আজিজ, আবু শাহরিয়ারর, হাসান আজিজুল হক, আবদুল মওদুদ, মীর নূরুল ইসলাম, কলিম আনোয়ার, লুৎফর রহমান, রাহাত খান, আবদুল আজিজ আল নোমান, গোলাম রব্বানী খান, কাজী আবদল আলীম, রাবেয়া খাতুন, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, মাহবুব তালুকদার, টিপু সুলতান, আবদার রশীদ, রশীদ হায়দার, মুহম্মদ সফিকুল্লাহ, সৈয়দ শামসুল হক, মানিক চৌধুরী, আফাজউদ্দিন আহমদ, গোলাম আব্বাস, মাহবুবুল আলম, মসিহউদ্দিন শাকের, আকান্দাস সিরাজুল ইসলাম, মোনাজাতউদ্দিন, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, দিলারা হাশেম, আবদুল মান্নান সৈয়দ, মীজানুর রহমান, হেমায়েত হোসেন, হুমায়ুন আজাদ, আহমদ ছফা, আবুল এহসান, মোহাম্মদ আলী, লায়লা সামাদ, সৈয়দ আবদুস সামাদ, আবুল হাসানাত, কামরুল আহসান, আবু আল সাঈদ, আবুল হাসান শামসুদ্দীন, ভূঁইয়া বজলুর রহমান, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, সৈয়দ আলী নকী, জাফর আলমগীর, আশকার ইবনে শাইখ, আ.ন.ম বজলুর রশীদ, আজিজুল হক, বেগম সুমলিমা সালাম প্রমুখ।

প্রবন্ধ ও প্রবন্ধকার ঃ

- অরুণকুমার সরকার — কবি নজরুল (পুনর্মুদ্রণ চতুরঙ্গ থেকে, ৬/৮);
- অমিয় চক্রবর্তী — কবিতার চরিত্র (২/৬);
- আবুল ফজল — ব্যক্তিগত (৪/৫-৬);
- আবদুল কাদির — কোহিনুর (২/৪); অনুবাদক নজরুল (২/৩); মোজাম্মেল হকের কাব্যে স্বজাতিপ্রেম (৪/৯); ফররুখ আহমদের কাব্যনাটিকা ও সনেট কাব্য (৪/১০); পুথিসাহিত্যে মানবতা (৬/৪); হাজী শরীয়তুল্লাহ (৫/৭); সাহিত্যে প্রগতি (অভিভাষণ, ৫/৮); বাংলা সাহিত্যে মুসলিম চিত্র (৬/১-২); সাহিত্যসাময়িকীপ্রসঙ্গে (৪/৪); একটি জটিল ও মহৎ চরিত্র (৪/৯);
- আবুল কালাম শামসুদ্দীন —জননেতা ফজলুল হক (২/৯); আলীগড় আন্দোলন (৩/১২); সাহিত্যপরিক্রমা (৪/১০); মোজাম্মেল হক (৫/৯); আমাদের নাট্যসাহিত্য (৫/১০), সংস্কৃতির পুনর্গঠন (৬/৩); কংগ্রেস ও ভারতীয় মুসলমান (৬/৪); আমাদের উপন্যাসে জীবনবোধ (৬/৬); 'হাতেম তায়ী' (৬/৮); বাংলাভাষায় নয়া শব্দ (৭/১); পাকবাংলার মনন (১৩৫১ সনের অভিভাষণ, ৭/২-৩);
- আহমদ শরীফ — লালন শাহ (১/১); বাংলা সাহিত্যে আঁধার যুগের ইতিকথা (১/৬); রূপবান-রূপবতী উপাখ্যান (২/৬);
- আসকার ইবনে শাইখ — কাব্যনাটকের সম্ভাবনা (১/১); ভুল মুহূর্ত (২/১১)
- আবদুল মওদুদ — ইসলামী জীবনাদর্শ ও মুসলিম রাষ্ট্র (১/২); মুসলিম বিজ্ঞান চর্চার নবমূল্যায়ন (১/৩); গালিব ও আঠারশ সাতান্ন (১/৫), পাঠান জাতির

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য (৩/৬); তৃণে গাঁথা মোতির মালা (৩/১২); পশতু ভাষার ইতিবৃত্ত (৪/১); জাস্টিস আমীর আলী (৪/৩); সৈনিক কবি খুশহাল খান খটক (৪/১০);

- আবদুল হক — সাহিত্যিকদের ক্লাব (১/২); প্রান্তীয় সাহিত্যিক (১/৩) 'আবদুল্লাহ' (১/৫); সাহিত্যিকদের সমস্যা (২/৫); নজরুলের সমাজচিন্তা (২/৯); সমৃদ্ধি, সংস্কৃতি মূল্যবোধ (৪/৫-৬); আদিমতার প্রচ্ছায়ায় (৪/৭); সভ্যতার সংকট (৫/১); বেগম রোকেয়া (৫/৫-৬);
- আবুল কাসেম অধ্যক্ষ — বাংলা প্রচলনের কয়েকটি সমস্যা (৫/১১); পূর্বপাকিস্তান বাংলা ভাষা সম্মেলন (৭/৪-৫);
- আবদুর রহমান — শিল্প ও শক্তি (৪/১২) ; আইন (৫/১);
- আসমা — মোহাম্মদ আবদুল করিম (৪/১২);
- আসাদল হক — সঙ্গীতে নজরুল (৫/৫-৬);
- আবদুল কাদের — এই যুদ্ধের (পাক-ভারত, ১৯৬৫) ফলশ্রুতি (৬/১-২);
- আতোয়ার রহমান — চর্যাপদের বাংলাদেশ (১/১২); চট্টগ্রামের কয়েকটি বারোমাসী (২/৭), অনুবাদক নজরুল (২/৯); বারোমাসীতে ধর্ম ও সমাজ (২/১০); ঐতিহাসিক লোককাব্য (৩/১); রেনেসাঁ আন্দোলন (৩/৫); সমকালীন উপন্যাস (৩/৬); কচিমুখের কাকলী (৩/৮); সাংবাদিক নজরুল (৩/৯); সাম্প্রতিক শিশু সাহিত্য : কবিতা (৪/৫-৬);
- আতাউর রহমান— নজরুল ইসলাম ও বাংলা কবিতার ঋতুবদল (২/৯); নজরুল কাব্যে প্রেম ও রোমান্টিকতা (৫/৯);
- আহমদ ফারুক — ওস্তাদ মস্তানগামী (২/৩); সালভাদর দ্য মাদারিয়া গা (২/৪); লাহোরের মায়া (২/৭); সাহিত্য সাময়িকী সংঘ (২/৮) উইলিয়াম ফকনার (২/১১); হৃদয়ের কবি কামিংস (৩/২); আব্বাসউদ্দীন আহমদ (৩/৪); সাহিত্য সাময়িকী প্রসঙ্গে (পূর্ববাংলার তৎকালীন পত্রিকা (৭/৬-৭); পুরস্কারের প্রহসন (৪/২);
- আহসান হাবীব — চরিত্রগঠনে শিশু সাহিত্যের ভূমিকা (২/১২); পাক-বাংলার কবিতার কথা (৬/৬);
- আউউদ্দিন আল আজাদ — রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা : পূর্বলেখ (২/১০);
- আবদুর রশীদ খান — পূর্বপাকিস্তানের কাব্য- সাহিত্যের ধারা (২/১২);
- আবুল মনসুর আহমদ — আমাদের সাহিত্যের প্রাণরূপ ও আঙ্গিক (৩/৭); মওলভী মুজীবর রহমান (৭/৬-৭);
- আবু জাফর শামসুদ্দীন — লেখকের বৃত্তি (২/১২); বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম (৫/২);
- আহমদ রফিক — আধুনিক কবিতার উত্তর-চিন্তা (৩/৩);
- আবু সয়ীদ আইউব — সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (৩/২);
- আনোয়ার হুসেইন — বার্লিনের স্মৃতি (৩/৬);
- আলম কোরায়শী — মোপাসাঁর চিঠি (৩/১০); আব্রাহাম লিংকন (৪/৪);
- আমীর আলী — নজরুল কাব্য প্রসঙ্গে (৩/১১);
- আনোয়ার আহমদ — পুরস্কারের প্রহসন (৪/২);
- আবদুল আজীজ আল নোমান — শিশু সাহিত্যে নজরুল (৪/৯);
- আবু শাহরিয়ার — সংস্কৃতি ঐতিহ্য ও আজকের সাহিত্য (৪/৯);
- আজীজুল হক — আধুনিক কবিতার পাঠকসমস্যা প্রসঙ্গে (৪/১১);
- আইনুল হক খান — হবীবুল্লাহ বাহার (৬/৭);
- আবুল হাসানাত — লেখকের সমস্যা (৩/৩);
- আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ — নজরুল ও তাঁর পূর্বসূরী : আরবী ফার্সী শব্দের ব্যবহার (৩/৩);
- আফলাতুন — বিদেশী সাহিত্য প্রসঙ্গে (৩/৩);
- আবদুল্লাহ আল মামুন — পাক-ভারতীয় সঙ্গীতে প্রকৃতি (৬/৩);
- আবুল কাসেম ফজলুল হক — ইংরেজীর কথা ও বাংলা প্রচলনের সমস্যা (৫/১২); এস. এম. মোর্শেদ (৫/৮);
- আবদুস সাত্তার — পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ধর্ম ও লৌকিক আচার (১/৭); পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি গোত্রভেদ ও বিবাহ বৈচিত্র্য (১/১২); উপজাতীয় ছড়া (১/৯); আরবী লোকসাহিত্য (৩/২); চাকমা সংস্কৃতি ও লোক-সাহিত্য (৩/১২); পাঙখো ও বনযোগী (৪/১); খাসিয়া (৪/৪); পূর্ব পাকিস্তানের উপজাতি : ওরাও (৫/১০ ও অন্যান্য);
- আনোয়ারা আলম —রাজধানীর নাট্যশালা (১/১২);
- আখতাররুজ্জামান — হেমিংওয়ে ও বুড়ো (১/১১);
- আজিজুল করিম — শিল্পসৃষ্টি (২/২);
- আমিনুল ইসলাম — উপন্যাস ও ছোটগল্পের প্রকৃতি (২/৬) ;

Dhaka University Institutional Repository

- আ. ন. ম. বজলুর রশীদ — আধুনিক ইউরোপীয় কবিতা (২/৮);
- আবদুল মান্নান সৈয়দ — উপন্যাসের বিন্যাস (৬/৭);
- ইবরাহিম খাঁ — আমার সাহিত্যিক জীবনের পটভূমি (১/১); পাতালপুরীর প্রাসাদ (চীনভ্রমণ, ৬/৯-১২);
- ইবনে জামান — একটি মহান আলেখ্য (শেরে বাংলা সম্পর্কে , ২/৯);
- ইজাবউদ্দিন আহমদ — জহির বিন কুদ্দুস (৩/৮);
- ইউসুফ হোসেন ডক্টর — ভারতীয় ভক্তিবাদে ইসলামের প্রভাব (৬/১-২);
- এ. জি. সেলিম — আধুনিক পশতু কবিতা (১/৫);
- এজাজ হোসেন — নাটক ও নাট্যশিল্প সেমিনার (৫/৩); আবদুর রহমান খান (৫/৪);
- এস. এম. হাবীবুর রহমান — বাংলা ভাষায় ক্রমবর্ধমান বানানভুল প্রসঙ্গে (৩/২);
- এ. কে. এম. জালালুদ্দীন — কল্পনায় বিলাসিতা (৬/৪);
- এ. টি. এম. শামসুদ্দীন — চৌ এন লাই একটি মোহনীয় ব্যক্তিত্ব (৪/৭); জন . এফ. কেনেডি (৪/৩);
- এ. কে. এম. আহমদউল্লাহ — ক্ষুধা হতে মুক্তি (৪/১২);
- এম আমজাদ আলী — বিদেশে ইকবাল (৬/৭);
- এ. কে, এম. ইনামুল হক — সঙ্গীতে মুসলিম স্পেন (৬/৬);
- কাজী নজরুল ইসলাম — সাহিত্যে জীবন ও যৌবন (১/৫); যদি আর বাঁশী বা বাজে (২/৯);
- কাজী আবদুল ওদুদ — চিঠিপত্র (৪/৭);
- কাজী রফিকুল হক — মোজাম্মেল হকের গদ্যরচনা (১/৮);
- কাশতকার — পারিবারিক ও সামাজিক সুখশান্তিতে খাদ্যের স্থান (৫/৩);
- কাজী আফসারউদ্দিন আহমদ — প্রেম (২/৬); পারীর বিদ্রোহ (২/১০); জেনি লিণ্ড হ্যান্স এণ্ডারসন (৩/৪); বিচিত্রবিলাস (৩/৬); হেনরিক হাইনে (৩/৭); বিচিত্র বিলাস (৩/৯); ঈসপ : উপকথার রূপকল্প ও গতিপ্রকৃতি (৩/১);
- কালাম মাহমুদ — খৈয়াম প্রতিভার স্বীকৃতি (৪/৮);
- কাজী আবুল কাসেম — নজরুল প্রসঙ্গে (৩/৯); ব্যবহারিক চিত্র শিল্প (৫/৩)
- কাজী দীন মুহম্মদ ডক্টর — বিদেশী পুস্তকের অবাধ আমদানী ও পুনর্মুদ্রণে আমাদের সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া (৪/২);
- খালেকদাদ চৌধুরী — কাব্যকথা (২/৩);
- গোলাম রহমান — বইয়ের বিচার (১/১১);
- জিয়াউল হক — বিজ্ঞানী আবদুস সালাম (৫/১);
- জয়নাল আবেদীন — মুঘল চিত্রকলায় ইউরোপীয় প্রভাব (২/৫) ; ইসলামে সুফী-সাধনা (৪/৭ ও অন্যান্য ?; আরবজাতির সঙ্গীত -চিন্তা (৪/১০, ঐ);
- জাফর হাসান — সাহিত্য সংবাদ (২/৫ ও অন্যান্য) ;
- জিয়া হায়দার — নজরুল কবিসত্তার উপাদান (২/৯);
- জসীমউদ্দীন — কবি গোলাম মোস্তফা (৫/২);
- জহুরুল হক — নিজের সঙ্গে লড়াই (৪/৯);
- তোফায়েল আহমদ — পূর্ব-পাকিস্তানের স্বতন্ত্র ইতিহাসের ধারা (৬/৩);
- তমিজউদ্দিন খান — যখন জেলে ছিলাম (৩/২);
- তালিম হোসেন — কবি গোলাম মোস্তফা (৫/২);
- নাজির আহমদ — সাহিত্যে মৌলিকতা ও চৌর্যবৃত্তি (৪/৩);
- নরেন্দ্রদেব — সাগরপারের মেয়েরা (৫/২);
- নাজমুল আলম — লোকসঙ্গীতে মুসলমানের দান (২/১০ ও অন্যান্য)
- নূরুল ইসলাম খান — ইংরেজীর কথা (৪/৩);
- নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান — বাংলা সাহিত্যে আরবী ফার্সী শব্দের প্রবেশকাল (৫/৮); পুথিসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপাখ্যান (৫/৯);
- পর্যবেক্ষক— (ছদ্মনাম, সম্পাদকীয় সহকারী ?) – 'পোড়োজমি'র কবি (৫/৪);
- ফখরুজ্জামান চৌধুরী — বইয়ের বিচার (১/১১), লেখা ও পেশা (২/৮), আলডুস হাক্সলী (৪/৩); কবি স্যাজ্যা পার্স (১/৫);
- বুলবুল ওসমান — পাবলিক লাইব্রেরী ((১/৩); সমালোচনাহীন সাহিত্য-চর্চা (২/১০); সুবর্ণজয়ন্তী: ঢাকা যাদুঘর (৪/৭); চিত্রশিল্পী এন্ড্রুওয়েন (৪/১২); পাকিস্তান কাউন্সিল (৫/১)

Dhaka University Institutional Repository

- ফজলুর রহমান খাঁ — আরবীভাষা ও সাহিত্য (১/৭); ইহুদীবাদের গোড়াতে (১/৮) লিপিকার জন্মকথা (১/১০); আবাদের ইতিকথা (২/১);
- ফারুক মাহমুদ — সংস্কৃতির স্বরূপ (২/১);
- বেনামী (সম্পাদনা সহকারী কেউ?)— খাজা নাজিমুদ্দীন (৫/২); চার্চিল (৫/৫-৬); আফ্রো-এশীয় সেমিনার (৫/৮); নয়াচীনের অগ্রগতি (৫/৮); সমারসেট মম (৬/৪); ঐতিহাসিক লংমার্চ (৬/৪); পাকিস্তানের সেনাবাহিনী পটভূমি (৬/৯-১২);
- বযলুর রহমান — নজরুল সাহিত্যের নবমূল্যায়ন (৭/৬-৭);
- বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর — বুদ্ধিজীবী প্রসঙ্গে (১/১২, ৯ ও অন্যান্য); বাউল গান (২/৭); মীর মোশাররফ হোসেন (২/৮); বাউল দুদ্দুশাহ (১/৬); মধ্যবয়সে মোড় ফেরা (সৈয়দ আলী আহসান প্রসঙ্গে, ৩/১০); 'সাম্প্রতিক' (৩/১২); বাঙালী সমাজ ও ধর্ম (৪/৫-৬); একজন অনন্য কবি পুরুষ (৪/৯), রূপকথা (৫/৪);
- মোতাহার হোসেন —শিক্ষিত সমাজে রাজনৈতিক চিন্তাশূন্যতা (৩/৪);
- মাহবুব কোরায়শী — মোনালিসার মহিমা (৩/৭);
- মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেন খান — বানান ও উচ্চারণ সমস্যা (৩/১১);
- মোহাম্মদ নাসির আলী — পুথি সাহিত্যের নবরূপায়ন : নাটকে (৩/১২); জীবনের জয়যাত্রা (৩/১);
- মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (ডক্টর) — ভাষায় গণতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র (বাংলা হরফ, বানান ও ভাষা -সংস্কার প্রসঙ্গে বাংলা কলেজের উদ্যোগে আয়োজিত সভার অভিভাষণ; ৭/৪-৫);
- মোহাম্মদ আবু জাফর— পরিচ্ছন্নতা, মূল্যবোধের সাধনায় (৭/৬-৭);
- মোরশেদা হক — বিদেশী সাহিত্য প্রসঙ্গে (৩/১২);
- মোজাফফর হোসেন — চিত্রশিল্পী ডঃ কিংম্যান (৩/১০); আকবর এলাহাবাদী (৫/৪); বিদেশী সাহিত্য প্রসঙ্গে (৪/১০ ও অন্যান্য);
- মাহবুবউল আলম — কয়েকটি ইংরেজী শব্দের বুৎপত্তি(৪/১);
- মাহবুব তালুকদার — সাহিত্যে অশ্লীলতা (২/১);
- মাহবুব জামাল জাহেদী — কায়েদে আজম (৫/৪);
- মুহিউদ্দীন খান — আলতাফ হোসাইন হালী (২/২);
- মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ — বাংলা সাহিত্যে নজরুলের দান (১/১); ইসলামে ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞান (৩/১); সাহিত্যে স্বকীয়তা (৩/১২);
- মাহমুদ হোসেন, ডক্টর — পাকিস্তানী জাতীয়তা (২/৩);
- মুজীবুর রহমান খাঁ— সাহিত্যের নবরূপায়ন (১/২); নজরুল-সাহিত্য প্রসঙ্গে (১/৩); আমাদের সাহিত্য-সমস্যার পটভূমি (১/১১); আয়নুল হক খাঁ (৬/৫); আবুল কালাম শামসুদ্দীন (৬/৮);
- মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী — সাহিত্যব্রতীর প্রতি (অপ্রকাশিত, ১/২) জনভাষা ও বাবুভাষা (পু, মু, ৩/৮); মওলবী মুজীবর রহমান (পুনর্মুদ্রণ, ৭/৬-৭);
- মোবারক হোসেন খান— পারস্য সঙ্গীত (৬/১-২);
- মোহাম্মদ আবু তালিব — লালন শাহ প্রসঙ্গে (১/৪);
- মোহিতলাল মজুমদার— নজরুলের কবিতা ('মোসলেম ভারত' ১৯২০ থেকে)
- মোহাম্মদ মতিউর রহমান — নজরুল প্রসঙ্গে (১/৫); সাহিত্যে বাস্তবতা (২/২); মুসলিম জাগরণে নজরুলের ভূমিকা (৫/৯);
- মালিহা খাতুন— আন্দকারায় (১/৭);
- মুহম্মদ সিদ্দিক খান— ওসমান আফগানের স্বাধীনতা সংগ্রাম (৬/১-২)
- মীর আবুল হোসেন — প্রেমসাধনায় রবীন্দ্রনাথ (১/৮); নজরুল সম্পর্কিত গ্রন্থ (৬/১-২);
- মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ — লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন (১/৮); সমকালীন কবিতার ধারা (১/১০, ১১ ও অন্যান্য) ; সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা (২/১); আজীজুল হাকিম (২/৬); নজরুলের কাব্যাদর্শ (২/৯) ; রেনেসাঁ আন্দোলন (৩/৫); সকালীন প্রবন্ধ-সাহিত্য (৩/৮ ও অন্যান্য); নজরুল কাব্যপ্রসঙ্গে (৩/১১); 'মুহূর্তের কবিতা': একটি স্মরণীয় গ্রন্থ (৪/২); আধুনিক কবিতা: একটি সেমিনার (৪/৩); বাংলা উপন্যাসের রূপরেখা (৪/৪); বেদুঈন শমসের (মৃত্যু ১৯৬৪তে, ৪/৭); বাংলাকাব্যে পাকিস্তান (৪/১২); মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (৫/৭); বাংলা কাব্যের সাংস্কৃতিক পটভূমি ও নজরুলকাব্যের ধারা (৫/৯); মধুসূদনের পূর্বসুরী (৭/২-৩); বইয়ের বাজার (৭/২-৩);
- মকসুদ জামিল — আইভর এগুরিক (২/৩); কায়েদে আজমের সংস্কৃতি চিন্তা (২/৮); স্মরণী (৫/১);
- মনিরউদ্দিন ইউসুফ — রুমীর মসনভী (২/৩ থেকে অনুবাদসহ আলোচনা) ; ইসলাম : সমাজ বিপ্লব (৩/১২);
- মুহম্মদ আযীয — ভিটসাহের মাজারে ২/৪);
- মুহম্মদ আবদুল আজীজ — হেমিংওয়ে : ব্যক্তি ও শিল্পী (২/৩);
- মুনীর চৌধুরী — পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্য : সাহিত্যিক -পাঠক সমস্যা (২/৮);
- মুজফফর আহমদ — নজরুল ইসলাম ও 'মোসলেম ভারত' (৫/১১); কবি মোহিতলাল ও নজরুল ইসলাম ('নন্দন' থেকে, ৭/৪-৫);

Dhaka University Institutional Repository

- মিয়া জিয়াউদ্দিন —ভারতের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য কি? (৬/১-২);
- মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন — লালনশাহ ফকিরের গান (২/৮); বাউল কাহারা (৩/৪); বাউল কবি মেছেরশাহ (৩/১০);
- মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম — শেরে বাংলার তিরোধান (২/৯);
- মোহাম্মদ হোসেন ডাঃ — নজরুল স্মৃতি(৬/৮);
- মোহাম্মদ নাসির আলী — শিশু সাহিত্যের সমস্যা (২/১১); জীবনের জয়যাত্রা (৩/২);
- মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ —সন্দ্বীপে নজরুল (৩/৯); বালিচাপা রত্নটি (৫/৯);
- মকসুদুর রহমান হিলালী — মুসলিম সঙ্গীতের ঐতিহ্য ৩/৪); জসীমউদ্দীনের কাব্যে স্বদেশপ্রেম (৪/১১);
- মোস্তফা হারুন — দাক্ষিণাত্যে উর্দুর উৎপত্তি ও বিকাশ (৩/১১); প্রাচীন ইন্দোনেশীয়া (৪/১০); প্রেমিক নেপোলিয়ন (৫/৭);
- মনিরুজ্জামান— কায়কোবাদের-সাহিত্য সাধনার সামাজিক পটভূমি (৩/১২);
- মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহ —বাঙলার ইতিহাস ও বাঙালী (৪/১২);
- মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার — বিভিন্ন দেশের প্রাচীন জ্যোতিষে ঐক্য ও অনৈক্য (৪/১২);
- মোবাশ্বের আলী — টলষ্টয় : যুদ্ধ ও শান্তি (৬/৮ ও অন্যান্য);
- মাহমুদুল হক, ডক্টর— আমাদের গঠনতন্ত্র ও রাষ্ট্রভাষা (৬/৫);
- মুহম্মদ কুদরাৎ-ই-খুদা— মাতৃভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম ('মাতৃভাষা' থেকে সংকলিত, ৬/৫);
- মাহফুজুল হক (ডক্টর)— আমাদের সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন (৭/৪-৫);
- রশীদ হায়দার — যুদ্ধ ও রিকশা বেবী টেকসী (৬/৯-১১);
- যতীন সরকার — সাহিত্য সাময়িকী প্রসঙ্গে (৬/১২);
- রায়হান শরীফ — অনুন্নত অর্থনীতির কথা (৩/৩);
- রফিকুল ইসলাম খান — কবি শাহেদ সোহরাওয়ার্দী (৫/৭);
- রশীদ আল ফারুকী — পূর্বপাকিস্তানের উপন্যাস (৬/৩); প্রাচীন ও আধুনিক উর্দু কাব্যের ধারা (৭/১);
- শফিক আহমদ খান — ব্যক্তিত্ব গঠনে গলগ্রন্থির প্রভাব (২/১);
- শামসুল আবেদীন — সরকার ও সাহিত্য (২/২); সাংবাদিকের দায়িত্ব (২/৩);
- শাহাবুদ্দিন আহমদ — জীবনানন্দ-কাব্যের মূলসুর (২/৬); যতি নয় জিজ্ঞাসা (৩/৯) ; নজরুল কাব্য প্রসঙ্গে (৩/১১); সন্তের সাহিত্য (৪/৫-৬); চেকভ ও তাঁর নাটক (৬/৪);
- শরীফ আল মুজাহিদ — আজাদী সংগ্রামের শেষ পর্যায় (২/১২);
- সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী — বাংলা প্রচলন প্রসঙ্গে (৬/৫); রাগীদের দল (ইউরোপীয় সংস্কৃতি প্রসঙ্গে, ১/২); বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা (২/২); সমকালীন প্রবন্ধসাহিত্য (৩/১২); শাহাদাৎ হোসেনের কবিতা (৪/৯);
- সাইদ আহমদ — শিল্পী সফিউদ্দিন (ইংরেজী প্রবন্ধের বাংলা রূপান্তর মকসুদ জামিল, ১/২);
- সৈয়দা সুলতানা আরা — জাতিগঠনে নারী (১/১১);
- সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় — পূর্বপাকিস্তানের কথাসাহিত্য : উপন্যাস (১/৪); বিভাগোত্তর ছোটগল্প (১/৮); পল্লীকবি জসীমউদ্দীন (৩/৬); বাংলা কাব্যে জসীমুদ্দীন (৫/১০);
- সেলিম চৌধুরী — আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে (১/১১); আব্বাসউদ্দীন আহমদ (২/৪); প্রমীলা নজরুল (২/১); বিদেশী সাহিত্য প্রসঙ্গে (৩/৪), শান্তির সৈনিক মার্টিন লুথার কিং (৫/৩);
- সিরাজুদ্দিন মৃধা — সভ্যতার গ্রামীণ উপাদান (২/২);
- সুশোভন আনোয়ার আলী — সিন্ধুর লোকশিল্প (২/৩); কাজী আকরাম হোসেন (৩/৭);
- সৈয়দ আলী আশরাফ — আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য(২/৭ ও অন্যান্য); সমকালীন কবিতা ও ঐতিহ্য (৬/৭ ও অন্যান্য);
- সৈয়দ মুরতজা আলী — সিলেটের পুরনো কথা (২/৭); সিলেটের প্রথম কালেক্টর থ্যেকারে (৪/১১);
- সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ডক্টর — সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় সাহায্য (২/৯);
- সৈয়দ আবদুল মান্নান — ইকবালের আত্মদর্শন (২/১০); কায়েদে আজম : আইনজীবী ও রাজনীতিক (৩/৪); ইকবাল-দর্শনের মর্মকথা (৩/৮) ; পাকিস্তানী সমাজে পরানুকরণবৃত্তি (২/১২);
- সানাউল হক — শর্টকার্ট (৩/৬);
- সৈয়দ আমজাদ হোসেন — আফতাবউদ্দিন আহমদ (৩/১০);
- সিরাজুদ্দিন হোসেন — কোলকাতার বইয়ের পুনর্মুদ্রন প্রসঙ্গে (৪/২); বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ (৪/৮);

Dhaka University Institutional Repository

- সৈয়দ শাহজাহান— হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (৪/৩);
- হুমায়ুন আহমেদ — আলবেয়ার কামু (৩/১);
- হাসান হাফিজুর রহমান - ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতা ও দুর্বোধ্যতার প্রশ্ন (৪/৩); শুধুই কি শিক্ষিত না কালচার্ডও? (৪/৪); বাংলা ভাষা এবং বাঙালিত্ব (৪/৭); পয়লা বৈশাখ (৪/৮); যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (৫/১); স্বরূপের সন্ধানে (৫/৫-৬); নতুন নাট্যনিরীক্ষা (৫/১২); সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রশ্নে (৬/৩); একুশে ফেব্রুয়ারী এবং আমাদের দায়িত্ব (৬/৬);
- হাসান জামান — আজাদী সংগ্রামের এক অধ্যায় (১/৪); আগামীদিনে ধর্মের ভূমিকা (১/৮);
- হাবীবুর রহমান — জন স্টেইনবেক (৩/৩); হেমিংওয়ের ছোটগল্প (৩/৯); মাইকেল এঞ্জেলো (৩/১০); হ্যান্স এণ্ডারসন (৩/১১);
- হাকীম হাফেজ আযীযুল ইসলাম — হাকিম হাবিবুর রহমান (৫/৭);[৯২]

পূবালীতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক প্রবন্ধ সবই আছে অনূদিত রচনার মধ্যে। যেসকল বিদেশী লেখকের অনুবাদ হয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন ঃ

- আদ্রেঁ মরোয়া — ঔপন্যাসিক ভলতেয়ার (প্রবন্ধ, অনুবাদ আবুজাফর শামসুদ্দীন, ২/৮); একই অনুবাদক মরোয়ার অন্যান্য প্রবন্ধ ও পূবালীতে অনুবাদ করেন যেমন 'জীবন শিল্পী রুশো' (২/১১); 'ঔপন্যাসিক স্তাঁদাল' (৩/৪) ; ফ্লবেয়ার ও মাদাম বোভারী (৩/৯);
- আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে — খুনী (গল্প, অনুবাদক আহমদ রফিক, ১/৮) ; সন্ধ্যার গণ্ডগোল (গল্প, অনুবাদকের নাম নেই, ১/১২);
- আর্নল্ড টয়েনবি — সভ্যতার অগ্নিপরীক্ষা (প্রবন্ধ, অনুবাদকের নাম নেই, ১/১০); ধর্মসমাজ ও সভ্যতা (প্রবন্ধ, অনুবাদকের নাম নেই, ২/১২);
- আলবার্তো মোরাভিয়া — প্রতিযোগিতা (গল্প, অনুবাদক আহমদ মনজুর, ২/৪) ; লরিড্রাইভার (গল্প, অনুবাদকের নাম নেই, ২/১২);
- আইরিন কাম্পেন — চতুর্থী (গল্প, অনুবাদক আতোয়ার রহমান, ৩/৩);
- আলবার্ট আইনস্টাইন — সমাজবাদ কেন? (প্রবন্ধ, অনুবাদকের নাম নেই, ৪/২);
- আইভর ব্রাউন— শেক্সপীয়রের নাটক: বিশ্বমানবতার সার্বজনীন রূপ (প্রবন্ধ, অনুবাদকের নাম নেই, ৪/৮);
- আঁদ্রেই ভজনেসেনস্কি — ত্রিকোণ নাশপাতি : আমেরিকা (কবিতা, অনুবাদকের নাম নেই, ৫/২);
- আমীর সাফারাল কাসেমী —চুম্বনের স্মৃতি (কবিতা, অনুবাদ আবদুস সাত্তার, ৫/৩);
- আলতাফ হোসেন হালী — শেখ সাদী (প্রবন্ধ, অনুবাদক মওলানা মোহাম্মদ সাদেক, ৫/৭);
- আইবান ব্যাংকার - নিঃসীম নীলাকাশ (গল্প, অনুবাদক হুমায়ুন আহমেদ, ২/১১);
- অ্যাণ্ডুস হাক্সলি — রূপচর্চা প্রসাধন শিল্প (প্রবন্ধ, অনুবাদ আবুল কাশেম ফজলুল হক ৫/৫-৬);
- ই. বি. কেভ — জংলী (গল্প, অনুবাদক, আতোয়ার রহমান, ২/৬);
- ইব্রাহীম জলীস — দুধের মাছি (গল্প, অনুবাদক কাজী মাসুম, ২/১০);
- ইয়েভস ভনেকয় — ফরাসীতে শেক্সপীয়র (প্রবন্ধ, অনুবাদকের নাম নেই, ৩/৩);
- ইসমত চুঘতাই — ক্ষুধে মা (গল্প, অনুবাদক মোহাম্মদ আজিজুল হক, ৫/১);
- ইবনে আল উমায়ার — একটি ঘুঘু (কবিতা- অনুবাদক আবদুস সাত্তার, ৫/৭);
- ইউসুফ হোসেন, ডক্টর —ভারতীয় ভক্তিবাদে ইসলামের প্রভাব (প্রবন্ধ, অনুবাদক ফারুক মাহমুদ, ৫/১২ ও অন্যান্য);
- য়ু পে চেঙ — সাংহাইয়ের একটি সড়ক পাঠাগার (গল্প, অনুবাদকের নাম নেই, ৬/৩);
- এরস্কিন কডওয়েল — বিলম্বিত বসন্ত (গল্প, অনুবাদক মোহাম্মদ শরীফ রাজা, ১/৩); মুক্তি (গল্প, অনুবাদক মোহাম্মদ আজীজুল হক, ৫/১০);
- এস. রহমতুল্লাহ — ব্যাঘ্রনিবাস সুন্দরবন (প্রবন্ধ, অনুবাদকের নাম নেই, ২/৪);
- এডগার এলান পো — ইস্রাফিল (কবিতা, অনুবাদক আহমদ শামীম, ২/১০)
- এম, আর কায়ানী (পাকিস্তান হাইকোর্টের অবাঙ্গালী বিচারপতি) — সাংবাদিকের দায়িত্ব (প্রবন্ধ, অনুবাদকের নাম নেই, ৩/৩);
- এম. টি. হলিংস — কারাগারে টাকশাল (অনুবাদক অনুক্ত, ৩/১০) ;
- এলিজার বিন ইহুদী — বাবায়ে উর্দুর শেষ রচনা (প্রবন্ধ , অনুবাদক মোস্তফা হারুন, ৫/১১);
- এইচ. এ. গিব— ইবনে বতুতার সফর : ধর্মীয় পটভূমি (প্রবন্ধ , অনুবাদক মোহাম্মদ নাসির আলী, ৫/৭);
- ওয়াজেদা তাবাচ্ছুম — হায়দার মামা (গল্প, অনুবাদ মোহাম্মদ আবদুর রব, ৬/৮);
- ওয়াহিদ তুরহান অধ্যাপক — সমকালীন তুরস্ক : সাংস্কৃতিক সমীক্ষা (প্রবন্ধ , অনুবাদকের নাম নেই, ৭/১);
- ওয়াল্টার ডিলা মেয়ার — অবগুণ্ঠিতা (কবিতা, অনুবাদক মাসুদ আহমেদ, ২/২);
- ওয়াল্ট হুইটম্যান — প্রত্যুষে, আদমের মতো (কবিতা, অনুবাদকের নাম নেই, ৩/৯), চলিষ্ণু সাগরপানে (পূর্বোক্ত, ৩/১০); দুটি কবিতা (হেমায়েত হোসেন অনূদিত , ৫/১);

Dhaka University Institutional Repository

- ক্যাথেরিণ এ্যানি পোর্টার — দাদীর প্রেম (গল্প, অনুবাদক হেমায়েত হোসেন, ৫/৭);
- ক্যার্ল ম্যানহাইম — বুদ্ধিজীবীর অতীত ও বর্তমান ভূমিকা (প্রবন্ধ, অনুবাদক মোহাম্মদ সাদউদ্দিন,৪/১);
- কার্লস্যাণ্ডবার্গ—কবিতা (অনুবাদক প্রশান্ত ঘোষাল, ৬/৪);
- কৃষণ চন্দর — দোলনা (গল্প, অনুবাদক কাজী মাসুম, ১/৫); একটি মেয়ের গন্ধ (গল্প, অনুবাদক আতোয়ার রহমান, ২/১১); শানু (গল্প, অনুবাদকের নাম নেই, ৪/৯); বচ্চন সিং (গল্প, অনুবাদক কাজী মাসুম, ৩/১২); লাশ্টবাস (গল্প, অনুবাদক পূর্বোক্ত, ৪/৭); জন্ম থেকে জন্মান্তর (গল্প, অনুবাদক রশীদ আল ফারুকী, ৬/৭);
- কুদরতুল্লাহ শাহাব — রেলওয়ে জংশন (গল্প, অনুবাদ মোস্তফা হারুন, ৪/১);
- খাজা আহমদ আব্বাস—আত্মহত্যা (গল্প, অনুবাদক এস. এম. এ. রাজ্জাক, ৩/৬) ; বিশ্বসুন্দরী (গল্প, অনুবাদক মুস্তাফিজুর রহমান, ৩/৮); তিনজন মহিলা (গল্প, অনুবাদক ব' নজীর আহমদ, ৫/২);
- খলিল জিবরান — অনির্বাণ শিখা (গল্প, অনুবাদক নজরুল হক, ১/১২); পবিত্র শহর (গল্প, অনুবাদক ব'নজীর আহমদ, ৫/১০);
- চার্লস দ্য ভেত্যুইন — মধ্যপ্রাচ্যের স্ফুরণোম্মুখ অগ্নিগিরি; ফিলিস্তিন (প্রবন্ধ অনুবাদকের নাম নেই, ৩/৬);
- চু ইউ সুপ — আমার নতুন কাকা (গল্প, অনুবাদকের নাম নেই, ৫/৩);
- জুলেস রেনার্ড — আপ্যায়ন (গল্প, অনুবাদক গোলাম রব্বানী খান, ১/২);
- জি. ভি. কারানদিকার — সাহিত্যমূল্যে বাস্তবতা (প্রবন্ধ, অনুবাদক শাহাবুদ্দীন আহমেদ, ৩/১১);
- জন স্টেইনবেক — নির্জন প্রহরার রাত (গল্প, অনুবাদক জিয়াউদ্দিন আহমদ, ৪/২);
- জোসেফ কটলার ও হাইমজ্যাকে — আইনস্টাইন কাহিনী (প্রবন্ধ, অনুবাদক হালিমা খাতুন, ৪/৮);
- জি. সি. হোম্‌স— বীট সম্প্রদায়ের দর্শন (প্রবন্ধ, অনুবাদক রফিক আজাদ ৪/১১ থেকে ক্রমশ ধারাবাহিক বের হয়);
- জ্যাপল সাত্রে — দেয়াল, (গল্প, অনুবাদকের নাম নেই, ৫/১১);
- টেনিসি উইলিয়ামস — নাটকে বায়রনের প্রেমপত্র (প্রবন্ধ, অনুবাদকের নাম নেই ৫/৭);
- টি. এস. এলিয়ট— দুর্বোধ্য কবিতা প্রসঙ্গে (প্রবন্ধ, অনুবাদকের নাম নেই, ১/৩) ; কবিতা (অনুবাদকের নাম নেই, ৫/১০);
- টেড হিউজেস — ছজন যুবক (কবিতা, রফিক আজাদ, ৪/৯);
- ডিলান টমাস — মেলা সমাপ্তির পরে (গল্প, অনুবাদক ফারুক মাহমুদ, ৬/৯-১১);
- ডব্লিউ বি. ইয়েটস — রেড হ্যানরাহান (গল্প, অনুবাদকের নাম নেই, ৩/২);
- ডব্লিউ বি. স্মিথ — পাকভারত উপমহাদেশে মুসলিম জাগরণের পটভূমি (অনুবাদক সরদার ফজলুল করিম, ৪/১ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়);
- ডেভিড ডি. এণ্ডারসন, ডক্টর — পাকিস্তানের সমকালীন সাহিত্য (প্রবন্ধ, অনুবাদক বুলবুল ওসমান, ৫/২);
- তানিয়ুস আবদুহু — সাদা বিড়ালটা (কবিতা, অনুবাদক আবদুস সাত্তার, ৫/১);
- তাতসুজু ইশিকাওয়া — আঁধারে আলো (গল্প, অনুবাদক আতাউল হক, ২/৫);
- নরেশগুহ— ইয়েটস ও রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ, অনুবাদক শাহাবুদ্দীন আহমদ, ৩/৭);
- পল ভিনসেন্ট ক্যারোল — পাহাড়িয়া পথ (গল্প, অনুবাদক গোলাম রব্বানী খান ১/৭);
- প্রেমচান্দ — কাঁদন (গল্প, অনুবাদক আবদুল বারী চৌধুরী, ২/১২); কবি (গল্প, অনুবাদকের নাম নেই, ৩/৩); বিসর্জন (গল্প, অনুবাদক মোহাম্মদ আজিজুল হক, ৩/৭); ঈশ্বরের অভিশাপ (গল্প, অনুবাদকের নাম নেই, ৪/১২);
- পার্লবাক — অন্যদিন (গল্প, অনুবাদক আহমেদ শমীম, ৩/৪);
- পাস্টের নাক— কবিতা (অনুবাদক প্রশান্ত ঘোষাল, ৪/৪);
- ফ্রাঁসোয়া জিরোড — নারী জাগরণ কোন্‌পথে? (প্রবন্ধ, অনুবাদকের নাম নেই, ৪/৫-৬);
- বার্ট্রাণ্ড রাসেল — পঞ্চাশ মেঘাটন বোমা সম্পর্কে (অনুবাদক তালিম হোসেন, ২/৪); রাজনৈতিক আদর্শ (অনুবাদক আবুল কাসেম ফজলুল হক, ৫/৩); যন্ত্র এবং আবেগ (অনুবাদক আহমদ ছফা, ৬/১-২); জাতীয় স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিকতা (অনুবাদক আবুল কাসেম ফজলুল হক, ৬/৪)
- ভন্‌হেনজ্ পায়নটেক —সমীক্ষণ (গল্প, অনুবাদকের নাম নেই, ২/১);
- মুহম্মদ ইকবাল —প্রজ্ঞান চর্চায় ইরান (১/৮ থেকে ধারাবাহিক, অনুবাদক?)
- মুলক রাজ আনন্দ — আফ্রো-এশীয়ায় সৃজনশীল সাহিত্যিকদের ভূমিকা (প্রবন্ধ অনুবাদক ফখরুজ্জামান চৌধুরী, ৫/৭);
- ম্যাক্সিম গোর্কি — ছাব্বিশজন পুরুষ ও একটি মেয়ে (বড়গল্প, অনুবাদক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী , ২/৭);
- মিলোভান যিলাস — যুদ্ধ (গল্প, অনুবাদক শওকত আলী, ৩/৭);
- মমতাজ শিরিন — দণ্ড (গল্প, অনুবাদক আতোয়ার রহমান, ৪/৪) ; উর্দু ছোটগল্পে পাশ্চাত্য প্রভাব (প্রবন্ধ, অনুবাদক রশীদ আল ফারুকী, ৫/৯);
- মৌলভী মুজিবর রহমান — জেল জীবনের ডায়রী (অনুবাদক আবুল ফজল, ৫/৩ থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় ;

Dhaka University Institutional Repository

- মিউ হসী — প্রাচীন চীনা কবিতা (অনুবাদক আহমদ শমীম, ৬/৬);
- মিকাইল যোশিংকো— গায়ের কুটুম্ব (গল্প, অনুবাদক মোহাম্মদ নাসির আলী, ৪/৭); নারী চরিত্র (অনুবাদকের নাম নেই, ৪/১২);
- রাজেন্দর সিংবেদী — ভোলা (গল্প, অনুবাদক আমিনুল ইসলাম, ১/৬);
- রেনে ক্লেয়ার — চলচ্চিত্রের গোড়ার কথা (প্রবন্ধ, অনুবাদক ফজলুল করীম, ১/১২);
- রবার্ট ফ্রষ্ট — কাঁস্তে : অস্ফুটভাষা (কবিতা, অনুবাদক আহমদ ফারুক, ৩/১২); আরও কবিতা (হেমায়েত হোসেন অনূদিত, ৪/১১ ও অন্যান্য) :
- রাজা নবাব আলী খান— মারিফুন্নাগমাত (প্রবন্ধ, অনুবাদক মকসুদুর রহমান হিলালী, ৪/২ থেকে ধারাবাহিক);
- লরেন্দ সার্জেন্ট হল্ — ডোবা পাহাড় (গল্প, অনুবাদক আতোয়ার রহমান, ১/৩) ;
- লেসলি পল — টি. এস. এলিয়ট : একটি সাক্ষাৎকার (প্রবন্ধ, অনুবাদক আফজাল চৌধুরী, ৫/১১);
- শেক্সপীয়র —কবিতা (অনুবাদক সন্তোষগুপ্ত, ৫/৩);
- শেন সুঙ ওয়েন — বন্দর (গল্প, অনুবাদকের নাম নেই, ৪/১);

সুধীন এন্ ঘোষ — রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর চিত্রকলা (অনুবাদক হায়াৎ মামুদ, ৬/৭);

- সাদত হাসান মান্টো — আইনের রক্ষাকবচ (নাটিকা, অনুবাদকের নাম নেই, ৩/৯); কালো নেকাব (গল্প, অনুবাদক মোহাম্মদ আজিুল হক, ৪/৮);
- স্টানলি ম্যারণ —ঐতিহ্যের গুরুত্ব (প্রবন্ধ, অনুবাদকের নাম নেই, ২/৪);
- স্টিফেন ক্রেন— কবিতা (সেলিম সারওয়ার অনূদিত , ৬/৪);
- সার্জেইভাসেনৎ সেভ — উপকথা (অনুবাদকের নাম নেই, ১/১০);
- সার্জি এনতোনভ — আবেদন (গল্প, ফাউজুল কামাল অনূদিত, ৪/৩);
- হাল (রুবাইয়াৎ-ই-হাল) — কবিতা (অনুবাদক আবুল ফজল, ১/১২ ও অন্যান্য);
- হায়াৎ দারাজ খান পাকিস্তানী — কবিতা (অনুবাদকের নাম নেই, ৩/১১);
- হার্বার্ট রীড— ১৯৪০ এর একজন সৈনিকের প্রতি (কবিতা, অনুবাদক আহমদ শমীম, ৩/৮);
- হাফিজ (রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ)— কবিতা (আবদুল হাফিজ অনূদিত, ৬/৮ থেকে ক্রমশ);
- হাজেরা মাসরুর — ছাই (গল্প, অনুবাদক মোহাম্মদ আজিজুল হক, ৩/১০)
- হায়াশি ফুমিকো — আশ্রয় (গল্প, অনুবাদক আতোয়ার রহমান, ৪/২);
- হুসান আল খতিব — আধুনিক আরবী সাহিত্য : প্যালেস্টাইন ট্রাজেডি (প্রবন্ধ, অনুবাদক মীজানুর রহমান, ৫/৮); ৯৩

'পুস্তক পরিচয়' এর তালিকার দিকে তাকালে দেখা যায় তৎকালে প্রকাশিত প্রধান পুস্তকাবলীর পরিচয় পূবালীতে তুলে ধরা হয়েছিল। সমালোচনা করেন প্রধান লেখকগণ। তবে সমকালের ন্যায় এর মান সব সময় উন্নত নয়। যেখানে শক্তিশীল সৃজনশীল লেখক সমালোচনা করেন, সেখানেই কেবল সাহিত্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু অনেকাংশই এর কেবল 'পুস্তক–সমালোচনা' বা 'পুস্তক–পরিচয়'। 'সমালোচনা সাহিত্য'ও ক্বচিৎ মেলে। যাই হোক তালিকাটা নিম্নরূপ :

- আবদুল কাদির —'শিবির জীবনের দিনগুলি' আজহারুল হক প্রণীত; 'জর্জ ওয়াশিংটন' কার্ডার এ্যানাটেরী হোয়াইট রচিত আবু হেনা মোস্তাফা কামাল অনূদিত ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশনস্ এর সহযোগিতায় বুক সোসাইটি প্রকাশিত (৪/১১);
- আবুল ফজল — 'গালিভারের সফরনামা' আবুল মনসুর আহমদ সম্পাদিত (১/২); মতিয়র রহমান খান গ্রন্থাবলী' (১/৪);
- আবদুল মান্নান - 'নজরুল সাহিত্য' মীর আবুল হোসেন সম্পাদিত (১/১);
- আহমদ জাফর — 'জীয়ন কাঠি' খলিল চৌধুরী প্রণীত (১/২);
- আবদুল মোমেন — 'আফ্রিকার হৃদয়ে সূর্যোদয়' আজাদ সুলতানা সম্পাদিত (১/১০)
- আলম কোরায়শী — 'নৌফেল ও হাতেম' (২/৪);
- আবুল কালাম শামসুদ্দীন —'অনুরাগ' ইমাউল হক প্রণীত (৩/২); 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' আবু জাফর শামসুদ্দীন প্রনীত (৪/৩);
- আবু হেনা মোস্তাফা কামাল — 'ছায়া হরিণ' আহসান হাবীব প্রণীত (৩/২); 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান' আবদুল গাফফার চৌধুরী প্রণীত (৩/৩); 'এক আকাশে অনেক তারা' লতিফা হিলালী প্রণীত (৩/৪);
- আবদুল মওদুদ— 'মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনবালী' (৪/১১); 'মেঘবরণ কেশ' ইসহাক চাখারী প্রণীত (৩/৩); A short History of Islam by Syeed Fayyaze Mahmud (২/৩);
- আবদুল হক — 'মনু বর্ণালী' জহুরুল হক প্রণীত (৪/১২); 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' ও 'মানুষের নামে' (৫/১);
- আবু জাফর —'অগ্নিদিনের বর্মা' জিতেন ঘোষ প্রণীত (৫/১২);
- আবদুর রফিক সন্যামত— "তালাক' আবুল কাসেম প্রণীত (৫/২); 'সীমান্তের চিঠি' ইব্রাহীম খলীল প্রণীত (৫/৪);

Dhaka University Institutional Repository

- আবদুল গনি হাজারী — 'পান্নামতি' সরদার জয়েনউদ্দীন প্রণীত (৫/৭) ; 'এক তারাতে কান্না' জিয়া হায়দার প্রণীত (৫/১১);
- আনোয়ার পাশা— 'একদিন প্রতিদিন' আতাউর রহমান প্রণীত কাব্যের পাল্টা সমালোচনা (৫/১১);
- আল কামাল আবদুল ওহাব —'নীলরঃ রক্ত'; 'পান্নামোতি' সরদার জয়েনউদ্দিন প্রণীত (৬/৩);
- আহমদ ছফা —'অনপ্রাকটিস্' মাও সেতুঙ প্রণীত এবং রফিকুল ইসলাম অনূদিত; 'পলাশ ডাঙ্গার উপকথা' খন্দকার আবদুর রহিম প্রণীত (৬/৫);
- আহমদ ফারুক — 'নতুন চীন নতুন দেশ' আবুল কালাম শামসুদ্দীন এবং 'আমার বাগান' আবদুল হালিম প্রণীত (৬/৯-১২); 'দিগন্তের পথে একা' মহিউদ্দীন প্রণীত (২/২); 'পরিবার গঠনে নারী' মুমতাজ জাহান সিদ্দিকী প্রণীত মসউদুর রহমান অনূদিত (৪/২);
- আহমদ জামাল—'অপরাধী' মুজিবউদ্দীন আহমদ প্রণীত (৪/৩);
- আহমদুজ্জামান—'মা' কাজী আবুল হোসেন প্রণীত উপন্যাস (২/২);
- খোন্দকার আলী আশরাফ— 'আমার জীবনদর্শন' জো. সি. দেব প্রণীত (৪/৩);
- গ্রন্থকীট —'যা দেখেছি' কোতোয়াল প্রণীত (ছদ্মনামে আলোচনা ছদ্মনামের বই, ৪/৮);
- জিয়া হায়দার —'নীলস্বপ্ন' জাহানারা আরজু প্রণীত (৩/৭);
- ফখরুজ্জামান চৌধুরী — 'শিল্পীর স্বপ্ন' মহীউদ্দীন প্রণীত উপন্যাস (২/৪); 'স্পুটনিক যখন ছুটলো' ডাঃ গৌরিশচন্দ্র সরকার প্রণীত (২/৪);
- নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান—'বেদনার এই বালুচরে' খোদেজা খাতুন প্রণীত কাব্য (৪/৪);
- ফজল শাহাবুদ্দীন — 'নতুন চীন নতুন দেশ' আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রণীত (৬/৪);
- বেগম সুফিয়া কামাল — 'আরবী কবিতা' আবদুস সাত্তার অনূদিত (৬/৩);
- বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর— 'সম্রাটের ছবি' 'কৃষ্ণপক্ষ' (১/৩); 'দুর্লভ দিন' (২/১২); 'আরণ্য নীলিমা' আহসান হাবীব প্রণীত (৩/২);
- মুনীর চৌধুরী — পিঙ্গল আকাশ' শওকত আলী প্রণীত (৪/৪); 'জনসংখ্যা ও সম্পদ' মোহাম্মদ মোর্তজা প্রণীত ৫/২);
- মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ — 'প্রেমের কবিতা' (১/৫); 'ক্ষীয়মাণ ' আবদুস শাকুর প্রণীত (১/৬); 'প্রবাল দ্বীপ' জামাল উদ্দীন মোল্লা প্রণীত (১/৭); 'কন্যাকুমারী' আবদুর রাজ্জাক প্রণীত (১/৯); 'উপান্ত' হাবীবুর রহমান প্রণীত (২/১১); 'ক্রান্তিকাল' আবদুল হক প্রণীত (৩/২); 'মহাবিদ্রোহের বীর সিপাহী' আতোয়ার রহমান প্রণীত (৩/৪); 'আবু জাফর শামসুদ্দীনের শ্রেষ্ঠ গল্প' (৩/৮); 'প্রেমে পড়েছি কৃষ্ণচূড়ার' (৩/১২); 'একই সমতলে' শাহেদ আলী প্রণীত, 'সপ্তক' (৪/১) ; 'মধুমতী' রাকেয়া খাতুন প্রণীত (৪/৪); 'সীমানা ছাড়িয়ে' সৈয়দ শামসুল হক প্রণীত (৫/১); 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা' মুহম্মদ সিদ্দিক খান প্রণীত (৬/৬); 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রণীত (৬/৮); 'খোলামন' আবদুর রহমান প্রণীত (৪/৯); 'অন্বেষণ' সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রণীত (৪/১০);
- মুহম্মদ আবদুল হাই— 'সাহিত্য সম্ভার' (৬/১-২);
- মকসুদ জামিল— 'কাঞ্চনমালা' (১/১০); 'সোনালী রোদ্দুর' সুধীর চৌধুরী প্র (১/১২) ; 'আওলিয়া দরবেশ' কাজী আবুল হোসেন প্রণীত (৬/১১); 'নজরুল রচনা সম্ভার (২/১);
- মনিরা হক — 'রক্তপদ্ম' (২/৪);
- মনিরুদ্দিন ইউসুফ—'পূর্বপাকিস্তানের সুফী সাধক (২/১২);
- মীর আবুল হোসেন — 'নজরানা' সৈয়দ আসফউদ্‌দৌলা সিরাজী প্রনীত (৩/৭); 'পড়া ও লেখা শিখানো' আবদুল হাকিম প্রণীত (৪/৭) ; 'বিপুলা পৃথিবী' (৪/৮) ; 'ধূসরলিপি' অজিতকুমার নিয়োগী প্রণীত (৫/৩) ; 'অনেক রঙের আকাশ' আহমদ রফিক প্রণীত 'হলদে লতা' আতোয়ার রহমান প্রণীত (৫/৭) ; 'অববাহিকার উপকথা' আলাউদ্দিন খান প্রণীত (৫/১০) ; 'সাম্প্রতিক ধারার গল্প' আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত (৬/৩) ; 'নয়া দৃষ্টিকোণ' আবদুল লতিফ বিশ্বাস প্রণীত (৬/৫) ; 'বিংশ শতাব্দীর বিচিত্র উপাখ্যান' আবদুল হাকিম প্রণীত (৭/১) ; 'পাতালে শর্বরী' মীজানুর রহমান শেলী 'ঘরমন জানালা' দিলারা হাশেম ; ও 'আমার বধূয়া' আনোয়ারা রহমান প্রণীত (৬/৭) ; 'আধুনিক চিন্তাধারা' অধ্যাপক আবুল কাসেম প্রণীত ও 'ছন্দে গড়া জীবনটা' আবদুল ওহাব খান প্রণীত (৪/৯) ; 'প্রবাহ' হামেদ আহমদ প্রণীত (৪/১১) ;
- মোহাম্মদ নাসির আলী — 'বিজয় অভিযান' আল কামাল আবদুল ওহাব (৬/৫) ;
- মাকিদ হায়দার — 'জগন্নাথ কলেজ ও হোম ইকনমিক্স কলেজ-বার্ষিকী (৬/৬);
- যতীন সরকার — 'সমকালীন সাহিত্যের ধারা' মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ প্রণীত (৬/১২) ;
- রাহাত খান— 'নীল যমুনা' আবদুল গাফফার চৌধুরী প্রণীত (৫/৯) ; একদিন প্রতিদিন' আতাউর রহমান প্রণীত ; 'ঐকতান' দিলওয়ার প্রণীত ; 'বাঘবন বন্দুক' বায়েজিদ খান পন্নী (শিকার কাহিনী) প্রণীত (৫/১০) ; 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়' সুফি জুলফিকার হায়দার প্রণীত (৬/৫) ;
- রফিকুল ইসলাম— 'নজরুল সাহিত্য' মীর আবুল হোসেন সম্পাদিত (১/৯) ;
- সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী— 'নটীর প্রেম' কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস প্রণীত (১/৪) ; শওকত ওসমান : 'জননী' (১/৭) ;
- সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়— 'জুলেখার মন' মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ প্রণীত (১/৫) ; 'বৃষ্টি ঝরা গান' মুহম্মদ শামসুর রহমান প্রণীত (১/৮) ; 'সাঁঝ আকাশের তারা' মুহম্মদ শামসুর রহমান প্রণীত (২/১) ;
- সুশোভন আনোয়ার আলী— 'মহুয়া' আবদুর রশীদ খান প্রণীত (৬/৮) ;

Dhaka University Institutional Repository

- সেলিম চৌধুরী— 'কালাম-ই রসুল' কাজী আবুল হোসেন প্রণীত (১/১০) ; 'জেহাদের ডাক' আবদুআল্লাহ জহীর উদ্দীন প্রণীত (৫/১২) ; 'ছয়ঋতু সাতরঙ' হেমায়েত হোসেন প্রণীত (৬/১-২) ; 'সমকালীন কথাসাহিত্যের আঙ্গিক' সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রণীত (২/৫) ;
- সরদার জয়েনউদ্দিন— 'পান্না হলো সবুজ' শওকত আলী প্রণীত (৫/৪) ;
- শাহাবুদ্দীন আহমদ— 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' শামসুর রাহমান প্রণীত (২/৮) ; 'সম্ভবা অনন্যা' 'সূর্য অন্যতর' সানাউল হক প্রণীত দুটি বই (৩/৮) ; 'সারেং বৌ' শহীদুল্লাহ কায়সার প্রণীত (৩/১০) ; 'দৃষ্টি' আবদুর রহমান প্রণীত (৪/৮) ;
- শামসুর রাহমান— 'সারা দুপুর' আহসান হাবীব প্রণীত (৬/১-২) ;
- শামসুজ্জামান খান— 'আমাদের প্রাচীন শিল্প' তোফায়েল আহমদ প্রণীত (৬/১-২) ;
- হায়াৎ মামুদ— কমলেশ সেন প্রণীত 'মানুষ শহর সমুদ্র' (৪/১১) ; 'পাকিস্তানের আধুনিক সেরাগল্প' (৫/৮) ;

পূবালীতে ফররুখ আহমদের পুরস্কারপ্রাপ্ত কাব্য 'হাতেমতায়ী' (১/২) এবং কয়েকটি নাটক যেমন — : মুনীর চৌধুরীর 'চিঠি' (৩/৭থেকে ক্রমশ) ; আবদার রশীদের 'দরবেশ' (মলিয়রের অনুসরণে, ৩/১১ থেকে) ; আবুল ফজলের 'স্বয়ম্বর' (৪/২ থেকে ক্রমশ) ; জিয়া হায়দার প্রণীত 'শুরু নেই শেষ নেই' (৫/১১) ; জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের 'যেখানে যেতে চাই' (৬/৬) ; সৈয়দ আবদুস সুলতানের 'যেখানে যেতে চাই' (৬/৬) ; আবদুল মান্নান সৈয়দের একাংকিকা 'একটি ভীষণ খেলা' ; ইব্রাহীম খাঁর 'মায়ের বুলি' (৭/৬-৭) ; মাহবুব তালুকদারের কাব্যনাটক 'দুই হাতে দুই' (৬/৩); নজরুল হকের 'ইয়ারমুকের যুদ্ধ' (৬/৯-১২) ; হেনরিক ইবসেনের অনুবাদে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'বুনো হাঁস' (৪/৫-৬) ; আফাজউদ্দিন আহমদ প্রণীত 'উপবন' (৪/৯- থেকে) এবং বিশ্বসাহিত্য থেকে আরও কতিপয় নাট্য-সাহিত্য অনুবাদ করে পূবালীতে ছাপা হয়েছে। লুৎফর রহমান প্রণীত কিংবদন্তী 'তিতাস বাঁকের উপাখ্যান' (৪/১) থেকে) ছাপা হয়েছে। বেগম সুফিয়া কামালের স্মৃতিকথা 'একালে আমাদের কাল' (৫/১ থেকে ক্রমশ) এবং সাদত আলী আখন্দের 'যখন দারোগা ছিলাম' (৫/১ থেকে ক্রমশ) ছাপা হয়। ভ্রমন কাহিনীগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শামসুল আলমের 'পথে প্রান্তরে' (৫/৭ থেকে) ; আবদুল মান্নানের 'আমার দেখা গণচীন' (৬/৫ থেকে) ; আনিসুল ইসলামের 'উপন্যাসের রেঙ্গুন' (৪/৫-৬ থেকে) ; 'শ্বেতহস্তীর দেশে' (৪/৮ থেকে) ; সৈয়দ আবদুস সুলতানের 'সুদূরের চিঠি' (৪/৫-৬ থেকে) ; মতিনউদ্দিন আহমদের 'হৃদয় দিয়ে দেখা' (৪/১) ; বিশ্বেশ্বর চৌধুরীর 'জীবন নদীর বাঁকে' (৭/১) পূবালী প্রকাশ করে।

আশরাফউজ্জামান রচিত 'বিভ্রান্ত' (১/১ থেকে ক্রমশ) ; আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যান' (১/৮ থেকে ক্রমশ); আবদুর রাজ্জাককৃত 'কালান্তর' (১/১০থেকে) ; শওকত আলীর 'পিঙ্গল আকাশ' (২/৭); শামসুদ্দীন আবুল কালাম প্রণীত 'জীবন-যৌবন' (৩/২ থেকে) ; কলিম আনওয়ারের 'বহ্নি সীমান্ত' (৩/২থেকে ক্রমশ); নির্মল চট্টোপধ্যায় এর 'হায়েনার হাসি' (রহস্যোপন্যাস, ৩/৯ থেকে ক্রমশ) ; আবু শাহরিয়ার এর 'মুখরিত প্রাঙ্গণ' (৪/৫-৬) ; হুমায়ুন কাদিরের 'নির্জন মেঘ' (৩/৬); মীর আবুল হোসেনের 'বিসর্পিল মন' (৬/৪ থেকে ক্রমশ); 'বিপনীমন' (৬/৬ থেকে); 'পথ আঁকা বাঁকা' (৫/৫-৬); এবং আনোয়ার পাশার 'নীড় সন্ধানী' (৬/১-২থেকে ক্রমশ); মোহাম্মদ আবদুল আজিজ এর 'গাঁয়ের নাম পলাশপুর' (৫/৮ থেকে ক্রমশ); মাহবুব উল আলমের 'মোমেনের জবানবন্দী' (৫/১০ থেকে ক্রমশ) ইত্যাদি উপন্যাসও পূবালীতেই ছাপা হয়েছিল। বিভিন্ন বিভাগীয় আলোচনা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে ; তাতে সম্পাদকীয় কর্মীরা অথবা নিয়মিত কলামিষ্টগণ বিভিন্ন ছদ্মনামে লিখেছেন নানাধরনের বিষয় নিয়ে । সমসাময়িক কালকে এবং সমকালের আলোচিত বিষয়গুলোকেই তাঁরা প্রকারান্তরে এসকল আলোচনার মাধ্যমে নথিভুক্ত করেছেন। ফলে এগুলোতে সমাজের চিন্তাচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। সমকালের ঢাকা শহর এবং বাংলাদেশের তৎকালীন সংস্কৃতি চর্চার খবরাখবরও তাই এতে পাওয়া যায়। চলচ্চিত্র, নাটক, সভা-সমিতির বিবরণসহ এ সকল আলোচনা ঐতিহাসিক মূল্য লাভ করেছে।নিয়মিত বিভাগের মধ্যে ছিল চিকিৎসা বিজ্ঞান, খোলা জানালা, কথা প্রসঙ্গে, চিত্রকলা প্রসঙ্গে, ঢাকায় থাকি, আলোচনা, বেতার জগৎ, বিশ্বপরিক্রমা, রঙ্গরূপ, সংস্কৃতি সংবাদ, মাঠে ময়দানে, বিজ্ঞান বিচিত্রা ইত্যাদি। এগুলোর লেখকের ছদ্মনাম ছিল 'চিকিৎসক'; 'দৃষ্টিবান'; 'মল্লিনাথ'; 'রূপকার'; 'নাগরিক'; 'বহুব্রীহি'; 'পরিব্রাজক' ; 'বহুরূপী'; 'দর্শক'; 'ইবনে সিনা' ইত্যাদি । এসব বিভাগে স্বনামেও লিখেছেন অনেকে। এঁদের মধ্যে উল্লেখ্য ঃ মকসুদ চৌধুরী, মকসুদ জামিল, ফখরুজ্জামান চৌধুরী, সেলিম চৌধুরী, কাজী লুৎফর রহমান, কাজী আফসারউদ্দীন আহমদ, শফিকুর রহমান, আহমদ ফারুক, আহমদুজ্জামান, আখতারুজ্জামান, মুহম্মদ আবু তাহের , আবদুল মওদুদ, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, আলম কোরায়শী, আমিনুর রহমান, বুলবুল ওসমান, শামসুল আবেদীন,সৈয়দ শাহ জাহান, মুস্তাক আহমদ, মোশারফ হোসেন, অনিল কুমার রায়, আনোয়ার এনায়েতুল্লাহ, ফওজুল করীম, শাহবুদ্দীন আহমদ , আজীজুল করীম, মাহমুদ আলম বেগ, শওকত আলী, ইবনে জামান, মীর আবুল হোসেন, মোহাম্মদ আজরফ, এস. এম. হাবীবুর রহমান, আফসারুন্নেসা , ফজলুল করীম, জয়নাল আবেদীন, মকসুদুর রহমান হিলালী, মোরশেদা হক, আবুল কালাম মোস্তফা, এস.সি. ভৌমিক, আহমদ জামাল, মাকিদ হায়দার , রশীদ হায়দার, আমিনুল ইসলাম, সিদ্দিক জামাল, সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমান, বেবী আনওয়ার , আবু কায়সার , অধ্যক্ষ আবুল কাসেম, জাবিদ জামাল, মৈত্রেয়ী দেবী ('ভারতের সাম্প্রদায়িকতা' প্রসঙ্গে পূ. মু.) খোন্দকার আলী আশরাফ, মুনীর চৌধুরী, নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, হোসেন মনসুর, মীজানুর রহমান, এ. টি. এম. শামসুদ্দীন, হায়াৎ মামুদ, আবদুল কাদির প্রমুখ।

সাহিত্যের উন্নতির লক্ষ্যে পূবালী কেবল অসংখ্য কবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রকাশ করেছে কেবল তাই নয়, সমাজের বহুবিধ সমস্যা নিয়েও গুরুতর আলোচনা ছেপে পরিস্থিতি-পরিবর্তনের চেষ্টা করেছে। ভারতীয় বইয়ের পুনর্মুদ্রণের হিড়িক দেশ বিভাগের পর পূর্ববাংলার সৃজ্যমান সাহিত্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছিলো এবং এদেশের লেখকদের সাহিত্য প্রয়াসকে কোনরূপেই উৎসাহিত করা হচ্ছিলো না। নিতান্তই গাঁটের পয়সা খরচ করে,

Dhaka University Institutional Repository

ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো অবস্থায় কিছু কিছু লেখক সাহিত্য সৃষ্টির ধারাকে সচল রেখেছিলেন বলেই পূর্ব বাংলার সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস স্তব্ধ হয়ে যায়নি। প্রকাশক-পাঠকদের সক্রিয় সচেতন প্রয়াসে পৃষ্ঠপোষকতায় লেখকগোষ্ঠী পূর্ণ মর্যাদা বা মূল্যের বিনিময়ে সন্তুষ্টি বা আত্মতৃপ্তি নিয়ে এদেশের সাহিত্য স্রষ্টাদের সাধনার পরিচয় খুব কমই পাওয়া গেছে, সেকারণে কালজয়ী সাহিত্য ও সৃষ্টি হয়েছে খুবই কম। এই বিষয়ে তখনকার সাহিত্যসমাজে সচেতনতা জাগলেও কোনো কার্যকর পরিবর্তন ঘটেনি। তবু তাঁরা যে এগিয়ে এসেছিলেন সমস্যা সমাধানের জন্য, তার মূল্য অপরিসীম। ভারতীয় বা বিদেশী পুস্তকের আমদানী বা পুনর্মুদ্রণকে যাঁরা সমর্থন করেন, তাঁরা যে সাহিত্য সংস্কৃতির প্রকৃত উন্নতির কথা স্মরণে রেখেই বলেন, তা নয়— নানা স্বার্থতাড়িত হয়েও তাঁরা কথা বলে থাকেন। পক্ষান্তরে বিদেশী বই আমদানীকে যে-কোনো কারণে বন্ধ করলেই যে সাহিত্যপরিস্থিতির অগ্রগতি ঘটবে এটাও ঠিক নয়। সাম্প্রদায়িকতাতাড়িত হয়েও অনেকে বিদেশী তথা ভারতীয় বই আমদানীর বিপক্ষে বলে থাকেন। এটাও সমর্থনযোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে দেশের সাহিত্যপরিস্থিতির উন্নতি কিসে ঘটবে— সে-বিষয়ে গভীর আন্তরিক আলোচনা-গবেষণা ও কর্মপন্থাই কাম্য। এ বিষয়ে পূবালীতে কিছু আলোচনাও হয়েছে, কাজী দীন মুহম্মদ এবং সিরাজুদ্দীন হোসেনের 'কোলকাতার বইয়ের পুনর্মুদ্রণ' এবং 'বিদেশী পুস্তকের অবাধ আমদানী ও পুনর্মুদ্রণে আমাদের সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া' বিষয়ের আলোচনা এখানে উদ্ধৃতি যোগ্য। পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে বাংলা একাডেমীতে ১৯৬৩ সনে এ বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হলে তাতে এঁরা এগুলো পড়েছিলেন। সিরাজুদ্দীন হোসেন পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্যের গ্রন্থ প্রকাশের অধোগতির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন— 'এর কারণ কি?' জবাবে লেখক নিজেই বলেন 'কারণ খুবই সহজবোধ্য। খ্যাত-অখ্যাত নির্বিশেষে কোলকাতীয় লেখকদের বইর পুনর্মুদ্রিত সংস্করণে বাজার ছেয়ে যাবার পাশাপাশি দেশী লেখকদের বইর প্রকাশকের অভাব। কবিতার বইর কলেবর ছোট হওয়ায় কবি কষ্টে সৃষ্টে ধার-কর্জ করে হলেও নিজের বই নিজে ছেপে বের করে কবিতার বইর তালিকা ঠিক রেখেছেন, কিন্তু গল্প-উপন্যাসের বেলায় লেখক তা পারেননি, বা পারছেন না। বছর দু'তিন আগে নামমাত্র মূল্যে পাণ্ডুলিপি দিয়ে মাত্র দু'চারজন প্রকাশক মিলত, তাঁরাও আজ হাত গুটিয়েছেন বা গুটাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আজ কপিরাইট সমেত পাণ্ডুলিপি বিক্রয় করতে গেলেও দেশী লেখকের পক্ষে প্রকাশক পাওয়া দুসাধ্য। কেননা, পুনর্মুদ্রিত কোলকাতার বই দিয়ে একশ্রেণীর প্রকাশক যেভাবে বাজার ছেয়ে ফেলেছেন, তাতে সংস্কৃতি সচেতন, অপেক্ষাকৃত স্বল্পবিত্ত প্রকাশকের পক্ষে কতখানি আর ঝুঁকি নেয়া সম্ভব ! স্বভাবতই তাঁদের কেউ কেউ প্রকাশনা ক্ষেত্র থেকে হাত গুটিয়েছেন। কেউ বা কেবল পুস্তক-বিক্রেতার ভূমিকা নিয়েছেন, আবার কেউ কেউ অবাক বিস্ময়ে বাজারের ভাবগতি দেখছেন। আর লেখকসমাজ ! প্রয়োজনীয় অর্থানুকূল্যের অভাবে প্রকাশকের কারচুপিতে স্ত্রী-পুত্র পরিজনের ইহ ও পারলৌকিক উভয়বিধ কল্যাণের খাতিরে সাহিত্য-সাধনার মোহ বিসর্জন দিয়ে কেউ খবরের কাগজে, কেউ কোন সেরেস্তায় আবার কেউবা মাষ্টারীর খাতায়, আর নয়তো নিদেনপক্ষে বিদেশী কোন কোম্পানীতে নাম লিখিয়ে মোটা কাপড়, মোটা ভাত ও মরণের পর কাফনের কাপড়টুকু সংস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করছেন।'

পুনর্মুদ্রণের সপক্ষ লোকেরা বলে থাকেন, 'বইয়ের গুণাগুণ বিচারের ভার যখন পাঠকেরই ওপরে এবং এদেশের পাঠকরা যখন কোলকাতার লেখকদের বই-ই পছন্দ করেন, তখন সে বইর পুনর্মুদ্রণে আপত্তি কি? তাঁরা এমনও বলেন, আমাদের দেশে যখন নামকরা লেখক কেউ নেই বা কেউ লিখতেই জানে না, তখন যে ভাষায় আমরা কথা বলি, সেই ভাষার সাহিত্য যখন হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়, তা নিতে দোষ কি?' এ প্রশ্নের জবাবে সিরাজউদ্দীন হোসেন বলেন প্রকৃত প্রস্তাবে অসৎ উপায়ে ব্যবসায়ীরা যা করেন,—তা 'না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়'। কপি রাইট আইনের বালাই না থাকায় নজরুল ইসলামও কি কম চুরি অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন? তাছাড়া "অনুমতি যদি পেয়েই থাকেন, পেলেন কিভাবে? বিনামূল্যে শত শত বইর স্বত্ব পাওয়ার ব্যাপারটি কি সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য? যদি বিনামূল্যেই তা পেয়ে থাকেন, তবে তার মাজেজা কি? একটি স্বাধীন দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এভাবে অবাধ অনুপ্রবেশ কি একেবারেই অর্থহীন? ঢাকার যে কটি প্রকাশক.... রাতারাতি মুনাফার পাহাড় গড়ছেন, জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় সংস্কৃতির তাৎপর্য বুঝবার মত চেতনা তাঁদের আছে কি?... আজ হোক কাল হোক তাঁরা তার.... মাসুল আদায় দিতে গিয়ে আকণ্ঠ বন্ধক দিয়েও পাকিস্তান কি ত্রাণ পাবে?"

লেখক ব্যবসায়ীদের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, তাদের আর এক কথা— 'মুসলমানের ঘরে আবার লেখক পয়দা হয় নাকি? পয়দা হয়না ঠিকই, তবে.... মুসলমান প্রকাশকদের নিজ সন্তান ছেড়ে অন্যের সন্তানকে কোলে টেনে নেয়ার বদ অভ্যাস.... তাঁরা ভুলে গিয়েছেন যে, বিভাগ-পূর্ব যুগে ভারতীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে কম-বেশী একই কাতারে দাঁড়িয়ে অনেক মুসলমান কবি ও সাহিত্যিক তদানীন্তন ভারতের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়ে বিরাজ করেছেন। আজও তাঁদের মধ্যে যে কজন সৃষ্টিধর্মী কবি সাহিত্যিককে প্রতিনিয়ত চোখের সামনে দেখি, তাঁদের কথা তুলেই বলতে চাই, সৈয়দ মুজতবা আলী, আবু সয়ীদ আইউব, হুমায়ুন কবির, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, কবি গোলাম মোস্তফা, জসীমউদ্দীন, ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, শওকত ওসমান, আবুল ফজল আজও বেঁচে আছেন। এঁদের সবাই মুসলমান ঘরের সন্তান। সাহিত্য ক্ষেত্রে এঁরা সবাই কম-বেশী সমসাময়িক। কিন্তু দেশ বিভাগের পর এঁরা কে কোথায়? সৈয়দ মুজতবা আলী আজ ভারতের জাতীয় অধ্যাপক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ; আবু সয়ীদ আইউব আজ ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা দফতরের অধিকর্তা, হুমায়ুন কবির ভারত সরকারের সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দফতরের মন্ত্রী। অর্থাৎ, ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেই বলুন, আজও সর্বত্র বরেণ্য, সর্বমহলে শ্রদ্ধেয়। আর এদিকে? যেকজন কবি ও সাহিত্যিকের নাম করেছি, সরকারী মহলে তাঁরা করুণার পাত্র। প্রকাশকের দরবারে উপেক্ষিত, সমাজ-জীবনে একরূপ অপরিচিত, অনাদর ও উপেক্ষায় আজ তাঁরা বলতে গেলে সাহিত্যসমাজ থেকে নির্বাসিত। সরকারী অঙ্গনতো দূরের কথা, এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অঙ্গনে প্রবেশের অধিকারও এঁদের নেই। এক যাত্রায় দুই ফল—এর কারণ কি? কারণ আমাদের প্রকাশক মহল, কারণ আমাদের সরকার, কারণ আমাদের সমাজ।'

সিরাজুদ্দীন হোসেনের আলোচনায় সমাজ ভাবনার এবং সমাজের একটি চিত্র আছে বলেই কথাগুলো উদ্ধৃত করা হলো। তিনি লিখেছেন : "বস্তুত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীই আজ আমাদের প্রতিভার মাপকাঠি। তাই রাষ্ট্রীয় জীবনে সাহিত্যিকদের আজ স্থান নেই। অর্থনৈতিক জীবনে অ-প্রতিষ্ঠিত বলে প্রকাশক

Dhaka University Institutional Repository

মহলে আজ তাঁরা উপেক্ষিত, করুণার পাত্র। তাই যখন দেখি, এদেশেরই কোন লেখক সাংসারিক দায় নির্বাহের জন্য নগদমূল্যে বিক্রির জন্য পাণ্ডুলিপি হাতে প্রকাশকের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন, আর ছ'মাস বা এক বছরের পরিশ্রমের মূল্য প্রকাশক সাহেব দেড় থেকে দুশো টাকার ওপরে দিতে রাজী নন, তখন বেদনায় কার না মন মুষড়ে?... আসলে... যে কোন জাতির জীবনে কবি সাহিত্যিকদের আসন সর্বোচ্চে। একমাত্র এঁরাই সর্বমহলে শ্রদ্ধার পাত্র। আর আমাদের দেশে? অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞার পাত্র যদি কেউ থাকেন, তা এঁরাই— এদেশের কবি সাহিত্যিকরা। ভুললে চলবেনা যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে অনুশীল, উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতাই সবচেয়ে বড় কথা। শিশু যেমন জন্মেই হাঁটতে শিখেনা, হাতে খড়ির আগে সে যেমন লিখতে বা পড়তে পারেনা, অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেও তেমনি, অনুশীলন ছাড়া কোন ক্ষেত্রেই কারও প্রতিষ্ঠা পাওয়া সম্ভব নয়। আর সে অনুশীলনের ব্যাপারে চাই উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা। বিভাগপূর্ব আমলে শুনতাম মুসলমানরা আবার দেশ শাসন করবে কি? মুসলমানরা শিল্প-বাণিজ্যেরই বা বুঝে কি? দৈনিক আজাদ?—সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ওতো একটা দুর্ঘটনা মাত্র। সেদিনকার সে চিন্তাধারা, সে যুক্তিজাল সত্ত্বেও বিভাগোত্তর জীবনে দেখা গেল, মুসলমানরাও রাষ্ট্র পরিচালনা করছে, শিল্প-বাণিজ্যেও তারা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। দৈনিক আজাদের পাশে আরও কত কত দৈনিক আজ প্রথমশ্রেণীর সাংবাদিকতায় নজীর প্রতিষ্ঠা করেছে। অবশ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বিভাগোত্তরকালে জীবনের সর্বক্ষেত্রে এদেশের মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করতে সরকার নানাভাবে উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা যুগিয়েছেন... স্বীকার করতে দোষ নেই.. এদেশের প্রকাশনা শিল্প কোনদিনই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। অথচ, প্রকাশনা শিল্পই জাতীয় জীবনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে দেশে দেশে পরিগণিত।... আর আমাদের দেশে প্রচার বিভাগেরই এককোণে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগ নামে নামমাত্র একটা বিভাগ রয়েছে। এঁরা কি প্রকাশ করেন বা করেছেন ; জানা নেই।... দায়িত্ব তাঁদের মন্ত্রীদের পিছু পিছু দৌড়ান আর সময়ে অসময়ে তাঁদের ছবি ছাপা। আর কি তাঁদের কাজ, কি তাঁদের দায়িত্ব, তা কেবল সরকারই জানেন।... সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবেই এদেশের প্রকাশনা-শিল্প মার খেয়েছে... পুস্তক প্রকাশনা ক্ষেত্রে এই অনাচার সম্পর্কে নিজ উদ্যমে আইন প্রণয়ণের তাগিদবোধের কোন কারণ তাঁদের আছে বলে মনে হয়না। তাই বলে দেশের জনমত বলতে কি কিছুই নেই?'

আলোচক জাতীয় স্বার্থে পরিশেষে, "এদেশের প্রকাশকরা যাতে জাতীয়-সংস্কৃতি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার তাগিদ বোধ করে, এদেশের ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকীদের শেষজীবনে যাতে পত্রিকার মাধ্যমে খয়রাতি তহবিল খুলতে না হয়, এদেশের কবি শাহাদাৎ হোসেনদের যাতে চাকুরীর আশায় দ্বারে দ্বারে ঘুরে শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে শোচনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে না মরতে হয়, মৃত্যুর আগে ঔষধের পয়সা যোগাড় করতে এদেশের মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীদের যাতে মাত্র ১০ টাকায় প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি বিক্রয়ের আশায় পত্রিকা অফিসের দ্বারে দ্বারে ধর্না দিতে না হয়, এদেশের রমেশশীলদের জন্য পত্রিকার পৃষ্ঠায় যাতে সাহায্যের আবেদন জানাতে না হয়, এদেশের শহীদ সাবেরদের যাতে বিনা চিকিৎসায় উন্মাদ হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ডাষ্টবিন থেকে কুঁড়িয়ে খেতে না হয়, তার জন্য অবিলম্বে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে:

প্রস্তাবাবলী

(ক) জাতীয় সাহিত্য গড়ে তুলবার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য অবিলম্বে আইন করে অননুমোদিত ও প্রতারণাপূর্ণ পন্থায় বিদেশী বইয়ের পুনর্মুদ্রণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে।

(খ) সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশ সৃষ্টির জন্য বিদেশীপুস্তক আমদানী-নীতি প্রয়োজন হলে আরও কিছুটা শিথিল করে সাহিত্যপুস্তক আমদানীর কোটা কিছুটা বাড়াতে হবে। আর কুরুচিপূর্ণ হালকা পত্রপত্রিকা আমদানী বন্ধ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন মত পাঠ্যপুস্তক আমদানীর নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। বলা বাহুল্য, আমদানী-নীতি বৈগুণ্যে হালকা পত্রপত্রিকার ওপর টাকা প্রতি চার আনা বাট্টা থাকায় আমদানীকারকগণ পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তে হালকা পত্রপত্রিকা আমদানীকেই নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ফলে, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক ছাড়াই তাঁদের বার্ষিক পরীক্ষায় বসতে বাধ্য হন।

(গ) জাতীয় সংস্কৃতি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রেরণা যোগানো ও পুস্তক প্রকাশনায় অধিকতর আগ্রহী করে তোলার জন্য স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-বহির্ভূত দেশী লেখকের সাহিত্যপদবাচ্য পুস্তক-পুস্তিকাকে অন্তত: দশ বছরের জন্য আয়কর মুক্ত ঘোষণা করতে হবে। বর্তমানে পুস্তক শিল্পের ওপর শতকরা ৩০ থেকে ৩৫ টাকার মত আয়করের যে বিধান রয়েছে, তা সামগ্রিকভাবে এই শিল্পের মূলে কুঠারাঘাতই করছে।

(ঘ) অন্যান্য শিল্পের মত পুস্তক-প্রকাশনা শিল্পকে ও শিল্পোন্নায়ন ব্যাংকের ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য ঘোষণা করতে হবে।

(ঙ) প্রকাশনা-শিল্পের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রতি বছর কিছু কিছু প্রকাশককে বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করত হবে।

(চ) আমদানী ও নিয়মিত পদ্ধতিতে বিদেশী পুস্তকের পুনর্মুদ্রণের প্রশ্নে পুস্তকের গুণাগুণ যাচাইর জন্য সরকারী তত্ত্বাবধানে একটি কেন্দ্রীয়-সংস্থা গঠন করতে হবে। বাংলাএকাডেমী বা অন্য কোন সংস্থাকে এই মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে।

(ছ) স্থানীয় স্বল্পবিত্ত প্রকাশক, লেখক মুদ্রাকর মিলে কেরালার অনুকরণে একটি সমবায়িক প্রকাশন-প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা যেতে পারে।"[৯৩]

ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ 'জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংকট কালে' বিদেশী পুস্তকের অবাধ আমদানী ও পুনর্মুদ্রণে আমাদের সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়ার আলোচনায় বলেন, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধাক্কায় সমাজের গতি ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছে 'এবং এখন থেকেই সুব্যবস্থা না করতে পারলে এর ফল সুদূরপ্রসারী হবে সন্দেহ নেই।' তিনি বলেন, বিদেশী উপাদান আমদানীর দরকার অবশ্যই আছে, কিন্তু গ্রহণের আগে বাছাই করতে হবে। আর বিদেশের সবকিছু থেকে জ্ঞানের বস্তু কাজের বস্তু গ্রহণীয় বস্তু যাচাই করে বাছাই করার ভার পাঠকসাধারণের ওপর ন্যস্ত করা কখনও বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে না। বিনা নির্বাচনে অবাধে বিদেশীমাল আমদানী যেমন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে ঘা দেয়, ঠিক তেমনি বিদেশী সাহিত্য ও পত্রপত্রিকার অবাধ আমদানীর ধাক্কা গোটা সাংস্কৃতিক জীবনের বুনিয়াদে লেগে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে আমাদের সামাজিক ধর্মীয় ও নৈতিকজীবনের ধারা যায় বিফল হয়ে।"[৯৪]

সৈনিক (৮ইজুন ১৯৫৬) থেকে পূবালী পুনর্মুদ্রণ করেছিল ডক্টর মাহফুজুল হকের একটি প্রবন্ধ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক মাহফুজুল হক ১৯৬৬ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী ফরিদপুরে এক মর্মান্তিক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত হন। সম্পাদকীয় নোটে বিশেষভাবে বলা হয়, 'আমাদের ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ...... বক্তব্যের সারবত্তা আজকের দিনেও নি:শেষিত কিংবা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েনি। এই নোটে বস্তুতপক্ষে পুবালীর দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত হয়েছে বলে তাঁদের সংস্কৃতি-চিন্তার স্বরূপ অনুধাবনের জন্য : প্রবন্ধটির সারাংশ সংকলিত করা হল:

> ভারতীয় মুসলমানদের পাকিস্তানদাবীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (দ্বিজাতিতত্ত্ব অনুযায়ী) বিশ্লেষণ করে লেখক বলেন, 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই আমাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে জীবন-স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছিল তাতে স্বভাবতই আশা জেগেছিল যে, প্রাক্স্বাধীনতা যুগের সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। যেকোন আন্দোলনের প্রথম স্তরে সাধারণত একটু বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হয় — এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলনা। পূর্ব পাকিস্তানের নতুন সংস্কৃতির পুরোধা হিসেবে যাঁরা সেদিন সামনে এসে দাড়ালেন, তাঁদের কাছে আরবী হরফ ও উর্দু শব্দের আমদানীই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল ; অন্যদিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের শাসন ভার যাদের হাতে ছিল, তাঁরা সবখানেই নিজেদের সুবিধামাফিক ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে......কিন্তু নবআজাদীর আনন্দোৎসব থেমে যেতে না যেতেই ভাষার প্রশ্নে দারুন মতভেদ ও দেশব্যাপী বিক্ষোভ জেগে উঠলো। সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রথম পদক্ষেপে বাধা পেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে গানে ও রাজনৈতিক সভাসমিতিতে ভাষার লড়াই চলল দীর্ঘ দিন ধরে।......ভাষা-আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক চেতনা নতুন পথে এগিয়ে চলল। রাষ্ট্র-ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী দুবছর পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবনে যে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিল, তা হচ্ছে ভাষার প্রশ্ন।রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামী আদর্শকে রূপায়িত করা তো দূরের কথা, জনসাধারনের মৌলিক দাবী ও অভাব-অভিযোগের প্রতিকারে ব্যর্থ হয়ে সরকার গণ-সমর্থন হারিয়ে বসল। সংগে সংগে তাদের প্রচারিত ইসলামী রাষ্ট্রের জিগির জনসাধারণের কাছে হাস্যাস্পদ এক রাজনৈতিক শ্লোগান ছাড়া আর কিছুই মনে হলনা । রাষ্ট্রীয় জীবনের এই ব্যর্থতার ঢেউ এসে লাগল আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে ।ইসলাম, মুসলিম লীগ, সরকার- তিনটিই একার্থ বোধক হয়ে পড়ল। তাই যে জীবনাদর্শ সামনে রেখে পাকিস্তান আন্দোলন করা হয়েছিল, আমাদের শিল্প-সাহিত্যে তার প্রতিফলন করাকে প্রতিক্রিয়াশীলতা বলে একদল প্রচার শুরু করলেন। দুর্ভাগ্যবশত: যাদের মুখে তখন সেই জীবনাদর্শের জয়গান শুনা যেত,তাদের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা মূল আর্দশ ও তার বিশ্বাসীদের সম্পর্কে এক বিরাট ভুল ধারনার সৃষ্টি করে। সুবিধাবাদী শ্রেণীর ব্যর্থতা ও ভিন্ন আদর্শের বিশ্বাসীদলের অপপ্রচারের ফলে আমাদের সংস্কৃতিসেবীদের মনে দেখা দিল অনিশ্চয়তা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব। অন্যদিকে পশ্চিম বাংলা থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় দেশভাগজনিত আর্তনাদ এবং অখণ্ড সংস্কৃতির জয়গান এদেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মনে দারুণ এক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। তাই অনেকেই কোলকাতাকেন্দ্রিক বিভাগ-পূর্ব সংস্কৃতিকে আকঁড়িয়ে ধরে প্রগতিশীল (?) শিবিরে জায়গা করে নেয়ার প্রচেষ্টায় লেগে গেলেন। পূর্বপাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবনে আজ এমনি এক অনিশ্চয়তা, লক্ষ্যহীনতা ও আদর্শের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে , আমাদের শিল্পী সাহিত্যিকদের সামনে আজ কোন স্পষ্ট পথ নেই, তাদের নেই কোন বলিষ্ঠ মত। মত ও পথের এই অনিশ্চয়তা আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের বর্তমান স্থবিরতা ও বন্ধ্যাত্বের জন্য দায়ী। একদল শিল্পী সাহিত্যিক সোজা পথ হিসেবে পশ্চিম বাংলার নেতৃত্ব মেনে নিশ্চিন্তে বসে আছেন, তাঁদের বক্তব্য বাংলা সংস্কৃতি এক ও অখণ্ড। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী সাহিত্যিকেরা যা লিখছেন বা বলছেন, তার চেয়ে উন্নততর কিছু সৃষ্টি করা পূর্ব পাকিস্তানী শিল্পীসাহিত্যিকদের পক্ষে সম্ভব হবেনা।......তাদের কাছে যুক্তি ও মর্যাদাবোধের চেয়ে অন্ধভক্তি ও হীনমন্যতাই বড় হয়ে দাড়িঁয়েছে । কিন্তু (পশ্চিমবঙ্গের) বইতে যে রুচি ও সংস্কৃতির পরিচয় ... যে মত ও পথের ইংগিত করা হয়েছে, তা কোন দেশপ্রেমিক পূর্ব পাকিস্তানী কি স্বীকার করে নিতে পারবেন? পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে যারা আজও কৃত্রিম দেশ-বিভাগ বলে উড়িয়ে দিতে চায় তাদের নেতৃত্ব কোন্ পাকিস্তানী মেতে নিতে পারবেন?... কাজেই তাঁদের রচনায় আমাদের জীবনধারাকে পুরোপুরি রূপয়িত হতে দেখার আশা বাতুলতাই হবে।.... আর একদল লেখক আছেন, যাঁরা নিজেদের লেখায় ইসলামী ভাবধারাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে Revivalism কেই আদর্শ হিসেবে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু দেশের মাটি হতে যে সাহিত্য রস সংগ্রহ করতে পারেনা, দেশের লোকের কাছে তা কোনদিনই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেনা এবং তা করে কোনদিনই মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কোন শিল্পকর্মে শুধু মননশীলতাই সার্থক সৃষ্টির একমাত্র লক্ষণ নয়, তার সঙ্গে প্রয়োজন বাস্তবতার ।...... দুর্ভাগ্যবশত এদলের লক্ষ্য পরিস্কার থাকলেও তাদের রচনায় বর্তমানকালের প্রতিফলনের অভাব পরিলক্ষিত হয়, কেবল অতীতের পুনরুদ্ধারের কথাই তাঁরা বারবার বলে থাকেন।ভুলে গেলে চলবেনা যে , ঐতিহ্যহীন সাহিত্যসৃষ্টির কথা বাতুলতা মাত্র। অতীত ঐতিহ্যকে বাদ দিতে গেলে আমাদের সাধনা হবে ব্যর্থ এবং জাতির অগ্রগতিও পদেপদে হোঁচট খাবে। জাতির বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন অতীতের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং বর্তমান অবস্থাকে মূলধন করেই ভবিষ্যৎ গঠিত হবে। আমাদের বর্তমান সাংস্কৃতিক জীবনকে অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তা হবে মস্ত বড় ভুল। অতীত ভাবধারার ক্ষীণতম স্রোত আজও আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্রকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কাজেই নতুন সাংস্কৃতিক জীবন সৃষ্টি করতে চাইলে পুরাণকে অবজ্ঞা করলে নিজের পায়ে কুড়াল মারা হবে। একথাও মনে রাখতে হবে যে, এক যুগের শিল্পরীতি অন্যযুগের যথাযথ সমাজচিত্র আঁকতে অক্ষম। কারণ সমাজটা স্থিতিশীল নয় ... গতিশীল। তাই সমালোচনার কষ্টি-পাথরে যাচাই করে যেটুকু মহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত কেবল সেটুকু নিয়ে বাকীটুকু বর্জন করে চলাই হবে সংস্কৃতিসেবীর কাজ। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্রের প্রভাব থাকবেই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে... মুসলিম লেখকের রচনায় যে ভাবধারা ও জাতীয়তাবোধের পরিচয় পাই, তার থেকে নিতে হবে প্রেরণা ও আদর্শ। কিন্তু তাই বলে আমরা পুনর্জাগরণের কথা বলছি না। অতীতকে মূলধন করে নতুন সৃষ্টির প্রচেষ্টাই আমাদের উদ্দেশ্য।.... ঐতিহ্যের গোড়া কাটার ফল যেমন মৃত্যু, তেমনি অতীতে ফিরে যাবার পথ আত্মলুপ্তির পথ ছাড়া আর কি? ভৌগলিক অবস্থিতি ও ধর্মীয় অনুভূতি দুটোই আমাদের জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমরা একদিকে বাঙ্গালী, অন্যদিকে মুসলমান।... সামাজিক মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত যে জীবনাদর্শ আমাদের লক্ষ্য, তার পথে জনসাধারণকে এগিয়ে নেয়াই হবে আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য।... ভাষা সম্পর্কে এক কথায় পাক-বাংলার জনসাধারণের মুখের ভাষাকে আমাদের সাহিত্য, গানে যথাযোগ্য স্থান দিতে হবে।'[৯৬]

১৯৬০ সনের পরে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি এবং বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির পর 'বাংলা'র প্রাধান্য কমাবার অসৎ-উদ্দেশ্যে একশ্রেণীর

Dhaka University Institutional Repository

বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী উর্দুর কথা না বলে ইংরেজীর শ্রেষ্ঠত্ব ও অপরিহার্যতা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পথ বেছে নিয়েছিলেন এই যুক্তিতে যে যে বাংলা উর্দুর বিবাদে পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তাই তাঁরা বাংলা ও উর্দুকে দ্বিতীয় স্তরে রেখে প্রথমগুরুত্বে ইংরেজী ভাষা-মাধ্যমকে গ্রহণের সুপারিশ করছিলেন। 'সংলাপ'-এ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন 'ইংরেজীর কথা' লিখেছিলেন ঐ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই। কিন্তু বাংলাভাষী লেখকবুদ্ধিজীবী এবং সংস্কৃতিকর্মী তাঁর ঐ লেখার প্রতিক্রিয়ায় নবনব যুক্তি উপস্থাপন করে বাংলাকে প্রথম গুরুত্বে অধিষ্ঠিত দেখার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতে থাকেন। পূবালীতে এ বিষয়ে ছোটখাটো 'আলোচনা' অনেক হয়েছে। তবে 'ইংরেজীর কথা' এবং 'ইংরেজীর কথা ও বাংলা প্রচলনের সমস্যা' শিরোনামে দুটো দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধও এতে ছাপা হয়েছে। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের বক্তব্যের সারহীনতা বা যুক্তির প্রতিক্রিয়াশীলতাকে উন্মোচন করে বাঙ্গালীর উন্নতি-অগ্রগতির সহায়ক ভাষা যে বাংলা সেকথাই জোর দিয়ে বলা হয়েছে। নূরুল ইসলাম খান 'ইংরেজীর কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন : "আমার বিবেচনায় এটি কোন মূল সমস্যা নয়। অনেকটা পোষণ করা ও সৃষ্ট সমস্যা।... সত্য কথা বলতে গেলে, আমাদের দেশে আজাদীর পরে ইংরেজীর স্থান কি হতে পারে সে সম্পর্কে একটা সর্ববাদীসম্মত ধারণা থাকা সত্ত্বেও একটা অনুদার মতবাদ ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে ঐ সমস্যাটি পোষণ করে আসছে এবং আর কিছু অহেতুক সমস্যার সৃষ্টি করছে।"[৯৭]

আবুল কাসেম ফজলুল হক 'ইংরেজীর কথা ও বাংলা প্রচলনের সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন এর বক্তব্য খণ্ডন করে স্পষ্ট করেই বলেন : "বাংলাই যে বাংলা ভাষা-ভাষীর শিক্ষার মাধ্যম হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের অফিস-আদালতে যে বাংলার মাধ্যমেই কাজ চলবে— এ নিয়ে আর প্রত্যক্ষভাবে কেউ মতদ্বৈধ প্রকাশে সাহসী হচ্ছে না। তবুও মনে হয়, ইংরেজী ভাষা আমাদের সমাজ-জীবনে কি ভূমিকা গ্রহণ করবে, এ-নিয়ে অনেকেই আজও দুর্ভাবনার অস্পষ্টতায় হাবুডুবু খাচ্ছেন। বাংলা প্রচলনের পাশে ইংরেজীর ভূমিকা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।"[৯৮]

অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে নৈতিক অবক্ষয়ের চিত্র সাহিত্যে রূপায়ন প্রসঙ্গে একটি আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ— নজরুল হক পূবালীতে প্রকাশিত শওকত আলীর উপন্যাস 'পিঙ্গল আকাশ' পড়ে এই 'আলোচনা'টা লিখেছিলেন ; 'নৈতিকমান ও সমকালীন সাহিত্য' শিরোনামে ঃ "অর্থনৈতিক সংকটের দরুণ আমাদের সমাজ-জীবনের পরতে পরতে এক ভয়াবহ ক্ষত সবার অলক্ষ্যে পচনক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে।... একটা অদৃশ্য দানবীয় শক্তি যেন আমাদের জীবনের সুন্দর স্বাস্থ্যকে বিকৃত বিক্ষত করে দিচ্ছে। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমাজ—যারা আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড, আজ সেই মেরুদণ্ড নৈতিক অধোগতির কারণে পঙ্গু হতে চলেছে।... জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত বেকার সমস্যা ও জীবনযাত্রার উর্ধগতি রোধ করা কোনক্রমেই সম্ভব হয়ে উঠছেনা, ফলে বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তসমাজ এক ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। আর তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আমাদের সমাজের নৈতিকমান ক্রমাবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যেন কোন অদৃশ্য শক্তির ইশারায় গোটা সমাজ এক অন্ধকারময় দুর্গম পথে অগ্রসর হচ্ছে। কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা শিল্পের অগ্রগতির দরুণ তার পূর্বের কাঠামো বদলাচ্ছে.... এই সংকটের প্রথম সারিতে রয়েছে দরিদ্র কৃষক মজুর। আর দ্বিতীয় সারিতে রয়েছে মধ্যবিত্ত সমাজ... মধ্যবিত্ত সমাজের একটি অংশ মেহনতি কৃষক-মজুরের দলে মিশে যেতে বাধ্য হচ্ছে আর একটি অংশ.... অর্থনৈতিক সংকটের মোকবিলা করতে না পারায় বাধ্য হয়ে বিবেক-মানবতার ইতি করে নানা দুর্নীতির পথে পা বাড়াচ্ছেন—সমাজের একটি শ্রেষ্ঠ অংশ দিনে দিনে নৈতিক অধোগতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থার মত আমাদের সমাজজীবনেও তাই আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে।... যে সমাজে আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব যত তীব্র হয়ে উঠেছে সে সমাজে নৈতিক অধ:পতন এবং পারস্পরিক সহানুভূতি ও মানবতাবোধ তত সীমিত হচ্ছে:... প্রতিকূল স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে... সমাজের এই ভাঙ্গনের মূলে রয়েছে আমাদের মানসিকতার দৈন্য। সমাজের কাঠামোর দ্রুত পরিবর্তন এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার সস্তা অনুকরণের সঙ্গে আমাদের শিক্ষা ও সংস্কারের ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে না বলেই সমাজের অলিগলি পথে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং নরনারীর সমঅধিকারের প্রতি যোগ্য মর্যাদা দেওয়ার মত মানসিকতা আমাদের সমাজে আজও সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠেনি। তার ফলে নানা সামাজিক ব্যধি স্বাভাবিকভাবেই এসে যাচ্ছে।.... সংস্কার ও রুচিবোধ বিভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিতে পারে তবু তারও একটা মানদণ্ড আছে। সেই মানদণ্ড নির্ধারণে ও নিয়ন্ত্রণের জন্যে সমাজে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দেয়।"[৯৯]

সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ, অর্থনীতি এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য বা কার্যক্রম নিয়ে পূবালী যেসকল আলোচনা-সমালোচনা তথা ভূমিকা পালন করেছে, সে সম্পর্কে পাকিস্তান-আমলে প্রকাশিত সংলাপের একটি সংখ্যায় পত্রিকাবিষয়ক আলোচনায় ডক্টর গোলাম সাকলায়েন মন্তব্য করেন : "একখানি সাহিত্য পত্রিকায় এতো বিষয়ের সমাবেশ থাকতো যা উন্নতমানের সাহিত্য-পত্রিকা হয়েও কিছুটা সংবাদ জগতের তথ্যাদি পরিবেশনে কুণ্ঠিত হতো না ... এবং নিছক সাহিত্যরসের যোগান দিয়েও শিল্পতত্ত্ব ও জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়েও নতুন দিক উদঘাটিত করে দেয়। কিন্তু পূবালীর কোন সাহিত্যিকগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়নি। তবু এটাই একমাত্র মাসিক কাগজ যেখানে একদিকে আকৃষ্ট করেছে বিশ্ববৈদগ্ধের দিকে এবং অন্যদিকে মুসলিম ঐতিহ্য ও ইতিহাস থেকে নানা বিষয়ের আমদানী করে তাকে একালের মানুষের কৌতুহলী দৃষ্টির সামনে তুলে ধরেছে নির্দ্বিধায়। অর্থাৎ আমাদের সামাজিক গোঁড়ামি অপসারিত করার আকাঙ্ক্ষায় দৃষ্টি দিয়েছে এবং সেই সঙ্গে সাহিত্যে নিরাভরণ পৌরুষের অবতারণা করেছে পত্রিকাখানি।"[১০০]

৫. পূর্বমেঘ (১৯৬০-৭১)

পূর্ববাংলা থেকে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকাগুলোর মধ্যে 'পূর্বমেঘ' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেকালেই এই পত্রটি অনেক নাম কিনেছিল। সমকাল, পূবালী, পরিক্রম, কণ্ঠস্বর, নাগরিক প্রভৃতি উন্নতমানের সাহিত্যপত্রে 'পূর্বমেঘ' এর বিজ্ঞাপন নিয়মিতই প্রায় ছাপা হতো। অবশ্য পূর্বমেঘেও ঐসকল পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি আছে। আসল কথা হলো, বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীদের প্রগতিশীল অংশের সদস্য সম্পাদক-লেখকেরা তখন উপর্যুক্ত পত্রিকাগুলোকে একই স্তরের মর্যাদাপূর্ণ বলে মনে করতেন অথবা তাঁরা পারস্পরিক পৃষ্ঠপোষকতায় আস্থাশীল ছিলেন। তবে পূবালী পরিক্রম সওগাত থেকে পূর্বমেঘ ও কণ্ঠস্বর

Dhaka University Institutional Repository

মাত্রাগতভাবে কিছুটা ভিন্ন ছিল। ওগুলো ছিল মাসিক পত্রিকা। কণ্ঠস্বর মাসিক বা দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক কোনোভাবেই চিহ্নিত হতে পারেনা। মাসিকের হিসেবে স্বাধীনভাবে ওটা প্রকাশিত হতো। নাগরিক ও পূর্বমেঘ ত্রৈমাসিক ছিল। বাছাবাছা মানসম্মত রচনা এতে প্রকাশিত হতো। পূর্বমেঘ ত্রৈমাসিক হলেও নিয়মিত প্রকাশিত হতে পারেনি। এগারো বছরে ত্রৈমাসিক হিসেবে প্রকাশিত হবার কথা ছিল ৪ × ১১ = ৪৪ টি। কিন্তু ২৩টি পুস্তিকা মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। সপ্তম বর্ষের তৃতীয় ও চতুর্থ বা তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা পৃথক বা যুগ্ম সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়ে থাকলে ২৪ বা ২৫টিও হতে পারে। তবে সম্পাদকদের নিকট থেকেও না-পাওয়া সংখ্যাটি বা দুটি সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। অতএব ২৩টির বেশী 'পূর্বমেঘ' প্রকাশিত হয়নি বলে ধরে নিতে হবে। কিন্তু এই ২৩টি পুস্তিকা ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত সময়ে রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয়েই পূর্ববাংলার সাহিত্য পত্রিকার ইতিহাসে অত্যন্ত উজ্জ্বল একটি স্থান সুদৃঢ়ভাবে দখল করে আছে। এটা বলাবাহুল্য নয়, সম্পাদকদের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের কারণে বা প্রভাবেই তা সম্ভব হয়েছিল। এর সঙ্গে প্রকাশক ও মুদ্রাকর হিসেবে যাঁরা যুক্ত ছিলেন—তাঁরাও এদেশের পণ্ডিতসমাজের সর্বাগ্রগণ্য সভ্য।

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা পূর্বমেঘ প্রকাশিত হয় আষাঢ় ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে জুন ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে। সম্পাদক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। পত্রিকায় পরিচিতি বা বৈশিষ্টজ্ঞাপক ঘোষণা ছিল—'শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা'। প্রকাশক ও মুদ্রাকর ডক্টর এ. আর. মল্লিক। ঠিকানা কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী। প্রেসঃ মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, রাজশাহী। দাম একটাকা। সাদা উন্নতমানের কাগজে রয়েল সাইজে, রুচিশীল মুদ্রণ-সৌকর্য নিয়ে প্রকাশিত প্রথম সংখ্যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৯৬। বলাদরকার, সমকালের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার পরেই পূর্বমেঘ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৬০ সনে পূর্বমেঘ এর সঙ্গে নামে, ভাবে, আদর্শে অনেকটা মিল রেখে প্রকাশিত হয়েছিল 'পূবালী'। তখনও 'পরিক্রম' বের হয়নি। সংলাপ, নাগরিকও না। উচ্চাদর্শের গুরুত্বপূর্ণ, খ্যাতিমান পত্রিকার হিসেবে তাঁদের সামনে ছিল এদেশের মোহাম্মদী, মাহেনও, সমকাল এবং বাংলাসাহিত্যের ঐতিহাসিকভাবে খ্যাত সকল পূর্বসূরী সাহিত্যপত্রিকা। সজ্ঞানেই তাঁরা দেশকাল সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের চাহিদার কথা স্মরণে রেখে এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পত্রিকার নামটা ছিল একেবারে কালীদাসীয়— 'পূর্বমেঘ', অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের বার্তা নিয়ে যেনো 'মাগরিবি-পাকে' যাবার অভীপ্সা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল— তখন পূর্ববাংলার জনগণের জীবন ও সাহিত্য সংস্কৃতি পশ্চিমপাকিস্তানী আমলাদের হামলায় একেবারে অতীষ্ঠ। এই পত্রিকায় অতীষ্ঠ, বিক্ষুব্ধ, উৎপীড়নে শঙ্কিত বাঙালি জনগণের মননের বিচিত্র চিত্র তাই প্রতিফলিত হয়েছে এবং একারণেই একালের পত্রিকারাজির মধ্যে পূর্বমেঘ অতিশয় পরিদৃশ্যমান একটি নক্ষত্রস্বরূপ। অন্যতর সম্পাদক ডক্টর মুস্তাফা নূরউল ইসলাম এক সাক্ষাৎকারে বলেন ঃ "সুস্থ শিল্পসাহিত্য সংস্কৃতি ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার লক্ষ্য-আদর্শ সামনে নিয়েই প্রকাশিত হয়েছিল পূর্বমেঘ। সেজন্য এর লেখক-শুভানুধ্যায়ী গোষ্ঠীর অধিকাংশই প্রগতিশীল, বামঘেঁষা তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদী। সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী বাংলাদেশ-আন্দোলনের সপক্ষশক্তির সহায়ক, যোদ্ধা মসীজীবীরা এর প্রধান কন্ট্রিবিউটর।"[১০১] পত্রিকা প্রকাশের প্রেরণা সম্পর্কে জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে অন্যতর সম্পাদক অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন ঃ লেখক সংঘের প্রতিক্রিয়া থেকে নয়—ইতিবাচক একটি ধারণা বা প্রেরণা থেকে আলোচনার মধ্য দিয়ে, কাজকর্মের পরও যে-সময় থাকে, সেটাকে কাজে লাগানোর জন্য (রাজশাহী থেকে) এই পত্রিকা আমরা প্রকাশের উদ্যোগ নিই।[১০২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তখন প্রকাশক ও সম্পাদকগণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিয়োজিত—একজন ইংরেজী, একজন বাংলা এবং একজন ইতিহাস বিভাগে। পত্রিকা প্রকাশের সুবিধা-অসুবিধা দুই-ই ছিল তখন। ঢাকার বাইরে থেকে ভালো পত্রিকা প্রকাশের প্রধান অন্তরায় উন্নতমানের লেখার অভাব।যে জন্য দেখা যায় এর অধিকাংশ লেখকই রাজশাহীকেন্দ্রিক তথা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গবেষক, কিংবা প্রাক্তন ছাত্র। চাঁদা তুলে এবং বিজ্ঞাপন সংগ্রহের মাধ্যমে পত্রিকার ব্যয় সংগ্রহ করে মফস্বল শহর রাজশাহী থেকে এই পত্রিকা প্রকাশের নেপথ্যে অবদান আছে অনেকের, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেনঃ পত্রিকা প্রকাশের জন্য অর্থ সংকটে পড়লেই স্থানীয় একজন ন্যাপ-নেতা মরহুম জনাব আতাউর রহমান বেরিয়ে পড়তেন, তিনি টাকা সংগ্রহ করতেন, বিজ্ঞাপনও। তা ছাড়া আমরাও চাঁদা নিতাম রাজশাহীকেন্দ্রিক সুধী-সমাজের কাছ থেকে। টাকার জন্য অসুবিধা হতো না। লেখার অভাবেই পত্রিকা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। তা ছাড়া মুস্তাফা সাহেব বিলেত গেলেন, এসে জাহাঙ্গীর নগরে যোগদান করলেন। পত্রিকা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। বলা দরকার জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীও বিলেত যান এবং তার ফলেও পত্রিকা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। একজন এ.কে.এন. আহমেদ তখন পাকিস্তান শিল্প-ব্যাংকের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন। তিনি মাঝে-মধ্যে এতে বিজ্ঞাপন দিতেন। ফলে কিছু অর্থের সাশ্রয় হতো। আরতাই উদ্বৃত্ত পয়সা থেকে লেখকদেরকে কিছু কিছু করে সম্মানীও দেয়া হতো। তখন পত্রিকায় লিখে পয়সা পাওয়া যেতো কেবল মোহাম্মদী, মাহেনও ও পূবালী থেকে। পূবালীর প্রকাশক বিবিধ পুস্তকের প্রকাশক ও বিক্রেতা ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন। ফলে পয়সা তিনি দিতে পারতেন। আর পত্রিকা প্রকাশের প্রেরণারূপে ব্যবসায়িক প্রয়োজন বা স্বার্থও তাঁর কিছু ছিল। কিন্তু তৎকালীন সর্বপ্রধান সাহিত্যপত্রিকা সমকাল লেখার জন্য পয়সা দিতনা।[১০৩] কোনো ভালো পত্রিকাই (নামমাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া) লেখকদের পয়সা দিয়ে লেখা চেয়েছে বলে ইতিহাসে জানা যায় না। বরং লেখার জন্য পয়সা যে সকল ব্যবসা-সফল পত্রিকা দিতে পেরেছে, তাদের থেকে বিনা পয়সার লেখা নিয়ে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকাই ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করেছে বেশী, এর কারণ সুসম্পাদকের কৃতিত্বে পত্রিকা সাহিত্যজগতে মর্যাদাবান হয়ে ওঠায় সৃষ্টিশীল লেখকেরা স্বতপ্রণোদিত হয়েই সৃষ্টিশীল রচনা প্রকাশের আকুলতা থেকে ঐসব পত্রিকায় লেখা দিয়েছেন (বা দিতেন)। ফলে তা সৃষ্টিশীলতার ইতিহাসে বেশী আলোচনা-সমালোচনার বিষয়ে কিংবা বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। তবু বলা খুব দরকার, বিনা পয়সার পত্রিকার থেকে পয়সা দিতে পারা সাহিত্যপত্রিকারই সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা সর্বাধিক। এর সঙ্গে দরকার সম্পাদকের যোগ্যতার সুসমন্বয়। যেমন বঙ্গদর্শনের কিংবা সবুজপত্রের অথবা সমকালের লেখকেরা আর্থিকভাবে পুরস্কৃত হবার সুযোগ পেলে সোনায় সোহাগা হতো। কিন্তু বঙ্গদর্শন, সবুজপত্র, কল্লোল, সমকাল বা পূর্বমেঘের লেখকেরা কিঞ্চিৎ অর্থপ্রাপ্তির খেয়াল নিয়ে লিখতেন না, এর অধিকাংশ রচনাই ছিল লেখকদের মুক্তবুদ্ধি তাড়িত, বিবেকসঞ্জাত এবং সৃষ্টির বেদনার বহিঃপ্রকাশ। মনীষী আবুল ফজল হচ্ছেন এইকালের একজন প্রধান চিন্তক। প্রায় সকল ভালো পত্রিকার ভালো রচনাটিই তিনি লিখেছেন। আবদুল হক, আহমদ শরীফ বা বদরুদ্দিন উমরও লিখেছেন। তবে

Dhaka University Institutional Repository

আবুল ফজল বয়স, সরকারী চাকুরীর ধরণ (সরকারী কলেজের অধ্যাপক, ১৯৫৮ সন থেকে অবসর প্রাপ্ত) এবং মুক্তবুদ্ধির সাধক শিখা-গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন, প্রভৃতি দিক থেকে কিছু ভিন্ন ও স্বতন্ত্র চরিত্রের-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। সাহিত্যিক খ্যাতির দিক থেকেও তিনি সর্বাগ্রগণ্য। ঐকালে তিনি যেসকল বক্তব্য বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করছিলেন, তা একদিকে খ্রীয়মান, নিস্প্রাণ, হতাশাগ্রস্ত বাঙালি শিক্ষিত সমাজকে প্রাণশক্তি যোগান দিচ্ছিল,— অপর দিকে শাসকশ্রেণীর আসনে কুঠারাঘাত হানছিল। 'পূর্বমেঘে'ও তিনি লেখা পাঠাতেন, কোনো কোনো লেখা ছাপা হলেও একটি লেখা তাঁর (সম্পাদকরাই আবেদন জানিয়েছিলেন লেখা পাঠানোর জন্য) সাহসের অভাবজনিত সীমাবদ্ধতার কারণে পূর্বমেঘের কর্ণধারগণ ছাপতে পারেননি।১০৪ তবে তৎকালে বদরুদ্দিন উমর এর ন্যায় স্পষ্টবাদী, বাঙালি জাতীয়তাবাদী, বিপ্লবী চিন্তক-লেখকের রচনা প্রকাশের জন্যও সাহসের দরকার হতো, এবং সে-সাহস পূর্বমেঘ হারায়নি। বিতর্কিত 'সাম্প্রদায়িকতা' ; 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম সংস্কৃতি' ; 'আত্মনিয়ন্ত্রণ ও গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ' শীর্ষক প্রভৃতি লেখা পূর্বমেঘে ছাপা হয়েছিল। এতে যেসকল বক্তব্য সেদিন উপস্থাপিত হয়েছিল—রীতিমতোভাবে তা ছিল পাকিস্তানের সংহতির জন্য মারাত্মক। লেখকদেরকে তুষ্ট রাখার জন্য 'পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড' গড়ে তোলা হলেও রাজশাহীতে এর কোনো শাখা ছিলনা। অতৃপ্ত, অতুষ্ট, বিক্ষুব্ধ চিত্তের কিছু লেখক তাই ঐ অঞ্চলে ছিলেন, এবং তাঁরা নিজেদের অভিব্যক্তি রূপ দিচ্ছিলেন পূর্বমেঘের পৃষ্ঠাতে। এতে মেজাজের দিক থেকে পূর্বমেঘের তাৎপর্যপূর্ণ তারতম্য সৃষ্টি হয়। তবে বি.এন. আর পূর্বমেঘকে মাঝেমধ্যে পৃষ্ঠপোষকতা দান করতো বলে জানা যায়। কিন্তু এতে সরকারী কোপানলে পড়ার পথে কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়নি। কারণ অবশ্যই বদরুদ্দিন উমরের লেখা ছাপার অপরাধ। তিনি তখন 'কমিউনিষ্ট' হিসেবে পাকিস্তান সরকারের তালিকাগ্রস্ত লেখক। পূর্বমেঘের মুদ্রক 'মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস'এর উপর সরকারী চাপ সৃষ্টি করা হলো। অসামর্থ্য জানালেন প্রেস মালিক। অতএব ছাপাখানা পরিবর্তন করতে হলো। পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ছাপা হয় ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্টিং ফার্ম, এবং শেষ সংখ্যা ছাপা হয় আইডিয়াল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, গ্রেটার রোড, রাজশাহী থেকে। প্রকাশক এ. আর. মল্লিক। সপ্তম বর্ষে প্রকাশক ও মুদ্রাকর ডঃ এ. আর. মল্লিকের স্থলে অভিষিক্ত হন ডক্টর মুখলেসুর রহমান। প্রচ্ছদ আঁকতেন কামরুল হাসান, মুস্তফা শওকত কামাল প্রমুখ। শেষের দিকে পত্রিকা যখন বছরে চার বা দুই বা তিন সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হতো তখন পৃষ্ঠা সংখ্যাও বেড়ে শতাধিক ১০৪, ১১২, ১১৪ ইত্যাদি হয়েছে। তৃতীয় বর্ষ থেকে পত্রিকার সাইজও ডিমাই হয়েছে (ডাবল ডিমাই ১/১৬ সাইজ)।

পূর্বমেঘের ২৩টি সংখ্যা বের হয়েছিল এই নিয়মে— আষাঢ় মাসে বর্ষ আরম্ভ, ১৩৬৭ প্রথম বর্ষ, চৈত্র ১৩৭৭ সনে একাদশ বর্ষে পত্রিকার কার্য সমাপ্ত। ১৩৬৭, ৬৮, ৬৯ তিন বছর নিয়মিত বের হয়েছে। তবে তৃতীয় বর্ষে দু'টো একত্রে, যুগ্ম সংখ্যা হিসেবে বের হয়েছিল। চতুর্থ বর্ষে (১৩৭০) পত্রিকা পুরো বন্ধ ছিল। পঞ্চম বর্ষে (১৩৭১, একটি যুগ্মসংখ্যা) তিনটি পুস্তিকা বেরোয়। ষষ্ঠ বর্ষে পুরো বন্ধ। সপ্তম বর্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হয়। তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশের তথ্য জানা যায়না। অষ্টম বর্ষে চারটি সংখ্যাই বের হয়। নবম ও দশমবর্ষে একেক খণ্ডে (চারসংখ্যা একত্রে) দুটি ; একাদশ বর্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ একত্রে দুটি মোট তিনবছরে চারটি পুস্তিকা বের হয়েছিল। ঘোষিত নিয়ম ছিল 'বাংলা বছরের আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ, ও চৈত্র মাসে প্রকাশিত হবে। প্রতি সংখ্যার দাম এক টাকা। বৈদেশিক দুই শিলিং। বার্ষিক সডাক (পাকিস্তান ও ভারতে) সাড়ে চার টাকা। বছরের যেকোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।' তবে উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে ঘোষণা দিতে তাঁরা সজ্ঞানেই নারাজ ছিলেন। ১৯৬৩ সনের দিকে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বিলেতে গমন করেন। অক্সফোর্ড থেকে তিনি যে চিঠি লেখেন, তাতে বোঝা যায় ১৯৬৩ সনের জুন নাগাদ তিনি যখন দেশ ত্যাগ করেন, তখন পূর্বমেঘের তিন বছর পূর্ণ হয়নি। এইপত্রে তিনি 'পূর্বমেঘ' নিয়ে যে ভাবনা বা ধারণা পোষণ করতেন, তা বিবৃত করেছিলেন। এতে তাঁর সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে চিন্তাধারার কিছু পরিচয় যেমন আছে, তেমনি আছে পূর্বমেঘের কাঙ্ক্ষিত স্বরূপ বর্ণনা। চতুর্থ বর্ষে বন্ধ থেকে পঞ্চম বর্ষে যখন পত্রিকা আবার মুস্তফা নূরউল ইসলাম এর একক উদ্যোগে প্রকাশিত হয় (যদিও সকল সংখ্যাতেই সম্পাদক হিসেবে জি.র.সি ও মু.নূ.ই দুজনের নামই ছাপা হয়েছে) তখন এই চিঠি পূর্বমেঘে (পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যায়) ছাপা হয়েছিল। সম্পাদকগণ এই বক্তব্য দ্বারাই কি পত্রিকার উদ্দেশ্য-আদর্শ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন? জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী লিখেছেন : "... ত্রৈমাসিক পত্র, সম্পাদনা থেকে শুরু করে ছাপা মফস্বল শহরে, সম্পাদনায় দুজন ব্যক্তি যাদের পেশা শিক্ষকতা, এবং পুঁজি বন্ধুজনের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার হাত থেকে কুড়িয়ে নেওয়া (বা কেড়ে নেওয়া?) কিছু টাকা— এতে পূর্বমেঘের পরিচয় কিছুটা থাকতে পারে ; তবে আসল পরিচয় নেই। আসল পরিচয় দিতে গেলে পূর্বমেঘ কোনজাতের পত্রিকা বা কোন জাতের নয়, বা কোন জাতের পত্রিকা হতে চায়, আর কোন জাতের নয়, সে আলোচনায় আসতে হয়। মুশকিল হল পত্রিকার জাতগুলি সবসময় পরিষ্কার ভাবে চিহ্নিত নয় ; তাছাড়া বর্ণ সংকর ত আছেই। একটা পত্রিকা হপ্তায় একবার বেরুচ্ছে, না মাসে একবার, না তিনমাসে—এতে বোধ হয় তার প্রকৃতি সবটা ধরা পড়েনা। ঠিক যেমন, প্রত্যেক দিন বের হয় বলেই টাইমস্ আর নিউজ অব দি ওয়ার্ল্ড এক জাতের কাগজ নয়, যদিও অবশ্য দুটোই দৈনিকপত্র। মাসিক মোহাম্মদী যদি আগামীকাল থেকে ত্রৈমাসিক হয়ে বেরোয় তাহলে কি পূর্বমেঘের সাথে তাকে এক বন্ধনীতে ফেলা যাবে? বা আবদুল হাই সাহেবের সাহিত্যপত্রিকা যদি বছরে দুবার ছাপা না হয়ে চারবার হয়, তার সাথে?

এর থেকে কেউ যদি বুদ্ধিমানের মতো বলে বসে, মাসিকপত্র ওজনে হালকা, ত্রৈমাসিক একটু ভারী, আর ষান্মাসিক গুরুতর ভারী, তাহলেও জওয়াব ঠিক হলোনা। এর মধ্যে কিছুটা সত্য থাকতে পারে, পূর্ণ সত্য নয়। আসলে আমরা কতোটা ভারী হতে চাই তার চাইতে জরুরী কথা আমরা কি ধরণের লেখা চাই, কেন চাই এবং কাদের চাই। মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিকের মধ্যে তফাৎটা বাহ্য হলেও যেটা মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে না সে হল মোহাম্মদী, পূর্বমেঘ ও সাহিত্যপত্রিকা তিন জাতের এবং যে সম্পাদকীয় প্রশ্ন তিনটি একটু আগেই আমি তুলেছি, সেগুলি তিন শ্রেণীর সম্পাদকের পক্ষেই খাটে এবং এদের সবাইকে এ-সব প্রশ্নের জওয়াব স্পষ্ট রাখতে হয়, নিজেদের চেতনায়। অবশ্য পত্রিকার শ্রেণীবিভাগ এখানেই শেষ নয়। পশ্চিম মুলুকে আপাততঃ আমি বিলেতের কথা ভাবছি Little magazine বলে আর একজাতের পত্রিকা আছে—এদের অবয়ব ছোট, আর হাঁক ডাক সেই অনুপাতে বড়। এবং প্রায় অনিবার্য নিয়মে ক্ষণস্থায়ী। এরা সাহিত্যে দুচার বৎসর অন্তরই একটা ছোট, সরব ও সৃষ্টিশীল গোষ্ঠীর মুখপত্র হিসেবে গজায়, এবং কদিন আসর জমিয়ে যেমন অতর্কিতে আসে তেমনি

Dhaka University Institutional Repository

অতর্কিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। আমাদের বাংলা মুলুকে এর সমগোত্রীয় পত্রিকার কথা ভাবতে গেলে কল্লোলের কথা মনে আসে। কিন্তু কল্লোল আমি স্বচক্ষে দেখিনি, তাই গোষ্ঠীবহির্ভূত রচনা এখানে কতটা থাকত, তা জানিনে। সুতরাং প্রস্তাবটা সঙ্গেসঙ্গেই তুলে নিচ্ছি। তাছাড়া কল্লোলের কলেবর হয়তো আদৌ ক্ষুদ্র ছিলনা। ক্ষুদ্র পত্রিকার সঙ্গে এর হয়তো এই টুকুই মিল ছিল যে এর পেছনের 'দল'টি দল হিসেবে ছিল সুনির্দিষ্ট, এবং সেই দলের মধ্যে সৃষ্টিধর্মীতা ও কলহপ্রবণতার স্বাভাবিক মিলন ঘটেছিল। তুলনায় প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্রে' যদিও সাহিত্যের একটা ঋতু পরিবর্তনের আভাস মেলে, কিন্তু চৌধুরী মহাশয় ছিলেন মজলিশি ও দিল-দরাজ ব্যক্তি, তাই তিনি পত্রিকাটিকে ঠিক ঠিক দলীয় পত্রিকা হতে দেননি। একটু নীচু স্তরে নেমে, ঢাকার 'অগত্যা'র কথা বলতে হয়। ক্ষুদ্র পত্রিকার অনেকগুলি লক্ষণ অগত্যায় বর্তমান ছিল কিন্তু সম্পাদকীয় বিচারবোধ এত ঢিলে ছিল যে বিস্তর সস্তা সাংবাদিকতার ভীড়ে পত্রিকাটি কোন তীক্ষ্ম রূপ নিতে পারেনি। আমরা যখন প্রথম পূর্বমেঘের কথা ভাবি তখন বোধ হয় শুধু এইটুকুই জানতাম যে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না মোহাম্মদী-সওগাত-মাহেনও-সমকালের সঙ্গে, না সাহিত্যপত্রিকার সঙ্গে। সত্যি বলতে গেলে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কোন পত্রিকাই তখন পূর্ববাংলায় ছিলনা। কথাটাকে আর একটু ঘুরিয়ে বলা যায়, 'পূর্বমেঘ' শ্রেণীর পত্রিকা এদেশে আমরাই প্রথম—এবং শ্রেণী বলতে অবশ্য আমি উৎকর্ষ বা অপকর্ষের কথা ভাবছি না, প্রাণী-বিদ্যার শ্রেণী (Species) অর্থে শব্দটা ব্যবহার করছি। এখন কিভাবে এই শ্রেণীর পরিচয় দেওয়া যায়। অবশ্যই রচনার গুণাগুণ দিয়ে নয়। যদি বলি এই শ্রেণীর পত্রিকায় শুধু উত্তম রচনারই জায়গা আছে তাহলে শুধু যে হঠকারিতা হবে, তাই নয়। কথাটা অনর্থক হবে। উত্তম রচনা কি, কে তার বিচার করবে, কি তার যথার্থ লক্ষণ? ইত্যাদি জিজ্ঞাসার কোন সহজ জওয়াব নেই। না—শুধু উত্তম-রচনার আদর্শ নিয়ে পূর্ববাংলায় পত্রিকা চালানোর দিন এখনও আসেনি, অফুরন্ত ঐশ্বর্য নিয়েও নয়। একটা বিশেষ লেখকগোষ্ঠীকে তুলে ধরাও আমাদের লক্ষ্য ছিলনা, বা একটা বিশেষ অঞ্চলের সাহিত্য চেষ্টাকে প্রতিফলিত করা নয়। পূর্বমেঘ রাজশাহীর আঞ্চলিক সাহিত্যপত্র নয়, বা হতে চায়নি।

এখানে আপনি হয়তো আমাকে থামিয়ে দেবেন। বলবেন, আমরা কখনও পূর্বমেঘের আদর্শ বা কর্মসূচী প্রস্তুত করিনি। কিন্তু সেটা যেমন সত্য, (যদিও অর্ধ সত্য), তেমনি সত্য আমরা কতকগুলি সম্পাদকীয় নীতি সবসময় সামনে রেখেছি। কথাটা খুব পোষাকী শোনাচ্ছে, 'সম্পাদকীয় নীতি' যদি কিছু বোঝায়, তাহলে সেটা খুবই ঝরঝরে পরিস্কার ব্যাপার হবে আর মাঝে মাঝে সে নীতির ব্যত্যয় ঘটছে এমনতরো নালিশের জন্য তৈরী থাকতে হবে। অবশ্যই হবে। তাইবলে নীতি ছিল না, বা নেই, এটাও নিশ্চয়ই আপনি মানেন না।

এখানে আমি একটা প্রতিবাদের সম্ভাবনা দেখছি। আমরা কি শুধু সম্পাদকীয় নীতির উপরই আমাদের শ্রেণী-স্বাতন্ত্র্য দাবী করছি? আমরা কি অস্বীকার করি যে কোন পত্রিকাই কোন একটা সম্পাদকীয় নীতি ছাড়া চলতে পারেনা?

বোধ হয় আমি বলতে চাই যে আমাদের সম্পাদকীয় নীতি একটু বিশিষ্ট। আমি খুব বিব্রত বোধ করছি কথাটাকে এইভাবে উপস্থাপিত করতে, কিন্তু এর চাইতে ভদ্র ভাবে ব্যক্ত করার উপযুক্ত ভাষা বা কৌশল আমার জানা নেই। এবং এইটুকু বলে, সেই বিশিষ্টতার বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা না করা অশিষ্টতা হবে। এবং প্রথমেই আপনার কাছে মাপ চাইছি, এই ব্যক্তিগত অশিষ্টতার জন্য যে সম্পাদকীয় নীতি কখনই পত্রিকার পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত করা হয়নি, এবং একটা বিশেষ নীতিবশতই করা হয়নি, এখন এককভাবে এতদুর থেকে সেটা করতে যাওয়া হয়তো অন্যায়। আমার আত্মপক্ষ সমর্থন এই বলে যে নীতিটি আমরা ঘোষণা করিনি বলেই যথাসাধ্য অনুসরণ করতে চেষ্টা করিনি, তা নয় এবং এখন, তিন বৎসরের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে, নীতিটিকে নিজেদের সামনে টেনে এনে এর গুণাগুণ যাচাই করাই আমার উদ্দেশ্য, আর আমি আগেই বলেছি—এটা শুধু আমাদের ধারণাগুলি নিজেদের কাছে স্পষ্ট করার জন্যই।

আমরা প্রতিষ্ঠিত খ্যাতি বলতে যা বোঝায় তাকে মূল্য দিইনি। শুধু বয়সের ও খ্যাতির ভারে যাঁরা কেটে যাচ্ছেন, যাঁদের ধার কেটে গেছে বলে সাম্প্রতিক রচনাগুলি সাক্ষ্য দেয়, বা যাঁদের ধার কোনদিনই ছিলনা, কিন্তু যাঁরা চর্চায় অলস, তাঁদেরকে আমরা আমাদের আসরে ডাকিনি। এতে অনেকে অসৌজন্যের আভাস পেয়েছেন।

আমরা যাঁদের ডেকেছি হাটে ঢাক পিটিয়ে ডাকিনি, বাড়ীতে যেয়ে ধর্ণা দিয়ে ডেকে এনেছি। অর্থাৎ আমাদের প্রথমে বুঝতে হয়েছে, কার কাছে সেই জিনিসটি মিলতে পারে, এবং প্রায়ই আমরা দেখেছি, যাঁর কাছে মিলতে পারে, তিনি প্রচলিত অর্থে লেখক নন, অর্থাৎ তিনি নিয়মিত লেখেন না, তবু আমরা তাঁর লেখাই চেয়েছি।

আমরা নতুন, উঠতি লেখকদের উপর নজর রেখেছি, এবং তাঁদেরকে বারবার অনুরোধ করেছি পূর্বমেঘের জন্য লিখতে। তাঁদের মত বা রাজনীতি কি, তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। তাঁদের লেখায় প্রতিশ্রুতি আছে কিনা, শুধু সেইটা দেখেছি।

অজ্ঞাত ও অপরিচিত লেখকের রচনা শ্রদ্ধার সঙ্গে, বিনয়ের সঙ্গে আমরা বিবেচনা করেছি। আমরা কোন একটা দল নিয়ে শুরু করিনি। তবে ঘটনার চাপে যদি কোন দল গড়ে ওঠে, তাহলে সে সম্ভাবনায় আমরা সন্তুষ্ট। এখানে 'দল' বলতে আমরা বুঝি একটা ছোট গোষ্ঠী, যাঁদের 'আনুগত্যে'র উপর আমরা আস্থা রাখতে পারি—দলাদলি অর্থে বুঝিনি।

পূর্বমেঘের সীমানা চিহ্নিত করছে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। যদিও শিল্প ও সংস্কৃতির অর্থ নিয়ে গুরুতর মতান্তর নেই—অন্তত আমাদের গোচরে আসেনি—সাহিত্য বলতে আমরা অনেকেই অনেক কিছু বুঝি। যেমন কেউ বুঝি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক বাংলা সাহিত্য, কেউ বুঝি ঐতিহাসিক বাংলার মুসলিম সাহিত্য, কেউ বুঝি পূর্ববাংলার সাহিত্য, আবার কেউ বুঝি পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্য। শেষ দুটি ঠিক এক বস্তু নয়। যিনি সাহিত্য বলতে শুধু পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্য বোঝেন তিনি নিশ্চয়ই বলেন না যে ৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টের পর থেকে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে যে সাহিত্য হচ্ছে, তাই সব,—তিনি বোঝেন যে সেইটুকুই আমাদের পক্ষে আপাততঃ সত্য, জলন্ত সত্য ; এর বাইরে বা এর আগে যা হয়েছে যা হচ্ছে তাতে তাঁর আগ্রহ নেই। আমরা প্রত্যেকেই এইভাবে সাহিত্যের একটা কার্যকরী সংজ্ঞা মনে মনে পুষছি। পূর্বমেঘের তিন বৎসরের পাতাগুলি ওল্টালে যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারবেন, আমরা যে শুধু এর

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক অর্থে বাংলা সাহিত্যকে বুঝেছি তাই নয়, আমরা যথাসম্ভব বাংলা সাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে প্রভেদটাকেও গৌণ ভাবতে চেয়েছি; অর্থাৎ আমরা সাহিত্য শব্দটির আগেপিছে কোন সংকোচনসূচক বিশেষণ জুড়ে দিইনি।

অবশ্য স্বাভাবিক নিয়মেই, বাংলা সাহিত্য, বা আরও পরিস্কারভাবে পূর্ববাংলার সাহিত্য নিয়েই আমাদের আগ্রহ ও আলোচনা বেশী। কিন্তু আমরা মনে করেছি, পূর্বমেঘের পৃষ্ঠায় আমরা যদি বাইরের পৃথিবীর সাহিত্য-কর্ম সম্বন্ধে মাঝেমাঝে দুটো একটা জানালা খুলে দিতে পারি, তাহলে বাংলা সাহিত্যের উপর তার ফল শুভ হতে বাধ্য। উপমহাদেশের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের উপর বাইরের হাওয়া যতোটা রয়েছে হয়তো আর কোন সাহিত্যেই ততটা নয়; তবু, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মানদণ্ডে, বাংলা সাহিত্য এখনও প্রাদেশিকতার গণ্ডী পুরোপুরী কাটাতে পারেনি। এবং এর জন্য বেশীদূর যাওয়ার প্রয়োজন নেই। উপমহাদেশের পাঁচটি কি ছয়টি উন্নত সাহিত্যের কথা ধরুন, তালিকা যতোই বিচিত্র হোক, তিনটি বা চারটি সাধারণ নাম প্রতিটি তালিকায় থাকবে, আশা করা যায়— এদের সাথে বাংলা সাহিত্যের আত্মীয়তা কতোটা ঘনিষ্ঠ? যে অর্থে ইংরেজীর সঙ্গে ফরাসীর, ফরাসীর সঙ্গে জার্মানের বা জার্মানের সঙ্গে ইতালীয় সাহিত্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ? যে কোন প্রধান য়ুরোপীয় সাহিত্যের সংগে বাকী সবকটি প্রধান য়ুরোপীয় সাহিত্যের যে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক, বাংলার সঙ্গে সে সম্পর্ক কোন ভারতীয় সাহিত্যরই নেই— না উর্দুর, না তামিলের, না গুজরাটীর। এটা একটা অস্বাভাবিক এবং অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি। এবং এ সম্বন্ধে, আমাদের বর্তমান সংস্কৃতির মূলধন নিয়ে বেশী কিছু করার নেই। কিন্তু পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার সময় হয়েছে।

তাহলে কি পূর্বমেঘের একটা কর্মসূচী থাকা উচিত? পরিস্কার জওয়াব দিতে আমার বাধছে। যে অর্থে সাহিত্যপত্রিকার একটা কর্মসূচী আছে, এবং এটা হয়তো প্রথম দৃষ্টিতেই পরিস্কার, সে অর্থে নিশ্চয়ই না। যতোদূর মনে পড়ে তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি, ক্রাইটেরিয়নের ২য় কি ৩য় বৎসরে সম্পাদক এলিয়ট এই প্রশ্নটি তুলেছিলেন, এবং খুব সম্ভব বলেছিলেন, কর্মসূচী না থাকলেও একটা 'প্রবণতা' নিশ্চয়ই এই জাতীয় ত্রৈমাসিকের থাকা উচিত। যে কোন সাহিত্যে যে কোন সময়ে একই সঙ্গে কতকগুলি ধারা পাশাপাশি রয়; এর মধ্যে সম্পাদক একটি বা দুটি সম্বন্ধে উৎসাহী, বাকীগুলি সম্বন্ধে নন। তিনি পত্রিকাকে সেই একটি বা দুটি ধারার মুখপত্র হিসেবে ব্যবহার করবেন।

একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আমরাও পূর্ব বাংলার সাহিত্যের কয়েকটি ধারাকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছি। গল্প উপন্যাস ও কবিতার ক্ষেত্রে নতুন ধারা বলে আমরা যেগুলি চিনতে পেরেছি এবং যেধারাগুলি আমাদের চোখে প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত দিয়েছে, আমরা তার সমর্থনে জায়গা দিয়েছি। কিন্তু এখনও, পূর্ববাংলায়, সাহিত্যের ধারাগুলি খুব স্পষ্ট বা প্রখর নয়। এবং কারণ বোধহয় এই যে জাতীয় জীবনে বৃহত্তর চিন্তা-ভাবনা (ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি)-র ধারাগুলি এখনও ভালোভাবে পথ কেটে নিতে পারেনি। শেষ বিচারে, সাহিত্যের ধারা বাইরের ব্যাপকতর জীবনের গভীরতর ধারাগুলিকেই অনুসরণ করে। এই বৃহত্তর জীবনে এখনও কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থাটা কাটেনি, তাই সাহিত্যের অঞ্চলেও আমরা একটা নীতিগত অস্পষ্টতা দেখতে পাই। ফলে, বাঞ্ছনীয় হলেও, পত্রিকার উপর সম্পাদকীয় ব্যক্তিত্বের ছাপ ইচ্ছে করেই আমরা চাপাইনি, কারণ আমরা মনে করি, সে সময় এখনও আসেনি। কিন্তু আমার মনে হয় এই অবস্থা বেশিদিন চলতে দেওয়া অনুচিত হবে। কারণ যদিও দল-মত প্রবণতা নির্বিশেষে ভালো লেখার সংগ্রহ নিয়ে যেসব পত্রিকা চলছে, তাদের নীতির সঙ্গে আমাদের কলহ নেই, কিন্তু সে নীতি আমাদের নয়। আমরা সাহিত্যের ঐতিহ্যে বিশ্বাস করি; এবং বিশ্বাস করি বলেই জানি, যে-সব নতুনধারা নতুন জীবন-বোধের পরিচয় বহন করছে, তারাই ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করবে, এবং আমরা সেই লেখকের জন্যই প্রস্তুত থাকব, যাঁর মধ্যে এই জীবনবোধের প্রতিশ্রুতি আছে! আমরা পাঠকসমাজের প্রতি দায়িত্ব এইভাবেই পালন করতে চাই—পরোক্ষভাবে, প্রথমত ও প্রধানত প্রকৃত লেখকের অভ্যর্থনার জন্য নিজেদের প্রস্তুত রেখে।"[১০৫]

'চিঠি'তে পত্রিকার তিন বছরের একটা পর্যবেক্ষণ আছে, এতে তরুণ সম্পাদকদের (তখন তাঁরা পয়ত্রিশ-ছত্রিশ বৎসরের; মুস্তফা নূরউল ইসলামের জন্ম ১৯২৭, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর ১৯২৮) রোমান্টিক ভাবনারও বহিঃপ্রকাশ আছে। কিন্তু 'রোমান্টিক' কথাটা বোধ হয় ঠিক হলোনা। এই অভিলাষ বাস্তবায়নের জন্য তাঁরা কিছু তৎপর ছিলেন এবং একেবারে ব্যর্থ হননি বলেই পূর্বমেঘ সফল ও উত্তম সাহিত্যপত্রিকার প্রসঙ্গে এখনও প্রথমেই আলোচনায় আসে। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষনীয়, তৎকালে বিপুল খ্যাতি অর্জনকারী 'পূর্বমেঘ' ঐ কালের সাহিত্য পত্রিকা বিষয়ক প্রবন্ধে কোনো গুরুত্বই পায়নি। কেউ কেউ অতি সাধারণ পত্রিকার নাম হিসেবে তাদের গবেষনায় স্থান দিলেও 'পূর্বমেঘ' এর বিশিষ্ট চরিত্রের মূল্যদেননি। কেউ কেউ আবার অনিয়মের অভিযোগ আর নিয়মিত করার পরামার্শ বা 'বিজ্ঞ সম্পাদকদ্বয় পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রাখবেন' মর্মে সুপারিশ পেশ করেই আলোচনা শেষ করে দিয়েছেন। কোনো গভীর মূল্য বা মন্তব্য ঐকালে বা পরবর্তী দুই দশকে পূর্বমেঘ লাভ করেনি।[১০৬]

পূর্বমেঘ এ কবিতা লিখেছিলেন নির্বাচিত কবিগণ। অসংখ্য কবিতা তাঁরা ছাপেননি বটে, তবে উৎকৃষ্ট বহুসংখ্যক আধুনিক বাংলা কবিতা, আর বিশ্ব-সাহিত্যের মূল্যবান কাব্যসম্পদও কিছু তাঁরা অনুদিত করে এতে ছেপেছিলেন। পত্রিকার ধারাক্রম অনুসারে একবার মাত্র কবিদের নামোল্লেখ করে পার্শ্বে সংখ্যার নম্বর উল্লেখ করা হলো। সংখ্যার উল্লেখ থেকে বুঝা যাবে কে কতোটি, বা কোন্ কোন্ সংখ্যায় কোন্ কোন্ কবি লিখেছিলেন।

কবিতা ঃ

সৈয়দ আলী আশরাফ (১/১, ১/৩); আতাউর রহমান (১/১; ২/১; ২/৪; ৩/৩; ৩/৪; ৫/১); আবুল হোসেন (১/২; ১/৪); সৈয়দ নূরুদ্দিন (১/২); হাসান হাফিজুর রহমান (১/২; ২/৩); মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১/২; ২/১; ২/২; ৮/৩; ১০/১-৪); জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (১/২; ১/৩; ২/১; ২/৪; ৮/২); আবদুল হাফিজ (১/৩); জগলুল হোসেন (১/৩; ১/৪); নুরুল আরেফিন (১/৩; ১/৪; ২/১; ৫/২); ফজল শাহাবুদ্দীন (১/৪; ২/২; ২/৩); মোহাম্মদ আজিজুল হক (১/৪); ফররুখ আহমদ (২/১; ২/২); জিয়া হায়দার (২/১; ২/৪; ৩/১-২; ৫/২, ৯/১-৪); শামসুর রাহমান (২/২; ৭/১-২ ৬টির একগুচ্ছ কবিতা); আবু বকর সিদ্দিক (২/২; ২/৪; ৮/২; ৮/৩; ৯/১-৪); বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (২/২; ৩/৩); আবু হেনা মোস্তফা কামাল (২/২; ২/৪; ১১/১; ১১/২-৪); সৈয়দ আলী আহসান (২/৩; ৩/৩; ৩/৪; ৮/৩; ৯/১-৪); আহসান হাবীব (২/৩; ৯/১-৪); গোলাম দস্তগীর (২/৪; ৫/৩-৪); ওমর আলী (৩/১-২; ৩/৪; ৫/৩-৪); হামিদুজ্জামান খান চৌধুরী (৩/১-২); রফিক আজাদ (৩/৩; ৩/৪;

Dhaka University Institutional Repository

৫/১ ; ৭/১-২) ; শামসুল হক কোরায়শী (৩/৪) ; হায়াৎ সাইফ (৫/১ ; ৮/২ ; ৮/৩) ; মযহারুল ইসলাম (৫/১ ; ৫/২ ; ৭/১-২) ; সেলিম আহমেদ (৫/১) ; দীনেশচন্দ্রপাল (৫/১) ; সিকদার আমিনুল হক (৫/১) ; জাহানআরা বেগম (৫/১) ; আবুল কাসেম (৫/২) ; নচিকেতা ভরদ্বাজ (৫/২) ; সানাউল হক (৫/৩-৪) ; জিনাত আরা মালিক (৫/৩-৪) ; অশোক সৈয়দ ('সমস্ত ভাষাণ দিলুম সমস্ত উড়াল' ৫/১) ; সুব্রত বড়ুয়া (৫/৩-৪) ; হায়াৎ মামুদ (৭/১-২) ; এস.এম, লুৎফর রহমান (৭/১-২) ; রাজিব আহসান চৌধুরী (৮/২) ; আনোয়ারুল করিম (৮/৩) ; মহসিন রেজা (৮/৩) ; সেলিম সারোয়ার (৮/৩ ; ১০/১-৪) ; মহাদেব সাহা (৮/৪ ; ১০/১-৪) ; রেজাউল হক (৯/১-৪) ; জাহিদ হোসেন (১০/১-৪) ; মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১১/১) ; মঞ্জুরে মওলা (১১/২-৪) ;

গল্প লিখেছিলেন ঃ

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (স্বাতী নক্ষত্রের শিশির, ১/২) ; হাসান আজীজুল হক (সীমানা, ১/৩ ; একজন চরিত্রহীনের সপক্ষে, ১/৪ ; পরবাসী, ৭/১-২ ; আমৃত্যু আজীবন, ৮/২ ; শোনিত সেতু, ৯/১-৪) ; জগলুল হোসেন (ক্ষণলগ্ন, ২/১), হুমায়ুন চৌধুরী (মৃত রাত, ২/২) ; ফজলুর রহিম (মেলা, ২/৩) ; আবু রুশদ (হারজিৎ, ২/৪) ; শেখ আতাউর রহমান (হঠাৎ দেখা, ৩/১-২) ; টেরোডাকটাইল, ১০/১-৪) ; আজিজুল হক (কান্নার মানে, ১/৩ ; উপেক্ষিত অন্ধকার, ১০/১-৪) ; নুরুল আলম (থিসিস, ১/৪) ; শওকত আলী (বিদায় গোধূলী, ৩/৩) ; অশোক সৈয়দ (৬৮/৩-৪) ; আশরাফুল ইসলাম (কুয়াশার রং, ২/৪ ; স্বগত, ৫/১) ; আবদুল মান্নান সৈয়দ (অধঃপতন, ৫/২) ; আবু বকর সিদ্দিক (দেবদূতদের বিষয়ে, ৫/৩-৪) ; শহীদুর রহমান (দেয়ালের দাগ, ৫/৩-৪, পঞ্চম দিনের রাত্রে, ৮/৪) ; ফারুক আলমগীর (চন্দন চতুর্দোলা, ৭/১-২) ; আবদুস শাকুর (বিচলিত প্রার্থনা, ৮/১) ; অসিত রায় চৌধুরী (নিবিড় তিমিরে, ৮/৪) ; সনৎ কুমার সাহা (সিদ্ধার্থ, ৮/৪) ;

'পূর্বমেঘ' অনেক অনূদিত রচনাও ছেপেছে। অনুবাদের শৈল্পিক মানের দিক থেকে পূর্বমেঘ বিশেষ মর্যাদা লাভ করতে পারে, কারণ, পরিক্রম নাগরিক কণ্ঠস্বর ও দুচারটে আধুনিকমনস্ক সাহিত্যপত্রিকায় প্রকাশিত অনুবাদ-রচনার পাশাপাশি পূর্বমেঘের অনুবাদ পড়লে সুখপাঠ্যগুণে পূর্বমেঘকেই প্রশংসা করতে হয়। কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ সবই কিছু কিছু অনূদিত হয়েছে। তারমধ্যে কবিতা ও নাটকই যেনো বেশী। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী অনুবাদ করেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত আধুনিক কবি টি. এস. এলিয়ট এর কবিতা (১/১) । আলেক্স কমফোর্ট থেকে অনুবাদ (কবিতা) করেছিলেন আখতার হোসেন (২/১)। স্যাজন প্যের্স এর থেকে এলিয়টকৃত ইংরেজীতে অনূদিত কবিতার বাংলায় ভাষান্তর করেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (২/৩); ফখরুজ্জামান চৌধুরী ইতালীর কবি গ্যিসেপ উনগোরিত্তির কবিতা অনুবাদ করেন 'স্মরণে-প্রশান্তি' শিরোনামে (২/৪)। ইব্‌ন আর-রুমী নামক আরবী কবি রচিত কবিতা অনুবাদ করেন 'নারসিসাস' শিরোনামে আবদুস সাত্তার (৩/৩)। আরবী কবি হাতিম আত্‌তাই থেকে আবদুস সাত্তার ৩ বর্ষ ৪ সংখ্যায় অনুবাদ করেন কবিতা 'তোমার প্রেম'। ফ্রেডারিক হেগুর্লিন থেকে রফিক আজাদ অনুবাদ করেন 'নিয়তিসঙ্গীত হাইপেরিয়ান' (৫/১)। ফরাসী কবি পল ক্লদ এবং ফ্রঁসিস এর কবিতা অনুবাদ করেন এবনে গোলাম সামাদ (৮/১)। স্পেনীয় কবি ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা থেকে কবিতা অনুবাদ করেন হায়াৎ মামুদ (৮/১) ; নুরুল আরেফিন অনুবাদ করেছিলেন ইতালীয় কবি জিনো ক্যাম্পালা, জোসেফ আনগারেত্তি, ইউজিনো মনতেল প্রমুখের কবিতা (৮/১)। হার্বার্ট রীড এর কবিতা 'অভিজ্ঞতা বিপরীত' অনুবাদ করেছিলেন গোলাম দস্তগীর (৮/৪)। এগারো বর্ষে (১ম সংখ্যা) এবনে গোলাম সামাদ অনুবাদ করে দিয়েছিলেন আরও ফরাসী কবিতা। এর পরের সংখ্যাতে (১১/২-৪) জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী অনুবাদ করেন জন মিল্টনের কবিতা থেকে 'শোকাচ্ছন্ন শ্যামসন'।

অনূদিত গল্পের মধ্যে আছে ; আলবার্তো মোরাভিয়ার অনুবাদ মেক্সিকোর মেয়ে ৩১ পৃষ্ঠা ব্যাপী দীর্ঘ গল্পের অনুবাদক হাবিবুর রহমান (১/১)। ভ্লাদিমির নবোকভ থেকে 'অরেলিয়ান' এর অনুবাদক মুখলেছুর রহমান (২/১)। আলবেয়ার কামু থেকে 'সিসিফসের উপাখ্যান' অনুবাদ করেন সারোয়ার মুর্শেদ (২/৩)। উইলিয়াম ফকনার এর গল্প 'ওয়াশ' অনুবাদ করেছিলেন মুখলেছুর রহমান (৩/৩)। আহমদ নদীম কাসমীর 'আরেক আকাশএর অনুবাদক মোহাম্মদ আজিজুল হক (৫/১)। জ্যাপল সাত্রের গল্প ফরাসি থেকে অনুবাদ করেন এবনে গোলাম সামাদ (প্রাচীর, ৫/৩-৪)। আলবার্তো মোরাভিয়ার গল্প থেকে 'আত্মজ' নামে অনুবাদ করেছিলেন অসিত রায় চৌধুরী (১১/১)। এছাড়াও মাইকেল পোলানীর ('মানববিদ্যা প্রসঙ্গে') প্রবন্ধ অনুবাদ করেছিলেন মফিজউদ্দিন আহমদ (২/১)। ব্রেটল্ট ব্রেখট এর প্রবন্ধ 'ম্যাকবেথ ও এপিক থিয়েটার' অনুবাদ করেন উমর হাবিব (৫/২) ; এবং জে. বি. প্রিস্টলির 'ডেঞ্জারাস কর্ণার' শীর্ষক নাটক এর অনুসরণে অনুবাদ করেন কবির চৌধুরী 'অচেনা' প্রথমবর্ষ চতুর্থ সংখ্যা থেকে। ডব্লিউ বি ইয়েটস এর একাঙ্কিকা 'ক্যাথলিস্ নিহুলিয়ানও অনুবাদ করেছিলেন কবীর চৌধুরী (৫/১)। টলস্টয়ের নাটক থেকে 'মাতাল' রূপান্তরিত করেছিলেন মাহমুদ হাসান (৫/১)। আলী আনোয়ার জ্যা আনুইকৃত নাটকের অনুবাদ করেন ধারাবাহিক এর অষ্টম বর্ষ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায়।

পূর্বমেঘ এর কয়েকটি পুস্তিকায় স্থায়ীত্ব লাভ করতে পেরেছে— এমন অনেক লেখাই প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে হাসান আজিজুল হক প্রণীত উপন্যাস 'বৃত্তায়ন' দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তাঁর 'শামুক' প্রকাশিত হয় তৃতীয় বর্ষ প্রথম-দ্বিতীয় যুগ্মসংখ্যা থেকে। 'জীবন ঘষে আগুন' নামকরা একটি বই পূর্ববাংলার কথাসাহিত্যে, এটিও এই পত্রিকায় (১১/২-৪) ছাপা হয়েছিল। এর প্রবন্ধ এবং আলোচনা-সমালোচনাসমূহও অতি-আধুনিক শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবে উজ্জীবিত এবং সমকালীন রাজনীতি ও সমাজভাবনায় তাড়িত, সচকিত। শুধু বক্তব্যের দিক থেকেই নয়, শিল্পসুষমা এবং পূর্ববাংলার আধুনিক সাহিত্যচিন্তার অকপট চিত্র বা বিশ্বস্তদলিলরূপেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। 'আলোচনা ' এবং 'গ্রন্থ-সমালোচনা'গুলোও প্রবন্ধের মানসম্মতই। বলাবাহুল্য আলোচনার পটভূমি সুসাহিত্যিক এবং আকার-পরিসরের দিক থেকেও গ্রন্থালোচনা কিংবা বিভিন্ন প্রসঙ্গের 'আলোচনা' প্রবন্ধের কাছাকাছি বিবেচনা করে প্রবন্ধের সঙ্গে উল্লেখ করা হলো। এতে গদ্য ও প্রবন্ধ লিখেছিলেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

- আবদুল হাফিজ — জীবনানন্দ দাশ ঃ একটি ভূমিকা (১/১); সুধীন্দ্রনাথের গদ্য (২/২); অসন্তুষ্ট বীট জেনারেশন (৩/৪);
- আতাউর রহমান — নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গে (১/৩);
- আবুল কাসেম চৌধুরী — 'পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যে চিন্তাধারা' (সাজ্জাদ হোসায়েনের লেখার প্রতিক্রিয়ায়, ১/৩); মেঘনাদবধ কাব্যের শতবর্ষ (২/৩);
- আহমদ হোসেন — লিও টলষ্টয়ের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী (উদযাপিত হলে তার প্রতিক্রিয়ায় তাঁর জীবনদর্শন ও সাহিত্যালোচনা, ১/৩);
- আবুল ফজল — সাহিত্যে আধুনিকতা (২/৪);
- আবু জুন্দ — সমসাময়িক ঘটনাবিচার (৫/১);
- আশিকুর রহমান — ঔপন্যাসিক নজরুল (৫/২);
- আমানুল্লাহ আহমদ — পূর্বপাকিস্তানের উপন্যাসে সমাজচিত্র (৮/৩);
- এ. কে. তৌফিকুর রহমান — আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার (ইতিহাস আলোচনা, (১/৪);
- এ. বি. এম. মোশাররফ হোসেন — ফতেহপুর সিক্রির মর্মবাণী (৩/১-২);
- ওয়াহিদুল হক — প্রবাসী আয়াত আলী (ওস্তাদ-এর মৃত্যুতে সংস্কৃতি ও সঙ্গীত সম্পর্কে ৩৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী দীর্ঘতর পরিসরে বিস্তারিত আলোচনা, ৮/৩);
- কবীর চৌধুরী — আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে : সংগ্রামও মৃত্যুর শিল্পী (২/২) : জন স্টেইনবেক (৩/৩);
- খোন্দকার সিরাজুল হক — হুমায়ুন কবিরের সাহিত্যচিন্তা (১১/১);
- গোলাম মুরশীদ — দুইপরাজিত বিদ্রোহী সৈনিক (মধুসূদন ও নজরুল প্রসঙ্গে, ৮/৪); মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথ (দীর্ঘ প্রবন্ধ ; ৩৭ পৃষ্ঠাব্যাপী, ১০/১-৪); বিদ্রোহী প্রেমিক (নজরুল বিষয়ক, ১১/১);
- জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী— কোম্পানী আমলে শিক্ষার সূচনা এবং মাধ্যম (১/৪) ; সংস্কৃতি ও সমকাল (৩/১-২); চিঠি (৫/১); ইংরেজীর ভবিষ্যত (৭/১-২) রবীন্দ্রনাথ ও আমরা (৮/১; অ্যারিওপ্যাজিটিকা (মিল্টনবিষয়ক, ১১/২-৪);
- ডাঃ জাকিয়া — ইয়ুঙের বৈশ্লেষিক মনোবিদ্যা (২/২);
- ফজলুর রহিম — মহাকবি কায়কোবাদ (২/৪);
- বখতিয়ার শাহ— সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১/২);
- বদরুদ্দিন উমর — আত্মনিয়ন্ত্রণ ও গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ (৩/৩) ; সাম্প্রদায়িকতা (৫/১); মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম সংস্কৃতি (৫/৩-৪); সাম্প্রদায়িকতা : লেখকের জবাব (৭/১-২); মুসলিম সংস্কৃতি (৮/১);
- মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম — কাজী নজরুল ইসলাম (১/১) ;
- মুখলেছুর রহমান — মুঘল চিত্রকলা (১/৩); ইতিহাস ও পুরাতত্ব (১১/২-৪);
- মুহম্মদ হাবিবুর রহমান — ঐতিহাসিক সেমিয়ার (এযুগের শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ঐতিহাসিকের মৃত্যুতে, চিন্তাধারার পরিচয় (১/২);
- মুহম্মদ এনামুল হক— Budhist Mystic Songs : Edited by Dr. Muhammad Shahidullah.
- মুহম্মদ আনোয়ার — নজরুল প্রসঙ্গে (২/২);বাংলা ছোটগল্পের পটভূমি ও প্রাথমিক প্রচেষ্টা (২/৪); রবীন্দ্র ছোটগল্পে প্রকৃতি (৩/১-২ ও অন্যান্য);নতুন ও পুরাতন (৫/১); সাম্প্রতিক শেক্সপীরিয় সমালোচনা (৫/২);
- মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান— আধুনিক কাব্যে লোকসাহিত্যের প্রভাব (৩/১-২);
- মুহম্মদ শমসের আলী — রাজশাহীর শিক্ষাক্ষেত্রে জমিদারদের ভূমিকা (৫/১);
- মোহাম্মদ আলী — বাংলা নাটক ও শেকস্পীয়র (৫/২);
- মুস্তফা নূরউল ইসলাম — মুসলিম বাংলায় জনমতের উন্মেষ ও সাময়িকপত্র সাধনা (৮/২);
- মহাদেব সাহা — আনন্দের মৃত্যু নেই (রবীন্দ্রকাব্য ও কবিতার দীর্ঘ আলোচনা, ৯/১-৪) ;
- রফিকুল ইসলাম — যে হোক সে হোক ভাষা কার্যরস লয়ে (২/৩); বাংলা ভাষাতত্ব (৩/১-২);
- রমেন্দ্রনাথ ঘোষ — নৈতিক মতাদর্শের দার্শনিক পশ্চাৎভূমি (রবীন্দ্র-দর্শন বিষয়ক, ১০/১-৪); অস্তীতিবাদ এবং নৈতিক মূল্যবোধ (১১/২-৪)
- শাহানারা হোসেন— প্রাথমিক মধ্যযুগে বাঙালী নারী (২/৩); সন্ধ্যাকর নন্দীর 'বরেন্দ্রী' (৩/৪) ;
- শেখ আতাউর রহমান — দি লাষ্ট সামার ঃ বোরিস্ পাস্তেরনাক (৯/১-৪)
- সুলতান আহমদ — দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৬০-৬৫ (১/১);
- সালাহউদ্দীন আহমদ — উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলার নাগরিক সমাজ (২/১); ঐতিহ্য ও সংকৃতি (৫/২); সাম্প্রদায়িকতা' (৭/১-২);
- সুখেন্দুনাথ ভট্টাচার্য — কান্তকবি রজনীকান্ত সেন (২/৩);
- সনৎকুমার সাহা — কোয়েসলারের দর্শন (৩/৩); তুলনামূলক বিচারে রামায়ণ ও ইলিয়ড (৩/৪); রবীন্দ্রসাহিত্যে দ্বিতীয় দিগন্ত (৫/১); সাহিত্যের দুই পুরুষ শ্রী কৃষ্ণ ও ডনজুয়াল (স্প্যানিশ-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, ৭/১-২); শিক্ষা ও প্রগতি (৮/২); তিমিরাচ্ছন্ন কবিতাগুচ্ছ ঃ রবীন্দ্রনাথ' (হায়াৎ মামুদের লেখার প্রতিক্রিয়া, ৯/১-৪); জীবন ও সাহিত্যের ধারা (প্রাচীন সাহিত্যের ও ধর্ম-দর্শনের প্রেক্ষাপটে, ১১/১);

Dhaka University Institutional Repository

- সৈয়দ মুর্তাজা আলী — দৌলত কাজী (১/১);
- সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন — পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যে চিন্তাধারা (১/২), 'সাম্প্রদায়িকতা', (৭/১-২);
- হাসান আজিজুল হক— শোপেন হাওয়ার (তাঁর দার্শনিক চিন্তার পরিচয়, ১/২);
- হায়াৎ মামুদ — তিমিরাচ্ছন্ন কবিতাগুচ্ছ ঃ রবীন্দ্রনাথ (৮/৪);

পূর্বমেঘে তৃতীয় শ্রেণীর বা নিকৃষ্টমানের কোনো পুস্তক-পুস্তিকা, গ্রন্থ-পত্রিকার আলোচনা দেখা যায়না। আবদুর রশিদ খান ও মোহাম্মদ মান্নান সম্পাদিত 'প্রেমের কবিতার'র আলোচনা করেন বখতিয়ার শাহ (১/১); সৈয়দ আলী আশরাফ প্রণীত 'চৈত্র যখন' এবং আবদুল গনি হাজারী প্রণীত 'সামান্যধন' এর আলোচনা করেন আজিজুল হক (১/১)। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী লেখেন শামসুর রাহমানের 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' এবং আতিকুর রহমান ডক্টর মযহারুল ইসলাম প্রণীত 'সাহিত্যপথে'র পরিচয় দেন (১/২)। প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করেন রণেশ দাশগুপ্ত প্রণীত 'উপন্যাসের শিল্পরূপ' শীর্ষক গ্রন্থের ওপর। মাহমুদ মোকাররম হোসেন প্রণীত গল্প সংকলন 'সূর্য স্বপ্ন'র ওপর লেখেন মতিয়র রহমান ; এবং ফজলে রাব্বী খুব বিরূপ সমালোচনা লেখেন সৈয়দ শামসুল হক প্রণীত 'দেওয়ালের দেশ' উপন্যাসটির। প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় আজিজুল হক কর্তৃক আলোচিত হয় সৈয়দ আলী আহসান প্রণীত কাব্যগ্রন্থ 'অনেক আকাশ'। পরের সংখ্যাতে (২/১) ৎ.ভ. Priestly রচিত literature and westernman (প্রকাশক Harper and Brothers, Newyork) এর বিষয়বস্তুর বর্ণনা দেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ; এবং জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বিশ্লেষণ করেছিলেন আবুল ফজলের 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা'র চিন্তার উৎকর্ষ। ফজলে রাব্বি এবারও একটি উপন্যাস প্রসঙ্গে আলোচনা করেন — তাহলো : রশীদ করীমের 'উত্তম পুরুষ'। দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় গ্রন্থপরিচয় প্রদান করেন রোকেয়া খাতুন 'নজরুল রচনাসম্ভার' এর। আবদুল হাফিজ মন্তব্য করেন ওমর আলীর কাব্য 'এদেশে শ্যামল রঙ রমনীর সুনাম শুনেছি'র ওপর। আজিম উদ্দিন আহমদ, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ ও রাজিয়া খানের বই যথাক্রমে 'বহিপীর' ও 'আবর্ত'র ওপর ; এবং ডক্টর মযহারুল ইসলামের গল্পগ্রন্থ 'তালতমাল' এর ওপর লেখেন আবুল কাশেম চৌধুরী। পরবর্তী (২/৩) সংখ্যায় Vance Packard রচিত পেঙ্গুইন প্রকাশিত The Hidden Pursuaders এর ওপর বদরুদ্দিন উমর ; আর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন-এর পুস্তক Mixed Grill এর ওপর লেখেন আমানুল্লাহ আহমদ। আবুল কাশেম চৌধুরী বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের গল্পগ্রন্থ 'অবিচ্ছিন্ন'র উপরও লিখেছিলেন একটি (২/৪) সংখ্যাতে। দেখা যায় বদরুদ্দিন উমর কেবল প্রবন্ধই লেখেননি পূর্বমেঘ-এ বেশকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের চিন্তাধারার স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়াসও পেয়েছিলেন। আর্থার কোয়েসলারের 'The Lotus and The Robot" শীর্ষক গ্রন্থের ওপর লিখেছিলেন ৩য় বর্ষ ১-২ সংখ্যায়। সালাহউদ্দিন আহমদ এবং ফজলে রাব্বি ঐ সংখ্যাতে গ্রন্থ-পরিচয় লিখেছিলেন (কিন্তু পত্রিকাটি খণ্ডিত বলে গ্রন্থের নাম জানা যায়নি)। তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় আনোয়ার পাশা সমালোচনা করেছিলেন আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ' ও সৈয়দ শামসুল হক প্রণীত 'একদা এক রাজ্যে' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থের ওপর। আবদুল হাফিজ শওকত ওসমানের প্রখ্যাত উপন্যাস 'ক্রীতদাসের হাসি'র ওপর লিখেছিলেন তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় এবং ফররুখ আহমদ এর 'নৌফেল ও হাতেম' এর ওপর পঞ্চম বর্ষ প্রথম আষাঢ় ১৩৭১ সংখ্যায় [এতে বুঝা যায় বইটি ১৯৬৪ সনের মধ্যেই প্রকাশিত হয়; কিন্তু বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'বাংলাদেশের লেখক পরিচিতি' তে ১৯৬৭ লেখা হয়েছে) । পূর্বোক্ত সংখ্যায়ই (৫/১) হায়াৎ সাইফ লিখেছিলেন সানাউল হকের 'সম্ভবা অনন্যা' শীর্ষক কবিতাপুস্তকের ওপর। আবু হেনা মোস্তফা কামাল লিখেছিলেন আহসান হাবীরের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সারা দুপর' এবং খোন্দকার সিরাজুল হক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'অন্বেষণ' শীর্ষক প্রবন্ধসংগ্রহের ওপর। আরও যেসমস্ত পুস্তক-পুস্তিকা সমালোচিত হয় মূল-লেখক' আলোচিত পুস্তক, আলোচক ও পত্রিকার বর্ষ সংখ্যা -- এই ক্রমানুসারে নিম্নে উল্লেখ করা হলো ; আ. ন. ম. বজলুর রশীদ — 'উত্তর ফাল্গুনী' (ক) ; নূরুল মোমেন - 'নয়া খান্দান' (না) ; আনিস চৌধুরী - 'মানচিত্র' (না); — আলোচক ঃ ছদরুদ্দিন আহমদ (৫/৩-৪); রশীদ করীম — 'প্রসন্নপাষাণ' (উ)— আবু হেনা মোস্তফা কামাল (৫/৩-৪); আহমদ শরীফ — 'মধ্যযুগের কাব্যসংগ্রহ' (সম্পাদনা/সংকলন) — হায়াৎ সাইফ (৫/৩-৪); সানাউল হক — 'বরিস পাস্তারনাক' (অনুবাদ) — হায়াৎ মামুদ (৫/৩-৪) ; সিকান্দার আবু জাফর — 'সমকাল কবিতা সংখ্যা' (সম্পাদনা, পত্রিকা) — হায়াৎ সাইফ (৭/১-২); শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী— 'যশোর খুলনার ছড়া' (সম্পাদনা, বা/এ) — আবদুল হাফিজ (ঐ) ; আমগীর জলীল - 'রাজশাহীর ছড়া (ঐ,ঐ)। জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত - 'দুর্বিনীত কাল' (গ) — ইমরুল কায়েস (ঐ)। হাসান আজিজুল হক— 'সমুদ্রের স্বপ্ন, শীতের অরণ্য' — আবদুস শাকুর (৮/১); সাদত আলী আখন্দ- 'তেরো নম্বরে পাঁচ বছর' (স্মৃতি) — ইমরুল কায়েস (ঐ); শাহেদ আলী— 'একই সমতলে'; আজীজুল হক— 'হয়তো নক্ষত্র নয়'— কুলসুম চৌধুরী (ঐ) ; হাসান আজিজুল হক — 'আত্মজা ও একটি করবীগাছ' — কুলসুম চৌধুরী (৮/৩); বদরুদ্দিন উমর — 'সংকৃতির সংকট' — সনৎ কুমার সাহা (ঐ); গণমুখী সাহিত্যের প্রচারক সৃজনী শিল্পী ও সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অগ্নিস্বাক্ষর, জয়ধ্বনী, সৃজনী — তিনটি পত্রিকার আলোচনা করেন ইমরুল কায়েস (৮/৩); লুৎফর রহমান সরকার— 'দৈনন্দিন' — রাশেদ জামাল (ঐ); কাজী দীন মুহম্মদ — বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)—সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় (৮/৪); সেলিনা হোসেন — উৎস থেকে নিরন্তর (গ)— মুহম্মদ আবদুল হাফিজ (ঐ) ; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম - 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' —সনৎ কুমার সাহা (ঐ); জ্যোতি প্রকাশ দত্ত — বহেনা সুবাতাস— মহাদেব সাহা (৯/১-৪); নাজিম মাহমদু - 'চেতনার সৈকতে' — ফজলে রাব্বী (৯/১-৪) ; আইনুদ্দীন আহমদকৃত ও মুহম্মদ আবদল হাফিজ সম্পাদিত - অন্যদিন : অন্য কবিতা — মোহসিন রেজা (৯/১-৪); মুজীবুর রহমান অনূদিত- স্যার সৈয়দ আহমদের 'রচনাবলী' ও 'পত্রাবলী' — এ. কে. এম. মহীউদ্দীন (১০/১-৪) ; আবুল হোসেন — বিরস সংলাপ; শামসুর রাহমান — নিজ বাসভূমে ; ফজল শাহাবুদ্দিন — আকাঙ্ক্ষিত অসুন্দর—জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (১১/১);

গ্রন্থালোচনাগুলোতে বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের সাহিত্য-পরিস্থিতির নানা প্রকার সমালোচনা আছে, সানাউল হকের 'সম্ভবা অনন্যা' শীর্ষক কাব্যালোচনায় আলোচক উল্লেখ করেন 'বিভাগোত্তর সাময়িক পক্ষাঘাত ও নৈরাজ্য আমাদের কাব্যসৃষ্টিতে যে ক্ষণিক স্থবিরতার চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল তার অবলোপ আজকে ঘটেছে ; এবং সামাজিক ও ধর্মীয় উৎকেন্দ্রিকতার একটা শাখাকে অক্ষত রেখেও আমাদের এই অর্বাচীনকালে পূর্বপাকিস্তানের

Dhaka University Institutional Repository

কাব্য-মানস বহুমুখী বিবর্তনের সম্ভাবনা সূচিত করেছে। এর মধ্যে বিভিন্ন বুদ্ধিদাহ্য বিশিষ্ট বিষয় কিঞ্চিৎ উত্তাপ বিতরণ করলেও অপেক্ষাকৃত আবেগ গ্রাহ্য ভাবপ্রবণ রোমান্টিকতা ... উনিশশ তেষট্টির উপকণ্ঠেও অব্যাহত।'[১০৭] আবদুল হাফিজ ফররুখ আহমদের 'নৌফেল ও হাতেম' শীর্ষক নাটকের সমালোচনাকালে প্রাসঙ্গিক মন্তব্যে বলেন ঃ

"পূর্ব বাংলার সাহিত্যে নাটক রচনার ব্যাপারটি এমনিতেও খানিকটা দুঃসাহসের কাজ। সার্থক নাটক এ পর্যন্ত (১৩৭১) আমরা পাইনি, যার মধ্যে একাধারে মঞ্চধর্মীতা ও অন্যদিকে সাহিত্যিক উৎকর্ষতার সমাবেশ ঘটেছে। .... কিন্তু পূর্ববাংলায় ... কবিতা যেমন আমাদের হাতে, — অন্ততঃ বিভাগোত্তর কালে একটা শ্রেষ্ঠ শিল্পে উন্নীত হয়নি — তেমনি হয়নি নাটক। গদ্যে রচিত নাটকের সংখ্যা কম — আর যা আছে তাও শিল্পকর্মের নজীর হিসেবে (নাটকের জটীল স্বভাবের কথা স্মরণে রেখে) উল্লেখযোগ্য নয়। সুতরাং এ মুহূর্তে 'নৌফেল ও হাতেম' হাতে নিয়ে বিপন্ন বিস্ময়ের সম্মুখীন হওয়া ছাড়া পথ থাকেনা। .... ফররুখ আহমদ কবি — তাঁর কাছে আদর্শ কাব্য-নাটক আশা করিনা —— বিশেষ করে তাঁর সামনে কোনও বাংলা কাব্য-নাটকও উপস্থিত নেই। পূর্ববাংলার কাব্য-নাটকের ইতিহাসে চিরকাল এক্ষেত্রে তিনি পথিকৃত বলে গণ্য হবেন। ... ফররুখ আহমদ ইসলামী জীবনধারায় বিশ্বাসী হলেও তিনি আসলে পূর্ববাংলার প্রগতিসাহিত্যেরই ধারক ও বাহক। তাঁর সিন্দবাদ সমুদ্রবিহারী—নোনা পানির হাম্মামে সে করতে চায় সফল গোসল। তাঁর হাতেম তায়ী গগন-বিহারী হয়েও ধূলিমলিনতাকে অস্বীকার করেনি। ফেরেশ্‌তা আর মানুষের হাড় দিয়ে তার অবয়ব গঠিত। ফররুখ আহমদের রাজনৈতিক সচেতনতা যদি আজ তাঁর কাব্যকে ছাড়িয়েও গিয়ে থাকে—তবু বলবো তাঁর জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত । নৌফেল-চরিতে রূপায়িত হয়েছে হীনমানসিকতার অধিকারী, অন্ধ দেশপ্রেমের (Chauvinism) পূজারী, অপরিচ্ছন্ন রাজনীতির পাটোয়ারী ও এদেশের মুনাফাখোর ব্যবসায়ী রাজনৈতিক কর্মীর মনোভাব। মুসাফির সাচ্চাসচেতন নাগরিক (conscious citizen), বৃদ্ধ সৎ নাগরিক আর মুর্শিদ প্রজ্ঞার প্রতীক। .... আজকের মুসলিম দুনিয়াকে ফররুখ আহমদ চিত্রিত করেছেন .... কিন্তু সে চিত্র অস্ফুট - শওকত ওসমানের মতো (ক্রীতদাসের হাসি) আরও বলিষ্ঠ হওয়ার অবকাশ ছিল তাঁর।'[১০৮]

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'অন্বেষণ' সম্পর্কে খোন্দকার সিরাজুল হক সর্বত্র প্রশংসা করতে পারেননি। স্পষ্ট উক্তিতে অনেক নিন্দা-মন্দ করা হলেও সমালোচকের উদ্দেশ্য মহত ও সদর্থক। আবু হেনা মোস্তফা কামাল 'সারা দুপুর' প্রসঙ্গে লিখেছিলেন : 'প্রকরণ সম্পর্কে অতিরিক্ত মনোযোগ কবিতার লাবণ্যকে নষ্ট করে কি? এই প্রশ্ন দিয়েই আলোচ্যগ্রন্থ সম্পর্কে বক্তব্যের অবতারণা করা যাক। ... আহসান হাবীবের .... পড়তে গিয়ে এই সব পার্শ্বচিন্তা আমার চিত্তকে অধিকার করেছে। তার প্রথম কারণ সম্ভবত এই যে 'রাত্রি শেষের' স্মৃতিও আহসান হাবীব যেন আমাদের কাছে, অভিন্ন। যে মধ্যবিত্ত চেতনা এবং উপলব্ধি আন্তরিক আবেগে 'রাত্রিশেষের' পাঠককে মুগ্ধ করেছিল — তার অনুপস্থিতি 'ছায়া হরিণে' স্পষ্ট। তৃতীয়তঃ 'সারা দুপুরে'র প্রকরণ বাদ দিলে আহসান হাবীবকে চেনার মতো অন্য কিছু অবশিষ্ট নেই। একজন কবির ক্ষয়কে কিংবা মৃত্যুকে এমন স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করার মতো বেদনাদায়ক ব্যাপার সবসময় ঘটেনা। সব সময় ঘটেনা বলেই হয়তো তার এতো নিদারুণ।'[১০৯] আলোচনা সমালোচনা বা পরিচিতিগুলো উন্নতমানের সাহিত্যাদর্শ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষী, ভালো। এই ধরণের সাহসী, প্রত্যয়ী সমালোচনা এবং প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে পাঠক ও লেখকদের নিয়ে যে সাহিত্যসমাজ—তাকে পুনর্গঠনের ও সংহত সৌন্দর্যময় করে তোলার জন্যে ভূমিকা পালন করেছে পূবালী।

পূর্বমেঘ-এর সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজচিন্তা বাঙলাভাষা সাহিত্য এবং বাঙালির জাতীয়তাবাদী মূলধারার চিন্তার অগ্রগতির সহায়ক-পরিপোষক ছিল। এতে মুদ্রিত হয়েছে আধুনিক জীবনঘনিষ্ঠ অনুভূতির কাব্যিক অভিব্যক্তি। কবিদের মধ্যে যেমন আছেন দেশের প্রধান কবিগণ, তেমনি তাদের উৎকৃষ্ট রচনাটিই ছাপা হয়েছে পূর্বমেঘে। ফররুখ আহমদ যখন এই পত্রিকায় লিখেছেন, তখন ইসলামী ভাবধারার পাকিস্তানী যোশের কবিতা না লিখে পত্রিকার চারিত্র স্মরণে রেখে লিখেছেন 'একটি প্রেমের কবিতা' : 'মেঘের আড়াল থেকে বিচ্ছুরিত দিনান্তের শিখা/বলে গেল অস্তমুখী প্রেমের কাহিনী ঃ নদী, নারী/যে হও সে হও তুমি দেখ এ উজ্জ্বল তরবারি/শহীদের তাজা রক্তে লেখা এই প্রেমের কবিতা।'[১১০]

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান 'বর্ণমনি, শতবার্ষিক' 'ফাল্গুনের আসন্ন শৈশবে' ইত্যাদিতে একুশের প্রেরণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ কবিতা লিখেছেন ঃ " রেখে যাও হাতের সোনা হাতে,/ খুলে নাও বর্ণমনি, সাথে/ কি আছে কি নেই, অবহেলা/ করে কি ঝরবে সারা বেলা। ... যদিও হৃদয় পুরাতন / তবু এর প্রসন্ন বৈভবে জ্বলেছে নবীন আয়োজন/ ফাল্গুনের আসন্ন শৈশবে।'[১১১]

আতাউর রহমানের কবিতায় সমাজচিত্র এবং সমকালীন ভাবনার প্রকাশ রয়েছে : "নতুন জগতে আমি বেছে নিই নতুন বন্ধুকে /ধর্মের দালাল কিংবা প্রকাশক কিংবা ঠিকাদার .../আমাকে ভোলায় নিত্য হেগের দ্বান্দ্বিক দর্শন —/ বিদেশের বড় ডিগ্রী কোনমতে বাগাতে পারলেই/ উচ্চমার্গ অনিবার্য , — মাইনে বাড়ে, ভাতাও দ্বিগুণ—/ সে আসন স্থায়ী হলে তৃপ্ত হই আল্লাহর দরগায়।।'[১১২]

আহসান হাবীবের একটি কবিতার কিয়দংশ — " যৌবনে জীবনে তুমি, /তোমারই অভাব নিত্য নবরূপে তোমাকে দেখার/ আকাঙ্ক্ষার দীপ জ্বেলে হৃদয়ে/কৈশোর যৌবনের সারাপথ হেঁটেছি,/ জীবন আমার একার নয় জেনেছি/ এবং তোমাতেই সমর্পণ করেছি; / রেখেছি একাগ্র দৃষ্টির আলোপথে ফেলে/ যে পথের ধূলি মেখেছি সর্বাঙ্গে।'[১১৩]

সৈয়দ আলী আহসানের 'আমার পূর্ববাংলা' কবিতাটি পাকিস্তান আমলের মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড প্রকাশিত দশম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে এবং কলেজের বাংলা বইয়ে সংকলিত হয়েছিল বলে খুব নাম করেছিল। তাছাড়া কবিত্ব-সম্পদেও উক্তিগুলো চমৎকার ; যদিও জীবনানন্দ দাশের প্রভাব এর আবহে স্পষ্ট - "আমার পূর্ব বাংলা অনেক রাত্রে গাছের/ পাতায় বৃষ্টির শব্দের মতো/ কখনও মৃদঙ্গ, হঠাৎ কখনও বেহালা —/ একসময় বাঁশীর সুর/ যখন রাত্রে একাকী ঘুম ভাঙ্গে/ অনবরত কোমল কোলাহলে/ স্বপ্নের মতো পাতায় পাতায়/ শব্দকে দেখি —'[১১৪]

পূর্বমেঘের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় সৈয়দ আলী আশরাফ শিরী ফরহাদের প্রেমলীলা অবলম্বনে আধুনিক কবিতা লিখেছিলেন "যাক/ জান

Dhaka University Institutional Repository

কোরবান — খাব খাবেই খাক/ মিলাক/ মিঙ্ক নাইলনি অ্যাপায়নে /উন্নাসিক নাগরিক বিলাস-ব্যসনে। /... তবু জানি / এবং দেহমন দিয়ে মানি / (হায় ফ্রয়েড)/ আঅরতির পালা/ যেদিন ফুরুবে সেদিন সব জ্বালা/ মিটিবে / ব্যাংকের /মোটা অংকের /চেক অথবা সম্মান-নির্বেদ ; / নির্বাক বিভেদ ।'১১৫

গল্প- উপন্যাস-নাটকগুলোর নামসমূহ লেখকদের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে একথা স্পষ্ট হয় যে পূর্বমেঘ কতিপয় উৎকৃষ্ট, স্থায়ী শিল্পমূল্যের রচনা প্রকাশের ক্ষেত্র তৈরি করে দিতে সক্ষম হয়েছিল — যখন ভালো সাহিত্যপত্রিকা এদেশে ছিল হাতে গোনা। প্রবন্ধগুলোও ছিল বক্তব্য-গুণবিশিষ্ট এবং পঠনোপযোগী। এগুলো পাঠকের চিন্তা আর অনুভবের মাত্রাকে দিয়েছে ব্যাপ্তি। সংস্কৃতি-চিন্তার ক্ষেত্রেও তাঁরা বিশ্বনাগরিকত্বকে বিস্মৃত হননি। রুশ সাহিত্যিক বরিস পাস্তারনাক এর মৃত্যুতে পূর্বমেঘ শোকালোচনা করে : ".. (তাঁর) মৃত্যুতে আধুনিক রাশিয়া বোধ হয় তার শ্রেষ্ঠ কবিকে হারাল । আধুনিক জগত হারালো শুধু একজন অত্যন্ত কুশলী গদ্য-কাব্য- অনুবাদক শিল্পীকে নয়, একজন বিস্ময়কর দ্রষ্টাকে, একটি আশ্চর্য কণ্ঠকে।"১১৬ রাজশেখর বসুর মৃত্যুতেও (২৭ এপ্রিল ১৯৬০) পূর্বমেঘ বাণীবদ্ধ করেছে এই উক্তি : 'বাংলা ভাষার জ্যেষ্ঠতম সাহিত্যিকের দেহান্ত ঘটল .... আর এই সাথে বিলুপ্ত হলো উনিশ শতকের বাংলার সংস্কৃতিচিন্তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত শেষ অবলম্বনটি।' নজরুল -রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও তাঁরা সজাগ সচেতন ভূমিকা পালন করেছেন। মনে রাখতে হয় বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি ধ্বংসের সেই অন্ধকারযুগে বাঙালিপনা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। আইউবের স্বৈরাচারী সামরিক শাসন দেশে প্রতিষ্ঠিত। নজরুলকে মুসলমানী খাতনার আর রবীন্দ্রনাথকে পাকিস্তান থেকে বিতাড়ন প্রচেষ্টার কালে পূর্বমেঘ রবীন্দ্র-নজরুলের শুধু নয় সুস্থ চিন্তা নিয়ে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন দত্ত, সুকান্ত প্রমুখের সাহিত্যচিন্তা ও কাব্যচর্চা করেছে। ফ্রয়েড, ইয়ুঙ, সাঁত্রে প্রমুখ দার্শনিকের মানববিদ্যা, মানবতাসংক্রান্ত ভাবনার সঙ্গে পরিচিত করাতে চেয়েছে বাঙালি পাঠকদের। রবীন্দ্র-নজরুল জন্মদিবস পালনের প্রেক্ষিতে পূর্বমেঘের প্রশ্ন : 'এই গতানুগতিকতার চরিত্ররূপ বিচার করে দেখবার সময় কী আজও আসেনি? বছরের বিশেষ একদিনে সভা সাজিয়ে এই দুই কবিকে স্মরণ করে তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেই কী দেশবাসীর করণীয় সব শেষ হয়ে যায়? প্রশ্নটা সম্ভবত ঃ এখন তলিয়ে দেখবার সময় এসেছে। .... আশ্চর্য আত্মবিস্মৃতিতে আজো আমাদের চেতনা ফিরে এলনা। তবু আমরা বছরের পর বছর ধরে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তীউৎসব উদযাপন করে এসেছি। এঁদের কীর্তি সাধনা গেছে তলিয়ে,উৎসবের উল্লাসই দেখা দিয়েছে বড়ো হয়ে। ... এপর্যন্ত একটি সর্বাঙ্গীন ভাল আলোচনাত পড়া গেল না নজরুল-সাহিত্য সম্পর্কে। প্রবন্ধ বা আলোচনামূলক গ্রন্থ যে গোটাকতক প্রকাশিত হয়নি ইদানিং তা নয়, কোন গ্রন্থের সংস্করণও হয়েছে একাধিক — কিন্তু সমালোচকের আন্তরিক দৃষ্টিতে নজরুল-সাহিত্যের পরিচিতি এবং নজরুল সাহিত্যের মূল্যায়ন একান্তই অনুপস্থিত। এমনকি নজরুল ইসলামের পূর্ণাংগ এবং প্রামাণ্য জীবনী রচনার প্রয়াসও তেমন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। সুর এবং সঙ্গীত রচয়িতা নজরুল ইসলামের পরিচয়ও কী পেয়েছি ভাল আলোচনার মাধ্যমে?'১১৭

সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে সমালোচকদের দৃষ্টি কতোটা মূল্যানুগ, তা জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর বক্তব্য থেকেও (আবুল ফজলের 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা' শীর্ষক গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে) অনুধাবন করা যায় : "... আমার বিবেচনায়, আমাদের পক্ষে বর্তমান যুগ সভ্যতা-সংকটের যুগ নয়, বন্য-বর্বরতার যুগ। আমাদের মূল্যবোধ এখনও বিপর্যস্ত। আমাদের চিন্তা-ভাবনা প্রধানত নেতিবাচক। আমরা একটা চারা লাগাতে যেয়ে দশটা গাছের মূলোৎপাটন করি। আমাদের ঐতিহ্য হয় বিকৃত কিংবা অস্পষ্ট। আমাদের মতান্তর সহজেই মনান্তরে দাঁড়ায়। আমাদের মধ্যে কৌতুক ও পরিহাসের অভাব। তাই শিষ্টাচারের ভাষা, গদ্যের ভাষা আমাদের এখনও অনায়ত্ত। সুতরাং দুঃখিত হয়ে বা অভিমান থেকে আবুল ফজল যখন অনুযোগ করেন, মননশীল সাহিত্যে আমাদের অনুরাগ নেই, বা মননশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে না, তার কথায় আমরা সায় দিতে পারি।'১১৮

পূর্বমেঘে সমাজসংস্কৃতি ও সাহিত্য চিন্তা নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্ক হয়েছে এবং সেই সমস্ত বিতর্ক উচ্চস্তরের বুদ্ধিজীবীদের আদর্শবোধসঞ্জাত দৃষ্টিরই প্রতিফলন বটে। বদরুদ্দিন উমরের 'সাম্প্রদায়িকতা' শীর্ষক প্রবন্ধটি (৫/১) সচেতন পাঠককে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাছাড়া 'সাম্প্রদায়িকতা' শীর্ষক একটি বইও তাঁর প্রকাশিত হয়। এসবই প্রতিফলিত হয়েছে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের আলোচনায়। তিনি বলেন : " জনাব বদরুদ্দিন উমরের প্রবন্ধগুলো পড়ে মনে হলো আমরা যেন ত্রিশ বছরের আগেকার অতীতে ফিরে গেছি। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকে পাক-ভারত উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়। এই বিতর্কের পেছনে মূল প্রশ্ন ছিল, ভারতবর্ষবাসীরা একজাতি কিনা এবং ভারতবর্ষে যে বিভিন্ন ধর্মীয়গোষ্ঠীর বাস তারা ইউরোপীয় অর্থে জাতি না সম্প্রদায়? মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্বের থিউরী যখন প্রথম উত্থাপিত হয় তখন সমালোচক দল একথাই বলেছেন যে, লীগ একটা সম্প্রদায়কে জাতি আখ্যা দিয়ে তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন হিন্দু-মুসলিম সমস্যা আর কোনভাবেই সমাধান করা গেলনা তখন দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতেই পাকিস্তান এবং ভারত এই দুই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।' বদরুদ্দিন উমরের 'সাম্প্রদায়িকতা'র সারমর্ম সম্পর্কে তিনি বলেন : ..."সারমর্ম এই যে, আমরা পাকিস্তানীরা জাতীয়তাবাদ যাকে বলছি সেটা আসলে সাম্প্রদায়িকতার নামান্তর। মুসলমানেরা একটা ধর্মীয় গোষ্ঠি। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কোন অর্থেই তাদের জাতি বলা যায়না। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, কতকগুলো ঐতিহাসিক কারণেই (যাকে এ্যাক্‌সিডেন্ট বা দুর্ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা চলে) এই গোষ্ঠী নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। এর পেছনে ছিল ইংরেজদের ভেদ-নীতি এবং মুসলমানদের শিক্ষাগত অনগ্রসরতা। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের প্রশয় এবং সমর্থন না পেলে এরা কখনও এভাবে প্রাধান্য লাভ করত না।' ইত্যাদি; সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন বদরুদ্দিন উমরের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আরও বলেন ঃ বদরুদ্দিন উমরের বক্তব্যে জাতীয়তাবাদের সত্যকারের কোনো সংজ্ঞা নেই। বিশ্বের সকল রাষ্ট্র 'সংজ্ঞানুযায়ী জাতিত্বের দাবি করতে, পারেনা। 'সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, ভাষাকে জাতীয়তাবাদের প্রধান মাপকাঠি হিসেবে স্বীকার করে নিয়েও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি কোন প্রশ্ন তোলেননি। ভাষার দিক থেকে ভারতবর্ষে কোন ঐক্য নেই এবং শুধু ভাষা নয়, নৃতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতেও এদেশে রয়েছে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠির সমষ্টি। .... তবু বদরুদ্দিন উমর(দের) মনে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সত্যতা সম্বন্ধে কোন সংশয় উপস্থিত হয়না। অথচ এঁরা বিনাদ্বিধায় বলছেন যে, পাকিস্তান অবাস্তব বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ... ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে তফাৎ কোথায়? পাঞ্জাবী এবং বাঙালী মুসলমান মিলে যদি এক রাষ্ট্র গঠন না করতে পারে তবে পাঞ্জাবী হিন্দু এবং আসামী হিন্দু অথবা দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়-ভাষী হিন্দু কোন্ যুক্তিতে এক

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে পারে তা স্পষ্ট নয়।.... আসল কথা ... বদরুদ্দিন উমরের বক্তব্য কোন যুক্তি বা তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।'১১৯

বদরুদ্দিন উমর ডক্টর সাজ্জাদ হোসায়েনের সমালোচনার জবাবে বলেন ঃ তিনি যে আলোচনা করেছেন "সেটা পড়ে মনে হয় তিনি একজন কাল্পনিক প্রতিপক্ষ খাড়া করে তাঁর কতকগুলি উদ্ভট মতামত খণ্ডন করতে উদ্যত হয়েছেন। তিনি প্রথমেই মন্তব্য করেছেন যে আমার প্রবন্ধগুলি পড়ে তাঁর মনে হয়েছে তিনি যেন তিরিশ বছর 'আগেকার অতীতে' ফিরে গেছেন। কিন্তু তাঁর এ আলোচনা পড়ে যে কোন সুবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকেরই মনে হবে যে আমরা প্রায় চৌদ্দশো বছর আগের পৃথিবীতে ফিরে গেছি। কাজেই এ নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বিশেষ করে সহজ হিসাবে চৌদ্দশোর কাছে তিরিশ বছর যখন নিতান্তই তুচ্ছ। তাঁর এই প্রাথমিক মন্তব্যের পর তিনি আমার বইয়ের মূল বক্তব্যের একটা সার দেবার চেষ্টা করে কিছু কথা বলেছেন যেগুলিকে অস্বীকার না করলেও তাকে বইটির একটা বিশ্বস্ত সার বলে গ্রহণ করা চলে না। কিন্তু পরবর্তী আলোচনায় আমার বক্তব্যের নামে তিনি মাঝে মাঝে স্বরচিত কিছু কিছু বক্তব্য আমার উপর যেভাবে আরোপ করেছেন সেটা আমার বইয়ের যে কোন সাধারণ পাঠকের কাছেই অত্যন্ত আপত্তিকর মনে হবে। তাঁর এই সমস্ত কাল্পনিক বক্তব্যগুলি সম্পর্কেই এখানে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন আলোচনাকালে নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছেন যে বইটিতে আমি শুধু মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার কথাই বলেছি, মুসলমানদেরকেই সবকিছু বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করেছি। শুধু তাই নয়। আমার বক্তব্য তাঁর কাছে নাকি হিন্দু-মহাসভার বক্তব্যের মতই মনে হয়েছে। কার মনে কখন কি কারণে কোন চিন্তার উদয় হয় সেটা মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং শিক্ষাতত্ত্বের বিচার্য বিষয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁর এই ধারণার যে ভিত্তি নেই সেটা আমার বইএর ১৬ ও ২২ পৃষ্ঠায় নজর দিলেই ধরা পড়বে।'১২০

এই বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন সালাহ্উদ্দীন আহমদও। তিনি বদরুদ্দিন উমরের বক্তব্যকেই সমর্থন করেছেন। তবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইতিহাসের আলোকে, বলেন মুসলমানদের জাতীয় আন্দোলনের এবং জাতীয়তাবাদের প্রধান ভিত্তি হলো স্বাতন্ত্র্যবোধ। এই স্বাতন্ত্রবোধ কেবলমাত্র ধর্মের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়না। লিখেছেন : '.... পাকিস্তান আন্দোলন ছিল মূলত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। স্বাধীন ও অখণ্ড ভারতে হিন্দুদের রাজনৈতিক আধিপত্যের ফলে মুসলমানরা শোষিতশ্রেণীতে পরিণত হতে পারে, এবং তাদের সংস্কৃতির ক্ষতি সাধিত হতে পারে, এই আশঙ্কা মুসলমানদের পাকিস্তান দাবীর পেছনে সংঘবদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব যাঁরা করেন, তাঁরা কেউ ধর্মীয় রাষ্ট্র স্থাপনের কথা চিন্তা করেননি। .... পাকিস্তান আন্দোলনের মাধ্যমে এই উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যের দাবী উত্থাপন করেছিলেন , যদিও ধর্মগত কারণ মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগাতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল, তথাপি পাকিস্তান আন্দোলনের মূল উৎস ছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদ, ইসলাম নয়। .... পরিশেষে একটা কথা পরিস্কারভাবে বলা প্রয়োজন। পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে এবং গণতন্ত্রের ভিত্তিতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। পাকিস্তানের বর্তমান সমস্যাগুলি কেবলমাত্র ইসলামের ভিত্তিতে সমাধান করা সম্ভব নয়। .... পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত পাকিস্তানবাদী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ আলোচনার অন্ত নেই। দুর্ভাগ্যবশত এই আলোচনা বহুক্ষেত্রে নিছক যুক্তিহীন ভাবাবেগ দ্বারা চালিত হয়েছে। বদরুদ্দিন উমরের 'সাম্প্রদায়িকতা' একটি আশ্চর্য ব্যতিক্রম।'১২১

পূর্বমেঘ–এ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং চিন্তাচর্চার অজস্র উদাহরণ বিদ্যমান। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ঐকালে ইংরেজী–খেদা আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠার পর লিখেছিলেন 'ইংরেজীর ভবিষ্যৎ' (৭/১–২)। তিনি উপসংহারে লিখেছেন : "এখন স্বাধীন দেশে আমরা নতুনভাবে বাংলাভাষার স্বাধীকারে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই। স্বচ্ছ ও সংস্কারমুক্ত মনে আমাদের এই কর্মে নিবিষ্ট হতে হবে। আমাদের অভীষ্ট বাংলাকে নির্মাণ করে নিতে হবে। দেড়শ বছরের উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করে নয়, আত্মস্থ করেই আমাদের এই সাধনা চলবে। ইংরেজী খেদার নেতিবাচক অন্ধগলির পথে নয় –– পৃথিবীর সমস্ত উন্নত ভাষার সাথে সহজ পরিচয়ের রাজপথ ধরেই আমরা অগ্রসর হবো।'১২২

উল্লেখ্য, সংলাপে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, 'ইংরেজীর কথা' (২/১) লিখেছিলেন বাংলার দাবীকে দুর্বল করে দেবার জন্য। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বাংলার দাবিকে সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের ভিত্তির ওপরে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন ইংরেজীর গুরুত্ব বিন্দুমাত্র বিস্মৃত না– হয়ে ও। এ প্রসঙ্গে 'পূবালী'র কথাও স্মরণযোগ্য। পূর্বমেঘে সাজ্জাদ হোসায়েন পূর্বপাকিস্তানের চিন্তাধারা সম্পর্কে এক প্রবন্ধ লিখলেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিতর্কের সূত্রপাত হয়। তিনি পূর্ববঙ্গের 'লেখকসাহিত্যিকেরা বিদেশী সাহিত্য পড়েন কিনা' সন্দেহে ভুগে বলেন 'অন্যদিকে ক্লাসিক্যাল ভাষার সঙ্গে ত লেখকশ্রেণী সাধারণভাবে সম্পর্কচ্যুত। .... তবে ক্লাসিক্যাল ভাষার সঙ্গে আমাদের ব্যবধান যতই বাড়ছে এদেশের প্রাচীন ভাবধারার সঙ্গে আমাদের দূরত্ব ততই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর ফলে আমরা আধুনিক হয়ে উঠছি বলে যদি কেউ মনে করেন, তিনি ভুল করবেন, কারণ আধুনিকতার অর্থ প্রাচীন ভাষার প্রতি অবহেলা নয়। এর একমাত্র সম্ভাব্য পরিণতি ঘোরতর প্রাদেশিকতা।'১২৩

উপর্যুক্ত প্রবন্ধের প্রেক্ষিতে পূর্বমেঘ প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় আবুল কাশেম চৌধুরী লিখেছিলেন পাল্টা–প্রবন্ধ 'পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যে চিন্তাধারা'। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আর যাঁরা লিখেছেন তাঁদের চিন্তায় ভর করেছিল প্রগতিশীলতা। যেমন, মুহম্মদ আনোয়ার লিখেছিলেন 'ইসলামে চিন্তার মুক্তি' (১/৪)। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী লিখেছিলেন 'সংস্কৃতি ও সমকাল' (৩/১–২) ইত্যাদি। পূর্বমেঘের লেখকের রচনায় ঐকালের জাতীয়–সমস্যাগুলোই আলোচিত–সমালোচিত–বিশ্লেষিত হয়েছে, একটি উদ্দেশ্য ছিল সমাজের সঠিক গতিপথ খুঁজে বের করা। পূর্বমেঘের সাধনা ব্যর্থ হয়নি। সমাজ আজও তাঁদের কাঙ্ক্ষিত পথেই অগ্রসর হতে অভিলাষী, যদিও এ পথে অন্তরায় পাকিস্তান আমলের থেকে আজও কোনো অংশেই কম দেখা যাচ্ছে না। তবু জাতির সঠিক সত্য অন্বেষণের সংগ্রামের এই সুদীর্ঘ পথ–পরিক্রমায় 'পূর্বমেঘ' এর সাধনা জয়যুক্ত হবে বলেই আশা ব্যক্ত করা চলে। কারণ ওঁদের সবকিছুতে ছাপিয়ে উঠেছে যা–– তাহলো মুক্তবুদ্ধির চর্চা। আর কুসংস্কার, আড়ষ্টতা, গোঁড়ামী থেকে মুক্তি একদিন বাঙালির ঘটবে , শিক্ষিতের সংখ্যাবৃদ্ধির হারের দিকে লক্ষ্য রেখে এ আশাব্যঞ্জক মন্তব্য ও করা চলে। শিক্ষা মনের ভূতকে আলোকের রাজ্যে দাবড়িয়ে নিয়ে যায়। আর আলোক হচ্ছে ভূতের সবচেয়ে বড় শত্রু। আলোকের নিকট মিথ্যার অন্ধকারের ভূত সব সময়ই পরাজিত হয়েছে। ভবিষ্যতেও হবে। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক সমস্যাক্রান্ত মানবগোষ্ঠি নিত্য নতুন সমস্যায়, সংকীর্ণ-চিন্তায় বদ্ধ হয়ে পড়ে ; এই বদ্ধতাও ভূতের রাজ্যে 'কানা-ভোলার' দুর্দশা থেকে কম বেগতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেনা। তবে সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার জন্য দরকার আরও নতুন নতুন 'পূর্বমেঘ' এর অব্যাহত প্রকাশ। কিন্তু সেদিকে সমাজের মনোযোগ আপাতত দেখা যাচ্ছেনা বলেই দুশ্চিন্তার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু নিরাশ হবারও কারণ নেই। সমাজের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়নি। কখন কোনদিকে মোড় ফিরবে, তা কি নিশ্চিত করে বলা যায়?

৬. কণ্ঠস্বর (১৯৬৫-৮৬)

পূর্ববাংলার আলোড়ন সৃষ্টিকারী সাহিত্যপত্রিকা কণ্ঠস্বরের প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৫ সনের শেষ নাগাদ, তবে তারিখবিহীন ভাবে। প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সনে, কিন্তু এবারও এটিতে বলা হয় না এটি মাসিক, দ্বিমাসিক কিংবা ত্রৈমাসিক, কোন্ শ্রেণীর। কেবলমাত্র নিয়মাবলী থেকে অনুমান করতে হয় কণ্ঠস্বরের কর্তারা মাসিক হিসেবেই চালাতে চেয়েছিলেন, তাই লেখা হয়েছিল (দ্বিতীয় সংখ্যায়) 'প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম সপ্তাহে কণ্ঠস্বর প্রকাশিত হয়। দাম প্রতি সংখ্যা আট আনা।'

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত 'কণ্ঠস্বর' এদেশের সাহিত্যপত্রিকাগুলোর মধ্যে স্থায়ী মূল্য পেয়েছে যেকটি—তার মধ্যে অন্যতম। সমকালে এবং পরবর্তীকালের সাহিত্যসমাজ পত্রিকার আলোচনাকালে কণ্ঠস্বরকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারেনি, নিকট ভবিষ্যতেও ইতিহাস থেকে এই নাম মুছে যাবে বলে মনে করার কারণ নেই। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, গোলাম সাকলায়েন, আবদুল মান্নান সৈয়দ, হুমায়ুন কবির, মহাদেব সাহা, মুহম্মদ আবদুল হাফিজ, আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুনীর চৌধুরী—সকলেই এই পত্রিকার মূল্য সম্পর্কে মতামত দিয়েছেন। পূর্ববাংলার সাহিত্যপত্রিকার আলোচনায় এই পত্রিকাটির প্রসঙ্গ বিভিন্নজন নানান ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম লিখেছেন (১৯৬৮) ঃ 'ঢাকা থেকে সম্প্রতি যে কয়েকটি সাহিত্যপত্র বেরিয়েছে তন্মধ্যে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের 'কণ্ঠস্বর' বিশেষ উল্লেখের দাবীদার।'[১২৪] গোলাম সাকলায়েন লিখেছেন (১৯৭০) ঃ "অগত্যারই উত্তরসূরী কণ্ঠস্বর। কলকাতার 'শনিবারের চিঠি'র মতো (প্রথম দিকের) অবয়ব নিয়ে 'কণ্ঠস্বর' তরুণ-সাহিত্যিক মহলের কণ্ঠস্বর শুনিয়ে আসছে। .... 'কণ্ঠস্বর'কে কেন্দ্র করে বিশ শতকের ষষ্ঠদশকের কতিপয় প্রতিশ্রুতিশীল লেখক একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ার কাজে উৎসাহী, এ দশকেই আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে একটি নবতর সাহিত্যান্দোলন জন্ম নেয়। শুরু হলো সাহিত্যের পালা-বদল। দই যুগ পরে আজ সৃষ্টিপ্রয়াসী তরুণ লেখক ও সাহিত্যব্রতীদের রচনায় যুগধর্ম সোচ্চার হয়ে উঠেছে। বস্তুতান্ত্রিক রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হতে চলেছে আজকের গল্প-কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধ ও সমালোচনা। কণ্ঠস্বরের পৃষ্ঠাগুলিতে জীবনের স্পর্শস্বাদ অনুপস্থিত নয়। এবং সেই সঙ্গে ভাববাদী ঐতিহ্যকে ত্যাগ করে বাস্তব অভিধায় শাশ্বত সত্যের কথা প্রচারে 'কণ্ঠস্বর' আশ্চর্য ভাবে মুখর।"[১২৫]

আবদুল মান্নান সৈয়দ 'কণ্ঠস্বর' কে 'লিটলম্যাগাজিন' বলতেই উৎসাহী। কারণ 'লিটল ম্যাগাজিনের আত্মায় মিশে আছে বিদ্রোহ'। এর সম্পাদক ও লেখকগোষ্ঠীর মূল সদস্যর রক্তে মিশে থাকে 'বিদ্রোহের তেজ ও জোশ' প্রজ্জলন্তরূপে। 'বাংলাদেশে ষাটের দশকে গেছে লিটল ম্যাগাজিনের ভরা জোয়ার। অন্ততঃ তিনটি লিটল ম্যাগাজিনের উল্লেখ অনিবার্য : 'স্বাক্ষর' 'সাম্প্রতিক' ও 'কণ্ঠস্বর'। 'স্বাক্ষর' ছিলো ষাটের দশকের নূতন কবিদের মুখপত্র — ছয়টি মাত্র সংখ্যা (প্রকৃতপক্ষে ৪টি) প্রকাশ করেই সে একটি কবিতাকেন্দ্রী নূতন স্বরলিপি প্রযোজনা করে। 'সাম্প্রতিক' ছিলো অবিসংবাদী এক অভিনব গদ্যের জনক -- একটিমাত্র সংখ্যাতে অবসিত হয়, পরে চারিত্রচ্যুত অবস্থায় অবশ্য অনেকদিন বেরিয়েছে। ষাটের দশকে আরো অনেক ক্ষণজীবী লিটল ম্যাগাজিন বেরিয়েছিলো : কিন্তু 'কণ্ঠস্বর'ই তার মধ্যে সর্বগ্রাসী ও মহত্তম ভূমিকা পালন করে। নবজাগ্রত সমস্ত কণ্ঠস্বর সে গ্রহণ করে, ঘোষিতভাবেই বর্জন করে পূর্বজ লেখকদের, তিরিশ সংখ্যা (প্রকৃতপক্ষে ৩২) ব্যাপী সে এই অটুট চারিত্র রচনা করে। পরে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সত্তরের দশকে এসে সে তার চরিত্রপাল্টানোর চেষ্টা করে এবং তা ঠিকই করে; কেননা এতোদিনে 'কণ্ঠস্বরের' মূল প্রয়োজন ফুরিয়েছে এবং সংগতভাবেই সে একদিন স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে।'[১২৬]

'কণ্ঠস্বর' পত্রিকার তৃতীয় পর্বের 'সহকারী সম্পাদক' আহমাদ মাযহার লিখেছিলেন : সমকাল এর ন্যায় উচ্চমানসম্পন্নপত্রিকা থাকা সত্ত্বেও সে সময়ের সৃষ্টিউন্মুখ তরুণ লেখকদের প্রকাশের জন্য 'মুক্ত-স্বাধীন ক্ষেত্র প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো'। 'এই মুক্ত স্বাধীন ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে গিয়েই ... সৃজনশীলতার তখন নবজাতক অবস্থা। বড় হয়ে ওঠার, ওপরে ওঠার জন্য তাদের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন বাহন এবং পরিবেশ। এই প্রয়োজনের তাড়না থেকেই ... প্রকাশিত হতে থাকে সেই সময়কার সবচেয়ে তারুণ্যদীপ্ত সৃষ্টিস্পন্দিত অভিঘাত সৃষ্টিকারী এবং দীর্ঘজীবী পত্রিকা 'কণ্ঠস্বর'। .... কণ্ঠস্বরের মূল লক্ষ্য ছিলো সৃষ্টি, নতুনতম সৃষ্টি। তার এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোনো ফাঁকি ছিলোনা।'[১২৭]

কণ্ঠস্বরের পঞ্চম বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে মুনীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে ১৯৬৯ সনে যে আলোচনা-উৎসবের আয়োজন করা হয়, তাতে মহাদেব সাহা, আবদুল মান্নান সৈয়দ, হুমায়ুন কবির, আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাফিজ প্রমুখ কণ্ঠস্বরের ভূমিকা নির্ণায়ক প্রবন্ধ বা আলোচনা পাঠ করেছিলেন। আবুল কাসেম ফজলুল হক সৃষ্টি বা গড়ার চেয়ে ধ্বংসোন্মুখ জরাজীর্ণ-পুরনোকে প্রবল আঘাতে সহসা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি বা ক্ষেত্র তৈরীর কাজের মধ্যেই এই পত্রিকার মহত্ব দেখতে পেয়েছিলেন বেশী। তিনি লিখেছেন : "সাহিত্যের ক্ষীয়মান ধারার ক্ষয়কে কণ্ঠস্বর প্রবাহিত করে নিয়ে গেছে একেবারে ধ্বংসের সমুদ্রের মোহনায়। মুমূর্ষুকে তাঁরা ঠেলে দিয়েছেন, অনেকটা সচেতনভাবেই, মৃত্যুর অন্ধকার গহ্বরে। চতুস্পার্শে সবকিছু ধ্বসে যাচ্ছে দেখে কোন প্রকার আক্ষেপ প্রকাশ না করে কণ্ঠস্বরের উদ্যোগীরা নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সেই সব কিছুকেই নির্দ্বিধায় হত্যা করেছেন, 'যাদের নিহত হওয়া অনিবার্য ছিল এবং প্রয়োজন ছিল।' যে সব জিনিসের ধ্বংস ছিল অনিবার্য এবং 'প্রয়োজনীয়', কিন্তু যেগুলোর ধ্বংস ঘনাতে হয়তো বেশ সময় লাগত—কণ্ঠস্বর সেগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায়। কণ্ঠস্বরের ধ্বংস -যজ্ঞের অনুকৃতি ঘটেছে ক্ষুদে সংকলন প্রকাশের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুদ্রতম দূরতম মফস্বল শহরটি পর্যন্ত। অগ্রজ কবি লেখকদের রচনায়ও কণ্ঠস্বরের প্রভাব খুঁজে বের করার জন্য, আমার মনে হয়, তেমন কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হবেনা। ধ্বংস যজ্ঞের মধ্যদিয়ে হয়তো অবচেতন ভাবেই, কণ্ঠস্বর সৃষ্টি করে দিয়েছে নতুন বীজ—বপনের উপযুক্ত ভূমি—যে-ভূমি তৈরী হতে কণ্ঠস্বরের আবির্ভাব না হলে, হয়তে আরও বেশ কিছুকালের প্রয়োজন হত।........ নৈতিকতার প্রচলিত আর্দশকে ভেঙ্গে দিয়ে সাময়িক শূন্যতা সৃষ্টি করে কণ্ঠস্বর যত অপরাধই করে থাকুক না কেন, কণ্ঠস্বর হচ্ছে পূর্ব বাঙলার প্রত্যাসন্ন সাংস্কৃতিক বিপ্লবেরই এক অচেতন অস্ত্র।..... কণ্ঠস্বর সাহিত্যক্ষেত্রে পুরনো শৃংখলাকে ভেঙ্গে দিয়েছে। নৈতিকতার প্রচলিত আদর্শের আমূল উৎখাত ঘটিয়েছে। এর ফলে নতুন শৃঙ্খলা ও নতুন সাহিত্যাদর্শের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়েছে... আমার ধারণা অন্তঃসম্পদের দিক থেকে দেখলে কণ্ঠস্বরের লেখকদের নতুনত্ব এই জায়গায় যে অগ্রজ লেখকেরা যখন প্রচলিত মূল্যবোধসমূহকে সংস্কারের মধ্যদিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন এবং 'চতুষ্পার্শে সবকিছু যাচ্ছে ধ্বংসে' বলে হাহাকার করছিলেন, কণ্ঠস্বরের লেখকেরা তখন বলিষ্ঠতার সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন সেগুলোকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য। অগ্রজ লেখকদের রচনা পড়ে মনে হয়: ইতিহাসের অগ্রগতি ঘটে নতুনের দ্বারা পুরনোর স্থলাভিষিক্ত হবার মধ্যদিয়ে নয়, পুরনোকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার মধ্য দিয়ে। আর কণ্ঠস্বরে রচনা পড়ে মনে হয়, ইতিহাসের অগ্রগতি ঘটে নতুনের দ্বারা পুরনোর স্থলাভিষিক্ত হবার ও পুরনোর বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে। এইখানেই কণ্ঠস্বরে বৈশিষ্ট্য ও নতুনত্ব।"

'কণ্ঠস্বর' এর সরকারী রেজিস্ট্রেশন পাকিস্তান আমলে ছিলনা। ১৯৭১ সনের পূর্বে (বা মধ্যে) এই পত্রিকার ২০ টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ২১ তম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় মার্চ ১৯৭২ এ অথবা তারপরে। এই সংখ্যায় সপ্তম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা 'এপ্রিল ১৯৭১ — মার্চ ১৯৭২'চিহ্ন দেয়া হয়েছিল। এরপরে ১৯৭২ সনের জুন ও সেপ্টেম্বর; ১৯৭৩ সনের মার্চ ও ডিসেম্বর; ১৯৭৪ সনের সেপ্টেম্বর; ১৯৭৫ সনের মার্চ, জুন ও ডিসেম্বর ; ১৯৭৬ সনের মার্চ এবং ১৯৭৬ সনের জুন এ ১২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যাগুলোতে কণ্ঠস্বরের পূর্বতন চারিত্র পাল্টে গেছে দেখা যায়। আকৃতি ডাবল ডিমাই একের ষোল স্থির হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা শতের উপর কখনও প্রায় দুইশো (১৮৫) হয়েছে । বিভিন্ন গোষ্ঠীর নবীন প্রবীণ লেখকদের লেখা এতে ছাপা হয়েছে। কণ্ঠস্বর-গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। অবশ্য তখন বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে; মোট কথা হাওয়াটাই গেছে বদলে। এই কালে বিশালকায় একটি কবিতা সংখ্যা, মার্চ ১৯৭৬, এটি তখনকার সদ্যপ্রয়াত কবি আবুল হাসানকে উৎসর্গ করা হয়—প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৭৫ সনের একটিকে 'গল্প সংখ্যা' আখ্যায়িত করা হয়েছিল। এই সংখ্যাতেই সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ 'কণ্ঠস্বরের একদশক' (১৯৬৬-৭৫) উপলক্ষে 'আত্মপক্ষ' লিখেছিলেন; আর সংকলিত করেছিলেন কণ্ঠস্বরের প্রাসঙ্গিক বহু তথ্য। 'বিভিন্ন সময়ে কণ্ঠস্বরে প্রকাশিত কয়েকটি ঘোষণা' কণ্ঠস্বর সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত বা উক্ত মুনীর চৌধুরী, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, অরুণ কুমার ঘোষ, আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাফিজ, হুমায়ুন কবির প্রমুখের লেখা বা ভাষণ আছে। আরও আছে কণ্ঠস্বরে উপস্থাপিত লেখক ও তাঁদের রচনার তালিকা, যেসকল প্রেসে কণ্ঠস্বর ছাপা হয়েছে তার নাম ঠিকানা, কণ্ঠস্বরের প্রচ্ছদ শিল্পীদের নাম, বিভিন্ন সময়ে কণ্ঠস্বরের সঙ্গে জড়িত কর্মীবৃন্দ; কণ্ঠস্বরের সমসাময়িক অন্যান্য লিটল ম্যাগাজিনের উপর মন্তব্য ও তথ্য ইত্যাদি। এরমধ্যে উল্লেখ্য যে কণ্ঠস্বর স্বাধীন বাংলাদেশ আমলে দুটি সংখ্যা একাত্তরের শহীদ হুমায়ুন কবির এবং তরুণ সাহিত্যিক, অকালে প্রয়াত খান মোহাম্মদ ফারাবীকে (৮/৪, ডিসেম্বর ৭৩) উৎসর্গ করা হয়েছিল। কণ্ঠস্বর পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে শেষ পর্যন্ত মিসেস খালেদা হাবীব কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইষ্ট বেঙ্গল বিউটি প্রেস, তাঁদের ছাপাখানা ছিল তবে মুদ্রণালয় পরিবর্তিতও হয়েছে। ৪৯ বীরেন বোস ষ্ট্রীট, ঢাকা-১১ থেকে প্রকাশিত হয় প্রথম সংখ্যা, দাম ৫০ পয়সা। পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনসহ ৫২; মোটা সাদা কাগজ ৮ × ৬ ইঞ্চি সাইজ। সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, সঙ্গে কোনো সহকারী বা সহযোগী সম্পাদকের নাম মুদ্রিত হয়নি। দ্বিতীয় সংখ্যাতেওনা, যোগাযোগের ঠিকানা , ইত্যাদি ছিলনা প্রথমে। তবে দ্বিতীয় সংখ্যায় যোগাযোগের ঠিকানা ১২ জগন্নাথ সাহা রোড, লালবাগ, ঢাকা উল্লেখ করা হয়েছিল। প্রথম তিনটি সংখ্যার সাইজ একই ছিল। কিন্তু পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে আসছিল। প্রথমটি ৫২, দ্বিতীয়টি ৪২, তৃতীয়টির ৩৪। এরপরই পত্রিকার আমূল পরিবর্তন ঘটে, সাইজ একের ষোল ডাবল ডিমাই হয়। এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে চলে আসে ১৬ তে। চতুর্থ সংখ্যায় (মার্চ ১৯৬৭) নতুন ঠিকানা হয় ২৪৫ উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা-১৪ ; এরপর এপ্রিল ১৯৬৭তে প্রকাশিত সংখ্যাটির (২/৬) পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়ে ৫০ হয়। কিন্তু ১৯৬৭র জুলাইয়ে আবার পত্রিকার আকার বড় হয়ে পূর্বতন অবস্থায় ফিরে যায়। আগষ্ট ১৯৬৭তে প্রকাশিত সংখ্যায় (২/১০) সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সঙ্গে 'সহযোগিতায়' তোফাজ্জল হোসেন সরকার, নির্মলেন্দু গুণ, গালিব আহসান খান, সাযযাদ কাদির প্রমুখের নাম মুদ্রিত হয়। সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ (৩/৬-৯) সংখ্যায় সহযোগী সম্পাদক হিসেবে শফিক খান, প্রচ্ছদশিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী, প্রচ্ছদ-আলোকচিত্রী গোলাম মোস্তফা, প্রকাশক খালেদা হাবীব, মুদ্রণালয় গাংচিল প্রেস, ৪৯/৬ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-১ উল্লেখ করা হয়। মূল্য ৭৫ পয়সা হয়েছিল। অতপর ডিসেম্বর ১৯৬৮ সংখ্যায় আবার ঠিকানা পরিবর্তন। কার্যালয় ৯৭/২ সিদ্দিক বাজার, ঢাকা-২। পৃষ্ঠা ৩৬। সাইজ প্রথমটির অনুরূপ, দাম : ৭৫ পয়সা। খালেদা হাবীব ২১৬ ধানমণ্ডি, ঢাকা থেকে (তাঁর বাড়ীর ঠিকানা, তিনি প্রখ্যাত সাহিত্যিক অধ্যক্ষ ইবরাহিম খাঁর মেয়ে) থেকে প্রকাশ করেছিলেন। মুদ্রণালয় শাহজাহান প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১০/২ সিদ্দিক বাজার, ঢাকা-২। 'নিরীক্ষণশীল মাসিক সাহিত্যপত্রিকা' কথাটা শীর্ষে লেখা হতো ১৯৬৮ সন থেকে। শফিক খানের নাম দীর্ঘদিন 'সহযোগী সম্পাদক' হিসেবে ছাপা হয়। কবিতা সংখ্যায় বিশেষ সহযোগী সম্পাদক ছিলেন কাজী আলী তারেক। ৬৪ পৃষ্ঠায় কবিতা সংখ্যা প্রকাশিত হয়। (৫/৬-৮) আগষ্ট ১৯৭০ সনে। কণ্ঠস্বরের ঘোষণা ছিল : 'যারা সাহিত্যের সনিষ্ঠ প্রেমিক, যারা শিল্পে উন্মোচিত, সৎ, অকপট, রক্তাক্ত, শব্দতাড়িত, যন্ত্রণাকাতর ; যারা উন্মাদ, অপচয়ী, বিকারগ্রস্ত, অসন্তুষ্ট, বিবরবাসী, যারা তরুণ, প্রতিভাবান, অপ্রতিষ্ঠিত, শ্রদ্ধাশীল, অনুপ্রাণিত, যারা পঙ্গু, অহংকারী যৌনতাস্পৃষ্ট কণ্ঠস্বর তাদেরই পত্রিকা। প্রবীণ মোড়ল, নবীন অধ্যাপক, পেশাদার লেখক, মূর্খ সাংবাদিক, 'পবিত্র' সাহিত্যিক, এবং গৃহপালিত সমালোচক এই পত্রিকায় অনাহূত।" দ্বিতীয় সংখ্যায় ঘোষণা ছিল : 'কণ্ঠস্বর যেহেতু তরুণ ও প্রতিশ্রুতিশীলদের পত্রিকা সেহেতু কেবল প্রতিশ্রুতিশীল তরুণদের কাছ থেকেই লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। কণ্ঠস্বর কেবলমাত্র 'নতুন' দৃষ্টিভংগীকে আহ্বান করে। যে উক্তি উচ্চারিত হয়ে গেছে বা ব্যবহৃত হয়েছে যে স্বর, তার ঘেয়ো পুনরাবৃত্তি এ পত্রিকায় অচল। রচনা প্রেরণে সংশয়চিত্ত, স্বল্প পরিচিত সেইসব তরুণতমদের জানানো যাচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

যে, এ পত্রিকাটি তাঁদের। বিনা দ্বিধায় তাঁরা রচনা পাঠাবেন। তাঁদের কোনো নতুন দৃষ্টি বা বিন্দুমাত্র প্রতিশ্রুতি লক্ষ্যযোগ্য হলেই তাদের সে সব রচনাকে প্রকাশিতব্য মনে করা হবে।' কণ্ঠস্বরের প্রথম সংখ্যাটিতে আবুদল্লাহ আবু সায়ীদের পরবর্তীকালে প্রকাশিত প্রবন্ধ-পুস্তিকার নামপ্রবন্ধ 'দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ' ছাপা হয়েছিল। কবিতা লিখেছিলেন— শহীদুর রহমান, রফিক আজাদ, ইমরুল চৌধুরী, মলয় রায় চৌধুরী, কামাল কাসেদ (ইভবন ফোয়ার কবিতার অনুবাদ), গল্প লিখেছিলেন—আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (নিঃশ্বাসে যে প্রবাদ) ও আবদুল মান্নান সৈয়দ (অতি ওয়ারিশ মাল)। প্রশান্ত ঘোষাল 'সাহিত্যিক দমননীতি' ; এবং 'আধুনিক কাব্য ও আত্মসচেতনতা' বিষয়ে বিতর্কমূলক আলোচনা লিখেছিলেন 'নতুন বিতর্কে' শিরোনামে। 'শিল্প ঈশ্বর প্রেম' নামে মোহাম্মদ রফিক অন্যতর প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

এরপর ১৯৬৬ থেকে ৭১ সন পর্যন্ত ১৯টি সংখ্যায় কবিতা লেখেন—আসাদ চৌধুরী, রফিক আজাদ, মোহাম্মদ রফিক, হায়াৎ সাইদ, আলতাফ হোসেন, আবুল হাসান, আফজাল চৌধুরী, আবদুল মান্নান সৈয়দ, রণপা চৌধুরী (রণজিৎ পাল চৌধুরী, স্বাক্ষরের অন্যতম সম্পাদক) রুবী রহমান, শহীদুর রহমান, শেখ আতাউর রহমান, হুমায়ুন কবির, আবদুল্লাহ আবু সায়ীফ, সাযযাদ কাদির, মাহমুদুল হক, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ফরহাদ, মজহার, কাজী সাহিদ হাসান, অনু ইসলাম, ফারুক আলমগীর, সুব্রত বড়ুয়া, সেলিম সারোয়ার, নির্মলেন্দু গুণ, রাজীব আহসান চৌধুরী, নুরুল হক, শহীদ কাদরী, হাসান আহমেদ কবির, নাজমুল আহসান চৌধুরী, মহাদেব সাহা, মুহম্মদ নুরুল হুদা, মাহবুব সাদিক, শাহনুর খান, মখদুম-ই-মুলক-মাশরাফী, রবীন সমাদ্দার, মাহমুদ আবু সাইদ, দাউদ হায়দার, আবু কায়সার প্রমুখ।[১২৯] গল্প লিখেছেন ঃ হাসান আজিজুল হক— আপন অন্ধকারে (১/২) ; শহীদুর রহমান— আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয় (১/২) ; আবদুল মান্নান সৈয়দ — মাংস (২/৩) ; আত্মহত্যা ব্যবসায়ী (২/৮) ; শুকতারা সন্ধ্যাতারা (৩/৯) ; প্রত্নপ্রতিহিংসা (৪/১২) ; ফারুক আলমগীর — স্বোপার্জিত নিষাদ (২/৩) ; সাযযাদ কাদির — রক্তের গন্ধ (২/৫) ; হেমাঙ্গ মৈনাক (২/১০) ; ফুলের সাথে বনলতা (৪/৬) ; আখতারুজ্জামান ইলিয়াস— নিরুদ্দেশ যাত্রা (২/৮) ; মাহমুদুল হক— মনসা মাগো (২/৯) ; বিষ (৩/১২) ; মুহম্মদ সিরাজ — বিনিদ্র রজনী, সোনালী পিপাসা ও একটি নারীমুখ (২/৯) ; নির্মলেন্দু গুণ— মৃত সত্তার দ্বীপে (২/১০) ; সুব্রত বড়ুয়া— অপরূপের খোঁজে (২/১১) ; মাহবুব সাদিক— জলছলছল (২/১২) ; আবু কায়সার— গুহা (২/১২) ; আবুল খায়ের— একটি অস্বাভাবিক গল্প (৩/৯) ; শাহনুর খান— বৃত্তচক্রে অশোক প্রপাত (৩/১২) ; সম্ভাব্য পতনের মুখে (৫/৫) ; মারসেল এমে — প্রাচীর পেরোনো (অনুবাদকের নাম নেই, ৩/১২) ; ইমরুল চৌধুরী - আত্মহত্যা গোলাপ ও কালো সমুদ্রের নীচে (৪/৬) ; হুমায়ুন কবির— সদগতি (৪/১০) ; নুরুল করিম নাসিম— একটি দুপুরের পলায়ন (৪/১০) ; মুহম্মদ আবদুল হাফিজ— এক হাজার আঁখি ও তিনলক্ষ অমিতাভ বেদনাগুচ্ছ (৪/১২) ; রবিউল আলম— একটি মৃত্যুর জন্ম (৫/৫) ; প্রতিদ্বন্দ্বী ছায়া (৫/১০) ; শেখ আতাউর রহমান— বিপ্রতীপ (৫/৫) ; মুহম্মদ আবু সায়ীদ— সমগ্র অবয়ব (৫/১০) ; আবদুস সেলিম— বিষণ্ন অস্তিত্ব (৫/১০) ইত্যাদি।

প্রবন্ধ আবদুল মান্নান সৈয়দ— শব্দের পাপ ও অন্যান্য অনুষঙ্গ (১/২) : পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য (২/৫) ; কাব্যযাত্রায় অমাবস্যা পূর্ণিমা (২/৬) ; বন্ধ দরজায় ধাক্কা (২/১০) ; এলোমেলো ভাবনা-বেদনা (২/১২) ; একশস্য পর্যায় : কবিতা (৪/১০) ; একালের কবিতা ঃ রূপকথার অন্বয় (৫/২) ; রাইনে মারিয়া রিলকে (৫/৫) ; আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ — বাংলা সমালোচনা প্রসঙ্গে (২/৩) ; কবিতার অনুবাদ (৫/৮) ; মোহাম্মদ রফিক — কফিনে শাদা গোলাপ (২/৮) ; সাম্প্রতিক কাব্যকলা ও নজরুল ইসলাম (৫/১০) ; মঈনুদ্দীন শাহরিয়ার - ধূর্ত কবিতা (২/৯) ; হুমায়ুন কবির — বিনয়ী শিল্পী (২/১০) ; প্রেম ; কবিতা কুসুম (৩/৯) ; দুর্বল কণ্ঠস্বর (৪/১০) ; কবিতার যাদু (লেসলি এ্যাবার ক্রম্বির অনুবাদ, ৫/৮) ; প্রশান্ত ঘোষাল— নতুন বিতর্কে (এই নামে তিনি প্রথম বেশ কয়েক সংখ্যায় আলোচনা করেন) ; আলতাফ হোসেন — রবীন্দ্রনাথের গানের কথারা ও অতিলৌকিক অনুভব (২/১১) ; আহমদ ছফা— ভবিষ্যতের জন্যে (২/১২) ; শেখ আতাউর রহমান — একটা ব্যক্তিগত প্রক্ষেপ (৩/৯) ; মুহম্মদ আবদুল হাফিজ — গিন্‌স্‌বার্গের চিৎকার (৪/৬) ; কণ্ঠস্বর ও সাম্প্রতিক সাহিত্য (৪/১০) ; আবুল কাসেম ফজলুল হক— পূর্ববাংলার সাহিত্য ও কণ্ঠস্বর (৪/১০) ; মহাদেব সাহা— অমিতাচারী কবিতা (৪/১০) ; মুনীর চৌধুরী — অভিভাষণ (সভাপতির, কণ্ঠস্বরের চতুর্থ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে, ৪/১০) ; মনসুর মুসা— রবীন্দ্রসাহিত্যের ভবিষ্যৎ (৪/১২) ; আঁদ্রে জিদ— সাহিত্যে প্রভাব (অনুবাদ: মোহাম্মদ হারুন উর রশীদ, ৫/৫) ; মুহম্মদ নুরুল হুদা— দ্বন্দ্বের নির্দ্বন্দ্বে (৫/৫) ; আবদুস সেলিম— 'দি ওয়েস্টল্যাণ্ড' একটি আধুনিক উপাখ্যান (৫/৮) ; লেসলি এবারক্রম্বি— কবিতার যাদু (অনুবাদ : হুমায়ুন কবির, ৫/৮) ; মোহাম্মদ হারুন উর রশীদ — আমাদের সাহিত্যে বিদেশী প্রভাব (৫/১০) ;

এছাড়াও বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা এবং গ্রন্থ-সমালোচনাও এতে ছাপা হয়। সকল আলোচনাই স্ফূর্তিতে উজ্জ্বল। কাজী শাহিদ হাসান আলোচনা করেন 'প্রতিষ্ঠার প্রতিভূ' শিরোনামে (২/৩) ; জ.জ. সংক্ষিপ্ত নামে বেশকিছু রচনা এতে প্রকাশিত হয়েছে। 'চলচ্চিত্রের সীমাবদ্ধতা' বিষয় আলোচনা যেমন আছে, তেমনি আছে সাম্প্রতিকতম কাব্য-প্রচেষ্টার ধারাবাহিক আলোচনা (করেন 'আগন্তুক ঋতু' শিরোনামে)। জ. জ. মার্চ ১৯৬৭ সংখ্যায় 'সমকাল'—প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। মাহবুবুল আলম ফ্রীডরিখ নীৎশের কবিতা অনুবাদ আর কবি সম্পর্কে আলোচনা করেন ২/৬এ। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ আলোচনা করেন আবদুল মান্নান সৈয়দের 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' বইয়ের ওপর (২/৮)। মোহাম্মদ রফিক সৈয়দ আলী আহসানের 'উচ্চারণ' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা লেখেন ডিসেম্বর ১৯৬৮ (৩/১২) সংখ্যায়। স্তেফান মালার্মে কর্তৃক অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পকলার নন্দনতাত্ত্বিক বিষয়ের ওপর প্রদত্ত ভাষণের অনুবাদ ('সাহিত্য ও সঙ্গীত') করেন মোহাম্মদ হারুণ উর রশীদ। সিরাজউদ্দিন আহমেদ প্রণীত 'বন্ধুর জন্য শোক' শীর্ষক গল্পগ্রন্থের ওপর লেখেন শরীফ হোসেন। শওকত ওসমান প্রণীত উপন্যাস 'সমাগম' এর ওপর আলোচনা করেন মনসুর মুসা। সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত 'পদ্মাবতী'র বিরূপ একটি সমালোচনা লেখেন হাসান আহমেদ কবির। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ লিখেন আফজাল চৌধুরীর বই 'কল্যাণব্রত'র ওপর ৫বর্ষ ২ সংখ্যায়। পরের (৫/৩-৫) সংখ্যায় লিখেছিলেন আতাউর রহমান প্রণীতকাব্য 'একদিন প্রতিদিন' ও আবদুর রশীদ খানের প্রথম কবিতার বই 'নিরন্তর স্বর' এর ওপর। মাহবুবুল আলম আলোচনা করেন 'রফিক আজাদ : তাঁর অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাস' শিরোনামে (৫/৮)। মোহাম্মদ হারুনউর রশীদ আলোচনা করেন শহীদ কাদরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উত্তরাধিকার'এর ওপর (৫/৮)। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ পূর্বোক্ত (৫/৮) সংখ্যাতেই সমালোচনা করেন আবদুল মান্নান সৈয়দের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'জোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসা'র। আবদুল মান্নান সৈয়দ 'সাময়িক প্রসঙ্গ'

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনামে একটি ব্যঙ্গাত্মক আলোচনা করেন কণ্ঠস্বরের পাকিস্তানী যুগের শেষ সংখ্যা (অক্টোবর ১৯৭০) এ। এছাড়া সেলিম স্যারোয়ার 'বৃত্ত' নামে একাঙ্কিকা লেখেন মার্চ ১৯৬৭ (২/৫) সংখ্যায়। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ অনুবাদ করেন এসকিলাস এর নাটক 'শৃঙ্খলিত প্রমিথিউস' সেপ্টেম্বর—নভেম্বর ১৯৬৭ সংখ্যায়। আবদুল মান্নান সৈয়দ নাটক লেখেন 'যুক্তিহীন যুগ' শিরোনামে মে ১৯৬৮ সংখ্যায় (২/১২-৩/৫)। অনূদিত হয়েছে গিওম এ্যাপোলিনেসঅর থেকে, প্রসঙ্গ কথাসহ (৫/৮)। বিষয়ের নাম থেকেই অনুমান করা যায় কণ্ঠস্বর সমকালীন আরসব পত্রিকা থেকে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যের রচনা প্রকাশ করেছে। সকল রচনা এর শিল্পোত্তীর্ণ নয়। সকল লেখক প্রতিষ্ঠাও পাননি। কিন্তু তবু সেকালে এগুলো ছিল নতুন চকচকে সোনার মত। তাঁদের অন্বিষ্টও ছিল ব্যতিক্রমী : তৃতীয় সংখ্যার ঘোষণা : "সাহিত্যকে যাঁরা অনুভব করতে চান, শততলে শতপথে, বিঘ্নিত রাস্তায়, আংগিকের জটিলাক্ষরে, চিন্তার বিচিত্র সরণীতে, কটু স্বাদে ও লোনা আঘ্রাণে, শততায়, শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে, অভিভূতিতে ও পাপে ; মহত্বে ও রিরংসায়, উৎকণ্ঠায় ও আলিঙ্গনে, কণ্ঠস্বর সেইসব পদপাতবিরল তরুণদের পত্রিকা।"

কেবলমাত্র তরুণদের পত্রিকাই যে কণ্ঠস্বর হতে চেয়েছিল লেখকসূচীর দিকে দৃষ্টি দিলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে তখনকার সব তরুণই যে কণ্ঠস্বরকে সদর্থকভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তা নয়। 'যৌনতাস্পৃষ্ট' 'বিকারগ্রস্ত'দের লেখাও এতে অনেক ছাপা হয়েছে, আর কবরস্থান, গোরস্থান, মৃত্যু, আত্মহত্যা, পলায়নপর মনোবৃত্তির অথবা আত্মরতির অকপট চিত্রলিপি 'কণ্ঠস্বর' হয়েছিলো বলে রাজনৈতিক সামাজিকভাবে তরুণসমাজকে আত্মগত ক্লেদাক্ত বিকৃত হতাশাগ্রস্ত অনগ্রসর অপ্রগতিশীল অনুভূতিপ্রবণ রচনায় অভিনিবিষ্ট করে রেখেছিল বলে এটাকে ক্ষতিকর সাহিত্যপ্রয়াস হিসেবেও কেউ কেউ চিহ্নিত করে থাকেন। অবশ্য এসব কথার সপক্ষে প্রচুর নযীরও দেয়া যায়। প্রথম দুতিন সংখ্যা কণ্ঠস্বর বাজারে এসেই আলোড়ন তুলেছিল। অথচ সেই প্রথম দিককার সংখ্যাগুলোতে কি পাওয়া যায়? প্রথম সংখ্যায় গল্প লিখেছিলেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস 'নিশ্বাসে যে প্রবাদ' এবং আবদুল মান্নান সৈয়দ 'অতিওয়ারিশ মাল'। দ্বিতীয় সংখ্যায় হাসান আজিজুল হক 'আপন অন্ধকারে' এবং শহীদুর রহমান 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়'। এগুলোতে মধ্যবিত্ত পরিবারের অনুভূতিপ্রবণ হতাশাগ্রস্ত তরুণদের যৌন-বিক্ষোভ যতো প্রাধান্য পেয়েছে, ততোটা পায়নি সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয় অধঃপতন ও অসৃষ্টিশীলতার রুদ্ধশ্বাস-পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার কোনো শৈল্পিক প্রেরণা। কণ্ঠস্বর-সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের গল্প নির্বাচনের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সাম্প্রতিক ধারার গল্প' শীর্ষক সংকলন-গ্রন্থের বিজ্ঞাপন থেকেও। এই সংকলনে যাঁদের লেখা গ্রথিত হয়েছে, তাঁদের কণ্ঠস্বরেরও লেখক ও গল্পকার।— "এই সংকলনের উদ্দেশ্য আমাদের গল্পের বিশেষ একটা ধারা, তার নিঃসঙ্গ জনকয় লেখক ও তাদের স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর।' আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসায় রক্তাক্ত আমাদের যে-তরুণ গল্পকারেরা বুঝেছেন যে : 'সাহিত্য আত্মজৈবনিক হওয়া উচিত', কেননা 'ডায়েরী আমাদের অন্তর্জীবনের সার্থকতম ইতিহাস'। বুঝেছেন যে, গল্প আমাদের ব্যক্তিগত রক্তের প্রেম যৌণতা বিষাদ আত্মহননের স্মারক ; এই ধারা সেই নিঃসঙ্গ জনকয় লেখকের—তাদের স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বরের। এই নতুন ধারার গল্পকারেরা যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সংযোজন করলেন বক্তব্যে ও আঙ্গিকে—তারই সার্থকতম উপস্থাপন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত 'সাম্প্রতিক ধারার গল্প' যাদের গল্পে সমৃদ্ধ, তারা : সৈয়দ শামসুল হক, শওকত আলী, হুমায়ুন চৌধুরী, মনিরুজ্জামান, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শহীদুর রহমান, হাসান আজিজুল হক।" কবিতাগুলোতেও আত্মহননের অনাকিনী আক্রমণ আর 'মহান মৃত্যুর দিকে, উর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান জীবন'-বেদ চর্চিত হয়েছে : শহীদুর রহমান গদ্যে কবিতা লিখেছেন : "আশ্চর্য কুঠুরিতে আমি/ আত্মহননের অনাকিনী আক্রমণ চালিয়েছে ; তরুণ কবিরা, শোন, ভুখা মিছিলে কতোদিন শরীক হোয়েছি— কতোদিন পালিয়ে ফিরেছি, কিন্তু শনিবারের দুপুর রাত পাড়ি দিতেই আমি সেই আশ্চর্য সুন্দর ছোট আঁধার কুঠুরিতে ঢুকলাম। অন্ধকারের রাণী সেখানে কেলি করছিলো। তরুণ কবিরা শোন, আমি অবাক বিস্ময়ে পৃথিবীর অতি পুরাতন অথচ উজ্জ্বল মসৃণ দেয়ালঅলা সেই চোরাকুঠুরিকে দেখতে থাকলাম। এবং তার বৈদূর্যখচিত অশনিক কারুকার্যে মুগ্ধ হোলাম আমি।'[১৩০]

রফিক আজাদ 'মৃত্যু : ২' শিরোনামে কবিতা লিখেছিলেন :... "... উল্লসিত হে অমল বান্ধববৃন্দ, জীবনময় তোমরা কভু দ্যাখোনি মৃত্যুর মহান / প্রতাপ? দেখেছ কী, হে আমার চতুষ্পার্শ্বে ঘূর্ণ্যমান মানবসকল?... তবে মৃত্যুর / কথাই পরস্পরে বলাবলি কর, সর্বক্ষণ। হে মহিলা অম্লান গোলাপ, তুমি কী / জেনেছো মৃত্যুকেই সর্বশেষ প্রিয়জন বলে? / জানো নি কী তোমার দেহের কোমল / ও মোলায়েম স্থানগুলি একদিন শক্ত ও নীরক্ত / হবে।... তোমার অকৃত্রিম ওষ্ঠের অরুণিমা / একদা কাগজের মত শাদা হয়ে যাবে। / ফ্লোরেসেন্ট নিতম্ব তোমার, ট্রান্সপারেন্ট / উরুসন্ধি, হে মধুর মহিলা, কদর্য পুরুষকেও / আকর্ষণের ক্ষমতা হারাবে। / মৃত্যুর কথা, আশ্চর্য তোমরা কেউ / ভাবতে পারো না ; ভুলেও কখনো / স্মরণে আসে না তার নাম কী? / উৎসাহে তোমরা যে কাটাও দিন / ভুলে থেকে প্রকৃত প্রভুর কথা, স্তব / কর প্রতিদিন আপতরম্যের।— উল্লসিত / গেয়ে যাও দৈনন্দিন জীবনের অচিরস্থায়ী / জীর্ণ-সঙ্গীত! অথচ অকৃতজ্ঞ হে / ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী, একটি বাক্য ও সান্ত্বনা / মহান মৃত্যুর স্তোত্রে।... / এই যে হুল্লোড়ে মেতে থাকো দিবস রজনী, / লুটে নাও দুই হাতে যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদ, / এতো মৃত্যুরই পরোক্ষ দান। দৃশ্যমান / তোমাদের নৃত্য নাট্যের নেপথ্যে সর্বেসর্বা / মৃত্যুর কী-যে অবদান, তা তোমরা / হে মূর্খ, বুঝতে পারো না।"[১৩১]

ইমরুল চৌধুরীর 'সৌরময় নাস্তিকতা' শীর্ষক কবিতার কয়েকটি পংক্তি : "যারা যৌবনকে যৌবনের উত্তাপকে/ বিশল্যকরণী দিয়ে বাঁধতে চায় / কি তাদের শরীর হীনতা/ বা যারা দূষিত কোরতে চায় সঙ্গমের বিলোকিত প্রতীকদের/ কি তাদের অপারগহীনতা/ কি সরল ও সহজলভ্য/ বিকোয় তারা স্বাস্থ্যহীন বাজারে বন্ধুদের চটুল উপহাসে/ কি তারা নিষ্ফল ধোঁকা দিচ্ছে নিজেকে / অবিনীত উদ্ধত শাঁশালো অনমনীয় যৌবনকে/ যারা নারীদেহে আলীঙ্গিত লুপ্ত ও বধির থাকতে চায় / ওইসব বপ্রক্রীড়াময় যুবকের সংগে ক্ষমাহীন/ অধিকন্তু আপোষহীন আমি / ওইসব লিংগহীন পুরুষদের সংগে / যারা সদর্থে চরিত্রহীন নয় লম্পট নয়।"[১৩২]

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিভিন্ন সময় বহুমাত্রিক বিতর্ক, আলোচনা সমালোচনা হয়েছে এখনও হচ্ছে। ১৯৬৫ সনের শেষ মুহূর্তে কণ্ঠস্বর যাত্রারম্ভ

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলো। পাক-ভারত যুদ্ধ আরম্ভ ও শেষ হয়েছে তার আগে। ১৯৬১ তে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীর আয়োজনও দেখেছিলেন কণ্ঠস্বর-স্বাক্ষর গোষ্ঠীর তরুণেরা। রবীন্দ্র বিতর্কের বিভিন্ন পর্যায়ে কমিউনিস্টরা এবং পরবর্তী প্রজন্মের কবি-সাহিত্যিকেরা তাঁকে বুর্জোয়া, গণমানুষের কবি নন— বলে, এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি খুঁজে, গবেষণা করে তাঁকে দুর্বল কবি এবং অসৎচরিত্রের ব্যক্তিত্ব (?) হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন ('উত্তর অন্বেষা'র আলোচনায় আবদুল হাফিজের বক্তব্য দ্রষ্টব্য; প্রসঙ্গত 'সীমান্ত' ও 'মুকুতির' পর্যালোচনাও দেখা যেতে পারে)। এঁদের মধ্যে শিবনারায়ণ রায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কথা উল্লেখ্য। এঁদেরই প্রভাবে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ লিখেছিলেন 'দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ'— যখন রবীন্দ্রনাথ বাঙালির স্বাধীনতা-সংগ্রামের শক্তি-সাহস জোগাচ্ছিলেন, তাঁর সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত দিয়ে। বলাবাহুল্য হবেনা, গোলাম সাকলায়েন কণ্ঠস্বরকে অগত্যার উত্তরসুরী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, কথাটার মধ্যে সত্য আছে। ফজলে লোহানীর ন্যায় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদও টিভি-ব্যক্তিত্ব হিসেবে এদেশে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন এবং একনামে শিক্ষিতসমাজের চেনা-জানা হতে পেরেছেন। দৃষ্টি আকর্ষণের, সমালোচিত হবার কৌশল বা যোগ্যতা তাঁরও ফজলে লোহানীর মতো ছিল বা আছে। আর পত্রিকার কথাবার্তা ও মূলসুরেও কিছুটা সঙ্গতি আছে। রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে শিবনারায়ণ রায় ও সুধীনদত্তের চিন্তাধারা অবলম্বণ করে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ কণ্ঠস্বরের প্রথম লেখায় রবীন্দ্রনাথের দুর্বলতাসমূহকে নিন্দনীয় করে তোলেন। তিনি বলেন :'.....অসাধারণ সংবেদনশীলতা নিয়ে জন্মেও সম্পূর্ণ জীবনবাদী ছিলেন না।... আমার মনে হয় নিজস্ব দুর্বলতাকে মহত্ত্বের নামে বেনামী করার ব্যাপারে কেউ এযাবৎ এত অদ্ভুত সুন্দর ভাষায় এমন অদ্ভুত সপারগ কথা বলতে পারেনি। অসংখ্য ভুল মিথ্যাকথাকে মহৎ জীবিত সত্য বলে প্রমাণ করার সবচেয়ে মসৃণ ও তৈলাক্ত ভাষা এই দানবীয় প্রতিভাবান ঈর্ষাজনকভাবে জানতেন।... বোঝাতে চাচ্ছি যে, রক্তমাংসের সুস্থ জীবনের অস্বীকার আছে রবীন্দ্রনাথে, তাঁর অধিকাংশ প্রধান চরিত্র কোনো না কোনো মহৎ তত্ত্বের উপায়হীন শিকার। কামরিরংসা তাড়িত মানুষকেও তাঁর হাতে লোভ-কামনাহীন উন্নত জীবে পরিণত হতে হয়েছে, যা মানুষের দুঃখজনক মৃত্যু। এসব দৃষ্টান্ত অসংখ্য।... একথা সত্যি যে, রবীন্দ্রনাথ পারতেন অনেক কিছু, করেছেনও অনেক কিছু, এবং করতে চাইলে পারতেন না, এমন বিষয় কম। আমার বক্তব্য শুধু যে, শ্রদ্ধেয় হবার, প্রতিষ্ঠিত থাকার লোভ রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধকে খণ্ডিত আত্মহত্যা দিয়েছিল।'

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ আরও লিখেছেন : "সঠিক মনে পড়ছেনা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জীবনবিমুখতার প্রতি এই পক্ষপাতকে সাক্ষী দাঁড় করিয়ে সুধীনদত্ত গ্যেটিয় জীবনবোধের তুলনায় একে পংগু বলেছিলেন কীনা। কিন্তু পংগু হোক না হোক, লোকচক্ষে মহৎ হওয়ার দুশ্চেষ্টা তাঁর সুস্থ জীবনবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। একথা বলছি এজন্যে যে, সামাজিকভাবে ভাল বা মহৎ হবার দুর্দমনীয় লোভ ছিল তাঁর। এইজন্যে যুগীয় রুচিবোধ ভেঙ্গে বৃহত্তর কোনো ভালোর আদর্শ তিনি গড়তে অক্ষম হলেন ; নিজের প্রতিষ্ঠাকে কোনভাবে হেয় দেখতে তিনি ভীত হতেন। ফলে তিনি ভূমিকা নিলেন সেই কারিগরের যিনি সমস্ত উনিশ শতকের দীর্ঘ সাধনায় সংগৃহীত সত্য শিব সুন্দরের নৈতিক প্রাসাদের শেষ গেঁথে দিয়ে বিদায় হয়েছিলেন। নিকট—যৌবনের ক্ষুব্দ দায়িত্বহীনতায় হঠাৎ একবার বিদ্রোহী হলেও (কড়ি ও কোমল) অচিরেই ভুল বুঝলেন, স্বকীয় জীবনবোধকে পংগুত্ব দিয়ে নিয়মিত আত্মক্ষয়ে নিজেকে ও যুগকে প্রতারিত করলেন এবং শ্রদ্ধেয় আসনে ঋষিত্বের প্রতিষ্ঠা নিয়ে বিদায় হলেন।"[১৩৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে 'কণ্ঠস্বর' ও 'স্বাক্ষর' কিংবা 'সাম্প্রতিক' প্রভৃতি লিটল ম্যাগাজিনের তরুণ কবি-সাহিত্যিকেরা প্রকারান্তরে একই গোষ্ঠীর সদস্য। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, শহীদুর রহমান, ইমরুল চৌধুরী, প্রশান্ত ঘোষাল, আবদুল মান্নান সৈয়দ স্বাক্ষরেও লিখেছিলেন আর স্বাক্ষর -এর সম্পাদক শুভানুধ্যায়ী রফিক আজাদ, ইমরুল চৌধুরী, রণজিৎ পাল চৌধুরী, আসাদ চৌধুরী প্রমুখ কণ্ঠস্বরেরও নিয়মিত লেখক। কণ্ঠস্বরেরই পূর্বতন প্রয়াস ওগুলো। ফলে কণ্ঠস্বরের বিভিন্ন সংখ্যায় স্বাক্ষরের পূর্ণ পৃষ্ঠার (অতি মনোযোগ দাবী করে—এমনভাবে) সুন্দর সুন্দর বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে।[১৩৪] এই গোষ্ঠীর তরুণ লেখকদের বিভিন্ন গ্রন্থের কিংবা সাহিত্য প্রয়াসের পরিচয়ও কণ্ঠস্বরে পাওয়া যায়। নানান আলোচনায় অতি আধুনিক অতি তরুণ সাহিত্যিকগোষ্ঠীর সাহিত্যপ্রয়াসের পরিচয়দানে বা প্রচারে কণ্ঠস্বর নিরলস ভূমিকা পালন করেছে। নানা ধরণের সাহিত্যসভা, সিম্পোজিয়ম এবং আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই গোষ্ঠীর তরুণেরা প্রবীণদের,পুরানোবাতিল সব চিন্তাধারার ধ্বংস-সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। একারণেই সমকালীন অন্যতম তরুণ সমালোচক আবুল কাসেম ফজলুল হকও লিখেছিলেন : "পূর্ব বাংলার সবচেয়ে গহীণ অন্ধকারময় দিনগুলোতে কণ্ঠস্বরের আন্দোলনই ছিল এখানকার প্রধান সাহিত্যান্দোলন। যুগের অন্ধকারকে, হতাশাকে, চরিত্রহীনতাকে, আত্মদহনকে—শঠতা, কপটতা, জালিয়াতি-চালিয়াতি, আত্মহনন ও গ্লানিকে কণ্ঠস্বর গর্ভে ধারণ করেছে। কণ্ঠস্বরের ধারা থেকে স্বতন্ত্র—এমন ধারাও ছিল এখানে, কিন্তু তা ছিল এতই নিষ্প্রভ যে তা উল্লেখযোগ্য কোনো আলো জ্বালতে পারেনি। হতে পারে, কণ্ঠস্বরের সামনে কোন পজিটিভ লক্ষ্য ছিল না ; তবু হৃদয়হীনতার যুগে হৃদয়ের জন্য আর্তনাদ করেছে কণ্ঠস্বর—দাঁড়াতে চেয়েছে হৃদয় নিয়ে, যদিও সে হৃদয় ছিল একেবারেই বিধ্বস্ত, বিক্ষত, আন্তরিকতাহীনতার যুগে চরিত্রহীনতার যুগে আন্তরিকতা ও চরিত্র নিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিল আমাদের সাহিত্যাঙ্গনে কণ্ঠস্বর। অন্ধকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে একটুও সাহস করেনি কণ্ঠস্বর, কিন্তু অন্ধকারের নিকট আত্মসমর্পণ করেও, অন্ধকারের স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়ে এর আসন্ন অবসানের অনিবার্যতাকে স্পষ্ট করে তুলেছে কণ্ঠস্বর।"[১৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

এ ধারার কতিপয় অপ্রধান পত্রিকা

[১. মেঘনা (ঢাকা ১৯৫৭) ২. সাহিত্য (১৯৬০-৬৩) ৩. যাত্রী (১৯৬০-৬২) ৪. সুন্দরম (১৯৬৩-৬৪)
৫. স্বাক্ষর (১৯৬৩-৬৬) ৬. স্বদেশ (১৯৬৩-৭০) ৭. পূর্বলেখ (১৯৬৬-৬৭) ৮. মেঘনা (চট্টগ্রাম, ১৯৬৭-৭০)]

১. মেঘনা (আশ্বিন ১৩৬৪/সেপ্টেম্বর ১৯৫৭)

পূর্ব বাঙলার সাময়িকপত্রের ইতিহাসে আবদুল গাফফার চৌধুরীর নাম যতো ক্ষীণাকারেই হোক— জায়গা করে নিয়েছে। মাসিক মোহাম্মদীর সহযোগী সম্পাদক হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন কাজ করেছিলেন। ১৯৫৮ সনে সাপ্তাহিক 'চাবুক' বের (সম্পাদক) করেন। 'মেঘনা' নামের সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদক হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে রেজিস্ট্রেশন নম্বর (ডিএ ৩২৮) গ্রহণ করেই মেঘনা ১৯৫৭ সনের জুলাই-এ মাসিক রূপে প্রকাশ করা হয়েছিল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪০। প্রাপ্ত তৃতীয় সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠার নম্বর ১২০। নিউজপ্রিন্ট কাগজে সুন্দর গেট-আপ, মেক-আপ, প্রচ্ছদ, মুদ্রণ- পরিপাটি সবকিছু নিয়ে মেঘনা রুচিশীলতার দাবী করেছিল। সমকাল পত্রিকার একমাস পূর্বে এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদে পূর্ববংগের প্রথম দিককার অন্যতম সাহিত্যপত্রিকা 'সংকেত' এর সম্পাদক সিরাজুর রহমানের পরিচালনায় এই মেঘনা বের হয়েছেলি স্মরণ করলে এর চেতনাগত স্টাণ্ডার্ড মোটামুটি আঁচ করা যায়। বলাবাহুল্য হবেনা, মেঘনার সত্বাধিকারী ছিলেন সিরাজুর রহমান। তৎকর্তৃক প্যারামাউন্ট প্রেস লিঃ ৯ হাটখোলা রোড, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তবে এই পত্রিকা ১৯৫৮ সনে যে আর প্রকাশিত হয়নি—সেটা অনুমান করতে কষ্ট হয়না। ফলে ১৯৫৮ তে গাফফার চৌধুরী পুনরায় 'সাপ্তাহিক চাবুক' বের করার জন্য সরকারের কাছে রেজিস্ট্রেশন নম্বর চেয়ে আবেদন জানান আর নম্বর প্রাপ্তির পূর্বেই তাঁরা কয়েকটি (৯টিরও বেশী) চাবুক প্রকাশ করেছিলেন। বুলবুল খানম নামের জনৈকা পাঠিকা গোপালগঞ্জ (তৎকালের ফরিপুরের মহকুমা) থেকে লিখেছিলেন : "মেঘনার প্রথম সংখ্যা দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ভালো লাগলো সাহিত্যের আসরে 'মেঘনা'কে। এক কথায় মেঘনা আমাকে খুশী করেছে, আনন্দ দিয়েছে প্রচুর। সাময়িকীতে যথার্থই লিখেছেন : এদেশে নতুন পত্রিকা প্রকাশ একটি দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা' ... স্বল্প পরিসরের মাঝেও মেঘনাতে চেষ্টা করা হয়েছে অনেক বিষয় জানাবার। 'পূর্বাশা' মনে দাগ কাটল। ওবায়দুল হক ও আহসান হাবীবের লেখা দুটো আমাকে মুগ্ধ করেছে। দুটো লেখাই বাস্তবধর্মী। 'খেলাধূলা' 'সাময়িকী' 'পাঁচমিশালী' তে আমার মনের কথাগুলোরই প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম। অন্যান্য সব বিভাগই আমাকে খুশী করেছে।" অপর এক পাঠক, হাফিজউদ্দীন--ঢাকা থেকে লিখেছেন : "প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা দেখলাম। 'প্যারিসে দুসপ্তাহ' লেখাটি বিশেষ আনন্দ দিয়েছে। রচনাটিতে ভ্রমণকাহিনী, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রস-রচনার যে অপূর্ব আস্বাদ-গুণের সমন্বয় হয়েছে, তা আমাকে একান্তভাবে দোলা দিয়েছে। নূরুল মোমেন সাহেবকে অনুরোধ তিনি যেন, কাহিনীর সঙ্গে প্যারিসের দর্শনীয় স্থানসমূহের কিছু ছবি দেবারও ব্যবস্থা করেন। পত্রিকার নিয়মাবলীতে বলা হয় : "মেঘনা সচিত্র সাহিত্যপত্র। ভালো ও সুলিখিত যে কোন রচনাই সাদরে গৃহীত হবে। বার্ষিক চাঁদা সাড়েচার টাকা। ষান্মাসিক দুই টাকা পাঁচ আনা। প্রতি সংখ্যা সাত আনা। পত্রিকায় 'সাময়িকী', 'যৎকিঞ্চিৎ' 'দেশবিদেশ', 'বেতার', 'খেলাধূলা', 'পুঁথিপত্র', 'চলচ্চিত্র' ও 'রঙ্গমঞ্চ' প্রভৃতি বিভাগ ছিল আলোচনার জন্য। ছন্দ, শব্দচয়ন, উপমায় উৎকৃষ্ট একটি ভালো কবিতা লিখেছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী। হুমায়ুন কাদির লিখেছিলেন গল্প 'রোগ'। নূরুল মোমেন ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন ধারাবাহিকভাবে 'প্যারিসে দু সপ্তাহ'। মুকাদ্দাস হোসেন লিখেছিলেন চিত্রপ্রদর্শনীর উপর আলোচনা 'দক্ষিণ আফ্রিকার চিত্রকলা'। একটি ইংরেজী প্রবন্ধ অবলম্বনে লিও টলষ্টয়ের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, সাহিত্য-প্রতিভা, আদর্শবোধ ও জীবনকাহিনী লিখেছিলেন ফখরুজ্জামান চৌধুরী। আনিসুজ্জামান গল্প লিখেছিলেন 'দশ টাকার নোট'। (পঞ্চাশ দশকের বিভিন্ন পত্রিকায় ডক্টর আনিসুজ্জামানের লেখা কবিতা, গান ও গল্প ছাপা হয়েছে দেখতে পাওয়া যায়)। ভিক্টোর হুগোর 'প্রেম' শীর্ষক গল্প সংকলন থেকে উদৃত করা হয় 'অবিস্মরণীয় প্রেম' নামে। নীলু দাস পঞ্চাশ-ষাট দশকের পত্র-পত্রিকায় অনেক গল্প লিখতেন, কিন্তু তাঁর কোনো পয়-পরিচিতি একালের সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। নীলু দাসের গল্প একটি মেঘনাতেও দেখা যায় (ঝিনুক লতা, ১/৩)। চলচ্চিত্র ও রঙ্গ-মঞ্চের আলোচনার বিভাগে সংস্কৃতিক পরিস্থিতির সমালোচনা আছে। আর পুস্তক সমালোচনার বিভাগ 'পুঁথিপত্রে' মহিউদ্দীন আহমদ অনূদিত এ্যালানপোর শ্রেষ্ঠ গল্প ১ম ও ২য় খণ্ড আলোচিত হয়।

২. সাহিত্য (বৈশাখ ১৩৬৭এপ্রিল ১৯৬০--১৩৬৯-৭০/১৯৬৩-৬৪)

'প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকার দাবি করলেও 'সাহিত্য' কে প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ সমকাল, সংলাপের মর্যাদা দেয়া যায় না। কিন্তু অতি তুচ্ছ পত্রিকাও 'সাহিত্য' ছিলনা। দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রিকাগুলোর মধ্যে 'সাহিত্য' উচ্চ মানের ছিল। আর আইউব খানের লেখক-সংঘ সংগঠনের 'লেখক-সংঘ পত্রিকা', 'পরিক্রমের' প্রথম দুতিন বছরের সমকালে প্রকাশিত হলেও হিন্দু-মুসলিমের মিলিত প্রয়াস বলে এতে উৎকট সাম্প্রদায়িকতা স্থান পায়নি। পৃষ্ঠপোষক এবং লেখক-সূচীতে হিন্দু মুসলমান আর পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের উভয়াঞ্চলের লেখকই ছিলেন। পশ্চিম-বঙ্গের সাহিত্যিকদের নিকট থেকে

Dhaka University Institutional Repository

এঁরা প্রশংসা কামনা করতেন (পেয়েছেনও) বলে হিন্দু-বিদ্বেষ প্রকাশের সুযোগও ছিল এতে কম। 'চতুরঙ্গ' থেকে হুমায়ুন কবিরের লেখা রবীন্দ্রনাথের উপর প্রবন্ধও সাহিত্য পুনর্মুদ্রিত করেছে। এদেশের ভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত উৎকট মতাদর্শের পক্ষপাতিও উদ্যোক্তারা ছিলেন না। ফলে একটা মুক্ত মন ও মানবতাবাদী সুর এই পত্রিকায় ফুটে উঠেছে। দুর্নীতি অবক্ষয় ইত্যাদির পরিবর্তে তাঁরা আনুগত্য প্রকাশ করেছেন সুনীতি, সুস্থ সাহিত্যচিন্তার পক্ষে। কিন্তু যুগের হুজুগে 'পকিস্তান লেখক সংঘের' সংস্পর্শ এঁরা পরিহার করতে পারেননি। হয়তো সম্ভবও ছিলনা। তখন প্রধান সাহিত্যিক, লেখক সবাই সংঘের তথা সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করে এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। অল্প শক্তিধর লেখকদের একাংশতো লালায়িতই ছিলেন লেখক সংঘের সুদৃষ্টি এবং প্রশংসা পাবার জন্য। অবশ্য শক্তিতে হীন হলেই যে সকল লেখক ঐ সংঘের প্রচ্ছায়া কামনা করতেন বা যেতেন সেখানে, তাও নয়। নীতিগত ভাবে পরিহার করে চলেছেন আইউব খানের ব্যক্তিগত উদ্যোগে গঠিত লেখক সংঘকে— এমন লেখকও (কিছু তরুণ) খুঁজে পাওয়া যাবে। তাছাড়া ওর ভেতরে হানাহানি ছিল। বড়বড় হোমরা-চোমরাদের ভয়ে কিছু বলবার সাহস না পেয়ে আবার অনেকে সেখানে ঘেঁষতেও সাহস পেতেন না। সেযাই হোক, লেখক সংঘের সদস্যদের এবং লেখক সংঘের সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধের মুদ্রণ 'সাহিত্যে' ঘটলেও এবং 'পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারী ও পাকিস্তান লেখক সংঘের সাধারণ সম্পাদক জনাব কুদরৎউল্লাহ শাহাব-এর 'শুভেচ্ছা' বাণী (There is always from and to spare for good literary and cultural magazines. Let us hope, 'Shahitaya will set a new and healthy standard in the field of literary journalism. I wish this new venture the best of luck.) নিয়ে যাত্রারম্ভ করলেও চিন্তার দিক থেকে কর্তৃপক্ষ শৃংখলিত ছিলেন না। নারায়ণগঞ্জের মতো ঢাকা থেকে দূরে অবস্থিত একটি মহকুমা শহরের এবং হিন্দু প্রধান অঞ্চলের অধিবাসী, হিন্দু সাহচর্যে পত্রিকা চলতো বলে এর অবস্থান ভিন্নতর, গণতান্ত্রিক, মানবতাবাদী ধারাতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া পত্রিকার কোথাও আঞ্চলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা নাই। সাহিত্যিক মানদণ্ডই প্রধান হয়ে উঠেছে।

'সাহিত্য' সম্পাদনা করেছিলেন 'জাগরী' পত্রিকার সম্পাদক এবং তখনকার একজন সক্রিয় সাহিত্যকর্মী, সংগঠক হেমায়েত হোসেন। এঁর পরিচয়-পরিচিতিও একালে হারিয়ে যেতে বসেছে। তখনকার পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প-কবিতা বেশ ছাপা হতো। তিনি নারায়নগঞ্জের ব্যবসায়ী আইনজীবী এবং সংকৃতিসেবীদের সমন্বিত করে বিজ্ঞাপন ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থের সংকুলানপূর্বক 'সাহিত্য'কে একটি নিয়মিত মাসিকরূপে প্রকাশের ইচ্ছা নিয়েই মাঠে নেমেছিলেন। এঁদের শুভার্থী-গ্রুপ মোটামুটি শক্তিশালীই ছিল। নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির পাবলিক লাইব্রেরী হলের একটি কক্ষে দিনাজপুরের বা সিলেটের নওরোজ বা আল-ইসলাহর মতো সুযোগ-সুবিধা নিয়ে যাত্রারম্ভ করেছিলেন। তাঁদের পক্ষে এনেছিলেন নারায়ণগঞ্জ সাহিত্যপরিষদ-এর কর্মকর্তাদের এবং মিউনিসিপ্যালিটির এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর জনাব মতিনউদ্দীন আহমদকে। তাঁদের পত্রিকার প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় থেকেই উদ্ধৃত করা যাক পত্রিকার ইতিহাসের খানিকটা — "সাহিত্য ও সংস্কৃতি জীবনেরই প্রতিচ্ছবি ; জীবনেরই প্রতিরূপ ... প্রতিফলিত হয় সামগ্রিক জীবন — মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম, প্রেম-জিজ্ঞাসা। আমাদের সাহিত্যেও তাই আমাদের সত্যিকার জনজীবনের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আজাদী-উত্তর আজ প্রায় ১৩ বছর পরেও দেখছি সাহিত্য-চর্চার উপযুক্ত মাধ্যম এখানে বিরল। আমাদের লেখকদের এখনো ভাবতে হয় কোথায় তাঁরা লিখবেন এবং কি লিখবেন। রুচিবান প্রকাশক ও এখানে অত্যন্ত বিরল। ফলে এখানে সাহিত্যের নামে যা হচ্ছে তা প্রায়শই দল নিরপেক্ষ সত্যিকার সাহিত্য সৃজনী নয় .... সাহিত্যের নামে কোন্দল চর্চাই বেশী। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি। আমাদের সাহিত্যিক, সাহিত্য-সমাজ এবং জীবন একসূত্রে গাঁথা নয় যেন। কেন যেন আলাদা আলাদা খাপছাড়া। একের সাথে অন্যের যোগ তত দৃঢ় নয়। অথচ এসব সূত্রের নিগূঢ় মিলন না-ঘটলে সত্যিকার সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সামান্য শক্তি ও সামর্থ্যের কথা জানা সত্ত্বেও অনেক আশা ও স্বপ্ন নিয়ে 'সাহিত্য' প্রকাশের যখন উদ্যোগ করি — তখন সাহিত্য-রসিক, স্থানীয় শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ব্যবসায়ীগণ — সাহিত্যের প্রতি যে অকুণ্ঠ দরদ ও সহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করেন, তাই-ই আমাদের এই-পত্রিকা প্রকাশের সাহস জোগাচ্ছে। .... ইতিমধ্যে নানারকম বাঁধা এসেছে ... কিন্তু তবু আমরা দমে যাইনি। সংকটকালে যে-সকল বন্ধু স্বজন ও শুভানুধ্যায়ী আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন — স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক মতিনউদ্দীন আহমদ; বিশিষ্ট ব্যবসায়ী অকৃত্রিম দরদী-প্রাণ বাবু বাদল চন্দ্র সেন, প্রবীণ আইনজীবী ও সাহিত্যরসিক ও বাবু কামাক্ষাপাদ চন্দ্র (প্রথম প্রস্তাবক ও পরিপোষক) নারায়ণগঞ্জ সাহিত্য পরিষদের সভাপতি রইসউদ্দীন আহমদ ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সত্যরঞ্জন সাহা— নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির .... মতিনউদ্দীন আহমদ অত্যন্ত অনুগ্রহপূর্বক 'সাহিত্য'র অফিস হিসাবে মিউনিসিপ্যালিটির পাবলিক লাইব্রেরী হলের একটি কক্ষ ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে ...' সাহিত্য প্রকাশের পথ সুগম করেছেন।

সম্পাদকীয়তে সাহিত্যের উদ্দেশ্য আদর্শ সম্পর্কে বলা হয় : "সাহিত্যক্ষেত্রে আমরা কোন বিশেষ দলের সমর্থক নই। সাহিত্যের মাধ্যমে সামগ্রিক ভাবে মানবতার কল্যাণ সাধনই আমাদের লক্ষ্য এবং আমাদের সৃষ্টিশীল প্রতিভার সৎ-বিকাশের দ্বারা জাতিকে গড়ে তোলা এবং দেশ ও সমাজের কল্যাণসাধনের প্রচেষ্টাই আমাদের আদর্শ। .... দলমত নির্বিশেষে সবার জন্যই আমাদের এ দুরূহ প্রচেষ্টা। ... আল্লাহ আমাদের সহায়। আদর্শ আমাদের পথের দিশারী।" একটি বিজ্ঞাপনে বলা হয় : " সাহিত্য খ্যাতনামা ও শক্তিশালী নবীন-প্রবীণ লেখকদের উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, রম্য-রচনা, অনুবাদ, সাহিতালোচনা, পত্রধারা, ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতিচারণ, ধারাবাহিক উপন্যাস, দেশ-বিদেশের সমকালীন সাহিত্যের খবর, বইপত্র সমালোচনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। 'সাহিত্য বিষয়ক উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা বলে সাহিত্যকেও চিহ্নিত করে এতে বিজ্ঞাপন দিয়ে' সাহিত্য সৃষ্টিতে সহায়তা' করার আহবান জানানো হয়।

'সাহিত্য' এর প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনামের সঙ্গে 'প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা' এবং 'সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্রিকা' ইত্যাদি কথা ব্যবহার করা হতো। এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৬৭ তে প্রকাশিত হয়। সম্পাদকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী হল থেকে হেমায়েত হোসেন কর্তৃক জিনাত প্রেস, কায়েদে আজম রোড, নারায়নগঞ্জ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।বৈশাখ ১৩৬৯ সংখ্যায় বলা হয় হেমায়েত হোসেন কর্তৃক নারায়ণগঞ্জের পাক প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। কভার ছাপা হয় নিউনেশন প্রেস, ১নং রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-৩ থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

নিউজপ্রিন্ট ১ বাই ৮ ক্রাউন সাইজ, পৃষ্ঠা ৫০, দ্বিতীয় সংখ্যার পৃষ্ঠা ৭২, তৃতীয় সংখ্যা ১৪৮ পৃষ্ঠা, ১৯৬০ সনের বিপ্লব সংখ্যার পৃষ্ঠা ১৮২। এই রকম এক এক সংখ্যা একএক সাইজে প্রকাশিত হতো। মোহাম্মদী বা সওগাতের মতো ১২ সংখ্যার পৃষ্ঠার ক্রমিক ধারাবাহিক ভাবে রক্ষা করা হতো না। অর্থাৎ নিয়মিত প্রকাশের ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন না, পত্রিকা নিয়মিত বেরও হয়নি। ১৩৬৯ পর্যন্ত বেরিয়ে থাকবে। প্রাপ্ত দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৬৯ সনের আশ্বিন-কার্তিক মাসে অর্থাৎ ১৯৬২ সনের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে। তাহলে পত্রিকার আয়ু ছিল মোটামুটি এপ্রিল ১৯৬০ থেকে ১৯৬২ সনের ডিসেম্বর, বেশী হলে ১৯৬৩ সনের এপ্রিল পর্যন্ত।

পত্রিকায় প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নাম প্রকাশিত হতো মতিন উদ্দিন আহমদের। 'প্রধান পৃষ্ঠপোষক' ছিলেন বাবু বাদল কৃষ্ণ সেন। বিপ্লব সংখ্যায় (১৯৬০) কামাক্ষাপদ চন্দর নাম তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ছাপা হয়। সহকারী সম্পাদক মুধুসূদন মিত্র ও সিরাজুল ইসলাম ভূঁইয়া। প্রচ্ছদ শিল্পী রশীদ আহমদ। মূল্য দশ আনা। প্রচ্ছদ রুচিশীল হয়েছিল। বিজ্ঞাপন তাঁরা ভালোই পেতেন। সাহিত্যের সঙ্গে অনেককে সংশ্লিষ্ট করতে পারার সুবাদে বিজ্ঞাপনও সহজলভ্য হয়েছিল। আবার ঘুরিয়ে বলা যায়—বিজ্ঞাপনের সুবিধার জন্যই বেশী লোককে পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছিল। পশ্চিম বাঙলার সাহিত্যিকদের কাছেও সাহিত্য আদৃত হয়েছিল বলে সাহিত্য গর্ববোধ করতো। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণ 'সাহিত্য' কে অভিনন্দন জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন। সাহিত্যে তা ছাপাও হয়েছে। তাছাড়া স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর উৎসাহমূলক পত্রে তাঁরা অত্যন্ত 'অনুপ্রাণিত' হন বলে জানান। "দেশবিদেশের এহেন অভিনন্দন, উৎসাহ, প্রেরণা ও স্নেহলাভে আমাদের বুকে নতুন শক্তি এসেছে, আমাদের উদ্যম আরও প্রাণবন্ত হয়েছে।"[১৩৬]

'সাহিত্যে'র প্রথম সংখ্যায় প্রবন্ধ লেখেন ঃ ইব্রাহীম খাঁ (পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য) ; অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (মানবজীবনের গতি ও নূতন জীবনাদর্শের প্রয়োজনীয়তা) ; সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (আধুনিক কবিতার সমস্যা) ; ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ('আমাদের সাহিত্যিক'—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পর্কে) ; ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন (পাক-বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্য) ; ইত্যাদি। কবিতা লিখেছিলেন ঃ ফররুখ আহমদ, সুফী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, শামসুর রাহমান, আশরাফ সিদ্দিকী, আজিজুর রহমান (গান) ; শ্রী তারাপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ; বানভট্ট ; আখতার জাহান প্রমুখ। গল্প লিখেছিলেন ঃ আহমদ মীর, আলাউদ্দীন আল আজাদ, শ্রী ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়, রাজিয়া মজিদ প্রমুখ এবং উপন্যাস লিখেছিলেন দীপঙ্কর (চৈতালী মন, ক্রমশ) ; মতিনউদ্দিন আহমদ লিখেছিলেন রস্য-রচনা—এজমালী কবিতা। 'আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প' বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন ওবায়দুল হক। আর ছিল 'সমকালীন সাহিত্য সমাচার'—অর্থাৎ সাহিত্যের খবরাখবর। দ্বিতীয় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একটি অপ্রকাশিত কবিতা' ছাপা হয়। কাজী নজরুল ইসলামের 'অভিযান' শীর্ষক কবিতা এতে মুদ্রণ করা হয়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে প্রকাশিত বলেই এতে মঈনুদ্দীনের 'আমাদের সাহিত্যে নজরুলের স্থান' শীর্ষক প্রবন্ধ ছাপা হয়। নজরুলের কয়েকটি চিঠিও 'সাহিত্য' (১/২) ছাপে।

প্রথম সংখ্যার লেখক ছাড়াও প্রাপ্ত সংখ্যাগুলোতে যাঁরা কবিতা লিখেছিলেন ঃ আবদুস সাত্তার, আবদুল মজিদ, এ. কে মকবুল আহমদ, আজহারুল ইসলাম, আবুল কাশেম শাবী, মোজাফফর হোসেন, আবদুল মান্নান হাওলাদার, বিষ্ণু দে, আহসান হাবীব, সিকান্দার আবু জাফর, আবদুর রশীদ খান, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, মীর আবুল খায়ের, কে. এম. শমসের আলী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, হেমায়েত হোসেন, মধুসূদন মিত্র, লতিফা হিলালী, আকাশ নূর মোহাম্মদ, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, দিনেশ দাশ, জাহানার বেগম, বিকাশ দাস, আবদুল্লাহ ইউসুফ ইমাম, মাসুদ আহমেদ, মুহম্মদ শামসুর রহমান, মনোয়ারা আরিফ তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

যাঁরা গল্প লিখেছিলেন ঃ খালেক দাদ চৌধুরী, নূরউল আলম, মনোজ বসু (টিফিনের ঘন্টা ১/৩, শ্রাবণ ১৩৬৭) ; অশোক বড়ুয়া (শেষ বেসাতি, ১/৩) ; বনফুল (কৃতজ্ঞতা, ১/৩) ; প্রেমেন্দ্র মিত্র (ছায়াকায়া, ১/৩) ; কলিম আনওয়ার (বড়গল্প স্পেসিস , ১/৩); রাজিয়া মজিদ (দেনা-পাওনা ; ১/৩) ; শওকত ওসমান (কালির আখর, বিপ্লব সংখ্যা ১৯৬০) ; সুবোধ ঘোষ (যাযাবর, পূর্বোক্ত) ; জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (পিতা, পূর্বোক্ত); আলাউদ্দীন আল আজাদ (পাশবিক, পূর্বোক্ত); হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (মৃগশিরা, পূর্বোক্ত) ; সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায় (কথায় কথায়, পূর্বোক্ত) ; মধুসূদন মিত্র (পদ্মকলির মত) ; হেমায়েত হোসেন (অতনুর কান্না, পূর্বোক্ত, পলাশের তৃষ্ণা, ২/২) ; আবদুল গাফফার চৌধুরী (বয়াতি, পূর্বোক্ত) ; শওকত আলী (বনটির প্রশ্ন, পূর্বোক্ত) ; বিজনকুমার ঘোষ (ফুলের সাধ, পূর্বোক্ত) ; নূরুল ইসলাম খান (ছক, পূর্বোক্ত) ; শহীদ আখন্দ (এই ঘর ; এই গান, পূর্বোক্ত) ; অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত (জারিজুরি, পূর্বোক্ত) ; আনোয়ারা চৌধুরী (নায়িকার বয়স চৌদ্দ, ২/৩-৪) ;

দীপঙ্কর লিখিত উপন্যাস 'চৈতালী মন' প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে 'সাহিত্য'-এ ধারাবাহিক বেরিয়েছিল। মতিন উদ্দীন আহমদ এর দীর্ঘ উপন্যাস (২৯ অনুচ্ছেদে) 'বুদ্বুদ' সাহিত্যেই প্রথম প্রকাশিত হয় এবং পরে হেমায়েত হোসেনের 'সাহিত্য' থেকেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। সুকুমার ভট্টাচার্যের 'বৃত্ত পেরিয়ে'-ও সাহিত্যে প্রকাশিত হয়। এছাড়া মহিউদ্দীন লিখিত 'মসনদ', প্রখ্যাত মার্কিন উপন্যাসিক সিন ক্লেয়ার এর নিগ্রো সমস্যার উপর লিখিত আলোড়নসৃষ্টিকারী (নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত) উপন্যাস Kings Blood Royal এর কবীর চৌধুরীকৃত অনুবাদ এবং সৈয়দ মুজতবা আলীর 'স্মৃতিচিত্রন' ('মনি') ইত্যাদি এতে প্রকাশিত হয়। বেশ কিছু পুস্তকের আলোচনা সমালোচনাও সাহিত্য প্রকাশিত করে। আবদুস শাকুর প্রণীত গল্পগ্রন্থ 'ক্ষীয়মান' এর আলোচনা করেন নূরুল ইসলাম খান, মুহম্মদ শামসুর রহমান প্রণীত কাব্যগ্রন্থ 'বৃষ্টিঝরা গান' এর আলোচনা লেখেন শ-র-ভূঁ। মোকাররম হোসেনের গল্পগ্রন্থ 'সূর্য-স্বপ্ন'র ওপর রনেশ দাস গুপ্ত ; আবুল হাসান শামসুদ্দীনের গল্প-গ্রন্থ 'মুখর প্রান্তর' এর ওপর মোকাররম হোসেন, আ.কা.শ নূর মোহাম্মদের 'বুনো মেঘ কথা কয়' এবং হানিফ খান প্রণীত 'ভাঙা বাঁশী'র ওপর যথাক্রমে ইবনে সাত্তার এবং মোঃ নুরুল আমিন আলোচনা লিখেছিলেন (২/২)। দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যায় (আশ্বিন কার্তিক ১৩৬৯) একগুচ্ছ পুস্তক আলোচিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থগুলো ঃ আবুল হাসানাৎ সম্পাদিত গল্পগ্রন্থ 'অফুরন্ত গল্প' ; মুহম্মদ শামসুর রহমান 'প্রণীত সাঁঝ আকাশের তারা' ; কবীর চৌধুরী অনূদিত নাটক

Dhaka University Institutional Repository

'বালিভিত' এর আলোচনা লেখেন যথাক্রমে নুরুল ইসলাম, মুহম্মদ মোকাররম হোসেন, মোঃ নুরুল আমিন, রনেশ দাশগুপ্ত প্রমুখ। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যসাময়িকী 'ইন্দ্রপ্রস্থ' ও 'মানসী', 'মানস', 'অনন্যা' প্রভৃতি এবং ঢাকার 'রঙ্গন' (প্রধান সম্পাদক সৈয়দ আসাদুজ্জামান, মাসিক পত্রিকা) এর আলোচনাও এতে প্রকাশ পায়। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরীর কাব্য-গ্রন্থ 'আমীর সওদাগর' এবং অধ্যাপক আবুল ফজল নুরউল আলম প্রণীত 'পুতুলের কান্না' প্রসঙ্গে লিখেছিলেন।

সাহিত্যের প্রবন্ধগুলোও কম গুরুত্বের নয়। অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আজরফ (আমাদের কথাসাহিত্যের পরিবেশ ও প্রতিশ্রুতি, ১/২) ; সৈয়দ মুজতবা আলী (সাহিত্য সংস্কৃতি, ১/৩ থেকে ক্রমশ) ; আবু তালিব (কবি বুরহানুল্লাহ, ১/৩) ; সৈয়দা রাজিয়া বেগম (রম্য রচনা ও সৈয়দ মুজতবা আলী, ১/৩) ; ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য, বিপ্লব সংখ্যা ১৯৬০) ; সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় (সাহিত্য প্রসঙ্গে, পূর্বোক্ত, ক্রমশ) ; ফখরুজ্জামান চৌধুরী (হারমান হেসে ও 'সিদ্ধার্থ' , পূর্বোক্ত) ; ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন (মনন সাহিত্য, পূর্বোক্ত) ; ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম (সনেটের কবি মধুসূদন, পূর্বোক্ত) ; আবদুল জব্বার খান (পূর্ব পাকিস্তানের চলচ্চিত্র শিল্প, বিপ্লব সংখ্যা ১৯৬০) ; মতিনউদ্দীন আহমদ (পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের বর্তমান ধারা, ফাল্গুন ১৩৬৭) ; ঈদসংখ্যা) ; শিশির কুমার দাশ (লেডিচ্যাটার্লির বিচার, পূর্বোক্ত) ; অধ্যাপক মাহমুদ মোকাররম হোসেন (সাহিত্য ও সৌন্দর্যবাদ, ২/২) ; জগলুল হায়দার আফরিক (ছোটগল্পের শিল্পরূপ, পূর্বোক্ত) মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ (বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, পূর্বোক্ত) এবং আদিত্য ও-হদেদার (রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা, ২/৩-৪) ; প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

'সাহিত্য' বৈশাখ ১৩৬৯ সনে 'পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে দুর্নীতি সম্পর্কে বিশেষ 'অসাধারণ' সংখ্যা প্রকাশ করে পূর্ব-বঙ্গবাসী সাহিত্যিকদের প্রতিভাহীনতার সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রের খ্যাতিমান লেখকগণ বিদেশী সাহিত্যের কোথা থেকে চুরি বা হুবহু নকল করেছেন ইত্যাদি সব সবিস্তারে ফাঁস করে দিয়েছেন। সম্পাদক এটা করেছিলেন সমাজ ও সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ একটা দায়িত্ববোধ থেকেই। পূর্ববঙ্গের সাহিত্য-সাধনায় প্রকৃতপক্ষে মহত্তম কোনো ফসল বিভাগ পরবর্তী দুই যুগেও ফলেনি। অথচ এখানকার কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে মহৎ-সৃষ্টির কোনো প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়নি। যেনো-তেনো প্রকারে এক-একখানা সাহিত্য সৃষ্টি বা সাহিত্যসমালোচনামূলক গ্রন্থ লিখে সমাজ থেকে নানা ফায়দা সংগ্রহের রীতি-নীতি দেখে বিক্ষুব্ধ-সম্পাদক সাহিত্যসমাজের অবক্ষয়রোধে দুর্নীতি দমনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই সংখ্যাতে নজরুলের সমকালীন মুসলিম-রেনেসাঁর কবি বেনজীর আহমদ লিখেছিলেন একটি নীতি-প্রচারমূলক উপদেশাত্মক প্রবন্ধ 'সাহিত্য দুর্নীতি ও জাতীয় চরিত্রে তার প্রভাব'। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসানকৃত এদেশের বহুলপঠিত গ্রন্থ 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' তে কোথা থেকে কতো চুরি ও নকল রয়েছে কিংবা ভুল তার বিবরণমূলক রচনাটি ১৩৬৩ সনের ১০ই ভাদ্রের দৈনিক আজাদ থেকে পুণর্মুদ্রিত করা হয়েছিল। গোলাম সাকলায়েন 'পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য' শিরোনামে 'সাপ্তাহিক দেশ' পত্রিকার ২৭ বৈশাখ ১৩৬৫ তারিখের সংখ্যায় লিখেছিলেন যে প্রবন্ধটি—তা আবুল কাসেম প্রণীত এবং মাহেনও-এ প্রকাশিত প্রবন্ধেরই নকল বা চুরি ; - এই সম্পদ দিয়ে আবুল কাসেম দৈনিক সংবাদ এর ২৩-৮-১৯৫৮ তারিখের সংখ্যায় যা লিখেছিলেন তাও চুরি বিষয়ক উক্ত সংকলনে সাহিত্য প্রকাশিত করে। অধ্যাপক মীর আবুল হোসেনও লিখেছিলেন 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে'। তাঁর রচনার বক্তব্য সৈয়দ আলী আহসান যে J .C. Ghosh লিখিত Bengali literature (১৯৪৮ সনে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত) গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ তার উপযুক্ত প্রমাণ দেওয়া। এই রচনাটি ২৩/৭/৬১ তারিখের ইত্তেফাক থেকে সংকলিত। 'মাহেনও' এর ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ সংখ্যায় প্রকাশিত 'কাকে বলি' শীর্ষক কবিতার নকল 'বেগম' (৩০/৪/৬১) এর জাহানারা বেগম রচিত 'প্রিয়তমেষু'—কবিতা দুটো উদ্ধৃত করে তার প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। সৈয়দ আলী আহসানের 'অনেক আকাশ' (১৩৬৬) বইয়ের কবিতাগুলো ইভানগলের কবিতার অনুবাদ। তাঁর Our Haritage বইটিও Heroes and Heroines of Islam" শীর্ষক গ্রন্থের অনুসরণ। 'দুর্মুখ' ছদ্ম নামে 'সাহিত্যে দুর্নীতি' শীর্ষক আলোচনায় এ সব তথ্য তুলে ধরেছিলেন। ১৫-৯-৬১ তারিখের ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয় শামসুল আরেফিন এর প্রবন্ধ—'বিদেশী ভাষায় পূর্ব পাকিস্তানের কবিতার অনুবাদ', এতেও সৈয়দ আলী আহসান ও সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতা যে কবিতা হয়নি তাই প্রমাণ করা হয়েছে। অথচ ইউনেস্কোতে অনুবাদের জন্য বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে এই দুজনের কবিতাই বাংলাএকাডেমীর পরিচালক হিসেবে ক্ষমতার জোরে পাঠানো হয়েছিল। টেক্সট বুক বোর্ডের বইয়ের লেখা নির্বাচনে দুর্নীতি ও বয়স কমানো-বাড়ানো ইত্যাদি বিষয়ে লিখেছিলেন এম. এইচ. আলী 'সাহিত্যে দুর্নীতি প্রসঙ্গে'। 'সাহিত্যে অসাধুতা' শিরোনামে ১৬.১০. ১৯৬১ তারিখের ইত্তেফাকে প্রকাশিত মকবুলা খাতুন এর লেখার পুণর্মুদ্রণ করা হয়। এর বক্তব্য গোলাম সাকলায়েন চুরি করেছেন পূবালীতে (২/১, আশ্বিন, ১৩৬৮) প্রকাশিত বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের লেখা থেকে। বেনামী রচনা 'সওজা বাংলা' আবিষ্কার প্রসঙ্গে'। দেশ এ (১৩৫৯) প্রকাশিত বিকাশ দাস এর কবিতা 'সাহিত্য' থেকে চুরি করেছেন আবদুল্লাহ্ ইউসুফ ইমাম (গোধূলী, ইত্তেফাক, ১৩৬৬)। জসীমুদ্দীনের কবিতা চুরি করে লিখেছেন করাচী থেকে আবদুর রহমান ভূঁইয়া। এরকম অনেক নকল ও চুরির বিবরণ পাওয়া যায় সাহিত্যের এই সংখ্যায়। সৈয়দ আলী আহসানের চুরি, দুর্নীতি ও আত্মসাতের বিরবণই দীর্ঘ ও লোমহর্ষক। অনেক অপ্রধান অশক্তিশালী লেখকের কথা ধর্তব্যের মধ্যে না-আনলেও চলে। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিত্ব আলী আহসানের কৃতিত্ব বিচার করতে গেলে চুরির ধনে বড় লোক ছাড়া তাঁকে আর কিছু বলা চলে না। উল্লেখ্য, বুদ্ধি ও কৌশল জানা না থাকলে চুরি করে সারা যায়না। সেই মেধা ও প্রতিভা অবশ্যই তাঁর আছে। পূর্ব পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকায় সৈয়দ আলী আহসানের যে চরিত্র ফুটে উঠেছে তা অনন্যসাধারণ গুরুত্ব দাবি করে। কারণ তিনি নকল, চুরি, তোয়াজ- তোষামোদ করে সাহিত্যিক জীবনের ভিত্তি তৈরী করেছিলেন এবং ঔপনিবেশিক সরকারের প্রীতিভাজন হয়ে বিভিন্ন উচ্চপদে আসীন হয়েছিলেন। ধিকৃত ভূমিকা অবলম্বনের সুযোগ বাংলাদেশেও তাঁর ঘটেছিল। কারণ জনগণের কল্যাণকামী সরকার বৃটিশের রাজত্বকালের পরে এদেশে এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। গণস্বার্থ-বিরোধী, অসৃষ্টিশীল লোকেদের প্রাধান্য দুর্নীতিবাজ সরকারের কাছে যে হবেই—সেটাই স্বাভাবিক।

'দুর্নীতি' সংক্রান্ত সংখ্যার (আমাদের কথা) সম্পাদকীয়তে লেখা হয়— পূর্ব পাকিস্তানের গত ১৫ বছরের সাহিত্যের খতিয়ান নিলে নিরাশ হতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নিষ্কলুষ মৌলিক নয় এখানকার সাহিত্য-শিল্প। "রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি সকলদিক দিয়েই জাতীয়—জীবনে যে দুর্নীতি ও অসাধুতার কালো-ছায়া ঘনীভূত হয়েছিল, আমাদের সাহিত্যও তার করালগ্রাস থেকে রেহাই পায়নি। কিছু সংখ্যক তথাকথিত 'সাহিত্যিক' আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে দুর্নীতি, অসাধুতা ও বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সৃষ্টি করে চলেছেন। অথচ তাঁদের অনেকেই উচ্চশিক্ষিত। উচ্চপদে ও মর্যাদায় সমাসীন। ... সুস্থ ও সৎ-সাহিত্য সৃষ্টির কল্যাণচিন্তায়ই সেইসব অসৎ ও অসাধু 'সাহিত্যিক'পদলোভীদের সাহিত্যিক দুর্নীতির প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ এবং সে সাথে আমাদের সাহিত্যজগতে সুস্থতা, সততা ও স্বচ্ছতার পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্যই আমাদের এই বিশেষ সংখ্যার উদ্দেশ্য। —এই ধরণের অভিযোগ আগেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়—আরও অভিযোগ হয়তো আছে—কিন্তু কোন লেখক প্রতিবাদ করেননি"।[১৩৭]

'যাঁরা জাতিরই খেয়ে পরে সে-জাতিরই ধ্বংস সাধন কার্যে লিপ্ত রয়েছেন..... জাতির যাঁরা চিন্তাবিদ, লেখক ও অধ্যাপক ; এবং যাঁরা নানারূপ শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংস্থার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাঁদের কার্যকলাপে, চিন্তাধারায় ও মত প্রকাশের বাধানিষেধ সম্পর্কে কুদরুতুল্লাহ শাহাবের (লেখক সংঘের 'লেখক ও তাঁর স্বাধীনতা' শীর্ষক) প্রবন্ধের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বেনজীর আহমদ বলেন : 'লেখক কোনক্রমেই আইনের উর্ধে নন। তিনি একদেশে থাকবেন অথচ অন্যদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবেন—এ কিছুতেই হতে পারেনা। তিনি একমত প্রচার করবেন অথচ অন্য মতবাদানুযায়ী জীবন-যাপনের কবি-সুলভ স্বাধীনতা নেবেন—এও চলতে পারেনা'।[১৩৮]

মতিনউদ্দীন আহমদ ১৩৬৭ সনের ঈদ সংখ্যায় লিখেছিলেন 'পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের বর্তমান ধারা ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ। এতে তিনি বলেন : বেশী করে উর্দু, আরবী, ফার্সী শব্দ বাংলায় প্রবেশ করালে উর্দুভাষীরা বাংলার স্বাদ গ্রহণে সক্ষম হবে এবং দ্রুত নৈকট্য আসবে। কারণ, "কোরাণ মজিদ পড়তে গিয়ে প্রত্যেক বাঙ্গালী মুসলমান লেখকের আরবী হরফের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায় ... কিছু উর্দু পড়ে ফেলতেও পারেন।... এই সুবিধা উর্দু দানিশগণের নাই।... বাংলাভাষী উর্দুতে কথা বলেন... উর্দুর সঙ্গে মোহারেবা আরো ভালো হয়ে উঠে, অথচ অপর পক্ষের বাংলা শেখা হয়ে উঠেনা। এই সব কারণে বাংলাভাষী যত সহজে উর্দু শিখে নিতে পারেন, উর্দুভাষী তত সহজে বাংলা শিখতে পারেন না। তাঁদের বেশীর ভাগই বাংলা শেখার দিকে মোটেই খেয়াল করেন না। রাইটার্স গিল্ডের বদৌলতে উর্দু ও বাংলা ভাষার লেখকগণ এক মহফিলে এসে বুক মিলিয়েছেন। তাঁরা যেন উর্দু ও বাংলা ভাষার দিলকেও তেমনি এক করে দেন, তাঁদের খেদমতে এই আমার আরজ।" তিনি উর্দু ও বাংলা ভাষার পত্র-পত্রিকাতে উর্দু ও বাংলার তর্জমা প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তর্জমার সময় "সহজবোধ্য শব্দগুলোকে' মূলরূপে রেখে প্রকাশ করলে 'উভয় ভাষার ভাণ্ডারেও নতুন নুতন শব্দ এসে জমা হতে থাকবে।' তিনি বলেন, আজাদীর পর প্রধান লেখকেরা "খুব বেশী কিছু দান করেন নি।" পরবর্তীদের নিকট থেকেই আশা করা হচ্ছে। তিনি বলেন 'প্রবীণরা জিন্দেগীর বন্দোবস্তেতেই ব্যস্ত। সওগাতে আবদুল গনি হাজারীও প্রবীণ সাহিত্যিকদের অসৃষ্টিশীলতার অভিযোগ করে বলেছিলেন, প্রবীণরা পাকিস্তান হাসিল করে স্বাধীন রাষ্ট্র থেকে নানানভাবে সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করার ধান্ধায় অন্ধ হয়ে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছেন, মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁরা কেউ মন দিতে প্রস্তুত ছিলেন না।[১৩৯]

মতিনউদ্দীন আহমদের 'পাকিস্তানী' ভাষা সৃষ্টির প্রস্তাবমূলক উপর্যুক্ত রচনাটির আদর্শ পাকিস্তানবাদী পত্রিকা নওবাহার, মাহেনও এর অনুরূপ। কিন্তু এই প্রবন্ধে প্রবীণদের সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে প্রবীণের সঠিক উক্তি খুব মূল্যবান। এর সঙ্গে সঙ্গতি আছে তরুণদের অভিযোগের বা মূল্যায়নের। সেযাইই হোক, মতিনউদ্দীন আহমদ ছিলেন পত্রিকার প্রধান উপদেষ্টা। তাঁর রচনা না-ছেপে উপায় ছিল না। তবে তাঁর সহযোগিতায় এবং স্নেহানুকূল্যে যে সাহিত্য বের হতে পেরেছিল—তাতে জনগণের স্বার্থের সপক্ষে অনেক বক্তব্য আছে এবং তার বহুলাংশই অসাম্প্রদায়িক ও প্রকৃত সৃষ্টিশীল সাহিত্যের প্রত্যাশী। পত্রিকার অলংকরণ, চিত্রণ, রুচিশীল ছিল। বিভিন্ন সময় তাঁরা নানান ভালো প্রেস থেকে কভার ছেপে নিতেন, আর আঁকাতেন ভালো শিল্পীদের দিয়ে। ১৯৬১ তে ত্রিশজন খ্যাতনামা লেখকের ছবিসহ সাহিত্যের একটি 'গল্প সংকলন' প্রকাশের সংবাদ জানা যায়—কিন্তু সেই সংখ্যাটি অনুসন্ধানে পাওয়া যায়নি। প্রকাশিত হয়েছিল কিনা-কে জানে। আরও পাওয়া যায়নি প্রকাশিত অনেক সংখ্যা। কিন্তু যা পাওয়া গেছে—তাতেই 'সাহিত্য' কে একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা হিসেবে চিনে নিতে কষ্ট হয়না।

৩. যাত্রী (১৯৬০-৬২)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র (বাংলা) খোন্দকার সিরাজুল হক, তাঁর অগ্রজ খোন্দকার আমিনুল হক এবং তাঁদের সুহৃদ দ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও প্রাণজিৎ শর্মা প্রমুখ মিলে গড়ে তুলেছিলেন 'ত্রিভুজ সাহিত্য সংস্থা'। তাঁদেরই উদ্যোগে বেরিয়েছিল 'যাত্রী' নামে সাহিত্য সাময়িকী। প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছিল বৈশাখ ১৩৬৭ এপ্রিল ১৯৬০ সনে। দুবছর চলেছিল, প্রথম বছরে মাসিক এবং দ্বিতীয় বছরে ত্রৈ-মাসিক হিসেবে। যাত্রীকে কেন্দ্র করে প্রগতিশীল তরুণদের একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। কিন্তু রাজশাহীর মতো একটি মফস্বল শহর থেকে পত্রিকার প্রকাশ অব্যাহত রাখা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। কারণ শিল্পনগরী না হওয়ায় বিজ্ঞাপন সুলভ ছিলনা। ফলে অর্থনৈতিক কারণেই যাত্রীর অকাল মৃত্যু ঘটেছিল। তবে যাত্রীর সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের অনেকেই আজ সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে সক্রিয় আছেন।[১৪০]

যাত্রীর-প্রকাশক ছিলেন শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। প্রকাশস্থল সাগরপাড়া, (কোনও সংখ্যায় কুমার পাড়া) ঘোড়ামারা, রাজশাহী। সম্পাদক খোন্দকার আমিনুল হক ও খোন্দকার সিরাজুল হক. তবে বিভিন্ন সংখ্যায় কয়েকজন তরুণ সাহিত্যকর্মীর নাম সহযোগী হিসেবে ছাপা হয়। প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল তরুণসমাজে সাহিত্যচর্চার পথ সুগম করা এবং একটি সংস্কৃতি-সচেতন গোষ্ঠী গড়ে তোলা। নিউজপ্রিন্টের সাধারণ ছাপা-বাঁধাই, মানসম্মত এই পত্রিকার সাইজ ছিল ৯ × ৭ ইঞ্চি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২। ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্টিং ফার্ম থেকে মোঃ মাজেদ আলী কর্তৃক মুদ্রিত (১/৭-৮

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যার, তবে বিভিন্ন সংখ্যা বিভিন্ন প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়েছে)। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় লিখেছিলেন ঃ প্রবন্ধ—মযহারুল ইসলাম, শ্রী সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, আবুল কাশেম চৌধুরী, খোন্দকার সিরাজুল হক, শ্রী প্রাণজিৎ শর্মা, আবদুল হাফিজ প্রমুখ। স্মৃতিকথা লিখেছিলেন প্রমথনাথ বিশীর কনিষ্ঠ সহোদর প্রফুল্লনাথ বিশী। ছোটগল্প ঃ নুরউল আলম, আজিজুল হক, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, দ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অন্নদা মোহন বাগচী, আমিনুল হক, আখতার বানু প্রমুখ। কবিতা ও গান লিখেছিলেন, মযহারুল ইসলাম, আবুহেনা মোস্তফা কামাল, বন্দে আলী মিয়া, আশরাফ সিদ্দিকী, আলমগীর জলীল, আবদুল মান্নান হাওলাদার, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, আহমদ সাত্তার, হুমায়ুন খান প্রমুখ। প্রথম বর্ষ সপ্তম -অষ্টম সংখ্যায় 'সমকালীন সাহিত্য—চিন্তা' শিরোনামে প্রবন্ধ লিখেছিলেন অধ্যাপক সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়। গল্প লিখেছিলেন অধ্যাপক নূরউল আলম (ম্যাডোনা) ; অন্নদা মোহন বাগচী (তামসী) ; আমিনুল হক (ভুল) ; কবিতা লিখেছিলেন ; আশরাফ সিদ্দিকী (আমি স্বামী) ; আবু হেনা মোস্তফা কামাল (সেই ক্লান্ত নাগরিক) ; বন্দে আলী মিয়া (গান) প্রমুখ। মিলু ইসলাম লিখেছিলেন রম্যরচনা — আড্ডা ; আর রওশন আরা লিখেছিলেন 'কাশবনের কন্যা' শীর্ষক উপন্যাসের আলোচনা।

সম্পাদকীয়তে ১৯৬১ সনের ফেব্রুয়ারীর পরের চেতনা নিয়ে লেখা হয়েছিল ঃ "বস্তুত মাতৃভাষার মাধ্যম ব্যতীত কোন শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা হতে পারেনা, অপরপক্ষে সে শিক্ষা পোষাকী হয়ে দাঁড়ায়.... আমরা বাংলাভাষার উত্তরোত্তর বিকাশ ও সমৃদ্ধি কামনা করি।' সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় পাকিস্তানী নাগরিক হিসেবে পাকিস্তান অর্জনের পর দেশের প্রেক্ষাপটে পাক-বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির পক্ষেই মত দেন। তিনি সাম্প্রদায়িক সাহিত্যিক ধ্যানধারণায় সম্পর্কের পরিচয় দেন। "একথা অস্বীকার করে কোন লাভ নেই যে পূর্ব পাকিস্তানের বিরাট জনশ্রেণীর সঙ্গে সে সাহিত্যের (পাক-পূর্ব বাংলা) আত্মীয়তা যতটা ছিল মৌখিক, ততোটা আন্তরিক ছিলনা.... বিশেষ করে সংখ্যাগুরু মুসলমানের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের বিশেষ কোন পরিচয়ই সে-সাহিত্য বহন করতো না। ফলে এদেশের জনজীবনে সে সাহিত্যের প্রসার খুব বেশী ঘটেনি।" তাঁর আলোচনার মূল কথা ছিল—পাকিস্তান অর্জনের পরে তা হয়েছিল। 'পাকিস্তানের জনসাধারণের জন্য বিশিষ্ট এক সাহিত্যসম্পদ গড়ে তোলার একটা প্রচেষ্টা সর্বত্রই লক্ষণীয়।' তাঁর লেখায় এদেশের সাহিত্যের তিনটি ধারা-১. ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের (মুসলিম নবজাগরণের আন্দোলন এঁদের মূল প্রেরণা হলেও) রচয়িতা গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ, মুফাখখারুল ইসলাম, তালিম হোসেন প্রমুখ মূলত পুনরুজ্জীবনবাদী— Revialist. ২. ইসলামী আদর্শ মূলভিত্তি, কিন্তু আধুনিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে রেনেসাঁসপন্থী যুগসচেতন মুসলমান। ৩. ধর্মীয় চিন্তাধারার গণ্ডীতে বদ্ধ দেখতে চাননা—যুগধর্মই তাঁদের সাহিত্যের চিন্তার নিয়ামক। পরিপার্শ্ব সচেতন, পুরাতন ঐতিহ্যকে বড় করে দেখতে নারাজ, হিন্দুসৃষ্ট বাংলা সাহিত্যকে সমগ্ররূপ বলে মানেন না, সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী ঐতিহ্যবাদী সম্পূর্ণ আলাদা ধারার সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসকেও পূর্বপাকিস্তানী সাহিত্যের যথার্থ প্রতিনিধিত্বমূলক ধারা বলে মেনে নিতে প্রস্তুত নন। এঁদের বক্তব্য হচ্ছে ঃ "সম্প্রদায় ও বহুবিচিত্র ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার অধিকারী মনুষ্য অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি আনতেই হবে, সেখানে হিন্দু মুসলমান বড় নয়, এদেশের মানুষই বড়। এঁরা সাহিত্যে ইসলামের দৈন্য মোচনের প্রয়োজনীয়তার উপর খুবই জোর দেন, কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের দাবীকে প্রাসঙ্গিক মনে করেন না। এঁরা নবজাগরণের মন্ত্রকে গ্রহণ করেছেন—সংস্কারমুক্তির বাণীরূপে। এঁরা অধিকাংশ তরুণ—শিক্ষিত, আধুনিক, পাশ্চাত্য সাহিত্য জানেন, প্রাচীন ও আধুনিক ঐতিহ্য সমভাবে গ্রাহ্য করেছেন, ধর্মীয় অপেক্ষা, জীবনের বিচিত্র দিকে (সাহিত্য, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, রাজনীতি) এঁদের ঝোঁক—আহসান হাবীব, শওকত ওসমান, শামসুর রাহমান, আলাউদ্দীন আল আজাদ, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, আবু ইসহাক, সরদার জয়েনউদ্দীন প্রমুখ এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এদেশে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদী সাহিত্যিকও আছেন—যেমন জসীমউদ্দীন, বন্দে আলী মিয়া ইত্যাদি'।[১৪১]

৪. সুন্দরম্ (১৯৬৩-৬৪)

এই কালের (১৯৪৭-৭১) তরুণদের সাহিত্য-প্রয়াস হিসেবে নানাকারণেই 'সুন্দরম' উল্লেখযোগ্য। ষাটের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে সমবেত হয়েছিলেন কোথা থেকে, কিভাবে জানিনা, বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিজগতের উজ্জ্বল সব ব্যক্তিরা। এই বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকেরা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ করে (সেপ্টেম্বর ১৯৬৩) পাকিস্তান আমলের পাক-বাংলা সংস্কৃতির বিপক্ষে প্রতিরোধে সোচ্চার হয়েছিলেন, আর দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন বাঙালি-সংস্কৃতির, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের খাঁটি নিদর্শনসমূহ। এইকালে, ঐ বিভাগের ছাত্রদের দ্বারাই প্রকাশিত হয়েছিল 'কবিতা' পত্রিকার অনুসরণে বাংলাদেশের শুধু কবিতাবিষয়ক ম্যাগাজিন 'স্বাক্ষর' এবং 'পূর্বলেখ'। আর ষাটের দশকের আলোড়নসৃষ্টিকারী 'কণ্ঠস্বর' পত্রিকাও বেরিয়েছিল প্রধানত এই বিভাগের ষাটের দশকেরই একদল শিক্ষার্থীর উদ্ভাবনী উদ্যোগে। 'পলিমাটি'র তরুণতর সংস্কৃতিসেবীদের অধিকাংশ এই বিভাগেরই ছাত্র। এ কিসের ফল? সমকালীন দেশ কাল সমাজ এবং মানুষের সার্বিক জীবনভাবনারই দ্যোতক এগুলো। নতুন সুখী-সুন্দর সমাজ এবং সৃষ্টিশীল আধুনিক সাহিত্য রচনার স্বপ্নকামনা জাগ্রত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে যুগেরই প্রভাবে। বাংলা বিভাগের ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ উদযাপনের সমকালে অধ্যয়নরত ছাত্রদের সর্বকনিষ্ঠ দলের উদ্যোগে গঠিত 'সুন্দরম্ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংস্থা'। এঁদের প্রিয় জীবনবেদ ছিল এই শাশ্বত উক্তি - সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। সুন্দরম্-গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে যে সংকলনটি প্রথম বের হয় (আগস্ট ১৯৬৩) তাতে অবশ্য কেবল তরুণদের উচ্ছাস ও আবেগই ব্যক্ত হয়নি। প্রবীণ চিন্তকদের সমাজ-ঘনিষ্ঠ বক্তব্য বা চিন্তাসংবলিত রচনাও তাতে গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হয়েছিল। ফলে স্বাক্ষর-কণ্ঠস্বর ইত্যাদির তরুণ উদ্যোক্তাদের থেকে স্বতন্ত্র বোধের পরিচয় সুন্দরম্-এ পাওয়া যায়। এঁরা বিশ্বাস করতেন কেবল তারুণ্য ও আবেগ দিয়ে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়। এর সঙ্গে প্রয়োজন প্রবীণের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সংযোগ। ইমরুল চৌধুরী, রফিক আজাদ, ফারুক আলমগীর, আহমদ ছফার মতো তরুণতর লেখকদিগের সঙ্গে 'সুন্দরম্' এ ছাপা হয়েছে তাই ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব, ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের ন্যায় প্রবীণদের চিন্তাপ্রধান রচনাবলী।

'সুন্দরম' এর তিন–চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হলেও সবগুলো সংখ্যার কপি পাওয়া যায়নি। প্রাপ্ত প্রথম সংখ্যার তথ্যানুযায়ী এর সম্পাদক ছিলেন আবুল কাসেম ফজলুল হক (তখন আ. কা. ম. ফজলুল হক লেখা হত)। তিন রঙের সুন্দর প্রচ্ছদটি এঁকেছিলেন কাজী গোলাম মোস্তফা। প্রচ্ছদের সঙ্গে পরিচ্ছন্নরুচির সঙ্গতি রক্ষা করা হয়েছিল মুদ্রণ–সৌকর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও। মুদ্রণত্রুটি তুলনামূলকভাবে ঐকালের অন্যান্য পত্রিকা থেকে কম, চোখেপড়ার মতো নয়। ঐ কালের আর দশটি পত্রিকা থেকে এর স্বাতন্ত্র্য সহজেই যেকারো চোখে পড়বে। ঐ সময়ে এদেশ থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল ঐকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যপত্রিকা 'সমকাল'। এর ছাপা, কাগজ, প্রচ্ছদ ও সম্পাদনার বৈশিষ্ট্য উন্নত রুচির ও উন্নত চিন্তার সকলকে আকৃষ্ট করেছিল। এর প্রভাব সৃজনশীল সাহিত্যপ্রয়াসে দুর্লক্ষ নয়। সুন্দরম্–এর উদ্যোগী তরুণদের আদর্শও কি ছিল সমকাল?

'সুন্দরম' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাংস্কৃতিক সংগঠন ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন একালের প্রখ্যাত কিছু ব্যক্তি : রফিক আজাদ, মালেকা বেগম, আহমদ ছফা, বুলবুল খান মাহবুব, রশীদ আল–ফারুকী, কিস্ওয়ার জাহান প্রমুখ বাংলা বিভাগের তখনকার ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। অন্যান্য বিভাগের উৎসাহী ছাত্রছাত্রীদের সংশ্লিষ্টতাও ছিল এর সঙ্গে। মানবতাবাদী দার্শনিক, শহীদ ডঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮–১৮৯৪) 'উদরদর্শন' শীর্ষক প্রবন্ধের অনুসরণে (বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিলের প্রভাবে। ডঃ দেব নোট দিয়েছেন ঃ বঙ্কিম মিলের ইউটিলিটারিয়ানিজমের নাম দিয়েছিলেন উদরদর্শন। মিলের মতে ব্যক্তির নিজের সুখের জন্যেই বহুজনের সুখসন্ধান তার অপরিহার্য কর্তব্য। —কমলাকান্তের দপ্তর দ্রষ্টব্য) লিখেছিলেন 'আলু দর্শনের ভূত ও ভবিষ্যৎ'। এতে তিনি সমকালীন সভ্যতার ভাববাদ ও বস্তুবাদের বিরোধের সরস বর্ণনা দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে ভাববাদ ও বস্তুবাদের সংশ্লেষণে গঠিত নতুন জীবনদর্শনের আশ্রয়েই মানবজাতির সভ্যতার সঙ্কট কাটতে পারে। এই দর্শন কে সরসভঙ্গিতে তিনি 'আলুদর্শন' নামে অভিহিত করেছিলেন। দর্শন আলোচনায় ভাষার সাহিত্যসম্পদও কি অনন্য–সুন্দর ঃ "বঙ্কিমচন্দ্রের উদরদর্শন যাঁরা পাঠ করেছেন, আলু–দর্শন নাম শুনে তাঁরা চমকে যাবেন না আশা করি। উনিশ শতকের শেষের দিকে এই উদার বাস্তববাদী জীবন–দর্শন মানুষের মনে যে আশার সঞ্চার করেছিল, দুঃখের বিষয় তা আজ নস্যাৎ হতে চলেছে। এই খাদ্যাভাব ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিনে অনেক অনুন্নত দেশে উদরদর্শনের পরিণতি হতে চলেছে উদর দংশনে। এই দংশন থেকে অব্যাহতি পাবার মহৌষধ নিহিত রয়েছে নবআবিষ্কৃত আলু–দর্শনে।' [১৪২]

ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের প্রবন্ধের নাম 'শিক্ষকের দায়িত্ব'। তিনি যথার্থই লিখেছিলেন ঃ 'আমার বিশ্বাস, যা অজ্ঞাত এবং রহস্যময় তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে শিক্ষকের এমন কতকগুলো দায়িত্ব রয়েছে যা কোন যন্ত্রপাতি দ্বারা পালন করা সম্ভব নয়। শিক্ষক যে সমবেদনা এবং অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে শিক্ষার কার্য করেন, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির মধ্যে তার সন্ধান করা বাতুলতা।'[১৪৩]

লেখকদের মধ্যে আর যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হলেন ঃ শামসুল আলম চৌধুরী, আবুল কাসেম ফজলুল হক, আল মাহমুদ, কামরুল আহসান, রফিক আজাদ, আবদুস সাত্তার, রফিক ইসলাম, ইমরুল চৌধুরী, মালেকা বেগম, দিলারা রহমান, শাহ ফজলে রাব্বি, আবিদুর রহমান, রশীদ আল ফারুকী, আহমদ ছফা, ফারুক আলমগীর প্রমুখ।

শামসুল আলম চৌধুরী তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রভাষক। তাঁর প্রবন্ধের নাম 'রবীন্দ্রনাথ ঃ উত্তরকাব্যে ইমেজ ও উক্তি।' এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চ থেকে শেষ লেখা পর্যন্ত কাব্যসমূহের আলঙ্কারিক বিশ্লেষণ আছে। আবুল কাসেম ফজলুল হকের 'আমাদের জাতীয় সমস্যার একদিক' শীর্ষক প্রবন্ধে পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় সংহতির সমস্যা ও পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে। পূর্ব বাংলার জনগণের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বিকাশের সুযোগ না থাকলে পাকিস্তানের সংহতিতে বিপত্তি ঘটবে। তাঁর প্রবন্ধে বাঙালী চরিত্রের দুর্বলতার কারণ ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং জাতীয় শক্তি অর্জনের জন্য উন্নত জাতীয় চরিত্র অর্জনের আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। "আমাদের ভাবনা ভাবতে হবে আমাদেরকেই। অদৃশ্য নিয়তির হাতের ক্রীড়ানক হয়ে যদি এখনও আমরা আমাদের বহু যগের সংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করতে না পারি, তবে আমি কামনা করি–- যত শীঘ্র পৃথিবী থেকে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই ততই মঙ্গল। ... আর বাঁচতে যদি আমাদের হয়ই, তবে নামেমাত্র পাকিস্তানী অথচ স্বভাবে সেই চিরদুর্বল বাঙালী হয়ে বেঁচে থাকা কোন যুক্তিতেই উচিত নয়।"

কবি আবদুস সাত্তার–এর 'সে এক নারীর প্রেম' উৎকৃষ্ট কবিতা। কবি হিসেবে রফিক আজাদ তখনও পরিচিতি লাভ করেনিনি। তরুণ রফিক আজাদ লিখেছিলেন 'জনৈক প্রেমকাতর যুবকের সম্ভাব্য বক্তব্য'। রফিক আজাদের কবিতায় তখনকার সামাজিক হতাশার সুস্পষ্ট প্রকাশ আছে। তাঁর কবিতার কয়েকটি পংক্তি ঃ

"জ্যোৎস্নার বিখ্যাত ভিতরে আমারও একদা যাতায়াত ছিল/ অবিশ্বাস্য অলৌকিক জ্যোৎস্নায় আবার ফিরিব কি?/ ফিরিবার বাসনা প্রবল, অথচ পথ জানা নেই। অন্ধকার অন্ধকার ; — চৌদিকে অন্ধকার ব্যতিরেকে অন্য শব্দ/ মর্গাশ্রিত। বিষন্নতা ছাড়া দ্বিতীয় রাস্তা নেই কোন।/ এ সর্বগ্রাসী বিষণ্ন ইতর অন্ধকার থেকে বুঝি আর/ মুক্তি নেই। সকলেই মুখোমুখি একেকটা সুতীক্ষ্ম চীৎকার ছুঁড়ে দেয়। জনে জনে ব্যক্তিগত শিল্পকথনে ক্রমাগত/ অন্ধকার জনিত দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।"

কবি আল মাহমুদের 'তৃষ্ণার ঋতুতে' শীর্ষক কবিতার কবিতা কাব্যপ্রেমিকদের আনন্দ দিয়েছিল। তিনি তখন আধুনিক কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর কবিতার কটি চরণ — "শুধু কি ধূলোর পথ? কত দূর যাব আর হেঁটে/ এও তো রৌদ্রের দিন, ঝকমকে পিপাসার ঋতু/ জীবিকা বিজয়ী প্রাণ আজ যেনো মনে হলো ভীতু/ বিন্দুও পাবেনা আর ব্যর্থ জিভে জলপাত্র চেটে। / মায়ের দেহের মতো চিরচেনা এই সে শহর।"[১৪৪]

'শনিবারে নয়' আহমদ ছফার প্রথম পর্যায়ের মুদ্রিত লেখাসমূহের একটি। পরবর্তীকালে কথাসাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। আবিদুর রহমান এই কালের পত্রপত্রিকায় অনেক লিখেছেন, দেখতে পাওয়া যায়। তিনি সুন্দরমে 'ছায়াবৃত্ত' নামে একটি দীর্ঘ ছোট গল্প

Dhaka University Institutional Repository

লিখেছিলেন। সাদাত হাসান মান্টোর গল্প 'একটি অবচেতন মুহূর্ত' অনুবাদ করেছিলেন রশীদ আল ফারুকী। সমারসেট মম থেকে 'সেই লোকটি' নামে গল্প অনুবাদ করেছিলেন ফারুক আলমগীর।

তরুণ সাহিত্যপ্রয়াসীদের সংকলন ছিল সুন্দরম। কিন্তু এটি কেবলই তারুণ্যজাত ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদ ছিলনা, আবেগও ছিলনা কেবল, সাহিত্য-শিল্প ও সমাজনিষ্ঠচিন্তার সম্পদেও তা সমৃদ্ধ ছিল। পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোতে পূর্ব বাঙলার স্বতন্ত্র জাতীয় -চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে এর রচনাবলীর চেতনাগত নির্যাসে। সম্পাদকীয়তে উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখা হয়েছিল ঃ

'তরুণ প্রাণের কর্মস্পৃহা আমাদের মনে সঙ্কলন প্রকাশ করার প্রবণতা জাগিয়েছিল। সম্প্রতি প্রকাশিত অসংখ্য সাময়িকী ও সঙ্কলন বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক মানসের পরিচয় বহন করে। আমাদের চিন্তা-ভাবনাকেও প্রকাশ করে আমাদের মধ্যে যেটুকু সাংস্কৃতিকচেতনা ও সৃজনক্ষমতা রয়েছে তার বিকাশ সাধন করব — এ-উদ্দেশ্য নিয়েই বিভিন্ন সময়ে সঙ্কলন প্রকাশ করার ইচ্ছা আমাদের। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন আজ বিপর্যস্ত। এ শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সব অনগ্রসর দেশের বেলায়েই একই কথা। শিল্প সাহিত্য শুধু মানবজীবনের এবং ব্যক্তিমানসে বাহ্যশক্তির, প্রতিক্রিয়ার প্রতিচ্ছবি হিসাবেই আজ বিচার্য নয়। অর্থনৈতিক চাপের ফলে জীবনের সম্ভাবনা ব্যাহত হতে থাকলে ব্যক্তির মনে যে প্রতিক্রিয়া সূচিত হয়, তাই যেন আজ সাহিত্যে সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিতে চাইছে। কারণ বৃহত্তর গণজীবনের সমগ্র সত্তাকে আজ ঐ একটি জিনিসেই জড়িয়ে আছে। সমস্যাকে শুধু তুলে ধরার প্রবণতাই সর্বক্ষেত্রে প্রবল দেখতে পাচ্ছি। সমাধানের প্রতি ইঙ্গিতও আমরা আশা করব বাঙলা সাহিত্যে। সুন্দরম আমাদের প্রথম প্রচেষ্টার ফল। আমাদের পূর্বসূরীদের লেখাও এতে সংযোজিত হয়েছে। একে সুন্দর করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। তবু যদি কারও চোখে অসুন্দর কিছু ঠেকে তবে তাঁর কাছ থেকে আশা করব ক্ষমাসুন্দর সহানুভূতি।'

সুন্দরম এর প্রকাশক ছিলেন, সংস্থার পক্ষে মুহাম্মদ সাদুল্লাহ, বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাক শাহ ফজলে রাব্বী। কাজী মামুনুর রশীদ কর্তৃক দি মোনালিসা ফাইন আর্ট এণ্ড প্রিন্টিং প্রেস, ৫৫ পাতলা খান লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অর্থ সংগৃহীত হতো। এব্যাপারে পত্রিকা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছিল জনাব রেজা আলী, দিলারা রহমান, হাবিবুল ইসলাম ভূঁয়া, রফিক আজাদ, এ. টি. এম. হাসান, শওকত আলম সিদ্দিকী, কাজী মানুনুর রশীদ, বুলবুল খান মাহবুব, নুরুল ইসলাম, কিসওয়ার জাহান, এস. এম. ফরিদ, কামরুল হুদা প্রমুখের প্রতি।

'সুন্দরম' নামে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ফেরদৌস সাজেদীনের সম্পাদনায় ১৯৭২-৭৫ সময়কালে পাঁচ-ছয়টি সংকলন প্রকাশিত হয়।তবু অনন্তজার্গে নামে ফেরদৌস সাজেদীনের একটি উপন্যাসের ভূমিকায় আবুল কাসেম ফজলুল হক লিখেছেন ঃ " মনে পড়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ... ফেরদৌস সাজেদীন 'সুন্দরম' নামে একটি সাহিত্যপত্রিকা কিছুকাল ধরে প্রকাশ করেছিলেন।' কিন্তু এই 'সুন্দরম'ও আজ দুষ্প্রাপ্য।

৫. স্বাক্ষর (১৯৬৩-৬৬)

চার বছরে মাত্র চারটি সংকলন প্রকাশিত হলেও সাহিত্যিক ও সামাজিক অগ্রগতির ইতিহাসে 'স্বাক্ষর' - এর ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। সাতচল্লিশের পরে একাত্তর পর্যন্ত এদেশ থেকে নিছক কবিতার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি পত্রিকার অভাব কোন প্রতিষ্ঠিত কবির দ্বারা পূর্ণ হয়নি। তাছাড়া তখনকার সৃষ্টিমুখর 'সাহিত্যউন্মাদ'-তরুণেরা তাদের প্রবল সৃষ্টি-আকাঙ্ক্ষার বাহন নির্মাণ করতে গিয়ে স্বাক্ষর প্রকাশ করেছিলেন। 'স্বাক্ষর গোষ্ঠীর' তরুণেরাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের ছাত্র। তাঁদের উচ্চাশা ছিল গগণচুম্বী। তাই উদ্যোগ নিয়েছিলেন 'স্বাক্ষর প্রকাশনী'র পক্ষ থেকে পরে-পরে বিচিত্র বিষয়ের সমন্বয়ে নানান পত্রিকা প্রকাশের। 'স্বাক্ষর' এর দ্বিতীয় সংকলনের একটি বিজ্ঞাপনে বলা হয় ঃ 'ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকা কণ্ঠস্বর' প্রকাশিত হবে ইমরুল চৌধুরী ও রফিক আজাদের সম্পাদনায়। 'ত্রৈমাসিক গল্পপত্রিকা শব্দরূপ' প্রকাশিত হবে শহীদুর রহমান ও আসাদ চৌধুরীর সম্পাদনায়। মাসিক সমালোচনা পত্রিকা 'বক্তব্য' প্রকাশিত হবে চিত্ত হালদার ও মোহাম্মদ মোজাদ্দেদ এর সম্পাদনায়। ত্রৈমাসিক প্রবন্ধ পত্রিকা 'সূচীপত্র' প্রকাশিত হবে প্রশান্ত ঘোষাল ও আফজল চৌধুরীর সম্পাদনায়। 'কণ্ঠস্বর', 'বক্তব্য' ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু অন্য সম্পাদকেব নামে ও নেতৃত্বে। 'সাম্প্রতিক' নামে 'তরুণতম লেখকদের একমাত্র ব্যক্তিগত সাময়িকী' প্রকাশের একটি বিজ্ঞাপনও ছাপা হয়েছিল স্বাক্ষরের তৃতীয় সংকলনে। এবং সত্যিই একটি সংকলন তখন (১৯৬৩-৬৫) প্রকাশিত হয়েছিল।[১৪৫] এগুলোর ইতিহাসও একালের সমালোচকদের দ্বারা (ঐসব পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কবি-সাহিত্যিক, যাঁরা একালে প্রতিষ্ঠিত লেখক) উন্মোচিত হয়ে থাকে। লিটল ম্যাগাজিনের ইতিহাসে, অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে স্বাক্ষর তার উল্লেখ দাবি করে। কারণ ষাটের দশকের প্রতিনিধিত্বশীল লিটল-ম্যাগাজিনের অন্যতম— বলা চলে, পথিকৃৎদের অন্যতম স্বাক্ষর। এঁদের উদ্যোগ পটভূমি তৈরী করেছিল 'কণ্ঠস্বর' কে দীর্ঘস্থায়ী একটি সাহিত্য প্রয়াস হিসেবে স্বার্থক হতো।

আবদুল মান্নান সৈয়দ 'লিটল ম্যাগাজিন' শীর্ষক একটি আলোচনায় বলেন ঃ 'লিটল ম্যাগাজিন বৃহৎবপু নয়, জনপ্রিয় নয়, প্রাতিষ্ঠানিক নয়, সর্বার্থসিদ্ধ নয় — এমন পত্রিকা। ... লিটলম্যাগাজিন মানে তারুণ্যের বিস্ফোরণ, অপ্রাতিষ্ঠানিক চীৎকার, নূতন জ্যামিতি ও ইশতিহার। সবসময় অবশ্য চীৎকৃত নয় — শান্ত নিঃশব্দ বিস্ফোরণও কখনো। সবসময় অবশ্য তরুণদের হাতে নয় - বৃদ্ধ কিন্তু অপ্রতিষ্ঠিত বা অস্বীকৃত অথবা বিদ্রোহী লেখকদের প্রযোজনায়ও। কিন্তু লিটলম্যাগাজিনের আত্মায় মিশে আছে বিদ্রোহ। লিটলম্যাগাজিনের সম্পাদক ও তার দুচারজন মূল লেখকের রক্তে বিদ্রোহের তেজ ও জোশ আদীপ্র প্রজ্জলন্ত না থাকলে সে লিটল ম্যাগাজিন থাকেনা আর। প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠানলোলুপ সম্পাদক বা লেখক দিয়ে লিটলম্যাগাজিন হয়না। আপাতবিদ্রোহী বা ছদ্মবিদ্রোহীদের দিয়েও হয়না। লক্ষহীন লেখকদের দিয়েও হয়না। তার মানে প্রত্যেকটি প্রকৃত লিটলম্যাগাজিনের একটি নিজস্ব চরিত্র থাকে, বক্তব্য থাকে, লক্ষ্য থাকে; কিন্তু বক্তব্য বা লক্ষ্য, আদর্শ বা উদ্দেশ্য দিয়েই আবার লক্ষ্যভেদ করা যাবেনা। তার সাহিত্যিক চরিতার্থতা চাই।'[১৪৬] ডঃ জিল্লুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্দিকী একটি 'চিঠি'তে পত্রিকার চারিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রকারভেদ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। লিটলম্যাগাজিন প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ ' পশ্চিম মুলুকে— আপাতত: আমি বিলেতের কথা ভাবছি— Little magazine বলে আর এক জাতের পত্রিকা আছে — এদের অবয়ব ছোট, আর হাঁকডাক সেই অনুপাতে বড়। এবং প্রায় অনিবার্য নিয়মে ক্ষণস্থায়ী; এরা সাহিত্যে দুচার বৎসর অন্তরই একটা ছোট, সরব ও সৃষ্টিশীলগোষ্ঠীর মুখপত্র হিসেবে গজায়, এবং কদিন আসর জমিয়ে যেমন অতর্কিতে আসে তেমনি অতর্কিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। আমাদের বাংলা মুলুকে এর সমগোত্রীয় পত্রিকার কথা ভাবতে গেলে কল্লোলের কথা মনে আসে।'[১৪৭] লিটলম্যাগাজিনের স্টাণ্ডার্ড এর সেই বিবেচনায় মান্নান সৈয়দ গং যেসমস্ত ঐতিহাসিকতা আরোপ করে বিরাট কিছু বিদ্রোহ সংঘঠিত করে ফেলার কথা বলেন; এবং সেইসব প্রসঙ্গে 'স্বাক্ষর', 'কণ্ঠস্বর', 'সাম্প্রতিক' ইত্যাদি এবং 'লিটলম্যাগাজিন' এর উল্লেখ করে থাকেন— তাতে খুব অতিরঞ্জন আছে বলে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। কল্লোলের ভূমিকা এখনও বিতর্কিত। তবু 'কল্লোল' একটি লিটলম্যাগাজিন এর পরিমাপক হলে উপরোক্ত পত্রিকা সে তুলনায় খুবই সামান্য মূল্যের বলেই স্বীকৃত হবে। তবু পূর্ব বাংলায় 'নাই মামার থেকে কানা মামা ভাল' কথাটার চল আছে বলেই স্বাক্ষর, সাম্প্রতিক, কণ্ঠস্বর কিছুধ্বনি প্রভৃতির গুরুত্ব 'অপরিসীম'।

'স্বাক্ষর' এর প্রথম সংকলন ১৯৬৩ তে বেরিয়েছিল 'পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক কবিতা আন্দোলনের প্রথম সংকলন' হিসেবে। ১৯৬৩ সনে এদেশ থেকে অনিয়মিত হলেও প্রকাশিত হচ্ছিল মাহেনও, দিলরুবা, আল-ইসলাহ, মোহাম্মদী, সংলাপ, পরিক্রম, সওগাত, সমকাল, পূর্বমেঘ, পূবালী প্রভৃতি পত্রিকা। সাহিত্যজগতে এমনসব উচ্চমানপত্রিকাবলী থাকা সত্ত্বেও সেই সময়ের সৃষ্টিশীল আবেগকাতর প্রতিষ্ঠাপ্রত্যাশী বিদ্রোহী, ভাঙনে বিশ্বাসী এবং নিজেদের রুচি-অভিরুচি-স্বপ্নকল্পনার চরিতার্থতায় অভিলাষী তরুণেরা অস্বস্ত হয়ে উঠেছিলেন এই কারণে যে এই সমস্ত পত্রিকার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— 'ভারসাম্যময় ঐতিহ্যানুসরণকারী'। এঁরা প্রথাবিরুদ্ধতায় তেমন বিপ্লবী বেশ নিয়ে অগ্রসর হননা। তরুণেরা প্রথাগত আনুগত্যে অস্থিতিশীল। নতুন পরিবেশের প্রত্যাশী। তাই তাঁদের ঘোষণা হয় এই রকম : "একথা আজ বিনাদ্বিধায় বলা যায় যে, পূর্ববাংলার সাহিত্যের এই ক্রান্তিকালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মতো দুঃসাহসিক পত্রপত্রিকা একটাও নেই। যাও দু চারটে সাহিত্যপত্রিকা আছে, তাতে তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত মোড়লদেরই আধিপত্য। সেখানে তরুণতম অথচ নিরীক্ষণশীলদের প্রবেশাধিকার নেই। এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই তরুণতম নিরীক্ষণশীলদের মুখপত্র 'স্বাক্ষরের' আত্মপ্রকাশ। পরবর্তী সংকলন বর্ধিত কলেবরে মূল্যবান প্রবন্ধ, কবিতা, ছোটগল্প, ব্যক্তিগত বিস্ফোরণ এবং অম্লমধুর সাহিত্যালোচনা নিয়ে আগামী তিন মাসের মধ্যেই বের হচ্ছে।' স্বাক্ষরে ঘোষণা দেওয়া হয় ঃ "মানসিক পরিণতির দিক দিয়ে যারা নিকটশৈশবে বাস করছে — তেমন পাঠক-পাঠিকা, অভদ্র বিজ্ঞাপনদাতা, অসৎ এজেন্ট এবং স্বাক্ষর-গোষ্ঠী বহির্ভূত লেখকদের কোনরূপ সহযোগিতার প্রয়োজন নেই।'[১৪৮]

স্বাক্ষর-গোষ্ঠীর বাইরের কোনো-কোনো তরুণ লেখকের রচনা প্রকাশ করলেও কোনো প্রবীণের রচনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়নি। অভদ্র বিজ্ঞাপনদাতার বিজ্ঞাপনও নিশ্চয়ই তাঁরা প্রকাশ করেননি। বলা দরকার, স্বাক্ষর বিজ্ঞাপন-ভিত্তিক পত্রিকা ছিলনা। দুএকটি বিজ্ঞাপনের পয়সা আর নিজেদের গাঁট তাঁদের ভরসা ছিল। প্রথম সংকলনে একটাও বিজ্ঞাপন নেই। দ্বিতীয় সংকলনে আজিজিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা ও এফডিসি-র দুটো বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল। তৃতীয় সংকলনেও কোনো বিজ্ঞাপন নেই। চতুর্থ সংকলনে 'ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান', ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ইন্সিওরেন্স, পিকাডেলী পেপার প্যারাডাইস, মল্লিক ব্রাদার্স, দিলদার, হোমিও হল, ইনাস করপোরেশন, ইস্টার্ণ ফেডারেল ইউনিয়ন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, এবং অলিমপিয়া জুয়েলার্স এর কয়েকটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল। পয়সা ঠিকমতো পাওয়া গিয়েছিল কিনা সেটাই প্রশ্ন। তবে অনেক বিজ্ঞাপনদাতা তখন এবং এখনও লিটলম্যাগাজিন বা সাহিত্যপত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিল ঠিকমতো পরিশোধ করেননা বলে রেওয়াজ আছে। 'সুন্দরম'এ বেশ কিছু বিজ্ঞাপন ছাপাহলেও সবগুলোর পয়সা পাওয়া যায়নি বলে সম্পাদক জানিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে বড় ব্যতিক্রম বোধ হয় 'উত্তরণ'। অসংখ্যা বিজ্ঞাপন ঐ পত্রিকায় রুচিশীল ভাষায় শিল্পসম্মতরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। এবং ঐ পত্রিকার সম্পাদক বিজ্ঞাপনের পয়সা না-পাওয়ার কথা বলেননি, আর বিজ্ঞাপন ভালোই পেতেন বলে জানিয়েছিলেন।

স্বাক্ষরের ঘোষণা ছিল যে তিনমাস অন্তরে পরবর্তী সংকলন প্রকাশিত হবে। কিন্তু চার বছরে চারটি প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় সংকলন ১৯৬৫ তে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংকলন প্রকাশের তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। মাঝখানে ১৯৬৪তে এবং পয়ষট্টি-পরবর্তী কালে চতুর্থ সংকলন ছেষট্টিতে প্রকাশিত হয়েছিল বলে ধরে নিতে হবে। স্বাক্ষর কবিতাপত্রিকা, বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা'র প্রভাব এঁদের ওপর সুস্পষ্ট। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকার কথা এঁরা নানান আলোচনার উচ্চারণ করতে খুব পছন্দ করেন। এবং এঁদের দাবি যে 'কবিতা'র পূর্ববঙ্গীয় উত্তরসুরী 'স্বাক্ষর' 'কণ্ঠস্বর' প্রভৃতি। কিন্তু প্রথম সংকলনে কেবল 'কবিতা' ও কবিতা-বিষয়ক রচনা ছাপা হলেও ঘোষণায় তাঁরা গল্প ইত্যাদি ছাপবেন বলে জানিয়েছিলেন।

তবে গদ্যে কিছু রচনা আছে, সেগুলোকে তাঁরা নিরীক্ষাধর্মী গল্প বলতে চাইলেও প্রকৃতপক্ষে তা শিল্পগুণসম্পন্ন কিছু হয়নি এবং এইগোষ্ঠীর তরুণেরা কবি হিসেবে উত্তরকালে প্রতিষ্ঠিত হলেও গল্পকার হিসেবে স্বার্থকতা লাভ করেননি।

রফিক আজাদ ও সিকদার আমিনুল হক প্রথম সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন। প্রকাশক ছিলেন সিকদার মোসাদ্দেকুর রহমান এবং প্রশান্ত ঘোষাল ১৫০ জগন্নাথ হল, ঢাকা থেকে। মুদ্রাকর ঃ কে. এম. আহমেদ, অভিযান প্রিন্টিং হাউস, ৫৪ আগামসি লেন, ঢাকা-২। দাম পঞ্চাশ পয়সা। কোনো প্রচ্ছদকারের নাম লেখা ছিলনা। তেমন জমকালো প্রচ্ছদও নয় তাঁদের। সাদা সিম্পলকাগজে লেখকদের নাম ১৮ পয়েন্টে অক্ষরে সাজিয়ে কবিতার স্তবকের মত করা হয়েছিল। পিছন কভারে সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছিল। দেখতে তিন স্তবকের একটি কবিতার মতো। প্রথম কবিতার লেখক ইমরুল চৌধুরী। তারপর সিকদার আমিনুল হক, রফিক আজাদ, আসাদুল ইসলাম চৌধুরী, অশোক সৈয়দ, শহীদুর রহমান, মুশফিকুর রহমান, বুলবুল খান মাহবুব ও প্রশান্ত ঘোষাল, কাজী সিরাজ, আর মফিজুল আলম।

স্বাক্ষরের পরিচিতিরূপে পরবর্তী সংকলনে লেখা ছিল— 'পূর্বপাকিস্তানের তরুণতম কবি ও বুদ্ধিজীবীর সাম্প্রতিক রচনাবলীর দ্বিতীয়

Dhaka University Institutional Repository

সংকলন'। এখানে 'বুদ্ধিজীবী' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। ষাটেরদশকে এদেশে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকাই এমন শব্দ প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিস্তৃত ব্যাখ্যা করলে নানা মনস্কতার পরিচয় উদঘাটন করা সম্ভব হবে, কিন্তু এখানে তার প্রয়োজন নেই। স্বাক্ষর একক সম্পাদকদের পত্রিকা ছিল না। দ্বিতীয়টির সম্পাদনায় ছিলেন ইমরুল চৌধুরী ও প্রশান্ত ঘোষাল। স্বাক্ষর প্রকাশনার পক্ষে আসাদ চৌধুরী এটি প্রকাশিত করেন এবং তাঁর দ্বারাই শাহজালাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস ৯৭/২ সিদ্দিক বাজার, ঢাকা-২ থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। প্রচ্ছদশিল্পীর নাম এবারে ছাপা হয় : আশীষ চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৬৪। দাম ৫০ পয়সা। সকল সংখ্যার সাইজই ১/১৬ ডাবল ডিমাই সাদা কাগজ, কোনোকোনোটার মান আরও উন্নত। দ্বিতীয়টির প্রচ্ছদ রুচিসম্মত, রচনাবলী মোটামুটি পরিচ্ছন্ন পঠনোপযোগী ছিল। কিন্তু প্রবীণ কবিসাহিত্যিকেরা এর ভাষা ও বক্তব্য অনুধাবনে অপারঙ্গম ছিলেন (দুর্বোধ্য?)। কল্লোলের যেমন বিরূপ সমালোচনা ছিল, এঁদের এবং এঁদের গ্রুপের কণ্ঠস্বর ও অপরাপর পত্রিকাগুলোকেও তেমনি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তবে মাত্রাগত প্রভেদ অবশ্যই রয়েছে। এঁরা বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে একটা নতুনত্ব সৃষ্টির প্রয়াস পেলেও তেমন কিছু করেননি বাংলাসাহিত্যে, তবে হাতেখড়ি দেবার জন্য, নিজেদের স্বকীয় আবেগের মুক্তি সাধনের জন্যে, স্বাধীনতাভোগের জন্যে স্বাক্ষরের উদ্যান কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। বিদ্রোহ, বিক্ষোভ এবং কবিতার কাঠামো, ছন্দ, রূপক ইত্যাদি অলঙ্কার ও শব্দপ্রয়োগের ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তথা অনুশীলনের অবকাশ স্বাক্ষর এনে দেয়ায় ষাটেরদশকের প্রধান কবিগণ এতে আত্মপ্রকাশিত করতে পেরেছিলেন। বলাবাহুল্য এদেশের প্রধান কবিগণ-- ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান সাতচল্লিশপূর্বকালেই আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার সুযোগ পান। শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দীন আল আজাদ, আবুজাফর ওবায়দুল্লাহ, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, আবুহেনা মোস্তফা কামাল প্রমুখ পঞ্চাশ দশকের প্রসূন। আল মাহমুদ, শহীদ কাদরী পঞ্চাশ-ষাটের সন্ধিক্ষণেই বেড়েছিলেন। এরপর কবি হিসেবে খ্যাতি ও স্থিতি লাভের অধিকারী রফিক আজাদ, আসাদ চৌধুরী, সিকদার আমিনুল হক প্রমুখ স্বাক্ষরেরই কর্ণধার, রথী-মহারথী। রফিক আজাদই প্রধান উদ্যোক্তা, তাঁর উৎসাহী-উদ্যোগে ঘনীভূত হয়েছিলেন স্বাক্ষরের লেখক সম্প্রদায়, তথা 'গোষ্ঠী'। আসাদুল ইসলাম চৌধুরীর নাম সংক্ষেপ করে আসাদ চৌধুরী করা— সেটাও রফিক আজাদেরই খেয়ালীসিদ্ধান্ত। কিন্তু সেদিনের খেয়াল আজ চরম সত্যে পরিণত, আসাদুল ইসলাম চৌধুরী স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ডপত্রে আর অফিস-আদালতের কাগজেই সীমাবদ্ধ। কাব্যরস-পিপাসুদের মন-মনান্তরে ব্যপ্ত কেবল 'আসাদ চৌধুরী'।

দ্বিতীয় সংকলনে যেসকল তরুণের কবিতা ছাপা হয়েছিল তাঁরা হলেন ঃ সিকদার আমিনুল হক, রফিক আজাদ, অশোক সৈয়দ, ইমরুল চৌধুরী, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, আসাদ চৌধুরী, শহীদুর রহমান, মফিজুল আলম, আফজল চৌধুরী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (অনুবাদ), হায়াৎ মাহমুদ (অনুবাদ); শাহজাহান হাফিজ (অনুবাদ) ও মোহাম্মদ রফিক (অনুবাদ)। প্রশান্ত ঘোষাল (পুস্তক পরিচিতি) ও ইমরুল চৌধুরীর ('সাম্প্রতিক কবিতা ঃ চকিত দৃষ্টি') দুটো গদ্য ছিল। এতে স্বাক্ষরের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া ডিলান টমাস থেকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, ফেদারিকো গারথিয়া থেকে হায়াৎ মামুদ, বার্নার্ড স্পেন্সার থেকে শাহজাহান হাফিজ, রাইনাক মারিয়া থেকে মোহাম্মদ রফিক কবিতার অনুবাদ করেছিলেন।

তৃতীয় সংকলনের সম্পাদক ছিলেন আসাদ চৌধুরী ও প্রশান্ত ঘোষাল। ১৯৬৫ সনে মুহম্মদ মুজাদ্দেদ ২৫৭ নং এলিফ্যান্ট রোড সাউথ ধানমণ্ডী থেকে প্রকাশ করেছিলেন। মুদ্রক ছিলেন প্রবাহ মুদ্রায়ণ ৩৭ আগামসি লেন ঢাকার আবদুস সালাম। মূল্য পঞ্চাশ পয়সা, পৃষ্ঠা ৫৬। এতে কবিতা লিখেছিলেন মফিজুল আলম, আফজাল চৌধুরী, হায়াৎ মামুদ, শাহজাহান হাফিজ, রফিক আজাদ, আসাদ চৌধুরী, শওকত আনোয়ার, শহীদুর রহমান, মোহাম্মদ রফিক, জিনাত আরা মালিক, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সিকদার আমিনুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, সাযযাদ কাদির, হায়াৎ সাইফ, সন্তোষ হালদার, প্রশান্ত ঘোষাল, আবু কায়সার ও ইমরুল চৌধুরী। অ্যালেন গীন্সবার্গ, লরেন্স ফার্লিং হেটি থেকেও অনুবাদ ছাপা হয়। একজন অনুবাদক মাহবুবুল আলম। জাবেদ চুঘতাই-র সাহিত্যসংক্রান্ত ভাবনার একটি অনুবাদও ছাপা হয় এতে (অনুবাদক অনুক্ত)।

চতুর্থ সংকলনের সম্পাদক ছিলেন রফিক আজাদ ও রণজিৎ পাল চৌধুরী। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কর্তৃক ১ অক্ষয় দাস লেন, ঢাকা-৪ থেকে প্রকাশিত এবং হক্কানী আর্ট প্রেস, ১/৩ দেবেন্দ্র দাস লেন, ঢাকা-১ থেকে জয়নাল আবেদীন আহমদ কর্তৃক মুদ্রিত। এটির প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন প্রাণেশ মণ্ডল। মূল্য পঞ্চাশ পয়সা।পৃষ্ঠা ৪৮। কবিরা হলেন ঃ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, জিনাত আরা রফিক, সাযযাদ কাদির, মোহাম্মদ রফিক, মফিজুল আলম, আবু কায়সার, আলতাফ হোসেন, আবুল হাসান, হুমায়ুন কবির, আফজাল চৌধুরী, মুস্তফা নূরউল আমিন, আসাদ চৌধুরী, কাজী সাহিদ হাসান, মাহবুব হোসেন খান, সিকদার আমিনুল হক, সৈয়দ আবু আকরাম, ফরহাদ মজহার, শওকত আনোয়ার, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ,রফিক আজাদ, রণজিৎ পাল চৌধুরী।

স্বাক্ষরের তরুণ কবিদের রচনায় আবেগের অভিব্যক্তি ঘটেছে বিভিন্ন ছন্দ-প্রকরণ ও আঙ্গিকে। তবে এতে সমকালীন অবক্ষয় ও হতাশার পরিচয় পাওয়া যায়। শহীদুর রহমানের 'রুগ্ন আত্মার ভাষণ' শীর্ষক কবিতার কটি চরণ :

'আমরা যাদের নেই কিছুতে বিশ্বাস শ্রদ্ধাভক্তি/মিথ্যের মোড়ক বিপন্ন বিষন্ন যারা বস্তুতা
নেই একদিন মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান/এতেক জেনেও তবু বেঁচে থাকতে চাই এবং আমরা
কতকগুলি নরনারী পরস্পরকে যৌন প্রহার কোরে/বুকে হাত রেখে নিজেরই বুকের ধুকপুকুনি শুনি
এবং অনন্ত কাল শুনে যেতে চাই আমরা আরো জানি/অদ্যাবধি আমাদের বর্তমান ব্যাখানবিহীন যেহেতু
অতীত থেকেও নেই ভবিষ্যত দর্শনীয় নয়/আমরা জেনেছি যারা করজোড়ে একদিন

সত্যাগ্রহ মৃত্যু পাওয়া যাবে'[১৪৯]

তৃতীয় সংকলনের রফিক আজাদকৃত একটি কবিতা (জরাগ্রস্তদের স্বগোতোক্তি) :

ডাক্তার ও নার্সহীন এই চিকিৎসা আলয়ে /আমিও রয়েছি পড়ে একুশ বছর :

আমার শরীরে হায়, লুকিয়ে রয়েছে এক দুরারোগ্য/রোগের জীবাণু, শিরা-উপশিরাব্যাপী, রক্তকণিকায়—

জাগ্রত অবস্থায় কিংবা ঘুমঘোর বেদনায়/আকণ্ঠ তৃষ্ণার কাৎরে বহুবার

শীর্ণহাত বাড়িয়েছি যাহাদের প্রতি —/অস্পষ্ট ছায়ার মত তারা সব শব্দহীন দূরত্ব গড়েছে :

স্যাঁতস্যেঁতে পরিপার্শ্বে, ঘৃণাহত, বমির নোংরায়/আজীবন পড়ে আছি

কারো বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত হয়নি আমার দিকে/এমনকি, পাইনি শীতল জল, এক ফোঁটা।'[১৫০]

'নভেম্বরের পূর্ণিমায় রচিত আত্মবিষয়ক গদ্য' শিরোনামে আসাদ চৌধুরী দিয়েছিলেন তরুণমনের প্রকৃতচিত্র — "আজো সে বিশ্বাস করে/শিশুগণ অমলিন আত্মার ঈশ্বর/তাহাদের বুকে/গোলাপের উদ্যাণ রয়েছে/ একদা তাহারও ছিল/এখনো, যদিচ, তাহার বিশ্বাস/অধুনা সে আত্মহীন বিমর্ষ যুবক/ অন্বিষ্ট আত্মহীন রমনীর প্রেম, /তাহার নিঃশ্বাসে/যে কোন পুষ্পের মৃত্যু হতে পারে/ তো সে এতদিন মৃত ভাতে/বাসী তরকারীতে ভরেছে উদর তার/এমনকি নিজস্ব শিল্পবোধও উচ্ছিষ্ট/সে তার বিকৃত আকাঙ্ক্ষার দিকে/মৃত বিমাতার রক্তহীন, উত্তাপহীন, শীতল হাত বাড়ায়/ সে তার উদ্যানকে খোঁজে পাগলের মত/দেহহীন, গন্ধহীন, কোন যুবতীর খদ্দরের শাড়ী/ যদি পেয়ে যায়,— যদি, কপালের ভাজ থেকে/মুছিবে ঘামের চিহ্ন, সযতনে।' [১৫১]

৬. স্বদেশ (১৯৬৩-৭০/১৩৭০-৭৭)

'স্বদেশ' নামে দুপর্যায়ে বছর চারেক একটি সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশিত হয়েছিল। এঁরা নানা বিষয়ে বহু রচনা প্রকাশ করেছিলেন, আর বাঙালীদের সামনে স্বদেশপ্রেমের আবেদন—আকূতি নিয়ে উপস্থিত হয়ে সামাজিক দায়িত্ব কিছু হলেও পালন করতে চেয়েছিলেন। সাময়িকপত্রের ইতিহাস থেকে এঁদের উদ্যোগকে তাই নির্বাসন দেয়া চলেনা। প্রথম পর্যায়ের 'স্বদেশ' এর প্রথম সংখ্যা 'সাহিত্য বার্ষিকী' হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল মফিজউদ্দিন আলী মহামেদ চৌধুরীর সম্পাদনায়। এটি প্রকাশিত হয় ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭০ সনে। কালাচাঁদ বসাক কর্তৃক নারায়ণ মেশিন প্রেস, ১৩৪ নবাবপুর রোড, ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্তৃক ৩৪ জিন্নাহ এভিন্যু, ঢাকা ২ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। নিউজপ্রিন্ট কাগজ, ভালো ছাপা-বাঁধাই ডিমাই ১/১৬ সাইজ পৃষ্ঠা ১৫৬। এতে মহিউদ্দীন কবিতা লিখেছিলেন (ভিক্ষু)। কামাল উদ্দীন লিখেছিলেন একটি উত্তম প্রবন্ধ 'ধর্মের বিপক্ষে ও সপক্ষে'। আরও লিখেছিলেন কাজি আফসার উদ্দীন আহমেদ (গল্প, চাওয়া-পাওয়ার ফুল) ; দিলদার খান (ছড়া, শ্যালিকার পূর্বরাগ) ; ফররুখ আহমদ (মহাকবি ইকবাল থেকে অনুবাদ) ; সৈয়দ আলী আহসান (কবিতা, স্বপ্নের জটলা) ; রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী (কবিতা, কুকুরটা) ; পাক দ্য জিন (গল্প, নীল আকাশের নীচে ; অনুবাদ—জামসেদ চৌধুরী) ; আবদুস সাত্তার (কবিতা, আমার এ-দেশ) ; শফিক চৌধুরী (ছোট কবিতা) ; মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহ (রম্যরচনা, গুরুচণ্ডালী) ; আবদুর রহমান (রম্যরচনা, ঢাকা) ; প্রজেশকুমার রায় (ব্যক্তিগত নিবন্ধ, যেকথা যায়না ভোলা) ; মুহম্মদ সিদ্দিক খান (প্রবন্ধ, ফারায়জী আন্দোলন) ; মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন (প্রবন্ধ, মোহাম্মদ কাসেম-মৃত লেখক) ; এস. ওয়াজেদ আলী (স্মৃতি, ছেলেবেলার কথা) ; নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (প্রবন্ধ, কবি নজরুল) ; পারভীন তাহমিনা খানম (ভ্রমণ, নতুন জীবনের পথে) ; আহমদ পারেছউদ্দীন (গল্প, নারী চরিত্র) ; অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আজরফ, দেওয়ান (প্রবন্ধ, ধর্ম ও নৈতিকতা) ; খাজা আহমদ আব্বাস (গল্প, লক্ষ্মী, অনুবাদ ঃ কাজী মাসুম) ; রথীন্দ্র ঘটক চৌধুরী ও সুরেন্দ্রনাথ ঘটক (সনেটের হটপাটকেল) ; টমাস ম্যান (গল্প, সেই অসাধারণ মেয়েটি) ; আবদুল জব্বার খান (আলোচনা, চলচ্চিত্র ও প্রতিক্রিয়া) ; কাজী আবুল হোসেন (গল্প, যেদিকে তাকাই) ; তালিম হোসেন (কবিতা, আমার দেশ) ; শাহেরজাদ (কবিতা, বিকেল পাঁচটা) ; এস. কবিরুল ইসলাম (কবিতা, মৃত্যুক্ষণ) ; আহমদ আলতামাস (কবিতা, ছোট কবিতা) ; লালা শামসুল ইসলাম (কবিতা, আমার কথা) ; কাজী জহুরুল হক (কবিতা, প্রেম) ; দুর্গেশ পত্র নবিশ (গল্প, একটি সঙ্গীত) ; শেখ নঈম (কবিতা, ওরা) ; খলিল জিবরান (কবিতা, আত্মার আর্তনাদ) ; সুবোধ কুমার রায় (কবিতা, মানভঞ্জন) প্রমুখ। 'সমকালীন সাহিত্য সংবাদ' কলামে ১৯৬৩ সনের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত বাংলাবিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ-র উপর আলোচনা আছে। নতুন বই বিভাগে 'নৌফেল ও হাতেম' ; 'ছায়াহরিণ', 'চরভাঙ্গাচর ', 'দৃষ্টি', 'শিবির জীবনের দিনগুলি', 'আলোছায়া', 'নাথিংনেস' প্রভৃতি বইয়ের উপর আলোচনা ছাপা হয়েছে। এগুলো লিখেছিলেন অরূপ আহমদ শামসুদ্দীন হায়দার, আমীর আহমদ, ফরিদ চৌধুরী প্রমুখ। এই সংকলনের 'বাংলা ভাষা' শীর্ষক রচনায় ডক্টর শহীদুল্লাহর প্রখ্যাত উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করে বাংলাভাষার চিরস্থায়ীত্ব সম্পর্কে, মাতৃভাষার চর্চার পক্ষে এবং ভাষা-বিতর্কে পাক-বাংলা সৃষ্টির মতকে খণ্ডন করে আরবী-ফার্সী ও সংস্কৃত শব্দবহুল প্রচলিত বাংলাভাষার পক্ষে মতামত দেওয়া হয়েছে। এবং সংস্কৃত এবং আরবী-ফার্সী শব্দ গ্রহণ-বর্জনে সংস্কৃতপন্থী ও মুসলমানী বাংলার পক্ষদের উদ্দেশ্য করে শহীদুল্লাহর মীমাংসা তুলে ধরা হয়। ভাষা-রীতি সম্বন্ধে পত্রিকার মতে এটাই শেষ কথা এবং এই সমস্ত বিতর্কের প্রেক্ষিতে বলা হয় : "বাস্তবিক আমরা এক অদ্ভূত আহাম্মকের স্বর্গেই বাস করছি বটে।"

'স্বদেশ'-এর পরবর্তী সংখ্যা বের হয় ১৩৭১ সনের কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে বর্ষ ও সংখ্যাচিহ্ন ধারণ করে। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৭১, দ্বিতীয় সংখ্যা পৌষ-মাঘ ১৩৭২ ; তৃতীয় সংখ্যা ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭১ ; চতুর্থ সংখ্যা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২

Dhaka University Institutional Repository

সনে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হয় যথাক্রমে আষাঢ়-শ্রাবণ ও ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭২ সনে। এই পর্যায়ে দি আইডিয়াল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১১৮ ঋষিকেশ দাস রোড, ঢাকা-১ থেকে মীর হাসান আলী কর্তৃক মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্তৃক 'কপোতাক্ষী' ৩৪ জিন্নাহ এভিনিউ, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত হয়। ডাবল ডিমাই ১/১৬ নিউজ প্রিন্ট ; প্রচ্ছদশিল্পী কাজী শামসুল আহসান। তবে পত্রিকার মান সাধারণ মাপের ও স্টাণ্ডার্ডের হয়েছিল। অনেক রচনা এই ছয়টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও এঁদের ঘোষিত কোন আদর্শ ছিলনা। তবে সমকালীন চিন্তাধারা থেকে তাঁরা দূরে সরে থাকতে চাননি।

সে যাহোক, স্বদেশের পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে রবীন্দ্রনাথের রচনা পুনর্মুদ্রণ (সৃষ্টির আত্মগ্লানি) ছাড়াও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। টাইফাস আন্তন শেকভ এর অনুবাদ ; আর মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহ (চীনা উপকথা থেকে) ; মবিনউদ্দীন আহমদ (ধারাবাহিক উপন্যাস—মায়াকাননের ইতিহাস); জাহাঙ্গীর চৌধুরী, কামাল চৌধুরী, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, আহমদ পারেছউদ্দীন (উপন্যাস, জীবন থেকেও বড়); জহুরুল হক, লালা এস. ইসলাম, মহিউদ্দীন, জ্যাপল সাত্র, রিচার্ড রগেন, আজহারুল ইসলাম, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, সৈয়দ আলী আহসান, মোহিতলাল মজুমদার, স্যাঁ জঁ পের্স, মক্‌ফী, হামেদ আহমদ, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, জাস্টিস এ. এস. চৌধুরী, ফয়জুন্নেসা মতিয়া বানু, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, কাজী আবুল কাসেম, সেন জায়ম্যে দে প্রে, আহসান হাবীব, সমার সেট মম, ম্যাক্সিম গোর্কী, কে. এম. শমসের আলী, বেগম জেবু আহমদ, আ.ন.ম. বজলুর রশীদ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (পুনর্মুদ্রণ), শ্রীপদ জোসী (পুনর্মুদ্রণ) ; আতাউর রহমান, আবদুল করীম (গান), মুহম্মদ আবদুল হাই প্রমুখ লেখকের বিভিন্ন ধরনের অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। আহমদ পারেছ উদ্দীনের জীবন থেকে বড় ; মবিনউদ্দীন আহমদ-এর মায়াকাননের ইতিহাস এবং হামেদ আহমদ এর কল-কল্লোল, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের শিরণী এবং কামাল চৌধুরী ও জাহাঙ্গীর চৌধুরীর গুচ্ছ-গুচ্ছ কবিতা আর অসংখ্য স্মরণীয় বাণীতে স্বদেশ ভরা থাকতো। তবে পত্রিকার ভাষাতে সাধু-চলিতের, শুদ্ধ-অশুদ্ধের মিশ্রণ থাকতো। লেখা ও লেখকের নামের বিন্যাসেও ঐক্য নেই। লেখকের নাম কোথাও শিরোনামের নীচে, কোথাও উপরে। রচনার পরিসর ছোট্ট, বৈচিত্র্য আনতে চায় এবং সাহিত্যের আনন্দ ও মনের খাদ্য সরবরাহ করতে চায় পাঠককে। তাই বলে রাজনীতির ব্যাপারে তাঁরা একেবারে সরকার ঘেঁষা ছিলেন না। শিক্ষা-কমিশন, ছাত্র-রাজনীতি, পাকিস্তানী শাসক ও শোষকদের নিয়ে মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহর ব্যঙ্গাত্মক একাঙ্কিকা 'ঝকমারী' এর উদাহরণ। পত্রিকা নুতন নতুন লেখার পরিবর্তে ধারাবাহিক এবং একই লেখকের পৌনপুনিক উপস্থিতি ক্লান্তিকর। পত্রিকা হিসেবে নিম্নমানের হবার কারণ এটাই। তাছাড়া কামাল চৌধুরী, জাহাঙ্গীর চৌধুরীর গাদা-গাদা অতি সাধারণ রচনাও ক্লান্তিকর।

অন্যশিল্পীর আঁকা ডি. এইচ. লরেন্সের ছবি ও উক্তি, জয়নুল আবেদীনের আঁকা রঙীন ছবি, পিকাসোর ছবি, আছে। জেমস জয়েস, আলবেয়ার কামু, আর্দ্রেজিঁদ, স্টিফেন স্পেণ্ডার, আলডায়াস, হাক্সলি জ্যাপল সাত্র, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, মহাআগান্ধী, গুঁস্তাভ ফ্লবেয়ার, বেগম রোকেয়া, ইউজিন আয়োনেস কো, হজরত মুহম্মদ (দঃ), পি. সি. রায় প্রমুখের বাণী, উক্তি উদ্ধৃত করে, প্রতি সংখ্যায় বিচিত্র ছবি ও ইংরেজী-বাংলা উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁরা মানবতা ও শিল্প সাহিত্যের আদর্শ প্রচার করেছিলেন। আসকার ওয়াইল্ড শ্লীল-অশ্লীল সম্বন্ধে বলেন ঃ 'শ্লীল, অশ্লীল? জানিনে জানি নে, জানিনে। কিছু বই সুলিখিত, কিছু বই কুলিখিত, এইমাত্র আর কিছু নয়।"[১৫২] প্রিন্স ওকাকুরা কাকুজোর উক্তি "প্রত্যেক জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মপ্রকাশ হচ্ছে শিল্পকলায়। কেননা শিল্পকলার মধ্য দিয়েই মানুষের অন্তর প্রকাশিত—শিল্পের বাণী সর্বলোকে বরণীয়।"

জীবনের অসীম কর্মব্যস্ততা, অনন্তজালা ও ঝঞ্চাটের মাঝে আমাদের কাব্যলক্ষ্মী যে ক্ষণিকের তরে এসে তার ওড়নার ঝিলিক দিয়ে যান, এইত জীবনে চরম পাওয়া। এ আনন্দ দীর্ঘ। ক্ষণস্থায়ী শুধু তাদেরই কাছে যারা মামুলী। জীবনের কোন এক প্রভাতে যদি ক্ষণিকের তরেও আলোর স্পর্শ পেয়ে থাকি—সুন্দরের গান গেয়ে আজও আমরা সেই পথে চলবো। লক্ষ্যভ্রষ্ট হবোনা, দিশাহারা হবোনা, এই আমার প্রতিজ্ঞা। শুধুমাত্র আমারই কেন, আমাদের সকলেরই প্রতিজ্ঞা।" উদ্বৃতি হিসেবে উক্ত এই কথাগুলো কার? এজরা পাউণ্ডের? আরও অনেক উক্তিতে তাঁদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন—যেমন ঃ "স্বদেশের প্রতি সামান্য অনুরাগ থাকিলেই যে দেশানুরাগ হয়, তাহা নাহ ; স্বদেশের প্রতি বিশেষ অনুরাগ চাই ঃ সেই বিশেষ অনুরাগই দেশানুরাগ বাচ্য। স্বদেশের প্রতি সামান্য অনুরাগ কি? না স্বদেশকে অন্যান্য দেশের সহিত সমানভাবে ভালবাসা। স্বদেশের প্রতি বিশেষ অনুরাগ কি? না অন্যান্য দেশ অপেক্ষা স্বদেশকে অধিক করিয়া ভালবাসা। স্বদেশের প্রতি এই যে বিশেষ অনুরাগ ইহাই প্রকৃতরূপে দেশানুরাগ শব্দের বাচ্য।"[১৫৩]

রবীন্দ্রনাথের উক্তি ঃ "আর কিছু না পার যে কোন একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কখনও ডাকিয়া কথা কহে নাই, তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আলো দাও, তাহাকে সেবা কর। তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে।"[১৫৪] Love I mankind can only be reaced through love of ownes country." Yevgeny yevtushenks. জ্যা পল সার্ত্র-এর উক্তি—প্রথম কর্তব্য ঃ এর দুটি লাইন ঃ "আমার মতে আজকের দিনে সংস্কৃতির জগতে সহ-অবস্থান-নীতির আরোপ হলো প্রথম কর্তব্য। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের মিলন হবে প্রধান উদ্দেশ্য। এদুয়ের সংস্কৃতিতে হওয়া উচিত নয় সংঘর্ষ। হওয়া চাই মিলন।' আবার সার্ত্রেরই অপর উক্তি ; "আমি নিজেকে সমাজতান্ত্রিক বলে মনে করি এবং সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠায় আমার সহানুভূতি থাকবে সব সময়। তার জন্যে আমায় যদি কেউ দোষ দেয় তাতে আমি কিছুই মনে করব না। সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি আমার আগ্রহ ও সহানুভূতি থাকবে চিরকাল।" জিঁদের উক্তি : 'শ্রেষ্ঠ শিল্পী মাত্রেই বিদ্রোহী, তাঁরা উজান বেয়ে চলেন।" এই সব দ্বারা তাঁরা সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থা ব্যক্ত করেছেন। পাশাপাশি সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে ভালবাসা এবং স্বদেশ হিসেবে একে প্রেম করা, ইসলামী আজানের গানকে ভাললাগা, এবং যৌনতাকে নিন্দা করার রীতিও লক্ষণীয়। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের প্রখ্যাত পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক উদ্ধৃতি থেকে এবং রচনাংশ উদ্ধৃত করার প্রবণতা থেকে বোঝা যায় এঁরা উদার মানবতাবাদী। তবে রচনার সাহিত্যিক পরিবেশন, শৈল্পিক মান অত্যন্ত গতানুগতিক। মোহাম্মদী, সওগাত ও অপরাপর সাহিত্যপত্রিকার মাপকাঠিই এঁদের কাম্য। কিন্তু তা হয়নি। সমকালীন সাহিত্য-স্বদেশে বিভিন্ন পত্র-

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকার রোমান্টিক বা যৌনাত্মক অংশ উদ্ধৃত করে ব্যঙ্গ বা আক্রমণ করেন অগত্যার মতো—যেমন ঃ 'সমস্ত ভাষান দিলুম সমস্ত উড়াল' শীর্ষক কবিতার (অশোক সৈয়দ পূর্বমেঘ,এর) "বেশ্যারা একমাত্র বেশ্যারাই প্রতিটি শিল্পের দাম দিতে জানে" উদ্ধৃত করে বলেছেন ঃ "রাজশাহীতে এত কাণ্ড চলিতেছে, জানিতাম না। এখন জানিতে বাসনা ইনি কি কখনও পাবনায় ছিলেন?" যৌনাত্মক রচনাংশ নিয়ে অপসংস্কৃতি প্রতিরোধের পরিবর্তে অশ্লীলতা, যৌনতা নিয়ে তামাশা করতে আনন্দ পান বলে মনে হয়। প্রাক পাকিস্তান যুগের ইসলামী ধারার কবি কামাল চৌধুরীর এই কবিতাটি স্বদেশের প্রিয়?— "পাকিস্তানের নরম মাটিরে বড় ভালবাসি মোরা/ ভালোবাসিতাম জামদানী শাড়ী, আউশ আমন, বোরো/ তারি বুকে রাখি আমাদের বুক শুনি ফজরের গান;/ চুমু দিয়ে এই মাটির অধরে শুরু হয় অভিযান।" সমকালীন সাহিত্যসমালোচনার বিভাগে (সাহিত্য সন্দেশ) আবদুল হকের 'জাতীয় চরিত নামা'র প্রসঙ্গে: "খালেদ, মুসা, অথবা তারেক মহাবীর, ইকবাল মনীষী। কিন্তু তাঁরা বাঙালীর বীর ও বাঙালীর মনীষী নন। খালেদ মুসা তারেকের চাইতে বরিশালের এ. কে. ফজলুল হক চট্টগ্রামর কাজেম আলী আমাদের অনেক আপন।"— বেশ কথা। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, বাঙলা একাডেমী এবং বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড কি তাহা মানিবেন?" ব্যঙ্গ-রঙ্গাত্মক অনেক সমালোচনা আছে—যার অর্থ অনেকটা নিছক হাসিরই কারণ বটে। তবে এই সমস্ত চুটকী জাতীয় উদ্ধৃতি ও সেসম্পর্কে মন্তব্য দ্বারা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে মহিলা লেখকদের অকৃত্রিম ভাব-প্রকাশের প্রবণতাকে, যেমন ; "কথায় আছে মেয়েদের সবকিছু বলিতে নাই। তবু এক মহিলা-কবি দেখিতেছি লিখিয়াছেন ; "আমি কি পারিনা,/ ঝরিয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দিতে আমার/বেহিসেবী ফুলে আর সুগন্ধে আমাকে?.../মনে করি এক্ষুণি এই মাটির টবটাকে ভেঙ্গে চুরে/মিশে যাই বনে প্রান্তরের সহস্রের দলে,/ আমার বুকে যে অরণ্যের গান" ইত্যাদি। তাছাড়া বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ভালোভালো লেখার অংশ উদ্ধৃতিসহ মন্তব্য দ্বারা পাঠকদের আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্যে অনেক পুরাতন রচনার পুনর্মুদ্রণ করেছেন। 'সাহিত্য স্বদেশ'-এর একটি উক্তি: "বিখ্যাত সাহিত্যপত্রিকাসমূহের সম্পাদকেরা এখন অধিকতর তরুণ সাহিত্যপ্রয়াসীদের নিকট নিরেট হাসির পাত্রে পরিণত হয়েছেন। প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রিকাসমূহের কোন প্রকার প্রভাব নেই পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সাহিত্যান্দোলনের উপর। মাহেনও মোহাম্মদীর কথা বলিতে পারিনা। কিন্তু সমকাল, পূবালী, পলাশ? হায় পরিক্রম?"

(দ্বিতীয় পর্যায় ১৩৭৬-৭৭/১৯৭০)

'স্বদেশ' নামে মাসিকসাহিত্যপত্রিকা ঢাকা থেকে আবার চার বছর পর ফাল্গুন ১৩৭৬, ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ সনে আহমদ ছফার সম্পাদনায় পুন প্রকাশিত হয়। এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা চিহ্নিত হয়ে প্রকাশিত হলেও মূল ঠিকানা একই। দীর্ঘ সম্পাদনাপরিষদের সদস্য ছিলেন : জাহাঙ্গীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, সন্তোষ গুপ্ত, আবদুল হালিম, সৈয়দ আকরম হোসেন, মুহম্মদ নুরুল হুদা, কাজী সিরাজ এবং সম্পাদনা 'সহযোগী' ছিলেন ঃ মুনতাসীর মামুন, আবদুল হাদী, নওফেল আলম বিল্লাহ ও ফারুকুল ইসলাম। প্রচ্ছদ শিল্পী হারাধন বর্মণ। প্রকাশনা দপতর : ৩৪ বাংলা বাজার, ঢাকা ১। ডাঃ এম. এ. এম. চৌধুরী ও এম. এ আলীম কর্তৃক ৩৪ বাংলা বাজার ঢাকা থেকে প্রকাশিত। মীর শফিকুর রহমান কর্তৃক ২৪, মোহিনী মোহন দাস লেন এর গ্রীনল্যাণ্ড প্রেস থেকে মুদ্রিত। দাম ১ টাকা, পৃষ্ঠা ৮৭। সাইজ ১/৮) ডাবল ক্রাউন। এই সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন ডক্টর আহমদ শরীফ (মিলন ময়দানের সন্ধানে) ; সত্যেন সেনের উপন্যাস 'জননী জন্মভূমিশ্চ' ধারাবাহিক প্রকাশ হতে আরম্ভ করে। গল্প লেখেন সৈয়দ আকরম হোসেন, কবিতা লিখেছিলেন শামসুর রাহমান, আবুল হাসান, নির্মলেন্দু গুণ, মুহম্মদ নুরুল হুদা, আবুল কাসেম, সাযযাদ কাদির প্রমুখ। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধটিও এতে প্রকাশিত হয়। অরুণ মৈত্র লেখেন আর্নেষ্ট চে' গুয়েভারার জীবন কথা। আবদুল মান্নান সৈয়দ গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন—চন্দ্রমল্লিকা। জাহাঙ্গীর চৌধুরী নিবন্ধ লেখেন, নাম—'তরুণ বিদ্রোহ ও জিজ্ঞাসা'। এছাড়া শামসুর রাহমানের 'নিরালোকে দিব্যরথ'; ডক্টর আহমদ শরীফের 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা'; সত্যেন সেনের 'পুরুষ মেধ'; সুবোধ লাহিড়ীর 'ভস্তার বিল' ; আজহার ইসলামের 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ' ; অজয় রায়ের 'বাঙলা ও বাঙালী' এবং 'পরিচিতি কাহিনী'— আর আহমদ ছফার 'নিহত নক্ষত্র' শীর্ষক গ্রন্থের আলোচনাও ছাপা হয়েছিল। পুস্তক-সমালোচনার ক্ষেত্রে 'নাগরিকের' প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই আলোচনাগুলো লিখেছিলেন যথাক্রমে জমিল শরাফী, সরদার ফজলুল করিম, শাহাবুদ্দীন আহামদ, মুনতাসীর, খালিকুজ্জামান ইলিয়াস ও মকবুল আহমদ। নবপর্যায়ের, প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা পাওয়া যায়নি। তৃতীয় সংখ্যার সহযোগী কেবলমাত্র অসীম সাহা। পৃষ্ঠা ৯৩, দাম ১ টাকা। মানিয়া আর্ট প্রেস ঢাকা থেকে মুদ্রিত। এই সংখ্যা প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৭৭, ১৯৭০ এর জুন নাগাদ। এতে লিখেছিলেন প্রবন্ধ ঃ আহমদ শরীফ (জাতিগঠনে ভাষার প্রভাব) ; মনসুর মুসা (আমাদের বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা); মফিজ চৌধুরী (সমকালীন ছাত্র-বিদ্রোহ); সরদার ফজলুল করিম (একটি কবিতা সম্পর্কে) , আকরম হোসেন (রবীন্দ্রনাথ ঃ একাল এবং আমরা) প্রমুখ। কবিতা লিখেছিলেন শহীদ সাবের, শামসুর রাহমান, সেলিম সারোয়ার, হুমায়ুন কবির, মুহম্মদ নূরুল হুদা, মাহবুব সাদিক, সাযযাদ কাদির, ল্যাংস্টন হিউজ (অনুবাদ রবীন সমদ্দার, নিগ্রো কবিতা) ; জামাল উদ্দীন হোসেন প্রমুখ। গল্প লিখেছিলেন : রাজিয়া খান (সূর্যাস্ত) ; রিওনুসুকে আকুতাগওয়া (নরকচিত্র, অনুবাদ মুস্তাফিজুর রহমান) ; বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯) ; অসীম সাহা (ব্যথিত বিলয়)। গ্রন্থ-পরিচিতি বিভাগে শামসুর রাহমানের 'নিজবাসভূমে'র আলোচনা লেখেন করুণাময়ী গোস্বামী এবং আনোয়ার পাশা লেখেন সত্যেন সেনের 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' গ্রন্থের ওপর।

উল্লেখ্য ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানের পরে ১৯৭১ সনের মার্চের কয়েক মাস পূর্বের সময়কালে প্রকাশিত স্বদেশের সমাজ সমালোচনায় লেখকেরা অনেকটা আলোর দিশা পেয়েছিলেন। পাকিস্তানী শাসকদের কঠোর চোখ-রাঙানীকে তখন বাঙালী বেশী ভয় পাচ্ছেনা, আর বুদ্ধিজীবীদের চারিত্র্যও অনেকটা পরিস্কার হয়ে ধরা পড়েছে। তখন বুদ্ধিজীবীরাই বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন। স্বদেশে, সাহিত্য ও

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতিক্ষেত্রে বাঙালী জাতীয়তাবাদ জয়ী হবার চূড়ান্ত লগ্ন উপস্থিত। এই ভাবসমূহ ফুটে উঠেছে স্বদেশের পরের সংখ্যাগুলোতে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল সত্তর সালের ফেব্রুয়ারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। স্বদেশ লিখেছিল ঃ 'চলতি মাসে বিশ্বের অন্যতম খ্যাতিমান দার্শনিক মহামনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল লোকান্তরিত হয়েছেন। সুদীর্ঘকাল পরমায়ু তিনি পেয়েছিলেন। তবু শোক প্রকাশ করছি—আগামী সংখ্যায় রাসেল সম্পর্কিত রচনা প্রকাশিত হবে।' হিসেব মতে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায়নি-সেটাই রাসেলসংখ্যা ছিল।

ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ সংখ্যায় একটি বিজ্ঞাপনে বলা হয় "রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম পাকিস্তানী রেকর্ড ১৬ই জানুয়ারী ১৯৭০ থেকে বাজারে ছাড়া হয়েছে। যাঁরা গেয়েছেন—সনজিদা খাতুন, মাহমুদা খাতুন, বিলকিস নাসিরুদ্দীন, আফসারী খানম, রাখী চক্রবর্তী, কলিম শরাফী প্রমুখ তাঁদের অন্যতম। দি গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইস্ট পাকিস্তান লিঃ এটা প্রকাশ করে। আহমদ ছফা সম্পাদিত স্বদেশ এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার (ফাল্গুন ১৩৭৯) সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল ঃ

> খুন রাঙা ফালগুনের রক্তবেগ তরঙ্গিত মরণহীন সুরেলা আহ্বান বেজেছে পূর্ব বাঙলার ঘরে ঘরে। শহীদী প্রাণের মরণবিহীন আকাঙ্ক্ষা এক সুর, এক ছন্দে, এক তালে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। শহর থেকে বন্দর, গঞ্জ থেকে গ্রাম, দেশের আনাচ কানাচ সব ঠাঁই সমুদ্র গর্জনের মতো উদাত্ত গম্ভীর অথচ চিত্তহারী এক বলবন্ত সঙ্গীতের সুরে স্পন্দিত শিহরিত। দিনের পর দিন যাচ্ছে—মাসের পর মাস, গড়িয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর। কিন্তু ফালগুনের খুন ঝরা সঙ্গীতের রক্তিম বেদনা প্রতিবার আমাদের গণচিত্তে বপন করে নতুন বেদনার বিজুলী, জাগিয়ে তোলে পেলব আশার রক্তমুকুল, প্রেরণা দেয় দুর্জয় মরণপ্রাণ সংগ্রামের। আটই ফালগুন তথা একুশে ফেব্রুয়ারী তারিখটি বাঙলা ভাষা-ভাষী মাত্রেরই হৃদয়ের রক্ত-রঙীন পলাশ ফোটার দিন। আমাদের নেই এর চাইতে মহত্তর কোনো পর্বদিন—না আনন্দের, না বেদনার, না আকাঙ্ক্ষার। আমাদের অতীত ইতিহাসের স্বেচ্ছাচার স্বৈরাচারিতা, অন্যায়-জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উন্মুখর, সংঘাতে সংক্ষুব্ধ দিনটির প্রতিটি মিনিট, প্রতিটি সেকেণ্ড আমাদের কাছে ফুসফুসের নিশ্বাস বায়ুর মতো দামী আর পবিত্র। এ দিনে হৃদযন্ত্রকে হাতে নিয়ে কড়া সূর্যের আলোকে জাতির রক্তশপথ নতুন করে পাঠ করি, হাওয়ার সাথে বুকের ধুকপুক মিশিয়ে কান ভরে শুনি কোটি মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার মধুকর গুঞ্জন। এই দিনেই তাজা প্রাণ বলি দিয়ে আমাদের জাতি অমৃত নির্ঝর মাতৃভাষায় দখল নিয়েছে। মাতৃভাষা আর মাতৃভূমির নিয়ত নিবিড় চেনাশোনার মাধ্যমে মানুষ নতুন সৃষ্টিলীলায় জীবনের ফণা উচিয়ে তুলছে। এ বিচিত্রমুখী সংগ্রামী কর্মপ্রয়াসের মধ্যদিয়ে মাতৃভূমি আপন অনন্ত যৌবনাস্বরূপ প্রকাশ করে চলেছেন। আমাদের ভাষায় সঞ্চারিত হচ্ছে তেজ, সাহিত্যে ধ্বনিত হচ্ছে জীবন, সঙ্গীতে লহরিত হচ্ছে আনন্দ বেদনা সংগ্রাম, আভা আসছে চিত্রকলায়। আমাদের ভাবী ইতিহাসের তোরণদ্বার আটই ফালগুন তথা একুশে ফেব্রুয়ারী আমাদের তাবৎ সৃষ্টিকর্মের উৎস। এমন মহান দিনকে সামনে রেখেই আত্ম প্রকাশ করলো 'স্বদেশ'।[১৫৫]

৭. পূর্বলেখ (১৯৬৬-৬৭)

'তারুণ্যের উৎসাহে কিছু একটা করার প্রেরণা থেকেই' পূর্বলেখ প্রকাশিত হয়েছিল ভূঁইয়া ইকবালের সম্পাদনায়। "১৯৬৬ সালে ঢাকায় কোনো নিয়মিত কবিতাপত্র ছিলোনা। এই অভাববোধ থেকে পূর্বলেখ প্রকাশের পরিকল্পনা। তবে বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকার স্মৃতিচারণ পড়ে খুব উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম। নামকরণ করেছিলেন শামসুর রাহমান। প্রথম সংখ্যা পেয়ে বুদ্ধদেব বসু আমাকে উৎসাহ দিয়ে একটি সুন্দর চিঠি লিখেছিলেন।'[১৫৬] উল্লেখ্য যে, সুনির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য-আদর্শের তাগিদে কোমর বেঁধে কোনো লক্ষ্য নিধারণ করে পূর্বলেখ প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়না। এতে কোন সম্পাদকীয় বা বক্তব্যও নেই। এর আগে কবিতা পত্রিকা 'স্বাক্ষর' বেরিয়েছিল। স্বাক্ষরের সমকালেই 'পূর্বলেখ' বের হয়। কিন্তু পূর্বলেখে তরুণ প্রবীণ উভয়েরই জায়গা হয়েছিল। তবু বলতে ইচ্ছে করে, পূর্ববঙ্গে আধুনিক সাহিত্যপ্রকাশের ক্ষেত্র যেখানে খুবই সঙ্কুচিত ছিল, সেখানে সেইকালে একগুচ্ছ আধুনিক কবিতা, কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ এবং কতিপয় কাব্য-গ্রন্থের আলোচনা নিয়ে পূর্বলেখের ৩টি সংকলন প্রকাশিত হয়ে সাময়িকপত্রের ইতিহাসে নাম লিখিয়েছিল এই বলে যে, সাতচল্লিশ সনের পরে শুধু কবিতার চিন্তা নিয়ে 'স্বাক্ষর'; 'কবিকণ্ঠ' এবং 'পূর্বলেখ' মাত্র বেরিয়েছিল। যুদ্ধপূর্ববর্তীকালে আর কোনো নিছক কবিতাপত্র প্রকাশের ঘটনা এখন আর জানা যায় না।

পরিচিতিতে বলা হয় 'সমকালীন কবিতা পুস্তিকা'। পূর্বলেখ এর প্রথম সংকলনটি 'কবিতা ত্রৈমাসিক' পরিচিতি দিয়ে মাঘ ১৩৭২ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ সনে প্রকাশিত হয়েছিল। 'সহযোগী' ছিলেন আলী মনোয়ার, আলী ইমাম। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন জয়নুল আবেদীন ও কাইয়ুম চৌধুরী। অঙ্গ সজ্জায় সবিহউল আলম ও মুহম্মদ জাহাঙ্গীর প্রমুখ। ভূঁইয়া ইকবাল কর্তৃক ৮৭, বিসিসি রোড, ঢাকা ৩ থেকে প্রকাশিত ও পাকিস্তান প্যাকেজেস, চট্টগ্রামে মুদ্রিত; ডাবল ডিমাই ১/১৬ সাইজ ৩২ পৃষ্ঠা। দাম এক টাকা। দ্বিতীয় সংকলন প্রকাশিত হয় ভাদ্র ১৩৭৩ এবং তৃতীয় সংকেলন প্রকাশের তারিখ নেই। কিন্তু অনুমান করা যায় ১৯৬৬ সনের শেষের দিকে অথবা ৬৭ সনের প্রথম দিকে প্রকাশিত হয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যহীনতার কারণে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। 'দ্বিতীয় সংকলনে' 'কবিতা ত্রৈমাসিক' কথাটি লেখা ছিলনা বলা হয় 'দ্বিতীয় সংকলন'। তৃতীয়বারে সংকলন না বলে বলা হয় 'তৃতীয় পুস্তিকা'। সে যাই হোক, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুস্তকে কবিতা লিখেছিলেন পূর্ববঙ্গের প্রধান কবিবৃন্দ — শামসুর রাহমান, আহসান হাবীব, সৈয়দ আলী আহসান, আবদুল গনি হাজারী, হাসান হাফিজুর রহমান, আল মাহমুদ, সিকানদার আবু জাফর, ফজল শাহাবুদ্দীন,মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, সন্তোষ গুপ্ত (অনুবাদ, শেক্সপীয়র থেকে); হুমায়ুন আজাদ,মাশুকুর রহমান চৌধুরী, সৈয়দ আলী আশরাফ, সুফী মোতাহার হোসেন, আতাউর রহমান, হায়াৎ মামুদ, মনিরুজ্জামান, আবদুল মান্নান সৈয়দ, রফিক আজাদ, ওমর আলী, মোহাম্মদ রফিক, সুব্রত বড়ুয়া, জিনাত আরা মালিক, মফিজুল আলম, আবুল হাসান, সানাউল হক, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আনোয়ার পাশা, আবু বকর সিদ্দিক,

Dhaka University Institutional Repository

ইমরুল চৌধুরী, আবু কায়সার, সাযযাদ কাদির, জিনাত আরা রফিক, সৈয়দ আকরম হোসেন, মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান, শেখ আবদুর রহমান, ফজলুর রহমান, আহমদ নূরে আলম, হুমায়ুন কবির, রফিক সন্যামত, আলতাফ হোসেন, আলী ইমাম, আলী মনোয়ার, মোহাম্মদ শরীফ হোসেন প্রমুখ। আবুল ফজল (আধুনিক কবিতা প্রসংগে) এবং সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ('আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে') প্রবন্ধ লিখেছিলেন যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় সংকলনে। প্রশান্ত ঘোষাল ই. ই. কামিংসের; এবং জিয়া হায়দার য়েন সিয়াং জেন এর; এবং ফজলে রাব্বি কেনেথ শ্লেড এলিং এর কবিতা অনুবাদ করেছিলেন। আনিসুজ্জামান সুফী মোতাহার হোসেনকৃত 'সনেট সংকলন' এর উপর লিখেছিলেন (প্রথম সংকলনে): মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ লিখেছিলেন ফজল শাহাবুদ্দীনের 'তৃষ্ণার অগ্নিতে একা' গ্রন্থের ওপর দ্বিতীয় সংকলনে। হায়াৎ মামুদ শামসুর রাহমান সম্পাদিত ও অনূদিত ফ্রস্টের কবিতার ওপর (পূর্বোক্ত), সরদার ফজলুল করিম লিখেছিলেন সানাউল হক অনূদিত 'বরিস পাস্তার নাক এর কবিতা'র ওপর (পূর্বোক্ত); হুমায়ুন আজাদ সিকানদার আবু জাফরের 'তিমিরান্তিক', 'বৈরীবৃষ্টিতে' ও 'প্রসন্নপ্রহর' এবং আনোয়ার পাশার কবিতার বই 'নদী নিঃশেষিত হলে'-র ওপর লিখেছিলেন। জিয়া হায়দার কবি ইয়েভতু শেংকোর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন তৃতীয় সংকলন। বিজ্ঞাপনের ভাষায়ও তাঁরা কবিতার শব্দ ও ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন। বিজ্ঞাপন তাঁরা মোটামুটি ভালোই পেতেন। সরদার ফজলুল করিম বরিস পাস্তারনাকের বইয়ের প্রশংসা করেছিলেন। পূর্বমেঘে এই বইয়ের নিন্দা করা হয়েছিল। পূর্বলেখ এর কর্মীবৃন্দ স্বাগত জানান শামসুর রাহমান ও ফজল শাহাবুদ্দীন সম্পাদিত কবিতা ও কবিদের পত্রিকা-'কবিকণ্ঠ' কে। 'কবিকণ্ঠ' পত্রিকাও ঐসময় প্রকাশিত হয়েছিল। কবিদের সংগঠন বা সংসদ গড়ে তোলা এবং কবিতার জন্য স্বতন্ত্র সংকলন প্রকাশের একটা প্রেরণা তখন সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এই ধরনের পত্রিকা খুব বেশী ছিলনা বলে 'পূর্বলেখ' এর একটা গুরুত্ব আছে বৈকি।

৮. মেঘনা (চট্টগ্রাম, ১৯৬৭ - ৭০)

আঞ্চলিক সাহিত্যপত্রিকাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চট্টগ্রামের 'দৈনিক সমাচার' পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক সেকান্দার হায়াত মজুমদার সম্পাদিত 'মাসিক মেঘনা'। বাংলাদেশের প্রখ্যাত, প্রথমশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিতলেখক, মন্ত্রি-মিনিস্টার-ব্যাংকার-বুর্জোয়া-ব্যবসায়ী, বীমা কোম্পানীর উচ্চপদাধিকারী, অধ্যাপক-গবেষকদের, আর নতুন তরুণ উদ্যোগী সাহিত্যশিল্পপ্রয়াসী ও সংস্কৃতিকর্মীদের জড়ো করে উদ্যোগ নিয়েছিলেন মেঘনাকে নিয়মিত মাসিকরূপে চালিয়ে যেতে। কিন্তু দুঃখের বিষয় নিয়মিত মাসিকরূপে মেঘনা দীর্ঘদিন বের হতে পারেনি। বছর তিনেক অনিয়মিত মাসিকরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে প্রথম দিকে কয়েক সংখ্যা নিয়মিতই বের হয়। কারণ বিজ্ঞাপন ভালোই পাওয়া যাচ্ছিলো। বিভিন্ন ব্যক্তির নাম ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসায়িক ক্ষেত্র তাঁরা প্রস্তুত করে নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু এদেশের ব্যবসায়ীদের সমাজসেবকমনস্কতা থাকলেও তা স্ফুলিংগের ন্যায়। দীর্ঘদিন ধরে কোনো সামাজিক কাজ তাঁরা চালিয়ে যাবার মানসিকতা ধরে রাখতে পারেন না। কেনো পারেন না সমাজতাত্ত্বিক, মানসিক, নৈতিক, সংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে তা বিচার বা অনুসন্ধান করা যেতে পারে বটে; তবে, সত্য হলো মেঘনার সঙ্গে বহু লোক জড়িত থাকলেও দুটো বছর ২৪ টি সংখ্যাও নিয়মিত প্রকাশিত হতে পারেনি। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬, এপ্রিল-মে ১৯৬৯ সনে (হয়ত জুনেই বের হয়েছিল) প্রকাশিত তৃতীয় বর্ষ প্রথম-দ্বিতীয় যুগ্ম-সংখ্যায় সম্পাদক বলেন (সম্পাদকীয়) ঃ 'অনিয়ম বিশৃঙ্খলা আর প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে আমরা দুটি বছর অতিক্রান্ত করে আজ তৃতীয় বর্ষে পদার্পন করলুম। মেঘনাকে নিয়মিত প্রকাশের ব্যাপারে গত দুবছর আমরা আমাদের শ্রদ্ধেয় পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদেরকে একাধিকবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম। কিন্তু নানা প্রতিকূল পরিবেশ তথা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সে প্রতিশ্রুতি সর্বত্র রক্ষা করতে পারিনি বলে আমরা লজ্জিত। তাই তৃতীয় বর্ষের যাত্রা শুরুতে আর প্রতিশ্রুতি নয় — হৃদ্যতাপূর্ণ সহযোগিতাই আমাদের কাম্য। বাংলা পত্রপত্রিকার উন্নতি-অবনতি আর অপমৃত্যুর ইতিহাসে আমাদের দেশ কোন পর্যায়ে তা আজকে অন্তত আমাদের পাঠকশ্রেণীর অজানা নয়। সেক্ষেত্রে মাসিকপত্রিকা, তাও আবার নগ্নছবিবিবর্জিত সাহিত্যপত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ যে কি দুরূহ ব্যাপার তা একমাত্র ভুক্তভোগীদেরই জানার কথা। এতোসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সুহৃদদের শুভেচ্ছাকেই সম্বল করে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। আমাদের পাঠকশ্রেণীর সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে মেঘনার দাম ষাট পয়সার পরিবর্তে চল্লিশ পয়সা রাখা হলো। সেসঙ্গে আকর্ষনীয় কিছু নতুন বিভাগও খোলা হলো। আমাদের নব উদ্যোগ পাঠক সম্প্রদায়ের আনন্দ জোগাতে সক্ষম হলে আমরা সুখী হবো। মেঘনার জন্মলগ্নে বাংলা সাহিত্যের দুজন মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামকে (যেহেতু তাঁদেরও জন্মোৎসবের মাস) সশ্রদ্ধভক্তিসহ স্মরণ করে, আমাদের যাত্রা অব্যাহত রাখার নতুন করে শপথ নিচ্ছি।"

মেঘনার শীর্ষে লেখা থাকতো 'জাতিগঠনমূলক সাহিত্য মাসিক'। সহকারী সম্পাদক : এইচ. এম. রফিকুল ইসলাম, প্রচ্ছদ করেছিলেন সবিহউল আলম। অঙ্গসজ্জা : মুহম্মদ জাহাঙ্গীর। মুদ্রাকর ও প্রকাশক সেকান্দার হায়াত মজুমদার। সিগনেট প্রেস, জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। যোগাযোগের ঠিকানা : মেঘনা কার্যালয়, পোঃ বক্স ৬৪৬ চট্টগ্রাম। দ্বিতীয় সংখ্যা ছাপাঘর, দেওয়ান বাজার থেকে মদ্রিত ও ১২০/এ চন্দনপুরা পশ্চিম গলি, চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত। ডাবল ডিমাই ১/৮ সাইজ এর ৫৬ পৃষ্ঠায়, সাদা কাগজ, হার্ডবোর্ড কভার এ প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছিল। সম্পাদক লিখেছিলেন : "নদীর নামে নাম, কিন্তু নাম নদী হবে আর তাতে আমাদের ঝড়ের নৌকার মতো ক্ষত-বিক্ষত হতে হবে — ছাড়পত্র পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একথা আমরা ভাবিনি। তবু সান্ত্বনা, পর্বত পরিমাণ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমাদের পত্রিকা প্রকাশ পেলো। পত্রিকা প্রকাশ এবং তার অকাল মৃত্যু আমাদের দেশে নতুন কোনো ঘটনা নয়। বরং বলা চলে পত্রিকার বেঁচে থাকাটাই একটা উল্লেখযোগ্য নতুন ঘটনা হতে পারে। আমাদের পত্রিকা বেঁচে থাকবেই এ-দম্ভোক্তি করার সাহস নেই— কারণ, সেখানে পদেপদে বাধা, অসহযোগিতা, ঈর্ষামূলকতা— সেখানে অর্থ আন্তরিকতা কোনটাই নিশ্চিত মূলধন হতে পারেনা। তবু বেঁচে থাকার আশা নিয়েই আমাদের যাত্রা — আন্তরিকতার অভাব থাকবেনা এইটুকুই আমাদের ভরসা — এর সঙ্গে যদি

Dhaka University Institutional Repository

যোগ হয় আপনাদের সহযোগিতা তবেই হবে আমাদের শুভ সূচনা।'

মেঘনায় শুভেচ্ছা বা বাণী পাঠিয়েছিলেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবুল ফজল, এম. খালেদ (ব্যাংকার); খুদা বখ্স (বীমা কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার); আবদুল জব্বার খান (পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পীকার); নুরুল আবছার খান (ডাইরেক্টর, ইস্ট রিজিওন্যাল ল্যাবরেটরিজ, ঢাকা); এস. এম. জাফর (আইনমন্ত্রী, পাকিস্তান); এস, এম. আমজাদ হোসেন (শিক্ষামন্ত্রী, পূর্বপাকিস্তান) শ্রী প্রবোধবর্মণ প্রমুখ। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হয়: চৌধুরী জহুরুল হক, সবিহউল আলম, বাবু সত্যরঞ্জন সিংহ, আলহাজ্ব নিজামউদ্দীন, আবদুল মান্নান পাটোয়ারী, প্রিয়লাল রায়; মৌলভী মোহাম্মদ সিরাজুল হক; এম. হাসমতউল্লাহ প্রমুখের প্রতি। সহায়তায় ছিলেন : এম. সফিয়ুল্লাহ, জয়নুল আবেদীন, কাজী নুরুন্নবী, লুৎফর রহমান পাটওয়ারী, সরওয়ার জাহান নিজাম; মেছবাহ উদ্দীন আহমদ, এম. ইউনুছ চৌধুরী, মোহাম্মদ সোলায়মান, জি. আবুল কাশেম, মঈনউল আলম, মীর মোশাররফ হোসেন, নুরুন্নবী চৌধুরী, মকবুল আহমদ পাটওয়ারী, মোহাম্মদ মোসলেম খান, অমলেন্দু বড়ুয়া, আজিজুল হক। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর বাণীতে লিখেছিলেন : " ... প্রথমেই মনে হল আজও এই পাকিস্তানে সাবেক হিন্দু-রাজত্বের সময়ের শহরগুলির নাম কেন? চট্টগ্রাম কেন ইসলামাবাদ, ঢাকা কেন জাহাঙ্গীর নগর, সিলেট কেন জালালাবাদ হয় না? রামচন্দ্র বলে কোন হিন্দু মুসলমান হয়ে আবদুল্লাহ নাম নিলে এখন তার নাম জিজ্ঞাসা করলে সেকি বলবে রামচন্দ্র, না আবদুল্লাহ?"[১৫৭]

আবুল ফজল লিখেছিলেন : "চট্টগ্রাম থেকে 'মেঘনা' নামে একটি সাহিত্যমাসিকী প্রকাশিত হচ্ছে শুনে খুব আশান্বিত হলাম। সাহিত্যের সঙ্গে সাহিত্যসাময়িকীর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবীড়। কারণ এসব সাময়িকীকে কেন্দ্র করেই নতুন নতুন লেখক গড়ে ওঠে — তাঁরা পেয়ে থাকে নিজেদের প্রকাশ করার একটা মাধ্যম। আর সাহিত্যের আধুনিক ধারা, উপধারা বিচার বিশ্লেষণ ইত্যাদির পরিচয় ফুটে ওঠে সুসম্পাদিতসাময়িকীর পৃষ্ঠায়। এ কারণে সাহিত্যের অগ্রগতিতে সাহিত্যমাসিকীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবদেশের সাহিত্যেই এ ভূমিকা স্বীকৃত। আমাদের দেশে সু-সম্পাদিত, স্বাধীন ও নির্ভীক সাহিত্য-মাসিকীর সংখ্যা অতি নগন্য। বিশেষ করে চট্টগ্রামে সাহিত্যমাসিকের একটা অভাব রয়েছে। আশা করি মেঘনা আমাদের সে অভাব পূরণ করতে সক্ষম হবে। আমি সর্বান্তকরণে মেঘনার দীর্ঘায়ু ও সুসমৃদ্ধি কামনা করি।"[১৫৮]

স্পীকার আবদুল জব্বার খান লিখেছিলেন : "জাতি গঠনের মহা উদ্দেশ্য নিয়ে চট্টগ্রাম হতে মাসিক 'মেঘনা' নামে একখানি সাহিত্যপত্রিকা শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করছে শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। 'দৈনিক সমাচার' পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক জনাব মোঃ হায়াত মজুমদারের সম্পাদনায় মাসিক মেঘনা যে আদর্শে ব্রতী হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, আমি তার সাফল্য কামনা করি। উন্নতসমাজ গঠনে সাহিত্য পত্রিকার ভূমিকা সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। এ ধরনের পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সকলের সহযোগিতা কাম্য।"[১৫৯]

খুদা বখশ লিখেছিলেন : "সাহিত্যই জাতির আত্মা, সাহিত্যিকেরাই জাতির প্রাণ, এ-আত্মাকে, এ-প্রাণকে যারা অস্বীকার করে তারা জাতীয় জীবনে সূর্যকে পশ্চাতে রেখে অন্ধকারকেই টেনে আনে। সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে সাহিত্য নিয়ে যতই চর্চা হবে দেশ ও দশের মংগল সাধন ততো সহজ হবে। সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট করার প্রশংসনীয় অণুপ্রেরণা যাদের আছে, তারা নিঃসন্দেহে জাতির মহান সেবায় নিয়োজিত।"[১৬০]

লেখকদের নামের আগে অধ্যাপক লেখা হতো। পত্রিকার অনেক লেখক সব বড় বড়, খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিক-অধ্যাপক। বিজ্ঞাপন সংগ্রহের প্রতি এঁদের মনোযোগ বেশী। প্রথম সংখ্যায় 'জাতি গঠনমূলক সাহিত্যপত্রিকা'; দ্বিতীয় সংখ্যায় 'নতুন চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট একটি অনন্য সাহিত্য মাসিক' এবং পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যায় : 'নতুন চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট একটি প্রগতিশীল সাহিত্য মাসিক' এবং তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় 'মাসিক সাহিত্যপত্র' কথাটা লেখা হয়েছিল।

মেঘনার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যাতে (মে ১৯৬৭) ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'পাকিস্তান আন্দোলনের দার্শনিক পটভূমি' শিরোনামে। আবুল ফজলের প্রবন্ধের নাম 'খাতার একটি পাতা'। মুহম্মদ সিকান্দার খান লিখেছিলেন 'চোঙ্গা গল্প প্রসঙ্গে'। গল্প লিখেছিলেন মাহবুব উল আলম (মানুষ সাপ); আনিস চৌধুরী (প্রত্যাশা); চৌধুরী জহুরুল হক (পুঞ্জ পুঞ্জ কুয়াশা); সবিহউল আলম (সাঁকো); বিপ্রদাশ বড়ুয়া (একটি অসমাপ্ত গল্প); নীলুফার খান (পায়ে পায়ে বেদনা); জহুর উশ শহীদ (একজন একাকী); ফিরোজা বেগম (অনেক আশ্বাসের আলো) প্রমুখ। আলাউদ্দীন আল আজাদ লিখেছিলেন নাটক 'বলোনা বিদায়' ; মনিরুজ্জামান গদ্যে প্রবচন—"ক্ষণবাক" ; দিলওয়ার হোসেন—নকসা—'বাংলাভাষা ; সূর্যের আলো : পাখীর গান' ; বেলাল মোহাম্মদ (ইতিহাস) 'স্মৃতিসৌধে ভরা চট্টগ্রাম' ; এবং কবিতা লিখেছিলেন ; আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, সেলিম আহমদ, শামসুন্নাহার বেগম ; এ. কে. এস. আমীর খসরু ; প্রমুখ। প্রাপ্ত সংখ্যাতে অন্যান্য কবিতা লিখেছিলেন যাঁরা তাঁরা : সৈয়দ আলী আহসান, দিলওয়ার হোসেন ; বিপ্রদাশ বড়ুয়া, মেহবুবা মোখলেস ; আবদুল কাদির, আল মাহমুদ, মুরশেদ নূর শাহরিয়ার, শামসুর রাহমান, মাশুকুর রহমান চৌধুরী, হাবীবুর রহমান, শামসুল ইসলাম, জামাল উদ্দীন হোসেইন, বেলাল মোহাম্মদ, কল্পনা মোহরের, জাহাঙ্গীর তারেক প্রমুখ। অন্যান্য রচনাকার—মাহবুবউল আলম (গল্প, শেষে মোতার রোমান্স; ডর করে) ; মোহাম্মদ আবু তাহের মজুমদার (প্রবন্ধ, আধুনিক ইংরেজী কবিতা ও টি. এস. ইলিয়ট); আবুল কালাম শামসুদ্দীন (প্রবন্ধ, পুঁথি সাহিত্য) ; চৌধুরী জহুরুল হক (গল্প, পাক; বিনিপয়সার বিজ্ঞাপন; অনুভব); মঈনউল আলম (গল্প, মোহন হাসি; অন্ধকার উপত্যকায়) ; আলাউদ্দিন আল আজাদ (পুস্তক-সমালোচনা, ফজল শাহাবুদ্দীন প্রণীত 'তৃষ্ণার অগ্নিতে একা' এবং সৈয়দ আলী আহসান প্রণীত 'সহসা চকিত') ; মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (প্রবন্ধ ; দুই জিহাদ) ; আবুল ফজল (প্রবন্ধ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী যদি দ্য-গলে হতে পারতেন) ; আল মাসুদ (গল্প, প্রতিচ্ছবির অন্তরালে) ; কে, এম, আমীর খসরু (প্রবন্ধ, শাহরিয়ার) ; দিলওয়ার হোসেন, (নাটিকা, ওবায়দুল হকের কমেডি অব ননসেন্স অবলম্বনে রচিত বাজে কথার বিলাস ; সৈয়দ আলী আহসানের কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনার আলোচনা) ; রশীদ আল ফারুকী (প্রবন্ধ, নববর্ষ সংবাদ; একক আত্মার সংলাপ) ; সুবির (আলোচনা, অন্যান্য কথা) ; আবদার রশীদ (গল্প, অভিসার, হেরফের)) ;

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি নজরুল); শামসুল ইসলাম (প্রবন্ধ, রবীন্দ্রকাব্যে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে নারীর স্থান) ; পূর্ণেন্দু দস্তিদার (প্রবন্ধ, সাহিত্য জিজ্ঞাসা—ম্যাক্সিম গোর্কির অন লিটারেচার এর অনুবাদ) ; আবুল ফজল (নাটক, হরিষে বিষাদ; প্রবন্ধ, সংস্কৃতি ও মুক্তচিন্তা) ; আহমেদ সাইফুদ্দীন খালেদ (গ্রন্থালোচনা, ইবনে বতুতার সফরনামা, মোহাম্মদ নাসির আলী প্রণীত ; এবং আবুল হাসান শামসুদ্দীন অনূদিত ও বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'মওলানা মোহাম্মদ আলীর আত্মজীবনী') ; নাজমুল আলম (একাঙ্কিকা, তুচ্ছ) ; নাজমাতুল আলম (গল্প, গাড়ী) কঙ্কন নন্দী (গল্প, মোম) প্রমুখ। এছাড়াও পেদ্রোদো আলবর্কের প্রবন্ধ থেকে 'দুই গৌরব' শিরোনামে অনুবাদ করেছিলেন জাহাঙ্গীর তারেক। ব্যঙ্গ রচনা লিখেছিলেন মনিরুজ্জামান 'অথ নজরুল বিবাদ সমাচার' শিরোনামে।

এই পত্রিকার রচনা ও রচনাকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আবুল ফজলের 'সংস্কৃতি ও মুক্তচিন্তা'। কবিতার থেকে গদ্য বেশী করে ছেপেছেন মেঘনার সম্পাদক। এতে সমাজের চিত্র এসেছে। গল্পগুলোতে মানবতাবাদী জীবনবাদী সৃষ্টি ও সুর মূর্ত হয়েছে। প্রথম বর্ষ পঞ্চম-ষষ্ঠ যুগ্ম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে যে সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে তা উল্লেখযোগ্য : "আমাদের জনজীবনে দুর্নীতি, দারিদ্র্য, অনৈক্য আর পাশ্চাত্যমুখী ভাবধারা যেভাবে প্রভাব বিস্তার শুরু করেছে, এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দেশের শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞব্যক্তিগণকে এগিয়ে আসা অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্যের নগ্ন ভাবধারা মুক্ত সমাজগঠনে ব্যর্থ হলে মুসলিম জাতির নিজস্ব ঐতিহ্য বলে কিছুই থাকবেনা। পঙ্গু হয়ে যাবে আমাদের সমাজব্যবস্থা। শুধু সরকারী প্রচেষ্টার প্রতি নির্ভর না-করে দেশের সাহিত্যিক বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণকে আমাদের তরুণ তরুণীদের মুক্ত ও স্বচ্ছল জীবন গঠনের জন্য নিজেদের জাতীয় ভাবধারাকে তাদের সামনে ফুটিয়ে তুলতে এগিয়ে আসা দরকার। দেশের মানুষকে সুন্দর ও সরল পথের সন্ধান দেওয়া আমাদের নৈতিক কর্তব্য।"[১৬১]

মেঘনার যোগাযোগের ও প্রকাশের ঠিকানা পরবর্তীতে পাল্টে গিয়েছিল। প্রথম বর্ষ পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৬৭ ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৪) ২৮৮ চন্দনপুরা থেকে প্রকাশিত ও দি টেম্পেস্ট প্রিন্টিং প্রেস লিমিটেড থেকে মুদ্রিত হয়। আঞ্চলিকপত্রিকা হলেও মেঘনা পূর্ব বাংলার সাহিত্যপত্রিকার ইতিহাসে জায়গা করে নিতে পেরেছিল, কারণ সম্পাদক একটি দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিজ্ঞতা ও সামাজিক সংযোগের সুযোগ-সুবিধাও মেঘনা প্রকাশের কাজে লাগিয়েছিলেন।

এ ধারার কিছু পত্রিকাপ্রয়াস

[১. অন্ন চাই আলো চাই (১৯৪৯) ; ২. দিশারী (১৯৫০) ; ৩. প্রাচী (১৯৫৭) ; ৪. পরিচিতি (১৯৫৯) ; ৫. বিবর্তন (১৯৬০) ; ৬. পরিচয় (১৯৬০) ; ৭. বইবিচিত্রা (১৯৬০) ; ৮. যুববাণী (১৯৬০) ; ৯. বর্তমান (১৯৬২) ; ১০. বিচিত্রিতা (১৯৬২) ; ১১. গণমন (১৯৬৩) ; ১২. সৈকত (১৯৬৩) ; ১৩. মৌসুম (১৯৬৪) ; ১৪. বর্ণালী (১৯৬৪) ; ১৫. বই (১৯৬৫) ; ১৬. বনানী (১৯৬৬-৬৯) ; ১৭. সুনিকেত মল্লার (১৯৬৭-৭০) ; ১৮. একান্ত (১৯৬৭) ; ১৯. ছোটগল্প (১৯৬৭) ; ২০. সুরভি (১৯৬৮) ; ২১. কিছুধ্বনি (১৯৭০) ; ২২. পূর্বাশা (১৯৭০) ; ২৩. সাম্প্রতিক (১৯৭০) ; ২৪. বালার্ক (১৯৭০)]

মনে রাখতে হবে যে, ব্যক্তিকউদ্যোগের কোনো পত্রিকা আলোচ্যকালে নিয়মিত প্রকাশিত না হলেও অনিয়মিতভাবে অথবা সংকলন আকারে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এক সংখ্যা বা দুই, তিন, চার-কিংবা পাঁচটি সংখ্যাও বের হয়েছে কোনো কোনোটার। এর কোনোটা ব্যক্তিক উদ্যোগ, কোনোটা কোনো না কোনো সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংস্থার মুখপত্র। এসবে কখনো-কখনো ভালো রচনাও প্রকাশিত হয়েছে। এ রকম একটি কয়েকটি পত্রিকা অন্নচাই আলো চাই, দিশারী, প্রাচী, পরিচয়, পরিচিতি ইত্যাদি আরো কত কি। মহীউদ্দীন সম্পাদিত 'অন্নচাই আলো চাই' শীর্ষক 'মাসিক সাহিত্যপত্র'টি ১৯৪৯ সনে প্রকাশিত হয়েছিল এবং ৪টি সংখ্যায় অনেক ভালো ভালো লেখা ছাপা হয়েছিল; কিন্তু ইতিহাস আজ অনেকটা বিস্মৃত এই পত্রিকাটি সম্পর্কে। এর বিষয়সূচীতে ছিল অর্থনীতি, রম্য-রচনা, গল্প, কাব্য-নাট্য, কবিতা, শিক্ষা, রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত রচনা ইত্যাদি। লেখকদের মধ্যে আছেন মাহমুদ জালাল, আহাদ, আবিদ, মহিউদ্দীন, মকবুল জালাল, আবদুল গফুর, আজিজ প্রমুখ। পদবী ছাড়া নামে আজ এঁদের চেনার উপায় অনেকটা সঙ্কুচিত। ১৯৫০ সনে হাবীবুর রহমান ও একরামুল হক সম্পাদিত মাসিক 'দিশারী'র ছয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।

'সীমান্ত' পত্রিকার অন্যতম সহযোগী সম্পাদক সুচরিত চৌধুরী ও ওয়ালী আহমেদ চট্টগ্রাম থেকে ১৯৫৭ সনের পয়লা মে'তে 'প্রাচী' সাহিত্য সংকলন প্রকাশ করেন। মানের দিক থেকে এটি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যপ্রয়াস ছিল। প্রচ্ছদ আঁকেন পূর্ণেন্দু পত্রী। ওয়ালী আহমেদ কর্তৃক ৫৪৬ টেরী বাজার চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, অন্নদাশংকর রায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবুল ফজল, পূর্ণেন্দু দস্তিদার, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, জসীমউদ্দীন, রমেশ শীল, বেগম সুফিয়া কামাল, ওহীদুল আলম, গোলাম কুদ্দুস, মতিউল ইসলাম, শুভাশীষ চৌধুরী, রামবসু, মাহবুবউল আলম, অনিল কুমার সিংহ, রমাপদ চৌধুরী, জিন্নাত আলী, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ফরিদউদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

আহমেদ, সুচরিত চৌধুরী, ওয়ালী আহমেদ, সুলতানা রহমান, আবদুস সালাম, সাগরময় ঘোষ, শক্তি প্রসাদ ঘোষ, অচিন্ত্য চক্রবর্তী প্রমুখ ছিলেন এর লেখক। অন্নদাশংকর রায়ের ব্যক্তিগত রচনাটি (আত্মজীবনীমূলক) মূল্যবান। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'জনমত ভীতি' শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটিও এতে মুদ্রিত হয়। মৃত্যুরপরবর্তীকালে প্রকাশিত প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রণ কিনা উল্লেখ করা হয়নি। তবে ১৯৫৭ সনে স্বৈরাচারের দেশে 'জনমত ভীতি' নামের প্রবন্ধ টাইটেল-গুণেই চমৎকার এবং সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগে, দায়িত্ববোধে সমুজ্জল। আবুল ফজলের রচনার শিরোনাম 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা'। মুদ্রণ পারিপাট্যে, প্রচ্ছদে, সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সাদা কাগজে ১/১৬ ডাবল ডিমাই সাইজের 'প্রাচী'র পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২০০।

ত্রৈমাসিক পরিচিতি (১৯৫৯)র সম্পাদক ছিলেন সুবোধ দাশগুপ্ত। সহ-সম্পাদক বারীন মিত্র। গ্রন্থ জগতের মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হয়। লেখক সংঘ পত্রিকা যে প্রেস থেকে প্রকাশিত হতো — সেই পূর্ববঙ্গ প্রেস, ২ জিন্দাবাহার ২য় লেন, ঢাকা থেকে মুহম্মদ ওবায়দুল হক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত।[১৬২] মোট চারটি সংখ্যা বের হয়।প্রথম সংখ্যার পৃষ্ঠা ছিল ৫১টি। দ্বিতীয় সংখ্যার ৯৭ পর্যন্ত। তৃতীয় সংখ্যায় ৯৮ থেকে ১৩৯ পৃষ্ঠা। শেষ সংখ্যায় সহকারী সম্পাদকরূপে শামসুল হকের নাম ছাপা হয়। পরে মাসিক সংখ্যা রূপে একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল যার সম্পাদক ছিলেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। প্রাপ্ত প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩৬৬ তে 'সাপ্তাহিক দেশ' (ভারত) থেকে পুনর্মুদ্রণ করা হয় 'জনসেবায় সাহিত্য' শীর্ষক প্রতিমা সেনগুপ্তের একটি প্রবন্ধ। আবদুস শুকুর ব্যক্তিগত নিবন্ধ লিখেছিলেন 'পড়ার নেশা'। হামেদ আহমদ ও মেহেদী গল্প লিখেছিলেন যথাক্রমে 'কিনে পড়ুন' ও 'বন্ধন' শিরোনামে। তাছাড়া তৎকালে প্রকাশিত পুস্তকাদির পরিচয় আর বইয়ের মান সম্পর্কে লেখা সম্পাদকীয়তে সাহিত্য জগতের সার্বিক উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় এঁদের আন্তরিকতার পরিচয় সুপরিস্ফুট। পরের সংখ্যাতেও অনুরূপ সরোজ আচার্যর 'বইলেখা'; অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের 'তোষামোদের ভাষা'; বি. বি. দাস-এর 'উপজাতীয় এলাকায় শিক্ষার আলো' এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি' শীর্ষক প্রবন্ধ মুদ্রিত ও সংকলিত হয়। মুন্সী কুদ্দুস লেখেন 'পাঠাগার ও তার প্রয়োজন'। ডাঃ গিরিশচন্দ্র সরকার-এর নাটিকা 'বিচার করে দেখুন'; আর বেরসিকের গল্প —'অন্ধকারের হাসি' এবং গ্রন্থজগতের বিবরণ-বিবৃতি ছাপা হয়েছিল।

১৯৬২ সনে ইউনেস্কো ও পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগের সহযোগিতায় 'ন্যাশনাল বুক সেন্টার অব পাকিস্তানের' প্রতিষ্ঠা হয় দেশে অধিকতর ভালো বই প্রচুর পরিমাণে প্রকাশ এবং যাঁরা পুস্তক প্রকাশনার কাজে নিযুক্ত আছেন, তাঁদের 'প্রকাশনা সম্পর্কে সামগ্রিক সাহায্য করা'র উদ্দেশ্য। এই সংস্থা থেকে 'বই' নামে যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সনে তার প্রথম সম্পাদক ছিলেন সরদার জয়েনউদ্দীন। সহযোগী সম্পাদক ছিলেন রশীদ হায়দার। এই পত্রিকা ছিল 'গ্রন্থজগতের মুখপত্র'। এঁদের দ্বারাও সাহিত্য ক্ষেত্রে কিছু সদর্থক অবদান রাখার চেষ্টা হয়েছিল। বিশেষ বিষয়ের নতুন ধরনের পত্রিকা হিসেবে এর মূল্য কিঞ্চিৎ হলেও রয়েছে। 'বই বিচিত্রা' (১৯৬০) নামেও গ্রন্থাগার লেখক-পাঠক-বিক্রেতা ও প্রকাশনা-শিল্প সংক্রান্ত একটা পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সনে যাঁরা বলেছিলেন 'পত্রিকা ক্ষেত্রে তাঁরা অভিনবত্বের দাবীদার'।[১৬৩]

'পরিচয়' নামে ঢাকা থেকে (১৯৬০) 'সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক মাসিকপত্র' বেরিয়েছিল একটি; সম্পাদিকা ছিলেন রোকেয়া সুলতানা। রইসউদ্দিন আহমদ কর্তৃক, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। মাসিক সাহিত্যপত্রিকা 'যুববাণী' (১৯৬০) ছিল 'পাকিস্তান কাউন্সিল অব ইয়ুথ -এর মুখপত্র'। প্রধান সম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ ওসমান গনি। পরে সম্পাদক হন সৈয়দ আবু তৈয়ব। আবদুল মান্নান ভূঁইয়া 'বিবর্তন' (১৯৬০) নামের মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। মুদ্রিত হয়েছিল বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩/৪ পাটুয়াটুলী লেন এবং প্রকাশিত হয়েছিল ৩৮/১১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১ থেকে। চট্টগ্রাম থেকে খালেদা রহমান সম্পাদনা করেছিলেন 'বিচিত্রিতা' মাসিক (১৯৬২)। 'মৌলিক গণতন্ত্রীদের মুখপত্র' হলেও ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত মাসিক 'গণমন' (১৯৬৩) সাহিত্যসেবীদের নিকট প্রিয় হয়েছিল আর অনুন্নত জেলাশহরের সাহিত্য- স্রষ্টাদের প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছিল।। প্রথম দিকে সম্পাদক ছিলেন আবদুর রাজ্জাক। চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত আর একটি সাহিত্যপত্রিকা কাজী মোহাম্মদ ইউসুফ সম্পাদিত মাসিক 'সুরভি' বিচিত্র বিষয়ের লেখা নিয়ে প্রকাশিত হতো ১৯৬৮ সনের দিকে। 'জাতির গঠন মূলক ঐতিহ্যবাহী চট্টলার নিরপেক্ষ সাহিত্য পত্রিকা' কথাটি তাঁরা যত্নের সঙ্গে পত্রিকায় উদ্বৃত করেছিলেন। টাঙ্গাইল থেকে ১৯৭০ সনে 'বালার্ক' প্রকাশিত করেছিলেন তরুণ সাহিত্যকর্মী শাহ্ ম. শ. আরেফিন বাদল (সম্পাদক), এবং অসিওর রহমান খান (প্রকাশক)— টাঙ্গাইলের 'বালার্ক সাহিত্যগোষ্ঠী'র সহযোগিতায়। মুদ্রিত হয় কল্লোল মুদ্রায়ণ টাঙ্গাইল থেকেই। আমিনুল ইসলাম বেদুর সম্পাদনায় ১৯৭০ সনে 'সাম্প্রতিক' এর ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৭৭ এ প্রকাশিত হয়, অবশ্য সাম্প্রতিক নামে ১৯৬৩-৬৪ তে গদ্যের একটি লিটল ম্যাগাজিন বেদুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় কণ্ঠস্বর ও স্বাক্ষরের সমকালে, স্বাক্ষরগোষ্ঠীর তরুণদের দ্বারা। বলা হয় : 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা' সাম্প্রতিক-এর উদ্দেশ্য: "সাম্প্রতিক একটি নির্ভেজাল সাহিত্যপত্র (প্রকাশ করা)। সকল মতবাদে সাম্প্রতিক নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে চায়। লেখা উচ্চমানের হলেই তা পত্রস্থ করা হয়। একমাত্র বিশুদ্ধ মননশীল লেখাই পাঠাতে হবে। সমালোচনা সাহিত্যের বিন্যাস সাম্প্রতিক বিশেষ ভাবে কামনা করে।"[১৬৪] সাম্প্রতিক স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বেশ ক বছর যাবত অনিয়মিত ভাবে হলেও অনেকগুলো সংখ্যা প্রকাশিত করে। সাহিত্যক্ষেত্রে 'সাম্প্রতিক' পরিচিতি অর্জন করেছিল। আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ প্রমুখ এদেশের লিটল ম্যগাজিনের আলোচনায় সাম্প্রতিকের প্রথম সংখ্যাটির ঐতিহাসিকতা স্বীকার করেন। আবদুল জব্বার সম্পাদিত মাসিক 'পূর্বাশা' একবছর চলে। যুদ্ধের সময় (১৯৭১) বন্ধ হয়ে যায়। এটি প্রকাশিত হতো ঢাকার হাটখোলা থেকে। মাহবুব জামিল এবং আহমদুজ্জামান (যথাক্রমে সম্পাদক ও সহযোগী সম্পাদক) সম্পাদনা করেছিলেন দ্বিমাসিক সাহিত্যপত্র 'বর্তমান' ১৯৬২ সনে। ঢাকা থেকেই এটি প্রকাশিত হয়েছিল মোঃ মীজানুর রহমান কর্তৃক। 'সৈকত' নামে একটি দ্বিমাসিক ডাইজেষ্ট পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা গ্রীষ্ম ১৩৭০ (১৯৬৩) এ প্রকাশিত হয় মাসুদ আহমেদ এর সম্পাদনায়। মোটামুটি ভালো স্টাণ্ডার্ডে প্রকাশিত হতে চেয়েছিল। তাঁদের দুটি কথা উল্লেখযোগ্য : "পূর্ব পাকিস্তানের বিক্ষিপ্ত সাহিত্য

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের সৃষ্টিধর্মী শিল্প প্রকরণকে সংবদ্ধকরণ ও বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যোগসাধন উদ্দেশ্যে আমরা সৈকতে সমবেত।" এঁদের গদ্যভঙ্গীতে ষাটের দশকের নতুন অনুকৃত আড়ষ্টতা ও দুর্বোধ্যতার ঢং সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়। এই ধরনের গদ্য পাওয়া যায় কণ্ঠস্বরে এবং ঐগোষ্ঠীর লেখকদের রচনায়। মীজানুর রহমান শেলীর (ডঃ) সম্পাদনায় ১৯৬৪ সনে (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী) 'মৌসুম' দ্বিমাসিক পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। রাজশাহী থেকেও নির্ভেজাল সাহিত্যানুরাগী তরুণদের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে ছোট ছোট সাহিত্যপত্রিকা। 'সুনিকেত মল্লার' 'একটি বীতকণ্ঠ সাহিত্য ত্রৈমাসিক' সম্পাদনা করতেন মোহসিন রেজা। এই পত্রিকার অনেক সুন্দর বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে ডক্টর মযহারুল ইসলাম সম্পাদিত 'উত্তর অন্বেষা' পত্রিকায়। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ সন পর্যন্ত পত্রিকাটি চলেছিল। তরুণ কবিসাহিত্যিকদের সঙ্গে প্রবীণ এবং অধ্যাপকদের লেখাও ছাপা হয়েছে তাতে। এই মোহসিন রেজা উত্তর-অন্বেষার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অধ্যাপক বদরুদ্দীন উমরের উৎসাহে রাজশাহী থেকে বের হয়েছিল 'বনানী' ডিসেম্বর১৯৬৬ তে; ১৯৬৯ সন পর্যন্ত চলে। এটির সম্পাদক ছিলেন তাজুল ইসলাম এবং মোহাম্মদ নূরুল আমিন। বদরুদ্দিন উমর তখন রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম কর্তৃক বনানী কার্যালয়, কাজিরগঞ্জ, রাজশাহী থেকে প্রকাশিত এবং মোহামদ আবদুর রশীদ খান কর্তৃক আইডিয়াল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, গ্রেটার রোড, রাজশাহী কর্তৃক মুদ্রিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৬। একান্ত' নামে 'পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ধারার প্রথম গল্প সংকলন' প্রথম প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪ মে ১৯৬৭ সনে। সম্পাদক ছিলেন : মোঃ আবদুল মান্নান। মোঃ মোহসিন রেজা কর্তৃক জয়নব ভিলা নবাবগঞ্জ, ঘোষপাড়া, রাজশাহী থেকে একান্ত প্রকাশিত হয় এবং মোঃ আবদুর রশীদ খান কর্তৃক আইডিয়াল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, গ্রেটার রোড, কাজিরগঞ্জ, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৬১। দাম এক টাকা। এটি পরে 'শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি মূলক ত্রৈমাসিকপত্রিকা' রূপে প্রকাশিত হয়। প্রথম বর্ষ ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হয় চৈত্র ১৩৭৪ সনে। ১৯৬৪ সনের জুলাই মাসে 'বর্ণালী' নামে সাহিত্য সংকলন এর ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ওসমান গনির সম্পাদনায়। এটি আওয়ামী লীগের বর্তমানকালের অন্যতম নেতা মোঃ মোজাফফর হোসেন পল্টু প্রকাশ করেছিলেন ২২ শান্তিনগর, ঢাকা-২ থেকে। 'ছোট-গল্প' নামের সংকলনটি প্রকাশ পায় ১৪ আগষ্ট ১৯৬৭ তে। সম্পাদক কামাল বিন মাহতাব। এই পত্রিকাটি ১৯৭০ সনের নভেম্বর এর দিকে 'গল্প আন্দোলনের মাসিক মুখপত্র' রূপে প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ সন পর্যন্ত কয়েকটি সংখ্যা বের হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সনেও পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। মাহতাব এর সঙ্গে সম্পাদকীয় সহযোগী হিসেবে ছিলেন আলমগীর রহমান। ১৯৭০ সনে আনওয়ার আহমদ কর্তৃক ৮/ডি, আরামবাগ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় বেবী আনওয়ার সম্পাদিত 'কিছুধ্বনি'। ১৯৭১ সনের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৩টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত সিনেমা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'পরিচয়' একটি পাঠক-প্রিয় পত্রিকা ছিল। টক-ঝাল-মিষ্টি সবই ছিল তাতে। অনেক বিজ্ঞাপন আর 'দলমত নির্বিশেষে সবার লেখাই ছাপা হবে'— এই ঘোষিত লক্ষ্যে ৯২ পৃষ্ঠার 'পরিচয়' ১৯৬০ সনে প্রকাশিত হয়েছিল। শামসুল হকের তথ্য অনুযায়ী এর সম্পাদিকা রোকেয়া সুলতানা এবং প্রকাশক রইসউদ্দিন আহমদ ঢাকা। তবে প্রাপ্ত সংখ্যার প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা না থাকায় সম্পাদকের নাম নিশ্চিতকরে জানা যায় না। 'একটি নৃত্য ও সঙ্গীত সম্মেলন' এর প্রতিবেদন আছে পরিচয়-এ। এটি ১৯৫৯ সনে অনুষ্ঠিত ঢাকার নিখিল পাকিস্তান দ্বিতীয় সঙ্গীত সম্মেলনের বিবরণ বলেই মনে পড়ে। গল্প লিখেছিলেন সেবাব্রত চৌধুরী (ত্রিবেণী); আনোয়ার মিজান (কথা ছিল); জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (অচেনা); দেবব্রত চৌধুরী (বিষামৃত); বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (পিংপংবল); এবং কবিতা লিখেছিলেন সৈয়দ শামসুল হক (কি এক মুহূর্ত); ওমর আলী (সাজান বাগান); তাহের চৌধুরী (একটি চীনা কবিতার অনুকরণে)। হাসান হাফিজুর রহমান 'উনিশশ উনষাট সালের কয়েকটি বই' শিরোনামে একগুচ্ছ পুস্তকের পরিচয় দিয়েছিলেন। রনেশ দাসগুপ্ত লিখেছিলেন শামসুর রাহমানের (প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে') কবিতার বইয়ের সমালোচনা। পরিচয় কি সিনে-মাসিকে সাহিত্য-সংলগ্নতা? নাকি সাহিত্যপত্রিকায় সিনেমা বিষয়ের সংযোজন? এই প্রশ্নের উত্তরে পত্রিকায় বলা হয়:" বাস্তবিক, সিরিয়াস সাহিত্য সৃষ্টির সুস্থ প্রয়াসে একটি সিনেমা পত্রিকা কি করে বিশেষ মানের মর্যাদায় পৌছানোর অভিলাষ পোষণ করতে পারে 'পরিচয়' তারই দুঃসাহসিক ঘোষণা।"[১৬৫]

তথ্যপঞ্জি

১. 'হাসান হাফিজুর রহমান' ; খালেদ খালেদুর রহমান সম্পাদিত, জুন ১৯৮৩, পৃ ১৮-১৯

২. পূর্বোক্ত, পৃ ২১

৩. সম্পাদকীয়, সওগাত ৩৫ বর্ষ ১ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৫৯

৪. সওগাত ৪১ বর্ষ ১ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, পৃ ৫৭

৫. একুশে ফেব্রুয়ারী স্মরণে, পূর্বোক্ত,৫৩ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা মাঘ-ফাল্গুন ১৩৭৭

৬. হাসান হাফিজুর রহমান, 'সওগাতের অর্ধশতাব্দী', আলোকিত গহবর, ঢাকা ১৯৭৭, পৃ ৫৯

৭. কবি ও গল্পকারদের নাম গুলো পত্রিকার ক্রমঅনুসারে (অবশ্যই পাকিস্তান আমলের অংশকে আলাদা করে নিয়ে) সাজানো হয়েছে, ফলে বিভাগপূর্ববর্তী কালের লেখকদের নামও এই তালিকায় অনেক সময় পরে এসেছে। এই নাম উল্লেখ করা হয়েছে পুনর্মুদ্রিত রচনার কিঞ্চিৎ আভাসের জন্য। মাসিকপত্রিকার সকল রচনার বিবরণ দেয়া আসলে দুসাধ্য কাজ। বিভিন্ন বিভাগ ছোট ছোট অসংখ্য আলোচনার নিচে বহুজনের নাম আছে। সিনেমার এবং এরকম অনেক বিভাগের অনেক আলোচনার উল্লেখ করা হয়নি।

৮. সওগাত (সাময়িকী), ৩৫ বর্ষ ১ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

৯. পূর্বোক্ত, পৃ ৫৯
১০. খালেকদাদ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৮
১১. ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, পূর্ববাংলার সাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃ ১-৯
১২. আবদুল গনি হাজারী, 'সাহিত্যে বিপনুবাদ' পূর্বোক্ত, পৃ ৫১
১৩. আনিসুজ্জামান, 'প্রগতি সাহিত্য প্রসঙ্গে', পূর্বোক্ত, পৃ ৫২-৫৪
১৪. সম্পাদকীয় 'সওগাত', ৪১ বর্ষ ১ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, পৃ ৫৯
১৫. মোহাম্মদ মোর্তজা, ভাষার রূপ, পূর্বোক্ত, ৪১ বর্ষ ৬ সংখ্যা বৈশাখ ১৩৬৬, পৃ ৪৬-৪৭
১৬. পূর্বোক্ত, সাহিত্য সম্পর্কে, পূর্বোক্ত, ৪১ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৬৬, পৃ ৯-১১
১৭. ফজলুর রহমান খাঁ, ভাষা ও বর্ণমালা, পূর্বোক্ত, ৪২ বর্ষ ৯ সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৬৮, পৃ ৪৫৪
১৮. আজীজুল হক, পূর্বপাকিস্তানী সাহিত্য : সতর্কতাচর্চা প্রসঙ্গে, সওগাত ৪৭ বর্ষ ৬ সংখ্যা বৈশাখ ১৩৭১, পৃ ৩৮০-৮১
১৯. মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, সাহিত্য ও জাতীয় চেতনা, সওগাত ৪৭ বর্ষ ১১ সংখ্যা আশ্বিন ১৩৭১, পৃ ৮৬৩
২০. আবদুল হক, সাহিত্য-উপভোগ ও সংস্কৃতি, সওগাত ৫০ বর্ষ ৩ সংখ্যা মাঘ ১৩৭৪ পৃ ১৫৩-৫৫
২১. সাময়িকী, সওগাত, ৩৫ বর্ষ ১ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৫৯
২২. পাটের কথা, পূর্বোক্ত
২৩. সাময়িকী, সওগাত ৩৬ বর্ষ ৫ সংখ্যা চৈত্র ১৩৬০, পৃ ৩১৬
২৪. সাময়িকী, সওগাত ৩৫ বর্ষ ১ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ ৬০
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ ৬৩
২৬. সাময়িকী, (পাক-মার্কিন সম্পর্ক), পূর্বোক্ত, ৩৬ বর্ষ ১২ সংখ্যা কার্তিক ১৩৬১, পৃ ৬৯৩
২৭. সাময়িকী, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৮৯
২৮. পূর্বোক্ত, পৃ ৬৮৮
২৯. সাময়িকী, পূর্বোক্ত, ৩৭ বর্ষ ৪-৫ সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৬১, পৃ ২৩৫-৩৬
৩০. 'পঁচিশে বৈশাখ' (সাময়িকী), পূর্বোক্ত, ৪১ বর্ষ ৬ সংখ্যা বৈশাখ ১৩৬৬ পৃ ৫৯
৩১. সাময়িকী, সওগাত, ৪১ বর্ষ ২ সংখ্যা পৌষ ১৩৬৫, পৃ ৬১-৬২
৩২ পূর্বোক্ত, ৪১ বর্ষ ১ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, পৃ ৫৮
৩৩. আবুল ফজল, রেখাচিত্র, পূর্বোক্ত, ৪৭ বর্ষ ১১ সংখ্যা আশ্বিন ১৩৭১, পৃ ৯১১
৩৪. শিক্ষা-সংস্কার, সাময়িকী, পূর্বোক্ত, ৩৬ বর্ষ ১২ সংখ্যা কার্তিক ১৩৬১
৩৫. সওগাত, ৪৫ বর্ষ, ৪ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯, পৃ ৪০৬
৩৬. মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, 'পূর্বপাকিস্তানের সাময়িকপত্র', আমাদের সাহিত্য, ঢাকা ১৯৬৯, পৃ ২৪১
৩৭. গোলাম সাকলায়েন, 'আমাদের সাহিত্যপত্রিকা ও সাহিত্যিক গোষ্ঠী', সংলাপ, জুন ১৯৭০, পৃ ৭৯
৩৮. ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ২৬-১-৯৩
৩৯. সৈয়দ আবুল মকসুদ এর সঙ্গে কথোপকথন ২২-৫-১৯৯৩
৪০. ইমরোজ (সম্পাদকীয়), ১ বর্ষ ১ সংখ্যা আশ্বিন ১৩৫৬
৪১. পত্রিকার ধারাক্রম অনুসারে কবিদের নাম সাজানো হলো
৪২. প্রধান গল্পকারদের রচনার কিছু কিছু শিরোনাম উল্লেখ করা হয়েছে, সব উল্লেখ করা হয়নি। অপ্রধান লেখকদের নামটা কেবল উল্লেখ করা হয়েছে। সংখ্যার ক্রমঅনুযায়ী লেখকদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, বয়স বা খ্যাতির মাপে নয়।
৪৩. কিরণশংকর সেনগুপ্ত ও কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ইমরোজের ১ বর্ষ ১ সংখ্যা আশ্বিন ১৩৫৬তে ছাপা হয়
৪৪. সম্পাদকীয় ১ বর্ষ ৫ সংখ্যা মাঘ ১৩৫৬, পৃ ৩২৮
৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ ৩২৫
৪৬. সম্পাদকীয়, ৪ বর্ষ ৬ সংখ্যা বৈশাখ ১৩৬০, পৃ ২০৪
৪৭. পূর্বোক্ত, ৩ বর্ষ ৫ সংখ্যা চৈত্র ১৩৫৮, পৃ ২৯২
৪৮. পূর্বোক্ত, ৪ বর্ষ ১১ সংখ্যা আশ্বিন ১৩৬০, পৃ ৪১০
৪৯. পূবোক্ত
৫০. সম্পাদকীয়, ২ বর্ষ ৩ সংখ্যা পৌষ ১৩৫৭

Dhaka University Institutional Repository

৫১. পূর্বোক্ত, ৩ বর্ষ ২-৩ সংখ্যা পৌষ-মাঘ ১৩৫৮ পৃ ১৩৪
৫২. সম্পাদকীয়, ১ বর্ষ ৯ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭, পৃ ৫০৭-১০
৫৩. সম্পাদকীয়, ৪ বর্ষ ১ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ ৫৫-৫৬
৫৪. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সাহিত্যে সম্প্রদায়িকতা, ইমরোজ, ১ বর্ষ ১ সংখ্যা আশ্বিন ১৩৫৬, পৃ ৪
৫৫. গোলাম সাকলায়েন, পূর্বোক্ত, পৃ ৭৮
৫৬. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, পূর্বোক্ত, পৃ ২৪২-৪৩
৫৭. হাসান হাফিজুর রহমান, 'সওগাত থেকে সমকাল', আলোকিত গহবর, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ ৩৩ - ৩৫
৫৮. হায়াৎ মামুদ, সিকানদার আবু জাফর, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, পৃ ৪৮-৪৯
৫৯. আবদুল হক, 'তিনি আজ ইতিহাস', নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ ৯৬-৯৭
৬০. পূর্বোক্ত
৬১. আবুল ফজল, উত্তরাধিকার, সমকাল, ১৯ বর্ষ ৭ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৮৪
৬২. পূর্বোক্ত, সাহিত্যের সংকট, সমকাল ২ বর্ষ ৬ সংখ্যা মাঘ ১৩৬৫, পৃ ৩৩২-৩৮
৬৩. পূর্বোক্ত, 'আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার : একটি জিজ্ঞাসা', পূর্বোক্ত, পৃ ২৪৯-৫১
৬৪. আবদুল হক, রাজনীতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সমকাল, ২ বর্ষ ৯ সংখ্যা বৈশাখ, ১৩৬৬, পৃ ৫৮২
৬৫. আবু রায়হান, নির্বাচন চিন্তা : একটি দৃষ্টিকোণ, পূর্বোক্ত, ৮ বর্ষ ৪ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৭১, পৃ ৩২০-২২
৬৬. আবদুল হক, নেতৃত্ব ও গণচেতনা, সমকাল ১৩ বর্ষ ১ সংখ্যা ভাদ্র ১৩৭৬, পৃ ১-৪
৬৭. সম্পাদকীয়, সমকাল, ১ বর্ষ ১ সংখ্যা ভাদ্র ১৩৬৪, পৃ ৬৯-৭২
৬৮. পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ ২ সংখ্যা আশ্বিন ১৩৬৪, পৃ ১৫১
৬৯. কবি ও গল্পকারদের নাম একবার করে পত্রিকার ক্রমানুসারে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাবন্ধিকদের নাম বর্ণানুসারে সাজিয়ে কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস, পুস্তক- সমালোচনা এবং অনুবাদিত লেখা ও সম্পাদকীয় বাদে যাবতীয় গদ্য রচনা, আলোচনা, সমালোচনা, প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি প্রবন্ধের তালিকার মধ্যে সাজানো হয়েছে
৭০. আবদুল হক, তিনি আজ ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ ৯৮-৯৯
৭১. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, জাফরভাই, সমকাল ১৮ বর্ষ নর্বপর্যায় ১ম সংখ্যা মাঘ ১৩৮২, পৃ ১৭
৭২. আবুল কাসেম ফজলুল হক, বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্য, ঢাকা ১৯৮৯ পৃ ১৭
৭৩. আবদুল হক, 'সমকাল এর ভূমিকা', নি:সঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃ ১০২-১০৪
৭৪. শামসুর রাহমান, 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', সমকাল, ১১ বর্ষ ১০-১২ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ -শ্রাবণ ১৩৭৫
৭৫. ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, রবীন্দ্রনাথ ও পূর্বপাকিস্তান, সমকাল ৪ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ ৬৭৫-৭৭
৭৬. সৈয়দ আলী আহসান, 'রবীন্দ্রনাথকে', পূর্বোক্ত, পৃ ৭১৭
৭৭. সিকানদার আবু জাফর, 'সংগ্রাম চলবেই', সমকাল, ৮ বর্ষ ৪ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৭১, পৃ ২৭৬
৭৮. ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, পূর্ববাংলার সংস্কৃতি, সমকাল ১বর্ষ ১ সংখ্যা ভাদ্র ১৩৬৪, পৃ ৩৫-৪১
৭৯. দ্বিজেন শর্মা, 'পূর্ববাংলার সংস্কৃতি' (বিতর্ক), সমকাল, ১ বর্ষ ২ সংখ্যা আশ্বিন ১৩৬৪ পৃ ১৩৭-৪১
৮০. আবদুল গনি হাজারী, 'সংস্কৃতি চিন্তা', সমকাল, ৮ বর্ষ ৩ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৭১, পৃ ১৮৩-৮৪
৮১. বুলবুল ওসমান, ধর্মের সমাজতত্ব, সমকাল, ১০ বর্ষ ১-২ সংখ্যা ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৩, পৃ ৬১
৮২. খাবুরাবি, সমকাল ৯ বর্ষ ৯-১২ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৭৩ পৃ ২৩০
৮৩. গোলাম সাকলায়েন, পূর্বোক্ত
৮৪. মুস্তফা নূরউল ইসলাম, সাক্ষাৎকার ০৭/০৬/১৯৯১
৮৫. পূবালী সম্পাদকীয় ১ বর্ষ ১ সংখ্যা আশ্বিন ১৩৬৭ পৃ ৬৭-৬৮
৮৬. প্রকাশকের নিবেদন, ১ বর্ষ ১০ সংখ্যা আষাঢ় ১৩৬৮
৮৭. লেখক সংঘ পত্রিকা, ১ বর্ষ ৬ সংখ্যা কার্তিক ১৩৬৮, সম্পাদকীয় পৃ ৩৮৮-৮৯
৮৮. ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় সাহায্য, পূবালী ২ বর্ষ ৯ সংখ্যা পৃ ৬৩০
৮৯. আহমদ ফারুক, পুরস্কারের প্রহসন, পূবালী ৪ বর্ষ ২ সংখ্যা, পৃ ১১৭-১৮
৯০. অনেকেই প্রায় প্রতি সংখ্যায় অথবা দু'এক সংখ্যা পরপরই কবিতা লিখেছেন, কিন্তু কবিদের নাম সংখ্যার ক্রম অনুসারে একবার উল্লেখ করা হয়েছে।
৯১. কবিতার নিয়ম গল্পেও প্রযোজ্য। উপর্যুক্ত নিয়মে গল্পকারদের নামগুলো সাজানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৯২. প্রবন্ধ বা আলোচনাগুলোর সামাজিক ও সাহিত্যিক গুরুত্বের কারণে রচনার নামসহ উল্লেখ করা হয়েছে। লেখক নাম বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হয়েছে।

৯৩. মূল লেখকের নাম বাংলা বানানে আদ্যাক্ষর অনুযায়ী অনুবাদসমূহের পরিচয় দেয়া হয়েছে।

৯৪. সিরাজুদ্দীন হোসেন, কোলকাতার বই-এর পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে (আলোচনা), পূবালী, ৪ বর্ষ ২ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৭০, পৃ ১৭৩–৭৭

৯৫. ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, বিদেশী পুস্তকের অবাধ আমদানী ও পুনর্মুদ্রণে আমাদের সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ ১৭৮–৭৯

৯৬. ডঃ মাহফুজুল হক, আমাদের সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন, পূবালী ৭ বর্ষ, ৪-৫ সংখ্যা, পৌষ-মাঘ ১৩৭৩, পৃ ৮৩৩–৩৫

৯৭. নুরুল ইসলাম খান, ইংরেজীর কথা, পূবালী, ৪ বর্ষ ৩ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৭০, পৃ ২৩৭–৪৩

৯৮. আবুল কাসেম ফজলুল হক, ইংরেজীর কথা ও বাংলা প্রচলনের সমস্যা, পূবালী ৫ বর্ষ ১২ সংখ্যা ভাদ্র ১৩৭২, পৃ ১১৭–২২

৯৯. নজরুল হক, নৈতিকমান ও সমকালীন সাহিত্য, পূবালী ২ বর্ষ ৮ সংখ্যা (আলোচনা), বৈশাখ ১৩৬৯, পৃ ৬৩৩

১০০. গোলাম সাকলায়েন, পূর্বোক্ত, পৃ ৮১

১০১. ডক্টর মুস্তাফা নূরউল ইসলামের সঙ্গে ৭/৬/৯১ তারিখের সাক্ষাৎকারে জানা যায়

১০২. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর সঙ্গে ৭/৬/৯১ তারিখের সাক্ষাৎকারে জানা যায়

১০৩. ১নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য

১০৪. ২নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য

১০৫. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, চিঠি, পূর্বমেঘ, ৫ বর্ষ ১ সংখ্যা আষাঢ় ১৩৭১

১০৬. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম আইউব খানের 'উন্নয়ন দশকে' বাংলা একাডেমী আয়োজিত সেমিনারে (১৯৬৮) পঠিত 'পূর্বপাকিস্তানের সাময়িকপত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে পূর্বমেঘের নাম উল্লেখ করলেও গুরুত্ব দেননি। গোলাম সাকলায়েন সংলাপের ১৯৭০ সনের জুন সংখ্যায় 'আমাদের সাহিত্যপত্রিকা ও সাহিত্যিক গোষ্ঠী' শীর্ষক প্রবন্ধে পূর্বমেঘ প্রকাশের সংবাদ দেন অনিয়মের অভিযোগ বা পূর্ববাংলার সাহিত্যপত্রিকার অনিয়ম এর দৃষ্টান্তস্থলে। যেমন : 'তথাপি আশা করবো বিজ্ঞ সম্পাদকদ্বয় পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রাখবেন পর্বতপ্রমাণ অসুবিধা সত্ত্বেও।' (পৃ ৮৩)

১০৭. হায়াৎ সাইফ, গ্রন্থ-প্রসঙ্গে, পূর্বমেঘ ৫ বর্ষ ১ সংখ্যা আষাঢ় ১৩৭১, পৃ ১১৭

১০৮. আবদুল হাফিজ, পূর্বোক্ত, পৃ ১২২–৩০

১০৯. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, পূর্বোক্ত ৫ বর্ষ ২ সংখ্যা আশ্বিন ১৩৭১, পৃ ৮২–৮৭

১১০. ফররুখ আহমদ, পূর্বোক্ত, ২ বর্ষ ১ সংখ্যা, পৃ ১২

১১১. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ ১৪

১১২. আতাউর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ ১৬

১১৩. আহসান হাবীব, ২ বর্ষ ৩ সংখ্যা, পৃ ১৯৩

১১৪. সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃ ১৯১

১১৫. সৈয়দ আলী আশরাফ, 'শিরী ফরহাদতত্ত্ব', ১ বর্ষ ১ সংখ্যা আষাঢ় ১৩৬৭, পৃ ২৭

১১৬. পূর্বমেঘ ১ বর্ষ ১ সংখ্যা পৃ ৮৩

১১৭. পূর্বোক্ত, পৃ ৮৬–৮৭

১১৮. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, গ্রন্থ-প্রসঙ্গে, পূর্বমেঘ ২ বর্ষ ১ সংখ্যা পৃ ৮৪–৮৫

১১৯. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, সাম্প্রদায়িকতা, পূর্বমেঘ ৭ বর্ষ ১–২ সংখ্যা, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৭৩, পৃ ৬৭–৬৯

১২০. বদরুদ্দিন উমর, উপর্যুক্ত পৃ ৭৫

১২১. সালাহউদ্দীন আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ ৮৩–৯০

১২২. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ইংরেজীর ভবিষ্যৎ, পূর্বমেঘ ৭ বর্ষ ১–২ সংখ্যা বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৭৩পৃ ১–১৫

১২৩. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যে চিন্তাধারা, পূর্বমেঘ, ১ বর্ষ ২সংখ্যা আশ্বিন ১৩৬৭

১২৪. মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, পূর্বোক্ত পৃ ২৪৪

১২৫. গোলাম সাকলাকেয়ন, পূর্বোক্ত পৃ ৭৮

১২৬. আবদুল মান্নান সৈয়দ, লিটল ম্যাগাজিন, সাহিত্য সাময়িকী, সম্পাদক : শিরীণ সুলতানা, ডিসেম্বর ১৯৮৮, পৃ ৫৫

১২৭. আহমদ মাযহার, কণ্ঠস্বর : তিনপর্বে, পূর্বোক্ত পৃ ১৮০

১২৮. আবুল কাসেম ফজলুল হক, পূর্ববাঙলার সাহিত্য ও কণ্ঠস্বর, কালের যাত্রার ধ্বনি, ঢাকা ১৯৭৩, পৃ ১১৫–২২

১২৯. কবিদের নাম পত্রিকার ক্রম অনুসারে একবার করে উল্লেখ করা হলেও, প্রধান কবিগণ অনেক লিখেছেন। এঁদের অনেকে গল্প, প্রবন্ধ, আলোচনাও লিখেছেন।

১৩০. শহীদুর রহমান, দুটি কবিতা, কণ্ঠস্বর প্রথম সংকলন ১৯৬৫, পৃ ১০

১৩১. রফিক আজাদ, মৃত্যু : ২, পূর্বোক্ত, পৃ ১১–১২

১৩২. ইমরুল চৌধুরী, সৌরময় নাস্তিকতা , পূর্বোক্ত, পৃ ১৬–১৭

১৩৩. আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পৃ ১–৯

১৩৪. কণ্ঠস্বরে মুদ্রিত স্বাক্ষরের একটি বিজ্ঞাপনের ভাষা এরূপ : "মৃত্যু আমরণ সঙ্গী যাদের/তারা কখনও কখনও/ এক হয়/ মৃত্যুকে প্রতিরোধ করবার/দুর্মর সংকল্প নিয়ে নয়,/মৃত্যুকে শক্তি সঞ্চয়ের জন্যেও নয় —কিংবা নয় মসজিদে গীর্জেয় /ব্যগ্র সমর্পণে ..../ মিলিত হয় / মৃত্যুকে ভয় কোরে দুর্ভাবনায় গভীর নৈরাজ্যে/ একজোটে পালিয়ে পালিয়ে ফিরতে । এই / পালিয়ে ফেরার মধ্যবর্তী অবিনশ্বর সময়াংশগুলি/ ভয়ঙ্কর মধুর মৃদু

Dhaka University Institutional Repository

করুণ/ ঈশ্বরপ্রতিম শব্দ সমন্বয়ে / ঘটনা হবে। আর সেই / অন্তরঙ্গ ঘটনাবলীর সাম্প্রতিকগ্রন্থ 'স্বাক্ষর' তৃতীয় সংকলন এ শীতেই বেরুচ্ছে। দাম এক টাকা।" (কণ্ঠস্বরের প্রথম সংকলনের শেষ প্রচ্ছদ থেকে)

১৩৫. আবুল কাসেম ফজলুল হক, পূর্বোক্ত

১৩৬. মাসিক সাহিত্য, সম্পাদক ঃ হেমায়েত হোসেন (নারায়ণগঞ্জ), বিপ্লব সংখ্যা ১৯৬০

১৩৭. সাহিত্য, পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যে দুর্নীতি সম্পর্কে বিশেষ অসাধারণ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৯, পৃ ১৮৬

১৩৮. বেনজীর আহমদ, 'সাহিত্যে দুর্নীতি ও জাতীয় চরিত্রে তার প্রভাব' ; পূর্বোক্ত পৃ ১৬০

১৩৯. মনিউদ্দীন আহমদ, পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের বর্তমান ধারা, (লেখক সংঘের দ্বিতীয় সভায় পঠিত) সাহিত্য, মাঘ-ফালগুন ১৩৬৭ সংখ্যা, পৃ ৪ ; এবং আবদুল গনি হাজারীর বক্তব্যের জন্য দেখুন সওগাত, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯ পৃ ৫০-৫১

১৪০. খোন্দকার সিরাজুল হকের ০৬/০৭/১৯৯১ তারিখের পত্র থেকে

১৪১. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, সমকালীন সাহিত্যচিন্তা, যাত্রী, ১ বর্ষ, ৭-৮ সংখ্যা (যুগ্ম) মার্চ-এপ্রিল ১৯৬০, পৃ ২৮

১৪২. ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব, আলু দর্শনের ভূত ও ভবিষ্যত, সুন্দরম্ ১ বর্ষ ১ সংখ্যা আগষ্ট ১৯৬৩, পৃ ১১

১৪৩. ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, শিক্ষকের দায়িত্ব, পূর্বোক্ত, পৃ ৯

১৪৪. আল মাহমুদ, তৃষ্ণার ঋতুতে, পূর্বোক্ত, পৃ ২৪.

১৪৫. আমিনুল ইসলাম বেদু লিখেছেন ঃ সাম্প্রতিকের প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসাহী কয়েকজন তরুনের প্রচেষ্টায়। চাঁদার টাকায় একটি মাত্র সংখ্যাই বের হয়েছিল। যাঁদের চাঁদায় সাম্প্রতিক বের হয়, তাঁরা হলেন ঃ জনাব আলতাফ হোসেন জোয়ারদার, শাহজাহান হাফিয, আবদুল মান্নান সৈয়দ, মফিজুল আলম, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। এঁদের মধ্যে আলতাফ হোসেন ১৯৭১ সনে পাকবাহিনীর দ্বারা নিহত হন। সাম্প্রতিক আবার ১৯৬৯ (প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৭০ সন থেকে) মাসিক পত্রিকা হিসেবে অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। দ্রঃ সাম্প্রতিক ৪ বর্ষ ১ সংখ্যা জুন-জুলাই ১৯৭৩ পৃ ৪৭

১৪৬. আবদুল মান্নান সৈয়দ, পূর্বোক্ত

১৪৭. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, চিঠি, পূর্বমেঘ, ৫ বর্ষ ১ সংখ্যা ১৩৭২

১৪৮. স্বাক্ষর, প্রথম সংকলনের শেষ প্রচ্ছদের উক্তি থেকে। এই কথাগুলো রফিক আজাদের বলে আসাদ চৌধুরীর নিকট থেকে প্রাপ্ত 'স্বাক্ষর'-এর সংখ্যাগুলোতে নোট লিখিত রয়েছে

১৪৯. শহীদুর রহমান, রুগ্ন আত্মার ভাষণ (কবিতা) স্বাক্ষর, দ্বিতীয় সংকলন ১৯৬৪ পৃ ৪১

১৫০. রফিক আজাদ, জ্বরাগ্রস্তদের সগতোক্তি, পূর্বোক্ত, তৃতীয় সংকলন ১৯৬৫, পৃ ৭

১৫১. আসাদ চৌধুরী, নভেম্বরের পূর্ণিমায় রচিত আত্মা বিষয়ক পদ্য শীর্ষক কবিতা ১৯৬৪-র দ্বিতীয় সংকলনের ৩৮ পৃষ্ঠায় আছে। কবিতাটি আসাদ চৌধুরী পরিমার্জন করে রেখেছেন

১৫২. স্বদেশ, ১ বর্ষ ৪ সংখ্যা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২

১৫৩. পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, কার্তিক-ভাদ্র ১৩৭১

১৫৪. পূর্বোক্ত

১৫৫. মফিজ উদ্দিন আলী মহাম্মেদ চৌধুরী বা মফিজ চৌধুরী (১৯২২-৯৪) স্বাধীন বাংলাদেশে মুজিব-মন্ত্রীসভায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। ঢাকার ইন্দিরা রোডে তাঁর বাড়ী। কবিতা উপন্যাস ও গল্প লিখতেন। অর্থাৎ সাহিত্যের ব্যাপারে উৎসাহী, সংস্কৃতিসেবীর মন তাঁর ছিল। প্রগতিশীল প্রবীণ ও তরুণ লেখক বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ঘনিষ্টতা ছিল। তিনিই স্বদেশের মূল প্রবর্তক ও প্রযোজক। ১২০০০ হাজার টাকা পূঁজি দিয়ে বেকার তরুণ সাহিত্যসেবক আহমদ ছফাকে 'স্বদেশ' চালাবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু আহমদ ছফার ব্যবস্থাপনায় ১২০০০ হাজার টাকায় তিন-চারটে স্বদেশ বেরুবার পর মূলধন সব ফুরিয়ে যায়। আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 'স্বদেশ'ও বন্ধ হয়ে যায়। সত্বাধিকারীর আশা ছিল উক্ত টাকা খাটিয়ে আহমদ ছফা স্বদেশকে নিয়মিত এবং বিকশিত করবেন। রাসেল সংখ্যা অনুসন্ধানে পাওয়া যায়নি। সূত্র ঃ আবুল কাসেম ফজলুল হকের সঙ্গে ২০/৬/৯২ তারিখের সাক্ষাৎকার

১৫৬. ভুঁইয়া ইকবালের ২৯/৭/৯১ তারিখের পত্র থেকে

১৫৭ + ১৫৮ + ১৫৯ + ১৬০. মেঘনা, ১ বর্ষ ১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৭৪,

১৬১. পূর্বোক্ত, সম্পাদকীয়, ১ বর্ষ ৫-৬ সংখ্যা (যুগ্ম) ; সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৬৭.

১৬২ + ১৬৩ + ১৬৪. শামসুল হক, বাংলা সাময়িকপত্র, ১ম খণ্ড, পৃ ১০৬

১৬৫. এখানে শামসুল হকের উপর্যুক্ত গ্রন্থ এবং বিভিন্নভাবে অনুসন্ধানের তথ্যাবলম্বনে 'সাহিত্য পত্রিকা' হিসেবে প্রকাশিত কতিপয় সাময়িকের আলোচনা করা হলেও, এই তালিকা যে দীর্ঘতর করা যায়না, তা নয়। তবে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে এদেশের আলোচ্যকালের সকল প্রধান পত্রিকার আলোচনাই স্থান পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

মার্কসীয় মতবাদ প্রভাবিত কতিপয় সাহিত্যপত্রিকা

প্রস্তাবনা

এ-ধারার পত্রিকাগুলো নিয়মিত নয় বলে ঋজু ও পুষ্ট নয় ইসলামী ধারার মতো; অনিয়মিত বলে ক্ষীণ কিন্তু স্ফুলিংগের ন্যায় উজ্জ্বল এবং প্রতিভার দীপ্তিতে ভাস্বর। চল্লিশের দশকে পাকিস্তান-আন্দোলনকে মুসলিম লীগ প্রাণবান করলেও এই আন্দোলনের ধারাকে গতিশীল করেছিলেন প্রগতিবাদী সাহিত্যিক-সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীনেতৃবৃন্দ। তাঁরা জনগণের সামনে নতুন স্বদেশে জীবনের বহুমাত্রিক স্ফূর্তি ও বিকাশের কথা বলেছিলেন বলেই জনগণ পাকিস্তানকে এরকম মনে-প্রাণে প্রত্যাশা করেছিলেন। এই প্রত্যাশা-জাগ্রতকারী সংগঠক ও কর্মীদের মধ্যথেকেই আজাদীলাভের পরবর্তী সংবাদ ও সাহিত্যিবিষয়ক সাময়িকপত্রসমূহ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছিল বলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পূর্ববাঙলার পত্র-পত্রিকাসেবীগণ উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থা এবং স্বদেশহিতের সহায়ক প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি প্রবর্তনের পক্ষে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন। তমদ্দুন মজলিশের মুখপত্র 'সৈনিক' (১৯৪৮-৫৭) : হিন্দু-সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'চাবুক' (১৯৩৩-৪৯), এবং 'কৃষ্টি' (১৯৪৭) ; চাটগাঁর 'সীমান্ত' (১৯৪৭-৫৩/৫৪)— সকল পত্রিকার বক্তব্যই প্রগতিশীল, জড়তা-আড়ষ্টতা ও সংস্কারমুক্ত, উন্নত সমাজব্যবস্থার সপক্ষে নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে উচ্চারিত। কিন্তু ক্রমে মুসলিম লীগের দক্ষিণপন্থীদের ক্ষমতা দৃঢ়ীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে কমিউনিস্ট কার্যক্রম কঠোর ভাবে দমন করা হয়। নন-কমিউনিস্ট অথচ বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের বাঙলা ও বাঙালি-সংস্কৃতি-চিন্তাচর্চার আগ্রহেরও উচ্ছেদসাধনপূর্বক তদস্থলে পাকিস্তানী একজাতীয় ভাষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি চিন্তাধারার বাস্তবায়ন করার যাবতীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপের ফলে ইসলামী-পাকিস্তানবাদী ধারা সচল-সক্রিয় ও বেগবান হয়ে ওঠে। ১৯৬০-৬২ পর্যন্ত প্রায় সকল বাঙালিই 'পাকিস্তান-জিন্দাবাদ' — এই শ্লোগানেই তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট ছিলেন। ফলে আইউবী সামরিক শাসনামলে এবং পরবর্তী অবক্ষয়ী-ব্যবস্থার ফলে প্রগতিশীল কার্যাবলী একদম স্তিমিত হয়ে আসে। এজন্য ১৯৫৩-৫৪ থেকে প্রগতিশীল ও মার্কসীয় আদর্শ প্রভাবিত সাহিত্য-চর্চার নমুনা কিংবা এ-ধারার পত্র-পত্রিকা কম প্রকাশিত হতে দেখা যায়। পূর্ব-বাঙলায় ৯২-ক ধারা জারীর পর এই সব প্রচেষ্টা 'আণ্ডার গ্রাউণ্ডে' চলে যায়। সামরিক শাসন ওঠে গেলেও ১৯৬৫/৬৬ সালের পূর্বে এধারা আর বেগবান হতে পারেনি। বলা বাহুল্য, সেজন্য পাকিস্তানী-পররাষ্ট্রীয় নীতির পরিবর্তনই অধিকাংশ কৃতিত্বের দাবিদার। ছয় দফা আন্দোলনের বুর্জোয়া, মধ্যশ্রেণীর আদর্শ অনুযায়ী একধরনের প্রগতিশীলতা—অনেকটা ফ্যাশন-স্বরূপ হলেও এদেশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল।

১৯৪৭-৭১ পর্বে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকাগুলোর মধ্যে মোটামুটিভাবে যেগুলোতে মার্কসীয় মতাদর্শের কিছু না কিছু প্রভাব আছে— অন্তত নিজেদেরকে প্রগতিশীল বলে আত্মপরিচয় দিতে যাঁরা পছন্দ করতেন, তাঁদের পত্রিকাগুলো হলো ঃ (১) কৃষ্টি (১৯৪৭); (২) সীমান্ত (১৯৪৭-৫৩/৫৪); (৩) সংকেত (১৯৪৮); (৪) অগত্যা (১৯৪৯-৫৩); (৫) মুক্তি (১৯৫০); (৬) পরিচিতি (১৯৫১-৫৩); (৭) যাত্রিক (১৯৫৩); (৮) স্পন্দন (১৯৫৩); (৯) উত্তরণ (১৯৫৮-৬০); (১০) পলিমাটি (১৯৬৩-৭১); নাগরিক (১৯৬৪-৭০)।

লক্ষ্য করা যাবে এর কোনো কোনোটাতে কায়েদে আজম ও পাকিস্তানের প্রতি লক্ষনীয় আনুগত্য রয়েছে। অথচ তাঁরা প্রগতিশীলতার কথা বলেছেন। এর কারণ তৎকালের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য। কায়েদে আজম ১৯৪৮ সনেই হঠাৎ ইন্তেকাল করেছিলেন। তাঁর কপটতা জনসাধারণ ভালো করে বুঝবার আগেই মৃত্যু তাঁকে বাঁচিয়েছিল কিছুটা। তাছাড়া ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হবে বলে কায়েদে আজমের ঘোষণাও ছিল— সেজন্য কায়েদে আজম আর ধর্ম নিরপেক্ষতাকে একত্রে মিলানো সম্ভব হয়েছিল।

১. কৃষ্টি (১৯৪৭)

আজাদী-উত্তর কালে ১৯৪৮ সন পর্যন্ত (প্রথম বছরে) ঢাকা থেকে কোনো সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়নি বলে যে-ধারনা গবেষকেরা পোষণ করেন [১] তা যে সঠিক নয়--- তার প্রমাণ একাধিক রয়েছে। সাপ্তাহিক 'চাবুক' ৪৭-পূর্বকাল থেকে ঢাকা থেকেই নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছিল; তাছাড়া আরও পত্র-পত্রিকা তখন বের হতো বলে 'চাবুক' থেকেই অনুমান করা যায়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত আজাদী-উত্তর সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের ঐতিহ্য খুঁজতে গেলেও নিরাশ হওয়া চলেনা — কারণ 'সীমান্ত'এবং 'কৃষ্টি' বাঙলা মাস-সনের হিসাবে একই কালে প্রকাশিত হলেও পত্রিকার গায়ে (কৃষ্টির) লিখিত খ্রীস্টিয় সন তারিখের হিসাবে 'সীমান্ত' থেকে 'কৃষ্টি' কে পূর্ববর্তী বলে ধরে নিতে কষ্ট হয়না। কৃষ্টি প্রকাশের তারিখ অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৪৭, কার্তিক ১৩৫৪। 'সীমান্ত' নভেম্বর '৪৭ এ প্রকাশিত হয় যদিও কার্তিক ১৩৫৪ সন তাতে লেখা আছে।

একটি 'সাহিত্য পত্রিকা'র মধ্যে যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত — কৃষ্টিতে তা বহুল পরিমাণেই পাওয়া যায়। যদি বলা যায় আজাদী-উত্তর উন্নত

Dhaka University Institutional Repository

মানের প্রথম সাহিত্য পত্রিকা 'কৃষ্টি' তাতে অত্যুক্তি হয়না। নিয়মিত প্রকাশের, দীর্ঘ যাত্রার উদ্দেশ্য ও আয়োজন কৃষ্টি-কর্তৃপক্ষের ছিল। কিন্তু 'কৃষ্টি' স্পষ্টত মার্কসীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল বলে এবং এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সকলেই হিন্দু-সম্প্রদায়ের ছিলেন বলে প্রথম সংখ্যার পরে আর প্রকাশের সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়নি। অনুমান করে বলা চলে, মুসলিম-লীগ সরকারের কর্ণধারেরা এর কণ্ঠ চেপে ধরেছিলেন। নচেত দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত না হবার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায়না। প্রথম সংখ্যায় কটি লেখা আছে যার পরবর্তী অংশ পরের সংখ্যায় প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সমাজতন্ত্র; সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদি কথা পত্রিকায় ছিল বলে পাকিস্তানের প্রথম দিকে একে ঘোরতর সন্দেহের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। তাছাড়া বাঙলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির পক্ষে স্পষ্ট সুপারিশ এবং সংগ্রামের প্রত্যয় কৃষ্টিকে পাকিস্তানী প্রশাসনের কোপানলে নিক্ষেপ করেছিল। এর পর ১৯৫০ এর দাঙ্গার ভয়াবহতা দেখে সকলেই হয়তো উদ্বাস্তু হয়ে দেশত্যাগ করেছিলেন। পরবর্তীকালে কৃষ্টি সম্পর্কে কোনো স্মৃতিকথাও সেকারণে এদেশ থেকে প্রকাশিত হয়নি। তবে কৃষ্টির একটি সংখ্যা মাত্র প্রকাশ পেলেও (তথ্য দৃষ্টে তাই মনে হয়, আরও দুএকটি লেখায় প্রথম সংখ্যার পর 'কৃষ্টি' আর বের হয়নি বলে মন্তব্য করা হয়েছে)[২] একটি সংখ্যা দিয়েই 'কৃষ্টি' পূর্বপাকিস্তান বা পূর্ব বাঙলার কৃষ্টির ইতিহাসে নিজের মূল্য ও অবস্থান উজ্জ্বল ও স্থায়ী রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে— কারণ এই পত্রিকার বক্তব্য এবং সাহিত্যিক-শৈল্পিক মান উন্নত ধরনের ছিল। একটি যথার্থ সাহিত্য পত্রিকা যে সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্য-শিল্পের উন্নতি সাধনের মহান ব্রত নিয়েই প্রকাশ পেয়ে থাকে— সেই সচেতন-সক্ষমতার বোধ -বুদ্ধি ও স্বদেশ হিতৈষণা তাঁদের ছিল।[৩]

'কৃষ্টি' প্রকাশিত হয় গোদনাইল, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা থেকে (কৃষ্টির 'অফিস' বলে উল্লিখিত)। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার গায়ে পরিচালকমণ্ডলীর (সম্পাদকমণ্ডলী?) সদস্যরূপে : সুধাংশু রায়, প্রভাত সরকার, সাধন চ্যাটার্জী, ফুলদা রায়, জীবন গোস্বামী প্রমুখের নাম মুদ্রিত আছে। সম্পাদক প্রকাশক মুদ্রকের কোনও তথ্যের উল্লেখ নেই। পরিচালক বলতে তাঁরা সম্পাদক বুঝিয়ে থাকবেন হয়তো। প্রাপ্ত সংখ্যার সাইজ ডিমাই ১/৪ সাদা কাগজ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৫ এর মধ্যে বিজ্ঞাপন ১০ পৃষ্ঠা। কৃষ্টির নিয়মাবলীতে বলা হয় ঃ "প্রতিবাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। কার্তিক মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা এবং বিশেষ সংখ্যা এক টাকা। বার্ষিক সডাক চাঁদা ছ' টাকা এবং ষান্মাসিক তিন টাকা। কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। রচনার মৌলিকত্ব রক্ষা করিয়া প্রয়োজন বোধে উহার সংশোধন বা অংশ বিশেষ বর্জন অথবা প্রকাশভঙ্গি পরিবর্তন করিবার অধিকার সম্পাদকের থাকিবে।' পত্রিকার মুদ্রণ পারিপাট্য ভালো। এই পত্রিকার একটি মাত্র প্রাপ্ত (বা প্রকাশিত) সংখ্যার সূচীপত্র নিম্নরূপ ঃ কৈফিয়ৎ (সম্পাদকীয় — কয়েকটি উপশিরোনাম : 'উল্লসিত সাম্রাজ্যবাদী', 'বাঙালি বিদ্বেষ', 'শিক্ষার ভাবী মাধ্যম', 'পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা শহর');

শ্রী লীলা দেবী (প্রবন্ধ) রবীন্দ্রনাথের চিঠি; শ্রী অমিয়েশ দাশগুপ্ত (কবিতা) দুটি গান; শ্রী প্রভাত কিরণ সরকার (গল্প) স্মৃতি-তীর্থ; শ্রী সুরেন্দ্র মোহন পঞ্চতীর্থ (জীবনী-আলোচনা) চন্দ্রাবতী; শ্রী কিরণ শংকর সেনগুপ্ত (কবিতা) স্তব্ধতা; অরুণোদয় (একঘন্টাকালে অভিনয়যোগ্য নাটক) সাইরেন (১২ পৃষ্ঠার বড় লেখা; লেখকের নাম অনুক্ত) শ্রী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কবিতা) মনোরমা; মুহম্মদ (ডক্টর) এনামুল হক (প্রবন্ধ) পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা ; পরিচালক (অর্থাৎ সম্পাদকদের কেউ; প্রবন্ধ) পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প-সম্ভার ঃ বস্ত্রশিল্প; আবদুল মান্নান (কবিতা) স্বাধীনতার ঝাণ্ডা উড়াও; শ্রী গোপাল ব্যানার্জী (কবিতা) জাতীয় পতাকা।

'কৈফিয়ৎ'-এ পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় ঃ 'কৃষ্টি-পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতিমূলক বাংলা মাসিক পত্রিকা। অনেকেই নামের উপর জোর দিয়ে থাকেন, ... এরপরও যদি অর্থ খোঁজেন, বলবো, কিছু আছে। সেকস্‌পীয়রের কথায় বলবো - হোয়াট ইস ইন অ নেম্‌এ? চলতি সাময়িকপত্রিকার মতো গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক ইত্যাদি দিয়ে পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে পারলেই হোল। পাঠক খুশী হলেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হোল। কিন্তু এটা হলো মুখ্য উদ্দেশ্য। এর পরে যুগের দাবী অনুযায়ী আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করবো সুধী-পাঠক সমাজকে বিশুদ্ধ সাহিত্য-রস পরিবেশন করতে। হয়ত তাতে মানসিক উৎকর্ষ বিধানে সাহায্য করবে। কতটুকুই বা পারবো?

বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে যে 'কালচার' গড়ে উঠেছে আমরা তারই অনুশীলন করে যাবো। অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন ভাষাগত 'কালচার' কি ভৌগলিক সীমারেখা দ্বারা নির্দেশিত হবে? কিন্তু কালচারের বাস্তবসত্ত্বা খুঁজতে গেলে আমরা ভুল করবো। ... সমগ্র বাংলা ভাষা-ভাষী ব্যক্তির মাঝে যে বিশেষ মনোবৃত্তি যুগ-যুগ ধরে ফল্গুনদীর মতো অন্তর্নিহিত হয়ে আসছে তারই পরিস্ফুটনকে বলবো 'কালচার'। আমরা তাকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করবো। তাকেই সহজভাবে অনুবাদ করতে গিয়ে নামের সাথে সত্তার সামঞ্জস্য রাখতে পারিনি, বলেছি 'কৃষ্টি'। রসিকসমাজ একে 'সংস্কৃতি' বলেও আখ্যা দিতে পারেন। তাতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। পত্রিকার বিষয়বস্তুই নামকে জাগিয়ে তুলবে।

"কৃষ্টি সাহিত্যিক পত্রিকা। বিশেষভাবে সাহিত্যই এর উপজীব্য। কিন্তু এ সাময়িকপত্রিকা। তাই বর্তমানকে আলোচনা করতে গিয়ে রাজনীতি বা সমাজনীতির ছোঁয়াচ একেবারে এড়াতে হয়ত পারব না। কিন্তু রাজনীতি বা সমাজনীতির কোন বিশেষ মতবাদের সমর্থক আমরা নই। তাই আমরা সাময়িক রাজনীতি বা সমাজনীতি—নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করব। ... নতুন লেখক গোষ্ঠীকে (প্রতিভা বিকাশের জন্য) সাহায্য করবো তাঁদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখবার জন্যে। এতে করে যদি আমরা একজন সাহিত্যিককে বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তাহলে আমাদের এই উদ্যম সার্থক হবে. ... দেশের চঞ্চল পরিস্থিতির জন্য ... আপ্রাণ চেষ্টায় .... অত্যন্ত অল্প সময়ে বের করেছি ... ত্রুটি পরের সংখ্যায় ঘটতে দেবোনা।"

'কৃষ্টি'র লেখাসমূহ ঐতিহাসিক বিবেচনায় আজ সেকালের এক মূল্যবান সমাজ দর্পন হয়ে পড়েছে। এর বিজ্ঞাপনগুলোর মধ্যে অধিকাংশই বস্ত্রমিলের এবং প্রেসের। এ-থেকে অনুমান করা যায় পত্রিকা প্রকাশের নেপথ্যে বস্ত্রমিলের মালিক-পুঁজিপতিদের পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে— এবং এ-কারণেই সমাজতান্ত্রিক ভাবনা এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ বিবেচনাকালে বস্ত্র মালিকদের স্বার্থকে তাঁরা অগ্রাহ্য করতে পারেননি।অথবা বস্ত্র শিল্পের

Dhaka University Institutional Repository

মালিকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে পত্রিকাটি শ্রমিকদের স্বার্থের অনুকূলে বক্তব্য উচ্চারণ করতে পারেননি।

বস্ত্রমিলের বিজ্ঞাপন দিতে গিয়ে যেসব কথা লেখা হয়েছে, তাতে যেমন তৎকালীন সমাজের একটি চিত্র পাওয়া যায়, তেমনি বস্ত্রশিল্পের এবং শ্রমিক শ্রেণীর বিভিন্ন দাবি-দাওয়া প্রসঙ্গে সমালোচনীয় সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারনায় অসঙ্গতি বা মালিক স্বার্থের আনুকূল্যও প্রকাশ পেয়েছে। সম্পাদক-গোষ্ঠীর কোনো-কোনো সদস্য কি বস্ত্রমিলের মালিকদের কেউ?— এ-ধারণাও করা অসঙ্গত মনে হয়না। লক্ষ্মী স্পিনিং এ্যাণ্ড উইভিং মিল্স লিঃ, নারায়ণগঞ্জ-এর বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছে : 'অন্ন ও বস্ত্রের দারুণ দুর্ভিক্ষ আজ আমাদের সকল উৎসবকে ম্লান করিয়া দিয়াছে।' আরও লেখা হয়েছে: 'ভারতবর্ষ আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে কিন্তু আজও আমরা পরিধেয় বস্ত্রের জন্য বিদেশী আমদানীর মুখাপেক্ষী। আজ এই বৈপ্লবিক যুগেও যদি আমরা স্বাবলম্বী হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা না করি, তবে আমাদের বহু বৎসরের আত্মত্যাগ ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

'পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প সম্ভার : বস্ত্রশিল্প' শীর্ষক নিবন্ধে জনৈক 'পরিচালক' (বেনামে সম্পাদকমণ্ডলীর কেউ লিখে থাকবেন) লিখেছেন : 'সমাজ ও সাহিত্যে শিল্পের স্থানকে অস্বীকার করা চলেনা। তাই শিল্পের সম্বন্ধে যে কোন প্রবন্ধ সাদরে গৃহীত হবে।' এই পার্থিব জগতে সমস্ত সমস্যার মূলে রয়েছে দুটি একটি প্রশ্ন। অপরটি বস্ত্র। বস্ত্র-সমস্যা পূর্বপাকিস্তানের অত্যাবশ্যকীয় সমস্যা। এর সমাধান করতে হলে বস্ত্রশিল্পের সার্বিক পর্যালোচনা করা দরকার। দেখা যাবে বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে আজ যান্ত্রিকযুগের একাধিপত্য। আলোচনায় পূর্ব পাকিস্তানের বস্ত্রমিলগুলোর উৎপাদনের অবস্থা আলোচনার স্বার্থে তুলে ধরা হয়েছে —

বস্ত্রকলসমূহ	তাঁতসংখ্যা	উৎপাদনের হার
১. ঢাকেশ্বরী কটন মিল (১নং মিল)	৭৮০	৩৩,০০,০০০ গজ
২. ঢাকেশ্বরী কটন মিল (২নং মিল)	৫১১	
৩. চিত্তরঞ্জন কটন মিল	১৫০	৪,০০,০০০ গজ
৪. লক্ষ্মী নারায়ণ কটন মিল	২২২	৪,২৫,০০০ গজ
৫. ঢাকা কটন মিল	১২৪	২,২৫,০০০ গজ
৬. মোহিনী মিল (১নং)	৫১৭	১৫,০০,০০০ গজ
৭. আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রকটন মিল	১১০	২,০০,০০০ গজ
৮. ন্যাশনাল কটন মিল	৩০০	৬,০০,০০০ গজ
৯. ভাগ্য লক্ষ্মী কটন মিল	৬	১২,০০০ গজ
১০. আবু বকর সিদ্দিক কটন মিল	১০০	২,০০,০০০ গজ
১১. লক্ষ্মী স্পিনিং মিল	×	×
	২৮২০	৬৮,৬২,০০০ গজ

পর্যালোচনায় বলা হয় : এইসব মিল থেকে উৎপাদনের সঠিক তথ্য পাওয়া না-গেলেও সম্ভাব্য উৎপাদনকে গণনা করেই আমরা আলোচনা করেছি। এতে দেখা যায়, পূর্ব-পাকিস্তানের সমস্ত কল থেকে মাসে মোট প্রায় ৬৮,৬২,০০০ গজ কাপড় পাওয়া যায় — অর্থাৎ বছরে প্রায় ৮,২৪,৬৪০০০০ গজ কাপড় পাওয়া যায়। পূর্ব পাকিস্তানের লোক সংখ্যা প্রায় ৩,৯১,১১,৯১২। বছরে ১টি লোকের অন্যূন ৩০ গজ কাপড়ের প্রয়োজন পড়ে। ২০ গজ ধরলেও ... উৎপাদিত কাপড়ের পরিমাণ থেকে সোয়া দুই গজ কাপড় মাথা পিছু পেতে পারি। এত বড় সমস্যা সমাধান করতে হলে উৎপাদিত কাপড়ের পরিমাণ দশগুণ বাড়াতে হবে। শুধু কলের সংখ্যা বাড়ালে চলবেনা — তার সঙ্গে প্রয়োজন হবে সুদক্ষ কারিগরের। মিল মালিকগণকে শুধু কল উৎপাদন এবং লাভের অঙ্ক দেখলেই চলবেনা। যে শ্রমিক এ উৎপাদন ও লাভের অঙ্ক বাড়িয়ে চলেছে তাদের উপরও দৃষ্টি দিতে হবে। তাদের দক্ষতার (EFFICIENCY) বিরুদ্ধে নালিশ জানালেই চলবেনা তাদের দক্ষতা বাড়াবার জন্য তাদের জীবন ধারণের মান বাড়িয়ে তুলতে হবে —— বুঝিয়ে দিতে হবে দায়িত্ববোধকে। ... শ্রমিকের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। শ্রমিকদেরও একটা দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব কতটুকুন তাঁরা পালন করবেন তাও তলিয়ে দেখতে হবে। একদিকে যেমন সস্তা সাম্যবাদী বুলি আওড়িয়ে শ্রমিকদের অস্বাভাবিক দাবী পূরণের আশায় বিভ্রান্ত করে দেওয়া উচিত নয়, তেমনি শ্রমিকদের অশিক্ষিত রেখে তাদের জীবন মান কমিয়ে, তাদের দক্ষতাকে পঙ্গু করে রাখা উচিত নয়। ... শ্রেণী সংগ্রাম বা class struggle এর যুক্তি দেখিয়ে মার্কসীয়পন্থীরা যেমন দেশের শিল্পকে পঙ্গু করে তুলছে, তেমনি Burganing মাস্টারের মত অনেক পুঁজিপতি দরকষাকষি করে মানুষের জীবন ধারণের সবচেয়ে নীচু মানকে উপেক্ষা করে শিল্পের প্রসার ক্ষুন্ন করে তুলছেন।[৪]

কৃষ্টি-র 'রাষ্ট্রীয় আদর্শ'বোধের প্রতিফলন ঘটেছে সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী চিন্তার সপক্ষে। ঐতিহ্যের প্রশ্নেও বাঙালির অবিভাজ্য সাংস্কৃতিক সত্তাকেই তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছেন। পাকিস্তানী সংস্কৃতি অর্থাৎ একজাতি, একধর্ম, একরাষ্ট্র, এক স্বার্থ — এই চিন্তাকে সর্বাত্মকভাবে সমর্থন করেননি কৃষ্টির কর্ণধারেরা। তাঁরা কটাক্ষ হেনেছেন আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদকেও। 'উল্লসিত সাম্রাজ্যবাদী' শীর্ষক সম্পাদকীয়

Dhaka University Institutional Repository

নিবন্ধে লেখা হয়ঃ "জটিল কূটনীতির দুর্ভেদ্য চক্রান্ত ও সুদীর্ঘ দু শতাব্দীব্যাপী শ্রম ও সাধনার ফলে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে যে সার্থক সাম্প্রদায়িক কলহের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করা হয়েছে তাতে করে মিঃ চার্চিল যে অত্যধিক প্রলুব্ধ হয়েছেন তা তাঁর সম্প্রতি প্রদত্ত এক্সেস শহরের বক্তৃতাতেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ... কুচক্রী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এতদিন নির্বিবাদে যাদের শোষণ করে আসছিল, আজ তারা বৃটিশ নাগপাশ ছিন্ন করেও যে সুস্থ বোধ করতে পারছেনা এটুকুই কি সাম্রাজ্যবাদীদের আজ সান্ত্বনার কারণ নয়? আজ আমাদের একথা কিছুতেই ভুললে চলবেনা যে সাম্প্রদায়িক অশান্তি যদি এখনও প্রশ্রয় প্রায়, তাহলে আমাদের সর্বনাশ অনিবার্য। দেশের সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধকে সুষ্ঠু ও সমুন্নত রাখবার গুরুদায়িত্ব আজ আমাদেরই ওপর ন্যস্ত। যারা এখনও মধ্যযুগীয় দুর্নীতি সমর্থন করে, তারাই যে নিঃসংশয়ে নবজাত পাকিস্তান এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু, একথা উপলব্ধি করবার সময় আমাদের সম্মুখীন।'

'বাঙালী বিদ্বেষ' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয় ঃ "বিহার ও আসামের বিভিন্ন স্থানে সম্প্রতি বাঙালী বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। .... বাঙলা ও আসামের মধ্যে বিদ্বেষের প্রশ্ন নিতান্তই অবাঞ্চনীয়, যুক্তিহীন ও বিষ্ময়কর; বরং বাঙালী ও অসমীয়াদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব ও অকুণ্ঠ নৈকটের প্রসারই সমধিক কাম্য।' 'শিক্ষার ভাবী মাধ্যম' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয় : ... 'আজ আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি; পরকীয় প্রভাব-জর্জর-সংস্কৃতি মোহ থেকে নিস্কৃতি লাভ করবার এই-ই প্রকৃষ্ট সময়। ইংরেজী ভাষায় সাংস্কৃতিক মূল্য অস্বীকার না-করলেও রাষ্ট্রীয় জীবনের গঠনমূলক সম্পর্কে ইংরেজী ভাষার মূল্য আমরা অস্বীকার করবো বৈকি। শুধু শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারেই নয়। শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও বাংলার মাধ্যম সুপ্রবর্তিত হোক আমরা এ কামনাই করবো।'

পত্রিকাটি হিন্দু সম্পাদিত বলে কমিউনিস্ট, পাকিস্তান-বিরোধী এবং ভারতের দালাল খ্যাতি পেয়ে থাকবে সমকালে, কিন্তু তাঁরা যে দেশপ্রেমিক স্বদেশহিতৈষী ছিলেন এবং পূর্ব বাঙলার সার্বিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা শহরেরও শ্রীবৃদ্ধি চাইতেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় 'পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা শহর' শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যে। নতুন রাজধানীকে উন্নত করার এবং রাজধানীর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসিক বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যে জরুরী সে বিষয়ে পত্রিকাটি যুগোপযোগী প্রস্তাব উত্থাপন করে এবং প্রসঙ্গত রেখে-ঢেকে তাঁরা যে- কথাটি বলতে চেয়েছেন, তাহলো সংখ্যালঘু হিন্দুদেরকে জোর করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে/উঠিয়ে দিয়ে সরকারী কর্মচারীদের বাসস্থান সমস্যা দুরীকরণের প্রয়াস হীন পদ্ধতি। পরিত্যাক্ত বাড়ী দখল সম্পর্কে পত্রিকার বক্তব্য : "সরকারপক্ষও যেমনি বাড়ী দখল করবার মনোভাব রাখবেন না, জনসাধারণও তেমনি বাড়ী আটক রাখবার মনোভাব রাখবেন না।' সরকারী মনোভাবকে কটাক্ষ করা হলেও চাপের মুখে এ ব্যাপারে খোলাখুলি মতামত ব্যক্ত করতে পারছিলেন না বলে কমিউনিস্ট বা মার্কসীয় মতাদর্শের পত্রিকার তথা সংখ্যালঘুদের বাক, ব্যক্তি ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা যে কতোটা হুমকির সম্মুখীন ছিল মানসচক্ষু সামান্য উন্মীলন করলেই তা সহজে উপলব্ধি করা যায়।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ, উন্নতির চিন্তা করে সকল বিষয়েই যেনো আদর্শ-স্থানীয় হয়ে ওঠে পাকিস্তানের সকল নাগরিক —সেজন্য অবতারণা করেছিলেন রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিত। এই প্রবন্ধে তিনি উর্দুকে একটি অপরিচিত বিদেশী ভাষা বলে বর্ণনা করেন এবং এই ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার বিরোধীতা করেন। তিনি বলেন, 'এই ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকার করিয়া লইলে, বাংলা ভাষার সমাধি রচনা করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তাবাসীরও জাতি হিসাবে 'গোর' দেওয়ার আয়োজন করিতে হইবে।' রাষ্ট্রভাষার সঙ্গে জাতীয় মর্যাদা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন জড়িত। উর্দু ইসলামী সাহিত্যে সমৃদ্ধ, উত্তর-ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা দরকার— এইসব যুক্তির অসারতা প্রদর্শন করে লেখক পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য উর্দু এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন : 'এক রাষ্ট্রে একাধিক (রাষ্ট্র)ভাষা অচল এই শ্রেণীর ধারণা সাম্রাজ্যবাদের পরিপোষক।' উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সম্ভাব্য ফলাফল বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন ঃ "ইহাতে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সর্বনাশ ঘটিবে। ... উর্দু বাহিয়া আসিবে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর মরণ, — রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যু। এই রাষ্ট্রীয় ভাষার সূত্র ধরিয়া শাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সর্ববিষয়ে পূর্ব-পাকিস্তান হইবে উত্তর ভারতীয় এবং পশ্চিমপাকিস্তানী উর্দু ওয়ালাদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র, যেমন ভারত ছিল ইংরেজী রাষ্ট্র ভাষার সূত্রে ইংরেজদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র' – এই বক্তব্যে 'উর্দুকে বিদেশী ইংরেজীর মত রাষ্ট্রভাষার সমপর্যায়ে স্থাপন এবং একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার প্রস্তাবকে ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের হাতিয়ার হিসেবে বর্ণনা লক্ষণীয়।[৫]

মুহম্মদ এনামুল হকের প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করার সাথে সাথে 'কৃষ্টি'ও স্মরণীয় মর্যাদা লাভ করেছে। প্রবন্ধের মুল্যবান অংশটা উদ্ধৃত করা হলো ঃ "পাকিস্তন একটি বিশাল রাষ্ট্র। পূর্ব ও পশ্চিম — এই দুই অঞ্চলে ইহা বিভক্ত। .... এক অংশের সহিত অপর অংশের যোগাযোগ রক্ষা করা একটা জটিল সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। ... দেশে অশান্তি দেখা দিলে যোগাযোগ রক্ষা করা একরূপ কঠিন। এই সমস্যার সুচারু সমাধান কখন সম্ভবপর হইবে, তাহা একমাত্র ভবিতব্যই বলিতে পারে।

সংস্কৃতির দিক হইতেও পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের অবস্থা একরূপ নহে। ... প্রকৃতিই এই অঞ্চলের লোককে এমনভাবে সৃষ্টি করিয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে.. সাংস্কৃতিক দিক হইতে কোন প্রকার সামঞ্জস্য নাই।

তবে ধর্মীয় দিক হইতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান একসূত্রে আবদ্ধ, — বলা বাহুল্য , এই অঞ্চলদ্বয়ের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কথা বাদ দিয়াই চিন্তা করা হইতেছে। মনে রাখা উচিত, ধর্ম্ম মানব-সংস্কৃতির একটি প্রধান অংশ বটে, কিন্তু ইহা তাহার সমস্তটুকু নয়। একমাত্র ধর্ম ব্যতীত মানব সংস্কৃতির অন্যান্য দিক, যেমন , ভৌগলিক প্রভাব, মানব-গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য, জীবন-যাপন-প্রণালী, শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি দিক হইতে পাকিস্তানের উভয় অংশে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যের ভাগই বেশী।

ধর্ম-বন্ধনও অচ্ছেদ্য বন্ধন নহে। ... ভাষার বন্ধনও অচ্ছেদ্য বন্ধন নহে। ... ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক প্রেরণাকে যাহারা এই নবীন রাষ্ট্রের অন্তঃসলিলা ফল্গু

Dhaka University Institutional Repository

বলিয়া মনে করেন, কিংবা প্রকৃত রাষ্ট্রীয় বন্ধন বলিয়া নির্বিচারে স্বীকার করেন, তাহাদের রাষ্ট্রীয় দৃষ্টি স্বচ্ছ ত নহেই; বরং অদূরদর্শিতার ঘোর কুয়াশাজালে সমাচ্ছন্ন। ... পাকিস্তান রাষ্ট্রগঠনে ধর্ম বা সম্প্রদায় বড় নহে, আত্মনিয়ন্ত্রণই বড়। কেননা, আত্মনিয়ন্ত্রণ-নীতির ভিত্তিতেই এই রাষ্ট্র পরিকল্পিত ও পরিমূর্তিত। মনে রাখিতে হইবে, আত্মনিয়ন্ত্রণ-নীতি স্বার্থপরতার নীতি, — নি:স্বার্থতার নীতি নহে। এইজন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থ আত্মপ্রাধান্য স্থাপন; — আত্মবিসর্জন নহে। কারণ আপন-আপন ধর্ম-কর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, ভাব-ভাষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, জীবন-যাপন প্রণালী প্রভৃতির ন্যায় বিষয়গুলো সম্মানজনকভাবে রক্ষা ও পুষ্ট করিয়া স্বাধীনভাবে বাঁচিয়া থাকার নামই আত্মনিয়ন্ত্রণ। যেখানে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন, ধরিয়া লইতে হইবে, সেখানে নিজের চিন্তাই প্রবল, অপরের চিন্তা দুর্বল। এই নীতিতে পাকিস্তান-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই রাষ্ট্রান্তর্গত দেশগুলি বিশেষ করিয়া পূর্বপাকিস্তান যদি নিজের কথাই বেশী করিয়া চিন্তা করে, তাহাতে অস্বাভাবিকতা দেখিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

প্রকৃত পক্ষে, পূর্বপাকিস্তান বর্তমানে নিজের কথাই বেশী করিয়া ভাবিতেছে। ইহার একমাত্র কারণ,— নানাদিক হইতে আজ তাহার আত্মনিয়ন্ত্রণনীতি আক্রান্ত। অধিকন্তু ভাষার দিক হইতে এই নীতি আক্রান্ত হইবার যে সম্ভাবনা সম্প্রতি দেখা দিয়াছে, তাহাতে পূর্বপাকিস্তানের পক্ষে বিচলিত হইবারই কথা। পূর্বপাকিস্তানের আপন ভাষা বাংলা। আত্মনিয়ন্ত্রণনীতি অনুসৃত হইলে, পাকিস্তানের দিক হইতে বাংলা ভাষার উপর হস্তক্ষেপ করা যায়না। কিন্তু চর্তুদিকের হাব-ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বাংলা উর্দুর দ্বারা স্থানান্তরিত হইবে। এই সম্ভাবনাই পূর্ব-পাকিস্তানের জীবনী-শক্তির মূলে আঘাত করিয়াছে। সুতরাং পূর্বপাকিস্তান বিচলিত না হইয়া পারেনা।

সম্প্রতি অনেকেই উর্দুকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে চালাইবার কথা চিন্তা করিতেছেন। ... তবে, একথা একান্তই সত্য যে, যদি তাঁহারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মাতৃভাষা বাংলাকে উদ্বন্ধনে মারিবার ব্যবস্থা পূর্বাহ্নেই করিয়া রাখিতে হইবে। কেননা, রাষ্ট্রভাষার পশ্চাতে থাকিবে এক বিরাট রাষ্ট্র- শক্তি। এই ভাষার সহিত সংগ্রাম করিয়া বাঁচিয়া থাকার শক্তি যে বাংলাভাষার নাই, সে কথা মনে করিনা। কিন্তু, তাহা জীবন্মৃত অবস্থায় বাঁচা, — আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিতে বাঁচা নয়। এই জাতীয় বাঁচার চেয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিতে বাঁচার মূল্য অনেক। আমার দেশে আমি ঘরে বাহিরে আমার ভাষায় কথা বলিতে পারিবনা, আমার ভাষায় লিখিতে পড়িতে পারিবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে পারিবনা, মনের মত করিয়া সুখ দুঃখ প্রকাশ করিতে পারিব না; — ইহার চেয়ে বৃহৎ আত্মপ্রবঞ্চনা ও আত্মহত্যা আছে কি? সত্যই আমরা আত্মপ্রবঞ্চনা ও আত্মহত্যাকে যদি আত্মনিয়ন্ত্রণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তবে কে আমাদিগকে বাঁচাইবে?"

.. লেখক উর্দুর পক্ষের যুক্তিগুলো খণ্ডন করেন একে একে। যেমন ঃ 'উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা রূপে পাকিস্তানে চালু করিবার পক্ষে আর একটি যুক্তি দেখান হইয়া থাকে; তাহা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যোগাযোগ ও ভাব আদান-প্রদানের অজুহাত। ইহার ন্যায় এমন দুর্বল যুক্তি সচরাচর খুব বেশী দেখা যায় না। .... ধর্মের নামে যাহারা অকারণে উর্দু-প্রীতি পোষণ করিয়া থাকেন, তাহারা একান্তই ভ্রান্ত।' নানা দিক থেকে তিনি উর্দুর সপক্ষ সুপারিশগুলোর পর্যালোচনা করে বাংলার বিপক্ষযুক্তিগুলো খণ্ডন করে উপসংহারে তিনি বলেন ঃ

"মোটের ওপর, বাংলাকে ছাড়িয়া উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে পূর্ব-পাকিস্তানবাসী গ্রহণ করিলে, তাহাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মৃত্যু অনিবার্য্য। ইংরেজ আমলের প্রথমদিকে বাংলার মুসলমান ইংরেজী ভাষাকে গ্রহণ না করিয়া যে-জাতীয় আত্মঘাতী ভুল করিয়াছিলেন, পূর্ব-পাকিস্তানবাসী এইবার উর্দুকে গ্রহণ করিলে অবিকল ঐ জাতীয় আর একটি রাজনৈতিক ভুলের পুনরাবৃত্তি করিবেন। এখনও এই ভুল করা হয় নাই, এখনও সাবধান হইবার সময় আছে। যাহাতে এই জাতীয় আত্মঘাতী এবং জাতিঘাতী ভুল অদূর ভবিষ্যতে না হইতে পারে, এখন হইতে সেই বিষয়ে সকলের সজাগ ও সচেষ্ট হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।' (পৃ- ৩৮)

পত্রিকার সার্বিক চারিত্রের সঙ্গে ভাব-ভাষা-বক্তব্য ও চিন্তার সঙ্গে মুদ্রিত কবিতা গল্প, নাটকের বক্তব্য ও চিন্তাধারার সঙ্গতি রয়েছে। বলাবাহুল্য, রচনাগুলো নির্বাচনের মধ্য দিয়েও চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। আবদুল মান্নান একজন কিশোর কবি (৮ম শ্রেণীর ছাত্র)। তার ঝাণ্ডা উড়াও শীর্ষক কবিতায় অসাম্প্রদায়িক ভাবটি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে :

"আশার তরী বেয়ে রে আজ জিন্না জহর পেল ফুল,/ উচ্চ করি আজকেরে তোর স্বাধীনতার ঝাণ্ডা তোল/ জাতির বিচার ভেদ ভুলিব,/ সবার সাথে হাত মিলাবো, / হিন্দু-মোসলেম ভাই বলিয়া বুকে দিব কোল'(পৃ-৪২)

শ্রী গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাতীয় পতাকা শীর্ষক কবিতায় সাম্যবাদী চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে নতুন দেশের পরিবর্তিত নতুন পরিস্থিতিতে সর্বশ্রেণীর সর্বহারাদের প্রতি নতুন ভাবে মনোযোগের দাবি নিয়ে ঃ দুশো বছরের শ্বেত জিঞ্জির খোল / জাতীয় পতাকা উর্দ্ধ গগনে বীর দর্পে তোল।/ নীচতায় ভরা হিংসা বিষের হানাহানি ভোল, .../ নব আদর্শে গঠনের কাজে লাগো, / পুরনো সমাজে গাণ্ডীব হাতে বিপ্লব নিয়ে জাগো।/ পুন্য লগনে বিপ্লবী বীর নওজোয়ান,/ স্বাধীন পতাকা দলে দলে সবারে তোরা ডাকিয়া আন।

সর্বহারা মজদুর সাথে কাঁধে কাঁধ দিয়ে আয় কৃষাণ,/ত্যাগের মন্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসে এই পতাকার রাখিতে মান।' (পৃ -৪৩)

কিরণশংকর সেনগুপ্ত 'স্তব্ধতা' শীর্ষক কবিতায় মানুষের হৃদয়দৈন্য দূর করার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। তাঁর দুঃখ হলো, জিজ্ঞাসা- চিহ্নিত সামাজিক ব্যাধিগুলোর এখনও নিরাময় হলোনা — "হৃদয়ের গভীর কোণে প্রশ্ন জাগে আর কতকাল, / পৃথিবীতে নেমে এসে স্তব্ধতা কেবল /বাড়াবে হৃদয় দৈন্য বেদনা অতল; '

'রবীন্দ্রনাথের চিঠি' শীর্ষক প্রবন্ধে সমাজ, সাহিত্য ও সমকালকে জানবার জন্য চিঠির মূল্য অনুধাবনের চেষ্টার পর মন্তব্য করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের চিঠি অন্যান্য কাব্য সৃষ্টির মত বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের আলোচনা পাকিস্তানে তখন প্রায় ছিলই না

Dhaka University Institutional Repository

যখন, তখন 'কৃষ্টি'র প্রয়াস ছিল এর ব্যতিক্রম, অবশ্য এর কারণও ছিল। ক্রমে দেখা যাবে, পূর্ব বাঙলার পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্র-সংক্রান্ত আলোচনা খুব কমে আসবে। এক সময় থাকবেই না। ১৯৬১/৬৭র পরে বৃদ্ধি পাবে আবার। রাজনীতি-সংস্কৃতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে সাহিত্য-চিন্তায় রবীন্দ্র-প্রসঙ্গও রূপরীতি ও প্রবণতার দিক থেকে পরিবর্তনের ইতিহাসকে স্বীকার করে আছে। নাটক 'সাইরেণ'এ জীবন-নাটকের পাঠ এবং জীবনের প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। 'স্মৃতি-তীর্থ' শীর্ষক গল্পে বিশ শতকের প্রথম দিককার রাজনীতির প্রেক্ষাপটে সোসালিস্ট রেভ্যুলুশন্যারী পার্টির কর্মী উচ্চ শিক্ষিত দুই তরুণ-তরুণীর প্রেমের ঘটনা ব্যক্ত হলেও এতে দেশ সেবার ব্রতই মুখ্য আদর্শ রূপে উপস্থাপিত । নায়ক নতুন প্রেমিকা তনুশ্রীর নামে তার পৈত্রিক জমিদারি বাড়ীটিকে পার্টির অফিসের জন্য দান করে তার নামকরণ করে 'তনুশ্রী-ভবন', তথাপি দুজনে বিয়ে করেনা। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ত্যাগী চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মনোবল সৃষ্টি করাই গল্পের উদ্দেশ্য।

পত্রিকাটির পরিচয়ে দুটো বিষয় স্পষ্ট — একটি হচ্ছে— কম হলেও মুসলিম লেখক এতে আছেন, তাঁদের চিন্তাও প্রাগ্রসর, বৈপ্লবিক, দূরদর্শী। আর অধিকাংশে লেখকই হিন্দু সম্প্রদায়ের। পূর্ববঙ্গের বস্ত্রকলগুলোর মালিকও হিন্দু — নাম থেকে বোঝা যায়। সাতচল্লিশ-সংলগ্ন সময়কালে হিন্দু-সমাজের বর্ণাঢ্যতার পরিচয় আছে এ পত্রিকায় আর আছে বেদনাদায়ক চিত্র—সরকারী কর্মকর্তাদের দ্বারাও হিন্দুদের আবাসগুলো একে একে দখল হয়ে যাচ্ছে। এই দখল বা অধিগ্রহণের কালে কতো যে জীবন-বিরোধী অমানবিক ঘটনার অবতারণা হয়েছিল তাও অনুমেয়। সমাজ পরিবর্তিত হতে হতে নতুন মাত্রা লাভ করবে যে কৃষ্টি তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

১৯৪৭ সনে প্রকাশিত মাসিক 'কৃষ্টি' সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ-ভাবনার ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালনের ব্রত নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু সামাজিক সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পারিস্থিতিই তাঁদেরকে বেশীদূর অগ্রসর হতে দেয়নি। তবু যে অভিপ্রায় ফুটে উঠেছে একটি সংখ্যার মধ্য দিয়েও তা অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বের দাবিদার।

২. সীমান্ত (১৯৪৭-৫২)

'দেশের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার সৌভাগ্য হয়না সকল সাহিত্য কর্মের'। কিন্তু ১৯৫২ সনের একুশে ফেব্রুয়ারীতে ঢাকায় গুলিবর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে লেখা প্রথম কবিতা 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসীর দাবী নিয়ে এসেছি'র তা হয়েছিল। 'বাজেয়াপ্ত হলেও (১৯৫২ সনে) হাতে হাতে কবিতাটি পূর্ব বাঙলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছিল।' ডঃ আনিসুজ্জামান উপর্যুক্ত সূত্রে আরও লিখেছেন : "একুশের প্রথম কবিতা যে মাহবুব উল আলম চৌধুরী লিখলেন, তা হয়তো এক আকস্মিক ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে কবিতা তাঁকে লিখতেই হতো — তাঁর সমগ্র জীবনাচরণ ও সাহিত্য চর্চার ধারায় তা ছিল অনিবার্য। নিতান্ত অল্প বয়স থেকেই রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে তিনি মিলিয়েছিলেন একই স্রোতে।[৬]

মাহবুব উল আলম চৌধুরীর (জ. ৭ নভেম্বর ১৯২৭) 'সীমান্ত' পত্রিকা এবং এই পত্রিকার মাধ্যমে গড়ে ওঠা 'সাংস্কৃতিক বৈঠক'; বৈঠক থেকে সৃষ্ট 'প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ' এবং এগুলোর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সম্মেলন (১৯৫১) প্রভৃতি পূর্ব বাঙলার বৈপ্লবিক রাজনৈতিক-আন্দোলনের সম্পূরক প্রগতিশীল গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারার মূল সুরও বেঁধে দিয়েছিল। এর সবই আজ ঐতিহাসিক ঘটনা। এর সঙ্গে জড়িত সকল ব্যক্তি, পত্র-পত্রিকা, পুস্তক, কবি-সাহিত্যিকদের অসংখ্য কার্যাবলীও বিশেষ 'মর্যাদার অধিকারী হয়ে আছে। 'সীমান্ত' ও তাই 'মর্যাদাবান মাসিক সাহিত্য পত্রিকা' হিসেবে বাঙলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে। সীমান্ত-সম্পাদক মাহবুব উল আলম চৌধুরীর জীবন-সাধনার সঙ্গে পত্রিকা ও সাহিত্য -সংস্কৃতির সাধনা একাত্ম হয়ে আছে। একটার কথা বলতে গেলে অপরটা চলে আসে সঙ্গত কারণে।

তরুণ, কুমার, মার্কসীয় মতাদর্শে দীক্ষিত অথচ রোমান্টিক ভাব-প্রবণতায় উজ্জ্বল, আবেগদীপ্ত মাহবুব উল আলম চৌধুরী পিতৃহীন (পিতা মরহুম আহমেদুর রহমান চৌধুরী, গহিরা, চট্টগ্রাম) হয়ে মামা আহমদ সগীর চৌধুরী (মুসলিমলীগের চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রভাবশালী নেতা)-র পৃষ্ঠপোষকতায় লেখাপড়া করে (গহিরা হাইস্কুল, চট্টগ্রাম থেকে) ১৯৪৫ সনে কলকাতা থেকে ২টি লেটার নিয়ে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৭ সনে তিনি চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪৮সনে উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণীর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, তখন ১৬/- টাকা সরকারী বৃত্তিও তিনি পেতেন। কিন্তু শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা উর্দুভাষী জনৈক আবদুর রহমান সিদ্দিকী কলেজ পরিদর্শনে এসে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কলেজ-মিলনায়তনে বক্তৃতাকালে বাঙলা ভাষা সম্পর্কে কটু মন্তব্য করে আরবী হরফে বাঙলা প্রচলনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করলে মাহবুব প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে এ নিয়ে শেষ পর্যন্ত লেখাপড়া অসমাপ্ত রেখেই কলেজ ছাড়তে বাধ্য হন। অধ্যক্ষ আবু হেনা ক্ষমা চাইবার পারমর্শও দিলেন, কিন্তু তাতে তিনি সম্মত হলেন না, কারণ ডিগ্রির প্রতি তাঁর মোহ ছিলনা। নচেত কলকাতা গিয়ে পড়াশুনা করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল — সে ইচ্ছা ও প্রেরণা বশে তিনি কলকাতা গিয়েওছিলেন; কিন্তু কমরেড মোজাফফর আহমদ নিরুৎসাহিত করলেন। সীমান্ত সম্পর্কে মোজাফফর আহমদ বলেছিলেন – এটাকে 'কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা করবেন না'। মাহবুব নিজেও কমিউনিস্ট পার্টির কার্ড হোল্ডার কমরেড ছিলেননা বটে, কিন্তু কমিউনিস্ট বলতে যা বোঝায়, তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে তাই। মুক্তবুদ্ধির চর্চা আর রোমান্টিক মানস-প্রবণতা তাঁকে অনেক দুঃসাহসী কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সরকারের খাতায় কমিউনিস্ট হিসেবেই তাঁর নাম ছিল। রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তন এলেই তাঁকে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে যেতে হত। বাসা, মালপত্র খানা-তল্লাসী হতো। এজন্য সুশৃঙ্খলভাবে সাহিত্য-চর্চা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। লিখেছেন অনেক, কিন্তু নমুনা নেই। বই-পুস্তক প্রচার করে খ্যাতি অর্জনের জন্যও পরে আর তেমন উৎসাহী হতে দেখা যায়না তাঁকে। ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, কিন্তু অনুরুদ্ধ হয়ে কিছু কিছু বলতে ও প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

করতে উদ্যোগী হন বলেই বাঙালির ও বাঙলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতির জন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তাঁর থেকে জানা সম্ভব হয়েছে। তাঁর দ্বারা, দেখা যায়— ইতিহাসের পাতায় সংযুক্ত হয়েছে অজানা অনেক তথ্য [৭] ও উপাদান।

মাহবুব উল আলম চৌধুরীর কর্মজীবন সাহিত্য চর্চা আর সংস্কৃতি সেবার মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল ১৯৪৫ সনে যখন তিনি সপ্তদশ বা অষ্টাদশ বর্ষীয় তরুণ মাত্র। তখনই (১৯৪৫) তিনি প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের চট্টগ্রাম জেলা শাখার নির্বাচিত সহকারী সম্পাদক। ১৯৪৫ সনে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের জন্ম জয়ন্তী উৎসবের অন্যতম সংগঠক ছিলেন তিনি। ১৯৪৬ সনে চট্টগ্রামে নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উৎসবের আয়োজন প্রথম হয় যে-পরিষদের উদ্যোগে মাহবুব ছিলেন তার সাধারণ সম্পাদক। বিশ্বশান্তির পক্ষে বাঙলাদেশে প্রথম প্রচারক ও স্বাক্ষরসংগ্রহের কৃতিত্বও তাঁকে দিতে হবে। সীমান্ত পত্রিকায় তিনি বিশ্বশান্তি পরিষদের (১৯৫০) ডাকে আণবিক বোমা নিষিদ্ধ-করণের দাবীতে ব্যাপক প্রচার করেন ও স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য চট্টগ্রামেও বিশ্বশান্তি পরিষদের শাখা স্থাপন (১৯৫০) করেন। সীমান্তের মাধ্যমে গণস্বাক্ষর সংগ্রহের ও প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তিনি বলেছেন : "আমরা শুধু সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলামনা, আন্তর্জাতিকতাবাদেও আস্থাশীল ছিলাম। সেজন্য বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধ-বিরোধী কর্মকাণ্ডে এবং প্রগতির ব্যাপারে জনসাধারণকে সতর্ক করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। যার ফলশ্রুতিতে দেখবেন প্রায় প্রতি সংখ্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে (১৯৫০ এর পরের সংখ্যায় অবশ্য) শান্তির সপক্ষে —আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন লেখকদের লেখার অনুবাদ এবং ভারত ও পূর্ববাঙলার উভয় সম্প্রদায়ের প্রগতিশীল লেখকদের লেখা কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, বক্তৃতা ইত্যাদি সীমান্তে প্রকাশিত করেছি। 'বিশ্বশান্তি' বলে আমাদের একটা আলাদা বিভাগই ছিল— সেখানে বিশ্বশান্তির সহায়ক ও যুদ্ধ-বিরোধী লেখাগুলো প্রকাশ করতাম। চট্টগ্রাম থেকে আমরা প্রায় পাঁচ লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ করি এবং তা ষ্টকহোমে যথাসময়ে পাঠিয়ে দিই। [৮] বিশ্বশান্তির সপক্ষে কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৪৮ সনে তাঁকে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে নিমন্ত্রণ জানানো হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে তাতে তিনি যোগদান করেন। ১৯৪৮ সনে গঠিত চট্টগ্রামের জেলা কবি সমিতির (সভাপতি রমেশ শীল, কবিয়াল) সংগঠক; ১৯৫০ এর দাঙ্গা-বিরোধী সংগঠন শান্তিফৌজ (চট্টগ্রাম) এর অধিনায়ক হিসাবে কলকাতার বিভিন্ন উপদ্রুত এলাকায় শুভেচ্ছা-সফর; চট্টগ্রাম অগ্রণী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি (১৯৫০) এবং সাংস্কৃতিক বৈঠকের আহবায়ক; চট্টগ্রাম জেলা শান্তি কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক (১৯৫১) এবং প্রদেশব্যাপী আণবিক যুদ্ধ-বিরোধী-স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানের পরিচালক; চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সংস্কৃতি সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ও সাংগঠনিক সম্পাদক (১৯৫১); পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের অন্যতম সংগঠক ও জেলা কমিটির প্রথম আহবায়ক; ১৯৫২ সনে চট্টগ্রাম জেলা রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহবায়ক; ১৯৫২তে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সংস্কৃতি সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ও সংগঠক মাহবুব উল আলম চৌধুরী আরও যে-সমস্ত সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন : তা এইরূপ : ১৯৫৩ — পূর্ব পাকিস্তান গণতন্ত্রীদলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জেলা কমিটির সম্পাদক; ১৯৫৪— যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত চট্টগ্রাম জেলা কর্মী শিবিরের আহবায়ক; ১৯৫৪ — ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে চট্টগ্রাম সংস্কৃতি প্রতিনিধি দলের দল-নেতা; ১৯৫১/১৯৫৫ — চট্টগ্রাম প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ ও কৃষ্টি কেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা; ১৯৫৫— নজরুল নিরাময় সমিতির সহকারী সম্পাদক; ১৯৫৫ — চট্টগ্রাম লোক সঙ্গীত সম্মেলনের সংগঠক ও যুব উৎসবের সভাপতি; ১৯৫৭ — চট্টগ্রাম সংস্কৃতি প্রতিনিধি-দলের নেতা হিসাবে কাগমারী সম্মেলনে যোগদান; ১৯৫২-৫৪ মাসিক উদয়ন পত্রিকার সম্পাদক; ১৯৭২-৭৮ — চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক স্বাধীনতার প্রধান সম্পাদক; ১৯৬৭ — গহিরা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, ইত্যাদি। তাঁর কতিপয় গ্রন্থ প্রবন্ধ পুস্তক-পুস্তিকায় প্রগতিশীল চিন্তা ও শিল্পকর্মের নমুনা আছে। ১৯৪৫ সনে হুমায়ুন কবিরের ভূমিকা সম্বলিত 'দারোগা' শীর্ষক নাটক প্রকাশিত হয়। ১৯৪৬ সনে প্রকাশিত পুস্তিকা - 'বিপ্লবের প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন' বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯৫৬ সনে 'মিশরের মুক্তি আন্দোলন' শীর্ষক পুস্তিকা রচিত হয়। 'সীমান্ত' পত্রিকায় 'আগামী কাল' শীর্ষক নাটক ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৫২ সনে মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত কবিতা-পুস্তিকা 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' -র রচয়িতা মাহবুব সওগাত, সোনার বাংলা, পরিচয়, নতুন সাহিত্য, দৈনিক সত্যযুগ, অগ্রণী, ডাক, ইস্পাত, পরিচিতি, পূর্বাশা, সাপ্তাহিক নওবেলাল, সাপ্তাহিক আওয়াজ, উদয়ন ও প্রগতিপত্রিকায় প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ইত্যাদি অনেক লিখেছেন।[৯]

সম্পাদকের এই সাংগঠনিক ও শৈল্পিক প্রতিভা 'সীমান্ত' পত্রিকা প্রকাশে কার্যকর ছিল বলেই সীমান্ত বছর পাঁচেক ধরে অনিয়মিত হলেও নিয়মিত মাসিকের বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত হতে পেরেছিল। মার্কসীয় মতাদর্শে প্রভাবিত কোনো পত্রিকাই পূর্ববাঙলায় এতগুলো সংখ্যা প্রকাশ করতে পারেনি— সাংগঠনিকভাবে খুব অল্প লোকই তখনকার রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সাহিত্যিক কার্যাবলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সীমান্ত এ সমস্ত নানা কারণে সমসাময়িক কালের রাজনীতি, সংস্কৃতি, সমাজ, সভ্যতা, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির উন্নতি-অগ্রগতির ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে গিয়েছে।

সীমান্ত পত্রিকার প্রথম সংখ্যা (১৩৫৪, কার্তিক) ১৯৪৭ সনের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় সীমান্ত কার্যালয়, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ চট্টগ্রাম হতে। ইম্পেরিয়াল প্রেস চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত হতো। প্রথম দু বছর সহযোগী সম্পাদক ছিলেন সুচরিত চৌধুরী, অতএব প্রথম দিকে প্রকাশকও ছিলেন দু জন মাহবুব উল আলম চৌধুরী ও সুচরিত চৌধুরী। সাদা কাগজে মোটামুটি মুদ্রণ সৌষ্ঠবে ১/১৬ ডিমাই সাইজের ৭৪ পৃষ্ঠার আকার নিয়ে পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সকল সংখ্যায় সমান পাতা থাকত না। নিয়মিত পত্রিকার মত ধারাবাহিক পৃষ্ঠা সংখ্যাও ছিল না। সব সময় একই কাগজও ব্যবহৃত হতোনা। কার্যালয় ও তাঁদের পরিবর্তন হতো। প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১৩৫৪) র গায়ে প্রকাশস্থল লেখা আছে সীমান্ত কার্যালয়, নিভৃত নিলয়, নন্দন কানন, চট্টগ্রাম। 'প্রতি বাঙলা মাসের ১৫ তারিখে (পরের দিকে ১৫ তারিখ কথাটা আর উল্লেখ করা হতোনা) প্রকাশিত হয়' নিয়মাবলীতে লেখা থাকত। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, বার্ষিক ৬ টাকা। ১৩৫৭ মাঘ সংখ্যায় বলা হয় : 'প্রতি সংখ্যার দাম ছয় আনা। বার্ষিক সডাক সাড়ে চার টাকা। সম্মাসিক দুটাকা চার আনা। দেশ ও বৃহত্তর জনতার মঙ্গল-সূচক রচনা সাদরে গৃহীত হয়।' ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৯৫০ সনের এপ্রিল ১৩৫৭ র বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয় 'নবপর্যায়' কথাটি শীর্ষে ধারণ করে। এই সংখ্যায় সম্পাদক হিসেবে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর একক নাম

Dhaka University Institutional Repository

নাম পাওয়া যায় এবং এই সংখ্যা ১৯৫০ এর দাঙ্গার প্রেক্ষিতে দাঙ্গা-বিরোধী ভাব-চিন্তা আবেদন নিয়ে বিশেষ সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয়, যা উভয় বাঙলায় আলোড়ন তুলেছিল। ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সনের এপ্রিল-মে বৈশাখ ১৩৫৮ সনে। এটি চট্টগ্রাম সংস্কৃতি সম্মেলন (১৯৫১) সংখ্যা এবং ১৯৫২ সনের জুন মাসে (বাঙলা সন উল্লেখ নেই, শুধু, 'আষাঢ়' কথাটা লিখিত আছে) প্রকাশিত সংখ্যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা হিসেবে, কিন্তু এটা ভুল হবারই কথা, হবে ৫ম বর্ষ। ৫ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় আবার প্রথম প্রচ্ছদে লেখা আছে "সীমান্ত নতুন ব্যবস্থাপনায় আবার আত্মপ্রকাশ করলো। বারবারই আমরা একে নিয়মিত প্রকাশ করার আশ্বাস দিয়ে আপনাদের হতাশ করেছি। কিন্তু আপনাদের বিচার করে দেখা দরকার এটা কি আমাদের ইচ্ছাকৃত?' পত্রিকার সম্পাদকেরা একে 'প্রগতিশীল কাগজ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। সীমান্ত পত্রিকার একজন কর্মকর্তা, একাত্তরের শহীদ, শহীদুল্লাহ সাবের সীমান্ত প্রকাশের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে এর উদ্দেশ্য-আদর্শ সম্পর্কে (দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যায়, পৌষ, ১৩৫৫, বলেন : বিভাগোত্তর কালের লেখক-শিল্পীদের আগমন ও বাস্তত্যাগ করে পলায়নের ব্যাপক সাংস্কৃতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে সীমান্তের আবির্ভাব ঘটে। "কিন্তু আজকের দুনিয়ায় সংস্কৃতির প্রত্যেকটি শাখা রাষ্ট্রিক ও সামাজিক আঘাতে বিপর্যস্ত। এই আঘাত থেকে 'সীমান্ত' ও রেহাই পায়নি। কাগজের অভাবে সীমান্ত অনির্দিষ্ট কাল বন্ধ থাকে। ... সীমান্ত সেই সাহিত্যই সৃষ্টি করবে যা শুধু সমাজের ছবি এঁকেই ক্ষান্ত থাকবে না, সামাজিক প্রগতির পথেরও সন্ধান দেবে। সমাজের প্রত্যেকটি শিল্পী, সাহিত্যিক , বুদ্ধিজীবীকে সীমান্তের পাশে সংহত কোরে, সমাজের মানুষের দাসত্বমুক্তির পথেই 'সীমান্তে'র সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অভিযান সার্থক হবে একথা আজ জোরের সঙ্গেই বলা যায়। শিল্পী সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে এটা নিশ্চয়ই আশা করা যেতে পারে যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে সীমান্তের ভূমিকা হবে প্রগতিশীল মুখপত্রের ভূমিকা।' ১৯৫২ সনের জুন সংখ্যায় মরহুম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের উপর প্রবন্ধ আছে। এরপর আর সীমান্ত প্রকাশ পেয়েছে কিনা বলা চলেনা। 'সিনেমা' পত্রিকার (বাংলার বাণী গ্রুপের) সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মাহবুব উল আলম চৌধুরী বলেন : "১৯৫২ সালে একুশের প্রথম কবিতাটি (কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি) বাজেয়াপ্ত হওয়ার পরপরই পত্রিকার (সীমান্ত) প্রকাশনা সরকার বন্ধ করে দেয়। [১০]

'সীমান্ত' অনিয়মিত ছিল একথা নিঃসন্দেহ। কিন্তু মোট কতগুলো সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল আজ আর তা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। সম্পাদক বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে ৭২, ৬০ ইত্যাদি সংখ্যা বলেন, কারণ তাঁর কাছেও কোনও ডকুমেন্ট নেই। তবে ৫ বছরে গোটা ত্রিশেক সংখ্যা প্রকাশ পেয়েছিল বলে ধরে নিতে পারি। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ১৩টির বেশি সংখ্যা উদ্ধার করা যায়নি। তবে এই কয়টি সংখ্যার মাধ্যমেই সীমান্তকে চিনে নিতে বেগ পেতে হয়না।

'চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন : প্রগতিশীল ধারা' (চট্টগ্রাম, ১৯৯১) শীর্ষক গ্রন্থে সীমান্ত- সম্পাদক মাহবুব উল আলম চৌধুরী স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন : ১৯৪৬ সনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কালে জাতি যখন বিভ্রান্ত, তখন কজন তরুণ মিলে চট্টগ্রামে সর্ব প্রথম নজরুল জয়ন্তী উদযাপনের জন্য একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয় — যার সভাপতি অধ্যাপক আবুল ফজল এবং সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন মাহবুবউল আলম চৌধুরী। "জয়ন্তী ... উপলক্ষে আমরা বেশ কিছু তরুণ কর্মী 'খুরশীদ মহল' সিনেমা হলের তিন তলায় মহড়ায় মিলিত হতে থাকি ... যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন তেজেন সেন, বঙ্কিম সেন, সুচরিত চৌধুরী, চিত্ত রঞ্জন দাস, চিরঞ্জীব দাস শর্মা, তখনকার চট্টগ্রাম জেলা জজ শৈবাল গুপ্তের ছেলে পার্থ সারথি প্রমুখ। ... আমাদের এ ধরনের কার্যকলাপ তখন তরুণ ও প্রবীণদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। আমরা এই উৎসাহ -উদ্দীপনাকে ধরে রাখার এবং চলমান করার প্রচেষ্টায় সিদ্ধান্ত নিলাম যে, একটি মাসিক পত্রিকা বের করবো। এই মাসিক পত্রিকার মূলনীতি হবে, অসাম্প্রদায়িক ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ — এবং আমরা এর চেয়ে বেশী কিছু চেয়েছিলাম — 'সবার উপরে মানুষ সত্য' কথাটিকে মানবতাবাদের এবং শ্রেণীগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে .... এও দাবী করেছিলাম যে, শিল্প সাহিত্যকে রাজনীতির হাতিয়ার হতে হবে। ... এ দাবী তখনকার উদারনৈতিক সাহিত্যিকেরা স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি.... কিন্তু আমাদের বুকে যে আগুন ছিল, সে আগুনের উত্তাপকে .... তাঁরা অস্বীকার করতে পারেননি। একটা নতুন সমাজ তৈরী যেখানে শ্রেণীভেদ থাকবেনা, কোন বর্ণভেদ থাকবে না, হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী থাকবেনা — এই ধরণের একটা চিন্তা-ভাবনা নিয়ে আমরা 'সীমান্ত' পত্রিকা প্রকাশে আগ্রহী হই। আমাদের এই আগ্রহকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিলেন আমাদের কিছু পুরনো কর্মী। ১৯৪৭ সনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেশ কজন শিল্পী সাহিত্যিক চট্টগ্রামে চলে আসেন — শওকত ওসমান, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, এবনে গোলাম নবী প্রমুখ — তাঁদের এবং চট্টগ্রামের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক ননী সেন গুপ্ত, চট্টগ্রাম প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক শুধাংশু সরকার ও কবি আসুতোষ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শুভাশীষ চৌধুরী— তাঁদের উৎসাহ এবং সহযোগিতায় সীমান্ত প্রকাশনা শুরু করি। ... ইম্পেরিয়াল প্রিন্টিং হাউজ (মামার) থেকে সীমান্ত ছাপান হতো।' তিনি আরও লিখেছেন : "যেদিন সীমান্ত-এর প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করা হয়, সেদিন চট্টগ্রামে উপস্থিত ছিলেন .... কবি বিভূতি চৌধুরী ... (তিনি) প্রকাশনা উৎসবে সভাপতিত্ব করেছিলেন .... মন্মথ দাশ .... সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন .... সুরেন রায় .... বঙ্কিম চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, কাজী নজরুল ইসলাম, মীর মোশাররফ হোসেন— এঁদের প্রতিকৃতি এঁকে প্রকাশনা-কক্ষটিকে সুসজ্জিত করেছিলেন। সীমান্ত প্রকাশনার পেছনে যাঁদের প্রচুর অবদান ছিল, তাঁদের মধ্যে অন্যতম গোপাল বিশ্বাস। এছাড়া আহমেদুল কবির, এস. এ. জামান, সায়দুল হাসান .... পরোক্ষভাবে সাহায্য সহযোগিতা এবং বিজ্ঞাপন জোগাড় করে না দিলে হয়তো সীমান্ত প্রকাশ করা সম্ভব হতোনা। ওলিল চৌধুরী, এলাহি বক্স এণ্ড কোং, হাশেম মিয়া রেষ্টুরেন্ট – এঁরা প্রায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিতেন। 'সীমান্ত' ... বাজারে আসার পরপরই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ...কমিউনিস্টদের মুখপত্র (বলে).... প্রচার করতে শুরু করে .... বাড়ীওয়ালা ভীত হয়ে 'সীমান্ত' অফিস (লাল দীঘির পশ্চিম পাড়ে, ব্যাংক ভবনের দোতলায় থেকে) স্থানান্তরের নোটিশ দেন। .... আর্য সঙ্গীত সমিতির অন্যতম .... বিধুভূষণ .... বুদ্ধমন্দির সড়কে অবস্থিত তাঁর বাড়ীটি ১৫ টাকা ভাড়ায় আমাদের দেন। যতদূর মনে পড়ে ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি আমরা বুদ্ধমন্দির সড়কে 'সীমান্তে'র অফিস স্থানান্তরিত করি। এখন বলে রাখা ভাল যে,'সীমান্ত' পত্রিকায় যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব ছিল একথা তখন অস্বীকার করলেও এখন গর্বের সঙ্গে স্বীকার করি। যে কোন একটি মাসিক পত্রিকা চালাতে হলে তার জন্যে একটা গোষ্ঠী সৃষ্টি করতে হয়। এই রকম একটা গোষ্ঠী হয়েছিল সীমান্তকে কেন্দ্র করে। তখন সাংস্কৃতিক বৈঠক বলে একটা সংস্থা আমরা গঠন করি। এর কোন নিয়ম

Dhaka University Institutional Repository

কানুন ছিলনা।" (পৃ ১-৬)

সম্পাদক এক সাক্ষাৎকারে পত্রিকার উদ্দেশ্য আদর্শ চরিত্র সম্পর্কে বর্তমান গবেষককে আরও জানান : "১৯৪৭ এর আগেও জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলো হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় বা মিলন ঘটাতে পারেনি। আমরা চেয়েছিলাম হিন্দু-মুসলিম নবীন-প্রবীণ সকলকে মিলাতে (সীমান্তে)। যৌথ উদ্যোগে একটি প্রগতিশীল পত্রিকা প্রকাশই আমাদের লক্ষ্য ছিল। প্রগতিশীলতা বলতে আমরা বুঝতে চেয়েছি মানবতাবাদী এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণে বিশ্বাসী। সেদিক থেকে আমরা অনেকটা সফল হয়েছিলাম : কারণ উভয়বঙ্গের নবীন প্রবীণ হিন্দু-মুসলিম, মানবতাবাদী এবং গণমানুষের কল্যাণে, প্রগতিশীল আন্দোলনে বিশ্বাসীদের লেখায় সীমান্তকে সমৃদ্ধ করতে আমরা সক্ষম হই। সাহিত্য পত্রিকার ইতিহাস লক্ষ্য করলে আপনি দেখবেন, সাতচল্লিশ পূর্ববর্তীকালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখপত্ররূপে সোচ্চার বসুমতি, ভারতবর্ষ, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকাগুলো উভয় সম্প্রদায়ের লেখকদের বাঙালী জাতির ঐতিহ্যের ভিত্তিতে রচিত লেখা দ্বারা এবং দুই প্রধান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য এবং উৎসবগুলিকে তুলে ধরার কোনও প্রচেষ্টা নেয়নি বললে চলে। একমাত্র নব পর্যায়ে পরিচয় কিচুটা করেছিল। আমরা চেষ্টা করেছি প্রবীণ শিল্পী-সাহিত্যিকদের দিয়ে অতীতের উভয় সম্প্রদায়ের যুক্ত সাধনার তথ্যগুলো জনসমাজে প্রকাশ করে দুই প্রধান সম্প্রদায়ের ঐক্যকে সুদৃঢ় করতে। এতেও আমরা কতোকটা সার্থকতা লাভ করেছি বলে মনে হয়। সমকালে বা অপরাপর প্রখ্যাত পত্রিকাগুলোতেও দুই বঙ্গের লেখকদের জড়ো করার চেষ্টা তেমন করা হয়নি।'

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন : 'সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পর্কে বহু কথাবার্তা বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, কিন্তু তাঁর মূল্যায়নের ব্যাপারে সীমান্তই অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে। জীবন চক্রবর্তীর দীর্ঘ প্রবন্ধে সুকান্তকে সীমান্তে উজ্জ্বলতর রূপে প্রথম উপস্থাপিত করা হয়।' তিনি আরও বলেন : 'ব্যক্তিগত ভাবে দেশ বিভাগটা আমার নিকট ভয়াবহভাবে বেদনার কারণ হয়ে ওঠে। এবং এর কোনো যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পাইনি। কারণ যেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধান হিসেবে পাকিস্তানকে অনেকে মেনে নিয়েছিলেন আমি পাকিস্তানের মধ্যে সেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার কোন সমাধান খুঁজে পাইনি। ভারত থেকে সমস্ত মুসলমানকে পাকিস্তানে এবং পাকিস্তান থেকে সমস্ত হিন্দুকে ভারতে পুনর্বাসিত করা সম্ভব হয়নি। কাজেই সংখ্যালঘু সমস্যা তো থেকেই গেলো। বরঞ্চ এটা করতে গিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভয়াবহ দাঙ্গা ক্রমান্বয়ে সংঘটিত হয়ে চলেছিল — তাতে উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পরের ওপর বিশ্বাস, আস্থা এবং শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যার ফলে অতীতের ইতিহাসের উজ্জ্বল দিকগুলোও অন্ধকারে ঢেকে যায় এবং অনুজ্জ্বল দিকগুলো কায়েমী স্বার্থবাদীরা প্রকাশ্যে নিয়ে আসে। এর ফলে মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দীর্ঘায়িত হয়। তাঁদের আত্মানুসন্ধানে বা স্বরূপ উপলব্ধিতে সময় লাগে, দীর্ঘদিন বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। দেশকে দ্বিখণ্ডিত করতে গিয়ে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল সেই ক্ষত এখনও শুকায়নি বলে বাঙালিত্ব -প্রশ্নে এখনও আমরা বিভ্রান্তির মধ্যে বাস করছি। বলা বাহুল্য, এই বিভ্রান্তি দূর করে সঠিক স্বরূপের সন্ধান, শিকড়ের সন্ধান, ঐতিহ্যের সন্ধান এবং নির্যাতিত মানুষের মুক্তির সন্ধানই ছিল আমাদের পত্রিকা এবং সাহিত্য চর্চার মূল উদ্দেশ্য, আদর্শ ও লক্ষ্য।' তিনি জানান, 'সীমান্তে মুদ্রিত লেখার জন্য সম্মানী দিতাম, কিন্তু সকলকে নয়, যাঁরা আর্থিক ভাবে দুর্বল, অভাবী ছিলেন, তাঁদেরকে কিছু দেয়া হতো — তবে সবটাই আমার ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে, পত্রিকার আয় থেকে নয়, আয় হতো কই? আমাকে বাড়ী থেকে মোটা অংকের মাসোহারা দেয়া হতো। এ থেকে সীমান্তের মুদ্রণ ব্যয় মাসে মাসে সাড়ে তিনশত টাকা খরচ হতো এবং অবশিষ্ট টাকা সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ক্রিয়া-কর্মে ব্যয় করতাম।'

পত্রিকার চরিত্র প্রসঙ্গে অপর এক প্রশ্নের জবাবে জনাব মাহবুবউল আলম চৌধুরী বলেন, "পাঁচবার আমাকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ অফার করা হয়, কিন্তু গ্রহণ করিনি। অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, এবং অসমর্থন-এর কারণে নয়, আমি নিজেকে তার যোগ্য বলে মনে করতাম না। তবে কমিউনিস্ট আন্দোলনে আমি যতোটা পারি আন্তরিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছি — প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য যদিও ছিলামনা। লক্ষ্য করবেন আপনি, সীমান্তের আর একটি ইন্টারেস্টিং ফিচার ছিল আন্তর্জাতিক ভাবে খ্যাত প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের পরিচয় প্রদান এবং তাঁদের সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থের সমালোচনা। ইলিয়া ইলেন বুর্গ, হাওয়ার্ড ফাস্ট, কৃষণ চন্দর, খাজা আহমদ আব্বাস, মুলক রাজ আনন্দ, ক্রিস্টফার কডওয়েল, নাজিম হিকমত আরও এমনিতর অনেক লেখক-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে লেখা সীমান্তে পাবেন।' তিনি আরও বলেন : 'কলকাতার নতুন সাহিত্য এবং পরিচয়-গোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের সৌভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক ছিল। তাঁদের জন্য এখানকার লেখা সংগ্রহ করে দিতাম আমরা। আর ওখানকার লেখা তাঁরা সংগ্রহ করে দিতেন। পশ্চিমবঙ্গে সীমান্ত বিক্রয় এবং বিতরণের দায়িত্ব পরিচয় নিত। সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র দৈনিক নতুন স্বাধীনতা, পরিচয়, নতুন সাহিত্য অন্যান্য পত্রিকা এবং ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর পুস্তিকা গোপনে এখানে আমরা বিতরণ ও বিক্রির ব্যবস্থা করতাম।'[১১]

'সীমান্ত'র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার 'সূচীপত্র'-র দিকে তাকালেই পত্রিকার গাম্ভীর্য এবং সম্পাদকের উপর্যুক্ত বক্তব্যসমূহের যাথার্থ উপলব্ধি করা যায় :

মুহম্মদ হবিবুল্লাহ বাহার— শুভেচ্ছা বাণী; আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (প্রবন্ধ) পদ্মবতী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ; আশুতোষ চৌধুরী (গাঁথা-চিত্র) স্বপ্নের জয় ; অন্নদাশংকর রায় (কবিতায়) বাণী ; ওহিদুল আলম (কবিতা) একটি কবিতা; জীবন কুমার চক্রবর্তী (কবিতা) নববধূ ; মাহবুব উল আলম চৌধুরী (কবিতা) স্বাধীনতা; সুবোধ বঞ্জন রায় (কবিতা) প্রতীক্ষা; সুধাংশু সরকার (কবিতা) ভয়াল; সায়ফুল আলম (কবিতা) টিকটিকি ; রেবতী মোহন চৌধুরী (কবিতা) রূপ; আবুল ফসল (গল্প) পুত্রার্থে ভার্যা ; শুভাশীষ চৌধুরী (গল্প) জীবন ও আর্ট; পরিমল কান্তি রায় (গল্প) আবরণ; ননী সেনগুপ্ত (প্রবন্ধ) বাংলাভাষার রূপান্তর; শুভাশীষ চৌধুরী সিনেমা শিল্প নিয়ে (সচিত্র আলোচনা) রূপায়ন ; প্রভাত কুমার সেন, বেতার প্রসঙ্গ ও শারদীয়ার রেকর্ড (রেডিও ও অডিও গানের রেকর্ড-সংক্রান্ত সমালোচনামূলক প্রতিবেদন) ; কিশোর-কানন (ছোটদের বিভাগ); নতুন লেখা (পুস্তক-সমালোচনার বিভাগ— কিরণ শংকর সেনগুপ্ত প্রণীত' স্বপ্ন কামনা' শীর্ষক কাব্য-গ্রন্থের আলোচনা করেন জীবন কুমার চক্রবর্তী); এবং আলোচনা। এ-বিভাগে সম্পাদকীয় বক্তব্য ছাপা হত। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার সুবিধা অসুবিধা ও এ-সম্পর্কে

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনা আছে। পশ্চিম-বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ-এর একটি বক্তব্য ('উপদেশ') এবং 'চট্টগ্রামে আবার দুর্যোগ' ইত্যাদি সম্পর্কে পর্যালোচনা রয়েছে। এখানে মন্তব্য করা সংগত যে, মাহবুব উল আলম চৌধুরী 'চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন ঃ প্রগতিশীল ধারা' শীর্ষক গ্রন্থে মুদ্রিত স্মৃতিকথায় লিখেছেন ; 'সীমান্ত-র প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল আমার যতদূর মনে পড়ে, তদানীন্তন মন্ত্রী সাহিত্যিক হবিবুল্লাহ বাহার, ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, কথা-শিল্পী মাহবুব উল আলম, অন্নদা শংকর রায়, কিরণ শংকর সেনগুপ্ত, সুভাশীষ চৌধুরী, ইবনে গোলাম নবী, ননী সেনগুপ্ত, মুনীর চৌধুরী ও আমার একটা কবিতা 'স্বাধীনতা' লেখা নিয়ে'(পৃ ৩)—এর মধ্যে কিছু বিস্মৃতিও কাজ করছে।

পাকিস্তানের প্রাদেশিক(পূর্ব) স্বাস্থ্যমন্ত্রী মুহম্মদ হবিবুল্লাহ বাহার তাঁর বাণীতে বলেন : "পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত থেকে সীমান্ত নাম দিয়ে মাসিক কাগজ বের' হচ্ছে শুনে তিনি আনন্দিত। তিনি বাণীতে আশা প্রকাশ করেন যে, "সীমান্তবর্তী চট্টগ্রাম সাহিত্যে আবার নূতন পথ সৃষ্টি করবে ... বাঙ্গালা সাহিত্যের কারবার এখনো মধ্যবিত্ত সমাজকে নিয়ে। জনগণমনকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করার জন্যে পথ রচনা করুক সীমান্তের অগ্রপথিকেরা।'

প্রথম সংখ্যার সীমান্তে মুদ্রিত কবিতাগুলোর মধ্যে দেখা যায় ওহিদুল আলম 'দুইটি অন্নের লাগি' যে জীবনকে 'ছিন্নভিন্ন করি' দেবার ইচ্ছা জাগে, সেজীবনকে পছন্দ করতে পারেননি। 'মরণেরে তুচ্ছ করি' 'মিটাইব হৃদয়ের আশ- এই উক্তির মধ্য দিয়ে তিনি প্রাণের (জীবনের) মুক্তি কামনা করেছেন। মাহবুব উল আলম চৌধুরী 'স্বাধীনতা' শীর্ষক কবিতায় স্বাধীনতার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, আর 'দুর্জয় অভিযান// জাল জুয়াচুরি শোষণের প্রতিশোধ' এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। তিনি বুঝেছেন : স্বাধীনতার অর্থ হলো ঃ "স্বাধীনতা নয় শাসন মুক্ত হওয়া/স্বাধীনতা বুঝি শোষণের অবসান; / তাজা তাজা প্রাণ, খুশি চঞ্চল হাওয়া — /কোটি কোটি মূক মানুষের জয়গান।'

গল্পগুলোতে বাঙালি মধ্যবিত্তের সমস্যা, প্রেম-ভালবাসা ও গ্রামীণ সমাজচিত্র চিত্রিত হয়েছে। পড়তে মন্দ লাগেনা - যদিও শিল্পের বিচারে সবখানি উত্তীর্ণ হয়নি। চট্টগ্রাম জেলা কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক ননী সেনগুপ্ত 'বাংলা ভাষার রূপান্তর' শীর্ষক প্রবন্ধে উর্দু আরবী-ফার্সী শব্দবহুল (মুসলমানী) সাম্প্রদায়িক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির সেই জোর জুলম সন্ত্রাসের রাজত্বে বসে একটি যুক্তিবিচার-প্রধান, দুরদর্শীর আলোকে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা উপস্থাপিত করেন। লেখকও সচেতন ছিলেন, হিন্দু হয়ে এই ধরনের আলোচনায় শিল্পীর স্বাধীনতার চেয়ে মরণের ঝুঁকি বেশি। দীর্ঘ পটভূমিকায় তিনি বলেন, সংস্কৃতি বা উর্দু ফার্সী শব্দবাহুল্য বাংলা সাহিত্যকে শৈল্পিক দিক থেকে খাটো করে ফেলবে। তিনি বলেন 'বিষাদ সিন্ধু' হিন্দুর নিকটও প্রিয়। বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের রচনা মুসলমানও পড়েন। কিন্তু কি জন্য? সাহিত্যিক (শৈল্পিক) গুণের জন্য। তবে দেশ ভাগ এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনার বিকাশের ফলে 'গনসাহিত্য' ও মুসলমানদের জীবন ভিত্তিক সাহিত্য সৃষ্টি যে হবে- সেটা স্বাভাবিক এবং যুগের দাবী ও তাই। কারণ পূর্ব বাংলার (মুসলমান-হিন্দু নির্বিশেষে) সাহিত্যিকরা সমাজ-ঘনিষ্ট বা দরিদ্র জনসাধারণের জীবন-ভিত্তিক সাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে সেখানকার জনগণের ভাষাকেই অবলম্বন করতে হবে। আর এ-অঞ্চলে মুসলমান বেশী বলে তাদের মুসলমানী ভাষা কেবল সাহিত্যের সুচিতার দাবীতে বর্জন করা যুক্তিসঙ্গত হবেনা। আবার গণসাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা যাবে কৃষক ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে হিন্দু মুসলমান সকলেই আছেন। হিন্দুরা সংখ্যায় কম বলে পূর্ব বঙ্গের মুসলমানী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ইসলামী শব্দবহুল ভাষা ব্যবহারে তারা (হিন্দুরা) অভ্যস্ত। এখানকার সাহিত্যে এই এলাকার ভাষাই স্থান পাবে। তবে সেটাকে স্বাভাবিক হতে হবে। অস্বাভাবিক প্রয়োগ প্রক্ষিপ্ত বলে দৃষ্টি কটু এবং শিল্প ধ্বংসকারী হবে। লেখক বলেন :

> "যদি তাই হয় তবে নবজীবনের এই প্রকাশ হবে কোন ভাষায়? কোন ভঙ্গিতে? গণ আন্দোলন ও মুসলমান জনতার জাগরণের রূপ দিতে হলে জনগণের টুকরা টুকরা চরিত্র অঙ্কনের ভিতব দিয়েই দিতে হবে। ফলে তাদের হাসিকান্না, সুখ দুঃখ, প্রেম ঘৃণা তাদেরই নিজস্ব ভাষায় রূপ পাবে । এর অন্যথা হতে পারে না। এখন মুসলমান চরিত্র অঙ্কনের জন্য মুসলমানী শব্দ ও ভাষার আমদানী যে অপরিহার্য তা কে অস্বীকার করবে? কে অস্বীকার করবে যে বাঙলা দেশের মুসলমান মূলত বাঙলায় কথা বললেও তার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে উর্দু ও আরবী ফার্সী শব্দ? তেমন 'গণ' বলতে আমরা যাদের বুঝি তার বিরাট অংশও মুসলমান বাংলার চাষী। আমরা লক্ষ্য করেছি পূর্ববঙ্গে হিন্দু চাষীদের ভাষায়ও মুসলমানী ঢংয়ের প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট। তেমনি পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান চাষীও হিন্দু চাষী ভাইদের থেকে অনুকরণ করে তাদের ভাব ও ভাষা। যেদিক থেকেই দেখা যাকনা কেন নূতন জীবন রূপায়ণে যে নূতন সাহিত্যের আবির্ভাব হবে তার উপর বাঙলাদেশের কোটি কোটি নরনারীর বিশাল একটি অংশের নিত্য ব্যবহার্য ভাষার প্রাধান্য থাকবেই। কাজেই উর্দুভাষা ও শব্দের দাবী বাংলা সাহিত্যে উপেক্ষণীয় নয়।
>
> যুগের দাবীকে বাঙলা সাহিত্য কখনও উপেক্ষা করেনি। ... মোটের উপর, আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, বাঙলা সাহিত্য আজ সমাজের মতই দুভাগে বিভক্ত। এক ভাগে আছে তারা যারা ক্রমাগতই এগিয়ে যেতে চায়, বাড়তে চায়, নবনব প্রকাশের মধ্যে নিজেকে বারবার নূতন করে দেখতে চায়। অন্য দল চায় কায়েমীকে ধরে রাখতে, নূতনকে যুক্তি দিয়ে নস্যাৎ করে দিতে। প্রথম দলের সাহিত্যে রূপ নিচ্ছে সমাজের যারা প্রাণবন্ত, যারা অগ্রগামী .... আর দ্বিতীয় দল পুরাতনকেও রূপ দিতে পারছেনা, নূতনকেও সঠিকভাবে আঁকড়ে ধরতে পারছেনা । তাই তাদের সৃষ্টির অবকাশ ফুরিয়ে গেছে। তারা বনিয়াদি চালে, বনিয়াদি ঢংয়ে সাহিত্যকে ধরে রাখার যত চেষ্টাই করুননা কেন, ইতিহাসের গতি রোধ করার সাধ্য তাদের নাই। সুতরাং ইতিহাস আপন পথ করে নেবেই এবং সেই কাহিনী রচিত হবে যে ভাষায় সে-ভাষা হিন্দু মুসলমান গোটা জনতার ভাষা। বাঙলা ভাষার এই রূপান্তর সমাজ বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মেই আসবে। আসবে সমাজ বিপ্লবের চারণদের কণ্ঠ থেকে। এমনই স্বাভাবিক নিয়মে বাঙলা সাহিত্যে এসেছে ইংরেজী, জার্মাণ, ফরাসী, রাশিয়ান, আরবী, ফার্সী, উর্দু। সাহিত্যের এই রূপান্তরকে গ্রহণ না করে শুধু জাতীয় অহমিকা চরিতার্থ করার জন্য এবং সম্ভবত রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক জিগিরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সংস্কৃত-উর্দু সমস্যাকে নিয়ে জলঘোলা করলে তার ফলে, আর যাই হোক, সাহিত্য ও সাহিত্যিক কারও দাবী মিটান হবে না। চাকরীতে শতকরা হার কমান সম্ভব, কিন্তু লেখকের পক্ষে কি শব্দের শতকরা হার নির্ণয় করে লেখা কখনও সম্ভব হবে?'[১২]

প্রবন্ধে উর্দুর দাবি উপেক্ষণীয় নয়— মন্তব্যের যাথার্থ কালের প্রেক্ষিতে ঠিক ছিল। নতুন জীবন রূপায়ণে যে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হবে— এটা দূরদর্শী মন্তব্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বাঙলাদেশের সাহিত্য' হিসেবে স্বতন্ত্র সংযোজন তার প্রমাণ। সীমান্তের সম্পাদকীয় আলোচনায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশের অন্তরায় বা সুবিধা -অসুবিধা সম্পর্কে যে সমস্ত বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে— তাও যেমন অধিকার সচেতন বলে দুঃসাহী, তেমনি তৎকালের সমাজচিত্র হিসেবেও আজও গুরুত্বপূর্ণ। একটি সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে: 'প্রকাশককে প্রথমে পুলিশের ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হয়। ছাড়পত্র পেলে তবেই অনুমতি পাওয়া যায়। জনমতের উপর পুলিশী কর্তৃত্ব যুদ্ধের সময়কার কুখ্যাত ভারত-রক্ষা আইনের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আজকের পরিবেশে জনমতের উপর এইরূপ কর্তৃত্ব অবাঞ্ছিতই শুধু নয়, গণস্বার্থ বিরোধী। আজ আমরা সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করেছি কিনা এবং কতদূর করেছি তার পরীক্ষা হবে জনমত প্রকাশের নিরঙ্কুশ অধিকারের কষ্টিপাথরে। কাজেই আমরা দাবী করি সংবাদ-পত্র প্রকাশের পথে যে-সমস্ত আমলাতান্ত্রিক অন্তরায় এখনও বর্তমান সেগুলি প্রত্যাহার করা হোক। এবং সেই সঙ্গে আরও দাবী করি, যেসমস্ত সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে গণ-আন্দোলনের সেবা করার জন্য সেগুলি রাহুমুক্ত হোক।'[১৩]

প্রথম সংখ্যাতেই সীমান্ত তখনকার গণতান্ত্রিক ও মুক্তবুদ্ধির দ্বারা সমর্থিত প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের প্রধান মুখপত্র হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিল এবং সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রাপ্ত সংখ্যাগুলোতে প্রবন্ধ পাওয়া যায় যেসমস্ত লেখকদের, তাঁরা হলেন : আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (পদ্মাবতী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ১/১; প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য ও মুসলমান ১/২; বড়যোগীর পুঁথি ২/২; সংস্কৃতি সম্মেলনে (১৯৫১) প্রদত্ত মূল সভাপতির ভাষণ ৪/১; রোসাঙ্গ শহর কোথায় ?৫/১)। ননী সেন গুপ্ত (বাংলা ভাষার রূপান্তর ১/১; এ যুগের কবিগুরু ২/৫); যোগেশ চন্দ্র সিংহ (ধর্মের গ্লানি ১/২; যুগের সীমান্ত ৩/১); জীবন কুমার চক্রবর্তী (ছাড়পত্র : সুকান্ত ভট্টাচার্য ১/৩); সুভাশীষ চৌধুরী (পরিচালক বড়ুয়া— কুমার প্রমথেশ বড়ুয়ার সিনেমা পরিচালনের কৌশল ও শিল্প-দক্ষতা বিষয়ে আলোচনা, ১/৩); ইলিয়া ইলেন বুর্গ (এর বক্তৃতা অনুবাদ করেন সৈয়দ জামাল আহমেদ 'সাহিত্য সংস্কৃতি ও বিশ্বশান্তি' শিরোনামে, ২/১; 'যুদ্ধকে আমরা ঠেকাবোই' অনুবাদ করেন গোপাল বিশ্বাস, ৩/৫) ; মোতাহের হোসেন চৌধুরী ('পশ্চিমবঙ্গের কবি, শিল্পী-সাহিত্যিকদের নিকট একটি আবেদন' —সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ১৯৫০ নিবারনের জন্য, ৩/১; কাব্যে সমাজ চেতনা ও ঐতিহ্যবোধ ৪/১; নজরুল ইসলাম ও রেনেসাঁস ৫/১); আবুল ফজল ('ইতিহাসের আহ্বান' সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা— ১৯৫০-এর প্রেক্ষিতে, ৩/১; সংস্কৃতি ৪/১); গোপাল বিশ্বাস (ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্যগতি (দাঙ্গা সংখ্যা ৩/১); কৃষণচন্দর ('কোরিয় রণাঙ্গণে আমেরিকার প্রথম নিহত সৈনিকের প্রতি খোলা চিঠি' অনুবাদক মাহবুবউল আলম চৌধুরী ৩/২) ; জন স্ট্রাচি ('কডওয়েল ও গণতন্ত্র' ; কডওয়েলের Studies in a dying culture এর ভূমিকার অনুবাদ করেন সম্ভবত আহমদুল কবির[১৪], ৩/৩) ; ক্লাড মরগ্যান (পল বরমনের ভাষণ, অনুবাদিকা—সুমিতা মুৎসুদ্দি ৩/৪) ; দীপক আচার্য (তুর্কী-কবি নাজিম হিকমত ৩/৪) ; শ্রীযুত সত্যেন মজুমদার (সংস্কৃতি সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, ১৯৫১, ৪/১) ; বেগম সুফিয়া কামাল (সংস্কৃতি সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, ১৯৫১, ৪/১) ; মোহাম্মদ ফেরদাউস খান (মাতৃভাষার মর্যাদা, সংস্কৃতি সম্মেলনে পঠিত, ১৯৫১, ৪/১) ; চৌধুরী হারুনর রশিদ (মাননীয় লিয়াকত আলী খান, মৃত্যুপরবর্তী রচনা, ৫/১) ; ইত্যাদি।

যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁরা : বেগম সুফিয়া কামাল (১/২) ; মাহবুব উল আলম চৌধুরী (১/২ ; ১/৩ ; ২/১ ; ৩/১ ; ৩/২) ; বঙ্কিম সেন (১/২) ; সুধাংশু সরকার (১/২) ; অচিন্ত্য চক্রবর্তী (১/২) ; আবদুস সালাম (১/২) ; বিভূতি চৌধুরী (১/৩) ; রবীন্দ্র মজুমদার (১/৩) ; ওহিদুল আলম (১/৩ ; ৩/১) ; সুচরিত চৌধুরী (১/৩ ; ২/১) ; শওকত ওসমান (২/১) ; অচিন্ত্য চক্রবর্তী (২/১ ; ৩/১ ; ৩/২) ; মোসফেকা রহমান (২/১) ; নুরুননাহার (২/১) ; এস. এম. বাজলুল হক (২/২) ; সবুজ চৌধুরী (২/২) ; চলন্তিকা রায় (২/২ ; ২/৫ ; ৩/১) ; চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় (২/৫) ; সুশান্ত চৌধুরী (২/৫) ; মোহাম্মদ শাহেদ উদ্দিন (২/৫) ; অন্নদা শংকর রায় (৩/১) ; শওকত ওসমান (৩/১) ; মতিউল ইসলাম (৩/১ ; ৩/২) ; প্রাথমিকা প্রামাণিক (৩/১) ; আলমগীর (৩/৩) ; সমরেন্দ্র দত্ত (৩/৩) ; (৪/১) ; দেবপ্রিয় বড়ুয়া (৩/৩) ; রুধির ভট্টাচার্য (৩/৩) ; উইলিয়াম হাইউট (সানাউল হক (?) অনুবাদিত, ৩/৩) ; আলাউদ্দিন আল আজাদ (৩/৪ ; ৪/১) ; শফিকউদ্দিন আহমেদ (৩/৪) ; জামালুদ্দিন (৩/৪) ; হাওয়ার্ড ফাস্ট (সানাউল হক? মা. আ. চৌ? ৩/৫) ; আতাউর রহমান (৩/৫ ; ৫/১) ; আজম চৌধুরী (৩/৫) ; চিরঞ্জীব শর্মা (৩/৫) ; শামসুর রাহমান (৪/১) ; নাজিম হিকমত (অনুবাদক-রামবসু, ৪/১), অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী, (৫/১) ; ইমামুর রশিদ (৫/১) ; পুর্ণেন্দুশেখর পত্রী , ৫/১); প্রমুখ।[১৫] তাছাড়া নিগ্রো লোকসঙ্গীত মনোয়ার চৌধুরীর (ছদ্মনাম?) অনুবাদে ছাপা হয়েছে (৩/২) ।

সীমান্তে গল্প লিখেছেন : আবুল ফজল (১/২) ; এ. বারী ওয়ারেসী (১/২, ওয়ারেসী বুক স্টোর-এর মালিক) ; এবনে গোলাম নবী (১/২ ; ২/১) ; মাহবুব উল আলম চৌধুরী (১/৩) ; মুনীর চৌধুরী (১/৩) ; শুভাশীষ চৌধুরী (১/৩) ; গোপাল বিশ্বাস (২/১ ; ৩/২ ; ৩/৪) ; সমরেন্দ্র দত্ত (২/২) ; দিলীপ মুখোপাধ্যায় (২/৫) ; শুধু চৌধুরী (সুচরিত চৌধুরীর ছদ্মনাম, ২/৫) ; কৃষণ চন্দর (শওকত ওসমানের অনুবাদে, ৩/১) ; সায়ফুল আলম (৩/১); বলবন্ত সিং (অনুবাদক শওকত ওসমান ৩/৩) ; সিরাজুল ইসলাম (আজিজ মিছির, ৩/৩ ; ৩/৫); দিলদার চৌধুরী ছদ্মনামে সানাউল হক (৩/৫); সু. র. আখতার (৩/৫ ছদ্মনাম?) ; শওকত ওসমান (৪/১); সুলেখা সান্যাল (৫/১) ; বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (৫/১) প্রমুখ।

ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন সংখ্যায় 'আগামীকাল' শীর্ষক নাটক লিখেছেন সম্পাদক মাহবুব উল আলম চৌধুরী (২/২ থেকে) : আমেরিকার প্রতিভাবান কথাশিল্পী এ্যালবার্ট ম্যলৃজ এর গল্পের সোভিয়েত লেখক এম. লেভিনা কর্তৃক নাট্যরূপের বাংলা অনুবাদ— 'সুখী মানুষ' করেন গোপাল বিশ্বাস । একাঙ্কিকা লিখেছেন এবনে গোলাম নবী (৩/১)। শওকত ওসমান 'লাল বানু' উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে লিখেছেন ২/২ থেকে বিভিন্ন সংখ্যায়। তিনি পি. লুকনিৎসকি থেকে 'নিশো' শীর্ষক উপন্যাসও ৩/২ থেকে ধারাবাহিক অনুবাদ করেন। বলা বাহুল্য, সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারনায়

Dhaka University Institutional Repository

আস্থাশীল বিদেশী সাহিত্যিকদের রচনা থেকে অনুবাদের প্রয়াসের মধ্যে মার্কসীয় মতাদর্শে আনুগত্য প্রকাশের নজীর আছে। মৌলিক বাঙলা-রচনাগুলোর মূল সুরও পত্রিকার আকর্ষণীয় চরিত্রের সম্পূরক। লেখক-গোষ্ঠীর মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক, প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক এবং যুগলীগ প্রভৃতি বামপন্থী সংস্থার সদস্য- পর্যাপ্ত সংখ্যায় ছিলেন বলে এই ধারনা ভ্রান্ত হতে পারেনা।

এসব ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে সীমান্তে লিখেছেন কিংবা আলোচনা-সমালোচনা, চিঠিপত্র, মতামত লিখে পত্রিকার মিশনারী-কাজে অংশ নিয়েছেন সুচরিত চৌধুরী, এবনে গোলাম নবী, আবুল ফজল, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, শহীদুল্লাহ সাবের, সৈয়দ জামাল আহমেদ, মাহবুব উল আলম চৌধুরী, দৌলতর রহমান, এ. টি. এম. শামসুদ্দিন, আকবর হোসেন , ইব্রাহিম খাঁ, ইরশাদ হোসেন; আবিদ আলী, আবদুল গনি, অমিয় ভূষণ চক্রবর্তী, ইয়াকুব খান, প্রাণ গোপাল নাথ প্রমুখ। বাণী পাঠিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ; অন্নদা শংকর রায়, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ। বিচিত্র বিষয় নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা মন্তব্য হয়েছে— সমকালের রাজনীতি, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রভাষার বিতর্ক : সিনেমা, চিত্রপ্রদর্শনী, সঙ্গীত, রেকর্ড, সাহিত্য-পুস্তক— সর্ব বিষয়ে; পত্র-পত্রিকা, গল্প-উপন্যাস-নাটক-কবিতার বই ইত্যাদি কিছুই বাদ পড়েনি। ১৯৫০ সনের হিন্দু-মুসলমানের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন ভাষার গল্প-কবিতার অনুবাদ, সংস্কৃতি-সম্মেলন, গণনাট্য ও গণ-সঙ্গীত এবং সমাজতান্ত্রিক বা মার্কসীয় সাহিত্যের অনুবাদ, চর্চা, সমালোচনা; বিশ্বশান্তি ও আণবিক বোমা নিষিদ্ধকরণ, যুদ্ধবিরোধী প্রচারণা—প্রভৃতি বিষয়ে উৎসাহী, আবেদনশীল, নিরাপোষ, ঝুঁকিপূর্ণ অনেক লেখা ছেপে, বক্তব্য প্রচার করে সেকালে জনগণের সপক্ষে এবং প্রশাসন বা স্টাবলিশমেন্টের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল সীমান্ত। পশ্চিম-বঙ্গেও সীমান্ত ব্যাপকভাবে আদৃত হয়। গোপাল হালদার পরিচয় পত্রিকায় সীমান্তর দাঙ্গা - বিরোধী সংখ্যা সম্পর্কে লিখেছিলেন (১৯৫০) :

"পূর্ব বাংলার সুদূর চট্টগ্রাম থেকে এমনি সময়ে হাতে এসে পৌছলো 'সীমান্ত' নামের মাসিক পত্রিকার দাঙ্গা-বিরোধী — ৩য় বর্ষের প্রথম বৈশাখ সংখ্যা। পূর্ব বাংলায় দাঙ্গা-বিরোধী মানুষ আছেন এবং তাঁরা তাঁদের সেই মতামত প্রকাশ করতে ভীত নন। এই সংবাদ আমরা পশ্চিম বাংলার মানুষেরা কজনা জানি। আমরা কজন তা বিশ্বাস করি? পশ্চিম বাংলা থেকে এমনি কোন দাঙ্গা বিরোধীর আশ্বাস দিয়ে কোন সাময়িক সংখ্যা পূর্ব বাংলায় গিয়েছে কিনা জানিনা। এ-প্রশ্ন তুলতেই ভয় পাই, কারণ তৎক্ষণাৎ উঠবে এই তর্ক, কোন বাংলা কতটা দাঙ্গামুখী। তারপর কে ঢিল ছুঁড়েছিল প্রথম? কবে? ...।'[১৬]

তৎকালের পূর্ব বাংলার অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, চিন্তা ও সাহিত্যের অগ্রগতির লক্ষ্যে সীমান্ত কি ধরনের ভূমিকা অবলম্বন করেছিল বা তার দৃষ্টিভঙ্গিই বা কী ছিল— তা বোঝার জন্য উপরের মন্তব্যের সঙ্গে পত্রিকায় মুদ্রিত রচনার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি সহযোগে সামান্য আলোচনা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। ১৯৪৭-৫২-র ভাষা আন্দোলন-এর সমকালে সীমান্তের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন চলেছিল। ৪৮-এর ভাষা আন্দোলন তখনও শুরু হয়নি। কিন্তু সীমান্তের নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৪৭ সংখ্যায় 'রাষ্ট্রভাষা' এবং 'সাংস্কৃতিক সংকট' সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছিল। প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবদুল হক 'ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব' গ্রন্থে লিখেছেন— ১৯৪৮ সনের মার্চ মাসে সক্রিয় ভাষা আন্দোলনের আরম্ভ হওয়ার পূর্বে লেখক-সম্প্রদায় রাষ্ট্রভাষার তত্ত্বগত দিক নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন। জুন মাস থেকে তাঁরা ক্রমাগত লিখে 'ভাষা আন্দোলের মানসিক প্রস্তুতি সম্ভব' করে তুলেছিলেন। প্রস্তুতি-পর্বে (কেউ একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বাংলা, কেউ উর্দু ও বাংলা উভয় ভাষার সুপারিশপূর্বক) যাঁরা লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে আবদুল হক সাহেব তাঁর লেখা পাঁচটি প্রবন্ধের (প্রথমটি ২২ শে জুন ১৯৪৭) কথা উল্লেখ করেছেন। আরও বলেছেন, মাহবুব জামাল জাহেদী, ফররুখ আহমদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কাসেম, ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, ইত্তেহাদ, আজাদ, সওগাত প্রভৃতি পত্রিকায় অনেক লিখেছেন। গণ আজাদী লীগ (জুলাই ৪৭), তমদ্দুন মজলিশ (সেপ্টেম্বর ১৯৪৭) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলেছেন। কলকাতা ও ঢাকা থেকে বাংলা ভাষার সপক্ষে উচ্চারিত এইসব বক্তব্য প্রেরণা জুগিয়েছিল ১৯৪৮-এর ভাষা আন্দোলনকে। আবদুল হক সাহেব আরও লিখেছেন : "মনে হয় আরও কেউ কেউ লিখেছিলেন যাঁদের কথা এখনও কোথাও উল্লেখ করা হয়নি।[১৭]

এখানে তাই উল্লেখযোগ্য যে: সীমান্ত পত্রিকার ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১৩৫৪, নভেম্বর ১৯৪৭)য় এবনে গোলাম নবী উর্দু ভাষাকে বাঙালিদের উপর জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়ে জাতির মানসিক সার্বিক বিকাশকে রুদ্ধ করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছিলেন : "... এত উৎকণ্ঠিত হতে হতোনা যদি মুষ্টিমেয় কয়েক জনের চাপে পড়ে গণের ভাষা রাষ্ট্রে স্থান না পায় ... তবে গণতন্ত্রের দুর্দিন বলে বলতে (ভাবতে?) হবে। গণতন্ত্রের বুলি আওড়ালেই গণতন্ত্রের মর্যাদা দেওয়া হয়না। ভাষার দিক থেকে .... বাংলা অপাংক্তেয় নয় ... যদি রাষ্ট্র জনসাধারণের হয় তবে জনগণের ভাষাই রাষ্ট্রে স্থান পাবে। .... কারণ এই ভাষাতেই রাষ্ট্রের মঙ্গল নিহিত। ... একজনের ঘাড়ে বিদেশী ভাষার জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দেওয়ার মধ্যে কোন সদুদ্দেশ্য থাকতে পারেনা। .... রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কাজ যদি আজও কোন বিদেশী ভাষায় চালাতে হয় তবে স্বাধীনতা শুধু ইতিহাসের পাতাই উজ্জ্বল করবে, জনসাধারণের সঙ্গে তার কোন চাক্ষুস পরিচয় হবেনা।"

'সাংস্কৃতি সংকট' শীর্ষক আলোচনায় এবনে গোলাম নবী সাংস্কৃতিক ভাবনায় উন্নতি- প্রগতির দিকে না গিয়ে পশ্চাৎধাবনের জন্য আশংকা প্রকাশ করে বলেন এই পরিস্থিতির পরিবর্তন আবশ্যক, কারণ, সংস্কৃতি হলো মানুষের বিবেক। এর বিকাশকে প্রতিহত করার অর্থই হলো মানুষের বিবেককে ধ্বংস করে দেয়া।[১৮]

দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (মাঘ ১৩৫৫) দৌলতুর রহমান 'আণবিক ভবিষ্যত' শীর্ষক নিবন্ধে আমেরিকার আণবিকশক্তি বৃদ্ধির কুফল ও পারমাণবিক পৃথিবীতে মানুষের শান্তির সম্ভাবনা কতোটা ক্ষীণ সে -সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করেন। 'আমাদের সাহিত্য' প্রসঙ্গে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর বক্তব্য ঃ রাষ্ট্রনায়কদের প্রকৃত মানসিকতা হলো কম্যুনিজম ও কমিউনিস্টদের প্রতাপ কমানো যায় কিভাবে তারই ষড়যন্ত্র করা। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

প্রগতিশীল তরুণেরা জনগণের ভাত কাপড়, চাকরী-সমস্যা এবং দুর্নীতি, দুর্ভিক্ষের অবসান চায়। তাই সরকার প্রগতির সাহিত্য ও সেই সাহিত্যের শক্তি দেখে ভীত হয়ে ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রগতির পক্ষ নিয়ে যেসব তরুণ সাহিত্য সংকৃতির চর্চা করতে চায়— তাদেরকে কমিউনিস্ট বলে দমন করতে চায়। লেখক এই পরিস্থিতিতে মন্তব্য করেন : " কিন্তু তারা যাই করুন, যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনে পৃথিবী ঘুরছে তার প্রগতি রোধ করার পক্ষে আমেরিকার আণবিক শক্তিও যথেষ্ট নয়। কারণ আধুনিক সমাজবাদ ও সাম্যবাদ কোন রাষ্ট্র কোন রাষ্ট্রের ঘাড়ে তুলে দেয়না। জনসাধারণের প্রয়োজনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে আপনাআপনি তার উদ্ভব হয়। এই সত্য কথাটি রাষ্ট্র-নায়কেরা জানেননা বলেই মরণ-কামড় দেবার আশায় তারা আজ এত চঞ্চল।"

১৯৫০ সনের দাঙ্গার উপর প্রায় সকল পত্রিকায় (সমকালে) কমবেশী মতামত/ মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছিল। শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের একক এবং সমবেত বক্তব্যও প্রচারিত হয়েছিল যার মূল বক্তব্য দাঙ্গার অমঙ্গল বর্ণনা। কিন্তু সীমান্তের দাঙ্গা বিরোধী সংখ্যা ছিল সেকালে ব্যতিক্রম। এই পত্রিকায় সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট গভীরভাবে বিশ্লেষণপূর্বক মনুষ্যত্ব ও মানবতার জয়গান করে যে মর্মস্পর্শী বক্তব্য তুলে ধরা হয় এবং কার্যকর পন্থা অবলম্বন করেন উদ্যোক্তারা — তার সামাজিক সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য অপরিসীম। উল্লেখ করা হয়েছে পূর্বে যে, দাঙ্গা-প্রতিরোধে চট্টগ্রামে সীমান্ত-র উদ্যোগে 'শান্তিফৌজ' গঠন, শান্তি সম্মেলন-এর আয়োজন ইত্যাদি আন্তরিকতার সঙ্গেই হয়েছিল। সীমান্তের দাঙ্গা-বিরোধী এই সংখ্যাটি না দেখলে এইসব কর্মী, ভাবুক, সাহিত্যিকদের যুগোপযোগী, কালের চাহিদার সম্পূরক ভূমিকা যথার্থ উপলব্ধি করা যায়না। বৈশাখ ১৩৫৭ (৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, নব পর্যায়) সীমান্ত ৮৪ পৃষ্ঠাব্যাপী [১৯] যে-সমস্ত লেখা প্রকাশ করেন, তা দাঙ্গা-নিবারনার্থ বিংশ শতাব্দীর যাবতীয় লেখার মধ্যে গুণে, আন্তরিকতায় শ্রেষ্ঠ নিঃসন্দেহে। বাঙালি মুসলমান লেখকদের মধ্যে প্রধান মানবতাবাদী সাহিত্যিক এবং মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনের একজন প্রধান সৈনিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী "পশ্চিম বঙ্গের কবি, শিল্পী- সাহিত্যিকের নিকট একটি আবেদন।'[২০] শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন ঃ 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিবারণের ব্যাপারে কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকদেরও কর্তব্য রয়েছে। সে সম্বন্ধে তাঁদের সচেতন হওয়া দরকার। কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকরা সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন মনুষ্যত্বকে। ... সেই মনুষ্যত্বের অপমানে তাঁদের চুপ করে থাকা অশোভন। সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত আবহাওয়া যে মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিকূল, মনুষ্যত্বপ্রেমিক হিসাবে তাঁরাই তা সবচেয়ে বেশী উপলব্ধি করেন। ... (এতে) শুধু মানুষ মারা যায় বলে যে দুঃখ তা নয়, যারা মারতে আসে তাদের মনুষ্যত্ব মরে যাওয়ার দুঃখও অপরিসীম। বিকৃত বুদ্ধি মনুষ্যত্বহীন মানুষ (সমূহ) দিয়ে জাতির ক্ষতি ছাড়া লাভ হয়না। তাই তাদের পুনরায় সহজ মনুষ্যত্বে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা প্রয়োজনীয় এবং সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে কবি শিল্পী সাহিত্যিকদের। .... যাতে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের পুণরাভিনয় না হয়, সে জন্যে মনুষ্যত্বে পূর্ণ আস্থাবান তরুণ সম্প্রদায়ের দ্বারা একটি শান্তিফৌজ গড়ে তোলা আবশ্যক। ... একথা মনে রাখা দরকার, দেশের মুক্তি আমরা পেয়েছি, কিন্তু মানুষের মুক্তি এখনো হয়নি, আর মানুষের মুক্তি না হলে দেশের মুক্তির কোন মানেই হয়না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মানুষের মুক্তির পথে প্রবল অন্তরায়। ... দাঙ্গা .. যে আসলে প্রগতিবিরোধেরই সজ্ঞাগ চেষ্টার ফল, তা উত্তমরূপে বিশ্লেষণ করে দেখাতে না পারলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে নিশ্চিহ্ন করা কঠিন হবে।' এই 'বিশ্লেষণের' কাজ করেন শ্রী যোগেশচন্দ্র সিংহ, 'যুগের সীমান্তে' শীর্ষক নিবন্ধে। তিনি বিশ্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে ভারতের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক গতিধারা পর্যালোচনা করে দীর্ঘ প্রবন্ধে বলেন দাঙ্গার মূল কারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটকে প্রগতিবিরোধীদের এড়িয়ে যাবার কৌশল বা ষড়যন্ত্র মাত্র। সমাজ-বিপ্লবকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা হচ্ছে 'দাঙ্গা'। অন্নদা শংকর রায় এসংখ্যাতেই লিখেছিলেন 'নজরুলকে' শীর্ষক কাব্যাংশ - "ভুল হয়ে গেছে বিলকুল

সবকিছু আজ ভাগ হয়ে গেছে

ভাগ হয়নিক নজরুল

এই ভুলটুকু আমাদের জীবনে বেঁচে থাক্

এই ভুল নিয়ে দুর্গত কবির

দুর্গতি মুছে যাক।"

শওকত ওসমান 'হুঁশিয়ার' শীর্ষক কবিতায় দাঙ্গার সমাজতাত্ত্বিক অর্থনৈতিক সংকট এড়াবার তথা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেন ঃ

এক হও দুনিয়ার মজলুম /চোখ থেকে মুছে ফেলো ঘুম।।

আমরা দুনিয়ার এক মজহাবী/ সমাজ-কলের চাকা আর চাবী।

বহু জাতি মজহাবের বেড়া/ তুলেছে যত দুনিয়ার লুঠেরা।

শোষণের কালো পিচকারী ভরি। আমাদের খুনে খেলে হোরি।।

'স্মৃতি নেই : হাসিনা নেই: কাকাবাবু' শীর্ষক কবিতা দাঙ্গা, দেশ ভাগ ও 'উদ্বাস্তু'- সমস্যার প্রেক্ষাপটে রচিত। সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রই যে দাঙ্গার মূল কারণ, তা মাহবুবউল আলম চৌধুরীর কবিতারও বিষয় — 'ভাঙা বাঙলার ক্ষুদ্ধ বাঙ্গালী আবার/শক্তি সঞ্চয় করছিল ধীরে ধীরে, /ভাঙা বাঙলার ক্ষুদ্ধ বাঙ্গালী আবার/ মিলিত হচ্ছিল রাম-রহিমের প্রশ্ন ভুলে, /ভাঙা বাঙলার ক্ষুদ্ধ বাঙ্গালী আবার/জেগে উঠছিল - মসজিদ মন্দিরের প্রভেদ ভুলে , .../ বিদেশী শয়তান বাঙালীর ঐক্যে/আবার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, আদেশ দিল/ প্রভুভক্ত দালালদের কাছে —"

এ সংখ্যার সমস্ত কবিতা দাঙ্গা বিরোধী, মনুষত্বের উদ্বোধক। কবিরা উদ্বাস্তু জনগণের দুঃখ বুকে চেপে রাখতে পারেননি —পারেননি উপর্যুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

কবিও — "এই ভিটে মাটি তোমাদের তরে রেখে গেলাম,/রেখে গেলাম ছোট ছোট অনেক আশা অনেক স্বপ্ন,/অনেক দীর্ঘশ্বাস / এই মাঠ ঘাট শ্যামল পৃথিবী রেখে গেলাম/রেখে গেলাম ফোটা ফোটা চোখের জল, বুকের ঢল / এই স্বদেশের নীল আকাশ।।"

সর্বকিছু দেবার পরও যদি দেশবাসীর মনে একটি মর্মবাণী জেগে থাকে, তবেই উদ্বাস্তর সান্ত্বনা — "... সেই বেদনায় অনুশোচনায়/ তোমার বক্ষে যদি জেগে ওঠে একটী মর্মবাণী 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'/ সেদিন বন্ধু তোমার ও বুকে আবার লইব ঠাঁই।'

এবনে গোলাম নবী 'নাটকের অন্তরালে' একাঙ্কিকায় স্পষ্ট উচ্চারণ করেন দাঙ্গার কারণ — "আপাতত দৃষ্টিতে দাঙ্গা সম্প্রদায়গত হলেও এর মূল কারণ স্বার্থ। এক শ্রেণীর লোকের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আজ হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে আত্মহুতি দিতে হচ্ছে..'। দেশের দশের রাষ্ট্রের কল্যাণ চাইলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা দরকার — এই হলো ১৯৫০ সনের দাঙ্গার প্রেক্ষিতে পূর্ববঙ্গের শিল্পীসাহিত্যিকদের বক্তব্য। কৃষণ চন্দরের দাঙ্গা বিষয়ক একটি গল্প অনুবাদ করেন শওকত ওসমান ('দুই অমৃতসর')— যার বক্তব্য হলো দেশ ভাগের পর একই মানুষ কিভাবে পাল্টে অন্য মানুষ হয়ে গেলো, একই অমৃতসর দুই রূপ দেখালো। হিন্দু-মুসলিম-শিখদের সাম্প্রদায়িক চেতনার বীভৎসতম চিত্রের পাশাপাশি ঐগল্পে মানবতার প্রতি আর্তিও ব্যক্ত হয়েছে। 'জনসাধারণ এবং প্রগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিকদের ভূমিকা' বিষয়ে 'আলোচনায় বলা হয় প্রগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিকরা 'জনসাধারণের থেকে একচুলও বিচ্ছিন্ন হতে চাননা। জনসাধারণের যে কোন অবস্থার মধ্যে প্রগতিশীল সাহিত্যিক শিল্পীরা নির্বিকার থাকতে পারেননা। ... সাম্রাজ্যবাদী দালাল সাহিত্যিকরা মুক্তি- আন্দোলনকে পিষে মারার জন্য কলম ধরেছেন, শোষিত মানবকে ঘৃণ্য জীবের পর্যায়ে নামিয়ে দাবিয়ে রাখার সাহিত্য তৈরী করছেন। সুতরাং দেখতে গেলে, সাহিত্যিক ও শিল্পী রাজনীতিকে বাদ দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করছেন না।'

আবুল ফজল দাঙ্গার প্রেক্ষিতে 'ইতিহাসের আহবান' জানিয়ে বলেছিলেন মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ দরকার আর এক্ষেত্রে ছাত্র ও যুব-সমাজের ভূমিকা প্রধান। তিনি পরিস্থিতিকে অগ্নিসম গণ্য করে বলেন : 'এরকম কাণ্ডজ্ঞানহীন সর্বনাশা আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা, নিজের মনুষ্যত্ব, ধর্ম ও রাষ্ট্রের প্রতি-বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। নিজের প্রতি রাষ্ট্র ও মানুষের প্রতি ছাত্র ও তরুণসমাজ কখনো এমন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেনা। যে ছাত্র প্রকৃত ছাত্র, যে তরুণের আছে প্রকৃত তারুণ্য, আগুণের সামনে দাঁড়িয়ে সে কখনো চুপ করে থাকতে পারেনা, সে কখনো নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারেনা।' তিনি তরুণ সমাজের দাঙ্গা মনুষ্যত্বহীনতা ও বর্বরতাকে রুখে দাঁড়াবার নৈতিক শক্তির উজ্জীবন কামনা করে পাঁচ পৃষ্ঠার এই গুরুত্বপূর্ণ রচনাটি সীমান্তে লিখেছিলেন। ফলে সীমান্তের আবেদন সার্বজনীন হতে পেরেছিল সন্দেহ নেই। যে-সমস্ত কারণে সীমান্ত সমকালে 'সাড়া' জাগিয়েছিল এবং ইতিহাসের পাতায় নিজের স্থায়ী আসন করে নিতে পেরেছে— এই দাঙ্গা বিরোধী সংখ্যাটি তার মধ্যে অন্যতম।

এছাড়া ১৯৫১ সনের মার্চ মাসে চট্টগ্রামের হরিখোলা মাঠে অনুষ্ঠিত সংস্কৃতি সম্মেলনে পঠিত রচনাবলী এবং সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণী সংকলন করে যে-সংখ্যাটি সীমান্ত (৪/১) প্রকাশ করে তাও নানান গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের আকর তথ্য হিসেবে আজ বহুমূল্য বিবেচিত হবে সন্দেহ নেই। কারণ, সম্মেলনে কারা কি বিষয়ে বলেছিলেন বা লিখিত প্রবন্ধ পড়েছিলেন, তা কোনো আলোচনায় পূর্ণাঙ্গ বিবৃত হয়না। অনেকেই জানেননা, এবং প্রায় কোথাও উল্লেখ করা হয়না যে, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, সত্যেন মজুমদার, সুফিয়া কামাল, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবুল ফজল প্রমুখ ব্যতীত মোহাম্মদ ফেরদাউস খানও 'মাতৃ-ভাষার মর্যাদা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ঐ প্রগতিশীল সংস্কৃতি-সম্মেলনে পাঠ করেছিলেন। পরবর্তীকালে দক্ষিণপন্থী পাকিস্তানবাদী ধারায় আত্মসমপন করায় আজ আর কেউ-ই ফেরদাউস খানের এই ভূমিকার কথা স্মরণে আনেন না। বাঙলা দেশের বন্ধ্যা বিকৃত বীভৎসতম সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির কলুষতায় সমাজ-জীবন যখন স্থবির হয়ে পড়েছিল তখন অনুষ্ঠিত ঐ সংস্কৃতি-সম্মেলনের গুরুত্ব যেমন অপরিসীম হয়ে দেখা দিয়েছিল, তেমনি সংস্কৃতি সম্মেলনের লিখিত রূপটিও সেইকালে অশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল, এতে সন্দেহ করা চলেনা। এই সংখ্যাটির যে মূল তাৎপর্য তাহলো সম্মেলনের বক্তাদের বক্তব্য ও রচনা দ্বারা তুলে ধরা হয়েছে এই শাশ্বত সত্য যে — জীবন, মানুষ ও সমাজকে বাদ দিয়ে সাহিত্য শিল্প সৃষ্টি সম্ভব নয় এবং মানুষের প্রতি মমত্ববোধই সেই সৃষ্টির প্রেরণা।

সংস্কৃতি সম্মেলনের কিঞ্চিৎ পরিচয় এই সংখ্যা সীমান্ত থেকে এইজন্য উপস্থাপন করা হচ্ছে যে এই কথাগুলো অন্যত্র প্রায় উল্লেখ করা হয়না। সম্মেলনে যে চিত্রপ্রদর্শনী হয়, তাতে জয়নুল আবেদীন, শফিউদ্দিন আহম্মদ, কামরুল হাসান, আজহারুল হক প্রমুখের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছিল। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন বিভাগীয় কমিশনার মিঃ এন. এম. খান। গীতানুষ্ঠানে সলিল চৌধুরীর সুর-সংযোজনায় নতুনত্বের সন্ধান পেয়ে দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ হয়েছিলেন। "যখন প্রশ্ন ওঠে যুদ্ধ কি শান্তি/ আমাদের বেছে নিতে হয় নাক ভ্রান্তি;/ আমরা জবাব দেই শান্তি, শান্তি, শান্তি/' – এই গানের সুরের মূর্চ্ছনায় শ্রোতারাও গেয়ে ওঠেন — শান্তি, শান্তি, শান্তি। বিশ্বশান্তি সম্মেলন ও পারমাণবিক অস্ত্র বন্ধের দাবির এবং হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সমকালে এই গান, তথা সংস্কৃতি-সম্মেলন এবং সীমান্তর সংখ্যাটি বাঙলাদেশের সংস্কৃতি-জগতে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। শান্তির সপক্ষে প্রচার সীমান্তর একটি প্রধান ও ব্যতিক্রমী সামাজিক দায়িত্ব পালনের প্রচেষ্টা নি:সন্দেহে বলা চলে।

সাহিত্য-জগতের সমালোচনায় সীমান্ত তার চরিত্র অনুযায়ী একটি দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে চেয়েছিল। সমকালের পত্রিকাসমূহের আলোচনার জন্য 'পত্রিকা প্রসঙ্গ' বিভাগের ভূমিকাটি দ্রষ্টব্য : " পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে ঢাকায় ও পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় অনেক সাময়িকী, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা বের হয়েছে। এই উদ্যম সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু সম্পাদক ও পরিচালকমণ্ডলীর জানা উচিত যে, এই ক্ষেত্রে তাঁদের দায়িত্ব অপরিসীম। কিন্তু অনেক মাসিক পত্রিকার কোন সুষ্ঠু আদর্শ নেই। তার ফলে অনেক কাগজ থাকা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক অন্ধকার বেড়েই চলেছে। এমন দায়িত্বহীনতার পরিচয় আমরা সহযোগীদের কাছ থেকে আশা করি নাই। এ সম্পর্কে আমরা প্রতি মাসেই আলোচনার বন্দোবস্ত রাখব।"[২১] মোহাম্মদী, তাহজিব, নওবাহার প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকার বিরুদ্ধে তাঁরা লিখেছেন। এতে বুঝা যায়, স্পষ্টতই 'সীমান্ত' সেকালে প্রগতির পক্ষে দাঁড়িয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

৩. সংকেত (ডিসেম্বর ১৯৪৮-- জানুআরি ১৯৪৯/ পৌষ ১৩৫৫)

'সংকেত' মাত্র দুবার বের হয়েছিল। পূর্ব-বাঙলার সাময়িকপত্রের ইতিহাসে 'বড়দের জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম সাহিত্যপত্র' [২২] হিসেবে সংকেত উচ্চ আসন অধিকার করে আছে। ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল কাইউম 'পূর্ব পাকিস্তানের সাময়িকপত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে (১৯৬৮) উপর্যুক্ত মন্তব্য কিভাবে করলেন, তা বোঝা যায় না— কারণ ঐ প্রবন্ধে তিনি আজাদী—পরবর্তীকালের কতিপয় সাময়িকপত্রের নামের পরই 'সীমান্ত'র তথ্য উল্লেখ করেছিলেন। তিনি সম্ভবত 'পূর্ব পাকিস্তান' বলতে ঐ মুহূর্তে ঢাকাকেই বুঝেছিলেন, অথবা চট্টগ্রাম কে 'পূর্ব পাকিস্তান' বিবেচনা করেননি। পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সাহিত্য পত্রিকা কোন্‌টি— নতুন তথ্য না-পাওয়া পর্যন্ত এর জবাব হলো 'কৃষ্টি'। কৃষ্টির সমকালে অথবা অত্যল্পকাল পরেই সীমান্ত প্রকাশিত হয়েছিল বলে সীমান্তকে দ্বিতীয় এবং পরবর্তী মাসে প্রকাশিত বলে 'সংকেত'কে তৃতীয় সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে মেনে নেয়া সঙ্গত। এর অল্পকাল পরেই ঢাকা থেকে এক ঝাঁক মাসিকপত্রিকা বাঙলার সাহিত্য-গগনে আবির্ভূত হয়েছিল। মোহাম্মদী ১৩৫৬ সনে ঢাকা থেকে নব-পর্যায়ে পুনরায় প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। এ ধারায় প্রায় এক মাস অন্তর-অন্তর পাকিস্তানবাদী ইসলাম-পন্থী গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় পত্রিকা প্রকাশ পায়। মাহেনও বের হয় চৈত্র ১৩৫৫ তে। দিলরুবা বৈশাখ ১৩৫৬, নওবাহার ও দ্যুতি ভাদ্র ১৩৫৬, ইমরোজ আশ্বিন ১৩৫৬; মোহাম্মদী অগ্রহায়ণ ১৩৫৬, তাহজিব বৈশাখ ১৩৫৭ ইত্যাদি। প্রগতিপন্থী ধারার ঐতিহ্য রক্ষা করতে এসময়ে অগত্যা মুকতি যাত্রিক স্পন্দন প্রভৃতি বের হয়। লক্ষ্যণীয় যে, এই ধারার পত্রিকার নামগুলোও ঈঙ্গিতময়। "সংকেত" নাম এবং এর সঙ্গে তখনকার প্রখ্যাত তরুণ বামপন্থী লেখক আলাউদ্দিন আল আজাদ এর সংশ্লিষ্টতা স্মরণ ও বিবেচনাযোগ্য। তাছাড়া পত্রিকায় ঘোষিত উদ্দেশ্যের মধ্যে 'প্রগতিশীল' কথাটিও লক্ষ্যণীয়। ডক্টর কাইউম মন্তব্য করেছেন : "দ্বিতীয় সংখ্যার পর আর পত্রিকাটি বেরোয়নি।"[২৩] সুদীর্ঘকাল পরে এখন মাত্র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা (পৌষ ১৩৫৫) টি পাওয়া যায়। এই সংখ্যার তথ্য অনুযায়ী সংকেত-এর সম্পাদক সিরাজুর রহমান। বিভাগীয় সম্পাদক চৌধুরী মমতাজ হোসেন এবং আলাউদ্দিন আল আজাদ। সংকেত এর সাইজ ছিল সাড়ে নয় ইঞ্চি বাই আট ইঞ্চি। পৃষ্ঠা সংখ্যা বিয়াল্লিশ, নিউজপ্রিন্ট। পত্রিকার শীর্ষে লেখা আছে ২৪ পয়েন্ট টাইপে "পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র প্রগতিশীল বাংলা মাসিক"। 'আমাদের কথা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে পত্রিকার 'যাত্রা' সম্পর্কে বলতে গিয়ে তৎকালের চিত্র এঁকেছেন ঃ "বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। পাথেয় অদৈম্য-আশা, সুদৃঢ় আত্ম-বিশ্বাস আর কর্মপ্রেরণা। যাত্রা-পথে আজ তলিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে বিগত দেড় বছরের (আগস্ট ১৯৪৭-জানুয়ারি ১৯৪৯) খতিয়ান। ঐতিহাসিক ১৫ই আগষ্টের বুনিয়াদ নিয়ে পূর্ব বাংলা পশ্চিমবাংলা থেকে পৃথক হয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে এক নূতন দায়িত্ববোধের সূচনা হলো। প্রথমত দেশ ভাগের ফলে বাঙ্গালী মুসলমানদের অধিকাংশই পড়লেন পূর্ববাংলার আওতায়। সাহিত্যের পূর্ণতার প্রয়োজনে এদের জীবন ও মননকে ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়লো। তারপর সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বসমর ও মন্বন্তরে যদিও পূর্ববাংলাই ধুঁকে ধুঁকে মরেছে সবচেয়ে বেশী, তবুও কলকাতা-কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যে তার কোন হদিসই মেলেনা ... আজাদীর এ দেড় বছরে কি চোখে পড়ে? শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির জমার ঘরে শূন্য। সাহিত্যের এক তামস যুগের মহড়া চলছে। চারিদিকে ঘন-ঘোর আঁধিয়ার, সাড়া-শব্দ নেই, এমনকি শাওন-রাতের বিজলীও না। অনুন্নীন, বস্ত্রহীন, নিঃসাড় পঙ্গু জীবনেরই প্রতীক এ দেড় বছর। ব্যারাক ; মালগাড়ী আর পোড়ো –বাড়ীর আস্তানার মতোই ছন্নছাড়া এর সংস্কৃতি। এদেশে মানুষ আছে, তাদের সুখ আছে, দুঃখ আছে,.... নেই শুধু তাদের প্রকাশের ভাষা। সভ্যতা হতবাক্। এর কারণ এ নয় যে প্রতিভার দুর্ভিক্ষ লেগেছে পূর্বপাকিস্তানে, এ নয় যে মানুষ আজ বাঁচতে চায় না সুন্দরের পথে, সুখের সাথে। সংস্কৃতি শিল্পের প্রতি সরকারী বেসরকারী হতাদর ও অবহেলাই এর জন্য মূলত দায়ী।..... নবজাগ্রত বুদ্ধিজীবী-সমাজ বিশ্বের ভাবধারার সাথে নিজেদের ভাবধারার সমন্বয় সাধনের জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছেন কিন্তু সেপথ কোথায়? যাঁদের হাতে অর্থ.... যাঁরা এদের বাঁচিয়ে রাখতে পারেন, তাঁরা ভুলেই গেছেন যে সমাজ সংস্কৃতি শিল্প ছাড়া বাঁচতে পারেনা।.... সাহিত্যপত্রিকায় লাভের কোটাটা টনটনে নয় তত। কাজেই কি প্রয়োজন তাতে? আর যাঁরা ভালোবাসেন সাহিত্যকে প্রাণ দিয়ে, তাঁরাও যে পরিচালনা করবেন একটা সাহিত্যপত্রিকা তার যো নেই। বাজারে কাগজ নেই। যা আছে কালোবাজারির দৌলতে দরটা তার এতই জমকালো... কাগজ কেনা... অসাধ্য। তারপর ব্যবসায়ী-সমাজ বিজ্ঞাপন দেবেন না। তাঁরা ভুলে যান সমাজে যাঁরা বুদ্ধিজীবী মাসিক পত্রিকার মারফত তাঁদের সওদা গিয়ে হাজির হবে তাঁদের (ই) হাতে।"

বলা হয়— উচ্চমূল্যের (স্টাণ্ডার্ড বোঝাচ্ছেন) পত্রিকা এখানে চলে না। "তবু আজ শুভ্রায়িত পূবের আকাশের সংকেত নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হলো কুসুম ছাওয়া ছায়াঘেরা অপরূপ রাজপথে নয়, সাহিত্য সংস্কৃতির বিঘ্ন-বহুল সর্পিল পথে। দৈনন্দিন জীবনের যে সংগ্রাম তার যে সংহতির সংকেত—এদের সবটুকু জহর নিতে হবে শুষে। আরো কতো জানা-অজানা বিঘ্নের ঝোড়ো মেঘ ভিড় জমাবে আকাশে। গতিপথে বন্ধু পাবো অনেক। ছেড়েও যাবেন অনেকে। যারা চাইবে এগুতে হাত ধরে তাদের নেবো টেনে। এ চলার বিরাম নেই... শিল্প সংস্কৃতির গতিতে যতিপাত হবার নয় কোন দিন।"

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সূচীপত্র ঃ এভলিন রেঞ্চ (প্রবন্ধ) সাংবাদিকের দৃষ্টিতে মিঃ জিন্নাহ (অনুবাদক চৌধুরী মমতাজ হোসেন — পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের একজন) ; আলতাফ হোসেন (প্রবন্ধ) এযুগের সেরা যাদুকর (ডন-সম্পাদক এর লেখার অনুবাদ করেন মিস লুৎফুন্নিসা বেগম লায়লী, রচনার বিষয়বস্তু কায়েদে আযম)। সুলতানউজ্জামান খান (কবিতা) স্রষ্টা নও তুমিই এক ইতিহাস ; হাসান হাফিজুর রহমান (কবিতা) কায়েদে আজমকে ; আশরাফ সিদ্দিকী (কবিতা) স্মরণ ; আনার চৌধুরী (কবিতা) পৌষের কাব্য ; শাহাদৎ উল্লাহ (গল্প) প্যাঁচ ; আলাউদ্দিন আল আজাদ (গল্প) একটি বুকের ঢেউ ; ছায়াছবি (সিনেমার আলোচনা)

আমাদের কথা (সম্পাদকীয়)। লক্ষণীয় যে প্রায় সব লেখাই কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে নিয়ে। ১৯৪৮-এর ১১ই সেপ্টেম্বরে কায়েদে আজমের পরলোক গমন করার মাস দুই পরেই এই পত্রিকার যাত্রা শুরু হয়েছিল। কায়েদে আজম ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ঘোষণা দিয়েছিলেন। মৃত্যুর পূবে নিন্দিত হবার সুযোগ কম পাওয়ায় তখনকার প্রগতিশীল পত্রিকাও কায়েদে আজম- চর্চা করতো। তখনও পূর্ববাঙলার জনগণ কায়েদে আজম কে কট্টর প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রতীকরূপে গ্রহণ করেনি। অথবা আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে দেখেনি যে, পাকিস্তান আন্দোলনে

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃবৃন্দ অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের থেকে কায়েদে আজমের মাহাত্ম্য এবং বিরাটত্ব বেশি কিছু ছিলনা। পশ্চিমারা বাঙালিকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে 'কাঙাল' করার জন্য ইকবাল ও কায়েদে আজমের ভাবমূর্তি বড় করে তুলে ধরেছিল সচেতন পরিকল্পনার দ্বারা। আর বাঙালীর যে কিছু নেই—, বিরাটত্ব, মহত্ব, বংশ ও কুল গৌরব—এমনকি জাতীয় নিরাপত্তার কাজে সহায়ক পর্যাপ্ত বীরত্বও যে বাঙালির নেই, এমন সব হীনত্ব প্রচারের মূলে-যে ছিল বাঙালিকে পাশ কাটিয়ে সকল ক্ষেত্রে পশ্চিম-পাকিস্তানীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র— তা বাঙালি জাতি তখনও স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে পারেনি বলেই একুশের প্রথম সংকলনের (১৯৫৩) সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমানও কায়েদে আজমের ছবিসহ কবিতা লিখেছিলেন ; আর

"স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু, আমরা এখনো/চারকোটি পরিবার/খাড়া রয়েছি তো।/ যে-ভিৎ কখনো কোনো রাজন্য পারেনি ভাঙতে .../ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক।/ একটি মিনার গড়েছি আমরা/চারকোটি পরিবার" —বায়ান্নোর একুশের পরে লেখা এই অমর কবিতার রচয়িতা আলাউদ্দিন আল আজাদের সম্পাদিত (বিভাগীয় সম্পাদক।) পত্রিকায় কায়েদে আজম এতটা গুরুত্ব পেতে পেরেছেন। তবু একথা সত্য যে গল্পগুলোতে যে দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতা পেয়েছে তা ইসলামপন্থীদের দৃষ্টি নয় এবং পত্রিকার রচনায় গোঁড়ামী নেই। সাহিত্যের মাধ্যমে পূর্ব বাঙলার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতে গিয়ে তাঁরা বাঙালির অন্তর্জীবনকে যথার্থভাবে প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন। তখনও বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়নি। বাংলা-উর্দুর বিতর্কে সচেতন বাঙালিরাও তখনও দ্বিধামুক্ত হতে পারেননি যে উর্দুর পরিবর্তে বাঙলা একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবার আইনগত ও গণতান্ত্রিক অধিকার বা যোগ্যতা রাখে। সবকিছু মিলিয়ে বিবেচনাপূর্বক বলতে হয় যে, কায়েদে আজমের ছবি ছাপলেও মুসলিম লীগের শাসনকালীন প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রধানতম ব্যক্তিরা যাঁরা তখন ক্ষমতায় আসীন ছিলেন — তাঁদের সুনজর ছিলনা এই পত্রিকার কর্মকর্তাদের উপর, এবং এঁরাও তখন ক্ষমতায় ভাগ বসাবার যোগ্য ছিলেন না; ফলে পত্রিকা চালাবার মতো আর্থিক সমর্থন পাননি। দু সংখ্যার পর তাই পত্রিকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নইলে পত্রিকা সম্পাদনের যোগ্যতা, প্রধান বাঙালি লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং মুদ্রণসৌকর্য সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান তাঁদের যা ছিল তাতে একটি মাসিক পত্রিকা চালানো যেতো এবং সে সামর্থ্য ছিল বলে তাঁদের প্রাথমিক উদ্যোগের মধ্যেও প্রমাণ পাওয়া যায়।

৪. অগত্যা (১৯৪৯-৫২)

চট্টগ্রাম ও ঢাকা থেকে সীমান্ত, কৃষ্টি, সংকেত ইত্যাদি প্রকাশিত হলেও কৃষ্টি ও সংকেত এক - দুসংখ্যার বেশী প্রকাশিত হয়নি; আর সীমান্ত মাসিক হলেও অনিয়মিত ভাবে বের হচ্ছিল এবং তাও চট্টগ্রাম থেকে। অতএব ঢাকার প্রগতিপন্থী লেখক-সাহিত্যিকদের ভাব ও বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম তখনও সৃষ্টি হয়নি। মোহাম্মদী, মাহেনও, দিলরুবা প্রভৃতিতে প্রগতিবাদী প্রতিবাদীদের স্থান ছিলনা। এমত অবস্থায় তরুণ-প্রাণের অকৃত্রিম হৃদয়াকূতি এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের একটি উপযুক্তপত্র প্রকাশের তাগিদ থেকেই আষাঢ় ১৩৫৬ জুন ১৯৪৯ সনে ১০৭ ইসলামপুর, ঢাকা থেকে অগত্যা প্রকাশিত হলো - যার কর্নধার প্রতিভাদীপ্ত একদল সমবয়সী তরুণ; পরবর্তীকালে এঁদের অধিকাংশই বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে এক-একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। কেউ কেউ বুদ্ধিজীবী-সমাজের অগ্রগণ্য হয়ে ব্যাপক পরিচিতি লাভে সমর্থ হয়েছেন। প্রখ্যাত টিভি ব্যক্তিত্ব ফজলে লোহানী (১৯২৮-৮৫), সাংস্কৃতিক-তারকা ফতেহ লোহানী, সাংবাদিক-কলামিষ্ট খোন্দকার আবদুল হামিদ, তাসিকুল আলম খাঁ, সাবের রেজ্জা করীম, শিল্পী কামরুল হাসান, সিন্দবাদ; সঙ্গীতজ্ঞ আবদুল আহাদ, কাজি আলাউদ্দিন, আবু সঈদ নাসির, মাহবুব জামাল জাহেদী; ডক্টর মুস্তাফা নুরউল ইসলাম (১৯২৭-), কবি আতাউর রহমান (১৯২৫-) নাট্যকার আনিস চৌধুরী (১৯২৯-৮৯) প্রমুখ 'অগত্যা'র আড্ডায় একত্রিত হয়েছিলেন এবং এই পত্রিকাকে ঘিরেই এঁদের উচ্ছ্বাস, আনন্দ, চিন্তা-ভাবনা এবং কর্মকাণ্ড আবর্তিত হতে শুরু করেছিল। বলাবাহুল্য তা ব্যাপকভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

অগত্যার প্রকাশকাল (১৯৪৯) থেকে বর্তমান (১৯৯৪) পর্যন্ত— এই দীর্ঘকালের ব্যবধানেও 'অগত্যা' যে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়নি, নানা প্রসঙ্গে এখনও স্মরণীয় হয়ে ওঠে — তাতেই বোঝা যায় এই পত্রিকা প্রকাশকালে কতোখানি স্থায়ী পরিচিতি অর্জন করেছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল তখনকার মেধাবী, প্রগতিশীল, উচ্চাভিলাষী তরুণেরা এর প্রাণকেন্দ্রে ছিলেন বলে। রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আইডেন্টিটির ক্ষেত্রে যাঁদের অবস্থান ছিল মুসলিম লীগের পাকিস্তানপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রতারক-ইসলামী ধারার বিপক্ষে। সোজা কথায়, স্টাবলিশমেন্টের বিরোধীতা করা ছিল তাঁদের উৎসাহী কার্যাবলীর মূল প্রেরণা। স্টাবলিশমেন্টের ভণ্ডামি, প্রতারণা এবং অপকীর্তির মুখোশ উন্মোচন করতে গিয়ে তাঁরা যে পদ্ধতি পন্থা ও ভাষাকে আশ্রয় করেছিলেন, তাতে ছিল তীক্ষ্ম হুল, শ্লীলতাবর্জিত ব্যঙ্গ-কৌতুক ও হাস্যরস। এইসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই 'অগত্যা' ব্যাপকভাবে পঠিত, বহুল পরিচিত হতে পেরেছিল, সঙ্গে সঙ্গে কুখ্যাতি অর্জন করেছিলো 'ভদ্রলোকের পত্রিকা নয়' বলে।[২৪] বলা হতো, ভদ্রলোকের অপাঠ্য, অশ্লীল কিন্তু বিষয়বস্তুর কারণেই তা প্রতিষ্ঠিত অপ্রতিষ্ঠিত, খ্যাত-অখ্যাত, সরকারী, সরকার-বিরোধী সকল প্রবীণ-তরুণের পাঠ্য হয়েছিল। এর সমালোচনার বিষয় ছিল মুসলিম লীগ সরকারের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক -অর্থনৈতিক-প্রশাসনিক অপপ্রয়াস; আর প্রতিষ্ঠিত, প্রবীণ কবি সাহিত্যিক এবং তাঁদের অনুগত অনুসারী হবু-খ্যাত ডানপন্থী তরুণ কবি-সাহিত্যিক। ফলে অশ্লীল বলে পড়ব না — এমন ভাব দেখিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলতোনা। যেমন এককালে চলতো না কল্লোল (১৯২৩) অগ্রগতি (১৯৩৫) অচলপত্র না-পড়ে অবজ্ঞা করা। অবশ্য একথা বলতে হবে যে, জনপ্রিয় হবার ও পরিচিতি অর্জনের কৌশল ও মেধা, আর সাহস উদ্যোক্তাদের দলপতির (ফজলে লোহানী) ছিল। ফজলে লোহানীর কথা স্মরণ করলেই কিছুটা অনুমান করা যায়; তিনি স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে দার্ঘদিন বিরতির পর লণ্ডন থেকে প্রবাস-জীবন সমাপ্ত করে দেশে এসে মৃত্যুর পূর্বে আশির দশকে বি, টি, ভি-তে 'যদি কিছু মনে না করেন' ম্যাগাজিন-অনুষ্ঠান করে কিভাবে অতি অল্প সময়ে একালের তরুণ-সমাজের কাছেও ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়-ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে সমর্থ হয়েছিলেন। অতএব দৃষ্টি আকর্ষণের কৌশল ছিল তাঁর স্বভাবগত। একজন সাংবাদিক-সমালোচক লিখেছেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

ধরে প্রচারিত বিটিভির এই অনুষ্ঠান হিসেবে তাঁর অননুকরণীয় ভংগী এই অনুষ্ঠানকে টিভির সর্বস্তরের দর্শকের কাছে জনপ্রিয় করেছে।... তৈরী ছক থেকে বের হয়ে নতুন ধরনের অনুষ্ঠান করেছিলেন ... টিভি মাধ্যম যে কেবল সাংস্কৃতিক বিনোদনের মাধ্যম নয়, এর যে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করার কথা .... তা তিনি প্রমাণ করেছিলেন ... দীর্ঘদিন মুদ্রণ সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে টিভি-সাংবাদিকতা করা সহজ হয়েছিল। ... তাঁর স্মার্টনেস, বাক্-চাতুর্য, উপস্থিত বুদ্ধি, হিউমার দিয়ে এধরনের শো প্রোগ্রামের মাধ্যমে যেভাবে জনগণকে মাতিয়ে রাখতেন তার জুড়ি মেলা ভার।"[২৫] কবি আতাউর রহমান 'অগত্যা এবং আমরা কয়েক জন' শীর্ষক এক স্মৃতি কথায় লিখেছেন ঃ ফজলে লোহানীর 'ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাসিকুলেরও সেটা ছিল। অগত্যায় ব্যঙ্গাত্মক লেখাগুলো ওদের যৌথ রচনা। মোস্তফা (মুস্তাফা নুরউল ইসলাম) সাহেবের কিছু অবদান আছে তাতে। ওদের ভাষার কিছু নিজস্ব কোড ছিল— সেটা ওরাই বুঝতো। সেই কোডের ভাষায় কথা বলতো আর হাসতো।' .... 'লোহানী ভ্রাতৃদ্বয় থাকেন আজিমপুরে বোন-ভগ্নিপতির বাসায়। —আমরা দল বেধে যেতাম — আমি, আনিস চৌধুরী, তাসিকুল আলম খাঁ, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম .... আড্ডা জমাতাম .. দেশের মুল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকিনি,... বুঝলাম (১৯৪৯ সনে) ফজলে লোহানী বামের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। তখন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা অগত্যা ছাড়া কেউ করতো না -- যদিও সে সমালোচনার চরিত্র ছিল ভিন্ন। ছাত্র আন্দোলন, যুব আন্দোলনের সঙ্গে লোহানীর যোগ ছিল। মধুর রেস্টুরেন্টের সাহিত্য সভায় পঠিত প্রবন্ধ গল্প-কবিতা অগত্যায় প্রকাশ করতেন। আর্থিক টানাটানি ছিল। তাই তিনি মাঝে মাঝে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আংশিক সময় কাজ করতেন। অনেক সময় রাতে কাজ করে তাসিকুলের সঙ্গে ইকবাল হলে আসতেন। আমার এবং (অথবা?) তাসিকুলের বেডে শুয়ে পড়তেন। ফজলে লোহানীর ছিল তীক্ষ্ম কাণ্ডজ্ঞান আর দ্রুত কাজ করার ক্ষমতা। 'অগত্যা' অফিসের কাজ তিনিই করতেন বেশী। নিজের হাতে চিঠিপত্র টাইপ করতেন। 'সবুজ' (আবু সঈদ নাসির, প্রকাশক ও মুদ্রাকর, অগত্যা) করতো বাইরের কাজ। লোহানী আনিস চৌধুরীর সঙ্গে বিজ্ঞান বিভাগে পড়ত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার দিকে তাসিকুলের মতো তারও অনীহা ছিল। প্রচলিত সামাজিকতা আর বাধাধরা জীবনের প্রতি অবজ্ঞাই ছিল। অগত্যায় অনেক লেখায় তার তীব্র ছাপ আছে। অনেক সমস্যার ভারের মাঝেও লোহানী প্রাণবন্ত, হাসিখুশি থাকতেন। ... ১৯৫২ এর ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনার পরপরই লোহানী কবিতা লিখলেন।[২৬] সে কবিতা সত্যিই বেশ ভাল হয়েছিল। ও হাত দিলে সব রকম লিখতে পারতেন। অগত্যার বেনামী লেখাগুলো বেশীর ভাগ লোহানীই লিখতেন। বহু অনুবাদ করেছেন। তাঁকে অনায়াসে সব্যসাচী বলা যায়।' [২৭]

আনিস চৌধুরী সম্পর্কে মুস্তাফা নূরউল ইসলাম লিখেছেন ঃ "সাতচল্লিশের পার্টিশনের পর ওরা তিনজন এসেছিল কলকাতা থেকে। সবুজ, লোহানী, আর আনিস। প্রথম তারুণ্যের আমরা কয়েকজন মিলেছিলাম, ... তখনকার দুর্দান্ত 'অগত্যাকে নিয়ে। কত অজস্র লেখা যে আনিস লিখেছে অগত্যায় স্বনামে, বেনামে, ছদ্মনামে: একটা কম্পিটিশনের মতো ছিল — কে কতো হুল-ফোটানো লেখা লিখতে পারে, কতো ত্যাঁড়া করে লিখতে পারে। হামলার লক্ষ্যবস্তু তখনকার পাকিস্তানী প্রভুরা। লেখায় কেউ কারুর চাইতে কম যেত না, তবে আমাদের মধ্যে সবচাইতে নির্বিরোধী, সবচাইতে সরল চেহারার, স্বল্পবাক আনিস চৌধুরী যে ঐ বিশেষ কর্মটিতে অমন ধারালো হয়ে উঠতে পারত, বাজ-পাখির মতো হয়ে যেত, ভেতরের আমরাই কেবল তা জানতাম। আনিসের লেখার একটা বিশেষ ভঙ্গি ছিল। ঐ ভঙ্গিটা যে কেমন করে রপ্ত করেছিল, বিনা আয়াসে তরতরিয়ে সে লিখে যেতে পারত। লেখার উপকরণের ব্যাপারে ভারি সৌখিন ছিল আনিস — সেই আমলেই রেডিও-বণ্ড কাগজ আর চাই পাইলট পেন। অগত্যার জন্য গল্প লিখতো, আর সম্পাদক লোহানী, আনিস, আমি তিনে মিলে আমরা 'প্রশ্নোত্তর' লিখতাম। (বিচিত্রায় প্রকাশিত হাসান হাফিজ লিখিত একটি প্রতিবেদনে মুস্তাফা নূরউল ইসলাম বলেন, সাক্ষাতকারে— একই ছদ্মনামে আমরা (লোহানী, আনিস, আমি) ঘুরে ফিরে লিখতাম। অগত্যার কিছু কলাম যেমন 'আদ্যোপান্ত' 'ইত্যাদি' 'প্রশ্নোত্তর', রেডিও বিষয়ক একটি কলাম - এসব আমরা একসঙ্গে বসে লিখতাম। কখনো পাইওনিয়ার প্রেসে বসে, কখনো হ্যাপী রেস্টুরেন্টে, সলিমাবাদ রেস্টুরেন্টে বা মধুর দোকানে এসব লেখা হত। এখন আর বলতে বাধা কী, প্রশ্নগুলো বানানো হত। ঐ কাজটি মূলত আনিসই করত। চট জলদি এত অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন ওর মাথায় কোথা থেকে যে আসত। তারপর যৌথ প্রয়াসে জবাব তৈরী করা। লক্ষ্য ঐ একই — শিশুরাষ্ট্র পাকিস্তানের দাঁতাল দখলদার মুরুব্বীরা, যারা কথায় কথায় ইসলামের নামে, দুই পাকিস্তানের ঐক্যের নামে, পাঁচ হাজার বছরের (বানোয়াট) ঐতিহ্যের নামে ছবক বিতরণ করতেন, ফরমান জারি করতেন। বিশেষ করে আরো ছিল — বাংলা ভাষা, হরফ, রবীন্দ্র- নজরুল এবং আমাদের বাঙালিত্ব নিয়ে করাচি-ঢাকার ক্ষমতাধর সেই মাতব্বরদের রক্তচক্ষু নির্দেশ। সবারিত জানা রয়েছে তাদের দুশমনি অভিযানকে রাজপথে রুখেছিল আটচল্লিশ-বায়ান্নোর তরুণ, ছাত্র আর সাধারণ মানুষ, সেই সঙ্গে একটু যোগ করি সীমিত সাধ্যে 'অগত্যা' নামের পত্রিকাটিও কিছু কাজ করেছিল। সেসব কথা তখনকার পাঠকরা এখনো সম্ভবতঃ স্মরণ করতে পারবেন। অগত্যার একেবারে ভেতর বাড়ির চারজনের অন্যতম ছিল আনিস চৌধুরী। না, প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আনিসকে তেমন দেখিনি— মিছিলে সমাবেশে কিংবা মঞ্চে। তবে প্রতিরোধী এবং প্রতিবাদী লেখালেখিতে কতো অজস্র-বার যে ঝলসে উঠতে দেখেছি তাকে। তখন আমাদের ঠাঁই ছিল পুরনো রেললাইনের পাশে বাখারির বেড়া- বাঁধা দোচালা টিনের শেডে। সারিসারি শেড- কে বা কারা যেন নামকরণ করেছিল 'ইকবাল হল'— বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের (ঢাঃ বিঃ) আদি চেহারা। সামনের সারির ঘরগুলোতে কেমন করে যে জুটেছিলাম আমরা কয়েকজন। এতদিন পরেও স্মরণ করতে পারছি সহবাসীদের কারুকে কারুকে - আখলাকুর রহমান, কেজি মোস্তফা, শহীদ খোন্দকার আবু তালেব, একদা কবি আতাউর রহমান, খালেক নওয়াজ (৫৪র নির্বাচনে যিনি ক্ষমতাসীন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনকে পরাজিত করেছিলেন) ছাত্রলীগ নেতা সামসুল হক, সাংবাদিক কবি তাসিকুল আলম খাঁ, আর সেই সঙ্গে আনিস চৌধুরী। সবাই আমরা ছাত্র সে-সময়টায়। ৪৮ থেকে ৫২ কাল পর্বের খানিকটা হয়ত ধারণা করা যেতে পারে এইসব মানুষের উল্লেখ থেকে। বলব কী, নানান ঝড় ঝাঁপটার ভেতর দিয়ে আনিস এবং আমরা হয়ে হয়ে উঠেছি এই কাল-ইতিহাসের পরিবেশে।' ... বিজ্ঞানের ছাত্র আনিস যে শেষ অবধি সাংবাদিকতায় জড়িয়ে পড়ল এবং জীবন ভর সাংবাদিকই রয়ে গেল, বিস্মিত হইনি তাতে। কেননা বিশেষ ঐ কাল-পরিবেশ লালন করেছিল তাকে, আর আমরা ত দেখেছি কী গভীর সচেতন, সংবেদনশীল ছিল তার চিত্ত। লেখার কলম ছিল দখলে, সমকালে মানুষ হয়ে ওঠা আনিসের জন্যে সম্ভবত অন্যতম বিকল্প কর্ম কিছু ছিলনা। কিন্তু আরো একটি লেখা যে ভবিতব্য তার ললাটে লিখে রেখেছেন খুব কাছের জন আমরা কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

তখন তা আন্দাজও করতে পারিনি। বলেছি প্রচুর গল্প লিখেছে আনিস— সংলাপ রচনায় হাতটি ছিল পাকা। ঐটেই পাঠককে টানত আগে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি অকস্মাৎ আবিষ্কার করা গেল আমাদের সেই আনিস রীতিমতো শক্তিশালী নাট্যকার। ..... এই প্রজন্মও জানুক— একদা আমাদের সেই সময় গেছে, একদা আমরা প্রতিবাদী অমন একটা পত্রিকা বার করেছিলাম, নাম 'অগত্যা'; আর আনিস চৌধুরী নামের লেখক মানুষটি ছিল সেই প্রতিবাদের অন্যতম হাতিয়ার।"২৮

অগতার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় আত্মপরিচয় দেয়া হয়—'বিচিত্র মাসিকপত্র' বলে। বর্ষ আরম্ভ হয় আষাঢ় ১৩৫৬ থেকে। প্রতি বাংলা মাসের প্রথম এবং ইংরেজী (খ্রীষ্টীয়) মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হবে বলে ঘোষণায় বলা হয়। মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা। বার্ষিক ছ টাকা নয় আনা। ষান্মাসিক তিনটাকা আট আনা এবং ত্রৈমাসিক একটাকা বার আনা। ডাক মাসুল অন্তর্ভুক্ত। "অগত্যার প্রচার সুরুচিসম্পন্ন পাঠক এবং সুসংস্কৃত ছাত্র সমাজ-এ।" আরও বলা হয় : "অগত্যা একমাত্র প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রিকা। জীবন, সাহিত্য, চলতি ঘটনা, বিশ্বপরিস্থিতি, সিনেমা, বেতার, দর্শন, বিজ্ঞান, কারুকলা, সমালোচনা এবং আমাদের কৃষ্টি ও অগ্রগতির একমাত্র পরিচায়ক। মননশীল রুচি সম্পন্ন সাহিত্য রচনাই অগত্যার উদ্দেশ্য। রাজনীতির সঙ্গে অগত্যার কোন সম্পর্ক নেই। কোন দল বা গোষ্ঠীর প্রচারপত্র অগত্যা নয়। অগত্যা আপনার আমার সকলের মুখপত্র। পৃষ্ঠা সংখ্যা চৌষট্টি। প্রতি পৃষ্ঠার মূল্য আধ পয়সা। চৌষট্টি পৃষ্ঠা অন্তত চৌষট্টি বার পড়তে ইচ্ছে করবে আপনার। অগত্যা ঢাকা থেকে প্রকাশিত। দ্বিবর্ণে ও প্রয়োজনবোধে বহুবর্ণে মুদ্রিত হবে।"

অগত্যার প্রকাশক ও মুদ্রাকর হিসেবে নাম ছাপা হত আবু সঈদ নাসির এর। সাধারণ উপদেষ্টা ফতেহ লোহানী। সম্পাদক-সমবায় (মণ্ডলী)তে ছিলেন- বিশ্বপরিক্রমায় খোন্দকার আবদুল হামিদ; সংস্কৃতি সংবাদে— তাসিকুল আলম (খাঁ); প্রচারে— সাবের রেজা করীম; সৌষ্ঠব রচনা ও আঙ্গিক-পরিকল্পনায়— কামরুল হাসান এবং সিন্দবাদ; সঙ্গীতে— আবদুল আহাদ, স্টুডিওর সংবাদ-এ— কাজি আলাউদ্দিন; এবং সম্পাদক ঃ ফজলে লোহানী। সপ্তম সংখ্যা (প্রথম বর্ষ) থেকে সম্পাদক সমবায়ের সদস্য সংখ্যা কমে যায়, (নিশ্চয়ই অগত্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে চাননি অনেকেই — কারণ নিরাপো নিন্দুক ছিল অগত্যা; সরকার-বিরোধী ভূমিকায় ভয় পেয়ে যাবেন কেউ কেউ। ফলে খোন্দকার আবদুল হামিদ, কাজি আলাউদ্দিন, আবদুল আহাদ এর নাম মুদ্রিত হয়না। তবে প্রথম বর্ষ সপ্তম সংখ্যায় ফতেহ লোহানী, তাসিকুল আলম, সাবের রেজা করীম, কামরুল হাসান, সিন্দবাদ এবং হামিদুর রহমান-এর নাম বলবৎ থাকে এবং নতুন আসে।

অগত্যার যে বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্যণীয় তাহলো— কায়েদে আজম বা ইকবালের কোন স্তুতি না নিয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তি পুরোভাগে উদ্ধৃত করে এবং ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-চিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধ ('পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর') ছেপে যাত্রা শুরু করেছিল। এরপরও মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম প্রণীত 'রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ ও বুর্জোয়া সাহিত্যিকের আত্মবিরোধ' শীর্ষক প্রবন্ধ ছাপা (৪/২) হয়। সোভিয়েত সাহিত্যিক আন্তন শেকভ সম্পর্কে আলোচনা ও মার্কসীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী সাহিত্যিক খাজা আহমদ আব্বাস এর রচনার অনুবাদ এতে গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হয়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইলিয়া ইলেনবুর্গ, এ্যালান মরে, আনাতোল ফ্রান্স, বালজাক, বার্নাডশ, হেমিংওয়ে, এ গ্রিনিন, গোর্কী প্রমুখ বিদেশী প্রগতিপন্থী লেখকদের সাহিত্যের অনুবাদ অগত্যায় বিশেষ মর্যাদায় ছাপা হয়। এদেশের পত্রপত্রিকায় এই শ্রেণীর সাহিত্যের প্রকাশ অনেকটা নতুন ছিল। এদিক থেকে প্রসঙ্গত মন্তব্য করা সঙ্গত যে বিদেশী সেরা সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ প্রগতিবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে বাঙালি পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে সাহিত্যিকপরিমণ্ডলে অগত্যা নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সৈয়দ আলী আহসানের 'পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পক্ষেত্রে নির্দেশ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধও ছাপা হয়। বোঝা যায় আলী আহসান তখনও ততোটা চিহ্নিত পাকিস্তানবাদী ইসলামপন্থী রবীন্দ্রবিরোধী বলে প্রগতিশীলদের কাছে পরিহার্য লেখকরূপে চিহ্নিত হননি। এক পর্যায়ে তিনি যে বাঙালি সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রবিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীলতার জলজ্যান্ত প্রতীকে পরিণত হন, তখনও পর্যন্ত তাঁর স্বরূপ পরিপূর্ণ উন্মোচিত হয়নি। কিন্তু অগত্যার আদর্শের সঙ্গে এই প্রবন্ধের বক্তব্য সংগতিপূর্ণ ছিলনা। তিনি পাকিস্তানী -ইসলামী সাহিত্যের শিল্পের নতুন আদর্শের কথা বলছিলেন। 'আমাদের চিত্র নাট্য' সম্পর্কে আলোচনা করেন আল্ নাসির। আন্তন শেকভ থেকে অনুবাদ করেন মুসা মনসুর। 'রাজদ্রোহী' শীর্ষক গল্প লেখেন ফতেহ লোহানী। 'আলেকজাণ্ডার কেন এগোলেন না' শীর্ষক ব্যঙ্গ-গল্পের রচয়িতা সম্পাদক ফজলে লোহানী। খাজা আহমদ আব্বাসের 'বারো ঘন্টা' শীর্ষক গল্পের অনুবাদ করেন মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। কবিতা 'আশির্ব্বাণী' লেখেন শাহাদাৎ হোসেন। 'অগত্যা' নামে কবিতা লেখেন ফররুখ আহমদ। আরও কবিতা লেখেন— শামসুল হুদা, বদরুল হাসান, নাজির আহমদ, তাসিকুল আলম খাঁ, উত্তীয় সেন, ইরফান প্রমুখ। উল্লেখযোগ্য যে 'বিদ্রোহী'র ষ্টাইলে 'নাস্তিক' শীর্ষক কবিতা লিখেছিলেন ইরফান— হে বদ্ধচক্ষু ভগবান, ...'বজ্রের অসি নামিয়ে রাখো, প্রাচুর্য্যের সন্ধানে চাহি .... অনন্তের প্রতি কোষ পানে, ধরণী কক্ষচ্যুত হলো বুঝি তাই।" (প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা আষাঢ় ১৩৫৬, পৃ ৬২)

মার্কসবাদী লেখক-কবি আতাউর রহমান লিখেছিলেন 'হিন্দু-মুসলমান' শীর্ষক কবিতা (১/১০-১১)। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর কথা উদ্ধৃত করে কবিতা রচনার স্টাইল এদেশে সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু অগত্যায় তা ছিল। আতাউর রহমান এই স্টাইল অণুসরণ করেন। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার 'আদ্যোপান্ত' বিভাগে ১৯৪৯ সনে প্রকাশিত সাহিত্য-প্রত্রিকার পটভূমিরূপে তখনকার সাহিত্যিক পরিস্থিতিটাও লক্ষণীয় ঃ "বহু শতাব্দী পর আজ আমাদের বুক থেকে পরাধীনতার গ্লানিময় জগদ্দল পাথর নেমে গেছে। আজ আমরা মুক্ত, স্বাধীন হয়েছি। আজ আমাদের সাহিত্য মুক্ত হওয়া দরকার। সাহিত্যিককেও সব রকম অনাচার থেকে আজাদ হওয়া প্রয়োজন। আজ আপনার উচিত দেশে সবল সুস্থ ইঙ্গিত দিয়ে, নতুন প্রেরণা দিয়ে, ভবিষতের শক্ত ভিত্তিমূল তৈরী করার কাজে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। আজ সাহিত্যকে নিতে হবে সংস্কারক আর সংগঠকের কঠিন ভূমিকা। যা মিথ্যা, যা সত্য নয়, যা বাস্তবের অপলাপ, তাকে আপনার তুলে ধরতে হবে সকলের চোখের সামনে। জীবনের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে যে দুর্নীতির সামান্য ছোঁয়া লেগে জীবনমূল ভেঙ্গে যেতে পারে তার

Dhaka University Institutional Repository

প্রবহমান গতিকে প্রতিরোধ করতে হবে দুর্জয় বিক্রমে। আজ সামান্য খ্যাতির তাড়নায় তাড়াহুড়ো করা বা সামান্য স্বীকৃতির জন্যে বা দুটো পয়সার জন্যে সাহিত্যিকের লেবেল গলায় ঝুলিয়ে বাজারে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়ান আপনার উচিত নয়। আজ সাহিত্যিকের গুরুদায়িত্ব, সাহিত্যের সত্যিকার কাজ আপনার স্কন্ধে তুলে নিতে হবে। সাহিত্যের স্রষ্টাকে জানতে হবে কি করে তার সৃষ্টিকে অন্তরঙ্গ করা যায়, তার সৃষ্টিকে দেশের অন্তরের অন্দর মহল ঘুরিয়ে আনার উপায় কি। জীবনদর্শনকে নিয়ে যাঁরা শিল্প গড়েন তাঁদের দৃষ্টিটা খ্যাতির ব্যাপ্তি বা লাভ লোকসানের ওপর নিবদ্ধ থাকলে চলবে না।

কিন্তু আজ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রায় পৌনে দু বছর অতিবাহিত হতে চললো — তবুও বাংলা ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা কিংবা দু একখানা ভালো সাময়িকপত্রিকাও এখানে প্রকাশিত হলো না। আর মুসলিম সাহিত্যের যাঁরা দিকপাল সেজে বসে আছেন তাঁদের কথা ছেড়েই দিন — একখানা সত্যিকার সাহিত্যিক মর্যাদা- সম্পন্ন ভালো সৃষ্টি তাঁদের হাত থেকে পাওয়া গেলনা। বরঞ্চ সাহিত্যের গুরুত্বকে, মর্যাদাকে অনেক ধুরন্ধর আজ বাজারে টেনে এনে যে-ভাবে লাঞ্ছিত আর হাস্যকর করে তুলেছেন তাতে মুখ বুজে থাকা সম্ভব নয়।

বিভাগপূর্ব বাংলায় ... যে কজন মুসলমান সাহিত্যিক স্বকীয়তা অর্জন করেছিলেন ... তা নিছক নিজেদের গুণেই। ... ফাঁকির অবকাশ থাকত না.... কিন্তু, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমাদের সাহিত্য এখানে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে কয়েকজন তথাকথিত স্তাবকদের সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে। তাঁরা স্বল্প প্রচারিত কুখ্যাত কয়েকটি সাময়িকে আর মাঝে মাঝে প্রকাশিত অল্প সংখ্যক মুদ্রিত কবিতা ও সাহিত্য সংগ্রহেই তাঁদের কার্য্যকলাপ আবদ্ধ রাখছেন। সত্যিকার মননশীল শিক্ষিত মহলে কিংবা বিদগ্ধ সাহিত্যানুরাগী মহলে তাঁরা আস্তে আস্তে অপাঙক্তেয় হয়ে পড়ছেন। ... এসব অসঙ্গতি, স্বেচ্ছাচার আর বিপর্যয়কে দূর করার জন্যে আজ 'অগত্যা'র আত্মপ্রকাশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ... অগত্যা কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মুখপত্র নয়, অগত্যা সকলের মুখপত্র।" পৃ ৭-৮

অগত্যার নিয়মিত বিভাগে আলোচনা হতো সমসাময়িক ঘটনাবলী।এগুলোর নাম ছিল — 'আদ্যোপান্ত', 'ইত্যাদি' 'অপ্রাসঙ্গিক' 'সিনেমা' 'বেতার' 'চিঠিপত্র' 'রোজ-নামচা' ইত্যাদি প্রভৃতি। এক নজরে অগত্যার লেখকদের তালিকাটা দেখে নিতে পারি ঃ রবীন্দ্রনাথ (উদ্ধৃতি, পুনর্মুদ্রণ), ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ; সৈয়দ আলী আহসান; আল নাসির; মুসা মনসুর; ফতেহ লোহানী; ফজলে লোহানী; খাজা আহমদ আব্বাস (অনুবাদক ঃ মু. নু ই), মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ; শাহাদাৎ হোসেন ফররুখ আহমদ; শামসুল হুদা; বদরুল হাসান; নাজির আহমদ; তাছিকুল আলম খাঁ (স এবং ছ দুই বানানই লেখা হয়েছে পত্রিকায়) ; উত্তীয় সেন; ইরফান; হামিদুর রহমান; কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত; হাশমত আজীজ; জয়েনউদ্দীন (সরদার); ইলিয়া ইরেনবুর্গ (ইঙ্গিত, নাটক; অনুবাদক : ব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য); হাবীবুর রহমান ; ম্যাক্সিম গোর্কী (অনুবাদক ফজলে লোহানী/আবুসঈদ নাসির); আনিস চৌধুরী; এ. গ্রিনিন (আমেরিকায় চিন্তার স্বাধীনতা, প্রবন্ধ, অনুবাদক, ফজলে লোহানী); আবদুর রশিদ চৌধুরী; শামসুর রাহমান; মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়; ইলিয়া ইলফ এবং ইউজেন পেট্রভ (কলম্বসের আমেরিকা সফর, অনুবাদ); শাহাদাৎ উল্লাহ; আইউব হোসেন সিদ্দিকী; সত্যদাস; কোহিনূর ইউসুফ জয়ী; আবু সঈদ নাসির; শফিকউদ্দিন আহমদ; আলাউদ্দিন আল আজাদ; আতাউর রহমান, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আবু তায়েব সাদিদ, সমরেন্দ্র দত্ত; এ্যালান মরে; আবদুল গনি; আনওয়ারুল হাফিজ; রশিদ আনওয়ার (আখলাকুর রহমানের ছদ্মনাম); আখলাকুর রহমান; আনাতোল ফ্রান্স (গল্প, অনুবাদ আ. স. নাসির); সিরাজুল ইসলাম; দৌলতন নেসা খাতুন (নাটক — খিচুড়ী); আবু হাইয়ান (গ্রন্থ পরিচিতি) ; মনোজ রায় চৌধুরী; মোহাম্মদ আবদুল মোমেন; খান আবদুর রশীদ ; হোসনে আরা; মোহাম্মদ শহীদ; সলিমুল হক; সাইয়িদ আতীকুল্লাহ; ফয়েজ আহমদ; মোহাম্মদ শহীদ; রাশেদ জামাল; ওমর খান; আবদুল মোহীত; মাহবুব জামাল জাহেদী; কাজী হাসান ইমাম; আবদুল্লাহ জয়নুল আবেদীন (উপন্যাস অভিসারিকা), আবদুল গাফফার চৌধুরী; দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়; বালজাক; হাসান হাফিজুর রহমান, আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে; নেয়ামাল বাসির; জহিরুল আলম; মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম; মোহাম্মদ কায়সুল হক; আহমদ-উজ-জামান।

বাংলাদেশের সাহিত্যের পর্যায় বিভাগ করলে সাতচল্লিশ-পরবর্তী সাহিত্যের যে-স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যগোচর হবে- তা সৃষ্টি করেছিলেন পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কবি সাহিত্যিকেরা। একালের সাহিত্যের মূল ধারায় নতুন সংযোজন বাঙালি সংস্কৃতির উজ্জীবন এবং অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের চেতনা। জাতীয়তাবাদী অসাম্প্রদায়িক আধুনিক সাহিত্যের প্রভাবান্বিত বাংলাদেশের মানবতাবাদী বুর্জোয়াভাবাদর্শের সাহিত্য-সংস্কৃতির স্রষ্টা যাঁরা সেই কবি-সাহিত্যিকেরা অগত্যায় স্বাধীনভাবে সাহিত্য-চর্চার সুযোগ পেয়েছিলেন, এদিক খেকে তাই এর সাহিত্যিক অবদান গৌন নয়। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস এবং রম্য-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক সংলাপ সৃষ্টিতে আর সাহিত্যের মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন, অধিকাংশ মুসলিম জনঅধ্যুষিত একটি দেশের আলাদা অর্থনীতি-পররাষ্ট্রীয়নীতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও ভাবিত শৈল্পিক জীবন -ভাবনা রূপায়নে পূর্ববাংলার কবি সাহিত্যিকেরা যে-যাত্রা সাতচল্লিশ-পরবর্তীকালে আরম্ভ করেছিলেন, পঞ্চাশ-পূর্ববর্তী দশকে সীমান্ত অগত্যা ইত্যাদি পত্রিকা তখন রথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। সাহিত্যের অগ্রগতির ক্ষেত্রে অগত্যার ভূমিকা তাই গুরুত্বের সঙ্গেই বিবেচ্য হতে পারে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯); শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩); ফররুখ আহমদ (১৯১৮-৭৪); সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-); (সরদার) জয়েন উদ্দীন (১৯২৩ - ৮ -); হোসনে আরা (১৯১৬ -); দৌলতুননেছা খাতুন (১৯২২ -) প্রমুখ বিভাগ-পূর্ববর্তীকালের লেখকেরা 'অগত্যায়' তরুণদের সঙ্গে লিখলেও পত্রিকাটি ছিল প্রধানত তরুণদের উচ্ছ্বাস-আনন্দ-উত্তেজনা, রাগ-ক্ষোভ-প্রেম- ভালবাসা মনের বিচিত্র অভিব্যক্তি প্রকাশের মাধ্যম। পঞ্চাশের দশকের প্রধান সাহিত্যিক-সংস্কৃতি—কর্মীবৃন্দের মধ্যে শামসুর রাহমান (১৯২৯); মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (১৯২৭); আতাউর রহমান (১৯২৫) ফয়েজ আহমদ (১৯২৫); আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২); সাইয়িদ আতীকুল্লাহ (১৯৩৩); বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর ; আবদুল গাফফার চৌধুরী (১৯৩১); নেয়ামাল বাসির (১৯৩৫); মাহবুব জামাল জাহেদী; সিরাজুল ইসলাম (আজিজ মিছির); আনিস চৌধুরী (১৯২৯-৮৯); ফজলে লোহানী (১৯২৫-৮৫); হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-৮৩) প্রমুখ অগত্যার ঘনিষ্ঠ শুভানুধ্যায়ী লেখক সম্প্রদায়। কবিতা, গল্প, উপন্যাস তাঁরা অনেক লিখেছেন, যা লিখেছেন তা সাহিত্য-শিল্প হিসেবে উত্তীর্ণ হয়নি সবগুলো— কিন্তু এজাতীয় রচনা মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকায় আগে প্রকাশিত হয়নি। বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ এবং সমকালীন জীবন চেতনার প্রতিফলক (সঙ্গে সঙ্গে এতদ্দেশীয় তরুণ লেখকদের সমকালীন জীবন চেতনার প্রতিফলন।) এতদ্দেশীয় লেখকদের

Dhaka University Institutional Repository

এই রচনাভাণ্ডার বাংলা সাহিত্যের গতি-পরিবর্তনে যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি সংযোজন ঘটিয়েছে এক নতুন ভাণ্ডারেরও।

মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকায় মানবতাবাদী বালজ্বাক, ফ্রান্স, শ', গ্রিনিন, হেমিংওয়ে, রবীন্দ্রনাথ—গোর্কী প্রমুখের রচনা এবং, বামপন্থী সাহিত্যিক, মার্কসীয় মতাদর্শে প্রভাবিত বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙলাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক অগ্রগতিতে সহায়ক প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা তরতাজা সাহিত্য ছেপে পূর্ব বাঙলার জনগণের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য অগত্যার প্রয়াস প্রশংসনীয়। একুশে ফেব্রুয়ারীর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর অগত্যা বিরোধে, বিষাদে, বিক্ষোভে স্পর্ধিত হয়েছিল। 'একুশের সংকলন'-এ ফজলে লোহানীর একুশ-সংক্রান্ত মুদ্রিত কবিতার সূতিকাগার অগত্যা। ১৯৫১ (১৩৫৮) তে অগত্যার 'প্রথম অসাধারণ সংখ্যা' প্রকাশিত হয়। ২০০ পৃষ্ঠার এই সংকলন আজকের প্রথম শ্রেণীর 'ঈদসংখ্যা'র মত — গল্পে -উপন্যাসে-কবিতা-রম্যরচনায় পড়বার উপযোগী এক-গুচ্ছ সাহিত্যের সমাহার। মধ্যবিত্ত, নব্য-নাগরিক জীবনের এবং বুর্জোয়া মানবতাবাদী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে লেখাগুলোতে। কিন্তু বাঙলাদেশের সাহিত্যের প্রধান ধারাতো ওটাই। এই ধারার বিকাশেও অগত্যা সহযাত্রীর ভূমিকা পালন করেছে। এই সংখ্যায় উপন্যাস লিখেছিলেন — আনিস চৌধুরী (প্রশ্নজাগে); মুসা মনসুর (আবর্ত); আবদুল্লাহ্ জয়নুল আবেদীন ('অভিসারিকা'); এখনও এগুলো অগ্রন্থিত। এতে তখনকার সমাজচিত্র ও রাষ্ট্রীয়-ভাবনার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে, আছে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম 'উপন্যাস' এবং আলাউদ্দীন আল আজাদ, 'এক হাজার এক রাত্রি' শিরোনামে গল্প লেখেন। ম্যাক্সিম গোর্কীর ৯ই জানুয়ারী (৭ইনএটা ৎঅনতঅর্া) শীর্ষক গল্প অনুবাদ করেন রওশন জাহান বেগম। রোবহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর এবং সমরেন্দ্র দত্ত-র কবিতার শিরোনাম যথাক্রমে 'যোদ্ধার গান'; এবং 'কিষাণ কন্যার জন্য'। এইসব নামের ধরণ বা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। গোলাম মোস্তফাকে ব্যঙ্গ করে লেখা কাজী নজরুলের (ছদ্মনাম হলাম মস্ত বাহ্, ইয়ে , ইটি) — 'গর্ভবান' শীর্ষক কবিতাও এই সংখ্যায় ছাপা হয়। উল্লেখ্য, নজরুল-রবীন্দ্র-গোর্কী-একুশে ফেব্রুয়ারীর প্রতি আনুগত্য ও আকর্ষণ আর গোলাম মোস্তফা, আকরাম খাঁ, আশরাফ সিদ্দিকী, আলী আহসান (প্রথম সংখ্যায় তাঁর লেখা ছাপালেও) প্রমুখ পাকিস্তানবাদী সাহিত্যকদের প্রতি ঘৃণা ও নিসঙ্কোচ আক্রমণ (হামলা)-প্রচেষ্টা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

অগত্যার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রথম লেখা ছিল নজরুল বিষয়ক।কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন ১১ই জ্যৈষ্ঠ বা ২৫ শে মে কে 'জাতির জন্য চরম লজ্জার দিন' নামে আখ্যায়িত করে লেখা হয়: "হে নজরুল, তোমার জন্মদিন ঘিরে আজ যে আন্দাজ (আনন্দ?) কলকোলাহল আর আলোড়ন জাগছে দেশময় – তাতে 'তুমি আছ কি নেই' সেই প্রশ্নই বারবার লাঞ্ছনার মতো উচ্চকিত হচ্ছে ... কতদিন আর বাঁচবে তুমি? দেখছো না তোমার জীবন আজ আমাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। ব্যাপক আয়োজন আর সমারোহ সব-কিছুর মধ্যেই রয়েছে তোমার অস্তিত্বের প্রতি একটা নিরঙ্কুশ ব্যঙ্গ। তুমি বেঁচে আছ তবু তোমাকে ছাড়াই আজ তোমার জন্মতিথি উদযাপন (করি)। অন্ধকার কক্ষে তুমি পঙ্গু-জীবনের শেষ দিন গুণছো, হয়ত তুমিও জাননা আজ তোমার জন্মদিন, ... কিন্তু বাইরে দেখ আমরা কি ঘটা করে তোমার জন্মদিন পালন করছি। তুমি আমাদের প্রিয় কবি, তাই তোমাকে ছাড়াই কত আনন্দ, উচ্ছলতা আর কত অনুপ্রেরণা। ... কত মাতামাতি করছি আজ তোমার সাহিত্য, দর্শন, কাব্য নিয়ে সভাসমিতিতে। যারা তোমার লেখা এক পাতাও পড়েনি এমন কত নেতা আজ অভিনেতার বাকচাতুর্য্যে সভায় দাঁড়িয়ে তোমার দর্শন আর কাব্যের বুলি কপচাচ্ছে; চেয়ে দেখ মঞ্চের পেছনে আরো কত জন দাঁড়িয়ে আছে তোমার জীবন তত্ত্বের উপর আলোচনা করার জন্যে। হাজার হোক আমরা প্রতিভার দাম দিতে জানি। তুমি এবার তাদের সুযোগ দাও। কি হবে আর বেঁচে।

হে আমাদের অমর কবি, জানি তুমি বিদ্রোহী, জানি তুমি সৈনিক, জানি তুমি অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ রোধ করার জন্যে উদাত্ত কণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলে। কিন্তু আজ আর কেন? তুমিতো ভালো করেই চেন এ জাতিকে ... জানোই ত আমরা ছেঁড়া জুতোর দাম দিই না। তোমার মৃত্যু হোক, আর এক মাইকেলের জন্ম দাও তুমি। নেতারা পাক সুযোগ তোমার উপর কিছু বলবার — করবার যখন কিছু তাদের নেই-ই। আর তোমার বেঁচেথেকে লাভ কি? কৃতঘ্নতা ও নির্লজ্জতার শেষ তুমি কখনই দেখতে পাবেনা?"

গোলাম মোস্তফা নজরুল ইসলামের রচনাবলীর মধ্যে পাকিস্তানের ধ্যান-ধারনা, তমদ্দুন-তাহজিব-বিরোধী কাব্যাংশ, উপমা, অলঙ্কার সংস্কার (সংশোধন, পরিমার্জন) করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁদের 'নওবাহার' ছিল এর মিডিয়া। নজরুলকে জাতীয় কবির মর্যাদা দেয়ার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী; তাই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন অতি-উৎসাহে নজরুলের হিন্দুয়ানীর, অনৈসলামিক কাব্য-কীর্তির। তাঁর শখ ছিল পাকিস্তানের জাতীয় কবি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের। এইসব হাস্যকর প্রয়াসের নির্লজ্জ সমালোচনা করতো অগত্যা, আর গোলাম মোস্তফাকে ব্যঙ্গ করা হত 'গোলমাল' বা- 'গোলাম কবি' বলে। মৌলানা আকরাম খাঁ-কে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা হতো 'হুজুরে আকরাম' বলে। পাকিস্তানী মিনিষ্টার দেরকেও ঐরূপ ব্যঙ্গ করা হতো। বই-পুস্তক প্রসঙ্গে সমালোচনার ষ্টাইল এর একটি নমুনা পাওয়া যায় – আশ্বিন-কার্তিক ১৩৫৬ সংখ্যার 'আদ্যোপান্ত' বিভাগে। গোলাম মোস্তফার (১৮৯৪-১৯৬৪) 'বুলবুলিস্তান' কাব্য-সংকলনের সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয় ঃ "সম্প্রতি গোলাম কবির 'বুলবুলিস্তান' বাজারে দেখা দিয়েছে। 'বুলবুলিস্তান' গোলাম কবির সঞ্চয়িতা, তাঁর পঁয়ত্রিশ বছরের কুকীর্তির একটি লোক হাসানো সংকলন। 'বুলবুলিস্তানে' ১৯১৫ ... থেকে ... হালে লেখা কবিতার দর্শন পাওয়া যায় এবং এ সঙ্গে এই সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের প্রতিটী স্তরে স্তরে বিকলাঙ্গ যৌনক্ষিপ্ত মানসিক অপ্রকৃতিস্থ মনোভাবের নিদর্শন দেখতে পাই। এক রকম লোলুপ কামনা, উদগ্র বাসনায় ছিঁড়ে খাওয়া-ভাব প্রতিটী ছত্রে ছত্রে ছত্রাকার হয়ে আছে গোলাম সাহেবের 'বুলবুলিস্তানে'।"

'অগত্যা' 'ভদ্রলোকের পত্রিকা ছিলনা'— একথা কেন বলা হতো বা হয় তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য 'আদ্যোপান্ত' বিভাগ থেকে কবি গোলাম মোস্তফা সম্পর্কে আলোচনার কিছু নমুনা দেয়া যাকঃ "ইদানিং আবার বাঙলা সাহিত্যে এক ডাগর ডোগর বাস্ত ঘুঘুর আনাগোনা শুরু হয়েছে। অনেক বনবাদাড় ঝেঁটিয়ে অনেক আবর্জনা কুড়িয়ে ইনি আবার নোতুন করে পুনর্জন্মলাভের চেষ্টায় যে আজকাল একটু তৎপর হয়ে উঠেছেন, এর সাম্প্রতিক কার্যকলাপে তা স্পষ্ট ধরা দিয়েছে ...! এই ঘোমটা ঢাকা হ্যাংলা প্রতিভা, যৌনক্ষিপ্ত জনাব গোলাম মোস্তফাকে পাঠকদের কাছে introduce করাতে

Dhaka University Institutional Repository

চাই............ এর উৎপাত বাঙলা সাহিত্যে আজকে নোতনু করে নয়....” ইত্যাদি। (পৃ-৬)

মৌলানা আকরম খাঁর সমালোচনার একটা উদাহরণ প্রথমবর্ষ চতুর্থ -পঞ্চম সংখ্যা (আশ্বিন-কার্তিক ১৩৫৬) থেকে নেয়া যাচ্ছে ঃ “আমাদের হুজুরে আকরাম দুসরা মুসলীম লীগের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে বক্তৃতাদানকালে উদাহরণ স্বরূপ জানাচ্ছেন, যে এমামের অনুপযুক্ততার জন্য মসজেদ পরিত্যাগ করে নোতুন মসজেদ স্থাপন করা অযৌক্তিক এবং শরা মতে নাজায়েজ।” (পৃ- ১৪)

‘চিঠিপত্র’ বিভাগে নিজেদের প্রস্তুতকৃত প্রশ্নের মধ্য দিয়ে অগত্যার সাহিত্য শিল্প-ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। মাঝে মাঝে এই রকম প্রশ্নে সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্য-শিল্পের সমালোচনা করা হতো ঃ- “বাংলা সাহিত্যের এক যুগ ছিল যখন গল্প উপন্যাস কবিতার বই বা মাসিক পত্রিকার নাম নিয়ে হৈচৈ হত । কিন্তু আজকের দিনের বিদগ্ধ পাঠক নামের চাইতে বিষয়বস্তুর বাহার এবং রংএর চাইতে আভ্যন্তরীণ সৌগন্ধের জন্যই লালায়িত বেশী। বর্তমান সময়ে পূর্ব বাংলায় শিল্প সংস্কৃতিকে গতিহীন করে তোলার যে হীন চক্রান্ত এবং সর্বোপরি পাঠক ঠকাবার যে জঘন্য মনোবৃত্তি কাজ করে চলেছে তার মূলোৎপাটন করার কাজে অগত্যা একনিষ্ঠ হোক। তাহলেই অগত্যার স্বীকৃতি নিশ্চিত। অগত্যা জিন্দাবাদ।”

অগত্যার জবাব ঃ “আমাদের সাধনা সত্যের সাধনা। আজ পূর্ববাংলার বিষাক্ত নাগিনীর ছোবল বাঁচিয়ে চলতে হচ্ছে অগত্যাকে। পূর্ববাংলার মূর্খতা এবং অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে বীরশক্তি দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে যে কটা ব্যবসায়ী কাগজ হস্তমৈথুন আর করাচীর লাট-বেলাট আর ঢাকার পেয়াদা বরকন্দাজদের ছবির বাহার নিয়ে হৈ চৈ বাঁধিয়ে বেড়াচ্ছে তাদের আয়ু বেশী দিন নেই ..... রবীন্দ্র -নজরুল-চণ্ডীদাস-আলাওলএর প্রাণের ভাষা, কৃষ্টি এবং ঐতিহ্য নিয়ে নোতুন পথের যাত্রী অগত্যা। .... নজরুলের সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটেনি। কবিগুরু ডাক দিয়ে গেছেন অসমাপ্ত কাজের সম্পূর্ণতার জন্য।”

চিঠিপত্র বিভাগের আর এক প্রশ্ন (বলা বাহুল্য যে এগুলো নিজেদেরই প্রস্তুত) ঃ “নাম শুনে মনে হয় পয়সার অভাবে ‘অগত্যা’ নাম রেখেছেন; ভবিষ্যতে পয়সা হলেও কি অগত্যার নাম ‘অগত্যা’ই থাকবে?”এর জবাবে পত্রিকার কর্মীদের পরিচয় দেয়া হয়েছে ঃ “স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই পয়সার অভাব আমাদের যথেষ্ট রয়েছে। অগত্যা বেরোবার আগে ফজলে লোহানী, আবু সঈদ নাসির, তা আ খাঁ এঁরা সবাই জর্জেট পরে ঘুরে বেড়াত; আর এখন লোহানীর প্যান্টে তালি উঠেছে। নাসিরের জুতোয় ফাটল ধরেছে। তা আ খাঁ লুকিয়ে লুকিয়ে পয়সার অভাবে বিড়ী খায়। প্রেসের মালিক দু বেলা টাকার জন্য ধন্না দেয়, বিজ্ঞাপনদাতারা পয়সা মারার জিকির তোলে, সিআইডি পেছনে পেছনে রাষ্ট্র-দ্রোহীতার গন্ধ শুঁকে বেড়ায়। কাজেই নাম শুনে তোমার যাই মনে হোক - অগত্যার অবস্থা আশান্বীত।”

‘কদর্য ব্যবহার’ সম্পর্কিত এক প্রশ্ন ‘ইচ্ছে করলেই আর একটু ভদ্রতার সঙ্গে উত্তর দিতে পারেন”— এর জবাবে বলা হয় ঃ “ভদ্রতা ? ছি ঃ ওসব ফরমালিটি কেন আমরা করতে যাব? ভাল ভাল কথা, মিষ্টিমিহি সখিসখিভাব দেখাবেন তারা যারা আগামীতে ব্যালট বাক্সের আশায় দিন গুনছেন। যেদিন আমি আপনার কাছে ভোট নিতে গিয়ে হাজারো প্রতিশ্রুতি দেব বড় একজন দেশ সেবক সাজব, মানবতার নামে কেঁদে ফেলবো, ধর্ম্মের নামে শহীদ হব, বিশ্ব প্রেমিকের পার্ট প্লে করবো সেদিনই আজকের এই কদর্য্য মানসিকতা ছেড়ে আরেকটু ভদ্র হব বিনয়ী সেজে গলবস্ত্র হয়ে উপযাচক বলে আপনার পা জাপটে ধরে বলবো - জোড়া পায়ে নাথি মারো বাবা, জোড়া পায়ে নাথি মারো, তার আগে আর নয়।'

সাহিত্যের মাধ্যমে সামাজিক চাহিদা নিবৃত্তির প্রশ্নে অগত্যার পরোক্ষ বক্তব্য ঃ প্রশ্ন— “সাহিত্যকে যেভাবে আপনারা ঘোষণা করে রাজনীতি থেকে বাদ দিয়েছেন তাতে আমার কিছু বলবার আছে। আরবী হরফে বাংলা ভাষার চর্চা সম্বন্ধে আপনার মতামতটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধাকারে দেখতে পেলে খুসী হব।” জবাবে বলা হয়, “ আমাদের জীবনের সাথে যে রাজনীতি আজ জড়িয়ে রয়েছে সেইটুকুই আমরা অগত্যা মারফত পরিবেশন করতে পারি। আরবী হরফে বাংলা চর্চা অযৌক্তিক, অবাস্তব, এবং অগণতান্ত্রিক।'

অগত্যা পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র নিউজপ্রিন্টে ছাপা পত্রিকা। এতে বলা হতো যে ‘সবচেয়ে কম ছাপা হয়, কিন্তু সবচেয়ে বেশী লোকে পড়ে।” এই পড়ার কারণ উপরের নমুনা থেকে বোঝা যায়। ‘অপ্রাসঙ্গিক’ বিভাগের শিরোভাগে বন্ধনীমধ্যে লেখা থাকতো — “শুরু হইতে আখের তক তামদ্দুনিক জবানে লিখিত”। এতে ঢাকার বিচিত্র জীবন ও সমাজব্যবস্থা পর্যালোচিত হয়েছে। ফলে এগুলোর মধ্যে তৎকালের সমাজচিত্র পাওয়া যায়। পাকিস্তান হবার পর ঢাকা শহর কর্পোরেশনে রূপ লাভ করে, কিন্তু ঢাকার রাজধানীর অবস্থা ছিল তখন ক্যামন? ‘রেডিও পাকিস্তানের’ সমালোচনায় তামদ্দুনিক অনুষ্ঠানের সমালোচনা করা হতো। অগত্যায় দুটি চরণ এর মধ্যেই রেডিওর সমালোচনা সম্পূর্ন করা যায়: ‘আপনি যদি কাউকে রাগাতে চান তবে রেডিও তে ঢাকা কেন্দ্রের প্রোগাম খুলে ধরুন।’ কেন? “রেডিও পাকিস্তানের পরিবেশনায় আমাদের পাকিস্তানকে একেবারে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। হালে যেসব অকাল-প্রস্তুত আর্টিষ্ট হালে পানি না পেয়ে অযথা শ্রেষ্ঠত্বের দাবীতে খাবি খাচ্ছিল তাদের খেদিয়ে নিয়ে এসে বোধ করি ‘আমাদের পাকিস্তান’ নামক খোঁয়াড়ে ঢোকানো হয়েছে। কারণ এদের প্রতিদিনকার অনুষ্ঠানে, যে-কণ্ঠনিনাদ আমরা শুনতে বাধ্য হই তাতে করে সেই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। বেতারে অভিনয় উপযোগী কণ্ঠের এমন অপূর্ব সমন্বয় আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।” (১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ-৩৪)। রেডিওতে উর্দু-অনুষ্ঠানের বাহুল্যকে মাহেনও-এর উর্দু বহুল পাক-জবান-এর মতো কঠোর সমালোচনা করা হতো।

‘সিনেমা’ বিভাগে শুধু সিনেমার শিল্পমান নিয়ে আলোচনাই হতোনা। সিনেমার নামে ভণ্ডামী করার জন্য সংশ্লিষ্টদের উদ্দেশ্যে খোলাচিঠি লিখে কুকীর্তির মুখোশ উন্মোচনও করা হত। “সকালে বিকেলে তোমরা ইন্টারভিউ করতে বাঙলার সেরা সুন্দরীদের। তোমাদের সকাল আর বিকেল কাটত বেশ আরামে। তোমাদের সে দিনগুলো হয়ত ফিরে পাবার জন্য তোমরা আজ উম্মুখ ... কিন্তু সে সঙ্গে Swindler এর দল, এও মনে রেখ যে বাঙলার যে সব ছেলে-মেয়ের জীবন নিয়ে তোমরা ছিনিমিনি খেলেছ, তারা তোমাদের পালাতে দেবেনা, তাদের হাতে তোমাদের কপালের লিখন

Dhaka University Institutional Repository

নির্ভর করছে।" (১/১, পৃ-৪৩) অবশ্য নিয়মিত বিভাগগুলোতেই এরকম ব্যাঙ্গাধিক্য ছিল।

গল্প-উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধের (এবং অনুবাদের) ভাষা ছিল সাহিত্য-শিল্প গুণান্বিত। তবে সৈয়দ আলী আহসানের প্রবন্ধ 'পূর্ব-পাকিস্তানের শিল্পক্ষেত্রে নির্দেশ' এর (প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৫৬) বক্তব্যটি পত্রিকার চরিত্র-বিরোধী হয়ে পড়েছিল। মাহেনও (তৃতীয় বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা আগস্ট ১৯৫১) পত্রিকায় তিনি পাকিস্তানের সংস্কৃতির পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই বক্তব্য খুব উদ্ধৃত হয়। কিন্তু ১৯৪৯ সনেই তিনি সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য-ভাস্কর্য সমস্ত ক্ষেত্রে ইসলামী-ঐতিহ্য নবরূপায়নের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, সে-তথ্যটি উদ্ধৃত হয়না মনে হয় অগত্যার ভূমিকার কারণেই। এতে যে তিনি হিন্দু-সভ্যতা-সংস্কৃতি বর্জনের কথা বলেছিলেন তা দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। হয়তো রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ স্পষ্ট করে নেই বলেই — এই প্রবন্ধ দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। অথবা রবীন্দ্রনাথকে বর্জনের প্রস্তাব সরকারী পত্রিকায় স্পষ্ট করে উচ্চারিত হয়েছিল বলেই মাহেনও-এর লেখাটি বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। এমনও হতে পারে পাকিস্তানী জোস্ ১৯৪৯ সনেও তীব্র ছিল এবং বায়ান্নোর ঘটনা ঘটতে দেরী ছিল। বাঙালির অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধের চেতনা তখনো জাগ্রত হয়নি বলেই তাঁর এই রচনাটির কথা পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তার ইতিহাসে যোগ হয়না। সৈয়দ আলী আহসান বলেন ঃ "নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন দিকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক এবং হওয়া উচিত। এতদিন যে জীবন-প্রথা আমরা মেনে আসছিলাম, যে নির্ধারিত পথে চলছিলাম এখন নতুন পটভূমিতে তা নতুনভাবে যাচাই করে নিতে হবে।যে উত্তরাধিকার শুধু এক সময়ের জন্য নয়, চিরকালের জন্য আমাদের হতে পারতো সে উত্তরাধিকার আমাদের সৃজন করতে হবে। জীবন-ক্ষেত্রের পরিচিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন আবশ্যক হয়ে পড়ছে — বিশেষ করে মানবজীবনের বিভিন্ন আদর্শের ধারার। সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, সঙ্গীত সমস্ত কিছুই নতুনভাবে আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং নতুন পরিপ্রেক্ষিতে তাকে নতুন আদর্শে পরিপুষ্ট করতে হবে। এতদিন আমরা পরাধীন ছিলাম এবং সে কারণে স্বভাবতই আমাদের অন্তর্নিহিত সমস্ত শিল্প-প্রতিভার স্ফূরণ সম্ভবপর হয়নি। আমাদের গতির পথে বাধা এসেছে, আমরা সহজভাবে অগ্রসর হতে পারিনি।

সাহিত্য ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনটি বড় বেশী স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। সাহিত্যিকরাই জাতির জীবনের মান নির্ণয় করে ও নতুন পথের নির্দেশ দেয়। ... রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে সাহিত্য ক্ষেত্রে যে সমস্যা ছিলো, নতুন পরিপ্রেক্ষিতে তার সমাধান করতে হবে। সাহিত্য ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রের পরিবর্তনের কথা এসে পড়ে। ভারতে মুসলমানরা এক সময় শিল্প ও স্থাপত্যে যুগান্তর এনেছিলো। সে-যুগান্তর সম্ভবপর হয়েছিল এ কারণে যে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাদের ধারণা ও নির্দেশ ছিলো স্পষ্ট। স্বাধীন মুক্ত আবহাওয়ায় তারা আপনাদেরে বিকাশ (আপনাদেরকে বিকশিত?) করেছিল নানাভাবে। ... পূর্ব পাকিস্তানের বিস্তৃত সীমারেখার মধ্যে শিল্পের প্রসার ঘটেছে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে। মৃৎ-শিল্পের হিন্দুয়ানী বৈশিষ্ট্য বর্জন করে মুসলমানী বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে হবে । ... সে যুগকে সেই অবস্থায় ফিরিয়ে আনা কারো পক্ষেই সম্ভবপর নয় এবং কেউ তা কামনাও করেনা তবে অতীতের গৌরবের কাহিনী আমাদের জন্য নতুন নির্দেশ বহন করবেই। বিদেশী স্থাপত্যের সেই সহজতা আমরা গ্রহণ করে তার মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন যদি আনতে পারি, তবে নতুন কিছু করা হবে।.... আমাদের বিশিষ্টতা আমাদের প্রকাশ করতেই হবে, কেননা সেই বিশিষ্টতা প্রকাশের মধ্যেই আমাদের নিজস্ব রূপ ফুটে উঠবে। প্রাচীনকে মুসলমানেরা কখনও অস্বীকার করেনি কিন্তু তার সংস্কার করেছে ও নতুন রূপে তাকে পরিদৃশ্যমান ও পরিবর্ধমান করেছে। ..... মোঘল উত্তরাধিকার আমাদের রয়েছে, কিছুদিন আগেকার ব্রিটিশ আমলের স্থপতিগত চেতনা আমাদের রয়েছে এবং বর্তমানে নতুনভাবে নতুন পথ অনুসরণের স্পৃহা আমাদের রয়েছে। সমস্ত কিছু মিলে আমাদের জন্য একটা নতুন নির্দেশ সৃজিত হবেই। এতদিন এটা সম্ভবপর হয়নি কেননা নিজের করে আমরা কিছু ভাবতে পারিনি। এখন নতুন পৃথিবীতে আমাদের জন্য যে নতুন আলো এসেছে সেই আলোতেই আমাদের সবকিছু প্রত্যক্ষ করতে হবে। তখন দেখতে পাবো যে শুধুমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রে নয় শিল্প ক্ষেত্রে এবং জীবনের অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীন সত্তা নতুনভাবে জাজ্বল্যমান হয়েছে।" (পৃ ১০-১২)

যে দৃষ্টিভঙ্গিতে অগত্যা সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সমালোচনা করেছে — তার দলিল হয়ে আছে অগত্যার পাতা। কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আশরাফ সিদ্দীকী, মাহেনও পত্রিকার সম্পাদক মীজানুর রহমান, গোলাম মোস্তফা, আকরম খাঁ, কবি মঈনউদ্দীন, বেদুঈন শমসের, আকবর হোসেন প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক সম্পর্কে (শেষ পর্যন্ত অনেকের স্বার্থের পক্ষে যায়, আবার কারো বা বিপক্ষে যায়) কৌতুককর বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা অগত্যা বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রকাশ করেছে। অনেক মতামত তাঁদের অভ্রান্ত কিন্তু ভ্রান্ত, বাচালতাও প্রকাশ পেয়েছে কোথাও কোথাও। আবুল মনসুর আহমদ প্রণীত 'আয়না' (২য় সং)র সমালোচনা ছাপা হয়েছে (রেডিও পাকিস্তান ঢাকার সৌজন্যে। এটির রচয়িতা অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ)। সমালোচকের মতামত পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং ভারসাম্য রক্ষাকারী, অনেকার্থে যথাযথ ছিল, কিন্তু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়, তা কি সর্বাংশে অভ্রান্ত, যথার্থ ছিল?— "উপন্যাস হিসেবে অনবদ্য এবং সার্থক হতে পারত 'লাল সালু'। কিন্তু তা হয়নি। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সতেজ নয় : বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক দর্শনের ওপর ভিত্তি-করেও তিনি 'লাল সালু' লেখেননি। উপন্যাসের প্রাণবস্তু হচ্ছে অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার প্রসারতা এবং ব্যাপকতার ওপরেই নির্ভর করে স্বার্থক উপন্যাস সৃষ্টির। লেখকের অভিজ্ঞতা আছে যথেষ্ট কিন্তু তা খুব বলিষ্ঠ নয় বলে 'লাল সালু' দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাস হতে পারেনি। .... ওয়ালীউল্লাহ সাহেব কসরত করে অনেক ঘটনা প্রবাহ বের করেছেন ময়মনসিংহ জেলার সাধারণ মুসলমানের জীবন যাত্রা থেকে। ধর্মের নামে মজিদ যে ধর্ম্মতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল তা গ্রহণ করল গ্রামের প্রতিটি মানুষ যারা আজ ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের চাইতে অনেক এগিয়ে গেছে সংগ্রামী আহবানে। উপন্যাস এখানেই হয়েছে ব্যর্থ। সচেতনভাবে হোক বা অচেতনভাবে হোক লেখক গতযুগের ফটোগ্রাফিক-সাহিত্য রচনা করেছেন। এবং তারাশংকর, অচিন্ত্য, বনফুলের দলে ভীড় জমিয়ে আগামী দিনের সবল কৃষককে পঙ্গু করে দেবার কাজে হাত দিয়েছেন। ধর্ম্মতন্ত্রের কাছে সত্যিই কী আজ ময়মনসিংহ জেলার তাহের কাদের ছমিরুদ্দীনরা আত্মসমর্পণ করেছে? শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর বাবুর মাষ্টারপিস্ হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' আজ ব্যর্থ উপন্যাসে পরিণত। ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের 'লালসালু'ও ব্যর্থতার গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে দুদিন বাদে।' সমালোচক তাসিকুল আলম খাঁর আরও মন্তব্য : "লেখকের চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা নেই বললেই চলে। ১৪৮ পৃষ্ঠার মধ্যে একটি চরিত্রও

Dhaka University Institutional Repository

মেলেনা যার ওপর দু কলম লেখা যায়।" (১/৩ সংখ্যা, পৃ ২২) এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন অদূরদর্শী সমালোচনা পত্রিকার দুর্বলতার দিক। প্যাশাপাশি আরবী হরফে বাংলা লেখার বিরোধীতা এবং মীজানুর রহমান সাহেবের (মাহেনও-এর) তামদ্দুনিক জবানের সমালোনা অব্যর্থ হয়েছে। 'চিন্তার স্বাধীনতা'য় বিশ্বাসী ছিল বলেই অগত্যা বহু বিষয়ে স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করেছে, তাঁরা প্রত্যাশা করতেন 'কৃষ্টি আর প্রগতির ব্যাপক প্রসার' তাই সমালোচনার সবগুলো অব্যর্থ না-হলেও সফল হয়েছে অনেকগুলো। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ যে পুঁজিপতিদের সৃষ্ট তাও কবিতা, প্রবন্ধে ব্যক্ত করা হয়েছে। আতাউর রহমান-এর কবিতা 'হিন্দু-মুসলমান'এর কটি লাইন : "বুঝেছি তোমরা স্বার্থের তরে সকলি করিতে পার— দাঙ্গা যুদ্ধ আকালে সৃজিয়া ভূখা জনগণে মার, বুঝেছি আজিকে তোমাদের যত ভণ্ডামি, চালবাজি তোমার জীবনে সত্য কেবল মুনাফার কার সাজি।। ভণ্ডামী আর চালাকি শঠতা ধরা পড়িয়াছে আজ, তোমার মাথায় ভেঙ্গে পড়ে তাই জনতার ক্রোধ-বাজ।" (১/১০-১১ চৈত্র ৫৬-বৈশাখ১৩৫৭ যুগ্মসংখ্যা পৃ-৩৭) ।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চিন্তায়, সামাজিক-ভাবনার গভীর প্রতিফলন অগত্যার আলোচনা, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও গল্পগুলোর প্রধান উপজীব্য। ১৯৪৩ সনের (১৩৫০) দুর্ভিক্ষ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫); সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬); নির্বাচন (১৯৪৬); দেশ বিভাগ (১৯৪৭) এবং বিভাগোত্তর কৃষ্টি-গত ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী হামলা, আরবী হরফে বাংলা লিখন প্রচেষ্টা (১৯৪৯), রাষ্ট্রভাষারূপে উর্দুকে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ (১৯৪৮, ৫২), লবণ সংকট (১৯৫১); সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৫০) উদ্বাস্তু সমস্যা, রেডিও-সংবাদপত্রে বিশুদ্ধ বাংলার পরিবর্তে উর্দু প্রধান পাক-বাংলার প্রচলন, এমনকি— ঢাকার বেতারেও অধিকাংশ সময় উর্দু অনুষ্ঠানের বাহুল্য—সবকিছু অকপটে অগত্যায় সমালোচিত হয়েছে।বাঙালির কৃষ্টি, সভ্যতা, ভাষা ও জাতির নিজস্বতা রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা তাঁরা করেছেন। উদ্যোক্তারা বয়সে তরুণ ছিলেন, সীমান্তর সম্পাদক-প্রমুখও তরুণ। অধিকাংশ মুসলিম লীগার, পাকিস্তানবাদী, ভণ্ড ইসলামপন্থীদের মধ্যে এঁদের প্রচেষ্টাকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করার জন্য যে ব্যঙ্গ-কৌতুকের সাহায্য নেয়া হয়েছিল, তার অজুহাতে একে 'অভদ্র' বলে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলেও এই 'অভদ্রতা' করার সৎ সাহসটুকুই বা কজন তখন দেখাতে স্বীকৃত ছিলেন। অভদ্রতা, বেয়াদবির একটা দায় আছে, সেই দায় বহনের কষ্ট কে নিতে রাজি ছিলেন? হিসেবী, কেতাদুরস্ত ভদ্র-লোকেরা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন, আর কোন দিকে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা —সেই অংক কষছিলেন যখন, তখন কতিপয় তরুণ যে উৎসাহ নিয়ে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজের বিভিন্ন সমস্যাকে যাচাই করে দেখতে চেয়েছিলেন এবং তখনকার পরিস্থিতিতে লেখকদের অতৃপ্ত শিল্প-সৃষ্টির এবং গ্রহীতার শিল্পরসপিপাসার আকাংক্ষা পূরণের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে অগত্যা যুগের দাবি পূরণ করেছিল, কালের চাহিদা মেটাতে প্রয়াসী হয়েছিল— এই অভিপ্রায়ের মূল্যই তো অনেকখানি। কতোটা করেছিল সেটার পরিমাপ না করলেও তাই ক্ষতি নেই।মার্কসবাদের ডেডিকেটেড কর্মী, প্রখ্যাত কবি ও গবেষক, অধ্যাপক আতাউর রহমান লিখেছেন ঃ

> "অগত্যাকে একটি কারণে স্মরণ করতে হবে। মুসলিম জাতীয়তাবাদ এর ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেশবিভাগের পর সেই জাতীয়তাবাদ আমাদের রাজনীতিতে সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাহজিব ও তমদ্দুন ছিল সেদিনের স্বাভাবিক ভাষা। সেই সময়ে আমরা অগত্যায় লিখতাম— বাঙালী মনোভাব নিয়ে ধর্ম-নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে। দ্বিতীয়, পূর্ব বাংলায় তখন যারা বামপন্থায় ভাবতো, লিখতো তাদের লেখা প্রকাশের সুযোগ তখন ছিলনা। অগত্যা এই সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। আজকে যারা বাংলাদেশে সাহিত্যে সংস্কৃতিতে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও উজ্জ্বল তাঁরা প্রায় সবাই অগত্যার মাধ্যমেও আত্মপ্রকাশ করেছেন। কবি শামসুর রাহমান; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম; হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দীন আল আজাদ; বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর- এঁদের প্রথম জীবনের অনেক লেখাই অগত্যায় প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের আত্মপ্রকাশের দুটো মাধ্যম ছিল— একটা অগত্যা — আর একটি সাহিত্য বৈঠক — যা প্রথমে বসতো মধুর রেষ্টুরেন্টে।" [২৯]

৫. মুক্তি (জুন ১৯৫০ -- সেপ্টেম্বর ১৯৫০)

বাঙলাদেশের সাময়িক-সাহিত্যের ইতিহাসে প্রায়-বিস্মৃত ও অনালোচিত একটি পত্রিকা—মুক্তি। মুক্তির সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন প্রখ্যাত কবি সাংবাদিক আবদুল গনি হাজারী (১৯২৫-৭৬)। তাঁর উচ্চ-সাহিত্যিকবোধ এবং সম্পাদনাকার্যে দক্ষতা ছিল। এসব গুণের সমন্বয়ে তরুণ বয়সে সম্পাদিত 'মুক্তি' লেখা ও লেখক নির্বাচনে এবং পত্রিকার মুদ্রণ-সৌকর্যে প্রথম শ্রেণীর একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকার তালিকায় সংযুক্ত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিল ; কিন্তু চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর কেনো হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলো— তা কেউ আর আজ বলতে পারবেন না, সে-ইতিহাস লেখাও হয়নি। মুক্তির যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন (হাজারীর সঙ্গে) চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের বিশিষ্ট লেখক মাহবুব জামাল জাহেদী। 'সম্পাদক-মণ্ডলী'র সদস্য ছিলেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা (১৯২০-৭১) ; অধ্যাপক হাবীবুর রহমান (১৯১৬-৬২) ; সরদার জয়েন উদ্দীন (১৯২৩-১৯৮ ......) দ্বিতীয় সংখ্যায় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য-তালিকা থেকে হাবীবুর রহমান এর নাম বাদ পড়ে। বেগম রোকাইয়া আনওয়ার অন্তর্ভুক্ত হন। প্রচ্ছদ আঁকেন শিল্পী কামরুল হাসান (১৯২১-৮৯)। মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন সরদার জয়েনউদ্দীন। পত্রিকার কর্মকর্তা, কর্তৃপক্ষ যেমন ছিলেন সেকালের সম্ভাবনাময় তরুণ সাহিত্যিক-শৈল্পিক-সাংবাদিক-ব্যক্তিত্ব, লেখকসূচীও দখল করেছিলেন দেশের সেরা মেধাবী শব্দ-সৈনিকেরা। একনজরে যদি লেখকদের নামগুলোর দিকে চোখ বুলানো যায় তাহলে দেখা যাবে, সেইসব সম্ভাবনাময় তরুণ, খ্যাত ও হবু-খ্যাত লেখকদের নির্বাচিত মান-সম্পন্ন-লেখাগুলো 'মুক্তি'তে ছাপা হয়েছিল। লেখাগুলো বক্তব্য ও মর্মগত-দিক দিয়ে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। এবং সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের কালের দাবির প্রেক্ষিতে অর্থপূর্ণ, মূল্যবান, সুনির্বাচিত ছিল সন্দেহ নেই। সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে মুক্তি হাতে নিলেই এর

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্ব মূল্য ও লক্ষ্য সহজেই যে-কারো উপলব্ধিতে স্পষ্ট ধরা পড়বে। যাঁরা সমকালে 'মুক্তি' দেখেছেন এবং পড়েছেন—তাঁরা সকলেই একটা উন্নতমানের পত্রিকা হিসেবে মুক্তির নাম উল্লেখ করে থাকেন। সমসাময়িক অপরাপর সাহিত্য পত্রিকাতেও 'মুক্তি' যে একটি প্রগতিশীল, উচ্চাভিলাষী, সুনির্দিষ্ট সামাজিক দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে প্রকাশিত পত্রিকাছিল—তা ব্যক্ত করা হয়েছে। 'দ্যুতি', 'তাহজিব' এবং 'সীমান্ত' পত্রিকায় 'মুক্তি'কে উচ্চমূল্য দিয়ে লেখা দীর্ঘ আলোচনা বা সমালোচনা ছাপা হয়েছিল।

মুক্তি তে আলাদাভাবে কোনো সম্পাদকীয় বিভাগ নেই—যাতে পত্রিকার 'যাত্রা' উপলক্ষে উদ্দেশ্য, আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তবে কেন, কী কারণে এই পত্রিকা প্রকাশ করা হয়েছিল— পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশক লেখক ও শিল্পী-শুভানুধ্যায়ীদের পরিচয়, শ্রেণীগত অবস্থান বা মতাদর্শের সন্ধান নিলেই পত্রিকার চরিত্র কিছুটা উপলব্ধি করা যায়। দ্বিতীয়ত, পত্রিকার লেখার বিষয় এবং বক্তব্যের 'পয়েন্ট অব ভিউ' বা দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করলেও তা বোঝা যায়। লক্ষ্য রাখতে হবে, বিভাগ-পূর্বকালের পাকিস্তান-আন্দোলন এর পক্ষে বা সঙ্গে যুক্ত লেখকেরা এই পত্রিকার লেখক-সূচী বেশি দখল করেন নি। তবে অগত্যার মতো মুক্তিরও প্রথম সংখ্যাতে পাকিস্তানবাদী, ইসলামী ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণকামী, রবীন্দ্র-বিরোধী লেখক ও চিন্তাবিদ সৈয়দ আলী আহসানের (১৯২২) 'নজরুল ইসলাম' শীর্ষক লেখা ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হিসেবে মুক্তিতে ছাপা হয়েছিল।[৩০] এই ব্যতিক্রমের কারণ কী—তা আর এখন বিশ্লেষণ করে লাভ নেই। তবে বিষয়গত বিবেচনায় এই রচনায় প্রগতি-বিরোধী কোনো সংকেত বা বক্তব্য নেই। কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য ও সাহিত্যের পরিচয়মূলক (পাদটীকায় বলা হয়েছিল : 'লেখকের প্রকাশিতব্য 'নজরুল ইসলাম' গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের অংশবিশেষ।') প্রবন্ধে পাকিস্তানী আদর্শ বেশি ব্যক্ত করার অবকাশ ছিলনা। কিন্তু নজরুল ইসলামের উক্ত-আলোচনায় কবির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাও প্রকাশ পায়নি। সমালোচকের ভাষায় আবশ্যকীয় পর্যাপ্ত অনুরাগ ও সহানুভূতির অভাব আছে বলেই মনে হয়। বরঞ্চ আছে পাণ্ডিত্যের অহমিকা—যাতে মনে হয় সমালোচক কবির থেকে বিরাট ও মহান কলাকার। কাব্য-রচনার পূর্বে তাঁর (সৈ. আ. আ) নিকট থেকে তালিম নিয়ে নিলে সাহিত্য-সাধনায় নজরুল ইসলাম উন্নতি করতে পারতেন।

আবদুল গনি হাজারী পাকিস্তান 'সাহিত্য সংসদ' (১৯৫২) এর একজন কর্মী ছিলেন এবং ১৯৫৪ তে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের' কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব (যুগ্ম-সম্পাদক) ছিলেন। তাঁর রচনায় চল্লিশের দশকের বামপন্থী লেখকদের ন্যায় ভাব-ভাবনা ও সামাজিক-চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সমাজ এর অবক্ষয় অধপতন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তাঁর সাহিত্যে এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি সমকালীন রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। 'আলোড়ন' নামে একটি পত্রিকা তিনি মুক্তির আগে সম্পাদনা করেছিলেন। তদানিন্তন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ছাত্র শাখার যে-অংশটি প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণায় আস্থাশীল ছিল তার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আদর্শবাদ দ্বারাও তিনি পরবর্তীকালে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাংলা একাডেমী, ঢাকা প্রকাশিত 'চরিতাভিধান' (১৯৮৫)-এ লেখা হয়েছে প্রথমে 'চন্দ্রবিন্দু' ও পরে 'মুক্তি' নামে যে দুটি পত্রিকা এ সময়ে আবদুল গনি হাজারী সাহেব বের করেছিলেন তাতে মানবতন্ত্রী আদর্শের স্পষ্ট ছাপ আছে। ইংরেজী সাপ্তাহিকী 'দি রিপাবলিক'ও তিনি প্রকাশ করেছিলেন এবং মানবতন্ত্রের প্রচার অব্যাহত রেখেছিলেন।[৩১] বলাবহুল্য আবদুল গণি হাজারী সংবাদপত্র ও সাহিত্য-জগতের (সাংবাদিক, সম্পাদক, প্রকাশক প্রভৃতি হিসেবে) 'তারকা' হিসেবে উচ্চ মর্যাদার আসন অলংকৃত করেছিলেন, রাষ্ট্রীয় সাহিত্য পুরস্কারও তিনি লাভ করেছিলেন। তাঁর চেতনায় জনগণ এবং দেশের প্রতি প্রেম ও সাহিত্যের প্রতি আন্তরিকতার পরিচয় আছে।

মাহবুব জামাল জাহেদী বিলেতে প্রবাস-জীবন যাপন শুরু করার পর দেশের মানুষের স্মৃতি থেকে অনেক দূরে চলে গেলেও, চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের পত্রপত্রিকায় তিনি বাঙলা ও বাঙালির স্বার্থের সপক্ষে অনেক লিখেছিলেন। তখনকার প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা দেখতে পাওয়া যায়। অনেক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তিনি সেকালে সাহিত্য ও শিক্ষিত-সমাজে গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থিত করেছিলেন। প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও লেখক আবদুল হক 'ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব' শীর্ষক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্টে পাকিস্তান সৃষ্টির আগেই কলকাতার বাঙালী মুসলমান সম্পাদিত সাহিত্য ও সংবাদ সাময়িক পত্রিকায় 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' প্রশ্নে যাঁরা আলোচনা করে ভাষা-আন্দোলনের উর্বর পরিপ্রেক্ষিত তৈরী করেছিলেন— তাঁদের মধ্যে মাহবুব জামাল জাহেদী অন্যতম। তিনি ২০শে জুলাই ১৯৪৭ সনের ইত্তেহাদ (কলকাতা) পত্রিকায় 'রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, সমগ্র পাকিস্তানের জন্য একমাত্র উর্দু এবং একমাত্র বাংলা রাষ্ট্রভাষার প্রস্তাব উভয়ই অযৌক্তিক হবে। উর্দু বাঙালীদের কাছে প্রায় বিদেশী ভাষা ; এবং এ ভাষা বিশেষভাবে মুসলমানী ভাষা তাও নয়। উর্দু, অধিকন্তু তুলনামূলকভাবে জটিল অথচ অনুন্নত ভাষা। পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য বাংলা রাষ্ট্রভাষা এবং পশ্চিমপাকিস্তনের জন্য উর্দু রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করা হলেই সুবিচার হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা কি হবে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে আসতে না পারলেও[৩২] বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর এই সচেতনতাও ছিল তখন অনেকটা বৈপ্লবিক এবং প্রগতিবাদী। দীর্ঘদিন যাবত তাঁর এই (প্রস্তাব) প্রবন্ধকে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলার সপক্ষে প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ' হিসেবে গণ্য হয়ে হয়েছে। যদিও তথ্যগতভাবে আবদুল হক-এর উপর্যুক্ত গ্রন্থ প্রকাশের পর সঠিক নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে, তথাপি তাঁর লেখার ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়। কিন্তু তাঁর (জনাব জাহেদী) সম্পর্কে ব্যাপকভাবে কোনও কিছু এখনও জানা যায় না।[৩৩]

সম্পাদক-মণ্ডলীর আর একজন অন্যতম সদস্য একাত্তরের শহীদ অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা (১৯২০-৭১) এম. এন. রায়ের র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজমে বিশ্বাসী ছিলেন। অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে (জগন্নাথ কলেজ ১৯৪৬-৪৯ ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজী বিভাগ ১৯৪৯-৭১) লেখা-লেখি করে বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনে বিচিত্র বিদ্যায় উৎসাহী, সজ্জন সংস্কৃতিবান, বাঙালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন বলে স্বাধীনতা-সংগ্রামের (১৯৭১) প্রথম বিভীষিকাময় ২৫শে মার্চের (১৯৭১) কালরাত্রিতে পাকিস্তানের সরকারী হানাদার- বাহিনীর

Dhaka University Institutional Repository

গুলিতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। অধ্যাপক হাবীবুর রহমান (১৯১৬-৬২) অর্থনীতিবিদ হিসেবে প্রখ্যাত ছিলেন এবং পাকিস্তান-সরকারের অর্থমন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন বিভাগে সক্রিয় জীবনে কর্মরত ছিলেন। সরকারী চাকুরী করা সত্ত্বেও তিনি পূর্ব -বাঙলার আঞ্চলিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা তুলে ধরে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন।[৩৪] সরদার জয়েনউদ্দীন (১৯২৩ — ৮-) পূর্ববঙ্গের প্রধানতম জনঘনিষ্ঠ কথাশিল্পী এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগের সরকারী কর্মজীবী হিসেবে সমাজের প্রথম সারির লোক ছিলেন। পত্রিকার কর্ণধারদের এই পরিচয় ছাড়াও দেখা যায়, এতে প্রখ্যাত মার্কসবাদী, র‍্যাডিক্যাল-হিউম্যানিষ্ট এম. এন, রায় (১৮৮৭-১৯৫৪) এর রচনার অনুবাদ এবং এম. এন. রায়ের র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজমের অনুসারী ও প্রচারক ভারতের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়ের (১৯২১) লেখাও ছাপা হয়েছিল। তাছাড়া বিদেশী মানবতাবাদী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক সাহিত্যিকদের রচনাবলীও অনূদিত হয়ে ছাপা হয়েছে। এ থেকে পত্রিকার চরিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা যায়।

পত্রিকার নিয়মাবলীতে অবশ্য বেশী কিছু বলা হয়নি। আষাঢ় থেকে বর্ষ শুরু (১৩৫৭, আষাঢ়) হবে। আর লেখা অমনোনীত হলে ফেরত দেয়া হবেনা এবং যেকোন মাস থেকে গ্রাহক করা হয়, দশ কপির কম এজেন্সী দেয়া হয়না। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখতে হবে ইত্যাদি গতানুগতিক এইসব কথা বলা হয়। যোগাযোগের জন্য ম্যানেজার, মাসিক মুক্তি, ১ মনওয়ার খান বাজার রোড, নবাবপুর, ঢাকার ঠিকানা দেয়া হয়। ক্যাপিট্যাল প্রিন্টিং প্রেস, ৫০ বেগম বাজার থেকে মুদ্রিত হয়ে ১, মনওয়ার খান রোড, মুক্তির কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হত সরদার জয়েনউদ্দীন কর্তৃক। সাধারণ সাদা কাগজে পাক্‌সি ক্রাউন সাইজে, দুই কলামে ঝকঝকে ছাপায় মুক্তি প্রথম সংখ্যা ১ থেকে ৫৯ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় সংখ্যা ৬০ থেকে ১১৮ এবং তৃতীয় সংখ্যা ১১৯ থেকে ১৭০ পৃষ্ঠাব্যাপী ছাপা হয়। চতুর্থ সংখ্যা অনুসন্ধানে বের করতে পারিনি। কিন্তু 'সাঁকো' পত্রিকার 'আবদুল গনি হাজারী স্মৃতি সংখ্যায় (১৯৭৮) খালেক বিন জয়েনউদ্দীন চতুর্থ সংখ্যার প্রকাশের কথা উল্লেখ করে লেখক-সূচীরও বর্ণনা দিয়েছেন। মুক্তির মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা ; ষন্মাসিক তিন টাকা, বার্ষিক সাড়ে পাঁচ টাকা। এঁরা বেশী বিজ্ঞাপন পেতেন বলে মনে হয় না। তবে সবধরণের বিজ্ঞাপন তাঁরা গ্রহণ করতেন না। 'কোন বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা বা না-করা ম্যানেজারের ইচ্ছাধীন'। প্রাপ্ত তিনটি সংখ্যায় চিত্তরঞ্জন কটন মিলস্ লিমিটেড নারায়নগঞ্জ ; ইণ্ডিয়া ফ্যানস্ কোম্পানীর পাকিস্তানী পরিবেশক M/S Gossen & Co. Ltd. ৩ জনগণ রোড, ঢাকা ; এস. এম. হানিফ লিমিটেড, ঢাকা - আমদানী-রপ্তানীকারকও এজেন্ট; ঢাকেশ্বরী কটন মিল্‌স লিঃ ঢাকা ; প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, বাংলা বাজার, ঢাকা ; ক্যাপিটাল প্রিন্টিং প্রেস (মুক্তির ছাপাখানা) ও ফয়েজ আহমদ সম্পাদিত 'ছোটদের সচিত্র মাসিক' 'হুল্লোড়' ; ইস্ট পাকিস্তান কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ ঢাকা ; এবং পূর্ববঙ্গ সরকারের সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেন্টের 'আরও বেশী আটা খান' এর বিজ্ঞাপন আছে। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় ১ পৃষ্ঠার ২টি ; দ্বিতীয় সংখ্যায় দেড় পৃষ্ঠায় ৪টি এবং তৃতীয় সংখ্যায় আড়াই পৃষ্ঠায় ৫টি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল। প্রাপ্ত ফাইলে ছিড়ে বাঁধাই করার ফলে দুই সংখ্যার কভার নেই বলে অনুমান করা যাচ্ছে না যে, আরও দু'-একটি বিজ্ঞাপন ছিল কী না। না-থাকলেও অুবিধা নেই, তাতে না হয় আরও দু'চার পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন থাকতো। তাতেও অনুমান করা যায় এটা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকা ছিলনা। মুক্তির 'বিজ্ঞাপনের হার' ছিল ঃ "পূর্ণপৃষ্ঠা দ্বিতীয় কভার - ১২৫ টাকা; তৃতীয় কভার - ১০০ টাকা ; চতুর্থ কভার - ১৫০ টাকা; সূচীপত্রের পৃষ্ঠায় (কেবল অর্ধপৃষ্ঠা নেয়া হবে) - ৫০ টাকা ; প্রথম পৃষ্ঠার বিপরীত পৃষ্ঠা - ৯০ টাকা ; এবং সাধারণ পৃষ্ঠা ৮০ টাকা"। মুক্তির লেখক ও লেখার সূচী নিম্নরূপ :

প্রথম বর্ষ ঃ প্রথম সংখ্যা; আষাঢ় ১৩৫৭

প্রবন্ধ ।। জেমস টরেস বোডেট— প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা ও আমাদের সভ্যতার ভবিষ্যত (অনুবাদকের নামোল্লেখ নেই।
কাজী আবদুল ওদুদ —কবিগুরু গ্যেটে (এ-নামে তাঁর একটি বই আছে, তবে এখন এটি অগ্রন্থিত)
এম. এন. রায় — বৃটিশ সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা ও ইউরোপের ভবিষ্যত (অনুবাদকের নামোল্লেখ নেই)
বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর —(আত্মগত প্রবন্ধ) বিছানা
পরেশ ভট্টাচার্য্য — আমাদের ভাষা ও সাহিত্য
সৈয়দ আলী আহসান — নজরুল ইসলাম

কবিতা।। ফররুখ আহমদ —বুদ্ধির শানিত দীপ্তি
শামসুর রাহমান— একটি ঐতিহাসিক চরিত্র
জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী — মুমূর্ষ প্রেম
হাবীবুর রহমান — প্রত্যয়

গল্প ।। কল্যাণ দাশগুপ্ত — তারা তিনজন Leopdds Alas লিখিত Adios Cordera নামক গল্পের অনুসরণে
সরদার জয়েনউদ্দীন — ভাবী

উপন্যাস ।। আলাউদ্দিন আল আজাদ— প্রাণবন্যা (ক্রমশঃ)

বিতর্কিকা ।। সৈয়দ মোহাম্মদ আলী — নতুন কবিতা ঃ একটি আলোচনা

বইপুস্তক।। ১. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম — 'জেগে আছি' গল্প-গ্রন্থ — আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রণীত
২. হরিপদ চট্টোপাধ্যায় — Soviet Genetics and World Sciences-- Julian Huxley-- Chatto and Windus 1949 ; এবং Russia puts the elock back - John Langdon -- Davies, Victor Gollancz Ltd. 1949. প্রণীত ও প্রকাশিত

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি- সংবাদ ।। (জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা— মানবতাবাদী আন্দোলন ঃ ফ্রান্স (ক্রমশঃ) সাময়িকী 'দিল্লী চুক্তির পর; 'পূর্ব্ব পাকিস্তানে শিক্ষা'

প্রথম বর্ষ ঃ দ্বিতীয় সংখ্যা ; শ্রাবণ ১৩৫৭

প্রবন্ধ ।। এলিয়োঁ ভিত্তেরিনি — রাজনীতি ও সংস্কৃতি (অনুবাদকের নাম নেই)

কামিল আবু সুয়ান — ইবনে সিনা, UNESCO র মুখপত্র COURIER থেকে অনুবাদ, অনুবাদকের নাম উল্লেখ নেই,

আবদুল হাই — ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নতুন মোড়

শিবনারায়ণ রায় — ফরাসী বিপ্লবে দার্শনিকদের দান

অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই — সেকাল ও একাল

কবিতা।। ফররুখ আহমদ — নতুন দিনের কবির প্রতি

হাবিব ইজ্জাদ— কবিতাগুচ্ছ , 'টিনটার্ন এ্যাবির 'কয়েকমাইল উপরে লিখিত কবিতা' অনুবাদ করেন আবদুর রশীদ খান — নিম্নের নোট সম্বলিত ঃ 'ওয়ার্ডসওয়ার্থ - শতবার্ষিকী' উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে পঠিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত'।

হাবিবুর রহমান — চাঁদ

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী — সনেটগুচ্ছ

গল্প।। দেবব্রত সুর চৌধুরী – আয়েষা

সরদার জয়েনউদ্দীন — করালী

উপন্যাস। আলাউদ্দিন আল আজাদ — প্রাণবন্যা (ক্রমশঃ)

বিতর্কিকা।। জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা — 'নতুন কবিতা; একটি আলোচনা'

সংস্কৃতি সংবাদ।। জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা — 'বেলজিয়াম ঃ খৃস্টধর্ম ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয়; 'পাক-ভারতীয় সঙ্গীত'; 'দুই বাঙ্গালার সাহিত্যের সাম্প্রতিক ধারা'

বই-পুস্তক।। মাহবুব জামাল জাহেদী আলোচনা করেছেন ' বঙ্গোপন্যাস' শিরোনাম দিয়ে জর্জ ওরয়েলের Animal Farm এবং Nineteen Eighty four শীর্ষক দুটি উপন্যাসের ; এবং শওকত ওসমান প্রণীত নাটক 'আমলার মামলা'র আলোচনা করেছেন রোকাইয়া আনওয়ার। আলোচকের নাম উল্লেখ না করে আলোকপাত করা হয়েছে ফয়েজ আহমদ সম্পাদিত 'হুল্লোড়' পত্রিকার ওপর।

সাময়িকী।। কোরিয়া ও উনো ; রাষ্ট্রের প্রয়োজন (লেখকের নাম উল্লেখ নেই)।

প্রথম বর্ষ ঃ তৃতীয় সংখ্যা ; ভাদ্র ১৩৫৭

প্রবন্ধ ।। সি. ই. এম. জোড় — 'যুদ্ধ থেকে দূরে থাকার রাজনীতি' (অনুবাদ ঃ দি নিউ ষ্টেটস্ম্যান এ্যাণ্ড নেশন পত্রিকা থেকে আবদুল গনি হাজারী)

অরুণ কুমার সরকার — আজকের দিনে বীরবল ('কবিতা' পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রণ)

সৈয়দ মোর্ত্তাজা আলী — সাধক কবি দাদ আলী

কবিতা।। শামসুর রাহমান — অগ্নিকোণের কবিতা

মনোজ রায় চৌধুরী — কালান্তর

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী — সনেটগুচ্ছ

গল্প। হাসান হাফিজুর রহমান — মাছ

নাটক।। জিল্লুর রহমান 'কলিযুগের শেষ'

আর্নষ্ট টল — 'জনতা ও মানুষ' (অনুঃ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী)

বিতর্কিকা।। সৈয়দ মোহাম্মদ আলী — আমাদের ভাষা ও সাহিত্য; ধর্ম ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়; মানববাদী আন্দোলন ঃ হলাণ্ড; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান; সলিমুল্লাহ হলে 'টিপু সুলতান'; ঢাকা কলেজে 'মাটির ঘর'; 'কালচারাল সেন্টারে 'তস্কর ও লস্কর'; বিশ্ববিদ্যালয়ে বিচিত্রানুষ্ঠান; ইকবাল হলে বিচিত্রানুষ্ঠান।

বই পুস্তক।। ব্রজেন ভট্টাচার্য — 'অগ্নিসম্ভব' (উপন্যাস) গোরী শংকর ভট্টাচার্য প্রণীত। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ— 'রাত্রিশেষ" (কবিতা) আহসান হাবীব প্রণীত

সাময়িকী।। শাসনতন্ত্রের মূলনীতি (সম্পাদকীয়)

প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যার লেখক সূচী 'আরো সমৃদ্ধ' বলে খালেক বিন জয়েনউদ্দীন লিখেছেন ; "মুক্তি তার অংগে .... বিতর্কিত, নতুন ভাবচিন্তার আন্তর্জাতিক নিবন্ধসহ আত্মপ্রকাশ করেছিল। এ-সংখ্যায় হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হাসান হাফিজুর রহমান, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আলাউদ্দীন আল আজাদ, শচীন্দ্রনাথ মিত্র, ফররুখ আহমদ, সুরজিত সিং, কামরুল হাসান, আবু সয়ীদ আইউব, এবিএম মুসা ও ব্রজেন ভট্টাচার্য লিখেছিলেন। এ সংখ্যায় জর্জ অর ওয়েলের Animal Farm এর অনুবাদ, আবু সয়ীদ আইউবের বিতর্ক এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নিবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখ্য।"৩৫

'সমকাল' পত্রিকার প্রথম বর্ষের (ভাদ্র ১৩৬৪ – শ্রাবণ ১৩৬৫) সংখ্যাগুলোর মূল্যায়ন করে 'উত্তরণ' পত্রিকায় (ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৫ সংখ্যায়) ডঃ

Dhaka University Institutional Repository

রফিকুল ইসলাম যা লিখেছিলেন তার মূলকথা হলো সমকাল-পূর্ববর্তীকালে মুসলমান লেখকেরা যে কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার অধিকাংশ উন্নতমানের সাহিত্য-শিল্পগুণান্বিত ছিলনা, অর্থাৎ সর্বাংশে পঠনোপযোগী ছিলনা। তিনি বলেন, সে তুলনায় সমকালের কবিতা-গল্প-উপন্যাস 'আধুনিক সাহিত্যের' মর্যাদাসম্পন্ন হয়, এবং একারণেই সমকাল মুসলিম-সম্পাদিত সাময়িকপত্রিকার ইতিহাসে একটি মাইল-ষ্টোন স্বরূপ দিক নির্দেশ করেছিল। বাঙলাদেশের সাহিত্যের অগ্রগতিতে তাঁর মতে এটাই হচ্ছে সমকালের সাহিত্যিক- অবদান (প্রধানত)। ডঃ রফিকুল ইসলাম সমকালের উচ্চমূল্য দিতে গিয়ে যা বলেছেন,[৩৬] তাতে অতিরঞ্জন হয়তো নেই, কিন্তু তথ্যগত ভ্রান্তি কিছু আছে বলে মনে হয়। যখন কৃষ্টি-সীমান্ত-অগত্যা-মুকৃতি-যাত্রিক প্রভৃতি পত্রিকায় মুদ্রিত কবিতা-গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-আলোচনা-অনুবাদগুলো চোখে পড়ে, তখন বলতেই হয়— বিভাগোত্তর কালে এইসমস্ত পত্রিকা আধুনিক অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী শিল্পগুণসম্পন্ন সাহিত্য' প্রকাশ করে বাঙলাদেশের সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলছিলো-- সমকাল যখন প্রকাশিতই হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে মাত্র। মুক্তির সাহিত্য-প্রচেষ্টা তুলনারহিত। এর সকল পৃষ্ঠা, সকল স্তবক, সকল চরণ পঠনোপযোগী—এটাই হচ্ছে এর প্রথম ও প্রধান কৃতিত্ব। লেখকসূচীর দিকে তাকালেই দেখা যায় 'মুকৃতি'র কবিগণ তখন তরুণ এবং সাহিত্যাঙ্গনে নবাগত হলেও ছিলেন সম্ভাবনাময়। ফররুখ আহমদ (১৯১৮-৭৬) বিভাগপূর্ব কালেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন কবি হিসেবে। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (১৯২৮); শামসুর রাহমান (১৯২৯) ; হাবিবুর রহমান (১৯২২-৭৬) ; মনোজ রায় চৌধুরী এবং হাবিব ইজাদ প্রমুখের মধ্যে প্রায় সকলেই স্থায়ী কবি-খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং এঁদের ১৯৫০ সনে রচিত কবিতাবলী শিল্প, ছন্দ, অলঙ্কার, ভাষায় আধুনিক জীবনের ছায়া এবং সমাজ-সচেতন বক্তব্যগত দিক দিয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল— এগুলোর সমমানের কবিতা তৎকালীন অপরাপর পত্রিকায় খুব অল্পই পাওয়া যায়। মুকৃতির চারটি সংখ্যার মধ্যে শামসুর রাহমান দুইসংখ্যায়; জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী তিন সংখ্যায়; মনোজরায় চৌধুরী এক সংখ্যায়; হাবিবুর রহমান দুই সংখ্যায়, ফররুখ আহমদ তিন সংখ্যায় ; হাবিব ইজাদ ও আবদুর রশীদ খান এক সংখ্যাতে কবিতা লিখেছিলেন এবং অনুবাদ করেছিলেন। (চতুর্থ সংখ্যার বিস্তারিত সূচী না পাওয়ার জন্য কিঞ্চিৎ ভুল থাকতে পারে) ফররুখ আহমদ ইসলামী-ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণবাদী কবি হলেও 'বুদ্ধির শাণিত দীপ্তি' শীর্ষক কবিতায় শব্দ-চয়নে পত্রিকার আদর্শকেই অনুসরণ করেছিলেন ঃ 'বুদ্ধির শাণিত দীপ্তি যে মুহূর্তে হল উগ্র উদ্যত নখর/ স্বার্থান্ধ, তখনি আমি চেয়েছি তোমাকে/ হে হৃদয়, ঘুমন্ত হৃদয়।/ চেয়েছি তোমার স্পর্শ .....' (পৃ- ৮)

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর 'সনেট-গুচ্ছ'তে ম্যাচিউর্ড কবিত্বশক্তির পরিচয় দুর্লক্ষ নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মারণাস্ত্র প্রয়োগের স্মৃতি কবি কাব্য রচনাকালে ভুলতে পারেননি- তাহলে ভ্রূকুটি ভোল। দেশে দেশে নগরে বন্দরে/ বহু মারণাস্ত্র আছে। তার মাঝে ভ্রূকুটি তোমার/ সবচেয়ে মারাত্মক। শব্দহীন তীব্রগতি তার,/ মুহূর্তে আঘাত হানে মর্মের নিগূঢ়তম স্তরে।' (পৃ- ৯৮)

শামসুর রাহমান 'একটি ঐতিহাসিক চরিত্র' আঁকতে বসে কবিতায় ১৩৫০ সনের দুর্ভিক্ষের (১৯৪৩) কথা বিস্মৃত না-হয়ে সচেতন ভাবেই খুশি হয়ে উল্লেখ করেছেন— "পৃথিবীর অনেক আকাশ/ আর অনেক হেমন্তের ধূসর গোধূলি পিছনে রেখে/ একদিন আমার রক্তে ছায়া ফেলেছে/রুগ্ন চাঁদের হাসি আর বিশীর্ণ পাঁজরের বুক..... /তেরোশ' পঞ্চাশের নির্মম ঘুম" (পৃ - ২৩)

হাবিবুর রহমানের 'প্রত্যয় ' - "এই অনন্তের মাঝে জীবনের বিচিত্রতা জানি,।/আপনারে ক্ষুদ্র করা, যেন এক নিষ্ঠুর বঞ্চনা,—/ব্যক্তির অস্তিত্ব নিয়ে আপনার সম্পূর্ণ ঠিকানা ।/পিছে ফেলে আসা— সব মূল্য ভুলি' সব মিছে জানা ; /মনে হয় ভুলে যেন আপনারে না করি বঞ্চনা; । /একদিনের তরে যেন নিজেরে বিরাট করে মানি।" (পৃ - ৪৩)

আবদুর রশীদ খান অনুবাদ করেছেন বিদেশী কবিতা। ১-৩ সংখ্যায় মোট পাঁচটি গল্প ছাপা হয়েছে যার দুটোর লেখকই সরদার জয়েনউদ্দীন; একটির হাসান হাফিজুর রহমান, এবং দুটির লেখক ও অনুবাদক যথাক্রমে দেবব্রত সুর চৌধুরী এবং কল্যাণ দাশগুপ্ত। গল্পগুলো রসোত্তীর্ণ এবং সমাজ ও বাঙালীর জীবন-ঘনিষ্ঠ, যথার্থ সাহিত্য মর্যাদায় এতে নর-নারীর জীবনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি রূপলাভ করেছে। প্রবন্ধগুলোর দিকে তাকালেই একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে—মুকৃতি বক্তব্য-প্রবন্ধ- প্রধান পত্রিকা ছিল। প্রথম—তৃতীয় সংখ্যায় ১৪ টি এবং চতুর্থ সংখ্যায় অন্তত (আনুমানিক) ৪টি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল (মোট ১৮টি)। আলোচনা, সমালোচনা এবং সম্পাদকীয়- নিবন্ধগুলো যদি প্রবন্ধ-নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে আরও চৌদ্দ-পনেরটি প্রবন্ধ-জাতীয় রচনা এতে ছাপা হয়েছিল (সর্ব মোট প্রায় ৩২টি)। এবং এই প্রবন্ধ-নিবন্ধ, আলোচনা-সমালোচনার বিষয়রূপে গণ্য হয়েছে সমকালীন সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে স্পর্শকাতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি। আলোচনায় মানবতাবাদের জয়গান, সমাজতন্ত্রের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং বাঙালির জাতীয় ও সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক স্বার্থকে কঠোরভাবে সংরক্ষণ-সমর্থন-এর দলিল লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। এর মধ্যেপাঁচটি মূল্যবান প্রবন্ধ অনূদিত রচনা। ১৬জুন ১৯৪৯ তারিখে ইউনেস্কোর প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাবিষয়ক সম্মেলনে ইউনেস্কোর ডিরেকটর জেনারেল জেম টরেস বোডেট-এর উদ্বোধনী ভাষণের অনুবাদ-এ শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব অত্যন্ত আবেদনশীল ভাষায় ও অকাট্য যুক্তিতে উপস্থাপিত হয়েছে। এতে গুরুত্ব পেয়েছে 'মানবতা'—যে 'মানবতা বলতে' লেখক বুঝেছেন 'ব্যক্তি-মানবের সঙ্গে বৃহত্তর মানবত্রের সমন্বয় সাধনের আদর্শ'। এম. এন. রায় প্রণীত 'বৃটিশ সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা ও ইউরোপের ভবিষ্যত' বিষয়ের আলোচনার অনুবাদ-রচনায় সমাজতন্ত্রের উজ্জ্বল দিকগুলো প্রতিফলিত হয়েছে। এলিয়ো ভিত্তেরিনি প্রণীত 'রাজনীতি ও সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধের বক্তব্য নামেই প্রকটিত। 'যুদ্ধ থেকে দূরে থাকার রাজনীতি', 'ইবনে সিনা', প্রভৃতি-প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। জ্ঞানচর্চা ও মানববিদ্যার পরিচয় প্রদানে প্রবন্ধগুলোর বক্তব্য মর্মস্পর্শী। এমন প্রবন্ধ এবং এইসব বিষয়ের চর্চা তখন এদেশের সাময়িকীগুলোতে ছাপা হতনা। এদেশের জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে মুকৃতির প্রকাশনা তাই অশেষ গুরুত্ববহ।

আলাউদ্দীন আল আজাদের 'প্রাণবন্যা'র দুকিস্তি ছাপা হয়েছিল। সম্পূর্ণ রচনাটি মুকৃতিতে প্রকাশিত হয়নি। জিল্লুর রহিমের 'কলিযুগের শেষ' ও

Dhaka University Institutional Repository

আর্নষ্ট টল এর 'জনতা ও মানুষ' নাটকের উচ্চমানও সাহিত্যে মূলবান সংযোজন। 'কবিতা' থেকে পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধ— বীরবল সম্পর্কে এদেশের পাঠকদের সাহিত্যরস-পিপাসার তীব্রতা বাড়িয়েছে। 'সাধক কবি দাদ আলী' শীর্ষক প্রবন্ধ পরিচিতিমূলক। আলী আহসানের 'নজরুল ইসলাম' ও দাদ আলীর কবি-কীর্তির সাহিত্যিক আলোচনা ইতিহাসের একটি অধ্যায়কে সমৃদ্ধ করেছে সন্দেহ নেই। 'ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নতুন মোড়' এবং 'ফরাসী বিপ্লবে দার্শনিকদের দান'; কবিগুরু গ্যেটের দুইশততম জন্মদিনে কাজী আবদুল ওদুদের গ্যেটে-সংক্রান্ত আলোচনা জনতা ও মানবতার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টিকে নতুনভাবে আকৃষ্ট করেছে। বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের 'বিছানা' শীর্ষক আত্মগত প্রবন্ধ ইঙ্গিতময়, প্রতীকী রচনা—যাতে সাহিত্য-শিল্প রচনার শৈল্পিক কলা-কৌশলই বিশ্লেষিত। পরেশ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ 'আমাদের ভাষা ও সাহিত্য' ; আবদুর রশীদ খান ও আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত ও সংকলিত 'নতুন কবিতা'র আলোচনা এবং অন্যান্য পুস্তক-সমালোচনা, বিচিত্র বিষয়ের পর্যালোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে জীবনবাদী, বস্তু বা বাস্তববাদী, সাধারণ মানুষের প্রতি আস্থাশীল সাহিত্য ও শিল্প-দৃষ্টি। নিছক কলাকৈবল্যবাদী কবিতা, গল্প ও সাহিত্য প্রশংসা লাভ করতে পারেনি মুক্তি তে।

'আমাদের ভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ এবং ঐ প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়ায় লিখিত বক্তব্যে বা প্রবন্ধে 'ভাষা' ও 'সাহিত্য' প্রসঙ্গে দেশের জন্য কল্যাণকর উন্নত, আদর্শ অনুসন্ধানের প্রয়াস লিপিবদ্ধ আছে। পরেশ ভট্টাচার্য 'আমাদের ভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, 'পূর্ববঙ্গের সাংস্কৃতিক জীবনে আজ যে সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে,... এ প্রদেশের সাহিত্য ও ভাষা ... সমস্যাই অন্যতম। পূর্ববঙ্গের ভবিষ্যত সাহিত্যের গতিপথ কি হবে, ভাষার রূপ কি হবে এ সমস্যা আজ পূর্ববঙ্গের জনগণকে ভাবিয়ে তুলেছে। পশ্চিম বঙ্গকে এ-নিয়ে বেশী মাথা ঘামাতে হবে না। পরিপক্ক ফলটি তারা পেয়েছেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গের এ দুটি সমস্যা আজও অমীমাংসিত আছে, অবশ্য এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে অনেক এবং আজও হচ্ছে।" তিনি বলেন— "সাংস্কৃতিক মুক্তিই মানুষের প্রকৃত মুক্তি এবং সে সংস্কৃতি গড়ে উঠবে ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমেই। .... বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে একটা সার্ববঙ্গিক রূপ নিয়েই। এ সাহিত্যের উপর পড়েছে উভয় বঙ্গের প্রভাব। কাজেই বঙ্গ যখন বিচ্ছিন্ন হলো, তখন বাংলা সাহিত্যও উভয় অংশে সমভাবে গৃহীত হবে— এরকম আশা গোড়াতে অনেকেই করেছিলেন। এটা যে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে অনেকেই এ চিন্তাকে মনে স্থান দিতে পারেননি। কিন্তু কার্যত এ রকমটাই হয়ে দাঁড়ালো। এর বিশ্লেষণ করা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা।" আলোচক বলেন, কলকাতার সঙ্গে 'নাড়ীর যোগ ছিন্ন' হবার পর অবিভাজ্য বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্য 'আমরা একান্তভাবে আমাদের বলেই গ্রহণ করতে পারবো কি না' বা তার বীজ থেকে 'পূর্ববঙ্গে নূতন চারা রোপন করা হবে', অথবা বাংলা সাহিত্য বৃক্ষের কোণ্ শাখা থেকে 'কলম বেধে নূতন চারা লাগাতে হবে'—এস্তার চিন্তা-ভাবনার সময় এসেছে—, 'মুসলিম প্রধান পূর্ববঙ্গে তথা ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে নূতন পরিবর্তিত আদর্শকেই স্বীকার করে নেয়া হবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু সমৃদ্ধ আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে 'গলাধাক্কা দিয়ে বিদায় করে একটা মধ্যযুগীয় সাহিত্যকে আদর্শ করে নেওয়াও কি জাতীয় উন্নতির পক্ষে সহায়ক হবে?' উগ্র জাতীয়তাবোধ এবং উৎকট ভাবালুতাকে প্রশ্রয় না-দিলে প্রশ্নটা সত্যিই গুরুতর। তবে ভেবে দেখতে হবে— বর্তমান বাংলা সাহিত্যে কি আমাদের দাবী নেই? সে দাবী আমরা ছাড়বোই বা কেন? একমাত্র উগ্রজাতীয়তাবোধ কিংবা অভিমান ছাড়া এমন কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না যার জন্যে একটা তৈরী-করা সাহিত্যের ঐতিহ্য থেকে আমরা নিজেদের বঞ্চিত করতে পারি। একটা নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি পত্তন করতে গিয়ে যদি আমরা অভিমানের বশে একটা ঐশ্বর্যকে অস্বীকার করে বসি, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ কিছুতেই আমাদের ক্ষমা করবে না। .... কাজেই বর্তমান বাংলা সাহিত্যের ভাষাকেও আমরা অনায়াসে গ্রহণ করতে পারি, পারি বাংলা সাহিত্যকে আপনার বলেই গ্রহণ করতে। কিন্তু তা বলে আমি আমাদের স্বাধীনতা বর্জন করে বা প্রয়োজনকে অস্বীকার করে পরের ধনে পোদ্দারী করার পরামর্শ দিচ্ছিনে। বর্তমান বাংলা ভাষাকেই আমরা প্রয়োজনানুযায়ী একটু অদল-বদল করে নেবো। পূর্ববঙ্গে বসে সাহিত্য রচনা করতে গেলে বাংলা ভাষাকে কিছুটা মার্জিত করা অবশ্য প্রয়োজন।...... কাজেই পূর্ববঙ্গে যে সাহিত্য রচিত হবে, তাতে স্থানীয় পরিবেশের (Local Colour) প্রভাব পড়বেই। প্রধানত মুসলিম জীবনকে কেন্দ্রকরেই পূর্ববঙ্গে সাহিত্য রচিত হবে। কাজেই মুসলিম জীবনের প্রতিচ্ছবি যদি সাহিত্যে পড়ে, তবে মুসলিম সংস্কৃতির পরিচায়ক আরবী শব্দ কিছু ঢুকবেই, ... মুসলিম সংস্কৃতি এবং ভাবধারাও সাহিত্যে রূপলাভ করবে এ স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছনীয়। কাজেই পূর্ব বাংলার মাটিতে যে সাহিত্য গড়ে উঠবে তা অনেকাংশে পশ্চিম বাংলার সাহিত্য থেকে একটা বিশিষ্টতা লাভ করবেই।..... আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করলেও আমাদের যে বিশিষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি হবে, তার জন্যে পশ্চিম বাংলার কাছে ঋণ স্বীকারের কিংবা হিন্দু প্রভাবের কথা অবান্তর হয়েই দাঁড়াবে। তারপর আসে সংস্কৃত শব্দের কথা ...... মুসলিম সংস্কৃতি কিংবা ভাবধারা (র প্রতিফলনের জন্য) আরবী ফারসী শব্দ একটু বেশী ঢুকবে (ই) ...... কিন্তু তাই বলে অপ্রয়োজনীয় শব্দ, শুধু আরবী ফারসী বলেই ঢোকাতে হবে কেন? প্রচলিত বাংলার শতকরা প্রায় ৪৪টা শব্দ তৎসম, ৫০/৫২টি শব্দ তদ্ভব, বাদবাকী দেশী এবং বৈদেশিক। এতগুলি সংস্কৃত এবং সংস্কৃত -ভব শব্দকে গলাধাক্কা দেওয়া কি সম্ভব? আর সম্ভব হলেও কি এটাকে বাংলা ভাষা বলা চলবে? আর, তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করতেই হয় যে মুসলিমদের সুবিধার জন্যে আরবী ফারসী শব্দের বহুল ব্যবহার প্রয়োজন, তাহলে প্রশ্ন করবো— পল্লী বাংলার মুসলমান, যারা অধিকাংশই মূর্খ তারাও কি এতে উপকৃত হবে? বিদেশী ভাষা গ্রহণ করে ভাষার সম্পদ বাড়ানো যেতে পারে, কিন্তু এতে উপকার হবে কার, মুসলিম গণজীবনের সঙ্গে এর কোন যোগ থাকবে কি? অথচ ভাষায় অপরিচিত আরবী ফারসী শব্দ ঢোকানোর চেষ্টার কসুর নেই, ওকালতিও যথেষ্ট চলছে।" ১৯৪৯ সনে বাংলাভাষার সংস্কার প্রস্তাব বা এতদুপলক্ষে আকরম খাঁর নেতৃত্বে গঠিত কমিটির কথা এখানে স্মর্তব্য। পাকিস্তানবাদীরা 'পাক-জবানে'র পক্ষে প্রচারনাসহ বাস্তব কর্মদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এইসব বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে মুক্তির লেখক মন্তব্য করেন— "একদল ব্যক্তি বাংলাকে উর্দুর একটা বাংলা সংস্করণ করবার চেষ্টায় আছেন। এর প্রতিক্রিয়া(য়)..... সংখ্যালঘু হিন্দু..... পশ্চিম বাংলার ধাচে অতিরিক্ত মাত্রায় উৎকট সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার দ্বারা ভাষাকে (যদি) সমৃদ্ধ করতে চেষ্টা শুরু করেন, তবে বাংলা ভাষার অবস্থাটা কি হবে, অনুমান করতে বলি। এটা রেষারেষির কথা হচ্ছে না। পরস্পরের সম্মিলিত চেষ্টায় একটা নতুন রাষ্ট্রের প্রয়োজনানুযায়ী তাগিদ মেটানোর জন্য সাহিত্য তৈরী হবে, তারই জন্য একটা গঠনমূলক প্রচেষ্টার প্রয়োজন। তাই পরমত সহিষ্ণু হয়ে ভাষার একটা সচল অথচ সহজবোধ্য রূপ বার করতে হবে যার সাহায্যে আমরা—কী হিন্দু, কী মুসলমান প্রত্যেকেই নিজেদের ভাবধারা প্রকাশ করতে পারি।" ডক্টর শহীদুল্লার বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি মন্তব্য করেন—"ভাষা গ্রহণ ব্যাপারে শুধু প্রয়োজনকেই

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকার করবো আর যদি নতুন, অপরিচিত বিদেশী শব্দই গ্রহণ করতে হয়, তবে এর বাঙ্গালীয়ানা রূপটিই (Naturalised Bengali) গ্রহণ করা সমীচীন হবে। আমরা যদি এই ভাবেই অগ্রসর হই, তবে ধীরে ধীরে যে ভাষা পূর্ববঙ্গে গড়ে উঠবে, তা পশ্চিমবঙ্গের ভাষা থেকে অনেকাংশেই স্বতন্ত্র হবে। আমাদের আর লঘিমাভাব (Inferiority Complex) মনে পোষণ করবারও দরকার হবে না। অপর পক্ষে, একটা তৈরী ভাষা নিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে নামবারও সুবিধে পাবো। এতে সময় এবং শক্তির অপচয় বারিত হবে, অথচ পরীক্ষা-সমীক্ষার উদ্বেগও থাকবে না।' লেখক উপসংহারে মন্তব্য করেন ঃ 'এতাবৎকাল যে বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে, তাকে কি আমরা অস্বীকার করবো? কোন ক্রমেই নয়। কারণ, যদিও তা হিন্দু- ভাবধারায় প্রভাবিত, তবু এর মধ্যে এমন অনেক অংশ রয়েছে যা প্রকৃতই সাহিত্য। এ পড়লে জাত হারানোরও ভয় নেই। যেমন ইংরেজী সাহিত্য পড়লেই খ্রীষ্টান হবার আশংকা থাকবেনা, তেমনি হিন্দুদের রচিত সাহিত্য পড়লেই নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারাতে হবে, এমন আশঙ্কারও কারণ থাকে না। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলেই আমার এ উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে।"[৩৭]

মুক্তির একটি প্রধানতম অংশ জুড়ে আছে অনুবাদ সাহিত্য। ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অগ্রগতিতে অনুবাদ-সাহিত্যের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় অধ্যাপক পরেশ ভট্টাচার্য-র উপর্যুক্ত প্রবন্ধের একটি অনুচ্ছেদে এবং আবদুল গনি হাজারী, জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা প্রমুখের নামী-বেনামী অনুবাদগুলোতে। পরেশ অনুবাদ-সাহিত্য সম্পর্কে বলেন ঃ "অবান্তর হলেও এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলবো। আমাদের সাহিত্যের একটা মস্ত অংশ জুড়ে রাখা উচিত অনুবাদ দিয়ে।" অবশ্য তিনি পাকিস্তানের তৎকালের অবস্থাকে এড়িয়ে যেতে চাননি এবং প্রকৃতপক্ষে একটি আবশ্যকীয় বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, ইসলামের দর্শন বিজ্ঞান এবং কবি ইকবালের সম্বন্ধে জানার জন্য তাঁর অনুবাদ দরকার। এ প্রদেশের হিন্দু-মুসলমান সকলের জন্যই এসমস্ত উপকরণ কাজে আসবে কারণ ইসলামী বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সভ্যতা, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গভীর-গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কম পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির জন্যও মুসলিম সাহিত্যের অনুবাদ হওয়া দরকার। কারণ বাঙালি মুসলমান হিন্দু সভ্যতা ও ভারতীয় দর্শন-ধর্ম-সংস্কৃতি সম্পর্কে যতোটা পরিচিত, হিন্দুরা মুসলিম সংস্কৃতি দর্শন ইত্যাদি সম্পর্কে ততোটা জ্ঞাত, কৌতূহলী এবং অভিজ্ঞ নন।[৩৮]

তৃতীয় সংখ্যায় সৈয়দ মোহাম্মদ আলী উপর্যুক্ত প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তখনকার একটি সাহিত্য-প্রবণতার রূপায়ন ঘটিয়েছিলেন। এখানে একটি কথা বলা দরকার যে, ১৯৪৮ সনে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি হঠকারী এক নীতি গ্রহণ করে 'ইয়া আজাদী ঝুঁটা হ্যায়, লাখো ইনসান ভুখা হ্যাঁয়,- শ্লোগান তুলেছিল এবং তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিষ্ট পার্টির প্রাদেশিক সম্পাদক ভবানী সেন রবীন্দ্রগুপ্ত ছদ্মনামে 'প্রগতি সাহিত্যের আত্ম-সমালোচনা' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল্যায়ণ করে তাঁর স্থান নির্ণয় করেন ইতিহাসের ডাস্টবিনে। এর বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট পার্টির অভ্যন্তরে যথেষ্ট ক্ষোভের সঞ্চার হলেও পার্টি-শৃঙ্খলার খাতিরে কেউ এর প্রকাশ্য প্রতিবাদ করতে সাহস করেননি। কিন্তু অন্যেরা এর প্রতিবাদ অব্যাহত রাখেন।[৩৯] তবু বামপন্থীদের কারো-কোরো মধ্যে সৃষ্টিশীল সাহিত্যে খুব বেশী-বেশী প্রগতিশীলতার উপাদান খোঁজা শুরু হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই পরেশ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধের মধ্যে বুর্জোয়া সাহিত্যের প্রতি সমর্থনমূলক মনোভাব আবিষ্কার করে পূর্ব বাংলার সাহিত্যের গতি-প্রকৃতিতে গণ-সাহিত্যের প্রাধান্য ঘোষিত হবে—নাকি, অখণ্ড বাংলা সাহিত্য—যার অধিকাংশ তথাকথিত বুর্জোয়া সাহিত্য বলে বর্জনযোগ্য(?) তাই-ই হবে পূর্ববঙ্গের ভবিষ্যত বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য—সেই প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন ঃ

"পূর্ববঙ্গের ভবিষ্যত ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা যে দিক থেকেই চালানো যাকনা কেন, একটি প্রশ্নকে এড়িয়ে গেলে আলোচনাটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।..... প্রশ্নটা হচ্ছে, পূর্ববঙ্গের ভবিষ্যত সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে গণসাহিত্যের দাবীদাররূপে আমাদের কর্তব্য কি অথবা রাজনৈতিক যথেচ্ছাচার ও ধর্মান্ধতার কবল থেকে মুক্তি দিয়ে কিভাবে পূর্ববঙ্গের সাহিত্যকে দুনিয়ার অখণ্ড সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের এক অংশরূপে গড়ে তোলা যায়। আর শুধু সাহিত্য বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই নয়, মানব জীবনের যে কোন সমস্যাই আলোচনার বিষয়বস্তু হৌকনা কেন, এই প্রশ্নকে ফাঁকি দেয়া চলেনা অর্থাৎ আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের বারবারই ঘুরে ফিরে দেখতে হবে সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা কিভাবে আমাদের আলোচ্য সমস্যার সমাধান করতে পারে। মোদ্দাকথা হচ্ছে, কমিউনিষ্ট বিরোধী তৃতীয় শিবিরপন্থীরাও যা স্বীকার করেছেন, "ধর্ম্মতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক সভ্যতা থেকে আমাদের দৃষ্টি ফিরে এসে নিবদ্ধ হয়েছে শ্রমতান্ত্রিক সভ্যতার উপর, যে সভ্যতা ভবিষ্যতের অনন্ত সম্ভাবনায় আজ রত্ন-গর্ভা"। এই মূল প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে একদল সাহিত্যিক গত দু-তিন বছর থেকেই পূর্ববঙ্গের ভবিষ্যত ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন এবং রাজনৈতিক যথেচ্ছাচার ও ধর্ম্মান্ধতার বিরুদ্ধে তাঁদের সমালোচনা যতই কড়া হোকনা কেন, শেষ পর্যন্ত সত্যিকারের কোন স্বর্ণোজ্জ্বল ছবি তাঁরা তুলে ধরতে পারেননি। বুর্জোয়া সাহিত্যের দেউলিয়াপনা আজ বারবার সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নানা অবাস্তব সমস্যার (যেমন, উর্দুভাষার প্রবর্তন, আরবী হরফ প্রবর্তনের পরিকল্পনা) সৃষ্টি করেছে, সেই দেউলিয়াপনাই আজ অন্যভাবে তাদের আক্রমণ করেছে। তা নাহলে তারা এত সহজে গণসাহিত্য সৃষ্টির মূল প্রশ্নকে এড়িয়ে যাবেন কেন বা অন্যের লেখায় গণসাহিত্যের ছায়া দেখলেই আতঙ্কগ্রস্ত হবেন কেন?..... "

পরেশ ভট্টাচার্য্যের বিভিন্ন বক্তব্যের সমালোচনা করে আলোচনার শেষাংশে সৈয়দ মোহাম্মদ আলী বলেন, "কথাগুলো আপত্তিকর এই জন্যে যে হিন্দু -ভাবধারার প্রভাব বঙ্গ সাহিত্যের বিরুদ্ধে সত্যিকারের মুসলমান সাহিত্যসেবীর কাছে বিশেষ কোন ক্ষোভের কারণ হতে পারেনা। আর যদি সত্যিকারের কোন ক্ষোভের কারণ হয় তবে ত দুদিন পরে যখন পূর্ববঙ্গীয় সাহিত্যে মুসলিম ভাবধারার প্রভাব পড়বে তখন শ্রী ভট্টাচার্যের মতো আপোষ-রফার পথই খুঁজতে হবে। সাহিত্যে কোন বিশেষ ভাবধারা মাপ-জোক করে, অন্যান্য ভাবধারার সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখে তার প্রভাব বিস্তার করেনা, করতে পারেনা।"[৪০]

মুক্তির সামাজিক ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০ (জানু-মার্চ) সনের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার পর পাকিস্তান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত-নেহেরু দিল্লীতে 'দাঙ্গা-নিরোধক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ৮ই এপ্রিল ১৯৫০ তারিখে। লিয়াকত আলীর একটি সৎকর্ম এই চুক্তি।[৪১] কিন্তু এতেও দুই দেশের মুসলমান-হিন্দুর মনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মুক্তির আলোচনায় স্পষ্ট হয় যে, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের একমাত্র প্রতিশেধক হিসেবে রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিয়ে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা করলেও এই একচক্ষু রাজনৈতিক স্বাধীনতা শান্তি স্বস্তি কায়েম করতে পারবে না। "পাকিস্তান ও

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের সামাজিক আদর্শে মূল ত্রুটি এই যে দুই পক্ষই রাজনৈতিক ক্ষমতাকে চরম মূল্য মনে করে। অথচ রাজনীতি সমাজ-জীবনের একটি অংশ মাত্র। সাংস্কৃতিক জীবনে আদান-প্রদানের মূল্য যত বেশী বিরোধের মূল্য তত নয়। এই দুটি জগতকে আলাদা করে যারা দেখতে পেরেছেন তারাই এই দুর্দিনে মনুষত্বে অধিষ্ঠিত থাকতে পেরেছিলেন। সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার জন্য কোন Iron Curtain দরকার হয়না ; যদি তার দরকার হয় তবে সেই সংস্কৃতি অচিরেই ধ্বংসোন্মুখ হয়। অন্যের সঙ্গে মিলনের মধ্য-দিয়েই নিজের বৈশিষ্ট্য ভাল করে ফুটে ওঠে। সাধারণভাবে দেখতে গেলে হিন্দু ও মুসলমানে কতই না তফাত ; কিন্তু ভিতরে রয়েছে মিল এবং সে মিল মনুষ্যত্বের মিল। এই গভীর মিলের কথা যতদিন না আমরা বুঝব ততদিন আমরা ধ্বংসের পথেই চল্‌বো। আর যতই আমরা এই মনুষ্যত্বের মিলকে ভিত্তি করে সমাজ গঠন করবার চেষ্টা করব ততই আমরা আলাদা থেকেও বন্ধু থাকতে পারব এবং সাংস্কৃতিক আদান প্রদান মারফত আমাদের লুপ্ত মিলিত ঐতিহ্যকে নতুনরূপে জীবন্ত করে তুলতে সক্ষম হবো। ঐতিহ্যকে পূর্ণতরো করা ও মিলনকে গভীরতরো করাই বিপ্লবের সাধনা। বিদ্বেষ-মূলক বিদ্রোহ শুধু ধ্বংসেই বিশ্বাসী তাই তাতে অমঙ্গলই বেড়ে চলে। দিল্লীচুক্তির ফলে উপযুক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু দৃষ্টি এখনও মোহমুক্ত হয়নি। দৃষ্টি স্বচ্ছ না হলে প্রেম শুধু বিলাসই হয়, পথের ধূলিতেই তার অকাল অবসান ঘটে।"[৪২]

রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয়-ভাবনার ক্ষেত্রেও মুক্তি স্বচ্ছদৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের স্বার্থের অনুকূলে নিরাপোষ কথা বলেছে—এমন স্পষ্ট বক্তব্য; ১৯৫০ সনেই পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে সুউচ্চ পর্যায়ের যুক্তিতর্কের অবতারণা— মুক্তিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঐতিহ্যের সঙ্গে সংগ্রথিত করে রেখেছে। মূল লাহোর প্রস্তাবের বক্তব্য অনুযায়ী পূর্ববঙ্গের সার্বিক স্বাধীনতার ঘোষণা ব্যক্ত হয়েছে ১৯৪৮ সনে ঘোষিত পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের 'মূলনীতি-রিপোর্ট' এর সমালোচনায়— "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ তিন বছর পর গত ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯৫০?) প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খান শাসনতন্ত্র রচনার প্রাথমিক উপাদান হিসাবে মূলনীতি নির্দ্ধারক কমিটির সুপারিশ পেশ করেছেন গণপরিষদে। রিপোর্টের পূর্ণবিবরণী পাঠে..... পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ স্তম্ভিত; বিস্ময়ে বিমূঢ় ও সর্বোপরি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। কারণ এই সুদীর্ঘ তিন বছর যাবৎ শাসনতন্ত্রের কর্ণধারগণ জনসাধারণকে পূর্ণ গণতন্ত্রের ও ইসলামী সমাজতন্ত্রের যে লোভনীয় ও আকর্ষণীয় রূপ সম্বন্ধে আশান্বিত করে আসছিলেন, উক্ত রিপোর্টের ফলে সে-সব সম্পূর্ণ ভাঁওতায় পরিণত হয়েছে। কমিটির সুপারিশ নিয়মতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের ছদ্মবেশে উপস্থিত করা হয়েছে একতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদের মূলনীতিগুলোকে।.... সমগ্র প্রদেশব্যাপী জনসাধারণের মধ্যে যে অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হয়ে উঠেছে, এ তারি একটু আভাষমাত্র। প্রস্তাবিত এই স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্রের ওপর জনগণ কোনকালেই আস্থা আনবেনা। তাদের ন্যূনতম দাবী হল ঃ ১. লাহোর প্রস্তাবকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হোক—প্রদেশকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হোক ; ২. রাষ্ট্রের শাসনকর্তা গণভোটে নির্বাচিত হবেন ; ৩. এক পরিষদযুক্ত আইন সভার বিধান করা হোক ; ৪. গণপরিষদ ব্যতীত শাসনতন্ত্র রহিত করার বা পরিবর্তন করার অধিকার আর কারও থাকবেনা; ৫. রাষ্ট্রের বা প্রদেশের শাসনকর্তা, কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার সদস্যগণের সকলেই আদালতে অভিযুক্ত হতে পারবেন এবং ৬. বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্থান দেওয়া হোক। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ত্রিংশ অধিবেশনে (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৩) সভাপতির অভিভাষণে কায়েদে আজম যে কথা বলেছিলেন জনগণ আজ সে কথারই প্রতিধ্বনি করে বলছে : The Constitution and the Government will be What the people will decide."[৪৩]

'মুক্তি' হচ্ছে পঞ্চাশ দশকের প্রথম বছরের অন্যতম একটি প্রগতিশীল পত্রিকা— যাতে সমকালীন সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ধার ও ভারওয়ালা, যুক্তি-প্রধান, পঠনোপযোগী ভাষায় উপস্থাপিত করে বাংলাদেশের স্বার্থে জনমত গঠনের চেষ্টা করেছিল।

সীমান্ত পত্রিকার কার্তিক ১৩৫৭ সংখ্যায় 'মুক্তি'র দীর্ঘ সমালোচনায় 'অধ্যাপক লেখক সম্পাদক'-দেরকে ব্যঙ্গ করে কম বিপ্লবী, সরকার ঘেঁষা(?) বলে আত্মন্তরীতা প্রকাশ করা হলেও ঐ পত্রিকার মাঘ ১৩৫৭ সংখ্যায় আবার এর প্রতিবাদও ছাপা হয়। সবকিছু মিলে মুক্তি যে তখনকার একটি আলোড়ন-সৃষ্টিকারী সাহিত্য পত্রিকা ছিল— তাতে সন্দেহ করা চলেনা। কার্তিক সংখ্যায় লেখা হয় ঃ "মুক্তি আমাদের সবচেয়ে নতুন সহযোগী। আজকের সমাজের বিভিন্ন দিকে বেড়ীর মহড়া চলছে। সুতরাং 'মুক্তি' নামটি সত্যিই আশাপ্রদ। এতে যেসব লেখা পরিবেশন করা হয়েছে তার মধ্যে প্রগতির লেবেল অন্তত আছে। কিন্তু সমস্ত বিবেচনার পর দেখা যায় আসলে সম্পাদকরা পাঠকদের খুব চালাকির সংগেই ঠকিয়েছেন। প্রগতির খোলস পরে যে রক্ষণশীলতার দালালী করা যায়—তা হয়তো সম্পাদকগণ জানেন অথবা জানেন না। কিন্তু ফল একই। কাজেই তাঁদের এই ত্রুটি এড়িয়ে যাওয়া চলেনা।" এর প্রেক্ষিতে মাঘ ১৩৫৭ সংখ্যার 'মতবাদ' বিভাগে প্রাণ গোপাল নাথ এবং ইয়াকুব খান সীমান্তর উপর্যুক্ত হঠকারী সমালোচনার নিন্দা করে স্পষ্ট করেই বলেন যে ঃ "সীমান্ত প্রগতিশীল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রগতিশীলতা যখন সংকীর্ণ, অন্ধ-আত্মন্তরীতায় পরিণত হয় তখন সবচেয়ে দৃষ্টি-কটু লাগে" (ইয়াকুব খান) এবং .... সমালোচক সম্ভবত নিজের অজান্তেই এমনসব মন্তব্য করেছেন যাতে আপনাকে পর করে দেবার সম্ভাবনা এখানেও রয়েছে।" (প্রাণ গোপাল নাথ)।

'তাহজিব' পত্রিকায় (১/৬, আশ্বিন ১৩৫৭) তরীকুল আলম 'মুক্তি' সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছেন এই ভাষায় ঃ "........ আগেই শংকিত হয়ে উঠতে হচ্ছে, কেননা আমাদের এই নিতান্ত দুর্ভাগা দেশে ভালো সাময়িকপত্রের আয়ু অত্যন্ত ক্ষীণ। এই ক্ষীণ আয়ুর থেকে 'মুক্তির' মুক্তিলাভ সংস্কৃতি-অনুরাগী মাত্রেরই কাম্য। সাহিত্যক্ষেত্রের গতানুগতিকতার বেদনাদায়ক অনুভূতি থেকে রেহাই পাবার একটা পথ-সংকেত মুক্তি দিয়েছে। তাছাড়াও বিভিন্ন বিভাগীয় আলোচনাগুলো মুক্তির বৈশিষ্ট্য। প্রগতি-বিরোধী সাংস্কৃতিক-আন্দোলনের তথাকথিত আওয়াজে মুষড়ে যাওয়া মন মুক্তির প্রগতি অনুসারী আন্দোলনকে অভিনন্দিত করেছে। প্রসঙ্গক্রমে একটা জিনিসের উল্লেখ ... বিতর্কিকা, পুস্তিকা বিভাগগুলিতে একরোখা মনোবৃত্তি-সম্পন্ন কথার যে প্রতিরোধী, অগ্নিকণার ফলঝুরি ছড়ান হচ্ছে সেগুলোর দিকে সম্পাদকদ্বয়ের আশু দৃষ্টিপাত করা উচিত .... সাহিত্যিক মান নির্ধারণের একটা সুস্পষ্টতা প্রদর্শনে মুক্তির শুভ প্রচেষ্টা আন্তরিক ধন্যবাদার্হ। পূর্ববাঙলার এই নবতম অন্যতম বিশিষ্ট সাহিত্য পত্রিকাটি সাহিত্য-সংস্কৃতির সত্যকার মুক্তি-সাধনে দীর্ঘজীবী হোক।"[৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

৬. পরিচিতি (১৯৫১-৫৩)

ত্রৈমাসিক 'পরিচিতি' চট্টগ্রাম প্রবর্তক প্রেস থেকে শ্রীশশাঙ্ক মোহন চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত হয়ে ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ের সদর দফতর চট্টগ্রামের পাহাড়তলীস্থ ওয়াজিউল্লাহ ইনস্টিটিউটের পক্ষ হতে মোসলেম উদ্দিন আহমদ কর্তৃক ('পরিচিতি কার্যালয়' থেকে) প্রকাশিত হতো। সম্পাদনা-পরিষদ এর সদস্য ছিলেন সমরেন্দ্র দত্ত, সিরাজুল ইসলাম (আজিজ মিছির), রুস্তম খান, এরশাদ হোসেন এবং মফিজ-উল হক। পরিষদ-এর সভাপতি ছিলেন মফিজ-উল হক। তিনি বঙ্গীয় রেলের কলকাতা হেড-অফিসে বিভাগ-পূর্বকালে কর্মরত এবং কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মী ছিলেন। সাতচল্লিশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিনি চট্টগ্রামে পোষ্টিং পেলেন। বাম-ভাবাপন্ন আরও কতিপয় সংস্কৃতি কর্মী, কর্মজীবীর সম্মিলনে স্বাধীনতার সংকটকালে উদ্বাস্তু হিসেবে (চট্টগ্রামের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অঙ্গনের প্রধান ব্যক্তিবর্গ ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা) দেশ-ত্যাগের ফলে শূন্য, বন্ধ্যা সাংস্কৃতিক-অবস্থার পরিবর্তন-লক্ষ্যে তিনি কাজ শুরু করলেন। বলাবাহুল্য নয়, ইতিপূর্বে সীমান্ত পত্রিকা এবং একে ঘিরে গড়ে ওঠা 'সাংস্কৃতিক বৈঠক' ও 'প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ' প্রভৃতির কিছু-কিছু সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক কর্মোদ্যম দানা বেঁধে উঠেছিল। তবে পাকিস্তানী শাসনামলে পর্যাপ্ত কর্মচঞ্চল ছিলনা পূর্ববঙ্গ কখনোই। সবসময় একটা মানসিক-সামাজিক চাপ বোধ করতে হয়েছে এখানকার সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বাঙালি নেতা-কর্মীবৃন্দকে। ফলে হাঁফিয়ে উঠেছিলেন তাঁরা। স্মৃতিকথায় মফিজ-উল হক লিখেছেন : "চট্টগ্রামে শিক্ষা সংস্কৃতির ধারক বাহক যাঁরা ছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন হিন্দু। তাঁরা তখন অনেকেই কলকাতা চলে গেছেন। ফলে চট্টগ্রাম হঠাৎ করেই যেন সাংস্কৃতিক-বন্ধ্যাত্বের অতল-তলে তলিয়ে গেল। পথে ঘাটে যাদের সাথেই দেখা হয় তারাই কেমন যেন অবজ্ঞাভরে কথা বলে। অনেকের সব কথাও আমরা বুঝিনা। কিন্তু আমরা যারা এই বন্ধ্যাত্ব মেনে নিলামনা, তারা সবাই মিলে চিন্তা করতে লাগলাম, কি করে আমাদের হারানো দিনগুলো ফিরে পাওয়া যায়। আমরা তখন একদিন একটি ত্রৈ-মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু লেখা পাব কোথায়? লিখবেন কে? পত্রিকার নামকরণ করা হলো 'পরিচিতি'।...... সম্পাদকমণ্ডলীও গঠিত হলো। প্রথম সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন গোলাম রসুল (কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা) ; নৃত্যলাল লাহিড়ী ; সিরাজুল ইসলাম (আজিজ মিছির বর্তমানে) সমরেন্দ্র দত্ত এবং আমি। প্রথম সংখ্যায় লেখা দিয়েছিলেন আবুল ফজল, শওকত ওসমান, আলাউদ্দীন আল আজাদ, শামসুর রাহমান, অমিয় ভূষণ চক্রবর্তী, মুনীর চৌধুরী, মিহীর সেন, সলিল চৌধুরী, চিরঞ্জীব দাশ শর্মা, গোপাল বিশ্বাস, সমরেন্দ্র দত্ত প্রমুখ। এই সংখ্যায় আমি একটি চীনা গল্প অনুবাদ করেছিলাম।"[৪৫] ১৩৫৮র বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা 'পরিচিতি' প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৫১ সনের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনের পরে-পরে প্রকাশিত এই পত্রিকার আদর্শ উদ্দেশ্য সীমান্ত ও চট্টগ্রামের প্রগতিশীল কর্মোদ্দমসমূহের সুরে সুর মিলানো ছিল। ওয়াজিউল্লাহ ইনস্টিটিউট তথা রেল অফিসকে ঘিরে বামপন্থী-কমিউনিস্টদের কার্যাবলী তখন বেশ সক্রিয় ছিল। এঁদেরই উদ্যোগ-আয়োজনে প্রকাশিত কমিউনিষ্ট ভাবাপন্ন 'পরিচিতি' সরকারী কোপানলেও চিহ্নিত পত্রিকা ছিল।

ফলে "পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে একটা সাড়া পড়ে গেল। কোর্ট থেকে সম্পাদকের নামে সমন জারি করা হলো। পত্রিকার প্রকাশক ওয়াজিউল্লাহ ইনস্টিটিউট (রেলওয়ে ইনস্টিটিউট)। তখন ইনস্টিটিউটের সাধরাণ সম্পাদক ছিলেন জনাব মোসলেম উদ্দীন আহমদ। বস্তুত তাঁর সহযোগিতার জন্যই পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল। আমরা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা মোসলেমউদ্দীন আহমদকে সাথে করে কোর্টে গেলাম। এস-ডি.ও সাহেব আমাদেরকে তাঁর খাস কামরায় ডেকে নিয়ে মিহির সেনের একটি কবিতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বল্লেন, 'দেখুন আপনারা একটু সাবধান হবেন, এ ধরণের লেখা যেন আর প্রকাশিত না হয়।' কিন্তু তারপরও পত্রিকাটি নিয়মিত প্রায় তিন বছর প্রকাশিত হয়। ১২টি সংখ্যার সবগুলো এখন আর একসঙ্গে পাওয়া সম্ভব নয়। তৃতীয় বর্ষ ১ম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয় ঃ "আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ এবং উদ্যমের মধ্যে যথেষ্ট আন্তরিকতা থাকলেও নানারকম অসুবিধার জন্য আশানুরূপ কাজ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।" পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে এই উক্তিতে যে "সমাজ-চেতনা সম্পন্ন যে-কোন ভাল লেখা প্রকাশ করতে 'পরিচিতি' সর্বদাই তৎপর থাকবে।"

'পরিচিতি'তে (প্রাপ্ত সংখ্যাগুলোতে) আবুল ফজলের 'বুদ্ধির মুক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। নূরউল আলম 'আমাদের লোক-সাহিত্য' ; সুলতানা রহমান 'পল্লীসংস্কৃতি'; আসহাবউদ্দীন আহমদ 'লোক-সঙ্গীত প্রসঙ্গে'; কামেলা শরাফী 'সাংস্কৃতিক জীবনে নারীর ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'সাহিত্য ও জীবন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ 'ইউনিটি' পত্রিকা থেকে অনুবাদ করেছিলেন অধ্যাপক এস. এহতেশাম হোসেন। আতাউর রহমান, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, রুস্তম খান, মীর আবুল খায়ের, মোহাম্মদ আজিজুল হক, দেবব্রত সেন, সমরেন্দ্র দত্ত প্রমুখ কবিতা লিখেছিলেন, আর চিরঞ্জীব দাশ শর্মা সুরারোপ করেছিলেন বিপ্লবীগানে। লক্ষণীয় আতাউর রহমান, শামসুর রাহমান প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর কবিরা তখনকার প্রায় সকল প্রগতিশীল পত্রিকায় লিখছিলেন। আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ প্রমুখ সম্ভাবনাময় তরুণদের কাব্যচর্চার ক্ষেত্র হয়েছিল পরিচিতির পাতা। মিহির আচার্য, মফিজ-উল হক, সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ গল্প লিখেছেন বা বিদেশী গল্পের অনুবাদ করেছেন। বিদেশী গল্পের, প্রবন্ধের, নানা-ধরণের রচনা 'পরিচিতি'-তেও ছাপা হয়েছে এবং এর সমস্ত পাতাই পঠনোপযোগী ছিল। যুগোপযোগী আলোচনায়, শিল্পচিন্তা বা চর্চায় ব্যয়িত হয়েছে এর প্রতিটি পৃষ্ঠা। ওলাইডস্ক্রিনার, লিন য়ুতান এর রচনার অনুবাদ আর স্টালিনের মৃত্যুতে শোক-জ্ঞাপন পত্রিকার একটি চরিত্র নির্দেশ করে। চট্টগ্রামের বা বাঙলাদেশের সংস্কৃতি-অঙ্গনের খবরাখবর প্রদান ও প্রতিবেদন ছাপানো এবং বই-পুস্তকের আলোচনা-সমালোচনায় দেশের হিতের প্রশ্নটি উচ্চকিত হয়েছে। পরিচিতির পাতাতে পূর্ব বাঙলার স্বাধীনতা পরবর্তী সাত বছরের প্রগতিশীল চিন্তাচর্চার দলিল লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। অতএব এই পত্রিকাও বাঙলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মূল্যবান দলিল সন্দেহ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

কামেলা শরাফী এবং মনি ইমাম প্রমুখ কয়েকজন বঙ্গ-ললনা এ-ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নারীদেরকে কর্মচাঞ্চল্যে এবং সামাজিক-দায়িত্বে-কর্মে অগ্রণী ভূমিকা নিতে উদ্বুদ্ধ করে আসছিলেন। ১৯৫০ সন পর্যন্তও এদেশের মেয়েদের নাটকের মঞ্চে অভিনয় করতে দেখতে পাওয়া যেতোনা। পুরুষ দ্বারাই নারী-চরিত্রের অভিনয় করানো হতো। ১৯৫১ সনে 'প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ' সুসংগঠিত করার পর 'জবানবন্দী' নাটকে কামেলা শরাফী আর মনি ইমাম প্রথম মঞ্চ-নাটকে অভিনয় করে সামাজিক বিধি-নিষেধ ও সংস্কারের বেড়ী ভাঙ্গেন। 'তৎকালীন নাটকে সৌখিন মহিলা শিল্পীর এটাই ছিল সর্ব প্রথম মঞ্চাবতরণ।[৪৬] পরিচিতির তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় কামেলা শরাফীর (কামেলা খান মজলিস) প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ-র বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত 'সাংস্কৃতিক জীবনে নারীর ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। নারী-প্রগতি বা নারী-স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাসে এই প্রবন্ধটি অবশ্যই ঐতিহাসিক মর্যাদার দাবিদার,—তিনি বলেন ঃ " ... সমাজের যূপকাষ্ঠে বর্তমানে নারী তার ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে বলি দিচ্ছে। সভ্যতা এগিয়ে যাচ্ছে, মানুষের উন্নতি হচ্ছে, অথচ নারী-মর্যাদা কোন অংশে বর্দ্ধিত হয়নি। কিন্তু কেন? তার মূলগত কারণ হচ্ছে অর্থনীতি। ..... (তিনি সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে নারীদের পশ্চাৎপদতার কথা উল্লেখ করে বলেন—) জীবনের সবচেয়ে যেটা প্রয়োজন তাকে (নারীও) উপেক্ষা করতে পারেনা। তাই আমাদের মহিলাদের নিকট আমার আবেদন যে তাঁরা আরও সচেতন হয়ে তাদের স্বার্থ অর্থাৎ নারীদের নিজস্ব অধিকার সম্বন্ধে বুঝে—নানাভাবে এগিয়ে আসুন কাজের ভেতর দিয়ে। সাংস্কৃতিক জীবনে রয়েছে আমাদের অধিকার। কারণ এই অধিকারই আমাদেরকে বেশী ভাবে বুঝিয়ে দেবে বা সচেতন করবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অধিকার সম্বন্ধে। আজ আর বিধিনিষেধের দোহাই দিয়ে চুপ করে থাকা সম্ভব নয়। শিল্পের বা সাহিত্যের অনাবিল আনন্দ আমরাও গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। আমাদের সে পিপাসু মন ভরে উঠবে এই জীবন-আনন্দে। আমাদের মহিলাবৃন্দের নিকট আমার অনুরোধ তাঁরা যেন সচেতনভাবে নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতি শিল্পকলায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। নারী সমাজের শিক্ষা দেবার ভার আমাদের। এই দায়িত্ব পালন করে নিজেদের স্বাধিকার অর্জনের পথে এগিয়ে আসুন।"[৪৭]

পরিচিতির মতো একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল সেই ভাষা-আন্দোলন এবং যুক্তফ্রন্ট (১৯৫৪) নির্বাচনের পূর্বে ১৯৫১-৫৩ সময়ে। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িক ভাবধারা এবং বাঙলা ভাষা, সঙ্গীত, নাটক, নানা কলা ও সংস্কৃতির বিকাশে পরিচিতির অবদান তাই ঐতিহ্যসিকতার দাবিদার। আজিজ মিসির (সিরাজুল ইসলাম) লিখেছেন ঃ "সীমান্তর মত পত্রিকা একদিকে—আর অন্যদিকে রেলওয়ের ওয়াজিউল্লাহ্ ক্লাব থেকে আর একটি পত্রিকা 'পরিচিতি' ... পাশাপাশি দেখলেই বোঝা যায় চট্টগ্রামে তখন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন কিভাবে চলছিল। এই পত্রিকা দুটির কপি যদি এখন কারো কাছে থেকে থাকে তবে দেখা যাবে যে আজকের যাঁরা ঢাকার প্রতিষ্ঠিত লেখক তাঁদের অনেকেরই গল্প-কবিতা-এদুটি পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। ঢাকা থেকে তাঁরা লেখা পাঠাতেন আর আমরা ছাপাতাম, এতে বোঝা যায় যে ঢাকায় তখন এধরণের পত্রিকা ছিলনা।"[৪৮] কখনও কখনও কৃষ্টি, অগত্যা, মুকুতি, যাত্রিক সে চাহিদা পূরণ করলেও আজিজ মিছির সাহেবের মন্তব্যে সত্য আছে। 'সীমান্ত' মোটামুটি পাঁচ বছর এবং 'পরিচিতি' তিন বছর চট্টগ্রাম থেকে বের হয়েছিল বলে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৩ সন পর্যন্ত প্রগতিশীলদের রচনা প্রকাশের মাধ্যম (রূপ) কিছু সুযোগ (তখন) চট্টগ্রামে ছিল ; এবং এতে গোটা পূর্ববাঙলার প্রাণ-প্রবাহ অন্তত কিছুটা ধ্বনিত হয়েছিল। অতঃপর "মোসলেম উদ্দীন সাহেবের রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের সম্পাদকের কার্যকাল শেষ হলে পত্রিকা (তিন বছর চলার পর ১৯৫৩ সনের শেষ নাগাদ) বন্ধ হয়ে যায়। চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক জীবনেও কেমন একটা ভাটা পড়লো তখন থেকেই। কারণ সে সময়ে চট্টগ্রামের প্রাণকেন্দ্র ছিল রেলওয়ে-অধ্যুষিত এলাকা।"[৪৯]

৭. যাত্রিক (১৯৫৩)

বাঙালি জাতীয়তাবাদে আস্থাশীল, বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী, পঞ্চাশ দশকের ছাত্র রাজনীতির একজন পুরোগামী সৈনিক, বিশিষ্ট চক্ষুচিকিৎসক, সমাজনিষ্ঠ চিন্তক, একাত্তরের মুক্তি-সংগ্রামের অন্যতম শহীদ, ডাক্তার আবদুল আলীম চৌধুরী (১৯২৮-৭১) এবং তাঁর আর এক সতীর্থ পূর্ববাঙলার পঞ্চাশ ও ষাট দশকের বিশিষ্ট সাহিত্যিক আহমদ কবির এর যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল 'যাত্রিক'। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের অব্যবহিত পরে, প্রাগ্রসরচিন্তার বাহন হয়ে যাত্রিক সমাজ-পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল বলে ঔপনিবেশিক শোষক দ্বারা কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুর মুখ দেখেছিল শীঘ্রই— মাত্র চার সংখ্যা প্রকাশিত হবার পরেই। (চার সংখ্যা পুরো প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তাও জানা যায়না—কিন্তু তিনটি সংখ্যা যে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতো নিশ্চিত, কারণ নমুনা পাওয়া যায়)। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় পৌষ ১৩৫৯ সনে। 'প্রত্যেক ইংরেজী মাসের প্রথম সপ্তাহে ও বাঙলা মাসের মাঝামাঝি প্রকাশিত' হবার অঙ্গীকার ঘোষণা করে নিয়মাবলীতে বলা হয়, "গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা এবং শিল্প ও সংস্কৃতিমূলক রচনা আমরা সাদরে গ্রহন করবো"। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল আট আনা, বার্ষিক চাঁদা সাড়ে পাঁচ টাকা এবং ষান্মাসিক পৌণে তিন টাকা। বলা হয়, যে-কোন মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যাবে। 'কার্যাধ্যক্ষ'র ঠিকানা ছিল ২৭ নং কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা। উইট-হিউমারের ভাষায় 'অগত্যা' লিখেছিল তাদের পত্রিকা নিউজপ্রিন্টে ছাপা পূর্ববঙ্গের একমাত্র সাহিত্যপত্রিকা। কিন্তু যাত্রিকের প্রাপ্ত সংখ্যাগুলোর কাগজও নিউজপ্রিন্ট। কাগজের অভাব এবং মূলবৃদ্ধির জন্য অনেক পত্রিকাই নিউজপ্রিন্টে ছাপা হয় তখন। এমনকি মোহাম্মদী, সওগাত-সমকালও—তবে মাঝেমধ্যে সাদা কাগজেও বের হয়েছে অনেক পত্রিকা, এমনকি উপর্যুক্ত পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা। আলোচ্য পত্রিকার সাইজ ১/৪ ক্রাউন ; পৃষ্ঠা ৫০ করে, তৃতীয় সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠার নম্বর ১৫০। যাত্রিকে বিজ্ঞাপন মোটামুটি ভালোই পাওয়া যেতো। ঔষধ-কোম্পানী, ফার্মেসী, বই এর লাইব্রেরী, তেলের মিল, চা, সিনেমা, হোটেল, কাগজের বিক্রেতা, প্রভৃতির বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে। সামাজিক প্রভাব বা সংযোগ যাত্রিকের উদ্যোক্তাদেরও ছিল। দেখা যায় যাত্রিকের শুভানুধ্যায়ীগ্রুপের তরুণেরাও পরবর্তীকালে বাঙলাদেশের সাহিত্যিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। একমাত্র কাজী মোতাহার হোসেন ছাড়া আলীম চৌধুরী, আহমদ কবির, আহমদ রফিক, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, সৈয়দ

Dhaka University Institutional Repository

নুরুদ্দীন, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, আনিস চৌধুরী, শামসুর রাহমান, আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুল গনি হাজারী, হাসান হাফিজুর রহমান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, এবেন গোলাম সামাদ, আলাউদ্দীন আল আজাদ, জহির রায়হান, ফজলে লোহানী, আবদুর রশীদ, সিরাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ সফিয়ুল্লাহ্, প্রমুখ পঞ্চাশ দশকের প্রধান তরুণ কবি-সাহিত্যিক-লেখকগণ যাত্রিকের লেখক- সম্প্রদায়ের সদস্য ছিলেন। পত্রিকা সম্পর্কে সম্পাদকের (সম্পাদকদের আলীম-কবিরের) বন্ধু, সতীর্থ, বিশিষ্ট লেখক ডাঃ আহমদ রফিকের কাছ থেকে জানা যায় ঃ

'যেমন প্রগতিশীল রাজনীতিতে, তেমনি প্রগতি-সাহিত্যের চর্চায়ও আলীমের উৎসাহ ছিলো আন্তরিক। এই উভয়দিকেই তাঁর ঝোঁক ক্রমেই বাম-চেতনার দিকে প্রসারিত হতে থাকে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ ইউনিয়নের প্রকাশিত দ্বিতীয় ম্যাগাজিনটিতে সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর লেখাটিতেও এই আভাস মেলে।' যাত্রিক সম্পর্কে তিনি লিখেছেন ঃ 'সেকালে ঢাকায় সাহিত্য পত্রিকার সংখ্যা ছিলো নিতান্ত কম। এর মধ্যে মেডিকেল-ছাত্রদের হাত দিয়েই দুই-দুইটি সাহিত্য মাসিক প্রকাশিত হয়। আমাদের সহপাঠী মঈদুর রহমানের 'খাপছাড়া' আর কবির- আলীমের 'যাত্রিক'। কিন্তু 'খাপছাড়া'র তুলনায় 'যাত্রিক' ছিলো পুরোপুরি প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রসারে নিবেদিত। 'যাত্রিক' এর প্রতিটি সংখ্যার লেখা বিচারে একথার প্রমাণ মিলবে। সেই সঙ্গে আরো প্রমাণ মিলবে রাজনীতি ও সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে তাঁর চেতনার গুণগত উত্তরনের। তাই একসময়ের ছাত্রলীগ ঘেঁষা আলীম তাঁর যাত্রিকে— স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে পেরেছেন যোশেফ স্তালিনের মৃত্যু উপলক্ষে কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা। সম্পাদকীয় লিখেছেন 'স্টালিনের মৃত্যু নেই' ... ছেপেছেন স্টালিনের পূর্ণ-পৃষ্ঠা ছবি। মুসলিম লীগের স্বৈরতন্ত্রী শাসনে এই প্রত্যেকটি কাজ ছিলো রীতিমতো ঝুঁকির, এমনকি বিপজ্জনকও বটে। ... 'যাত্রিক' প্রকাশের তাড়নায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন আলীম, সঙ্গে ছিলেন আহমদ কবীর —— পত্রিকা বেরোবে, কবে বেরোবে, এই সব নিয়ে দিনের পর দিন কতই না হিসাব-নিকাশ..... যোগ দিয়েছে জহির রায়হান....... সে তখন সবে লেখায় হাত দিয়েছে। ছটফটে অস্থির প্রকৃতির জহীরের তখন সাংবাদিক-সাহিত্যিক হওয়ার স্বপ্ন। এই জহীর যাত্রিকের প্রকাশনায় যথেষ্ট সাহায্য করেছে। শুধু লেখা দিয়ে নয়, মূলত কাজকর্মের মাধ্যমেই। পরবর্তীকালে জহীর 'প্রবাহ' নামে একটি সাময়িকী প্রকাশ করেছিলো। সম্পাদক ছিলেন কবি আহসান হাবীব।

যাত্রিক প্রকাশের পরিকল্পনা, লেখা সংগ্রহ, ছাপার সমস্যা, অর্থনৈতিক সাচ্ছন্দ্য, এইসব নিয়ে সারাক্ষণ আলীমের মগ্নতা দেখে মনে হয়েছে .... যাত্রিক বুঝি তাঁর মানসসন্তান। ..... প্রকাশনায় সরফুল আলম। সব মিলে যেন একটা যৌথ সংসারের কাজ। উদ্দেশ্য, কাগজটির মান ধরে রাখা, সেই সঙ্গে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখতে চেষ্টা করা। নর্থব্রুক হল রোডের রেনেসাঁস প্রিন্টার্স থেকে ছাপা এই কাগজটির জন্য ছাপাখানার মালিক জাকিউল্লাহও (ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ছেলে) কম পরিশ্রম করেনি, অবশ্য আমাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কারণে। মনে পড়ে সদ্য ছাপা 'যাত্রিক' এর প্রথম সংখ্যার (পৌষ ১৩৫৯) কয়েকটা কপি হাতে নিয়ে খুশিতে উচ্ছকিত আলীম যখন ব্যারাকে এসে পৌঁছলো, তখন সেই কাগজের কাঁচা গন্ধ নাকে টেনে আমাদেরও খুশির শেষ ছিলোনা। ছাত্র জীবনে, বিশেষ করে চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতো জটিল ও শ্রমসাধ্য বিষয়ের ছাত্র হয়ে সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ তখনকার জন্য যেমন বিরল ঘটনা, তেমনি গর্বেরও বিষয়। অর্থনৈতিক ঝুঁকি যেমন ছিলো, তেমনি ছিলো পড়াশোনায় ক্ষতির ভয়। সব ঝুঁকি, সব ভয় হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে মনে হয় সাহিত্য চর্চার জাদুকরী টানে আলীম এই দায়িত্ব নির্দ্বিধায় কাঁধে তুলে নিয়েছিলো। আর সাহিত্য অঙ্গনে 'যাত্রিক' সেসময় মোটামুটি ভালোই নাম কিনেছিলো। যাত্রিক প্রকাশনার মধ্য দিয়ে একটি বিষয় বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো ; আর তা হলো সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আলীমের বিশ্বস্ততা। দেখা গেল, এদিক থেকে অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছে আলীম। পরবর্তী সময়ে এই বিশ্বাস আরো সুনির্দিষ্ট, আরো দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে। 'যাত্রিক'-এর সংখ্যাগুলো মিলিয়ে দেখলে এসত্য বোঝা যাবে।'[৫০]

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার 'চলতি সাহিত্য' বিভাগে মুসলমানী বাঙলা সাহিত্য বনাম হিন্দু বাঙলা সাহিত্যের আলোচনার ধারায় এটা স্পষ্ট হয় যে, বাঙলা ও বাঙালিদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা কেবল লেখা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সম্পাদকগণ ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেননি, সজ্ঞানে তাঁরা এবিষয়ে মতামত জ্ঞাপন করে সাহিত্যের আদর্শ প্রচারে ছিলেন অকুণ্ঠ। " ... তাই যে সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে তা আকার-বিহীন, পানীয় পদার্থের মত। জাতীয় কৃষ্টি এবং সভ্যতাকে ফুটিয়ে তোলার মূলে যে সাহিত্য,—সভ্যতার মাপকাঠি যে সাহিত্য, তা সাহিত্য-পিপাসুদের দিনে দিনে শংকিত করে তুলছে। পূর্ববাঙলার সাহিত্য যে বাঙলাভাষার উপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে, একথা অনস্বীকার্য ..... সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সবারই স্থান এক ..... বিনা প্রয়োজনে ধার করা শব্দ ব্যবহারের উদ্ভট পরিকল্পনা জনসাধারণের বিরক্তিরই উদ্রেক করবে। ..... বাঙলা সাহিত্য যে মহান গৌরব বহন করছে, তাকে অক্ষুন্ন রাখার দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের। সাহিত্যে সংকট সৃষ্টির উদ্ভট খেয়াল পরিত্যাগ করে গঠনমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করাই হবে প্রত্যেক সৎবুদ্ধিপরায়ণ সাহিত্যিকের প্রধান কর্তব্য। যে সাহিত্য আমাদের প্রেরণা যুগিয়ে আসছে এতকাল, সেই বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন ভাবধারার প্রবর্তন করে একে, রূপে-রসে-গন্ধে অতুলনীয় করে গড়ে তুলবার দায়িত্ব আমাদেরই। সে দায়িত্ব পালন করার জন্য আজ এগিয়ে আসতে হবে সমস্ত সাহিত্যদরদীদের।"[৫১]

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যাতে নিম্নোক্ত লেখকদের রচনা ছিল—

প্রবন্ধ ঃ সৈয়দ নুরুদ্দীন — পাকিস্তানের জাতীয় মুখশ্রী
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী — কাব্যে চলিত ভাষা
কাজী মোতাহার হোসেন—নজরুল কাব্য পরিচিতি
মাস্তানা— ভারতীয় নৃত্যের আদিকথা

গল্প ঃ বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর — পটভূমি
আনিস চৌধুরী — পরিক্রমা
জিগমেন্ট মরিজ — হাসি (অনুবাদ ঃ আজিজুল হক)

Dhaka University Institutional Repository

কবিতা ঃ শামসুর রাহমান — রূপালি স্নান
আশরাফ সিদ্দিকী — একটি কি দুটি পাখি
আবদুল গনি হাজারী — কি বুনছো
হাসান হাফিজুর রহমান— উদার চরিতনামাকে

এছাড়া সংগ্রহ; চলিত সাহিত্য ; গ্রন্থ-পরিচয় ; খেলাধূলা ; মঞ্চ ; সম্পাদকীয় প্রভৃতি বিভাগ ছিল মাসিক পত্রিকার ন্যায়। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'সংগ্রহ' বিভাগে শ্রেষ্ঠ কথামালা জড়ো করেছেন। চলতি বিভাগে বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্য বিষয়ে তখনকার প্রধান বিতর্কিত বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। আহসান হাবীব প্রণীত 'রাত্রিশেষ' কাব্যগ্রন্থের আলোচনা করেছেন আবদুল গাফফার চৌধুরী এবং Military and Political Consequences of Atomic Energy' গ্রন্থের আলোচনা করেছেন আবদুল্লাহ আল মুতী।'পাক-ক্রিকেট দলের ভারত সফর' শিরোনামে 'খেলাধূলা'র খবর পর্যালোচনা করেছেন জামালুদ্দিন। জহির রায়হান ২৮ ডিসেম্বর ১৯৫২তে কার্জন হলে অভিনীত 'নার্সিংহোম' শীর্ষক নাটকের মঞ্চায়নের সাফল্য-ব্যর্থতার আলোচনা করেছেন এবং 'পাট' নিয়ে পূর্ববাঙলার কৃষকদের স্পর্শকাতর ইস্যুর আলোচনা হয়েছে সাম্পাদকীয় বিভাগে। সকল গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা, সমালোচনা—বিষয়,বক্তব্য ও ভাষা-সৌন্দর্যে হৃদয়গ্রাহী, পঠনোপযোগী উন্নতমানের সাহিত্য-পত্রিকার মর্যাদার অধিকারী। অন্য দুটি সংখ্যায় (২ ও ৩) কাজী মোতাহার হোসেনের 'নজরুল কাব্য পরিচিতি' শীর্ষক প্রবন্ধের বাকী অংশ প্রকাশ অব্যাহত থাকে। কাজী ফজলুর রহমান লেখেন— 'সমালোচনা প্রসঙ্গে' (১/২)। মুজতবা নকীবুল্লাহ— 'ইউরোপীয় জীপ্সী' (১/২) ; এবনে গোলাম সামাদ - 'জীববিজ্ঞানীর দর্শন' (১/২) ; মাস্তানা - 'ভারতীয় নৃত্যে অভিনয় ও মুদ্রার ভাষা' (১/২-৩) ; মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহ— 'ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে অর্থনৈতিক বাজেট' (১/৩) ; এবং রফিক আহমদ (আহমদ রফিক?) — 'যোশেফ স্টালিন' (১/৩)। শ্রী তামস রঞ্জন রায় প্রণীত 'অপরাধ প্রবণতার সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পুণর্মুদ্রিত হয় (কোথা থেকে, তা উল্লেখ নেই) দ্বিতীয় সংখ্যায়। পরের (১/৩) সংখ্যায় সুধীর রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'লণ্ডন রঙ্গমঞ্চ' শীর্ষক রচনা প্রকাশিত হয়। গল্প লেখেন ; আলাউদ্দীন আল আজাদ (ছায়া মৃগ ১/২) ; জহির রায়হান (হারানো বলয় ১/২) ; আহমদ কবির (নোনা ১/২) ; সিরাজুল ইসলাম (কয়েকটি লালুফুল, ১/৩) ; আনিস চৌধুরী (রঙ ১/৩) এবং মোপাসার গল্প 'উইল' অনুবাদ করেন জিয়াউদ্দীন আহমদ। কবিতার রচয়িতা ঃ ফজলে লোহানী (গলি ১/২) ; আবদুর রশীদ (অবাঞ্চিত ১/২) ; দিলদার চৌধুরী (শবযাত্রা ১/২) ; আহমদ রফিক (কমরেড স্টালিন ১/৩) ; জামালুদ্দীন (একটি মহৎ স্মরণ ১/৩) এবং আলাউদ্দীন আল আজাদ (জলরং ১/৩) প্রমুখ। নিয়মিত বিভাগে চলতি সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 'মঞ্চ' (১/২) ও 'চলচ্চিত্র' (১/৩) বিষয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে তপতী মিত্র এবং জহির রায়হান। 'গ্রন্থপরিচয়' দেন আনিস চৌধুরী। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সিগনেট বুক্স প্রকাশিত টেনেসী উইলিয়ামস্ এর এ স্ট্রীট কারণেমড্ ডিজ্যায়ার (১/২) ; এবং আবদুল গনি হাজারী সরদার জয়েন উদ্দিন প্রণীত 'নয়ান ঢুলি' শীর্ষক গল্পের বইয়ের আলোচনা করেন। আনিসুজ্জামান (প্রফেসর) যে তরুণ বয়সে গান লিখতেন তা যাত্রিকের পাতা আজ সাক্ষী দিচ্ছে। প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় তিনি 'নতুন শপথের গান' লেখন— যার মূল সুর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র মোতাবেক সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকারে দৃঢ় উচ্চকিত। পূর্ববাঙলার প্রগতিশীল সংস্কৃতির অগ্রগামী সৈনিক, তরুণ আনিসুজ্জামানের এই গানে বিপ্লবের প্রেরণা মূর্ত—'সাম্যবাদী আর শান্তিকামী সব মানুষের সাথে/ মানুষের গান, জীবনের গান, গাইবো যে এক সাথে।" এতে সুর সংযোজন পূর্বক স্বরলিপি তৈরী করেন আবদুর রশীদ।

উপরোক্ত গানটিতে শুধু নয়, গোটা পত্রিকার সমস্ত লেখার মূল সুরই মার্কসীয় ধ্যান-ধারণায় পুষ্ট। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, সমালোচনা, সম্পাদকীয় ও সঙ্গীতে 'কঠিন মাটির বুক চিরে ফের ফসল জন্ম' দিয়ে 'কৃষকের ক্লান্তি, শ্রমিকের শ্রান্তি' দূর করবার এবং দেশে 'নব পরিবেশ/ নতুন জীবন-স্রোত' আনবার, 'শান্তির গান' গাওয়ার প্রত্যয়-শপথের অঙ্গীকার দৃঢ়ভাবে অভিব্যক্ত ও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ঝরঝরে ছাপা, পরিচ্ছন্ন- সম্পাদনা পত্রিকার মানকে প্রতিষ্ঠিত করেনি কেবল, সম্পাদকদের কাঙ্ক্ষিত সমাজ-ভাবনা, সাহিত্য-চিন্তা ও লালিত সংস্কৃতির স্বরূপ পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছে। পত্রিকাটি দীর্ঘদিন প্রকাশিত হতে পারলে অসাম্প্রদায়িক, শোষণ-মুক্ত, সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত সাহিত্যাদর্শ ও সাংস্কৃতিক রুচি-বিনির্মাণে অধিকতর সক্ষম হতো।

যাত্রিকের সাহিত্য চিন্তা গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ— সমালোচনা প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তখনকার উদীয়মান যুবসমাজের বামপন্থী অংশের লেখকেরা এর সুচী দখল করেছিলেন। অতএব পরবর্তীকালে যাঁরা বাঙলাদেশের সাহিত্য সমাজের রথী-মহারথী হয়েছেন, তাঁদেরই আত্মপ্রকাশের মাধ্যমরূপে যাত্রিক আবির্ভূত হয়েছিল। এতে যে চারিত্র-আদর্শ ফুটে উঠেছে— তৎকালের অধিকাংশ সাহিত্য-পত্রিকাই তা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন 'নজরুলের কাব্য পরিচিতি' প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে নবীনদের জেগে ওঠার জন্য 'ডাক' দিয়েছেন। প্রবন্ধকার লক্ষ্য করেছিলেন নজরুল-কাব্যে প্রধানভাবে পরিস্ফুট হয়েছে 'বঞ্চিত মানবতার উদ্ধারের জন্য .... (উদাত্ত) আহবান। এখানে হিন্দু মুসলমানের প্রশ্ন নাই'। নজরুল-কাব্যে তিনি লক্ষ্য করেছেন সংগ্রামের জন্য জেগে ওঠার আহ্বানের প্রবলতা এবং 'বেপরোয়া যৌবনের সাহসিকতা ও উদ্দামতা'। তিনি লিখেছেন ঃ কবি নজরুল তরুণ-তরুণী "সবাইকে ডাকছেন, আর বলছেন, সব বাধা ঠেলে অগ্রসর হতে হবে, বীরের মত বসুন্ধরার রত্নসম্ভার লুটে নিয়ে ভোগ করতে হবে ; আর শ্রমমহান বিচিত্র সুন্দর জগৎ সৃষ্টি করতে হবে। অতীতের জন্য আফসোস করে লাভ নেই।... যাকরে তখত তাউস/ জাগরে জাগ বেহুশ।" রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রামের পরে ১৯৫২ সনের নভেম্বর- ডিসেম্বর মাসে প্রণীত এবং ১৯৫৩ র জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত যাত্রিকের নজরুল প্রসঙ্গের আলোচনায় তরুণ-সমাজকে জাগরণ-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ। একুশের প্রথম সংকলন হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' (মার্চ, ১৯৫৩) প্রকাশের আগেই একুশের ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিতে প্রথম শ্রেণীর গল্প 'ছায়ামৃগ' প্রণয়ন করেছিলেন আলাউদ্দীন আল্ আজাদ। জহির রায়হানও 'হারানো বলয়' লিখেছিলেন—, যার একটি নারী-চরিত্র 'আপত্তিকর প্রচারপত্র' বিলি করার অপরাধে

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশের হাতে বন্দী হয়েছিল। অপরাপর লেখাগুলোতেও একুশে ফেব্রুয়ারীর রাষ্ট্র-ভাষা আন্দোলন এবং পুলিশী হত্যাকাণ্ডের প্রভাব স্পষ্ট। বাঙলাদেশের সাহিত্যে একুশে ফেব্রুয়ারীর চেতনার বা প্রভাবের ইতিহাস খুঁজতে গেলে যাত্রিকের রচনাগুলোর মূল্য পূর্বেই স্বীকার করে নিতে হবে। সাহিত্যের অগ্রগতিতে উন্নতমানের সমালোচনার গুরুত্ব অপরিসীম এবং সাহিত্যের অবনতি বা উন্নতির সহায়ক বা অন্তরায় যে সমালোচনা –সাহিত্যের কারণেই তা কাজী ফজলুর রহমানের 'সমালোচনা প্রসঙ্গে' (১ বর্ষ, ২ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৯) শীর্ষক প্রবন্ধে যুক্তিগ্রাহ্য ভাষায় আলোচিত হয়েছে— যার তাৎপর্য আজও পূর্ববাঙলার সাহিত্যজগতে অফুরন্ত। লেখক সমালোচনার ব্যাকরণ, প্রকরণ ও প্রচলনগত অর্থ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে, আমাদের সমালোচনা-সাহিত্য যে অবক্ষয়কবলিত হয়ে পড়েছে— তা নির্দ্বিধায় উপস্থাপন করেছেন। পিছনের ঐতিহাসিক সূত্র টেনে তিনি বলেন ঃ

"গত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ (অর্থাৎ বিশ শতকের গোড়া থেকেই) সমালোচনা সাহিত্যের মান বিশেষ উন্নত হয়নি।" অথচ "সমালোচনাও সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একে অন্যান্য সাহিত্যরূপ হতে বিশেষ পৃথক করে দেখা চলেনা। সাহিত্যের সামগ্রিক উন্নতির জন্য সমালোচনা-সাহিত্যের মানউন্নয়ন অপরিহার্য।" লেখক লক্ষ্য করেন, উন্নতমানের সমালোচনার অভাবেই সাহিত্যের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সাধিত হচ্ছেনা। কারণ, "প্রথম শ্রেণীর সমালোচনা-সাহিত্যের অভাব সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতির গতিকে মন্থর করেছে। সুষ্ঠু সমালোচনা-সাহিত্য যদি সাহিত্যের অন্যান্য শাখার পাশাপাশি গড়ে উঠত, তবে নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যকর প্রভাব সাহিত্যের অন্যান্য শাখাকে সমৃদ্ধতর করত। আর সমালোচনা যখন সাহিত্যেরই একটা বিশিষ্ট অঙ্গ তখন সার্থক সমালোচনাকে অবশ্যই সার্থক সাহিত্য হতে হবে। তা না-হলে কোন আলোচনাই যথার্থ অর্থে সাহিত্য-সমালোচনার মর্যাদা পেতে পারেনা। তাই আলোচকের প্রাথমিক লক্ষ্য হতে হবে তার লেখা যেন সাহিত্য-পদবাচ্য হতে পারে। তারপর দেখতে হবে তা যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ কিনা।"

নিরপেক্ষ সমালোচনার অসীম গুরুত্ব প্রদানে লেখক সমকালীন সাহিত্য-পরিস্থিতিতে আশু-পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সাহিত্য-জগতে যাত্রিকের সমকক্ষ চিন্তাধারার পরিচয় ক্বচিৎ মেলে। পূর্ব বাঙলার তৎকালীন অধঃগামী সাহিত্য-পরিস্থিতিতে সাহিত্যের সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্যে এঁদের সাহিত্য-ভাবনা ছিল যুগোপযোগী। যাকে বলে কালের দাবীর পরিপূরক—তাই। গতানুগতিক সাহিত্যের ঐতিহ্য নিয়ে বিতর্কের চর্বিত চর্বণ তাঁদের রুচিকে বিস্বাদিত করে তুলেছিল। তাই রুচির গঠনের জন্য উপযুক্ত স্রষ্টার তথা সমালোচকের আবির্ভাব কামনা করেছে যাত্রিক। কারণ, 'সমালোচক পাঠকের রুচিবোধকে উন্নত করবেন.... দরদের সাথে তার সাংস্কৃতিক বিকাশের সহায়তা" করবেন। লেখক তাঁর সমকালের সমালোচক সম্প্রদায়কে কটাক্ষ করে লিখেছেন ঃ "(সমালোচকদের) আজ আত্মজিজ্ঞাসার দিন এসেছে, তাঁরা তাঁদের গুরু-দায়িত্ব যথাযথ বহন করতে সক্ষম হচ্ছেন কিনা। তাঁদের নিজেদেরই প্রমাণ করতে হবে যে, সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁরা অবাঞ্চনীয় আগন্তুক নন। তাঁদের দেখাতে হবে যে, "ব্যর্থ লেখকই হন সমালোচক" এই কথাটা ভুল। আজ তাই সমালোচকদের এক নতুন ধরনের সমালোচনায় হাত দিতে হবে, — তা হচ্ছে 'সমালোচনা - সাহিত্যেরই' সমালোচনা।"[৫২]

'চলতি সাহিত্য' এবং পুস্তক-সমালোচনায় যাত্রিকের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় লক্ষণীয়। 'দ্যুতি' (অগ্রহায়ণ ১৩৫৯) পত্রিকায় প্রকাশিত আবদুর রশীদ খানের 'পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক কাব্য সাহিত্য' এবং 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় (কার্তিক ১৩৫৯) মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রণীত 'বাঙলা ভাষায় আরবী ফারসী শব্দ' শীর্ষক প্রবন্ধসমূহের আলোচনা করে পূর্ব বাঙলার সার্বিক সাহিত্যিক অগ্রগতির প্রতিবন্ধক রূপে এগুলো যে বিশেষ উদ্দেশ্যবাদী, ভ্রান্ত বক্তব্যপূর্ণ, অন্তঃসারশূন্য আলোচনা তা বোঝাতে পত্রিকা যত্নশীল হয়েছে। আবদুর রশীদ খান সাম্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে একই দৃষ্টিতে 'দুই অসুর' রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। 'যাত্রিক' এর প্রতিবাদ করে লিখেছে ঃ "শোষণকে বিলুপ্ত করার জন্য যে সাম্যবাদের সৃষ্টি, গরীবকে ধনীর রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি দিতে যে সাম্যবাদের সৃষ্টি—তাকেই লেখক সজ্ঞানে শোষক-শ্রেণীভুক্ত করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন।" প্রসঙ্গত যাত্রিক-এর মন্তব্য ঃ "সাম্যবাদ বাতিল করে কোন 'বাদে' দেশের অর্থনৈতিক অচলাবস্থাকে দূর করতে পারবে তার কোন ঈঙ্গিত রশীদ খানের প্রবন্ধে নেই। শুধু এক্ষেত্রে নয়, সাহিত্যের আসরেও নানারকম সংকট এবং বিপন্নবাদের ধূয়া তুলে এরা পাঠক-সাধারণকে বিভ্রান্ত করছেন।"[৫৩]

কবিতাগুলোতেও শ্রমজীবী মানুষদের সপক্ষে (ফজলে লোহানী, গলি, ১/২); পথের ধূলায় নিষ্পেশিত মানবতার জয়গানে (আবদুর রশীদ, অবাঞ্ছিত, ১/২); 'মৌন পূর্ববাঙলা'কে সবাক করার লক্ষ্যে (দিলদার চৌধুরী, শবযাত্রা ১/২) কবিরা শব্দ চয়নে তৎপর হয়েছেন। আলাউদ্দীন আল আজাদ 'জলরং' কবিতায় লিখেছেন 'নগর বাসীরা /জ্বলুক এবার/ লাল টুকটুক/ আগুনের রং/ তোমাদের মুখে।" [৫৪] কমরেড স্টালিনের (জঃ ২১ ডিসেম্বর ১৮৭৯ — মৃঃ ৫ মার্চ ১৯৫৩) মৃত্যুর পরে প্রকাশিত যাত্রিকের (প্রথম বর্ষ) তৃতীয় সংখ্যায় রফিক আহমদ (?) 'যোশেফ স্টালিন' শীর্ষক প্রবন্ধে সমাজতন্ত্র, রাশিয়ার অভ্যুত্থান ও স্টালিনের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করেন। আহমদ রফিক 'কমরেড স্টালিন' নামে কবিতা লেখেন। (রফিক আহমদ ও আহমদ রফিক একই ব্যক্তি। একটি স্বনামে, অন্যটি বেনামীতে প্রকাশ করা হয় একই লেখক বারবার উপস্থাপন করলে একঘেয়েমী আসতে পারে বিবেচনায়।) 'স্টালিনের মৃত্যু নেই' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে স্পষ্টতই বলা হয় 'স্টালিন অমর', অর্থাৎ তাঁর আদর্শ সমাজতন্ত্রও অমর। এই দৃষ্টিতে 'এ স্ট্রীট কার নেমড ডিজায়ার' এর সমালোচনা প্রসঙ্গে আনিস চৌধুরীর ক্ষোভ ঃ ঐ বইয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আলোচনা এবং অবক্ষয়কবলিত জনসমাজের প্রকৃত চিত্র নেই। দেশ বিভাগের ফলে অবিভাজ্য বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্যকে "ভিনদেশী বলে আখ্যায়িত করবো কোন বিদ্বেষ নিয়ে?" —ঐতিহ্য সম্পর্কে যাত্রিকের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এই রকম।

সংস্কৃতি-ভাবনায়ও 'যাত্রিক' তাঁদের প্রদর্শিত সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির মতোই বাঙালিয়ানা তথা ভারতীয় শিল্প-কলার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন 'ভারতীয় নৃত্যে অভিনয় ও মুদ্রার ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে , 'মঞ্চ' বিভাগে তপতী মিত্রের মঞ্চ ও নাটক সংক্রান্ত আলোচনাগুলোতে 'সংস্কৃতি সংসদ' কর্তৃক প্রযোজিত 'পথিক' ; কৃষ্টিসংঘের 'পোষ্যপুত্র'; বিজন ভট্টাচার্যের 'অবরোধ' শীর্ষক নাটকের মঞ্চায়নের উপর সমালোচনাকালে পত্রিকার উচ্চ-সংস্কৃতিবোধ প্রকটিত হয়েছে। ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাতেও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার বিশেষ পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। 'ইউরোপীয় জীপসী' প্রবন্ধে মুজতবা নকীবুল্লাহ বলেন ঃ "ইউরোপীয় জীপসীরা ইজিপসীয়ান, তাতার বা বহেমিয়ান নয়। বরং তাহারা নিম্নশ্রেণীভুক্ত ভারতীয় হিন্দু যাহারা

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ শতাব্দীর পরে কোনও কারণবশত ভারত ত্যাগ করিয়া যাযাবরের ন্যায় নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে চতুর্দশ শতাব্দীতে বলকানে উপস্থিত হয় এবং উক্ত স্থান হইতে সারা ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে।" বিজ্ঞান-চিন্তাও যাত্রিক করেছে ; এবনে গোলাম সামাদ— 'জীব বিজ্ঞানীর দর্শন' শীর্ষক প্রবন্ধে আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনায় জ্ঞানগত উৎকর্ষের পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন।

সমাজ-ভাবনায় 'যাত্রিক' সামাজিক-সমস্যার কারণ অনুসন্ধানে সমস্যার গভীরে যেতে চেয়েছিল। ফরাসী-বিপ্লবোত্তর পৃথিবী শ্রেণী-সংগ্রামের পরিণতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। 'Haves and Haves not দের বিশ্বে অপরাধপ্রবণতাও বৃদ্ধি পায়। এই প্রেক্ষিতে 'প্রোব্লেম চাইল্ড'দের কথা আলোচনা করা হয়। এতে সমাজ-ভাবনায় যাত্রিকের ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। "কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা-সংস্কৃতির সংজ্ঞা এবং কেন্দ্রও যেমন পরিবর্তিত হচ্ছে, মানবের ভবিষ্যত বিকাশ এবং সম্ভাবনা সম্বন্ধেও শিক্ষাজগতে নূতন আশার বাণী উচ্চারিত হচ্ছে। বর্তমান মানব-কেন্দ্রিক সভ্যতা এবং শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষার যুগে অপরাধপ্রবণ ডেলিন্‌-কুয়েন্টদের সম্বন্ধেও তাই নূতন মত ও পথের সন্ধান মিলছে।...... (অপরাধ প্রবণ শিশুরা) অনুকূল পরিবেশে বর্ধিত হলে, যথোপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ করলে এদের অধিকাংশেরই জীবন-স্রোত সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতো।" রুশ দেশের উদাহরণ দিয়ে লেখক দেখাতে চেয়েছেন অর্থনৈতিক সমস্যাই কেবল অপরাধ-প্রবণতার কারণ নয়, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যারূপে এটাকে বিবেচনা করতে হবে। কারণ যেসমস্ত উচ্ছৃঙ্খল যুবক-যুবতী নিজেদের নষ্ট করে তারা কেবল নিজের শক্তি ও সম্ভাবনাই নষ্ট করেনা— এটা জাতীয় সম্পদেরই অপচয়। এই ধরণের বক্তব্য প্রকারান্তরে পাঠকদের স্ব-সমাজের প্রতি তাকাতে উদ্বুদ্ধ করে থাকবে। যাত্রিক এর রচয়িতারও সেই বক্তব্য ঃ "এদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও নূতন প্রেরণা নিয়ে এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করে অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের মত সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হবেন এবং এক বিরাট অপচয়ের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করে নিজেরা কৃতার্থ হবেন, জাতিকেও সমৃদ্ধ করবেন।"[৫৫]

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ভাবনায় যাত্রিকের স্পষ্ট মতামত দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় তাঁদের পক্ষ ও বিপক্ষ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ারের ফরমোজা থেকে মার্কিন সপ্তম নৌবহর প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে সমালোচনা করে যাত্রিক লিখেছে : "মুখে —— যতই শান্তির বুলি আওড়াক না কেন, এদের যুদ্ধ-লিপ্সা (আমেরিকার) যে ক্রমেই বেড়ে চলেছে তা আজ সবার কাছেই স্পষ্ট। এরা চায় যুদ্ধকে জীইয়ে রেখে এশিয়ার বুকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে কায়েম রাখতে ..... এশিয়াতে এরা সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য যে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে তা আজ উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়েছে। শান্তির মুখোশ পরা যুদ্ধবাজদের প্রকৃত স্বরূপ যতই প্রকাশ পাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জনমতও ততই দিন দিন দানা বেঁধে উঠছে।"[৫৬]

নেহেরুর "যুদ্ধ নয়' ঘোষণার প্রেক্ষিতে দেশের রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা নিয়ে যাত্রিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ভেবেছে আন্তরিকভাবে। 'পাক-ভারত মৈত্রী'র আবশ্যকতার পক্ষে মত দিয়েও যাত্রিক বলেছে নেহেরুর 'যুদ্ধ নয়' ঘোষণার প্রস্তাবটি আন্তরিকভাবে সমর্থন করা যায় না। কারণ দেশে বিরাজমান পাঞ্জাবের খালের পানি সমস্যা, বাস্তুত্যাগীদের সম্পত্তি-বন্টনের মতো নানা সমস্যা জীবন্ত রেখে মৈত্রী চুক্তি আন্তরিক প্রমাণিত হয়না। বস্তুতঃ গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, কাশ্মীর সমস্যাই মূলতঃ অন্যান্য সমস্যাগুলিকে জীইয়ে রেখেছে। নেহেরু-সরকার কাশ্মীর-সমস্যাকে সবিশেষ গুরুত্ব না-দিয়ে 'এড়িয়ে চলা' নীতি গ্রহণ করেছেন। তবে এই পরিস্থিতি কোনো দেশের জন্যেই মঙ্গলকর হবেনা। "সংকটাপন্ন রাষ্ট্র দুটিকে যুদ্ধ আরও ভয়াবহ সংকটের মুখে টেনে নিয়ে যাবে। আর তারই সুযোগ গ্রহণ করে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো রাজনৈতিক দাবাখেলার ঘুঁটি হিসেবে আমাদের ব্যবহার করুক—এটা আমাদের কাম্য নয়।" কালে দেখা যায় কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে যাত্রিকের ভবিষ্যতবাণী যথার্থ ফলেছিল ঃ "পাক-ভারতের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করে যে স্নায়ুযুদ্ধ বর্তমানে চলছে, অদূর ভবিষ্যতে তার বহিঃপ্রকাশ কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়।..... ভারত সরকার যদি হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে আন্তরিকতার সঙ্গে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানকল্পে আপোষমূলক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসেন, তবেই স্নায়ু-যুদ্ধের মূল অবসান হবে এবং একমাত্র তখনই নেহেরুর 'যুদ্ধ নয়' ঘোষণা দু' দেশের শান্তি-পিপাসু নাগরিকদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় সাফল্যমণ্ডিত হবে।"[৫৭]

দেশের কৃষি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি সব ব্যাপারেই 'যাত্রিক' উচ্চকণ্ঠ ছিল এবং মতামতের মধ্যে বৈদগ্ধ ও পরিপক্কতা ছিল। পূর্ববাঙলা পাটচাষের প্রধান উর্বর ক্ষেত্র হলেও ১৯৫২ পর্যন্ত দেশে পাটকল পর্যাপ্ত সংখ্যায় গড়ে ওঠেনি; এবং কৃষকদের পাটের ন্যায্যমূল্য পাবার কোনো ব্যবস্থাও নতুন দেশের সরকার করতে পারেনি। অবিভক্ত বঙ্গের সরকারও ঔপনিবেশিক-আমলে কৃষকদের জন্য পাটের নিশ্চিত, নির্ধারিত ন্যায্য-মূল্যের ব্যবস্থা করতে পারেনি। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এ নিয়ে অনেক বাক্‌-বিতণ্ডা হয়েছে। কিন্তু কোনো ফল হয়নি তখন—প্রধানত পার্লামেন্টে কংগ্রেসদলীয় ও অন্যান্য দলের জমিদার-শ্রেণীর সদস্যরা কায়েমী-স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। সাতচল্লিশের পরে পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিদের হীন-স্বার্থে পাট ও কৃষিপণ্যের মূল্য ওঠেনি। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী ষড়যন্ত্রতো ছিলই। বঙ্গবিভক্ত হয়েছে, কিন্তু পূর্ববঙ্গের উৎপাদিত পাটের প্রক্রিয়াকরণ-এর কোনও ব্যবস্থাদি গৃহিত হয়নি ঃ —এই প্রসঙ্গে 'যাত্রিক' এর পৌষ ১৩৫৯, ডিসেম্বর ১৯৫২ সংখ্যার সম্পাদকীয়-তে মন্তব্য করা হয় ঃ "পাটের বাজারে মন্দাবস্থা দেখেই আজ পূর্ববাঙলায় কয়টি চটকল আছে, তার হিসাবের প্রশ্ন উঠেছে। নিজের জমিতে পাট তৈরী করে, সে-পাট বিক্রি করবার জন্য অপরাপর রাষ্ট্রের তোয়াজ করার নীতি আমরা তখনই পরিহার করতে পারবো, যখন আমাদের দেশের মাটিতে পাটকে ফৈনিসড গুডস হিসাবে তৈরী করবার মত যথেষ্ট চটকল আমাদের থাকবে। সরকার এ সম্বন্ধে যত শীঘ্র অবহিত হন ততই দেশের এবং দশের মঙ্গল।" পাটের মূল্য কমে যাওয়ার প্রেক্ষিতে জনগণের স্বার্থ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে খুব কম পত্রিকাই। যাঁদের শ্রেণীগত অবস্থান এবং চিন্তাধারায় জনগণ আছে, তাঁরাই এই ধরনের চিন্তা করতে পারেন। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৫৩-৫৪ সনের বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। অর্থমন্ত্রী আশা করেন যে নূতন ট্যাক্স বসিয়ে ঘাটতির পরিমাণ পূরণ করেও উক্ত বাজেটে ১৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত দেখানো যাবে। এই পরিস্থিতিতে যাত্রিকের সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয় ঃ "দেশসমূহ অর্থনৈতিক সংকটের মুখে চলছে। বৈদেশিক বাণিজ্যে আমাদের লোকসান হয়েছে প্রচুর। পাটের বাজার

Dhaka University Institutional Repository

মন্দা। কাজেই বাজেটে বিপুল পরিমাণ ঘাটতিতে আমরা শঙ্কিত হইনি ; সরকারের বর্তমান অর্থনীতির দিকে চোখ ফেরালে বরং এরকম অবস্থাই অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হতে বাধ্য।"

কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী অর্থনৈতিক সংকটের কথা বলে ব্যয়-সংকোচের পরামর্শ দিলে তার জবাবে যাত্রিক বলে ঃ "এবারকার বাজেটে দেশরক্ষা বাবদ বরাদ্দ হয়েছে ৬০ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। পূর্বেকার তুলনায় এই বরাদ্দের পরিমাণ ৫৯ লক্ষ টাকা বেশী। দেশরক্ষা দফতরের গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করতে চাইনা। কিন্তু তাতে করে দেশের অত্যাবশ্যকীয় খাতে নির্দয় হস্তে ব্যয় কমিয়ে দিতে হবে, এটা কিভাবে যুক্তিগ্রাহ্য? শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে কেন্দ্রীয় সরকার যে ২ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন তাকে বরাদ্দ না বলে দান বললেও অত্যুক্তি হয়না। রাষ্ট্র শিল্পায়নের খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ১২ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা মাত্র।" বাজেট সম্পর্কে আলোচনার শেষে মন্তব্য ঃ "দেশের জনসাধারণের স্বার্থ সর্বাগ্রে বিবেচিত হয়েছে যে বাজেটে সেটাই সর্বতোভাবে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু আলোচ্য বাজেট সে দিক দিয়ে হতাশাব্যঞ্জক। শিল্পপতিদের অধিকতর সুবিধা দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কর-জর্জরিত করার নীতি বৃটিশ আমলেই ছিল। এখনও দেখছি সে চেহারার পরিবর্তন হয়নি।"

চারদশক পূর্বে উচ্চারিত বা আলোচিত মত-মন্তব্য ও সাহিত্যে বিধৃত সমাজচিত্র আজও আকর্ষণীয় এবং মূল্যবান। এর সবই এখনও সহজে আগ্রহ সহকারে পঠনযোগ্য — এটাই এই পত্রিকাটির (যাত্রিক) সার্থকতা বা সাফল্য। কালের দাবি মিটিয়ে ভবিষ্যত- প্রজন্মের পাঠোপযোগিতা অর্জনের ভাগ্য কটি পত্রিকার হয়?

৮. স্পন্দন (১৯৫৩)

মার্কসীয় মতাদর্শে প্রভাবিত পত্রিকার তালিকায় 'স্পন্দন' এর অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা দরকার যে, ঘোষিত 'কমিউনিস্ট' ১৯৫৪ সনের পূর্বে পূর্ব বাঙলায় টিক্‌তে পারতো না। কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র প্রকাশের সুযোগও (প্রকাশ্যে) দেয়া হতোনা। সাহিত্য-বিষয়ক পত্রপত্রিকায় রাজনীতি করার অধিকারও সীমিত-নিয়ন্ত্রিত ছিল। প্রচ্ছন্নভাবে কমিউনিষ্টরা যে কাজ করতেন তাকেই মার্কসীয় মতাদর্শের বলে গণ্য করা হতো। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মতামত প্রচার করার সীমিত সুযোগের সেই স্বৈরশাসনের কালে 'স্পন্দন' স্পষ্টভাষণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে "পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র প্রগতিশীল পত্রিকা" রূপে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল "ঝিমিয়ে পড়া ম্লান বাঙলা সাহিত্যকে আবার রূপেরসে পূর্ণ উদ্ভাসিত করার ও বাঙলার মূক-বধির জনতার প্রাণে স্পন্দন জাগানো(র) একমাত্র লক্ষ্য" নিয়ে। তাঁদের ইচ্ছা ছিল 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেকটি জেলায় ও বড় বড় শহরে স্পন্দন বিক্রি' হবে এবং 'প্রচেষ্টা' ছিল— 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি ঘরে..... নিয়মিত ভাবে' স্পন্দন পৌছে দেবার। লক্ষ্যনীয় পূর্ববাঙলার সকল সাময়িকপত্রই এরূপ উচ্চাকাঙক্ষা ব্যক্ত করেই সামাজিক সাংস্কৃতিক 'সংকট' দূর করার কিংবা শূণ্যতা পূরণের জন্য আবির্ভূত হতো। প্রগতিশীল কোনো পত্রিকাই ধারাবাহিকভাবে নিয়মিত দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হতে পারেনি। কৃষ্টি, সীমান্ত, সংকেত, অগত্যা, মুক্‌তি, যাত্রিক, পরিচিতি সব বন্ধ অথবা অনিয়মিত-অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, ওদিকে মোহাম্মদী- সওগাত-মাহেনও-দিলরুবা-নওবাহার কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে চল্‌লেও সবধরণের কথা বিশেষত বাঙলা ও বাঙালীর দুঃখ-কষ্টের (বঞ্চনার) কথা অকপটে প্রকাশ করা যেতো না, প্রকাশ করা হতো না। অথবা পত্রিকার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী লেখকদেরকে আপোষ করে বলতে হতো। এই পরিস্থিতিতে ১৯৫৩র এপ্রিল-মে (বৈশাখ ১৩৬০ সনে) তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলা বিভাগের ছাত্র, বিশিষ্ট সাহিত্যসেবক মহিউদ্দিন আহমদ এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। রেজিস্ট্রেশন নম্বর (ডিএ ২৪৫) গ্রহণ পূর্বক নিয়মিত প্রকাশের সকল আয়োজন সম্পন্ন করে 'স্পন্দন' যাত্রা শুরু করেছিল। পত্রিকাটির সকল সংখ্যা এখন পাওয়া যায়না। প্রথম বর্ষ পঞ্চম, অষ্টম-নবম, দ্বিতীয় বর্ষ পঞ্চম ও ষষ্ঠ-সপ্তম— এই মাত্র চারটি সংখ্যা পাওয়া যায় এবং এর উপর ভিত্তি করে অনুসন্ধানের অভিজ্ঞতা থেকে ধারনা করা যায় যে,যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ফলাফল বাতিলের ষড়যন্ত্র '৯২-ক ধারা প্রবর্তন এবং দমন-নিপীড়ন ইত্যাদি পরিস্থিতি উদ্ভাবনের পর বছর-দুয়েক চলে (বৈশাখ ১৩৬০ থেকে চৈত্র ১৩৬১ নাগাদ) পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এই পত্রিকায় তখনকার যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল লেখকগণ লিখতেন। অগত্যার সম্পাদক ও প্রধান লেখক ফজলে লোহানী, আনিস চৌধুরী, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান এবং অন্যান্য লেখকগণ যেমন : আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, আহমদ শরীফ, সৈয়দ শামসুল হক, জহির রায়হান, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, সিকান্দার আবু জাফর (পরবর্তীতে যিনি নিজেই 'সমকাল' (১৯৫৭) প্রকাশ করবেন); আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর প্রমুখ লিখেছিলেন আর মোহাম্মদী-মাহেনও-দিলরুবা ও নওবাহার প্রভৃতি পত্রিকার দক্ষিণপন্থী লেখকদের রচনা এতে কম প্রকাশিত হয়েছে (আনম বজলুর রশীদের কবিতা আছে। তিনি রবীন্দ্র-বিরোধীতার কালে রবীন্দ্র-চর্চার বিপক্ষে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন) ; বরঞ্চ হরেন ঘোষ, রমেন্দ্র কুমার রায়, মদন ঘোষ, যতীন্দ্রমোহন সিংহ, অনঙ্গ মিত্র, রামপ্রসাদ দেবনাথ, সুশীল কুমার দত্ত, সুবোধ কুমার রায় প্রমুখ হিন্দু লেখকদের রচনা প্রকাশিত হয়েছে অনেক, আর কবি জীবনানন্দ দাশের (জন্ম ঃ ১৭-২-১৮৯৯— মৃত্যু ঃ ২২-১০-১৯৫৪) মৃত্যুর পরে 'স্পন্দন' শোক ও শ্রদ্ধার সঙ্গে 'বনলতা সেন' কবিতা পুনর্মুদ্রিত করে (২/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩৬১) এবং কবি শামসুর রাহমান জীবনানন্দের স্মরণে কবিতা লেখেন 'পুরানের নতুন জন্ম'। স্পন্দনের প্রবন্ধগুলোর বিষয় ও নামকরণের বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। সাহিত্যে বাস্তবতা, স্টাইল, দুর্বোধ্যতা, সাহিত্যের নানা সমস্যা প্রভৃতি নিয়ে পূর্ব বাঙলার প্রধান লেখক-সাহিত্যিকদের রচনাসমূহ স্পন্দন প্রকাশিত করেছিল। মোপার্সা, লুস্যন, এমিলি জোলা, ফ্রেডেরিক বুটেট প্রমুখের রচনার অনুবাদ প্রকাশ এবং উর্দু-প্রীতির প্রতি ব্যঙ্গ আর বাঙলাভাষার প্রতি অকৃত্রিম সমর্থন—সবকিছু মিলিয়ে 'স্পন্দন' কে সীমান্তর ধারারই একটি পত্রিকা বলে গণ্য করা সঙ্গত। নিয়মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল নবীন লেখক-লেখিকাদের প্রকাশযোগ্য রচনা প্রকাশের আশ্বাস। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক প্যারামাউন্ট প্রেস লিমিটেড, ৯ হাটখোলা রোড ঢাকা হতে মুদ্রিত ও ৪ ফোল্ডার স্ট্রীট ওয়ারী থেকে প্রকাশিত হতো। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৬২। মোটামুটিভাবে (৬০, ৬২, ৬৪ পৃষ্ঠার) ৪

Dhaka University Institutional Repository

ফর্মা ডিমাই ১/১৬ উসাইজ ভালো নিউজপ্রিন্টে ছাপা হতো। মূল্য ছয় আনা। নিউজপ্রিন্টে ছাপা পত্রিকা 'স্পন্দন'। সরকারের নিউজপ্রিন্ট- বরাদ্দনীতি নিয়ে অনেক সমালোচনা করেছে, যাতে প্রবল প্রতিবাদ ব্যক্ত হয়েছে উর্দু ও বাঙলা পত্রিকায় কাগজ-বরাদ্দের বৈষম্য-নীতির বিরুদ্ধে। 'স্পন্দন' এর আবির্ভাব সম্পর্কে প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা ভাদ্র ১৩৬০ সংখ্যায় লেখা হয় পত্রিকার জগতে বিরাট শূন্যতা বা সাংস্কৃতিক সংকটের কালে স্পন্দন-এর আবির্ভাব হয়েছিল 'নেহাত অচেনা, নূতন বেশে'। "পূর্বপাকিস্তানে বাঙলা-সাহিত্যের জগতে বা আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে সাময়িকপত্রিকার রাজ্যে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। রাজ্য বটে, তবে এ রাজ্যে প্রজা বা রাজার বালাই যাওবা ছিল ইদানীং তাও প্রায় নিঃশেষের শেষ সীমায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল— এমননি নিদারুন দুঃসময়ে বা আমাদের সাংস্কৃতিক সংকটের ঠিক মাহেন্দ্রক্ষণটিতেই আবির্ভাব হয়েছিল স্পন্দনের।" ১৯৫৩ সনের দিকে পত্রিকার সংখ্যা কমে এসেছিল, সাংস্কৃতিক সংকট ও সাহিত্যিক শূন্যতার সময় 'স্পন্দন' প্রকাশিত হয় বলে পত্রিকার দাবি ছিল। বলা হয়ঃ "বর্ষ শেষের গ্লানিভরা ব্যথা যখন বর্ষশুরুর বৈশাখেও মলিনতা ও মানসিক মৃত্যুর নির্মম পদধ্বনি শুনিয়েছিল, ঠিক সেই সময়টিতেই শান্ত সাবধান পায়ে এখানকার বাঙলা সাহিত্যের রাজ্যে, নেহাত অচেনা নূতন বেশেই এসেছিল স্পন্দন"। প্রথম বর্ষের প্রথম চারটি সংখ্যা প্রকাশের অভিজ্ঞতা পঞ্চম সংখ্যায় ব্যক্ত করে বলা হয়ঃ "তার সেই অনাড়ম্বর অথচ গাম্ভীর্যপূর্ণ জীবন, চঞ্চল অথচ বাচালতাবিহীন, প্রতিশ্রুত অথচ অহমিকাশূন্য রূপ অনেকের মনে জাগিয়েছিল উদ্দীপ্ত আশা। আর অনেককে দিয়েছিল ঈর্ষার জ্বালা, শাসনের কষাঘাত। এমনি নানা মনের নানা প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই স্পন্দনের এই এগিয়ে আসার ছোট্ট পথটুকু পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য-সেবীদের পরম লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। সাহিত্য-সেবীদের বিশেষ করে যাঁরা আমাদের বাঙলা সাহিত্যকে নতুন করে নতুন রূপে সাজাবেন, সেই নবীন সাহিত্যগোষ্ঠী অতি আগ্রহের সাথে, অতি সহানুভূতির সাথে তার চলা লক্ষ্য করেছিলেন। এবং মাত্র এই ছটা মাসের ক্ষুদ্র এই জীবনে তার, সে যতটা পেয়েছে বিদ্রূপ বা হতাশার বাণী, তার চেয়ে বেঁচে থাকার আশীর্বাদ অনেক অনেক বেশী জুটেছে তার ভাগ্যে।"

পত্রিকার অভিজ্ঞতায় আরো বলা হয় যে, যশোলিপ্সু অথচ পরিশ্রমবিমুখ সাহিত্যিকদের চোখ ঠারানি বড় গাত্রদাহের সৃষ্টি করেছিল তখন। ফলে স্পন্দনের সৎ-সাহিত্য প্রয়াসে ঈর্ষান্বিত হয়েছেন অনেকে, আর ঠকবাজরা হয়েছিলেন আহত ও শঙ্কিত। নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন দেখে অপরের কবরের উপর প্রাসাদ গড়তে আগ্রহীরা যে জঞ্জাল সৃষ্টি করছিলেন, সেই 'আকাশ-কুসুম রচনা...... সাহিত্যকে এতটুকু এগিয়ে যেতে" দিচ্ছিল না। অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে এ-ও লক্ষ্য করা যাচ্ছিল যে, "তরুণ সমাজের একটি অংশ আবার সস্তা সিনেমা পত্রিকা ও আমদানী করা আরো নানা মুখরোচক ইংরেজী পত্রিকার মধ্যে নিজেদেরকে ডুবিয়ে রেখে ক্ষণিকের উত্তেজনা লাভটাকেই আজকে চরম লাভ বলে মনে করেছেন। এর প্রতিক্রিয়া যা হবার তাই হচ্ছে। সাহিত্যে নতুন চিন্তার খোরাক বা নতুন কোনো কিছুই আর আসছেনা। যে কোন সাহিত্য পত্রিকার আবির্ভাবও এই কারণেই ব্যর্থ হচ্ছে। আমাদের রুচিবিকারই এর প্রধান কারণ। নবীন সাহিত্যসেবী এবং সাহিত্যামোদীদের উৎসাহ যদি সিনেমার পত্রিকায় .... সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েই থাকে, তাহলে বলব, স্পন্দনের আবির্ভাব ব্যর্থ হয়েছে।" কিন্তু স্পন্দন এবং প্রগতিশীল সাহিত্যচর্চার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। তার আত্মসচেতন প্রশ্নটি লক্ষণীয়ঃ "কিন্তু তাই কি হয়েছে? আমরা কি আমাদের সাংস্কৃতিক ব্যভিচার থেকে ধীরে ধীরে উঠে এসে নতুন আলোতে মুক্ত বাতাসে, নবীন আশা নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন এক পরিবেশের মধ্যে এসে দাঁড়াতে শুরু করিনি?" ১৯৫৪-র যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিরোধীদের বিজয়লাভের পর স্পন্দনের বক্তব্য হলো— "এ প্রশ্নের জবাবের জন্যে বেশীদূর যেতে হবেনা, বেশী ভাবতেও হবে না, ... স্পন্দন শতশত নতুন পাঠক, শুভাকাঙ্ক্ষী লাভ করেই চলেছে।"

বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের পর 'চিত্রালী' প্রভৃতি সিনেমা-সাপ্তাহিকের প্রকাশ ও হামিদুল হক চৌধুরী প্রমুখের উদ্যোগে অপসংস্কৃতির হলিউডী-উপকরণ আমদানীর ঘটনার প্রেক্ষিতে স্পন্দনের সমালোচনা যুগোপযোগী ছিল। এসব উদ্যোগ যে যথার্থ সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল---সেই ইতিহাসই স্পন্দনের পাতায় বিধৃত রয়েছে। (উত্তরণের সম্পাদকীয়তেও দেখা যাবে এ প্রসঙ্গে কটাক্ষ আছে)।

'স্পন্দন'-এ গল্প লিখেছিলেন, আনিস চৌধুরী (রূপালী মৃত্যু,১/৫); আঙ্গুর,১/৮-৯); সৈয়দ শামসুল হক (রোগ, ১/৫); আবিদুর রহমান (সংঘাত, ১/৫); নেয়ামাল ওয়াকিল (জীবন ও জীবিকা, ১/৫); খেয়ালী (ছদ্মনাম, না, ১/৫); খণ্ডিতলয়, ১/৮-৯); মপার্সাঁ (অনুবাদ আবদার রশীদ, দ্বৈরথ, ১/৫); ফজলে লোহানী (চরমুরালী, ১/৮-৯); এমিলি জোলার গল্প (অনুবাদ, ২/৫); জিয়াউল হক (অপঘাত, ১/৮-৯); আহমদ মোয়েদ (উর্দু কি 'দুছরি ছবক', ১/৮-৯); মনজুর রশীদ (দুঃশাসন, ১/৮-৯); আহমদ মীর (মেয়ে স্কুলের মোড়ে, ২/৫; পুনশ্চ: ২/৭); লুৎফা রহমান (প্রাগৈতিহাসিক, ২/৫); শরীফা খাতুন (দর্পন, মাসিমো বটে পল্লী থেকে, ২/৫); রামপ্রসাদ দেবনাথ (ঘড়ি, ২/৫); আবদুর রউফ (একটি ঝড়ের রাতে, ২/৫); সুশীল কুমার দত্ত (চোর, ২/৫); আবদুল গাফফার চৌধুরী (বৃষ্টি, ২/৬-৭); জহির রায়হান (ভাঙ্গাচোরা, ২/৬-৭); বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (গ্রামীন, ২/৬-৭); রাজা হুসেন (ছাব্বিশ অক্টোবর, ঢাকা, ২/৬-৭); মোহাম্মদ আজিজুল হক (পারিস্থিতি, ফ্রেডারিক বুটেট এর অনুবাদ, ২/৬-৭); আফলাতুন (অন্তরাল, ল্যুসুন থেকে অনুবাদ, ২/৬-৭); সারওয়ারী আহমদ (ছবি, ২/৬-৭); মাহমুদ শাহ কোরেশী (রূপান্তর, ২/৬-৭) প্রমুখ। উপন্যাস ধারবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল সিকান্দার আবু জাফর (জীবনের মানচিত্র) এবং সৈয়দ শামসুল হকের (অন্যজন)। এ উপন্যাস দুটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত নয়। গল্প-উপন্যাসে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জীবনের বিচিত্র রূপ ফুটে উঠেছে। প্রেমের গল্প ও প্রেমচিন্তার মধ্যে গল্পকার সচেতনভাবে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জীবনের প্রেমানুভূতি ও অর্থনৈতিক-সামাজিক সংকট-চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। জীবন ঘনিষ্ঠতা আছে এবং মানব-হৃদয়ের বিচিত্র চাওয়া-পাওয়ার রূপায়নে গল্প, উপন্যাসসমূহ পূর্ববাঙলার তৎকালীন পাঠকসমাজের শিল্প-সাহিত্যের ক্ষুধাতৃষ্ণার পানাহার-রূপে কালের দাবি মিটিয়েছে। কোনো-কোনো গল্পকার শ্রেণী-চেতনাবশত সমাজ-ভাবনার ক্ষেত্রে শ্রমবিমুখ পুঁজিপতিশ্রেণীর ধ্বংস কামনা করেছেন। জাগ্রত হোক নিম্নমধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক, কারিগরশ্রেণী—এই হচ্ছে মূল অভিপ্রায়। নারী স্বাধীনতার, নারী-জাগরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে অনেক গল্পে। সামাজিক কুসংস্কার এবং বাঙালির গ্রামীন কৃষিভিত্তিক সমাজের নানান মিথ, সামাজিক চিত্র এবং নাগরিক জীবনের, মধ্যবিত্তের 'টনটনে প্রেস্টিজ জ্ঞান' প্রভৃতি নিয়ে চমকপ্রদ পঠনোপযোগী হয়েছিল স্পন্দনের গল্পসমূহ।[৫৮] তবে কাঁচা-গল্পও এতে অনেক ছাপা হয়েছে। আবিদুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

(সংঘাত, ১/৫) ; লুৎফা রহমান (প্রাগৈতিহাসিক, ২/৫); রামপ্রসাদ দেবনাথ (ঘড়ি, ২/৫); আবদুর রউফ (একটি ঝড়ের রাতে, ২/৫); সুশীল কুমার দত্ত (চোর, ২/৫); আহমদ মীর (পুনশ্চ, ২/৬-৭); রাজাহুসেন (ছাব্বিশে অক্টোবর, ঢাকা, ২/৬-৭) প্রমুখের গল্পগুলো শৈল্পিক- বিচারে অপরিপক্ক ; তবে তাতে যৌনতা ও নোংরামী নেই। বরং চিন্তায় সমাজ-সংলগ্নতা আছে। রচনাকারগণ লেখাগুলোকে সাহিত্য হিসেবে গড়ে তুলবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। 'খেয়ালী'র ছদ্মনামে 'না' (১/৫) এবং 'খণ্ডিত লয়' (১/৮-৯) গল্পদুটোতে রাজনীতি-সংলগ্নতা, রাজনীতিতে নারীদের আগ্রহ ও স্বাধীনতা-সংগ্রামে মেয়েদের আগ্রহ এবং পাকিস্তান অর্জন-এর সামাজিক ঘটনা প্রেমের কাহিনীর অন্তরালে ব্যক্ত হয়েছে। বিষয়বস্তুতে প্রগতিশীল স্পন্দনের গল্পগুলো পূর্ব বাঙলার সাহিত্যের ভাণ্ডারে মূল্যবান সংযোজন সন্দেহ নেই। স্পন্দনের কবিদের তালিকায় আনম বজলুর রশীদ (নবজাতক, ১/৫); আবু হেনা মোস্তফা কামাল (বিকেলের কবিতা, ১/৫); মুসা মনসুর (দিন মজুরী, ১/৮-৯); রাবেয়া খান (জলছবি, ১/৮-৯); নজরুল হক (চিরদিন মনে রবে, ১/৮-৯); আহমদ মীর (আজও ভুলিনি, ১/৮-৯); অনঙ্গ মিত্র (অকাল মেঘ, ২/৫); আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (ছড়া, ২/৫ ; প্রিয়তমাসু, ২/৬-৭); এম, আহমদ আলী (বন্যা ১৩৬১, ২/৬-৭); মুস্তফা জামাল (তার কবরের পাশে, ২/৬-৭); সৈয়দ শামসুল হক (দুটি কবিতা, ২/৬-৭); আতাউল হক (পিকনিক, ২/৬-৭); আবদুল জব্বার (হকার, ২/৬-৭); সুবোধকুমার রায় (জীবনানন্দ, ২/৬-৭) প্রমুখ রয়েছেন। এর মধ্যে জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু- উপলক্ষে 'পুরানের নতুন জন্ম' শীর্ষক নিম্নোক্ত কবিতাটি স্মরণীয়:

> "জানা ছিল তাঁর কথা। কিশোর বয়সে যখন
> পালে লেগেছিল নতুন হাওয়া, অজানা মাটির গন্ধে মন
> আলো অন্ধকারে উন্মন;
> সেই শিশির-স্নিগ্ধ পায়রা নরম জীবনের বাঁকে
> মনের ক্ষমতায় বলা চলে—আবিষ্কার করেছিলাম তাঁকে।
> * * * *
> এখন তিনি মূল্যবান গ্রন্থ হয়ে জ্বলছেন আমাদের ধ্যানে, শুধু
> মহাশূণ্যে সময়ের অনন্ত বালি কাঁপছে ধু ধু
> আর সময় সময় আজীবন নাগরিক কলরবে
> কিন্নরের ভাষা পড়বে মনে— নির্জনে নীরবে।
> মাঝে মাঝে ভাবি, আমিও সে পুরাণ পুরুষের মতো :
> আমার গলা বেয়ে ওঠে গান, হৃদয়ে অঙ্গার-ক্ষত।"[৫৯]

স্পন্দনের সাহিত্য-সংস্কৃতি-ভাবনা 'ভাষার' প্রশ্নে উচ্চকিত হয়েছে। বলা হয় দেশবিভক্তির ফলে 'দুটি দেশের বাসিন্দাদের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি আজ নাহোক, কালে পরস্পরের থেকে পৃথক হবেই। কিন্তু এসব মেনে নেওয়া সত্বেও আমাদের মাতৃভাষাকে কেটে ছেটে দুটো সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষায় দাঁড় করাবার প্রয়োজন কেমন করে ঘটে সেটাই বোঝা শক্ত। কালের চাকা ঘুরতে ঘুরতে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের মানুষের জীবনে অনেক পরিবর্তন আসবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ...... মাতৃভাষাকে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে বা তার অঙ্গহানির আয়োজন করে দিয়ে আমরা আর যাই লাভ করিনা কেন, মনের মতো কিছুই পাবোনা। এর চেয়ে কালের উপরে নির্ভর করে সব ছেড়ে দেওয়াই ভালো মনে হয়। কিন্তু একটি সমাজ বা জাতির পক্ষে, এইভাবে কালের উপরে নির্ভর করে থাকা কখনোই যুক্তি-সঙ্গত নয়। সেইজন্যেই আমাদের উচিত এ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে একটা চিন্তার, ভাবের ও বুদ্ধির আদান-প্রদান করে নিয়ে পরস্পরের সাথে যথাসম্ভব শিগগীর বোঝা-পড়া করে নেওয়া। 'বোঝাপড়া' কথাটা শুনে চমকে উঠবারই কথা। যেন নিজেদের মধ্যেই আমাদের ঝগড়া বেধে বসে আছে। অনুমান একটুও মিথ্যে নয়। আমরা নিজেরাই আজ পর্যন্ত ঠিক করতে পারিনি আমাদের মাতৃভাষার রূপ কি হবে? এবং নিজেদের এই অক্ষমতা ঢাকবার জন্যেই আমরা বর্তমানে এর-ওর এমনকি সরকারের ঘাড়েও দোষ চাপিয়ে মাতৃভাষার প্রতি উন্নাসিকতার চরম করে ছাড়ছি। এটা শুধু মাতৃভাষার প্রতি নয়—সমস্ত জাতি বা দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু নয়। এই বিশ্বাসঘাতকতার চরম প্রমাণ পাওয়া গেছে সম্প্রতি—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা পাঠ্য-তালিকা সম্বন্ধে বাক্-বিতণ্ডার মধ্যেই। 'আজাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত বাদ-প্রতিবাদের মোদ্দা কথা হলো, এক পক্ষ চান, পুরাতন যা কিছু সবকে রাতারাতি ভেঙে চুরমার করে দিয়ে তার ওপরে নতুন প্রাসাদ গড়ে তুলতে। আর অপর পক্ষ চান, পুরাতনকে যথাসম্ভব বজায় রেখে ধীরে ধীরে তার সংস্কার করে যেতে। যাঁরা হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে নতুন প্রাসাদ গড়ে তুলতে চান, তাঁরা যে মোটেই চিন্তাশীল বা মাতৃভাষার প্রতি একবিন্দুও দরদী নন, তা তাদের চিঠির ভাষা, যুক্তি ও কার্যকলাপ লক্ষ্য করলেই বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়। এবং এও বোঝা যায় যে, মাতৃভাষার প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধ বা হৃদয়ের টানটুকু এঁদের আসরে নামায়নি। এঁরা এসেছেন নিজের নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই। যেহেতু আমার শত্রু সে, সুতরাং সে যা বলবে সবই খারাপ বা প্রতিবাদ-যোগ্য; এই মনোভাবটুকু আজকের ভাষা-আন্দোলনের যে কতোখানি ক্ষতি করেছে তা ভেবে দেখবার সময় এসেছে। .... তুচ্ছ ব্যক্তিগত স্বার্থকে পুঁজি করে (বই পাঠ্য তালিকায় স্থান পায়নি কিংবা, পরীক্ষার খাতা দেখবার সুযোগ পাইনি এমন) যদি আমরা মাতৃভাষার কালো বাজারী করতে বসি, তাহলে বলতে লজ্জা নেই আমাদের (জাতির) চরম দুর্গতি আসন্ন প্রায়। একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই তাঁর অলৌকিক শক্তি দিয়ে আমাদের রক্ষা করতে পারেন অন্যথায় পূর্বপাকিস্তানে বাঙ্গালী বলে আর কাউকে খুঁজেই পাওয়া যাবে না।"[৬০]

'একান্ত আমাদের' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে সমাজের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে ঃ "এখানে গাল-ভরা শ্লোগান আছে কিন্তু বহু বিঘোষিত সেই আদর্শের ধারে

Dhaka University Institutional Repository

কাছে কাউকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কলকারখানা স্থাপনের বিজ্ঞাপন দেখি, কিন্তু নতুন কোনো কিছু তৈরী হয়েছে বা হচ্ছে তা দেখিনে। আমাদের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অনেক সুখ-সুবিধার হাজার আশ্বাস, লাখো প্রতিশ্রুতি ও বীরত্বব্যঞ্জক সচিত্র প্রবন্ধ পড়ি আমরা কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সাড়ে চার আনা দাম দিয়ে একখানি ব্লেড কিনতে না পেরে আমরা সকলেই, এক একজন মহাকবি বা সক্রেটিস জাতীয় দার্শনিকে পরিণত হয়ে চলেছি। বাঙালী পাঠক আছে, বই নেই। আমাদের টাকা আছে, নিউজপ্রিন্ট নেই। বাঙালী নেতা আছেন, মুখে তাঁর বাঙলা ভাষা নেই। বাঙলার জন্যে আমরা জান কোরবান করতে পারি, কিন্তু বাঙলা কাগজ বা বই কিনে পড়িনে। বাঙলা ভাষার জন্যে আমরা চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ব্লাকমার্কেটে বিদেশী যাবতীয় গলার ওষুধের দাম বাড়িয়ে দিই, কিন্তু কাজের কাজ করতে পারিনে, ড্রাগ-কন্ট্রোল এবং প্রাইস-কন্ট্রোল আছে, কিন্তু ওষুধ বিক্রেতারা যাবতীয় নিরুদ্দিষ্ট ওষুধ অতি পরিচিত লোকেদের সামনে পাঁচগুণ দামে ঠিক বের করে দেন, মৌরি হাসি হেসে।

পূর্ব পাকিস্তানে সাড়ে চারকোটি বাঙালী মিলে আমরা 'রাষ্ট্রভাষা বাঙলা চাই' বলে খুব চিৎকার করেছি; কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন উর্দু ভাষাভাষী ঢাকায় এবং এদেশের সর্বত্র উর্দু ভাষার উন্নতি বিধানের নানা পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে গড়ে তোলার জন্যে উর্দু এ্যাকাডেমী, আঞ্জুমানে তারক্কীয়ে উর্দু সুচারুরূপে গড়ে তুলেছেন, এবং আরো সুষ্ঠুভাবে নিজেদের মাতৃভাষার জন্যে তারা চিৎকারের চেয়ে বেশী কাজই করে যাচ্ছেন। আমরা বলি 'বাঙলা চাই'; কিন্তু ঐ মুখেই সার। কার্যক্ষেত্রে দেখি, পড়তে পারি আর না পারি বেশ রঙ্গচঙ্গে একটি আমদানী করা মোটা উর্দু-মাসিক পত্রিকা হাতে নিয়ে ট্রেনে বাসে স্টীমারে ভ্রমণ করতে গৌরবে এবং এ্যারিষ্টোক্রেসিতে আমরা চরম শিখরে উঠে বসে আছি বলে নিজেদের মনে করি। বাঙলা মাসিক পত্রিকা বা বই হাতে রাখাটাকে বা এই বাঙালী-ধরণের জিনিসের সাথে আমাদের নাড়ীর যোগ আছে, একথাটাকে গলায় প্রকাশ করলেও কাজেকর্মে প্রকাশ করতে আমরা রীতিমত লজ্জিত। ঠিক এই কারণেই পূর্ব-পাকিস্তানে বাঙলা সাময়িক পত্রিকা বা গল্প-প্রবন্ধের বইয়ের চেয়ে আমদানী করা উর্দু সাময়িক পত্রিকা ও বইগুলো বেশী পরিমাণে বিক্রী হচ্ছে। সুতরাং এখানেও সেই মুখে বড় বড় বুলি আছে, কিন্তু দোয়াতের মধ্যে কালি নেই। চরম সুখের কথা এই যে, এই কালি না থাকার পেছনে আমাদের ছোট-বড় সকলেরই যথেষ্ট সাহায্য ও সহানুভূতি রয়েছে।"

পাকিস্তান সরকারের নিউজপ্রিন্ট বরাদ্দ-ক্ষেত্রে বৈষম্য-নীতির সমালোচনা করা হয়েছে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে— "হাত কচলে, বলতে যাচ্ছিলেম, 'ওরা অতো কাগজ পায়, মাত্র দু'রীম ছাপিয়ে পত্রিকা বের করে বাকীটা ব্লাক করে, অন্ততঃ আমাদের পত্রিকার চাহিদা মতো কাগজ দিন। ... কিন্তু বলতে পারলেম না। .... কিন্তু এমনটি কেন হচ্ছে? আমাদের চারিদিকে এ কিসের অসামঞ্জস্য, এ কিসের অভাব, এ কিসের আধিক্য? (পার্থক্য?) খোলসা করে বিস্তারিত সব বলতে বসলে সে হবে আর এক কেচ্ছা। এবং সে কেচ্ছা বয়ান করতে গেলে আমাদের সীমা ছাড়িয়ে রাজনীতির বর্ডার ক্রস করে যাবো আমরা, অতএব আজকের মতো এখানেই থেমে যেতে বাধ্য হলেম।"[৬১]

কয়েকটি প্রবন্ধে সাহিত্য-শিল্পের এবং আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতা প্রসঙ্গে আলোচনা আছে। দুর্বোধ্য উৎকর্ষ ও আভিজাত্যের প্রধান লক্ষণ মনে করে বুঝুক আর না বুঝুক একশ্রেণীর লোক ভাসা-ভাসা আলোচনা করে কিংবা ড্রইংরুমে ছবি টাঙিয়ে 'এ্যারিষ্টোক্রেসি' 'ইন্টেলেকচুয়াল'-ভাব দেখাতে চান। এটা যেন 'ফ্যাশন' হয়ে গেছে। কিন্তু একথাতো ঠিক যে সাহিত্যের প্রসাদগুণই প্রধান। দুরূহ ও অনধিগম্য সাহিত্য খুব কমক্ষেত্রেই কালজয়ী হয়। সেজন্য অকারণ দুর্বোধ্যতাকে তারিফ করার কোন অর্থ হয়না। প্রাঞ্জলতা যেমন গুণ, অস্পষ্টতা তেমনিই দোষ। তবে এও মনে রাখতে হবে : "বড় বড় কবির উৎকৃষ্ট কাব্যে যে জটিলতা, তা প্রায়সই বুদ্ধি, অনুভূতি ও ভাবের গভীরতার দরুন, ভাষার (কৃত্রিম) মারপ্যাঁচের জন্য নয়। যেহেতু কবি-সাহিত্যিকেরা সাধারণ মানুষের চেয়ে গভীরতর অনুভূতি ও সূক্ষ্মতর চিন্তার অধিকারী, সেহেতু এটা খুবই স্বাভাবিক যে, তাঁদের সব ভাব ও চিন্তা পাঠক সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেনা, এজন্য তাকে খানিকটা অভিনিবেশ প্রয়োগ করে কবির ভাবধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে হবে। কবি যখন নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে সব ভুলে গিয়ে তাঁর অন্তরের কথা বলতে থাকেন, তখন লোকে তাঁর চিন্তা ও ভাবধারার সঙ্গে সহজে চলতে পারবে কিনা এ সম্বন্ধে সচেতন থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর রচনার যেটুকু অস্পষ্টতা তা অন্তর্নিহিত অর্থ ও ভাবের, শব্দার্থ কিংবা বহিরঙ্গের নয়।"[৬২] আহমদ শরীফ 'আধুনিক কবিতা কি দুর্বোধ্য?" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন সমাজ-শৃঙ্খলার ন্যায় সাহিত্য-সমাজেও 'মাতব্বর', 'জিম্মি' প্রভৃতি রয়েছে। লেখক-সমালোচকগণ এই সমাজের 'মাতব্বর' আর পাঠকগণ 'জিম্মি'। নেতৃত্বের ঝামেলাও এখানে আছে। "অর্থাৎ এখানেও মন জাগিয়ে ও মন-বানিয়ে চলতে হয়। এ যিনি না-পারেন, হয় তাকে (পাঠকদ্বারা) অস্বীকার করা হয়, অথবা পাঠক তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বা নিন্দা-নৈরাশ্য মুখর হয়ে ওঠে। পাঠকদের মধ্যে যাঁরা বুদ্ধি-বোধিতে শ্রেষ্ঠ—তাঁরা এ-সমাজে পতি, সর্দার। তাঁদেরই নাম হচ্ছে সমালোচক। তাঁরা একাধারে বিচারপতি ও বিরোধী দলপতি। তাঁরা কখনো কারো প্রতি প্রশংসায় মুখর, আবার কখনো নিন্দায় ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন, তাঁরা কখনো করুণ, আবার কখনো দারুন। ... সুতরাং সমালোচনা হচ্ছে মনুষ্য জীবনের অন্তর ও বাহ্য প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন কিছুর মূল্যমান। বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমালোচনার কাজ হচ্ছে অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞাত-অজ্ঞাত বিধি-ব্যবস্থা বিশ্বাস-সংস্কার রীতি ; গত-আগত নীতি—রুচি অমনোযোগী পরমুখাপেক্ষী মনুষ্য সাধারণকে অবহিত করা, প্রয়োজন-বুদ্ধিকে উসকিয়ে দেওয়া।" সমালোচকের নিন্দাবানে জর্জরতি হয়েছেন সকল বড় বড় সাহিত্যিকই। লেখক আরও বলেন ঃ .... "এসব ঘটনা দেখিয়ে ইতিহাস আমাদের বলে যে সমাজে ধর্মে রাষ্ট্রে সাহিত্যে শিল্পে কোন নতুন মত পথ আদর্শ বা সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমকালীন বয়োজ্যেষ্ঠরা পূর্বলব্দ সংস্কার বশতঃ বুঝতে পারে (না) ফলতঃ স্বীকার করতেও তাদের চরম আপত্তি। নবীনে প্রবীনে দ্বন্দ্ব এখানেই, নবীন মাত্রেই উদার ও প্রগতিশীল; প্রবীণতা মানেই রক্ষণশীলতা। উভয়দলই সমাজের তথা মানুষের কল্যাণ কামী; উভয় দলই তর্ক-বিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যা কিছুই করেন সমাজের হিতার্থেই। আজ যারা প্রবীন হয়ে বিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে নবীনদের মতে বা কাজে বাধা দিচ্ছে, তারাই কিছুকাল আগে নবীন বয়সে প্রবীনদের 'সঙ্গে লড়েছে। পুরুষ পরম্পরায় এভাবেই চলেছে। কিন্তু নবীন-প্রবীণ কেউ আজো বিজ্ঞতা বা বুদ্ধি-বোধিতে হার মানতে রাজী হয়নি। জয় পরাজয় শেষ পর্যন্ত প্রাকৃতিক নিয়মেই সংঘটিত হচ্ছে। তবু চৈতন্য উদয় হয় না।"[৬৩]

মোফাজ্জল হায়দার চোধুরী 'প্রবন্ধ সাহিত্য' শিরোনামের আলোচনায় বর্তমানের সাহিত্য-পরিস্থিতিতে 'মনন সাহিত্য' চর্চার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে

Dhaka University Institutional Repository

বলেন ঃ "আমাদের প্রবন্ধ ... বা মনন সাহিত্য বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে কাব্যের উপেক্ষিতা। এর উপযুক্ত যত্ন নেওয়া হয়নি। বোধ করি বাঙালীর হৃদয়বৃত্তিই এর অনুকূল নয়। বাঙালীর মনে ভাব বেশি, চিন্তা কম। ভাব আর চিন্তায় কি তবে কিছু পার্থক্য আছে? কিছুটা যেন আছে। গুড় আর মিছরির মধ্যে যে পার্থক্য — সেই পার্থক্য। ভার যখন পরিণতি লাভ করে বা সংহত হয়ে দানা বাঁধে — তখন সে যে আকার ধারণ করে — তাই চিন্তা। মনের মধ্যে ভাবকে এমনি থিতিয়ে নেওয়ার নামই আমরা দিয়েছি 'মনন' বা 'চিন্তন'। এইটে যেন বাঙালী পারে কম। অন্তরের উচ্ছ্বাসে সে উদ্বেল হয়ে উঠতে পারে—হৃদয়াবেগের বন্যায় সে ভেসে যেতে পারে, কিন্তু খুব স্থিতধী হয়ে, ভাবটাকে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে, তারপর পরিপাটি করে বলা—এটি যেন তার ধাতে সয়না। হয়ত তাই বাঙলার মনন সাহিত্যের দৈন্য। .... পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যের যাবতীয় রচনাই প্রায় এই শ্রেণীর (প্রবন্ধ); এবং এটিই হচ্ছে মানবজাতির সমস্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার। মানুষ যাকিছু ভেবেছে, বুঝেছে, মানুষের মনীষা যা কিছু আবিষ্কার করেছে—তা সবই সে জমা করে রেখে গেছে— এই (প্রবন্ধ-সাহিত্য) ভাণ্ডারে। সেই হিসাবে প্রবন্ধ সাহিত্যই মানব-জাতির, সামগ্রিক চিন্তাধারার বাহন। অতএব আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন প্রবন্ধ সাহিত্যের মূল্য কতো বেশী এবং এর প্রয়োজন কি অপরিসীম; অথচ এই সাহিত্যের মূল্যই কেউ দেয়না...... প্রবন্ধের মধ্য-দিয়ে লেখক নিজের ভাবনা চিন্তাকে প্রকাশ করেন বলে ..... এই রচনার মধ্যদিয়ে নিজের (লেখকের) ব্যক্তিত্বটি ফুটে ওঠে। এই ব্যক্তিত্বই তাঁর রচনাকে দেয় ষ্টাইল (Style) বা ভঙ্গি । Style is the expression of the writer himself স্টাইল হচ্ছে লেখকেরই ব্যক্তিত্বের সৌরভ যা তাঁর রচনায় সঞ্চারিত হয়। যার ব্যক্তিত্ব হতো মহান এবং সেই ব্যক্তিত্ব যে পরিমানে রচনার মধ্যে ব্যঞ্জিত হয়ে উঠে তাকে বিশেষ চরিত্র দান করে— রচনা সেই পরিমানে চিত্তাকর্ষক ও মহৎ হয়ে ওঠে। অবশ্য অনেকে মনে করেন যে, প্রবন্ধের মধ্যে লেখক নিজেকে গোপন রেখে নৈর্ব্যক্তিকভাবে Objective দৃষ্টিতে বস্তুকে আলোচনা করবেন। কিন্তু এতে আমরা বিশ্বাস করতে পারিনা, কেননা, কোনো লেখকই লেখার মধ্য থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ গোপন করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।"[৬৪]

প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনাটি জ্ঞানগর্ভ এবং জ্ঞানোদ্দীপক। ইংরেজী সাহিত্যের কোন প্রবন্ধের অনুসরণে 'স্টাইল' সম্পর্কে আলোচনা করেন নাজমুল হক (১/৮-৯) এবং 'সাহিত্যের পাত্র-পাত্রী' বিষয়ে আলোকপাত করেন মদন ঘোষ (১/৮-৯)। এসমস্ত আলোচনায় টাইপ-চরিত্র বর্জন করে স্বকীয়-বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল নতুন সাহিত্য তথা চরিত্র সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ-সমালোচনায় 'স্পন্দন' কালের প্রেক্ষিতে সাহিত্য পত্রিকার যথার্থ ভূমিকা গ্রহণ করতে চেয়েছিল। কবিতার থেকে গদ্য প্রকাশের প্রতি আগ্রহ দেখিয়ে গল্প-উপন্যাস কথা-সাহিত্যের চর্চার দ্বারা স্পন্দন বাঙলাদেশের সাহিত্যের এবং সমাজ-সংস্কৃতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করেছিল, তাকে হেলায় পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলেনা বলেই ইতিহাস থেকেও 'স্পন্দন' এর নাম মুছে যাওয়া উচিত নয়।

৯. উত্তরণ (১৩৬৫-৬৭ --১৯৫৮-৬০)

মৌলানা ভাসানীর অনুরাগী, প্রতিবাদী তারুণ্য, পঞ্চাশের দশকের ছাত্র-যুব আন্দোলনের অগ্রগামী সৈনিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-সংসদ এবং সংস্কৃতি-সংসদের প্রথম সারির (তৎকালীন) পুরোধা, বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব, মানবতাবাদী, সাম্য-চিন্তার সপক্ষ কবি ও সাহিত্যিক এনামুল হক (পরে ডক্টর, এবং জাতীয় যাদুঘরের মহাপরিচালক ও বাঙলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব, জন্ম : ১৯৩৭) ১৯৫৮ সনে আইউব খানের সামরিক শাসন জারির (অক্টোবর ১৯৫৮) সন্ধিক্ষণে পূর্ববাঙলায় প্রথম শ্রেণীর একটি সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছিলেন, কিন্তু সামরিক শাসনের হঠাৎ আবির্ভাবের ফলে আত্মগোপন করতে হলো বলে পিছিয়ে গেলো। পাঠকদের হাতে যথাসময়ে পৌছুতে পারলোনা কালের দাবি, মনের মুক্তি ইত্যাদি সংস্কৃতিক সংকট মোকাবিলার অভিলাষী, সাহিত্যের উন্নতি অগ্রগতির শব্দ-সৈনিক—দ্বিমাসিক উত্তরণ। যে অবক্ষয়-অব্যবস্থার অজুহাতে সামরিক শাসন জারি করা হলো —সেই পরিস্থিতি সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক-প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিবর্তনের লক্ষ্যই ছিল যে পত্রিকা প্রকাশের মূল প্রেরণা ; সেই উত্তরণ অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে সামরিক শাসনের তীব্রতা কমে এলেই বাজারে এলো; দু বছর দুমাস চলে শেষে আবার বন্ধও হয়ে গেলো। এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ভাদ্র-আশ্বিণ ১৩৬৫ সনে আর শেষ সংখ্যা ১৩৬৭ সনের ভাদ্র, ১৯৬০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। তৃতীয় বর্ষের 'বর্ষশুরু সংখ্যা' রূপে দুই বাঙলার প্রায় পঁচাত্তর জন প্রতিশ্রুতিশীল, খ্যাত ও হবু-খ্যাত, তরুণ, প্রবীণ কবি-সাহিত্যিকের রচনা, শিল্পকর্ম (চারু শিল্পসহ) ও সাহিত্যিক প্রয়াসের ফসল ২৭৫ পৃষ্ঠার সাড়ে নয় ইঞ্চি বাই সাড়ে সাত ইঞ্চি সাইজের স্পেশাল ইস্যুটিই যে এর অন্তিম সংখ্যা হবে তা কেউ এর আয়োজন, অবয়ব, উদ্যম, সম্পাদকীয় ইত্যাদি দেখে কল্পনাও করেননি। বরঞ্চ 'মাসিক' করার ঘোষণায় খুশি হয়েছিলেন সৎ সংস্কৃতিসেবীগণ। কিন্তু সামরিক প্রশাসক আইউব খানের প্রেস-সংক্রান্ত নতুন আইনের (প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস্ এ্যাক্ট) আবর্তে হারিয়ে গেলো পূর্ববাঙলার সর্বোৎকৃষ্ট, পরিপূর্ণ সম্ভাবনাময় একটি সাহিত্য পত্রিকা।[৬৫] তবে যে-কটি সংখ্যা (৬+৬+১ = ১৩টি?) এর প্রকাশিত হতে পেরেছিল এবং এতে যে- সমস্ত লেখা প্রকাশিত হয়, তৎকালে পূর্ববাঙলার শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী লেখক সম্প্রদায়ের মানস-মুক্তির লক্ষ্যে সে-ছিল এক অপূর্ব প্রয়াস। কালের দাবী মেটানো বলে যে-কথাটি সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনায় মানদণ্ডরূপে সর্বত্র গুরুত্ব, মূল্য-নির্ধারণ ও ভূমিকা- বিচারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়— সে-বিবেচনায় উত্তরণ প্রকৃতপক্ষে যথার্থভাবেই তা পালন করতে পেরেছিল। সেজন্য বাঙলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের অগ্রগতিতে উত্তরণের উচ্চ-মূল্য (ভূমিকা) অস্বীকার করা যাবেনা।

আইউব খানের সামরিক শাসনে শিল্পী-সাহিত্যিক-রাজনীতিবিদদের সর্বপ্রকারের (বাক্-ব্যক্তি-সংবাদপত্র) স্বাধীনতা অপহৃত হলে দেশে অবক্ষয়কবলিত অন্ধকার এক বন্ধ্যা অবস্থার সৃষ্টি হয়। সকল সৃষ্টি প্রয়াস অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। বিশেষত পূর্ব বাঙলার জনগণের মানসিক সংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক রুচি ও চিন্তাকে বিকৃতির যে ষড়যন্ত্র অক্টোপাশের মতো চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল — ১৯৫৮-পরবর্তী সময়ে তা চরম আকার ধারণ করে। আর এই যুগ-সন্ধিক্ষণের কালে 'উত্তরণ' সরবরাহ করেছিল পূর্ববাঙলার জনগণের সাংস্কৃতিক-মানসিক ক্ষুধা-তৃষ্ণার একমাত্র পানাহার—

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য, তথা সাহিত্যপত্রিকা। এই দেশের অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনার, বন্ধনের নানারূপের— বহু সমালোচনা, আর বাঙালিরই বুদ্ধি, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পচর্চার স্বাধীনতা হরণের গ্লানি ও পরিণতি সংক্রান্ত বহু রচনা ; বিশেষত চিন্তাবিদ আবুল ফজলের (১৯০৩-৮৩) 'শিল্পীর স্বাধীনতা' শীর্ষক প্রবন্ধ— যাতে বলা হয় ঃ "পোষা বাঘ যেমন পুরোপুরি বাঘ নয়, তেমনি পোষা শিল্পীও খাঁটি শিল্পী নয়' উত্তরণ ছেপেছিল বা প্রকাশের ঝুঁকি নিয়েছিল। আইউব খান যখন 'লেখক সংঘ' তৈরী করে লেখক-সাহিত্যিক-কবি-শিল্পীদের সরকারীভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করার অর্থাৎ শিল্পী-সাহিত্যিক স্রষ্টা রূপকারদের বশ্যতা স্বীকারের মায়াজাল বিস্তার করলেন, মনের ও অর্থের দিক দিয়ে দরিদ্র, ক্ষীণযোগ্যমনস্ক বাঙালি-বুদ্ধিজীবীরা তাতে জড়িয়ে পড়ে জাতির চিন্তাকেই প্রকারান্তরে শৃঙ্খলিত করার কাজে পরম উৎসাহে ও বিপুল উদ্দীপনায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। সেই কালের প্রেক্ষাপটে জাতীয় স্বার্থে, দেশের বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তার শৃঙ্খল মোচনের লক্ষ্যে আবুল ফজল লিখেছিলেন দুঃসাহসী বিবেকী-প্রতিধ্বনির সেই ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, আর উত্তরণ-সম্পাদক এনামুল হক তা প্রকাশ করেছিলেন সব রকমের ঝুঁকি মেনে নিয়ে। শুধু শিল্পীর স্বাধীনতার বিষয়ে পরাধীনতার কঠোর শৃঙ্খলের মধ্যে বসে লেখা এই প্রবন্ধই নয়, সাহিত্য-শিল্পের, সংস্কৃতি-অর্থনীতির তৎকালীন সংকট, শূন্যতা ও নৈরাজ্যের কালে 'উত্তরণ' সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সমস্যাসমূহকে পাঠকসমাজে উপস্থাপন করে মনের দিগন্ত উম্মোচন আর সংস্কারের, নিশূতি অন্ধকারে আলো ফেলবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল।

আবুল ফজল- এর এই রচনাটি (শিল্পীর স্বাধীনতা) প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ভাদ্র- আশ্বিন ১৩৬৬, সেপ্টেম্বর- অক্টোবর ১৯৫৯সনে, আইউব খানের সামরিক শাসন প্রবর্তনের এক বছর, প্রেসিডেন্ট আইউব কর্তৃক করাচীতে 'পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড' বা 'পাকিস্তান লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠার (জানুয়ারী ১৯৫৯) ৮/৯ মাস পরে। তখন এই লেখা প্রকাশ এবং মত প্রকাশের দায়িত্ব স্বীকার করা সমূহ-বিপদের কারণ ছিল। খ্রীস্টপূর্ব ৪১২-৩২২ অব্দের চিন্তাবিদ ডায়োজিনিস এর উক্তির সাহায্যে তিনি ঘোষণা করেন 'মানুষের নিজস্ব বলতে একমাত্র জিনিস হচ্ছে মনের চিন্তা '। আর সেই চিন্তা প্রকাশ করতে গিয়ে সব সময় রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের আরোপিত সুরে কন্ঠ মিলাতে না- পারলেও সব সময় খুব দোষের হয়না। তিনি বলেন: 'রাষ্ট্রের সুরে সুর না মেলালেই মানুষ রাষ্ট্রদ্রোহী হয়না, হয়না রাষ্ট্রের দুষমন বা সমাজের শত্রু'। আরও বলেন ঃ 'যে সব বৃত্তি মানুষকে পশু থেকে পৃথক করেছে তার মধ্যে সবার সেরা হচ্ছে Reason বা যুক্তি।...... যুক্তি তথা reason এর চর্চা অব্যাহত রাখতে, আর সমাজকে নৈতিক ও মানসিক দাসত্বের হাত থেকে বাঁচাতে হলে —স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও সেই চিন্তাকে প্রকাশ ও গ্রহণ করার অধিকার মানতেই হবে— সমাজকে দিতেই হবে সেটুকু স্বাধীকার। নইলে স্বাধীনতার কোন মানেই থাকেনা।" প্রসঙ্গত উল্লেখ করেন- ' 'বাঙলাভাষার প্রায় সব বড় কবি শিল্পী সাহিত্যিকের জন্ম পরাধীনতার যুগে' হলেও তাঁদের রচিত 'সাহিত্য নোবল প্রাইজ পর্যন্ত জয় করে আনতে সক্ষম' হয়েছে, অর্থাৎ তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন এই দিকে যে, এখন স্বাধীন যুগের লেখকেরা পরাধীন যুগের নৈতিক মানসিক সাহস ও স্বাধীকারটুকুও ভোগ করতে পারছেন না। জাতির মননচর্চার বিকাশে স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রশাসকদের হিটলারী মনোভাবকে সমালোচনা করে তিনি উচ্চারণ করেন এই শাশ্বত উক্তি ঃ "সাহিত্য-শিল্পের ঐতিহ্য এত সুদীর্ঘ ও মানুষের আত্মার সঙ্গে তা এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে তার মূলোৎপাটন করতে হলে গোটা মানব-বংশের মূলোৎপাটন করতে হবে। যা করা কোন হিটলার বা তাঁর অনুকারকের পক্ষেই সম্ভব নয়। মানুষ বিকাশধর্মী জীব— তার বিকাশের জন্য এযাবত যত উপায়-উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে নিঃসন্দেহে সাহিত্য-শিল্প শ্রেষ্ঠতম। এই বিকাশ-ধর্ম মানুষের এত সহজাত যে—মানুষকে মানুষ রেখে এর লোপ-সাধন কিছুতেই সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য পোষা বাঘ যেমন পুরোপুরি বাঘ নয়, তেমনি পোষা শিল্পীও খাঁটি শিল্পী নয়। শিল্পীর জন্য স্বাধীনতা— বিকাশের স্বাধীনতা, প্রকাশের স্বাধীনতা অপরিহার্য। যেমন অপরিহার্য পুরোপুরি বাঘ হওয়ার জন্য স্বাধীন অরণ্য-জীবন। সার্কাসের রয়াল বেঙ্গল টাইগারের চেয়ে বনের কেঁদো বাঘ যে অনেক বেশী বাঘ তা বোধ করি সকলেই স্বীকার করবেন। দুর্দান্ত শাসকেরা চিরকালই শিল্পীর স্বাধীনতাকে হরণ করতে ও দমন করতে চেয়েছে। আজও বহু দেশে তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু এসব দুশ্চেষ্টা বারবারই ব্যর্থ হয়েছে, সামনেও হবে। একচক্ষু হরিণের মত ক্ষমতার নেশায় পাওয়া শাসকরা কিন্তু তা দেখতে পাননা বা দেখেও না-দেখার ভান করেন।" ৬৬

লেখকের জন্য স্বাধীনতা কেন অত্যাবশ্যক তা প্রখ্যাত সাহিত্যিক ই. এম. ফরস্টার এর উক্তি উদ্ধৃত করে আবুল ফজল বলেন, তিনটি কারণে লেখকের স্বাধীনতা লেখক ও দেশের জনসাধারণের জন্য অত্যাবশ্যক। ই. এম. ফরস্টার যে তিনটি কারণে লেখকের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন লেখক তা উদ্ধৃত করেন — "প্রথমত লেখককে নিজে বোধ করতে হবে তিনি পুরোপুরি স্বাধীন, তা না হলে সৃষ্টির জন্য ভাল কিছু রচনার তিনি প্রেরণাই পাবেন না। তিনি যদি নির্ভয় হতে পারেন, মনে মনে আত্মস্থ হতে পারেন, সহজ হতে পারেন ভিতরে ভিতরে, একমাত্র তখনই তাঁর জন্য সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ রচিত হবে। দ্বিতীয়ত লেখক শুধু নিজে স্বাধীন এ বোধ করলে চলবে না। স্বাধীনতা হলো লেখকের জন্য প্রাথমিক শর্ত। কিন্তু লেখক ও শিল্পীর আরো কিছু চাই। অর্থাৎ লেখক যা বোধ করছেন তা অন্যকে বলার স্বাধীনতাও তাঁর থাকা চাই। তা নাহলে তাঁর অবস্থা হবে বদ্ধমুখ বোতলের মতো। লেখক শূন্যে বিহার করতে পারেন না — শ্রোতা বা পাঠক না হলে তাঁর চলেনা। তাঁর প্রকাশের পথে অন্তরায় ঘটতে পারে এ আশংকা থাকলে তিনি একদিন অনুভব করতেই ভুলে যাবেন। অনেক সময় শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন রাজকর্মচারিরাও এই সত্যটা বুঝতে পারেন না, ফলে তাঁরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভাল রচনার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান। তৃতীয়ত যদি পড়ার স্বাধীনতা জনসাধারণের না থাকে, লেখকের অনুভূতি যদি তাঁরা গ্রহণ করতে অক্ষম হন তাহলে তাঁদের নিজের অনুভূতি বা অনুভব করবার শক্তিও চাপা পড়ে যাবে এবং তাঁরা থেকে যাবেন অপরিণত— চির immature. কাজেই লেখকের স্বাধীনতা যে শুধু লেখকের জন্যই প্রয়োজন তা নয়। দেশের জনসাধারণের জন্যও তা অত্যাবশ্যক। ... অফিসিয়াল পয়েন্ট অব ভিউ-র রোলার চালাতে গেলেই শিল্প স্বধর্ম হারাতে বাধ্য। শিল্প ও শিল্পী স্বধর্ম হারালে সমাজও স্বধর্ম তথা মানবধর্ম না হরিয়ে পারেনা। সাহিত্যের প্রাণবায়ু ও তার বিচিত্র অনুভূতি থেকে যে সমাজ বঞ্চিত, সেই সমাজ অপরিণত মানুষের সমাজ তথা 'ছোট লোকের সমাজ'। সে সমাজের চাওয়া-পাওয়া, বাসনা কামনাও হবে তেমনি ক্ষুদ্র ও সামান্য। সে সমাজের পক্ষে বড় কিছু করা, মহৎ কিছু গড়া, এমনকি বৃহৎ কিছু আকাঙ্ক্ষা করাও সম্ভব নয়।"

Dhaka University Institutional Repository

লেখক গুরুত্ব দিয়েছিলেন সামরিক শাসনের তথা সাতচল্লিশের স্বাধীনতা-পরবর্তী অসৃষ্টিশীল সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রতি। তিনি শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিক তথা সৃষ্টিশীল ব্যক্তিদের জাতীয়-বৃহত্তর স্বার্থে সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকার আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করে বলেন 'ইংরেজ শাসনামলে আমাদের লেখকেরা অনুভূতি-প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক বেশী নিঃশঙ্ক ছিলেন। তাই মধুসূদনের পক্ষে রামের পরিবর্তে রাবণকে বীর বানানো সম্ভব হয়েছিল এবং নজরুলের পক্ষে, 'খোদার আসন আরশ ছেদিয়া' মাথা তুলে দাঁড়ানো যতো কষ্টই হোক শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছিল। 'বল বীর আমি চির উন্নত শির' এ ধরনের উক্তি কি পাকিস্তান আমলে বিশেষত সামরিক শাসনের সময়ে কোনো লেখকের পক্ষে উচ্চারণ করা সম্ভব ছিল? 'মনের উপর, আত্মার উপর কী প্রচণ্ড জুলুম' এই দেশে? এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য একজন বিবেকবান সাহিত্যিক, জাতির অলঙ্কার একজন সৎ- বুদ্ধিজীবী এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংকট মোকাবিলা করার সামাজিক দায়িত্ব- পালনের লক্ষ্যে প্রকাশিত একটি পত্রিকা কি করে নিশ্চুপ বসে থাকতে পারেন? তাই তাঁদের উচ্চারণ করতে হয় বলিষ্ঠ কণ্ঠে : "এ অসহ্য কূপমণ্ডুকতার হাত থেকে সমাজকে বাঁচাতে হলে শিল্পীকে অভিব্যক্তির স্বাধীনতা দিতে হবে — মেনে নিতে হবে সাহিত্য-শিল্পের এ প্রাথমিক শর্তটুকু।৬৭

এমন প্রগতিশীল সামাজিক ভূমিকার কারণেই পরে প্রকাশের অনুমতি না পেয়ে উত্তরণ অকাল মৃত্যুবরণ করেছিল। সম্পাদক ডক্টর এনামুল হক বলেন : তখন প্রগতিশীলতা, নতুন চিন্তা ছিল পত্রিকা প্রকাশের প্রধান অন্তরায়। বিজ্ঞাপন যতো কষ্টই হোক, পাওয়া যেতো। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রতিবন্ধকতাই তখন ভালো পত্রিকা প্রকাশের প্রধান অন্তরায় ছিলো।৬৮ গতানুগতিক পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো অন্তরায় ছিলনা, নেই এখনও। সবকালের অবস্থাই এক। কিন্তু কোনো পত্রিকা বিশ বছর প্রকাশিত হয়ে যা করেছে উত্তরণ দুবছরেই তা করতে পেরে ইতিহাসের পাতা উজ্জ্বল করতে সক্ষম হয়েছে। বলা বাহুল্য, দু বাঙলার পাঠক সমাজেই উত্তরণ খুব আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়। কাজী আবদুল ওদুদ থেকে আবুল ফজল, শামসুর রাহমান, আবদুল মান্নান সৈয়দ এবং পরিচয়, নতুন সাহিত্য— প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক— সকলেই একবাক্যে উত্তরণের প্রশস্তি গেয়েছেন।৬৯ কিন্তু আইনের বাধা অতিক্রম করে তখন ঐ বয়সে আবুল ফজল সাহেবের দুঃসাহসী ভাষণের জন্য শঙ্কিত হলেন তাঁর বন্ধুরা। তিনি সদ্য চাকুরীজীবন থেকে অবসর নিচ্ছেন (২২ শে নভেম্বর ১৯৫৯ .... অবসর উপলক্ষে সংবর্ধনা জানানো হয়।) এদিকে সামরিক শাসনের ভরা জোয়ার — ভয় ভাবনায় সারা দেশের মানুষের এক মুমূর্ষ অবস্থা। এ প্রবন্ধ (শিল্পীর স্বাধীনতা) বের হওয়ার পর ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঢাকা থেকে অধ্যাপক আহমদ শরীফ লিখে পাঠালেন : "আপনি দেশের উঁচু স্তরের বুদ্ধিজীবীদের মনের কথাই বলেছেন। কিন্তু এসব কথা বলা বা লেখায় আইনের বাধা দুস্তর। এ বয়সে সে দায় আপনার দেহ ও মনের অনুকূল নয়। কথায় বলে 'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গ ভাঙ্গে হীরার ধার।' আমাদের তো তার চাইতেও জঘন্য অবস্থা। জানি বক্তব্য প্রকাশের একটা বেদনা-মধুর আকূতি রয়েছে। আপনি আপনার বক্তব্য লিখে রাখুন কিন্তু কাগজে দেবেন না। উত্তর পুরুষ বা ভাবীকাল আমাদের ভাব-ভাবনার বিচার করবে। তারা উপলব্ধি করবে আমরা পাথুরে প্রতিমা নই, বুদ্ধি আমাদের ছিল, অনুভব করবার মতো একখানা হৃদয়ও ছিল।"৭০

সম্পাদক এনামুল হক-এর সঙ্গে প্রথম সংখ্যার কার্যকরী সম্পাদক হিসেবে মোহাম্মদ ইউনুস এর নাম ছাপা হয়েছিল। পত্রিকার প্রায় সব সংখ্যার প্রচ্ছদ-শিল্পীই কাইয়ুম চৌধুরী। সম্পাদক এনামুল হক কর্তৃক বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩/৪ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা হতে মুদ্রিত ও 'উত্তরণ প্রকাশনী', গ্রীণ হাউস, সিদ্ধেশ্বরী, রমনা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতো। পরে বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে খাজা হাবিবুল্লাহ কর্তৃক মুদ্রিত ও উত্তরণ প্রকাশনীর নতুন কার্যালয়, ৮০ ঝুলন বাড়ী লেন, ঢাকা ১ থেকে প্রকাশিত হত। পৃষ্ঠা ৬৮। পরের দুটো সংখ্যায় অন্য কারো নাম সম্পাদকমণ্ডলীতে উল্লেখ না থাকলেও দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় 'সহ-সম্পাদক' হিসেবে নাম ছাপা হয় ষাট-সত্তর দশকের প্রখ্যাত গল্পকার (একাত্তরের শহীদ, দার্শনিক গোবিন্দচন্দ্র দেবের পালিত পুত্র ছোটগল্পে ১৯৭১ সনে 'বাঙলা একাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত বর্তমানে আমেরিকায় প্রবাসী, সপ্রতিভ তরুণ) জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত-র। দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় জ্যোতিপ্রকাশের সঙ্গে হুমায়ুন চৌধুরীর নামও ছাপা হয়। তৃতীয় বর্ষ প্রথম (বর্ষ শুরু, বিশেষ) সংখ্যার প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা করেন শিল্পী পাশা। কার্যনির্বাহক সম্পাদক ছিলেন মওলা চৌধুরী। নিয়মাবলীতে বলা হয় : "উত্তরণ দ্বিমাসিক-সাহিত্যপত্র। প্রত্যেক ইংরেজী দ্বিতীয় মাসের পহেলা তারিখে উত্তরণ প্রকাশিত হয়। দাম বার্ষিক সডাক তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা আট আনা। পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বার্ষিক সডাক চার টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ আনা। বছরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া চলে। দাম অগ্রিম দেয়। নমুনা সংখ্যার জন্য দশ আনার ডাক টিকিট পাঠাতে হয়। উত্তরণে প্রকাশের জন্য প্রেরিত রচনা সম্পাদকীয় কার্যালয়ে গৃহীত হবার এক মাসের মধ্যে মতামত জানানো হয়। উপর্যুক্ত ডাক টিকিট সঙ্গে থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়।" একটি বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয় : "মতভিন্নতা নির্বিশেষে নবাগত ও প্রতিষ্ঠিত লেখকদের একত্র সমাবেশ" উত্তরণে হবে। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারেও সম্পাদক বলেছেন ঃ " উত্তরণ ছিল প্রগতিশীল নবীন এবং প্রবীণদের সমন্বিত উপস্থাপন-ফোরাম। অপ্রচলিত ধরণের লেখাও উত্তরণে প্রকাশ করা হয়।"৭১ তৃতীয় বর্ষের প্রথম (বর্ষ শুরুর বিশেষ) সংখ্যার 'সম্পাদকীয়'তে বলা হয় ঃ

"সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির মুখপত্র হিসেবে উত্তরণ-এর আত্মপ্রকাশ। কোন আন্দোলন বা মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে উত্তরণ -এর আগ্রহ নেই। মতামত নির্বিশেষে নতুন পুরনো এবং প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিশ্রুতিশীল যে-কোন লেখকের রুচিবান ও পরিচ্ছন্ন লেখা প্রকাশের জন্যে উত্তরণ আগ্রহী। আর এই প্রচেষ্টায় যদি কোন মহৎ প্রেরণা তার মুক্ত-বুদ্ধির আশ্রয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে, তবে তাকে উপেক্ষা না করে তার সহযোগিতাই উত্তরণ -এর উদ্দেশ্য।" সম্পাদকীয়তে তৎকালের সাংস্কৃতিক-সামাজিক পরিস্থিতির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। সম্পাদক যা অস্ফুটে বলতে চেয়েছেন ব্যাখ্যা করলে তার সামাজিক প্রেক্ষাপট বোঝা যায়ঃ "একেই পত্রিকা-প্রকাশের পরিবেশ যেখানে নিরাপদ ও লাভজনক নয় এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশধারা যেখানে স্পষ্ট অথচ সামগ্রিক এক সংকটে আবর্তিত সেখানে কোন সাহিত্যপত্র নিয়মিত প্রকাশ করতে যে-সব অসুবিধে এবং প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, সচেতন পাঠক মাত্রেই তা অনুধাবন করতে পারবেন। এসব সত্ত্বেও উত্তরণ যে তৃতীয় বর্ষে উত্তোরিত হোল তা সম্ভব হয়েছে একমাত্র লেখক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের সক্রিয় এবং অকুণ্ঠ সহযোগিতায়। আরো একটা সুখবর বলতে হবে — দ্বিমাসিক হিসেবে দু বছর চলবার পর এখন থেকে উত্তরণ প্রতি মাসে প্রকাশিত হচ্ছে। আর্থিক স্বচ্ছলতা ছাড়া কোন পত্রিকাই বাঁচতে পারেনা। আর সেটা নির্ভর করে বিষয়-বস্তুর পরিবেশনা, প্রকাশনার মান এবং পাঠকের আগ্রহ ও আর্থিক সঙ্গতির ওপরে। একথা না

Dhaka University Institutional Repository

বললেও চলে, এধরণের সাহিত্য-পত্র সব পাঠককে আকৃষ্ট করেনা এবং এর প্রতিষ্ঠাও তেমনি সময়-সাপেক্ষ। তাই ক্রমাগত ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে এখানকার প্রকাশকরা সীমিত পাঠকের বিচিত্র চাহিদা মেটোবার তাগিদ অনুভব করেন। আর তাতে করেই একই পত্রিকার ভেতরে শিশু থেকে শুরু করে ফুটবল -ক্রিকেট, সচিত্র- সিনেমা এমনকি যৌন-বিষয়াদি পর্যন্ত অন্তর্ভূক্ত করতে দ্বিধা করেন না। আমরা মনে করি, প্রতিটি বিষয়ের সুষ্ঠু পরিবেশনার জন্য পৃথক পৃথক মুখপত্রে প্রয়োজন।

বাঙলা সাহিত্যের সাময়িকী প্রকাশের ক্ষেত্রে এমনিতর সংকট যেমন নতুন নয় তেমনি পরিত্রাণের পথ কন্টকিত হোলেও একেবারে দুরধিগম্য নয়। আন্তরিক ও সৎ-প্রচেষ্টার সফলতায় আমরা বিশ্বাস হারাইনে। তার প্রমাণ উত্তরণের তৃতীয় বর্ষে প্রদাপণ। কিন্তু এই সংকট আরো জটিলতর হচ্ছে তথাকথিত কতক সংস্কৃতিসেবীর নিছক ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির জন্যে। অনেক নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। দেশে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি সাধারণত সংস্কৃতির পরিপুষ্টি ও সমৃদ্ধির লক্ষণ। আর সব পত্রিকাই যে নির্ভেজাল সাহিত্যের বাহন হবে এমনও আশা করা যায় না। ব্যক্তি প্রচেষ্টা হোলেও এদের অভিনন্দন জানাতে হয়। কিন্তু রুচির বিকৃতির সঙ্গে পসারের বিস্তৃতিই যদি কারো লক্ষ্য হয় তবে তাকে প্রশ্রয় দেবার কোন কারণই নেই। সস্তা পর্নোগ্রাফী ও উদ্দেশ্য এবং আদর্শহীন নিম্নমানের অসংখ্য সিনেমা-পত্রিকার প্রকাশ (এখানে উল্লেখযোগ্য, ঢাকা থেকে প্রকাশিত সিনেমা-পত্রিকা সংখ্যায় এ পর্যন্ত ঢাকা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত সবাকচিত্রের সমষ্টির কয়েকগুণ বেশী) সুস্থ সমাজমন গঠনের পক্ষে অসম্ভব রকমের ক্ষতিকর। এহেন অপচেষ্টার প্রতিরোধের জন্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহল থেকে দাবী উঠেছে। সুধীজনের আগ্রহশীল প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি সরকারের অশ্লীলতা-প্রতিরোধ আইনের অবমাননা করে কিভাবে এগুলোর প্রসার দিনদিন বেড়ে উঠছে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।"[৭২]

উপরের বক্তব্যে পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে ১৯৬০ সনের বাঙলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক পরিস্থিতির কিছু বিবরণও পাওয়া যায়। তাছাড়া প্রত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলীও তৎকালে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। যেমন প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যাতেই সাংস্কৃতিক সংকটের ও ধর্ম, জাতীয়তা এবং পূর্ববাঙলার মানুষের জাতিসত্তার গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের কালে 'ধর্ম ,জাতি, আমরা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখক দ্বিজেন শর্মা 'সমকাল' পত্রিকার প্রথম বর্ষ সপ্তম-অষ্টম সংখ্যায় মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম প্রণীত 'পূর্ব বাঙলার সংস্কৃতি সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা করে বলেন ঃ "ধর্মের পরিমাপে জাতির পরিচয় হয়না। কিংবা ধর্মকে জাতীয় চরিত্র বিকাশের সহযোগী উপাদান বলেও স্বীকৃতি দেয়া যায়না। যদিও বহুল প্রচারিত। তবু ও এ-প্রসঙ্গে স্বাধীনতা-উত্তরকালে পাকিস্তানী জাতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কায়েদে আজমকৃত উক্তির পুনঃস্মরণ অপ্রাসংগিক নয়। যুক্ত নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে পার্লামেন্টে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর বক্তৃতায়ও এই সত্য অস্বীকার করতে পারেননি। ধর্ম জাতীয় চরিত্রের নিয়ন্তা নয়। জাতীয় চরিত্র ইতিহাস নির্দিষ্ট বিশেষ কালের জীবন-সংগ্রাম ও পরিপার্শ্বের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। ধর্মের ঐতিহাসিক ভূমিকার গুরুত্ব অস্বীকারের প্রশ্ন অবাস্তব। ধর্মকে বর্জন করে সভ্যতার পরিচয় পূর্ণ হয়না। কিন্তু সভ্যতা সংস্কৃতি গতিশীল। গতির অস্তিত্ব অস্বীকার করে এ সম্পর্কে কোন বিশ্লেষণই শুদ্ধ হতে পারে না। কারণ গতিই সত্যের আত্মা। সভ্যতা সংস্কৃতির গতিশীলতার রহস্য সুধীজনের সুপরিজ্ঞাত। উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বই ঐতিহাসিক গতির মৌল উৎস। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই অসভ্য সমাজ থেকে আজকের সর্বাধুনিক সমাজব্যবস্থার ক্রমবিবর্তন ব্যাখ্যা সম্ভব। বিরোধী-শক্তি প্রবাহের দ্বন্দ্বে পুরাতনের বিলোপ আর নতুন আবির্ভাবের হেগেলীয় তত্ত্ব বিজ্ঞানসিদ্ধ এই সূত্র থেকে ইতিহাস-ব্যাখ্যা মার্ক্সের মহৎ কীর্তি। .... জাতি আধুনিক কালের সৃষ্টি। ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে জাতির আত্মপ্রকাশ অন্বিত। ধর্মের সামাজিক ভূমিকা যখন শেষ, জাতি অভ্যুদয়ের তখন শুরু। তাই ধর্ম জাতিগঠনের কারণ হতে পারেনা।জাতি সমস্যা পর্যালোচনায় অধুনা নিন্দিত জে. ভি. ষ্টালিনের খ্যাতি অনন্য সাধারণ। তাঁর সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়। 'ধর্মীয় আচরণ কিংবা অতীতের স্মৃতি জাতীয় ভাগ্যের নিয়ামক নয়। জাতীয় বৈশিষ্ট্য, জীবন শর্ত ও পরিপার্শ্বের প্রতিফলন'। তাই পূর্ব পাকিস্তানে জাতিগঠনের কারণ আমাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য নয়। রাষ্ট্র, অর্থনীতি, ভাষা, সংস্কৃতি, জাতীয় বংশানুক্রম এবং ঐতিহাসিক নিয়মে নির্দিষ্ট বিশেষ কালই আমাদের জাতি গঠনের মুখ্য উপাদান এবং এদের বিকশিত অবস্থাই জাতি গঠনের কারণ।"[৭৩]

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় 'অনুবাদ সাহিত্য প্রসঙ্গে' প্রবন্ধ রচনা করেন টিপু সুলতান। বিশিষ্ট সমাজ-বিজ্ঞানী প্রফেসর এ. কে. নাজমুল করিম এর লেখা একটি প্রবন্ধ 'উনবিংশ শতাব্দী ও স্যার সৈয়দ আহমদ' এবং একাত্তরের শহীদ বুদ্ধিজীবী, শহীদুল্লাহ কায়সার ছদ্মনামে একটি রচনা (ছোটভাই শহীদ জহীর রায়হানের মাধ্যমে উত্তরণ সম্পাদক-এনামুল হক সংগ্রহ করেছিলেন লেখাটা[৭৪] লিখেছিলেন পাকিস্তানের 'প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যর্থতা কোথায়?' কবিতা লিখেছিলেন ঃ সানাউল হক, আতাউর রহমান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং 'ব্যক্তিগত' শিরোনামে নিবন্ধ লিখেছিলেন আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। জহির রায়হান এবং শওকত আলী লিখেছিলেন গল্প। টি . এস. এলিয়ট এবং তাগুসুজো ইশিকওয়া-র কবিতা ও গল্প অনুবাদ করেছিলেন যথাক্রমে মাহমদু হাসান ও আনোয়ার জাহিদ। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় আলাউদ্দিন আল আজাদের প্রখ্যাত নাটিকা, 'মরক্কোর জাদুকর'। আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রণীত গল্প-গ্রন্থ 'অন্ধকার সিঁড়ি' (১৯৫৮) র সমালোচনা লেখেন মাহমুদ শাহ কোরেশী এবং রফিকুল ইসলাম লেখেন 'সমকাল' পত্রিকার প্রথম বর্ষের সংখ্যাগুলোর মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণধর্মী একটি সমালোচনা। ফাইন-আর্টসের আলোচনা এবং অনেক ছবি ছাপা হতো এপত্রিকায়। প্রায় নিয়মমতো একটি না একটি (শিল্প অথবা শিল্পসংক্রান্ত আলোচনা) বিষয় প্রতি সংখ্যাতেই থাকতো। 'ত্রয়ী শিল্পীর চিত্রপ্রদর্শনী' শিরোনামে প্রথম সংখ্যায় সাদেক খান লিখেছিলেন পূর্ববাঙলার চিত্র শিল্পের পর্যালোচনা।

অন্যান্য সংখ্যাতে প্রবন্ধ লেখেন কবীর চৌধুরী (আমাদের নাটকের কথা, ১/২); রনেশ দাশ গুপ্ত (উপন্যাসের শিল্পকলাগত গতিপ্রকৃতি, ১/২; যার নাড়ীতে বাজে সুর—সাহিত্য শিল্প সমালোচনা, ২/১; কবিতার রহস্য ভাষা— মাতৃভাষা, ২/৩; দীননাথ সেন (পূর্ব পাকিস্তানের লোকসঙ্গীতের ধারা, ১/২); আতাউর রহমান (বাঙালী মুসলিম সাহিত্যকদের ধারা, ১/৫-৬); হাবীবুর রশীদ (আধুনিক কবি ও কবিতা, ১/৫-৬); আবুল ফজল (শিল্পীর স্বাধীনতা, ২/১) এ. কে. নাজমুল করিম (সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্যে অশ্লীলতা, ২/২); আহমদ শরীফ (নর-সুন্দর, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, ২/২); আব্বাস উদ্দীনের জীবন ও সংস্কৃতি

Dhaka University Institutional Repository

চেতনার উপর লিখেছিলেন কামরুল হাসান এবং জয়নুল আবেদীন (২/৩)। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রাপ্ত সংখ্যাগুলোতে (প্রথম বর্ষের ৩ ও ৪ এবং দ্বিতীয়বর্ষের ৪, ৫, ৬ সংখ্যাগুলো অনুসন্ধানে পাওয়া যায়নি) কবিতা লেখেন হাসান হাফিজুর রহমান (১/২; ২/২); ডি. এইচ. লরেন্সের অনুবাদ করেন সেবাব্রত চৌধুরী (১/২); আবদুস সাত্তার (১/২); আল মাহমুদ (১/২); সৈয়দ শামসুল হক (১/৫-৬; ২/৩); আবদুর রশীদ খান (১/৫-৬); ফয়েজ আহমদ ফয়েজ (অনুবাদক রনেশ দাশ গুপ্ত (১/৫-৬; ২/৩); হামিদুজ্জামান খান চৌধুরী (১/৫-৬) সেবাব্রত চৌধুরী (২/১); হাবীবুর রহমান (২/১); আবদুল গনি হাজারী (২/১); শামসুর রাহমান (২/১); আহসান হাবীব (২/২); আবু বকর সিদ্দিক (২/২); লু-স্যুন (অনুবাদ, ২/২); নুরুল আরেফিন (২/২); বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (২/৩); কমলেশ সেন (২/৩); প্রমুখ। গল্প লেখেন ঃ শওকত ওসমান (১/২); জনস্টেইনবেক (অনুবাদ রেজাউর রহমান (১/২); মনিরুজ্জামান (১/২; ২/২); জ্যোতি প্রকাশ দত্ত (১/৫-৬); আরস্কিন কডওয়েল (অনুবাদ?, ১/৫-৬); আবদুস শাকুর (১/৫-৬); আহমদ মীর (২/১); হুমায়ুন কাদির (২/১); টিপু সুলতান (২/৩)।

জহির রায়হানের প্রখ্যাত উপন্যাস 'বরফগলা নদী' (১৯৬৯) উত্তরণের কয়েক সংখ্যাতেই ধারাবাহিকভাবে প্রথমে প্রকাশিত হয় – যার বিষয়বস্তু প্রণয়নে লেখককে সমকালীন সমাজব্যবস্থাই প্রধানভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এতে বিবৃত হয়েছে ঃ 'ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবারের সামগ্রিক ধ্বংসের কাহিনী।.... বিষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মধবিত্ত পরিবারের সংকট বহুমুখী। আর্থিক দুরবস্থার সঙ্গে উন্নত জীবন কামনার সংকট, পুরানো মূল্যবোধের সঙ্গে নতুন মূল্যবোধের সংঘাত, শ্রেণী উত্তরণ প্রয়াসের সঙ্গে কল্যাণকামী আদর্শবোধের দ্বন্দ্ব মধ্যবিত্তপরিবারে ব্যাপক আকারে পরিলক্ষিত ....। এসব দ্বন্দ্ব রূপায়িত করে 'বরফগলা নদী'র কাহিনী গড়ে উঠেছে।"[৭৫] গল্পগুলোতেও সমাজ-ব্যবস্থার অকপট রূপায়ন আছে, কিন্তু শহুরে, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিচ্ছবি আঁকতে যতোটা মনোযোগী, ততোটা নন, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের আর শহর ও গ্রামের বিভিন্ন এলাকার খেটে খাওয়া মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে। তবু এইসব গল্প, উপন্যাস পূর্ববাঙলার সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হয়। 'মরক্কোর যাদুকর' নাটিকা ছাড়াও এনামুল হকের বহু-খ্যাত (অভিনীত/মঞ্চস্থ) নৃত্য-নাট্য 'উত্তরণের দেশে' (১৯৬১) প্রথম প্রকাশিত হয়েছে 'উত্তরণ'- এই। দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ ও বিপ্লবী ভাবে-অনুভবে-উদ্দীপিত এই নৃত্যনাট্য ভোক্তাদের শিল্পরস-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য তখন পূর্ববাঙলায় একমাত্র পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অণুপ্রেরণায় লেখক যখন পূর্ণাঙ্গ নৃত্য-নাট্য 'উত্তরণের দেশে' রচনা করেন, তখন পর্যন্ত দুই বাঙলায় কোনও লেখক তা করেন নি। গ্রন্থ-চিত্র-প্রভৃতি শিল্প-সাহিত্যের সমালোচনায় উত্তরণে অংশ নিয়েছিলেন পূর্ববাঙলার প্রধান সমালোচক-সপ্রাবন্ধিকদের উজ্জ্বল-একাংশ— সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, আনোয়ার জাহিদ, মুহম্মদ আবদুল হাই, বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবদুল গনি হাজারী, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, আবদুস সাত্তার, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, হাবিবুর রহমান, খান আতাউর রহমান, কামরুল হাসান প্রমুখ।

উত্তরণের ৩য় বর্ষের আরম্ভ-সংখ্যাটি সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশেষ সংযোজন। সম্পাদক যা সম্পাদকীয়তে লিখেছেন তাতে 'প্রয়োজন বোধ' কথাটা অত্যন্ত তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনায় আনলে পত্রিকার সমাজ-সচেতনতার মাত্রা উপলব্ধি করা যায় ঃ "প্রয়োজনবোধে পরিকল্পিতভাবেই উভয় বাঙলার লেখকদের লেখা নিয়ে বর্ধিত কলেবরে বর্ষশুরু সংখ্যা বের হোল। উল্লেখযোগ্য অনেক লেখকের লেখাই সময় ও স্থানাভাবে প্রকাশ করা গেলো না।" পত্রিকাটি সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্য সম্পর্কে কি মনোভাব পোষণ করতো সম্পাদকীয় থেকেই একটি উক্তি উদ্ধৃত করে তার পরিচয় নেয়া যায় ঃ "একথা নতুন করে বলতে হবে না যে, স্বাধীনতা-উত্তর কালে বাঙলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা দুই স্বতন্ত্র জীবনবোধ এবং মূল্যায়ণে প্রবাহিত। এই স্বাতন্ত্র্য হয়তো ক্ষীণ এবং অনেকের মানসিকতায় তা বিসদৃশ্য ঠেকবে। কিন্তু এই সত্যকে অস্বীকার করা নিতান্তই বাস্তববর্জিত মনের পরিচায়ক হবে। তবে ভাষার ঐক্যবোধে রাষ্ট্রের পরিধি পেরিয়ে সাহিত্যের যে আত্মীয়তা তা খুবই স্বাভাবিক। আর সে জন্যই পরস্পরকে জানবার এবং জানাবার প্রয়োজনে এধরনের 'সংকলন-জাতীয়' বিশেষ-সংখ্যা প্রকাশের আয়োজন।"[৭৬] একনজরে এর বিষয়-অনুসারী শ্রেণীবিন্যাসিত সূচীপত্রের দিকে তাকালেই বোঝা যায় এঁদের আয়োজনের, আন্তরিকতার— মূল্য কতটা। "উত্তরণ সাহিত্যপত্র বর্ষ শুরু সংখ্যা। তৃতীয় বর্ষ । ভাদ্র ১৩৬৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬০; পৃ ২৭৫ + বিজ্ঞাপন ৪১; দাম দুই টাকা; নিউজপ্রিন্ট, সাইজ সাড় নয় ইঞ্চি × সাড়ে সাত ইঞ্চি।'

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

প্রবন্ধ। আবুল ফজল ।। সাহিত্যের ঐতিহ্য ; রণেশ দাশগুপ্ত।। নৈরাশ্যবাদের বিরুদ্ধে—অব্যাহত সাহিত্যের জন্যে; গোপাল হালদার।। আন্তন চেকফ ও সাহিত্যের পটভূমি; এ. কে. নাজমুল করিম।। সাম্প্রতিক সাহিত্য শিল্পের সমস্যা ; সাদেক খান।। পূর্ব পাকিস্তানের সমকালীন চিত্রকলা ; অজিত কুমার গুহ।। যে উপন্যাস লেখা হয়নি ; খান আতাউর রহমান।। বাঙলায় লঘু সঙ্গীতের আধুনিক রূপ; আতোয়ার রহমান।। সাম্প্রতিক শিশু-সাহিত্যের সমস্যা।

উপন্যাস ।। সৈয়দ শামসুল হক।। সীমানা ছাড়িয়ে

গল্প ।। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ।। মৌচাক; শওকত ওসমান ।। ওঝার মৃত্যু; সমরেশ বসু ।। বাসিনীর খোঁজে; দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।। জটায়ু; এনামুল হক।। বৃহস্পতি শুক্রশানি; নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ।। বাঁচবার জন্যে; সত্য গুপ্ত ।। ইরফান গাজীর ঘোড়া; বিমল কর ।। ভূগোল; সন্তোষকুমার ঘোষ ।। ছায়া হরিণ; জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত ।। সাজানো ফুলের বাগান; হুমায়ুন চৌধুরী ।। শেষ অংকের নায়ক;

কবিতা ।। আল্লামা ইকবাল ।। চিত্রি ও শিল্পী (অনুবাদ ঃ ব. নজির আহমদ); বিষ্ণু দে ।। অন্য অন্ধকার; ফররুখ আহমদ। সফর –নামা; আবদুর রশীদ খান ।। বিমুগ্ধ সন্ধ্যা; বিমলচন্দ্র ঘোষ ।। খাড়া রোদ; সানাউল হক। শিশির; শুদ্ধসত্ব বসু।। হরিণী; ফয়েজ আহমদ ফয়েজ।। কারাগারে সন্ধ্যা (অনুবাদ : রণেশ দাশ গুপ্ত); আহসান হাবীব। যখন বিরতি; মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ।। হাসো; সুভাষ মুখোপাধ্যায় ।। বারুদের মত; সিকানদার

আবু জাফর ।। সোনা-স্বপ্নের বীজেরা মরেনা; আবদুল গনি হাজারী ।। বৃষ্টির জন্য; তালিম হোসেন ।। রাতদিন; হাবীবুর রহমান ।। একটি ফুলের জন্ম; আতাউর রহমান।। ছায়ার দিন; রাম বসু ।। অক্লান্ত শূন্যতা তুমি; চিত্ত ঘোষ ।। নিয়ত নদীর জল; আশিস স্যান্যাল ।। একটি চতুর্দশপদী; শামসুর রাহমান।। আজীবন আমি; হাসান হাফিজুর রহমান।। স্বদেশ আমার; বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর।। রোদের তিথিকে খোলে ; আল মাহমুদ।। নিজের দিকে ; মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ।। উদ্বেল মুখর নদী; আবদুস সাত্তার ।। খড়ি মাটি রেখা; ফজল শাহাবুদ্দীন ।। একাকী যন্ত্রণা; ওমর আলী।। ভীরু মেয়ে; দেবব্রত চৌধুরী ।। জোনাকী জ্বলে শুধু; সেবাব্রত চৌধুরী ।। মুহূর্তগুলি; কমলেশ সেন।। বন্দুকের কুঁদোর মত মানুষ; মনজুরে মওলা।। গানে আর গানে; জিয়া হায়দার ।। যন্ত্রণা থেকে; আবু বকর সিদ্দিক ।। রোগের মৃত্যু নেই; বেগম সুফিয়া কামাল ।। এ পৃথিবী বড় মনোরম; লতিফা হিলালী ।। বৃষ্টির প্রহর;

রম্য -রচনা ।। বুলবুল ওসমান ।। পা ; কাব্য-নাটক ।। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।। কর্ণফুলী ; গ্রন্থ সমালোচনা ।। অধ্যাপক উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য (কলকাতা ১৩৬৪) প্রণীত বাঙলার বাউল ও বাউল গান : আলোচক আহমদ শরীফ; অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ সম্পাদিত (১৯৬০, ঢাকা) কৃষ্ণকান্তের উইল: আলোচক আনিসুজ্জামান; অধ্যাপক মীর আবুল হোসেন কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'নজরুল সাহিত্য': আলোচক ফজলুল আলম ; চিত্র শিল্প ।। কামরুল হাসান। নববধূ (রঙীন ৪ রং) ; মোহাম্মদ কিবরিয়া ।। মাছ (রঙীন ঐ) পাবলো পিকাসো।। প্রথম পদক্ষেপ; জয়নুল আবেদীন।। গুন্টানা; শফিউদ্দিন আহমদ ।। বন্যার কবলে ; আমিনুল ইসলাম।। আসন্ন বর্ষণ ; মুর্তজা বশীর।। মাছ ; আবদুর রাজ্জাক ।। একটি মুখ ; রশীদ চৌধুরী ।। কাক ; কাইয়ুম চৌধুরী ।। কাক; আবদুল বাসেত ।। ফুল ও ফুলদানী।

এই সংখ্যার চিত্রগুলো স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করলেও একটি এ্যালবাম-এর মূল্য দিতে হয়। পূর্ববাঙলার প্রধান দশজন শিল্পীর এক গুচ্ছ চিত্রের একটি সংগ্রহ এটা। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধও তাই। এক একটি সংকলন যেন। পূর্ববাঙলার একটি প্রধান পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস 'সীমানা ছাড়িয়ে' (১৯৬৪) প্রথম এই পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। বাঙলাদেশের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক সৈয়দ শামসুল হকের লেখা ঐ উপন্যাসের বিষয়বস্তুও স্বাধীনতা-উত্তর সমাজ-রাজনীতি আর সাংস্কৃতিক অবক্ষয়-জনিত জীবন-যন্ত্রণা ও বোধের প্রকাশ। উপন্যাস-শেষে লেখক পাদটীকায় সংযোজন করেছেন এই মন্তব্য ঃ " বর্তমান উপন্যাসে আজাদীর পরবর্তী এক বিশেষ সময়ের (১৯৪৭-৬০) উপলব্ধিকে রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।" 'রাজনৈতিক আদর্শের ব্যর্থতা' প্রেমের ব্যর্থতা ও শিল্পীর ব্যর্থতা— এই তিনটি ব্যর্থতার কাহিনী নিয়ে সীমানা ছাড়িয়ে', যদিও কাহিনী পরিচর্যায় সংহতি ও সুসংবদ্ধতার অভাব আছে বলে সমালোচকেরা[৭৭] উল্লেখ করেন,কিন্তু সমকালীন রাজনীতি ও সমাজ-সমালোচনার শিল্প-সাহিত্যকে কালের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করেই সদর্থক কিছু মূল্য দিতে হয় বলে পত্রিকার অবদানকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মেনে নিতে হয়।

উত্তরণের প্রাবন্ধিকেরা— বিশেষ করে আবুল ফজল, রণেশ দাশ গুপ্ত, আতোয়ার রহমান, গোপাল হালদার, এ. কে. নাজমুল করিম, অজিত কুমার গুহ, কাজী মোতাহার হোসেন, টিপু সুলতান প্রমুখ যে-সমস্ত আলোচনা করেছেন, তাতে পূর্ব বাঙলার সাহিত্য-পরিস্থিতির তৎকালীন সমস্যাসমূহ প্রকটিত হয়েছে। কেউ কেউ সমাধানও নির্দেশ করেছেন। ফল যা-ই হোক, বড় প্রাপ্তি হলো পাঠকদের সম্মুখে জাতীয় অভাবটাকে, শূন্যতা, ক্ষীণতাকে তুলে ধরে যে হতাশার সৃষ্টি করেছিলেন উত্তরণ-কর্তৃপক্ষ— তাতে পাবার, গড়বার, সৃষ্টি করাবার তথা সংগ্রামের আকূতি ও প্রেরণা তৈরী হয়েছিল। লেখক-শিল্পী সাহিত্যিকদের মনের গভীরতর স্তরে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল তখন তা ব্যর্থ হয়নি। পরবর্তীকালে যে উন্নতর সমাজ ও জীবন ঘনিষ্ঠ, সৃষ্টি-মনস্ক সাহিত্য শিল্প সৃষ্টি হয়েছে বাঙলাদেশে— তার সূচনা পটভূমি এবং গৌরচন্দ্রিকা রচনায় উত্তরণের অবদান কালিক মাপকাঠিতে অতুলনীয় বিবেচিত হবে, সন্দেহ নেই। উত্তরণ এর প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় টিপু সুলতান সাংস্কৃতিক-প্রশ্নে উচ্চকিত হয়ে লেখেন ঃ 'সাংস্কৃতিক চেতনার মাধ্যমে আমরা জানতে চাই নিজেদের মানস সম্পদকে। .... আজকের দিনে তাই সাহিত্য সংস্কৃতি আমাদের কাছে একটা ব্যাপক আবেদন এনে হাজির করেছে। তাকে সঠিকভাবে বিচার করতে গেলে আমাদের উদার মনোভাবের প্রয়োজন দেখা দেবে। নিরপেক্ষতার আদর্শে তাকে বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদের সংকীর্ণতাকে পরিহার করে মুক্ত বুদ্ধির আশ্রয় নিতে হবে। বর্তমান কালের সাহিত্য সংস্কৃতির মৌলিক প্রশ্নগুলোও আজ শ্রেণী ও জাতীয় স্বার্থের উর্ধে স্থান পাওয়ার দাবী জানাতে শুরু করেছে। একথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে মানবের সামগ্রিক মঙ্গল কামনার শুভবুদ্ধির উপর যে মহতি সাহিত্য-সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি রচিত হতে চলেছে শ্রেণী ও জাতীয় স্বার্থের সংকীর্ণতায় আজ আমাদের নিরবচ্ছিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মন তার সাথে হিংসাত্মকভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। একথাও সত্য যে বিশ্বের প্রত্যেকটি জাতি হয়তো সামাজিক প্রয়োজনের খাতিরেই ইতিহাসের একটি বিশেষ কালে তার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে স্বাদেশিকতার কঠিন প্রাকারের মাঝে আবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু সাহিত্য সংস্কৃতি তার ভেতরের আপন শক্তিতেই সেই প্রাকার ভেংগে ফেরারী কয়েদীর মত ছুটে চলেছে দূর হতে দূরের পানে। গ্রীক-সাহিত্য-সংস্কৃতি বন্দী হয়ে থাকেনি গ্রীক নগর-রাষ্ট্রের ছোট্ট সীমানার মাঝে।' (উত্তরণ, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ ৬)

লেখক আরও বলেন ঃ 'পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলবার পথে সবচেয়ে বড় সহায় হলো উভয় অংশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরস্পর আদান প্রদান। এই সাহিত্য সংস্কৃতির বিনিময়ের মাধ্যমে আমাদের মাঝে গড়ে উঠবে নিবিড় আন্তরিক সম্পর্ক, জাগ্রত হবে বৃহত্তর জাতীয়তাবোধ, নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল হবে দৃঢ়তর। জাতীয় সাহিত্যের মহতি উৎসবের দিন আজো আমাদের আসেনি। তারই প্রতীক্ষায় আমাদের সাহিত্য-সাধনায় লিপ্ত মনের পিপাসা যেদিন সাহিত্য সঙ্গীত ও চিত্রকলার প্রাচুর্যের সমাহারে নিবৃত্ত হবে সেদিন দেশের বুকে প্রবাহিত হবে উচ্ছল প্রাণধারা আর মানুষের মুখে ফুটবে অজস্র হাসি। আমরা সেই সোনালী যুগের সাধক।'[৭৮]

সমাজ অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রীয় সমস্যা নিয়ে ভাবনায়ও উত্তরণ কখনও পিছিয়ে থাকতে চায়নি। ১৯৫৮ সনের শেষের দিকে পাকিস্তানের সামরিক শাসনের দীর্ঘ দশকের শুরুতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যর্থতা এবং পূর্ববাঙলার, তথা পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের প্রতি পাকিস্তানী-ঔপনিবেশিক শোষকদের অর্থনৈতিক আচরণের (বা শোষণের) চিত্র তুলে ধরে পাঠক-সমাজের চৈতন্যবোধের জাগরণ সৃষ্টিতে উত্তরণ যে দায়িত্ব পালন

Dhaka University Institutional Repository

করেছিল, বলাবাহুল্য গুরুত্বের সংগেই — তাও উল্লেখযোগ্য ঃ

অর্থনৈতিক বিষয়ের আলোচক বলেন, পাকিস্তানের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার কথা মনে রেখে, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য বা ব্যর্থতা বিচার করতে হবে। লক্ষণীয় যে দেড় শতাধিক বৎসর কাল বিদেশী শোষণ ও শাসনাধীনে থাকার ফলে পাকিস্তানের অর্থনীতি শিল্পে অনগ্রসর, কৃষি প্রধান। আজাদী প্রাপ্তিকালে জাতীয় অর্থনীতির মূল চাবিকাঠি বিদেশীদের হাতে থাকার দরুণ স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠনের ঐতিহাসিক পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কৃষি-অর্থনীতির উপর সামন্তবাদী ভূমি-ব্যবস্থার প্রাধান্য আছে। তাছাড়া পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ভৌগলিক ব্যবধানের কথাও মনে রাখা দরকার কোনো পরিকল্পনা প্রণয়ন বা কার্যকরীকরণ-এর পন্থা ও লক্ষ্য নির্ধারণের সময়। এই প্রেক্ষিতে "প্রতিবাদের আশংকা না করেই বলা চলে যে পাকিস্তানের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনার সীমিত লক্ষ্যটুকুও বাস্তবায়িত হতে পারেনি। দেশের রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী, বুদ্ধিজীবী প্রত্যেককেই এই ব্যর্থতার কারণগুলো সঠিকভাবে নির্ধারণে যত্নবান হতে হবে এবং সে কারণ দূর করতে সচেষ্ট হতে হবে।" তিনি আরও মন্তব্য করেন ঃ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রণয়ন, লক্ষ্য নিধারণ ও বাস্তবায়িতকরণের জন্য নির্ধারিত পন্থার মধ্যেই যে বর্তমান বিফলতার বীজ লুকানো রয়েছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যর্থতার অন্য একটি কারণ হোল বৈদেশিক পুঁজি, ঋণ ও বৈদেশিক সাহায্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা। এই নির্ভরশীলতার পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে বাংলাদেশের প্রকৃত স্বাধীনতা কতোটা ক্ষুন্ন হয়েছে, তা সকল দৃষ্টিক্ষমই অনুভব করতে পারেন। তখনই উত্তরণ এব্যাপারে সতর্ক করতে চেয়েছিল। তাঁরা পরিকল্পনায় নির্ধারিত অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা দেখিয়ে এই নির্ভরশীলতার ছবি পরিস্ফুট করেন। সংশোধিত পরিকল্পনার অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা নিম্নরূপ ঃ

উৎস	পরিমাণ (কোটি টাকায়)
সরকারী সঞ্চয়	১০০.০০
বেসরকারী সঞ্চয়	৫৬০.০০
মোট সঞ্চয়	৬৬০.০০
বৈদেশিক পুঁজি ঋণ ও সাহায্য	৪২০.০০
	১০৮০.০০

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সর্বমোট ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশের বেশী অংশ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৩৯ ভাগ অর্থই বিদেশী পুঁজি, ঋণ বা সাহায্য-লব্ধ অর্থ থেকে আসছে। 'কোন দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার এক তৃতীয়াংশেরও বেশী বৈদেশিক অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল— এ কল্পনাও করা যায় না। বাস্তব অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করা গেছে যে বৈদেশিক সাহায্যের উপর এই অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা প্রতি পদে পদে পরিকল্পনা রূপায়নে দুর্লঙ্ঘনীয় বাধার সৃষ্টি করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ দফতর কর্তৃক নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে যে বৈদেশিক সাহায্যের অনিশ্চয়তা ও শর্তাবলী অনেক বড় পরিকল্পনার রূপায়নে বাস্তব অসুবিধার সৃষ্টি করেছে।' তাঁদের আলোচনায় একথা স্পষ্ট করে বলা হয় যে, পাকিস্তানের দুই অংশের ভৌগলিক ব্যবধানজনিত যে বৈশিষ্ট্য, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তা সম্পূর্ণভাবেই অস্বীকৃত হয়েছে। ফলে দুই অংশের অসম বিকাশ জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর ভারসাম্য বিনষ্ট করে এক জটিল প্রক্রিয়ার সূচনা করেছে। বৈষম্য-নীতির পরিচয় দিয়ে লেখক আরো বলেন ঃ

পাকিস্তানের মোট লোক-সংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ পূর্ব -পাকিস্তানে। পাকিস্তানের মোট আয়তন হোল ৩৬৫ হাজার বর্গমাইল। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন হোল ৫৪ হাজার ১৪১ বর্গমাইল। পূর্ব পাকিস্তানে প্রতি বর্গমাইলে লোক সংখ্যা হোল ৩১৫। এ অবস্থায় উভয় অংশের সম-বিকাশের স্বার্থে সমগ্র পরিকল্পনার শতকরা ৬০ ভাগই পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়নমূলক ও শিল্প-গঠনের শতকরা ৮০ ভাগই কেন্দ্রীভূত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। দুই অংশের বিরাট ভৌগলিক ব্যবধানের জন্য এক অংশ থেকে অন্য অংশে মাল ও শম চলাচলের পূর্ণ স্বাধীনতা নেই। ফলে এক অংশের উন্নতি বা শ্রী বৃদ্ধি অন্য অংশে প্রতিফলিত হয়না। এক অংশের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা অন্য-অন্য অংশের আয়বৃদ্ধিতে সহায়তা করেনা। বস্তুত আজাদীর পর হতে দুই অংশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভিন্ন ধরনে ও ভিন্ন গতিতে বেড়ে উঠছে। অন্য কোন দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় এমন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়না। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এ-বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করার ফলে আজাদী-উত্তরকালে পূর্ব-পাকিস্তানের জীবন-যাত্রার মান ক্রমশঃ নিম্নমুখী হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় পাকিস্তানের সামগ্রিক ও সুসম বিকাশের স্বার্থে, স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি গঠনের জন্য উপরোক্ত দুর্বলতাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী কার্যকরী হবে বলে সকলেই আশা করেন। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের বিশেষ পশ্চাৎপদতার প্রতি লক্ষ্য রেখে নয়া পরিকল্পনা রচনা আজ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। [৭৯]

সার্বিকভাবে পত্রিকায় যে সুর ফুটে উঠেছে তা হলো অসাম্প্রদায়িকতা, অবিভক্ত বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্যে আস্থাশীলতা, সাম্যবাদ, মানবতাবাদ এবং সাহিত্য-শিল্পে উচ্চতর আদর্শের অনুরাগী সৃষ্টিশীলতার প্রবর্তক। সেকালে এরূপ সাহিত্য পত্রিকা প্রায়ই প্রকাশিত হতোনা। পাকিস্তান আমলে যে মুষ্টিমেয় বাংলা সাহিত্যপত্রিকা জাতির গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে চেয়েছে— উত্তরণ তাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

১০. পলিমাটি (১৯৬৪-৯৪)

ষাট দশকের সংগ্রামী তারুণ্য, প্রতিবাদী কবি ফজলুল হক সরকার (১৯৪৪) সম্পাদিত ব্যতিক্রমী চিন্তা-সম্পদে-পূর্ণ প্রগতিশীল সাহিত্যসাময়িকী 'পলিমাটির'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের 'বসন্ত' ঋতুতে; একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা-শহীদদের স্মৃতি-সংখ্যারূপে 'কালের যাত্রার ধ্বনি' শোনাবার ব্যাকুল আগ্রহে। কালের হিসেব কষে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের আর্থ-রাজনীতিক-সামাজিক পরিবেশ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ১৯৬৬ সনের ফেব্রুয়ারিতে ছয়-দফা-আন্দোলন আরম্ভের সমকালে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, রীতি-নীতি, বৈষম্যে-বিক্ষুব্ধ দেশ-প্রেমিক প্রতিবাদী তরুণ-সমাজের মুখপত্ররূপে যখন 'পলিমাটি' আবির্ভূত হলো, —তখন, এদেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়া ও চীনের লাল-হলুদ মলাটের বই প্রচুর আমদানী হচ্ছে, আর মার্কসীয় মতাদর্শের প্রভাব বাঙলার তরুণ-সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এদেশের তরুণ-সমাজ স্বপ্ন দেখছেন শোষণহীন, সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় স্বস্তির-শান্তির- সৃষ্টিশীল একটি আধুনিক রাষ্ট্রের। মার্কস-লেনিন-মাওসেতুঙের মহান আদর্শ অনুসরণ করে তরুণতর রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কর্মীদের যে-অংশের মধ্যে শ্রেণী -সংগ্রাম আর উৎপাদন ব্যবস্থার এবং জনগণের সাংস্কৃতিক স্বাধীকারের প্রশ্নের বিশ্লেষণ-সমালোচন প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল— তাঁদেরই কতিপয় আবুল কাসেম ফজলুল হক, রফিক আজাদ, রফিকুল আলম খান, গোলাম সরোয়ার, মাহবুবউল্লাহ, বুলবুল খান মাহবুব, হুমায়ুন আজাদ, হুমায়ুন কবীর, মনসুর মুসা, আলাউদ্দীন খান, আজিজুল হক প্রধান, জুলফিকার মতিন, আকরম হোসেন, আহমদ ছফা প্রমুখ পলিমাটিকে ঘিরে আপন আপন স্বকীয়-অনুভূতি-উপলব্ধিজাত কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প প্রভৃতি সাহিত্য প্রকাশের মাধ্যমে স্বদেশহিতের লক্ষ্যে এককালে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। এর উদ্যোক্তা-রচয়িতাদের সকলেই প্রায় তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগের মেধাবী ছাত্র। কেউবা সদ্য সমাপ্ত করেছেন ছাত্রত্ব। এঁদের তেমন মুরব্বী ছিলেননা। কিন্তু কতিপয় শিক্ষক (মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী প্রমুখ) সস্নেহ-উৎসাহ দিতেন তাঁদের মনের, বিবেকের স্বতঃউৎসারিত প্রেরণাবশে। তবে সাধারণভাবে পলিমাটির কবি-লেখকেরা সমাজের মুরব্বী—প্রবীণ, কায়েমী স্বার্থী, প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদদের ভূমিকার প্রতি পোষণ করতেন প্রবল ঘৃণা, বিতৃষ্ণা আর অশ্রদ্ধা। ফলে পাকিস্তান সরকারের তৎকালীন পররাষ্ট্রীয় নীতিতে আমূল পরিবর্তন সংঘটনের ফলে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে সৌহার্দ্য-বন্ধুত্ব স্থাপনের কার্যধারা গৃহিত হলেও এই তরুণেরা প্রবীণ বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা সাদরে অভিনন্দিত হননি, প্রকৃত সমাজ-সমালোচনামূলক প্রতিবাদী রচনা প্রকাশের জন্য তাঁদের কাছে ওঁরা পরিহার্য হয়ে পড়েছিলেন। কারণ, বুদ্ধিজীবী-সমাজে আত্মবিক্রয়, আপোষকামীতা এবং সামাজিক স্বার্থে যথোপযুক্ত ভূমিকা পালনে চরম ব্যর্থতা আর যুগোপযোগী উন্নতমানের সাহিত্য সৃষ্টি করতে অক্ষম লেখকদের মেধা শূন্যতার স্বরূপ উন্মোচন পূর্বক সংগ্রামের মাধ্যমে সুখী, সুন্দর শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দৃঢ় শপথ উচ্চারিত হয়েছিল পলিমাটিতে। জনমনের হতাশা ব্যর্থতা এবং সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র এতে তুলে ধরাতে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীদের নিন্দনীয়-ভূমিকা প্রকট হয়ে উঠেছিল। তাতে তাঁদের সামাজিক অবস্থান নড়চড়ে হয়ে পড়বার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এঁদেরই ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা এবং অযোগ্যতার ফলে সমাজের অভ্যন্তরে চিন্তা, বুদ্ধিবিবেক-যুক্তি, নৈতিকতা, চারিত্রদৈন্য, স্খলন-পতন সমাজকে ধ্বংসের মুখোমুখি নিয়ে গিয়েছিল। অথচ এ অবস্থার অবসানের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ, মহৎ, সৃষ্টিশীল কোনো সামাজিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিলোনা। এমনি পরিস্থিতিতে পলিমাটির আবির্ভাব আন্তরিক উদ্যোগ হিসেবে অবশ্যই মহৎ। কিন্তু ক্ষীণ- সামর্থের বিলম্বিত-প্রকাশের অনাড়ম্বর আয়োজনের পলিমাটি অনেকের কাছে হয়ত অনভিজাত বিবেচিত হতে পারে।

পলিমাটির লেখকেরাই ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। সবাই প্রায় নিম্ন ও মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। কেবল প্রবল উৎসাহের ফলেই কারো পকেটের পয়সায়, কারো উপর্যুপরি পীড়াপীড়ির ফলে সংগৃহীত ক্ষুদে-ব্যবসায়ী এবং সাধারণশ্রেণীর সমাজসেবীদের দেয়া সৌজন্যমূলক বিজ্ঞাপনের পয়সায় পলিমাটি প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য স্বাধীন বাংলাদেশ আমলে সম্পাদক ফজলুল হক সরকার নিজস্ব যোগ্যতায় একক উদ্যোগে পলিমাটিকে সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল করে দীর্ঘ-বিলম্বে অনিয়মিতভাবে হলেও প্রকাশ করে চলেছেন।

উদ্যোক্তারা উপলব্ধি করেছিলেন নিজস্ব পত্রিকা ছাড়া স্বকীয় চিন্তা প্রকাশ করা যায় না। আর লেখকের নিজের ও স্ব-সমাজের যুগ-চাহিদার কথা অকপটে প্রকাশের জন্য চাই একটি নিজস্ব প্রকাশ-মাধ্যম। ক্ষীণকায় পলিমাটি তাই একদল তরুণের অভিপ্রায়ে জন্ম নিয়েছিল। সদস্যরা কেউ লেখা দিয়ে, কেউবা পরামর্শ, উৎসাহ, মুদ্রণকাজে এবং অর্থসংগ্রহে সহযোগিতা দিয়েছিলেন।

'কণ্ঠস্বর' এর সমসাময়িক কালে প্রকাশিত 'পলিমাটি' চিন্তা-চেতনা ও আদর্শগত দিক দিয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ছিল। সমাজ ভাবনা ও সাহিত্যচিন্তার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টি ভঙ্গির পরিচয় দিলেও পত্রিকাটির মূল্য-নির্ধারণের কোনো প্রয়াস এ-পর্যন্ত চোখে পড়েনি। পলিমাটির প্রয়াসকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত প্রকাশিত পাঁচটি সংখ্যা[৮০] একত্রে মিলিয়ে পড়লে যে কথাটি স্পষ্ট হয়, তা হচ্ছে— পূর্ববাংলার তৎকালীন বুদ্ধিজীবী সংস্কৃতিকর্মী ও সাহিত্যসমাজের তরুণকর্মীদের ভাবনা-চিন্তার একটি দলিল হয়ে রয়েছে পলিমাটি। বুদ্ধিজীবী, চিন্তাশীল বাঙালি নাগরিক সদস্যরা ষাটের দশকের শেষার্ধে বাংলাদেশের মুক্তি ও অগ্রগতির জন্য কিছু চিন্তা করেছিলেন কিনা অথবা করলেও, তাঁদের চিন্তার স্বরূপ কী ছিল — তার চিত্র তুলে ধরে বলেই আজ পলিমাটির স্বতন্ত্রগুরুত্ব স্বীকৃত হবে। আজকের পাঠকের কাছে তথ্যে কারণেই পলিমাটি অশেষ কৌতূহলের ও অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে উঠেছে।

সাধারণ প্রচ্ছদ, সাদা কাগজের (৪৮ পৃষ্ঠার ১/১৬ ডিমাই সাইজ) ক্ষীণাকৃতির পলিমাটির প্রথম সংখ্যায় বলা হয় এটি 'একটি সাহিত্য সংকলন। ভাবে বেদনায় উজ্জীবনে অন্তঃসার প্রার্থনায় উন্মোচিত স্বাধিকারের প্রাকৃতিক ষড়ঋতুর আলিঙ্গনে বছরে বার কয়েক ফসলী'। কিন্তু একবারের বেশী

Dhaka University Institutional Repository

বছরে কখনোই প্রকাশিত হতে পারেনি। লক্ষণীয় পলিমাটিতে কথা বলার স্বতন্ত্র ষ্টাইল ছিল অনেকটা কণ্ঠস্বরের মতো। কিন্তু এর বক্তব্য ও উদ্দেশ্য ছিল আরও উন্নত এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উচ্চকিত। পলিমাটির লক্ষ্য-আদর্শ সম্পর্কে কাব্যের ভাষায় সর্বপ্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠাতেই বলা হয় ঃ "পলিমাটি তাদের সাথে আপোষহীণ/ যারা কাব্য কলাকে/ যৌন-সর্বস্ব টেডিনীরূপে দেখতে চায়। অথবা যারা কালো বোরখা পরিয়ে পর্দানশীল করতে চায়'/ 'যে বিশ্বাস পলিমাটিতে উপ্ত' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয় ঃ "যারা আদর্শহীন উন্মার্গগামী/ যারা কল্পনায় জরাগ্রস্ত বিবস্ত/চিন্তায় পারম্পর্যহীন লেখায় অসংযত/যারা আত্মহননে উন্মুখ/সদা চঞ্চল এবং অভিপ্রায়হীন/যান্ত্রিকতায় ক্ষতবিক্ষত পংগু/যারা জীবন বিমুখ দুর্বোধ্য এবং উন্নাসিক/ সেসব বিকৃত লেখকদের জন্য পলিমাটি নয়/— যারা অনাদৃত অপ্রতিষ্ঠিত অথচ অকপট প্রতিশ্রুতিশীল/ যারা চিন্তায় ধ্যানে কর্মে সমন্বিত স্বনিষ্ঠ/ যারা জীবন জিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ উত্তপ্ত অথচ সংযত/যারা উৎপীড়িত আহত অথচ সংগ্রামী/ যারা প্রেমে ব্যর্থ অথচ অকুণ্ঠ/ যারা স্বভাবে উন্মুক্ত কিন্তু/আত্মবিশ্বাসী এবং অধিকার-সচেতন/ যারা স্বাধীন এবং নির্ভীক/ তারাই পলিমাটির লেখক"। সূচীপত্রের পৃষ্ঠায় আরো লেখা ছিল ঃ "এদেশ আমার গর্ব/ এ মাটি আমার কাছে সোনা/ এখানে মুক্তির লক্ষ্যে হয় মুকুলিত/ আমার সহস্র সাধ সহস্র বাসনা।"

পলিমাটির প্রথম সংখ্যায় (১৩৭৩) আবুল কাসেম ফজলুল হক লিখেছিলেন প্রবন্ধ, 'ক্রান্তিকাল : সংস্কৃতি ও সাহিত্য' এবং মাহবুব উল্লাহ 'সংস্কৃতি ও শ্রেণীসংগ্রাম'। কবিতা লিখেছিলেন বুলবুল খান মাহবুব, ফজলুল হক সরকার, হুমায়ুন আজাদ, অজামিল বণিক, আলাউদ্দিন খান এবং আজিজুল হক প্রধান। প্রকাশনায় রফিকুল আলম খান, প্রচ্ছদ অঙ্কনে গোলাম সরোয়ার এবং সহযোগিতায় বেগম আসমা রব্বানী, সাবির আহমদ চৌধুরী এবং আবুল কাসেম ফজলুল হক। মুদ্রণে আল ইসলাম প্রেস, ১৪ ফ্রি স্কুল ষ্ট্রিট, ঢাকা। পৃষ্ঠা ৪৮। দ্বিতীয় সংখ্যার (১৩৭৪; বর্ষা) প্রচ্ছদ আঁকেন আবদুল হাই। মুদ্রিত হয় স্বপন আর্ট প্রেস, হাজী ওসমান গনি রোড, নওয়াবপুর, ঢাকা-১ থেকে। প্রকাশের ঠিকানা দেওয়া হয় ৭ সার্কুলার রোড, ধানমণ্ডি , ঢাকা-২। স্বপন আর্ট প্রেস ও আলম প্রিন্টিং প্রেস, ২১, মীরপুর রোড, ঢাকা থেকে কে, এম, বদরুদ্দোজা কর্তৃক মুদ্রিত। দ্বিতীয় সংখ্যার মূল্য ছিল পঞ্চাশ পয়সা। পৃষ্ঠা ৪৮। প্রথম সংখ্যার কোন মূল্য ধরা হয়নি। দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রবন্ধ লেখেন আবুল কাসেম ফজলুল হক— 'প্রত্যাশার পৃথিবী'। একমাত্র গল্পকার জিয়াউল হক (নিরুত্তাপ অন্ধকারে); নাটক লেখেন সাদিকীন (বিষুব রেখা); আর কবিতা লেখেন ঃ সৈয়দ আকরম হোসেন; আজিজুল হক প্রধান, আলাউদ্দিন খান, ফজলুল হক সরকার, আবু জাফর আবদুল্লাহ এবং বুলবুল খান মাহবুব।

তৃতীয় সংকলন (১৩৭৫) টি ৭৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। দাম এক টাকা। এবারও মুদ্রণালয় পরিবর্তিত হয়। মুদ্রক সাদিকীন, অন্তরীপ মুদ্রণালয়, ২৫৫ জগন্নাথ সাহা রোড, ঢাকা-১। আবুল কাসেম ফজলুল হকের 'কালের যাত্রার ধ্বনি' শীর্ষক বিখ্যাত দীর্ঘ প্রবন্ধটি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গল্প লেখেন জিয়াউল হক, সাঈদুর রহমান সাঈদ। গ্রন্থ সমালোচনা করেন মনসুর মুসা ও ফজলুল হক সরকার (যথাক্রমে বুলবুল খান রচতি 'রক্তের কারুকাজ' শীর্ষক কবিতার সংকলন এবং মুহম্মদ হাবীবুর রহমান সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব পাকিস্তান' শীর্ষক সাম্প্রদায়িক মনোভাব এর পুস্তিকার)। কবিদের তালিকায় রয়েছেন : মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান, নাসিরুল ইসলাম, জিয়াদ আলী, হুমায়ুন কবীর, আহমদ ছফা, কে. মুশতাক এলাহী, সাদিকীন, এবং ফজলুল হক সরকার।

পলিমাটির পঞ্চম সংকলন প্রকাশ পায় ১৩৭৭ সনের বসন্তে। প্রকাশনায় বেগম খালেদা সরকার, ৫১ ফ্রি স্কুল ষ্ট্রিট, কাঁঠাল বাগান, ঢাকা-২। প্রচ্ছদের শিল্পী: গোলাম সারোয়ার। মুদ্রণে লতিফ আর্ট প্রেস ২২/২ শেখ সাহেব বাজার, ঢাকা-২। দাম এক টাকা। পৃষ্ঠা ৮৫। ফজলুল হক সরকারের দীর্ঘ নাটক 'দাবী; সেলিনা হোসেন (বিমূর্ত) ও নূরউদ্দীন আহমদ (শুভলগ্ন) এর গল্প এবং আবুল কাসেম ফজলুল হকের 'পূর্ব বাঙলার সাংস্কৃতিক অঙ্গন', সামসুল আলম এর 'একুশের প্রেক্ষিতে কতিপয় প্রসঙ্গ' শীর্ষক প্রবন্ধ এতে ছাপা হয়। কবিতা লেখেন জুলফিকার মতিন, প্রদীপ বড়ুয়া, রাবেয়া বেগম রোজী এবং রাজিয়া মীর।

'পলিমাটি'র রচনাগুলোতে পূর্ববাংলার প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে অবক্ষয়াক্রান্ত ক্রান্তিকাল চিহ্নিত করে সচকিত হয়েছে এই বক্তব্যে ঃ 'জীবনের এই প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সর্বনাশের মুখোমুখি হয়ে আমাদের আজ করণীয় কী?' 'মানব জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ বজায় রেখে জীবনধারণ করতে গেলে সমাজ প্রবাহের আশ্রয় ছাড়া বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তির পক্ষে এককভাবে বসবাস করা সম্ভব নয়। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষেরা "ক্রান্তিলগ্নের অস্থিরতায় দাঁড়িয়ে প্রায় সকলেই সমাজ রক্ষার প্রয়োজনকে অস্বীকার করে ব্যক্তিগতভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। কেউই বুঝতে চেষ্টা করছেনা যে, ব্যক্তিজীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা তথা জীবন-উপলব্ধি ও জীবন-ভাবনা সমাজ-প্রবাহের বিভিন্ন স্তরের অবস্থা-ব্যবস্থা দ্বারাই কালে কালে নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। আমাদের বর্তমান জীবন-যন্ত্রণা ও জীবন-বিকৃতির কারণও সমাজ-প্রবাহের বর্তমান স্তরের অব্যবস্থাই"; সমগ্র বিশ্বজুড়েই যুগ-সংক্রান্তির সংকট সম্প্রসারিত হয়েছে। এবং "বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে মুক্তিকামী জনগণের সংগ্রামের রূপ নিয়ে এই সংকট আজ অস্তিত্বশীল। মুক্তি-সংগ্রামে শোষিত জনগণের চূড়ান্ত জয় লাভের পূর্ব পর্যন্ত এই সংকটের কালো মেঘ দূর হবেনা। ... সমাজ বিকাশের যে স্তরে এখন আমরা আছি তাতে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান যতটুকু অগ্রসর হয়েছে তার ওপর নির্ভর করে এটা উপলব্ধি করা যায় যে মানুষের সুখ শান্তি এবং কল্যাণের জন্য শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য।"[৮১]

শ্রেণী সংগ্রামের জন্য সংস্কৃতির অপরিহার্যতা প্রসঙ্গের আলোচনায় মাহবুবউল্লাহ বলেন ঃ "স্বাধীনতা উত্তরকালে পাকিস্তানের ঐতিহাসিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা সেই একই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি 'সংস্কৃতি শ্রেণী সংগ্রামের শক্ত হাতিয়ার'। স্বাধীনতা লাভের পর এদেশের শাসন ক্ষমতা চলে যায় পুঁজিপতি ও সামন্ত শ্রেনীর হাতে। তাও আবার অবাঙালী পুঁজিপতি ও সামন্ত শ্রেণীর প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বে। ফলত বাঙালী পুঁজিপতিদের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেকাংশেই অপূর্ণ থেকে যায়। এই শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ ও পূর্ব বাঙলার আপামর শোষিত জনগণের পুঞ্জিভূত ক্রোধই ভাষা-আন্দোলনের বাস্তব ভিত্তি জুগিয়েছিল। ভাষার সংগে সমগ্র বাঙালী সংস্কৃতির অস্তিত্বের প্রশ্নটি জড়িত। যে জাতির সংস্কৃতি বিকৃত হয়ে যায়— সে জাতি নির্বীর্য ও ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। উপনিবেশবাদের যুগে সাম্রাজ্যবাদীরা ঔপনিবেশিক জাতিগুলোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিনষ্ট করেই তাদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রেখেছে যুগযুগ ধরে। ঠিক

Dhaka University Institutional Repository

একই কারণে বাঙালী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামে বাঙালী সংস্কৃতি এক সুমহান প্রেরণার উৎস। শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর নেতৃত্ব ভিন্ন সংগ্রামে চূড়ান্ত বিজয় অসম্ভব। এখানকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শের হাতিয়ার মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের সৃজনশীল প্রয়োগেই এ সংগ্রামের বিজয় সুনিশ্চিত হতে পারে।"[৮২]

পত্রিকাটি সমাজ এর প্রতি লক্ষ্য রেখে উচ্চারণ করে, — প্রত্যাশার পৃথিবীর সৃষ্টিকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলতে হলে সুস্পষ্ট আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য সংগ্রাম করতে হবে— যে কোন প্রকারের চূড়ান্ত সংগ্রামের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী ধনবাদী সামন্তবাদী পাপসমূহের সঙ্গে এই প্রশ্নে কোন প্রকার আপোষ চলতে পারেনা। সুস্পষ্ট আদর্শের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে, অতীত আবর্জনার বোঝা মাথায় তুলে নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সঙ্গে আপোষ করলে তা আদর্শের প্রতি, বিশ্বাসের প্রতি, বিশ্বাস ঘাতকতারই নামান্তর। প্রতিক্রিয়াশীল চক্র কোনদিনই এমন উদার হতে পারে না যে ঔদার্যবশত তারা প্রগতির শান্তির হাতে তাদের ক্ষমতাকে তুলে দেবে। প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সত্যিকার প্রগতির সংগ্রাম আপোষহীন।[৮৩]

'কালের যাত্রার ধ্বনি' প্রবন্ধে লেখক বাংলাদেশের সাহিত্যের সমালোচনায় উচ্চকিত হয়ে বলেন : "পূর্ববাঙলার সাহিত্য পরিবেশের পরিবর্তন সাধন করতে হবে — আমূল পরিবর্তন। বাঙলা সাহিত্যে নতুন ধারা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে কল্লোলের প্রচেষ্টা ও Sad generation-এর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে থাকলেও বিশেষত Sad generation এর প্রচেষ্টার ফলে পূর্ব বাঙলার অভিজাত সাহিত্যের অঙ্গনে বর্তমানে এমন একটি সামাজিক মনোভূমি প্রস্তুত হয়েছে যে, এই শ্রেণীর তরুণ সাহিত্যিকেরা সাম্রাজ্যবাদী সামন্তবাদী পুঁজিবাদী ও অবিশ্বাসবাদী ধ্যান-ধারণার মোহ থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হয়ে জীবনের অন্তর্নিহিত শিল্পানুসন্ধিৎসা ও সত্যানুসন্ধিৎসাকে চরিতার্থ করার সুস্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে নতুন ধারার সাহিত্যের গোড়া পত্তন করতে পারেন; কিন্তু নতুন ধারার গোড়া পত্তন করতে হলে অবশ্যই তাঁদের শ্রেণীগত ভূমিকা বদলাতে হবে এবং বিগত যুগের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে এ যুগের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। ঘুণে ধরা অভিজাত শ্রেণী ত্যাগ করে তাঁদের নেমে আসতে হবে জনগণের ভূমিকায়। অভিজাতের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে জনগণের কল্যাণ সাধনের কথা বললে চলবেনা অভিজাত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে লালন করে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করতে চাইলে জনগণ তাঁদের গ্রহণ করবেনা, বর্জন করবে।"[৮৪] লক্ষ্য করলে দেখা যায়- পূর্ব বাঙলার সাহিত্যের উন্নতির জন্য 'পলিমাটি'র রচয়িতাদের চিন্তার মূল্য অপরিসীম। উপর্যুক্ত প্রবন্ধে লেখক পূর্ববাংলার সাহিত্য-পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেন সৎ সমালোচনা বড় সমালোচক ও নতুন মানদণ্ড খুব আবশ্যক ঃ "আমাদের সাহিত্যকে সঠিক পথে বিকশিত করার সহায়ক হিসেবে সৎ-সমালোচনার প্রয়োজন আজ প্রকট। শিল্প সাহিত্যের মূল্য বিচারের বেলায় সব সময়ই দুটো দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। একটি শিল্পকর্ম ও সাহিত্য কর্মের আদর্শগত দিক এবংঅপরটি তার শৈল্পিক দিক। আদর্শগত দিককে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র শৈল্পিক দিক বিচার করলে সে সমালোচনা হবে অসম্পূর্ণ। কোন বিশেষ আদর্শকে কোন ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারেন, — কিন্তু এই অস্বীকারের পরও নতুন আদর্শকে অবলম্বন করার কিংবা নতুন আদর্শের অনুসন্ধান করার প্রয়োজন থেকে যায়। প্রত্যেক শিল্পকর্মেই কোন না কোন আদর্শের কিংবা আদর্শের অনুসন্ধানের কিংবা অবিশ্বাসবাদের পরিচয় প্রকাশ পায়। তাই তার মূল্যায়নের সময় সেই প্রচ্ছন্ন কিংবা স্পষ্ট আদর্শেরও মূল্যায়ন অপরিহার্য। যে সাহিত্য আদর্শগত দিক থেকে প্রতিক্রিয়াশীল অথচ শৈল্পিক বিচারে উৎকৃষ্ট তা কখনও উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করতে পারেনা। তেমনি যে সাহিত্য শৈল্পিক দিক থেকে নিকৃষ্ট অথচ আদর্শগত দিক থেকে প্রগতিশীল তাও উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করতে পারেনা। আমাদের যা কাম্য তা হচ্ছে যথার্থ আদর্শ ও শৈল্পিক সৌন্দর্য — এ দুয়ের সার্থক সমন্বয়।" এই সমন্বয় সাধনের জন্য আবশ্যক মূল্যবিচারের নতুন মানদণ্ড নির্ধারণ, পুরাতন মানদণ্ড বর্জন। "আমাদের সমাজে মূল্য বিচারের পুরোনো মানদণ্ড এখন আর কার্যকরী থাকার যোগ্য নয়। — একথা সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের আর সব ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য"।[৮৫]

পূর্ব বাঙলার সাংস্কৃতিক জগতের ঐতিহাসিক চিত্র অঙ্কিত আছে পলিমাটির ৫ম সংকলনে। 'পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক অংগন' বিভক্ত ছিল সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক দুইটি দলে। উপর্যুক্ত প্রবন্ধের লেখক বলেন, যাঁরা পাকিস্তান সরকারের সহযোগী হিসেবে বাঙালির স্বার্থের বিরুদ্ধে ধর্মের নামে সবকিছু করেছেন তাঁরা নিজেরাই ছিলেন না যথার্থ ধার্মিক। 'ইসলামকে তাঁরা ব্যবহার করেছেন হীন উপায়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের একটা হাতিয়ার হিসেবে। স্বাধীনতার (১৯৪৭) পরে দীর্ঘকাল ধরে তাঁরা জনবিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের উচ্ছিষ্ট লাভের জন্য ছুটোছুটি করেছেন। অসম্প্রদায়িক দল প্রথম পর্যায়ে সাম্প্রদায়িকদের সহযোগিতায় পাকিস্তানী সরকারের অপকর্মের বিরুদ্ধে গৌরবজনক ভূমিকা গ্রহণ করলেও 'আইউব-মোনেম আমলে' তাঁদের ভূমিকা মোটেই প্রশংসার যোগ্য নয়। আইউবী-স্বৈরাচার, পাশবিক নিপীড়ন-নির্যাতনের সময় এঁরা কোনো প্রতিবাদ জানানো তো দূরের কথা, কোন প্রকার অসহযোগিতা পর্যন্ত প্রদর্শন করেননি .... তাঁদের সহযোগিতা ভিন্ন স্বৈরশাসন দীর্ঘদিন টিকে থাকত পারত না। বিবেকের বাণী যাঁরা এই সময়ে উচ্চারণ করেছেন, "তাঁদের সংখ্যা ছিল নগণ্য এবং তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন তরুণ। এই জন্যই তা কোন সংগঠিত প্রয়াস হিসেবে দাঁড়াতে পারেনি। কিন্তু পূর্ব বাঙলায় নতুন জীবন-প্রবাহ, সৃষ্টিশীল সুখী সমাজ-ব্যবস্থা 'প্রবর্তনের জন্য দরকার নতুন সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন'। পূর্ববাংলার জনগণের কণ্ঠস্বর তুলে ধরে বলা হয় তাদের আজ মূলত দুটি দাবী —" এক, সাম্রাজ্যবাদী ও অপর সকল বহিরশক্তির রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সকল প্রকার শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ থেকে পূর্ব বাঙলাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে হবে। অপরটি হল—পূর্ব বাঙলার বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটিয়ে এমন একটি সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে যাতে মানুষের ওপর মানুষের শোষণ নিপীড়ন আধিপত্যও বিলুপ্ত হবে এবং অন্যায়মুক্ত, অভাবমুক্ত এক নতুন সমাজ ও জীবন প্রতিষ্ঠিত হবে।"[৮৬] জনগণের এই দুটি দাবী কিভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে তার জন্য সমাজের চিন্তাশীল অংশের 'সামাজিক দায়িত্ব' পালন করার জন্য পলিমাটির সাহিত্যপ্রয়াস ছিল তৎপর। তাঁরা স্পষ্টতই উচ্চারণ করেন : "আমাদের বাংলা ভাষা চর্চা এবং চর্চার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্তব্য।' .. তবে, 'ইংরেজী(ও) আমাদের শিখতে হবে এবং উচ্চশিক্ষা-ক্ষেত্রে ইংরেজীর প্রতি আরো গুরুত্ব দিতে হবে। ইংরেজী বর্জনের প্রশ্নটি নেহাত বাতুলতা। .... শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা।"[৮৭] গদ্য রচনাগুলোর চেতনার সমধর্মী বক্তব্য ও অনুভব—এ পত্রিকার কবিতা ও গল্পগুলোতেও সমভাবে উচ্চকিত। ক্রান্তিকালের প্রশ্নটিকে অবজ্ঞা করে যারা উন্নয়ন দশকের প্রশস্তি গান- তাদের উদ্দেশ্যে পলিমাটির কবি-সম্পাদক প্রশ্ন রাখেন ঃ "ওগো ক্রান্তিকাল তোমার উতকর্ষের নান্দীপাঠ আর কতকাল শুনবো।"[৮৮]

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব বাঙলার মুক্তি-সংগ্রামের পূর্বক্ষণে পলিমাটির সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ভূমিকা ছিল যুগোপযোগী, উন্নত সমাজব্যবস্থার পক্ষে। তাই যত ক্ষীণ ও নিষ্প্রভই হোক — এই পত্রিকার ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল, স্বতন্ত্র জীবন-ভাবনায় সচকিত । রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনের ক্রান্তিকালের গুরুতর প্রশ্নগুলো উত্থাপনের ক্ষেত্রে এর সমমানের চিন্তাচর্চা তৎকালের পূর্ববাঙলায় ছিল দুর্লভ।

১১. নাগরিক (১৯৬৪-৭০)

'নাগরিক এর আসা যাওয়া' শীর্ষক একটি স্মৃতিচারণমূলক রচনায় ডাঃ আহমদ রফিক (১৯২৯) লিখেছেন : "পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকের কথা। আমাদের রাজনীতি তখন আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রীয় উভয় স্তরেই এক চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার পরিণতি বহন করে চলছে। এবং এর প্রভাব সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও কম পড়েনি।.. দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেখাজোখার পরিকল্পনা নিতে নিতে মনে হলো, একটা কাগজ বের করলে কেমন হয়? সাহিত্যের কাগজ, মাসিক অথবা ত্রৈমাসিক। মেডিকেল ব্যারাকে পঞ্চাশের প্রথমদিকে কবির-আলীমের (আহমদ কবির ও শহীদ আলীম চৌধুরী) 'যাত্রিক' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা বার বার হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করতে ভোলেনা। মনে পড়িয়ে দেয় মাসিক পত্রিকার ত্রৈমাসিক চরিত্র অর্জনের কথা।... (অতএব) ধীরগামী ত্রৈমাসিকই ভালো। তাড়াহুড়োর ঝামেলা নেই; সবদিক থেকেই স্বস্তির অবকাশ থেকে যায়। এইসব চিন্তায় সময় যত গড়িয়ে যায় কাগজ বের করার ইচ্ছা ততই তীব্র হতে থাকে। কিন্তু অর্থনৈতিক সংকটের ভয় সে ইচ্ছাকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলতে থাকে। পকেটহীন মধ্যবিত্ত। তবু স্বপ্ন দেখাটাই তার রীত। হোকনা তা শুধু একটি কাগজ বের করার স্বপ্ন। শেষ পর্যন্ত ভয়ে ভয়েই পরিকল্পনাটাকে একটা ছকে ফেলা গেল। এমনকি সেই সঙ্গে যুৎসই আধুনিক ধরণের একটা নামও। সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট মনে রেখে। শহর ঢাকার চেহারা তখন বড় একটা আধুনিক না হলেও তার চরিত্রে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগতে শুরু করেছে। একপা দুইপা করে সেদিকেই তার যাত্রা শুরু। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা এতটা জমজমাট হয়ে উঠেনি। গাছগাছালি ও ঝোপঝাড়ের আড়ালে দিলকুশা নবাব বাড়িটা তখনও শ্যাওলাধরা আভিজাত্য নিয়ে টিকে আছে। সেই উঠতি ঢাকার বর্ধমান নাগরিক চরিত্রের কথা মনে রেখে পত্রিকার নাম দাঁড়ালো 'নাগরিক'। এক কথায় গড়ে উঠতে থাকা নাগরিক সংস্কৃতির দর্পণ ও মুখপত্র। এই সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষা নাগরিক-এর সাত বছরের স্বল্পায়ু জীবনে কতখানি ধরা পড়েছে বা আদৌ পড়েছে কিনা সে মূল্যায়নের দায় সম্ভবত সচেতন পাঠকের।... তৎকালীন ঢাকার বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে দুই চারজন ছাড়া কমবেশী সবাই এই পত্রিকায় লিখেছেন।... যাঁদের লেখা ছাপা হয়নি তাঁদের সাথে যোগাযোগের অভাবই ছিল বড় কথা।"৮৯ আহমদ রফিক তখনকার ঢাকার সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন : "সেই সময় ঢাকায় কয়টাই বা সাহিত্যের কাগজ। সরকারী কাগজ বাদ দিলে পুরনো আমলের দুই একটা কাগজ বছরে ছমাসে একবার চেহারা দেখায়। আর সমকাল তখন কালের সঙ্গে তাল মেলাতে না-পেরে ভয়ানকভাবে অনিয়মিত। একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট 'লেখক সংঘ পত্রিকা' মোটামুটি নিয়মিত বেরুচ্ছে ('পরিক্রম' হবে আসলে, কিন্তু পরিক্রমও নিয়মিত বের হয়নি)।... অই লেখক সংঘ পত্রিকায় লেখার সুবাদেই শাহাবুদ্দীনের সাথে পরিচয়। .... কাগজ বের করার টানা খাটুনিতে শাহাবুদ্দীন খুবই উৎসাহবোধ করে। ... বরাবরই সঙ্গে ছিল।... নিয়মিত সংখ্যা 'নাগরিক' বের হওয়ার পর থেকে লেখকদের সাথে যোগাযোগের দায়িত্বটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল শাহাবুদ্দীনের। বাকী সব দায় আমার কাঁধে। অবশেষে ক্ষীণাঙ্গ সংকলন সংখ্যা 'নাগরিক' বেরিয়ে এল পূর্ববঙ্গ প্রেস থেকে।' কিন্তু নিয়মিত পত্রিকার অনুমতি পাওয়া গেলো না আহমদ রফিকের রাজনৈতিক চরিত্রের জন্যই। সরকারের খাতায় লালকালিতে (নাকি কালো কালিতে? মোটকথা সন্দেহভাজন ব্যক্তি ব্যক্তি ছিলেন) তাঁর নাম লেখা। অতএব কৌশল হিসেব 'কস্মিনকালেও সাহিত্যের ত্রিসীমানা মাড়ায়নি' এমন একজন— বোরহানুদ্দীন ভূঁইয়ার নামে ডিক্লিয়ারেশন এর জন্য আবেদন করে তবে সদুত্তর পাওয়া গেলো। রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ৯৭/৬৩। 'শাহাবুদ্দীন মহাখুশী। এবার সত্যিসত্যি কাগজ বের হতে যাচ্ছে। ঠিক হলো, ধারালো অথচ ওজনদার সাহিত্য ত্রৈমাসিক হিসাবে নাগরিক-এর প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে। নামের ভার, খ্যাতি, মত পথ ইত্যাদির উর্ধে লেখার গুণেই লেখা ছাপাতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রবীণ-নবীনের প্রশ্ন উহ্য।' এই নীতি মেনে চলার জন্য 'চেষ্টার ত্রুটি ছিলনা নাগরিক সম্পাদকের পক্ষ থেকে।... নানান অসুবিধা সত্ত্বেও নাগরিক তার সাহিত্যবৈশিষ্ট্য গড়ে তুলেছিল প্রধানত প্রবন্ধ ও সমালোচনা বিভাগের মাধ্যমে। তখনকার মননশীল লেখকপাঠকদের একাংশের মতামতে আমাদের এই উক্তির সমর্থন মেলে। এক্ষেত্রে আমরা লাইনচ্যুত হইনি। নিজেদের রচনার উপর লেখা কঠোর সমালোচনাও আমরা পত্রস্থ করেছি। তেমনি ছাপিয়েছি নিকট বন্ধুদের লেখার ব্যবচ্ছেদধর্মী আলোচনা।' উপর্যুক্ত ভাষ্যে স্পষ্ট যে, ডাঃ আহমদ রফিকই নাগরিকের মূল ব্যক্তি ছিলেন। যদিও সম্পাদক এবং প্রকাশক হিসেবে বোরহানউদ্দিন ভূঁইয়ার নাম মুদ্রিত হয়েছিল। প্রকাশের ঠিকানা ছিল ১১৮/২ আরামবাগ, ঢাকা-২। মহিউদ্দীন আহমদ কর্তৃক ইণ্ডাস্ট্রিয়েল প্রেস, ৪৯ ডিআইটি মার্কেট, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হতো। কভার ছাপা হতো ফ্রেণ্ডস্ ট্রেড প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১ থেকে। মূল্য একটাকা। পৃষ্ঠা ৪৮, ৫৮ ইত্যাদি। কার্টিজ পেপারে রুচিশীল প্রচ্ছদ মুদ্রণ ছিল। সেকালে নাগরিকের ন্যায় ত্রৈমাসিক পত্রিকা হয়তো ছিল (যেমন সংলাপ, উত্তর অন্বেষা) কিন্তু বক্তব্য ও সাহিত্যশিল্পগুণান্বিত হবার সঙ্গে সঙ্গে চেতনার সমন্বয়ে যে স্টাণ্ডার্ড গড়ে উঠেছিল তেমন আর দ্বিতীয়টি ছিলনা। সমকাল ছিল মাসিক পত্রিকা। এ প্রসঙ্গে সেটা বিবেচ্য নয়। প্রথম দিকে সহযোগিতায় শাহাবুদ্দিন আহমদ ছিলেন। পরে সহযোগী সম্পাদকীয় পরিষদ গঠিত হয়। তাজুন্নেসা আহমদ ; আনোয়ারুল হক খান সিএস. পি ; আহমদ রফিক ; বুল ওসমানের নাম ছিল তাতে। বুলবুল ওসমান ও অল্প দিনেই বিদায় নেন। চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় আহমদ রফিক বুলবুল ওসমান শাহাবুদ্দিন আহমদের নাম ছাপা হয় 'সহযোগী সম্পাদনা পরিষদে'। চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় সৈয়দ আবুল মকসুদ অন্তর্ভুক্ত হন এবং ক্রমান্বয়ে তিনি পত্রিকার কার্যকর কাণ্ডারীতে পরিণত হন। চতুর্থ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় সহযোগী সম্পাদক এককভাবে সৈয়দ আবুল মকসুদ আহমদ রফিক অর্থকরী এবং আবুল মকসুদ। আনুষঙ্গিক বিষয়াদির তদারকি করতেন। ষষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যা ১৯৭০ সনের শেষ নাগাদ প্রকাশিত হয়। তারপর আর বের হয়নি। ত্রৈমাসিক হিসেবে ১৯৬৪ সনের ফেব্রুয়ারি থেকে প্রকাশিত হলেও হিসেব মতো সবকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। সাত বছরে ৭×৪ = ২৮ টি সংখ্যা প্রকাশিত হবার কথা থাকলেও অপ্রাপ্তব্য ৩য় বর্ষের ৪টি এবং দ্বিতীয় বর্ষের ২য় সংখ্যা সহ নাগরিকের মোট

Dhaka University Institutional Repository

৫+ ১৪ = ১৯টি খণ্ড প্রকাশিত হয়। যুগ্ম সংখ্যা আছে দুটি। পঞ্চম বর্ষে যুগ্ম সংখ্যা হিসেবে দুটি খণ্ডে চারসংখ্যা প্রকাশিত হয়। বাদবাকী সময় পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। অনিয়মের অভিযোগ থেকে নাগরিক ত্রৈমাসিক হয়েও অব্যাহতি পায়নি। আহমদ রফিক সত্ত্বাধিকারী হলেও কেন তার নাম সম্পাদনা–সহযোগীদের তালিকায় ছাপা হতো তার বর্ণনা নিজেই দিয়েছেন পূর্বোক্ত রচনায় ঃ" "কোন সন্ধানী পাঠক নাগরিক এর সংখ্যাগুলো উলটে-পালটে দেখলে অবাক হবেন যে, এর নিয়মতান্ত্রিক প্রকাশক-সম্পাদক হিসেবে পত্রিকার পরিকল্পনাকারী–প্রকাশক–সম্পাদক তথা সমগ্র দায়বহনকারী ব্যক্তির নাম মুদ্রিত নেই। পরে গঠিত সহযোগী সম্পাদনাপরিষদে তার নামটি সদস্য হিসেবে গুঁজে দেওয়া হয়েছিল।...উত্তরকালের সমায়িকপত্রের সংকলন গ্রন্থটিতে লেখক শামসুল হক [প্রকৃতপক্ষে তার 'বাংলা সাময়িকপত্র ১৯৪৭–৭১' শীর্ষক বইখানার কথা বলা হচ্ছে] নাগরিক–এর পরিচিতির মধ্যে ছোট্ট একটি পাদটীকা যোগ করেছিলেন এই বলে যে 'প্রকৃতপক্ষে পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন ডাঃ আহমদ রফিক'। 'সম্পাদনা সহযোগী'দের সম্পর্কে আহমদ রফিক লিখেছেন : ...'শাহাবুদ্দীনের পর বুলবুল ওসমান স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই পত্রিকা দেখাশোনায় সহযোগিতার হাত নিয়ে এগিয়ে এসেছে। অবশ্য বেশীদিন অবস্থান করা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। ও তখন যাই যাই করছে। এর মধ্যেই এসে পড়েছে সৈয়দ আবদুল মকসুদ। শুরু হয়েছে নাগরিক সম্পাদনায় 'মকসুদ পর্ব'। মকসুদ নাগরিক–এর সান্নিধ্যে প্রথম আসে 'কুকুর হইতে সাবধান' গল্প নিয়ে।.... প্রয়োজনীয় দরজাটি নাগরিকই তার জন্য খুলে দিয়েছিল। সাহিত্যের টানে সরকারী চাকুরী ছেড়ে ভেসে পড়া, নাগরিক সম্পাদনার সাথে সংযুক্ত হওয়া এবং চার বছরেরও অধিককাল সেখানে লেগে থাকা ইত্যাদি আরও কিছু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মকসুদের জীবনে পটপরিবর্তনের সূচনা। জীবনে প্রতিষ্ঠা ও সাহিত্যে স্বীকৃতির জন্য যে নিরন্তর লড়াই তাঁকে চালিয়ে যেতে হয়েছে সেকাহিনী আর কেউ জানে না।.... তরুণ মকসুদকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন যেসাহিত্যরসিক ভদ্রলোক, তাকে সাহিত্য জগতে ঠেলে দেবার পেছনে অই ভদ্রলোকের অবদানও নেহাৎ কম নয়। মকসুদের প্রথম গল্পটি হাতে এসেছিল ঐ ভদ্রলোকের প্রশংসাপত্র গায়ে এঁটে। অবশ্য ছাপা হয়েছিল নিজগুণে। মকসুদের সাহিত্যকর্মের ভবিষ্যত সম্ভাবনা বিষয়ে বরাবরই উঁচু ধারনা পোষণ করেছেন অই জিয়াউল হক সাহেব। করেছেন হোম ডিপার্টমেন্টে চাকুরী। কিন্তু তার পড়াশোনা সাহিত্যরুচি ও সাহিত্যবোধ আমাকে বরাবর মুগ্ধ করেছে।[৯০]..... পত্রিকাটিকে আকর্ষণীয় ও আধুনিকতায় সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য তার ভাবনা ও চেষ্টার ত্রুটি ছিলনা। এর আগে অন্যকোন সহযোগী নাগরিক সম্পর্কে এতটা ভাবেনি। তার চেষ্টায়ই সে সময়কার তরুণ, অতিতরুণদের লেখা, বিশেষ করে কবিতা নাগরিক এর পাতায় উল্লেখযোগ্য স্থান পেয়েছে। দুই কবি বন্ধু নির্মলেন্দু গুণ ও আবুল হাসানের একেবারে প্রথম দিককার বেশ কিছু কবিতা মকসুদের মাধ্যমেই 'নাগরিক'–এ ছাপা হয়। আবু কায়সার প্রমুখ এমনি আরো কয়েকজনের কবিতাও স্থান পায়। তেমনি ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা।'

'সত্তরে পৌঁছে সমস্যার নানামুখি আঁচ নাগরিক প্রকাশনা স্পর্শ করতে থাকে। কারণ অবশ্য ভালো লেখার দুর্ভিক্ষ নয়। বরং বলা যায় আগের তুলনায় সত্তরে এসে বেশ কয়েকজন শক্তিমান লেখকের প্রকাশ লক্ষণীয়। আসলে সমস্যাটা নিতান্তই ব্যক্তিগত, সময় দিতে না পারার সমস্যা। মকসুদ তখন প্রায়ই বলতো ঃ ' এবার একটা জমকালো 'সান্ত্বনা সংখ্যা' বের করে নাগরিকের মৃত্যু ঘোষণা করে দিলে কেমন হয়।' কিন্তু একাত্তরের অশুভ পদধ্বনিতে ওর এত সাধের সান্ত্বনা সংখ্যা আর বের করতে পারেনি। তবু শেষ সংখ্যাটি তার হাত দিয়ে বেশ সমৃদ্ধি নিয়েই বেরিয়েছিল। কলকাতার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের দুটো কবিতাও সে এতে যোগ করতে পেরেছিল সম্ভবত দৈনিক 'পূর্বদেশ' এর সাহিত্যসম্পাদক শহীদ গোলাম মোস্তফার সহযোগিতায়। সংখ্যাটি আমার সংগ্রহে নেই। অনেকগুলোই নেই। কোনো সহৃদয় পাঠকের কাছে যদি থাকে ...."। ডাক্তার রফিকের স্মৃতিকথার বক্তব্য যথার্থ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তিনটি কবিতা'—১. ইন্দিরাগান্ধীর প্রতি ; ২. বন্দী জেগে আছো, এবং ৩. দ্বারভাঙা জেলার রমনী, নাগরিক এর ষষ্ঠবর্ষ প্রথম, ভাদ্র-কার্তিক ১৩৭৭ চিহ্নিত সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। ঐ সংখ্যায় তারাপদ রায়–এর 'একুশ তলা বাড়ীর কার্নিশে' শীর্ষক একটি, আর সিকানদার আবু জাফর এর 'সন্দষ্ট' এবং একলিমুর রেজার (এক মুঠো আকাশ) এবং আহমদ রফিক –এর 'দুটি কবিতা'— ১. 'আলো গান নিসর্গের রূপসী প্রান্তরে এসো' ; ও ২. 'ভিয়েৎনামে মার্কিন বর্বরতায়'— ছাপা হয়েছিল। 'নাগরিক' এ অনেক কবিতা ছাপা হলেও, কবির সংখ্যা বেশী নয়। নির্বাচিত কবিদের ভালো-ভালো কবিতা গুচ্ছাকারে প্রকাশ করা হয়েছে অনেক সময়। নতুন কবিদের রচনার সংখ্যা এক বা দুই। প্রথম সংখ্যায় কবিতা লিখেছিলেন শামসুর রাহমান ও রুহুল খৈয়াম। পরবর্তী বিভিন্ন সংখ্যায় আর যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁরা হলেন ঃ মীজানুর রহিম, সানাউল হক, আহসান হাবীব, হারুনঅর রশীদ, এস, এম, লুৎফর রহমান, শাজাহান কবির, সৈয়দ আলী আহসান, হায়াৎ মামুদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, নূরুল হক, নির্মলেন্দু গুণ, আবুল হাসান, শহীদ আজ্জাদ, আবুবকর সিদ্দিক, সৈয়দ আবুল মকসুদ, আবদুল গনি হাজারী, আনোয়ারুল করীম, মহীউদ্দীন, মহাদেব সাহা, মিরজা শরফুল হোসেন প্রমুখ। অনেক অনূদিত কবিতাও ছাপা হয়েছে। তৃতীয় বর্ষ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যায় মুদ্রিত সকল কবিতাই অনুবাদিত। নাজিম হিকমত ; ডি. এইচ. লরেন্স, রবার্ট ফ্রষ্ট ; ওয়াই. এ. ইয়েভতু শেঙ্কো প্রমুখের কবিতা অনুবাদ করেছিলেন আহমদ রফিক, মোহাম্মদ সারওয়ার জাহান এবং সৈয়দ আবুল মকসুদ। বিভিন্ন সংখ্যায় মিখাইল নুয়েম, জোশ মালিহাবাদী, আমীর মিনাই প্রমুখের কবিতার অনুবাদ ও ছাপা হয়েছে। অনুবাদের মধ্যে আরও আছে– আলবেয়ার কামুর উপন্যাস প্লেগ (এটির অনুবাদকের নাম অনুক্ত, 'অতিথি' অনুবাদক আবদুল হাই); এবং লিউনিদ আন্দ্রেয়েভ, আলেকজাণ্ডার কুপরিণ, ও, হেনরী, আহমদ নদীম কাসমীর গল্প। মনিরুজ্জামান প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'লেবেডফের ভাষা' শিরোনামে নাগরিকের শেষ—ষষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যায়। (পঞ্চম বর্ষ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর অপর প্রবন্ধের নাম 'বাক্য')। বাট্রাণ্ড রাসেলের The war crimes in vietnam পুস্তকের 'সংবাদপত্র ও ভিয়েৎনাম যুদ্ধ' শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবাদ করেছিলেন নেয়ামাল বাসির। রাসেলের একই গ্রন্থের 'ভিয়েৎনামে যুদ্ধ ও নির্যাতন' প্রবন্ধটি এর পূর্ববর্তী সংখ্যায় (৫/৩-৪) উপর্যুক্ত অনুবাদকের ভাষায় ছাপা হয়েছিল। রাসেলের মৃত্যুর পর (১৯৭০) সারা বিশ্বের মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিকেরা শোকে কাতর হয়েছিলেন। বাংলা পত্র-পত্রিকার লেখকসম্পাদকেরাও যথাসম্ভব শ্রদ্ধানিবেদনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। কোনো পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশন করে, কোনো পত্রিকায় তাঁর ব্যক্তিত্ব, দর্শন, চিন্তা ও জীবন-সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপনপূর্বক নিবন্ধ-প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় লিখে ; কোথাও বা তাঁর রচনার অংশবিশেষ অনুবাদ করে। নাগরিকও এই মহান মানবতাবাদী, দার্শনিক ও

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধিজীবীর প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচয় দিয়েছিল। উপর্যুক্ত রচনা ছাড়াও বশীর আল হেলাল লিখেছিলেন রাসেল–এর সার্বিক চিন্তা কর্ম ও রচনাবলীর মর্মজ্ঞাপক একটি প্রবন্ধ—'বুদ্ধি ও বিবেকের কাণ্ডারী রাসেল'।

চিন্তাচর্চায় 'নাগরিক' পূর্ববঙ্গের পত্রপত্রিকার মধ্যে আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছিল। এগুলোর মানও উন্নত। বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর 'আধুনিক কবিতার জীবন দর্শন' বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং এটাই ছিল নাগরিকের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রথম লেখা। তাছাড়া আহমদ রফিক লিখেছিলেন সাহিত্যে দর্শন (১/১) ; আধুনিক কবিতায় বিষাদ (১/২) ; এবং নজরুল গীতি প্রসঙ্গে (৪/৪)। আনোয়ারুল হক খান চলচ্চিত্রের শিল্পরূপ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন (১/২)। শামসুর রাহমান কবিতার পাশাপাশি প্রবন্ধও লিখেছিলেন নাগরিকে। নিসঙ্গবোধ ও আধুনিক বাংলা কবিতা (১/৩) ; এলিয়ট ও আমরা (১/৪) তাঁর রচনার শিরোনাম। গোলাম মোস্তফার মৃত্যুর (১৯৬৪) পরে শাহাবুদ্দীন আহমদ লিখেছিলেন তাঁর জীবন কর্ম ও চিন্তার ওপরে (১/৩)। লেখক সংঘ পত্রিকা সম্পাদনাকালে গোলাম মোস্তফার বেসরকারী সহযোগী ছিলেন তিনি। একালে সাহিত্যপত্রিকার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন বলে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার তাঁর পূর্ণ ছিল। সাহিত্য ও সাময়িকপত্র সংক্রান্ত তাঁর (সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের সমস্যা, ৪/১) আলোচনায় তাই পূর্ববঙ্গের সাহিত্যপত্রিকাপরিস্থিতি যা বর্ণিত হয়েছে—তাতে কিছু সত্য আছে। জিয়াউল হকের নামে এবং স্বনামে সাহিত্যপত্রিকা সম্পর্কে সৈয়দ আবুল মকসুদও কিছু আলোচনা লিখেছিলেন ; তাতে এবং মোহাম্মদ বদরুল আমীন খানের 'পাঠকের বক্তব্য'তে পত্রিকাপরিস্থিতির উপর আলোচনা আছে। এগুলো আজ কালের দর্পণ। বুলবুল ওসমান দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন— দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় 'সমকালীন ছোটগল্পে পূর্ব পাকিস্তান' ও তৃতীয় সংখ্যায় 'শিল্প ও শিক্ষাতত্ত্ব' বিষয়ে। 'অতিআধুনিকতার নৈরাশ্য; সঙ্গতি ও সুরস্রোতে নাটক' লিখেছিলেন আশরফ উদ্‌দৌলা (যথাক্রমে ২/৪ ও ৪/১ সংখ্যায়)। 'গোর্কী ও সাহিত্যের আদর্শ' শিরোনামে লিখেছিলেন তখনকার তরুণ লেখক আহমেদ হুমায়ুন (৪/১)। অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন—'সতীময়না ও লোর চন্দ্রানী' (৪/৩) ; নেয়ামাল বাসীর—'ফয়েজ আহমদ ফয়েজ' (৪/৪) সম্পর্কে দুটো ভালো আলোচনা বা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। নজরুল সম্পর্কে প্রকাশিত দুটি ব্যক্তিগত রচনার লেখক সিদ্দিকুর রহমান (দ্বিতীয় চিন্তার আলোকে নজরুল ৪/৪) ও সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (বেতারে কবি নজরুল, দৈনিক যুগান্তর থেকে পুনর্মুদ্রণ, ৫/৩–৪)। আবু জাফর শামসুদ্দীন মুক্তবুদ্ধির প্রচারক ও সাধক ই. এম. ফরস্টার সম্পর্কে এবং সরদার ফজলুল করিম লেনিনের মেটেরিয়ালিজম এণ্ড এমপিরিওক্রিটি সিজম গ্রন্থ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন পঞ্চম বর্ষ তৃতীয়–চতুর্থ যুগ্ম সংখ্যায় ঐ সংখ্যাতেই আবদুল গনি হাজারী 'ঐতিহ্যচিন্তার ভূমিকা' শিরোনামে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। লেনিন–উৎসব এর ওপর প্রতিবেদনধর্মী রচনা লিখেছিলেন বিপস্মি চাকমা (৫/১–২)।

নাগরিকে গল্প লিখেছিলেন ঃ সাইয়িদ আতীকুল্লাহ (উলু খাগড়া, ১/১ ; প্রেমের গল্প, ২/১ ; একটি গল্প ৫/৩–৪) ; শওকত ওসমান (একটি ট্রাজেডি, ১/১ ; কয়েকটি ছোটগল্প, ২/৩) ; হাসান আজিজুল হক (আবর্তের সম্মুখে, ১/২ ; উটপাখি, ১/৩ ; সারা দুপুর ২/১ ; রোদে যাবো, ৪/২) ; মীর নুরুল ইসলাম (অনুস্মৃতি, ১/২) ; লিউনিদ আন্দ্রেয়েভ ((মিথ্যা, আবদুল হাই অনূদিত, ১/২) ; বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (আমরা দুজন, ১/৩; প্রেম, ২/৪); আহমদ রফিক (গ্রহণের আলোয়, ১/৩; মায়া হরিণ ৪/২ ও ৪/৩); জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (লৌহ বেষ্টনী, ১/৩; ক্রীতদাসী বাসনা, ২/১; আবদুল মান্নান সৈয়দ (অভিভূত চাষা, ১/৪); আলেকজাণ্ডার কুপরিণ (প্রলোভন, অনুঃ আবদুল হাই, ১/৪); ও, হেনরী (আপ্যায়ন, অনু ঃ আশরাফউদ্‌দৌলা, ১/৪); আলবেয়ার কামু (অতিথি, আবদুল হাই, ২/১); শাহাদৎ চৌধুরী (হত্যাকাণ্ড, পূর্বাবৃত্তি, ২/৩); আহমদ নদীম কাসমী (মৃগয়া, অনুবাদ তাজাকলম, ২/৩); বশীর আলহেলাল (চুরিব লগ্ন, ৪/১ ; ফালতু, ৪/৩, কীটনাশক, ৪/৪); সৈয়দ আবুল মকসুদ (কুকুর হইতে সাবধান, ৪/১; কারফিউ, ৫/১–২; সোনালী শোধ, ৬/১); জাহানারা হাকিম গহবর, ৫/১–২); আলফাঁসো আলায়াস (দূরভাষিণী, অনু: কালীপ্রসাদ ভৌমিক, ৫/১–২); এবং ই. এম. ফরষ্টার (এর গল্প 'স্বর্গ হতে বিদায়' অনুবাদ করেছিলেন বশীর আল হেলাল, ৫/৩–৪)। আন্তন শেখভের নাটক 'চেরী বাগিচার' অনুবাদ করেছিলেন শাহাবুদ্দীন আহমদ। আঁদ্রে জিদ এর রচনা 'স্ট্রেট ইজ দি গেট' এর অনুবাদ করেছিলেন রেজাউর রহমান। 'বিশ্বসাহিত্য : এবারের নায়ক শোলঝোনিৎ সিন' শিরোনামে তাঁর নোবেলপুরস্কার প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে প্রবন্ধ লিখেন গৌতম উদয়ন বড়ুয়া।

বেশকিছু বইয়ের আলোচনাও তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন। আলোচিত গ্রন্থের প্রণেতা, আলোচ্যগ্রন্থ ও আলোচক — এই ক্রমিকে ১৪টি সংখ্যার আলোচিত পুস্তকসমূহের উল্লেখ করা হলো। বলা প্রয়োজন, প্রতিটি বইয়ের আলোচনাই প্রবন্ধের স্টাইল স্বতন্ত্র বা ভিন্ননামে এবং বিস্তৃতআকারে প্রকাশিত হয়েছে। যার মূল্য ও গুরুত্ব হলো আলোচনাগুলোতে সার্বিকভাবে পূর্ববাংলার সমকালীন সাহিত্যপরিস্থিতি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিম্বিত হয়েছে। এতে সাহিত্যবোধের পরিশীলনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ প্রণীত 'নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলোকবিতা'— হুমায়ুন আহমেদ ; শামসুর রাহমান প্রণীত 'রৌদ্র করোটিতে' — শাহাবুদ্দিন আহমদ; আবু রুশদ প্রণীত Songs of Lalan Shah – জরীন কলম; হাসান হাফিজুর রহমান প্রণীত 'বিমুখ প্রান্তর' — শাহাবুদ্দিন আহমদ; বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর প্রনীত 'অবিচ্ছিন্ন' —জাবালী; আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত 'আবুজাফর শামসুদ্দীনের শ্রেষ্ঠ গল্প'— মীর মহসিন আলী; আতাউর রহমান খান প্রণীত 'ওজারতির দুই বছর' – জরীন কলম; সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রণীত 'অন্বেষণ'— আহমেদ হুমায়ুন; আহসান হাবীব প্রণীত 'সারা দুপুর', আবদুল গনি হাজারী প্রণীত 'সূর্যের সিঁড়ি', আলমাহমুদ প্রণীত 'লোক লোকান্তর' — শাহাবুদ্দিন আহমদ; বুলবুল ওসমান প্রণীত 'কানামামা', হুমায়ুন কাদির প্রণীত 'একগুচ্ছ গোলাপ ও কয়েকটি গল্প'— জাবালী ; আহমদ রফিক প্রণীত 'নির্বাসিত নায়ক' ও আবদুল মান্নান সৈয়দ এর 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ'— শাহাবুদ্দীন আহমদ ; রশীদ হাদয়ার প্রণীত নানকুর বোধি — জুহাইর; আবদুল হক প্রণীত রোকেয়ার নিজের বাড়ী — সাহানা বেগম; আবুজাফর শামসুদ্দীন প্রণীত 'শেষ রাত্রির তারা', এবং 'এক জোড়া প্যান্ট ও অন্যান্য গল্প' — জাবলী; আবদুল কাদির প্রণীত 'উত্তর বসন্ত' — শাহাবুদ্দিন আহমদ '; আনোয়ার পাশা প্রণীত 'সাহিত্য শিল্পী আবুল ফজল' — মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন — গোলাম রহমানের 'ক্যাফে দ্য খোরাসান', মুজীবুর রহমান খাঁ প্রণীত 'সাহিত্যের সীমানা' — অজাতশত্রু; আবদুল হক প্রণীত 'সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ' — জাবালী; অধ্যক্ষ আনোয়ারুল করিম প্রণীত 'বাউল কবি লালন শাহ' — আহমদ

Dhaka University Institutional Repository

রফিক; মোহাম্মদ নাসির আলী প্রণীত 'লেবু মামার সপ্তকাণ্ড' ও 'যোগাযোগ' — আবদুল হক; মেরী ম্যাকার্থীর 'ভিয়েতনাম' বাট্রাণ্ড রাসেলের ওয়ার ক্রাইমস্ ইন ভিয়েতনাম — জাবালী; কুদরতুল্লাহ শাহাব প্রণীত ও নেয়ামাল বাসির অনূদিত গল্প 'ধূপছায়া' — বিপশ্চি চাকমা; সিকান্দার আবু জাফর অনূদিত রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম — আহমদ রফিক; আবদুর রশিদ খান প্রণীত 'বিস্মিত প্রহর'— সৈয়দ আবুল মকসুদ; আজহারুল ইসলাম প্রণীত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ'— আবু জাহেদ সালাহ্ উদ্দীন; নেয়ামাল ওয়াকিল প্রণীত 'রঙ ও রূপো' (নাটক) — সুরাইয়া মজুমদার ইত্যাদি।

জ্যাক দুখরে নামের দীর্ঘকায় ফরাসী সাংবাদিক ঢাকায় এসেছিলেন ১৯৬৯ সনের প্রথম দিকে। 'সাংবাদিক ও সাহিত্যানুরাগী দ্যুখরে ছিলেন মুক্তচিন্তার মানুষ। ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ঘুরে' তখন তিনি ঢাকায়, 'বিশ্ব রাজনীতি ও সাহিত্যসম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল' দ্যুখরেকে দিয়ে আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ আহমদ রফিক লিখিয়ে নিয়ে বশীর আল হেলালের দ্বারা অনুবাদ করিয়ে 'নাগরিক' এ ছেপেছিলেন (ফরাসী সাহিত্যের গতি প্রকৃতি, ৪/৩, ফাল্গুন-বৈশাখ ১৩৭৫-৭৬)। আবদুল হক লিখেছিলেন 'সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম মুহূর্তে' শিরোনামে উপনিবেশগুলোর অধিবাসীর চিন্তাধারার বিকৃতিসাধনে সাম্রাজ্যবাদীদের গৃহীত কৌশল সম্পর্কে। তবে উপনিবেশগুলোর জাগরণবাদী ধারার কথাও তিনি প্রবন্ধে ব্যক্ত করেন।

১৯৬৮-র গণঅভ্যুত্থানের ক্রান্তিকালে 'সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম মুহূর্তে' শিরোনামের প্রবন্ধে আবদুল হক আবেগ, মনের ও চিন্তার বিকাশ বিকৃতি অবমোচন ঘটাবার মতো আনন্দদায়ক একটি প্রবন্ধে যে আলোচনা করেন তা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ এবং সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তার দ্যোতক ঃ "কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যতদিন তার পদানত দেশে ক্ষমতাসীন থাকে ততদিন প্রবল প্রতিরোধের মুখেও তার মনে হয় সে সর্বেসর্বা, সে চিরঞ্জীব, পদানত জাতিকে শাসন করাই তার স্বাভাবিক অধিকার। প্রজ্ঞার উদয় না হওয়া পর্যন্ত এই রকম মনে হয় এবং প্রজ্ঞার উদয় কখনো হয় কখনো হয়না ; হলে সময় থাকতে সরে পড়ে, না হলে শেষ পর্যন্ত বিতাড়িত হয়। তথাপি শুধু বিদেশী শাসক নয়, কখনো কখনো কিছুসংখ্যক দেশী মানুষও ভাবতে ভরসা পায়না তাদের দেশে একদিন স্বাধীনতার সূর্যের উদয় হবে। দাস মনোভাবাপন্ন কেউ কেউ স্থায়ীভাবেই স্বদেশে চিরস্থায়ী বিদেশী শাসন কামনা করে ; যেমন অবিভক্ত এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা করতো। বৃটিশরা তাদের স্বধর্মী এবং তাদের শরীরের রক্তের একাংশ ঐ বৃটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয়দের অবদান, এই হিসাবে বৃটিশদের তারা-মনে করতো স্বজাতি ; আর এই কারণে তারা অবিভক্ত ভারতে চিরস্থায়ী বৃটিশ শাসন কামনা করতো। স্বধর্ম রক্তের ঈষৎ সংমিশ্রণের জন্য স্বদেশে বিদেশী শাসন কামনা এই প্রথম নয় এবং শেষও নয়।

ধর্ম ও মিশ্রিত রক্তের আত্মীয়তা যেখানে নেই, সেখানেও অন্য অনেক জটিল কারণে দেশী মানুষ বিদেশী শাসন কামনা করে। মীর জাফর ও কুইসলিংশ্রেণীর লোক, এবং বিদেশী শক্তির ভাড়াটের সংখ্যা পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে খুব কম নয় (মীর জাফর অবশ্য ছিলেন আরবের লোক)। এরা যেসব কারণে বিদেশী শক্তির ভাড়াটে অথবা পঞ্চম বাহিনীর কাজ করে, ভারতীয় লেখক নীরদচন্দ্র চৌধুরী অথবা সিঙ্গাপুরের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী অথবা আরব উপদ্বীপের পূর্ব উপকূল-অঞ্চলের ক্ষুদ্র সুলতানেরা একটু অন্য কারণে বিদেশী শাসন অথবা বিদেশী অভিভাবকত্ব কামনা করেন।" আজকের প্রখ্যাত নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মানসিকতা বিশ্লেষণ করে আবদুল হক লিখেছিলেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী বৃটিশ শাসনের অবসানে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন কারণ তাঁর কাছে বৃটিশরা শিক্ষায় সভ্যতায় সংস্কৃতিতে বিজ্ঞানে বীরজাতি। 'তাঁর মানসের মূল অনুভূতিটা বীর পূজার অনুভূতি।... তাঁদের মনোভাবটা, সংক্ষেপে, 'বিদেশী ভাল, তবু প্রতিবেশী বা স্বজাতি নয়'। পদানত জাতির মানসকে যদি এতটা অধঃপতিত করে না থাকতে পারে, তবে বৃথাই বৃটিশ কূটনীতি।' দাসমনোভাবের কারণ বিশ্লেষণ করে লেখক আরও বলেন, 'এই দাস মনোভাবের মূল উৎসটা হচ্ছে বৈদেশিক শক্তির আনুকূল্যে উপজাত ও বর্ধিত কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থবোধ। বৃটিশ বাহিনীর প্রহরায় ক্ষুদ্র সমস্ত 'সুলতান' যতটা সার্বভৌম এবং নিরাপদ বোধ করেন, অনেকগুলি সুলতানের যৌথ সঙ্ঘে স্বভাবতই ততোটা সার্বভৌম এবং অনেকগুলি সুলতানের সম্মিলিত প্রজাবাহিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ততোটা নিরাপদ বোধ করার ভরসা পাননা।...'[৯১]

আহমেদ হুমায়ুন 'গোর্কি ও সাহিত্যের আদর্শ' শীর্ষক প্রবন্ধে এদেশে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার বিপ্লবসহায়ক চেতনার লেখক গোর্কির সাহিত্যাদর্শের পরিচয় করাতে গিয়ে রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে এদেশের লোকেদের সামনে সমাজ গঠনে সাহিত্যের ভূমিকার গুরুত্বই বর্ণনা করেছেন প্রকারান্তরে—"রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যের কোন সম্ভাব নেই, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে জীবনকে বিচার করলে এবং সাহিত্যরচনায় প্রবৃত্ত হলে চিরায়তসাহিত্য সম্ভব নয়—এই প্রচারণার মাধ্যমে রক্ষণশীল পণ্ডিতরা সাহিত্যের অঙ্গন থেকে বস্তুকে চিরকাল নির্বাসিত করে রাখার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু গোর্কি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে এই অসত্যকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন, তিনি সবল হাতে প্রতিষ্ঠা করেছেন এই আদর্শ যে, সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষ অথবা শ্রেণী বিশেষের সম্পত্তি নয়, সাহিত্য সমষ্টির কল্যাণের জন্যে সাধারণের জন্যে।

গোর্কি তাঁর সৃষ্টিতে শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জয়গান, আঙ্গিক সর্বস্বতা এবং শব্দের অর্থহীন যাদুকরীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ রেখে গেছেন। উনিশ শতকী রুশ সাহিত্যে ব্যক্তির একক প্রতাপশালী ভূমিকাকে খর্ব করে গোর্কি সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সমষ্টির শাসন। আঙ্গিকসর্বস্বতাকে বিসর্জন দিয়ে সাহিত্যের অঙ্গনে বন্যার স্রোতাধারার মত তিনি ডেকে নিয়ে এসেছেন নীচুতলার আঁধারচারী মানুষের দৃপ্ত মিছিল। জীবন সম্পর্কে গোর্কির অপরিমিত অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ম গভীর উপলব্ধি এবং সর্বোপরি তাঁর প্রতিভা একদিকে তাঁকে যেমন গতানুগতিক প্রচারসাহিত্যের হাত থেকে রক্ষা করেছে, অন্যদিকে তেমনি এই গুণাবলী তাঁর সাহিত্য ও আদর্শকে দিয়েছে অবিসলবাদী প্রতিষ্ঠা।

আজকের দিনে শিল্পসাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যখন নতুন করে বিশ্বাসের সংকট দেখা দিয়েছে, হিপ্পির হল্লা ও বীটলদের বীভৎস ব্যাভিচারে যখন শিল্প-সাহিত্যের জগত কলুষিত হয়ে উঠেছে তখন গোর্কির শিক্ষা ও আদর্শকে নতুনভাবে স্মরণ করার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার আত্মকেন্দ্রিক দেউলিয়া সাহিত্য-জগতের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির সুস্পষ্ট তুলনা রয়েছে। সংকটকবলিত তৎকালীন রুশ সাহিত্যের কদাকার ছবির সঙ্গে সমকালীন সাহিত্যপ্রতিকৃতির সাদৃশ্য মোটেই দুর্লক্ষ নয়। সাহিত্যের 'শিব-সুন্দর' ক্ষেত্র থেকে রাজনীতিকে বিসর্জন দেবার নামে, আধুনিকতার অজুহাতে ও চিরায়ত সাহিত্যের ধূঁয়াতুলে বিকৃত মূল্যবোধের পূজারীরা সাহিত্যক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ক্লেদ জমা করে তুলেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর যুগের ক্লান্তি, অবসাদ ও হতাশা এই অবক্ষয়ী সাহিত্যধারাকে দিয়েছে অবাঞ্ছিত প্রশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা। সাহিত্যকে এই গ্লানি থেকে মুক্ত করে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার এখন আবার নতুনভাবে অনুভূত হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার উদগাতা বরণীয় সাহিত্যিক ম্যাকসিম গোর্কির জন্মশতবার্ষিকী সেই প্রয়োজনীয়তাকে আবার নতুনভাবে স্মরণ করিয়ে দিল।'[৯২]

আবদুল কাদির 'শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি' প্রবন্ধেও কুসংস্কার থেকে মুক্ত চিন্তার যুগোপযোগী ধারাকে চিনিয়ে দেবার জন্যে মানবগোষ্ঠীর সর্বপ্রাচীন শিল্পকলা নৃত্য ও সঙ্গীত সম্পর্কে বাঙালী মুসলমানের সমাজমনস্কতার পরিচয় উদঘাটন করে বলেন সাহিত্যও হবে 'স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত ; তার প্রকরণ আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে সৃষ্টি—তাতেই লেখা হয় প্রাণময়। বাইরের ফরমাসে তার প্রকরণ তৈরী হলে লেখা হয় কৃত্রিম ও প্রাণহীন। চারপাশের জনগণের সুখ-দুঃখ ও আশা-আশঙ্কার সঙ্গে চিত্তের গভীর যোগ স্থাপনেই হবে সরস ও সতেজ, প্রাণস্পর্শী ও প্রাণপ্রদ ; এ সত্যটি সদা স্মর্তব্য'। সাহিত্যের মতো সঙ্গীত-চর্চার আদর্শ সম্বন্ধেও আজ আমাদের নূতন করে ভাবতে হবে। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ তাঁর 'সমস্যা ও সমাধান' পুস্তকের 'সঙ্গীত সমস্যা' প্রবন্ধে বহু প্রামাণ্য দলীল উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, গীতি-বাদ্য হারাম হওয়ার অনুকূলে একটিও ছহি হাদিস্ বিদ্যমান নাই। তবে শর্ত এই যে, সঙ্গীত হবে নির্দোষ ও সদ্ভাবপূর্ণ—মানুষের মনে কুরুচি ও কুপ্রবৃত্তির উদ্রেক করে তেমন সঙ্গীত সর্বদা পরিত্যাজ্য।--কিন্তু এই শর্তটি সম্পর্কে আলবেয়ার কাম্যুর কথায় বলা যেতে পারে যে, ঃ'It was not invented to bring evil into the world. [Resistance, Rebellion and Death, P-18] । সর্বদেশে ও সর্বকালে শিল্পের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য ও আনন্দ সৃষ্টি। এই মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়েই পৃথিবীর সকল রাজ্যের মুসলমানও সঙ্গীতানুশীলন করেছেন।... পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞান আমাদের চিন্তায় আজ আলোড়ন এনেছে ; কিন্তু ইউরোপীয় সঙ্গীতের মেলডী (Melody) ও হারমনি (harmony) আমাদের সঙ্গীতে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে কি।.... সে-মহিমাকে কতোদূর উন্নত ও প্রসারিত করা চলে তারই পরীক্ষা অতঃপর আমাদের সঙ্গীত-শিল্পীদের করতে হবে। শুধু প্রস্তুতির স্তরে যে সাধনা, তা সাধারণের রুচিকেই তৃপ্ত করে। কিন্তু একটা জাতির সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে হলে চাই অসামান্য প্রতিভার আবির্ভাব। প্রতিভা বিধাতার দান ; কিন্তু তার উদ্ভব ও বিকাশের জন্য চাই সমাজ- ব্যবস্থার আনুকূল্য।' আবদুল কাদির চিত্রকলা অভিনয় প্রভৃতি সম্পর্কেও দীর্ঘ আলোচনা করে বলেন, 'সঙ্গীতের মতোই সংস্কৃতির একটা বড় অঙ্গ চিত্রকলা। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ তাঁর 'চিত্রকলা ও এছলাম' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, ইসলামে সকল প্রকার ছবি ও মূর্তির ব্যবহার হারাম করা হয়নি ; হজরত রসুলে করিম জীবজন্তুর চিত্র সমন্বিত কোনো কোনো জিনিস স্বয়ং ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর পরিজনগণের মধ্যে এ প্রকার চিত্রিত পর্দার এবং জীবজন্তুর মূর্তির ছবি ও প্রতিমূর্তি ব্যবহার করার অনুমতিও হজরত রসুলে করিম দিয়েছেন (মা. মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ সন, পৃ-৫৬৫)।... প্রাচীন আরবে চিত্রাঙ্কনের প্রথা প্রচলিত ছিল। সারাসেন সাম্রাজ্যে লিথোগ্রাফ ও অলঙ্করণ শিল্পের চরমোৎকর্ষ ঘটে। মোগল চিত্রকলা এই উপমহাদেশের এক গৌরবের বস্তু। আবদুর রহমান চুঘতাই সেই ধারা অনুসরণ করে যে স্বকীয়তার অধিকারী হয়েছেন, তা চিত্রশিল্পে তুলনাহীন। কিন্তু পিকাসোর Culism এর অনুসরণ করে আমাদের সাম্প্রতিক শিল্পীগণ তেমন কৃতিত্বের দাবীদার হতে পারছেন কি?... স্থাপত্যে মুসলমানেরা একদা পুরোগামী হলেও ভাস্কর্যে চিরদিনই একেবারে অনুপস্থিত....গোড়াতেই বলেছি, নৃত্য মানুষের আদিম শিল্প। আধুনিক কালে নৃত্যেও যে একটা জাতির চিৎপ্রকর্ষ মহিমময় রূপ লাভ করতে পারে, তার সার্থক প্রমাণ এ প্রদেশে দিয়ে গেছেন মরহুম বুলবুল চৌধুরী। কিন্তু 'তাঁর আবদ্ধ কাজ' অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। আজ এ প্রদেশে ও ছায়াছবি নির্মাণের প্রবল প্রতিযোগিতা চলেছে। সিনেমা ও থিয়েটারের একটা বড় আকর্ষণ নৃত্যে কোনো নূতন আঙ্গিক বা জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টির কোনো উদ্যম এখানে হচ্ছে কি?"[৯৩]

"নাগরিক 'সাহিত্য' বা 'সাহিত্যপত্রিকা' বিষয়টি সিরিয়াসলিই নিয়েছিল। সচেতনভাবে সামাজিক দায়িত্ব বুঝে পত্রিকা চালালে তার মধ্যদিয়ে কর্মকর্তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য মনোভাব ও মেধরার পরিচয় পাওয়া যায়। আহমদ রফিক ১৯৫০-৫২ সন থেকেই সাহিত্য ও রাজনীতিক্ষেত্রের সক্রিয়কর্মী। পত্রপত্রিকায় রচনা প্রকাশ ও সম্পাদনার অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল। পত্রিকাটি সচেতনভাবে প্রকাশিত হতো। এতে বাঙালির সংস্কৃতি, সাহিত্য সমাজ, এবং রাজনীতির ব্যাপারে রাসেল থেকে শুরু করে একালের আবদুল হক পর্যন্ত সমাজঘনিষ্ট চিন্তক লেখকদের রচনা—যাই প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ফুটে উঠেছে গণ-মানুষের আশা-আকাঙ্খার আর গণমনবিধৃত সাহিত্যের প্রতি আস্থা। সাহিত্যপত্রিকার বিকাশ অর্থাৎ বহু ব্যাপক পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশের নিশ্চয়তা তাঁরা কামনা করেছিলেন। এসবের উন্নতির চিন্তা থেকেই। সাহিত্যপত্রিকার সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে তিন-চারটি রচনা থেকেও এঁদের উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত হয়েছে। ঐকালের সাহিত্যপত্রিকায় সাহিত্যপত্রকির সমস্যা কি ছিল তার কিঞ্চিৎ উল্লেখও যুক্তিযুক্ত হবে, কারণ সামাজিক অগ্রগতির ইতিহাসে এসব রচনা অনেকটা মাইলফলকের কাজ করে থাকে। শাহাবুদ্দিন আহমদ লিখেছেন ঃ

"আমাদের এখানে ভাল সাহিত্যপত্রিকার অভাব। পত্রিকা যে দু'একটা বেরোয় না, এমন নয়। কিন্তু কোন পত্রিকাই দীর্ঘায়ু পায়না। অধিকাংশ পত্রিকাই অল্প সময়েই প্রাণ হারায়। এই অপমৃত্যুর কারণ কি?'

লেখক কারণ অনুসন্ধান করে পেয়েছেন 'প্রথমত ভালো পত্রিকার জন্য ভাল লেখা চাই। কিন্তু ভাল যাঁরা আমাদের এখানে লেখেন তাঁদের সংখ্যা কম। এবং তাঁরা এত কম যে মাত্র একটি পত্রিকার জন্যে বাছাই করা লেখা পেতে গেলে অন্য পত্রিকার উপোসে মরা ছাড়া গতি নেই। উপোস এজন্যে যে ভাল লেখকেরা বেশী লেখেন না ; কিংবা লিখবার অবসর পাননা। দ্বিতীয়ত অর্থ সমস্যা। আমরা যারা এখান থেকে পত্রিকা বের করি তারা লেখকদের পারিশ্রমিক দিতে অপারগ। আমাদের যাঁরা ভালো লেখক তাঁরা কখনো পরম স্বচ্ছলতার মুখ দেখেন না, এবং অভাবের হা পূরণ করার জন্যেও তাঁরা অনেক সময় লেখেন এবং

Dhaka University Institutional Repository

অনেক সময় মৌলিক রচনাকে বাধ্য হয়ে দূরে সরিয়ে অনুবাদের আশ্রয় নেন। সুতরাং অর্থ দিয়ে রচনা কিনতে না পারার জন্যেই যথাসময়ে লেখা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়না। তৃতীয়ত পাঠক-সমস্যা ....ফলে সাহিতপত্রিকার...বাজার (এ) ... ভীড় নেই... প্রকাশক নিরুৎসাহে ... (পত্রিকা বন্ধ করে দেন) ... আর একটি (কারণ)... বিজ্ঞাপন.... বিজ্ঞাপন কে দেয়? আর বিজ্ঞাপন সময় সময় দিলেও পয়সা কে দেয়?... মোটকথা সর্বব্যাপারে সহানুভূতির অভাব। এবং হৃদয়ের এই আন্তরিক অভাব একা শুধু বিজ্ঞাপনদাতার নয়, শুধু লেখকের নয়, এমনকি প্রকাশকেরও।... পত্রিকা প্রকাশের জন্যে প্রকাশকের মনে যদি ক্ষণিকের উন্মাদনা প্রশ্রয় পায় তবে তার বিলুপ্তি অবধারিত।'

প্রসঙ্গক্রমে লেখক এও উল্লেখ করেন ঃ "অর্থকরী সমস্যা নিদারুণ সন্দেহ নেই। কিন্তু নেশা যদি আত্মার সঙ্গে একাত্ম না হতে পারে তার অকাল মৃত্যু অনিবার্য। কেবল আত্মরক্ষার জন্যে সৃষ্ট নেশা বাস্তব হতে পারে। এবং বাস্তবতাই একমাত্র মরণের পথ আগলাতে সক্ষম।... অর্থাৎ পত্রিকা বের করার আগে আমরা প্রথমে ভাবব আমরা ভাল লেখা ছাপব কিনা ; ভাল লেখা ছাপলে (ছাপতে হলে) ভাল লেখক পাব কিনা, আমরা ভাল লেখক পেলে তাকে ভাল পয়সা দিতে পারব কিনা। পয়সার কথাটা এত বেশী করে বলার কারণ এই যে পয়সা লেখককে প্রকৃতিস্থ করতে পারে, তাঁকে অবসর দিতে পারে, আর সাহিত্যের এবং শিল্পের জন্য অবসর অত্যাবশ্যক। বিশেষ করে... উন্নতমানের শিল্প-সাহিত্যের.... জন্যেত বটেই। (আবার) পয়সাটা সাহিত্যের জন্যে যে সর্বস্ব তা বলব না। যেমন অনেক সময় স্বচ্ছলতা সাহিত্যিকের সর্বনাশ করেছে। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই সেই সব লেখক সতিকার লেখক নন। লেখাটা সে লেখকের নেশা নয়, জীবন মরণ নয়।... প্রকৃত লেখকের লোভটা অর্থের উপর কেন্দ্রীভূত না হয়ে হবে লেখার ওপরে। অর্থটা তার কাছে মুখ্য হবে না। মুখ্য না হলেও তবু অর্থের প্রয়োজন আছে।..পয়সা দিয়ে যে সাহিত্যের উন্নতি অসম্ভব নয় তা আমরা অস্বীকার করি কি করে? (তারপর একথাও সত্যি যে)... যাঁরা পত্রিকা বের করেন... তাঁরা একটা দায়িত্ব সম্পর্কে খুব বেশী সচেতন নন। এখানে যখনই কোনো পত্রিকা বের হয়। দেখা যায় সেই পত্রিকার মালিকেরা একটি নিজস্ব গোষ্ঠী সৃষ্টি করেন এবং পুনঃপুনঃ নিজেদের মনঃপুত ব্যক্তির লেখা ছাপেন। এতে সুবিধা অসুবিধা দুই-ই আছে। (সুবিধা হল এতে সাহিত্যপত্রিকার একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বা চারিত্রের জন্য বিশেষ গোষ্ঠীরও প্রয়োজন)... কিন্তু অসুবিধা যেটা তা হল, স্বাতন্ত্রের দিকে এমনি কড়া নজর রাখতে গিয়ে নতুন লেখক তৈরীর কাজটা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়না। অথচ পত্রিকার নতুনত্বের জন্যে নিরন্তর নতুনের সন্ধান একান্ত আবশ্যক। কেননা নতুন নতুন লেখকই পত্রিকাকে নতুন জীবন দিতে পারে। তাতে পত্রিকার একঘেয়েমী নষ্ট হয় এবং পত্রিকা মাঝে মাঝে পুরনো খোলস পাল্টে উজ্জ্বল চেহারা ফিরে পায়।' শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদকদের নতুন লেখক সৃষ্টির জন্যে উদার এবং কষ্টসহিষ্ণু মনের সম্পাদকের অভাব লক্ষ্য করেন। বিপরীত বা প্রতিপক্ষগোষ্ঠী বা দলের লেখকের 'সুন্দর' ও সৌন্দর্যের উদ্বোধক রচনা যে-কোনো সম্পাদকের ছাপা উচিত বলে মনে করেন। এরপর তিনি পত্রিকার কাটতি হয়না মর্মে আক্ষেপ করে বলেন, দেশে কি এক হাজার সামর্থবান শিক্ষিত রুচিশীল ব্যক্তিও (পাঠক) নেই যে একটি সাহিত্যপত্রিকার একহাজার কপিও বিক্রি হয় না। 'নিশ্চয় কোথাও একটা গলদ আছে।' লেখক ও পাঠকদের চাহিদার বা সম্পর্কের ঘনিষ্ট সম্মিলন ঘটছে না বলেই হয়তো এমন হচ্ছে। এ দেশের লেখকেরা উৎকর্ষের জন্য সাধনা করছেন। কিন্তু পাঠকেরা উৎকৃষ্ট বা উত্তম নয় বলে তা ছুঁয়ে দেখছেন না। ফলে পত্রিকা ষ্টলেই পড়ে থাকে। 'একটা ব্যাপ্ত চাহিদার অভাবে, আকুল পিপাসার অভাবে বদ্ধপানির নিস্কৃতি ঘটছে না এবং সাহিত্য তার যৌবনের সঙ্গী না পেয়ে বিষন্ন মুখে দিনাতিপাত করছে।' লেখক এবং সম্পাদকগণ যে পত্রিকার 'ভূমিকা' সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, শাহাবুদ্দীন আহমদের আলোচনার উপসংহারের এই বক্তব্যই তার প্রমাণ ঃ "সাহিত্যপত্রিকা সম্বন্ধে এত কথা বলার কারণ সাহিত্য সাহিত্যপত্রিকা ভিন্ন দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে পা বাড়াতে পারেনা। লেখকের চিন্তা-সুরাকে পরিবেশনের জন্য ভৃঙ্গারের প্রয়োজন। সে ভৃঙ্গার সাহিত্যপত্রিকা। এবং ভৃঙ্গারবহনের জন্য প্রয়োজন শাকীর। সে শাকী হলেন সম্পাদক অথবা পত্রিকা প্রকাশক। এদের অভাব মানেই সাহিত্যের স্বর্গপ্রাপ্তি। পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্য কি সেই স্বর্গের সিঁড়িতে পা রেখেছে? তাহলে আর আশা কি?"[৯৪] নাগরিকের ঘোষণা ছিল যে "প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হয়। যে কোন ভালো লেখা, লেখকের খ্যাতি, অখ্যাতি, গোত্র, মত নির্বিচারে প্রকাশ করা হয়। প্রতি সংখ্যার দাম একটাকা, বার্ষিক সডাক পাঁচ টাকা। লেখার অন্তর্নিহিত মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।" আহমদ রফিক 'নাগরিকের আসা-যাওয়া'তেও লিখেছেন ঃ 'নাগরিক নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীর কক্ষে সীমিত জীবন যাপন করেনি। গোষ্ঠীবহির্ভূত স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনই ছিল তার আকাঙ্ক্ষিত। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল সুস্থ এবং সুষ্ঠু সংস্কৃতির শিকড় ছোঁয়া রূপের নির্মাণে সহায়তা করা। অবশ্য আধুনিকতা ও প্রগতি-চেতনার সমন্বিত পদযাত্রায়।' জনাব রফিক বলেন, 'নাগরিকের এই উদ্দেশ্য ও নীতি সহ-সম্পাদক মকসুদের লেখায় নতুন করে ফুটে উঠেছিল পঞ্চম বর্ষ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যায়।' আবুল মকসুদ — লিখিত নাগরিকের নীতি ও উদ্দেশ্যসংক্রান্ত সেই রচনাটি ঃ "আন্তর্জাতিকতায় পুরোপুরি আস্থাবান হওয়া সত্ত্বেও স্বদেশের সংস্কৃতির গভীরে যাদের শেকড়, চিরায়ত মূল্যবোধে বিশ্বাসে ও সত্যানুসন্ধানী চেতনায় যাঁরা দীপ্যমান,—যাঁরা রুগ্নভাববিলাসিতা ও বাগসর্বস্বতার বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জীবনের জটিলতা, পংকিলতা ও যন্ত্রণায় ভয়-বিহ্বল না হয়ে গভীরতর বেদনায় যাঁরা সৃষ্টিশীল, সর্বোপরি মানবজাতির কল্যাণসাধনে যেসব শিল্পী-সাধক উৎসর্গীকৃতপ্রাণ ও মানবতার বাণী নিয়ে দ্রুত অগ্রসরতর— নাগরিক তাদেরই মুখপত্র এবং একই সঙ্গে নাগরিকে ক্লাসিক, রোমান্টিক, সর্বাধুনিক ও লোকায়তিক শিল্পীবৃন্দের যে কোন সুচিন্তিত ও সুলিখিত রচনা ... প্রকাশ করা হয়।"

নাগরিকের প্রচ্ছদ এঁকেছেন ইমদাদ হোসেন, নিতুন কুণ্ডু, আশীষ চৌধুরী, হাশেম খান, কাইয়ুম চৌধুরী প্রমুখ। 'শেষ দিককার সংখ্যাগুলোতে আমরা নিজেরাই প্রচ্ছদের পরিকল্পনা করে নিয়েছিলাম। কখনও প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার শিল্পকর্মের উপর নির্ভর করে, কখনও বা মকসুদ তার মেজাজমর্জিমত প্রচ্ছদ তৈরী করে নিয়েছে।'[৯৫] কার্টিজ কাগজে একের আট সাইজে নাগরিকের স্বপ্ন ছিল চতুরঙ্গের সুখ্যাতি কেনার, কিন্তু তা হয়নি বটে, তবে তাঁদের দৌড়, অনুশীলন ব্যর্থ হয়নি। পূর্ববাংলার সাহিত্যপত্রিকার ইতিহাসে এর নাম উজ্জ্বলরূপে শোভিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

১. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, 'পূর্ব পাকিস্তানের সাময়িকপত্র', আমাদের সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৯,পৃ ২ ৩৯

২. আবদুল হক, 'ভাষা আন্দোলনের পটভূমি', ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব, মুক্তধারা, ঢাকা ২য় সংস্করণ ১৯৮৪, পৃ ৬৩

৩. বাংলা ভাষার রাজনীতি ও তৎকালীন সামাজিক অবস্থার আলোচনার প্রথম সূত্রেই 'কৃষ্টি' উল্লেখিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে 'ভাষা-আন্দোলন' শুরু হবার আগেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশমূলক ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের প্রবন্ধ ('পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা')-টির কথা মূল্যবান আলোচনা-গ্রন্থ/ গবেষণা এবং ইতিহাসে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লিখিত হয়ে থাকে।

৪. কৃষ্টি, কার্তিক ১৩৫৪, পৃ ৪১

৫. আবদুল হক, ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব, পৃ ৪৯

৬. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি, ঢাকা ১৯৮৫ ; আনিসুজ্জামান কর্তৃক লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য

৭. মাহবুব উল আলম চৌধুরীর সঙ্গে ২২-০৫-১৯৯২ তারিখে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য

৮. পূর্বোক্ত

৯. মাহবুব উল আলম চৌধুরীর নিজের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত এবং স্বাক্ষরিত 'বায়োডাটা' থেকে

১০. সিনেমা (সাপ্তাহিক) ৪ঠা ফাল্গুন ১৩৯৫, পৃ ৯

১১. ৭ সংখ্যক পাদটীকা দ্রঃ

১২. ননী সেন গুপ্ত, বাংলা ভাষার রূপান্তর (প্রবন্ধ), সীমান্ত, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা কার্তিক ১৩৫৪, পৃ ৫৬

১৩. সীমান্ত পূর্বোক্ত, সম্পাদকীয়-আলোচনা, পৃ ৭২

১৪. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের সময় সম্পাদক মাহবুব উল আলম চৌধুরী স্মৃতি থেকে সানাউল হক এর অনুবাদ বলে উল্লেখ করেছিলেন। শওকত ওসমান 'চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন : প্রগতিশীলধারা' শীর্ষক বই-এর স্মৃতিকথায় লিখেছেন : "সংস্কৃতি-আন্দোলনের সহায়করূপে নানাভাবে বর্তমান 'সংবাদ' দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক আহমদুল কবিরের নাম স্মরণ না করে উপায় নেই। চল্লিশ বছর পূর্বের কথা। তখন চালচুলোহীন কুমার তিনি। পাকিস্তানের সরকারী অফিসার আমদানী-রফতানী বিভাগে। ... সাংস্কৃতিক নানা পর্ব-অনুষ্ঠানে তাঁর সাহায্য পাওয়া যেত। সরকারী অফিসার তাই নেপথ্যে থাকতেন। সীমান্ত পত্রিকায় ছদ্মনামে ক্রিষ্টফার কডওয়েল এর বই থেকে এক প্রবন্ধ তিনি অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। অন্য ধরনের সাহায্যের কথা বাদ দিলাম" (পৃ-৫৩) প্রকৃত তথ্য হয়ত আরও অনুসন্ধানের পর জানা যাবে।

১৫. প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সূচীপত্র সম্পূর্ণ উল্লেখকরা হয়েছে বলে এখানে পুনরুক্তি করা হয়নি। মাহবুব উল আলম চৌধুরী জানান (সাক্ষাৎকারকালে) প্রাথমিকা প্রামাণিক, মোহাম্মদ শাহেদ উদ্দিন, সবুজ চৌধুরী, মোসফেকা রহমান, আলমগীর প্রভৃতি ছদ্মনামে তিনিই লিখতেন। চলন্তিকা রায়, শুধু চৌধুরী বিভিন্ন ছদ্মনামে লিখতেন সুচরিত চৌধুরী। আজম চৌধুরী, দিলদার চৌধুরী প্রভৃতি নামে লিখেছেন সানাউল হক, তিনি খোদ সরকারী আমলা-অফিসার ছিলেন। সিরাজুল ইসলাম নামে লিখতেন আজিজ মিছির। ইমামুর রশিদ ময়মনসিংহের লোক ছিলেন।

১৬. উদ্ধৃত, চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন ঃ প্রগতিশীল ধারা; পৃ ৭

১৭. আবদুল হক, 'ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব' পূর্বোক্ত, পৃ ১৩

১৮. সীমান্ত, ১ বর্ষ, ২ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৪

১৯. সীমান্ত-সম্পাদক মাহবুব উল আলম চৌধুরী বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে এই সংখ্যাটির কথা প্রসঙ্গে ২০০ পৃষ্ঠার কথা বলে থাকেন, কারণ দীর্ঘ দিন পর তিনি প্রকৃতপক্ষে কি করেছিলেন, তা ঠিক ঠিক মনে করতে পারেননি; সংখ্যাটিও তাঁর নিজের কাছে নেই।

২০. মোতাহের হোসেন চৌধুরীর এই লেখাটি 'সংস্কৃতি-কথা' (১৯৫৮) শীর্ষক গ্রন্থে সংকলনের সময় প্রধান উদ্যোক্তা লেখকের ভগ্নি-পুত্র, পাকিস্তানের সিভিল সার্ভেন্ট, প্রয়াত প্রখ্যাত কবি, সানাউল হক (এবং তাঁর সহদর কবি ইমাউল হক প্রমুখ) পাকিস্তানের তৎকালীন রাজনীতিক পরিস্থিতির কারণে স্পর্শকাতর (পাকিস্তান সরকারের সমীপে, পশ্চিমবঙ্গের লোকেদের সঙ্গে আত্মীয়তা বৃদ্ধির অনুরোধ আছে) ৫ পৃষ্ঠা বাদ দিয়ে পরিমার্জনপূর্বক মুদ্রিত করেন। 'সংস্কৃতি কথায়' প্রবন্ধের শিরোনামও পরিবর্তিত হয়েছে - 'একটি নিবেদন'। 'সংস্কৃতি কথায়' ৬ পৃষ্ঠা ছাপা হয়েছে, মূল লেখাটি ১২ পৃষ্ঠার। বাকী অংশটি হিসাবমতে গ্রন্থাকারে এখনও অসংকলিত রয়েছে।

২১. সীমান্ত, কার্তিক ১৩৫৭, পৃ ১৩

২২. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, পূর্বোক্ত, ঢাকা ১৯৬৯, পৃ ২৩৯

২৩. পূর্বোক্ত

২৪. কবি আতাউর রহমান এবং ডঃ আহমদ শরীফ এর সঙ্গে 'অগত্যা' প্রসঙ্গে আলোচনা কালে গবেষককে তাঁরা আন্তরিকভাবে অকপটে বলেন ঃ 'অগত্যা ভদ্রলোকের পত্রিকা ছিলনা'। দৈনিক বাংলার (৯ কার্তিক ১৩৯৮) সাহিত্যের পাতায় প্রকাশিত আতাউর রহমান এর 'অগত্যা এবং আমরা কয়েকজন' শীর্ষক স্মৃতিকথায় লেখা হয়েছে প্রথম পরিচয়-কালে পত্রিকার কর্মী তাসিকুল আলম খাঁকে তিনি বলেছিলেন : "ফাজলামিতে ভরা আর নামটাতেই আমার আপত্তি আছে।'

২৫. মুহম্মদ জাহাঙ্গীর, বাংলাদেশে সাংবাদিকতা, ঢাকা ১৯৮৭, পৃ ১৩৩

২৬. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশের প্রথম সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারী' (১৯৫৩) তে ফজলে লোহানী, আতাউর রহমান , আনিস চৌধুরীর কবিতা রয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

২৭. আতাউর রহমান, '২৪ সংখ্যক পাদটীকায় উল্লিখিত সূত্রে

২৮. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, আনিসকে দেখছি, ইত্তেফাক ৩০শে কার্তিক ১৩৯৭

২৯. ২৭ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য। বাঙলাদেশের জনগণের নিকট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী মধুর রেষ্টুরেন্টের পরিচয় প্রদানের প্রয়োজন পড়ে না। এদেশের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে মধুর রেষ্টুরেন্ট অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে।

৩০. সৈয়দ আলী আহসান রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত ধারণা পরবর্তীতে বর্জন করেছিলেন বলে ডঃ আনিসুজ্জামান 'স্বরূপের সন্ধানে' শীর্ষক গ্রন্থে (পাদটীকায়, পৃঃ ১০৯) উল্লেখ করলেও এই বক্তব্য সমর্থন করা যায়না এই কারণে যে, ব্যবসায়িক কারণে বা রাজনৈতিক পরিস্থিতি-পরিবর্তনের ফলে, অথবা যুগের হাওয়া বদলের সঙ্গে সঙ্গে ভোল-পাল্টানোর অর্থ আন্তরিকভাবে কোনও মতাদর্শ গ্রহণ বা 'বর্জন' বোঝায় না। সার্বিকভাবে লেখক-ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র এবং কর্ম ও চিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্র-সংক্রান্ত মত পরিবর্তন (বর্জন) এর তথ্য সংগতিপূর্ণ নয়। বরং দীর্ঘকালের কর্ম ও চিন্তা এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থান বিবেচনা করলে তাঁকে 'চলতি হাওয়ার পন্থী'-ই বলতে হয়

৩১. চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫, পৃ ২১

৩২. আবদুল হক,পূর্বোক্ত, পৃ ৪৭

৩৩. বাংলা একাডেমীর লেখক পরিচিতিতে মাহবুব জামাল জাহেদীর নাম নেই। মুস্তাফা নূরউল ইসলামের স্মৃতিকথা-'আনিসকে দেখছি' তে জনাব জাহেদীর উল্লেখ আছে কিন্তু কোনো পরিচয় নেই; যা আছে তাহলো মুস্তাফা নূরউল ইসলাম প্রমুখের 'অগত্যা'-গোষ্ঠীর সঙ্গে মাহবুব জামাল জাহেদীও যুক্ত ছিলেন। তিনি যে, 'দীর্ঘকাল প্রবাসী' এবং হৃদরোগাক্রান্ত — তা উক্ত স্মৃতিকথাতেই উল্লিখিত আছে। তাঁর সঠিক জন্ম-সন সন্ধান করেও জানতে পারিনি কোথাও কোনো স্মৃতিকথায়ও তাঁর পরিচয় দেয়া হয়না।

৩৪. চরিতাভিধান, পূর্বোক্ত,পৃ ১১২ ও ২৯১

৩৫. খালেক বিন জয়েনউদ্দীন, 'আবদুল গনি হাজারী এবং মুকৃতি', আবদুল গনি হাজারী স্মৃতি সংখ্যা: ১৯৭৮; সম্পাদক : আবু হেনা মোঃ কামাল (ঢাকা), পৃ ১১৫-১৭। মুকৃতির ঐ সংখ্যায় কে কি লিখেছেন, তা বলা নেই এবং মুকৃতির ঐ সংখ্যা দেখতে পাওয়া যায়নি বলে বিস্তারিত বলা গেল না।

৩৬. রফিকুল ইসলামের আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : উত্তরণ (দ্বিমাসিক পত্রিকা), সম্পাদক : এনামুল হক, ১ বর্ষ ১ সংখ্যা, ঢাকা ভাদ্র- আশ্বিন ১৩৬৫

৩৭. মুকৃতি, সম্পাদক : আবদুল গনি হাজারী ও মাহবুব জামাল জাহেদী; ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা ঢাকা, আষাঢ় ১৩৫৭,পৃ ৩৯ – ৪২

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ ৪২-৪৩

৩৯. সীমান্ত-সম্পাদক মাহবুব উল আলম চৌধুরীর সঙ্গে ২২.০৫.৯২ তারিখে সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে একথা উল্লেখ করেন যে, তিনিও কমিউনিস্ট পার্টির রবীন্দ্র সাহিত্যকে বুর্জোয়া ভাবধারার বলে বর্জনের নীতির বিরোধীতা করে 'দৈনিক সত্যযুগ' পত্রিকায় তিন কিস্তিতে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৯৫০ সনের স্বাধীনতা দিবসের পূর্বদিন ১৩ আগস্ট তারিখে ঢাকায় দুই বাঙলার কবি সাহিত্যিকদের এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'কলিকাতা পোয়েট্রী গ্রুপের' উদ্যোগে কলকাতা থেকে বুদ্ধদেব বসু, শিবনারায়ণ রায় প্রমুখ কয়েকজন সাহিত্যিক ঢাকায় আসেন। ডঃ শহীদুল্লাহ্‌ গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ আলী আহসান, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, মুনীর চৌধুরী, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী প্রমুখ ঢাকার উল্লেখযোগ্য প্রায় সকল কবি-সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে ঐ সভায় বাঙলা সাহিত্যের তৎকালীন বিতর্কের (পূর্ব বাঙলার সাহিত্য কি প্রাক্‌-বিভাগ-যুগের বাংলা সাহিত্যকেই অনুসরণ করে চলবে, না নতুন রাষ্ট্র গঠনের ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে নতুন পথে চলবে—মোটামুটি এই হল বিতর্কের বিষয়) পরিপ্রেক্ষিতে খোলাখুলি অনেক আলোচনা হয়। ঐ আলোচনা-সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ মুকৃতি-র দ্বিতীয় সংখ্যার (শ্রাবণ ১৩৫৭) 'সংস্কৃতি-সংবাদ' বিভাগে প্রকাশিত হয় (পৃ ১০৯-১০)। প্রতিবেদনে বলা হয়, বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য সমর্থন করে শিবনারায়ণ রায় 'সাহিত্যে মতবাদ প্রচারের প্রচেষ্টাকে নিন্দা করে বলেন যে, কোন একটি বিশিষ্ট মতবাদকে ভিত্তি করে সাহিত্যের উৎকর্ষতার বিচার করা মোটেই শোভনীয় নয়। স্বীয় মূল্যেই সাহিত্যের বিচার করা উচিত। অবশ্য তিনি এ কথাও বলেন নি যে, মতবাদ প্রচার করলেই সে-সাহিত্য উৎকৃষ্ট সাহিত্য হবেনা বা সাহিত্য-বিচারে তা উতরোবেনা। তবে সাহিত্যের বিচারে সে মতবাদের প্রয়োগ ঔচিত্য-বিরোধী। উদাহরণ স্বরূপ তিনি সম্প্রতি কলকাতায় প্রকাশিত একখানি পুস্তিকার কথা উল্লেখ করেন, যাতে কোন একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের মতবাদের ভিত্তিতে সাহিত্য-বিচারের জন্য বলা হয়েছে। এবং সে-মতবাদ অনুসারে রবীন্দ্রনাথকেও বর্তমান যুগের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় একজন বুর্জোয়া কবি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।'

৪০. মুকৃতি, ১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৭, পৃ ১৫৫-৫৮

৪১. আহমদ শরীফ, বাংলার বিপ্লবী পটভূমি, ঢাকা ১৯৮৯, পৃ ৩৫

৪২. মুকৃতি, সাময়িকী, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৫৭, পৃ ৫৮

৪৩. পূর্বোক্ত, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, পৃ ১৭০

৪৪. তাহজিব, সম্পাদক ঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান, ১ বর্ষ ৬ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫৭, পৃ ৩৯১

৪৫. মফিজ উল হক, 'স্মৃতির সায়রে চট্টগ্রাম', চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন : প্রগতিশীল ধারা, পৃ ৬৭

৪৬. আজিজ মিছির (সিরাজুল ইসলাম), পঞ্চাশ দশকের শুরু ঃ প্রগতিশীল আন্দোলন, চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন : প্রগতিশীল ধারা, পৃ ৪০

৪৭. পরিচিতি, সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি মফিজ -উল-হক, ৩ বর্ষ, ১ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬০, পৃ ১০

৪৮. আজিজ মিছির, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৮

৪৯. মফিজ উল হক, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৭-৬৮

Dhaka University Institutional Repository

৫০. আহমদ রফিক (ডাক্তার, সাহিত্যিক), যে স্মৃতি রক্ত ঝরায়, শ্যামলী নাসরীণ চৌধুরী প্রণীত 'একাত্তরের শহীদ ডাক্তার আলীম চৌধুরী' শীর্ষক গ্রন্থের পরিশিষ্ট, পৃ ৭৪-৭৫

৫১. যাত্রিক, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, পৌষ ১৩৫৯, পৃ ৩৭

৫২. কাজী মোতাহার হোসেন প্রণীত 'নজরুল কাব্য পরিচিতি' এবং কাজী ফজলুর রহমান প্রণীত 'সমালোচনা প্রসঙ্গে' শীর্ষক প্রবন্ধের জন্য দ্রষ্টব্য : যাত্রিক, ১ বর্ষ ২ সংখ্যা মাঘ ১৩৫৯ পৃ ৫২-৫৪ ও ৬৩-৬৭

৫৩. যাত্রিক, ১ বর্ষ ৩ সংখ্যা মাঘ ১৩৫৯ পৃ ৯১ এবং ৯১-৯৬

৫৪. যাত্রিক, ১ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৫৯, পৃ ১৩০

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ ৯০

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ ১০০

৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ ৯৯

৫৮. আনিস চৌধুরীর 'রূপালী মৃত্যু' (১/৫); আবদুল গাফফার চৌধুরীর 'বৃষ্টি' (২/৬-৭); সৈয়দ শামসুল হকের 'রোগ' (১/৫); জহির রায়হানের 'ভাঙাচোরা' (২/৬-৭); বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর এর 'গ্রামীন' (২/৬-৭); নেয়ামাল ওয়াকিল-এর 'জীবন ও জীবিকা' (১/৫) গল্পগুলো (স্পন্দন'-এর) এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য

৫৯. শামসুর রাহমান, পুরানের নতুন জন্ম, স্পন্দন, ২ বর্ষ, ৬-৭ যুগ্ম-সংখ্যা আশ্বিন-কার্তিক, ১৩৬৯, পৃ ৭

৬০. স্পন্দন, ১ বর্ষ, ৫ সংখ্যা ('সাহিত্যের পসরা'); সম্পাদক ঃ মহিউদ্দীন আহমদ, ভাদ্র ১৩৬০

৬১. স্পন্দন, ১ বর্ষ, ৮-৯ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৬০ পৃ ১-৩

৬২. রৈবত (ছদ্মনাম?), দুর্বোধ্য, স্পন্দন, ১ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, পৃ ১৫

৬৩. আহমদ শরীফ, আধুনিক কবিতা কি দুর্বোধ্য?; স্পন্দন ২ বর্ষ ৬ -৭ যুগ্ম-সংখ্যা আশ্বিন-কার্তিক ১৩৬১, পৃ ৫৮

৬৪. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, প্রবন্ধ সাহিত্য, স্পন্দন, ২ বর্ষ, ৬ -৭ যুগ্মসংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩৬১, পৃ ২০

৬৫. সম্পাদক ডক্টর এনামুল হক ১৫.০৬.৯১ তারিখের এক আলোচনায় বর্তমান গবেষককে জানান '১৯৬১ সনের প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস রুলস-এ পত্রিকা প্রকাশের জন্য নতুন করে পারমিশন নেবার দরকার হলো। আমাকে পাকিস্তান-বিরোধী প্রগতিশীল (বামপন্থী) সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মী মনে করা হতো (সরকারী দৃষ্টিতে) বলে ডিআইবি রিপোর্টের প্রতিবন্ধকতার কথা বলে উত্তরণের ডিক্লিয়ারেশন নবায়ন করা হলোনা। পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলো।' এই ঘটনার পর তিনি ব্যারিষ্টার ডঃ আলীম আল রাজীকে আইনজীবী নিয়োগ করে 'রীট' এর জন্য নোটিশ দিলেন যে প্রকাশক অর্থশালী, আর সম্পাদক এম. এ. পাশ, যোগ্য ব্যক্তি— কেনো পত্রিকার ডিক্লিয়ারেশন দেয়া হবে না। ইত্তেফাকে সিরাজউদ্দিন হোসেন সাহেবের নিকট গেলেন 'উত্তরণ' বন্ধের একটা সংবাদ প্রকাশের জন্য— কিন্তু তিনিও বললেন ঃ "আমাদের পত্রিকাটি (এই ধরণের নিউজ প্রকাশের, সরকারের সমালোচনা করার অপরাধে) বন্ধ হয়ে যাক, এটা চাইনা।" ডি.আই.বি.-র লোকেরা সম্পাদককে ডেকে নিয়ে মামলা না-করার জন্য চাপ সৃষ্টি করলেন। বল্লেন, "রাজনীতি না-করলে জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে লড়াই সমীচীন হবেনা।"

৬৬. আবুল ফজল সাহেবের এই রচনাটি তাঁর 'নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন' (১৯৮১) গ্রন্থে সংকলিত আছে। 'উত্তরণ' ২ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৬ তে প্রথম মুদ্রিত হয়।

৬৭. উত্তরণ, ২ বর্ষ ১ সংখ্যা ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৬, পৃ ৮

৬৮. সম্পাদকের সঙ্গে (২১.৬.৯১) আলাপ থেকে

৬৯. 'তের নম্বরে পাঁচ-বছর' গ্রন্থের লেখক সাদত আলী আখন্দ 'প্রিয় ডক্টর সাহেব' সম্বোধন পূর্বক চিঠি লিখে 'উত্তরণ' এ তাঁর 'তের নম্বরে পাঁচ বছর' ছাপার জন্য অনুরোধ জানান. উল্লখ্য, তখন 'উত্তরণ' সম্পাদক এনামুল হক 'ডক্টর' হননি। আখন্দ সাহেব মনে করতেন এই পত্রিকার সম্পাদক প্রখ্যাত ভাষাতাত্বিক, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের এককালীন মহা-পরিচালক (তখন 'পরিচালক' বলা হতো) 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থের প্রণেতা ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক। তাছাড়া এমন উন্নততর পত্রিকা আর কোন্ এনামুল হক সম্পাদনা করতে পারেন? সম্পাদক এনামুল হক সাক্ষাৎকারে, গল্পচ্ছলে একথা জানান।

কাজী আবদুল ওদুদ আবুল ফজল সাহেবকে ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখে জানান, 'চমৎকার হয়েছে'। (রেখা চিত্র, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৬৫, পৃ ৩৫৩ দ্রঃ)। আবদুল মান্নান সৈয়দ 'শিল্পতরু' পত্রিকায়, আর শামসুর রাহমান 'মূলধারা' পত্রিকায় ('জনান্তিক' শামসুর রাহমানের কলাম, মূলধারা, প্রধান সম্পাদক শামসুর রাহমান, বর্ষ ১, সংখ্যা ১১, ১১ মার্চ, ১৯৯০, রবিবার) লিখেছেন : "সত্যি কথা বলতে কী সেকালে 'উত্তরণ'র মতো সাহিত্য সংকলন পূর্ব বাংলায় প্রকাশিত হয়নি। তরুণ সম্পাদকের শ্রম ও নিষ্ঠার জন্যই অমন সুন্দর এবং উন্নতমানের সংকলন ছাপা হয়েছিলো। রীতিমতো সাড়া জাগিয়েছিলো 'উত্তরণ'।"

৭০. আবুল ফজল 'রেখাচিত্র' (১৯৬৫)তে উত্তরণকে প্রগতিশীল মাসিক পত্রিকা উল্লেখ করে 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রকাশের কাহিনী বিবৃত করেছেন ৩৫৪ পৃষ্ঠায়

৭১. ডঃ এনামুল হক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার কালে বলেন

৭২. তৃতীয় বর্ষের বর্ষশুরু বিশেষ সংখ্যার সম্পাদকীয়, 'উত্তরণ' ভাদ্র, ১৩৬৭

৭৩. দ্বিজেন শর্মা, 'ধর্ম জাতি আমরা'; উত্তরণ, ১ বর্ষ ১ সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৫.

Dhaka University Institutional Repository

৭৪. সাক্ষাৎকার (২১.০৬.৯১) –এ সম্পাদকের প্রদত্ত তথ্য অবলম্বনে

৭৫. মনসুর মুসা, পূর্ব বাংলার উপন্যাস, ঢাকা ১৯৭৪, পৃ ৯২

৭৬. সম্পাদকীয়, উত্তরণ, বর্ষ শুরু সংখ্যা, ৩ বর্ষ, ভাদ্র ১৩৬৭

৭৭. মনসুর মুসা, পূর্বোক্ত, পৃ ১০২

৭৮. টিপু সুলতান, 'অনুবাদ সাহিত্য প্রসঙ্গ'; উত্তরণ, ১ বর্ষ ১ সংখ্যা পৃ ৬–৯

৭৯. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, (শহীদুল্লাহ কায়সার), প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যর্থতা কোথায়? উত্তরণ, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, পৃ ৪২–৪৫

৮০. পলিমাটির একটি সংখ্যা প্রেস থেকেই কি কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে চারটি সংখ্যা এখন পাওয়া যায়। পলিমাটির একজন নিয়মিত লেখক আবুল কাসেম ফজলুল হক এই তথ্য উল্লেখ করে বলেন, ঐ সংখ্যাতে তাঁরও একটি লেখা ছিল, ফলে খোঁয়া যাবার কথাটি মনে আছে। তিনি জানান ৭১ সনের পূর্বে পলিমাটির চারটি সংখ্যাই বাজারে এসেছিল।

৮১. আবুল কাসেম ফজলুল হক, ক্রান্তিকাল ঃ সংস্কৃতি ও সাহিত্য,পলিমাটি, ১ম সংকলন, ১৩৭৩, পৃ ১৫

৮২. মাহবুব উল্লাহ, সংস্কৃতি ও শ্রেণীসংগ্রাম, পলিমাটি, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৩

৮৩. আবুল কাসেম ফজলুল হক, প্রত্যাশার পৃথিবী,পলিমাটি, ২য় সংকলন, ১৩৭৪, পৃ ১৯

৮৪. পূর্বোক্ত, কালের যাত্রার ধ্বনি, পলিমাটি ৩য় সংকলন ১৩৭৫, পৃ ৩৬

৮৫. পূর্বোক্ত, পৃ ৪৬–৪৮

৮৬. পূর্বোক্ত, পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গন, পূর্বোক্ত, ৫ম সংকলন, ১৩৭৭, পৃ ১০–১৫

৮৭. সামসুল আলম, একুশের প্রেক্ষিতে কতিপয় প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ ১৭–২০

৮৮. পলিমাটি পঞ্চম সংকলনের প্রচ্ছদে উদ্ধৃত কবিতার প্রথম চরণ।

৮৯. আহমদ রফিক, 'নাগরিক'–এর আসা যাওয়া, 'সাহিত্য সাময়িকী' সম্পাদক শিরীণ সুলতানা, প্রকাশক : রূপম প্রকাশনী, ৪ বর্ষ, শীত সংকলন, ডিসেম্বর ১৯৮৮, পৃ ১৯১

৯০. পূর্বোক্ত, পৃ ১৯৯। সৈয়দ আবুল মকসুদ ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, পাকিস্তান আমলের ঐ সন্ত্রাসের রাজত্বে স্বররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাকুরে জিয়াউল হক আমাদেরকে সরকারি মনোভাব পূর্বাহ্নেই জানিয়ে সতর্ক করে দিতেন। পুলিশের, গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীরা মাঝে-মধ্যে, প্রেসে এবং বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে আমাদেরকে সন্ত্রস্ত রাখতো। পত্রিকাটির প্রতি জিয়াউল হকের আন্তরিকতা এবং ব্যক্তিগত ঋণের স্বীকৃতিস্বরূপই সৈয়দ আবুল মকসুদ জিয়াউল হকের ছদ্মনামে দু' একটি আলোচনা লিখেছিলেন। জিয়াউল হক কিছুদিন পূর্বে দেহত্যাগ করেন।

৯১. আবদুল হক, সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম মুহূর্তে, নাগরিক ৪ বর্ষ ২ সংখ্যা, ১৩৭৫, পৃ ৫। সংখ্যাটিতে মাসের নাম উল্লেখ নেই। তবে আবদুল হকের রচনায় ১৯৬৮ সনের তথ্য রয়েছে বলে ১৯৬৯ এর রচনা বলে মনে হয়।

৯২. আহমেদ হুমায়ুন, গোর্কি ও সাহিত্যের আদর্শ, নাগরিক, ৪ বর্ষ ১ সংখ্যা শ্রাবণ–আশ্বিন, ১৩৭৫, পৃ ৩

৯৩. আবদুল কাদির, শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি, নাগরিক ২ বর্ষ ৪ সংখ্যা কার্তিক–পৌষ ১৩৭৪, পৃ ৭

৯৪. শাহাবুদ্দীন আহমদ, সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের সমস্যা, নাগরিক, ৪ বর্ষ ১ সংখ্যা, শ্রাবণ–আশ্বিন, ১৩৭৫, পৃ ২৭, ৩২

৯৫. আহমদ রফিক, নাগরিকের আসা–যাওয়া, পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৪৭ সনে সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তান। রামমোহন রায় (১৭৭৪–১৮৩৩); ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০–৯১); মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৯২৪–৭৩); বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮–৯৪); রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১); দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩–১৯১৩); প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮–১৯৪৬); শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬–১৯৩৮) ; সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২–১৯২২); রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪–১৯১৯); রাজশেখর বসু (১৮৮০–১৯৬০); মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮–১৯৫২); কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪–১৯৭০); বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪–১৯৫০); কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯–১৯৭৬); জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯–১৯৫৪); আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৭–১৯৭৯); তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮–১৯৭১); সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১–৬০); জসীমউদ্দীন (১৯০৩–৭৬); আবুল ফজল (১৯০৩–৮৩); বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮–৭৪); আবু সয়ীদ আইউব (১৯০৬–৮২; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১০–৫৬); ফররুখ আহমদ (১৯১৮–৭৪); সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৭–৪৭) প্রমুখ কবি–সাহিত্যিক এবং বঙ্গদর্শন, ভারতী, সাধনা, সবুজপত্র, সওগাত, কল্লোল, শিখা, কালিকলম, কবিতা, পরিচয়, বুলবুল, অগ্রগতি, মোহাম্মদী, চতুরঙ্গ প্রভৃতি সাহিত্যপত্রিকার সাধনায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এমন উৎকর্ষ ঘটে যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশকের মধ্যেই বিশ্বসাহিত্যের বিচারে কয়েকটি ভাষা ও সাহিত্যের সমকক্ষ না হতে পারলেও ভারতের সকল ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতো হয়েছিল বটেই, জাপান, চীন, ইন্দোচীন, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের ভাষা ও সাহিত্যের থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। এদেশে ইংরেজ শাসন ও সে সুবাদে ইউরোপীয় দর্শন ও সাহিত্য–সংস্কৃতির প্রভাবেই এই ফললাভ ঘটেছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু ইংরেজ– শাসনের প্রভাব বিশ্বের আরো বহু দেশে এবং অঞ্চলেই পড়েছিল বা ঘটবার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছিল; কিন্তু সাধনার ঐকান্তিকতায় এবং মেধার কৌলিণ্যে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; এমনকি নোবেল প্রাইজ লাভের সৌভাগ্যও হয়েছিল। বিষয়, চিন্তা ও প্রকরণগত দিক থেকে বিশ্বসাহিত্যের প্রায় সর্বপ্রকারের নিদর্শন উজ্জ্বল না–হলেও বাংলায় পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল। এই সময় কলকাতাই ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য–সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র। সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতা, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদী ধ্যান– ধারণা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা কিংবা আর্থিক নিশ্চয়তার দাবীও সোচ্চার হয়েছিল। এই রাজনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের পর্বে পাক–ভারত উপমহাদেশের 'হিন্দু' ও 'মুসলমান' ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের অঞ্চলগুলোকে পুনর্বিন্যাসিত করে 'পাকিস্তান' সৃষ্টি করে নিয়েছিল বা ভারত বিভক্ত করে দিয়েছিল। ফলে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির নতুন রাজধানী 'ঢাকা' কে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্য আবার একটি গাছের নতুন কাণ্ডের মতো বিকশিত হতে আরম্ভ করে। বস্তুত সূচনাপর্বে ঢাকা–কেন্দ্রিক সাহিত্যের স্টান্ডার্ড পূর্বসৃষ্টসাহিত্যের সমমানের না–হলেও নিম্নতম পর্যায় থেকেই 'বাংলাদেশের সাহিত্যের' যাত্রা আরম্ভ হয়। 'বাংলাদেশের সাহিত্য' অভিধা একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের অব্যবহিত পরে গড়ে উঠলেও সাতচল্লিশের পরবর্তী পূর্ববাংলায় পূর্ববঙ্গবাসী লেখক–সাহিত্যিকদের সার্বিক প্রয়াসকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু সাতচল্লিশ–একাত্তর সময়কালে 'বাংলাদেশের সাহিত্য' বা পূর্ববাংলার বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে বিতর্ক হয়েছে, তাতে স্পষ্টতই দ্বিধা–দ্বন্দ্ব এবং চিন্তার অস্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। 'পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যের ধারা সম্পূর্ণ বাংলার সাহিত্যের ধারা থেকে হবে ভিন্ন' এই উক্তির মধ্যে ব্যাখ্যার অনেক অবকাশ থাকলেও তৎকালে স্পষ্ট করে এই কথা খুবই কম বলা হয়েছে যে, স্বতন্ত্র পররাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক নিয়মরীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, নৈতিক মানদণ্ড এবং সাহিত্যের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত জনজীবনের প্রকৃতি ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যেরই হবে। তাই প্রায় সকল পত্রিকার অনেকাংশ আলোচনায় সমগ্র বাংলার সাহিত্যের ধারাকে স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি দানের স্থূল বক্তব্যই প্রাধান্য পেয়েছে। বঙ্গবিভাগের পর দুটি স্বতন্ত্র আধুনিক সংজ্ঞায় বিবেচ্য রাষ্ট্রের আওতায় পড়ে বাংলা সাহিত্য যে দুটি স্বতন্ত্র কাণ্ডের অভিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পল্লবিত হয়ে চলবে এই সত্যটি তখন সহজভাবে মেনে না নিলেও বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এ ব্যাপারে আর সংশয়ের অবকাশ নেই। কারণ এতদিনে এই সাহিত্য প্রায় অর্ধশতাব্দীর প্রৌঢ়ের পরিপক্ক, স্বতন্ত্র, স্পষ্টিকৃত ব্যক্তিত্ব নিয়ে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে গেছে। পূর্ববঙ্গ থেকে রাষ্ট্রভাষা–আন্দোলনের চেতনাজাত যে সাহিত্য, মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সম্মুখ–সমরে প্রবৃত্ত হবার উদাত্ত আহবান–সমৃদ্ধ বিপ্লবীসাহিত্য এসবই সৃষ্টি হয়েছে পূর্ববাংলার কবি–সাহিত্যিকদের হাতে। কারণ তাঁরা সাতচল্লিশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করলেও সাংস্কৃতিক

Dhaka University Institutional Repository

এবং অর্থনৈতিক অবরুদ্ধদশার মোচন দেখতে পাননি ; পক্ষান্তরে ভারতের অঙ্গরাজ্য, বাংলাভাষী অঞ্চলের কবি-সাহিত্যিকদের সম্মুখে এই বাস্তব সমস্যা-সংকুল সামাজিক পরিস্থিতি ছিল না। তাঁদের স্বার্থ এবং অগ্রগতির ভাবনা সংশ্লিষ্ট হয়ে গিয়েছিল গোটা ভারতবর্ষের প্রায় শতকোটি অধিবাসীর স্বার্থের সঙ্গে। অবশ্য বাংলাদেশ যে সৃষ্টি হয়েছে সেই সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছে এতদঅঞ্চলের বাংলাসাহিত্যপত্রিকাগুলো।এসবের মধ্যে আবার ষাটের দশকের আগে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রিকা যেমন মোহাম্মদী, মাহেনও, দিলরুবা, নওবাহার, তাহজিব, লেখক সংঘ পত্রিকা, পরিক্রম, সংলাপ প্রভৃতিতে পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী ধ্যান ধারণাই স্বোচ্চার ছিল। সাহিত্যপত্রিকাগুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে এই ধারাই প্রবল দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ১৯৫৮ সনের সামরিক শাসনের পরে, ১৯৬৪ সন থেকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম পুনরুজ্জীবিত হলে বা ১৯৬৫র নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবং কিছুকাল পরে পাক-ভারত যুদ্ধ, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সংগে সাংস্কৃতিক চুক্তি ও তৎপরবর্তী ছয়-দফা আন্দোলনের ফলে পাকিস্তানবাদী, ইসলামী পুনরুজ্জীবনকামী ধারা দুর্বল হতে থাকে, সবল সক্রিয় ও সম্মানীয় প্রগতিশীল ধারারূপে বিকশিত হতে থাকে মানবতাবাদী বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারা। ইমরোজ, সওগাত, সমকাল, পূবালী, পূর্বমেঘ, কণ্ঠস্বর, পলিমাটি, উত্তরণ, নাগরিক এবং এতদানুসারী অসংখ্য অনিয়মিত ক্ষুদ্র পত্রিকা ও সংকলন প্রভৃতির বক্তব্য এবং বিকাশের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করলেই একথা প্রমাণিত হয়। ষাটের দশকে হঠাৎ করে একসঙ্গে একঝাঁক পত্রিকা প্রকাশিত হয় — যেগুলো মানবতাবাদী বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাধারাকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছিল। সমকালের ধারার পরিণতি লক্ষ্য করলে, এটা যেমন স্পষ্ট হয় , তেমনি বিপরীত দিকে পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী ধর্মীয় ধারার পত্রিকাগুলোর পরিণতি দেখলেও তা প্রকটিত হয়। মাহেনও, মোহম্মদী, আল-ইসলাহর ধারায় ১৯৬৫ সনের পর আর কোনো ধার ছিল না, ক্ষয়িষ্ণু মৃত প্রায়, পত্রিকা ধরলেই তা মনে হয়। উপরন্ত পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী পত্রিকাগুলোর মধ্যে ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে যেগুলো প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর রচনার বক্তব্যের মধ্যেও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়। পাকিস্তান সরকার যে পূর্ববঙ্গবাসীদের অবিশ্বাস বা সন্দেহের চোখে দেখে, তা তাঁরাও অভিযোগ আকারে প্রকাশ করতে থাকেন এবং চাপা বিক্ষোভ কিছু কিছু প্রকাশ করছিলেন, তবে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সমর্থন তাঁরা করতে পারছিলেন না; এক্ষেত্রে তাঁরা হতে পেরেছিলেন 'মানবতাবাদী'। কারণ মানবতাবাদী হতে কারোরই বাধা নেই। পাকিস্তানবাদী হয়েও যেমন মানবতাবাদী হওয়া যায়, বাঙালি জাতীয়তাবাদী হয়েও তেমনি মানবতাবাদী হওয়া যায়। পক্ষান্তরে পাকিস্তানবাদী হলেও মানবতাবাদী নন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী হলেও মানবতাবাদী হতে পারেননা— এমনও দেখতে পাওয়া যায়। তবে পাকিস্তানবাদী ধারা নিস্ক্রিয় হয়ে অথবা মানবতাবাদী চারিত্র ধারণ করার ফলে ষাটের দশকের শেষার্ধে গিয়ে অধিকাংশ পত্রিকা বাঙালি জাতীয়তাবাদী অথবা এই ধারার সহায়ক-সহযোগী মানবতাবাদী হয়ে পড়ে। মার্কসীয় মতাদর্শের অনুসারী-অনুরাগীরাও মার্কসবাদের প্রতি ধর্মভীরু বাঙালিদের আনুগত্য হালকা বলে মানবতাবাদী ধারাকেই পুষ্ট করেছেন। ১৯৭০-৭১-এ বাঙা লিজাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়, তার মূলে এই ধারার চিন্তার বিকাশে সহায়ক হয়েছে যেসকল সাহিত্যপত্রিকা— সেগুলোর কৃতিত্বই সর্বাধিক। কিন্তু সাহিত্যিকদের ব্যর্থতা হচ্ছে পাকিস্তান আমলে সাহিত্যপত্রিকার যে ধারাটি সচল রেওয়াজের ন্যায় গড়ে উঠেছিল বাংলাদেশ-আমলে তা প্রায় একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশের সাহিত্যসংস্কৃতি ও সমাজের অগ্রগতিতে সাতচল্লিশ-একাত্তর পর্বের সাহিত্যপত্রিকাগুলো যতো অনিয়মিত, বিক্ষিপ্ত, স্বল্পায়ুই হোকনা কেন, যে অনন্যসাধারণ ভূমিকা রেখেছিল, বাংলাদেশ আমলে তা রক্ষা করতে অনেকটা ব্যর্থ হয়। পাকিস্তান আমলের সাহিত্যপত্রিকার কর্ণধারেরা বাংলাদেশ আমলে সাহিত্যপত্রিকা কিংবা বাঙালিজাতীয়তাবাদী মানবতাবাদী সাহিত্য-সংস্কৃতিচিন্তার গতিধারাকে সক্রিয় রাখতে ব্যর্থ হন, প্রবল করার প্রশ্নই ওঠেনা। এখন দুই দশক (সাতচল্লিশ থেকে সত্তর যতোদূর, ততোখানিই দূরত্বে এসে চুরানব্বইতে) অতিক্রমণের পর একাওরের ক্ষয়িষ্ণু ধারাটিই পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, পত্রপত্রিকা যা বের হয়, তাতে মোহাম্মদী-মাহেনও- দিলরুবাই যেনো নতুন নামে বিচিত্র রূপে প্রকাশিত হচ্ছে বলে মনে হয়। সমকালের ধারাটি এখন অবরুদ্ধ, চাপের মধ্যে মৃতপ্রায় ক্ষীণায়ু কৃশকায়। ঔপনিবেশিক আমলে এদেশ থেকে একই সঙ্গে একগুচ্ছ মাসিক-দ্বিমাসিক-ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। পাকিস্তানের প্রায় সমানবয়সী স্বাধীন বাংলাদেশ আমলে একটি-দুটি মাসিক সাহিত্যপত্রিকাও নিয়মিত প্রকাশিত হয়নি। দুই তিনটি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের আশ্বাস দিয়েও পৃষ্ঠপোষকতার অথবা পাঠক এর অভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। এমনকি সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা এখন নিতান্তই অপাংক্তেয় পেশা রূপে গণ্য হয়েছে। বৈশ্যবৃত্তির সাফল্য নেই যে সাহিত্যকর্মে — তা এখন অবজ্ঞার স্বীকার। সাহিত্যপত্রিকার প্রতি সমাজের আগ্রহ বর্তমানে স্তিমিতপ্রায়। এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য দরকার সমকাল-পূর্বমেঘের মতো একদল নিয়মিত মাসিক-দ্বিমাসিক-ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রিকার আবির্ভাব। এ ঘটনা যতো দেরীতে না ঘটবে, ততোই সমাজের জন্য কল্যাণকর হবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট – ক :

প্রথম প্রকাশের সন ও সম্পাদকের নামসহ
আলোচিত পত্রিকার নাম (বর্ণানুক্রমিক)

অগত্যা ১৯৪৯ ফজলে লোহানী
অন্ন চাই আলো চাই ১৯৪৯ মহিউদ্দিন
অভিযান ১৯৫৪ মোঃ আকবর হোসেন বি. এ.
অতএব ১৯৬০ মহসিন আলী দেওয়ান
আল-ইসলাহ্ ১৯৩২ মওলবী মুহম্মদ নুরুল হক
ইমরোজ ১৯৪৯ মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ
উত্তরণ ১৯৫৮ এনামুল হক
উত্তর-অন্বেষা ১৯৬৭ মযহারুল ইসলাম
একান্ত ১৯৬৭ মোঃ আবদুল মান্নান
কৃষ্টি ১৯৪৭ সুধাংশু রায়, প্রভাত সরকার প্রমুখ
কণ্ঠস্বর ১৯৬৫ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
কিছুধ্বনি ১৯৭০ বেবী আনওয়ার
গণমন ১৯৬৩ আবদুর রাজ্জাক
ছোটগল্প ১৯৬৮ কামাল বিন মাহতাব
জাগরী ১৯৫৬ হেমায়েত হোসেন
তাহজিব ১৯৫০ সৈয়দ আবদুল মান্নান
দ্যুতি ১৯৪৯ আবেদ আলী
দিলরুবা ১৯৪৯ কাজী মোতাহার হোসেন
দিশারী ১৯৫০ হাবীবুর রহমান ও একরামুল হক
দিগন্ত ১৯৫৩ বেগম এম. ই. খান
দিগন্ত ১৯৬৬ আবদুল কাদির মাহমুদ
নওরোজ ১৯৪২ মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেন বি. এল
নওবাহার ১৯৪৯ মাহফুজা খাতুন
নাগরিক ১৯৬৪ বোরহান উদ্দিন ভূঁইয়া
পরিচিতি ১৯৫১ মফিজুউল হক (সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি)
প্রাচী ১৯৫৭ সুচরিত চৌধুরী ও ওয়ালী আহমেদ
পরিচিতি ১৯৫৯ সুবোধ দাশগুপ্ত
পূর্বমেঘ ১৯৬০ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও মুস্তাফা নূরউল ইসলাম
পরিচয় ১৯৬০ রোকেয়া সুলতানা
পূবালী ১৯৬০ মোঃ নুরুল ইসলাম
পূরবী ১৯৬০ গোলাম মোস্তফা ও মুহম্মদ আবদুল হাই
প্রবাহ ১৯৬১ এস. এম. রহমান
পরিক্রম ১৯৬২ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও রফিকুল ইসলাম
পূর্বমেঘ ১৯৬৬ ভূঁইয়া ইকবাল

পলিমাটি ১৯৬৪ ফজলুল হক সরকার
পূর্বাশা ১৯৭০ আবদুল জব্বার
বিবর্তন ১৯৬০ আবদুল মান্নান ভূঁইয়া
বই বিচিত্রা ১৯৬০
বর্তমান ১৯৬২ মাহবুব জামিল
বিচিত্রিতা ১৯৬২ খালেদা রহমান
বর্ণালী ১৯৬৪ ওসমান গনি
বই ১৯৬৫ সরদার জয়েনউদ্দীন
বনানী ১৯৬৬ তাজুল ইসলাম ও মোহাম্মদ নুরুল আমিন
বালার্ক ১৯৭০ শা. ম. শ. আরেফিন বাদল
মোহাম্মদী ১৯২৭ মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ
মাহেনও ১৯৪৯ আবদুর রশিদ
মুকুতি ১৯৫০ আবদুল গনি হাজারী ও মাহবুব জামাল জাহেদী
মেঘনা ১৯৫৭ আবদুল গাফফার চৌধুরী
মৌসুম ১৯৬৪ মীজানুর রহমান শেলী
মেঘনা ১৯৬৭ সেকান্দার হায়াৎ মজুমদার
যাত্রিক ১৯৫৩ আবদুল আলীম চৌধুরী ও আহমদ কবির
যাত্রী ১৯৬০ খোন্দকার আমিনুল হক ও খোন্দকার সিরাজুল হক
যুববাণী ১৯৬০ মুহম্মদ ওসমান গনি
লেখক সংঘ পত্রিকা ১৯৬১ গোলাম মোস্তফা
সওগাত ১৯১৮ মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন
সীমান্ত ১৯৪৭ মাহবুব উল আলম চৌধুরী ও সুচরিত চৌধুরী
সংকেত ১৯৪৮ সিরাজুর রহমান
সমকাল ১৯৫৭ সিকানদার আবু জাফর
স্পন্দন ১৯৫৩ মহিউদ্দিন আহমদ
সংলাপ ১৯৬১ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ও আবুল হোসেন
সাহিত্য ১৯৬০ হেমায়েত হোসেন
সুন্দরম্ ১৯৬৩ আবুল কাসেম ফজলুল হক
স্বাক্ষর ১৯৬৩ রফিক আজাদ ও সিকদার আমিনুল হক
স্বদেশ ১৯৬৩ মফিজউদ্দিন আলী মহামেদ চৌধুরী
সৈকত ১৯৬৩ মাসুদ আহমেদ
সুনিকেত মল্লার ১৯৬৭ মহসিন রেজা
সুরভি ১৯৬৮ কাজী মোহাম্মদ ইউসুফ
সাম্প্রতিক ১৯৭০ আমিনুল ইসলাম বেদু

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

সওগাত

▪ সচিত্র মাসিক পত্র ▪

সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন

পৌষ—১৩৬৫

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

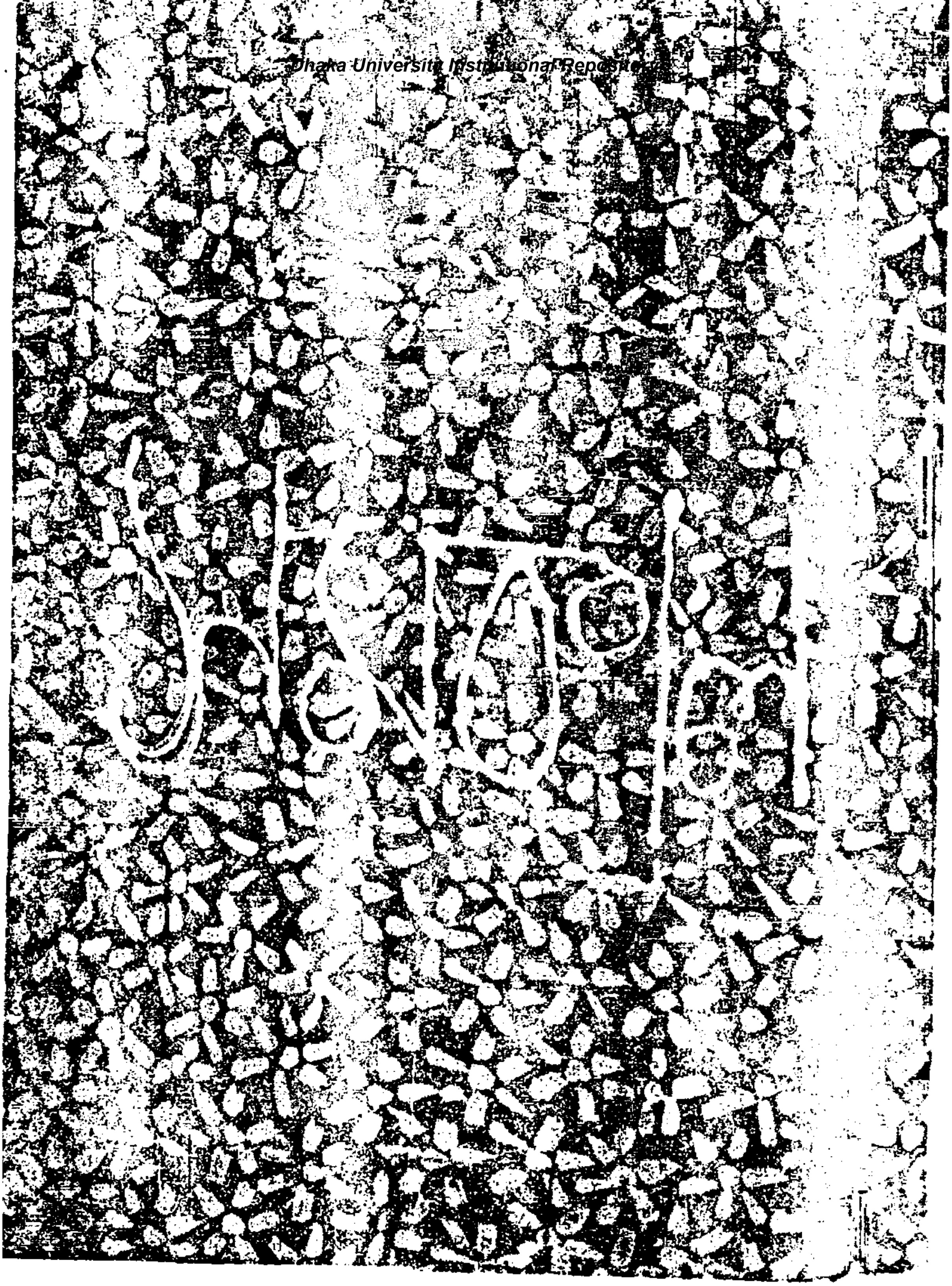

৬৬০

Dhaka University Institutional Repository

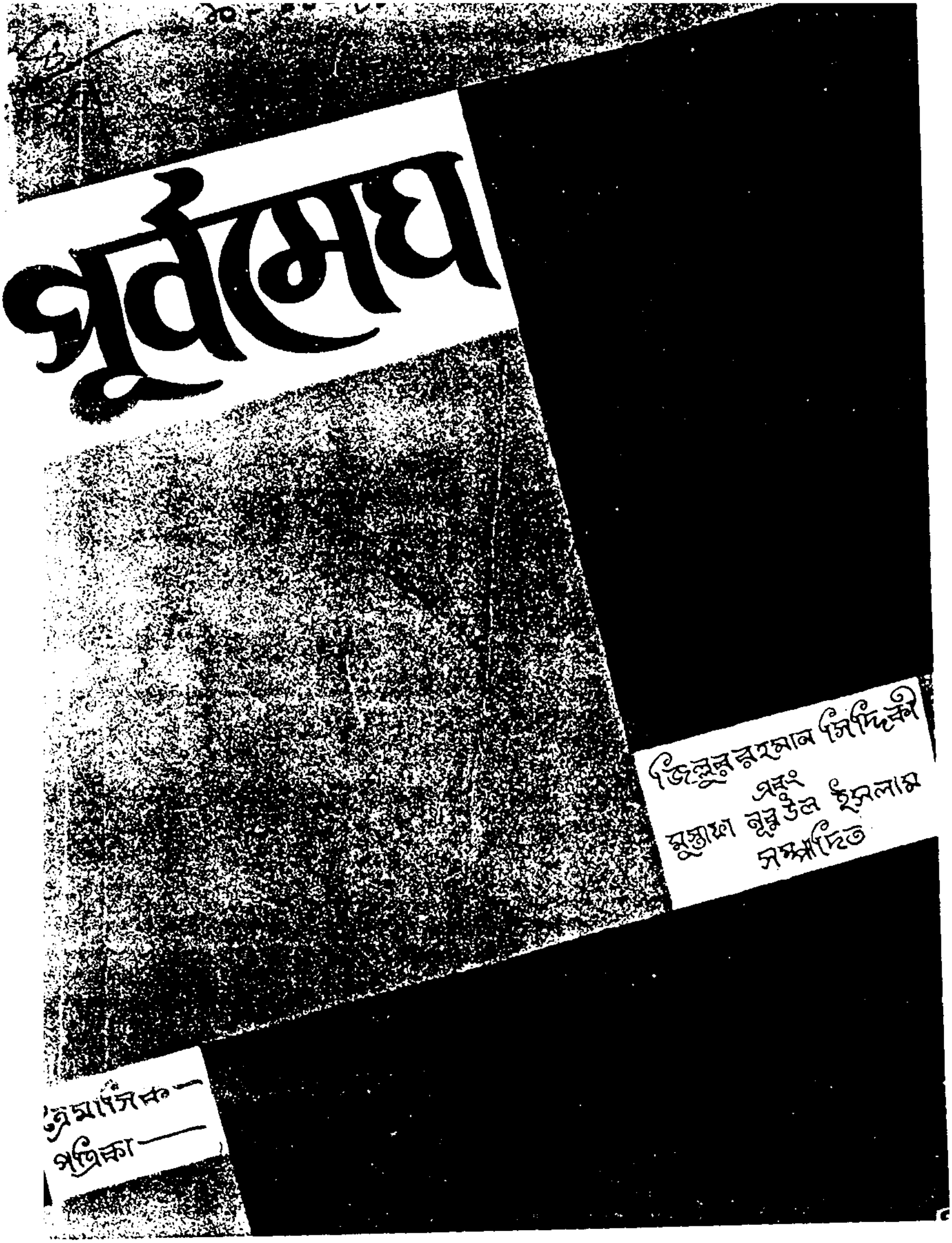

Dhaka University Institutional Repository

পরিক্রম

● চতুর্থ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা : শ্রাবণ, ১৩৭২ ●

৩৬২

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

কণ্ঠস্বর

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬

Board for Development of Bengali LIBRARY

সূচীপত্র

প্রবন্ধ :

আবদুল মান্নান সৈয়দ — শব্দের পাপ ও অন্যান্য অনুষঙ্গ

কবিতা :

আসাদ চৌধুরী — বিষণ্ণ স্বদেশ

রফিক আজাদ — ডাক

মোহাম্মদ রফিক — দুটো কবিতা

আফজাল চৌধুরী — দুটো কবিতা

হায়াৎ সাইফ — নগরী : কুহক : সমুদ্র

গল্প :

হাসান আজিজুল হক — আপন অন্ধকারে

শহীদুর রহমান — আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়

আলোচনা :

প্রশান্ত ঘোষাল — নতুন বিতর্কে ২

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত

সংলাপ

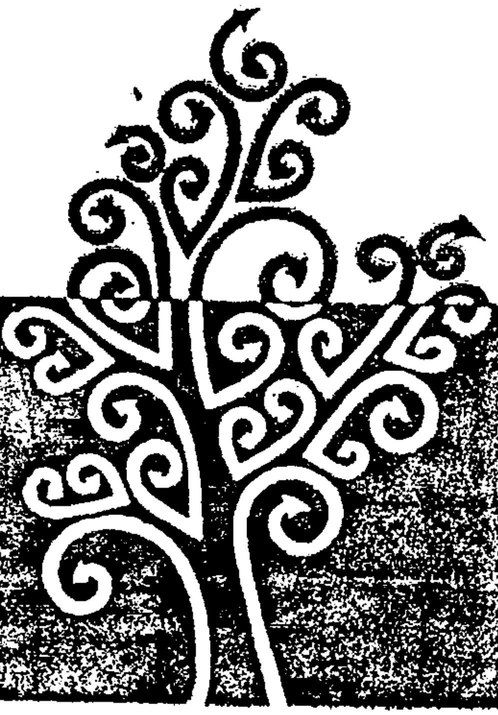

সম্পাদনায় :
সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন
আবুল হোসেন

ইমরোজ

১ম সংখ্যা | আশ্বিন : ১৩৫৬ | ১ম বর্ষ

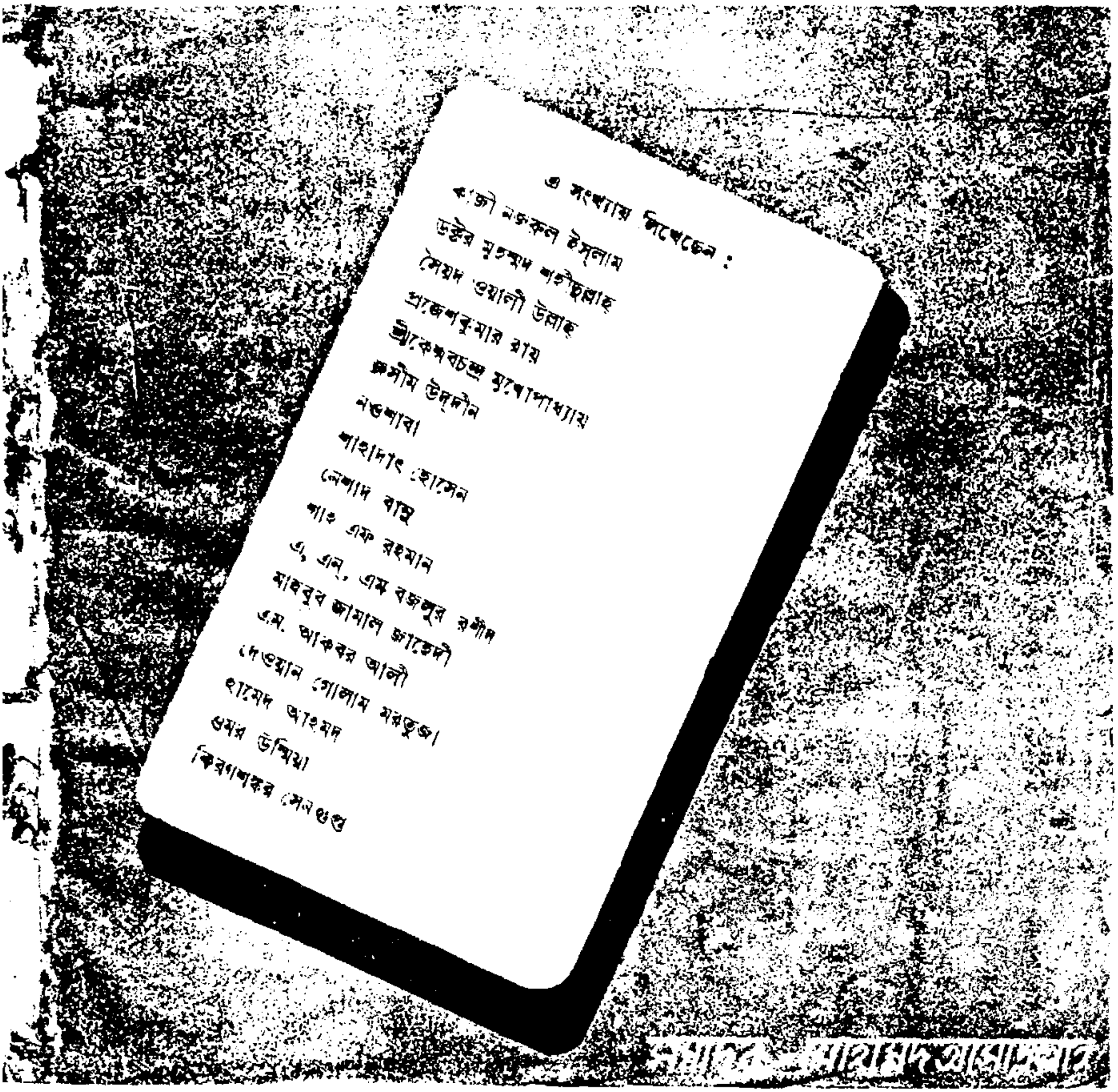

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদনা করেছেন [illegible] চৌধুরী

মুহম্মদ মুজাদ্দেদ, কর্তৃক ২৫৭, এলিফ্যান্ট রোড, সাউথ, ধানমণ্ডী, ঢাকা—২ থেকে প্রকাশিত এবং প্রবাহ মুদ্রায়ন, ৩৭, আগামসি লেন, ঢাকা—২ থেকে আরেফুস সালাম কর্তৃক মুদ্রিত। মূল্য: পঞ্চাশ পয়সা।

Abdul Hai

স্বাক্ষর

চতুর্থ সংকলন

রফিক আজাদ ও রণজিৎ পাল চৌধুরী সম্পাদিত

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
আবদুল মান্নান সৈয়দ
আসাদ চৌধুরী
আফজাল চৌধুরী
শওকত আনোয়ার
মোহাম্মদ রফিক
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
হুমায়ুন কবির
[illegible]
[illegible]
[illegible]
আবু কায়সার
সৈয়দ আবু [illegible]
মাহবুব হোসেন [illegible]
রফিক আজাদ
রণপা চৌধুরী

Dhaka University Institutional Repository

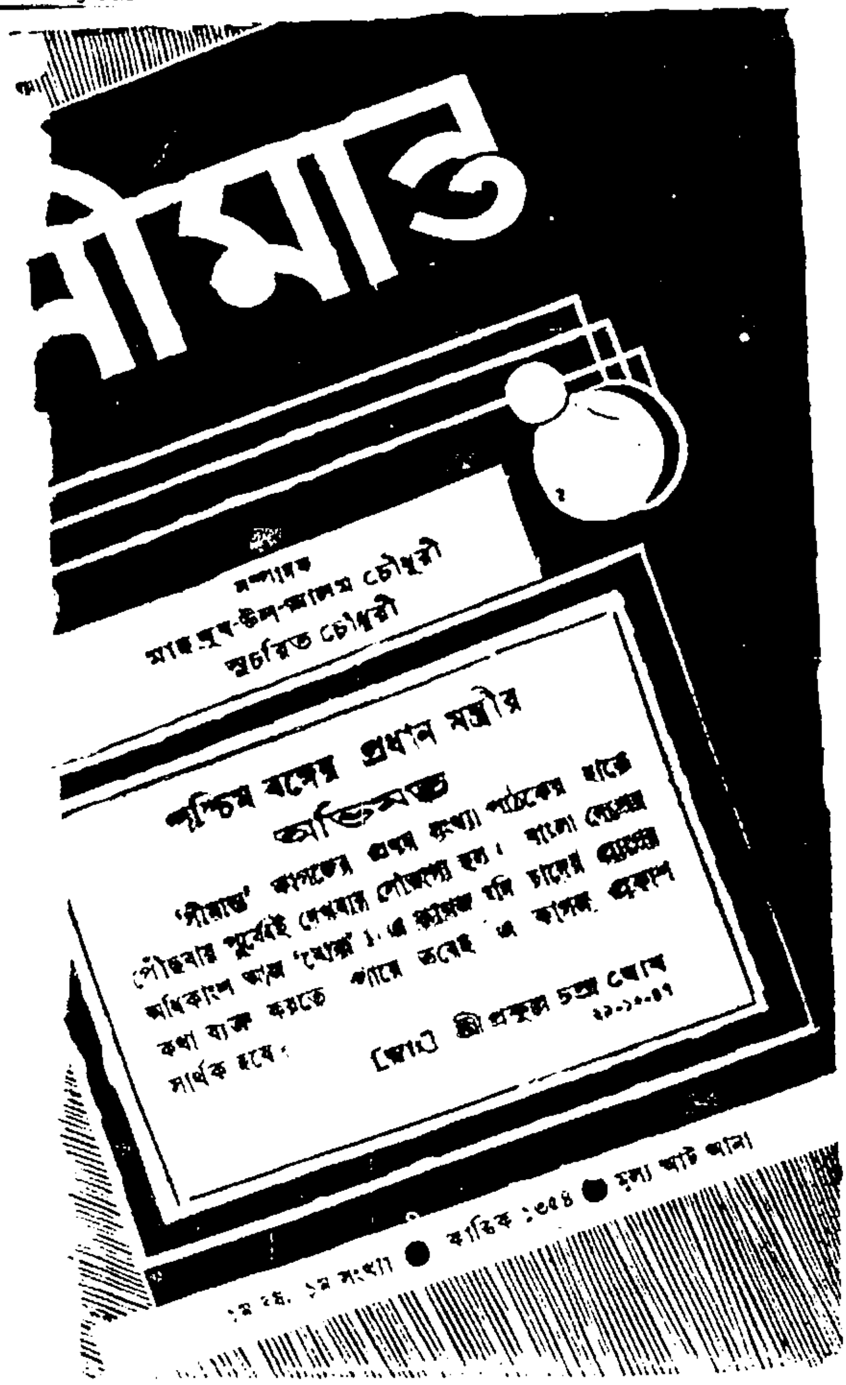

'সীমান্ত' পত্রিকার প্রচ্ছদ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। কার্তিক ১৩৫৪
(অধ্যাপক মাহবুবুল হকের সৌজন্যে)

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

চ্ছ
কোং
জুতা, মহিলাদের
দি, প্রসাধন
, আলোয়ান,
সমারোহ
জন্যই
বন
ঢাকা
ত্র।

সওগাত

কৃতজ্ঞতা

জীবনের পরিস্থিতে যাঁরা আজ বহিঃকেন্দ্রিক শক্তির আঘাতে ছিটকে পড়ে কোন এক অজানা পথে পা বাড়ালো, সেই লক্ষ কোটি ক্লিষ্ট মানুষের শান্তির আহ্বান যেন জয়যুক্ত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

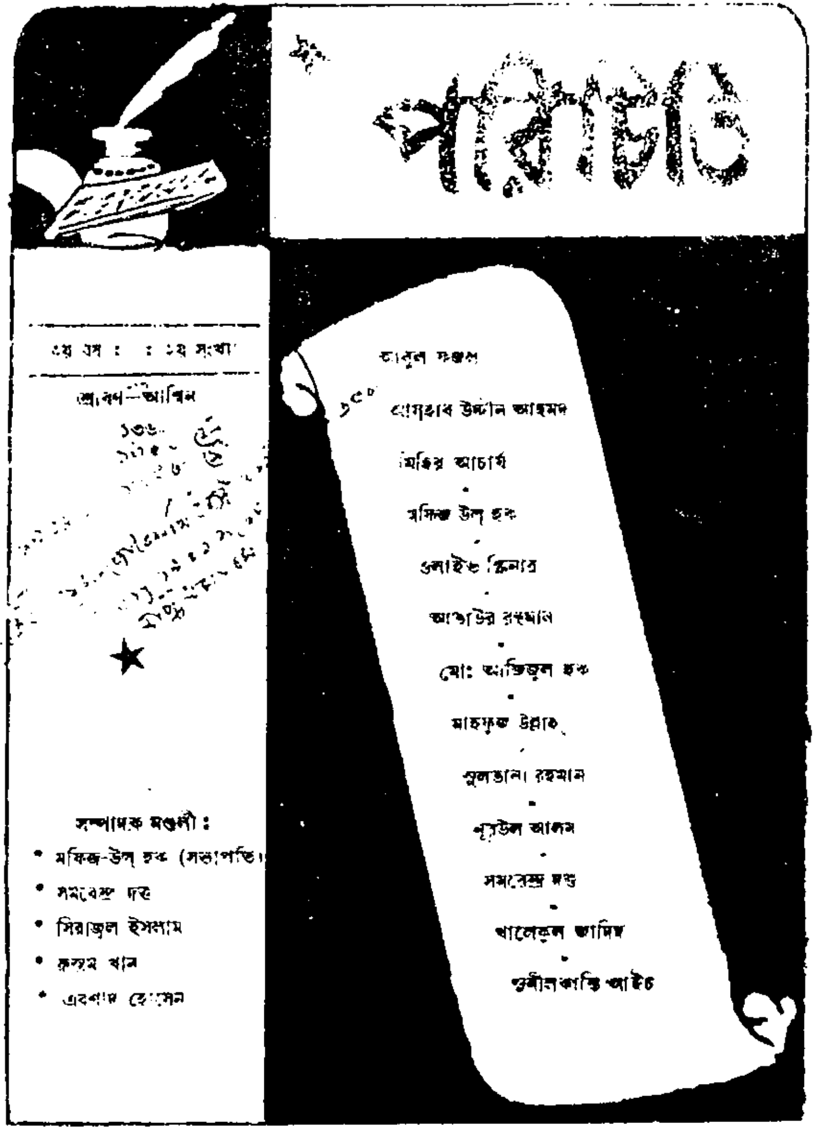

'পরিচিতি' পত্রিকার প্রচ্ছদ। ৩য় বর্ষঃ ২য় সংখ্যা। শ্রাবণ - আশ্বিন ১৩৬০
(সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি মফিজ-উল হকের সৌজন্যে)।

১৫ই মার্চ ১৯৭১ এ চট্টগ্রাম "শিল্পী সাহিত্যিক সংস্কৃতিসেবীদের প্রতিরোধ সংঘ" আয়োজিত অনুষ্ঠানে সমবেত দর্শক শ্রোতাদের জন-সমুদ্রের একাংশ। (মৃনাল সরকারের সৌজন্যে)

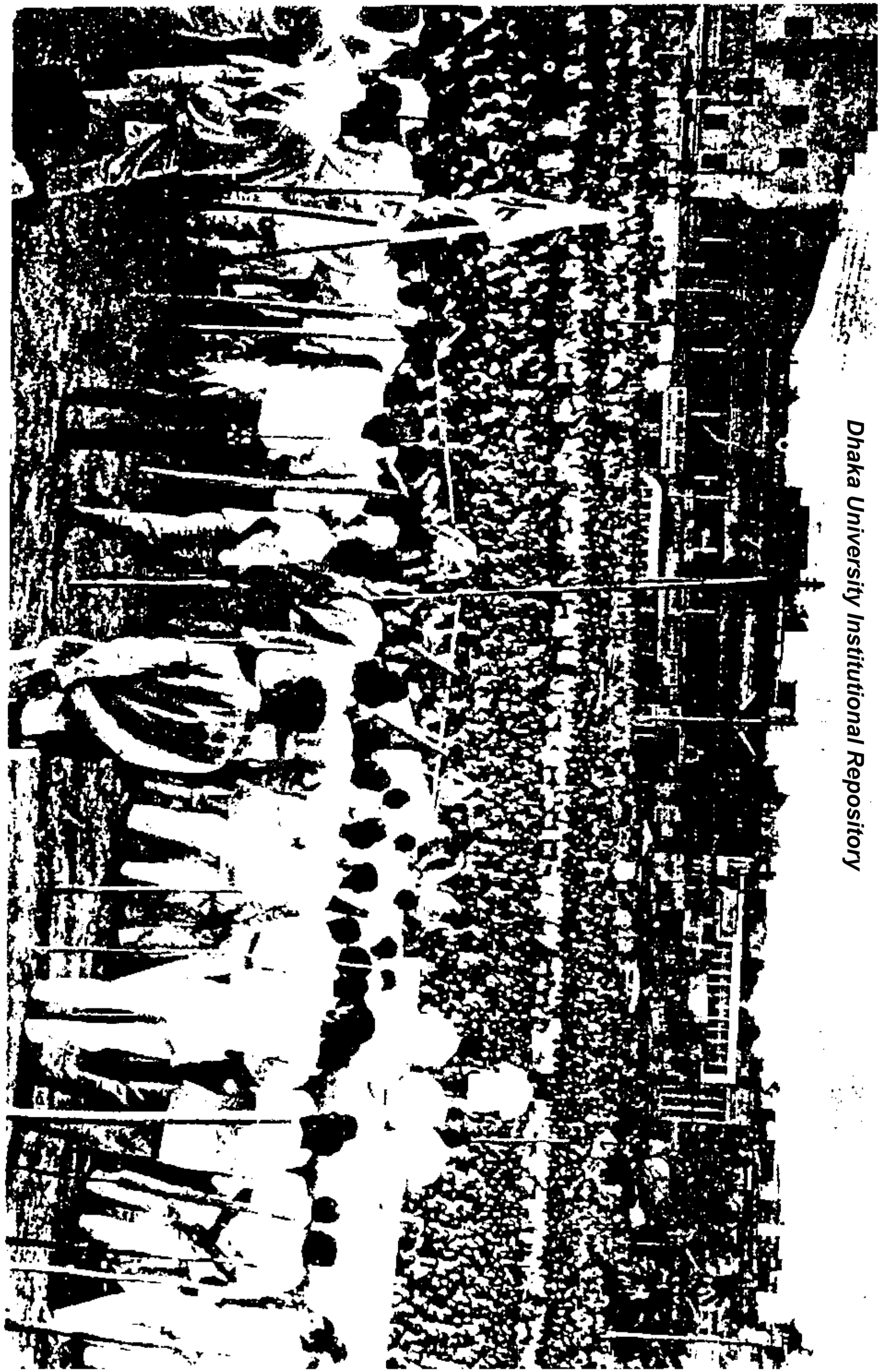

Dhaka University Institutional Repository

পলিমাটি

সম্পূর্ণনতুনদৃষ্টিভঙ্গিরঅনিয়মিতসাহিত্যসংকলনপলিমাটিরউন্মোচিতদ্বিতীয়প্রয়াসবর্ষাতেরশতচুয়াত্তর

উপদ্রুত ক্রান্তি লগ্নে দুর্বিনীত হাওয়ার প্লাবন
জীবনের অর্থ খুঁজি সন্ত্রাসের বিবস্ত্র প্রচ্ছায়
জানিনা উন্মীলিত জীবনের স্বর্ণ কারুকাজ
সৃষ্টি-সুখ অহঙ্কারে পৃথিবীর কোথায় অঙ্কিত
জানিনা মনুষ্যত্বের ঘরে কেন বিপন্ন বাসর
বঞ্চিত প্রেমের জন্য অহরহ হাতড়ায় মন
এখানে আদিম সুখে শ্বাপদ সংকুল জনপদে
সন্দিগ্ধ পৌরুষ তাই নিরন্তর তোলে বিষ ফণা
বিদ্রোহী আত্মারা আজ বিদ্রোহের মন্ত্র ভুলে আছে
চৈতন্য মগ্ন বুঝি বিনাশ্রম ঘুমের আস্বাদে

মননেচিন্তায়কল্পনায়ওকর্মেপলিমাটিসার্বভৌমজীবনেরজয়গানযারসঙ্গেপাঠকস্বনির্ভরতায়একাত্মহবেন

সম্পাদক ● মফজলুল হক সরকার

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম বর্ষ   প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা · ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বি-মাসিক

সাহিত্য-পত্র

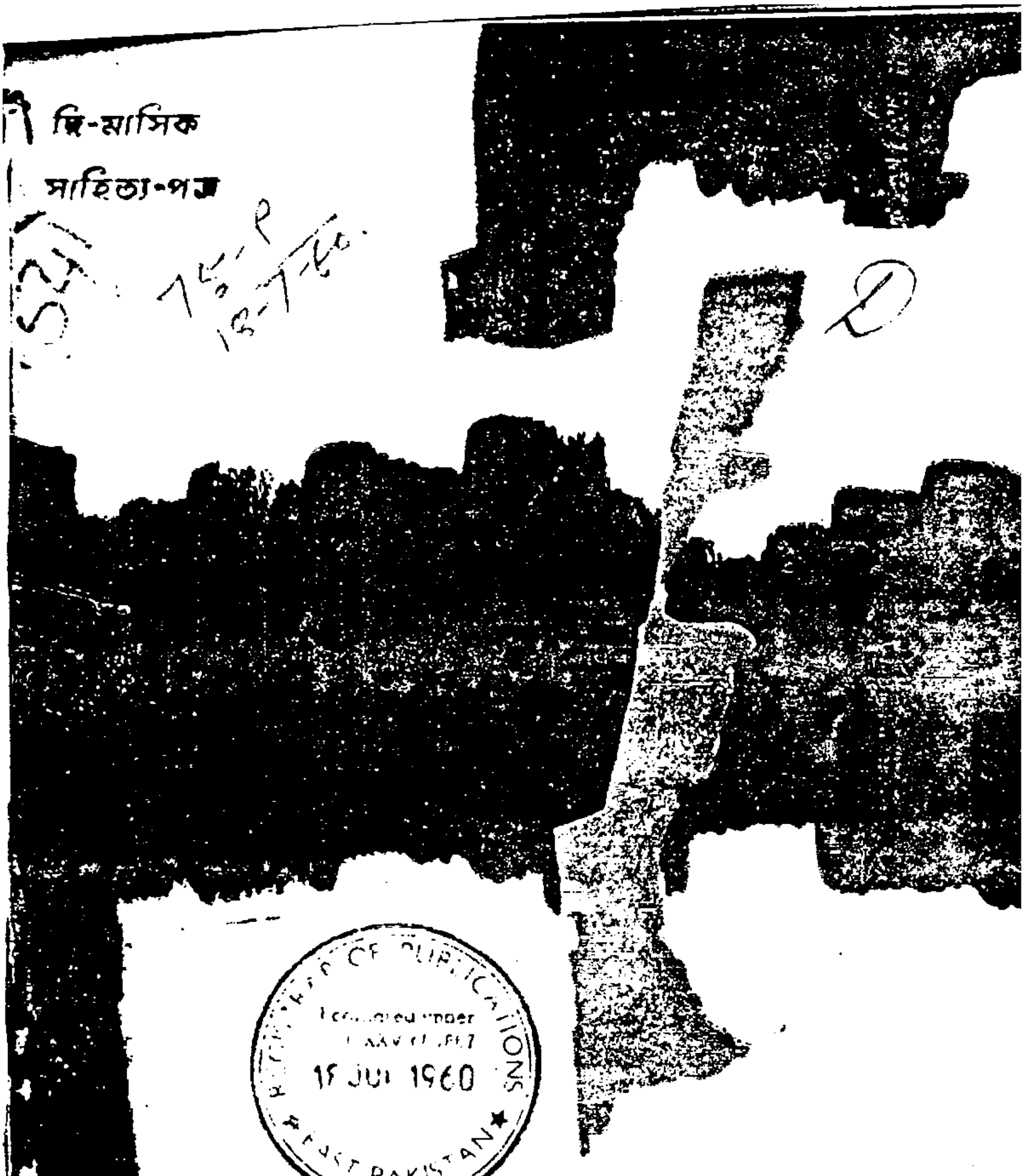

... OF PUBLICATIONS
... EAST PAKISTAN
19 JUL 1960

উত্তরণ

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা ॥ পৌষ-মাঘ ॥ ১৩৬৬

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান নবযুগ প্রবর্তন

অভিযান

—তৃতীয় বার্ষিক সংখ্যা : : ১৯৫৬-৫৭ সাল—

"দেশের জাতির লজ্জা গ্লানি কলঙ্ক ও অপমান
তোমার তেজেই দগ্ধ হবে জাগবে বুকে নূতন প্রাণ।"

—নজরুল ইসলাম

—সম্পাদক—

মোঃ আকবর হোসেন